প্রবাসী

চিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন

১৩১৯

১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

প্রবাসী

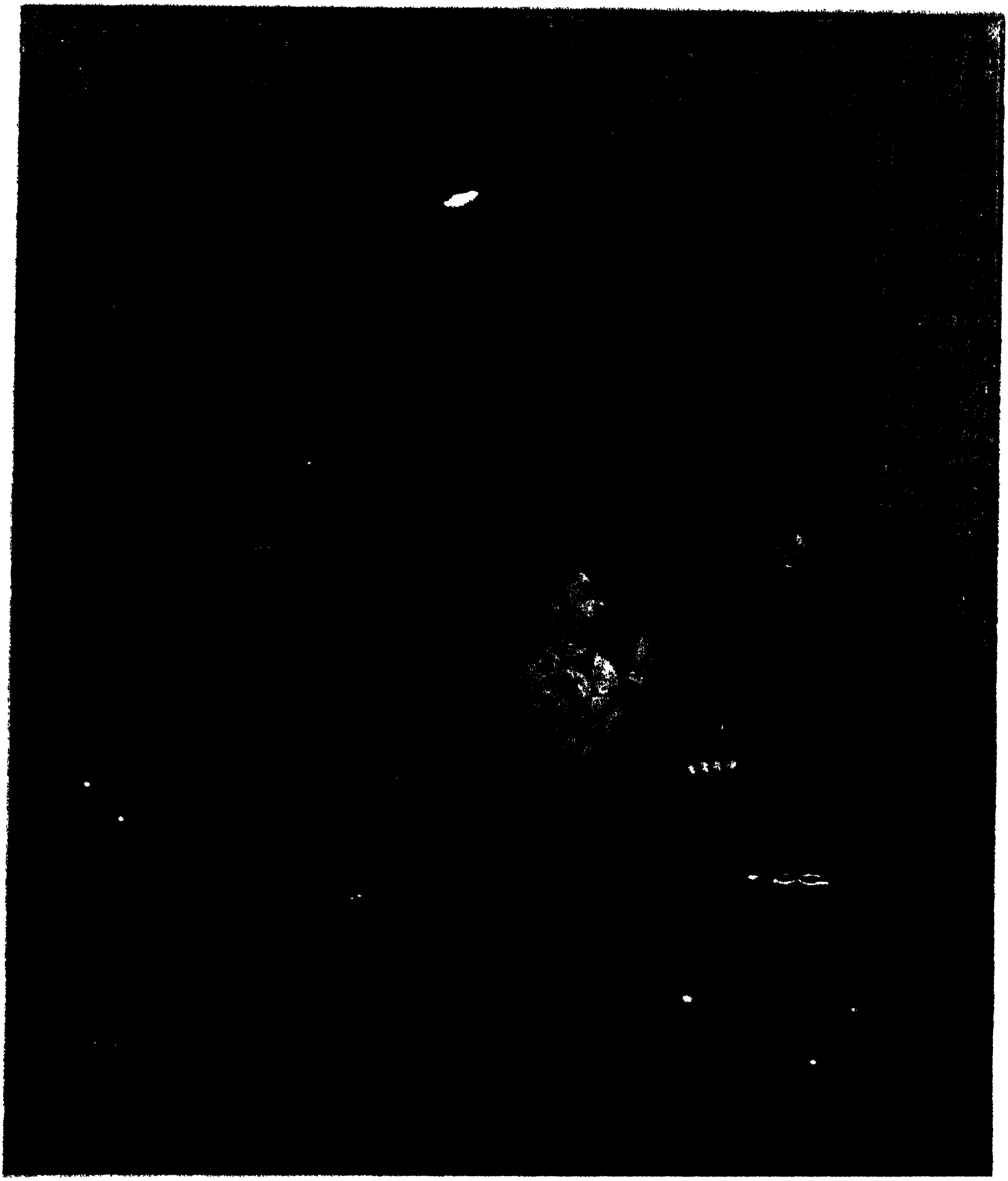
বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন ১৩১৯)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বর্ণানুক্রমিক চিত্রসূচী



পূজা।

শ্রীযুক্ত আনন্দ কে, কুমারস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি প্রাচীন চিত্র হইতে।

Three colour blocks by U. Ray & Sons. *Kuntaline Press, Calcutta.*

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩১৯

১ম সংখ্যা

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

একজন বিখ্যাত চিত্রকরের মুখে শুনিয়াছিলাম, দৃষ্টিশক্তির অত্যন্ত প্রখরতা ছবি আঁকার পক্ষে অনুকূল অবস্থা নহে। সমস্ত খুঁটিনাটিই যদি বেশি করিয়া চোখে পড়ে তবে মোট জিনিষটাকে মনের মধ্যে এক করিয়া লইয়া দেখা শক্ত হয়—তখন খুঁটিনাটিগুলা সমগ্রের অনুগত হয় না, সমগ্রটা কেবলমাত্র খুঁটিনাটির সমষ্টি হইয়া উঠে।

ঐ মোট জিনিষটাকে মনের মধ্যে দেখার দিকেই ভারতবর্ষের যত ঝোঁক—সেই জন্য ঐ চোখের দেখাটাকে আমাদের দেশে যথাসম্ভব খাটো করিয়া লইয়াছে। তাই ভারতবর্ষ, কি জ্ঞান কি কর্ম্ম সকল দিকেই উপকরণের ভিড়টাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে—নহিলে এই সমগ্রের দিকে মনটাকে চালনা করিবার খোলসা জায়গা পাওয়া যায় না।

সকল সভ্য জাতিই আপনার ইতিহাসের ছোট বড় সমস্ত উপকরণ জমাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই উপকরণসঞ্চয় দেখি না। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে তারিখ ও নামের পুঞ্জীকৃত তালিকা পাওয়া অসম্ভব। ইহার অসুবিধা নাই যে তাহা নহে—কিন্তু সুবিধাও আছে। বাহুল্যের দ্বারা প্রচ্ছন্ন না থাকাতে ইতিহাসের সমগ্রটাকে ভারতবর্ষে মোট.দৃষ্টির দ্বারা দেখিয়া লওয়া সহজ।

সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই একটা নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, নিদ্রা ও জাগরণের পালা আছে;—একবার ভিতরের দিকে একবার বাহিরের দিকে নামা উঠার ছন্দ নিয়তই চলিতেছে। থামা এবং চলার অবিরত যোগেই বিশ্বের গতিক্রিয়া সম্পাদিত। বিজ্ঞান বলে বস্তু মাত্রই সছিদ্র, অর্থাৎ "আছে" এবং "নাই" এই দুইয়ের সমষ্টিতেই তাহার অস্তিত্ব। এই আলোক ও অন্ধকার, প্রকাশ ও অপ্রকাশ এমনি ছন্দে ছন্দে যতি রাখিয়া চলিতেছে যে তাহাতে সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে না, তাহাকে তালে তালে অগ্রসর করিতেছে।

ঘড়ির ফলকটার উপরে মিনিটের কাঁটা ও ঘণ্টার কাঁটার দিকে তাকাইলে মনে হয় তাহা অবাধে একটানা চলিয়াছে কিম্বা চলিতেছেই না। কিন্তু সেকেণ্ডের কাঁটা লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় তাহা টিক্‌টিক্ করিয়া লাফ দিয়া দিয়া চলিতেছে। দোলনদণ্ডটা যে একবার বামে থামিয়া দক্ষিণে যায়, আবার দক্ষিণে থামিয়া বামে আসে তাহা ঐ সেকেণ্ডের তালে লয়েই ধরা পড়ে। বিশ্বব্যাপারে আমরা ঐ মিনিটের কাঁটা ঘড়ির কাঁটাটাকেই দেখি কিন্তু যদি তাহার অণুপরিমাণকালের সেকেণ্ডের কাঁটাটাকে দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম বিশ্ব নিমেষে নিমেষে থামিতেছে ও চলিতেছে—তাহার একটানা তানের মধ্যে পলকে পলকে লয় পড়িতেছে। সৃষ্টির দ্বন্দ্বদোলকটির এক প্রান্তে হাঁ অন্য প্রান্তে না, একপ্রান্তে এক অন্য প্রান্তে দুই, একপ্রান্তে আকর্ষণ অন্য প্রান্তে বিকর্ষণ, একপ্রান্তে কেন্দ্রের অভিমুখী

ও অন্য প্রান্তে কেন্দ্রের প্রতিমুখী শক্তি। তর্কশাস্ত্রে এই বিরোধকে মিলাইবার জন্য আমরা কত মতবাদের অসাধ্য ব্যায়ামে প্রবৃত্ত, কিন্তু সৃষ্টিশাস্ত্রে ইহারা সহজেই মিলিত হইয়া বিশ্বরহস্যকে অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিতেছে।

শক্তি জিনিষটা যদি একলা থাকে তবে সে নিজের একঝোঁকা জোরে কেবল একটা দীর্ঘ লাইন ধরিয়া ভীষণ উদ্ধতবেগে সোজা চলিতে থাকে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না; কিন্তু শক্তিকে জগতে একাধিপত্য দেওয়া হয় নাই বলিয়াই, বরাবর তাহাকে জুড়িতে জোড়া হইয়াছে বলিয়াই দুইয়ের উল্টাটানে বিশ্বের সকল জিনিষই নম্র হইয়া গোল হইয়া সুসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে। সোজা লাইনের সমাপ্তিহীনতা, সোজা লাইনের অতি তীব্র তীক্ষ্ণ কৃশতা বিশ্বপ্রকৃতির নহে; গোল আকারের সুন্দর পরিপুষ্ট পরিসমাপ্তিই বিশ্বের স্বভাবগত। এই এক শক্তির একাগ্র সোজা রেখায় সৃষ্টি হয় না—তাহা কেবল ভেদ করিতে পারে, কিন্তু কোনো কিছুকেই ধরিতে পারে না, বেড়িতে পারে না, তাহা একেবারে রিক্ত, তাহা প্রলয়েরই রেখা; রুদ্রের প্রলয়পিনাকের মত তাহাতে কেবল একই সুর, তাহাতে সঙ্গীত নাই; এই জন্য শক্তি একক হইয়া উঠিলেই তাহা বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। দুই শক্তির যোগেই বিশ্বের যত কিছু ছন্দ। আমাদের এই জগৎকাব্য মিত্রাক্ষর—পদে পদে তাহার জুড়িজুড়ি মিল।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই ছন্দটি যত স্পষ্ট এবং বাধাহীন, মানবপ্রকৃতির মধ্যে তেমন নহে। সেখানেও এই সঙ্কোচন ও প্রসারণের তত্ত্বটি আছে—কিন্তু তাহার সামঞ্জস্যটিকে আমরা সহজে রাখিতে পারি না। বিশ্বের গানে তালটি সহজ, মানুষের গানে তালটি বহু সাধনার সামগ্রী। আমরা অনেক সময়ে দ্বন্দ্বের এক প্রান্তে আসিয়া এমনি ঝুঁকিয়া পড়ি যে অন্য প্রান্তে ফিরিতে বিলম্ব হয় তখন তাল কাটিয়া যায়, প্রাণপণে ত্রুটি সারিয়া লইতে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতে হয়। একদিকে আত্ম, একদিকে পর; একদিকে অর্জ্জন, একদিকে বর্জ্জন; একদিকে সংযম, একদিকে স্বাধীনতা; একদিকে আচার, একদিকে বিচার মানুষকে টানিতেছে; এই দুই টানার তাল বাঁচাইয়া সমে আসিয়া পৌঁছিতে শেখাই মনুষ্যত্বের শিক্ষা; এই তাল-অভ্যাসের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস। ভারতবর্ষে সেই তালের সাধনার ছবিটিকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সুযোগ আছে।

গ্রীস রোম ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন মহাসভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতিসংঘাত আছে। এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুরামাত্রায় জাগিয়া উঠে। এইরূপ সংঘাতেই মানুষ রূঢ়িক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।

পর্দ্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাঙ্কেই আমরা আর্য্য-অনার্য্যের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত দেখিতে পাই। এই সংঘাতের প্রথম প্রবলবেগে অনার্য্যের প্রতি আর্য্যের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাক্কায় আর্য্যেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল।

এইরূপ সংহত হইবার অপেক্ষা ছিল। কারণ, ভারতবর্ষে আর্য্যেরা কালে কালে ও দলে দলে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই গোত্র, দেবতা ও মন্ত্র যে একই ছিল তাহা নহে। বাহির হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাঁহাদিগকে বাধা না দিত তবে এই আর্য্য উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নানা শাখা প্রতিশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাহারা আপনাদিগকে এক বলিয়া জানিতে পারিত না। আপনাদের সামান্য বাহ্য ভেদগুলিকেই বড় করিয়া দেখিত। পরের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াই আর্য্যেরা আপনাকে আপন বলিয়া উপলব্ধি করিলেন।

বিশ্বের সকল পদার্থের মত সংঘাত পদার্থেরও দুই প্রান্ত আছে—তাহার একপ্রান্তে বিচ্ছেদ, আর এক প্রান্তে মিলন। তাই এই সংঘাতের প্রথম অবস্থায় স্ববর্ণের ভেদরক্ষার দিকে আর্য্যদের যে আত্মসঙ্কোচন জন্মিয়াছিল সেইখানেই ইতিহাস চিরকাল থামিয়া থাকিতে পারে না। বিশ্বছন্দতত্ত্বের নিয়মে আত্মপ্রসারণের পথে মিলনের দিকে ইতিহাসকে একদিন ফিরিতে হইয়াছিল।

অনার্য্যদের সহিত বিরোধের দিনে আর্য্যসমাজে যাঁহারা বীর ছিলেন জানিনা তাঁহারা কে? তাঁহাদের চরিতকাহিনী ভারতবর্ষের মহাকাব্যে কই তেমন করিয়া ত বর্ণিত হয় নাই। হয় ত জনমেজয়ের সর্পসত্রের কথায়

মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রাচীন যুদ্ধ-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। পুরুষানুক্রমিক শত্রুতার প্রতিহিংসা সাধনের জন্য সর্প-উপাসক অনার্য্য নাগজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিবার জন্য জনমেজয় নিদারুণ উদ্যোগ করিয়াছিলেন এই পুরাণ-কথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে বটে তবু এই রাজা ইতিহাসে ত কোনো বিশেষ গৌরব লাভ করেন নাই।

কিন্তু অনার্য্যদের সহিত আর্য্যদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসায়ে যিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তিনি আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

আর্য্য অনার্য্যের যোগবন্ধন তখনকার কালের যে একটি মহা উদ্যোগের অঙ্গ, রামায়ণ-কাহিনীতে সেই উদ্যোগের নেতারূপে আমরা তিনজন ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই। জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এই তিন জনের মধ্যে কেবলমাত্র একটা ব্যক্তিগত যোগ নহে একটা একঅভিপ্রায়ের যোগ দেখা যায়। বুঝিতে পারি রামচন্দ্রের জীবনের কাজে বিশ্বামিত্র দীক্ষাদাতা—এবং বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সম্মুখে যে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তিনি জনক রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সম-সাময়িক ছিলেন সে কথা হয় ত বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্ত্তী। আকাশের যুগ্মনক্ষত্র-গুলিকে কাছে হইতে দেখিতে গেলে মাঝখানকার ব্যবধানে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখায়—তাহারা যে জোড়া তাহা দূর হইতে সহজেই দেখা যায়। জাতীয় ইতিহাসের আকাশেও এইরূপ অনেক জোড়া নক্ষত্র আছে, কালের ব্যবধানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের ঐক্য হারাইয়া যায়—কিন্তু আভ্যন্তরিক যোগের আকর্ষণে তাহারা এক হইয়া মিলিয়াছে। জনক বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের যোগও যদি সেইরূপ কালের যোগ না হইয়া ভাবের যোগ হয় তবে তাহা আশ্চর্য্য নহে।

এইরূপ ভাবগত ইতিহাসে ব্যক্তি ক্রমে ভাবের স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ পুরাণকথায় যেমন রাজা আর্থার। তিনি জাতির মনে ব্যক্তিরূপ ত্যাগ করিয়া ভাবরূপ ধারণ করিয়াছেন। জনক ও বিশ্বামিত্র সেইরূপ আর্য্য-ইতিহাসগত একটি বিশেষ ভাবের রূপক হইয়া উঠিয়াছেন। রাজা আর্থার মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ক্ষত্রিয়দের একটি বিশেষ খৃষ্টীয় আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকেই জয়যুক্ত করিবার জন্য বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত লড়াই করি-তেছেন এই যেমন দেখি, তেমনি ভারতে একদিন ক্ষত্রিয়দল ধর্ম্মে এবং আচরণে একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিয়া বিরোধিদলের সহিত দীর্ঘকাল ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ভারতীয় ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণেরাই যে তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে।

তখনকার কালের নবক্ষত্রিয়দলের এই ভাবটা কি, তাহার পূরাপূরি সমস্তটা জানা এখন অসম্ভব, কেননা বিপ্লবের জয় পরাজয়ের পরে আবার যখন সকল পক্ষের মধ্যে একটা রফা হইয়া গেল তখন সমাজের মধ্যে বিরোধের বিষয়গুলি আর পৃথক হইয়া রহিল না এবং ক্ষতচিহ্নগুলি যত শীঘ্র জোড়া লাগিতে পারে তাহারি চেষ্টা চলিতে লাগিল। তখন নূতন দলের আদর্শকে ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিয়া লইয়া পুনরায় আপন স্থান গ্রহণ করিলেন।

তথাপি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আদর্শের প্রভেদ কোন্ পথ দিয়া কি আকারে ঘটিয়াছিল তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। যজ্ঞবিধিগুলি কৌলিকবিদ্যা। এক এক কুলের আর্য্যদলের মধ্যে একএকটি কুলপতিকে আশ্রয় করিয়া বিশেষ বিশেষ স্তবমন্ত্র ও দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার বিধিবিধান রক্ষিত ছিল। যাঁহারা এইসমস্ত ভাল করিয়া জানিতেন পৌরোহিত্যে তাঁহাদেরই বিশেষ যশ ও ধনলাভের সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এই ধর্ম্মকার্য্য একটা বৃত্তি হইয়া উঠিয়াছিল এবং কৃপণের ধনের মত ইহা সকলের পক্ষে সুগম ছিল না। এই সমস্ত মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র বিধি বিশেষরূপে আয়ত্ত ও তাহা প্রয়োগ করিবার ভার স্বভাবতই একটি বিশেষ শ্রেণীর উপর ছিল। আত্মরক্ষা যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশ-অধিকারে যাঁহাদিগকে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাঁহারা এই কাজের ভার লইতে পারেন না, কারণ ইহা দীর্ঘকাল

অধ্যয়ন ও অভ্যাস সাপেক্ষ। কোনো এক শ্রেণী এই-সমস্তকে রক্ষা করিবার ভার যদি না লন, তবে কৌলিকসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় এবং পিতৃপিতামহদের সহিত যোগধারা নষ্ট হইয়া সমাজ শৃঙ্খলাভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই কারণে যখন সমাজের একশ্রেণী যুদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে নব নব অধ্যবসায়ে নিযুক্ত তখন আর একশ্রেণী বংশের প্রাচীন ধর্ম্ম এবং সমস্ত স্মরণীয় ব্যাপারকে বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্যই বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু যখনি বিশেষ শ্রেণীর উপর এইরূপ কাজের ভার পড়ে তখনি সমস্ত জাতির চিত্তবিকাশের সঙ্গে তাহার ধর্ম্ম-বিকাশের সমতানতায় একটা বাধা পড়িয়া যায়। কারণ সেই বিশেষ শ্রেণী ধর্ম্মবিধিগুলিকে বাঁধের মত একজায়গায় দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখেন সুতরাং সমস্ত জাতির মনের অগ্রসরগতির সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যভাবে এই সামঞ্জস্য এতদূর পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় যে অবশেষে একটা বিপ্লব ব্যতীত সমন্বয়সাধনের উপায় পাওয়া যায় না। এইরূপে একদা ব্রাহ্মণেরা যখন আর্য্যদের চিরাগত প্রথা ও পূজাপদ্ধতিকে আগলাইয়া বসিয়াছিলেন, যখন সেইসমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে ক্রমশই তাঁহারা কেবল জটিল ও বিস্তারিত করিয়া তুলিতেছিলেন তখন ক্ষত্রিয়েরা সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুষিক বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে জয়োল্লাসে অগ্রসর হইয়া চলিতে-ছিলেন এবং তখন আর্য্যদের মধ্যে প্রধান মিলনের ক্ষেত্র ছিল ক্ষত্রিয়সমাজ। শত্রুর সহিত যুদ্ধে যাহারা এক হইয়া প্রাণ দেয় তাহাদের মত এমন মিলন আর কাহারও হইতে পারে না। মৃত্যুর সম্মুখে যাহারা একত্র হয় তাহারা পরস্পরের অনৈক্যকে বড় করিয়া দেখিতে পারে না। অপর পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মন্ত্র দেবতা ও যজ্ঞকার্য্যের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার ব্যবসায় ক্ষত্রিয়ের নহে, তাঁহারা মানবের বন্ধুরদুর্গম জীবনক্ষেত্রে নব নব ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে মানুষ, এই কারণে প্রথামূলক বাহ্যানুষ্ঠানগত ভেদের বোধটা ক্ষত্রিয়ের মনে তেমন সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না। অতএব আত্মরক্ষা ও উপনিবেশ বিস্তারের উপলক্ষ্যে সমস্ত আর্য্যদলের মধ্যকার ঐক্যসূত্রটি ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে। এইরূপে একদিন ক্ষত্রিয়েরাই সমস্ত অনৈক্যের অভ্যন্তরে একই যে সত্যপদার্থ ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতিকে অপরাবিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় একদিন পুরাতনের সহিত নূতনের বিরোধ বাধিয়াছিল।

সমাজে যখন একটা বড় ভাব সংক্রামকরূপে দেখা দেয় তখন তাহা একান্তভাবে কোনো গণ্ডিকে মানে না। আর্য্যজাতির নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ যতই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ততই সমাজের সর্ব্বত্রই এই অনুভূতি সঞ্চারিত হইতে লাগিল যে দেবতারা নামে নানা কিন্তু সত্যে এক;—অতএব বিশেষ দেবতাকে বিশেষ স্তব ও বিশেষ বিধিতে সন্তুষ্ট করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় এই ধারণা সমাজের সর্ব্বত্রই ক্ষয় হইয়া দলভেদে উপাসনাভেদ স্বভাবতই ঘুচিবার চেষ্টা করিল। তথাপি ইহা সত্য যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা অনুকূল আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং সেইজন্যই ব্রহ্মবিদ্যা রাজবিদ্যা নাম গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই প্রভেদটি সামান্য নহে। ইহা একেবারে বাহিরের দিক ও অন্তরের দিকের ভেদ। বাহিরের দিকে যখন আমরা দৃষ্টি রাখি তখনি আমরা কেবলি বহুকে ও বিচিত্রকে দেখিতে পাই, অন্তরে যখন দেখি তখনি একের দেখা পাওয়া যায়। যখন আমরা বাহুশক্তিকেই দেবতা বলিয়া জানিয়াছি তখন মন্ত্রতন্ত্র ও নানা বাহ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে বাহির হইতে বিশেষভাবে আপনাদের পক্ষভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্য বাহিরের বহু শক্তিই যখন দেবতা তখন বাহিরের নানা অনুষ্ঠানই আমাদের ধর্ম্মকার্য্য এবং এই অনুষ্ঠানের প্রভেদ ও তাহারই গূঢ়শক্তিঅনুসারেই ফলের তারতম্য কল্পনা।

এইরূপে সমাজে যে আদর্শের ভেদ হইয়া গেল—সেই আদর্শভেদের মূর্ত্তিপরিগ্রহস্বরূপে আমরা দুই দেবতাকে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু। ব্রহ্মার চারিমুখ

চারিবেদ—তাহা চিরকালের মত ধ্যানরত স্থির;—আর বিষ্ণুর চারি ক্রিয়াশীল হস্ত কেবলি নব নব ক্ষেত্রে মঙ্গলকে ঘোষিত করিতেছে, ঐক্যচক্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, শাসনকে প্রচারিত করিতেছে এবং সৌন্দর্য্যকে বিকাশিত করিয়া তুলিতেছে।

দেবতারা যখন বাহিরে থাকেন, যখন মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভূত না হয় তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল কামনার সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। তখন তাঁহাদিগকে স্তবে বশ করিয়া আমরা হিরণ্য চাই, গো চাই, আয়ু চাই, শত্রু-পরাভব চাই; যাগযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে আমাদের অনিষ্ট করিবেন এই আশঙ্কা তখন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। এই কামনা এবং ভয়ের পূজা বাহ্য পূজা, ইহা পরের পূজা। দেবতা যখন অন্তরের ধন হইয়া উঠেন তখনই অন্তরের পূজা আরম্ভ হয়—সেই পূজাই ভক্তির পূজা।

ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে আমরা দুইটি ধারা দেখিতে পাই, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ। এই ব্রহ্মবিদ্যা কখনো একের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়াছে, কখনো দুইকে মানিয়া সেই দুইয়ের মধ্যেই একেকে দেখিয়াছে। দুইকে না মানিলে পূজা হয় না, আবার দুইয়ের মধ্যে একেকে না মানিলে ভক্তি হয় না। দ্বৈতবাদী য়িহুদিদের দূরবর্ত্তী দেবতা ভয়ের দেবতা, শাসনের দেবতা, নিয়মের দেবতা। সেই দেবতা নূতন টেষ্টামেণ্টে যখন মানবের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া আত্মীয়তা স্বীকার করিলেন তখনি তিনি প্রেমের দেবতা ভক্তির দেবতা হইলেন। বৈদিক দেবতা যখন মানুষ হইতে পৃথক্ তখন তাঁহার পূজা চলিতে পারে কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মা যখন আনন্দের অচিন্ত্যরহস্যলীলায় এক হইয়াও দুই, দুই হইয়াও এক, তখনি সেই অন্তরতম দেবতাকে ভক্তি করা চলে। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেমভক্তির ধর্ম্ম আরম্ভ হয়। এই ভক্তিধর্ম্মের দেবতাই বিষ্ণু।

বিপ্লবের অবসানে বৈষ্ণবধর্ম্মকে ব্রাহ্মণেরা আপন করিয়া লইয়াছেন কিন্তু গোড়ায় যে তাহা করেন নাই তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনো অবশিষ্ট আছে। বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগু পদাঘাত করিয়াছিলেন এই কাহিনীর মধ্যে একটি বিরোধের ইতিহাস সংহত হইয়া আছে। এই ভৃগু যজ্ঞকর্ত্তা ও যজ্ঞফলভাগীদের আদর্শরূপে বেদে কথিত আছেন। ভারতবর্ষে পূজার আসনে ব্রহ্মার স্থানকে সংকীর্ণ করিয়া বিষ্ণুই যখন তাহা অধিকার করিলেন—বহুপল্লবিত যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভক্তিধর্ম্মের যুগ যখন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইল তখন সেই সন্ধিক্ষণে একটা বড় ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা। এই বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার যাঁহাদের হাতে, এবং সেই অধিকার লইয়া যাঁহারা সমাজে একটি বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে তাহার বেড়া ভাঙিতে দেন নাই।

এই ভক্তির বৈষ্ণবধর্ম্ম যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, তাহার একটি প্রমাণ একদা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এই ধর্ম্মের গুরুরূপে দেখিতে পাই—এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধে আঘাতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই—প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহারা দুইজনেই ক্ষত্রিয়—একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর একজন শ্রীরামচন্দ্র। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় ক্ষত্রিয় দলের এই ভক্তিধর্ম্ম, যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তেমনি রামচন্দ্রের জীবনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল।

বৃত্তিগত ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই চিত্তগত ভেদ এমন একটা সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল যখন বিচ্ছেদের বিদারণ-রেখা দিয়া সামাজিক বিপ্লবের অগ্নিউচ্ছ্বাস উদ্গিরিত হইতে আরম্ভ করিল। বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবদ্ধ হইয়া আছে।

এই বিপ্লবের ইতিহাসে ব্রাহ্মণপক্ষ বশিষ্ঠ নামটিকে ও ক্ষত্রিয়পক্ষ বিশ্বামিত্র নামটিকে আশ্রয় করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্রই যে পরস্পরের বিরুদ্ধ দলে যোগ দিয়াছে তাহা নহে। এমন অনেক রাজা ছিলেন যাঁহারা ব্রাহ্মণদের সপক্ষে ছিলেন। কথিত আছে ব্রাহ্মণের বিদ্যা বিশ্বামিত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া রোদন করিতেছিল,

হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; অবশেষে রাজ্য সম্পদ সমস্ত হারাইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে তাঁহাকে সম্পূর্ণ হার মানিতে হইয়াছিল।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরো আছে। প্রাচীনকালের এই মহাবিপ্লবের আর যে একজন প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মকাণ্ডের নিরর্থকতা হইতে সমাজকে মুক্তি দিতে দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি একদিন পাণ্ডবদের সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করেন। সেই জরাসন্ধ রাজা তখনকার ক্ষত্রিয়দলের শত্রুপক্ষ ছিলেন। তিনি বিস্তর ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী ও পীড়িত করিয়াছিলেন। ভীমার্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিতে হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ-পক্ষপাতী ক্ষত্রবিদ্বেষী রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা যে বধ করাইয়াছিলেন এটা একটা খাপছাড়া ঘটনামাত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তখন দুই দল হইয়াছিল। সেই দুই দলকে সমাজের মধ্যে এক করিবার চেষ্টায় যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন শিশুপাল বিরুদ্ধদলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেন। এই যজ্ঞে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সমস্ত আচার্য্য ও রাজার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছিল। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের পদক্ষালনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন পরবর্ত্তীকালের সেই অত্যুক্তির প্রয়াসেই পুরকালীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বিরোধের ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের গোড়ায় এই সামাজিক বিবাদ। তাহার একদিকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ, অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ। বিরুদ্ধপক্ষে সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মণ - দ্রোণ কৃপ ও অশ্বত্থামাও বড় সামান্য ছিলেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজবিপ্লব। অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ। রামায়ণের কালে রামচন্দ্র নূতন দলের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। বশিষ্ঠের সনাতন ধর্ম্মই ছিল রামের কুলধর্ম্ম, বশিষ্ঠবংশই ছিল তাঁহাদের চিরপুরাতন পুরোহিত-বংশ, তথাপি অল্পবয়সেই রামচন্দ্র সেই বশিষ্ঠের বিরুদ্ধপক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুত বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈতৃক অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। রাম যে পন্থা লইয়াছিলেন তাহাতে দশরথের সম্মতি ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রবল প্রভাবের কাছে তাঁহার আপত্তি টিঁকিতে পারে নাই। পরবর্ত্তীকালে এই কাব্য যখন জাতীয়সমাজের বৃহৎ ইতিহাসের স্মৃতিকে কোনো এক রাজবংশের পারিবারিক ঘরের কথা করিয়া আনিয়াছিল তখনই দুর্ব্বলচিত্ত বৃদ্ধ রাজার অদ্ভুত স্ত্রৈণতাকেই রামের বনবাসের কারণ বলিয়া ঘটাইয়াছে।

রামচন্দ্র যে নব্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার আর এক প্রমাণ আছে। একদা যে ব্রাহ্মণ ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন তাঁহারই বংশোদ্ভব পরশুরামের ব্রত ছিল ক্ষত্রিয়বিনাশ। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়ের এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণবীরকে বধ না করিয়া তিনি তাঁহাকে যে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান করা যায়, ঐক্যসাধনব্রত গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র তাহার প্রথম পর্ব্বেই কতক বীর্য্যবলে কতক ক্ষমাগুণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধভঞ্জন করিয়াছিলেন। রামের জীবনের সকল কার্য্যেই এই উদার বীর্য্যবান সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্রই রামচন্দ্রকে জনকের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বেই রামচন্দ্র জনকের ভূকর্ষণজাত কন্যাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইসমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়ত তথ্য খুঁজিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

মূল কথা এই, জনক ক্ষত্রিয় রাজার আদর্শ ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এ বিদ্যা কেবল মাত্র তাঁহার জ্ঞানের বিষয় ছিল না; এ বিদ্যা তাঁহার সমস্ত জীবনে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল; তিনি তাঁহার রাজ্যসংসারের বিচিত্র কর্ম্মের কেন্দ্রস্থলে এই ব্রহ্মজ্ঞানকে অবিচলিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। চরমতম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের ছোট বড় সমস্ত কর্ম্মের আশ্চর্য্য যোগসাধন ইহাই ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়দের সর্ব্বোচ্চ

কীর্ত্তি। 'আমাদের দেশে যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের অগ্রণী ছিলেন তাঁহারা ত্যাগকেই ভোগের পরিণাম করিয়া কর্ম্মকেই মুক্তি-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

এই জনক একদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন, আর এক দিকে স্বহস্তে হলচালন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানিতে পারি কৃষিবিস্তারের দ্বারা আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করা ক্ষত্রিয়দের একটি ব্রতের মধ্যে ছিল। একদিন পশুপালন আর্য্যদের বিশেষ উপজীবিকা ছিল। এই ধেনুই অরণ্যাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণদের প্রধান সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইত। বনভূমিতে গোচারণ সহজ; তপোবনে যাহারা শিষ্যরূপে উপনীত হইত গুরুর গোপালনে নিযুক্ত থাকা তাহাদের প্রধান কাজ ছিল।

অবশেষে একদিন রণজয়ী ক্ষত্রিয়েরা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে অরণ্যবাধা অপসারিত করিয়া পশুসম্পদের স্থলে কৃষি-সম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। আমেরিকায় য়ুরোপীয় উপনিবেশিকগণ যখন অরণ্যের উচ্ছেদ করিয়া কৃষিবিস্তারের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতেছিলেন তখন যেমন মৃগয়াজীবী আরণ্যকগণ পদে পদে তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছিল—ভারতবর্ষেও সেইরূপ আরণ্যকদের সহিত কৃষকদের বিরোধে কৃষি-ব্যাপার কেবলি বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা অরণ্যের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে যাইবেন তাঁহাদের কাজ সহজ ছিল না। জনক মিথিলার রাজা ছিলেন —ইহা হইতে জানা যায় আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্য উপনিবেশ আপনার সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল। তখন দুর্গম বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগে অরণ্য অক্ষত ছিল এবং দ্রাবিড়সভ্যতা সেই দিকেই প্রবল হইয়া আর্য্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। রাবণ বীরপরাক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি বেদের দেবতাকে পরাস্ত করিয়া আর্য্যদের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইয়া নিজের দেবতা শিবকে জয়ী করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ে স্বকীয় দলের দেবতার প্রভাব প্রকাশ পায় পৃথিবীতে সকল সমাজেরই বিশেষ অবস্থায় এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকে—কোনো পক্ষের পরাভবে সে পক্ষের দেবতারই পরাভব গণ্য হয়। রাবণ আর্য্যদেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এই যে লোকশ্রুতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ইহার অর্থই এই যে, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি বৈদিক দেবতার উপাসকদিগকে বারম্বার পরাভূত করিয়াছিলেন।

এমন অবস্থায় সেই শিবের হরধনু ভাঙিবে কে একদিন এই এক প্রশ্ন আর্য্যসমাজে উঠিয়াছিল। শিবোপাসকদের প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া যিনি দক্ষিণ-খণ্ডে আর্য্যদের কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থ ভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনকরাজার অমানুষিক মানস কন্যার সহিত পরিণীত হইবেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধনু ভঙ্গ করিবার দুঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্দ্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনি তিনি হরধনু ভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনি তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালন-রেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন। তখনকার অনেক বীর রাজাই এই সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা হরধনু ভাঙিতে পারেন নাই, এইজন্যই রাজর্ষি জনকের কন্যাকে লাভ করিবার গৌরব হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই দুঃসাধ্য ব্রতের অধিকারী কে হইবেন, ক্ষত্রিয় তপস্বিগণ সেই সন্ধান হইতে বিরত হন নাই। একদা বিশ্বামিত্রের সেই সন্ধান রামচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া সার্থক হইল।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈব রাক্ষস-দিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যে ভূমি হলচালনের অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামী-দের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়া ছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন;* তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের

* অল্পদিন হইল "রাক্ষস-রহস্য" নামক একটি স্বাধীন চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আমি পাণ্ডুলিপি আকারে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেই "অহল্যা" শব্দটির

যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ যৌবরাজ্য-অভিষেকে বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্ব্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবতঃ তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে একটি দল ছিল তাহা নিঃসন্দেহ অত্যন্ত প্রবল—এবং স্বভাবতই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই এইজন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীর পুত্রকেও তিনি নির্ব্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই নির্ব্বাসনে রামের বীরত্বের সহায় হইলেন লক্ষ্মণ ও তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী হইলেন সীতা অর্থাৎ তাঁহার সেই ব্রত। এই সীতাকেই তিনি নানা বাধা ও নানা শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া বন হইতে বনান্তরে ঋষিদের আশ্রম ও রাক্ষসদের আবাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

আর্য্য অনার্য্যের বিরোধকে বিদ্বেষের দ্বারা জাগ্রত রাখিয়া যুদ্ধের দ্বারা নিধনের দ্বারা তাহার সমাধানের প্রয়াস অন্তহীন দুশ্চেষ্টা। প্রেমের দ্বারা মিলনের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে ইহার মীমাংসা হইলেই এত বড় বৃহৎ ব্যাপারও সহজ হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরের মিলন জিনিষটা ত ইচ্ছা করিলেই হয় না। ধর্ম্ম যখন বাহিরের জিনিষ হয়, নিজের দেবতা যখন নিজের বিষয়সম্পত্তির মত অত্যন্ত স্বকীয় হইয়া থাকে তখন মানুষের মনের মধ্যকার ভেদ কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। জ্যু-দের সঙ্গে জেণ্টাইলদের মিলনের কোনো সেতু ছিল না। কেননা জ্যু-রা জিহোভাকে বিশেষভাবে আপনাদের জাতীয় সম্পত্তি বলিয়াই জানিত এবং এই জিহোভার সমস্ত অনুশাসন, তাঁহার আদিষ্ট সমস্ত বিধিনিষেধ বিশেষভাবে জ্যু-জাতিরই পালনীয় এইরূপ তাহাদের ধারণা ছিল। তেমনি আর্য্য-দেবতা ও আর্য্য-বিধিবিধান যখন বিশেষ জাতিগতভাবে সঙ্কীর্ণ ছিল তখন আর্য্য অনার্য্যের পরস্পর সংঘাত, এক পক্ষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ছাড়া, কিছুতেই মিটিতে পারিত না। কিন্তু ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেবতার ধারণা যখন বিশ্বজনীন হইয়া উঠিল—বাহিরের ভেদ বিভেদ একান্ত সত্য নহে এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষের কল্পনা হইতে দৈব বিভীষিকাসকল যখন চলিয়া গেল তখনই আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে সত্যকার মিলনের সেতু স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর হইল। তখনি বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম্মের দেবতা অন্তরের ভক্তির দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং কোনো বিশেষ শাস্ত্র ও শিক্ষা ও জাতির মধ্যে তিনি আবদ্ধ হইয়া রহিলেন না।

ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্য্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিতের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্ত্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনী-সৃষ্টির দ্বারাও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্য্য জাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচাররক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল। রামচরিতের মধ্যে যে একটি সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস ছিল পরবর্ত্তীকালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নব্যকালের সামাজিক আদর্শের অনুগত করা হইয়াছিল। সেই সময়েই রামের চরিতকে গৃহধর্ম্মের ও সমাজধর্ম্মের আশ্রয়রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা জাগিয়াছিল এবং রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিদ্বেষের সঙ্কোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন ও সেই নীতির দ্বারা একটি বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া সমস্ত জাতির নিকট চিরকালের মত বরণীয় হইয়াছিলেন সে কথাটা সরিয়া গিয়াছে এবং

এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা আমি দেখিলাম। লেখক আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই—তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক। ইহার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার এই, এককালে যে-রামচন্দ্র ধর্ম্মনীতি ও কৃষিবিদ্যাকে নূতন পথে চালনা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী-কালে তাঁহারই চরিতকে সমাজ পুরাতন বিধিবন্ধনের অনুকূল করিয়া ব্যবহার করিয়াছে। একদিন সমাজে যিনি গতির পক্ষে বীর্য্যপ্রকাশ করিয়াছিলেন আর একদিন সমাজ তাঁহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর বলিয়া প্রচার করিয়াছে। বস্তুত রামচন্দ্রের জীবনের কার্য্যে এই গতিস্থিতির সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

তৎসত্ত্বেও এ কথা ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন এ তাঁহার গৌরব নহে তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।

নৃতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্ব্বর জাতির অনেকেরই মধ্যে একএকটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। অনেক সময়ে তাহারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলিয়া গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তাহারা আখ্যাত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপে নাগবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যায় রামচন্দ্র যে অনার্য্যদলকে বশ করিয়াছিলেন তাহারাও যে এইরূপ কারণেই বানর বলিয়া পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল ত বানর নহে রামচন্দ্রের দলে ভল্লুকও ছিল। বানর যদি অবজ্ঞাসূচক আখ্যা হইত তবে ভল্লুকের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

রামচন্দ্র এই যে বানরদিগকে বশ করিয়াছিলেন তাহা রাজনীতির দ্বারা নহে, ভক্তিধর্ম্মের দ্বারা। এইরূপে তিনি হনুমানের ভক্তি পাইয়া দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায়, যে-কোনো মহাত্মাই বাহ্য-ধর্ম্মের স্থলে ভক্তিধর্ম্মকে জাগাইয়াছেন তিনি স্বয়ং পূজা লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শিখ, সুফী, কবিরপন্থী প্রভৃতি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, ভক্তি যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় অনুবর্ত্তীদের কাছে তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ভগবানের সহিত ভক্তের অন্তরতম যোগ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া তাঁহারাও যেন দেবত্বের সহিত মনুষ্যত্বের ভেদসীমা অতিক্রম করিয়া থাকেন। এইরূপে হনুমান ও বিভীষণ রামচন্দ্রের উপাসক ও ভক্ত বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়াছেন।

রামচন্দ্র ধর্ম্মের দ্বারাই অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য বিস্তার করেন নাই। দক্ষিণে তিনি কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সেই যে বীজ রোপন করিয়া আসিয়াছিলেন বহু শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষ তাহার ফল লাভ করিয়াছিল। এই দাক্ষিণাত্যে ক্রমে দারুণ শৈবধর্ম্মও ভক্তিধর্ম্মের রূপ গ্রহণ করিল এবং একদা এই দাক্ষিণাত্য হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার এক ধারায় ভক্তিস্রোত ও আর এক ধারায় অদ্বৈতজ্ঞান উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া দিল।

আমরা আর্য্যদের ইতিহাসে সঙ্কোচ ও প্রসারণের এই একটি রূপ দেখিলাম। মানুষের একদিকে তাহার বিশেষত্ব আর একদিকে তাহার বিশ্বত্ব এই দুই দিকের টানই ভারতবর্ষে যেমন করিয়া কাজ করিয়াছে তাহা যদি আমরা আলোচনা করিয়া না দেখি তবে ভারতবর্ষকে আমরা চিনিতেই পারিব না। একদিন তাহার এই আত্মরক্ষণ শক্তির দিকে ছিল ব্রাহ্মণ, আত্মপ্রসারণ শক্তির দিকে ছিল ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যখন অগ্রসর হইয়াছে তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে বাধা দিয়াছে কিন্তু বাধা অতিক্রম করিয়াও ক্ষত্রিয় যখন সমাজকে বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে তখন ব্রাহ্মণ পুনরায় নূতনকে আপন পুরাতনের সঙ্গে বাঁধিয়া সমস্তটাকে আপন করিয়া লইয়া আবার একটা সীমা বাঁধিয়া লইয়াছে। য়ুরোপীয়েরা যখন ভারতবর্ষে চিরদিন ব্রাহ্মণদের এই কাজটির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এমনি ভাবে করিয়াছেন যেন এই ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ নামক একটি বিশেষ ব্যবসায়ী দলের চাতুরী।

তাঁহারা ইহা ভুলিয়া যান যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যথার্থ জাতিগত ভেদ নাই, তাহারা একই জাতির দুই স্বাভাবিক শক্তি। ইংলণ্ডে সমস্ত ইংরেজ জাতি লিবারেল ও কন্সারভেটিব এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া রাষ্ট্রনীতিকে চালনা করিতেছে—ক্ষমতা লাভের জন্য এই দুই শাখার মধ্যে প্রতিযোগিতার মধ্যে বিবাদও আছে, কৌশলও আছে, এমন কি, ঘুষ এবং অন্যায়ও আছে, তথাপি এই দুই সম্প্রদায়কে যেমন দুই স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ পক্ষের মত করিয়া দেখিলে ভুল দেখা হয়—বস্তুত তাহারা প্রকৃতির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-শক্তির মত বাহিরে দেখিতে বিরুদ্ধ কিন্তু অন্তরে একই সৃজনশক্তির এপিঠ ওপিঠ, তেমনি ভারতবর্ষে সমাজের স্বাভাবিক স্থিতি ও গতি-শক্তি দুই শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাসকে সৃষ্টি করিয়াছে—কোনো পক্ষেই তাহা কৃত্রিম নহে।

তবে দেখা গিয়াছে বটে ভারতবর্ষে এই স্থিতি ও গতি-শক্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই—সমস্ত বিরোধের পর ব্রাহ্মণই এখানকার সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের বিশেষ চাতুর্য্যই তাহার কারণ এমন অদ্ভুত কথা নিতান্তই ইতিহাসবিরুদ্ধ কথা। তাহার প্রকৃত কারণ ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যে জাতি-সংঘাত ঘটিয়াছে তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ জাতির সংঘাত। তাহাদের মধ্যে বর্ণের ও আদর্শের ভেদ এতই গুরুতর যে এই প্রবল বিরুদ্ধতার আঘাতে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষণীশক্তিই বলবান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আত্মপ্রসারণের দিকে চলিতে গেলে আপনাকে হারাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া সমাজের সতর্কতাবৃত্তি পদে পদে আপনাকে জাগ্রত রাখিয়াছে।

তুষারাবৃত আল্প্‌স্‌ গিরিমালার শিখরে যে দুঃসাহসিকেরা আরোহণ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আপনাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া অগ্রসর হয়—তাহারা চলিতে চলিতে আপনাকে বাঁধে, বাঁধিতে বাঁধিতে চলে—সেখানে চলিবার উপায় স্বভাবতই এই প্রণালী অবলম্বন করে, তাহা চালকদের কৌশল নহে। বন্দীশালায় যে বন্ধনে ধরিয়া রাখে দুর্গম পথে সেই বন্ধনই গতির সহায়। ভারতবর্ষেও সমাজ কেবলি দড়িদড়া লইয়া আপনাকে বাঁধিতে বাঁধিতে চলিয়াছে কেননা আপনার পথে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা পিছলিয়া অন্যের পথে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তাহার সম্পূর্ণ ছিল। এই জন্যই ভারতবর্ষে স্বভাবের নিয়মে আত্মরক্ষণীশক্তি আত্ম-প্রসারণীশক্তির অপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছে।

রামচন্দ্রের জীবন আলোচনায় আমরা ইহাই দেখিলাম যে ক্ষত্রিয়েরা একদিন ধর্ম্মকে এমন একটা ঐক্যের দিকে পাইয়াছিলেন যাহাতে অনার্য্যদের সহিত বিরুদ্ধতাকে তাঁহারা মিলননীতির দ্বারাই সহজে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। দুই পক্ষের চিরন্তন প্রাণান্তিক সংগ্রাম কখনো কোনো সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না—হয় এক পক্ষকে মারিতে, নয় দুই পক্ষকে মিলিতে হইবে। ভারতবর্ষে একদা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই মিলনের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে এই ধর্ম্ম ও এই মিলননীতি বাধা পাইয়াছিল কিন্তু অবশেষে ব্রাহ্মণেরা ইহাকে স্বীকার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

আর্য্যে অনার্য্যে যখন অল্প অল্প করিয়া যোগ স্থাপন হইতেছে তখন অনার্য্যদের ধর্ম্মের সঙ্গেও বোঝাপড়া করার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অনার্য্যদের দেবতা শিবের সঙ্গে আর্য্যউপাসকদের একটা বিরোধ চলিতেছিল, এবং সেই বিরোধে কখনো আর্য্যেরা কখনো অনার্য্যেরা জয়ী হইতেছিল। কৃষ্ণের অনুবর্ত্তী অর্জ্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। শিবভক্ত বাণ অসুরের কন্যা উষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করিয়া-ছিলেন—এই সংগ্রামে কৃষ্ণ জয়ী হইয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞে অনার্য্য শিবকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই সেই উপলক্ষ্যে শিবের অনার্য্য অনুচরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়া-ছিল। অবশেষে শিবকে বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলাইয়া একদিন তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়া আর্য্য অনার্য্যের এই ধর্ম্মবিরোধ মিটাইতে হইয়াছিল। তথাপি দেবতা যখন অনেক হইয়া পড়েন তখন তাঁহাদের মধ্যে কে বড় কে ছোট সে বিবাদ সহজে মিটিতে চায় না। তাই মহাভারতে রুদ্রের সহিত বিষ্ণুর সংগ্রামের উল্লেখ আছে—সেই সংগ্রামে রুদ্র বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্য্যদের সহিত অনার্য্যদের রক্তের মিলন ও

ধর্ম্মের মিলন ঘটিতেছিল। এইরূপে যতই বর্ণসঙ্কর ও ধর্ম্মসঙ্কর উৎপন্ন হইতে লাগিল ততই সমাজের আত্মরক্ষণী-শক্তি বারম্বার সীমানির্ণয় করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই তাহাকে গ্রহণ করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছে। মনুতে বর্ণসঙ্করের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আছে এবং তাহাতে মূর্ত্তি-পূজা-ব্যবসায়ী দেবল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় রক্তে ও ধর্ম্মে অনার্য্যদের মিশ্রণকে গ্রহণ করিয়াও তাহাকে বাধা দিবার প্রয়াস কোনো দিন নিরস্ত হয় নাই। এইরূপে প্রসারণের পরমুহূর্ত্তেই সঙ্কোচন আপনাকে বারম্বার অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন ইহারই একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের দুই ক্ষত্রিয় রাজসন্ন্যাসীকে আশ্রয় করিয়া প্রচণ্ডশক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্ম্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়ম মাত্র নহে—সেই ধর্ম্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ্য প্রথাপালনের দ্বারা নহে, এই ধর্ম্মনীতি যে মানুষের সহিত মানুষের কোনো ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারে না ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্ত্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে তাহা দেখিতে দেখিতে জাতির চিরন্তন সংস্কার ও বাধা অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশকে অধিকার করিয়া লইল। এইবার অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়গুরুর প্রভাবে ব্রাহ্মণের শক্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

সেটা সম্পূর্ণ ভাল হইয়াছিল এমন কথা কোনোমতেই বলিতে পারি না। এইরূপ একপক্ষের ঐকান্তিকতায় জাতি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না, তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে বাধ্য। এই কারণেই বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া যেরূপ সংস্কারজালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে এমন আর কোনোকালেই করে নাই। এতদিন ভারতবর্ষে আর্য্য অনার্য্যের যে মিলন ঘটিতেছিল তাহার মধ্যে পদে পদে একটা সংযম ছিল—মাঝে মাঝে বাঁধ বাঁধিয়া প্রলয় স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা হইতেছিল। আর্য্যজাতি অনার্য্যের কাছ হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করিতেছিল তাহাকে আর্য্য করিয়া লইয়া আপন প্রকৃতির অনুগত করিয়া লইতেছিল—এমনি করিয়া ধীরে ধীরে একটি প্রাণবান জাতীয় কলেবর গড়িয়া আর্য্যে অনার্য্যে একটি আন্তরিক সংস্রব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিতেছিল। নিশ্চয়ই সেই মিলন-ব্যাপারের মাঝখানে কোনো এক সময়ে বাঁধাবাঁধি ও বাহ্যিকতার মাত্রা অত্যন্ত বেশি হইয়া পড়িয়াছিল, নহিলে এত বড় বিপ্লব উৎপন্ন হইতেই পারিত না এবং সে বিপ্লব কোনো সৈন্যবল আশ্রয় না করিয়া কেবলমাত্র ধর্ম্মবলে সমস্ত দেশকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিতে পারিত না। নিশ্চয়ই তৎপূর্ব্বে সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও মানুষের অন্তরে বাহিরে বৃহৎ একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়াও তেমনি প্রবল হইয়া একেবারে সমাজের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল। রোগের আক্রমণও যেমন নিদারুণ, চিকিৎসার আক্রমণও তেমনি সাংঘাতিক হইয়া প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন এই বৌদ্ধপ্রভাবের বন্যা যখন সরিয়া গেল তখন দেখা গেল সমাজের সমস্ত বেড়াগুলা ভাঙিয়া গিয়াছে। যে একটি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্র্য ঐক্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল সেই ব্যবস্থাটা ভূমিসাৎ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ঐক্যের চেষ্টাতেই ঐক্য নষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্যগুলি অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল—যাহা বাগান ছিল তাহা জঙ্গল হইয়া উঠিল।

তাহার প্রধান কারণ এই, একদিন ভারতসমাজে কখনো ব্রাহ্মণ কখনো ক্ষত্রিয় যখন প্রাধান্য লাভ করিতেছিলেন তখনো উভয়ের ভিতরকার একটা জাতিগত ঐক্য ছিল। এই জন্য তখনকার জাতিরচনাকার্য্য আর্য্যদের হাতেই ছিল। কিন্তু বৌদ্ধপ্রভাবের সময় কেবল ভারতবর্ষের ভিতরকার অনার্য্যেরা নহে ভারতবর্ষের বাহির হইতেও অনার্য্যদের সমাগম হইয়া তাহারা এমন একটি প্রবলতা লাভ করিল যে আর্য্যদের সহিত তাহাদের সুবিহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। যতদিন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বল ছিল ততদিন এই অসামঞ্জস্য, অস্বাস্থ্য আকারে, প্রকাশ পায় নাই কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল

তখন তাহা নানা অদ্ভুত অসঙ্গতিরূপে অবাধে সমস্ত দেশকে একেবারে ছাইয়া ফেলিল।

অনার্য্যেরা এখন সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া একেবারে সমাজের মাঝখানে আসিয়া বসিয়াছে সুতরাং এখন তাঁহাদের সহিত ভেদ ও মিলন বাহিরের নহে তাহা একেবারে সমাজের ভিতরের কথা হইয়া পড়িল।

এই বৌদ্ধপ্লাবনে আর্য্যসমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসম্প্রদায় আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিয়াছিল কারণ আর্য্যজাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ভার চিরকাল ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন তখনো ধর্ম্মসমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এ ভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তখন সমাজে আর সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া গিয়াছিল।

অনার্য্যের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের প্রায় কোনো বাধা ছিল না তাহা পুরাণে স্পষ্টই দেখা যায়। এইজন্য দেখা যায় বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী অধিকাংশ রাজবংশ ক্ষত্রিয়-বংশ নহে।

এদিকে শক হুন প্রভৃতি বিদেশীয় অনার্য্যগণ দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমাজের মধ্যে অবাধে মিশিয়া যাইতে লাগিল—বৌদ্ধধর্ম্মের কাটা খাল দিয়া এই সমস্ত বন্যার জল নানা শাখায় একেবারে সমাজের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল। কারণ, তখন বাধা দিবার ব্যবস্থাটা সমাজ-প্রকৃতির মধ্যে দুর্ব্বল। এইরূপে ধর্ম্মেকর্ম্মে অনার্য্যসম্মিশ্রণ অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সর্ব্বপ্রকার অদ্ভুত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যখন কোনো সঙ্গতির সূত্র রহিল না তখনি সমাজের অন্তরস্থিত আর্য্যপ্রকৃতি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল। আর্য্যপ্রকৃতি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়াই নিজেকে সুস্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার একটা চেষ্টা উদ্যত হইয়া উঠিল।

আমরা কি এবং কোন্ জিনিষটা আমাদের—চারিদিকের বিপুল বিশ্লিষ্টতার ভিতর হইতে এইটেকে উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল। সেই যুগেই ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়া সীমাচিহ্নিত করিল। তৎপূর্ব্বে বৌদ্ধ-সমাজের যোগে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এত দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে সে আপনার কলেবরটাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাইতেছিল না। এইজন্য আর্য্য জন-শ্রুতিতে প্রচলিত কোনো পুরাতন চক্রবর্ত্তী সম্রাটের রাজ্য-সীমার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনার ভৌগোলিক সত্তাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল। তাহার পরে, সামাজিক প্রলয়-ঝড়ে আপনার ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে খুঁজিয়া লইয়া জোড়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সময়েই সংগ্রহকর্ত্তাদের কাজ দেশের প্রধান কাজ হইল। তখন-কার যিনি ব্যাস, নূতন রচনা তাঁহার কাজ নহে পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত। এই ব্যাস একব্যক্তি না হইতে পারেন কিন্তু ইনি সমাজের একই শক্তি। কোথায় আর্য্যসমাজের স্থিরপ্রতিষ্ঠা ইনি তাহাই খুঁজিয়া একত্র করিতে লাগিলেন।

সেই চেষ্টার বশে ব্যাস বেদ সংগ্রহ করিলেন। যথার্থ বৈদিককালে মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালীগুলিকে সমাজ যত্ন করিয়া শিখিয়াছে ও রাখিয়াছে, তবু তখন তাহা শিক্ষণীয় বিদ্যা মাত্র ছিল এবং সে বিদ্যাকেও সকলে পরাবিদ্যা বলিয়া মানিত না।

কিন্তু একদিন বিশ্লিষ্ট সমাজকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য এমন একটি পুরাতন শাস্ত্রকে মাঝখানে দাঁড় করাইবার দরকার হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে নানা লোক নানা প্রকার তর্ক করিতে পারিবে না-যা আর্য্যসমাজের সর্ব্ব পুরাতন বাণী; যাহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র বিরুদ্ধসম্প্রদায়ও এক হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এই জন্য বেদ যদিচ প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে তখন অনেক দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল তথাপি দূরের জিনিষ বলিয়াই তাহাকে দূর হইতে মান্য করা সকলের পক্ষে সহজ হইয়া-ছিল। আসল কথা, যে জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল কোনো একটি দৃঢ়নিশ্চল কেন্দ্রকে স্বীকার না করিলে তাহার পরিধি নির্ণয় কঠিন হয়। তাহার পরে আর্য্য-সমাজে এতদিনকার যত কিছু জনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকেও একত্র করিয়া মহাভারত নামে সঙ্কলিত করা হইল।

যেমন একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন, তেমনি একটি

ধারাবাহিক পরিধিসূত্রও ত চাই সেই পরিধি সূত্রই ইতিহাস। তাই ব্যাসের আর এক কাজ হইল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্য্যসমাজের যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্য্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্ত্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্য্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে কিন্তু ইহা যথার্থই আর্য্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এইসমস্ত জনশ্রুতিকে গলাইয়া পোড়াইয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া ইহা হইতে তথ্যমূলক ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিত তবে আর্য্যসমাজের ইতিহাসের সত্য স্বরূপটি আমরা দেখিতে পাইতাম না। মহাভারত সংগ্রহের দিনে আর্য্যজাতির ইতিহাস আর্য্যজাতির স্মৃতিপটে যেরূপ রেখায় আঁকা ছিল, তাহার মধ্যে কিছু বা স্পষ্ট কিছু বা লুপ্ত, কিছু বা সুসঙ্গত কিছু বা পরস্পরবিরুদ্ধ, মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে।

এই মহাভারতে কেবল যে নির্ব্বিচারে জনশ্রুতি সঙ্কলন করা হইয়াছে তাহাও নহে। আতসকাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্য্যালোক এবং আরএকপিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আরএকদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি - সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির যে সমন্বয় যোগ তাহাই সমস্ত ভারত-ইতিহাসের চরমতত্ত্ব। নিঃসন্দেহই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোনো সমস্যার মীমাংসা কোনো তত্ত্বনির্ণয় করিতেছে, ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে —নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না, অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে, এমন কি, পরস্পর বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে; সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়াই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গায় তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোন্‌খানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা। এই গীতার মধ্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা লজিকগত অসঙ্গতি দেখিতে পান। ইহাতে সাংখ্য, বেদান্ত এবং যোগকে যে একত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা মনে করেন সেটা একটা জোড়াতাড়া ব্যাপার -- অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ইহার মূলটি সাংখ্য ও যোগ, বেদান্তটি তাহার পরবর্ত্তী কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা যোজনা করা। হইতেও পারে মূল ভগবদ্গীতা ভারতবর্ষের সাংখ্য ও যোগতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উপদিষ্ট, কিন্তু মহাভারতসঙ্কলনের যুগে সেই মূলের বিশুদ্ধিতারক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না—সমস্ত জাতির চিত্তকে সমগ্র করিয়া এক করিয়া দেখাই তখনকার সাধনা ছিল। অতএব যে গ্রন্থে তত্ত্বের সহিত জীবনকে মিলাইয়া মানুষের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সে গ্রন্থে বেদান্ততত্ত্বকে তাঁহারা বাদ দিতে পারেন নাই। সাংখ্যই হোক্ যোগই হোক্ বেদান্তই হোক্ সকল তত্ত্বেরই কেন্দ্রস্থলে একই বস্তু আছেন, তিনি কেবলমাত্র জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্ম্মের আশ্রয় নহেন, তিনি পরিপূর্ণ মানব-জীবনের পরমাগতি, তাঁহাতে আসিয়া না মিলিলে কোনো কথাই সত্যে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না; অতএব ভারতচিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই সেই এক মূল সত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা। তাই মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্ব্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে। তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সঙ্গতি ও অসঙ্গতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায় যে সমস্তকে লইয়াই সত্য,

অতএব এক জায়গায় মিল আছেই। এমন কি, গীতায় যজ্ঞকেও সাধনাক্ষেত্রে স্থান দিয়াছে। কিন্তু গীতায় যজ্ঞ-ব্যাপার এমন একটি বড় ভাব পাইয়াছে যাহাতে তাহার সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া সে একটি বিশ্বের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যেসকল ক্রিয়াকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে তাহাই মানুষের যজ্ঞ। গীতাকার যদি এখনকার কালের লোক হইতেন তবে সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি মানুষের সেই যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেন। যেমন জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে যোগ, কর্ম্মের দ্বারা অনন্ত মঙ্গলের সঙ্গে যোগ, ভক্তির দ্বারা অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে যোগ, তেমনি যজ্ঞের দ্বারা অনন্ত শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ—এইরূপে গীতায় ভূমার সঙ্গে মানুষের সকল প্রকারের যোগকেই সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন—একদা যজ্ঞকাণ্ডের দ্বারা মানুষের যে চেষ্টা বিশ্বশক্তির সিংহদ্বারে আঘাত করিতেছিল গীতা তাহাকেও সত্য বলিয়া দেখিয়াছেন।

এইরূপে ইতিহাসের নানা বিক্ষিপ্ততার মধ্য হইতে তখনকার কালের প্রতিভা যেমন একটি মূলসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল তেমনি বেদের মধ্য হইতেও তাহা একটি সূত্র উদ্ধার করিয়াছিল তাহাই ব্রহ্মসূত্র। তখনকার ব্যাসের এও একটি কীর্ত্তি। তিনি যেমন একদিকে ব্যষ্টিকে রাখিয়াছেন আরএকদিকে তেমনি সমষ্টিকেও প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্কলন কেবল আয়োজনমাত্র নহে তাহা সংযোজন, শুধু সঞ্চয় নহে তাহা পরিচয়। সমস্ত বেদের নানা পথের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্তের একটি সন্ধান ও একটি লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাই বেদান্ত। তাহার মধ্যে একটি দ্বৈতেরও দিক আছে একটি অদ্বৈতেরও দিক আছে কারণ এই দুইটি দিক ব্যতীত কোনো একটি দিকও সত্য হইতে পারে না। লজিকে ইহার কোনো সমন্বয় পায় না, এইজন্য যেখানে ইহার সমন্বয় সেখানে ইহাকে অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রে এই দ্বৈত অদ্বৈত দুই দিককেই রক্ষা করা হইয়াছে। এইজন্য পরবর্ত্তীকালে এই একই ব্রহ্মসূত্রকে লজিক নানা বাদ বিবাদে বিভক্ত করিতে পারিয়াছে। ফলত ব্রহ্মসূত্রে আর্য্যধর্ম্মের মূলতত্ত্বটি সমস্ত আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রকে এক আলোকে আলোকিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কেবল আর্য্যধর্ম্ম কেন সমস্ত মানবের ধর্ম্মের ইহাই এক আলোক।

এইরূপে নানা বিরুদ্ধতার দ্বারা পীড়িত আর্য্যপ্রকৃতি একদিন আপনার সীমা নির্ণয় করিয়া আপনার মূল ঐক্যটি লাভ করিবার জন্য একান্ত যত্নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার লক্ষণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, আর্য্য জাতির বিধিনিষেধগুলি যাহা কেবল স্মৃতিরূপে নানাস্থানে ছড়াইয়া ছিল এই সময়ে তাহাও সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল।

আমরা এই যে মহাভারতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম ইহাকে কেহ যেন কালগত যুগ না মনে করেন—ইহা ভাবগতযুগ—অর্থাৎ আমরা কোনো একটি সঙ্কীর্ণ কালে ইহাকে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি না। বৌদ্ধযুগের যথার্থ আরম্ভ কবে তাহা সুস্পষ্টরূপে বলা অসম্ভব—শাক্যসিংহের বহু পূর্ব্বেই যে তাহার আয়োজন চলিতেছিল এবং তাঁহার পূর্ব্বেও যে অন্য বুদ্ধ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একটি ভাবের ধারাপরম্পরা যাহা গৌতমবুদ্ধে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। মহাভারতের যুগে ও তেমনি কবে আরম্ভ তাহা স্থির করিয়া বলিলে ভুল বলা হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমাজের মধ্যে ছড়ানো ও কুড়ানো এক সঙ্গেই চলিতেছে। যেমন পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা। ইহা যে পুরাতন পক্ষ ও নূতন পক্ষের বোঝাপড়া তাহাতে সন্দেহ নাই। একপক্ষ বলিতেছেন যেসকল মন্ত্র ও কর্ম্মকাণ্ড চলিয়া আসিয়াছে তাহা অনাদি, তাহার বিশেষ গুণবশতই তাহার দ্বারাই চরমসিদ্ধি লাভ করা যায়—অপর পক্ষ বলিতেছেন জ্ঞান ব্যতীত আর কোনো উপায়ে মুক্তি নাই। যে দুই গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া এই দুই মত বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে তাহার রচনাকাল যখনই হৌক্, এই মতদ্বৈধ যে অতি পুরাতন তাহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ আর্য্যসমাজের যে উদ্যম আপনার সামগ্রীগুলিকে বিশেষভাবে সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ সঙ্কলন করিয়া স্বজাতির প্রাচীন পথটিকে চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছে তাহা বিশেষ কোনো সময়ে সীমাবদ্ধ নহে। আর্য্য অনার্য্যের চিরন্তন সংমিশ্রণের

সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি চিরকালই কাজ করিয়া আসিয়াছে; ইহাই আমাদের বক্তব্য।

একথা কেহ যেন না মনে করেন যে অনার্য্যরা আমাদিগকে দিবার মত কোন জিনিষ দেয় নাই। বস্তুত প্রাচীন দ্রাবিড়গণ সভ্যতায় হীন ছিল না। তাঁহাদের সহযোগে হিন্দু সভ্যতা রূপে বিচিত্র, ও রসে গভীর হইয়াছে। দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে এবং গড়িতে পারিত। কলাবিদ্যায় তাহারা নিপুণ ছিল এবং তাহাদের গণেশ দেবতার বধূ ছিল কলাবধূ। আর্য্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সম্মিশ্রণ-চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্য্যও নহে সম্পূর্ণ অনার্য্যও নহে, তাহাই হিন্দু। এই দুই বিরুদ্ধের নিরন্তর সমন্বয়প্রয়াসে ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য্য সামগ্রী পাইয়াছে। তাহা অনন্তকে অন্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে এবং ভূমাকে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। এই কারণেই ভারতবর্ষে এই দুই বিরুদ্ধ যেখানে না মেলে সেখানে মূঢ়তা ও অন্ধ সংস্কারের আর অন্ত থাকে না; যেখানে মেলে সেখানে অনন্তের অন্তহীন রসরূপ আপনাকে অবাধে সর্ব্বত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। এই কারণেই ভারতবর্ষ এমন একটি জিনিষ পাইয়াছে যাহাকে ঠিকমত ব্যবহার করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং ঠিকমত ব্যবহার করিতে না পারিলে যাহা জাতির জীবনকে মূঢ়তার ভারে ধূলিলুন্ঠিত করিয়া দেয়। আর্য্য ও দ্রাবিড়ের এই চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধতার সম্মিলন যেখানে সিদ্ধ হইয়াছে সেখানে সৌন্দর্য্য জাগিয়াছে, যেখানে হওয়া সম্ভবপর হয় নাই সেখানে কদর্য্যতার সীমা দেখি না। একথাও মনে রাখিতে হইবে শুধু দ্রাবিড় নহে বর্ব্বর অনার্য্যদের সামগ্রীও একদিন দ্বার খোলা পাইয়া অসঙ্কোচে আর্য্যসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই অনধিকারপ্রবেশের বেদনাবোধ বহুকাল ধরিয়া আমাদের সমাজে সুতীব্র হইয়া ছিল।

যুদ্ধ এখন বাহিরে নহে যুদ্ধ এখন দেহের মধ্যে—কেন না অস্ত্র এখন শরীরের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে, শত্রু এখন ঘরের ভিতরে। আর্য্য সভ্যতার পক্ষে ব্রাহ্মণ এখন একমাত্র। এইজন্য এই সময়ে বেদ যেমন অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে সমাজস্থিতির সেতু হইয়া দাঁড়াইল, ব্রাহ্মণও সেইরূপ সমাজে সর্ব্বোচ্চ পূজ্যপদ গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখনকার পুরাণে ইতিহাসে কাব্যে সর্ব্বত্রই এই চেষ্টা এমনি প্রবল আকারে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইতেছে যে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহা একটা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রয়াস, তাহা উজানস্রোতে গুণটানা, এইজন্য গুণবন্ধন অনেকগুলি এবং কঠিন টানের বিরামমাত্র নাই। ব্রাহ্মণের এই চেষ্টাকে কোনো একটি সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা মনে করিলে ইতিহাসকে সঙ্কীর্ণ ও মিথ্যা করিয়া দেখা হয়। এ চেষ্টা তখনকার সঙ্কটগ্রস্ত আর্য্যজাতির অন্তরের চেষ্টা। ইহা আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রযত্ন। তখন সমস্ত সমাজের লোকের মনে ব্রাহ্মণের প্রভাবকে সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতে না পারিলে যাহা চারিদিকে ভাঙিয়া পড়িতেছিল তাহাকে জুড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় ছিল না।

এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের দুইটি কাজ হইল। এক, পূর্ব্বধারাকে রক্ষা করা, আর এক, নূতনকে তাহার সহিত মিলাইয়া লওয়া। জীবনীপ্রক্রিয়ার এই দুইটি কাজই তখন অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও অধিকারকে এমন অপরিমিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। অনার্য্যদেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈদিক রুদ্র উপাধি গ্রহণ করিয়া শিব আর্য্য দেবতার দলে স্থান পাইলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সামাজিক মিলন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে রূপ গ্রহণ করিল। ব্রহ্মায় আর্য্য সমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল, এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল।

শিব যদিচ রুদ্রনামে আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিলেন তথাপি তাঁহার মধ্যে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই মূর্ত্তিই স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। আর্য্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করিয়া নির্ব্বাণের আনন্দে নিমগ্ন, তাঁহার দিগ্বাস সন্ন্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ; অনার্য্যের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্ত গজাজিনধারী, গঞ্জিকা ও ভাঙ ধুতুরায় উন্মত্ত। আর্য্যের দিকে তিনি বুদ্ধেরই প্রতিরূপ এবং সেই রূপেই তিনি সর্ব্বত্র সহজেই বুদ্ধমন্দিরসকল অধিকার করিতেছেন,

অন্যদিকে তিনি ভূত প্রেত প্রভৃতি শ্মশানচর সমস্ত বিভীষিকা এবং সর্পপূজা, বৃষপূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া সমাজের অন্তর্গত অনার্য্যদের সমস্ত তামসিক উপাসনাকে আশ্রয় দান করিতেছেন। একদিকে প্রবৃত্তিকে শান্ত করিয়া নির্জ্জনে ধ্যানে জপে তাঁহার সাধনা; অন্যদিকে চড়কপূজা প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়া ও শরীরকে নানা প্রকারে ক্লেশে উত্তেজিত করিয়া নিদারুণভাবে তাঁহার আরাধনা।

এইরূপে আর্য্য অনার্য্যের ধারা গঙ্গাযমুনার মত একত্র হইল তবু তাহার দুই রং পাশাপাশি বহিয়া গেল। এইরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যেও কৃষ্ণের নামকে আশ্রয় করিয়া যে-সমস্ত কাহিনী প্রবেশ করিল তাহা পাণ্ডবসখা ভাগবতধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বীরশ্রেষ্ঠ দ্বারকাপুরীর শ্রীকৃষ্ণের কথা নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের একদিকে ভগবদ্গীতার বিশুদ্ধ অবিমিশ্র উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব রহিল আর একদিকে অনার্য্য আভীর গোপজাতির লোকপ্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা তাহার সহিত যুক্ত হইল। শৈবধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যে জিনিষগুলি মিলিত হইল তাহা নিরাভরণ এবং নিদারুণ; তাহার শান্তি এবং তাহার মত্ততা, তাহার স্থাণুবৎ অচল স্থিতি এবং তাহার উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য উভয়ই বিনাশের ভাবসূত্রটিকে আশ্রয় করিয়া গাঁথা পড়িল। বাহিরের দিকে তাহা আসক্তিবন্ধন ছেদন ও মৃত্যু, অন্তরের দিকে তাহা একের মধ্যে বিলয়—ইহাই আর্য্য সভ্যতার অদ্বৈতসূত্র। ইহাই নেতি নেতির দিক—ত্যাগই ইহার আভরণ, শ্মশানেই ইহার বাস। বৈষ্ণব ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া লোকপ্রচলিত যে পুরাণকাহিনী আর্য্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার মধ্যে প্রেমের, সৌন্দর্য্যের এবং যৌবনের লীলা; প্রলয়পিণাকের স্থলে সেখানে বাঁশির ধ্বনি; ভূত প্রেতের স্থলে সেখানে গোপিনীদের বিলাস; সেখানে বৃন্দাবনের চিরবসন্ত এবং গোলোকধামের চির ঐশ্বর্য্য; এইখানে আর্য্য সভ্যতার দ্বৈতসূত্র।

একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। এই যে আভীর-সম্প্রদায়-প্রচলিত কৃষ্ণকথা বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহার কারণ এই যে, এখানে পরস্পর মিশিবার একটি সত্যপথ ছিল। নায়ক নায়িকার সম্বন্ধকে জীব ও ভগবানের সম্বন্ধের রূপক ভাবে পৃথিবীর নানাস্থানেই মানুষ স্বীকার করিয়াছে। আর্য্যবৈষ্ণব ভক্তির এই তত্ত্বটিকে অনার্য্যদের কাহিনীর সঙ্গে মিলিত করিয়া সেইসমস্ত কাহিনীকে একটি উচ্চতম সত্যের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া লইল। অনার্য্যের চিত্তে যাহা কেবল রসমাদকতারূপে ছিল আর্য্য তাহাকে সত্যের মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেখিল—তাহা কেবল বিশেষ জাতির বিশেষ একটি পুরাণকথারূপে রহিল না, তাহা সমস্ত মানবের একটি চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্যের রূপকরূপে প্রকাশ পাইল। আর্য্য এবং দ্রাবিড়ের সম্মিলনে এইরূপে হিন্দুসভ্যতায় সত্যের সহিত রূপের বিচিত্র সম্মিলন ঘটিয়া আসিয়াছে—এইখানে জ্ঞানের সহিত রসের একের সহিত বিচিত্রের অন্তরতর সংযোগ ঘটিয়াছে।

আর্য্যসমাজের মূলে পিতৃশাসনতন্ত্র, অনার্য্যসমাজের মূলে মাতৃশাসনতন্ত্র। এইজন্য বেদে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য নাই। আর্য্যসমাজে অনার্য্য প্রভাবের সঙ্গে এই স্ত্রীদেবতাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে লাগিল। তাহা লইয়াও যে সমাজে বিস্তর বিরোধ ঘটিয়াছে প্রাকৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবীতন্ত্রের মধ্যেও একদিকে হৈমবতী উমার সুশোভনা আর্য্যমূর্ত্তি অন্যদিকে করালী কালিকার কপালমালিনী বিবসনা অনার্য্যমূর্ত্তি।

কিন্তু সমস্ত অনার্য্য অনৈক্যকে তাহার সমস্ত কল্পনা-কাহিনী আচার ও পূজাপদ্ধতি লইয়া আর্য্যভাবের ঐক্যসূত্রে আদ্যোপান্ত মিলিত করিয়া তোলা কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না—তাহার সমস্তটাকেই রক্ষা করিতে গেলে তাহার মধ্যে শত সহস্র অসঙ্গতি থাকিয়া যায়। এইসমস্ত অসঙ্গতির কোনোপ্রকার সমন্বয় হয় না—কেবল কালক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় মাত্র। এই অভ্যাসের মধ্যে অসঙ্গতিগুলি একত্র থাকে, তাহাদের মিলিত করিবার প্রয়োজনবোধও চলিয়া যায়। তখন ধীরে ধীরে এই নীতিই সমাজে প্রবল হইয়া উঠে যে যাহার যেরূপ শক্তি ও প্রবৃত্তি সে সেইরূপ পূজা আচার লইয়াই থাক্। ইহা একপ্রকার হাল ছাড়িয়া দেওয়া নীতি। যখন বিরুদ্ধগুলিকে পাশে রাখিতেই হইবে অথচ কোনো মতেই মিলাইতে পারা যাইবে না তখন এই কথা ছাড়া অন্য কথা হইতেই পারে না।

এইরূপে বৌদ্ধযুগের প্রলয়াবসানে বিপর্য্যস্ত সমাজের নূতন পুরাতন সমস্ত বিচ্ছিন্ন পদার্থ লইয়া ব্রাহ্মণ যেমন করিয়া পারে সেগুলিকে সাজাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বসিল। এমন অবস্থায় স্বভাবতই শৃঙ্খল অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। যাহারা স্বতই স্বতন্ত্র, যাহারা নানা জাতির নানা কালের সামগ্রী, তাহাদিগকে এক করিয়া বাঁধিতে গেলে বাঁধন অত্যন্ত আঁট করিয়া রাখিতে হয়—তাহারা জীবনধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে আপনার যোগ আপনিই সাধন করে না।

ভারতবর্ষে ইতিহাসের আরম্ভযুগে যখন আর্য্য অনার্য্যে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন দুই পক্ষের মধ্যে একটা প্রবল বিরোধ ছিল। এই প্রকার বিরোধের মধ্যেও এক প্রকারের সমকক্ষতা থাকে। মানুষ যাহার সঙ্গে লড়াই করে তাহাকে তীব্রভাবে দ্বেষ করিতে পারে কিন্তু তাহাকে মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে পারে না। এইজন্য ক্ষত্রিয়েরা অনার্য্যের সহিত যেমন লড়াই করিয়াছে তেমনি তাহাদের সহিত মিলিতও হইয়াছে। মহাভারতে ক্ষত্রিয়দের বিবাহের ফর্দ্দ ধরিলেই তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু ইতিহাসের পরবর্ত্তী যুগে যখন আরএকদিন অনার্য্য বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল অনার্য্যেরা তখন আর বাহিরে নাই তাহারা একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তখন যুদ্ধ করিবার দিন আর নাই। এইজন্য সেই অবস্থায় বিদ্বেষ একান্ত একটা ঘৃণার আকার ধরিয়াছিল। এই ঘৃণাই তখন অস্ত্র। ঘৃণার দ্বারা মানুষকে কেবল যে দূরে ঠেকাইয়া রাখা যায় তাহা নহে, যাহাকে সকল প্রকারে ঘৃণা করা যায় তাহারো মন আপনি খাটো হইয়া আসে; সেও আপনার হীনতার সঙ্কোচে সমাজের মধ্যে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে; যেখানে সে থাকে সেখানে সে কোনোরূপ অধিকার দাবী করে না। এইরূপে যখন সমাজের একভাগ আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয়া লয় এবং আর একভাগ আপনার আধিপত্যে কোনো বাধাই পায় না—তখন নীচে যে থাকে সে যতই অবনত হয় উপরে যে থাকে সেও ততই নামিয়া পড়িতে থাকে। ভারতবর্ষে আত্মপ্রসারণের দিনে যে অনার্য্যবিদ্বেষ ছিল এবং আত্মসঙ্কোচনের দিনে যে অনার্য্যবিদ্বেষ জাগিল উহার মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ। প্রথম বিদ্বেষের সমতলটানে মনুষ্যত্ব খাড়া থাকে দ্বিতীয় বিদ্বেষের নীচের টানে মনুষ্যত্ব নামিয়া যায়। যাহাকে মারি সে যখন ফিরিয়া মারে তখন মানুষের মঙ্গল, যা াকে মারি সে যখন নীরবে সে মার মাথা পাতিয়া লয় তখন বড় দুর্গতি। বেদে অনার্য্যদের প্রতি যে বিদ্বেষ প্রকাশ আছে তাহার মধ্যে পৌরুষ দেখিতে পাই, মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি যে একান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার মধ্যে কাপুরুষতারই লক্ষণ ফুটিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটে। যেখানেই কোনো একপক্ষ সম্পূর্ণ একেশ্বর হয়, যেখানেই তাহার সমকক্ষ ও প্রতিকক্ষ কেহই থাকে না, সেখানেই কেবল বন্ধনের পর বন্ধনের দিন আসে, সেখানেই একেশ্বর প্রভু নিজের প্রতাপকে সকল দিক হইতেই সম্পূর্ণ বাধাহীনরূপে নিরাপদ করিতে গিয়া নিজের প্রতাপই নত করিয়া ফেলে। বস্তুত মানুষ যেখানেই মানুষকে ঘৃণা করিবার অপ্রতিহত অধিকার পায় সেখানে যে মাদক বিষ তাহার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তেমন নিদারুণ বিষ মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। আর্য্য ও অনার্য্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, য়ুরোপীয় ও এসিয়াটিক, আমেরিকান ও নিগ্রো, যেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে সেখানেই দুই পক্ষের কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষের সর্ব্বনাশকে ঘনাইয়া আনে। বরং শত্রুতা শ্রেয়, কিন্তু ঘৃণা ভয়ঙ্কর।

ব্রাহ্মণ একদিন সমস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজের একেশ্বর হইয়া উঠিল এবং সমাজবিধি সকলকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া বাঁধিল। ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসারণের যুগের পর অত্যন্ত সঙ্কোচনের যুগ স্বভাবতই ঘটিল।

বিপদ হইল এই যে, পূর্ব্বে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই শক্তি ছিল। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধতার যোগে সমাজের গতি মধ্যপথে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল; এখন সমাজে সেই ক্ষত্রিয়শক্তি আর কাজ করিল না। সমাজের অনার্য্য-শক্তি ব্রাহ্মণশক্তির প্রতিযোগীরূপে দাঁড়াইতে পারিল না—ব্রাহ্মণ তাহাকে অবজ্ঞার সহিত স্বীকার করিয়া লইয়া আপন পরাভবের উপরেও জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিল। এদিকে বাহির হইতে যে বীর জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া রাজপুত নামে ভারতবর্ষের

প্রায় সমস্ত সিংহাসনগুলিই অধিকার করিয়া লইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য অনার্য্যদের ন্যায় তাহাদিগকেও স্বীকার করিয়া লইয়া একটি কৃত্রিম ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল। এই ক্ষত্রিয়গণ বুদ্ধিপ্রকৃতিতে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ নহে। ইহারা প্রাচীন আর্য্য ক্ষত্রিয়দের ন্যায় সমাজের সৃষ্টিকার্য্যে আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিতে পারে নাই, ইহারা সাহস ও বাহুবল লইয়া ব্রাহ্মণশক্তির সহায় ও অনুবর্ত্তী হইয়া বন্ধনকে দৃঢ় করিবার দিকেই সম্পূর্ণ যোগ দিল।

এরূপ অবস্থায় কখনোই সমাজের ওজন ঠিক থাকিতে পারে না। আত্মপ্রসারের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া একমাত্র আত্মরক্ষণীশক্তি সঙ্কোচের দিকেই যখন পাকের পর পাক জড়াইয়া চলে তখন জাতির প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। কারণ সমাজের এই বন্ধন একটা কৃত্রিম পদার্থ; এইরূপ শিকল দিয়া বাঁধার দ্বারা কখনো কলেবর গঠিত হয় না। ইহাতে কেবলই বংশানুক্রমে জাতির মধ্যে কলের ধর্ম্মই জাগে ও জীবনের ধর্ম্মই হ্রাস পায়; এরূপ জাতি চিন্তায় ও কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বভারের অযোগ্য হইয়া পরাধীনতার জন্যই সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আর্য্যইতিহাসের প্রথম যুগে যখন সমাজের অভ্যাস-প্রবণতা বিস্তর বাহিরের জিনিষ জমাইয়া তুলিয়া চলিবার পথ বন্ধ করিয়া দিতেছিল তখন সমাজের চিত্তবৃত্তি তাহার মধ্যে দিয়া ঐক্যের পথ সন্ধান করিয়া এই বহুর বাধা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছিল। আজও সমাজে তেমনি আর একদিন আসিয়াছে। আজ বাহিরের জিনিষ আরো অনেক বেশি এবং আরো অনেক অসঙ্গত। তাহা আমাদের জাতির চিত্তকে ভারগ্রস্ত করিয়া দিতেছে। অথচ সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে একমাত্র শক্তি আধিপত্য করিতেছে তাহা রক্ষণীশক্তি। তাহা যা-কিছু আছে তাহাকেই রাখিতেছে, যাহা ভাঙিয়া পড়িতেছে তাহাকেও জমাইতেছে, যাহা উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে তাহাকেও কুড়াইতেছে। জাতির জীবনের গতিকে এইসকল অভ্যাসের জড়সঞ্চয় পদে পদে বাধা না দিয়া থাকিতে পারে না; ইহা মানুষের চিন্তাকে সঙ্কীর্ণ ও কর্ম্মকে সংরুদ্ধ করিবেই;—সেই দুর্গতি হইতে বাঁচাইবার জন্য এইকালেই সকলের চেয়ে সেই চিত্তশক্তিরই প্রয়োজন হইয়াছে যাহা জটিলতার মধ্য হইতে সরলকে, বাহ্যিকতার মধ্য হইতে অন্তরকে এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্য হইতে এককে বাধামুক্ত করিয়া বাহির করিবে। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই চিত্তশক্তিকেই অপরাধী করিয়া তাহাকে সমাজ হাজার শিকলে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। ছেলে একদিন ঘরের বাহির হইয়াছিল বলিয়া বাপ তাহাকে আজ লোহার সিন্দুকে পুরিয়া আধমরা করিয়া নিজকে নিশ্চিন্ত রাখিবার উপায় বাহির করিয়াছে।

কিন্তু তবু এই বন্ধনজর্জ্জর চিত্ত একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের একান্ত আত্ম-সঙ্কোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্মপ্রসারণের উদ্বোধনচেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্য যুগে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। নানক কবীর প্রভৃতি গুরুগণ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়াছেন। কবীরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জ্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী-কেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন্ নিভৃতে সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা যেন ধ্যান-যোগে তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মধ্য যুগে পরে পরে বারবার সেইরূপ গুরুরই অভ্যুদয় হইয়াছে—তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা এই ছিল যাহা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সোজা করিয়া তোলা। ইঁহারাই লোকাচার শাস্ত্রবিধি, ও সমস্ত চিরাভ্যাসের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া সত্য ভারতকে তাহার বাহ্য বেষ্টনের অন্তঃপুরে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

সেই যুগের এখনও অবসান হয় নাই, সেই চেষ্টা এখনো চলিতেছে। এই চেষ্টাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না; কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীন-কাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে;—ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী; তাহার শ্রীকৃষ্ণ তাহার শ্রীরামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক;

আমাদের চিরদিনের সেই মুক্তিপ্রিয় ভারতবর্ষ বহুকালের জড়ত্বের নানা বোঝাকে মাথায় লইয়া একই জায়গায় শতাব্দীর পর শতাব্দী নিশ্চল পড়িয়া থাকিবে ইহা কখনই তাহার প্রকৃতিগত নহে। ইহা তাহার দেহ নহে, ইহা তাহার জীবনের আনন্দ নহে, ইহা তাহার বাহিরের দায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা। ভারতের অন্তরতম সত্যপ্রকৃতিই ভারতকে এই সমস্ত নিরর্থক বাহুল্যের ভীষণ বোঝা হইতে বাঁচাইবেই। তাহার ইতিহাস তাহার পথকে যতই অসাধ্যরূপে বাধাসঙ্কুল করিয়া তুলুক না, তাহার প্রতিভা নিজের শক্তিতে এই পর্ব্বত-প্রমাণ বিঘ্নব্যূহ ভেদ করিয়াই বাহির হইয়া যাইবে —যত বড় সমস্যা তত বড়ই তাহার তপস্যা হইবে—যাহা কালে কালে জমিয়া উঠিয়াছে তাহারই মধ্যে হাল ছাড়িয়া ডুবিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা এমন করিয়া চিরকালের মত হার মানিবে না। এরূপ হার মানা যে মৃত্যুর পথ। যাহা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা যদি শুদ্ধমাত্র সেখানে পড়িয়াই থাকিত তবে সে অসুবিধা কোনো মতে সহ্য করা যাইত—কিন্তু তাহাকে যে খোরাকী দিতে হয়। জাতিমাত্রেরই শক্তি পরিমিত—সে এমন কথা যদি বলে যে, যাহা আছে এবং যাহা আসে সমস্তকেই আমি নির্ব্বিচারে পুষিব তবে এত রক্তশোষণে তাহার শক্তি ক্ষয় না হইয়া থাকিতে পারে না। যে সমাজ নিকৃষ্টকে বহন ও পোষণ করিতেছে উৎকৃষ্টকে সে উপবাসী রাখিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মূঢ়ের জন্য মূঢ়তা, দুর্ব্বলের জন্য দুর্ব্বলতা, অনার্য্যের জন্য বীভৎসতা সমাজে রক্ষা করা কর্ত্তব্য এ কথা কানে শুনিতে মন্দ লাগে না কিন্তু জাতির প্রাণভাণ্ডার হইতে যখন তাহার খাদ্য জোগাইতে হয় তখন জাতির যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ প্রত্যহই তাহার ভাগ নষ্ট হয় এবং প্রত্যহই জাতির বুদ্ধি দুর্ব্বল ও বীর্য্য মৃতপ্রায় হইয়া আসে। নীচের প্রতি যাহা প্রশ্রয় উচ্চের প্রতি তাহাই বঞ্চনা ;—কখনই তাহাকে ঔদার্য্য বলা যাইতে পারে না ; ইহাই তামসিকতা —এবং এই তামসিকতা কখনই ভারতবর্ষের সত্য সামগ্রী নহে।

ঘোরতর দুর্য্যোগের নিশীথ অন্ধকারেও এই তামসিকতার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকে নাই। যেসমস্ত অদ্ভুত দুঃস্বপ্নভার তাহার বুক চাপিয়া নিশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সরল সত্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার জন্য তাহার অভিভূত চৈতন্যও ক্ষণে ক্ষণে একান্ত চেষ্টা করিয়াছে। আজ আমরা যে-কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে-কালকে বাহির হইতে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না, তবু অনুভব করিতেছি ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, এককে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে বাঁধের উপর বাঁধ পড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর স্রোত খেলিতে-ছিল না, আজ কোথায় তাহার প্রাচীর ভাঙিয়াছে—তাই আজ এই স্থির জলে আবার যেন মহাসমুদ্রের সংস্রব পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার-ভাঁটার আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে। এখনি দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্যোগ সজীবহৃৎপিণ্ডচালিত রক্তস্রোতের মত একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে একবার আপনার দিকে ফিরিতেছে। একবার সার্ব্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্ব্বস্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজত্বকে ছাড়িতে চাহিতেছে, আবার সে দেখিতেছে নিজত্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজত্বই হারানো হয় সর্ব্বত্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই ত লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই ধাক্কার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্ব্বজাতিকে ও সর্ব্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়,—এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষে, ওভার্টুন হলে, ৩রা চৈত্র তারিখে পঠিত।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliere ফরাসী-গ্রন্থ হইতে)

দ্বিতীয় খণ্ড।

অবতরণিকা।

মধ্য-এসিয়ার লোকসমূহ—সামন্ত-তন্ত্র—মুসলমান-ধর্ম্ম।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় জনসমাজের অবনতি অরাজকতায় পর্য্যবসিত হইল; বাহির হইতে আক্রমণ ঘন-ঘন আরম্ভ হইল। সেইসব সময়ে, এতটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল যে, শিল্প ও সাহিত্যে কোন উল্লেখ-যোগ্য রচনা প্রকাশের অবসর মাত্র হয় নাই। ভারতের ইতিহাস-সম্বন্ধীয় প্রামাণিক দলিলপত্রের একান্তই অভাব। একাদশ শতাব্দী হইতে, আবার প্রমাণ-লেখ্যসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে দেখিতে পাই, ভারত অনেকটা রূপান্তরিত। তিনটি উপাদান, এই রূপান্তরীকরণে সাহায্য করিয়াছিল; মধ্য-এসিয়ার আদিমবাসী জনপুঞ্জের ভারতে বাসস্থাপন, সামন্ততন্ত্র, মুসলমান-ধর্ম্ম।

১

মধ্য-এসিয়া।—ভূগোল। উরাল—আল্‌টায়িক প্রদেশের লোক। উহাদের দৈহিক গঠন। উহাদের স্বভাব। উহাদের আচার ব্যবহার। উহাদের ভাষা।—উহাদের ইতিহাসে বিপুল বংশাবলী।—সাধারণ সভ্যতার ইতিহাসে, উবাল-আল্‌টায়িক প্রদেশনিবাসীদিগের বিশেষ কার্য্য।—উরাল-আল্‌টায়িক লোকপুঞ্জের উপর পারস্য ও চীনের প্রভাব।—তুর্কদিগের সাম্রাজ্য।—উইগুরদিগের সাম্রাজ্য।—রাজ্য-শাসনের কলাকৌশল।—মোগোল-সাম্রাজ্য।—ভারতের উপর আক্রমণ—মুসলমানের পূর্ব্বে:—শক (য়ু-চি) ও শ্বেত হুন্ বা তুর্কম্যান। রাজপুত। মুসলমানের পর তুর্ক, আফগান, মোগল।—ভারতীয় সভ্যতার উপর মধ্য-এসিয়াবাসী জনপুঞ্জের প্রভাব। (১)

আধুনিক যুরোপের ন্যায়, আধুনিক ভারত,—প্রাচীন সভ্যজাতি ও কতকগুলি অসভ্যজাতি—এই দুয়ের সংমিশ্রণে, এবং পরস্পরের ধর্ম্মবিশ্বাস, রীতিনীতি ও চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে সংগঠিত হয়।

প্রাচীন মহাদেশের সভ্যতা, সাগরউপকূলেই বিকাশ লাভ করে; কালক্রমে উপকূলবাসী লোকেরা অসভ্যদিগকে এবং শত্রুদিগকে জয় করিয়া বা হটাইয়া দিয়া যুরোপ

(১) তুর্কেরা, বৈকাল হ্রদ ও উস্‌সুরি হ্রদ (লিয়াও) এই দুইয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়; পূর্ব্বদিকে তুঙ্গু জাতি। ঐ প্রদেশ হইতে উইগুর জাতিও নিঃসৃত হয়; উহারা খঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দতে, পূর্ব্ব হইতেই, চামি ও বকু‍লের সন্নিকটে একটা রাজ্য স্থাপন করে। চতুর্থ শতাব্দীতে, তুর্ক জাতীয় হিউং-নুগণ—হুন্‌রা যাহাদের ভাবী বংশধর—চীন আক্রমণ করে; কিন্তু প্রথম চীন সম্রাট্ সিন্-শি হ্বাং-টি (২২১—২১০) বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন—সেই অবধি পশ্চিমদিকেই আক্রমণ চলিতে থাকে। খৃঃ পূঃ ১৫৭ অব্দে, হ্বাং-নু ও উন্সুনেরা, তারিনের অববাহিকা হইতে হিন্দ-শকদিগকে (জেঠ্ বা য়ু-চি) দুরীভূত করে। এই য়ু-চিদিগের উৎপত্তির কথা ভাল জানা নাই। শকেরা প্রথমে ট্রান্‌সক্‌সিয়ানা প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, খঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে উহারা বাক্তিয়ানার (বাহ্লিক) গ্রীক রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া, ভারতে কনিষ্কের প্রভুত্বাধীনে একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করে। পরে পূর্ব্বদিক্ হইতে অন্যান্য অভিযান আরম্ভ হয়; সিয়েন-পি, য়ুয্যান্‌য়ুয্যান্, (সিয়েন-পিদিগের এক শাখা), তুর্ক বা তুকিউ,—ইহারা ষষ্ঠ শতাব্দীতে ক্যাস্‌পিয়েন পর্য্যন্ত স্বকীয় রাজত্ব বিস্তার করে; এবং য়ুইগুর,—ইহারা ৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তুর্ক-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করে। ক্রমান্বয়ে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তুর্কদিগের বিভিন্ন জনপুঞ্জ, পুরোবর্ত্তী-এসিয়াকে আক্রমণ করে এবং তথায় শক্তিশালী কতকগুলি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে: যথা, খোরাসানের তাহিবিদ্‌বংশ; তুলুমিড্-বংশ এবং ইজিপ্ট ও সিরিয়ায় ইক্ষিদি-বংশ; গাজ্‌নেভিদ্-বংশ—যাহাদের সাম্রাজ্য জর্জিয়া হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; সেল্‌জুকিড্-বংশ, পারস্য দেশে ও ট্র্যান্‌সক্‌সিয়ানায় খওয়ারেজ-মিয়েন-বংশ।

পূর্ব্বদিকে, অন্যান্য উরালনিবাসী লোক, চীনের অরাজকতার সময় সুযোগ পাইয়া চীনদেশ আক্রমণ করে; তন্মধ্যে কেহ কেহ চীন সম্রাট্‌দিগের সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত হয়। এইরূপে, যেসকল তুর্ক বৃহৎ প্রাচীরের এধারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারা হান্-বংশের পতনে (খৃঃ পূঃ ২০৬, ২২০,) সুযোগ পাইয়া উত্তর-চীন দখল করিয়া বসে; ৩০৮ হইতে ৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত অনেকগুলি তুর্ক রাজবংশ পরিদৃষ্ট হয়। তাং-বংশ যাহারা চীনের একতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাদের অবনতিতে খিটান্‌রা চীন আক্রমণ করে; ৮৭২ অব্দে উহারা উত্তর-চীনে একটা রাজ্য স্থাপন করে। সুঙ্গেরা (৯৬০ হইতে ১২৮০ পর্য্যন্ত) উত্তর চীনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু মাঞ্চু-জাতীয় এক জনপুঞ্জ,—খিটান বা লিয়াওদিগের বিজেতা—পেকিন্ দখল করে, সুঙ্গেরা যাংসি নদীর দক্ষিণে সরিয়া যায় এবং মাঞ্চুরা উত্তর বিভাগে স্বর্ণ-রাজ্য (কিন্) স্থাপন করে। আরও উত্তরে কারাখিতাইদিগের রাজ্য দৃষ্ট হয়। বোধ হয় নেষ্টোরীয় সম্প্রদায়ের খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত কারাখিতাইদিগের যে রাজা, তিনিই মধ্য যুগের কাহিনীতে পুরোহিত জোহান নামে খ্যাত।

তেমুজিন্, জেঙ্গিস খাঁ, মধ্য মালভূমির মোগোল ও তুর্কিদিগকে একত্র করিয়া, কারাখিতাইদিগের রাজ্য ধ্বংস করে; উত্তর-চীন ও তুর্কিস্থান জয় করে (১২০৯-১৫) এবং মোগোল-সাম্রাজ্য স্থাপন করে। জেঙ্গিস খাঁর পুত্রগণ পেকিনে মোগোল-সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করে। এই সাম্রাজ্য জর্ম্মান দেশ হইতে চীন সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং বরফ্-স্তূপের সমুদ্র হইতে আরব ও হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। য়ুয়ান্-রাজবংশই মোগোলদিগের চীন-রাজবংশ (১২০৯ বা ১২৮০ হইতে ১৩৬৮ পর্য্যন্ত)। যে সময়ে মিঙ্গেরা (১৩৬৮—১৬৪৪) মোগোলদিগকে চীন হইতে বিদূরিত করে, তখন রাজধানী কারাকোরনে উঠিয়া যায়। কারাকোরনের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয় (ইহাই জেঙ্গিস খাঁর রাজধানী)। খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইবার পর মোগোল-সাম্রাজ্য তাইমুর লঙ্গ্ কর্ত্তৃক মধ্য-এসিয়ায় পুনর্গঠিত হয়। তাইমুর লঙ্গের জন্ম ১৩৩৩ অব্দে এবং মৃত্যু ১৪০৬ অব্দে। সমরখন্দ তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার বংশধরেরা তাঁহার উত্তরাধিকারী হয় নাই। সপ্তম শতাব্দীতে, সমরখন্দ জেঙ্গিস খাঁর বংশধরদিগের দখলে আসে। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে,—তুর্ক-সাম্রাজ্যের মধ্যে অটোম্যান-সাম্রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সাম্রাজ্য (১২৫৯—১৩২৬) অথমান-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।



সরস্বতী
প্রাচীন চিত্র হইতে, চিত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত

ও এসিয়ার অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করে; রুস-সাম্রাজ্যের বিস্তৃত অনুর্ব্বর ভূমিতে ও মোঙ্গলিয়ার মরুভূমিতে এখনও কতকগুলি পশুচারোপজীবী অস্থিরবাস জাতি পরিলক্ষিত হয়। যেরূপ অসভ্যজাতিদিগের উপর প্রাচীন সুসভ্য-জাতিদিগের বিজয়-কাহিনী প্রাচীন ইতিহাসে বিবৃত হয়, সেইরূপ সুসভ্যজাতিদিগের উপর অসভ্যজাতিদিগের বিজয়-বার্ত্তা ও অসভ্যজাতিদিগের সভ্যতার উন্নতির কথা আধুনিক ইতিহাসে বিবৃত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে,—গ্রীক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর হইতে, ইংরাজ-সাম্রাজ্যের পত্তন পর্য্যন্ত, বৈদেশিক আক্রমণ দুই সহস্র বৎসর কাল স্থায়ী হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভ হইতে আক্রমণকারীরা কেবল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে সমগ্র দেশের বিজয়সাধন ও রূপান্তরীকরণের আরম্ভ হয়।

ঐসকল আক্রমণকারীরা কোন্ কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন এবং উহাদের রীতিনীতি কিরূপ ছিল তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

***

প্রথমে উহাদের উৎপত্তির কথা। মধ্য-এসিয়া একটি মালভূমিরূপে গঠিত; উহা হিমালয় হইতে, উত্তরের বিস্তৃত অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে। এই অনুর্ব্বর সমভূমি Dniepre হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত। পামীর ও বৈকালহ্রদ—এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি গিরিমালা, ঐ মালভূমিকে বিভক্ত করিয়াছে। উহার পূর্ব্বাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চতর, এবং চীনের সমভূমির উর্দ্ধে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে; উহার পশ্চিমাংশ কাস্পিয়েন পর্য্যন্ত, মৃদু-ঢালে নামিয়া আসিয়াছে। দুইটি গিরিপথের দ্বারা এই গিরিমালা বিখণ্ডিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী সুগম—আল্তাই পর্ব্বতের দক্ষিণে, এবং অপরটি দুর্গম—পামীরের মধ্যে অবস্থিত। অতএব দেখা যাইতেছে, যেসকল লোক মধ্য-মালভূমিতে বাস করে তাহারা ভারত ও চীন সহজে আক্রমণ করিতে পারে, অথবা অনুর্ব্বর সমভূমির উপর দিয়া, য়ুরোপ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতে পারে।

সম্ভবতঃ এইসমস্ত জনপুঞ্জের একই উৎপত্তিস্থান। উহারা উরাল-আল্তায়িক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহাদের ভাষার শব্দশাস্ত্রগত লক্ষণগুলি একই; এই সকল ভাষা সংশ্লেষাত্মক (agglutinant); উহাদের বাক্যরচনা-পদ্ধতি অনুসারে, বিশেষ্যের পূর্ব্বে বিশেষণ, কর্ত্তৃপদের পূর্ব্বে কর্ম্মপদ, এবং বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়। উহাদের দৈহিক গঠন এইরূপ:—উহাদের উচ্চতা মধ্যপ্রমাণ, কাঁধ চওড়া, মাথা লম্বা, মুখ চ্যাপ্টা, চোয়ালের অস্থি দৃঢ়, চোক্ ছোট ও নাকের পাশে ত্যার্চ্চা, চোখের পাতা অপ্রশস্ত, গালের হাড় 'বাহির-করা', চুল রুক্ষ, শ্মশ্রু বিরল, দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ দীর্ঘ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হ্রস্ব। উহারা নির্ভীক অশ্বারোহী, সর্ব্বপ্রকার কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত; এত অধিক ঘোড়ায় চড়ে যে, উহাদের অনেকেরই পা ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়। উহাদের পরিচ্ছদ গদি-ভরা, অ-সংস্কৃত চর্ম্মের আলখাল্লা, 'সিদ্ধ-করা' চামড়ার কোমরবন্দ; ভারী ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ, অথবা 'কসাক'-জাতীয় লোমশ টুপী। নৈতিক হিসাবে স্থূলরুচি, কিন্তু বুদ্ধিমান; উদাসীন কিন্তু নিষ্ঠুর; সাহসী, শ্রমসহিষ্ণু, অভিচার-মন্ত্রতন্ত্রে ও মূর্ত্তিপূজায় উহাদের বিশ্বাস; কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মভাব উহাদের আদৌ নাই; সকল ধর্ম্ম-পদ্ধতিই অনুসরণ করিতে উহারা প্রস্তুত। বিশেষত উহারা যুদ্ধপ্রিয় ও কঠোর নিয়মশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাবান্। উহারা রমণীর অবস্থা প্রায় পুরুষেরই অবস্থার সমান করিয়া তুলিয়াছে। প্রধানের দুহিতারা, উত্তরাধিকারিসূত্রে, ভূমি গোধন ও সৈন্যের ভাগ পায়। মধ্য-এসিয়ায় কতকগুলি প্রভাবান্বিতা রাজ্যেশ্বরীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে, জেঙ্গিস খাঁর মাতা একটি দৃষ্টান্ত।

এইসমস্ত লোকের মধ্যে পরিবারই সমাজের আদিম রূপ; পরিবার ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া গোত্রে পরিণত হয়। এই গোত্র কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি। আবার কতকগুলি গোত্র লইয়া একটি শাখা-জাতি গঠিত হয়। কিন্তু কালক্রমে অবিরাম যুঝাযুঝির ফলে, শাখা-জাতি ও গোত্রগুলি উচ্ছিন্ন হয়,—এমন কি পারিবারিক বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ে। যেসকল সর্দ্দার সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও সৌভাগ্যবান, যোদ্ধৃগণ তাহাদিগকেই ঘিরিয়া দলবদ্ধ হইত। এইরূপে একপ্রকার সামন্ততন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

একান্ত বাধ্য ও অনুগত থাকিবে বলিয়া যোদ্ধৃগণ সর্দ্দারের নিকট শপথ গ্রহণ করিত। তাহার বিনিময়ে সর্দ্দার তাহাকে আশ্রয়দান করিবে,—লুটের কিঞ্চিৎ ভাগ দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিত। যাহারা অস্থিরবাস তাহাদের সম্পত্তি—গোমহিষাদি; এবং যাহারা স্থিরবাস তাহাদের সম্পত্তি - ভূমি। কালক্রমে রাষ্ট্রিকপদ্ধতি সংগঠিত হইল। উরাল-বাসীদিগের মধ্যে, সম্রাট্ বা রাজা ছিল, বড় বড় সামন্ত ছিল, বড় বড় জাইগিরদার ছিল, দলের সর্দ্দার ছিল, অস্ত্রধারীদিগের নায়ক ছিল,—সামন্ততন্ত্রের শ্রেণী-পরম্পরা সমস্তই ছিল।

***

উৎপত্তিসূত্র এক হইলেও, এইসকল জাতিদিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই চরিত্রগত লক্ষণ বিভিন্ন। উহাদের জাতিগত প্রভেদ ইতিহাস আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। উরালীয়দিগের মধ্যে কোন কোন জাতি, সাইবিরিয়ায় তুষার-সজ্ঘাত-বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে, কেহ বা মোঙ্গোলিয়ার মরুভূমে কেহ বা মধ্য-মালভূমের শিখরদেশে, অথবা ট্র্যান্স্‌ক্যাক্‌সিয়ানার উর্ব্বর ক্ষেত্রে বাস করিত। উহারা সকলেই সভ্যতর রাজ্যের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইত; এবং উভয়ই কতকটা পরস্পরের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

যেসকল জাতির ইতিহাসে কিছু কৃতিত্ব আছে, তন্মধ্যে তুরাণীদিগের (তুর্কম্যান) নাম, (২) য়ু-চি বা শকদিগের নাম, অ্যাটিলার হুন্‌দিগের নাম, (চীনদিগের কর্ত্তৃক অভিহিত—হিয়ং-নু), তুর্কজাতির বিভিন্ন জনসংঘের নাম, উইগুর, মোগল, মাঞ্চু-তাতার, কারাখিতাই ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এইসকল জাতি আপনাদিগের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিত, প্রতিবেশীদিগের সহিত যুদ্ধ করিত। প্রতিবেশী যথা, আফ্‌গান, বেলুচি, তিব্বতী; (৩) উহারা সভ্য-সাম্রাজ্যসমূহকে আক্রমণ করিত, অথবা ঐসকল সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিত। কি জয়, কি পরাজয়—উভয় সূত্রেই ঐসকল জনসজ্ঘ স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেশ ছাইয়া ফেলিল। প্রাচীন যুগে, দারায়ুস, আলেক্‌জাণ্ডার এবং চীনসম্রাট্ শি-হুয়াং-টি—ইহাদেরই অভিযান উল্লেখযোগ্য; সেলিউকস্-বংশের পতনে, পারস্য-দেশ, শক-বংশীয় পার্থীয়দিগের হস্তগত হয়। আধুনিক যুগের প্রথম শতাব্দীতে চীন-সৈন্য, চীন-তুর্কিস্থান ও খাশগারিয়া জয় করে; পরে, হান্-সম্রাট্‌দিগের পতনে, মাঞ্চু, তুর্ক ও মোগোলেরা চীনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায়। পরে তাংরা উহাদিগকে দূরীভূত করিয়া সমরখন্দ পর্য্যন্ত ট্রান্‌সক্‌সিয়ানা দখল করে। কালিফ-আধিপত্যের অবনতি হইলে, ঐ রাজ্য সেল্‌জুক্‌দিগের হস্তগত হয় ও তাহারা প্রায় সমস্ত প্রদেশই দখল করে। মাঞ্চুগণ কর্ত্তৃক সুং-সম্রাটেরা উত্তর-চীন হইতে দূরীভূত হইলে, সুং-সম্রাটেরা তুর্ক ও মোগোলের সাহায্য প্রার্থনা করে। জেঙ্গিস্ খাঁ মধ্য-এসিয়া হইতে, তত্রত্য সমস্ত লোকপুঞ্জকে সেখানে প্রেরণ করেন;—তাহারাই একটি সমগ্র জাতিতে পরিণত হয়। জেঙ্গিস্ খাঁ ও তাঁহার পুত্রের সৈন্যগণ চীন, মধ্য-এসিয়া, এসিয়া ও য়ুরোপের রুসিয়া, পারস্য আণ্ডাটোলি জয় করিয়া, সিলেসিয়া ও মোরাভিয়া পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসে। জেঙ্গিস্ খাঁর মৃত্যুর পর, মোগোল-সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে; পরে তৈমুর লঙ্গ্ ঐ বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য কতকটা পুনর্গঠিত করেন। তৈমুর লঙ্গের বংশধরেরা ঐ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারে নাই। বহুশতাব্দীব্যাপী অরাজকতার পর, মোগোলিয়া, খাশগারিয়া, তিব্বত ও প্রাচ্য তুর্কিস্থান, মাঞ্চুদিগের চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

***

মধ্য-এসিয়ার জনসজ্ঘের অভিযান মানবসাধারণ-সভ্যতার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহারাই এসিয়া ও য়ুরোপের বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে স্থলপথ দিয়া যোগাযোগ স্থাপন করে। একবার লভ্যের আস্বাদ পাইয়া তাহারা বাণিজ্যের আনুকূল্য করিতে লাগিল, যাহারা "রেশমের পথ" অনুসরণ করিত—সেই স্বার্থবাহদিগকে তাহারা রক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে, প্রাচীন য়ুরোপ ও আধুনিক য়ুরোপ, চীনের দ্রব্যজাত পাইতে

(২) য়ু-চিগণ বোধ হয় উরাল-আল্টায়িক জাতি হইতে উৎপন্ন নহে। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, য়ু-চি শক হইতে ভিন্ন।

(৩) আফ্‌গান ও বেলুচিরা ইরাণী জাতি হইতে উৎপন্ন; তিব্বতীয়েরা স্বতন্ত্র জাতি—উহারা মোগোলীয় জাতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। উহাদের ভাষা একাক্ষরিক।

লাগিল, এবং চীনদেশ ভারতের পারস্যের ও য়ুরোপের দ্রব্যজাত পাইতে লাগিল। কৃষিজাত ও উদ্যমজাত দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসামগ্রীও উহারা লাভ করিতে লাগিল:—চীন ও জাপানে,—পারস্যদেশীয় ধাতু-ঢালাই কাজ, মিনার কাজ, কুম্ভকারের কাজ—এইসকল কাজের অনুকরণ আরম্ভ হইল।

তুর্ক ও মোগলদিগের প্রসাদে, এসিয়া ও য়ুরোপের জাতিদিগের মধ্যে, পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানেরও বিনিময় হইতে লাগিল।

যেসকল জাতি সম্মিলিত হইয়া একীভূত হইয়াছিল, তুর্ক ও মোগলেরা তাহাদের শিল্প, তাহাদের প্রতিষ্ঠান-সকল গ্রহণ করিল। স্বকীয় প্রাচীন বর্ণমালা পরিত্যাগ করিয়া, উহারা দুই প্রকার লিপি গ্রহণ করিল—একটি সংস্কৃত, আর একটি সিরিয়াক্; আরও কিছুকাল পরে, আরব-লিপিও গ্রহণ করিল; উহারা বিভিন্ন জাতির গ্রন্থ সকল অনুবাদ করিল। উহাদের প্রাকৃতিক শক্তিমূলক পৌত্তলিকতার সহিত চীনীয়, বৌদ্ধ, ও খৃষ্টীয় মত বিশ্বাস জড়িত হইয়া পড়িল। খাস্‌গারিয়ায় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ-ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই পথ দিয়াই চীনদেশ,—বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও জোরোয়াষ্টার-ধর্ম্মের সহিত পরিচিত হয়। ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নেষ্টর-সম্প্রদায়ের খৃষ্টানেরা তুর্কদিগের অনেককেই খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করে। কারাখাতাইদিগের মধ্যেও একজন খৃষ্টান রাজা ছিল—যাহাকে য়ুরোপীয়েরা জোহান পুরোহিত নামে অভিহিত করিত।

বিশেষতঃ দুইটি দেশ, উরালীয়দিগের উপর প্রভাব বিস্তার করে;—চীন ও পারস্য। চীন ও পারস্যের কেন্দ্রগত রাজ্যশাসনপ্রণালী উহাদিগকে মুগ্ধ করে। ষষ্ঠ-শতাব্দীতে, তুর্ক জাতীয় সমস্ত লোক একটি সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে একত্র সম্মিলিত হয়। এই সাম্রাজ্য কাস্পীয়-সাগর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই সাম্রাজ্যের গঠন-প্রণালী, তুর্কদিগের সামন্ততন্ত্রের প্রথা ও চীনদেশীয় শাসনতন্ত্র—এই দুয়ের মাঝামাঝি। সম্রাটের শাসনাধীনে, ঐ সাম্রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি সামন্ত অর্থাৎ সৈনিক রাজপুরুষ ও কতকগুলি স্বাধীন মনুষ্য ছিল। একাদশ শতাব্দীতে, খাসগারিয়ার উইগুরেরা—যাহারা খুব ধনশালী ও উরালীয়দিগের অপেক্ষা সভ্যতর, তাহারা তুর্ক-সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করে। একজন উইগুর গ্রন্থকার "রাজ্য-শাসনের কলাকৌশল," এই নামে একটি কাব্য রচনা করে। এই রূপক জাতীয় রচনায়,—মূর্ত্তিমতী রাজশক্তি আসিয়া প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক ব্যবসায়ের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে রাজার নিকট ব্যাখ্যা করিতেছে। একজন প্রকৃত তুর্কের ধরণে, কবি বলিতেছেন;—"যুদ্ধে মৃত্যু, সম্মানের মৃত্যু"; কিন্তু এদিকে আবার চীনীয় ভাব প্রবেশ করায়, দেওয়ানী বিভাগের রাজপুরুষগণ পদমর্য্যাদায় ফৌজদারী বিভাগের রাজ-পুরুষদিগের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে, ব্যবসায়ী সৈনিকদিগের পদ, কারিগর ও কৃষকদিগের পদ অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। কবি রাজাকে বলিতে-ছেন:—"কৃষক ও কারিগরদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে কিন্তু সাবধান, তাহাদের সহিত বেশী ঘনিষ্ঠতা করিবে না। তাহাদের কিসের উপর অনুরাগ?—না, উদরের উপায়। তাদের প্রিয় আসক্তি কি?—না, ঔদরিকতা। উদর পূর্ণ হইলেই উহারা চুপ্ করিয়া থাকে; ক্ষুধিত হইলেই, বিদ্রোহী হয়। উহাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় দিবে।" (৪) জেঙ্গিস্ খাঁর সামরিক বন্দোবস্তের মধ্যে তাহার ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্ব প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাঁহার রাজ্যশাসন-প্রণালী, তাঁহার গুপ্তচর নিয়োগ-প্রথা, চীনকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, মোগোলেরা একটা চীনীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে; সেই রাজবংশ দেড়শত বৎসর রাজত্ব করে:—কুব্লাই খাঁ একটি বৃহৎ খাল খনন করেন, এবং কাগজ-মুদ্রা বাহির করেন; মোগোলদিগের মধ্যে চীনীয় প্রভাব প্রবল ছিল।

(৪) "রাজশাসনের কলা-কৌশলের" এই অনুদিত অংশটি আমি M. Cahunএর গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। ঐ গ্রন্থের নাম—"এসিয়ার ইতিহাসের অবতরণিকা" (পৃ ১৮৭)। "কুদাৎকু" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার যদিও মুসলমান,—উহাতে মুসলমানধর্ম্মের প্রভাব বড় একটা লক্ষিত হয় না। বরং প্রধান মন্ত্রী আবু আলি হুসেন রচিত "সিয়াসেৎ নামা" অর্থাৎ রাজ্যশাসনের গ্রন্থে দেখা যায় যে পাশ্চাত্য তুর্কেরা, আরব ও পারস্যবাসীদিগের মতামতে ও রীতিনীতিতে দীক্ষিত হইয়াছিল। সেলজুকদিগের প্রথম সুলতানদ্বয়—আল্প-আর্স্লান ও মালিক-শা—ইহাঁদেরই প্রধান মন্ত্রী—উল্লিখিত আবু-আলি-হুসেন। (১০৬৩—৯২)।

উরালীয়গণ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর, যে সভ্যতা রূঢ় হইলেও একটু জটিল ধরণের—সেই উরালীয় সভ্যতার মধ্যে মুসলমানধর্ম্ম, একটি নূতন উপাদান প্রবর্ত্তিত করে। মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে উহাদিগের আটশত বৎসর লাগিয়াছিল। প্রথম কালিফদিগের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, এই ধর্ম্মান্তরগ্রহণ-কার্য্য তৈমুর লঙ্গ্ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হয়। কিন্তু তথাপি মুসলমানধর্ম্ম মোগোলদিগের মধ্যে বহুকাল তিষ্ঠিতে পারে নাই; ষোড়শ শতাব্দীতে উহারা তিব্বতীয় লামাগণ কর্ত্তৃক পুনর্গঠিত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। আমেরিকার আবিষ্কার, উত্তমাশা অন্তরীপের আবিষ্কার, বড় বড় কেন্দ্রীভূত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, —এইসমস্ত কারণে মধ্য-এসিয়ায় উরালীয়দিগের ঐতিহাসিক লীলার অবসান হয়। উরালীয় বংশের অন্যান্য জাতি, য়ুরোপে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে:-যথা, অটোম্যান তুর্ক, হঙ্গারীয়, বুলগারীয় ইত্যাদি।

***

এক্ষণে দেখা যাউক, কোন্ কোন্ দেশের লোক ভারত আক্রমণ করে, এবং তাহাদিগের ভারতবিজয়ের ফলে কিরূপ সভ্যতা ভারতে আনীত হয়।

এইসকল বিজয়-অভিযান, দুই কাল বিভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে, আক্রমণকারিগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে মিশিয়া যায়।

প্রাচীন যুগের প্রায় শেষ ভাগে, য়ু-চি বা হিন্দ-সীথীয় বা শক জাতির আবির্ভাব।(৫) একশত বৎসর পুর্ব্বে, উহারা উইগুরদিগের কর্ত্তৃক খাস্‌গারিয়া হইতে বিদূরিত হইয়া ট্রান্‌সক্‌সিয়ানায় একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করে। পার্থীয়দিগের বিজয়-অভিযান,—য়ু-চিদিগকে পঞ্জাবে, হিন্দুস্থানে, গুজরাটে ঠেলিয়া লইয়া যায়। সীথীয় বা শকেরা পারস্য ও চীনের সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপন করে; বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, উহারা ভারতকে রূপান্তরিত করিয়া তুলে। বহুসংখ্যক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মতবাদটি জোরোয়াষ্টারের ধর্ম্ম হইতে; এবং বুদ্ধ ও মারের যুদ্ধ ব্যাপারটা ঐ ধর্ম্মের অন্তর্গত অমঙ্গলের দেবতা হইতে, গৃহীত হয়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধদিগের "স্থবির" পদবীর উৎপত্তিসূত্র চীনীয়।

তুর্ক ও উইগুর সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় অভিযানের নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হয়; হুসাংদিগের,—বিশেষতঃ—আরব-দিগের বিজয়াভিযান। শ্বেত হুনরা তুর্ক জাতীয়—যাহাদিগকে বৈজন্তীগণ (Byzantine) এফ্‌টালিট্‌-নামে অভিহিত করিত। উহারা পঞ্জাবে, ও হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্বেতহুন, শক ও আফগান—ইহারা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া, রাজপুত নাম গ্রহণ করে।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে, রাজপুত রাজারা, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরভাগে কতকগুলি রাজ্য জয় করে। রাজপুতদিগের প্রধান অবলম্বন ছিল সামন্ত্র-তন্ত্র বা জাইগিরদারি-পদ্ধতি।

একাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া, ভারত-

---

(৫) হিন্দ-সীথীয় বা শক জাতির উৎপত্তি, অন্যান্য সীথীয় জাতির উৎপত্তির ন্যায় কুহেলিকাচ্ছন্ন। উহাদিগকে মোগোল জাতির অন্তর্ভুক্ত বলা হয় কিন্তু উহাদিগের ভাষার যে শব্দগুলি আমরা জানি (প্রায় ৬০ শব্দ) উহা উরালো-আল্টায়িক ভাষার শব্দ নহে: এবং দক্ষিণ রুসিয়ার সমাধি-মন্দিরে যেসকল মূর্ত্তিশিল্প পাওয়া গিয়াছে, সেইসকল মূর্ত্তির দৈহিক গঠনাদর্শের সহিত, মোগোলীয় দৈহিক গঠনাদর্শের অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। লাহোরের যাদুঘরে যে মূর্ত্তিটি রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতেও ঐরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। উহা শকজাতীয় এক রাজার মূর্ত্তি;—দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, দীর্ঘকুন্তল, ঘনবিন্যস্ত গুম্ফ, নিষ্ঠুর-ভীষণ মুখের ভাব, আয়ত নেত্র, থুতি সম্মুখদিকে প্রসারিত, ললাট ও নাসিকায় "মুমূর্ষু গ্লাডিয়েটারের" সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তথাপি ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক, প্রাচীনেরা রুমানিয়া ও দক্ষিণ-রুসের সমস্ত লোককে সীথীয় নামে অভিহিত করিত, এবং উহাদের উৎপত্তিসূত্রও অত্যন্ত বিভিন্ন। তা ছাড়া, যাহারা খৃষ্টাব্দের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে খাসগারিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই য়ু-চিগণ যদি মলদাভিয়ার সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিল এইরূপ মনে করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, মোগোল জাতির সহিত সাঙ্কর্য্য সংঘটিত হইয়া উহারা একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সাধারণের বিশ্বাস, পঞ্জাবের জাঠেরা প্রাচীন সীথীয়দিগের বংশধর। এবং Ibbetsএর মতে, জাট ও রাজপুতের একই উৎপত্তি-সূত্র। সে যাহাই হউক, রাজপুত-নাম অনতিবিলম্বে সামন্ততন্ত্রের অন্তর্ভূত জাইগিরদারের প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়ায়। নয় শত বৎসর হইতে, সকল জাতিরাই রাজপুত ছিল:—যথা, হিন্দু, সীথীয়, তুর্ক, তর্কম্যান আফগান, দ্রাবিড়ীয়। ডাক্তার Trumppএর মতে, রাজপুত আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন। কিন্তু অনেক জাতিতত্ত্ববিৎ, সীথীয়দিগকেও আর্য্য বলিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, রাজপুতদিগের মধ্যে, শুকচঞ্চু নাসা বিরল নহে; উহাদের গঠন-ছাঁচ, আফগান গঠন-ছাঁচকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আফগানেরা আর্য্য হইলেও, উহাদের উৎপত্তি সেমিটিক জাতি হইতে, এইরূপ সাধারণ মত। Macudiর মতে রাজপুতদের প্রকৃত দেশ—কান্দাহার। (Barlierde Meynard, I. p. 372) কিন্তু রাজপুত-দিগের রাজ্যগুলি ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

আক্রমণকারিগণ মসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, ভারতবাসী-দিগের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে। কি তুর্ক কি আফ্গান—যেসকল জনসঙ্ঘ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা মুসলমানধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আরব ও পারস্য-সভ্যতা গ্রহণ করে। এই যুগে, বাবর মোগোল-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, এবং কুব্লাই খাঁর চীনদেশীয় কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে, কতকগুলি নূতন প্রতিষ্ঠানও প্রবর্ত্তিত করেন।

যদি এ কথা সত্য হয় যে,—সকল দেশেই যুদ্ধবিগ্রহ ও বিজয়াভিযান সভ্যতার উন্নতিকল্পে আনুকূল্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের সম্বন্ধে এ কথা আরও বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ভারত কেবল পরাজয়ের দ্বারাই বহির্জগতের সংস্রবে আইসে এবং বৈদেশিকদিগের রীতিনীতি ও শিল্পকলার সহিত পরিচিত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অসময়ে

ক্ষুদ্র শিশু হর্ষে যবে ছুটি'
আঁচল ধরি' বাড়া'ল হাত দুটি,
মলিন ছেলে, অঙ্গে তাহার ধূলি,
আমি তারে লইনি' বুকে তুলি'।

চেয়ে তাহার সজল আঁখির পানে,
মুখখানি তার বাজল বড়ই প্রাণে,—
মলিন সে যে, অঙ্গে তাহার ধূলি—
তবু তারে লইনি' বুকে তুলি'।

বৃথাই আজি সারা সকাল সাঁঝে,
খুঁজে তা'রে বেড়াই ধূলার মাঝে;
ক্ষুদ্র শিশু আজকে ভুবন-যোড়া,
বাহুর পাশে দেয়না সে তো ধরা!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

এতা বা জাপানী পারিআ*

আবহমান কাল হইতে জাপানে সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এক শ্রেণীর লোক ছিল; ইহাদিগকে 'এতা' বলা হইত। সাধারণ জাপানী ইহাদিগকে একান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত, সমাজ ইহাদিগকে নির্ম্মমভাবে দূরীভূত করিয়াছিল। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সাধারণ ব্যবসায় অবলম্বন করা ইহাদের পক্ষে আইনত নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণ জাপানী ও 'এতা'র মধ্যে ব্যবধান এত বিস্তৃত ছিল যে তাহাদের নিকট হইতে কেহ কর্জ্জ লইতে পারিত না, বা তাহাদিগকে চুরট ধরাইবার আগুনটুকুও দিত না। সমাজ হইতে বিতাড়িত তাহাদের দুঃসহ জীবন য়ুরোপের মধ্যযুগের ইহুদীদের অপেক্ষাও শোচনীয় ছিল। বর্ত্তমান মিকাদোর করুণাময় শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন পর্য্যন্ত এতাদের অযোগ্যতা দূরীকৃত ও তাহাদিগকে উন্নত হইবার সুযোগ প্রদত্ত হয় নাই। ১৮৭১ সালে এতাদের মুক্তিদান করা হইল। তাহাদের প্রতি সামাজিক নিষেধাজ্ঞাগুলি রহিত করা হইল, ও সাধারণ জাপানীর সহিত তাহাদিগকে সমান অধিকার দেওয়া হইল। 'এতা' এই নামটি ক্রমশ অব্যবহার্য্য হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু জাপানীর চিত্তে 'এতা'বংশজাত লোকমাত্রেরই প্রতি একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা এখনও বিদ্যমান; কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই নীচবংশজাত লোকেরা তাহাদিগের নূতন অধিকার লাভ করিবার যে অনুপযুক্ত নয় তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে, এবং সাধারণ জাপানী কর্ত্তৃক আশাতীত হৃদ্যতার সহিত গৃহীত হইয়াছে।

এই স্বতন্ত্র শ্রেণীর উৎপত্তি সমাজ-বিজ্ঞানেতিহাসের একটা বিশেষ চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন। খুব সম্ভবত সর্ব্বপ্রথম 'এতা'গণ যুদ্ধের বন্দী ছিল, কারণ সে সময়ে বন্দীরূপে গৃহীত ব্যক্তিগণ দাসরূপে ব্যবহৃত হইত। সেই হেতু মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক কালের আক্রমণকারী য়্যামাতোগণ যুদ্ধে যেসব জাতিকে জয় করিয়াছিল হয়ত তাহারাই আদিম 'এতা'। হোক্কাইদোর আইনুগণ এই আদিম অধিবাসীদিগের অবশেষ; প্রধান দ্বীপটিতে ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের কিছু প্রতিপত্তি ছিল। আধুনিক জাপানীর

* মাদ্রাজ প্রদেশের অস্পৃশ্য জাতিদিগকে পারিআ বলে।

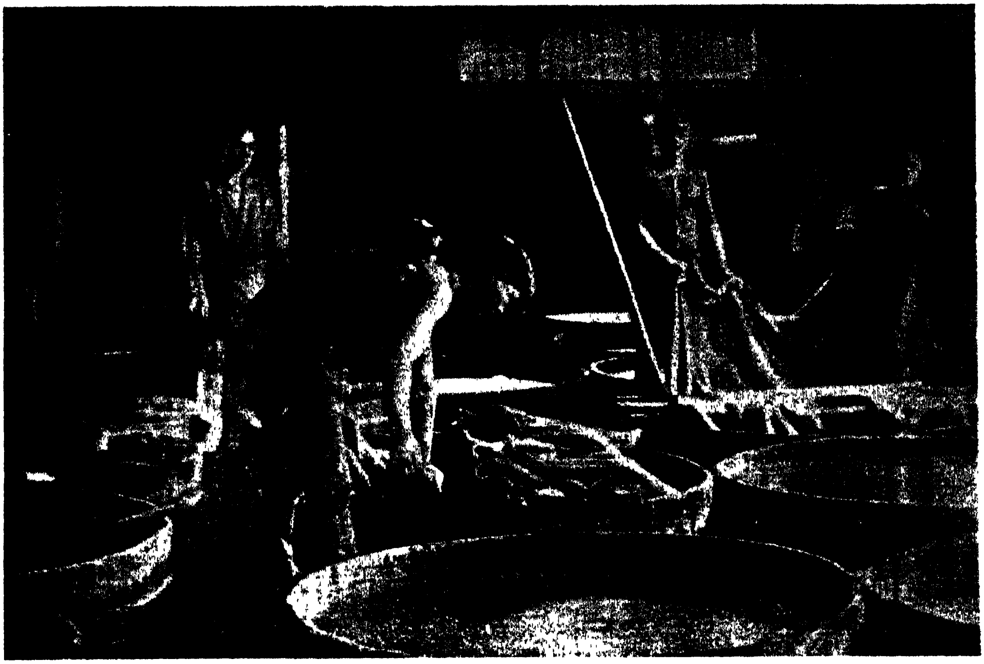


একটি এতা গ্রাম।

পিতৃপুরুষদের সহিত অবিরাম সংগ্রামের ফলে আদিম অধিবাসিগণ উত্তরদিকে বিতাড়িত হইয়াছিল; কেবল যাহারা বিজেতাদের হস্তগত হইল তাহারাই 'এতা' নামে অভিহিত হইয়াছিল। স্বনামধন্যা সম্রাজ্ঞী জিঙ্গোর রাজত্বকালে কোরিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী অভিযানের ফলে সেখান হইতে বহু বন্দী জাপানে আনীত হইয়াছিল, পরে হিদেওষির অভিযানের ফলে বন্দীসংখ্যা আরো বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পর এই হতভাগ্য বন্দিগণ ও তাহাদের সন্তানসন্ততির প্রতি নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা আরো কঠোর রূপ ধারণ করিয়াছিল, কারণ বৌদ্ধধর্ম্মে জীবহিংসা নিষিদ্ধ এবং তখনকার জাপানী সভ্যতার ব্যবস্থা অনুসারে 'এতা'রাই কশাইয়ের কার্য্য করিত। ইতিপূর্ব্বে জাপানীরা মাংসাহারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিল কিন্তু নবপ্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে এ রীতি উল্টাইয়া গেল, ও জীবহিংসাপরায়ণ 'এতা' পূর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত হইতে লাগিল। জাপানীদের মধ্যে মৃতদেহ ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যের প্রতি যে একটা ঘৃণা ছিল—মৃতদেহের স্পর্শ অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত ও যে বাটীতে মৃত্যু হইত সে বাটীখানি সাধারণত নষ্ট করিয়া ফেলা হইত—তাহা এই নবধর্ম্মের জীবহিংসা-নিষেধমূলক শিক্ষার প্রভাব সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

জাপানী সভ্যতার অন্যান্য কতকগুলি রীতি 'এতা'-দিগকে সমাজ-গণ্ডির বাহিরে বহু দূরে বিতাড়িত করিয়াছিল। অপরাধীদিগকে 'এতা'দের মধ্যে নির্ব্বাসিত করা একটি বিধি ছিল। সমাজের অকর্ম্মণ্য লোকগুলাও প্রায়ই ইহাদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত; কারণ দুরবস্থায় পড়িয়া যাহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইত তাহারা সমাজ-ঘৃণিত এইসব লোকেদের মধ্যে স্বচ্ছন্দ বোধ করিত। 'এতা'-কুমারীকে যে হৃদয় দান করিয়াছে এমন ব্যক্তিকে প্রেমের মধুর বন্ধনও নির্ব্বাসনের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিত না; সমাজচ্যুতা ললনার পাণিগ্রহণ করিয়া সে আর সমাজে মুখ দেখাইতে পারিত না। 'এতা'র পক্ষে সভ্যতার উচ্চধাপে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উঠান মাড়ানও নিষিদ্ধ ছিল।

'এতা'রা দেশের কেবল এক অংশে আবদ্ধ ছিল এমন নহে; শহরের নিকটে দেশের সর্ব্বত্রই তাহাদিগকে



এতাগণ চর্ম্ম পরিষ্কার করিতেছে।

দেখা যাইত। আমাদের মনে হইতে পারে যে-স্থানে তাহারা বিশেষরূপে ঘৃণিত হওয়াই সম্ভব এমন স্থান তাহাদের পরিত্যাগ করাই উচিত; কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেও সুবিধা ছিল না, কারণ তাহাদের যে ব্যবসায় তাহাতে নগরসান্নিধ্যে বাস করা একান্ত প্রয়োজন। পুরাতন তোকিওতে আসাকুসা ও ষিনাগাওয়া নামক স্থানে দুইটি 'এতা' গ্রাম ছিল। অধুনা এ দুটি স্থান সাম্রাজ্যের বিরাট্ রাজধানীর অন্তর্গত হইলেও, সমাজে যা কিছু হীন তাহার সহিত নাম দুটি কতক পরিমাণে জড়িত। কিওতোয় 'এতা'গণ বর্ত্তমান শহরের উত্তর প্রান্তে, কিওতো রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে তানাকা-মুরা নামক স্থানে বাস করিত। ওস্যাকায় সমাজচ্যুতেরা নিবিহামামাচি নামক স্থানে বাস করিত।

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য 'এতা'গণকে প্রাণীহনন, চর্ম্মপরিষ্কৃতকরণ ও কবরখনন করিবার একচেটিয়া অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চামড়ার চটিজুতা প্রস্তুত করিত। সাধারণ জাপানী মৃত পশুর চামড়া লইয়া কাজ করা ঘৃণ্য মনে করিত। পরে তোকুগাওয়া যুগে 'এতা'রা ডিটেক্‌টিভ্ ও জেলরক্ষীর কাজ করিত; প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মৃতদেহ বহন করিত। লোকে বলে আজকালও 'এতা'দের বংশধরেরাই এইরূপ কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাজি দেখাইয়া বেড়াইত; তাহাদের ভাগ্যহীনা স্ত্রীলোকেরা দ্বারে দ্বারে সামিসেন্ বাজাইয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিত। 'এতা' গ্রামের বাটীগুলি নিতান্ত আদিম ধরণের ছিল; খড়ের কুঁড়ে, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে, প্রত্যেক দিকে আট হাতের অধিক হইবে না; মাটির মেঝেগুলি মোটা খড় বা নল-খাগড়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত।

'এতা'রা সভ্য জাপানীর ভাষায় কথা কহিত, তাহাদের উচ্চারণও অন্যান্য জাপানীর মতই ছিল। কিন্তু জাপানীরা এ কথা স্বীকার করিত না, তাহারা বলিত 'এতা'দের কথা বিদেশী কর্ত্তৃক কথিত জাপানীর মত শুনায়।

সাধারণত 'এতা'রা বৌদ্ধধর্ম্মের 'যোদো' ও 'ষিন্‌যু' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ধর্ম্মে তাহাদের গভীর বিশ্বাস ছিল; সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া সান্ত্বনার জন্য তাহারা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক কুটীর-



এতাগণ চর্ম্ম পরিষ্কার করিতেছে

মধ্যেই সুসজ্জিত বেদীর উপর বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইত। উপরিউক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার কারণ এ সম্প্রদায় দুটী অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল, ও তাহাদের সহজবুদ্ধির উপযোগী ছিল। উপরন্তু বৌদ্ধেরা, এ জগতে তাহারা যে সান্ত্বনা ও সমাদর পায় নাই তাহা পরজগতে পাইবে, এরূপ আশ্বাস দিত।

আশ্চর্য্য এই যে এত বাধা সত্ত্বেও এই ঘৃণিত জাতির মধ্যে কতবার এমন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যাহাদের গুণাবলী সভ্য জাপানীরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কেহ কেহ স্বজাতীয় হতভাগ্যদের মধ্যেও সচ্ছল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তোকুগাওয়া যুগে প্রত্যেক 'এতা' গ্রামের একজন করিয়া প্রধান নির্ব্বাচিত হইত; সে দেশশাসকদিগের নিকট তাহার এলাকায় ঘটিত সমস্ত বিষয়ের জন্য দায়ী থাকিত। আসাকুসার 'এতা' গ্রামের দানজাএমোন্ নামক এক ব্যক্তি প্রধান ঐতিহাসিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আর একজন বিখ্যাত 'এতা' সর্দ্দারের নাম জেন্‌হিচি। কথিত আছে তাহার ধমনীতে সামুরাই-রক্ত প্রবাহিত ছিল; তাহার পিতা নাকি দাইম্যো সাতাকে য়োষিনোবুর সভাসদ্ ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ইয়েয়াসুর-সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার হস্তে বন্দী হন, ও পরে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হয়। পুত্র জেন্‌হিচি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইল; কিন্তু উদারহৃদয় ইয়েয়াসু তাহাকে ক্ষমা করিলেন। এই অসাধারণ উদারতায় সে এত কৃতজ্ঞ ও লজ্জিত হইল যে সে সংসার পরিত্যাগ করিয়া এতাদিগের মধ্যে বাস করিতে লাগিল। ইয়েয়াসু তাহাকে সে গ্রামের মোড়ল করিয়া দিলেন। সেও অনতিবিলম্বে দানজাএমোনের মত প্রসিদ্ধি লাভ করিল, ও এতাদের সম্মানের পাত্র হইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ স্বচ্ছন্দে কাটাইয়াছিল। কিন্তু তোকুগাওয়া যুগেই এতার বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর নিয়মাবলী প্রচলিত ছিল। এমন কি কেহ এতাকে গৃহে স্থান দান করিলে বা কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে তাহাকে পঞ্চাশ দিন কারাবাস করিতে হইত।

তাহাদের মুক্তির পর স্বভাবতই তাহাদের অবস্থায় এক বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত



এতা-পল্লীর পশুর খোঁয়াড়।

হইলে এই পতিত জাতির বংশধরগণ উচ্চশ্রেণীর জাপানী শিশুগণের সহিত পাঠের সময় ও ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে মিশিবার সুযোগ পাইল। শিক্ষার প্রভাবে কত 'এতা'-বংশধর আজ দেশের পার্ল্যামেণ্ট্ বা মহাসভার সভ্য। তাহাদিগকে সাধারণ জাপানী প্রজার সকল অধিকার যখন দেওয়া হইয়াছিল তখন তাহারা সংখ্যায় সর্ব্বসমেত ৪০০,০০০ ছিল; কিন্তু এখন পরস্পর বিবাহের দ্বারা তাহারা এমন মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে আজকাল কে 'এতা'-বংশজাত, কে নয় তাহা বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর জাপানী পরিবারেরা রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট। ইহারা এবং কৃষিপল্লীবাসীরা একদা-ঘৃণিত 'এতা' সম্বন্ধীয় কোনো কিছুর বিরুদ্ধে তাঁহাদের পূর্ব্ব-সংস্কার এখনো সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। কোবেতে কেহ কেহ বলিত যে কেবল 'এতা'-বংশীয়েরাই বিদেশীর ভৃত্য হয়; এই কারণে কোবের বিদেশী পরিবারে উচ্চ শ্রেণীর জাপানী ভৃত্যেরা অনেকে কার্য্য গ্রহণ করিত না। সে যাহাই হোক, সকল দিক দিয়া দেখিলে, জাপানী সমাজে আজকাল 'এতা'-বংশজাত ও অন্য জাপানীর মধ্যে কোনো ইতর-বিশেষ করা হয় না। ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে জাপ-জাতি সমাজের অতি পুরাতন এই ঘৃণ্য জাতিকে কিরূপ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"না ফুটিত আহা যদি!"

(১)

আছিল ফুলটি কুঁড়ি যতদিন,
মন ছিল মোর ভালো;—
সুখী ছিনু ভাবি'—ফুটিবে এখনি
উদ্যান করি' আলো।

(২)

আজ সে ফুটেছে ঢল ঢল রূপে;
আজ ভাবি নিরবধি—
কখন ঝরিবে—ভূমিতে লুটা'বে!—
না ফুটিত আহা যদি!

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

জীবনস্মৃতি

লোকেন পালিত।

বিলাতে যখন আমি য়ুনিভারসিটি কলেজে ইংরাজি-সাহিত্য-ক্লাসে, তখন সেখানে লোকেন পালিত ছিল আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। সে বয়সে আমার চেয়ে প্রায় বছর চারেকের ছোট। যে বয়সে জীবনস্মৃতি লিখিতেছি সে বয়সে চার বছরের তারতম্য চোখে পড়িবার মত নহে; কিন্তু সতেরোর সঙ্গে তেরোর প্রভেদ এত বেশি যে সেটা ডিঙাইয়া বন্ধুত্ব করা কঠিন। বয়সের গৌরব নাই বলিয়াই বয়স সম্বন্ধে বালক আপনার মর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু এই বালকটি সম্বন্ধে সে বাধা আমার মনে একেবারেই ছিল না। তাহার একমাত্র কারণ বুদ্ধিশক্তিতে আমি লোকেনকে কিছু মাত্র ছোট বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না।

য়ুনিভারসিটি কলেজের লাইব্রেরিতে ছাত্র ও ছাত্রীরা বসিয়া পড়াশুনা করে; আমাদের দুইজনের সেখানে গল্প করিবার আড্ডা ছিল। সে কাজটা চুপি চুপি সারিলে কাহারো আপত্তির কোনো কারণ থাকিত না—কিন্তু হাসির প্রভূত বাষ্পে আমার বন্ধুর তরুণ মন একেবারে সর্ব্বদা পরিস্ফীত হইয়া ছিল, সামান্য একটু নাড়া পাইলে তাহা সশব্দে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিত। সকল দেশেই ছাত্রীদের পাঠনিষ্ঠায় অস্বাভাবিক আতিশয্য দেখা যায়। আমাদের কত পাঠরত প্রতিবেশিনী ছাত্রীর নীল চক্ষুর নীরব ভর্ৎসনা-কটাক্ষ আমাদের সরব হাস্যালাপের উপর নিষ্ফলে বর্ষিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে আজ আমার মনে অনুতাপ উদয় হয়। কিন্তু তখনকার দিনে পাঠাভ্যাসের ব্যাঘাতপীড়া সম্বন্ধে আমার চিত্তে সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না। কোনো দিন আমার মাথা ধরে নাই এবং বিধাতার প্রসাদে কোনো দিন বিদ্যালয়ের পড়ার বিঘ্নে আমাকে একটু কষ্ট দেয় নাই।

এই লাইব্রেরি-মন্দিরে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন হাস্যালাপ চলিত বলিলে অত্যুক্তি হয়। সাহিত্য-আলোচনাও করিতাম। সে আলোচনায় বালক বন্ধুকে অর্ব্বাচীন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। যদিও বাংলা বই সে আমার চেয়ে অনেক কম পড়িয়াছিল, কিন্তু চিন্তাশক্তিতে সেই কমিটুকু সে অনায়াসেই পোষাইয়া লইতে পারিত।

আমাদের অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল। তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্ম্মজ্ঞান আছে—পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম ইংরেজি বানানরীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর হইতে পারিত যদি তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা দিতে না হইত। কিন্তু আমার গর্ব্ব টিঁকিল না। দেখিলাম বাংলা বানানও বাঁধন মানে না; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়মব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে সাহায্য করিত তাহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইত।

তাহার পর কয়েক বৎসর পরে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া লোকেন যখন ভারতবর্ষে ফিরিল তখন, সেই কলেজের লাইব্রেরিঘরে হাস্যোচ্ছ্বাসতরঙ্গিত যে আলোচনা সুরু হইয়াছিল তাহাই ক্রমশ প্রশস্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মত অগ্রসর করিয়াছে। আমার পূর্ণ যৌবনের দিনে সাধনার সম্পাদক হইয়া অবিশ্রাম গতিতে যখন গদ্য পদ্যর জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছি তখন লোকেনের অজস্র উৎসাহ আমার উদ্যমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দেয় নাই। তখনকার কত পঞ্চভূতের ডায়ারি এবং কত কবিতা মফস্বলে তাহারই বাংলাঘরে বসিয়া লেখা। আমাদের কাব্যালোচনা ও সঙ্গীতের সভা কতদিন সন্ধ্যাতারার আমলে সুরু হইয়া শুকতারার আমলে ভোরের হাওয়ার মধ্যে রাত্রের দীপশিখার সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইয়াছে। সরস্বতীর পদ্মবনে বন্ধুত্বের পদ্মটির পরেই দেবীর বিলাস বুঝি সকলের চেয়ে বেশি। এই বনে স্বর্ণরেণুর

পরিচয় বড় বেশি পাওয়া যায় নাই কিন্তু প্রণয়ের সুগন্ধি মধু সম্বন্ধে নালিশ করিবার কারণ আমার ঘটে নাই।

ভগ্নহৃদয়।

বিলাতে থাকিতে আরএকটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে জাহাজে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। "ভগ্নহৃদয়" নামে ইহা ছাপান হইয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল লেখাটা খুব ভাল হইয়াছে। লেখকের পক্ষে এরূপ মনে হওয়া অসামান্য নহে। কিন্তু তখনকার পাঠকদের কাছেও এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই। মনে আছে এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের মন্ত্রী আমাব সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভাল লাগিয়াছে, এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমার এই আঠারো বছর বয়সের কবিতা সম্বন্ধে আমার ত্রিশ বছর বয়সের একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম এইখানে উদ্ধৃত করি :—"ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটুএকটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটাখানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মত কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী হয়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়—আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মত। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না কেবল নিজের মনটাই ছিল;—তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত।"

আমার পনেরো ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ তেইশ বছর পর্য্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে যুগে পৃথিবীতে জল-স্থলের বিভাগ ভাল করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপরে বৃহদায়তন অদ্ভুতাকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদ্‌হীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। আমার অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণ-বহির্ভূত অদ্ভুতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানেনা, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানেনা। তাহারা নিজেকে কিছুই জানেনা বলিয়া পদে পদে আরএকটাকিছুকে নকল করিতে থাকে। অসত্য, সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে। জীবনের সেই একটা অকৃতার্থ অবস্থায় যখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলা বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে, যখন সত্য তাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই, তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

শিশুদের দাঁত যখন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন সেই অনুদ্‌গত দাঁতগুলি শরীরের মধ্যে জ্বরের দাহ আনয়ন করে। সেই উত্তেজনার সার্থকতা ততক্ষণ কিছুই নাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁতগুলা বাহির হইয়া বাহিরের খাদ্যপদার্থকে অন্তরস্থ করিবার সহায়তা না করে। মনের আবেগগুলারও সেই দশা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরের সঙ্গে তাহারা আপন সত্যসম্বন্ধ স্থাপন না করে ততক্ষণ তাহারা ব্যাধির মত মনকে পীড়া দেয়।

তখনকার অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষাটা লাভ করিয়াছি সেটা সকল নীতিশাস্ত্রেই লেখে—কিন্তু তাই বলিয়াই সেটা অবজ্ঞার যোগ্য নহে। আমাদের প্রবৃত্তিগুলাকে যাহা-কিছুই নিজের মধ্যে ঠেলিয়া রাখে, সম্পূর্ণ বাহির হইতে দেয় না, তাহাই জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। স্বার্থ আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে শেষ পরিণাম পর্য্যন্ত যাইতে দেয় না—তাহাকে পুরাপুরি ছাড়িয়া দিতে চায় না—এইজন্য সকলপ্রকার আঘাত আতিশয্য অসত্য স্বার্থ-সাধনের সাথের সাথী। মঙ্গলকর্ম্মে যখন তাহারা একেবারে মুক্তিলাভ করে তখনি তাহাদের বিকার

ঘুচিয়া যায়—তখনি তাহারা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। আমাদের প্রবৃত্তির সত্য পরিণাম সেইখানে—আনন্দেরও পথ সেই দিকে।

নিজের মনের এই যে অপরিণতির কথা বলিলাম ইহার সঙ্গে তখনকার কালের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত যোগ দিয়াছিল। সেই কালটার বেগ এখনই যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না। যে সময়টার কথা বলিতেছি তখনকার দিকে তাকাইলে মনে পড়ে ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা যে পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে পরিমাণে খাদ্য পাই নাই। তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্‌স্‌পিয়র, মিল্টন ও বায়রন। ইঁহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিষটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে তাহার একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই দুর্দ্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষ্যানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।

আমাদের সমাজ, আমাদের ছোট ছোট কর্ম্মক্ষেত্র এমন সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না,—সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপ চাপ; এই জন্যই ইংরাজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্যকলার সৌন্দর্য্য আমাদিগকে যে সুখ দেয়, ইহা সে সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ। তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার।

য়ুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়া স্বরূপে রেনেসাঁশের যুগ আসিয়াছিল শেক্‌স্‌পিয়রের সমসাময়িক কালের নাট্যসাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা। এ সাহিত্যে ভালমন্দ সুন্দর-অসুন্দরের বিচারই মুখ্য ছিল না—মানুষ আপনার হৃদয়-প্রকৃতিকে তাহার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধা মুক্ত করিয়া দিয়া তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। এইজন্যই এই সাহিত্যে, প্রকাশের অত্যন্ত তীব্রতা প্রাচুর্য্য ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলি খেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলি আচারের ঢাকার মধ্যে চাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণ পরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধলীলার দীপক রাগিণীতে আমাদের চমক লাগিয়া গিয়াছিল।

ইংরেজি সাহিত্যে আর একদিন যখন পোপের কালের টিমাতেতালা বন্ধ হইয়া ফরাসিবিপ্লবনৃত্যের ঝাঁপতালের পালা আরম্ভ হইল বায়রন সেই সময়কার কবি। তাঁহার কাব্যেও সেই হৃদয়াবেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভাল মানুষ সমাজের ঘোমটাপরা হৃদয়টিকে, এই কনে বউকে উতলা করিয়া তুলিয়াছিল।

তাই, ইংরেজি সাহিত্যালোচনার সেই চঞ্চলতাটা আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই চঞ্চলতার ঢেউটাই বাল্যকালে আমাদিগকে চারিদিক হইতে আঘাত করিয়াছে। সেই প্রথম জাগরণের দিন সংযমের দিন নহে, তাহা উত্তেজনারই দিন।

অথচ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার খুব একটা প্রভেদ ছিল। য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়ম-বন্ধনের বিরুদ্ধবিদ্রোহ সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার অন্তরে বাহিরে একটা মিল ছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই

ঝড়ের গর্জ্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্য সুরটি মর্ম্মর ধ্বনির উপরে চড়িতে চায় না - কিন্তু সেটুকুতে ত আমাদের মন তৃপ্তি মানিতেছিল না, এই জন্যই আমরা ঝড়ের ডাকের নকল করিতে গিয়া নিজের প্রতি জবরদস্তি করিয়া অতিশয়োক্তির দিকে যাইতেছিলাম। এখনো সেই ঝোঁকটা কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সহজে কাটিবে না। তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজি সাহিত্যে সাহিত্যকলার সংযম এখনো আসে নাই; এখনো সেখানে বেশি করিয়া বলা ও তীব্র করিয়া প্রকাশ করার প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্রই। হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণ মাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে, সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য্য, সুতরাং সংযম ও সরলতা, এ কথাটা এখনও ইংরেজি-সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই।

আমাদের মন শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কেবল মাত্র এই ইংরেজি সাহিত্যেই গড়িয়া উঠিতেছে। য়ুরোপের যেসকল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে সাহিত্যকলার মর্য্যাদা সংযমের সাধনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সে সাহিত্যগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ নহে, এইজন্যই সাহিত্য-রচনার রীতি ও লক্ষ্যটি এখনো আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তখনকার কালের ইংরেজিসাহিত্যশিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে যিনি আমাদের কাছে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি হৃদয়েরই উপাসক ছিলেন। সত্যকে যে সমগ্র ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা নহে, তাহাকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিলেই যেন তাহার সার্থকতা হইল এইরূপ তাঁহার মনের ভাব ছিল। জ্ঞানের দিক দিয়া ধর্ম্মে তাঁহার কোনো আস্থাই ছিল না, অথচ শ্যামাবিষয়ক গান করিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। এ স্থলে কোনো সত্য বস্তু তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল না, যে-কোনো কল্পনায় হৃদয়াবেগকে উত্তেজিত করিতে পারে তাহাকেই তিনি সত্যের মত ব্যবহার করিতে চাহিতেন। সত্য উপলব্ধির প্রয়োজন অপেক্ষা হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন প্রবল হওয়াতেই যাহাতে সেই প্রয়োজন মেটে তাহা স্থূল হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা ছিল না।

তখনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেন্থাম, মিল ও কোঁতের আধিপত্য। তাঁহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকেরা তখন তর্ক করিতেছিলেন। য়ুরোপে এই মিলের যুগ ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক পর্য্যায়। মানুষের চিত্তের আবর্জ্জনা দূর করিয়া দিবার জন্য স্বভাবের চেষ্টারূপেই এই ভাঙিবার ও সরাইবার প্রলয়শক্তি কিছু দিনের জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা আমাদের পড়িয়া পাওয়া জিনিষ। ইহাকে আমরা সত্যরূপে খাটাইবার জন্য ব্যবহার করি নাই। ইহাকে আমরা শুদ্ধমাত্র একটা মানসিক বিদ্রোহের উত্তেজনারূপেই ব্যবহার করিয়াছি। নাস্তিকতা আমাদের একটা নেশা ছিল। এইজন্য তখন আমরা দুই দল মানুষ দেখিয়াছি। একদল ঈশ্বরের অস্তিত্ববিশ্বাসকে যুক্তি অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদাই গায়ে পড়িয়া তর্ক করিতেন। পাখী শিকারে শিকারীর যেমন আমোদ, গাছের উপরে বা তলায় একটা সজীব প্রাণী দেখিলেই তখনই তাহাকে নিকাশ করিয়া ফেলিবার জন্য শিকারীর হাত যেমন নিশ্‌পিশ্‌ করিতে থাকে, তেমনি যেখানে তাঁহারা দেখিতেন কোনো নিরীহ বিশ্বাস কোথাও কোনো বিপদের আশঙ্কা না করিয়া আরামে বসিয়া আছে তখনি তাহাকে পাড়িয়া ফেলিবার জন্য তাঁহাদের উত্তেজনা জন্মিত। অল্পকালের জন্য আমাদের একজন মাষ্টার ছিলেন, তাঁহার এই আমোদ ছিল। আমি তখন নিতান্ত বালক ছিলাম, কিন্তু আমাকেও তিনি ছাড়িতেন না। অথচ তাঁহার বিদ্যা সামান্যই ছিল—তিনি যে সত্যানুসন্ধানের উৎসাহে সকল মতামত আলোচনা করিয়া একটা পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও নহে; তিনি আরএকজন ব্যক্তির মুখ হইতে তর্কগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি প্রাণপণে তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিতাম, কিন্তু আমি তাঁহার নিতান্ত অসমকক্ষ প্রতিপক্ষ ছিলাম বলিয়া আমাকে প্রায়ই বড় দুঃখ পাইতে হইত। একএকদিন এত রাগ হইত যে কাঁদিতে ইচ্ছা করিত।

আর একদল ছিলেন তাঁহারা ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিতেন না, সম্ভোগ করিতেন। এইজন্য ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যত কলাকৌশল, যতপ্রকার শব্দগন্ধরূপরসের আয়োজন

আছে, তাহাকে ভোগীর মত আশ্রয় করিয়া তাঁহারা আবিষ্ট হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন; ভক্তিই তাঁহাদের বিলাস। এই উভয়দলেই সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা সত্য-সন্ধানের তপস্যাজাত ছিল না, তাহা প্রধানত আবেগের উত্তেজনা ছিল।

যদিও এই ধর্ম্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত তথাপি ইহা আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে ধর্ম্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া করিয়া মস্ত একটা আগুন জ্বালাইতেছিলাম। সে কেবলি অগ্নিপূজা; সে কেবলি আহুতি দিয়া শিখাকেই বাড়াইয়া তোলা; তাহার আর কোন লক্ষ্য ছিল না। ইহার কোনো লক্ষ্য নাই বলিয়াই ইহার কোনো পরিমাণ নাই; ইহাকে যত বাড়ানো যায় তত বাড়ানোই চলে।

যেমন ধর্ম্মসম্বন্ধে তেমনি নিজের হৃদয়াবেগ সম্বন্ধেও কোনো সত্য থাকিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, উত্তেজনা থাকিলেই যথেষ্ট। তখনকার কবির একটি শ্লোক মনে পড়ে:—

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়
বেচিনি ত তাহা কাহারো কাছে,
ভাঙাচোরা হোক্, যা হোক্ তা'হোক্
আমার হৃদয় আমারি আছে।

সত্যের দিক দিয়া হৃদয়ের কোনো বালাই নাই, তাহার পক্ষে ভাঙিয়া যাওয়া বা অন্য কোনো প্রকার দুর্ঘটনা নিতান্তই বাহুল্য, কিন্তু যেন তাহা ভাঙিয়াছে এমন একটা ভাবাবেশ মনের নেশার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক;—দুঃখবৈরাগ্যের সত্যটা স্পৃহনীয় নয়, কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহার ঝাঁঝটুকু উপভোগের সামগ্রী,—এইজন্য কাব্যে সেই জিনিষটার কারবার জমিয়া উঠিয়াছিল—ইহাই দেবতাকে বাদ দিয়া দেবোপাসনার রসটুকু ছাঁকিয়া লওয়া। আজও আমাদের দেশে এ বালাই ঘুচে নাই। সেইজন্যই আজও আমরা ধর্ম্মকে যেখানে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি সেখানে ভাবুকতা দিয়া আর্টের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহার সমর্থন করি। সেইজন্যই বহুল পরিমাণে আমাদের দেশহিতৈষিতা দেশের যথার্থ সেবা নহে, কিন্তু দেশ সম্বন্ধে হৃদয়ের মধ্যে একটা ভাব অনুভব করার আয়োজন করা।

সন্ধ্যাসঙ্গীত।

নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ যে অবস্থার কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, মোহিত বাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত আমার গ্রন্থাবলীতে সেই অবস্থার কবিতাগুলি "হৃদয়-অরণ্য" নামের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রভাতসঙ্গীতে "পুনর্মিলন" নামক কবিতায় আছে—

"হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।
সে বন আঁধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।"

"হৃদয়-অরণ্য" নাম এই কবিতা হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

এইরূপে, বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে—কেবল "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এ প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

এক সময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন—তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জ্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।

এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানিনা কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যেসব কবিতা ভাল বাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যেসব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি, তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা আপনি

সেইসকল কল্পিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল।

একটা স্লেট লইয়া কবিতা লিখিতাম। সেটাও বোধ হয় একটা মুক্তির লক্ষণ। তাহার আগে কোমর বাঁধিয়া যখন খাতায় কবিতা লিখিতাম তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই রীতি-মত কাব্য লিখিবার একটা পণ ছিল, কবিযশের পাকা সেহায় সেগুলি জমা হইতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া মনে মনে হিসাব মিলাইবার একটা চিন্তা ছিল। কিন্তু স্লেটে যাহা লিখিতাম তাহা লিখিবার খেয়ালেই লেখা। স্লেট জিনিষটা বলে, ভয় কি তোমার, যাহা খুসি তাহাই লেখনা, হাত বুলাইলেই ত মুছিয়া যাইবে।

কিন্তু এমনি করিয়া ছুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।

ইহাকে কেহ যেন গর্ব্বোচ্ছ্বাস বলিয়া মনে না করেন। পূর্ব্বের অনেক রচনায় বরঞ্চ গর্ব্ব ছিল - কারণ, গর্ব্বই সেসব লেখার শেষ বেতন। নিজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হঠাৎ নিঃসংশয়তা অনুভব করিবার যে পরিতৃপ্তি তাহাকে অহঙ্কার বলিব না। ছেলের প্রতি মা-বাপের প্রথম যে আনন্দ, সে, ছেলে সুন্দর বলিয়া নহে, ছেলে যথার্থ আমারই বলিয়া। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহারা গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন কিন্তু সে আরএকটা জিনিষ। এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দো-বন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটা খালের মত সীধা চলেনা—আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম কিন্তু এখন লেশমাত্র সঙ্কোচ বোধ হইল না। স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় নিয়মকে ভাঙে, তাহার পরে নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে—তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।

আমার সেই উচ্ছৃঙ্খল কবিতা শোনাইবার একজন মাত্র লোক তখন ছিলেন, অক্ষয় বাবু। তিনি হঠাৎ আমার এই লেখাগুলি দেখিয়া ভারি খুসি হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কাছ হইতে অনুমোদন পাইয়া আমার পথ আরো প্রশস্ত হইয়া গেল।

বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক—যেমন

একদিন দেব তরুণ তপন
　　হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
　　খেলা করে নীল নলিনী-দলে।

তিনমাত্রা জিনিষটা ছুইমাত্রার মত চৌকা নহে, তাহা গোলার মত গোল, এই জন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়, তাহার এই বেগবান গতির নৃত্য যেন ঘন ঘন ঝঙ্কারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন ছুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিকেলে ধাবমান হওয়ার মত। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসঙ্গীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। মনে কোন ভয়ডর যেন ছিল না। লিখিয়া গিয়াছি, কাহারো কাছে কোনো জবাবদিহির কথা ভাবি নাই। কোনোপ্রকার পূর্ব্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে জোর পাই-লাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়া ছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিষকে পাই নাই। হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম আমার হাতে শৃঙ্খল পরানো নাই। সেইজন্যই হাতটাকে যেমন খুসি ব্যবহার করিতে পারি এই আনন্দটাকে প্রকাশ করিবার জন্যই হাতটাকে যথেচ্ছ ছুঁড়িয়াছি।

আমার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্যহিসাবে সন্ধ্যাসঙ্গীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতা-গুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব মূর্ত্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই

যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুসি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুসিটার মূল্য আছে।

গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ।

ব্যারিষ্টার হইব বলিয়া বিলাতে আয়োজন সুরু করিয়াছিলাম এমন সময়ে পিতা আমাকে দেশে ডাকিয়া আনাইলেন। আমার কৃতিত্বলাভের এই সুযোগ ভাঙিয়া যাওয়াতে বন্ধুগণ কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া আমাকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধের জোরে আবার একবার বিলাতে যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম। সঙ্গে আরো একজন আত্মীয় ছিলেন। ব্যারিষ্টার হইয়া আসাটা আমার ভাগ্য এমনি সম্পূর্ণ নামঞ্জুর করিয়া দিলেন যে বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিতেও হইল না—বিশেষ কারণে মান্দ্রাজের ঘাটে নামিয়া পড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। ঘটনাটা যত বড় গুরুতর, কারণটা তদনুরূপ কিছুই নহে; শুনিলে লোকে হাসিবে এবং সে হাস্যটা ষোল আনা আমারই প্রাপ্য নহে; এই জন্যই সেটাকে বিবৃত করিয়া বলিলাম না। যাহা হউক লক্ষ্মীর প্রসাদ-লাভের জন্য দুইবার যাত্রা করিয়া দুইবারই তাড়া খাইয়া আসিয়াছি। আশা করি, বার-লাইব্রেরির ভূ-ভারবৃদ্ধি না করাতে আইন-দেবতা আমাকে সদয়চক্ষে দেখিবেন।

পিতা তখন মসুরি পাহাড়ে ছিলেন। বড় ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, বরং মনে হইল তিনি খুসি হইয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি মনে করিয়াছিলেন ফিরিয়া আসাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে এবং এই মঙ্গল ঈশ্বর-আশীর্ব্বাদেই ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্ব্বদিন সায়াহ্নে বেথুন-সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকাল কলেজ হলে আমি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া। সভাপতি ছিলেন বৃদ্ধ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল সঙ্গীত। যন্ত্র-সঙ্গীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার প্রবন্ধে লিখিত অংশ অল্পই ছিল। আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় প্রায় আগাগোড়াই নানাপ্রকার সুর দিয়া নানা-ভাবের গান গাহিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় "বন্দে বাল্মীকি-কোকিলং" বলিয়া আমার প্রতি যে প্রচুর সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমি তাহার প্রধান কারণ এই বুঝি যে, আমার বয়স তখন অল্প ছিল এবং বালককণ্ঠে নানা বিচিত্র গান শুনিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু যে মতটিকে তখন এত স্পর্দ্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়া-ছিলাম সে মতটি যে সত্য নয় সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্য্যেই বড়—বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে! বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্ব্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভাল। হিন্দুস্থানী গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সঙ্গীতের উৎকর্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য এদেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্য্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্য্য বিকাশের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে, এদেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্ত্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে

ছাড়াইয়া যায়। গান রচনা করিবার সময় এইটে বার বার অনুভব করা গিয়াছে। গুন গুন করিতে করিতে যখনি একটা লাইন লিখিলাম—"তোমার গোপন কথাটি সখি রেখোনা মনে"—তখনি দেখিলাম সুর যে জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমারাত্রির নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে—তাহা যেন সমস্ত জলস্থলআকাশের নিগূঢ় গোপন কথা। বহু বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম "তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে!" সেই গানের ঐ একটিমাত্র পদ মনে এমন একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে আজও ঐ লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ঐ গানের ঐ পদটার মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। স্বরগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম—"আমি চিনিগো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী"—সঙ্গে যদি সুরটুকু না থাকিত তবে এ গানের কি ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্ত্তি মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে কোন্ রহস্য-সিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি—তাহাকেই শারদপ্রাতে, মাধবী রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই—হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী!

ইহার অনেক দিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল—

"খাঁচার মাঝে অচিন্ পাখী কম্‌নে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখীর পায়।"

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন্ পাখী বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়—মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই অচিন্ পাখীর নিঃশব্দ যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে!

এই কারণে চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সঙ্কোচ বোধ করি। কেননা গানের বহিতে আসল জিনিষটিই বাদ পড়িয়া যায়। সঙ্গীত বাদ দিয়া সঙ্গীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয় যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাঁহার মূষিকটাকে ধরিয়া রাখা।

গঙ্গাতীর।

বিলাতযাত্রার আরম্ভ পথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন—আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্ব্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্নপরিবেষণ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতই অত্যাবশ্যক ছিল। সে ত খুব বেশি দিনের কথা নহে—তবু ইতিমধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের তরুচ্ছায়া-প্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নিভৃত নীড়গুলির মধ্যে কলকারখানা, উর্দ্ধফণা সাপের মত প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিঃশ্বাস ফুঁসিতেছে। এখন খরমধ্যাহ্নে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলাদেশের প্রশস্ত স্নিগ্ধছায়া সঙ্কীর্ণতম হইয়া আসিয়াছে। এখন দেশের সর্ব্বত্রই অনবসর আপন সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হয় ত সে

ভালই—কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভালো এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না।

আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গকরা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মত একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির "ভরাবাদর মাহভাদর" পদটিতে মনের মত সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন ক্ষ্যাপার মত কাটাইয়া দিতাম; কখনো বা সূর্য্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ব্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

আমরা যে বাগানে ছিলাম তাহা মোরান্ সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপানগুলি পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ বারান্দায় গিয়া পৌঁছিত। সেই বারান্দাটাই বাড়ির বারান্দা। ঘরগুলি সমতল নহে—কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে দুই চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে। ঘাটের উপরেই বৈঠকখানা ঘরের সাসিগুলিতে রঙীন ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা—সেই দোলায় রৌদ্রছায়াখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে; আর একটি ছবি ছিল, কোনো দুর্গপ্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসববেশে সজ্জিত নরনারী কেহ বা উঠিতেছে কেহ বা নামিতেছে। সাসির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড় উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন্ দূর দেশের কোন দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্‌মল্ করিয়া মেলিয়া দিত—এবং কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভৃতছায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত। বাড়ির সর্ব্বোচ্চতলে চারিদিক খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমার কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘন গাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসঙ্গীতের পালা চলিতেছে—এই ঘরের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলাম—

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার—
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।

এখন হইতে কাব্য সমালোচকদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এই একটা রব উঠিতেছিল যে, আমি ভাঙাভাঙা ছন্দ ও আধআধ ভাষার কবি। সমস্তই তখনকার ধোঁয়া-ধোঁয়া ছায়া-ছায়া। কথাটা তখন আমার পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক্ না কেন, তাহা অমূলক নহে। বস্তুতই সেই কবিতাগুলির মধ্যে বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্ব কিছুই ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংস্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গণ্ডি-বদ্ধ হইয়া মানুষ হইয়াছিলাম তাহাতে লিখিবার সম্বল পাইব কোথায়? কিন্তু একটা কথা আমি মানিতে পারি না। তাঁহারা আমার কবিতাকে যখন ঝাপ্‌সা বলিতেন তখন সেই সঙ্গে এই খোঁচাটুকুও ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবে যোগ করিয়া দিতেন—ওটা যেন একটা ফ্যাশান্। যাহার নিজের দৃষ্টি খুব ভাল সে ব্যক্তি কোনো যুবককে চশমা পরিতে দেখিলে অনেক সময়ে রাগ করে এবং মনে করে ও বুঝি চশমাটাকে অলঙ্কার রূপে ব্যবহার করিতেছে। বেচারা চোখে কম দেখে এ অপবাদটা স্বীকার করা যাইতে পারে কিন্তু কম দেখার ভান করে এটা কিছু বেশি হইয়া পড়ে।

যেমন নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না কারণ তাহা সৃষ্টির একটা বিশেষ অবস্থার সত্য—তেমনি কাব্যের

অস্ফুটতাকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্যসাহিত্যের একটা সত্যেরই অপলাপ করা হয়। মানুষের মধ্যে অবস্থা-বিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। মনুষ্যপ্রকৃতিতে তাহা সত্য সুতরাং তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কি করিয়া! এরূপ কবিতার মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কি না মূল্য নাই বলিয়া তর্ক করা চলিতে পারে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না? কেননা কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার কোনো পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়—ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। অতএব হৃদয়ের অব্যক্ত আকূতিকে ব্যক্ত করায় পাপ নাই—যত অপরাধ ব্যক্ত না করিতে পারার দিকে। মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভাল করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে ত লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানস-প্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না—ইহার বর্ণনা নাই—এইজন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে—তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যাসঙ্গীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনো মতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনো মতে জাগিয়া উঠিতে চায়—ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে—অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে। সকল সৃষ্টিতেই যেমন দুই শক্তির লীলা, কাব্য-সৃষ্টির মধ্যেও তেমনি। যেখানে অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক, অথবা সামঞ্জস্য যেখানে সম্পূর্ণ, সেখানে কাব্যলেখা বোধ হয় চলে না। যেখানে অসামঞ্জস্যের বেদনাই প্রবল ভাবে সামঞ্জস্যকে পাইতে ও প্রকাশ করিতে চাহিতেছে সেইখানেই কবিতা বাঁশির অবরোধের ভিতর হইতে নিঃশ্বাসের মত রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই তাহা নহে। আমার অন্য কোনো প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি—রমেশদত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ-সভার দ্বারের কাছে বঙ্কিম বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন;—রমেশবাবু বঙ্কিম বাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিম বাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, "এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য—রমেশ তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ?" তিনি বলিলেন "না"।—তখন বঙ্কিম বাবু সন্ধ্যাসঙ্গীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।

প্রিয় বাবু।

এই সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্ব্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যা-সঙ্গীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্ব্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবল মাত্র ব্যক্তিগত রুচির

কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভ কালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যোৎস্নায়

(পল ভ্যার্লেনের মূল ফরাসী হইতে)

রজত শশধর
হাসিছে বন 'পর,
প্রতিটি শাখে শাখে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে
উঠিছে গুঞ্জন,
হে হৃদি-রঞ্জন!

সরসী সুবিমল
মুকুর অবিকল,
তমাল-কালোকায়
তাহাতে মূরছায়
বায়ুর ক্রন্দনে,
ডুবি এস স্বপনে!

গভীর কোমলতা
নিবিড় নীরবতা
রঙিন আলিপন
হতেছে বরিষণ,
গগন নিমগন,
এই ত সুলগন!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুস্কিল আসান

(গল্প)

ট্রেন ছাড়িতে যখন দশ মিনিট মাত্র দেরী—সেই সময় গোবিন্দ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকন্যাদিকে বহন করিয়া একখানি বয়েল গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনের বাহিরে দাঁড়াইল।—মোটমোটারীগুলিকে টানাটানি করিয়া ফেলিতে ফেলিতে বাবু ডাকিলেন—"কুলী—কুলী।—ইধার! ইধার—কুলী-লোগ্ ইধার!"......

দুইজন বালক কুলী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মধ্যে একজন ঠোঁট মুচকাইয়া একটু হাসিল, আর একজন বলিল, "টিরেন ত আ গিয়া বাবু! অব্—"

বাধা দিয়া ব্যস্তস্বরে গোবিন্দবাবু বলিলেন—"ট্রেন এয়েছে তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি বাপু!—কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়াচ্চে তা বল্‌তে পারিস্! আজ এগাড়ীতে যে আমার না গেলেই নয়!"—

কুলী উত্তর করিল—"বিশ মিনিট তীশ মিনিট হোগা মালুম! অব্ ছোড়েকা কুছ্ দেরী নেহি হায়।"

"বিশ না ত্রিশ রে? ঠিক করে বল্ না!—জামালপুরে যে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে!—তাহোক্—তোরা আমার বাক্স দুটো আর এই বিছানার লগেজটা ট্রেনে তুলে দিবি চল্! ভাগলপুরে গিয়ে ওজন দেব এখন!"—পরে বয়েল গাড়ীর কাছে আসিয়া ছোট টিনের হাতবাক্সটি লইয়া বলিলেন।—"নেবে এস ...শীগ্‌গীর চলে এস! আর গাড়ীর সময় মোটে নেই, বল্লুম ত তখনি, ছেলের পা কাট্‌ল ত কাট্‌লই, গাড়ীতে উঠে জলপটী দিও, তা না করে তুমি সাতঘণ্টা দেরী কল্লে......এখন বোঝ টেরটা!"

আলোয়ানের ভিতর হইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া উত্তর হইল, "ও মা! চৌকাটে লেগে ছেলের আঙ্গুলটা অমন করে কেটে গেল, রক্তে রক্তগঙ্গা, দু-দুটো নখ একেবারে উঠে গেছে,—সে নিয়ে বুঝি কোথাও যাওয়া যায়?—কি যে বল!"......

"হ্যাঁ আমি ত অমনি বলি! এখন ফিরে যাও, গিয়ে সোমবারে থুব্‌ড়ো মেয়ের বিয়ে কি করে দাও দেখ্‌ব তখন!......যাক্ শীগ্‌গীর নেমে পড়,......চল চল ষ্টেশনে চল,—তুমি খোকাকে নাও—আর মন্দা!—তুই এই

পোঁটলা দুটো নিয়ে খুকীর হাত ধরে চলে আয়......আমি টিকিট কিন্‌তে যাচ্ছি!—আ—হা দাঁড়িয়ে কেন—? যা যা, ইণ্টার ক্লাশ থার্ড ক্লাশ যাতে হোক একখানা মেয়েগাড়ীতে উঠে পড় গিয়ে—চিনিস্ ত সব!"

মায়ে মেয়েতে একবার চোখে চোখে চাহিল; পরে একটু উদ্বেগের স্বরে মন্দা বলিল, "তুমি ঠিক্ আস্‌বে ত বাবা?"

"আস্‌ব না ত যাব কোন্ চুলোয়?—যা না তোরা,—সং এর মত দাঁড়িয়ে তবু! যাবি ত যা নৈলে থাক্ পড়ে, আমি চল্লুম।"

বলিতে বলিতে বাবু টিকিট ঘরের দিকে ছুটিলেন। ব্যস্ততায় সম্মুখ পশ্চাৎ লক্ষ্য নাই, বারান্দায় উঠিতে একটা নীচু গ্যাসের লণ্ঠনে ঠক্ করিয়া মাথা ঠুকিয়া গেল। "উহুঃ উহুঃ গেলুম রে!"—বলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি আবার ছুটিলেন।

নিকটেই একজন রেলওয়ে কনষ্টেবল্ দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিল, পুলিশস্বভাবসিদ্ধ ধীর গম্ভীর স্বরে সে বলিল, "তিস্‌রা ঘণ্টা বাজ্‌তা হ্যায় বাবু! অব ভিতর যানেকা হুকুম নেহি!" এবং দ্বার আগলাইয়া দাঁড়াইল।

"হুকুম নেই? বলকি বাপু? এ যে নূতন কথা!—মরুক গে, এই নাও, পান খেও। আমায় ছেড়ে দাও—, আমার মেয়ে ছেলে সব গাড়ীতে উঠেছে!—"

পুলিস সরিয়া দাঁড়াইল। বাবু আবার ছুটিলেন। একজন ভদ্রবেশী মুসলমান্ বলিতেছিল, "কাহে হালাকান্ হোতে হেঁ বাবুসাব! দুস্‌রা টিরেনমে যাইয়ে,......ইস্‌বক্ত টিকিট মিল্‌না ওর গাড়ীপর চড়্‌না দোনো জুলুম হোগা।"

"চুপ্ কর বাবু তোরা একটু চুপ কর! আমি যেন এমনি বোকা তাই সব্বাই মিলে কেবলি আমায় শেখাতে এসেছেন!—খালি বাধা আর বাধা!......একবার টিকিট-ঘরে পৌঁছতে পাল্লে যে বাঁচি!"—তখন টিকিটঘরের জানালায় আর গোল নাই,—তরুণ টিকিটমাষ্টারটি মুখে চুরুট লইয়া নিশ্চিন্তভাবে ট্রেন ষ্টেশনমাষ্টার ও গার্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। এমন সময় ক্লান্ত গোবিন্দবাবু আসিয়া বলিলেন, "এই যে নরেন! দাওত বাবা, চারখানা বর্দ্ধমানের ইণ্টারের টিকিট......দাও শীগ্‌গীর দাও, তোমার ভরসাতেই—"

আর তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, রেলিং ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

"মামা যে! এত তাড়াতাড়ি!—আর সময়—"

"দে বাবা, আগে টিকিট্ ক'খানা ফেলে দে, তারপর সেসব কথা হবে এখন! তোর মামী গাড়ীতে বসে আছে—তশু মন্দার বে, না গেলেই নয়। বর্দ্ধমানের টিকিট!—"

নরেন একবার ত্বরিতচক্ষে আপনার টেবিলের প্রতি চাহিল—পরে চারিদিকে চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "বর্দ্ধমানের ত টিকিট কাটা নেই—এই নিন্ হুগ্‌লির—, ক আনা পয়সা—"

"তায় জল আট্‌কাবে না!—নাও—এস বাবা!—তোমার ভাল হোক্!—মন্দার বিয়েয় যাচ্ছ ত?"—

বলিতে বলিতে ততক্ষণ তিনি ট্রেনের নিকট আসিলেন। দেখিলেন স্ত্রীকন্যা গাড়ীতে উঠিয়াছে কিন্তু ট্রাঙ্ক দুইটা তখনো পড়িয়া—ওজন ওজন করিয়া কুলীতে ও একজন ষ্টেশনের লোকের মধ্যে কি বচসা হইতেছে।

"তোদের তাতে কি রে বাপু! যেখানে নাব্‌ব সেখানের লোকেরা তা বুঝে নেবে।—দে রে তুলে দে!"—

বাক্স দুটি কোনমতে গাড়ীতে ঠেলিয়া দিয়া—হাত-বাক্সটি স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, "সাবধান, এটাকে যেন কাছছাড়া কোরো না! দেখো!"—

গাড়ী তখন মৃদু মৃদু চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—তিনি ত্বরিতহস্তে পাশের কক্ষের দুয়ার টানিয়া উঠিয়া পড়িলেন। নরেনও প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ছিল; মুখ বাড়াইয়া গোবিন্দবাবু তাহাকে বলিলেন, "যেও নরেন্! নিশ্চয় যেও!"

নরেন মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। দুই পার্শ্বে জামালপুরের বহুবিস্তৃত কল্‌কারখানা; অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রেলপথের দুইধারে নিম্নভূমি প্রস্তরকঙ্করাবৃত।

গায়ের কাপড় খুলিতে খুলিতে মন্দার মাতা বলিলেন

"মা গো! এই গরমে কি এই ধোকড় গায়ে দেওয়া যায়? - "

গাড়ীতে আরও কএকটি স্ত্রীলোক ছিলেন, তাহার মধ্যে একজন স্থূলকায়া প্রৌঢ়া কিছু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "একখানা সিল্কের চাদর নিলেই পার, এত গীরিম্মিতি ও চট্ গায়ে দেওয়া কেন!"

মন্দার মা এই রমণীর বলিবার ভঙ্গী ও অঙ্গের বহর ও স্বর্ণালঙ্কারের স্তূপ দেখিয়া বুঝিলেন যে ইনি কিছু ধনের গর্ব্বও রাখেন। মনে একটু হাসিয়া মুখে সরল হাসির সহিতই বলিলেন, "আর মা, সিল্কের চাদর নেব কোত্থেকে! একটি প্রাণীর ওপর এতগুনো মানুষের ভার, তারপর আবার মাথায় আগুন—মেয়ের বিয়ে না দিলে নয়,—এখনকার দিনের কায়স্থ বদ্যির বিয়ের ব্যাপার ত আপনারা সবই জানেন—,কি করে কি করি মা! বাইরে আসা—তাই এটা জড়িয়েছি।"

প্রৌঢ়া তাঁহার কথায় কিছু সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। স্থূল শরীরখানি টানিয়া নিকটে আনিয়া বলিলেন, "ওঃ এই বুঝি তোমার মেয়ে?--বিয়ে দিচ্চ কোথায়?—বর কী পাশ?--কি কি চায়?"—

"দেশেই বিয়ে হবে। আমরা পাশকরা বর কোথা পাব মা!—ছেলের বাপ কি চাকুরী করেন, ছেলেও রেলে কি কাজ কচ্ছে—এতেই খরচ কষে মেজে তবুও হাজারটি টাকার কম ত নয়! এই দেখুন না গয়নাতেই ত আটশ টাকা পড়ল।"

"হাজার টাকা?" প্রৌঢ়ার চোখে মুখে অবজ্ঞার হাসি খেলিয়া উঠিল। "মোটে হাজার টাকা? ই-ই তোমার খরচ! আমার বীণার বিয়েতে শুদ্ধ বিয়ের খরচই পড়েছিল চার হাজার! তারপরে তত্ত্ব তল্লাস ত আলাদা!"

মন্দার মা হাসিয়া উঠিলেন, "ওমা চার হাজার টাকা যে আমরা চোখেও দেখিনি মা?—ওঁর মোটে পঞ্চাশটি টাকা মাইনে—এতটা খরচ—আমরা অত টাকা কোথায় পাব? এই যা দিতে হচ্চে তাতেই আমাদের হাড় ভেঙ্গে গেছে।"

প্রৌঢ়া আর কিছু বলিলেন না। এই পরিবারটির প্রতি যেন কিছু উদাস হইয়া বাহিরে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভাবটি যেন—"তবে আর তোমরা কী!"—

প্যাসেঞ্জার গাড়ী স্বভাবত ধীরে ধীরে চলিতেছিল। ক্রমে আরও গতি হ্রাস হইল, অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন খিড়কীরায়া পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বালক বালিকারা মুখ বাহির করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। একটি যুবতী প্রসন্ন মুখে বলিতে লাগিলেন, "ও মা! ঠিক যেন সাঁঝ হয়ে গেছে?"—মন্দার মাতা মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "দুপুর বেলায় এতটা আঁধার দেখায় না, সন্ধ্যেও হয়ে এল কি না।"

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই ট্রেন সুলতানগঞ্জ ষ্টেশনে থামিল। এখানে বাঙ্গালী যাত্রী মোটে নাই, তৃতীয় শ্রেণী হইতে কএকজন লোটাকম্বলধারী উঠিল ও নামিল।—একজন বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ওড়নামণ্ডিতা দুইজন স্ত্রীলোককে লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছিল, সে এই কাম্‌রাখানির সম্মুখে একবার দাঁড়াইয়া বলিল, "ইয়ে কোঠ্‌রী জানানা লোগকা বাস্তে,—তুম্‌লোক্ এহি গাড়ীমে উঠ্‌যাও,—হাম্ দুসরা—"

ব্যাপার দেখিয়া প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি ব্যস্ত হইলেন, এই অপরিচ্ছন্ন "ছোটলোকদের" সহিত বসিতে হইবে ভাবিয়া তিনি পূর্ব্বাহ্ণেই সাবধান হইলেন। বৃদ্ধ হাতলে হাত দিতেই তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিলেন,—"থাম থাম! —সব জানানা গাড়ীই তোমাদের জন্য নয়!—তোমরা কি এই ক্লাশের টিকিট কিনেছ?—উঠ্‌লেই হ'ল নাকি?"—পরে আপন মনে গন্‌গন্ করিয়া বলিলেন—"চেরোর আক্কেল দেখ দেখি! ইষ্টিশানে ইষ্টিশানে নেবে খোঁজ নেয় না! কোথাকার কে সব উঠে পড়ছে!"

বৃদ্ধও একটু চটিয়া বলিল, "টিক্‌স্ নেই লিয়া তব্ আপনে হুকুমসে চঢ়নে আয়া? বাঙ্গালীকা কৌড়ি হ্যায় ঔর হাম্‌লোগকা কুছ নেই হ্যায়?—হাম্‌লোগ এইসা গরীব"—

গতিক মন্দ দেখিয়া মন্দার মা বলিল,—"সে কথা ত হচ্চে না বাবা! তোমরা ক' নম্বর গাড়ীতে উঠ্‌বে তাই জিজ্ঞাস্ কচ্ছে'ন উনি।"

"লম্বর? আরে গাড়ীমে ত অব্ লম্বর উম্বর কুছ্ নেই রহতা হ্যায়—কীস আংরেজী হরপ লিখ্ দিয়া যো কি পঢ়ে নেই শকেঁ!—হামরা তিন লম্বর কা টিকস্ হাম্—"

এই সময় তাঁহার কথায় বাধা পড়িল—আর একজন যুবক হিন্দুস্থানী সেইদিকে আসিতেছিল, বৃদ্ধকে দেখিয়া

দ্রুত নিকটে আসিয়া বলিল,—"কাঁহা মিশরজী! কাঁহা? আপকে সাথ্ ইঁহা মুলাকাৎ হোগা হাম্ নেহি জান্তাথা,—দর্শনলাল নে চার ধরকা আমট্র আপ্কো লিয়ে হামারা পাশ ধর দিয়া - আব্ তলুক দেনেকা ফুরসৎ—"

"রাখি দহু মুহু?—যানেকা বখৎ লেলে বাঙ্গে! মগর গাড়ী পর চঢ়না আব মুস্কিল হুয়া! বাঙ্গালী জানানী সানি কহতে হেঁ ই গাড়ী দুস্‌রা,—আব্ সমে ভি কম্"—

বৃদ্ধ বলিতে বলিতেই টিকিট বাহির করিতেছিলেন, যুবক চট্ করিয়া তাহার হাত হইতে টিকিট টানিয়া লইল। পরে একটু হাসিয়া বলিল "থাট কিলাস্‌ক টিকস্! আপ লোগ ইধার আইয়ে";—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের হাত ধরিয়া সে টানিয়া লইয়া চলিল, রমণীদ্বয় তাহাদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইল।

ঘণ্টা বাজিতেছিল—এঞ্জিনেও বাঁশী দিল, মেয়েরা স্ব স্ব স্থানে স্থির হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় দেখা গেল, অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে কে একজন দ্রুতপদে সেই দিকে আসিতেছে - মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত একজন স্ত্রীলোক আসিয়া শিক্ষিতপটুতার সহিত হাতল ঘুরাইয়া নিমেষ মধ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। গাড়ীর আরোহিণীরা একবার হাঁ না করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে এবং ট্রেন মৃদু মৃদু চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সে স্ত্রীলোক, সুতরাং আপত্তি করিবার কোন কারণও নাই।—কিন্তু সকলে বিস্মিত চক্ষে দেখিতেছিলেন—এ কোন জাতীয়া?—সর্ব্বাঙ্গে এমনভাবে চাদর জড়ান যে সে পশ্চিমে কি বাঙ্গালী বা মারহাট্টা তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। সঙ্গে কোন পুরুষ বা কিছু দ্রব্যাদিও নাই। সহসা কোথা হইতে সাঁঝের আঁধারের মধ্য দিয়া এ অদ্ভুত জীবটি তাঁহাদের পথসঙ্গিনী হইল? এ কে? কোথায় যাইবে?

তাঁহারা সকলেই তাহাকে দেখিতেছিলেন কিন্তু সে কাহারও প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিল না, স্থিরপদে তাঁহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া এক কোণে গেল—তাহার পর শায়িত শিশুটিকে ধীরে ধীরে সরাইয়া, পায়ের কাছের পোটমাণ্টটা ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া একপাশে গিয়া বসিল এবং মুক্ত জানালার বাহিরে মুখ ঝুলাইয়া ঘোম্‌টাটি ঈষৎ তুলিয়া দিল।

গাড়ী তখন ছুটিতেছে। বাহিরে অন্ধকার, নবাগতার মুখ দেখা যায় না। কিন্তু ঘরখানির ভিতরে উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে সেই নূতন শালুর ওড়নাঢাকা রহস্যটির পরিচয় লইবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। পার্শ্বস্থা যুবতী তাঁহার ছেলেটির অকাল নিদ্রাভঙ্গে কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং ননদিনীর সহিত গোপনে—"দেখ্‌চ দিদি, মাগীর দেমাক্! ছেলেটাকে না নড়ালে কি হত না? আমাকে বল্লেই ত আমি সরে বস্‌তাম্!" বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে করিতে তাহার মুখ দেখিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিলেন! বিরক্তি সংযত করিয়া তিনিই প্রথমে বলিলেন, "হ্যাঁগা তুমি কি লোক? কোথা যাচ্চ?"

নবাগতা উত্তর দিল না।

যুবতী আবার বলিলেন, "শুন্‌ছ? তোমাকেই বল্‌ছি?"

পূর্ব্বোক্তা প্রৌঢ়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কি মেয়ে বাছা তুমি! দেখ্‌ছ ও কথা কবে না, তবু তোমার কি যেচে কথা না বল্লেই নয়?"

ননদিনী বলিলেন, "তুই থাম্ বৌ! আমি জিজ্ঞেস কচ্ছি?" বলা বাহুল্য বধূ অপেক্ষা তাঁহার কৌতূহল আরও বেশি হইয়াছিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, রমণী যেমন অটলভাবে বসিয়া ছিল তেমনি থাকিল, কাহারও কোন কথার উত্তর দিল না। মন্দার মা একবার "হে বাছা! তুম্‌লোকের ঘর কি সুল্‌তান্‌গঞ্জমেই হায় না আর কাঁহা থেকে আস্‌তা?" বলিয়া তাঁহার প্রবাসবাসের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলেন। তাহা শুনিয়া মন্দা হাসিয়া বলিল, "তুমি হিন্দুস্থানী কথা বোলো না ত মা! একটুও যদি হয়!" কিন্তু বস্ত্রাবৃতা তাহারও কোনো উত্তর দিল না।

তখন একজন বৃদ্ধা বিরক্তস্বরে বলিলেন—"মরণ আর কি! কি জাতের মেয়ে তারও ঠিক্ নেই,—বাক্সটা ঠেলে এনে আমার ঝুড়িটায় ছুঁইয়ে দিয়েছে একেবারে! বাবার পেসাদী সন্দেশ চন্নামেত্ত আছে আমার, সব গেল বুঝি!"

সকল রমণীর মুখেই বিরক্তিচিহ্ন দেখা যাইতেছিল। কিন্তু আগন্তুকের অটলতা দেখিয়া তাঁহারা তাহার পরিচয় লাভের আশা ত্যাগ করিলেন। গাড়ীও ক্রমে দুইটা ছোট ছোট ষ্টেশন পার হইয়া ভাগলপুরে থামিল। এই ষ্টেশনটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং জনতাও তদনুরূপ। এখানে ট্রেন থামিতেই অল্পবয়স্কারা কেহ কেহ মাথায় কাপড় টানিয়া মুখ ফিরাইল। কেহ বা সেটুকুরও অপেক্ষা না রাখিয়া যথেচ্ছভাবে দেখিতে লাগিল। দুই এক দলের সঙ্গী বা অভিভাবকেরা আসিয়া স্ত্রীলোকদের কোন-কিছুর প্রয়োজন বা অসুবিধা আছে কিনা খোঁজ লইয়া গেলেন। গোবিন্দ বাবু আসিয়া বলিলেন, "এখানে মাল ওজন হবে না, একেবারে নেবেই হবে—দোকড় খরচ পড়বে—তা কি করব ?"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্লাটফর্ম্মে যথারীতি চা চুরুট, সোডা বরফের সঙ্গে "গর্ম্মাগরম পুরী মিঠাই" "অবাক্‌জলপ্যান্" "লিয়ে বাবু পাকা তরবুজ্জা" হাঁকিয়া ফেরিওয়ালারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সঙ্গীদের নিকট জানাইয়া স্ত্রীলোকেরা সকলেই কিছু কিছু কিনিল। বালক বালিকারা অধৈর্য্য ভাবে "মা আমি কলা নেব"—"ঐ দ্যাখ পিসি মা! সোলার পাখী বিক্রি হচ্চে—আমি নেব"—"ঐ বড় জিলিপী দুখানা নাওনা মা!" ইত্যাকার বাহ্না ধরিয়া তাঁহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল।

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির সঙ্গী আসেন নাই, অধীর বিরক্তির সহিত তিনি কেবলই বাহিরে চাহিতেছিলেন। সকলেরই লোক আসিল এবং ফিরিল দেখিয়া জ্বলিতচক্ষে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"চেরোর আক্কেল দেখছ—এ পর্য্যন্ত নাকি একটা উঁকিও দিলে ?—ওর সঙ্গে আসাই আমার বোকামী হয়েছে ? তখনই আমি ওনাকে বলেছিলাম যে চারুটার সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই, ছুটি হলে তুমিই আমায় রেখে এস,—তা না এ কী বিপদে পড়লাম ?"

মন্দার মাতা বলিলেন,—"আমাদের ওঁকে বলব কি মা তাঁকে ডেকে দিতে ?" তাহাতেও তাঁহার নাসিকা কুঞ্চিত হইল দেখিয়া আর কেহ কিছু বলিলেন না।—ক্রমে গাড়ী আবার চলিল।

তখন রাত্রি হইয়াছে। বালকবালিকারা ঘুমাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা জিনিষপত্র গোছ করিয়া কেহ ট্রাঙ্কে কেহ বিছানার লগেজে বসিয়া ছেলেদের শুইবার স্থান করিয়া দিলেন। দুইএকজন বা মেজেতেই একটু বিছানা বিছাইয়া শিশুকে লইয়া শয়ন করিল।

তখন মন্দার একজন সমবয়সী কিশোরী—তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদু হাস্যের সহিত কানের কাছে প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ ভাই! তোমার নাকি বিয়ে ?"

কিশোরী বিবাহিতা। মন্দা তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইল। বিবাহের কথাটা এতক্ষণ চাপাই ছিল,—এইবার কথা উঠিতেই, একজন যুবতী বলিলেন,—"দিব্যি মেয়েটি!—কি কি গয়না দিচ্চেন্ ?"

একমুখ হাসিয়া মন্দার মা বলিলেন, "ও আমার অদেষ্ট! গয়না আর কি দেব ভাই ? এই দ্যাখই না, গয়না ত সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি।" বলিয়া হাতবাক্সটি সম্মুখে টানিয়া আনিলেন।

তখন সকল স্ত্রীলোকই একসঙ্গে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে; যাহারা শয়ন করিয়াছিল তাহারাও উঠিয়া বসিল, সহসা স্তন্যচ্যুত হইয়া নিদ্রাতুর শিশু চীৎকার করিয়া উঠিল। জননীদের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই,—"হার দিয়েছ কেন নেক্‌লেশ দিলেই ত ঠিক্ হত"—"আর কি কেউ ও পাতাকাজের চুড়ি পরে ? কুচো চুড়ি দাওনি কেন ?" প্রভৃতি মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রৌঢ়া ঈষৎ অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন, "নেহাৎ 'কনে গয়না,' তা যেমন মানুষ তেমনি ত দেবে!—বেশ্ হয়েছে!" মন্দার মাও হাসিয়া বলিলেন, "আর পাব কোথা ভাই! এর জন্যেও সেক্‌রার কাছে টাকা ধার রইল, চেনা লোক তাই দিয়েছে!"—বাক্সে বিবাহের অলঙ্কার ছাড়া আরও গহনা ছিল, প্রশ্ন হইল "ওই গহনাগুলো বুঝি তোমার ?"

"হ্যাঁ ও কখানা আমারই বটে! কেবল এই হার ছড়াটা খোকার—আর"......

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া একজন বলিল, "তোমার মোটে এই কখানা গয়না! শুধু বালা অনন্ত—"

তাঁহার কথাতেও হাসির বাধা দিয়া মন্দার মা বলিলেন,

"কি বল্‌ছ ভাই—পা-ব কোথা! বিয়ের সময় বাপের বাড়ীর গয়না ভেঙে চুরে ঐ কখানা গা-ঢাকা করে রেখেছি! পরি ত তেম্‌নি! যেমন হয়েছে অমনি ধরাই রয়েছে! গরীব মানুষের গহনা জান ত 'কখনো বা আভরণ কখনো বা পেট-ভরণ!'"

এ কথার পর আর কেহ কিছু বলিলেন না, কেবল বিধবা ননদিনী একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। মন্দার মা বাক্সটি বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "বড় দুঃখের জিনিষ ক'টা ভাই! তাই সাথে সাথে নিয়ে যাচ্চি। যাদের সামগ্রী তাদের হাতে হাতে সঁপে দিয়ে তবে আমার নিস্তার! মেয়ে ত পরের জিনিষ বৈ নয়! এতদিন খাইয়ে মাখিয়ে—সাজিয়ে পরিয়ে পরের ঘরে পাঠাতে চলেছি!"

মন্দার মুখখানি ম্লান হইয়া উঠিল কিন্তু তাহার পার্শ্বের সঙ্গিনী তাহার কানে কানে বলিল "আর ন্যাকাম কর কেন ভাই? মনের কথা ত মনই জান্‌ছে!"

তখন আর মন্দা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, আঁধারে মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাস্যে তাহাকে আনন্দের ভৎসনা করিয়া বলিল, "যাও! তুমি বড় দুষ্টু!"

সঙ্গিনী বলিল, "তা ত বুঝলাম, কিন্তু একটা কথা বলি, বর্দ্ধমানের ঐ দিকে তোমাদের বাড়ী শুন্‌লাম, আমার শ্বশুর-বাড়ীও ঐ দিকে, বাথানতলা জানত? তারই কাছে, তোমাদের বাড়ী কি ঐ দিকে?"

তাহার পর দুই জনে একমনে বাক্যালাপ আরম্ভ হইল, কিশোরীর নাম কনকলতা, তাহার পিতা বাঁকীপুরের উকীল, সম্প্রতি সে মাতার সহিত পিত্রালয়—ইংরাজ-বাজার চলিয়াছে। তিনপাহাড় ষ্টেশনে নামিবে। শুনিয়া মন্দা অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তাহারা যে আরও অনেক দূর যাইবে। কনকের জন্য সত্যই তাহার মন খারাপ করিবে ইহা সে মাইরি দিব্য করিয়া জানাইয়া দিল! কনক তাহার গাল টিপিয়া আদর করিল এবং যখন একদেশে বাড়ী তখন কখনো না কখনো দেখা হইবেই বলিয়া আশ্বাস দিল।

ক্রমে প্রায় সকলেই নিদ্রালু হইতেছিলেন; মন্দার মা বলিলেন "তুই ঘুমুবি ত ঘুমো না মন্দা, আমি জেগেই থাক্‌ব!"

কিন্তু মন্দাই ঘুমাইল না, সমান উৎসাহে কনকের সহিত গল্প করিতে লাগিল, এবং তাহার জননী জানালার পাশে মাথা দিয়া ঢুলিতে লাগিলেন।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট ষ্টেশন আসে ও পার হইয়া যায়, যাত্রীর ভীড় মোটে নাই। একস্থানে আসিলে মন্দা বলিল, "এটা আবার কি ইষ্টিশান? নাম যে ছাই করে ডাক্‌লে বুঝ্‌তেই পারলাম না!"

কনক বলিল, "কেন? লণ্ঠনের গায় লেখা পড়নি?"

মন্দা হাসিয়া উঠিল। বলিল "ওমা, সে যে ইংরিজি! পড়ব কি করে?—"

কনক একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "এটা 'পিরপানটা' ষ্টেশন!"

মন্দা বিস্ময়ানন্দে বলিল, "তুমি ইংরিজি জান নাকি ভাই?"

কনক বলিল "হ্যাঁ জানি বৈকি, আমরা দাদার কাছে পড়ি। তুমি জান না?"

মন্দা শুষ্ক হাস্যে বলিল "না!"— তখন গাড়ী ছাড়িয়া আবার চলিতেছে, বধূটি তাহাদের কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "কি নাম বল্লে গা?—পিরপান্‌টা? কেন ঐ যে বাংলায় 'পীরপৈন্তী' লেখা দেখ্‌ছি?"

তাহা কনকও দেখিয়াছিল, একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, "তা হল ত কি? ইংরিজিতে অমনি উচ্চারণই হয়?"

কনকের মাতা হাসিয়া বলিলেন, "তোর মাথা হয়!"

"হয় না? তুমি দাদাকে জিজ্ঞেস্ কোরো দিকিন্?" কনক রাগিয়াছিল।

তাহাকে অন্যমনা করিবার জন্য মন্দা বলিল, "আচ্ছা ভাই ঐযে আলোগুলো জ্বলছে—ও কি জান?—"

কনক কথা বলিল না। মন্দা আবার বলিল "পাহাড়ে ঐ রকম আলো বড্ড জলে—দেখেছ?"

কনক শীঘ্র কথা কহিত না, কিন্তু উপস্থিত একটি ঘটনায় সকলেই যেন চঞ্চল হইয়া পড়িলেন! সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি বেঞ্চের একপাশেই জড়সড় ভাবে শুইয়া ছিলেন, সম্প্রতি তিনি এত ধারে আসিয়াছেন যে প্রতি মুহূর্ত্তে পতনাশঙ্কা—এবং দেখিতে না দেখিতে পড়িয়াও গেলেন!

—বৃদ্ধা হাঁউমাউ করিয়া উঠিলেন—তাঁহার কন্যা ও বধূ তাড়াতাড়ি ধরিয়া তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "আহা হা বুড়ো মানুষ, কোথাও লাগ্‌ল কি মা?" বৃদ্ধার কিন্তু সেকথায় কান নাই, তাঁহার বক্তব্য যে তিনি ত ঘুমান নাই! ঐ কাপড়-জড়ান মাগী তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে!"

বৃদ্ধার কন্যা পুত্রবধূ যদিও স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে কেহ তাঁহাকে ফেলিয়া দেয় নাই—তথাপি সেই নীরব স্ত্রীলোকটিকে গালি দিবার এই সুবিধাটুকু তাঁহারা ত্যাগ করিলেন না। মিজেদের দল পুরু দেখিয়া, "ও মাগী কি কম্! পেটে পেটে বজ্জাতি নিয়ে কেমন গাড্ডিল হয়ে বসে রয়েছে দেখছ না।" "দে না পোড়ামুখীর মুখখানা দেয়ালে ঠুকে।" প্রভৃতি রোষবাক্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি সে পোড়ামুখী বা সোনামুখী আপনার মুখ ফিরাইল না।

এই গোলমালে তন্দ্রাতুরা প্রৌঢ়া জাগিয়া বলিলেন, "এটা কি এষ্টেশন গা, দেখেছ তোমরা?"

মন্দা মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "এক্ষুনি কি একটা ছোট্ট ইষ্টিশান গেল, কি ভাই?"

কনক বধূটির প্রতি রোষকটাক্ষে চাহিয়া বলিল, "কি জানি ভাই, আমি জানি না।"

বৌ তাহা দেখিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন—"দেখবেনা আবার কেন, পষ্ট মিরজাচৌকী লেখা, দেখলে না আবার"—

ননদিনী হাসিয়া উঠিলেন—বৌকে ঠেলা দিয়া বলিলেন, "নে নে আর ছেলে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করে না। জিনিসপত্তরগুলো গুছিয়ে নে! এইবার আমরা নাব্‌ব। তুই খুকীকে কোলে নিয়ে বস্, আমাকে আবার মার হাত ধরে নাবাতে হবে।"

মন্দার মা বলিলেন, "তোমরা কোথায় নাববে ভাই?"

"এই যে সায়েবগঞ্জে! হ্যাঁলা নিশে আস্‌বে ত?"

বধূ বলিলেন, "কেন—আস্‌বে না কেন?—আমি নিজে চিঠি দিয়েছি?"

প্রৌঢ়াও একটু মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "আমিও ঠিক্ হয়েই থাকি—সক্‌রীগলিতে আমাকে নাম্‌তে হবে।"

মন্দার মা চোখ মেলিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন,—"ওমা, সবাই তোমরা চলে যাবে—এতটা পথ আমরাই একা যাব?"

বিছানা কাপড় ভাঁজ করিতে করিতে বৃদ্ধার কন্যা বলিলেন, "তার আর ভাবনা কি ভাই, কত মানুষ উঠ্‌বে এখন, বসবার ঠাঁই মেলা তখন দুষ্কর হবে হয় ত!"

"সেও ভাল ভাই! একা যেতে আমার বড় ভয় করে!"

ট্রেন ষ্টেশনে থামিতেই বৃদ্ধার পুত্র দ্বারে আসিয়া বলিলেন "তোমরা ঠিক্ হয়ে আছ ত?—ভাল, তাড়াতাড়ির দরকার নেই—এখানে অনেকক্ষণ গাড়ী থাম্‌বে, ততক্ষণ আমি খোঁজ নিই নিশি এল কি না?"—

"কে রমানাথ বাবু কি?—এই যে আমি নিশীন্দ্র—" বলিতে বলিতে মাথায় চাদরজড়ান জিনের-কোট গায়ে একজন শীর্ণকায় যুবক আসিয়া রমানাথের সহিত মিলিত হইল। স্বাগতসম্ভাষণাদির পর নিশীন্দ্র বলিল "পাল্কী ত কিছুতেই জোগাড় কর্ত্তে—"

বাধা দিয়া রমানাথ বলিল, "দরকার কি!—এইত বাসা, এটুক—রাত্তির বেলা—দেখে নেওয়া যাবে। এস গো তোমরা নেবে এস!"—গায়ে চাদর জড়াইয়া ছেলে কোলে করিয়া বধূ নামিয়া গেল, কন্যা বৃদ্ধাকে নামাইতে লাগিলেন, বৃদ্ধা বলিলেন, "তুই ছাড় মা! আমি নিজেই যাচ্ছি এখন!"

রমানাথ বলিল—"না না; অততে কাজ কি! তুমি ওর হাত ধরেই এস না।"—তখন স্ত্রীলোক তিনজনকে প্লাটফর্ম্মের পাশে দাঁড় করাইয়া পুরুষ দুইজনে জিনিস সরাইতে লাগিলেন। গোলমালে বধূর কোলে শিশু কাঁদিতে লাগিল।

সাহেবগঞ্জ প্রকাণ্ড ষ্টেশন। দীর্ঘ দালানে উজ্জ্বল বাতি জ্বালাইয়া কর্ম্মচারীরা বসিয়া আছে। বড় বড় ঘরগুলি বিলাতি প্রথায় উৎকৃষ্ট ভাবে সজ্জিত। দেয়ালে নানাবিধ খাদ্য ও ঔষধ প্রভৃতির বিজ্ঞাপন বিচিত্র বর্ণে শোভা পাইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা মেম ও তাঁহাদের শিশুদের মুক্ত আনন্দের দ্রুত পদচালনায় লীলাভঙ্গীই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

মন্দা অনেক লোক দেখিয়া একটু মুখ ঢাকিয়াছিল কিন্তু

কনক পূর্ব্ববৎ নিশ্চিন্ত ভাবে ষ্টেশনের দিকে চাহিয়া ছিল। সহসা সে মুখ ফিরাইয়া মন্দাকে চিম্‌টি কাটিয়া বলিল, "ও ভাই ও ভাই! খুব মজা হয়েছে দেখ্‌লি না? ঐ বৌটার গা ঘেঁসে তুটো সাহেব চলে গেল, মাগী একেবারে আঁৎকে উঠেছে।"

কথাটায় হাসিবার কারণ কিছুই নাই—বরং ভাবিতে মন্দার ভয়ই পাইল, সে শিহরিয়া বলিল, "ও মা সত্যি না কি?"—

"হ্যাঁ সত্যি না ত কি? বেশ্ হয়েছে—যেমন কর্ম্ম—"

অর্দ্ধসমাপ্ত কথা মুখে লইয়া কনক থামিল কিন্তু মন্দা তাহাতে সায় দিল না। কনক বলিল "তুমি অমন গোঁজ হয়ে বসে কেন আছ ভাই—এদিকে এসে ছাখ না কত মেম সাহেব—আর ছেলেগুলি কি সুন্দর ভাই?"

হাসিয়া মন্দা বলিল, "সত্যি! আমাদের জামালপুরেও ঢের সাহেব মেম্—আর ভাই, সন্ধ্যে বেলায় মুঙ্গেরে যদি ছাখ—উঃ সে যেন সাহেব বিবির হাট বসে যায়!"

একটু মুখ ভার করিয়া কনক বলিল, "আমাদের বাঁকী-পুরেও মেলা সাহেব আছে!"

গাড়ী ছাড়িতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছিল—কনকের মাতা বলিলেন, "গাড়ী ছাড়বে ত কখন? গরমে যে মাথা ধরে উঠ্‌ল!"

মন্দার মা বলিলেন, "এখানে সায়েবরা খানা খায় কিনা তাই দেরী হচ্চে।" এমন সময় হঠাৎ একটা বড় ঝাঁকুনী দিয়া গাড়ী চলিল।—প্রৌঢ়া অসাবধান ছিলেন—তাঁহার মাথা সজোরে জানালায় আসিয়া পড়িল। তিনি রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "কেন বাছা, এই ত গাড়ী চলেছে, আর তুমি বল্লে এখন ছুটবে না!"

মন্দার মা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন "তাই'ত! এত শীগ্‌গীর ত কখনো চলে না!" বলিতে বলিতে গাড়ী আবার থামিল।

কনকের মা বলিলেন, "নাও! আবার থাম্‌ল যে!"

কনক হা হা শব্দে হাসিয়া বলিল—"লাইন বদ্‌লাচ্চে মা লাইন বদলাচ্চে! ওই দেখ আর একখানা গাড়ী এসে পড়ল!"

অপর পার্শ্ব দিয়া মেল ট্রেন হুস্ হুস্ শব্দে আসিয়া দাঁড়াইল এবং প্যাসেঞ্জারও মৃদু মৃদু চলিয়া ষ্টেশন ছাড়াইল।—

সকরীগলির ক্ষুদ্র ষ্টেশনে প্রৌঢ়ার আত্মীয় দাঁড়াইয়া ছিলেন, ট্রেন হইতেই তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। গাড়ী থামিবামাত্রই উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "এই যে নরেশ! বাবা, চেয়োর আক্কেল শোন"—

যুবক কিন্তু আর বলিতে দিলেন না,—বাধা দিয়া "চুপ কর মা! এখানে গোল কোরো না,—শীগ্‌গীর নেবে এস, এখানে বেশীক্ষণ গাড়ী দাঁড়ায় না।" বলিয়া কুলী ডাকিয়া জিনিস পত্র নামাইয়া লইলেন।

তুইটা ক্ষুদ্র ষ্টেশনের পরই তিনপাহাড় জংসন। অপর পার্শ্বে রাজমহলের ট্রেন দাঁড়াইয়া আছে। কনক বলিল, "ঐ যে আমাদের গাড়ী! এইবার ত আমরা চল্লুম ভাই!"

মন্দা মুখ হেঁট করিল।—কনক মুগ্ধ স্বরে বলিল—"ও মা! আবার এত কেন ভাই!—পথের সাথী বৈ ত নই! তা দুঃখু কি—গিয়েই আমি চিঠি দেব—তুমি দেবে ত?"

মন্দা ঘাড় নাড়িল। কনকের মাও "আসি দিদি!" বলিয়া মন্দার মার কাছে বিদায় লইলেন।—কনকের পায়ে চারি গাছা মল ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতেছিল, পা তুখানি আল্‌তায় সন্তরঞ্জিত, মাঝের আঙ্গুল তুটিতে সুন্দর ডায়মন-কাটা আঙ্গ্‌টি—মন্দা বিষাদজড়িত চক্ষে তাহাই দেখিতে-ছিল। তাহারা গিয়া অপর পার্শ্বের ট্রেনে চাপিল।

তখন ষ্টেশনের ঘড়িতে বাজিতেছিল,—এক তুই তিন—চার পাঁচ ছয়—সাত আট নয়!—"ও মা নটা বাজল এতক্ষণে—রাত যে কত দেখাচ্চে!—মন্দা! ভাল হয়ে বস, আমি খোকাকে এখানে শুইয়ে দিই!"—বলিতে বলিতে মন্দার মা নিজেও শুইবার উপক্রম করিলেন। গাড়ীতে আর কেহই নাই—যথেষ্ট স্থান। সবিস্ময়ে তাঁহারা দেখিলেন এতক্ষণ পরে সেই বস্ত্রাবৃতা ধীরপদে মাঝের বেঞ্চে আসিয়া বসিল। মন্দার মা বলিলেন, "বস বাছা! একটু গড়িয়ে নাও, এখুনি হয়ত লোক এসে পড়বে।—মন্দা, তুইও একটু শুয়ে নে না!"—

"আমার ঘুম পায়নি, তুমিই শোও!" নবপরিচিতা সখীর বিদায়শোকে মন্দা তখনও ব্যথিত;—গাড়ী চলিতে

লাগিল, সে মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল,—তিনপাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গত্রয় তাহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া তিনটা কালো দৈত্যের মত চলিয়া গেল!—সহসা কি একটা অকারণ দুর্ভাবনায় বালিকার চিত্ত পীড়িত হইতেছিল তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না।

এঞ্জিনের ধুঁয়ায় পাথর কয়লার গুঁড়া উড়িয়া আসিতেছিল, কখনো কখনো বা চোখে পড়িয়া পীড়াও দিতেছিল, মন্দা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া বসিয়াই থাকিল। দমকা বাতাসে তাহার সম্মুখের চুলগুলি হাল্কাভাবে উড়িতে লাগিল। বাহিরে আঁধার—কেবল প্রত্যেক কক্ষের জানালাপথে বহিশ্চ্যুত আলোকচতুষ্কগুলি গাড়ীর সমান দৈর্ঘ্যে সারি বাঁধিয়া তাহার সহিতই ছুটিয়া চলিতেছিল।

মন্দার চিত্ত ক্রমেই স্থির হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশের আঁধার ভেদ করিয়া চাঁদ উঠিল, মাঠের বুকে দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষচ্ছায়া গাড়ীর বিপরীত মুখে ছুটিতে দেখা যাইতে লাগিল, মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলায় শীর্ণ জলধারা চিক্ মিক্ করিয়া উঠিল। রাত্রি প্রায় দশটা।

সহসা গাড়ীর ভিতরে একটা হুড়াহুড়ি শব্দ উঠিল,—ও কি?—মুখ ফিরাইয়া মন্দা দেখিল, অদ্ভুত কাণ্ড! সেই বস্ত্রাবৃতা স্ত্রীলোকটা হঠাৎ আসিয়া তাহার মাতার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে এবং তিনি তাহার হাত ছাড়াইবার জন্য ছট্ ফট্ করিতেছেন!

"ও কিরে মাগী; আমার মাকে তুই ধরেছিস্ কেন?" বলিয়া মন্দা ছুটিয়া তাহাদের নিকট আসিল। তখন পুরুষবৎ পরুষস্বরে সে বলিল, "চুপ কর ছুঁড়ি! তা না হলে সবাইকে খুন কর্ব্ব আজ—দেখেছিস্!" সভয়ে মন্দা দেখিল তাহার হাতে দীর্ঘ ছুরিকা—আলোকে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। তাহার মাতা অজ্ঞান, সম্ভবত তাহাকে ক্লোরোফর্ম্ম করা হইয়াছে।—দেখিতে দেখিতে সেই দস্যু তাহাদের সর্ব্বস্বের আধার সেই গহনার বাক্সটি হস্তগত করিল।—মন্দা প্রথমত হতবুদ্ধি হইয়াছিল, সহসা তাহার মনে হইল, "দরজার পাশের ঐ শিকলী টানিলে ত গাড়ী থামে! এবং বিপদেরও অবসান হয়!" তখন সে ধীরে ধীরে সেইখানে গিয়া হাত বাড়াইল।

কিন্তু দস্যু তাহা অপেক্ষাও চতুর ও ক্ষিপ্রহস্ত,—মুহূর্ত্ত মধ্যে সে ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতে ছুরি বসাইয়া দিল, মন্দা চীৎকার করিয়া মেঝেয় পড়িয়া গেল। বাক্সটি তখন তাহার হস্তগত,—সে একবার এক নিমেষে সমস্ত দৃশ্যটা দেখিয়া লইল, তাহার পর দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল।—কিন্তু বোধ হয় চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইতে সাহস হইল না, কপাট খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিল।

বারহারোয়া ষ্টেশন। গাড়ী থামিতেই চোর নিঃশব্দে প্লাটফর্ম্মের বিপরীত পার্শ্বে নামিয়া পড়িল। ক্ষুদ্র ষ্টেশন, তাহাতে রাত্রি—সে সম্ভব নিরাপদেই যাইত কিন্তু তাহা ঘটিল না। অন্ধকার ঘটনার পূর্ব্বে ক্রমাগতই ট্রেনে এইরূপ চুরি ডাকাতির সংবাদে রেল-কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তিত ও সাবধান হইয়াছিলেন, প্রায় প্রত্যেক ট্রেনেই একএকজন রেল-পুলিশ-কর্ম্মচারী থাকিতেন, অদ্য স্বয়ং সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীই ছদ্মবেশে যাইতেছিলেন।

চোর ফাষ্টক্লাশের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, সাহেব তাহার ভাব দেখিয়াই সন্দেহ করিলেন,—সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "এ নিশ্চয় দুষ্ট লোক—নামিয়া পড়!"

চোর ধীরে ধীরেই যাইতেছিল, তখন সে ওড়নাখানি খুলিয়া ঘাড়ে লইয়াছে, সম্পূর্ণ পুরুষ-বেশ। সাহেব নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাঁহার দুইজন সঙ্গী গিয়া দস্যুকে চাপিয়া ধরিল।

"কে রে?—কেন আমায় ধরলি?" চোর বলিল। দূর হইতে সাহেব তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিলেন "উহার পরিচয় না লইয়া ছাড়িও না!" চোর বিলক্ষণ বুঝিল যে এইবার তাহার সমূহ বিপদ উপস্থিত! সে মুহূর্ত্ত মধ্যে ছুরি টানিয়া একজনের বাহুতে বিদ্ধ করিয়া দিল!—

তখন চাঁদের আলোয় সমস্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল,—আহত সিপাহী হাঁকিল "হুজুর! আমায় খুন করিল!" সে আহত তবু চোরকে ছাড়ে নাই, দস্যু আবার তাহার স্কন্ধে আঘাত করিল। এইবার সে ভূপতিত হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ধাক্কা দিয়া চোর দৌড় দিল।

সাহেব তখন উচ্চকণ্ঠে—"পুলিশ-পুলিশ-কুলি—"বলিয়া ডাকিতেছিলেন।—চোর পলাইতে পারিল না অল্পদূরেই কএকজন পুলিশ ও কুলিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল!

মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষুদ্র ষ্টেশনটি কোলাহলে পূর্ণ হইয়া গেল। গাড়ী থামাইয়া গার্ড ও ষ্টেশনমাষ্টার সেইখানে আসিলেন। চোরের নিকট গহনাপূর্ণ বাক্স পাওয়া গিয়াছে তাহা কোন্ আরোহীর সর্ব্বাগ্রে তাহাই অন্বেষণ আবশ্যক।

অল্পসময়ের মধ্যেই স্ত্রীলোকদের কক্ষের ভীষণ অবস্থা জানা গেল এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ স্ত্রীলোকদের অভিভাবককেও পাওয়া গেল।—স্ত্রীকন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া গোবিন্দবাবু যেন উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। তিনি মাথা কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—"দোহাই হুজুর! আপনারাই বিচার করুন, আমার যা সর্ব্বনাশ হল তার উপায় আপনারাই করুন!"

সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয়!" পরে দস্যুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোমার কিছু বলিবার আছে?"

সে উত্তর দিল না, ক্রূর দৃষ্টিতে আহত চাপরাশীর প্রতি চাহিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "ও আর বল্‌বে কি আমার মাথা!—মেয়েটাকে যা চোট্ দিয়েছে—হাতখানা ভাল হলে বাঁচি,—আইবড় মেয়ে—তাতে অমন হয়ে হাত কেটে গেল—এই বিপত্তি, কি করে যে কি হবে তাও ত বুঝ্‌চি' না!"

ততক্ষণ সাহেব তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী একজন পুলিশ-পরিচ্ছদধারী বাঙ্গালী বাবুর সহিত কি পরামর্শ করিতেছিলেন,—তাহার পর ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিয়া ও সময়োচিত উপদেশ দিয়া গোবিন্দ বাবুকে বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই বাবু! আমি তোমার বিষয় সমস্ত ইঁহাদিগকে বলিলাম, যাহা কর্ত্তব্য সমস্তই হইবে - তুমি কোন ভাবনা করিও না!"

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "তবে আমার গহনার বাক্সটা আমায় দিতে হুকুম হোক্—এই ট্রেনেই আমি বাড়ী যাব!"

"পাইবে—পাইবে"—বলিতে বলিতে সাহেব গিয়া তাঁহার গাড়ীতে উঠিলেন, চাপরাশীকে লইয়া আর দুই জন লোক অন্য কক্ষে উঠিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

গাড়ী চলিতে দেখিয়াই গোবিন্দ বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"অ্যাঁ, হল কি? গাড়ী যে চল্ল!—আমার স্ত্রী পরিবার সব যে চলে—"

বাধা দিয়া সেই বাঙ্গালী ইন্সপেক্টর বলিলেন—"না—তাও কি হয়? তাঁরা ও পাশে নেমেছেন, আপনার স্ত্রী আর মেয়ে ত বড্ড অসুস্থ—তাঁদেরকে রীতিমত ডাক্তার দেখাতে হবে—তা ছাড়া"—

"এই বনগাঁয়ে আবার ডাক্তার কোথা পাব? থাক্‌বই বা কোথা?—কেন মশাই আপনারা সুদ্ধ আমার পিছনে লাগ্‌লেন বলুন ত?—এক ত ভগবানই মেরে দেছেন···তার উপর এ পুলিশের হাঙ্গামা—আমি এখন করি কি?"

গোবিন্দ বাবুর কথায় হাসিয়া ইন্সপেক্টার বলিলেন, "এতবড় ব্যাপারটা হয়ে গেল, মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি—এর পর আপনার সমস্ত বজায় থেকেও যে কেবল এই হাঙ্গামটুকু মাত্র পোহাতে হবে এ ভাবনায় কাতর হলে চলবে কেন মশায়?"

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন,—"এখানে আর কেন, চলুন এ খুনেটার একটা বন্দোবস্ত করে এঁর মেয়ে ছেলেদের সব এঁর জিম্মা করে দিতে হবে।"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন - "গাড়ী ত চলে গেল, আমি এখন মেয়ে ছেলে নিয়ে যাই কোথা বলুন ত?"

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন, "তা আমি কি করে জান্‌ব? —খানিকক্ষণের জন্য ষ্টেশনেও থাক্‌তে পারেন অথবা গ্রামে"—

ইন্সপেক্টার হাসিয়া বলিলেন, "গ্রামের কথা ছেড়ে দিন্—এই ত গ্রাম!"

সকলে আসিয়া ষ্টেশনে উঠিলেন। ক্ষুদ্র ষ্টেশনে কিছু মাত্র আড়ম্বর নাই,—ঘরও বেশি নাই,—ষ্টেশনের একখানি ঘরে এক পাশে ষ্টেশনমাষ্টারের স্ত্রী থাকেন—সেই ঘরের সম্মুখে গোবিন্দবাবুর পরিবারেরা বসিয়া ছিলেন।—মন্দার মার চৈতন্য হইয়াছে, তিনি শুইয়া শুইয়া কাঁদিতেছিলেন,—মন্দার আহত হাতখানিতে কে একটা জলপটি বাঁধিয়া দিয়াছিল কিন্তু তাহাতে রক্তস্রাব বন্ধ হয় নাই, যন্ত্রণায় তাহার মুখ নীল হইয়া গিয়াছে কিন্তু কি ভাবিয়া সে নীরবে তাহা সহ্য করিতেছিল, রক্তে তাহার কাপড়ের অর্দ্ধেকটা রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে—সে বার বার তাহাতেই হাত মুছিতেছিল।

কপাট একটু খুলিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের স্ত্রী বসিয়া ছিলেন এবং মন্দার সহিত মৃদু স্বরে কথা বলিতেছিলেন। এমন

সময় সকলে আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন।—ষ্টেশন-মাষ্টার পত্নী দ্বার রুদ্ধ করিলেন।—মন্দা ধীরে ধীরে সরিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল—তাহার জননী কাঁদিয়া উঠিলেন।

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "এখুনি কান্নার হয়েছে কি?—এখনও যে কতটা ভোগ বাকী আছে তাত জানই না!—খুব মেয়ে বিয়ে দিতে এসেছিলে—এখন এই রাত্তিরে ছেলে পিলে নিয়ে চল বুনো সাঁওতালদের বাড়ী—মাথা গুঁজবার ঠাঁই ত একটা চাই?··· আসবার সময় যখনি বাধা পড়েছে, রক্তারক্তি হয়েছে, তখনি জানি একটা বিষম অমঙ্গল হবে"··

ইন্সপেক্টার বলিলেন, "সেসব কথা পরে হবে, এখন আগে দেখুন আপনার মেয়ের হাতে কতটা আঘাত লেগেছে। রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে!"

"রক্ত?—রক্তের কথা আর বল্‌বেন না;—রক্ত দেখেই আজ যাত্রা করেছিলাম—তাই পথে এ বিপদ ঘটল!—আর এই মেয়ে!—হিঁদুর ঘরে মেয়ে যে কি কাল হয়েই জন্ম নেয়—সে যার মেয়ে হয় সেই জানে!—কি রে মন্দা!—কতখানি কেটেছে বল ত?"

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন, "না না আঘাত নিশ্চয় বেশি নয়, বেশ বসে আছে, বেশি হলে ছেলে মানুষ কেঁদে অস্থির হত!—তা আপনি ইচ্ছে করলে ডাক্তারবাবুর বাসাতেও গিয়ে দেখাতে পারেন!—এই কুলি!—বাবুকে ডাক্তারবাবুর বাসা দেখিয়ে দিস্!"—পরে ইন্সপেক্টারের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "চলুন আশুবাবু! ততক্ষণ আমরা চোরটার বন্দোবস্ত করে ফেলি!"

আশুবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "তার আর বিশেষ কি করব? এই আস্‌ছে প্যাসেঞ্জারে ওকে রাজমহলে চালান দিতে হবে। চারজন কন্‌ষ্টেবল্ আছে তার কাছে! ভয় কি?"—

ষ্টেশনমাষ্টার বলিল—"না না! বড় ভয়ানক লোক সে! তাই সাবধান হতে বলছিলাম!—দেখলেন ত দু-দুজন লোককে খুন করবার চেষ্টা করেছে!"

"যা করেছে তা করেছে আর করতে হবে না! এইবার বাছাধন টের পাবেন!—কিন্তু এ ভদ্রলোকটির এখন কি উপায় হয় বলুন দেখি?"—পরে মৃদু হাসিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন—"ডাক্তার যে এই রাত্তিরে বেরোবে তা ত বুঝতেই পারছেন?"

"তা আমিই বা আর কি করব মশায়?"—ষ্টেশন-মাষ্টারের মুখ অপ্রসন্ন। আশুবাবুও কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দবাবু এতক্ষণ কন্যার ক্ষত দেখিতে-ছিলেন—এইবার বলিলেন "না, এ রক্ত সহজে বন্ধ হবে না। মেয়ে আবার বাহাদুরী করে গাড়ী থামাতে গিয়েছিলেন!—বেশ হয়েছে! একরত্তি মেয়ে গিয়েছে ডাকাতের সঙ্গে টক্কর দিতে? যেমন কর্ম্ম—"

তখন ফিস্ ফিস্ করিয়া মন্দার মা বলিলেন, "তুমি কি বলচ?—রক্ত পড়ে মেয়েটা খুন হয়ে যাচ্চে আর তুমি এলে তাকে বক্‌তে?"

"বকব কেন?—কি বল্লাম?—কিন্তু আমি কি করব তাই আগে বল!"

"কেন? একটু চিনি কি দু ফোঁটা সর্ষের তেল হলেও কতকটা রক্ত পড়া বন্ধ হয়। দ্যাখনা কোথাও যদি--"

"চিনি?—রাত্তিরে ত কোথাও ভিক্ষেও মিলবে না চুরি কর্ত্তে যেতে হয়!"

মন্দার মা বলিলেন "কেন? এখানে দোকান নেই?"

তখন সহসা ব্যগ্রভাবে গোবিন্দবাবু বলিলেন—"ঠিক্ বলেছ! ও মশাই! কি আপনার নাম!—আশুবাবু হাঁ ও আশুবাবু! আমার হাতবাক্সটি দিন মশায়!—আমার সমস্ত টাকা কড়ি সব এতেই আছে।"

আশুবাবুর মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি দেখা গেল—ধীর স্বরে তিনি বলিলেন "বাক্স?—এ বাক্স—দেখুন গোবিন্দ বাবু! রীতিমত এন্‌কোয়ারীর পূর্ব্বে এ বাক্স ত আপনাকে দেওয়া হবে না! এ বাক্স নিয়ে এখন ঢের গোল"—

গোবিন্দবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—"কি?—বাক্স আমি পাব না? অ্যাঁ বলেন কি! হাঁ বাক্স যখন চোরের হাত থেকে পুলিশের হাতে গিয়ে পড়েছে তখন ও বাক্স আর পেতে হবে না তা ঠিক জানি!"

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন—"পাবেন বৈ কি নিশ্চয় পাবেন।—কিন্তু আজই—এখনি"—

গোবিন্দবাবু বলিলেন—"বুঝেছি বুঝেছি—আর বল্‌তে হবে না!—পুলিশের হাতে জিনিস্ পড়লে তার খালাসের

উপায়—তা আমার না জানা নয়!—কি করব বাবা! হাতে আর কানা কড়িও নেই যে তোমাদের পূজো করি!"

আশুবাবু কিয়ংকাল নির্ব্বাক থাকিয়া বলিলেন,—"আমাকে এতটা ছোট লোক ভেবে নিচ্চেন কেন? আমার যদি কোন ক্ষমতা থাকৃত তবে আপনার এই অবস্থা দেখে—যাক্ সে কথা পরে হবে এখন"—

"এখন তবে আমি করি কি?—ছেলে মেয়ের হাত ধরে ভিক্ষেয় না গেলে ত একটু নুনও মিল্‌বে না!—দাঁড়াই কোথা—ডাক্তার না হয় চুলোয় গেল!"—এই সময় সম্মুখের ঘরের দরজা খুলিয়া একটি ছোট মেয়ে বাহিরে আসিয়া বলিল "মা এই চিনি পাঠিয়ে দিলেন—আর বল্লেন"—

ষ্টেশনমাষ্টার শুনিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া উগ্রস্বরে বলিলেন—"কি বল্লে তোর মা?—ভারি ত ইয়ে হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি!—চল—" বলিতে বলিতে তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া হাঁকিলেন—"হ্যাঁ গা!"—

আর কথা শোনা গেল না। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল যে তাঁহাদের মধ্যে মৃদুস্বরে কোন বচসা চলিয়াছে—এবং ক্ষণকাল পরেই সশব্দে গৃহদ্বারে অর্গল বদ্ধ হইল।—আশুবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মন্দার মার এতক্ষণও আশা ছিল যে ষ্টেশনমাষ্টারের স্ত্রীর নিকট স্থান পাইবেন কিন্তু এইবার নিরাশ ভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নেহাতই পথে দাঁড়ান অদৃষ্টে ছিল, হা ভগবান!"

গোবিন্দবাবু আশুবাবুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"সকালের এদিকে কি আর ট্রেন আছে বল্‌তে পারেন?—মেল—মেল বুঝি ভোরেই আসে—না?"—

এই সময় মন্দা মাতার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল,—"হাতটা যেন অসাড় হয়ে যাচ্চে মা!"

গোবিন্দ বাবু শুনিতে পাইয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—"বেশ হচ্চে! ফের যদি গোল করেছিস ত তোর ভাল হবে না মন্দা!"—

পিতার মুখভঙ্গী দেখিয়া বালিকা চুপ করিল—তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। তাহার মাতা বলিলেন, "কেন তুমি ওকে অমন কর বলত?—ওর যা হচ্চে তা ওই জানছে। অন্য মেয়ে হলে এতক্ষণ হাট বসিয়ে দিত!—যাও—তুমি একটু জল নিয়ে এস—আমি চিনি বেঁধে দিই?"—মন্দা আর থাকিতে পারিল না।—"ওমা আমার হাত খসে গেল মা!—আর আমি পারছিনে গো!" বলিয়া মুক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল!—

গোবিন্দ বাবু হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া ছিলেন।—মৃদুস্বরে আশুবাবু বলিলেন—"আমার বাসা এই কাছেই—সেখানে আমি একলা থাকি; কোনো স্ত্রীলোক পরিবার সেখানে নেই; তাই আমি বলতে এতক্ষণ ইতস্তত করছিলাম, মনে করেছিলাম, ষ্টেশনমাষ্টারের ঘরেই আপনারা আশ্রয় পাবেন। তা যদি ইচ্ছে করেন ত আমার বাসাতে আস্‌তে পারেন।"—

চমকিত ভাবে গোবিন্দ বাবু বলিলেন—"ইচ্ছে করি ত?—বলেন কি মশায়!—আপনি কি সত্যি এতটা দয়া করবেন?"

হাসিয়া আশুবাবু বলিলেন—"এ আর দয়া কি বলুন? এতবড় বিপদগ্রস্ত আপনি—এ সময় যদি—একটু স্থানও দিতে না পারি"—

"একটু স্থানই আর ক'জন দ্যায়?"—বলিয়া গোবিন্দ বাবু ষ্টেশনমাষ্টারের দ্বারের দিকে চাহিলেন।

আশু বাবু হাসিয়া বলিলেন—"যেতে দিন সে কথা!—আপনারা আমার সঙ্গে আসুন—এই পথ দিয়ে বাইরে চলুন আমি চোরটাকে একবার দেখেই যাচ্ছি?"—

পথে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন আশু একজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া বলিলেন—এ আমাদের মালীর স্ত্রী—আমাদের বাড়ীতে ত স্ত্রীলোক নেই—আর আপনার স্ত্রী কন্যাও কাতর—তাই—"

"বেশ করেছ বাবা—বেশ করেছ! তুমি দেবতা—"

আশু বাবু হাসিয়া বলিলেন—"বটে!—আচ্ছা, মনিয়ার মা!—তুই এঁদের নিয়ে আমার বাসায় যা!—পাঁচুকে বলিস্—সে বিছানা টিছানা ঠিক করে দেবে... ..আমি ডাক্তার বাবুকে নিয়ে শীগ্‌গীর যাচ্ছি!—"

তিনি চলিয়া গেলে চলিতে চলিতে মন্দার মা বলিলেন—"আহা, এ ছেলেটি কে গা?"—

"পুলিশ। কিন্তু সত্যি বড় ভাল লোক,—পুলিশ যে এমন হয় তা আমি জানতাম না।"—

আশুবাবুর বাসাটি ছোট কিন্তু পরিষ্কার; লণ্ঠনের বাতি নামাইয়া তাঁহার ভৃত্য প্রভুর অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল, নূতন অভ্যাগতদের দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কাহাকেও অভ্যর্থনা করিল না। তাঁহারা বারান্দাতেই বসিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আশুবাবু ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ডাক্তার মন্দার হাতের অবস্থা দেখিলেন!—"কোন আশঙ্কা নাই। তবে আঘাত কিছু গভীর ও অনেকক্ষণ ধরিয়া রক্তপাত হইয়াছে সেইজন্য রোগী বড় দুর্ব্বল হইয়াছে—তাহার শুশ্রূষা আবশ্যক" বলিয়া হাতে ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া দিলেন।

গোবিন্দ বাবু মৃদুস্বরে আশু বাবুকে বলিলেন, "ডাক্তার ত ডাকলেন···কিন্তু ভিজিট? আমার কাছে যে—"

বাধা দিয়া আশুবাবু বলিলেন, "সে কথা এখন কেন? আমার বাড়ীতে যখন এয়েছেন"—পরে হাসিয়া বলিলেন, "চলুন মেয়েটির রক্ত বন্ধ হল কিনা দেখি।"—

সে রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিল কিন্তু সকালেই দেখা গেল মন্দার জ্বর আসিয়াছে,—হাতেও খুব ব্যথা, দেখিয়া মন্দার মা হতাশ ভাবে স্বামীকে বলিলেন—"এইবার ত বিষম বিপদ! এখন কি করা যায়?—"

"আমায় কেটে নুন লঙ্কা দিয়ে খাও!··· পরশু বিয়ে—আর আজ এই বনে আমরা পড়ে রইলুম—গহনার বাক্স গেল······সব গেল!—"

মন্দার মা বলিলেন—"বরেরা কি ভাববে? অ্যাঁ? একটা উপায় কিছু ঠাওরাও।"......

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "আমাকে আর একটি কথা বলোনা বল্‌ছি!—থাক্‌বে মেয়ে নিয়ে পড়ে—আমার যে দিকে দুচোখ্ যাবে চলে যাব তাহলে!—"

ভয়ে মন্দার মা নীরব হইলেন।—অনতিদূরে আশু বাবুও দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন—"এক কাজ করুন,—বরপক্ষকে একখানা টেলিগ্রাম দিন্ যে এই অবস্থা—তাঁহারা যেন লগ্নটি আর কিছুদিন পিছিয়ে দেন্! ততদিনে আপনার মেয়ে ভাল হয়ে উঠবেন।—"

"ততদিন? কতদিন?—গহনা ফেরত পাব ত তদ্দিনে?"

আশু বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"গহনা? তা ঠিক্ বলতে পারছিনে·কিন্তু তাতে আর কি—পাবেনই যখন তখন আর কথা কি?"

শুষ্ক হাস্যের সহিত মুখভঙ্গি করিয়া গোবিন্দবাবু বলিলেন—"কথা?—যথেষ্ট কথা আছে! সে বরের বাবা এমন লোকই নয় যে যা পণ করেছে তার একপয়সা কমে মেয়ে নেয়! এ গহনা ফেরত না পেলে মেয়ের বিয়েও বন্ধ!"

আশু কি ভাবিতেছিলেন।—মন্দার মাতা দূর হইতে দেখিতেছিলেন এই পুলিশের বাবুটির বয়স বেশি নয়·· মুখখানিও অত্যন্ত সুকুমার—তাহাকে দেখিলে লজ্জা না হইয়া বরং স্নেহই জন্মায়!—তিনি ঈষৎ ঘোম্‌টা টানিয়া নিকটে আসিয়া আশুবাবুর দুটি হাতে ধরিয়া বলিলেন, "তুমি মনে করলেই ফিরে দিতে পার বাবা!—গরীবদের উপর একটু দয়া কর—ভগবান্ তোমার ভাল করবেন!—"

সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়া আশুবাবু সরিয়া দাঁড়াইলেন,—চকিত দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"সে কথা আপনাকে বল্‌তে হত না মা!—আমার যদি সাধ্য থাকৃত তবে—কিন্তু তা ত হবার জো নেই—এই বাক্স মহকুমায় যাবে··· হয় ত জেলাতেও তলব হতে পারে—গোবিন্দবাবুকেও কিছু বেগ পেতে হবে—তবে গহনা ফেরত পাবেন নিশ্চয়। এখন আর কোন উপায় নেই।"

আশুবাবু নীরব হইলেন। মন্দার মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। গোবিন্দবাবু বলিলেন, "ও মেয়ের বিয়ে থাওয়া সব চুকে গেছে গো? কি আর ভাব্‌ছ ছাই?—ও মেয়ে চিরকাল থুবড়ো হয়েই থাকবে·· ও মেয়ে কি কম অলক্ষুণে······তা যাত্রার সময়ে রক্তারক্তি দেখেই বুঝেছি···"

মন্দার মা গদ্‌গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"মা চণ্ডী, তোমার মনে এই ছিল মা!—"

আশুবাবু বলিলেন, "এখন হতাশ হলে চল্‌বে কেন? এখন প্রধান কর্ত্তব্য হচ্চে বরপক্ষকে একটা খবর দেওয়া—তাঁরা হয় ত প্রস্তুত হবেন—খামোখা ভদ্রলোকদের হায়রান্ করা কেন?—ঠিকানাটা বলুনত দেখি তাঁদের, একটা তার দিয়ে আসি?"······

মন্দার মা বলিলেন,—"তার চাইতে ও বাড়ীর মেজ খুড়শ্বশুরকে তার দিলে ভাল হয় না গা?"—

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "তিনি আর কি করবেন?"—

"কেন? বরের বাপের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে—বলে কয়ে যদি দিনটে ফিরিয়ে দিতে পারেন!"—

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে গোবিন্দবাবু বলিলেন "তোমাদের যাখুসি কর—কিন্তু গহনা না পেলে কিছুতে কিছু হবেনা জেনো!—"

আশুবাবু বলিলেন,—"গহনা ত পাবেনই!—এখন ঠিকানা দুটোই দিন,—বিপদের কথা সকলকেই বলা ভাল!—যদি আপনার আত্মীয়রা কেউ আসেন বা কিছু—"

বিকৃত হাসির সহিত গোবিন্দবাবু বলিলেন—"সে গুড়ে বালি!—আমার আত্মীয়রা তেমন কাঁচা নন!"—তথাপি আশুবাবু ছাড়িলেন না,—ঠিকানা লইয়া চলিয়া গেলেন।—দিনমানে তাঁহার অবসর নাই তথাপি দুই তিন বার আসিয়া মন্দার খবর লইতেছিলেন। ডাক্তার বলিলেন "যদিও কোন ভয় নাই তবু আরোগ্য হইতে প্রায় দশবার দিন লাগিবে।"—

পরদিন দুইখানা টেলিগ্রামেরই উত্তর আসিল; বরের পিতা লিখিয়াছেন "তাঁহার পুত্রের গাত্রহরিদ্রা হইয়াছে—এবং অন্যত্র কন্যা স্থির করিয়া কল্যই বিবাহ!" আর কোন কথা নাই!—

শুনিয়া গোবিন্দবাবু বলিলেন,—'দেখ্‌লে আমি ত বলেইছিলাম যে তারা তেমন পাত্রই নয়!—কন্যার ত আর অভাব নাই—যেমন একটা ছেড়েছে অমনি দশটা ঝাফিয়ে পড়েছে!—তাদের আর ভাবনা কি?—থাক্‌লেন এই মন্দাই—বুড়ো মেয়ে—আবার কোথায় বর পাব—কি কষ্ট—কত কষ্টে এটা হয়েছিল তা ত জানই!"—

মন্দার মা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আগে মন্দা বাঁচুক ত ঢের বর মিল্‌বে!"—

"মরবে? কে?—সেদিকে নিশ্চিন্ত থাক—বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ের কিছু হয় না!"—

মৃদু গর্জ্জনে তাঁহার পত্নী বলিলেন, "তোমার কথা শুনলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়!—নিজের মেয়ে—ও সব বল্‌তে তোমার কি একটুও ব্যথা হয় না?—যিনি জীব দিয়েছেন—"

"সেই ভেবেই তবে চুপ করে থাক!—তিনিই তোমার মেয়ের বর খুঁজে দেবেন!—আমাকে ধরে যদি ফের জামাল্‌পুর আর বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমান আর জামাল্‌পুর—দৌড় করিয়েছ ত জানবে তখন।"—

মন্দার মা আর কোন কথা বলিলেন না,—বিরক্তিপূর্ণ মুখে ছেলেটিকে তেল মাখাইতে লাগিলেন। আশুবাবু চাহিয়া দেখিলেন অনতিদূরে শায়িতা রুগ্না বালিকার মুদিত চক্ষু বহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে!—পাঁচু চাকর তখন ডাকিতেছিল, "মা ঠাক্‌রুন, আখার জ্বাল বয়ে যাচ্ছে—শীগ্‌গির আসুন!"—

গোবিন্দবাবু বলিলেন "দেখুন আশুবাবু!"—কিন্তু মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—আশু চলিয়া গিয়াছেন।—

পাঁচ দিনে মন্দার জ্বর ত্যাগ হইল।—ইতিমধ্যে গোবিন্দবাবু জামাল্‌পুর গিয়া আবশ্যকীয় খরচপত্র আনিয়াছিলেন—কিন্তু আশু কিছুই লইতে স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন "আপনারা আমার অতিথি, অতিথির কাছে কিছু লইলে আমার পাপ হইবে, আমি হিন্দু!"—

মন্দার মা সবিস্ময়ে দেখিতেন এই অপরিচিত যুবক তাঁহাদের প্রতি যে যত্নসমাদর করিতেছে তাহা অত্যন্ত হৃদয়ের সহিত ও তাহা আত্মজনের নিকটও বিরল।—তিনি দিনে দশবার করিয়া তাহাকে—"ভগবান তোমার ভাল করবেন বাবা।" বলিয়া শুভবাচন করিতেন, আশু মৃদু হাসিতেন।

আরও তিন দিন চলিয়া গেল।—সেদিন আশুর আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ডাক্তারের সঙ্গে অনেক বচসার পর পোনের টাকা ফি ও বার টাকা ঔষধের মূল্য দিয়া গোবিন্দবাবুর মেজাজ্‌ অত্যন্ত বিরক্ত, প্রায় বারটার সময় আশুর সহিত বাটী আসিয়া দেখিলেন, মন্দা বসিয়া রুটি খাইতেছে—ও ভাইটিকে একটু একটু খাওয়াইতেছে।—পিতাকে দেখিয়া আরোগ্য লাভের আনন্দে বালিকা মিষ্ট হাসিল, বালক বলিল—"বাবা দিদি উটি খাচ্চে।"

"আমায় স্বর্গে তুল্‌ছেন তা' হলে!"—তাঁহার মুখে স্পষ্ট

বিরক্তি।—স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাত দাও ত,—বারটা বেজে গেছে!"—

মন্দার মা জানিতেন যে তাঁহার স্বামীর সকাল সকাল খাওয়া অভ্যাস—কিন্তু পরের বাড়ীতে ও রুগ্না কন্যার পথ্য দিতে আজ কিছু বিলম্ব হইয়াছে,—ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "এই যে ফেন গড়াচ্চি! বস তোমরা···আমি এই চল্লাম"—

গোবিন্দবাবু যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন,—"ভাত হয় নি তা আমি আগেই বুঝেছি!—রাক্ষসী মেয়ের উদর টাইটুম্বুর করে না ভরে ত আর কারু ভাত পাবার উপায় নেই—এখন বল ত শুনি কতক্ষণ বস্‌তে হবে!— ভদ্রলোকের ছেলে আশুবাবু—তোমার দায়ে তাঁরও পিত্তি চুঁইয়ে গেল"—

আশুও তাঁহাদের স্বজাতি,—এ কয় দিন তিনিও মন্দার মার রান্নাই খাইতেছেন। তাঁহার পাচক কনষ্টেবলটি জল তোলা, বাজার করা প্রভৃতিতে ব্যস্ত ছিল। গোবিন্দ বাবুর কথায় বাধা দিয়া তিনি বলিলেন—"আমার জন্যে ভাবনা কেন করছেন, আমার খাবার কোন সময় বাঁধা নেই—যেদিন যখন জোটে খাই, কোনো দিন বা জোটেও না।"—

"দায়ে পড়েই জোটে না!—নে তোর খাওয়া হল মন্দা? —টাইটুকুও ত জুড়ে বসে আছ!"—মন্দার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল—সে তাড়াতাড়ি—জল খাইয়া থালা তুলিল। রান্নাঘর হইতে তাহার মা বলিলেন,—"ওকি রে মন্দা! উঠ্‌ছিস্ কেন? এই যে এখুনি বস্‌লি! আট দিনের উপোস্—উঠিস্ নি উঠিস নি।" সত্যই তাহার পাতে সমস্ত আহার্য্য পড়িয়াই ছিল, কিন্তু সে আর বসিল না থালা হাতে ধীরে ধীরে কূপের দিকে চলিয়া গেল। ডান্‌হাতে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা,—বাঁহাতে জলের ঘটী ও একটু গোময় লইয়া সে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে বসিতেই আশু বলিলেন—"ও আবার কি?—তুমি এঁটো নিতে এলে কেন?—পাঁচু গেল কোথা?—পাঁচু—পাঁচু!"—পাঁচু নাই। তখন নিকটে আসিয়া ব্যগ্রভাবে আশুবাবু বলিলেন—"ছেড়ে দাও, তুমি জল ঘেঁটোনা!"—"তুই আবার কেন অত করতে গেলি?—এই যে আমিই আস্‌ছি!"—বলিতে বলিতে তাহার মাতাও নিকটে আসিলেন। গোবিন্দবাবু বলিলেন, "একটু বাহাদুরী ত দেখান চাই? জলটল্ ঘেঁটে আবার জ্বর আসুক, আর তুই ব্যাটা ডাক্তারের টাকা গুণে মর!"

মন্দা আর দাঁড়াইল না।—হাতে জল দিয়া ঘরে ঢুকিল।

আহারান্তে পান লইতে গিয়া বিরলে আশুবাবু মন্দার মাকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা গোবিন্দবাবু কি সব দিনই এমনি বকেন আপনাকে?"—

হাসিয়া মন্দার মা বলিলেন, "বকেন বৈ কি বাবা!—ওঁর স্বভাবই অমনি!"—

"আর মেয়েটিকে?—তাকেও কি"—বলিতে বলিতে আশুবাবু একটা ঢোক গিলিলেন, মুখখানি ঈষৎ বিবর্ণ হইল।—মন্দার মা তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "মেয়েকে?—না মেয়েকে কেন অমন কর্ব্বে সব দিন? এই বিয়ের কথার পর—অনেক পণ চেয়েছিল তারা বাবা!—কতকষ্টে গরীবমানুষ গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম,—তারপর এই বিপদ ঘটল,—রুক্ষ মেজাজী মানুষ—সব চোট্ মেয়ের উপরই দিচ্চে—কিন্তু দেখচ ত বাবা মেয়ের আমার কোন দোষ নেই!—কি করব ওর কপালই মন্দ—তা ছাড়া আর কি বল্‌ব!—একটা বর হাতছাড়া হয়ে গেল—এই বিদেশে বাস—ভাব্‌না হয়না মা-বাপের?"—

আশুবাবু আর কিছু বলিলেন না। পান লইয়া চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর বাসায় আসিয়া দেখিলেন গোবিন্দ-বাবু তখন আরও চটিয়া বসিয়া আছেন।—বৈকালের ডাকে দেশের চিঠি আসিয়াছে।—দুগ্ধ ও সন্দেশের জন্য যাহাদিগকে বায়না দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যথাসময়ে সে-সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিল এবং নষ্ট হইয়াছে—অতএব তাহাদিগকে মূল্য সমানই দিতে হইবে নতুবা তাহারা নালিশ করিবে বলিয়াছে!—এইরূপ অনেক দুঃসংবাদ দিয়া গোবিন্দবাবুর কাকা শেষে সেই বরের "শুভবিবাহ জাম্‌ড়া গ্রামের নরনাথ বাবুর কন্যার সহিত নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে!"—লিখিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিয়াছেন!

গোবিন্দবাবুর বকুনি আপ্‌শোষ ও বিরক্তির আর অন্ত নাই!—মেয়ের যে আর বিবাহ হইবে না তাহাও তাঁহার স্থির বিশ্বাস!—মন্দার মাতা বা মন্দা কেহই সেখানে ছিল না।—আশুবাবু নীরবে ঘরে গিয়া লণ্ঠনের আলোকে

কি লিখিতে বসিলেন।—গোবিন্দবাবু তাহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন—আজকালের ছোকরারা লোকের দুঃখ বুঝে না!—তাঁহার এত কথায় লোকটা একটা প্রশ্ন পর্য্যন্ত করিল না!—

অন্ধকারের মধ্যেই আশুবাবু বাহিরে আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি ভাঁজকরা চিঠি দিল। গোবিন্দবাবু বলিলেন "কার চিঠি এল আবার! আবার কার কি চাই! আমাকে সবাই কেটে কেটে ভাগা দিয়ে শেষ করে ফেলুক!"······

আশুবাবু কোনো জবাব না দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোবিন্দবাবু চিঠি খুলিয়া আলোর দিকে ঝুঁকিয়া প্রথমেই নাম দেখিলেন—আশুতোষ রায়!—"তুমি আবার কি লিখেছ আশুবাবু!" আশু তখন দূরে অন্য দিকে চাহিয়া ছিলেন। গোবিন্দ বাবু নীরবে পত্রখানি পাঠ করিলেন। পাঠান্তে আবার আশুর প্রতি চাহিলেন। থামের আড়ালে তাঁহার মুখখানি অর্দ্ধাবৃত।

তাঁহার নিকটে আসিয়া গোবিন্দবাবু বলিলেন, "এ কি সত্যি আশুবাবু!"

আশুবাবু মৃদু হাসিলেন।—গোবিন্দবাবু বলিলেন, "সত্যি কি তুমি মন্দাকে বিয়ে করতে চাও?"—

একবার চারিদিকে ত্বরিত দৃষ্টিপাত করিয়া আশু বলিলেন,—"তাতে আপত্তি কি গোবিন্দ বাবু?—আমিত আপনাদের স্বঘর!"—

"আপনি—বাবা - তুমি ত আমার সব অবস্থাই শুনেছ! এর পরও বিয়ে কর্ত্তে চাও?"—

"আপনার অবস্থা ভগবান আপনায় দিয়েছেন—তার উপর আর কথা নাই! তার জন্যে আপনার মেয়েটি ত কোনো অপরাধ করেনি?—আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি আপনার মেয়েকে ·····আপনার টাকাকে ত নয়!······ আপনি আমাকে অতটা ছোটলোক ভাব্‌ছেন কেন?"—

"ছোটলোক?—দেব্‌তা তবে আর কাকে বল্‌ব?— ওগো—ওগো!—শুনচ?"—

রান্নাঘর হইতে মন্দার মা উত্তর করিলেন, "কাকে ডাক্‌ছ—আমাকে?"—

পুলকচঞ্চলস্বরে গোবিন্দ বাবু বলিলেন,—"এস—হাঁ— শোনই আগে!"

আশু পুনরায় ধীরপদে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

পার্শ্বের কক্ষে মন্দার কনিষ্ঠা ভগ্নী তখন ডাকিতেছিল —"দিদি ওঠনা, দিদি ওঠ্‌না, একটা গল্প বল্‌ আজ! দাই যে সেই গল্পটা বলে! সেই রাজাসেঁ মুলাকাৎ হুয়া—ঘর দিয়া বানায়কে!"

সুশীলকুমার পাঁড়ে।

রূপ ও ধূপ

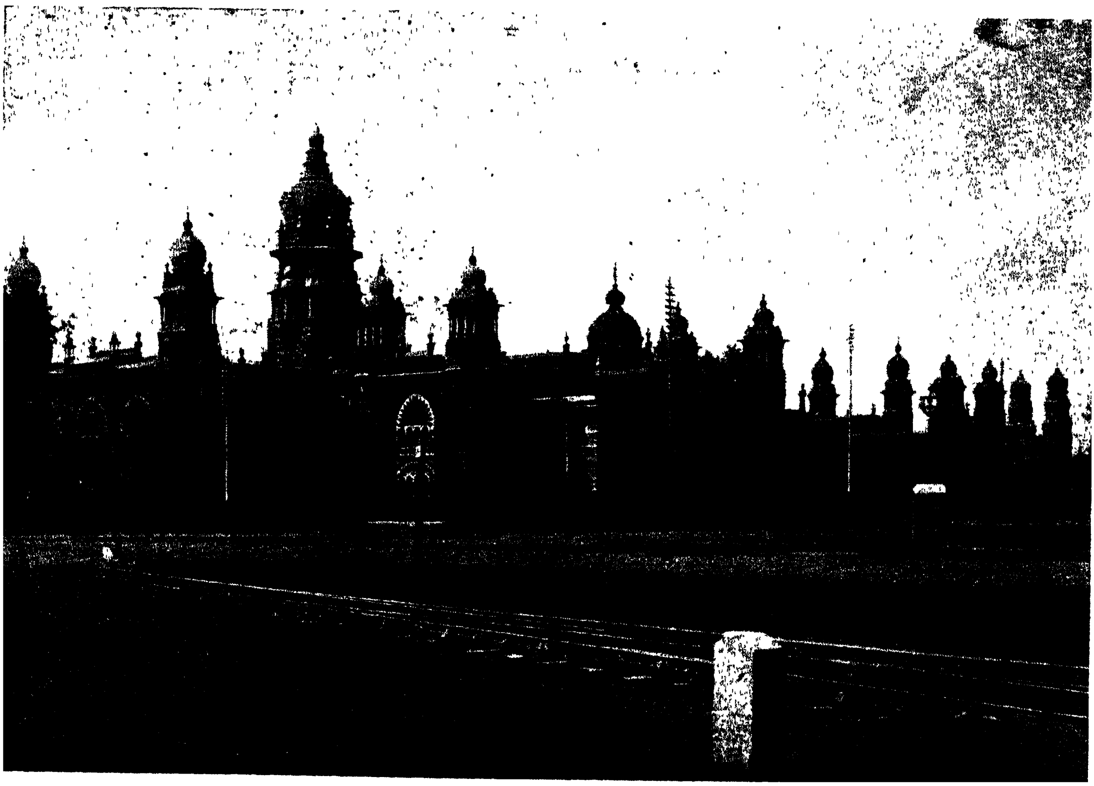
ওগো রূপ,—অপরূপ!
তোমার দেউলে আপনা দহিল
কত যে সুরভি ধূপ।
অচল নিঠুর! চরণের মূলে
তবু একবার চাহিলেনা ভুলে,
পড়িল না দাগ কঠোর তোমার
ধাতুর বক্ষ 'পরে।
কামনা-উজল বদন তোমার,
কিসের গরব? ধূপ আপনার
পরাণের পূত সৌরভ-ধূমে
দিয়েছে মলিন করে'।
ঐ পুড়ে যায়—একটুকু বাকী,
মেল একবার পাষাণের আঁখি,
তুলিতেছে শরে লোচন-রাজীব
তা'ও কি অর্ঘ্য নিবে?
হবে না কি দেহে কৃপা-শিহরণ?
বিঁধিছে বক্ষঃ কেড়ে প্রহরণ!
হোমানলে ঐ ঘেরিয়া ঘুরিছে
আপনা আহুতি দিবে।
ওগো রূপ—অপরূপ!
মেল একবার পাষাণ লোচন,
দহে ম'লো কত ধূপ!

শ্রীকালিদাস রায়।

ভারতীয় স্থাপত্যের দাবী

ফার্গুসন-প্রণীত ভারতীয় ও প্রাচ্যদেশীয় স্থাপত্যবিষয়ক ইতিবৃত্তের (History of Indian and Eastern Architecture) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের গৃহাদি নির্ম্মাণে দেশীয় স্থাপত্যের দাবীসম্বন্ধীয় পুরাতন প্রশ্নটী পুনরায় জনসাধারণের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে।

মর্ম্ম প্রণিধান করিতে পারিলে পাশ্চাত্য শিল্পিগণও যে তদ্দেশীয় স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন, ফার্গুসন অকপটে তাহা বিশ্বাস করিতেন। তাই, এদেশ হইতে বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি এই মত তত্রত্য বিদ্বানমণ্ডলী ও কলাবিদ্‌গণের মধ্যে প্রচার করিতে যত্নবান হ'ন এবং এহেন সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন ভারতীয় শিল্পকে সজীব রাখিবার জন্ম সরকারবাহাদুরকে অনুরোধ করেন। ইহার ফলে, লর্ড্ ক্যানিঙের সময় আর্য্যাবর্ত্তে জেনারেল কানিংহামের

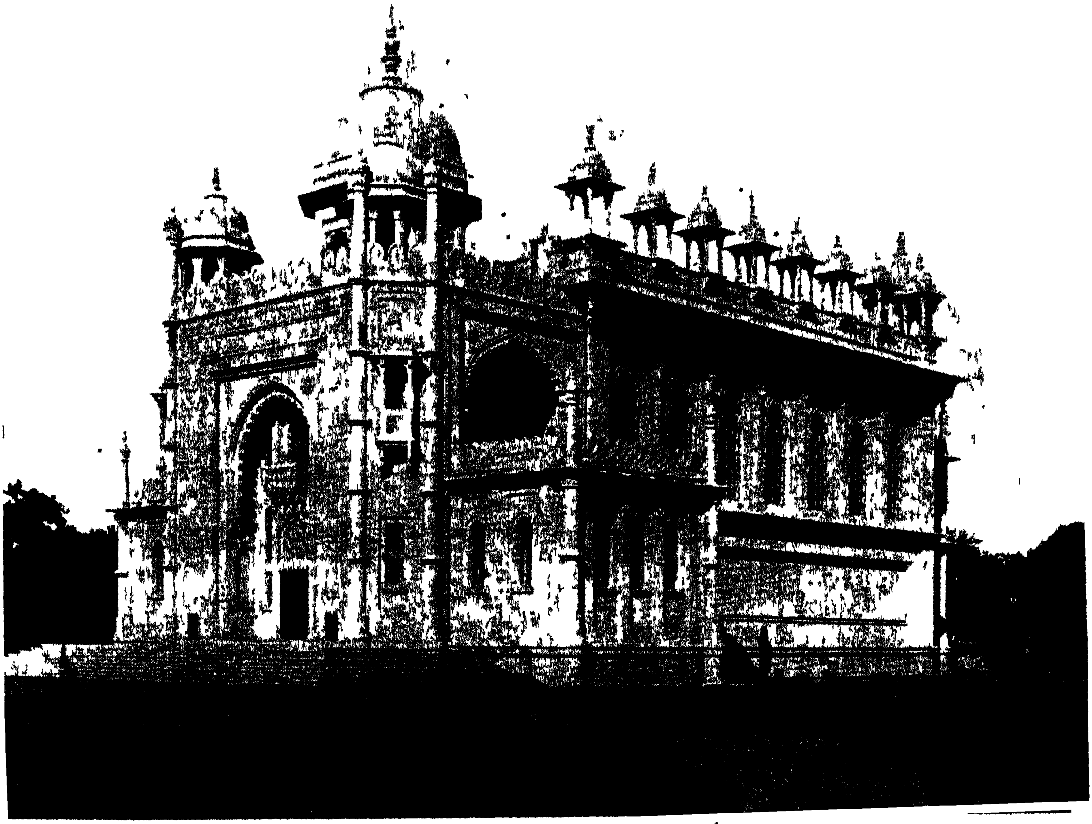


মান্দ্রাজ হাইকোর্ট।

ফার্গুসন সাহেবই সর্ব্বপ্রথম এদেশের স্থাপত্যকলার প্রতি অনুসন্ধিৎসুর চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন; এবং প্রাচ্য সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পরিবর্ত্তমান জনসাধারণের ধর্ম্মমত ও আদর্শের সহিত ইহার সম্পর্ক বিচার করিয়া এই শিল্পটীকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার মতে ভারতীয় বাস্তশিল্পের বিভিন্ন গঠনপ্রণালী বিভিন্ন সূত্রানুযায়ী রচিত এবং ঐ সূত্রগুলির প্রত্যেকটীই বিশেষ ভাবদ্যোতক। ঐসকল সূত্রের

অধীনে আর্কিওলজিক্যাল্ সার্ভে আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় পুরাকীর্ত্তিসমূহকে তালিকাভুক্ত ও সংরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে সরকারবাহাদুর এক ইস্তাহারও জারী করেন এবং প্রাদেশিক জেলাসমূহে নিয়মিত সার্ভের কার্য্য চালাইবার আদেশ দেন। পুরাকীর্ত্তিসম্বন্ধীয় এই বিভাগ লর্ড কর্জ্জনের সময় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ভারতের স্থাপত্যসম্বন্ধে ফার্গুসনের প্রথম গ্রন্থ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পর অনেকেই তাঁহার



ভিক্টোরিয়া-স্মৃতি-সৌধ, মাদ্রাজ।

পন্থা অনুসরণ করিয়া এ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐসকল গ্রন্থে ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যার অশেষ মহিমার পরিচয় পাইয়া দেশ বিদেশ হইতে পর্য্যটকগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং তাজমহল ও দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধস্তূপ-গুলির নয়নাভিরাম কারুকার্য্য দেখিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে থাকেন। দুঃখের বিষয়, ঐ প্রশংসা এযাবত 'পুস্তকস্থ'ই রহিয়া গিয়াছে—কার্য্যক্ষেত্রে ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শ বিস্তার করিবার পক্ষে কেহই কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই।* এদেশের পাব্লিক ওয়ার্ক্স্ ডিপার্ট্মেণ্ট তো গৃহাদি নির্ম্মাণে ভারতীয় আদর্শ বর্জ্জন করিয়াই কার্য্য করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ! বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাই শহরে সরকারী বা বেসরকারী যেসকল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার গঠনপ্রণালী পঞ্চদশ শতাব্দীর বা বর্ত্তমান কালের য়ুরোপীয় আদর্শেরই অনুরূপ। এই আদর্শ অবলম্বনে গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছায় কার্য্য করিয়াছেন, কিংবা শিল্পানভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। তবে ইহার প্রচলন আরম্ভ হওয়ার সময়ে ইহার বিরুদ্ধে কিছুই আন্দোলন যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় মন্দিরটী গ্রীকস্থাপত্যের আদর্শে নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব হয়, তখন ফার্গুসন সাহেব ইহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। এ দেশের গৃহাদি নির্ম্মাণে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের আদর্শ অবলম্বনের প্রয়োজন সম্বন্ধে এক বিচিত্র যুক্তি প্রদর্শিত হয়। ঐ যুক্তি এই যে ভারতীয় বাস্তুশিল্পের আদর্শ মন্দির ও মসজিদাদি নির্ম্মাণের পক্ষেই প্রশস্ত ; অধিবাসিগণের রুচি ও ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হওয়ায় বর্ত্তমানে ভারতের গৃহাদি য়ুরোপীয় আদর্শেই প্রস্তুত হওয়া শ্রেয়ঃ। উল্লিখিত যুক্তিটী যে

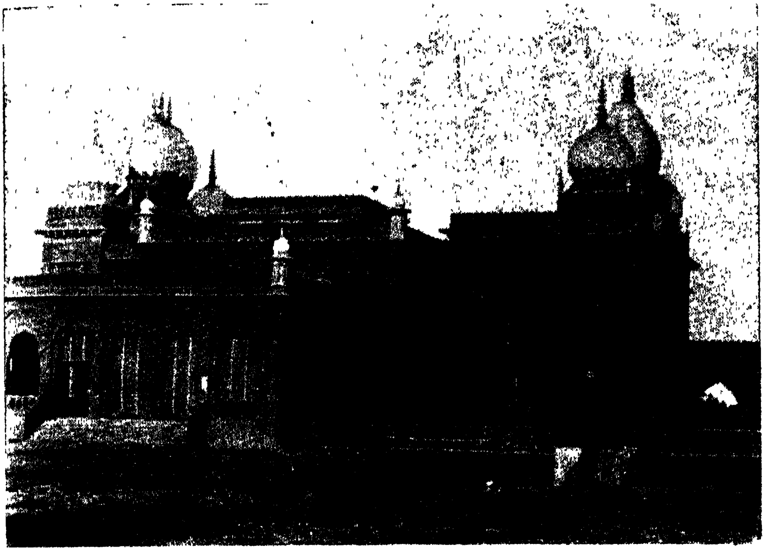


ভিক্টোরিয়া-স্মৃতি-সৌধের সম্মুখ দৃশ্য।

কিরূপ ভিত্তিহীন, তাহা পাব্‌লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টেরই কতিপয় যোগ্য কর্ম্মচারী, মান্দ্রাজ ও জয়পুরে কয়েকখানি সরকারী গৃহ ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শে প্রস্তুত করিয়া, বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে কয়েকখানি সরকারী আপিসের চিত্র সন্নিবেশিত করিলাম, তাহা হইতেও ইহার অসারত্ব প্রমাণিত হইবে।

য়ুরোপীয় স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক আর একদল লোকের এ সম্বন্ধে অভিমত আরো অদ্ভুত। ঐ দলের অন্যতম নেতা মিঃ রোজার্ স্মিথ্, এফ্-আর-আই-বি-এ, মহোদয় বলেন—

'ভারতীয় স্থাপত্য ভারতবর্ষের আবহাওয়ার পক্ষে উপযোগী হইলেও, ভারতে সুনিপুণ বাস্তুশিল্পীর অভাব না থাকিলেও, এবং ঐ শিল্প স্বভাবতঃই সুন্দর হইলেও—উহার বিরুদ্ধে এই উত্তরই যথেষ্ট যে, উহা



তাঞ্জোরের কালেক্টরী।

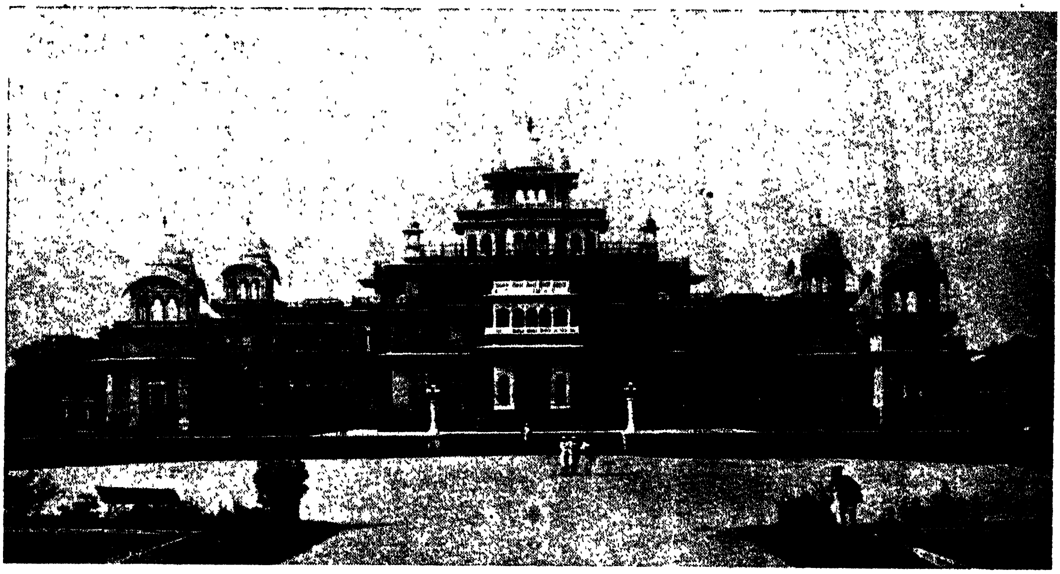
বিলাতী ধরণের তো নহেই, উহার মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবেরও আভাস পাওয়া যায় না।'

ভারতীয় শিল্পের তথা-কথিত পৃষ্ঠপোষক লর্ড কর্জ্জনও এবিষয়ে মিঃ স্মিথের সহিত একমত। ভিক্টোরিয়া-স্মৃতি-মন্দিরের গঠনপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার প্রস্তাব যখন কর্জ্জনের নিকট উপস্থিত করা হয়, তখন তিনি বাকচাতুর্য্যে তাহা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। অতঃপর জনৈক অভিজ্ঞ শিল্পীর সহায়তায় এদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থপতিকারের সন্ধান লইয়া তদ্দ্বারা ঐ মন্দিরের পরিকল্পনা রচনা করা সম্বন্ধে হ্যাবেল সাহেব যখন তাঁহাকে পরামর্শ দেন, তখন তিনি এই বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করেন যে, 'কলিকাতা য়ুরোপীয়দের রাজধানী, সুতরাং এস্থানে ভারতীয় আদর্শে গৃহ নির্ম্মিত হইলে বেমানান হইবে।'

লর্ড কর্জ্জনের এই কথায় আসল গুমর একেবারেই ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে। যাক্ সেজন্য আমাদের হতাশ্বাস হওয়ার কারণ নাই। চিরদিন কাহারই সমান যায়না—ভারতীয় শিল্পলক্ষ্মীরও চিরদিন এইরূপ দুর্দ্দশায় অতিবাহিত হইবে না। ইতিমধ্যেই পাব্‌লিক্ ওয়ার্ক্‌স্ ডিপার্ট্‌মেন্ট্ আপনাদের ভুল কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন। বিগত ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে, রয়েল্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ ব্রিটীশ আর্কিটেক্‌ট্‌স্‌এর এক সভায় ভারত-গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন স্থাপত্যমন্ত্রী (Consulting Architect) জেম্‌স্ র‍্যান্‌সাম্ ভারতের আবহাওয়ার পক্ষে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুপযোগিতা প্রমাণ করিতে যাইয়া স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন —

'ভারতের স্বভাব-সুন্দর দৃশ্যাবলীর পার্শ্বে গথিক বা ডোরিক ধরণে নির্ম্মিত গৃহগুলি এমন অসমঞ্জস ও অশোভন দৃষ্ট হয় যে, যাঁহার কিছুমাত্র সৌন্দর্য্যবোধ আছে, তিনিই তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন। ঐসকল গৃহের গঠনপ্রণালী একদিকে যেমন কর্ত্তৃপক্ষের বীভৎস রুচির পরিচায়ক, অন্যদিকে পাব্‌লিক ওয়ার্ক্‌স্ ডিপার্টমেণ্টেরও দুরবস্থার সাক্ষীস্বরূপ। দেশীয় বাস্তুশিল্পের অভাব প্রযুক্ত ভারতের স্থপতিকার্য্যে পাশ্চাত্য আদর্শ অবলম্বিত হইয়া থাকে, এ কথা কেহ বলিলে বিষম ভুল করিবেন; কারণ, হিন্দু ও মুসলমানী স্থাপত্যের বহু নমুনা এখনও ভারতের অনেকস্থলে বিদ্যমান আছে। ঐ নমুনা একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির সহিত বেশ মানানসই, অন্যদিকে দেশের আবহাওয়ার পক্ষেও সম্পূর্ণ উপযোগী।'

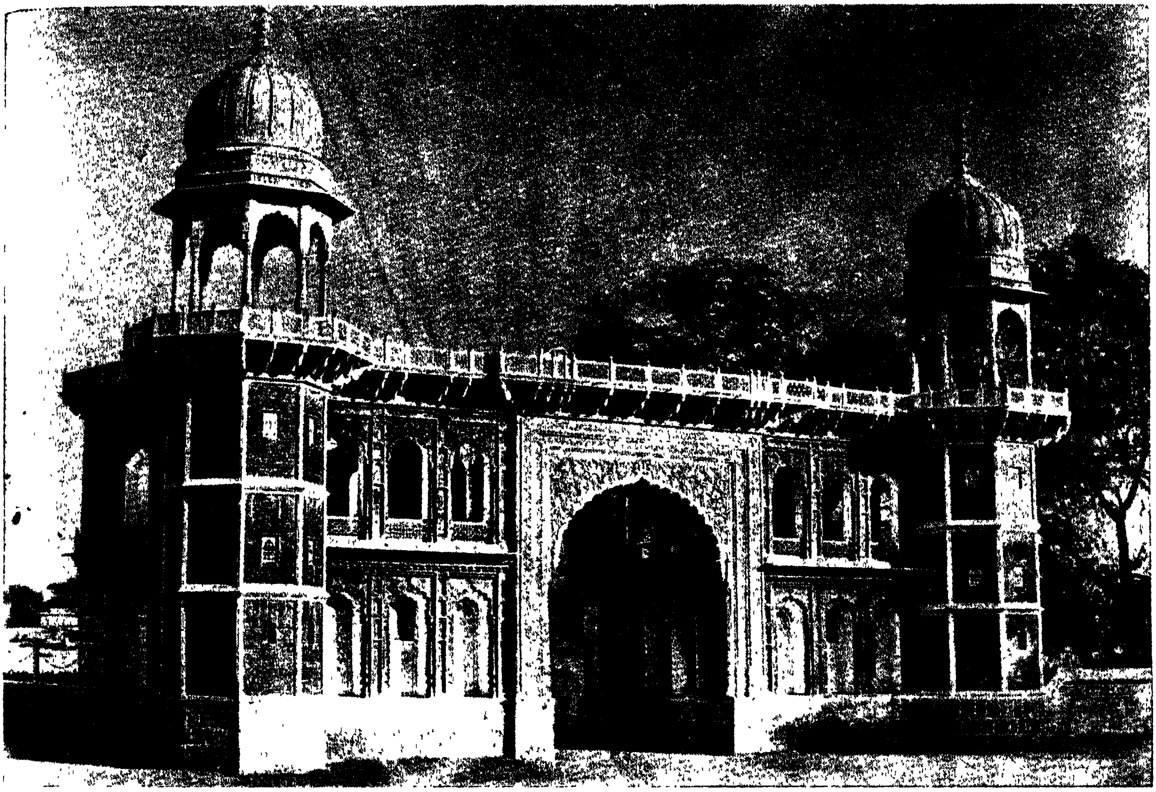
বহুদিনের জড়তাসত্ত্বেও এদেশের কারিগরগণ যে এখনও সূক্ষ্ম স্থপতিকার্য্যে নিপুণতা দেখাইতে সমর্থ, এবং, কার্য্যক্ষেত্রে অবলম্বিত হইলে, ভারতীয় বাস্তুশিল্পের আদর্শ যে বর্ত্তমান কালেরও রুচির অনুরূপ হইতে পারে, বহুস্থলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রাসিংটন্, আর্‌উইন্, হেরিস প্রভৃতি ইঞ্জিনিয়ারগণের উপদেশানুসারে প্রাচ্য প্রণালীতে রচিত মান্দ্রাজের হাইকোর্ট মন্দির, ওয়াই-এম্-সি-এ গৃহ, এগ্‌মোর ষ্টেশন এবং মুর বাজার এ বিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত। মান্দ্রাজের ভিক্টোরিয়া-স্মৃতিমন্দিরটী দাক্ষিণাত্যের স্থপতি-সূত্রানুসারে পরিকল্পিত হওয়ায় কারুকার্য্যে ও গঠন-সৌন্দর্য্যে বিশেষ নয়নাভিরাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মন্দিরের সম্মুখাংশের রমণীয় শোভা স্থপতিকারের শিল্পপটুতার প্রধান নিদর্শন। তাঞ্জোরের কালেক্টরী ও মাদুরার মিউনিসিপাল্ বাজার প্রভৃতি কতিপয় গৃহের গঠনপ্রণালীও প্রাচ্যস্থাপত্যের একতম দৃষ্টান্তস্থল। এই দৃষ্টান্ত জয়পুরের আলবার্ট হলে অধিকতর রমণীয়রূপে প্রকটিত। এই হলটি পুরাশিল্পের মিউজিয়ম।



আলবার্ট হল, জয়পুর।



বুলন্দশহরের প্রথম সৌধ।

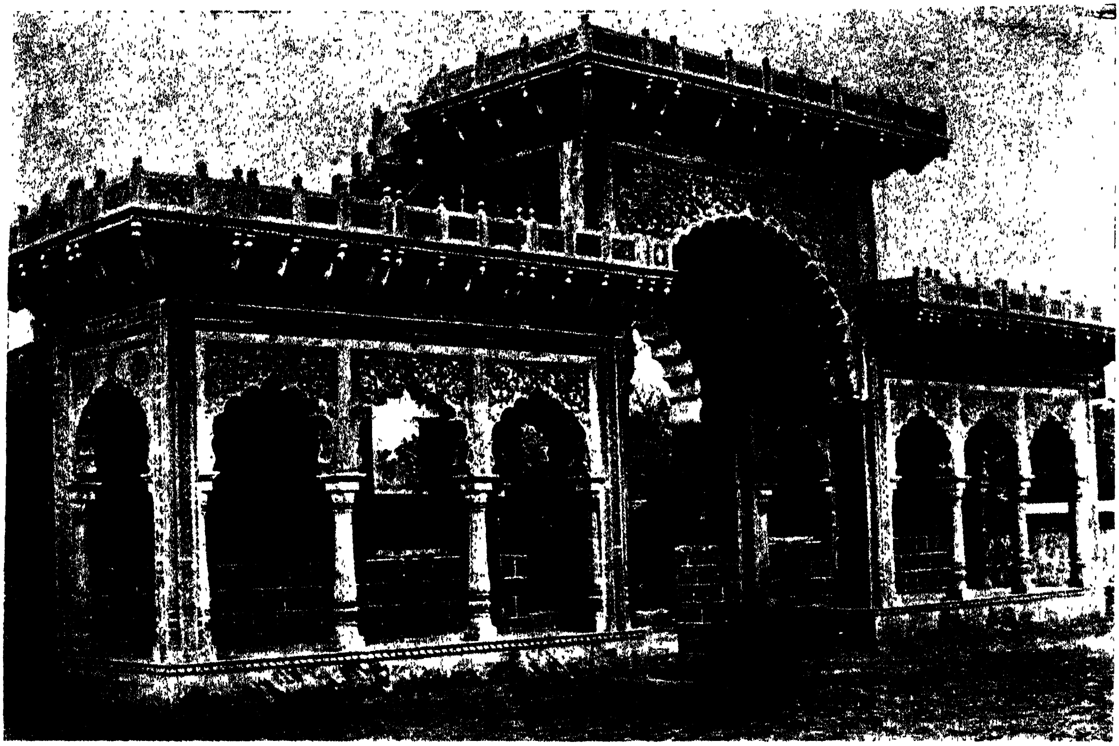


বুলন্দশহরের দ্বিতীয় সৌধ।

ইহাতে যেসকল সুন্দর সুন্দর শিল্প-নমুনা রাখা হইয়াছে মন্দিরটি তাহার উপযুক্ত ও চমৎকার আধার।

বর্ত্তমানকালে এদেশের যেসকল স্থানে প্রাচ্যস্থাপত্যের আদর্শে নির্ম্মিত গৃহাদি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে বুলন্দশহরের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৮ সালে এফ. এস্. গ্রাউজ নামক জনৈক বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ান এই শহরে প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনিই সমগ্র শহরটী ভারতীয় আদর্শে গঠিত করিবার উদ্দেশ্যে খাঁটী দেশীয় মিস্ত্রী দ্বারা উহার সংস্কার আরম্ভ করেন। ফলে, অল্পদিনের মধ্যেই ইহার অধিকাংশস্থলে চারু কারুকার্য্যখচিত বহু হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয় এবং সূক্ষ্ম বাস্তুশিল্পের মহিমায় এ স্থানটী সমগ্র প্রদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এই শহরটীরই অন্তর্ভুক্ত মিউনিসিপাল্ উদ্যানের ক্ষুদ্র দ্বার ও বাজার-তোরণটীকে লক্ষ্য করিয়া বিলাতের সোসাইটী অব্ আর্ট্সের সভায় মিঃ পার্ডন্ ক্লার্ক্ ভারতীয় স্থাপত্যের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মিঃ গ্রাউজ বুলন্দশহরকে প্রাচ্যস্থাপত্যের আদর্শে গঠিত করিয়া বিকৃতরুচি জমিদার ও জনসাধারণকে দেশীয় শিল্পের রমণীয়তা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু এ কার্য্যে তিনি পাব্লিক্ ওয়ার্ক্স্ ডিপার্টমেণ্টের অনভিমতে দেশীয় মিস্ত্রীর সহায়তা গ্রহণ করায় কর্ত্তৃপক্ষের অজস্র তিরস্কার লাভ করেন এবং ১৮৮৪ সালে হঠাৎ বদলীর পরওয়ানা পান। এই ঘটনায় ভারতের লুপ্তপ্রায় বাস্তুশিল্পের পুনরুদ্ধার কল্পে গ্রাউজের চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। তিনি তাই এদেশের শিল্পিবৃন্দের দুরবস্থার কথা স্মরণপূর্ব্বক আক্ষেপ সহকারে বলিয়াছেন—

'দেশীয় জনবৃন্দের নিকট ইহাদের উৎসাহ পাওয়ার আশা তো নাই-ই; সরকারী গৃহাদির নির্ম্মাণকার্য্যে অতঃপর ইহাদিগকে নিয়োগ করা সম্বন্ধেও কর্ত্তৃপক্ষের নিষেধপত্র প্রচারিত হইল। অথচ শিবপুর ও রুড়্কি-ফেরত যেসকল ইংরেজিনবীশকে নিয়োগকালেই আড়াই শো মুদ্রা মাসহারা দেওয়ার বরাদ্দ আছে, শিল্পজ্ঞানে বা শিল্পরচনায় এই-

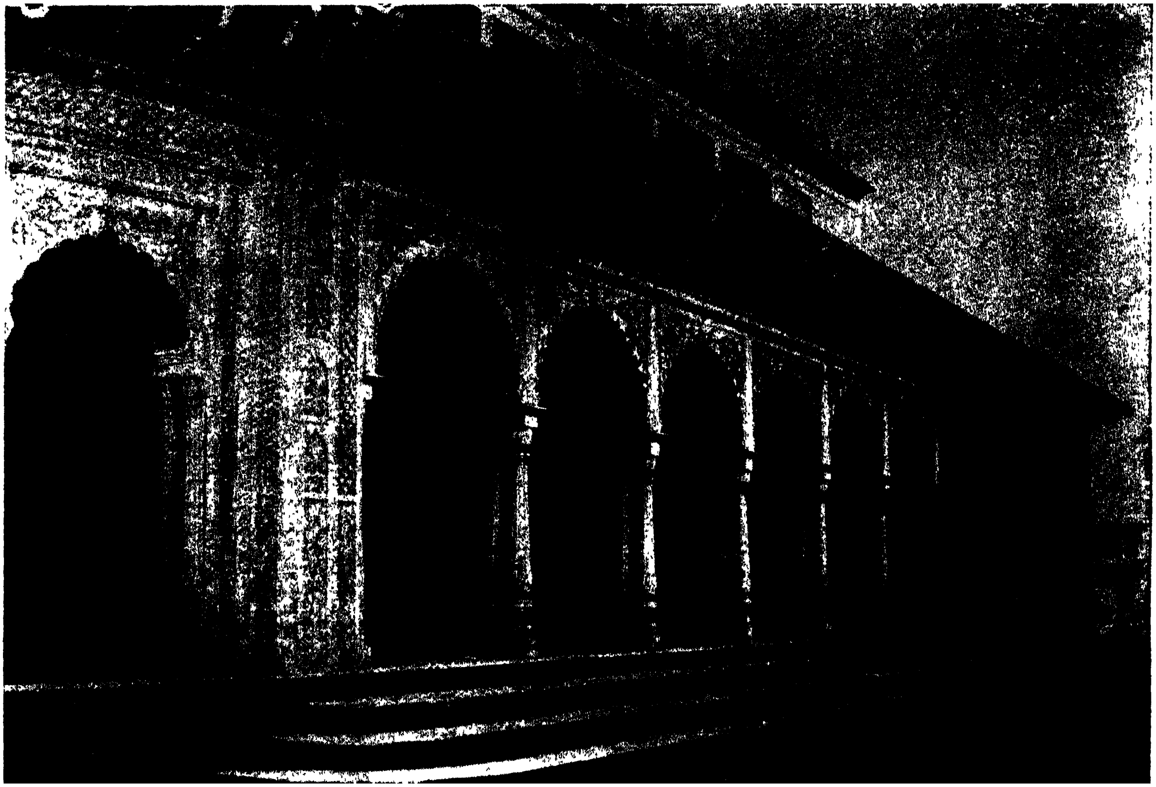


বুলন্দশহরের তৃতীয় সৌধ।

সকল নিরক্ষর কারিগরগণ তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।'

বুলন্দশহর, মান্দ্রাজ, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের যেসকল বাস্তুশিল্পের কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহাদের গঠনপ্রণালী প্রধানতঃ মুসলমানী স্থাপত্যের অনুরূপ। হিন্দুস্থাপত্যের নমুনা দাক্ষিণাত্যে—বিশেষতঃ উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরে—প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। হ্যাবেল সাহেব তাঁহার গ্রন্থে হিন্দুকৃত প্রস্তরশিল্পের আদর্শস্বরূপে পুরীর এমার মঠ ও জাজপুরের বিরজামন্দিরের নামোল্লেখ করিয়াছেন। পুরাকীর্ত্তি বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ মার্স্যাল্ ১৯০২—১৯০৩ সালের সরকারী বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে লিখিয়াছেন—'ভুবনেশ্বরে এখনও এমন কারিগর আছে যাহারা প্রাচীনকালের ন্যায় সূক্ষ্ম-প্রস্তর-শিল্পের কার্য্যে সুনিপুণ।' দুঃখের বিষয়, যেসকল মিস্ত্রী ভুবনেশ্বর ও কনারকের বিখ্যাত মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া জগতে অশেষ শিল্পকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে, উৎসাহ ও কর্ম্মের অভাবে অধুনা তাহাদের সন্তানগণ মার্চেন্ট্-আপিসের কেরাণীগিরীর সন্ধানে ব্যাপৃত! এদেশের ধনকুবেরগণ ও শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা গৃহনির্ম্মাণে প্রতি বৎসরই অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, অথচ একটীবার কার্য্যের পরীক্ষা লইবার জন্যও উহার একটী টাকা দেশীয় শিল্পীর হাতে দিতে রাজী নহেন! এবিষয়ে মান্দ্রাজের চেটীসম্প্রদায় সকলের আদর্শ হওয়ার যোগ্য। এই সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিবর্গ লেখা পড়ায় গণ্ডমূর্খ হইলেও, দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে অসাধারণ যত্নশীল। ইহারা চিদাম্বরম্, রামেশ্বরম্, কঞ্জিবরম্ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে স্বদেশীয় কারিগর নিযুক্ত করিয়া হিন্দুস্থাপত্যের উৎকর্ষ বিধানে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

মথুরা, ভরতপুর, যোধপুর, বিকানীর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে হিন্দুস্থাপত্যের অধিকার অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। গত বৎসর এলাহাবাদ শিল্প প্রদর্শনীতে ঐসকল স্থানে প্রচলিত শিল্পের যে নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছিল,



বুলন্দশহরের চতুর্থ সৌধ।

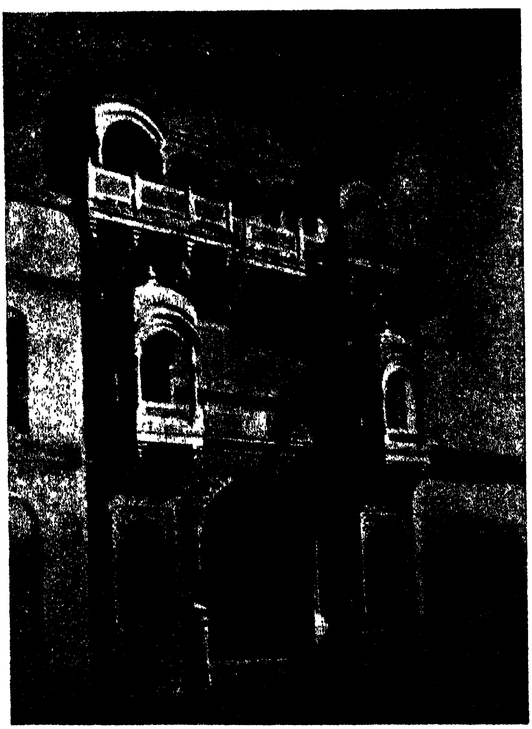
তাহা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠতম। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বারাণসীতেও গৃহরচনায় হিন্দুস্থাপত্যের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ মধ্যে আমরা কাশীর যে প্রস্তর তোরণের চিত্রটী সন্নিবেশিত করিলাম, তাহা হিন্দু স্থাপত্যের আদর্শে গঠিত; উহার পরিকল্পনা মাধোপ্রসাদ নামক জনৈক দেশীয় শিল্পীর রচিত এবং তদনুসারে তোরণটী মন্নু নামক একজন হিন্দু মিস্ত্রীর কীর্ত্তি।

শুনা যায়, ঢাকার লাটপ্রাসাদ নির্ম্মিত হওয়ার পর ভারতে সরকারী গৃহরচনার প্রণালী নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উঠিয়াছে; এবং গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান স্থাপত্যমন্ত্রী মিঃ বেগ্ এ বিষয়ে প্রচলিত রীতির পরিবর্ত্তন অনুমোদন করিয়া স্বীয় মন্তব্য সরকারে দাখিল করিয়াছেন। লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটীর সভ্যগণ ভারতের পুরাকীর্ত্তিসমূহের সংরক্ষণ ও স্থপতিকারগণের নাম ধামাদি সংগ্রহ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার প্রার্থনায় ভারতসচিবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন —উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রার্থনা যথারীতি ভারতসরকারে জ্ঞাপন করা হইবে। সম্প্রতি বড় লাটসাহেব মহামান্য লর্ড হার্ডিং একটি বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে নূতন দিল্লী সংরচনায় দেশীয় স্থাপত্যরীতি অনুসারেই গৃহাদি নির্ম্মিত হওয়া যে উচিত তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত।

এ সমস্তই কিঞ্চিৎ আশার কথা। ইহার উপর আমাদের সম্মুখেও কয়েকটী সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাতে যাহাতে চিত্রবিদ্যা ও স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়, তজ্জন্য এখনই চেষ্টা হওয়ার আবশ্যক। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় ঐ স্থানে যেসকল হর্ম্ম্য ও গৃহনির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়াছে তাহার কতকাংশও যাহাতে যুক্তপ্রদেশের বিচক্ষণ কারিগর দ্বারা সম্পন্ন করান হয়, তৎসম্বন্ধে সরকারবাহাদুরকে বিশেষ ভাবে



বুলন্দশহরের মিউনিসিপাল উদ্যানের তোরণ।



কাশীর একটি প্রস্তর তোরণ।

অনুরোধ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। দিল্লী ভিন্ন উড়িষ্যা-বিহারের নূতন রাজধানী ও সরকারী গ্রীষ্মনিবাস, এবং আসামের সরকারী গৃহাদিও নূতন গঠিত হইবে। এক্ষেত্রেও ভারতীয় শিল্পলক্ষ্মী আশা ও ঔৎসুক্যে সরকার বাহাদুরের বিচারের অপেক্ষায় চাহিয়া আছেন। বলা বাহুল্য সরকার-বাহাদুর এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উদারতা প্রদর্শন করিলে ভারতীয় প্রজাবৃন্দ তাহাকে রাজার শ্রেষ্ঠতম দান (Boon) বলিয়া মনে করিবে। কলিকাতায় বাসগৃহাদির সংস্কার-কার্য্য অচিরেই আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। সে সময়ে এ দেশেরই জনবর্গের বাসপল্লীর অধিকতর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে। ভারতবাসিগণ তখন যদি বাস্তুশিল্প সম্বন্ধে "স্বদেশী প্রতিজ্ঞা" গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশীয় কারিগরগণের প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষপাত করেন তবেই উপেক্ষিতা শিল্পলক্ষ্মী ও দুঃস্থ শিল্পজীবী উভয়ের যথেষ্ট হিত সাধিত হয়। শিবপুর বা রুড়কির সার্টিফিকেটধারী ইংরেজীনবীশগণের সহিত তুলনায় এ দেশীয় শিল্পিগণ যে কোন অংশে হীন নহে, তাহা দার্ঢ্যসহকারে বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে রুচিবিজ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতায় কাহার শ্রেষ্ঠত্ব অপরাজিত, কলেজ স্কোয়ারের ব্যাপ্‌টিষ্ট্‌ মিশন হাউস ও সার্কুলার

রোডের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরের গঠনবৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

ভারতের স্থাপত্যশিল্পের সহিত অন্যান্য সূক্ষ্মশিল্পের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং এই শিল্পের উৎকর্ষ না ঘটিলে ভারতের অন্যান্য শিল্পগৌরবও অচিরে লুপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান ভারতে সমাজসংস্কার, ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতির যতটা প্রয়োজন, স্থাপত্যসংস্কারের আবশ্যক তদপেক্ষা ন্যূন নহে।*

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

রজনী

নামিয়া এসেছে রাতি,
হৃদয় খুলিয়া বসিনু আজিকে
তাহারে করিয়া সাথী।
নামিয়া এসেছে রাতি!

আহা, আকাশ সাগরে বেয়ে আসে আজ
কেরে ও জ্যোৎস্নাতরী,
তারি তোলা ঢেউ মাণিকের দাম
চলেছে মাথায় করি!

ঘুমভরা যত ফুলের উপরে
পরীরা নাচিয়া গায়,
অই তাহাদের মঞ্জীর-ধ্বনি
বুঝি আজ শোনা যায়!

বাজে বীণা বাজে মৃদুল মধুর
চরাচর মূরছায়!
ওরে এমন রজনী—ফুল্ল কুসুম,
মধু যে উছলি যায়।

সে মধুসাগরে সিনান করিয়ে
কে তুলে মিলন-তান,
রজনী ধরণী আকাশে বাতাসে
এক হতে চায় প্রাণ!

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

* মডার্ণ রিভিউ হইতে সঙ্কলিত।

মৌনীবাবা*

স্বভাবসাধু, আজন্মবৈরাগী আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপনে অনিচ্ছুক ভগবদ্ভক্ত মৌনীবাবা চিরদিন আপনাকে একান্তে মানবচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এমন প্রদর্শনপ্রবৃত্তিবিহীন মানুষকে আমরা প্রকাশ করিব কি করিয়া? তাঁহার কোন গুণ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি অসম্ভব; বরং সে মহজ্জীবনের নির্লিপ্ত বৈরাগ্য, ঐকান্তিকী ব্যাকুলতা, গভীর ঈশ্বরানুরাগ সম্যক প্রকাশ করিবার সুযোগ ও সামর্থ্য নাই, ইহাই একান্ত ক্ষোভের বিষয়। যে মহাসাধনার জন্য সে জীবন এ সংসারে প্রেরিত হইয়াছিল, শিশুকালেই তাহার বিশেষত্ব আত্মীয় পরিজন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সঙ্গিগণ যখন খেলার আনন্দে মত্ত থাকিত এই শিশু-সাধু তখন একান্তে দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে তাহা দেখিতেন। উত্তরকালে ইনি ওঁকারনাথ পর্ব্বতে জীবনের শেষ পঞ্চ বর্ষকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। জীবনের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে একই ভাব, একই উদ্দেশ্য এই সাধুজীবনের বিশেষত্ব ঘোষণা করিতেছে। এমন সাধুচরিত্র প্রকাশ করিলেও পুণ্য, পাঠ করিলেও পুণ্য লাভ হয়। এইজন্য আমরা অযোগ্যতা সত্ত্বেও ভক্তি-নতশিরে যথাসাধ্য সেই পূতচরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মৌনীবাবার পিতা।

১২৬৩ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী আজুদিয়া গ্রামে গোপজাতীয় এক ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারে সাধু প্যারীলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভক্ত শিবনাথ ঘোষ মহাশয় বাল্যকাল হইতে বৈরাগ্যপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জীবনের দুইটী বিশেষ ঘটনা নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। শিবনাথের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহাদের বাসগ্রামে এক সন্ন্যাসী আগমন করেন। শিবনাথ তাঁহার সঙ্গ লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইবেন স্থির করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। জ্যেষ্ঠ ইহাতে আপত্তি করিয়া তাঁহাকে বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু বালক শিবনাথের বিষয়-বিমুখ হৃদয় তাহাতে সম্মত হইল না। জ্যেষ্ঠ বিরক্ত হইয়া বলিলেন:—"যদি বিষয়কর্ম্মে মন না দাও তবে বিষয়ের এক কপর্দ্দকও পাইবে না—ইহা লিখিয়া দিয়া যাও।" শিবনাথ অগ্রজের ইচ্ছানুরূপ লিখিয়া দিলেন। সেইদিন হইতে তিনি অবিষয়ী হইলেন।

আর একটী ঘটনা এই:—শেষ জীবনে প্যারীলালের সংসার ত্যাগের সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ঠিক ঠিক, আমার যা আগেই করা উচিত ছিল প্যারী তাহা করিয়া আমাকে বড় লজ্জা দিয়াছে।" এই বলিয়া ভারতের পুণ্যতীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছায় ভক্ত শিবনাথ সেই যে গৃহ ছাড়িলেন, আর ফিরিলেন না। সপ্তদশ বৎসর অতীত হইয়াছে শিবনাথ নিরুদ্দেশ। আজ তিনি এ লোকে কিম্বা লোকান্তরে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এরূপ পিতার পুত্র প্যারীলাল যে স্বভাব-সাধু হইবেন তাহা বলা বাহুল্য।

* এই প্রবন্ধ শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ প্রণীত "মৌনীবাবা" নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইল। প্রবন্ধের ভাব ও ভাষা—উভয়ের জন্যই লেখক গ্রন্থকর্ত্রীর নিকট ঋণী।

শিক্ষা ও শিক্ষকতা।

ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া প্যারীলাল পাবনা জেলা স্কুলে পড়িতে যান। এই স্থানেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পাবনায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি রাজসাহী কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া তিনি প্রথমে জলপাইগুড়ী ও পরে সদ্যপুষ্করিণী (রংপুর) গমন করেন। শেষোক্ত স্থানেই তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের আরম্ভ এবং তথায়ই তাহার শেষ হয়।

প্রচার ও সন্ন্যাস।

নরসেবা প্যারীলালের একটী নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল। আর তিনি বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলেই রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ী, সৈদপুর, নিলফামারী, শিলিগুড়ী, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ বহির্গত হইতেন। কিন্তু এরূপ প্রচারে তাঁহার তৃষিত আত্মা পরিতৃপ্ত হইল না, অনুক্ষণ ভগবৎসঙ্গ লাভের জন্য তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল এবং এইরূপ নিত্যযুক্ত অবস্থা লাভের পূর্ব্বে প্রচার করাকে তিনি গুরুতর আত্মবিনাশের কার্য্য বলিয়া অনুভব করিলেন; তিনি বলিতেন "আগে অধিকারী হই।" বাল্যকাল হইতেই প্যারীলাল সংসারবিমুখ ছিলেন; পত্নীবিয়োগের পর এই সংসার-বিমুখতা আরও বর্দ্ধিত হইল। অবশেষে সকলত্যাগী অনন্যকর্ম্মা হইয়া তপস্যা করিবেন বলিয়া সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

"জনসমাজই ধর্ম্মসাধনের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র"—বন্ধুগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। বিনয়ী প্যারীলাল শত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেন নির্জ্জন সাধনের আবশ্যকতা কত বেশী। বুদ্ধ সাত বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সত্য লাভ করেন, খৃষ্ট ৪০ দিন ৪০ রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় তপস্যা করেন, মহম্মদ আড়াই বৎসর হেরা পর্ব্বতের উপরে গভীর তপস্যা করিয়া মহান্ ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এইসকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগকে যদি এত কঠোর সাধন করিয়া ধর্ম্ম লাভ করিতে হইয়াছিল, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের তদপেক্ষা কত অধিক সাধনার দরকার আছে; এই সমুদয় কথা বলিয়া তিনি আত্মীয়স্বজনদিগকে কত বুঝাইতেন। অবশেষে তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন।

নরসেবা এবং ব্রহ্মনিষ্ঠা।

সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই প্যারীলালের জীবনে ধর্ম্মভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নরসেবা তাঁহার জীবনের একটী বিশেষ ব্রত ছিল এবং অবসর পাইলেই তিনি প্রচারার্থ বহির্গত হইতেন। কোন বন্ধু কিম্বা কোন পরিবার রোগ, শোক কিম্বা অন্য কোন প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইলে, প্যারীলাল তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন। উৎসব এবং অনুষ্ঠানে বন্ধুবান্ধব তাঁহার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিতেন। মৌনীবাবার জীবনচরিতে কয়েকখানা চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে; এই চিঠি হইতে ২।১টা ঘটনা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ লিখিয়াছেন:—

"সময়ে সময়ে কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া তাঁহাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর সেবার জন্য কোন কোন স্থানে যাইতে দেখা গিয়াছে। সেবায় তিনি বড় আনন্দ পাইতেন। এজন্য কখন নিজের হাতে রন্ধন করিয়া পরিজনবর্গকে আহার করাইতেন। গরমের সময়ে আহারে বসিলে নিজের হাতে না হইলে অপরের দ্বারা বাতাস করাইতেন। এই ঘটনায় সময়ে সময়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতাম কিন্তু কিছুতেই নিবৃত্ত করাইতে পারিতাম না। একদিনের কথা মনে আছে। সে দিন রবিবার খুব বৃষ্টি হইতেছিল। ভোরে উঠিয়া দেখি তিনি ধ্যানে মগ্ন। দেখিতে দেখিতে ১২টা বাজিয়া গেল, তবু আসন ত্যাগ করিলেন না। আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা বিকালে হাটে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে তিনি উঠিলেন এবং আমাদিগকে রাখিয়া নিজেই বৃষ্টির ভিতরে হাটে চলিয়া গেলেন। তাঁহার তৎকালের উৎফুল্লতা দেখিয়া মনে হইয়াছিল তিনি যেন কি এক অপার্থিব বস্তু পাইয়াছেন। হাট হইতে আসিয়া স্বয়ং রন্ধন করিলেন এবং স্ত্রীপুরুষ সকলকে খাওয়াইয়া পরে রাত্রিতে নিজে আহার করিলেন। এইসব কার্য্যের মধ্যে তাঁহার যে এক নিমগ্ন-আনন্দ বিহ্বলতা দেখিয়াছি তাহা ব্যক্ত করা যায় না। একদিন রাত্রিতে বড়ই গরম পড়িয়াছিল এজন্য ভাল ঘুম হইতেছিল না। মধ্য রাত্রিতে জাগিয়া দেখি, তিনি দুই হাতে দুইখানা পাখা লইয়া দাঁড়াইয়া স্নেহময়ী জননীর মত আমাদিগকে ব্যজন করিতেছেন। জানিনা কতদিন এইরূপে অজ্ঞাতসারে তাঁহার সেবা লইয়াছি।"

একদিকে যেমন "নরসেবা," অপরদিকে তেমনি ব্রহ্মনিষ্ঠা। এবিষয়ে উমেশবাবু এই প্রকার লিখিয়াছেন:—"ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ অবধি তিনি প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত ২।৩ ঘণ্টা উপাসনা, ধ্যান ও গ্রন্থপাঠে কাটাইতেন, ইহা তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। ইহাতে কখন তাঁহাকে শিথিল যত্ন হইতে দেখা যায় নাই। স্নানান্তে প্রতিদিন তাঁহার বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা হইত এবং ইহা উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মগণের এক আকর্ষণের বস্তু ছিল। অনেকে প্রলুব্ধচিত্তে তাহাতে আসিয়া যোগ দিতেন। তিনি কখন কখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ধ্যানে কাটাইতেন। রবিবারে ইস্কুল ছিল না বলিয়া বেলা ৯।১০টা পর্য্যন্ত উপাসনায় কাটাইতেন। 'তাপসমালা' গ্রন্থ তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। দরবেশদিগের কঠোর বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা তাঁহার জীবনের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যখন 'তাপসমালা' পড়া হইত, তখন তিনি ভাবাবেশে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না, শয়ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মনাম করিতেন। অনেক সময়ে গ্রন্থ পাঠ বন্ধ রাখিতে হইত। তাঁহার প্রব্রজ্যা গ্রহণের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি অধিকাংশ রাত্রি জাগ্রৎ থাকিয়া ধ্যানাদিতে কাটাইতেন। তিনি আর আমি একঘরে শয়ন করিতাম, সন্তান যেমন মার নিকট আবদার করে, তেমনই ভাবে কখন কখন গভীর রাত্রিতে তাঁহাকে আবদার করিতে শুনিতাম। সেই আবদারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। আমি বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে এই চিন্তা করিতাম ইনি ব্রহ্ম নামের মাধুর্য্যে এমন মজিয়াছেন যে শ্রান্তিহারিণী নিদ্রাও তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। তিনি অধিকাংশ সময় উপাসনার ভাবে থাকিতেন। যখন নাম জপ করিতেন, তখন তাঁহার মুখে চোখে এক অপূর্ব্ব বিজুলি খেলিত, শরীর কণ্টকিত হইত। বলিতে বলিতে সে দেবমূর্ত্তি আজ আমার মানস-নেত্রে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।"

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুহ লিখিয়াছেন:—"তাঁহার ধর্ম্মতৃষ্ণা, ব্যাকুলতা ধ্যানশীলতা যাহা দেখিয়াছি, তাহা অতি অপূর্ব্ব। আমি সময় সময় তাঁহার গৃহে সদ্যপুষ্করিণীতে যাইতাম। একবার শনিবার অপরাহ্ণে গিয়াছি, একজন মহিলা (স্বর্ণময়ী) ছিলেন কিন্তু তবুও আগ্রহ করিয়া তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিলেন। নিরামিষ খাইতেন, আমি তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত নিরামিষান্ন ভোজন করিয়া বড় তৃপ্তি অনুভব করিলাম। তিনি আহার করিলেন না, বলিলেন আমি পরে আহার করিব। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিছানায় বসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলাম।

তিনি বলিলেন, দাদা আপনি শয়ন করুন আমি একটু ভগবানের নাম করিব। এই বলিয়া আসন করিয়া বসিলেন; আমি অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় ছুইটার সময় জাগিয়া দেখি তিনি তখনও গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁহার অপূর্ব্ব ধ্যানমগ্নতা দেখিয়া আমার বড় বিস্ময় জন্মিল। আমি আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু ভোর ৪টার সময় তিনি আমাকে ডাকিয়া উঠাইলেন। আমি বলিলাম 'কই আপনি ত আহার করিলেন না?' বলিলেন 'না আজ ত আর খাওয়া হইল না।' শুনিয়াছি তাঁহার প্রায়ই এইরূপ হইত। যিনি সমস্ত রজনী ধ্যানে যাপন করেন তাঁহার ধর্ম্মতৃষ্ণার কথা আর কি বলিব!"

ভক্তগণের দৃষ্টিও অন্য প্রকার। এ বিষয়ে একটা ঘটনা এই :-

প্যারীলালের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহার সঙ্গ লাভের জন্য কিছুদিন সপ্তপুষ্করিণীতে তাঁহার গৃহে ছিলেন। তিনি দেখিতেন প্যারীলাল প্রতিদিন প্রাতে একটা বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া দন্ত ধাবন করিতেন। একদিন দেখিলেন ডাল ভাঙ্গিতে গিয়া ডাল আর ভাঙ্গা হইল না। বন্ধু কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্যারীলাল বলিলেন "সবদিন ত মন জাগ্রত থাকেনা"। আজ তিনি বৃক্ষের মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে পাইয়াছেন। প্রতিদিন যে তিনি ডাল ভাঙ্গিয়া লন, ইহাতে বৃক্ষ বেদনা অনুভব করে; বৃক্ষেও চৈতন্য আছে। এই ঘটনার পর হইতে প্যারীলাল আর দাঁতন ব্যবহার করেন নাই।

সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি তিনমাসকাল ভ্রাতাভগিনীদিগের সহিত নলহাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি দুই তিন ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইতেন না। আর সমুদয় সময় ব্রহ্মভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। নির্জ্জন ও সজন—উভয় অবস্থাতেই তাঁহার ঐ একই নিমগ্ন ভাব। আহার করিতেন ব্রহ্মভাবে, বিহার করিতেন ব্রহ্মভাবে এবং সেবা করিতেন ব্রহ্মভাবে।

তিনি নরনারীকে কি চক্ষে দেখিতেন নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা বুঝা যায় :—

সন্ন্যাস যাত্রার দিন বাড়ীর মেথরাণী যখন কাজ করিতে আসিল, মৌনীবাবা তাহাকে ডাকিলেন, বলিলেন—"তুমি আমার মা। শিশুকালে মা স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন, এতদিন তুমি আমার সেই কাজ করিলে—তুমি আমার মা। আমি তপস্যায় যাইতেছি—তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। তোমার আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আমার সাধনা সফল হইবে না।" এই বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে নমস্কার করিলেন।

চিত্রকূট।

যাত্রাকালে প্যারীলালের সঙ্গী—উপনিষদ্ গীতা, বাইবেল, ব্রহ্মসঙ্গীত ও আর কয়েকখানি গ্রন্থ। চিত্রকূট অবস্থানকালে মাসে মাসে তিনি পুস্তক চাহিয়া পাঠাইতেন। তিনি প্রথম কয়েকমাস বন্ধুবান্ধবদিগকে চিঠি লিখিতেন এবং তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে দৈনিক কার্য্যাবলী লিখিয়া রাখিতেন। আমরা ইহার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "পিতা আমাকে রাজপুত্র করিয়া এস্থানে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আমাকে যেস্থানে রাখিয়াছেন, তাহা সাধন ভজনের পক্ষে এই চিত্রকূটের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গৃহটী অতি পরিপাটী ও নির্জ্জন;—এমন নির্জ্জন যে দুধওয়ালা ভিন্ন অন্য লোকের সহিত প্রায়ই দেখা হয় না। যদিও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি আসেন, খুব অল্প সময়ই থাকিয়া চলিয়া যান। কেবল অযোধ্যা হইতে আগত একটী সাধক বন্ধু সময় সময় আসিয়া ধর্ম্মকথাতে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এদিকে পিতার কৃপা প্রচুর বর্দ্ধিত হইতেছে। যখনই তাঁহার চরণতলে বসিতেছি, তখনই কৃপা করিতেছেন। পিতার ইচ্ছা শীঘ্র শীঘ্র আমাকে নবজীবন দান করিয়া মুক্ত করিয়া দেন। অন্যান্য সাধকদের দুই প্রহরের রৌদ্রের সময় ভিক্ষা করিতে হয়, তাঁহাদের অনেক সময়ই নষ্ট হয়; এবং বড় ক্লেশ পাইতে হয়। পিতার অপার কৃপায় গৃহে বসিয়া আমি তাঁহার প্রেম-খাদ্য ভক্ষণ করি। এখানে কাঁচা দুধই বিক্রয় হয়। কিন্তু পিতার কৃপায় আমার দুধওয়ালা আমার দুধ গরম করিয়া দেন। মাসের মধ্যে পনের দিন ছোলা পাই। অবশিষ্ট ১৫ দিনের মধ্যে ৫ দিন ছাতু পাই, সুতরাং রান্নার দায় হইতেও একপ্রকার মুক্ত। আর সে রান্নাও অতি অল্প সময়ের জন্য; কারণ কেবল ভাত ও রুটি ভিন্ন ত আর কিছু রান্না করি না। যে জলে স্নান করি তাহার ন্যায় নির্ম্মল জল আর কমই আছে। যদিও কৌপীন পরি, তাহা হইলেও বস্ত্রের অভাব অনুভব করি না; কারণ আমার কোট পরিলেই সমস্ত অভাব চলিয়া যায়। এই প্রকারে পিতা আমাকে পরম সুখে রাখিয়াছেন। নিমন্ত্রণেরও অভাব নাই। আমি সমস্ত ভার তাঁহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। মধ্যে মধ্যে যদিও অবিশ্বাস আসে। শীঘ্রই পিতা তাহা হইতেও আমাকে মুক্ত করিবেন। কারণ—আমি তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করিয়াছি। লোকে এমন গুরুকে ফেলিয়া মানুষকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। এ গুরু যে কি করেন তাহা আর কি লিখিব। মহা পাপীকে অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ধারের পথে লইয়া যান; অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করেন, অধিক কি, নিয়ত সঙ্গে থাকিয়া তাহার সমস্ত তত্ত্বাবধান করেন।"

খাদ্য।

মৌনীবাবা নিজের খাদ্য বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন :-

"দয়াময়ের, মঙ্গলময়ের যে পাপীর সহিত কি লীলা খেলা, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। আমি যে দিন এখানে পৌঁছিয়াছিলাম, কেবল সেই দিন অনাহারে ছিলাম। ফটকশিলা দেখিয়া আমি যখন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি, আর উপায়ান্তর নাই, কোথায় যাইব—কাহারও সহিত আলাপ নাই, তখন চিত্রকূটের দিকে আসিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া, একটা ভাঙা ইঁদারার ধারে সমস্ত রাত্রি কাটাইলাম কিন্তু যিনি কীটাণুকীটেরও পর্য্যন্ত তত্ত্ব লন, তিনি কি তাঁহার পুত্রকে অনাহারে রাখিতে পারেন? একব্যক্তি খুব প্রাতে সেখানে উপস্থিত। সে আমার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সে আসিয়াই আমার জন্য কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। অনেক কথাবার্ত্তার পর সে আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, আমাকে উদাসীন নানকপন্থী বাবাজীদের আশ্রমে লইয়া গেল। সেখানে যাওয়ার পর রুটি, ভাত, পরমান্ন প্রভৃতি পিতা আমাকে খাওয়াইলেন। এই প্রকার রুটি, লুচি, পরমান্ন প্রভৃতি খাইয়া চারিদিন সেখানে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। একেবারে সেখানে থাকিলে এক বাবু হইয়া উঠিতাম, এইজন্য পিতা আমাকে অনসূয়া দেবীর মন্দিরে লইয়া গেলেন। ২০শে আগষ্ট হইতে ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সেখানে কাটাইয়াছি। পীড়ার জন্য দুই দিন উপবাস ভিন্ন আর উপবাস দিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এখানে যেসকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা অতি বিচিত্র। প্রথম দিন যাইয়াই খাদ্য পাইলাম। দ্বিতীয় দিন আমার সে নিভৃত স্থান হইতে আমি বড় বাহির হই নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সিদ্ধি বাবাজির এক চেলা আসিয়া, আমি উপরে দেখা করিতে অথবা খাইতে যাই নাই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল। তাহার পর দেখি সন্ধ্যার সময় তিনখানা রুটি ও দুধ আমার জন্য আসিয়া উপস্থিত। তাহার পরদিন বুঝি উপরে গিয়াছিলাম, কিন্তু বাঁদরের উৎপাতে এবং চাকরদের তাচ্ছিল্যে আর উপরে যাইব

না ঠিক করিলাম। কিন্তু পিতা কি পুত্রকে উপবাসে রাখিতে পারেন? একব্যক্তি স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে খাদ্য আনিয়া দিতে লাগিল। এক শত দেড় শত হাত উপর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এবং সেই ভয়ঙ্কর বাঁদরের উৎপাত সহ্য করিয়া কে কাহার খাদ্য আনিয়া থাকে? দুই-তিনখানা রুটি আসিত, শেষে আমার অনুরোধে একখানা দেড়খানা আসিত। কোন দিন লুচি এবং অন্যান্য মিষ্ট খাদ্যও জুটিত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইতে হইতেই আর একব্যক্তি আসিয়া জুটিল। সেও আসিয়া পিতার আজ্ঞায় আমার সেবায় নিযুক্ত হইল। জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রি একটা কি দুইটার সময় আমার জন্য মোহনভোগ লইয়া আসিয়া উপস্থিত। পিতা এইরূপে আমার সেবায় নিযুক্ত আছেন। এই সময়ে আমার বোধ হইত, আমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া মঙ্গলময় পিতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রুটি কাপড়ে বাঁধিয়া এবং ঘটীতে জল লইয়া আসিয়াছেন। এইরূপে দিন যাইতেছে. এরূপ সময়ে কোন এক ঘটনাতে তাহারা আমাকে 'নাস্তিক' বলিয়া ঠাওরাইয়া আমাকে খাদ্য আনিয়া দিবে না ঠিক করিল। পরদিন বলিল "আপনি উপরে যাই-বেন?" খা'বার সময় উপরে গেলাম কিন্তু কেহ কথা বলিল না। পিতা ঘরে বসাইয়া আমাকে খাদ্য দিবেন এই আজ্ঞা অবহেলা করিয়া উপরে আসিয়াছি বলিয়া এরূপ ঘটিল মনে করিয়া নামিয়া আসিলাম। আজ প্রাতঃকাল হইতেই পিতা আমাকে অপূর্ব্বভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আসিয়া প্রা-না করিতে লাগিলাম। খানিক পরে যিনি আমার খাদ্য আনিতেন, তিনি "জ্বর হইয়াছে" বলিয়া শুইয়া কোঁ কোঁ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোঁকানি দেখিয়া ভাণ বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে এক আশ্চর্য্য, যাহারা কোন দিন আমার খোঁজ লয় না (একদিন আমার খাবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল) এরূপ একব্যক্তি আমার খাদ্য দিয়া গেল। আমি দেখিয়া অবাক্ হইয়া খাইতে লাগিলাম।"

শয্যা।

শয্যার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"প্রথম দিন বৃক্ষতলস্থ ভাঙ্গা ইঁদারার পার্শ্ব। তাহার পর কোট এবং ক্ষুদ্র আসনের উপর শরীরের উপরিভাগ রাখিয়া শয়ন করিয়াই যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। জ্বর হইবার পর হইতে কোট এবং আসনখানা বিছাইয়া শয়ন করিতাম। এখন কোট গায় দিই; সুতরাং আসন এবং তাহার উপরের কাপড়খানা প্রথমতঃ শুইবার সময় বিছাইয়া লই, কিন্তু তাহা থাকে না; প্রকৃত পক্ষে মাটীতেই শুইতে হয়। উপাধান একখণ্ড প্রস্তর।"

মানসিক সুখ।

নিম্নলিখিত অংশে তাঁহার মানসিক অবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে:—

"যখন পিতার অপার করুণায় নিষ্পাপ থাকি, তখন সকলই আমাকে অপার সুখ দেয়। গৃহের দিকে তাকাইলে গৃহ তাঁহাতে পরিপূর্ণ দেখি; বৃক্ষ, পর্ব্বত, বন, আকাশ সকলই মঙ্গলময় দেবতায় পরিপূর্ণ দেখিতে পাই। তখন আনন্দময় পিতার পুত্র হইয়া আনন্দে তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে থাকি। আমার সে সময়ের আনন্দ লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। পিতার অপার কৃপায় আমি দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছি। পিতা আমার অবিশ্বাস দূর করিতেছেন, আমার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করিতেছেন, আমার রিপুদিগকে দমন করিতেছেন। যখন পিতার প্রেমান্ন ভক্ষণ করি, তখন যে কি সুখ অনুভব করি—বলিতে পারি না। যখন মঙ্গলময়ের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া রাত্রিতে ঘুমাই, তখন আর আমার কোন চিন্তা থাকে না। পীড়িত অবস্থাতে মঙ্গলময় আমাকে কোলে করিয়া রাখেন, সুতরাং আমার আর অসুখের সম্ভাবনা কি? বাসনা, লালসা প্রভৃতির দিকে মন গেলে যখন পিতাকে দেখিতে পাই না, তখন যে যন্ত্রণা অনুভব করি, তাহা অবর্ণনীয়। পাপ দুঃখের মূল। লোকে নিষ্পাপ থাকিলে এই পৃথিবীতেই স্বর্গভোগ করিতে পারে; কিন্তু নিষ্পাপ থাকা নিজের আয়ত্ত নয়। সম্পূর্ণ ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর না করিলে নিষ্পাপ হওয়া যায় না। যে নিজের বলে নিষ্পাপ হইতে চেষ্টা করিবে, সে আরও পাপে পড়িবে।

আমার গৃহের সম্মুখে বাদ্‌লা গাছের ন্যায় একটী কচিকচি-পত্র-বিশিষ্ট বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটী একেবারে সম্মুখে। বৃক্ষটীর পত্রে পত্রে ব্রহ্মনাম লিখা। এই বৃক্ষে কত রকম ছোট ছোট পাখী আসিয়া আমার চিত্তরঞ্জন করে, বলিতে পারিনা। ইহাদের মধ্যে দুইটী পাখী অতি সুন্দর, স্বরও মিষ্ট। ইহাদের মধ্যে একটা পাখী আমাকে দেখিয়া ভয় করে না, অতি নিকটে আসে। তাহাকে দেখিলে আমার বড় আনন্দ হয়; পূর্ব্বকালের ঋষিদের আশ্রমের কথা মনে হয়। ইহারা এবং আর দুইটী অতি ক্ষুদ্র পাখী নিয়ত বৃক্ষে বাস করিয়া আমাকে আনন্দ দান করিতেছে। আমার চিত্তবিনোদনার্থে পিতা এই সুন্দর গায়ক এবং নর্ত্তককে নিযুক্ত করিয়াছেন। যখন কোন স্থান হইতে শ্রান্ত হইয়া আসিয়া গৃহের সম্মুখস্থ প্রস্তরে বসি, তখন ইহারা আমার হৃদয়ে পিতার অপার প্রেম ঢালিতে থাকে। ময়ূরগণ সর্ব্বদাই চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। নদীতে মৎস্যগণও আমাকে অপার সুখ দেয়।"

মৌনীবাবা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এক চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেই চিঠি হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল:—

"পীড়িত অবস্থায় লালসা প্রভৃতি কতকগুলি রিপু মাথা উঠাইয়াছিল। সেগুলি পিতা আবার ক্রমে বশীভূত করিয়া দিতেছেন। এখন দিন একপ্রকারে যাইতেছে। প্রাতে উঠিয়া, কিছুকাল পিতৃচরণ মস্তকে ধারণ করিয়া ব্যায়াম করি। তাহার পর মুখ ধুইয়া পিতার চরণতলে বসি। অধিকাংশ সময়ই কৃপা স্মরণ এবং বিশেষ প্রকারে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি। পিতার কৃপায় অনেক সময়ই সফল হই। সময়ে সময়ে পিতার মহত্ত্বে ডুব দিয়া নিজের ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া পরম সুখী হই। সময়ে সময়ে পিতা কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার স্বরূপ কণঞ্চিৎরূপ অনুভব করান। মধ্যে মধ্যে খাবার চিন্তা এবং বাহিরের চিন্তাও স্থান পায়; কিন্তু তাহাদের অবস্থা পিতার কৃপায় ক্রমে শোচনীয় ভাব ধারণ করিতেছে। এই প্রকারে প্রায় দুই প্রহর কাটিয়া যায়। তাহার পর কিঞ্চিৎকাল পাঠে রত হই। কখন কখন মোহ আসিয়া এরূপ করিয়া ধরে যে আমি এসকল হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকি। কখন কখন আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দেয়, কিন্তু ইহারাও ক্রমে বলহীন হইতেছে। তাহার পর আহারাদি নিত্যকার্য্যে ব্যাপৃত হই। রান্না করিয়া আচ্ছা করিয়া আহার করি। তৎপর কিছুকাল পিতাকে স্মরণ করিতে করিতে গড়াগড়ি দিয়া কিঞ্চিৎকাল পিতার চরণতলে বসি, পাত্রাদি পরিষ্কার করিয়াও কোন কোন দিন পিতার চরণতলে বসিবার সময় থাকে, কচিৎ দুই একদিন থাকে না। সন্ধ্যার সময় একটু গৃহের উপর ভ্রমণ করিয়া এবং ব্যায়াম করিয়া পিতার চরণামৃত পান করিবার জন্য বসি। কোন কোন দিন ২।১ ঘণ্টা পিতা বসাইয়া রাখেন, কোন কোন দিন শীঘ্রই শুইয়া পড়ি। কোন কোন দিন শুইয়া শুইয়া পিতার স্মরণ মনন ইত্যাদিতে অনেক সময় পিতা যাপন করান। তাহার পর ২।৩ ঘণ্টা ঘুমাই, পরেই আবার উঠাইয়া দেন। তাহার পর আর বড় ঘুম হয় না। এইরূপে দিন গত হইতেছে। ক্রমেই আশা বৃদ্ধি পাইতেছে, নিরাশা অন্তর্ধান হইতেছে। এই প্রকার সর্ব্বশক্তিমান্ পরম দয়ালু

পিতা যাহার, তাহার আবার মুক্তির জন্য চিন্তা ? পাপচিন্তা নরকভোগ যদিও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তত্রাচ তাহাদের শক্তি যে খর্ব্ব হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি। পিতা শীঘ্রই আমাদের জন্য উপায় করিবেন। বাহির হইতে সাধন ভজন সম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত হই এরূপ কোন সঙ্গী এখানে নাই। কেবল মাত্র পিতা আছেন। আমি আর অন্য সঙ্গী চাই না। পিতা ভিন্ন অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেই আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। সর্ব্বসাক্ষী জাগ্রত জীবন্ত দেবতা আমার গুরু, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু হইয়া আছেন। তবে আর অভাব কি ? আমি তাঁহার সঙ্গেই কথা বলি, তাঁহার নিকট হইতেই অব্যর্থ উপদেশ পাই। তিনি আবার দয়া করিয়া আমাকে ঘাড়ে ধরিয়া এইসকল সাধনায় নিযুক্ত করেন। যখন আমাকে দেখি না তখন তাঁহাকে দেখি এবং যখন আমাকে দেখিতে পাই তখনই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, আর পরম দয়ালু পিতা শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপেই বিশেষ ভাবে আমার নিকট প্রত্যক্ষ হন। আমার নরকভোগ তাঁহারই ইচ্ছা। আমার অহঙ্কারের দন্তপাটি উৎপাটন করিতেছেন, এবং আমার মধ্যে যে কিছু নাই, তাহাই চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন। পূর্ণ মঙ্গলময় শীঘ্র আমাকে মুক্ত করিয়া লইবেন। আমি আর কিছু চাইনা, কেবল তাঁহার অভয় চরণ পূজা করিবার অধিকার চাই। পিতা অনেক শিখাইয়াছেন।"

ওঁকারনাথ।

চিত্রকূটে প্যারীলালের তপস্যার প্রথমাবস্থা। ক্রমে জীবনের গভীরতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্রাদি লেখা বন্ধ করিলেন। অনুক্ষণ ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মানন্দরসপানে বিভোর হইয়া থাকিতেন।

দুইবৎসর চিত্রকূটে তপস্যার পর প্যারীলাল ওঁকারনাথ পর্ব্বতে গমন করেন।

তিনি চিত্রকূট হইতে আসিয়া সন্ধ্যাকালে নর্ম্মদা পার হইয়া এই শহরের এক মিঠাইবিক্রেতার দোকানে বিশ্রাম করেন; পরে পর্ব্বতে উঠিয়া গুহাবাস করিতে আরম্ভ করেন। এখন হইতে তিনি স্নানাহার, নিদ্রা একপ্রকার ত্যাগ করিলেন মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার নাম মৌনীবাবা হইল।

ঘটনাক্রমে মিঠাইবিক্রেতার দোকানে মৌনীবাবার পদার্পণের পর হইতে তাহার ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। মৌনীবাবার আশীর্ব্বাদে এইরূপ হইয়াছে মনে করিয়া সে সস্ত্রীক তাঁহার আশ্রমে আসিয়া তাঁহার সেবাধিকার ভিক্ষা করিল। মহাত্যাগী বৈরাগী মৌনীবাবার কাহারও সেবা গ্রহণের আবশ্যকতা ছিল না। তিনি তাহাদের ব্যাকুলতায় প্রতিদিন বিকালবেলা কেবল একপোয়া দুধ ও কিছু বেলপাতার রস গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহাই তাঁহার এখনকার দৈনিক আহার।

সেবক কোন কোন দিন আধসের তিনপোয়া দুধ জ্বাল দিয়া একপোয়া করিয়া আনিত। মৌনীবাবা বুঝিতে পারিয়া, ইহাতে তাঁহার তপঃবিঘ্ন হয় বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তিনি সেবা গ্রহণ করেন না বলিয়া মিঠাইবিক্রেতা ও তাহার পত্নী বড় ক্ষুব্ধ হইত। অবশেষে তাহারা তাঁহার জন্য একটি ভাল গুহা নির্ম্মাণ করিয়া দিবার অনুমতি চাহিল, মৌনীবাবা সম্মত হইলেন।

সিদ্ধপুরুষের সম্মান।

কিছুদিনের মধ্যে সিদ্ধপুরুষরূপে মৌনীবাবার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বিকালবেলায় একবার মাত্র গুহা হইতে বাহির হইয়া নর্ম্মদায় আসিতেন। সেই সময় দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য গুহাদ্বারে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। একাদশীতে সমস্ত দিন উপবাসের পর কত লোক তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া জলগ্রহণ করিবার আশায় তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিত। এক একদিন মৌনীবাবা গুহার দ্বার খুলিয়া বিষম জনতা দেখিয়াই পুনরায় দ্বার বন্ধ করিতেন। মহারাজ হোলকার একদিন নর্ম্মদাস্নান করিতে আসিয়া মৌনীবাবাকে দর্শন করিতে তাঁহার আশ্রমদ্বারে আসেন। মৌনীবাবা দ্বার খুলিতেই তিনি তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। এক-ব্যক্তি হোলকারের পরিচয় জানাইলেন; শুনিয়াই মৌনীবাবা গুহা প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন,—হোলকার দ্বার রোধ করিলেন। তিনি বলিলেন "বাবা, আমাকে উপদেশ দিন।" মৌনীবাবা ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন—"আমি কিছুই নই।" হোলকার কর্ত্তৃক তাঁহার চরণে অর্পিত সহস্র মুদ্রা চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে ইঙ্গিত করিয়া মৌনীবাবা দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ইহার পর গুহাদ্বারে দেবনাগর অক্ষরে লিখিয়া দিলেন:—

"নাহং ব্রাহ্মণঃ ন চাহং সাধুঃ।"

মৌনীবাবু ওঁকারনাথে কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন, তাহা শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠি হইতে উদ্ধৃত হইল:—"আমি ওঁকারনাথে উপস্থিত হইয়া লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া মৌনীবাবার সাধনগুহার সন্ধান জানিয়া লইলাম। তাঁহার সাধন-গুহার উপরে একটী শ্বেত পতাকা উড়িতেছিল। লোকে সেই পতাকা দেখাইয়া বলিল ঐ স্থানে মৌনীবাবা অবস্থিতি করেন। তাঁহার সাধন-গুহার নিকটে গমন করিয়া দেখিলাম তাঁহার প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ আছে। দ্বার অবরুদ্ধ থাকায় অনেকক্ষণ আমাকে বাহিরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সাধনে বিঘ্ন জন্মাইয়া আমার আগমন-সংবাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা হইল না। এজন্য বাহিরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। আমি বোধ হয় ৯টা ১০টার সময় সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ২টা কি ২৷৷০টার পূর্ব্বে তাঁহার কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। তৎপর মনে হইল যেন তিনি গুহার বাহিরে আসিয়াছেন। এই সময়েই তিনি আহারের জন্য বাহিরে আগমন করিতেন। তাঁহার বাহিরে আগমনের সাড়া পাইয়া আমি ইঙ্গিতে আমার আগমন বার্ত্তা তাঁহাকে জানাইলাম। তখন তিনি দ্বার খুলিয়া আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমাকে দেখিয়াই যে তাঁহার অতিশয় ভাবোচ্ছ্বাস হইল তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তিনি অতি আগ্রহের সহিত আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি মৌনী ছিলেন বলিয়া বাক্যে তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস কিছুই ব্যক্ত হইল না; কিন্তু আকার প্রকারে তাহা বিশেষ অভিব্যক্ত হইল।

"আমি তাঁহার গুহায় প্রবেশের দ্বারদেশে গমন করিয়াই দেখিতে পাইলাম দ্বারের চৌকাঠের মস্তকে লিখিত আছে "নাহং ব্রাহ্মণঃ ন চাহং সাধুঃ"। এরূপ লিখিয়া রাখিবার অভিপ্রায় সহসা অনুভূত হইল না, পরিশেষে জানিতে পারিয়াছিলাম উক্ত স্থানে সাধু এবং ব্রাহ্মণদিগের নিকটে লোকে নানা প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য গমন করিয়া থাকে। মৌনীবাবার সাধু বলিয়া খ্যাতি ছিল। এজন্য তাঁহার নিকটেও লোকের সমাগম হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হয় বলিয়া লোকসমাগম বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দ্বারদেশে উক্ত বাক্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

"আমাদের মৌনীবাবা শুধু সাংসারিক সুখ সুবিধার বাসনা পরিহার করিয়াছিলেন তাহা নহে সাধুনাম গ্রহণে যে সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা, তিনি তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। লোকসমাগমকে তিনি কিছুতেই পছন্দ করিতেন না, তাহাকে তিনি সাধনকণ্টক স্বরূপই মনে করিতেন; এজন্য সেই তীর্থস্থানের যে অংশে লোকের গমনাগমন নাই বলিলেই হয় এরূপ স্থানেই তাঁহার সাধন-গুহা হইয়াছিল।

"তাঁহার সাধন-গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, গুহাতে উপবেশন ও শয়নের উপযুক্ত স্থান আছে কিন্তু দাঁড়াইবার মত ব্যবস্থা নাই। সেই গুহাতে বসিবার একখানি চর্ম্ম। উপাধানের জন্য একটা পাথরের লোড়া এবং মশার উৎপাত নিবারণের জন্য ধূনা করিবার প্রয়োজন হয় বলিয়া একটা পাথরের থালার মত জিনিস আছে; তদ্ভিন্ন তিনটী ঘটী দেখা গেল, একটী একটু বড় জল রাখিবার জন্য, অন্য দুইটীর একটী জলপানের জন্য ও অপরটী শৌচাদির জন্য। এতদ্ভিন্ন তাঁহার গুহায় অন্য কোন বস্তু দেখা গেল না। তাঁহার পরিধানে আলখাল্লার মত এক বস্ত্র দেখা গেল। এসকলের উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে তিনি শরীর রক্ষার উপযুক্ত বস্তুরও কত ন্যূনতা ঘটাইয়াছিলেন। পার্থিব প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রভাব তাঁহার উপরে কত সামান্য ছিল, এসকল দ্বারা তাহাই অনুভূত হইতে পারে। পরিচ্ছদাদির ত এই অবস্থা। আহারের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম পূর্ব্বে কখনও বেলপাতার রস কখনও বা অল্প একটু দুগ্ধ পান করিতেন। সেরূপ করাতে তাঁহার শরীর এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাঁহাকে কোনও ক্রমে বুকে ভর দিয়া গুহার বাহির হইতে হইত। শরীরের সেইরূপ অবস্থায় আর কিছুই করা যায় না বলিয়া অবশেষে অল্প অল্প রুটি ও তরকারি আহার করিতে প্রবৃত্ত হন। যিনি তাঁহাকে সাধনের জন্য গুহা করিয়া দিয়াছিলেন বোধ হয় তিনিই প্রতিদিন ২॥০টা ৩টার সময় কিছু রুটি ও তরকারি পাঠাইয়া দিতেন। দিনের মধ্যে একবার ঐ সামান্য আহার্য্য গ্রহণ করিয়াই তাঁহাকে কঠিন মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত হইতে হইত।

"অতি প্রত্যূষে একবার গুহা হইতে বাহির হইয়া নিম্নে নর্ম্মদায় অবতরণ করেন প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক নর্ম্মদা হইতে পানীয় জল লইয়া গুহায় প্রত্যাবৃত্ত হন। তাহার পর গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া নিয়মিত সাধনে রত হন। নিদ্রার স্বতন্ত্র সময় বা ব্যবস্থা নাই। শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইলে অধিকাংশ সময় যোগাসনে বসিয়াই যে একটু নিদ্রা হয়। এই ভাবে লোক সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া দিনের পর দিন ঘোর একান্তের মধ্যে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত।"

শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মৌনীবাবাকে দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন,—"বুদ্ধদেবের ন্যায় জীবন্ত সাধক দেখিয়া আসিলাম। পুস্তকে বুদ্ধের কঠোর তপস্যার কথা পড়িয়াছিলাম, এবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম।"

অপূর্ব্ব মিছিল।

পাঁচ বৎসর ওঁকারনাথ বাসের মধ্যে মৌনীবাবা একবার মাত্র শহরে গিয়াছিলেন। এক জন্মাষ্টমীর মেলায় তাঁহাকে পাল্কীর ন্যায় একপ্রকার যানে উঠাইয়া লইয়া সকলে মিলিয়া শহর পরিভ্রমণ করাইয়া আনিয়াছিল। এই দিন শহরবাসী এবং যাত্রিগণ তাঁহার প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। সকলে তাঁহাকে জোর করিয়া যখন যানে তুলিয়া লইল, তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি করিয়া সকলে টাকা পয়সা কড়ি ছড়াইতে লাগিল। প্রায় আড়াই মাইল পথ এই প্রকার মিছিল হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর বাহকগণ তাঁহাকে গুহায় ফিরাইয়া দিয়া গেল।

শেষ দিন।

মৌনীবাবা দেহত্যাগের তিন চারিমাস পূর্ব্বে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিতে তাঁহার শেষ জীবনের আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল :—

দয়াময় অপার করুণা করিয়া আমার সমস্ত উপাধি বিনাশ করিয়াছেন। আমি এবং আমার এখন কিছুই নাই। সমস্ত জগতই সেই একমাত্র পরাৎপর পরমাত্মারই প্রকাশ। আমার কোন সমাজ নাই, জাতি নাই কুল নাই, মান অপমান এবং ঘৃণা ও আদর কিছুই নাই। আমার নিকট সমস্ত সমাজ এবং সর্ব্বলোক এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার শত্রু মিত্র কেহ নাই আমার ভাই ভগিনী মাতা, পিতা কিছুই নাই। এক ব্রহ্মই সর্ব্বভূতে চরাচরে সুন্দররূপে জাগ্রত জীবন্তভাবে প্রকাশিত। আমি কাহাকে আপনার এবং কাহাকে পর বলিব এবং কাহার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিব? এখন সর্ব্বজীবে এবং সমস্ত লোকে আমার সমভাব এবং অতি পবিত্রভাব। আমার মস্তক শঙ্কর, কৃষ্ণ এবং যীশু প্রভৃতি মহাত্মাগণ হইতে একটি কীটাণুকীটের নিকট আমার অন্তরাত্মা দয়ালহরি প্রকৃতপক্ষে এবং ভক্তির সহিত অবনত করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এখন আমি সর্ব্বলোক সহিত সেই অখণ্ড অবতার পুরুষকে মস্তকে ধারণ করিতেছি। এখন আমি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম পাইয়াছি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান এবং ব্রাহ্ম আমার নিকট এক হইয়াছে; পাপী এবং পুণ্যাত্মা এক হইয়াছে। আহা, আমার অন্তরাত্মা দয়ালহরির কতই দয়া। আমি ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি যেসকল মিথ্যা উপাধি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম তাহা সমূলে বিনাশ করিয়া আমাকে কচিখোকা করিয়াছেন। এখন কাহারও নিকট কিছু চাহিতে এবং জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হয়। দয়ালহরি আপনাআপনি প্রার্থনা বিনা সকল বিধান করিতেছেন এবং সংসার হইতে আমাকে রক্ষা করিতেছেন। আমি বিপথে যাইতে চাহিলেও ফিরাইয়া আনিতেছেন।"

নির্বাণ।

পাঁচ বৎসর পরে ১৩০১ সনের মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে মৌনীবাবা কথা কহিলেন। সকালবেলায় মিঠাই বিক্রেতা ও তাহার পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা আমার মা বাপ। আমার দোষ তোমরা ক্ষমা কর, তোমরা আমার বড় উপকার করিয়াছ। ইচ্ছামত আমার সেবা করিতে পার না বলিয়া দুঃখ কর; আজ তোমাদের যাহা ইচ্ছা আমাকে আনিয়া দাও—আমি খাইব।"

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি খাইবেন?" মৌনীবাবা বলিলেন "খিচুড়ী করিয়া আন।"

সেবক পত্নীসহ খিচুড়ী আনিতে গেল। আসিয়া দেখে মৌনীবাবা সমাধিস্থ। ধ্যান ভঙ্গের প্রতীক্ষায় তাহারা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল, কিন্তু বাবার আর ধ্যান ভাঙ্গিল না। তাহারা বুঝিল না যে মহাসাধনা অন্তে মৌনীবাবা নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার এ সমাধি আর ভাঙ্গিবার নয়। অবশেষে যখন সব বুঝিল, সদ্য পুত্রহারা জনক জননীর ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

দেহান্তে বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্র হইয়া নর্ম্মদাতীরে প্রস্তর মধ্যে মৌনীবাবার পরিত্যক্ত দেহ সমাধিস্থ করিয়া আসিল, এদিনও ওঁকারনাথে আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল। স্থানবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মৌনীবাবার গুহায় আসিয়া তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিল। পাঁচখানি বৃহৎ নৌকা সজ্জিত করিয়া মৃতদেহ সমাধিঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। পঁচিশখান কাপড় ও পাঁচ মণ মালপুয়া বিতরিত হইল এবং মৌনীবাবার নামে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি উঠিয়া ওঁকারনাথকে কম্পিত করিয়া তুলিল।

এইরূপে ৩৮ বৎসর বয়সে মৌনীবাবার নির্ব্বাণ লাভ হইল। নব্য ভারতের এক মহাসাধক গোপনে আবির্ভূত হইয়া গোপনেই জীবনের কার্য্য সমাপনান্তে অন্তর্হিত হইলেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

একটি স্বদেশী কারখানা

সে আজ বিশ বৎসরের কথা। কলিকাতায় ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডে একটি একতলা বাড়ীর এক কোণে একটি ক্ষুদ্র ঘরে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আবাস। বাড়ীর সামনে ও পিছনে খোলা জমি। ইতস্ততঃ খোলা, ভাঁড়, হাঁড়ি, কলসী, কাঠের পিপা উপক্রম করিতেছে। এই হাড় ভস্মীভূত হইয়া তাহার উপাদান হইতে ফস্‌ফোরস (phosphorus) ঘটিত ঔষধ প্রস্তুত হইবার উপায় উদ্‌ভাবিত হইতেছে। এই প্রকার নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে। যে কারখানার বৃত্তান্ত আমরা প্রকাশ করিতেছি, ভগবানের বিধান অনুসারে ঐ প্রকারে তাহার সূচনা হইতেছে।

অনেক যুবকই বলিয়া থাকেন মূলধন নাই বলিয়া



বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিভাগ।

বিক্ষিপ্ত। কোথাও গন্ধক দ্রাবক (sulphuric acid) ও লোহার ছাঁট (scrap iron) সংযোগে হীরাকষ প্রস্তুত হইতেছে, কোথাও লেবুর রস হইতে সিট্রিক অম্ল (citric acid) বানাইবার চেষ্টা হইতেছে, কোথাও সোরা ও গন্ধক দ্রাবক যোগে তেজ্‌ আব্‌ (nitric acid) চোলাই (distillation) হইতেছে। আবার ছাদের উপর মাংসবিক্রেতার দোকান হইতে সংগৃহীত কাঁচা হাড় শুকাইতেছে;—পাড়ার লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া আপত্তি করিতেছে এবং মিউনিসিপালিটিতে দরখাস্ত দিবার

আমাদের দেশে ব্যবসা ও কারবার চলে না। কিন্তু ইহা সর্ব্বাংশে সত্য নয়, আসল কথাও ইহা নয়। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে "নাছোড়বান্দা" হইয়া লাগা চাই, এবং লাগিয়া সামান্য আরম্ভ হইতে শিক্ষানবিশী করা চাই। একেবারে মস্ত একটা কিছু করিয়া বসিব, ভাবিলেই, কার্য্যহানি হয়। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে ও পরে অনেকগুলি যৌথ কারবার খোলা হয়। তাহার মধ্যে কয়েকটি মৃত, কোনটি বা মুমূর্ষু; কত উঠিল, কত ডুবিল, ইহার কারণ কি?



বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ঠিক্ নির্ম্মিত হইয়াছে, কি না, তাহার পরীক্ষা করিবার ঘর।

মাড়োয়ারীরা লোটা ও রস্‌সী সম্বল লইয়া রাজপুতানার মরুভূমি হইতে আসিয়া বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া করিল কি প্রকারে? বাঙ্গালী কেবল কেরাণীগিরিতে পটুতা এবং ওকালতী বুদ্ধি লাভ করিতে শিখিয়াছে।

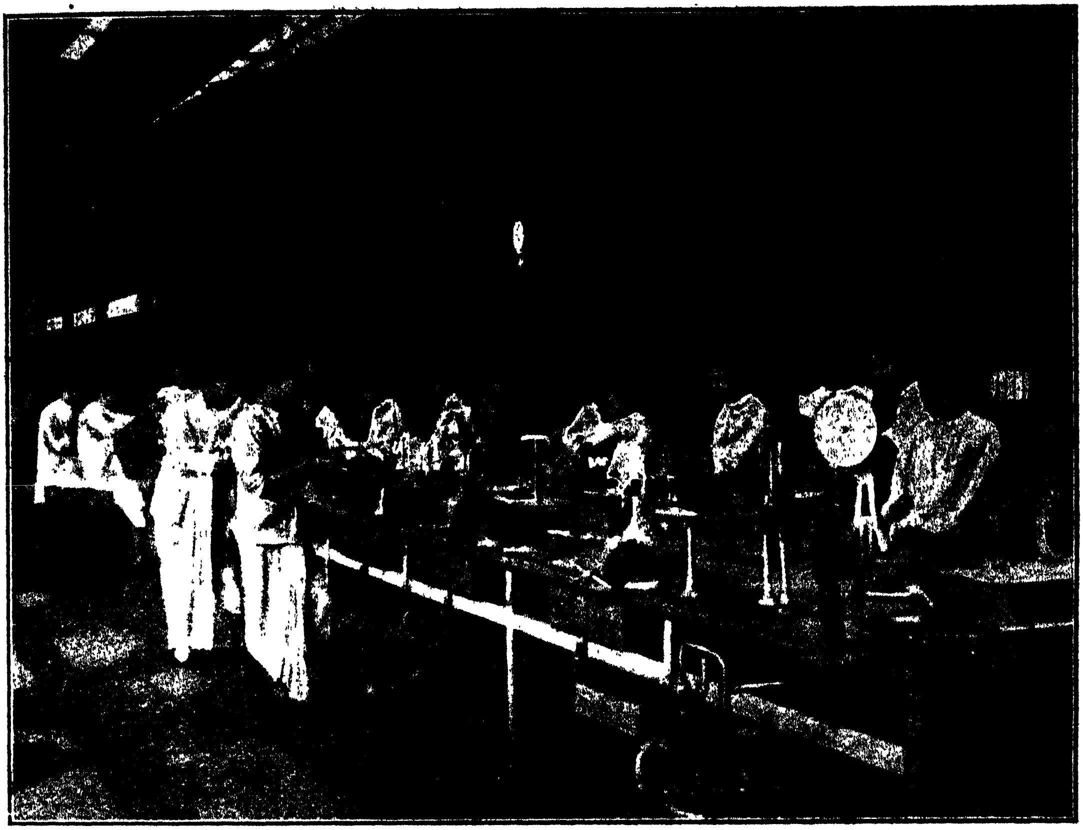
ডাক্তার রায় যখন "বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের" সূত্রপাত করিতেছিলেন, তখন তাঁহার আয় ছিল, আয়কর ৬৷৷০ বাদে, মাসিক ২৪৩৷৷০। তখন পৈত্রিক ঋণও ছিল, এবং তাঁহার দানের পরিমাণটা বরাবরই খুব বেশী। এই বেতনে তিনি ৭৷৮বৎসর চাকরী করিয়াছেন। অথচ তাঁহার দ্বারা এত বড় একটা কারবারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

কারখানার এই প্রারম্ভাবস্থায় আর একজন উদ্যমশীল, অসাধারণ অধ্যবসায়ী ও স্বার্থত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি বিখ্যাত ডাক্তার স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বসু। ইনি ডাক্তার রায়ের বাল্য-সুহৃদ্। উভয়ের সহযোগ মণিকাঞ্চন যোগের মত হইল। অমূল্য বাবু আসিয়া না যুটিলে কারখানাকে লাভের ব্যাপার করা আরও সময়সাপেক্ষ এবং কঠিনতর হইত। প্রথম অবস্থায় ইঁহারা ব্যক্তিগত লাভলোক্‌সানের দিকে তাকান নাই; স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া, কাজটিকে কেমন করিয়া সফল করা যায়, একমাত্র তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

অমূল্য বাবুর ভগিনীপতি স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সিংহও রসায়নে এম্‌-এ পাশ করিয়াই এই কাজে যোগ দেন। পরিতাপের বিষয় এই যে অল্পকাল পরেই এই উৎসাহী পুরুষের, ভ্রমক্রমে স্বহস্তে প্রুসিক এসিড বিষপ্রয়োগে, প্রাণবিয়োগ হয়।

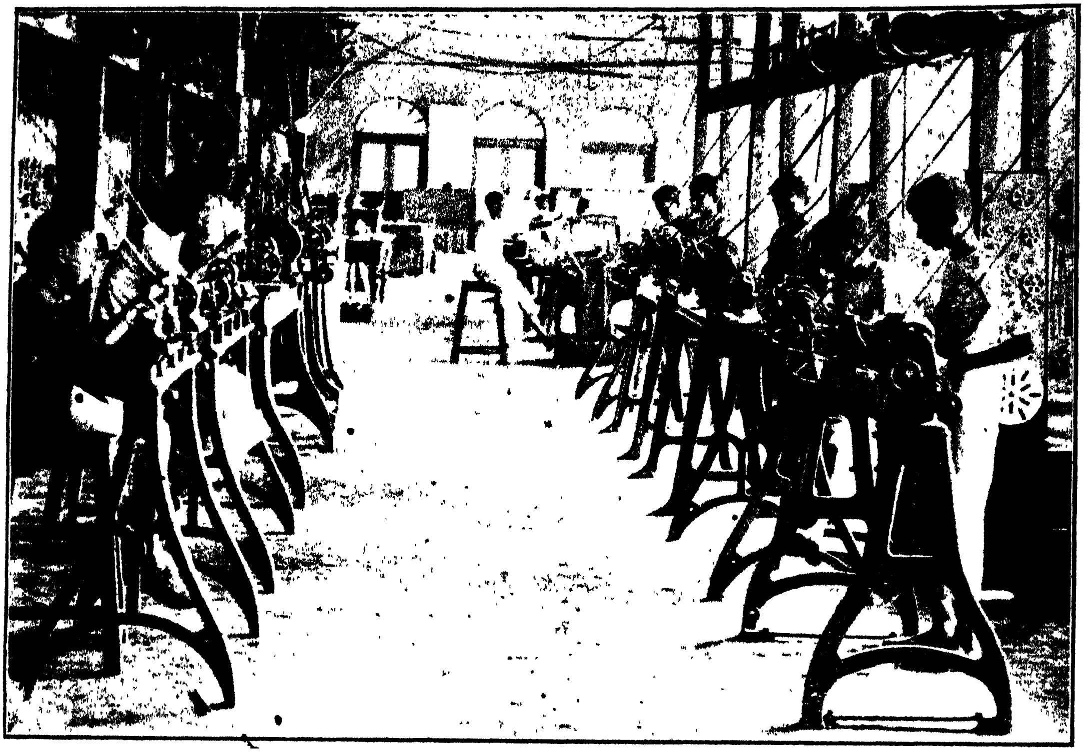
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, প্রভৃতি আরো অনেকে এই কারখানার জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নাম করা সুসাধ্য নয়।

ব্যবসা দ্বারা শুধু জীবিকার্জ্জন নয়, সম্মান ও শক্তি



যন্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা— সূক্ষ্মযন্ত্র-বিভাগ।

লাভ করিতে পারি, এই কথাটী স্বদেশী আন্দোলনের দিনে সহজ ও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উৎসাহের প্রথম আবেগে একে একে অনেকগুলি কারবার জন্মলাভ করে। কাপড়, মোজা, গেঞ্জি, সাবান চিনি, চামড়া, কলম, পেন্‌সিল, দেশলাই, ইত্যাদি কত রকমের কারখানার অনুষ্ঠান হইয়াছে। আজ সাময়িক উত্তেজনার অবসাদ কালে দেখিতে পাইতেছি যে কারবার আরম্ভ করা যত সহজ, স্থায়ী ও লাভবান করা তত সহজ নহে। অনেক সদ্যোজাত কারবারের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। আজকাল বাঙ্গালীর যৌথ-কারবারের মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল ভরসার ও গৌরবের স্থল। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে অতি ক্ষুদ্র আয়তনে ইহার সূচনা হয়। পরলোকগত ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সন্তানোপম যত্নে এই কারবারটিকে বর্দ্ধিত করিতে থাকেন। পরীক্ষা কাল উত্তীর্ণ হইলে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে কারবারটি দাঁড়াইয়াছে তখন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইঁহারা কারবারটীকে লিমিটেড্ করিয়া লয়েন। কিন্তু এই অবস্থায় আসিতে অনুষ্ঠাতৃগণকে যথেষ্ট বাধা ও বিপদ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এলোপ্যাথি চিকিৎসায় দেশীয় ঔষধের উপর এখন লোকের যে আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বেঙ্গল কেমিক্যালের দরুনই হইয়াছে। এই কোম্পানার প্রথম অবস্থায় দেশীয় ঔষধ কোন ডাক্তারই বিশ্বাস করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। যদিও এই প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করা তৎকালে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল,—তথাপি শুধু এই লইয়া থাকিলে কারবার চালান যায় না বলিয়া এই কারখানা পেটেণ্ট ধরণের বিলাতী ঔষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এটকিনের টনিক, প্যারিসের

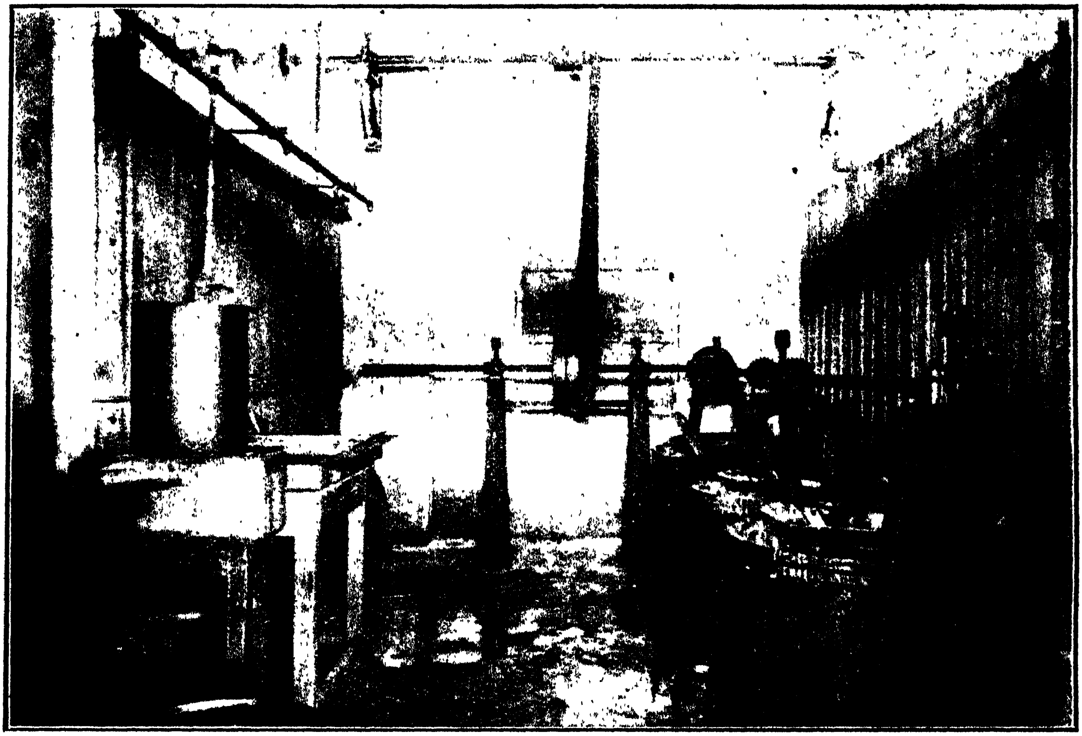


থরাদকরার ঘর।

কেমিক্যাল ফুড্ ইত্যাদির তৎকালে কাটৃতি ছিল। এই সকল বাঁধা ধরণের ঔষধ বিক্রয় করিয়া ইহাঁরা দেশীয় ঔষধ প্রস্তুত করিবার ও কিছু দিন জীবিত থাকিবার উপযুক্ত সম্পদ্ সংগ্রহ করিতেন। "যমানি জলসার" আজকাল অনেক স্থানেই প্রস্তুত হইতেছে। বেঙ্গল কেমিক্যালে এই ঔষধ প্রথম প্রস্তুত হয় এবং ইহাঁরাই যমানি জলের উপকারিতা সাধারণ্যে প্রচারিত করেন। কোম্পানীর তৎকালীন হিসাবপত্রে পাঁচ আনার যোয়ান কিনিবার রসিদ পাওয়া যায়; আজ ইহাঁরা এককালে সহস্রাধিক টাকার যোয়ান কিনিতেছেন।

২৫০০৲ টাকা মূলধন লইয়া লিমিটেড্ কোম্পানী হইবার পরেও ৩।৪ বৎসর কাল ৯১ নং আপার সারকুলার রোডে ইহাঁদের আফিস ও কারখানা উভয়ই ছিল। কারবার প্রসারিত হইলে সারকুলার রোডের বাড়ীতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া কুলান কঠিন হইয়া পড়ে। তখন ইহাঁরা ৯০ নং মাণিকতলা মেন রোডে কারখানা স্থাপিত করেন। এই সময়ে ইহাঁদের মনে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত দ্বারা লাভবান হইবার ইচ্ছা হয়। অদম্য সাহস ও বিচক্ষণ ব্যবসায়-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া ইহাঁরা গন্ধক দ্রাবক প্রস্তুত আরম্ভ করেন। ইহাঁদের দ্রাবক বাহির হইয়াছে বলিয়া বাজারে দ্রাবকের মূল্য শতকার ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা সুলভ হইয়াছে। আজকাল আপার সারকুলার রোডে কেবল আফিস আছে। সর্ব্বপ্রকার প্রস্তুতকার্য্য মাণিকতলার কারখানায় হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার এই কারখানা দেখিয়াছিলাম। আবার গত ১২ই চৈত্র তারিখে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাঁদের মাণিকতলার কারখানা দেখিতে গিয়া আনন্দিত হইয়াছি। ডাক্তার রায় এবং কারখানার সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় বিশেষ যত্ন করিয়া সমুদয় ব্যাপার বুঝাইয়া দেন। বিস্তৃত জমির উপর কলঘর, ফার্ম্মেসী, এসিড ঘর, ছুতোরের ঘর, ল্যাবোরেটরী, প্যাকিং ঘর, ঢালাইঘর, গুদাম, কর্ম্মচারিগণের মেস্ সুশৃঙ্খল ভাবে চত্বরাকারে সাজান। নানা

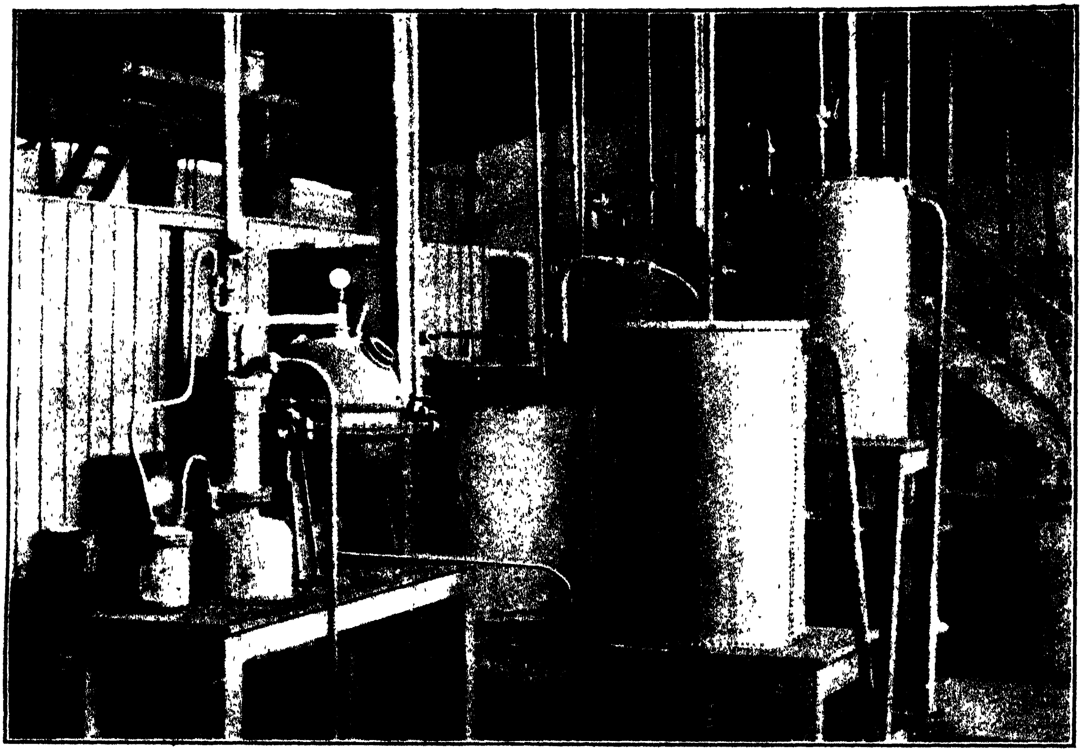


ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা। ঘনীকরণ ও নির্য্যাস বহিষ্করণের পাত্রাদি।

প্রকার শব্দে মুখরিত এই কারখানাটী জীবন্ত চিত্রের ন্যায় মনে হয়। ইহাঁদের সকল কার্য্য এবং ব্যবস্থার ভিতরে একটা প্রাণ আছে, একটা সামঞ্জস্য আছে। ইহাঁরা ঠেকিয়া শিখিয়াছেন যে কার্য্য পরিচালনার জন্য যথাসম্ভব নিজেদের কারখানার উপর নির্ভর না করিলে অসুবিধায় পড়িতে হয়। সেইজন্য এই একটী কারখানায় দশ রকমের ব্যবসায়সংঘ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রথমেই দেখি ছাপাখানা। ঔষধের কারবার আছে, আচ্ছা বেশ্; কিন্তু তার ভিতর আবার ছাপাখানা কেন? ইহাঁদের করাত কল, ঢালাইখানা, সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন করা চলে। কিন্তু একবার ঘুরিয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের সহজ উত্তর পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায় যে কারখানার সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতার জন্য এইসব আবশ্যক। আমরা দেখিলাম যে দুইটী বড় মেশিন প্রেস ও দুইটী ছোট প্রেসে কেবল নিজেদের বিজ্ঞাপন, লেবেল, ক্যাটালগ ছাপা হইতেছে। প্রিন্টার, কম্পোজিটার, মেশিনম্যান লইয়া এই ছাপাখানাকেই একটা স্বতন্ত্র কারবার মনে হয়। এত কাজ যদি বাহিরে করিতে হইত তবে ব্যয় ত বহুল পরিমাণে অতিরিক্ত হইতই, অসুবিধারও অন্ত থাকিত না। একই প্রকার ছাপার কার্য্য বারবার করিতে হয় বলিয়া ইহাঁদের ষ্টিরিওটাইপ করিবার বেশ বন্দোবস্ত আছে। ইহাঁরা নিজেরাই উড্ ব্লক, ইলেক্ট্রো প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

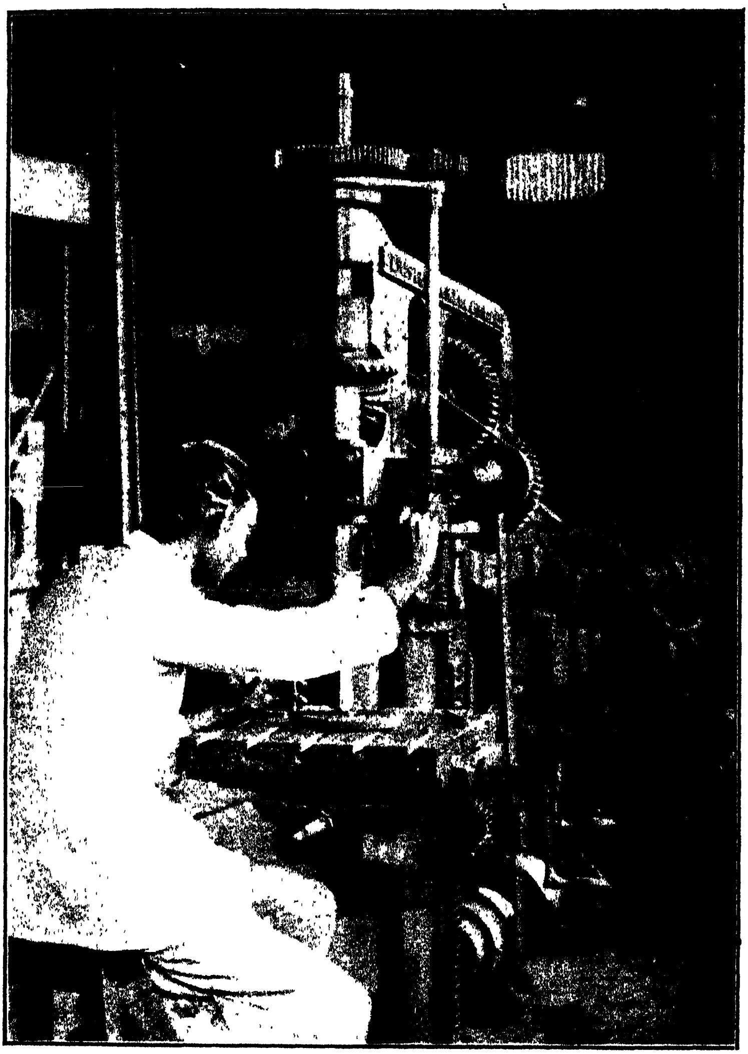
ওয়ার্কশপে গিয়া দেখি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে। জানিলাম প্রথমে গুটিকতক মাত্র কল বসাইয়া অল্প স্বল্প বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও বেশীর ভাগ ইহাঁদের ফার্ম্মেসীর ফিটিংএর কাজ করিতে হইত। নিজেদের কল ও ইমারতের কার্য্য এই ওয়ার্কশপটী থাকার দরুন সহজে ও অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইয়াছে।

নিজেরা না করিয়া বাড়ী তৈরী প্রভৃতি কোনও কোনও কাজ হয়ত বাহিরের কণ্ট্রাক্টর দ্বারা করাইলে তুল্য ব্যয়ে সম্পন্ন হইত অথচ নিজেদের ঝঞ্জাট বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু অপরের নিকট যাহা ঝঞ্জাট ইহাঁরা তাহাই



ঔষধ প্রস্তুত বিভাগ। বায়ুশূন্য পাত্রে নির্য্যাস বহিষ্করণ প্রক্রিয়া (Vacuum Extraction Process)।

অভিজ্ঞতার মূল্য স্যানে গ্রহণ করেন। নক্সা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত এত রকমের, এত বিভিন্ন কার্য্যোপযোগী কল বসাইয়া ও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ইহাঁদের পাকা শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আজ ইহাঁরা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ল্যাবোরেটরী-ফিটার্স বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ল্যাবোরেটরীতে ব্যবহার্য্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ওয়ার্কশপে প্রস্তুত হইতেছে। তদ্ব্যতীত কলেজ-সমূহের ল্যাবোরেটরীর পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার আবশ্যকীয় কাজ করিতে ইহাঁরা পারদর্শী হইয়াছেন। কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল হইতে বিশেষ উপায়ে গ্যাস প্রস্তুতের ব্যবস্থা ইহাঁরা অনেকস্থানে করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, গৌহাটী, কটক, বাঁকীপুর, মান্দ্রাজ, লাহোর, যেখানে ল্যাবোরেটরী প্রস্তুত হইতেছে, সেইখানেই ইহাঁরা আহূত হইয়া প্রশংসার সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। ল্যাবোরেটরী প্রস্তুত করিতে হইলে খ্যাতনামা অধ্যাপকগণও ইহাঁদের পরামর্শ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বেশ বড় রকমের একটী ওয়ার্কশপ আছে বলিয়াই এইসকল কাজ সুচারুরূপে করিতে পারিতেছেন। ওয়ার্কশপে অনেক লোক একত্র কাজ করিতেছে। এতগুলি লোকের প্রাত্যহিক কাজের হিসাব রাখা একটী গোলমেলে ব্যাপার। ইহাঁরা এমন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহাতে কাজের সঙ্গে সঙ্গে হিসাব হইতে থাকে। যখনই কোনও কাজ আরম্ভ হয় তখনই ক্রমিক সংখ্যা ও কাজের নাম দিয়া একটী খাম রাখা হয়। সকালে আসিয়া ফোরম্যান কাজ বিলাইয়া দেয়, সন্ধ্যাবেলায় কারিগরেরা নিজেদের কাজ তাহাদের নামে উঠাইয়া দেয়। ছোট ছোট ছাপান ফারামে তাহাদের কাজ লেখা হয় এবং অর্ডারের নাম ও ক্রমিক নম্বর তাহাতে ফেলা হয়। এ ফারামে কারিগরের মজুরীও ঘণ্টা হিসাব কষিয়া ফেলা হয়। তারপর এই ফারামগুলি যে যে কাজের জন্য সেই সেই খামের ভিতর রাখা হয়। গুদাম হইতে



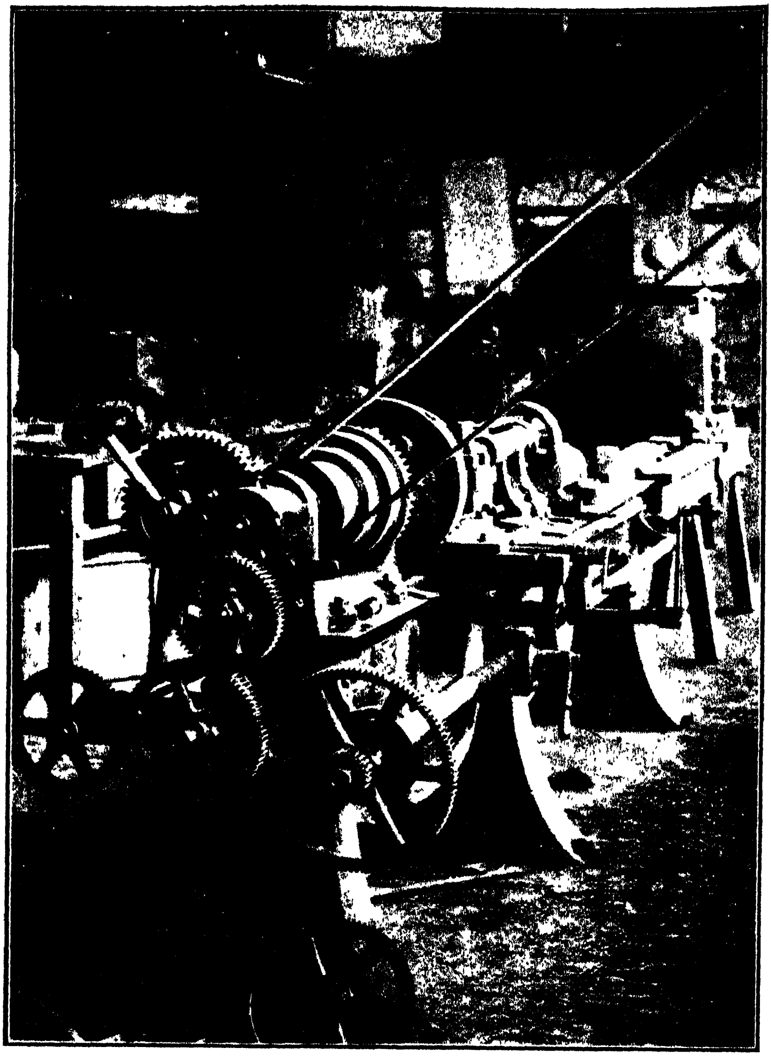
যন্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা। ছিদ্র করিবার যন্ত্র।

তেমনি ভর্ত্তি হইতে থাকে। খামের পৃষ্ঠে অভ্যন্তরস্থ ফারামের মূল্যের অঙ্কগুলি তোলা হয়। কাজ শেষ হইলে মজুরী ও জিনিষের মূল্যে একুনে যে টাকা হয় তাহার উপর শপ চালাইবার ব্যয় শতকরা হিসাবে ফেলিয়া মোট খরচা বাহির করা হয়।

ওয়ার্কশপে দেখিলাম সুন্দর সুন্দর পাখা প্রস্তুত হইতেছে। নীচে কেরোসিনের বাতি জ্বালাইয়া দিলেই পাখা ঘুরিতে থাকে। অনেক ছোট বড় যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে যাহার নির্ম্মাণকৌশল ও সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

এসিড ঘরে দুইটী সীসার চেম্বার আছে। চেম্বারগুলি আগাগোড়া সীসার তৈরী। সীসা ঝালিবার জন্য হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করিতে হয়। দক্ষ লেড্‌-ম্যানব্যতীত এই কাজ অপরের দ্বারা হইবার নহে। ইঁহারা হাতে ধরিয়া লেড্‌ম্যান তৈরী করিয়া লইয়াছেন। এমন নিপুণতার সহিত চেম্বার তৈরী যে, বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে বিলাত হইতে দক্ষ কারিগর আনিয়া করিলেও ইহা অপেক্ষা সুন্দর হইত না। চেম্বারের কাজ দিবারাত্র সমান চলে এবং প্রত্যহ ৪ হাজার পাউণ্ড এসিড্ প্রস্তুত হয়। গিল্টীর কাজে, সোডাওয়াটারের কলে প্রচুর এসিড্ বিক্রয় হয়। গবর্ণমেণ্টের টাঁকশাল, টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ, গোলা বারুদের কারখানা প্রভৃতিতে ইঁহাদের এসিড সরবরাহ হয়। এ দেশে সহযোগী রাসায়নিক দ্রব্যের কারবার না থাকায় এসিডের কাটতি অনেকটা সীমাবদ্ধ। ফট্‌কিরি, সোডা, ব্লীচিং পাউডার, গ্যালভানাইজিং প্রভৃতি কারখানায় এত এসিড্ লাগে যে ইঁহাদের এঁকএকটী কারখানার জন্ত একটী করিয়া

মাল বাহির করিবার জন্য "ম" চিহ্নিত নির্দ্দিষ্ট ফারাম আছে তাহাতে যে কাজের জন্য মাল লওয়া হইতেছে সেই কাজের নাম ও নম্বর দেওয়া থাকে। সমস্ত দিনে যত মাল বাহির হয় তাহা নিজের খাতায় উঠাইয়া ও চেক্ করিয়া জিনিষের মূল্য ফেলিয়া গুদামসরকার এই ফারামগুলি ওয়ার্কশপে ফেরৎ দেয়। যে যে কাজের জন্য জিনিষ বাহির হইল, পুনরায় সেই সেই খামের ভিতর এই ফারামগুলি রাখা হয়। কোনও কাজ যেমন অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার খামের ভিতর মজুরী ও জিনিষের মূল্য হিসাবী ফারামও

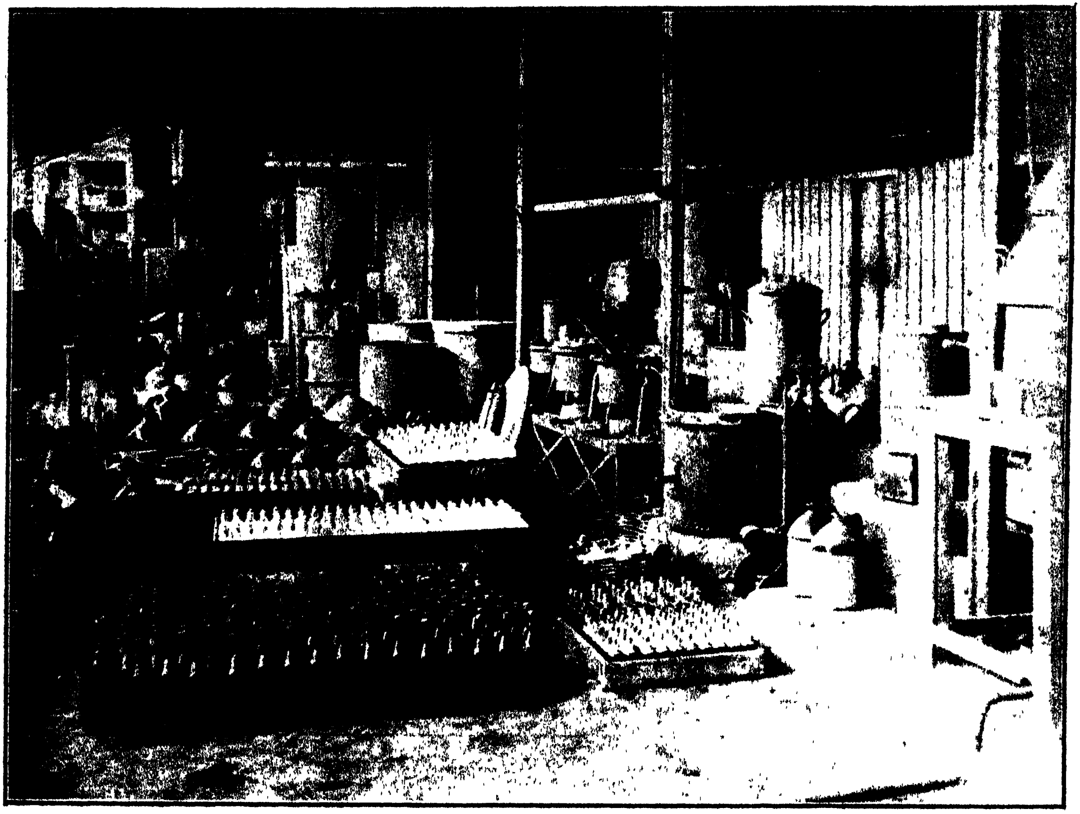


খরাদ করিবার যন্ত্র।

এসিডের ব্যবসা চলিতে পারে। নানা কারণে এদেশে ঐসব কারবার হইতে পারে নাই—শীঘ্র যে হইবে এমন আশাও নাই। অপরিমিত রেলভাড়াই ফট্‌কিরী সোডা প্রভৃতি কারবার চালাইবার প্রধান অন্তরায়। মধ্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় মাল আনাইতে যে ভাড়া পড়ে বিলাত হইতে আনিতে হইলে তদপেক্ষা কমে হয়। ইউরোপে সর্ব্বত্র পাইরাইট হইতে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত হয়। গন্ধক হইতে এসিড প্রস্তুত এক-প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। পাই-রাইটের মূল্য অনেক কম কিন্তু এ দেশে এ পর্য্যন্ত ভাল পাইরাইট পাওয়া যায় নাই। স্পেন হইতে পাইরাইট্‌ আনিতে পারিলে সুবিধা হইত কিন্তু ষ্টীমার ভাড়া দিয়া আর বিশেষ লাভ থাকে না। আমরা জানিতে পারিলাম যে বোম্বেতে এখনো বিলাত হইতে সালফিউরিক এসিড আমদানী হয়। রেল ভাড়ার আধিক্য হেতু কলিকাতা হইতে বোম্বেতে এসিড্‌ পাঠান অসম্ভব। বোম্বে গিয়া ইহাঁরা একটী এসিডের কারখানা খুলিলে হয়ত সুবিধা হইত।

ফার্ম্মেসীতে প্রবেশ করিলেই পাইপের অরণ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষ্টীম পাইপ, হাওয়ার পাইপ, নিষ্কাশিত হাওয়ার পাইপ, অপরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ জলের পাইপ ইত্যাদি। যন্ত্রাদিরও অন্ত নাই। পারকোলেটার, একষ্ট্রাক্‌-টার, ইভাপোরেটার, টীংচার প্রেস, ফিলটার প্রেস, রকমারী ষ্টীল, ইত্যাদি। সবগুলির নাম মনে রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা। আমাদেরি বাসক, গুড়্‌চী, কুটজ, নিম, এইসকল কলের ভিতর দিয়া বিভিন্ন বর্ণ গন্ধ গুণ ও নাম লইয়া বাহির হইতেছে। এই করিয়াই বেঙ্গল কেমিক্যাল ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের এমন একদিন ছিল যখন আরব, পারস্য, তিব্বত, চীন, ও সিংহল হইতে চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে সমাগত হইতেন। ডাইয়সকর্ডেস দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস হইতে এদেশে আসিয়া আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। চরক ও সুশ্রুত কোন্‌ সুদূর অতীতকালের অমরত্বে মণ্ডিত তাহা স্থির নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। তবে তাহা যে ২৫০০



ঔষধাদি শিশ বোতলে পুরিবার ঘর।

বৎসরের পূর্ব্বের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চরক সুশ্রুতের পরেই বাগ্‌ভটের "অষ্টাঙ্গহৃদয়"; তাহাও একুশশত বৎসরের পুরাণো। বোগ্দাদের খালিফার রাজসভায় হিন্দু কবিরাজগণ রাজবৈদ্য ছিলেন; সেও আজ হাজার বছরের কথা। এই সময় হইতে কয়েক শত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্র গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। এই সময়েই ধাতুঘটিত ঔষধ, ক্ষারাদি, পারদঘটিত ঔষধাদি কবিরাজী শাস্ত্রে স্থান পায়। যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা কবিরাজী শাস্ত্রকে আদরণীয় করিয়াছিল পরবর্ত্তী কালে তাহা লোপ পাইতে থাকে। কবিরাজগণ বংশানুক্রমে প্রচলিত ধরণে চিকিৎসা করায় কবিরাজী চিকিৎসা আজকালকার অবস্থায় আসিয়া পহুঁছিয়াছে। গত শতাব্দীতেও কবিরাজী চিকিৎসা এতদপেক্ষা উন্নত ছিল। ডাক্তারী চিকিৎসা প্রচলিত হওয়ায় দেশীয় ঔষধের লুপ্তপ্রায় গৌরবটুকুও বুঝি বা অন্তর্হিত হয়।• ডাক্তার কানাইলাল দে, উদয় দত্ত, এবং এইন্সলি (Ainslie), ওয়ারিং (Waring), ওয়াইজ্ (Wise), প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত তাঁহাদের জীবিত কালে দেশীয় ঔষধের গুণাবলী পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অনুসন্ধান ফলে অনেক স্থলেই দেশীয় ভেষজাদির আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রস্তুত না হওয়ার দরুন ঔষধ সাধারণ্যে তেমন করিয়া প্রচলিত হইতে পারে নাই। বেঙ্গল কেমিক্যাল এই কার্য্য গ্রহণ করিয়া দেশের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

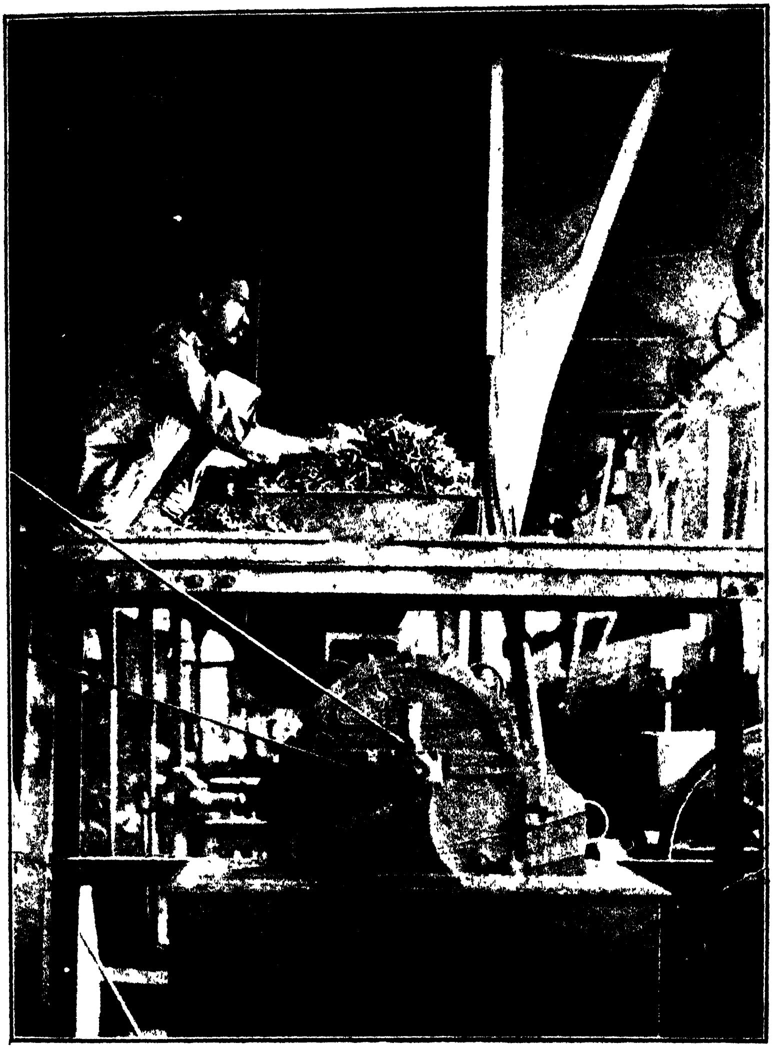
আজকাল ইঁহাদের ঔষধপ্রস্তুত-বিভাগে দেশীয় ঔষধই বেশী প্রস্তুত হইতেছে। বিলাতী স্পিরিট বা সুরাসার কিনিয়া



ঔষধাদি কাগজে মুড়িয়া প্যাক করিবার ঘর



গন্ধক দ্রাবক প্রস্তুত করিবার সীসানির্ম্মিত চেম্বার।

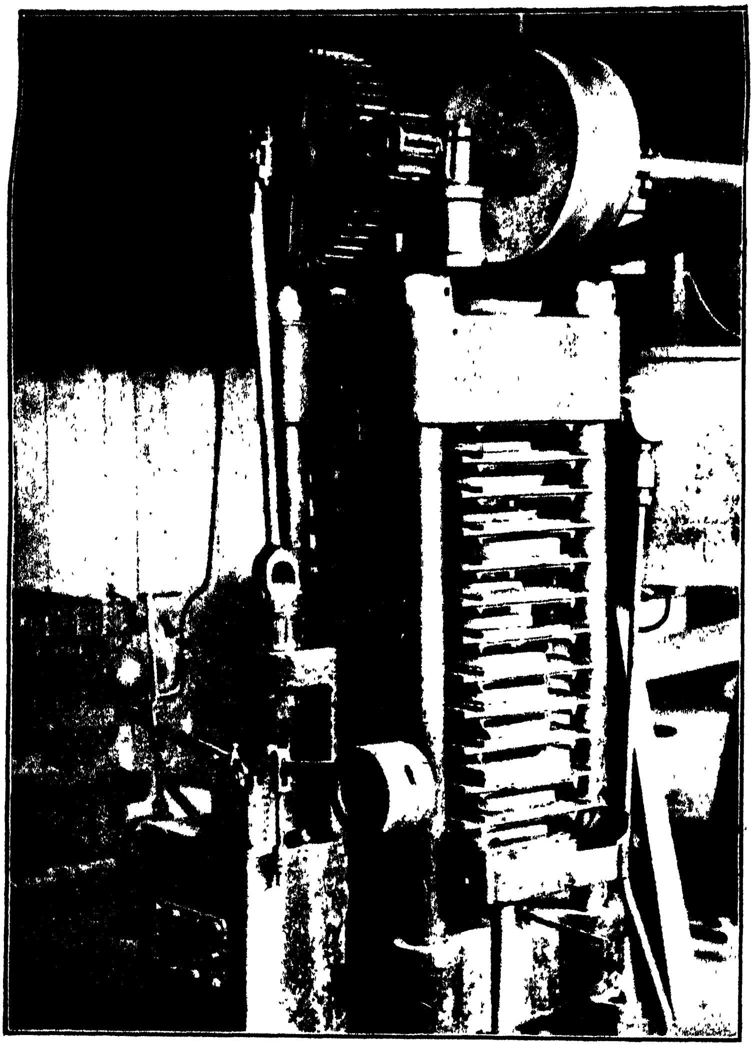


দেশী ঔষধ চূর্ণ করিবার যন্ত্র।

টাংচার ইত্যাদি কিছুকাল ইঁহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গত দুই বৎসর হইল আবগারী বিভাগের এক নূতন আইন হইয়াছে তাহাতে বিলাতী স্পিরিটের উপর এত শুল্ক বসিয়াছে যে ফলে বিলাতী স্পিরিট অপেক্ষা বিলাতে প্রস্তুত টাংচার ইত্যাদির মূল্য কম দাঁড়াইয়াছে। দেশে যে স্পিরিট হয় তাহার শুল্ক বাড়ে নাই কিন্তু তাহা এত দুর্গন্ধ যে টাংচারে ব্যবহৃত হইতে পারে না। স্পিরিটের এই অসুবিধা হওয়াতে ফার্ম্মাকোপিয়ার টাংচার ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার আশা ইঁহারা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দেশীয় স্পিরিটের উপর শুল্ক কম আছে বলিয়া ইঁহারা সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে চোলাই কারখানা খুলিয়া স্পিরিট প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে শুধু ঔষধের উপযোগী বিশুদ্ধ স্পিরিট নয়, মিথিলেটেড্ স্পিরিটও প্রস্তুত করিবেন। প্রস্তাবটী অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে দুই লক্ষ টাকা মূলধন বাড়াইয়া লইয়াছেন। এক্ষণে মূলধন পাঁচলক্ষ টাকা হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ইঁহারা তিন লক্ষ টাকার উপর শতকরা ৬৷৷০ হিসাবে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ দিতেছেন।

আজকাল প্রতিবৎসর বহু লক্ষ টাকার মহুয়া বিদেশে যায়। জর্ম্মনীতে গোরু, ভেড়া, শূকরের খাদ্য বলিয়া মহুয়া এত রপ্তানী হয়। ইঁহারা স্পিরিটের ব্যবসা খুলিলে প্রতিবৎসর ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকার মহুয়া কিনিবেন। ভারতে স্পিরিটের বাজার কাহার হইবে এ লইয়া আজকাল জর্ম্মনীতে ও জাভাতে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দিনেমারেরা স্পিরিটের দর খুব কমাইয়া দিয়াছে। ইঁহারা সাহস করেন যে জাভা স্পিরিট অপেক্ষা কম মূল্যে স্পিরিট বিক্রয় করিয়াও ইঁহারা লাভ করিবেন। ইঁহারা যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহাই লাভজনক করিয়াছেন। স্পিরিটের ব্যবসাও যে সফল হইবে তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। সুলভ স্পিরিটের কারবার এদেশে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। ইঁহারা করিলে একটা নূতন জিনিষ হইবে।

সুগন্ধ প্রস্তুত বিভাগে ইঁহারা দেশের ফুল হইতে সুগন্ধী এসেন্স ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন। ফুল ফুটিবার সময় হইলে গাজিপুর, কনৌজ, কটক প্রভৃতি স্থানে যন্ত্রাদি সহ লোক-



জলের চাপে তৈলানিষ্কাশন যন্ত্র। (Hydraulic Press-Oil Mill)।

জন পাঠাইয়া বিশেষ উপায়ে একস্‌ট্রাক্‌ট্‌ প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসেন। একস্‌ট্রাক্‌ট্‌ হইতে এসেন্স প্রস্তুত এখানকার ল্যাবোরেটরীতে ছোট ছোট মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এই এক্‌স্‌ট্রাক্‌ট ভিন্ন অন্য উপাদানও এই এসেন্সে কিছু কিছু আছে।

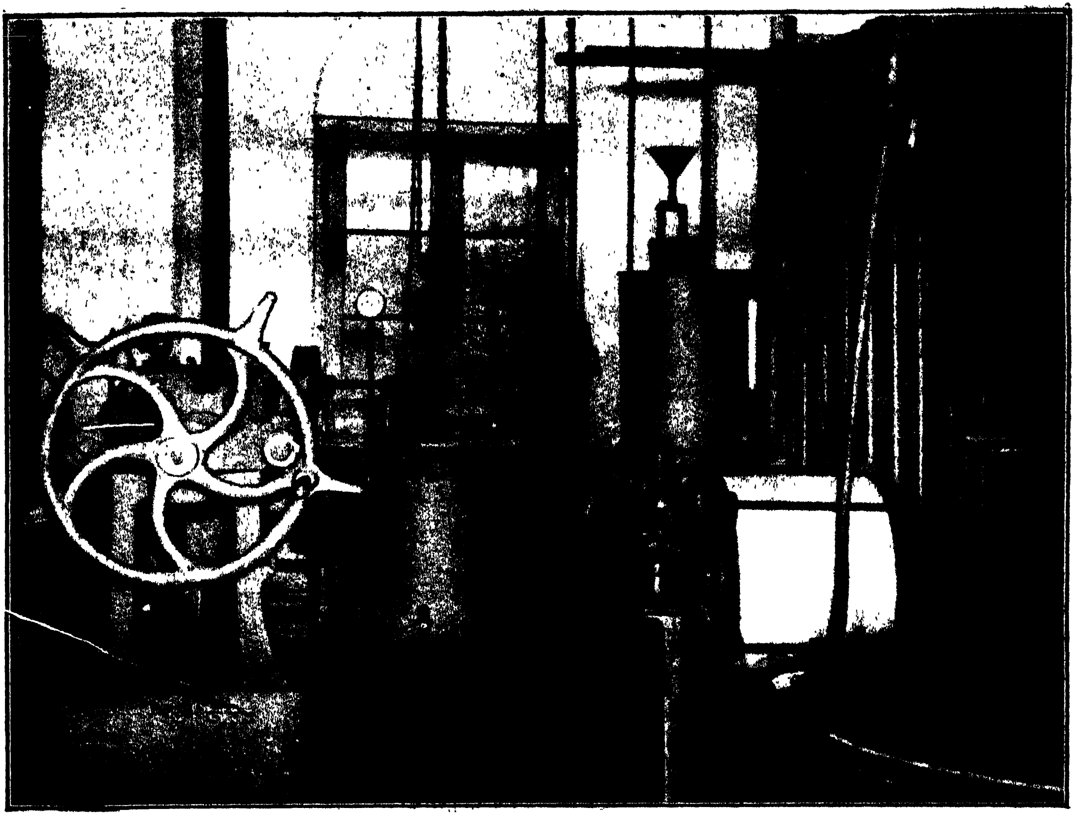
কারখানাটী খালের উপর হওয়ায় জাহাজ হইতে মাল আনাগোনার বেশ সুবিধা। ফার্ম্মেসী ও এসিডঘরের ভিতর দিয়া ও বাহিরে সর্ব্বত্র ট্রলিলাইন আছে। তাহাতে মাল চলাচল সহজ হইয়াছে। খাল হইতে জল লইবার লাইসেন্স করিয়া পাইপ বসান আছে। দরকার হইলে দমকল দ্বারা খাল হইতে জল তুলিয়া পুকুরে ফেলা হয়। আফিস কারখানায় মাল যাতায়াতের জন্য ঘরেই কতকগুলি গোরুর গাড়ী আছে। কারখানা ও আফিস প্রাইভেট্‌ টেলিফোন দ্বারা সংবদ্ধ। সরঞ্জামের কোন ক্রটীই নাই। কুড়িজন লোক লইয়া ইঁহাদের একটী ফায়ার ব্রিগেড্‌ বা আগুন নিবাইবার দল আছে। লোকগুলি নিজেদের কর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। বিপদসূচক ঘণ্টা দিয়া সপ্তাহে দুই তিনবার ড্রিল করান হয়। যে কোন সময় বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি করিলে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে জল ফেলিতে তিন মিনিটের বেশী সময় লাগে না। সময় সময় গভীর রাত্রে অতর্কিতে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া মশাল জ্বালিয়া ড্রিল দেওয়া হয়। এই সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কারবারটীর প্রত্যেক অঙ্গটীই পূর্ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টার পরিচয় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। যাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিয়া খাটিতেছেন তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। ইঁহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত দেখিলে বাঙ্গালীর কর্ম্মকুশলতার উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়।

আলোচনা

পৌষ-সংক্রান্তি।

(১)

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার মুসলমান বালকেরা পৌষমাসে উৎসব করিয়া থাকে। পৌষমাসে প্রত্যহ সন্ধ্যার পরেই মুসলমানবালকেরা দল



শিশুখাদ্য প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদি।

বাঁধিয়া বাড়ী বাড়ী যাইয়া ছড়া আবৃত্তি করে। সঙ্গীতের সুরের মত এই আবৃত্তিরও এক রকম সুর আছে। উহা শুনিতে বড়ই মধুর। এই বালকদলের নাম "কুলার বউর দল"। দল প্রত্যেক বাড়ী উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব প্রথমেই সমস্বরে "কুলার বউ" "কুলার বউ" বলিয়া দুইবার উচ্চ রব করিয়া উঠে। উহা হইতেই দলের ঐরূপ নাম হইয়াছে। বিগত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রকাশিত বরিশালের পৌষ-সংক্রান্তির ছড়াগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে বিক্রম-পুরের প্রচলিত ঐরূপ ছড়ার সহিত বরিশালের ছড়ার অনেক সাদৃশ্য আছে। নিম্নলিখিতরূপ ছড়া আবৃত্তি করিয়া বিক্রমপুরের "কুলার বউর দল" সকল বাড়ী হইতেই চাউল দাউল কিংবা পয়সা আদায় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দলের সর্দ্দার সে ডাকিয়া ডাকিয়া প্রত্যেক পংক্তি গোড়ায় গাহিয়া দেয়, তৎপশ্চাৎ অন্যান্য সকলেই সমস্বরে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে।

আইলাম রে বরণে
ঠাকুর-গোঁসাই-চরণে,
ঠাকুর গোঁসাই দিল বর(১)
চাউল কড়ি বাইর কর,
চাউল আর দেও কড়ি
ঐ ঘরেতে সোনার লড়ি(২),
সোনার লড়ি রূপার থাল
ঐ ঘরখান দেখতে ভাল,
ঐ ঘরের উঁচা(১) টুঁই
টাকা আছে মোচা দুই।
বাইনা বাড়ী(২) গিয়া রে
একটা টাকা পাইলাম রে।
বাইনা বাড়ী ঘুঘুর বাসা
টাকা ভাঙ্গায় দু' দু' পয়সা,
ন' ন' মাসে ন' ন' টাকা
আমরা পাইলাম ছয় টাকা।
টাকা দেও বাড়ী যাই
বাঘের বয়ান এলা(৩) গাই।
কুলার বউ　কুলার বউ॥

তৎপরেই বাঘের গান গাহিয়া থাকে। ইহার মধ্যে অনেক কথা অশ্লীলও আছে, তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্টগুলি নিয়ে প্রকাশিত করিলাম।

আর বাঘ—আর বাঘ।
এক বাঘ চৈতা(৪)
বাওন(৫) মাইরা(৬) নিল পৈতা।
আর বাঘের গলার দড়ি
সারা আড়ি(৭) লড়ালড়ি(৮)।

(১) বর—এখানে আদেশ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) লড়ি—যষ্টি।

আর বাঘ হৈ চৈ
গোয়াল মাইর্য়া খাইল দই।
আর বাঘেরা বাপে পুতে(৯)
গাছে উঠ্যা গায়ে মুতে(১০)।
আর বাঘ অইট্যা(১১)
গোয়ালের দই খাইল লুইটা(১২)।
আর বাঘেরা দিল লাফ
ঐ ব্যাটা বুড়ীর বাপ।
আর বাঘের গলায় কাঁটা
চাউল দিবা পাঁচ বউট্যা(১৩),
না দেও যদি কাউল্‌কা(১৪) আইমু
বইক্যা(১৫) তোমাগো উদ্ধার করমু।

৩০শে পৌষ তারিখে বালকগণ সকল বাড়ী হইতে চাউল দাউল অথবা পয়সা সংগ্রহ করিয়া কোনও জঙ্গলের মধ্যে সমবেত হয়। জঙ্গলের কতক জায়গা পরিষ্কার করিয়া সেখানে রাঁধিয়া বাড়িয়া সকলে মিলিয়া ভোজন করে। এইরূপ ভোজনকে তাহারা "জোলাভাতি" (চড়িভাতি?) বলিয়া থাকে।

(২)

এখানে হিন্দু বালিকাদিগের মধ্যে "মাঘমণ্ডলের ব্রত"ও প্রচলিত আছে। পৌষমাসের সংক্রান্তি দিন হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘমাসের সংক্রান্তি দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া বালিকাগণ পুকুরের ধারে আসিয়া বসে। হাতে এক মুঠা দুর্ব্বা লইয়া জল-সিঞ্চন করিয়া গানের সুরে ছড়া আবৃত্তি করে। বোধ হয় অতি প্রত্যুষে "গাত্রোত্থান করা" শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই ব্রতের প্রচলন হইয়াছে। তাহা ছাড়া ছড়াগুলি শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া "আত্মনির্ভরতা" শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এইরূপ ছড়ার সৃষ্টি। দুর্ব্বার মুঠা দ্বারা জলসিঞ্চন করিতে করিতে বালিকাগণ নিম্নলিখিত ছড়াগুলি গাহিয়া থাকে।

উঠ উঠ সূর্য্যিমামা ঝিকিমিকি দিয়া
বামুন বাড়ীর পুব দিক্‌ দিয়া,
আইস আইস সূর্য্যিমামা আমাগো বাড়ী আইস
আমাগো উঠানে রৌদ ছড়াইয়া বইস।
বড়সি বাইতে গেলাম পুকইরে(১) আজ
রাগল্‌ বোয়াল পাইলাম মাছ।
পাইলাম পাইলাম কুটব কে?
ওরা(২) আইল কুটনী(৩) দা হাতে কইর্য়া
অগ(৪) দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া
নিজে কুটলাম যেমন তেমন কইর্য়া।

(১) উঁচা=উচ্চ। (২) বাইনাবাড়ী=বেনেবাড়ী।
(৩) এলা=এখন। (৪) চৈতা=চিত্রিত বা চিতাবাঘ।
(৫) বাওন্=ব্রাহ্মণ। (৬) মাইর্য়া=মারিয়া। (৭) আট্=হাট।
(৮) লড়ালাড়ি=দৌড়াদৌড়ি। (৯) পুতে=পুত্রে।
(১০) মুতে=মূত্রত্যাগ করে। (১১) অইট্যা=সম্ভবতঃ "হটিয়া"।
(১২) লুইট্যা=লুঠিয়া। (১৩) বেত্রনির্ম্মিত চাউল রাখিবার পাত্র।
(১৪) কাউলকা=কল্য। (১৫) বইক্যা=বকিয়া।
(১) পুকইরে=পুকুরে। (২) ওরা=এখানে অন্য যে কোনও লোকের কথা বুঝাইতেছে। (৩) কুটনী=মাছ কুটিবার লোক।
(৪) অগ=উহাদিগকে।

কুট্‌লাম্ কুট্‌লাম্ রাঁধ্‌ব কে?
ওরা আইল রাঁধুনী কড়াই হাতে কইর্য়া।
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া
নিজে রাঁধলাম যেমন তেমন কইর্য়া।
রাঁধলাম রাঁধলাম খাইব কে?
ওরা আইল খাওনী থাল হাতে কইর্য়া।
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া
নিজে খাইলাম যেমন তেমন কইর্য়া।
খাইলাম খাইলাম কাঁটা কুড়াইব কে?
ওরা আইল কাঁটা কুড়ানী গোবর হাতে কইর্য়া।
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া
নিজে কুড়াইলাম যেমন তেমন কইর্য়া।
কুড়াইলাম কুড়াইলাম থাল ধুইব কে?
ওরা আইল থাল ধুয়নী জল হাতে কইর্য়া।
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া
নিজে ধুইলাম যেমন তেমন কইর্য়া॥

অর্থাৎ সকল কার্য্যই, অন্যের উপর ভার না দিয়া নিজেই যেমন পারি করিব—এই শিক্ষাই ইহার মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। তৎপরে বালিকাগণ পুকুর হইতে বাড়ীতে আসিয়া মাটিতে গোলাকৃতি "আঁক" কাটিয়া তাহাকে লাল নীল সবুজ রঙ্গের গুঁড়ি দ্বারা চিত্রিত করে। যে বালিকা যত বৎসর ধরিয়া ব্রত আরম্ভ করিয়াছে, সেই বালিকা ঐরূপ ততটী "আঁক" কাটিবে। সেই আঁকের উর্দ্ধদিকে একটী সূর্য্য এবং নিম্নে একটী অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত করা হয়। সকলগুলিকেই ঐরূপ চিত্রিত করা হয়। সকলের নিম্নে ব্রতকারিণীর বসিবার আসন অঙ্কিত করা হইয়া থাকে। সেই আসনে বসিয়া ফুল হাতে লইয়া ব্রতকারিণী নিম্নলিখিত ছড়া কহিয়া সেই "আঁক" পূজা করিয়া থাকে। এই ছড়া গানের সুরে বলিতে হয় না, শুধু আবৃত্তি করিয়া যায়।

মাঘমণ্ডল—সোনার কুণ্ডল
সোনার কুণ্ডলে ঢাইল্যা(১) ঘি
আমরা বড়-মানুষের পুত্রের ঝি।
(পুনঃ) মাঘমণ্ডল - সোনার কুণ্ডল
সোনার কুণ্ডলে ঢাইল্যা মধু
আমরা বড়-মানুষের পুত্রের বধূ।
(প্রণাম) সূর্য্যিঠাকুর প্রণাম
পূরে যেন মনস্কাম।
সূর্য্যি ঠাকুর বৈঠ, বৈঠ, বৈঠ॥

এই ব্রত পাঁচ বৎসর ধরিয়া করিতে হয়। বালিকারা যখন ভালরূপ কথা বলিতে শেখে, সেই সময় হইতেই তাহাদিগকে ব্রত গ্রহণ করান হয়। যেই বৎসর ব্রত সম্পূর্ণ হয় (অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়) সেই বৎসর মাঘমাসের সংক্রান্তির দিন চন্দ্রসূর্য্যবিশিষ্ট পূর্ব্বকথিত গোলাকার "পঞ্চমণ্ডলকে" অতি উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়া পূজা করা হয়। যে বালিকা নিজ 'আঁক' সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর করিয়া চিত্রিত করিতে পারে তাহার প্রশংসা হয়। সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে ক্ষীরের নাড়ু, নারিকেলের নাড়ু, বাতাসা, সন্দেশ প্রভৃতি অনেক রকম খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়।

শ্রীপ্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১) ঢাইল্যা=ঢালিয়া।

পৌষ-সংক্রান্তি।

আজ পৌষ-সংক্রান্তির একটা ছড়া পাঠাইতেছি। ইহা ময়মনসিংহ শহরের উপকণ্ঠে প্রচলিত। পৌষ-মাসের প্রথম হইতে রাখাল বালকেরা সন্ধ্যাবেলা এই ছড়া গাহিয়া শহরের বাসায় বাসায় ঘুরিয়া চাল কড়ি সংগ্রহ করে। দলের সব চেয়ে বড় বালকটি প্রথম গায়, তারপর কোরাসে সকলে গাহিতে আরম্ভ করে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ছড়াটি তাহারা গাহিয়া থাকে :—

আইলাম রে ভাই কান্দি ভাইয়া,
বাঘ রইছে হরিণ লইয়া;
হরিণ খাইয়া সেজ্জা (১) খায়,
সোনার লাঙ্গল ঘরে যায়।
সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল,
ঘর-জামাইয়া জুড়ছে হাল।
জুড়ছে হাল জুড়ছে মই
আমোন ধানের গুড়িত (২) রে।
আমোন ধানের বড় বড় পাতা,
পোলায় (৩) খায় বুড়ীর মাথা।
—ও পোলা আমার রে
বানবাসী যায়াম্ (৪) রে—।
বনেতে বেরুয়া (৫) বাঁশ,
সেখানেতে নীল হাঁস।
নাল হাঁস নীল পেয়রা (৬)
হাত বাড়াইয়া পাইলাম ফোরা;
মাথা ভইরা (৭) পাইলাম তেল
শরীর জুড়াইয়া গেল।
আইট্টা-কলা (৮) ডিঙ্গার (৯) পাত,
ঘরগুষ্টি সেলামে থাক।
থুব, থুব।

আরো অন্যান্য ছড়া আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকগুলিতেই অশ্লীলতা ঢুকিয়াছে।

এইরূপে তাহারা চাল কড়ি সংগ্রহ করিয়া সংক্রান্তির দিন গরু বাছুর স্নান করাইয়া মাঠে লইয়া যায়। মাঠে গরু চরিতে থাকে আর তাহারা বনের ছায়াযুক্ত কোনো বৃক্ষের তলে সিন্নি রাঁধিয়া সকলে মিলিয়া হাসিয়া নাচিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করে।*

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

(১) সেজ্জা—সজারু। (২) গুড়িত—গোড়াতে। (৩) পোলায়—ছেলে। (৪) যায়াম—যাইব। (৫) বেরুয়া—এক প্রকার বাঁশ। (৬) পেয়রা—পায়রা, কবুতর। (৭) ভইরা—ভরিয়া। (৮) আইট্টা কলা—এক প্রকার বিচিযুক্ত কলা। (৯) ডিঙ্গা—ঐ।

'নবমী-গাওয়া'-উৎসব।

পৌষ-সংক্রান্তি* ও নবান্নের† ন্যায় 'নবমী-গাওয়া'-ও বরিশালের বহুকাল-প্রচলিত একটা সাধারণ উৎসব। এই উৎসব (দুর্গাপূজার সময়) মহানবমীর দিন বৈকালে প্রধানতঃ নমঃশূদ্র সম্প্রদায় দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে নমঃশূদ্রগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া,—নানাবিধ সং সাজিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং গৃহস্থের নিকট হইতে নারিকেল ও 'ক্যালা-হন্দেশ'‡ বক্‌সিস লইয়া তৎবিনিময়ে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক একটা ভোজের আয়োজন করিয়া থাকে।

এই উৎসব উপলক্ষে নমঃশূদ্রগণ যেসকল গান গাহিয়া বেড়ায়, তন্মধ্যে নিম্নধৃত বন্দনা-সঙ্গীতটীই প্রধান—ইহা সর্ব্বত্র সর্ব্বাগ্রে গীত হইয়া থাকে।

---

* চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত মৎসঙ্কলিত পৌষ-সংক্রান্তি ও নবান্নসম্বন্ধীয় ছড়াগুলিতে কয়েকটা মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটিয়াছে। উহাদের মধ্যে 'কুলাইরে দেবা কত ধন' স্থলে মুদ্রিত 'কুলাই রে দেবতা কত ধন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভুলগুলি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির বুঝিতে কষ্ট হইবে না।—লেখক।

† গত সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত নবান্নসম্বন্ধীয় ছড়াটীর একটী পাঠান্তর সংপ্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। উহা এইরূপ :—

দাঁড় কাউয়ারে আহ্বান করা—ইত্যাদি

............কাক বলি লইও,
ডোঙ্গা ভরা চাউল দিমু
প্যাট্টী ভরা খাইও,
এট্টি এট্টি কলা দিমু,
পুব দিকে লইয়া যাইও।

[টীকা :—ডোঙ্গা = কলাগাছের খোলে (বেটোতে) প্রস্তুত পাত্র-বিশেষ। চাউল = চাউলের জল; বরিশালে 'চাউলমাখা' নামে প্রসিদ্ধ। প্যাট্টী = পেটটী। এট্টি = একটী। পুব = পূর্ব্ব।]

নবান্নের দিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে 'পার্ব্বণ' করিয়া কাককে 'বলি' (ডোঙ্গাপূর্ণ চাউল, কলা ইত্যাদি) দেওয়ার নিয়ম। ঐ বলি কাক কর্ত্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থের আহার করা অধর্ম্ম। বলির কলা মুখে করিয়া কাক পূর্ব্ব দিকে গমন করিলে গৃহস্থের কল্যাণ সূচিত হয়। তাই, নিমন্ত্রণ কালেই কাককে শুভপথ অবলম্বনে অনুরোধ করা হইয়াছে। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে বাটীতে 'পদধূলি' দেওয়ার নিমিত্ত অকুলীন গৃহস্থ যেমন কুলীন বেহাইকে সাধাসাধি করিয়া থাকেন, নবান্ন উপলক্ষে কাক নিমন্ত্রণেও সেইরূপ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য এই, বেহায়া বেহাইগণের ন্যায় এই নির্লজ্জ পক্ষীও নিমন্ত্রণের দিন সত্য সত্যই দুর্লভদর্শন হইয়া উঠে।—লেখক।

‡ কলা ও সন্দেশ (নারিকেলের লাড়ুকে) ইহারা একসঙ্গে 'ক্যালা হন্দেশ' বলিয়া উচ্চারণ করে। এইরূপ উচ্চারণ ভাবসূত্রে (By association of ideas) বরিশালবাসীর মনে দুর্গাপূজার কথা সহজে স্মরণ করাইয়া দেয়।—লেখক।

বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারাওণ। (১)
পেরথোমে বন্দিলাম মাগো দুগগার চরোণ। (২)
বন্দোম্ সরেস্বতী—ইত্যাদি॥
তারপরে বন্দিলাম মোরা অসুরের চরোণ।
বন্দোম সরেস্বতী—ইত্যাদি॥
তারপরে বন্দিলাম মোরা জয়ারি (৩) চরোণ।
বন্দোম সরেস্বতী—ইত্যাদি॥
তারপরে বন্দিলাম মোরা বিজয়ার (৪ চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী—ইত্যাদি॥
তারপর বন্দি যে দেব কার্ত্তিকের (৫) চরোণ।
বন্দোম সরেস্বতী—ইত্যাদি॥
তারপর বন্দি যে দেব গোণেশের (৬) চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারাওণ॥

বর্ত্তমানে বরিশালে ও তৎসন্নিহিত জেলাসমূহে নমঃশূদ্রজাতির ধর্ম্মঘট হওয়ায় 'নবমী-গাওয়া'-উৎসবের অনেকটা বিলোপ ঘটিয়াছে, বটে; কিন্তু ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বেও আমরা ইহার যেরূপ ব্যাপকতা দেখিয়াছি এবং এতদুপলক্ষে পল্লীবাসী নমঃশূদ্রগণের যে উদযোগ-উৎসাহের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে ইহাকে বঙ্গের একতম প্রধান ও প্রাচীন সাধারণ-উৎসব বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

পৌষ-সংক্রান্তি, নবান্ন ও নবমী-গাওয়ার ন্যায় আরো অনেক উৎসব এখনও পল্লীগ্রামে প্রচলিত আছে। ঐসকল উৎসবের প্রধান উপাদান—ছড়া-আবৃত্তি বা নৃত্যগীত। আমরা এবম্বিধ উৎসবের অনেক ছড়া ও গান সংগ্রহ করিয়াছি।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

মন্তব্য:—পৌষসংক্রান্তি বা তৎসম উৎসব সম্বন্ধে এত লেখা আমরা প্রত্যেক মাসে পাইতেছি যে সেসমস্ত ছাপা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং অতঃপর এসম্বন্ধে আর কোনো নূতন প্রবন্ধ গৃহীত ও মুদ্রিত হইবে না।—সম্পাদক, প্রবাসী।

মহত্ত্ব

(সেখ সাদীর মূল পারসী হইতে)

অমূল নির্ম্মল ওই হীরক রতন
নিজগুণে দীপ্ত করে অন্ধ ধরাতল;
ধূলিরাশি পশে যদি ত্রিদিব ভবন
তবুও হীনতা তার প্রকাশে কেবল।

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(১) বন্দম্ সরস্বতী...নারায়ণ। (২) প্রথমে......দুর্গার-ই চরণ। (৩) জয়া—লক্ষ্মী। (৪) বিজয়া—সরস্বতী। (জয়া-বিজয়া 'পাশপুতুলা' নামেও পরিচিত)। (৫) কার্ত্তিক। (৬) গণেশ।

প্রবাসী-বাঙ্গালী

রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু

আজ আমরা যাঁহার জীবনের গুটিকতক কথা সাধারণের গোচর করিতে উপস্থিত, তিনি ধর্ম্মজগতের একজন নিভৃত সাধক, কর্ম্মজগতের অনাড়ম্বর কর্ম্মী, সমাজের প্রচ্ছন্ন সংস্কারক, এবং বীণাপাণির নীরব সেবক। তিনি যদি আজ সভাসমিতির পীঠস্থানে বক্তৃতার ঝঙ্কারে সহস্র চক্ষুর লক্ষ্য হইতেন, অথবা সাহিত্যসেবাব্রতে আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিতেন, তাহা হইলে আজ গুণিগণের অগ্রণীদিগের চরিতাভিধানের প্রকৃষ্টস্থান তাঁহার প্রাপ্য হইত। বঙ্গের সাহিত্যরসগ্রাহিবর্গ তাঁহার প্রতিভার কতদূর আদর করিয়াছেন তাহার নিদর্শন পাই নাই, কিন্তু, তিনি যে য়ুরোপীয় সুধীসমাজে সমাদৃত তাহার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু। তিনি কাশীর বর্ত্তমান জজ।

শ্রীশবাবু ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ২১ মার্চ্চ, পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ অব্দের আগষ্ট মাসে, যখন তিনি ৬ বৎসরের শিশু, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার জননীই তাঁহার শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। বাল্যে ফরীদকোটের সুপ্রসিদ্ধ রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট তাঁহার শিক্ষা লাভ হয়। ১৮৭৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়, তাহাতে শ্রীশ বাবু পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে প্রথম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক পুরস্কার পান। আরবী ভাষা তাঁহার শিক্ষণীয় দ্বিতীয় ভাষা (Second language) ছিল। ১৮৮১ অব্দের বি. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাহাতে ইংরাজি, রসায়ন, জড়বিজ্ঞান, প্রাণিতত্ত্ব, এবং গণিত তাঁহার পরীক্ষার বিষয় ছিল। এই সময় লাহোরে শিক্ষাদান কার্য্য শিখাইবার জন্য সেনট্রাল ট্রেনিং কলেজ (Central Training College) প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশবাবু প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তথায় অধ্যয়ন করিয়া, ১৮৮৩ অব্দের মে মাসে শিক্ষকতা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং



রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু।

শ্রীশবাবুকে যদি ঐ নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের হেডমাষ্টার করা হয়, তবেই তাহারা তথায় যাইবে, অন্যথা নহে। ছাত্রগণের এই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইলে বিদ্যালয়টির শ্রী ফিরিয়া যায়। শ্রীশবাবু তথায় সুব্যবস্থা সংস্কার ও উন্নত প্রণালীর শিক্ষা প্রবর্ত্তন দ্বারা স্কুলটিকে প্রকৃতই "আদর্শস্কুলে" পরিণত করেন। এই বিদ্যালয়টি এখনও বিদ্যমান আছে। এখন ইহার হেডমাষ্টার জনৈক ইংরাজ।

লাহোরে অবস্থানকালে তিনি ষ্টুডেণ্টস্ ক্লব্ নামে একটী ছাত্র-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং "ষ্টুডেণ্ট্স্ ফ্রেণ্ড্" নামে একখানি সাময়িক পত্রও বাহির করেন। এই সময় তিনি যে উর্দ্দু ভাষায় একখানি প্রাকৃতিক ভূগোল রচনা করিয়াছিলেন তাহা তথাকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়। পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ রায় সাহেব গোলাব সিংহ শ্রীশবাবুর উক্ত সাময়িক পত্র এবং গ্রন্থ লইয়া স্বীয় যন্ত্রালয়ের কার্য্যারম্ভ করেন। শ্রীশবাবু পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের

লাহোর গভর্মেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় ট্রেনিং স্কুলের সংসৃষ্ট "মডেল স্কুল" বা আদর্শ বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; কিন্তু শ্রীশবাবু এমনই লোকপ্রিয় ছিলেন এবং ছাত্রগণ ও তাহাদের অভিভাবকগণের হৃদয় এতদূর অধিকার করিয়াছিলেন যে যতদিন তিনি গভর্মেণ্ট স্কুলে ছিলেন, ততদিন নবপ্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুলটি অচলপ্রায় হইয়া ছিল। কোন ছাত্রই তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য বিদ্যালয়ে গমন করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহারা অবশেষে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যে,

সংস্কার সম্বন্ধে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বহুলাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে লাহোরে "Lahore Bengali School" নামে একটি বিদ্যালয় ছিল; তিনি ঐ স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। স্কুলটি এখন নাই।

শ্রীশবাবু যখন শিক্ষকতা করিতেছিলেন সেই সঙ্গে আইন অধ্যয়নও করিতেছিলেন। তিনি ১৮৮৩ অব্দে এলাহাবাদে আসিয়া আইন পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া লাহোরের শিক্ষকতা কার্য্য ত্যাগ করিয়া

মীরাটে আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি বেরেলীর অস্থায়ী মুন্সেফ মনোনীত হন এবং ছয় মাস মুন্সেফী করিয়া ১৮৮৬ অব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করিতে থাকেন। এখানে সাঙ্কেতিক-লিখন-কলাভিজ্ঞ জনৈক (Judgment Reporter) রায় লিখিবার রিপোর্টারের প্রয়োজন হইলে সেই পদে শ্রীশবাবুই মনোনীত হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রেখাক্ষর বা সাঙ্কেতিক (Shorthand) লেখা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার চর্চ্চাও রাখিয়াছিলেন সুতরাং হাইকোর্টের রায়-লেখক রিপোর্টরের কার্য্য তিনি অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতে থাকেন।

শ্রীশবাবু যখন মীরাটে ওকালতী করিতেছিলেন, তখনই সংস্কৃত ভাষানুশীলনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে এবং এলাহাবাদে আসিয়া অধিক উদ্যম ও আগ্রহের সহিত এই দুরূহ ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার লাভে যত্নপর হন। পরে তিনি বৈদিক সাহিত্যানুশীলন করিতে উদ্যত হন এবং পাণিনি আয়ত্ত না হইলে বেদাধ্যয়ন বৃথা, ইহা বুঝিতে পারিয়া, প্রথমে পাণিনি অধ্যয়নেই মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এই সুবিশাল এবং সুকঠিন শাস্ত্রানুশীলনে যথেষ্ট শক্তি ও সময়ের প্রয়োজন দেখিয়া শ্রীশবাবু ওকালতী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পুনরায় মুন্সেফী পদ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইয়া গাজীপুর গমন করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, জলসরবরাহ-কারখানা (Water Works), বৃহৎজাতকের ইংরাজী অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ স্বামী, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে, তখন গাজীপুরে ইঞ্জিনিয়ারী করিতেছিলেন। এখানে তাঁহার সহিত শ্রীশবাবুর হৃদ্যতা জন্মে এবং হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থাবলী ও হিন্দু-সাহিত্য প্রচার কার্য্যে শ্রীশবাবুর সহিত স্বামিজীর সহ-যোগিতা ও সহানুভূতির সূত্রপাত হয়।

১৮৯৬ অব্দে শ্রীশবাবু বারাণসী বদলী হন। তাঁহার পক্ষে ইহা মাহেন্দ্র-যোগ বলা যাইতে পারে। তিনি কাশীর বিখ্যাত তাত্যা শাস্ত্রী প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যাকরণবিদ্ ও বৈদিকভাষাতত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট পাণিনি রীতিমত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তিন বৎসরের অক্লান্ত শ্রমে, একাগ্র সাধনায়, তিনি বৈদিক ব্যাকরণশাস্ত্র' সমাপ্ত করেন। এই সময় অর্থাৎ ১৮৯৬ অব্দে শ্রীমতী এনি বেসান্ট বারাণসী আগমন করিলে, শ্রীশবাবু ইঁহার সহিত একযোগে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীমতীর বক্তৃতা রেখাক্ষর (Shorthand) লিখনপ্রণালীতে লিখিয়া প্রচার করিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে শ্রীমতী বেসান্টের যে দিগন্তব্যাপী যশ ও কৃতকার্য্যতা প্রচার হইয়া পড়িল—শ্রীশবাবুর ক্ষিপ্র লিখনদক্ষতা ও আন্তরিক চেষ্টাই তাহার মূল। শুনা যায় সাঙ্কেতিক লিখনে তৎ-কালীন ভারতে শ্রীশবাবুর ন্যায় নির্ভুল ক্ষিপ্রলেখক আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার নিকট শ্রীমতী বেসান্ট স্বীয় ঋণ স্বীকারচ্ছলে ১৮৯৬ অব্দের অক্টোবর মাসে থিওসফিক্যাল সোসাইটি সভার ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে বারাণসীধামে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে বলিয়াছিলেন ;—

"I am indebted to Babu Srish Chandra Bose, Munsif of Benares, for the wonderfully accurate report which he most kindly took of the discourses. I have been reported by the best London men, but have never sent a report to the press with less correction than that supplied by my amateur friend."

বারাণসীর সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা ও তাহার উন্নতিকল্পে শ্রীশবাবু গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ঐ কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ন্যাসরক্ষক। থিওসফিক্যাল সোসাইটি নামক সম্প্রদায়ের তিনি একজন অকপটকর্ম্মী। উহার উন্নতি, বৃদ্ধি এবং সর্ব্ববিধ হিতসাধনে তিনি কখন কুণ্ঠিত নহেন।

১৯০১ অব্দে শ্রীশবাবু এলাহাবাদে বদলি হন। এখানে আসিয়া তিনি হিন্দুশাস্ত্র ও বৈদিক ব্যাকরণ সাধারণের সুগম করিবার মানসে বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে থাকেন। ইংরাজি ভাষা ভারতের সর্ব্বত্র এবং জগতের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত বলিয়া তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং বৈদিক সাহিত্য ও ব্যাকরণ ইংরাজিতে প্রণয়ন ও অনুবাদ করিয়া প্রয়াগস্থ স্বীয় ভদ্রাসন "ভুবনেশ্বরী আশ্রমের" একান্তে স্থাপিত "পাণিনি কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশ করিতে থাকেন। এখানে তিনি তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী * সমাপ্ত করেন। উহা রয়াল আট-

* The Astadhyayi of Panini—complete in 1682 pages, Royal Octavo : containing Sanskrit Sutras and Vrittis with Notes and Explanations in English, based on the celebrated Commentary called the Kasika.

পেজী আকারে ১৬৮২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হয়। তাঁহার অপর কীর্ত্তি "সিদ্ধান্তকৌমুদীর" সটীক সানুবাদ সংস্করণ। এই বিরাট গ্রন্থও উক্ত আকারের ২৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী প্রকাশিত হইলে কাশীর মহামহোপাধ্যায় বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভারতের নানা প্রদেশের প্রধান প্রধান পত্রসম্পাদকগণ এবং য়ুরোপ ও এমেরিকার জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীশ বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার শতমুখে প্রশংসা করেন। আমরা সেই রাশীকৃত প্রশংসাপত্র হইতে বিদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিতের কয়েকখানি পত্রাংশ প্রকাশ করিলাম।

The Right Hon'ble F. Max Muller, Oxford, 30th April, 1896,—"* * Allow me to congratulate you on your successful termination of Panini's Grammar. It was a great undertaking, and you have done your part of the work most admirably. I say once more what should I have given for such an edition of Panini when I was young, and how much time would it have saved me and others. Whatever people may say, no one knows Sanskrit, who does not know Panini."

Professor T. Jolly, Ph. D., Wurzburg (Germany), 23rd Agril, 1893. "* * Nothing could have been more gratifying to me no doubt, than to get hold of a trustworthy translation of Panini's Ashtadhyayi, the standard work of Sanskrit literature, and I shall gladly do my best to make this valuable work known to lovers and students of the immortal literature of ancient India in this country."

Professor W. D. Whitney, New Haven, U. S. A., 17th June: 1893. "* * The work seems to me to be very well planned and executed, doing credit to the translator and publisher. It is also, in my opinion, a very valuable (producton), undertaking as it does to give the European student of the native grammer more help than he can find anywhere else. It ought to have a good sale in Europe (and correspondingly in America.)"

Professor V. Fausbol, Copenhagen. 15th June, 1893.—"* * It appears to me to be a splendid production of Indian industsy and scholarship and I value it particularly on account of the extracts from the Kasika."

Professor Dr. R. Pischel, Hlale (Saals), 27th May, 1893.—"* I have gone through it and find it an extremely valuable and useful book, all the more so as there are very few Sanskrit scholars in Europe who understand Panini."

শ্রীশবাবুর অপর কীর্ত্তি সিদ্ধান্তকৌমুদী সম্বন্ধে The Indian Mirror, The Hindoo, The Indian People প্রভৃতি পত্রে উক্ত হইয়াছে—

"The next great undertaking of the Panini office was the publication of the Siddhanta Kaumudy of Bhattoji Diksit. This is a standard work on Sanskrit grammar and Sanskrit scholars spend at least a dozen years in mastering its intricacies.* * * It may be mentioned that the Oriental Translation Fund of England advertised about three quarters of a century ago as under preparation the English translation of the Siddhanta Kaumudi by Professor Horace Hayman Wilson. But perhaps he found the work too laborious for him, for the advertised translation was never published."

অধ্যাপক ম্যাকডনেল্ (Prof. A. A. Macdonell, M.A., Oxford), অধ্যাপক বেণ্ডল্ (Prof. Cecil Bendall, M.A., Cambridge) প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীশবাবুর এই গ্রন্থ এবং পাণিনি যে প্রখ্যাত পণ্ডিত বথ্লিঙ্কের পাণিনি অপেক্ষা সরল এবং সুখবোধ্য তাহাও পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক পৌসুই লিখিয়াছেন,—

"I have duly received the first volume of your Siddhanta Kaumudi. I was much pleased to get such a nice present from you. I have no hesitation to confess that I found inextricable difficulties in the use of Bohtlingk's Panini before I was so fortunate as to obtain from my friend * * * a spare copy he had of your Ashtadhyayi. It is a capital book for reference, and the Siddhanta Kaumudi for study."—*Professor Louis de la Vallee Pounui, Professor at Ghent, Editor of the Museon, 13, Boulevard du Parc, Gand: le 2 Decembre 1902.*

উক্ত গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত তিনি বেদান্ত, উপনিষদ, যোগ, স্মৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বহু দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থের (সটীক) ইংরাজি অনুবাদ এবং ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ * রচনা

* The Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka and Manduka Upanishads with Madhva's commentary.
Yajnavalkaya Smriti with the commentary Mitakshara and notes from the gloss, Balambhatti.
The Chhandogya Upanishad with Madhva's Bhasya.
The Vedanta Sutras with Baladeva's commentary.
An Easy Introduction to Yoga Philosophy.
Tattwa Traya of Ramanuja School.
Gheranda Sanhita.
Shiva Sanhita.
The Three Truths of Theosophy.
Daily Practice of the Hindus.
Catechism of Hinduism.

করিয়াছেন। সেসকল পুস্তক বহুপ্রশংসিত এবং যুক্ত-প্রদেশে ও প্রদেশান্তরের হিন্দুসমাজে সমাদৃত হইতেছে। এইসকল গ্রন্থের অনেকগুলি শ্রীশবাবুর প্রকাশিত Sacred Books of the Hindus নামক গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রীশবাবুই প্রথমে মধ্বাচার্য্যের সভাষ্য উপনিষদ ইংরাজিতে অনুবাদিত করিয়া য়ুরোপীয় বেদান্তাধ্যায়ীদিগের সর্ব্ব-প্রথম জ্ঞানগোচর করেন। তাঁহার লিখিত পাণিনির সটীক ইংরাজী গ্রন্থ কতদূর সম্মান ও উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত মতগুলি হইতে জানা যায়। উহা শুদ্ধ গ্রন্থেরই প্রশংসা নহে কিন্তু গ্রন্থকারের গভীর পাণ্ডিত্য, প্রতিভা এবং মনস্বিতার চিরস্মারক—তাঁহার স্থায়ী কীর্ত্তি। এপর্য্যন্ত কোন য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবাসীর গ্রন্থ এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্ধারিত হয় নাই; কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীশবাবুর পাণিনি লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির এম-এ কোর্স নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

তিনি যে শাস্ত্রগ্রন্থের মর্ম্মোদ্ভেদে নিপুণতা দেখাইয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বলে তিনি যে ভাষা, যে বিদ্যা, যে বিষয় শিক্ষা করিতে চাহিয়াছেন তাহাতেই গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়া নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত "Folk-Tales of Hindostan" নামক গল্পগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেশ বিদেশের গল্পপাঠক সমালোচক এবং সম্পাদকগণ মুগ্ধ হইয়াছেন। লণ্ডনের "Review of Reviews" পত্র, উহাকে জগৎ-বিখ্যাত আরব্যোপন্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লণ্ডনের "Folklore" পত্রে একজন অবসর-প্রাপ্ত সিভিলিয়ান (M. M. Longworth Daine, I.C.S.) ইহার গল্পাংশ, ভাষা, কল্পনা এবং চমৎকারিত্বের প্রশংসা করিয়া ইহাকে সুপ্রসিদ্ধ "আলিফ্ লায়লার" সমকক্ষ করিয়া বলিয়াছেন,—

"It is to be hoped that Shaikh Chilli will make known to the world some more gems from his treasure house."

পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগ ও বড়োদা রাজ্য এই পুস্তকখানিকে ছাত্রগণকে পুরস্কার দিবার ও পাঠাগারের উপযোগী বলিয়া অনুমোদন এবং ক্রয় করিয়াছেন।

শ্রীশবাবু হিন্দী বর্ণপরিচয়, হিন্দীতে Alphabetical Cards প্রভৃতি বাহির করেন এবং হিন্দী সাঙ্কেতিক লিখনপ্রণালী (Hindi Shorthand) নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এদেশে আবশ্যকীয় টাইপ না থাকায় উহা পিটম্যানের "শর্টহ্যাণ্ড প্রেসে" মুদ্রিত হয়।

আরবী ভাষা এবং মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়া অনেক মৌলবীকেও বিস্ময় প্রকাশ করিতে হইয়াছে। তিনি একদিকে যেমন বৈদান্তিক, পণ্ডিত, অপর-দিকে তেমনি সুফীদিগের ভাবে তন্ময়; কারণ ফারসীতেও তিনি সুপণ্ডিত। একবার ওহাবী সম্প্রদায় সুন্নি সম্প্রদায়ের সহিত একই মসজীদে উপাসনা করিবার অধিকারী কি না, এই বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি মুসলমান ব্যবহার-শাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জটিল প্রশ্নগুলির সরল ও সঙ্গত মীমাংসা করিয়া দেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রায় পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে * প্রকাশিত হয়। বড় বেশীদিনের কথা নহে, বারাণসীর আদালতে বিলাত-ফেরত কোন ভদ্র লোকের সমাজচ্যুতি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার কথা সংবাদপত্রে অনেকেই পড়িয়াছেন। এই মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাদীর বিপক্ষপক্ষ সমর্থন করেন, কিন্তু সুপণ্ডিত শ্রীশবাবুর জেরায় তাঁহাদের কোন যুক্তিই টিঁকে নাই। বিশাল হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান এবং অকাট্য যুক্তির সম্মুখে কাশীর সেই প্রসিদ্ধ মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়দিগকে হার মানিতে হইয়াছে। বিচারপতি শ্রীশবাবু সুচিন্তিত সুবিস্তৃত রায় লিখিয়া এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তাঁহার সেই পাণ্ডিত্য-পূর্ণ রায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা সাধারণের পক্ষেও উপাদেয় পাঠ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

জনহিতকর কার্য্যেও শ্রীশবাবুর অনুরাগ বড় অল্প নহে, তিনি অধ্যয়ন গ্রন্থলিখন এবং বিচারকার্য্যে কঠোর শ্রম করিয়াও সার্ব্বজনিক মঙ্গলকর্ম্মে যোগদান করিয়া থাকেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার কার্য্যে, বারাণসী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যে সহা-য়তা তাহার অন্যতম নিদর্শন। তিনি যখন বেরিলীর সবজজ

* The right of Wahabis to pray in the same mosque with the Sunnies—an Important Judgment on a very disputed question of Muhamadan Law.

ছিলেন তখন সম্রাট সপ্তম এডবার্ড পরলোকগত হন। তিনি সম্রাটের স্মারক স্বরূপ তথায় "Edward Memorial School" প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী হন। এলাহাবাদে "Indian Girls' High School" নামে যে বালিকা বিদ্যালয় আছে শ্রীশ বাবুই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এইসকল কার্য্য যথাসাধ্য প্রচ্ছন্নভাবে করিয়া থাকেন বলিয়া সাধারণে তাহা প্রায়ই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ফ্রীমেসন সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ও পদস্থ সভ্য, থিওসফিক্যাল সোসাইটীর সম্মানিত সভ্য ও উৎকর্ষবিধায়ক, জনসাধারণের প্রিয়, ব্যবহারে অমায়িক, কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী, সুবিচারক, ধর্ম্মপ্রাণ, এবং সাহিত্যের অকপট ও অক্লান্ত সেবক। ১৯১০ অব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীশবাবু স্মলকজকোর্টের জজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় বারাণসী গমন করেন। তদবধি তিনি কাশী প্রবাসেই আছেন। সম্রাটের অভিষেক উৎসব উপলক্ষ্যে গভর্মেণ্ট শ্রীশবাবুকে রায়বাহাদুর উপাধি দিয়া তাঁহার গুণের সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে জানেন তাঁহাদের মত যে "মহামহোপাধ্যায়" বা "শমস্-উল্-উলামা" বা উভয় উপাধি এক সঙ্গে দিলেই তাঁহার উপযুক্ত হইত।

আমরা প্রবন্ধারম্ভে শ্রীশবাবুর জন্ম এবং ৬ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগের কথাই বলিয়াছি; তাঁহার পিতার কথা বলা হয় নাই। শিক্ষাসংস্কারপ্রিয়তা, অধ্যয়নশীলতা, সাহিত্যানুরাগ, অধ্যবসায়, স্বাস্থ্য এবং চরিত্রবল—এসমস্তই শ্রীশবাবু পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐসকল গুণ তাঁহার পিতায় বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান ছিল। শ্রীশবাবুর মাতাঠাকুরাণী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার মত দয়ালু, উদারহৃদয় ও অতিথিসেবাপরায়ণ গৃহকর্ত্রী সর্ব্বদেশেই দুর্লভ। তাঁহাদের পরিবার আদর্শ হিন্দু পরিবার। আমরা ১৩০৯ সালে, "প্রবাসীর" ২য় বৎসরে, শ্রীশবাবুর পিতা স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বসু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমরা উক্ত প্রবন্ধে ট্রীবিউন, ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপীনিয়ন প্রভৃতি হইতে যেসকল সাময়িক মন্তব্য উদ্ধার করিয়াছি তাহাতে জানা যাইবে যে শ্রীশবাবুর পিতা শ্যামাচরণ বাবুই পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক এবং পঞ্জাবের সমসাময়িক যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যে সহযোগী ছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পঞ্জাবে যেসকল প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন, শ্যামাচরণ বাবু তাঁহাদের অন্যতম। পঞ্জাবের উন্নতিবিধানকল্পে তাঁহার কৃতিত্ব বড় অল্প ছিল না এবং তাহা ডাক্তার লাইট্নার ও সার লেপেল গ্রিফিন প্রমুখ বিখ্যাত রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভাবে স্বীকৃতও হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপীনিয়ন পত্রিকা ১৮৬৭ অব্দের ১৬ আগষ্ট শ্যামাচরণ বাবুর মৃত্যুতে লিখিয়াছিলেন,—

"The deceased gentleman took considerable interest in all matters affecting the welfare of his adoptive country and together with other Bengalis threw himself actively into all movements which sometime ago reflected credit on this Province."

১৯০৭ অব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের লাইট নামক পত্রে শ্যামাচরণ বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়। তাহাতে পঞ্জাবে শ্যামাচরণ বাবুর কীর্ত্তি স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা এই পঞ্জাবপ্রবাসী বাঙ্গালী সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রবাসীর ২য় ভাগে পঞ্জাবপ্রবাসী বাঙ্গালী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং ১৯০৭, ২রা ফেব্রুয়ারীর "লাইট" পত্রিকার "Father of the Punjab University" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ঐ প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"His devotion to the cause of education in the Punjab was as unflinching as that of David Hare in Bengal."

এই শিক্ষাবিস্তার এবং জাতীয় ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রচার করিবার জন্য প্রতিভাবান্ পিতাপুত্রের উক্তরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা, অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও কৃতকার্য্যতা পঞ্জাব এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বাঙ্গালীর নাম চিরস্মরণীয় এবং চিরবরণীয় করিয়া রাখিবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

স্নেহবিদ্ধ

এত যে বেদনা দে'ছ ওগো প্রিয় মোর,
কভু তাহে ঝরে নাই নয়নের লোর;
আজি তব অযাচিত দয়ার্দ্র আদরে
নয়নের জল মোর অবিরল ঝরে!

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নীলকুঠি

[এমান্যুএল আরেন্ লিখিত 'লা মের্জ ব্লু' নামক মূল ফরাসী গল্পের অনুসরণে]

আমার কাকা জাঁ তাঁহার জীবনের এই কাহিনীটি আমাদের কাছে বলিয়াছিলেন—

তোমরা ত জানোই টাকার ধান্দায় আমাকে ফ্রান্সের চারিদিকেই ঘুরে বেড়াতে হ'ত। একবারকার যাত্রায় দিজোঁ এলাকার কাছাকাছি একটা নেহাত বেগানা জায়গায় একটা ছোট ষ্টেসনের ধারে একখানি অদ্ভুত ধরণের ছোটখাটো বাড়ী দেখেছিলাম।

সেই বাড়ীখানির রং ফিকে নীল; বৃষ্টিবাদল, ঝড়ঝাপট খেয়ে খেয়ে ফিকে রং আরো ফিকে হয়ে ছাতের ধূসর রঙের সঙ্গে প্রায় একাকার হবার উপক্রম হয়েছে।

প্রথমবারে যখন আমি সেই বাড়ীখানি দেখি—সে আজ প্রায় চল্লিশ বছরের কথা সে রেলগাড়ীর কামরা থেকে বসেই; গাড়ী তখন সেই ছোট্ট ব্লেজি-বা ষ্টেসনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই নীলকুঠির সামনের ছোট্ট বাগানটিতে একটি বালিকা লাটিম ঘুরিয়ে খেলা করছিল তার বয়েস দশ বছরের কাছাকাছি, ফুটফুটে গোলাপী তার রং, পোষাকটি তার বসন্তের সজ্জার মতো, আর তার চুলগুলি একটি নীল রেশমী ফিতার ফাঁশে বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গে তার উচ্ছল আনন্দের ঢেউ,—আনন্দেরই প্রতিমা সে!··সেদিন সকালবেলাটায় আমার মেজাজটা খুসি ছিল না; আমার কারবারটা ঠিক চলছিল না, তাই আমি বদ মেজাজে চিন্তার বোঝাই নিয়ে পারীশহরে ফিরে যাচ্ছিলাম।·· ···এই ক্ষণিকের ছবিখানি আনন্দের প্রলেপ দিয়ে আমার মনের সকল গ্লানি মুছে দিলে। আজ প্রভাতে নয়ন মেলেই এই প্রকৃতি-সুন্দর কুণো দেশের সাজানো বাগানে সুন্দরী বালিকার মাধুরী দেখেই মনে হ'ল, আজকের দিনটা আমার ভালোয় ভালোয় যাবে। আমি ভাবলাম—"এমন জায়গায় যারা বাস করে তারা নিশ্চয় খুব সুখী!··না আছে তাদের চিন্তা, না আছে তাদের বিরক্তির কোনো কারণ।" আর সেই আনন্দপ্রতিমা মেয়েটির সরলতা দেখে আমার হিংসে হতে লাগল। যদি আমি তারই মতো আমার ভাবনার বোঝা নামিয়ে ফেলে বিশ্বসৌন্দর্য্যের লীলার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারতাম।

গাড়ী ছেড়ে দিলে। ঠিক সেই সময়ে নীলকুঠির একটা জানলা খুলে একজন কে ডাকলে—"লোরিন্!"···আর অমনি ছোট মেয়েটি বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

লোরিন্! এই নামটিও আমার কাছে বড় মিঠা লাগল। এবং গাড়ীতে নিষ্কর্ম্মা বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমি কল্পনার চক্ষে দেখতে লাগলাম সেই লোরিন্, সেই লাটিম, সেই বাগান, আর সেই নীলকুঠি। ক্রমে ক্রমে সব ঘোলা হয়ে ঝাপসা হয়ে এল, কুঠি বাগান লাটিম লোরিন্ সব আমার ভাবনার মধ্যে একশা হয়ে গেল।

তারপর অনেকদিন ওমুখো আর হইনি। ফ্রান্সের উত্তর থেকে পূর্ব্ব কখনো লীল, কখনো বা ন্যান্সি, অন্ন-চেষ্টায় ছুটোছুটি করে ফিরছিলাম, মাথায় আমার দোসরা চিন্তার অবসর আর ছিল না।

প্রায় দশ বৎসর পরে। একদিন শুভদিনে আমি মার্সেঈ যাত্রা করলাম। সেখানকার কাজ সেরে ফেরবার মুখে আমার পুরোণো স্মৃতি জেগে উঠল। আমি বুঝে শুনে সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হলাম যেন ব্লেজি-বা ষ্টেসনে গিয়েই আমার সুপ্রভাত হয়। সেই নীলকুঠি ঠিক তেমনি আছে, মনে হল রংটি যেন আরো ফিকে হয়ে গেছে, আর যেন কুঠির দিকে কারো বেশি নজর নেই।··কিন্তু সেই বাগানে একটি তরুণী বসে ছিল, সুন্দরী গৌরী, তার চুলগুলি আজ তার মনেরই মতন গোলাপী ফিতায় বাঁধা!..এই ত সেই লোরিন্, আমি যে তাকে চিনি! তার পাশে একজন তরুণ বসে ছিল—সমস্ত প্রাণ দিয়ে যেন সে লোরিনকে দেখছিল, লোরিনের তুষ্টির জন্যে সে যেন আপনাকে পলকে পলকে নিবেদন করে দিচ্ছিল; আর তাদের দুজনকে ঘিরে সেই সরল হাসি আর মনের শান্তি তেমনি ভাবেই বিরাজ করছিল।

তাদের সেই তরুণ হৃদয়ের ভাববিগলিত মিলনদৃশ্য দেখে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যখন ট্রেন ছাড়বার সঙ্কেতঘণ্টা বেজে উঠল আমি তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাত দুলিয়ে মাথা নেড়ে

অভিবাদন করে চেঁচিয়ে বললাম –নমস্কার নমস্কার কুমারী লোরিন !……আজকে তবে আসি……

তরুণী আমার দিকে বিস্ময়ে বিকসিত কুরঙ্গ-নয়ন তুলে চাইলে, সঙ্গে সঙ্গে সেই তরুণও। তারপর তারা দুজনে হাসিতে যেন গলে' ঝরে পড়তে লাগল ; তারাও নমস্কার করে' তাদের রুমাল দুলিয়ে আমায় প্রত্যভিবাদন করলে। ……আমি গাড়ীর জানলায় মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে সব দেখলাম। …..আমার মন খুসি হয়ে গেল !

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, মাসেঈ লাইনে অনেকবার যাওয়াআসা করেছি বটে কিন্তু কাজের তাড়ায় এমন গাড়ীতে যেতে আসতে হয়েছে যে-ট্রেন গভীর রাত্রে ব্লেজি-বা ষ্টেসনে না থেমেই পেরিয়ে যায়। একবার সুবিধা-মত সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাওয়া ঘটল, সেই যে-গাড়ী ঠিক সকাল বেলায় ব্লেজি-বা ষ্টেসনে পৌছয়। সে আজ কত-দিন যেদিন সেই বাগানে লোরিনকে তার প্রণয়ীর পাশে দেখেছিলাম ? বারো বচ্ছর, পনর বচ্ছরই বা ; আমার ঠিক মনেও নেই।……

এবার ট্রেন যখন সেই ছোট ষ্টেসনে এসে থামল, দেখলাম সেই বাগানে কেবলমাত্র একটি ছোট ছেলে ঘাসের উপর শয়ান একটা প্রকাণ্ড কুকুরকে ধরে' টানা-টানি করে' খেলা করছে।……তবে কি আমি লোরিনকে একবার দেখতে পাব না ?……আমি বড়ই ক্ষুণ্ণ মনে হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ ছেলেটি চেঁচাতে লাগল— মা ! …মা ! ….বেলগাড়ী !……কলের গাড়ী !……

তখন একজন মহিলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল।…এই সেই, নিশ্চয় ! একটু মোটা, একটু কালো, কিন্তু তবু আমি তাকে দেখবামাত্র চিনেছি। তাকে দেখবামাত্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে আমি টুপি তুলে তাকে অভিবাদন করলাম।…সেও আমার অভিবাদন প্রত্যর্পণ করলে, কিন্তু একটু বিস্ময়ের ভাবে।… সে চিরদিনই সেই একই রকম আছে, তেমনি প্রিয়দর্শন, তেমনি সরল, তেমনি ঠিক তারই মতন।… গাড়ী যখন ছাড়ল, তখন আমার এই আগমনটিকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্যে একটা কমলা লেবু নিয়ে ছেলেটির উদ্দেশে বাগানের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিলাম ; কমলা লেবু ঘাসের উপর গড়িয়ে গেল আর তার পিছনে পিছনে ছেলেটি আর কুকুরটি দৌড়তে লাগল।…

এর পরের আমার জীবনে এমন সব বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল যে আজ এত বৎসর পরে সেসমস্ত যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। তোমরা জানো ব্যবসা উপলক্ষে তুর্কে গিয়ে কালা-পানিতে আমার জাহাজ ডুবি হয়েছিল। তখন সেই দুরবস্থায় পড়ে সেই ব্লেজি-বা ষ্টেসনের ধারের সেই নীলকুঠির কথা আমার মনে পড়ছিল কিনা তোমরা ভাবছ ? মনে পড়েছিল বৈ কি ! সেই জাহাজ-ডুবির পর মৃত্যু আর আমার মধ্যে যখন একখানি তক্তামাত্র ব্যবধান তখন ঠিক সেই প্রথম দিনের মতনই হুবহু সমস্ত চিন্তা আমার মনের উপর দিয়ে বুলিয়ে বুলিয়ে যাচ্ছিল।… আমি তখন নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলছিলাম হায়রে হতভাগা জাঁ ! পৃথিবী ঘুঁটে দৌড়ে বেড়ানোর মজাটা ত এবার টের পেলি। যদি তুই অল্পে সন্তুষ্ট হতে জানতিস তা হ'লে হয় ত তুইও তোর অচেনা বন্ধু লোরিনের মতোই শান্তিতে থাকতে পারতিস, চাই কি বুরগঞের রৌদ্রতপ্ত সেই নীলকুঠির কোলেই ঠাঁই পেতিস। আজ আর সেসব সুখের সম্ভাবনাও তুই রাখিস নি !

ভাগ্যে ভাগ্যে আমি সেবার বেঁচে গেলাম। সে যেন দৈব ঘটনা। আমি যখন অবসন্ন মৃতপ্রায় তখন এক ওলন্দাজ জাহাজ দু'দিন পরে আমায় জল থেকে তুলে নিলে।…পনর কি কুড়ি দিন পরে, ঠিক মনে নেই, আমি আবার ফ্রান্সে ফিরে এলাম। দেশে ফিরেই আমি মার্সেঈ থেকে পারী শহরের ট্রেনের যাত্রী হ'লাম। এই আমার শেষ যাত্রা। এই বুড়ো বয়সে এত নাকালের পর টো টো করে ঘুরে বেড়াবার সাধ আর আমার ছিল না।

সকাল বেলা গাড়ী সেই ব্লেজি-বা ষ্টেসনে পৌছল। আমার হৃদয় যেন আনন্দে উদ্বেগে ফেটে পড়বার মতন হয়ে উঠল, হৃদয় যেন বক্ষপঞ্জর ভেঙেচুরে লোরিনকে একবার দেখবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছিল। এখনি গাড়ী থামবে আর ছেড়ে চলে যাবে, একটি মুহূর্ত্তের মাত্র সুযোগ, হয় ত তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হবে না।

গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দূর হতেই দেখতে পেলাম

ষ্টেসনের পাশেই সেই নীলকুঠি রৌদ্র মেখে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।...হঠাৎ রৌদ্র মাখা নীলকুঠি দেখে আমার কেমন কালাপানিতে নৌকা-ডুবির কথা মনে এল।...সে আজও এই বাড়ীতে আছে, হয় ত তেমনি শান্ত উদাসীন, আমার ভরাডুবির খবরও সে রাখে না।...গাড়ী এসে ঠিক কুঠির সামনেই থামল। আমি দেখলাম সেই বাগানের একটি লতাবিতানের নীচে একজন বর্ষীয়সী রমণী বসে রয়েছে—তার রূপালি চুলগুলি সীঁথিতে দুভাগ হয়ে পিঠময় ছড়িয়ে গেছে, আর তার চারিদিকে ঘিরে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কলরব করছে।

এই লোরিন্!...তাকে আর কেউ চিনতে পারত না; আমি কিন্তু তাকে চিনি!...এক মুহূর্ত্তেরও দ্বিধা আমার হয় নি।—সেই বালিকা বয়সে লাটিম নিয়ে তার খেলা; তারপর তারুণ্যের লীলাচপল সেই সাক্ষাৎ; তারপর সে গৃহিণী, সে মাতা; আর আজ সে ঠাকুর-মা, দিদিমা, নাতিনাতিনী-পরিবৃতা; বার বার বিভিন্ন মূর্ত্তি, কিন্তু সকল মূর্ত্তিই সেই এক অভিন্নের!

এবারকার এই ক্ষণিক সাক্ষাতের আসন্ন অবসানের আশঙ্কা আমার চিত্ত তিক্ত রসে ভরে তুলতে লাগল। আর আমি এ পথে কখনো আসব না, এই আমার এজন্মের শেষ সাক্ষাৎ! আমার বড়ই সাধ হতে লাগল আমি একটিবার অল্পক্ষণের জন্যে কথা কয়ে আমার চল্লিশ বছরের পুরাতন অচেনা বন্ধুটির কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে যাই।...দৈব আমার সহায় হ'ল; এঞ্জিনটা অল্প বিগড়ে গেল; অন্তত পক্ষে ঘণ্টাখানেক লাগবে কল সারতে; ততক্ষণ সেই ষ্টেসনেই থাকতে হবে।—আর আমায় পায় কে? সাধ আমি মেটাব। আমাদের এই বৃদ্ধ বয়সে সঙ্কোচের ত কোনো কারণ নেই।

আমি কুঠির ফটকের দিকে চললাম; আমার পা কিন্তু তখন থরথর করে কাঁপছিল। ভাবের আতিশয্যে এমন অভিভূত আমি কস্মিন কালেও হই নি। আর, আমি যা হই তা হই ভীরু নই, এটা ঠিক, তার উপর ত তুর্কীর দেশে বিষম রকম তুর্কী নাচন নেচে এই সদ্য আসছি।...যাক।...আমি ডাক-ঘণ্টার দড়ি ত টেনে দিয়েছি! মালী এসে দরজা খুলে দিলে; আমি তাকে বললাম—"ঐ যে লতাঘরে বুড়ী-গিন্নি বসে রয়েছেন আমি একবার তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চাই।"...মালী আমাকে বাগানে ঢুকিয়ে গিন্নিকে ডাকতে গেল।...সে এল।...

এতদিন পরে লোরিন আজ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু আমি তাকে বলবার মতন কোনো কথাই এখন খুঁজে পাচ্ছি না। সেই তখন আমায় জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার কিসে হ'ল মশায়?"

ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি আমায় চিনতে পারছ না?"

—কৈ না ত......

—আঃ! আমি, আমি কিন্তু তোমায় খুব চিনি!...... ভেবে দেখ!......আমি যে তোমায় চিনেছি সে কি আজকের কথা?... ...আমি তোমাকে এই বাগানে এতটুকু বেলায় লাটিম নিয়ে খেলা করতে দেখেছি; আমি সেই লোক, তোমার নিশ্চয় মনে আছে, যে গাড়ীর জানলা থেকে তোমায় একদিন নমস্কার করে গিয়েছিল—তখনো তোমার বিয়ে হয়নি; আর তারপর, অনেক দিন পরে, যে লোক একটা কমলা লেবু একটি ছোট......

সেই মহিলাটি কেমনতর ভয় পেয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল; প্রথমটা কয়েক পা পিছিয়ে হটে গিয়ে সরে দাঁড়াল; আমায় হয় ত পাগল কি মাতাল ঠাউরে থাকবে; কিন্তু তারপর আমার বৃদ্ধ বয়সের শান্ত মূর্ত্তি দেখে ভরসা করে খুব কোমল শান্ত স্বরে বললে—"আপনার নিশ্চয় কোনো রকম ভুল হয়ে থাকবে। আমরা সবে এই এক বচ্ছর এই নীলকুঠিতে আছি।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম।—আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি......তবে......লো......... রি......ন......নন?"

—লোরিন?......আপনি মশায় কার কথা কচ্ছেন আমি ত ঠিক বুঝতে পারছিনে। আমাদের এখানে ত সে নামের কেউ নেই।

আমার মনে হতে লাগল যেন আমার চারিদিকে স্বপ্নের ঘোর লেগেছে। যখন সেই মহিলা চলে যাবার উপক্রম করলেন তখন আমি বল্লাম—"ক্ষমা করবেন......

আর একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান।... ..আপনার আগে এবাড়ীতে কাঁরা থাকতেন ?"

—আমাদের আগে ? ·· একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, চিরকুমার তিনি। দশ বচ্ছর হল তাঁর মৃত্যু হয়েছে।......

তিনি খুব ঘটা করে' নমস্কার করে' আমাকে ফটকের বার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফটক বন্ধ করে দিলেন। আমি একেবারে আস্ত একটি বোকা বনে' গিয়ে ব্রেজি বা গাঁয়ের গলি দিয়ে চলছিলাম, বিষম দুর্ঘটনার দুঃখে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।......আমাকে তল্লাস করে জানতেই হবে ··· নিশ্চয় আশ্চর্য্য রকম একটা ভুল এর মধ্যে জড়িয়ে আছে, সে জট সন্ধান করে খুলতেই হবে।

আমি ষ্টেসন-মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে ভদ্রলোক কিছুই জানেন না, এ ষ্টেসনে তিনি নবাগত। কিন্তু তিনি সন্ধান বলে দিলেন যে এই গাঁয়ের সবার চেয়ে বুড়ো একটি লোক ষ্টেসনের কাছেই নীলকুঠির সামনেই থাকে, তার কাছে খবর মিলতে পারে।

বৃদ্ধ চিন্তাসূত্র গুছিয়ে নিতে নিতে বললে—লোরিন ··· অ্যাঁ, লোরিন ·· আমার ত স্মরণ হয় না......

—কিন্তু বছর পনর ষোল আগে ঐ বাগানে যে একজন মহিলাকে দেখেছিলাম একটু মোটা একটু কালো, একটি ছোট ছেলে আর একটা প্রকাণ্ড কুকুরের সঙ্গে····· সে তবে কে ? . ...

—ও ! একটা বড় কুকুর, অ্যাঁ, একটা খুব বড় কুকুর......হ্যাঁ হ্যাঁ, সে যে দারোগা গিন্নি মাদাম জিলামে। কিন্তু তার নাম ত লোরিন ছিল না, এ ত আমি খুব জানি, আমি যে বরাবর তাদের বাড়ীতেই থাকতাম। তার নাম ছিল ফ্রাঁসোয়াজ।

আমি ত একেবারে মূঢ়ের মতন হয়ে গেলাম !

—আচ্ছা, মশায়, ভালো করে মনে করে দেখুন ত ......আচ্ছা, তারো আগে, প্রায় বছর বারো আগে, একজন যুবতী মেয়ে খুব ফরসা বেশ লম্বা, মাথার চুলে গোলাপী ফিতে, আর একজন কালো মতো যুবা পুরুষ, খুব সম্ভব সেই মেয়েটির বাগ্‌দত্ত স্বামী, এই বাগান-বাড়ীতে কি থাকত ? · ...

বৃদ্ধ ভাবলে, ভাবলে, কতক্ষণ ধরে ভাবলে।......

অবশেষে সে তার বুড়ীকে ডাকলে। বুড়ী মানুষটি ছোটখাটো, চোখ দুটি উজ্জ্বল জীবন্ত, চটপটে ধর্'ণর, দেখলেই মনে হয় যে তার স্মরণশক্তি বেশ তেজালো। বুড়ো তাকে সব কথা বললে।·····

-- ও। সে যে মাদমোয়াজেল স্তেফানি, কণ্ট্রাক্টার সাহেবের মেয়ে ?·· ···সেই ত লম্বা মতন, চুলে ফিতে বাঁধা ? ·· ·· এ সে বৈ আর কেউ নয়। ·· দিজোঁশহরের এক সওদাগরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, আহা বেচারা ! তাদের বিয়ে সুখের হয় নি, তারা আলাদা হয়ে আছে। আহা, মেয়েটা এখন, ঐ যে কি বলে ভালো ওর নামটা, সোমব্যারনোঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ সোমব্যারনোঁ শহরে তার বাপের বাড়ীতেই আছে, আহা বড় দুঃখ তার ·

আমি যাবার জন্যে নমস্কার করলাম।·· ·· সময় আর নেই, ট্রেন এইবার ছাড়বে · ·

লোরিন। লোরিন। সে ত একেবারে ভ্রান্তি নয়, আমি যে তাকে এতটুকুবেলায় দেখেছি, আমি যে তার নাম শুনেছি··· আজও যেন তাকে চোখের সামনে দেখছি সে বসন্তের প্রজাপতিটির মতন হাওয়ার গানে আলোর তালে পুষ্পগন্ধের সুরে লাটিম ঘুরিয়ে নেচে খেলে বেড়াচ্ছে ·

এই কথা না শুনে বুড়ী বলে উঠল ·ও ! এ কথা আগে বলতে হয়, মশায় !·· আপনি আগে বললেন একজন গিন্নির কথা, তারপর বল্লেন একজন সোমথ মেয়ের কথা,····· এখন বলছেন একটি ছোট মেয়ের কথা ! ·· হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকে ত আমার বেশ মনে আছে, ·· লোরিন,·· · হ্যাঁ, লোরিনই ত তার নাম বটে।...... উঃ, সে কি আজকের কথা গো, নেই কম ত দুকুড়ি বচ্ছর হবে !..... সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি ত·· সে ডাক্তার সাহেবের মেয়ে, আমাদেরই তারা আপনার লোক। · · আহা মেয়েটা দশ বচ্ছর বয়সেই মারা গেল !·····

দশ বৎসর বয়সে, আমি তাকে দেখার কয়েক দিন পরেই, সে মারা গেছে ! আর আমি ? আমি তার পর এই চল্লিশ বৎসর ধরে তাকে অনুসরণ করে আসছি !··

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনোমোহন বসু



স্বর্গীয় মনোমোহন বসু।

মনোমোহন বসুর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একাধারে কবি, নাটককার, উপন্যাসিক, বক্তা, শিক্ষাদাতা ও স্বদেশভক্ত হারাইয়াছে। মনোমোহনের কৃতিত্ব ঐসকল বিষয়ে অল্প ছিল না, এবং তাঁহার যশ চিরকাল অম্লান থাকিবে।

চব্বিশ-পরগণা জেলার ছোটজাগুলে গ্রামের প্রসিদ্ধ বসুবংশজ মনোমোহন বংশগৌরবেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা চার সহোদর, মনোমোহন কনিষ্ঠ। শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া তিনি মাতুলালয়ে বনগ্রামের সন্নিকট নিশ্চিন্তপুর গ্রামে লালিত হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে উলঙ্গ শিশু মনোমোহন রামায়ণ ও মহাভারত মুখস্থ করিয়া তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় দিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন; এই বয়সেই তিনি নিজেই পদ্য রচনা করিয়া স্নেহপরায়ণ মাতামহের পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার প্রিয়দর্শন সৌম্যমূর্ত্তি, অমায়িকতা ও সুশীলতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কবিত্বময় চিত্ত, এবং নির্দ্দোষ স্বভাব আত্মীয় পর, সতীর্থ শিক্ষক, সকলেরই প্রীতি ও স্নেহ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন এবং পুরস্কার লাভ করিয়া মাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। হেয়ার স্কুলে পাঠকালে তিনি প্রসিদ্ধ শিক্ষক রিচার্ডসনের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তৎপরে তিনি জেনেরাল এসেমব্লি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া প্রিন্সিপাল ওগিলভি ও অধ্যাপক এণ্ডারসনের মনোমোহন হইয়াছিলেন; অধ্যাপক এণ্ডারসন প্রায়ই তাঁহাকে দিয়া কাউপার ও মিল্টনের কবিতা বাংলা পদ্যে ভাষান্তরিত করাইতেন। একবার কলেজে একটি বাংলা প্রবন্ধের জন্য স্বর্ণপদক দিবার প্রস্তাব হয়; মনোমোহন সেই প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ রচনা করেন; বিচার ফলে তিনি দ্বিতীয় সাব্যস্ত হইলে মনোমোহন আশ্চর্য্য হইয়া অধ্যক্ষ ওগিলভির নিকট গিয়া যে ছাত্র প্রথম হইয়াছে তাহার রচনা দেখিতে চাহিলেন। অধ্যক্ষ মৃদুহাস্যের সহিত তাঁহাকে সেই প্রবন্ধ দিলে মনোমোহন বিশেষ মনোযোগের সহিত উহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিনয়বচনে অধ্যক্ষকে অনুরোধ করিলেন যে এই প্রবন্ধ ও তাঁহার প্রবন্ধ বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠাবান কোনো বিশেষ বিচারকের দ্বারা তুলিত হোক। অধ্যক্ষ মনোমোহনের অনুরোধে বিশেষ দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের ভাব দেখিয়া পুনর্বিচার করাইতে স্বীকৃত হইলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর এই বিচার-ভার অর্পিত হইল। এবারের প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে না পারিলে সকলের নিকট অপদস্থ ও উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, ইহা মনে করিয়া মনোমোহন উদ্বেগে ও আশঙ্কায় রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন তিনি কলেজে উপস্থিত হইবামাত্র অধ্যক্ষ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—'মোনোমোহন, পুনর্বিচারে তোমারই জয় হইয়াছে।' মুহূর্ত্ত-মধ্যে এ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল—কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সকলে আসিয়া মনোমোহনকে ঘিরিয়া জয়োল্লাস করিতে লাগিলেন এবং পরদিন টাউনহলে এক

প্রকাশ্য সভা করিয়া তাঁহাকে একটী স্বর্ণপদক ও কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ পুরস্কার দিলেন।

পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া মনোমোহন ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকরে ও অক্ষয় দত্তের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি নিজেও কতকদিনের জন্য বিভাকর নামক একখানি সংবাদপত্র পরিচালিত করিয়াছিলেন।

মনোমোহনের বয়স যখন ৩৪।৩৫ বৎসর তখন একবার তাঁহাদের গ্রামে নাটক করিবার প্রস্তাব হয় এবং উহার ব্যয়াদি নির্ব্বাহের জন্য গ্রাম হইতে ৬০০৲ টাকা চাঁদা উঠে। এই উপলক্ষে তিনি রামাভিষেক নাটকখানি রচনা করেন। কিন্তু নাটকের বন্দোবস্তাদি শেষ হইবার পূর্ব্বেই উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ (১৮৬৬ সালের মন্বন্তর) দেখা দেওয়ায় নাট্য-তহবিলের সমস্ত টাকা সেস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ফলে, রামাভিষেকের অভিনয় হইতে পারে নাই। এই নাটকখানি অতঃপর গ্রন্থকার নিজেই প্রকাশিত করেন। প্রথমতঃ ইহা অতি খারাপ কাগজে অস্পষ্ট হরফে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। কিন্তু উহারই কাট্‌তি এত অধিক হইতে থাকে যে, পুস্তকের মূল্য ক্রমে ক্রমে তিনগুণ বর্দ্ধিত করা হইলেও অল্প দিনের মধ্যেই উহার কয়েক সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

এই সময় এদেশে হাফআখড়াই নামক একপ্রকার সঙ্গীত-সমরের প্রচলন ছিল। ধর্ম্ম, নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন লইয়া দুই দল গায়কের মধ্যে এই আখড়াইয়ের লড়াই চলিত। দেশের অনেক প্রসিদ্ধ লোক ইহার কোন না কোন দলে নেতৃত্ব করিতেন। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতিব সাহিত্য-গুরু তদানীন্তন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি —ঈশ্বর গুপ্তও এক হাফআখড়াইয়ের ওস্তাদ ছিলেন। মনোমোহন প্রভৃতির সহিত কাশীধামে অবস্থানকালে গুপ্তকবি এক হাফআখড়াইয়ের আসরে অন্য উপযুক্ত লোক না পাইয়া মনোমোহনকেই প্রতিপক্ষ নির্ব্বাচিত করেন এবং তাঁহার সহিত সঙ্গীতযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অসীম প্রতিভাবলে মনোমোহন এই লড়াইয়ে গুপ্ত কবিকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গুরুশিষ্যের এই সঙ্গীতসমরের কাহিনী 'মনোমোহন-গীতাবলী'তে লিপিবদ্ধ আছে।

নাট্য-সাহিত্যে মনোমোহনের দ্বিতীয় কীর্ত্তি—প্রণয়-পরীক্ষা নাটক। এই নাটক প্রকাশের পরই নাট্যকারের যশ সমগ্র বঙ্গভূমিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং সকলেই তাঁহাকে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ নাটককার বলিয়া অভিনন্দিত করেন। এই পুস্তকের ভূমিকা পাঠ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন —'গ্রন্থকার যে একজন শক্তিশালী লেখক, ভূমিকাপাঠেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।' এই প্রণয়পরীক্ষার সম্পর্কেই মনোমোহনের 'নাটুকে মনোমোহন' খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রণয়পরীক্ষার পরবর্ত্তী রচনা—মনোমোহনের পদ্যমালা। ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য পুস্তক। ইহার ছন্দ, ভাষা ও ভাব একাধারে সরল ও সুন্দর। এই পুস্তকখানি পড়িয়া ভূদেববাবু মনোমোহনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—'পদার্থ ও জীবজন্তু সম্বন্ধীয় এরূপ সরল ও সরস কবিতাপুস্তক এপর্য্যন্ত এদেশে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা শিশুগণের কণ্ঠাভরণস্বরূপ।' বলাবাহুল্য, এই পদ্য-মালা বিক্রয় করিয়া মনোমোহনের যথেষ্ট অর্থ লাভ হইত।

রচনার ন্যায় বক্তৃতায়ও মনোমোহনের স্বাভাবিক শক্তি ছিল। স্বভাবতঃই তিনি আমুদে ও রসিকতাপ্রিয় ছিলেন, বক্তৃতাক্ষেত্রেও অনাবিল হাস্যপ্রমোদের তরঙ্গ তুলিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতেন। একবার হিন্দুমেলার সভাপতিরূপে তিনি যে রসপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র ও ব্রাহ্মপ্রচারক নগেন্দ্রনাথের ন্যায় গুরুগম্ভীর ব্যক্তিও হাস্যসম্বরণ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার কোন বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া লজ্জাবশতঃ কিছু বলিতে না পারায়, মনোমোহন উঠিয়া তাঁহার লাজুকতা সম্বন্ধে এমন রসিকতাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিয়া স্বয়ং বিদ্যাসাগরও খুসি হইয়াছিলেন। বক্তৃতামালা ও হিন্দু আচার ব্যবহার নামক তৎকৃত পুস্তক দুখানিতে এইরূপ রসিকতার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

শৈশবাবধি মনোমোহন চাকরীর উপর বিতৃষ্ণ ছিলেন। দাসত্বকে তিনি শ্ববৃত্তির তুল্য মনে করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়াছিলেন। পরানুগৃহীত কিংবা পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকাকে তিনি আদপেই পছন্দ করিতেন না; তাই

পুত্রগণের উপার্জ্জিত অর্থের প্রতিও কোনদিন তাঁহার অনুরাগ দৃষ্ট হয় নাই। নিজের পুস্তকাদি বিক্রয়েই তাঁহার যথেষ্ট আয় হইত। তাহার উপর 'মনোমোহন লাইব্রেরী' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়টী ও 'মধ্যস্থ যন্ত্রালয়' নামক একটী ছাপাখানা স্থাপন করিয়া অর্থাগমের আরো সুযোগ করিয়া লইয়াছিলেন। এই মধ্যস্থ যন্ত্রালয় হইতে তাঁহার সম্পাদিত প্রসিদ্ধ 'মধ্যস্থ' বাহির হইত। ইহা বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বে প্রকাশিত একতম প্রাচীন সাপ্তাহিক পত্রিকা। পরবর্ত্তী সময়ে এই পত্রিকা বঙ্গদর্শনের প্রধান প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমতঃ মনোমোহন ও বঙ্কিমের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু দীনবন্ধুর সহিত এক রচনার প্রতিযোগিতায় মনোমোহনের বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের পরাজয় সাব্যস্ত হইলে তিনি দারুণ মনোমোহনদ্বেষী হইয়া উঠেন। এই বিদ্বেষের ভাব বঙ্গদর্শন ও মধ্যস্থের প্রতিযোগিতায় সম্যক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। যখন বঙ্গদর্শনে বিদ্যাসাগর ও ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তখন মনোমোহন মধ্যস্থে তাহার প্রতিবাদ করেন। এতদুপলক্ষে বঙ্গদর্শনের ভারতচন্দ্র সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের উত্তরে তিনি "ভারতচন্দ্রের গ্রহণ" নামক যে কবিতাটী মধ্যস্থে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার তিনটী ছত্র এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—

'বঙ্গদর্শনের দর্শন-বিদ্যা চমৎকার।
সে দোষ দর্শনে রোষ হয় না কার?
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন,
সমালোচন কেন তার?'

মধ্যস্থে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও দর্শনাদি বিষয়ে মনোমোহনের বহু প্রবন্ধ এবং তাঁহার রচিত অনেক কবিতা, গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা পত্রিকা সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মধ্যস্থে উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই পত্রিকায়ই তাঁহার দুলীন নামক উপন্যাসখানির প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়। রচনাবৈচিত্র্যে ইহা পাঠকগণের এতদূর মনোমোহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, মহারাজা সূর্য্যকান্তের ন্যায় ব্যক্তিও দুলীনকে বাস্তবজগতের জীব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

মধ্যস্থ সম্পাদনের গুরুতর পরিশ্রমে মনোমোহনের শিরঃপীড়া জন্মে। তাই তিনি বাধ্য হইয়া পত্রিকাখানিকে প্রথমতঃ পাক্ষিকে, অতঃপর মাসিকে পরিবর্ত্তিত করেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও তাঁহাকে অনন্যসহায় হইয়া সম্পাদনের সমস্ত কর্ম্ম করিতে হওয়ায় তাঁহার ব্যারাম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং স্বাস্থ্যের অনুরোধে অল্প দিন পরেই তাঁহাকে পত্রিকাখানি উঠাইয়া দিতে হয়। এইরূপ অসময়ে বিলোপ ঘটায় মধ্যস্থে দুলীনকে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই—এই পুস্তকের শেষাংশ মনোমোহনের পুত্র—বোসের সার্কাসের সত্বাধিকারী প্রসিদ্ধ প্রফেসর বোসের সম্পাদিত 'গান ও গল্পে' প্রকাশিত হইয়াছে।

বৌবাজার অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের অনুরোধে মনোমোহনের সতী-নাটক বিরচিত এবং উহাদের অর্থানুকূল্যে ইহা প্রকাশিত হয়। এই নাটকের অন্তর্গত শান্তে পাগলা ভক্তি-প্রেম ও হাস্যরসের এক অপূর্ব্ব চিত্র। স্বর্গীয় কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন মনোমোহনের সাক্ষাৎ পাইলেই শান্তে পাগলার কথাগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে বলিতেন—'মনোমোহন বাবু, আমি আপনাকে সহজে মরিতে দিব না, এখনও আরো বিশ বছরের বেশি বাঁচাইয়া রাখিব।' পদ্মমালার ন্যায় এই সতীনাটকও যে মনোমোহনকে চিরদিন বাঁচাইয়া রাখিবে, সে বিষয়ে আমাদেরও সন্দেহ নাই।

সতীনাটকের পর রচিত হরিশ্চন্দ্র, পার্থবিজয়, রাসলীলা ও আনন্দময় নামক নাটকগুলিও গ্রন্থকারের অর্থাগমের ও খ্যাতিবিস্তারের সহায় হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র ও পার্থবিজয় বৌবাজার অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের ব্যয়ে প্রকাশিত হয়। রাসলীলা ও আনন্দময় নামক নাটক দুইখানি এমারেল্ড্ থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি প্রণয়ন করেন। সতীর অভিমান নামক তৎকৃত আর একখানি নাটক বহুদিন যাবত অপ্রকাশিত ছিল—সংপ্রতি নাট্য-মন্দির-পত্রে উহা মুদ্রিত হইয়াছে।

নাট্যরচনার ন্যায় সঙ্গীতরচনায়ও মনোমোহনের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই দেশহিতমূলক। মনোমোহন নিজে যে অত্যন্ত দেশবৎসল ছিলেন, তাঁহার রচিত সঙ্গীতাদি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে এদেশে যে স্বদেশীয়তার লক্ষণ

দেখা দিয়াছে, তাহার সূত্রপাত মনোমোহনের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে কলিকাতার ঠাকুর বাবুদের প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলা এ বিষয়ের প্রধান সহায় হইয়াছিল। মনোমোহনের রচিত 'দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটী ঐ হিন্দুমেলায়ই সর্ব্বপ্রথম গীত হয়।

কবিতাদি সমস্ত বিষয়ের রচনায়ই মনোমোহনের অসীম ক্ষিপ্রকারিতা ছিল। পথে চলিতে চলিতে তাঁহার কবিতারচনা হইয়া যাইত। একবার স্ত্রীর সহিত তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে একস্থানের একটী মন্দির দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উহার গায়ে অনেকগুলি কবিতা লিখিয়া রাখেন। তাঁহার শেষ বয়সের দৈনন্দিন লিপির মধ্যে তাঁহার বহু সাময়িক রচনা স্থান পাইয়াছে।

সামাজিক জীবনে মনোমোহন অতি অমায়িক ও স্নেহশীল ছিলেন। তাঁহার অধরপুট মৃদুমধুর সরস হাস্যে সর্ব্বদাই উজ্জ্বল থাকিত। প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র ও প্রাণাধিক ভাগিনেয়ের মৃত্যুতেও ক্ষণকালের জন্য তাঁহার এই হাসির বিলোপ ঘটে নাই। অক্লান্ত কর্ম্ম ও অদম্য উৎসাহের বলে অতীত কালের যে জীবনকে তিনি বর্ত্তমানযুগ পর্য্যন্তও টানিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন. মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও তাহা পঠনানুরাগে অবিচল ছিল। পাঠের সময় পৌত্র পৌত্রীগণ বিরক্ত করিলে তিনি এই বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেন যে. তিনি না পড়িলে তাঁহার অন্তরের গুরুমশায়টী তাঁহার কান মলিয়া দিবে।*

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

না-জানা

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম
　　কাজের পথে!
নইলে আমার এমন দেখা
　　ঘটত না ত কোনো মতে।

এই কোণে মোর ছিল বাসা,
এইখানে মোর যাওয়া আসা,
সূর্য্য উঠে অস্তে মিলায়
　　এই রাঙা পর্ব্বতে;—
প্রতিদিনের ভার বহে যাই
　　এই কাজেরি পথে।

জেনেছিলাম কিছুই আমার
　　নাই অজানা;
যেখানে যা পাবার আছে
　　জানি সবার ঠিক ঠিকানা।
ফসল নিয়ে গেছি হাটে
ধেনুর পিছে গেছি মাঠে,
বর্ষানদী পার করেছি
　　খেয়ার তরীখানা।
পথে পথে দিন গিয়েছে
　　সকল পথই জানা।

সেদিন আমি জেগেছিলেম
　　দেখে কারে!
পসরা মোর পূর্ণ ছিল,
　　চলেছিলেম রাজার দ্বারে।
সেদিন সবাই ছিল কাজে
গোঠের মাঝে, মাঠের মাঝে,
ধরা সেদিন ভরা ছিল
　　পাকা ধানের ভারে।
ভোরের বেলা জেগেছিলেম
　　দেখেছিলেম কারে!

সেদিন চলে যেতে যেতে
　　চমক লাগে।
মনে হল বনের কোণে
　　কাহার গায়ের গন্ধ জাগে।
পথের বাঁকে বটের ছায়ে
কে গেল গো চপল পায়ে,
চকিতে মোর নয়ন দুটি
　　ভরি দিয়ে অরুণ রাগে।

---

* এই প্রবন্ধের অধিকাংশ উপকরণ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

সেদিন চলে যেতে যেতে
মনে হল কেমন লাগে।

এত কালের পথ হারালেম
এক নিমেষে।
জানিনে ত কোথায় এলেম
একটু পথের বাইরে এসে!
কেটেছে দিন দিনের পরে
এমনি পথে, এমনি ঘরে,
জানিনে ত চলতেছিলেম
এমন অচিন্ দেশে!
চিরকালের জানাশোনা
ঘুচ্‌ল এক নিমেষে।

রইল পড়ে পসরা মোর
পথের পাশে।
চারিদিকের আকাশ আজি
দিক্-ভোলানো হাসি হাসে।
সকল জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়ে ছিলে না-জানা যে,
তাই দেখে আজ বেলা গেল,
নয়ন ভরে আসে।
পসরা মোর পাসরিলাম
রইল পথের পাশে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিবেদিতা

নিবেদিতা চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে চোখের জলের কালী দিয়া না লিখিলে সে লেখা সম্পূর্ণ হয় না। তিনি যে আমাদেরই ছিলেন, তিনি যে ভারতবর্ষে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এই কথাটী আমরা এখন অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারিতেছি। স্বামী বিবেকানন্দ এই দুর্লভরত্ন আনিয়া জননী ভারতবর্ষের পাদপদ্মে উপহার দিয়াছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনের সহিত ভারতবর্ষের এই যে একান্ত সংযোগ ইহা অতি বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। কোথায় ধনজনসম্পদময় সুদূর ইংলণ্ডের সুসভ্য সমাজে প্রতিষ্ঠাময় জীবন—আর কোথায় ধ্বংসদশাগ্রস্ত ভারতবর্ষের কোন এক দরিদ্রপল্লীতে নিতান্ত অখ্যাতভাবে জীবন যাপন! কোথায় সুখসৌভাগ্য ও আভিজাত্যের গৌরব আর কোথায় দুঃখদারিদ্র্য ও নিন্দা অপমান! কোথায় স্বজন গৃহ পরিবারের সুখময় আশ্রয়, আর কোথায় বহু দূরদেশে, এক নিতান্ত বিভিন্ন আচারাবলম্বী ভিন্নভাষাভাষী বিদেশীর সহিত ধনী-দীন-জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধন! কোন্ শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া নিবেদিতার জীবনের গতি এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল প্রথমে তাহাই জানিতে কৌতূহল হয়। নিবেদিতা তাঁহার "The Master as I saw him" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় তাঁহার এইরূপ ভাবে জীবনের গতি পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ।

১৮৯৫ খৃঃ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইংলণ্ডে গিয়া বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রের দিকে নিবেদিতার মন কিছু কিছু আকৃষ্ট হয়। স্বামীজী বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, বক্তৃতা শেষ হইলে পরে শ্রোতাগণ যে যে প্রশ্ন করিতেন তাহারও মীমাংসা করিয়া দিতেন। এইসকল বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর শুনিয়া প্রথমতঃ নিবেদিতার মনে বর্ত্তমানকালে প্রচলিত য়ুরোপীয় ধর্ম্মানুশাসনের সহিত ভারতীয় দর্শনের তুলনা উদিত হইল। স্বামীজীর নিকট এইসকল বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া নিবেদিতার মনের ভাব ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে স্বামীজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাও বাড়িতে লাগিল। নিবেদিতা কেবল যে বিদ্যাবতী ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, লোকচরিত্র অধ্যয়নে তাঁহার ন্যায় সুনিপুণা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীজীর সহিত পরিচয়ে নিবেদিতা বুঝিতে পারিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ শুধু সুপণ্ডিত, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ও অলোক-সাধারণ প্রতিভাশালী নহেন, তাঁহার অসাধারণ সত্যানুরাগ ও বীরত্ব-প্রভাতেই তাঁহার চরিত্র এত অধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

তিনি উচ্চকণ্ঠে জগৎ-সমাজ আহ্বানধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"What the world wants to-day, is twenty men and women who can dare to stand in the street yonder, and say that they *possess* nothing but God. Who will go ? * * * Why should one fear ? If this is true, what else could matter ? If it is not true, what do our lives matter ?"

"আজিকার দিনের পৃথিবী কি চায় ?—বিংশতি জন এমন রমণী এবং পুরুষ যাহারা সাহস করিয়া একেবারে পথে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন আর আমাদের কিছু সম্বল নাই ! কে যাইবে ? * * ঐরূপ (ঈশ্বরকে ধরিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ) করিতে ভয়ই বা কেন ? ইহা যদি সত্য হয় (অর্থাৎ ঈশ্বর যদি থাকেন) তবে অপর সমস্ত ত্যাগে কি আসে যায় ? আর ইহা যদি সত্য না হয় (ঈশ্বর যদি না থাকেন) তবে জীবনধারণেই বা কি যায় আসে ?"

স্বামীজীর এই আহ্বান নিবেদিতার কর্ণে বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ধ্বনিত হইয়াছিল। তখন তিনি মনে মনে এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন, কে যেন তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব বিশ্বাসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। স্বামীজী আবার বলিয়াছেন,—

"The world is in need of those whose life is one burning love—self-less. The love will make every word tell like a thunder-bolt. Awake, awake, great souls ! The world is burning in misery. Can you sleep ?"

"পৃথিবী চায় তাহাদিগকে যাহাদিগের জীবন আত্মাহুতিদানে' জ্বলন্ত প্রেম স্বরূপ হইয়াছে। সেই ভালবাসাই তোমার প্রত্যেক কথাতে বজ্রতুল্য বল দিবে। জাগো, জাগো মহাপ্রাণগণ, পৃথিবী দুঃখক্লেশে দগ্ধ হইতেছে, তুমি কি ঘুমাইতে পার ?"

স্বামী বিবেকানন্দের এইসকল বাক্য নিবেদিতার জীবনেই সফল হইয়াছিল। ধন-মান-সম্পদ গৃহ-পরিবার সমস্ত ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল ভগবানকেই সম্বল করিয়া জগতের পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনই আত্মস্মৃতি-রহিত জ্বলন্ত প্রেমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছিল।

"নিবেদিতা !" এই নাম তাঁহার কি সার্থকই হইয়াছিল ! ভগবৎ-পাদপদ্মে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, 'আপনার' বলিয়া অভিমানের বেড়া দিয়া পৃথক্ করিয়া এতটুকুও রাখেন নাই। "নিবেদিতা" এই নামটীতেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য অন্য কিছুরই আর আবশ্যক হয় না।

বোসপাড়ার একটী ছোটবাড়ীতে নিবেদিতা থাকিতেন, এই বাড়ীতে মেয়েদের পাঠশালাও বসিত। সাধারণ হিসাবে বিদ্যালয় বলিলে যাহা বুঝায় এই বিদ্যালয়টী সেরূপ ধরণের নহে, স্বামী বিবেকানন্দ যে ব্রহ্মচারিণীগণের মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সঙ্কল্পকে ভিত্তি করিয়া নিবেদিতা এই বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের কার্য্যেই নিবেদিতা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং এই বিদ্যালয়ের কার্য্যেই নিবেদিতা তাঁহার জীবন দান করিয়া গিয়াছেন। বোসপাড়ার একটী ছোট গলি,—তাহার ভিতর একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয়,—নিবেদিতার ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালিনী একান্তনিষ্ঠাব্রতাবলম্বিনী রমণী,—যাঁহার পক্ষে পৃথিবীতে কোন কার্য্যেই সফল হওয়া অসম্ভব ছিল না,·তিনি যে সমস্ত জীবন এই বিদ্যালয়ের জন্যই দান করিয়া গিয়াছেন, প্রথমে একথা শুনিলেই আশ্চর্য্য হইতে হয়, এবং এইরূপ ভাবে জীবন উৎসর্গ করাকে অনেকে শক্তির অযথা অপচয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই জন্য নিবেদিতাকে ও নিবেদিতার সঙ্কল্পিত কার্য্যকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ভারতের পুনর্জ্জীবন লাভের উপায় সম্বন্ধে তাঁহার যাহা মত ছিল প্রথমে তাহাই বুঝিয়া লইতে হয়।

সকল মানবেরই একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব, সেই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ! শিক্ষার উদ্দেশ্য একই, কিন্তু দেশ, কাল ও প্রয়োজনভেদে শিক্ষা-প্রণালী বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষা-প্রণালী যেরূপ হওয়া উচিত নিবেদিতা তাঁহার "The Web of Indian Life" এবং "The Master as I saw him" নামক পুস্তকদ্বয়ে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা তাঁহার মতের সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। নিবেদিতা বলিয়াছেন,—

"পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতের সর্ব্বত্র একটা অশান্ত ভাবের উদয় হইয়াছে, সেই সঙ্গে উন্নতির শত শত সর্ব্বরোগহর ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে। এইসকল উন্নতিকামিগণের ভিতর একদল সমাজসংস্কারক মনে করেন ভারতবর্ষের কতগুলি প্রাচীন সামাজিক প্রথা ধ্বংস করিলেই মাতৃভূমির উন্নতি হইবে। সমাজ সংস্কারের জন্য এই সংস্কারকদলের প্রবল উৎসাহ দেখিয়া বুঝা যায়, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে প্রাণহীন হয় নাই। যদি ভারতের জীবনদীপ একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত তাহা হইলে কি আর প্রাচ্য পাশ্চাত্য

সংঘর্ষে সংস্কারকরূপ এইসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিষ্কাসিত হইত? কিন্তু এই উপরউপরের সংস্কারের চেষ্টায় ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগের ন্যায় এখনও বিচলিত হয় নাই। তাহাতে কি ইহাই বুঝায় না যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ গভীরতা, গুরুত্ব ও সজীবতা এখনও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান?

"ভারতবর্ষের উন্নতিকামী আর একদল আছেন, তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী। ভারতে পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রচলনই ভারতকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। বৈদেশিক রাষ্ট্রপরিচালন-প্রণালীর মধ্যে অনেক নিয়মই যে ভারতের আত্মস্থ করিয়া লওয়া প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় "রাজনীতি" এই বাক্যের ব্যবহারই একরূপ ক্লেশকর আত্মপ্রবঞ্চনা (painful insincerity) ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপর একদল আছেন যাঁহাদের মতে বিভিন্ন ধর্ম্মের কেন্দ্রগুলিকে সজাগ করিয়া তোলাই উন্নতির উপায়। তাহা ভিন্ন আর এক চতুর্থদল আছেন যাঁহাদের মতে অর্থনীতি-শাস্ত্রঘটিত দুর্ভাগ্য (economic grievances) ভারতের শোচনীয় অবস্থার একমাত্র কারণ। এবং তাহারই প্রতিকারের দ্বারা দরিদ্রভারতের দারিদ্র্যদশা দূর করিতে পারিলেই তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে আর বাধা থাকে না।"

"এইরূপ ভাবে সামাজিক সংশোধনই হউক, রাজনৈতিক শিক্ষাই হউক, নির্জ্জীব ধর্ম্মভাবের স্পন্দন অথবা অর্থনৈতিক শাস্ত্রোক্ত অভাব-পূরণ—যাহাই হউক না কেন, এইসকলেরই আধার স্বরূপ এই-সকলের অপেক্ষা অধিক বাস্তব একটী পদার্থ আছে, তাহা ভারতবর্ষের জাতীয়ত্ব। এই জাতীয়ত্ব বিশাল ভারতের অসংখ্য সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়গত নহে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়কেই এই জাতীয়ত্বরূপ মিলনসূত্র বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমাজের দিক দিয়া,—অর্থনীতি রাজনীতি অথবা ধর্ম্মনীতির দিক দিয়া যে-কেহ উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা পরোক্ষভাবে জাতীয়ত্বকেই জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন। এই যে নব জাতীয়ত্বের অভ্যুদয়, ইহা ভারতের প্রাচীন কলাবিদ্যার নববিকাশ স্বরূপ হইবে। ইহা ভারতের প্রাচীন পাণ্ডিত্য ক্ষমতার নব আলোচনা, পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী জীবন্ত নূতন ভাষ্য। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বিগত জাতির যথার্থ আত্মজ স্বরূপ উহা একটী নব আদর্শ। সেই নূতন আদর্শ যুবকগণের মধ্যে জীবন্তভাব সজাগ করিয়া তুলিবে এবং প্রাচীনগণের শ্রদ্ধার ভিত্তিস্বরূপ হইবে। এই নব আদর্শের সাফল্য ইহাতেই পরীক্ষিত হইবে যে ইহার প্রভাবে ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্প্রদায় ও সমাজ জীবনস্পন্দনে স্পন্দিত হইবে। নিজের কেন্দ্র মধ্যে আয়ত্ত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা এবং আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা উহা দ্বারা এরূপ বৃদ্ধি পাইবে যাহা এপর্য্যন্ত একরূপ অজ্ঞাত আছে। জাতীয় জীবনের এই নব আদর্শ বা ঐরূপ জাতীয়ত্ব ভারতে বিকাশ করিয়া তুলিবার জন্য দুইটী জিনিসের প্রয়োজন। প্রথম, মাতৃভূমির প্রতি প্রেম, জ্বলন্ত প্রেম। সে প্রেম আত্ম হইতে, বিত্ত হইতে, পুত্র হইতেও অধিক হইবে। আপনার সম্প্রদায়ের প্রতি যে প্রেম লোকের এখন দেখা যায় তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রেম করিতে হইবে। তাঁহাকে—যিনি সকল সম্প্রদায়কে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন, সকল ধর্ম্মকেই আশ্রয় দিয়াছেন, সেই সর্ব্বধাত্রী মাতৃভূমিকে প্রেম করিতে হইবে, তবেই ভাই যেমন ভাইকে আপনা হইতেও অধিক ভালবাসে তেমনি মাতৃভূমির প্রত্যেক মনুষ্য ধনী দরিদ্র বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন ভাবাভাবী ভিন্ন মতাশ্রয়ী সকলেরই প্রতি এই প্রেম নির্ব্বিচারে আপনার উপর অপেক্ষা অধিক ঘনীভূত-ভাবে প্রকাশ করিতে পারিবে। এই জ্বলন্ত প্রেম সম্প্রদায়ের গণ্ডি ছাড়াইয়া সমগ্র ভারতবর্ষবাসীকেই এক করিয়া লইবে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা। এই শিক্ষার অর্থ বাহিরের দ্রব্য আহরণ নহে, আপনার ভিতর হইতে এই শিক্ষাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে।"

ভারতবর্ষের শিক্ষার ভিত্তি ত্যাগ ও প্রেম। আত্মত্যাগই প্রেমের জীবন, এবং প্রেমেই ত্যাগের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি। ত্যাগ অর্থে নিঃস্বতা নহে, অক্ষয় ধনে ধনী হইবার পথই ত্যাগ; ত্যাগ অর্থে পরাজয় নহে, বরং জগৎসমাজে বিজয়ী হইবার একমাত্র উপায়ই আত্মত্যাগ। কিন্তু সে ত্যাগ একেবারে স্বার্থবোধমাত্রবিহীন হওয়া চাই, যাঁহার ত্যাগে অজ্ঞাতসারেও অভিমানের অথবা কামনার ছায়া স্পর্শ করে তাঁহার অমূল্য দানও ধূলিমুষ্টির ন্যায় তুচ্ছ হইয়া যায়। নিবেদিতার মতে ইহাই ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষা। এই জাতীয় শিক্ষা বংশপরম্পরা হইতে ভারত-বাসীতে অন্তর্নিহিতভাবে আছে, তাহাকে জাগ্রত করিয়া তোলাই বর্ত্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা যখন কেবল গ্রন্থে নিবদ্ধ থাকে তখন তাহা কতকগুলি বর্ণে অঙ্কিত রেখা মাত্র; জ্ঞান, বুদ্ধির তুলিকায় তাহার অস্পষ্ট ছায়াময়ী মূর্ত্তি কখন অঙ্কিত করিতে পারিলেও উহাতে জীবন দিতে পারে না। শিক্ষা তখনই জীবন প্রাপ্ত হয় যখন তাহা মানবহৃদয়ে ভাবরূপে জাগ্রত হইয়া উঠে। তখন তাহার সমগ্রজীবনে, ছোট বড় প্রত্যেক কার্য্যে, বাক্যে, চিন্তায়, দিনে, রাত্রে, প্রতি মুহূর্ত্তে শিক্ষার সাফল্য প্রস্ফুটিত হয়। নিবেদিতা এই ভাবেই ভারতবর্ষীয় রমণীগণের ভিতর শিক্ষা জাগ্রত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, এবং এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাবের প্রারম্ভে ভারতরমণীগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য যখন প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল তখন সমাজ তাহার বিরোধী হইয়াছিল। তখন অনেকেরই এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে ভিন্ন দেশের রমণী হইতে ভারতরমণীর যে কৌলিক বিশেষত্ব তাহা এই পাশ্চাত্য অনুকরণের শিক্ষায় ধ্বংস হইয়া যাইবে। ঐ বিরোধের ফলেই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বন্যায় আমাদের তৎকালীন যুবকসমাজ একেবারে ভাসিয়া যাইলেও পাশ্চাত্য-শিক্ষার ঐরূপ মোহকরী প্রভাব ভারতবর্ষের অন্তঃপুরে সেরূপভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। পতি-পুত্র-পরিবার-আত্মীয়-

স্বজন-প্রতিবাসী-পরিচিতের নিয়ত কল্যাণধ্যানে দেহবোধ-পর্য্যন্ত-বিরহিতা নিয়তশ্রমপরায়ণা আমাদের পূর্ব্ব-পিতামহীগণের জীবনযাপনের স্মৃতি বিশুষ্ক বকুলমালার সৌরভের ন্যায় ভারতবর্ষের অন্তঃপুরেই রক্ষিত ছিল, নবশিক্ষার প্রবল ঝটিকায় তাহা একেবারে উড়িয়া যায় নাই। ভগিনী নিবেদিতা সুদূর প্রতীচ্য দেশ হইতেও সেই সৌরভে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

রমণী, জাতির জননী। একটী দীপ হইতে আর একটী দীপ জ্বালিবার মত মায়ের জীবনের আলো হইতেই সন্তানের জীবনদীপ প্রজ্বলিত হয়। নিবেদিতা তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"রমণীই সমস্ত পৃথিবীতে ন্যায়ের আদর্শের রক্ষাকর্ত্রী। বালক নিঃসহায়ের শবদেহ দাহঘাটে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইবে না, যদি না যখন সে শিশু ছিল তখন তাহার জননী এইরূপ ভাবের সৎকার্য্যের প্রশংসায় তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ করিত। স্বামী তাহার হৃদয়ের উচ্চভাব লইয়া গৃহে ফিরিতে এত চেষ্টাশীল হইত না, যদি না তাহার স্ত্রী স্বামীর সেইসকল চরিত্রগত উন্নত গুণগুলি স্মরণ করিয়া সুখী হইত। তদ্ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায় রমণীগণ প্রত্যেক কার্য্য এবং তাহাদিগের সম্পূর্ণজীবন উচ্চ আদর্শের দৃষ্টান্ত স্বরূপে দান করে।"

রমণী স্থিতিবিধায়িনী। কুলক্রমাগত শোণিতধারায় প্রবাহিত যেসকল মহৎভাব আজ পর্য্যন্ত ভারতরমণীর প্রকৃতির মধ্যে রক্ষিত আছে, স্বামী বিবেকানন্দ সেই-সকল ভাবকেই শিক্ষাসংস্কারের দ্বারা নবভাবে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামীজীর সেই ইচ্ছাকে অনুবর্ত্তন করিয়াই ভগিনী নিবেদিতা এই শিক্ষালয়ের কার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যদিও ইহার আয়োজন বৃহৎ নহে, তথাপি নিবেদিতা জানিতেন অগ্ন্যুৎপাদনের প্রয়োজন হইলে রাশি রাশি ইন্ধন সংগ্রহে জীবন যাপনই একমাত্র আবশ্যকীয় নহে। সামান্য ইন্ধনে অগ্ন্যুৎপাদন করিয়া ধীরে ধীরে উহার পোষণ করিতে পারিলে কালে উহা আপনা হইতেই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, এই বিদ্যালয় হইতেই ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী গার্গীর পুনরভ্যুদয় হইবে।

এই শিক্ষালয়ে ছোট ছোট বালিকা হইতে বয়ঃপ্রাপ্তা, বধূ, গৃহিণী ও বিধবাগণ সকলকেই, যিনি যেরূপ ভাবে শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে, শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। ভাষা, অঙ্ক, শিল্পকার্য্য, সেলাই এবং চিত্রবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট মেয়েদের উচ্চশ্রেণীর মেয়েরাই শিক্ষা দিত। উচ্চ-শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে তিন চারিটী বিধবাও ছিল, ইহারা এই বিদ্যালয়ের কার্য্যেই জীবন সমর্পণ করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল। শ্রীমতী সুধীরা, যিনি এই উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী এবং সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিচালিকা ছিলেন, তিনি চিরকুমারীব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ের কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় উন্নতমনা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী অতি দুর্লভ। সন্তানের কল্যাণে মাতার যেরূপ প্রাণপণচেষ্টা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের কল্যাণের জন্য তাঁহার চেষ্টাও সেইরূপ ঐকান্তিক ছিল, এবং ছাত্রীরাও তাঁহাকে মনের সঙ্গে ভালবাসিত ও সকল প্রকারে তাঁহার আদেশ পালনের চেষ্টা করিত। শিক্ষালয় পরিচালনে সুধীরা দেবীই নিবেদিতার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

এই শিক্ষালয় বাড়ীটী তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। উপরের ঘরগুলি খুব ছোট ছোট, ছাতও নীচু। গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে সেই ঘরগুলি এত গরম হইত যে, কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকিলেই মাথা ধরিয়া যাইত। গ্রীষ্মপ্রধান-দেশবাসীর পক্ষে এইরূপ গরম অনেকটা অভ্যস্ত, কিন্তু শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীর পক্ষে গ্রীষ্মকালে সেরূপ গৃহে বাস করা কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। নিবেদিতার ঘরে গ্রীষ্মনিবারণের জন্য টানাপাখাও ছিল না, কেবল একখানি হাতপাখা সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিত। তাঁহার ছোট ঘরটী তিনি নিজের ইচ্ছামত সাজাইয়াছিলেন। সেই ঘরের ভিতর দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি কাযের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। বেশীর ভাগই লেখাপড়ার কায। কাযে তাঁহার মন এত নিবিষ্ট থাকিত যে সে সময় শীত গ্রীষ্ম বোধ থাকিত না। আমরা দেখিয়াছি কখন কখনও কায ছাড়িয়া যখন তিনি বাহিরে আসিতেন, তখন অসহ্য গরমে তাঁহার মুখচোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে একএকবার এঘর ওঘর ঘুরিয়া ছাত্রীরা কে কোথায় কি করিতেছে তাহা তিনি দেখিয়া আসিতেন, কপালে হাত দিয়া মাঝে মাঝে চাপিয়া ধরিতেছেন দেখিয়া শিক্ষয়িত্রীদিগের কেহ কারণ জিজ্ঞাসা

করিলে বলিতেন "মাথায় বড় কষ্ট!" আবার তখনই গিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিতেন।

এই যে লেখাপড়ার কায, ইহাও বিদ্যালয়েরই জন্য। বিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যের জন্যই তাঁহার পুস্তক লিখিবার অধিক প্রয়োজন হইত। যখন খরচের টানাটানি পড়িত, তখন নিজের সম্বন্ধে কোন খরচটা কমাইতে পারা যায় সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িত, নিজের শরীর পোষণে যে যৎসামান্য ব্যয় তাহাও যেন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিত। ইহার ফলে, শারীরিক অনিয়মে তাঁহার শরীর দিনে দিনে যখন রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িত তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য স্থান পরিবর্ত্তনে যাইতে হইত। মনের একাগ্রতার জন্য শরীর সম্বন্ধে তাঁহার লক্ষ্যই ছিল না, সেজন্য শরীর যে দিন দিন ভগ্ন হইতেছে তাহা যেন তিনি বুঝিতেই পারিতেন না।

বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্যার্থী হইয়া যদিও তিনি দ্বারে দ্বারে দাঁড়ান নাই তথাপি বিদ্যালয়ের আর্থিক অনাটনের বিষয় আমাদের দেশবাসিগণের যে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল তাহা নহে। এই বিদ্যালয়ের আর একটী শাখা বিদ্যালয় ছিল সেটীতে কেবল ছোট মেয়েদেরই শিক্ষা দেওয়া হইত। আর্থিক অভাবের জন্য নিবেদিতা যখন কোনরূপে সেই পাঠশালাটীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন মাসিক ত্রিশটী টাকা যদি সাহায্য পান সেজন্য কয়েকবার বেঙ্গলী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও যখন কিছু ফল হইল না তখন পাঠশালাটী তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "ভগিনী নিবেদিতা" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।" এখন আর নিবেদিতা নাই, নিজে অর্দ্ধাশনে অনশনে থাকিয়াও তিনি যে ভারতবর্ষে একমাত্র জাতীয় রমণী-বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন এখনও কি ঠিক দেশবাসীর সে বিদ্যালয়ের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ঘটিবে না?

বড় মেয়েদের শিক্ষা দিবার ভার শ্রীমতী সুধীরার উপর ছিল, নিবেদিতা যখন অবসর পাইতেন তখনই তিনি ছাত্রীদের শিক্ষার ভার লইতেন। গণিত ও চিত্রবিদ্যা এই দুইটীই তিনি বেশীর ভাগ শিক্ষা দিতেন। অবসরমত ইংরাজী ভাষাও শিখাইতেন। তাঁহার শিখাইবার প্রণালী অত্যন্ত সুন্দর ও নূতন ধরণের। যে প্রণালীতে তিনি গণিত ও চিত্রবিদ্যা শিখাইতেন, তাহাতে যাহাদের শিখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা কম তাহারাও অতি সহজে বুঝিয়া লইত। ছোট ছোট মেয়েরা খেলা করিতে করিতে তেঁতুলের বীজ অথবা অন্য কোন ফলের বীজ দিয়া প্রথমে গণনা শিখিত। জোড় কি বিজোড় খেলাতেই প্রথমে ছোট ছোট মেয়েদের যোগ বিয়োগ অভ্যাস হইত, তাহার পর তাহারা শ্লেটে অঙ্ক রাখিয়া অঙ্ক কসিতে শিখিত। শিক্ষালয়ের বড় মেয়েরা ছোট মেয়েদের শিক্ষা দিত, নিবেদিতা তাহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে উপদেশ দিতেন তাহার কিছু এখানে তাঁহার নিজের কথাতেই দিলাম;—"মেয়েরা যদি কিছু না জানে তবে তাহাদের বলিবে 'আচ্ছা, আমরা চেষ্টা করিব তাহা হইলে নিশ্চয় শিখিতে পারিব'। মেয়েরা যদি কিছু বলিতে পারে আর কিছু ভুল করে তবে তাহাদের বলিবে, 'হাঁ, হইল। কিন্তু আমরা আরও ভাল করিতে চেষ্টা করিব।' যদি কোন মেয়ে ঠিক করিয়া বলিতে পারে তবে তাহাকে বলিবে 'ঠিক্ ঠিক্।' এবং অন্য মেয়েদের বলিবে 'আমরাও পারিব, আবার আমরা চেষ্টা করিব'।" কথা বলিবার সময় তিনি কতকগুলি কথার উপর জোর দিয়া বলিতেন। "নিশ্চয়!" এই কথাটীর উপর জোর দিয়া বলিতেন। আবার যখন কাহারও কোন বিষয় ঠিক হইত, তখন "ঠিক্ ঠিক্!" বলিয়া বালিকার মত আনন্দে হাততালি দিতেন। লেখায় অথবা অঙ্কে যদি ভুল থাকিত তবে তখনই তাহা ভাল করিয়া কাটিয়া দিতেন এবং সর্ব্বদা বলিতেন "ভুল কখনও রাখিবে না। ভুল বুঝিবামাত্র কাটিয়া দিবে।"

ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্র প্রভৃতি কলাবিদ্যার উপর তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। ভারতীয় ভাস্কর্য্য, চিত্র ও কলাবিদ্যা সকলেরই মূলে আধ্যাত্মিকতার বীজ নিহিত আছে ইহা তিনি মনের সঙ্গে বিশ্বাস করিতেন। সুনিপুণ চিত্রকরের অঙ্কিত একখানি চিত্র অপেক্ষা মেয়েদের হাতের আঁকা পিঁড়ি আল্পনা তাঁহার নিকট অধিক আদরের

ছিল। একটী মেয়ের হাতের আঁকা আল্পনা তিনি তাঁহার শয়নগৃহের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই আলিপনার মধ্যে একটী বড় শতদল পদ্ম ও চারিপাশে ছোট ছোট যুঁইফুলের মত ফুল ছিল। এই আলিপনা তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, যে-কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহাকেই তিনি সেই আলিপনা দেখাইতেন। তিনি সকলের কাছেই বলিতেন, "কুমারস্বামী এই আলিপনার অনেক প্রশংসা করিলেন," কুমারস্বামী যে তাঁহার ছাত্রীর অঙ্কিত আলিপনার প্রশংসা করিয়াছেন এ আনন্দ তাঁহার আর রাখিবার স্থান ছিল না। পদ্মফুলের চিত্র বিশেষতঃ সহস্রদল শ্বেতপদ্মের চিত্র তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল, তিনি বলিতেন এই ফুল ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অন্য কেহ আঁকিতে জানে না। আলিপনাব পদ্মের চারিপাশেব ছোট ছোট ফুল দেখাইয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন, "কি সুন্দর সাদা ছোট ফুল! এই ছোট ফুলগুলি সকলে ঐ বড় ফুলের দিকেই মুখ ফিরাইয়া আছে, যেন বলিতেছে, 'আমরা তোমার কাছেই যাইতে চাই'।" নিবেদিতা মেয়েদের পাথরে ও মাটীতে ছাঁচ কাটার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ছাঁচ কাটিবার জন্য একরাশি মাটী ও নরুন আনিয়া সকল মেয়েদের সঙ্গে লইয়া "আমরা সকলেই শিখিব" বলিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছাঁচ কাটিতে বসিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে অনেক মেয়ে ছাঁচ কাটিতে অভ্যাস করিতেছিল। যে প্রথম যে ছাঁচটী প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দিত সেটী যতই খারাপ হউক না কেন তিনি অতি আদরের সঙ্গে লইতেন, এবং দেবতার প্রসাদ যেমন লোকে মাথায় ধারণ করে সেইরূপ ভাবে মাথায় ছুঁয়াইয়া নিজের ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন। ছোট মেয়েরা তাঁহাকে ছোট ছোট পুতুল গড়িয়া আনিয়া দিত। সে পুতুলগুলি একটী বাক্সে করিয়া রাখিতেন। তাঁহার ঘরে মেয়েদের হাতে প্রস্তুত এইসকল দ্রব্য স্তরে স্তরে সাজানো থাকিত, একএকদিন সব মেয়েদের একত্র করিয়া তাহাদের হাতের শিল্প কেমন ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে তাহা দেখাইতেন। মেয়েদের সপ্তাহের মধ্যে একদিন করিয়া সংস্কৃত শিখানো হইবে এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। নিবেদিতা বলিলেন—"যেদিন মেয়েদের হাতের তালপাতে লেখা সংস্কৃত শ্লোক আমার ঘরের দেওয়ালে শোভা পাইবে সেদিন কি আনন্দের দিনই হইবে।"

সপ্তাহের মধ্যে একদিন অথবা দুইদিন তিনি ইতিহাসে পাঠ দিতেন, সে সময় তিনি এতই তন্ময় হইয়া যাইতেন যে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইত তিনি কোথায় আছেন ও কাহাদের নিকট বলিতেছেন তাহাও তাঁহার মনে নাই। একদিন রাজপুতানার ইতিহাস বলিতে বলিতে তিনি যখন উদয়পুর গিয়াছিলেন তাঁহার সেই সময়ের ভ্রমণ-কাহিনী বলিতেছিলেন। "আমি পাহাড়ে উঠিয়া পাথরের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পদ্মিনী দেবীর কথা স্মরণ করিলাম"—বলিতে বলিতে নিবেদিতা যথার্থই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাতযোড় করিয়া বসিলেন। নিবেদিতার তখনকার মুখের ভাব যিনি দেখিয়াছেন তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না। নিবেদিতা বলিতে লাগিলেন, "অনলকুণ্ডের সম্মুখে পদ্মিনী দেবী হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি চোখ বুজিয়া পদ্মিনীর শেষচিন্তা মনে আনিতে চেষ্টা করিলাম। আ! কি সুন্দর! কি সুন্দর!" বলিতে বলিতে ভাবাবেশে মুগ্ধা নিবেদিতা কিছুক্ষণ মুদিতনেত্রে নীরব হইয়া রহিলেন। তিনি যে স্কুলঘরে বালিকাদের সম্মুখে বসিয়া তাহাদের ইতিহাসে পাঠ দিতেছেন, তাহা আর তাঁহার মনে নাই, পদ্মিনীর শেষচিন্তায় সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মন লয় হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার এই তন্ময়ভাব কতবার দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই তিনি একেবারে ভাবমগ্ন হইয়া যাইতেন। মেয়েদের বলিতেন "ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা! ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করিবে 'ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা!'" বলিয়া নিজের জপমালা হাতে লইয়া নিজে জপ করিতেন "মা! মা! মা!" ভারতবর্ষ যে তাঁহার কি প্রাণের প্রিয় ছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাইনা। কে জানে কে তাঁহার চোখে এমন সোনার কাজল পরাইয়া দিয়াছিল যে তাঁহার নিকট সকলই সুবর্ণময় হইয়া গিয়াছিল। কে জানে তাঁহার

গুরুদেব তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া মৃণ্ময়ীর ভিতর কি চিণ্ময়ী প্রতিমার অধিষ্ঠান দেখাইয়াছিলেন, তাই ভারতের ধূলি-কণার ভিতরও তিনি আধ্যাত্মিকতারূপ অমৃতরসের আস্বাদ পাইয়াছিলেন। সেই অমৃতপানে বিভোর হইয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, কত লোক তাহা শুনিয়া তাঁহাকে পাগল বলিবে। কিন্তু ধন মান যশঃ লইয়া যাহারা পাগল তাহারা এমন পাগলের কথা বুঝিবে কি করিয়া?

বাংলাভাষা ভাল করিয়া শিখিবেন ইহা তাঁহার বহুদিনের বাসনা ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া শিখিতে পারেন নাই বলিয়া বাংলাভাষা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তথাপি এক একটী ছোট ছোট কথা যখন যাহার নিকট শিখিবার সুবিধা পাইতেন, শিখিয়া লইতেন। সে সময় যদি একটী ছোট মেয়েও তাঁহার শিক্ষয়িত্রী হইত, তাহার নিকটেও তাঁহার বিনীতা ছাত্রীর ন্যায় আচরণ দেখা যাইত। একটী নূতন কথা শিখিলেই ক্ষুদ্র বালিকার মত আনন্দে হাসিয়া অস্থির হইতেন। একদিন কোন মেয়ে শ্লেটে দাগ টানিতে টানিতে বলিয়াছিল "লাইন টানিতেছি।" "লাইন" এই শব্দটী শুনিবামাত্র নিবেদিতা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন "আপনার ভাষায় বল।" কিন্তু "লাইন"এর বাঙ্গলা প্রতিশব্দটী যে কি তাহা কোন মেয়েই ভাবিয়া পাইল না। সকলেই বলিতে লাগিল "সিষ্টার, আমরা তো বরাবর লাইনই বলি।" দুঃখে, বিরক্তিতে নিবেদিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, নিবেদিতা বলিলেন "তোমরা আপনার ভাষাও ভুলিয়া গেলে?" তাহার পর যখন একটী মেয়ে বলিল "লাইনের বাংলা রেখা" তখন আর নিবেদিতার আনন্দের সীমা রহিল না, যেন তিনি একটী হারাণো জিনিস্ কুড়াইয়া পাইয়াছেন। বার বার "রেখা, রেখা, রেখা" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

নিবেদিতা যখন ছবি আঁকিতে শিখাইতেন তখন সকল মেয়েকে সারি দিয়া বসাইতেন, ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিতেন না। শিক্ষয়িত্রীরাও সে সময় ছাত্রীদের শ্রেণীভুক্ত হইতেন, এমন কি, সিষ্টার ক্রিষ্টিন্‌কেও এই সময় ছাত্রীদলভুক্ত হইতে হইত। ক্রিষ্টিন্ ছোট মেয়েদের কাছে ঘেঁসিয়া বসিতেন। তাঁহার বড় ভয় যে তাঁহার আঁকা ছবি ভাল হইবে না, তাহা দেখিয়া বড় মেয়েরা হাসিবে। মেয়েরা প্রত্যেকে রং তুলি পেন্সিল ও একখানা করিয়া কাগজ পাইতেন, নিবেদিতার নিজের হাতেও তুলি আর কাগজ থাকিত, তিনি প্রায়ই প্রথমে পেন্সিল দিয়া একটী বৃত্ত আঁকিতেন, সেই কাগজখানি হাতে লইয়া কিরকম ভাবে হস্তচালনা করিয়া বৃত্ত আঁকিতে হইবে প্রত্যেক মেয়ের কাছে দাঁড়াইয়া এক একবার দেখাইয়া দিতেন। মেয়েরা প্রথমে পেন্সিলের উল্টাপিঠ দিয়া কাগজে দাগ না পড়ে অথচ সমভাবে রেখা টানিবার মত হস্তচালনা অভ্যাস হয় এইরূপ ভাবে কাগজের উপর দাগ বুলাইবার মত পেন্সিল বুলাইত তাহার পর দ্রুতহস্তে রেখা টানিত। এইরূপ রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ চিত্র আঁকা হইত। সিষ্টার ক্রিষ্টিনের ছবি ভাল না হইলে তিনি লজ্জায় হাসিয়া অস্থির হইতেন।

বিদ্যালয়টী যেন মেয়েদের একটী আনন্দনিকেতন ছিল। বড় মেয়েরা যাহারা বিদ্যালয়ে আসিত তাহারা কেহই অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বধূ বা কন্যা নহে, এজন্য তাহাদের সংসারের কাজ শেষ করিয়া তাহার পর আসিতে হইত। স্কুলে আসিতে হইবে এই উৎসাহে মেয়েরা সকাল হইতে প্রাণপণে সংসারের কাজ শেষ করিত। নিবেদিতা প্রায়ই মাঝে মাঝে তাঁহার ছাত্রীদের দক্ষিণেশ্বর অথবা কলিকাতার অন্য কোন স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাইতেন, সে সময় ছাত্রীদের যথাসম্ভব আতিথ্যও করিতেন। আবার গ্রীষ্মাবকাশ প্রভৃতির সময়েও বিদায়কালে মেয়েদের খাবার খাওয়াইতেন। ছাত্রীর সংখ্যা কম নহে, তিনিও দরিদ্র, অপর্য্যাপ্ত সামগ্রী কোথায় পাইবেন? যে খাবার আনিতেন, ছাত্রীর সংখ্যা গণনা করিয়া সকলের জন্য ছোট ছোট একটী করিয়া সুন্দর শালপাতের ঠোঙ্গা গড়িতেন, তাহারই ভিতর খাবার রাখিয়া ঝুড়ি হাতে একে একে সকলকে পরিবেষণ করিতেন। আবার খাওয়া শেষ হইলে মেয়েরা ঠোঙ্গা ফেলিবে বলিয়া নিজেই ঝুড়ি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এইরূপে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র অতিথিগণের আতিথ্যসৎকার সমাধা করিতেন।

পুরী, ভুবনেশ্বর অথবা ঐরূপ কোন স্থানে মাঝে মাঝে

মেয়েদের বেড়াইতে লইয়া যাইতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, অনেকবার এইরূপ যাইবার প্রস্তাবও হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ ঘটিয়া উঠে নাই। নিবেদিতা দেশভ্রমণের, বিশেষতঃ তীর্থভ্রমণের, অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি নিজে ভারতবর্ষের সকল তীর্থই প্রায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেইসকল ভ্রমণকাহিনী মেয়েদের নিকট গল্প করিতেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলেন, মেয়েদের নিকট যখন তাঁহার বদরিকাযাত্রার পথের কাহিনী বর্ণনা করিতেন তখন মনে হইত এইমাত্র যাহা দেখিতেছেন, তাহাই যেন বলিতেছেন। নিবেদিতা পথে অলকনন্দার তীরে এক বৃদ্ধাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কথা মেয়েদের কাছে বলিতেন—"তিনি (সেই বৃদ্ধা) স্নান করিয়া উঠিয়াছেন, তখনও ভিজা কাপড় পরিয়া আছেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি শীতকে গ্রাহ্য করেন না। অলকনন্দা নদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে (বলিতে বলিতে নিবেদিতা হাত যোড় করিলেন) সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি প্রণাম করিতেছেন। কি সুন্দর! কি সুন্দর তাঁহার মুখ! আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।" আবার বদরিকার পথে আর একস্থানে একজন প্রাচীনা পথে চলিয়াছেন, নিবেদিতা তাঁহার কিছুদূরে পিছনে চলিতেছেন। নিবেদিতা বলিতেন "তুষার গলিয়া গিয়াছে, পিছলে তাঁহার পা সরিয়া যাইতেছে। আমার ভয় হইল, তিনি হয়তো পড়িয়া যাইবেন। তিনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন? আমি তাঁহার বাহু ধরিতে পারি কি? আমি তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন। আঃ কি সুন্দর সে হাসি! তিনি আপনার যষ্টির উপর ভর দিয়া চলিয়া গেলেন।"

"তিনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন?" নিবেদিতার এই কথা বেদনার মত হৃদয়ে আঘাত করে। নিবেদিতা যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যাইতেন তখন যেন কত দীন হীন, এইভাবে প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তিনি জানিতেন, মন্দিরে উঠিয়া দেবীদর্শন করিবার অধিকার তাঁহার নাই। কিন্তু মন্দিরে যাঁহারা দেবীর পূজা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে নিবেদিতার মত অধিকারী কি কেহ ছিল? যাঁহার চরণধূলিস্পর্শে লোক পবিত্র হয়, তিনি নিজেকে দেবালয়প্রবেশে অনধিকারিণী ভাবিয়া সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইতেন। যে সর্ব্বত্যাগিনী গৃহ, সমাজ, সমাজিক সম্মান, আত্মীয়স্বজনের দুশ্ছেদ্য স্নেহপাশ সকলই পরিহার করিয়া ভারতের কল্যাণে নিঃশেষ ভাবে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, ভারতবাসী কি তাঁহাকে আপনার গৃহে, পরিবারে, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিল? তাহা যদি হইত তবে এত শীঘ্র আমরা তাঁহাকে হারাইতাম না।

বদরিকার তুষার-পিচ্ছল পথে প্রাচীনা রমণী যে নিবেদিতার সাহায্য করিবার জন্য সাগ্রহ প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া হাসিয়া আপনার যষ্টির উপর ভর দিয়াই চলিয়া গেলেন নিবেদিতা তাহাতে ক্ষুব্ধ অথবা দুঃখিত হন নাই বরং আনন্দিতই হইয়াছিলেন। নিবেদিতা বলিয়াছেন "কি সুন্দর সে হাসি!" নিবেদিতার বলিবার ভাবে বোধ হয় ক্ষুদ্র বালিকা তাহার জননীকে সাহায্য করিতে চাহিলে মা যেমন মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসেন, সে হাসিতে উপেক্ষা প্রকাশ পায় না বরং অক্ষম চেষ্টার প্রতি স্নেহ ও আত্মনির্ভরের ভাবই প্রকাশ পায়, প্রাচীনার হাসিতেও সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছিল।

এই ভাবটী নিবেদিতার বড় শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল। নিবেদিতা ইহাকে ভারতবর্ষের বংশগত ভাব বলিয়া গ্রহণ করিতেন। "তিনি ভারতবাসী" নিবেদিতা অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে এই কথা উচ্চারণ করিতেন। শুনিয়াছি, নিবেদিতার কাছে যে গোয়ালা দুধ দিত সে একদিন তাঁহার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহিয়াছিল। নিবেদিতা তাহার কথা শুনিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত হইলেন, এবং আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া বার বার তাহাকে নমস্কার করিলেন। বলিলেন, "তুমি ভারতবাসী, তুমি আমার নিকট কি উপদেশ চাও? তোমরা কি না জান? তুমি শ্রীকৃষ্ণের জাতি। তোমাকে আমি নমস্কার করি।"

মেয়েদের কখন কখন তিনি যাদুঘর (মিউজিয়াম) দেখাইতে লইয়া যাইতেন। মিউজিয়ামের যেসব গৃহে প্রাচীনকালের স্থাপত্যের নিদর্শন আছে সেইসব গৃহই ভাল করিয়া দেখাইতেন। বৌদ্ধযুগের ভাস্করনির্ম্মিত

প্রস্তরময় মূর্ত্তি ও স্তম্ভ প্রভৃতি যে গৃহে আছে একদিন সেই গৃহে মেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নিবেদিতা একখানি শিলালিপির নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া মেয়েদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই প্রস্তরের নাম কাম্যপ্রস্তর, মহারাজ অশোক এই প্রস্তরের নিকট বসিয়া কামনা করিয়াছিলেন, এসো আমরা সকলে এখানে কামনা করি।" বলিয়া সেই প্রস্তরমূলে মেয়েদের সকলকে লইয়া উপবেশন করিলেন এবং "তোমরা সকলেই মনে মনে কামনা কর" বলিয়া নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। আবার যখন মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি কামনা করিয়াছিলে?" মেয়েরা উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "ঠিক্, কাম্যমন্ত্র মনে মনেই জপ করিবে।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কখনও তিনি কাহারও সহিত আলোচনা অথবা তর্কবিতর্ক করিতেন না, কিন্তু তাঁহার জীবনকেই একখানি জীবন্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলা যায়। তাঁহার হৃদয়ে যে প্রবল আধ্যাত্মিকতার পিপাসা ছিল সে পিপাসা কলসীর জলে পূর্ণ হইবার নহে। তিনি যে দেশে, যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেখানে রমণীর স্বাধীনতা অব্যাহত, সমাজে তাঁহাদের উচ্চসম্মান, জীবনের পথে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই পথ নির্ণয় করিয়া লইবার অধিকার তাঁহাদের আছে। নিবেদিতাও নিজের জীবনের পথের লক্ষ্য নিজেই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা ছিল তাহাতে সমাজ তাঁহাকে রমণীকুলের বরেণ্যা ও শীর্ষস্থানীয়া বলিয়া গ্রহণ করিত। তথাপি নিবেদিতা জীবনের সেই পুষ্পাস্তীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া এমন এক দুর্গম পথে চলিয়াছিলেন যে লোকে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে নিবেদিতার এই আজীবন তপস্যাকে সতীর তপস্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিকই নিবেদিতা মূর্ত্তিমতী তপস্যা ছিলেন। তপস্যা ও তাঁহার জীবন মিলিয়া মিশিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছিল। তপঃসমুদ্রের তীরে বসিয়া অঞ্জলিবারি পানে তাঁহার তৃষ্ণা দূর হয় নাই, তিনি একেবারে সেই সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কথাতেই বলিতে পারি তাঁহার চিত্ত "ভাবৈকরস" হইয়া পরম কল্যাণে স্থিত হইয়াছিল।

ভাব মানবসমাজের প্রাণ স্বরূপ, ভাবহীন সমাজ মৃতপ্রায়। কর্ত্তব্যের পাষাণ মূর্ত্তিতে ভাবই প্রাণদান করে। ভাবের তরঙ্গমালাই কর্ম্মপ্রবাহে নির্ম্মলস্রোতা স্রোতস্বিনীর প্রাণময়ী গতি আনিয়া দেয়। নিবেদিতা যাহা করিতেন তাহা কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেই করিতেন না, উহাতে হৃদয়ের ভালবাসা ঢালিয়া দিতেন। কর্ত্তব্যবুদ্ধি কৃতকার্য্য হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া রাখে, ভালবাসা কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া দেয়। কর্ত্তব্যের দান দীনের প্রতি দয়া, ভালবাসার দান পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাহার কল্যাণে জীবন সমর্পণ। নিবেদিতা ভালবাসিয়া ভারতবর্ষকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কেবল কর্ত্তব্যবোধে করেন নাই।

তিনি কোন কোন দিন মেয়েদের নিকট তাঁহার গুরুদেবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেন। কিন্তু গুরুদেবের নামমাত্র উল্লেখে তাঁহার অন্তর ভাবরসে এতই পরিপূর্ণ হইত যে অধিক কথা বলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত। কেবল গুরুদেবের সম্বন্ধে এই একটীমাত্র কথা তিনি বারবার বলিতেন "তাঁহার নাম বীরেশ্বর, তিনি বীরদিগের ঈশ্বর ছিলেন। পৃথিবীর বীরগণ তাঁহার পদানুসরণ করিয়া চলিবে। তোমরা সকলে ছোট ছোট সুখ দুঃখ ছাড়িয়া বীর হও।" "বীর" এই কথাটার উপর তিনি সব সময়ই জোর দিয়া বলিতেন।

মেয়েদের পড়িবার ঘরে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি চিত্র ছিল। অপরদিকের দেয়ালে মানচিত্র টাঙ্গানো থাকিত। নিবেদিতা একদিন মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংসদেবের ছবির নীচে টাঙ্গাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "রামকৃষ্ণদেব জগৎগুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলে থাকিবে।"

নিবেদিতার এই কথা তাঁহার মনের কথা। তিনি যাহা বুঝিতেন জগৎসমক্ষে তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "না মরিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।" অর্থাৎ আপনাকে একেবারে লয় করিয়া না দিলে আধ্যাত্মিক জগতে কেহ পুনর্জ্জন্ম

লাভ করিতে পারে না। নিবেদিতা সেইভাবে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, তিনি অপার মহোদধিতে আপনার বিন্দুত্ব একেবারে লয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা না হইলে নিবেদিতা যে ভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমন অপার্থিব আত্মত্যাগ জগতে কখনও সম্ভব হয় না। আত্মত্যাগের কাহিনী আমরা লোকমুখে শুনিয়াছি, পুস্তকেও পড়িয়াছি, কিন্তু নিবেদিতার আত্মত্যাগ যাহা চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছি তাহা আর কোন স্থানে দেখিয়াছি অথবা দেখিব বলিয়া মনে হয় না।

নিবেদিতা যখনই নিজের নাম স্বাক্ষর করিতেন "Nivedita of Ramkrishna-Vivekananda" এই বলিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিতেন। উদারমতাবলম্বিগণ সম্প্রদায়ের গণ্ডি অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন, নিবেদিতা সর্ব্বদাই সম্প্রদায়ের নামের সহিত আপনার নাম যুক্ত করিয়া রাখিতেন, অথচ তাঁহার মত উদার মত অতি অল্প লোকেরই আছে। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী এবং একনিষ্ঠতা, ইহার একটীর সঙ্গে আর একটীর আকাশপাতাল প্রভেদ। একটীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা আর একটীতে আত্মবিসর্জ্জন। জগতে কেন্দ্রানুগ গতির সহিত কেন্দ্রাতিগ গতির যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সেইরূপ একনিষ্ঠার সহিত অনন্তে আত্মব্যাপ্তির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। নিবেদিতার জীবন একনিষ্ঠতার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! নিবেদিতা যে-পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন সে-পথের কঠোরতা ব্যর্থতা তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়-আকাশে বিন্দুমাত্র সংশয়মেঘের সঞ্চার করিতে পারে নাই। একমাত্র ধ্রুবতারাকেই লক্ষ্য করিয়া অসংশয়ে তিনি যেন আপন পথে নিয়ত চলিয়া গিয়াছেন। এক পরিপূর্ণ চন্দ্রের মধুর জ্যোৎস্নায় তাঁহার চিত্ত মধুময় হইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি মাতৃরূপে সকলকেই বুকে ধরিয়াছেন। তাঁহার ভালবাসা স্বার্থগন্ধরহিত, এজন্যই সে প্রেম প্রতিদানের কামনা রাখিত না, অপ্রতিদানেও ম্লান না হইয়া সমভাবেই উজ্জ্বল থাকিত।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে॥

পার্থিব জগতে যত দুঃখই তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লউন না কেন, সংশয়পীড়ায় কখনও তাঁহার চিত্ত পীড়িত হয় নাই। তাঁহার শেষ বাক্যও ঐ ভাবের পরিচায়ক—"The boat is sinking but I shall yet see the sunrise."

তিনি এমন ভাবময়ী ছিলেন যে অনেক সময় তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত ভাব যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কখনও তিনি লোক-শিক্ষয়িত্রী, কখন স্নেহবিগলিতা জননী, কখন কর্ত্তব্যে একনিষ্ঠ মায়ামমতাবর্জ্জিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মী, কখন বিনীতা ছাত্রী অথবা সেবিকা, আবার কখনও ভগবৎ-ভাবে বিভোরা। বোসপাড়ার বাড়ীতে এইরূপে দুইটি য়ুরোপীয় মহিলা বৎসরের পর বৎসর বাস করিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিষ্টিন। ক্রিষ্টিনের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে একস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। বাগবাজার উদ্বোধন আফিসে শ্রীশ্রীমাতাদেবী (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্ম্মিনী) কখন কখন আসিয়া বাস করেন। ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিষ্টিন্ দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার তথায় গিয়া কিছুক্ষণ মাতাদেবীর নিকট বসিয়া থাকিতেন। সে সময় নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে নিবেদিতা মাতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতা—যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, মাতাদেবীর নিকটে তাঁহার এইরূপ শিশুর মত ভাব ছিল। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহ হাস্যে চাহিতেন তখন মায়ের আদরে বালিকার মত তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে আসনে বসিবেন, নিবেদিতা যদি সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার যে আনন্দ হইত সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে বুঝা যাইত। কতবার সেই আসনকে প্রণাম করিতেন, অতি যত্নে ধূলা ঝাড়িয়া তাহার পর আসনখানি পাতিতেন, তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত এই অধিকারটুকু পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে। মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন এইরূপ কথা হইয়াছিল, নিবেদিতা সেই অবধি বিদ্যালয়ের সংস্কার আরম্ভ করিলেন। যেদিন মা বিদ্যালয়ে আসিবেন নিবেদিতা সে দিন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন। এখানে ওখানে ছুটাছুটী করিতেছেন, কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনও বা আনন্দে অধীর হইয়া কখন

বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদিগের, কখন ছাত্রীদিগের এবং কখন বা দাসীর গলা পর্য্যন্ত জড়াইয়া ধরিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নয়জন নির্ব্বাসিত যেদিন মুক্তিলাভ করিলেন সেদিনও নিবেদিতার এমনই আনন্দ দেখিয়াছিলাম। সেদিনও বিদ্যালয়ের দ্বারে পূর্ণ-কুম্ভ কদলী বৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছিল। সেদিনও আনন্দের দিন বলিয়া মেয়েদের অনধ্যায় হইয়াছিল।

অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নিবেদিতা দৃপ্তাসিংহীর মত উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, সে সময় তিনি জগতে কাহাকেও দৃক্‌পাত করিতেন না। তাঁহার রোষাগ্নিদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে অতি গর্ব্বিতকেও মস্তক অবনত করিতে হইত। আবার অপর দিকে তাঁহার নম্রতাও অনন্যদুর্লভ ছিল, সে নম্রতা মৌখিক বিনয় নহে, আন্তরিক সৌজন্য। তিনি অতি দরিদ্রের সহিতও যেরূপ সসম্ভ্রম ব্যবহার করিতেন সেরূপ ব্যবহার কেবল তাঁহাতেই সম্ভব হইত।

তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে একটী সদাজাগ্রত ভাব ছিল, সেইটীকে তাঁহার যোদ্ধৃত্বের ভাবও বলা যাইতে পারে। তিনি একদিকে যাহা বুঝিতেন তাহার ভিতর যেমন তিলমাত্র জটিলতা বা সংশয়ের সম্পর্ক রাখিতেন না, তেমনি আবার অন্যদিকে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা তাঁহার জীবনের প্রতিক্ষণেই সফল করিবার জন্য যোদ্ধা যেমন যুদ্ধের সময় সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে সেইরূপ তাঁহার সমগ্র প্রকৃতিতে এই সদাজাগ্রত ভাব বর্ত্তমান থাকিত। এইজন্য তাঁহার কথায় ও কাযে বিন্দুমাত্র গরমিল দেখা যাইত না। মানুষ্যত্বের উপর শ্রদ্ধা নিবেদিতার স্বভাবের মজ্জাগত ভাব। মানুষ যেন মানুষ হয় ইহাই তিনি চাহিতেন। মানুষের ভিতরে যেখানে যে ভাবেই মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিয়াছেন, তেজস্বিনী নিবেদিতা সেইখানেই শ্রদ্ধা সহকারে আপনার মস্তক নত করিয়াছেন।

নিবেদিতার জীবন আলোচনা করিতে গেলে এত কথা বলিবার আসিয়া উপস্থিত হয় যে তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এবং লেখকের সামর্থ্যে কুলায় না। তিনি যেসকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তাহার ভিতর তাঁহার পরিচয় অনেকাংশে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে যে ভালবাসা দিয়া তিনি ভারতকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন সেই ভালবাসা দিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে হয়।

আজ নিবেদিতার কথা বলিতে গিয়া একদিকে যেমন সেই দৃঢ়ব্রতা সন্ন্যাসিনীর সত্য, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রেমপূত চরিত্র স্মরণ করিয়া বিমল আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অপরদিকে আবার আপনাদিগের অপৌরুষ ও দৈন্য স্মরণ করিয়া ক্ষোভে ও লজ্জায় অভিভূত হইতে হইতেছে। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে নিবেদিতাকে পরমাত্মীয়ারূপে সে হৃদয়ের কাছে পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে নিবেদিতা যখন জগতে ছিলেন, তখন তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া বুঝিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারে নাই। পার্থিব দৃষ্টিতে আজ আমরা তাঁহাকে হারাইয়াছি, আজ তাঁহার সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি লোকলোচনের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, আজ বোসপাড়ার বিদ্যালয়গৃহ শূন্য, নিবেদিতা আর সেখানে নাই! কিন্তু তাঁহার আজীবন সাধনার মূর্ত্তরূপ এখনও রহিয়াছে। নিবেদিতা যাহা প্রাণ দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সেই বোসপাড়ার বিদ্যালয়টী এখনও আছে; নিবেদিতার অভাবে তাহা কি শূন্যগর্ভেই মিলাইয়া যাইবে? স্বামী বিবেকানন্দের সেই বজ্রনির্ঘোষ আহ্বান-ধ্বনি, "জাগো, জাগো মহাপ্রাণগণ, পৃথিবী দুঃখক্লেশে দগ্ধ হইতেছে, তুমি কি ঘুমাইতে পার?"—যে আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া নিবেদিতা কেবল ঈশ্বরমাত্র সম্বল করিয়া জগতের পথে দাঁড়াইয়াছিলেন সে আহ্বান কি ভারতবাসীর শ্রবণে ব্যর্থ হইবে? ভারতে কি এমন বিংশতি জন রমণী এবং পুরুষ নাই যাঁহারা ভগবানের নামমাত্র সম্বল করিয়া ভারতের কল্যাণকামনায় পথে গিয়া দাঁড়াইতে পারেন? ইহা যদি সম্ভব না হয়, ভারতবাসীর এতটুকুও কি প্রাণ নাই যে নিবেদিতা অনশন অর্দ্ধাশন স্বীকার করিয়াও যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা কপর্দ্দকমাত্র ভিক্ষা দিয়াও সেই বিদ্যালয়কে রক্ষা করিতে পারেন? তপস্বিনী নিবেদিতা অনাহার অনিদ্রায় শিক্ষাসমিধে যে হোমানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন তাহার উজ্জ্বল শিখা কি সমস্ত ভারতবর্ষকে আলোকিত করিবে না? হব্য অভাবে তাহা কি যজ্ঞারম্ভেই নির্ব্বাপিত হইবে? শ্রীসরলাবালা দাসী।

মাছের সন্তানবাৎসল্য

অন্যদেশের মত আমাদের দেশেও নানারকম জীবজন্তু আছে। অন্যদেশের জীবজন্তুদের যেমন বুদ্ধি আছে, আমাদের দেশের জীবজন্তুদেরও সেইরূপ বুদ্ধি আছে। অন্যদেশের জীবজন্তুদের যেমন নানা শক্তি ও গুণ আছে, আমাদের দেশের জীবজন্তুদেরও সেইরূপ আছে। অথচ আমাদের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকে যদি ঘোড়ার প্রভু-ভক্তির বিষয় লিখিতে হয় তবে আরবদেশ হইতে দৃষ্টান্তের আমদানী করিতে হয়। যদি কুকুরের কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার বর্ণনা করিতে হয় তবে ওয়েল্‌স্‌ দেশ হইতে আমরা দৃষ্টান্তের আমদানী করি। বানরের দুষ্টামি, ভাঁড়ামি ও নকল করিবার প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হয়। ইহার কারণ এই যে আমরা জীবজন্তুদের কার্য্যপ্রণালী, ব্যবহার এবং প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করি না। এসকল পর্য্যবেক্ষণ করা আমাদের অভ্যাস নাই। ইউরোপ আমেরিকায় বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা পর্য্যন্ত এসকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া বড় বড় পুস্তক লিখিয়াছেন। এমন কি যে কেঁচোকে আমরা এত নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য জীব মনে করি, ডারুইন তাহার সম্বন্ধে একখানি বহি লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহার দ্বারা কিরূপে জমী উর্ব্বর ও চাষযোগ্য হয়। লাবক্‌ পিঁপড়া, বোল্‌তা ও মৌমাছি সম্বন্ধে একখানি মনোরম বহি লিখিয়াছেন। রোমেন্‌জ্‌ প্রণীত "জীবের বুদ্ধি" (Animal Intelligence) নামক পুস্তক সাধারণ পাঠকের পরিচিত।

মাছ আমাদের দেশে খুব হয়, এবং বাঙ্গালী খুব মৎস্যাশী। কিন্তু মাছের সন্তানবাৎসল্যের খবরটা আমাদিগকে ডাক্তার বিল্‌হেল্‌ম্‌ বার্ণ্ট (Dr. Wilhelm Berndt) নামক এক জার্ম্মেন্‌ প্রাণিতত্ত্ববিদের লেখা একটি প্রবন্ধ হইতে সংগ্রহ করিতে হইতেছে।

মৎস্য-পিতা অনেক মানব-পিতাকে সন্তানবাৎসল্যে পরাজিত করিতে পারে। মানবসমাজে মাতৃস্নেহ প্রায় সর্ব্বত্রই আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, কারণ সন্তানস্নেহ-হীনা মাতা কচিৎ দেখা যায়। কিন্তু সন্তানবাৎসল্যবিহীন পিতা অনেক দেখা যায়। ইতরপ্রাণীদের মধ্যে স্তন্যপায়ী জীবদের মা খুব স্নেহশীলা হয়, কিন্তু পিতাকে প্রায়ই তাহার উল্টা দেখা যায়! পাখীদের মধ্যে বড় বড় শিকারী-পাখীদের পিতারা খুব স্নেহশীল; তাহারা অনেক সময় সন্তানদের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করে। কিন্তু অন্য অনেক পাখীর সাদাসিধে পালকবিশিষ্ট মা শিশুগুলিকে "মানুষ" করিতেই ব্যস্ত থাকে, আর জাঁকাল পালকে ঢাকা পুরুষ পক্ষীগুলা কেবল নৃত্য গীত লইয়াই থাকে।

ভেক ও মৎস্যদের মধ্যে উচ্চ আদর্শের দাম্পত্যসম্বন্ধ ও সন্তানস্নেহ দেখা যায়। ভেকদের মধ্যে অনেক পিতা সন্তানগুলিকে খুব শৈশবে গিলিয়া ফেলে, কিন্তু তাহা খাইয়া ফেলিবার জন্য নহে। পিতার কণ্ঠের নিকট শিশু-গুলি আনন্দে বাড়িতে থাকে। অন্য একজাতীয় ভেকের শিশুরা মায়ের পিঠের উপরিস্থ মৌচাকের মত ছোটে ছোট গর্ত্তে শৈশবকাল কাটায়। আর একজাতীয় ভেক আছে, তাহাদিগকে ইংরাজীতে ধাত্রী-ভেক (obstetrical toad or nurse- frog) বলে। ইহাদের মধ্যে পিতা ধাইয়ের কাজ করে, সে সদ্যঃপ্রসূত ডিমের মালা তাহার পিছনের পাদুটিতে জড়াইয়া প্রায় দুই হপ্তাকাল নিজেকে গর্ত্তে সমাহিত করে! তাহার পর ডিম ফুটিবার সময় বাহিরে আসে।

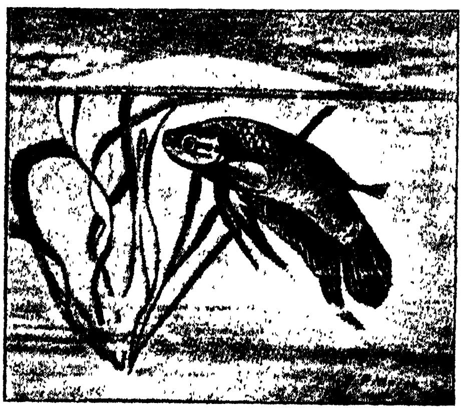
সন্তানস্নেহ ও সন্তানপালন সম্বন্ধে মাছদের মধ্যে অনেক রকমের সাদৃশ্য ও প্রভেদ আছে। ইউরোপের মাছগুলার সন্তানবাৎসল্য নাই; একমাত্র ব্যতিক্রম ষ্টিক্‌লব্যাক্‌ নামক মাছ। ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করে, এবং পুরুষেরা সন্তানের জন্য বহু স্বার্থত্যাগ করে। অনেক জাতীয় মৎস্যমাতা শিশুগুলি ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া কতকটা বড় হওয়া পর্য্যন্ত ডিমগুলিকে মুখের মধ্যেই রাখে। শিশুগুলি মধ্যে মধ্যে বাহিরে আসে, আবার ভয় পাইলে বা ক্লান্ত হইলে তাড়াতাড়ি গিয়া মায়ের মুখের ভিতর আশ্রয় লয়। দেখিলে বড় কৌতুক বোধ হয়। মুরগী যেমন সাবধানে ও যত্নের সহিত ছানাগুলিকে চরাইয়া লইয়া বেড়ায়, অনেক মৎস্যপিতা সেইরূপ নিজের শিশুগুলিকে সঙ্গে লইয়া সাঁতার দিয়া বেড়ায়। দেখিলে বড় আনন্দ হয়।

পরদেশ-মৎস্য (Paradise fish) নামক এক রকম



মৎস্য-পিতা শিশুমাছদিগকে চরাইতেছে।

মাছ আছে, যাহাদের মধ্যে পিতাই স্নেহশীল কিন্তু মাতা রাক্ষসী। ডাঃ বার্ণট্ বলেন, তিনি অনেক সময় মাতাকে মৎস্যপিতার অগোচরে ডিমগুলি চুরি করিয়া খাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছেন! তখন হয় ত পুরুষ-মৎস্যটি জলের উপর হইতে ফেন-বুদ্বুদ সংগ্রহ করিয়া নিজ ফেননির্ম্মিত বাসাটির উন্নতি করিতে ব্যস্ত। পুরুষটি নারীর এই রাক্ষসীচেষ্টা দেখিবামাত্রই তাহাকে কামড়াইয়া



পুরুষ যোদ্ধা মাছ ফেন-বাসায় পাহারা দিতেছে।

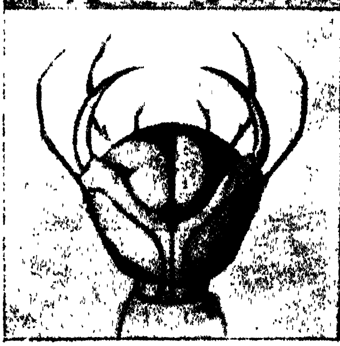
তাড়াইয়া দেয়। এই মৎস্যকে যোদ্ধামাছও বলে। আমাদের ছবিতে দেখান হইয়াছে যে পুরুষ যোদ্ধামাছ কেমন আত্মোৎসর্গের সহিত ফেনের বাসার নীচে পাহারা দিতেছে। ঐ বাসায় শিশুগুলি বাড়িতেছে। ডিম ফুটিয়া শিশুগুলি বাহির হইবার পর পিতৃস্নেহ উন্মত্ততার আকার ধারণ করে। তখন অন্য কোন পুরুষ মাছকে জলাশয়ে স্থাপন করিলে মৎস্যপিতা নির্দ্দয়ভাবে তাহার প্রাণবধ করে। যদি কোন মানুষ জলের মধ্যে তখন আঙ্গুল দেয়, তাহা হইলে সাহসী পিতা ক্রোধের সহিত এক মিনিট ধরিয়া আঙুলটার বিরুদ্ধে, কামড়াইয়া কামড়াইয়া, যুদ্ধ করে।

এদেশের সোল সাল মৎস্যের সন্তানবাৎসল্য সুবিদিত।

আগে হজম পরে ভোজন

অনেক কীট আছে, তাহাদের শারীরিক গঠন এরূপ যে তাহারা কেবল জলের মত তরল খাদ্যই গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের খাদ্য উদরের মধ্যে গেলে পরে পরিপাক করিবার জন্য রস নিঃসৃত হয়। ঐ রসের দ্বারা খাদ্য জীর্ণ হইয়া রক্তমাংসাদিতে পরিণত হয়। পূর্ব্বোক্ত কীটগুলি কেবল তরল খাদ্য খাইতে পারে বলিয়া আগেই তাহাদের শিকারের মধ্যে জীর্ণকারী একটু রস চালাইয়া দেয়। এই প্রকারে শিকারের শরীরটা গলিয়া জলীয় হইলে, তাহা তাহারা চুষিয়া খাইতে থাকে। শেষে কেবল শিকারের শরীরের শুক্‌না চামড়াটি বাকী থাকে। আঁরি কুপ্যাঁ (Henri Coupin) নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক পারীর লা নাতিয়ুর (*La Nature*) পত্রে লিখিয়াছেন, যে, এইরূপ কীটের সংখ্যা বড় কম নয়। তিনি ডাইটিস্কস্ নামক একটি কীটের এইরূপ আহার-প্রণালীর কথা বলিয়াছেন। এই কীট পুকুরে সচরাচর বাস করে বলিয়া লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা আমাদের দেশের পুকুরেও থাকে। আমরা ছবি দিলাম। পাঠকগণ চেহারা দেখিয়া সন্ধান লইতে পারেন।

এই কীটের মুখ নাই। ইহার ফাঁপা দাড়া আছে। তাহার দ্বারা ইহা শিকার ধরে, ও তাহার পর উহার শরীরে হজমী রস চালাইয়া দেয়, এবং যখন শরীরটা জীর্ণ হইয়া গলিতে থাকে, তখন দাড়ার অগ্রভাগস্থিত সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া ঐ জলীয় আহার চুষিয়া লয়। কীট প্রথমে শিকারের রক্তটা চুষিয়া খায়, তার পর পূর্ব্বোক্তরূপে উহার শরীরটা আগে হজম করিয়া পরে আহার করে। মিষ্টার পোর্টিয়ার (Mr. Portier) ঐ কীটের নিকট একটি ছোট মাছ ফেলিয়া দিয়া উহার সমস্ত ভোজন প্রক্রিয়াটি দেখিয়াছেন। কীট প্রথমে মাছটাকে দাড়ার

ডাইটিস্কস্ নামক কীট, প্রথমে উদরের বাহিরে হজম্ করিয়া পরে আহার করে। প্রথমটি ডুব দিতেছে, দ্বিতীয়টি সাঁতার কাটিতেছে, তৃতীয়টি একটি মাছকে হজম্ করিয়া আহার করিতেছে। নীচে বাম কোণে কীটটির মাথা ও দাড়া দেখান হইয়াছে।

দ্বারা ধরিয়া উহার শরীরে একটা বিষ প্রবেশ করাইয়া উহাকে অসাড় করিয়া ফেলে। তাহার পর কালো হজ্‌মী রস উহার শরীরে ঢুকাইয়া দেয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরিষ্কার দেখা যায় যে কেমন করিয়া ঐ রসের শক্তিতে মাছের শরীরের সকল অংশ অল্প অল্প করিয়া তরল হইয়া আসে। এই ক্রিয়া কতকদূর চলিলে হঠাৎ মাছের শরীরে একটা স্রোত লক্ষিত হয়, যাহার টানে উহার শরীরের এইসমস্ত তরলীভূত অংশটা কীটের দাড়ার কাছে পৌঁছিতে থাকে, এবং দাড়ার অগ্রভাগস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া কীটের উদরে প্রবেশ করে। এইরূপে মৎস্য বা অন্য শিকারের শরীর হইতে সমস্ত তরল অংশ চোষা হইয়া গেলে, প্রায় আধ মিনিট কাল উহার শরীর শুষ্ক থাকে। তাহার পর আবার হঠাৎ কীটটা হজ্‌মীরস শিকারের শরীরে ঢুকাইয়া দেয়। তদনন্তর শিকারের শরীর পুনরায় তরল হইতে থাকে এবং কীটের শোষণ হত্যাদি কর্ম্ম আবার আরম্ভ হয়। শেষে বারবার এইরূপ হইয়া শিকারের কেবল ত্বক্‌টি বাকী থাকে।

আমাদের দেশে মিহি বালি ও ধূলাতে একরকম কীট থাকে; তাহা আমরা অনেকেই দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার বাংলা নাম জানি না। এই কীট বালি ও ধূলায় পানের খিলির মত, বা কেরোসিন তেলের বোতলে তেল ঢালিবার টিনের ফানেলের মত ক্রমসংকীর্ণ মসৃণ গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তলায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। ঐ গর্ত্তে কোন পিঁপড়া বা তদ্রূপ ছোট জীব পড়িলে তাহাকে ধরিয়া খায়। উহা পলাইবার চেষ্টা করিলে উহার গায়ে ধূলা বা বালি ছুড়িয়া উহাকে চাপা দিয়া ফেলে এবং এইরূপে

উহার পলায়ন বন্ধ করে। এই কীটকে ইংরাজীতে পিপীলিকা-সিংহ (Ant-lion) বলে। ইহার বাংলা নাম কি? এই কীটেরও ভোজনপ্রণালী পূর্ব্বোক্ত পুকুরবাসী কীটের মত।

দেখিতে উকুনের মত যেসকল পোকা গাছে ছিদ্র করে, তাহারাও গাছের মধ্যে আগে হজ্‌মীরস ঢুকাইয়া দিয়া তাহার উপাদানগুলিকে তাহাদের ভোজনের উপযোগী খুব পাত্‌লা-তরল করিয়া লয়।

এইসকল ব্যাপার আমাদের দেশে কেহ নিজে লক্ষ্য করিয়াছেন কি? না করিয়া থাকেন ত এখন করিতে পারেন।

জীবনবিদ্যার ইন্দ্রজাল

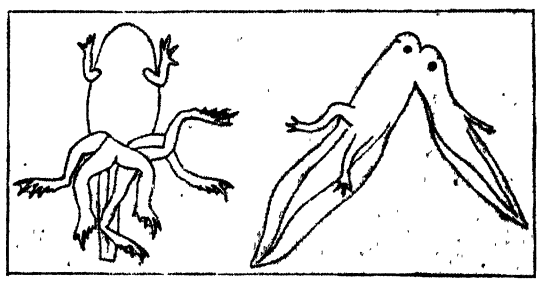
জীবনবিদ্যা (biology) বিজ্ঞানের একটি পুরাতন শাখা নহে, ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহার ক্রমিক উন্নতি হইতেছে ও ইহার গবেষণার প্রণালীও অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জীবনবিদ্যাবিদেরা জীবনতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া যেসকল ফল পাইতেছেন, তাহা ঐন্দ্রজালিকের জাদুর মত বিস্ময়কর। কোন জীবের শরীরে ক্ষত হইয়াছে, ক্ষতস্থান হইতে একটা পা গজাইল, যাহা পূর্ব্বে ঐ স্থানে ঐরূপ কোন জীবের দেখা যায় নাই; দুটি জীব মাথা বা লেজের দ্বারা যুক্ত হইয়া একত্র জীবন ধারণ করিতেছে; ইত্যাদি নানা ব্যাপার এই বৈজ্ঞানিক-দিগের গবেষণামন্দিরে দেখা যায়। ইঁহারা ঐন্দ্রজালিকের মত মজা দেখাইবার বা দেখিবার নিমিত্ত যে এইসকল পরীক্ষা করেন, তাহা নয়; তাঁহারা জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব, উহার উৎপত্তি, প্রকৃতি, ইত্যাদি বুঝিতে পারিবার আশায় এরূপ করিয়া থাকেন। এইরূপ করিতে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে যেখানে কোন জীবের চোখ ছিল, সেখানে একটি পা গজাইল; যেখানে একটি লেজ ছিল, সেখানে দুটি লেজ হইল; একটি বিচ্ছিন্ন বাহু হইতে ক্রমশঃ একটি সমগ্র জীব উৎপন্ন হইল; একটি আহত জীব ক্ষতস্থান হইতে একটি শাখা বা ফ্যাকৃড়া বাহির করিল, ইত্যাদি। উচ্চ শ্রেণীর জীবে এ পর্য্যন্ত এরূপ কিছু দেখা যায় নাই, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর জীবে, এমন কি ব্যাঙে পর্য্যন্ত, দেখা গিয়াছে।



তারামৎস্যের কর্ত্তিত ভুজ হইতে নূতন তারামৎস্যের উদ্ভবের ক্রমবিকাশ।

আমরা যে দুটি ছবি দিলাম, তাহার একটিতে দেখা যাইবে, একটি তারামৎস্য (star-fish) হইতে তাহার একটি ভুজ কাটিয়া লওয়া হয়; ঐ ভুজটি হইতে ক্রমশঃ আরও বাহু গজাইয়া শেষে উহা স্বতন্ত্র একটি তারামৎস্যে পরিণত হইয়াছে।

অপর চিত্রটিতে দেখা যাইবে, যে, একটি ব্যাঙাচির শরীরের ক্ষতস্থান হইতে চারিটি নূতন পা বাহির হইয়াছে,



ব্যাঙাচির ক্ষতস্থানে পদ-উদ্গম ও মাথায় মাথায় জোড়-কলম।

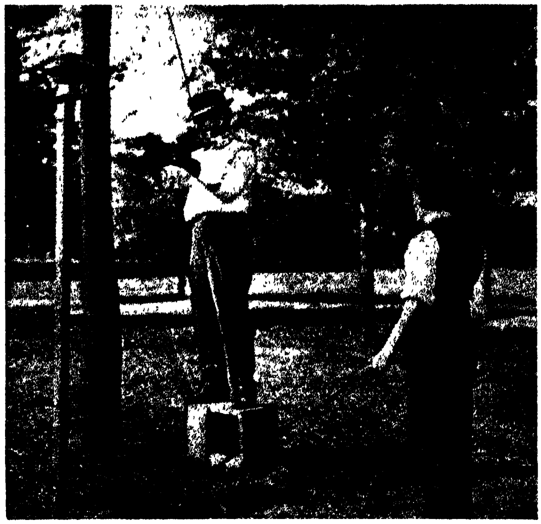
যাহা স্বাভাবিক ব্যাঙাচির থাকে না। আর দুটি ব্যাঙা-চিকে, গাছের মত কলম করিয়া, মাথায় মাথায় জোড় লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহারা এই সংলগ্ন অবস্থাতেই জীবিত রহিয়াছে।

তাড়িতের সাহায্যে চাষ

আমাদের দেশে সাক্ষাৎ ভাবে চাষের ভার রহিয়াছে নিরক্ষর অশিক্ষিত কৃষকদের উপর। তাহারা যে কৃষি-বিষয়ে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, তাহা নয়। তাহাদের বাপ পিতামহ যে যে উপায়ে চাষ করিতেন, তাহারা সেসব উপায়ই জানে, এবং সে উপায়গুলি অনেক স্থলেই ভাল। তবে কি না, সংসারে কোন বিষয়ই এক স্থানে স্থির থাকে না, সকল বিষয়েই হয় উন্নতি নয় অবনতি হয়। অন্যান্য সুসভ্য দেশে শিক্ষিত কৃষকের হাতে পড়িয়া চাষেরও উন্নতি হইতেছে, বিজ্ঞানসম্মত নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। সেইসব দেশের তুলনায় আমাদের দেশ পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় অনেকে কুলক্রমাগত রীতি অনুসারেও ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিতেছে না।

আমাদের দেশে নূতন নূতন রকম চাষের প্রণালীর পরীক্ষা প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রে হয়, কিন্তু এইসকল পরীক্ষার ফল চাষার কাছে প্রায়ই পৌঁছে না। জমীদারদের মধ্যে অধিকাংশই নিজের নিজের ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্তি ও রাজপুরুষদের মনস্তুষ্টি সাধনেই ব্যস্ত। তাঁহারা চাষার রক্ত শোষণ করিয়া জীবনধারণ করেন, কিন্তু চাষের উন্নতির জন্য কিছুই করেন না।

অনেক উদ্ভিদই যে বড় গাছের ছায়ায় পড়িলে, রোদ আলোক না পাইলে, "আওতায়" থাকিলে বাড়ে না, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অনেকেই দেখিয়াছেন যে ঘনপত্রবিশিষ্ট বড় বড় গাছের তলার জমি ঘাসে ঢাকা নয়। তাহার কারণ ঐ আওতা। সুতরাং এই ব্যাপারটির বৈজ্ঞানিক কারণটি বুঝাইয়া না বলিলেও ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে অনেক উদ্ভিদেরই বৃদ্ধির পক্ষে রৌদ্র আলোক আবশ্যক। পরীক্ষার দ্বারা এখন স্থির হইয়াছে যে তাড়িতশক্তির বিকিরণ দ্বারাও ঠিক্ এইরূপ কাজ হয়। তাড়িতের দ্বারা গাছের বৃদ্ধির সাহায্য করা যায় কিনা, তাহার পরীক্ষা গত ২০।২৫ বৎসর ধরিয়া হইতেছে। তাড়িতশক্তির প্রয়োগে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয়, ইহা প্রমাণিতও হইয়াছে। তবে এই শক্তিপ্রয়োগদ্বারা যে ব্যবসা-হিসাবে লাভ করা যায়, এতদিন তাহা প্রমাণিত হয় নাই। এখন তাহাও হইতেছে।



ডাক্তার লাইম্যান জে, ব্রিগ্‌স্ উদ্ভিদবৃদ্ধির জন্য তাড়িতের তার সংযোগ করিতেছেন।

আমেরিকার আর্লিংটন শহরে একটি কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রে লাইম্যান জে, ব্রিগ্‌স্ (Dr. Lyman J. Briggs) কয়েকজন সহকারীর সাহায্যে এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কৃষিবিভাগের রিচার্ড গ্লোইড্ (Richard Gloëde) সাহেবও এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ পরীক্ষা কাচের সাসির ছাদ ও দেওয়ালযুক্ত চারাগাছগৃহে (Greenhouse) করা হয়। এই গৃহের মাটির ভিতর একটি লোহার তার বিস্তৃত থাকে। আবার ফুলের চারাগুলির চারি ফুট উপরে জালের আকারে অনেকগুলি তার বিস্তৃত থাকে। তাহাতে প্রায় ১২ ইঞ্চি ব্যাসের ছিদ্রবিশিষ্ট জাল নির্ম্মিত হয়। এই জাল হইতে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পিতলের শিকল ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। যেখানে তাড়িতশক্তি উৎপন্ন হইতেছে সেখান হইতে দুটি তারের দ্বারা পরীক্ষাগৃহে তাড়িত আনা হয়। একটি তার মাটির নীচের লোহার তারের সহিত যুক্ত হয়, আর একটি উপরের জালের সহিত যুক্ত হয়। কতকগুলি চন্দ্রমল্লিকার চারা লইয়া গ্লোইড্ সাহেব পরীক্ষা করেন। খুব ভাল বাছাই চারা লইয়া একস্থানে লাগান হয়, আর

খারাপ চারাগুলি পূর্ব্বোক্তরূপ তাড়িত-তারযুক্ত স্থানে লাগান হয়। উভয় স্থানেরই মাটি ইত্যাদি আর সব বিষয়ে অবস্থা ঠিক্ একই রকমের ছিল। এই পরীক্ষায় দেখা যায় যে তাড়িতশক্তির সাহায্যে খারাপ চারাগুলিও খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়াছিল, এবং তাহাদের জীবনীশক্তি ভাল চারাগুলি অপেক্ষাও ভাল হইয়াছিল।

তাড়িতশক্তিতে যে কেবল উদ্ভিদেরই বৃদ্ধির সহায়তা হয়, তাহা নহে। জার্ম্মেনীতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বিদ্যালয়ের যে শ্রেণীতে তাড়িতশক্তি বিকীর্ণ হইবার বন্দোবস্ত থাকে, সে শ্রেণীর ছাত্রদের কেবল যে শারীরিক বৃদ্ধি ও উন্নতি অন্য ছাত্রদের চেয়ে বেশী হয়, তা নয়; পরন্তু তাহাদের মানসিক ক্রিয়াও বেশী হয়, তাহারা অন্য ছাত্রদের চেয়ে শীঘ্র ও সহজে শিক্ষা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অল্পবুদ্ধি বালকদের অবস্থা একবারে আশাশূন্য নহে। তাহাদিগকে যদি মুক্তস্থানে বিশুদ্ধ বাতাসে বৈদ্যুতিক শক্তিপূর্ণ আকাশে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া স্নেহের সহিত দক্ষ শিক্ষক শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তাহাদেরও মানসিক উন্নতির খুব সম্ভাবনা আছে।

গরুর গাড়ীর গান

(Gouldsbury)

'যাচ্ছে সময়!' যাচ্ছে?—বটে!—আমরা কি জানি?
সাবেক চালে চল্‌ছি মোরা সাবেক বিধানী!
কাল ছুটেছে কাস্তে হাতে,—গ্রাহ্য করিনে;
তার পিছুতে বেদম ছুটে পথে মরিনে।
থাক্‌তে আয়ু ভয়টা কিসের? সময় আছে ঢের;
চালের সেরা লক্ষ্মী চাল; নেই তুলনা এর।
কেউ বা ছোটে, কেউ বা হাঁটে, কেউ বা হাঁকায় রথ,
শিস্ দিয়ে কেউ আপন মনে একলা চলে পথ;
হট্টগোলের মাঝখানে সে শুন্‌ছে পেতে কান
মান্ধাতারো পূর্ব্বযুগের গরুর গাড়ীর গান!
চল্‌ছি চালে,—যুগের কালের নেইক হিসেবই;
ঘুম-পাড়ানি মাসীর কোলে ঘুমায় পৃথিবী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কষ্টিপাথর

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা (চৈত্র)।

আর্ট—শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী—

সৌন্দর্য্যতত্ত্বশাস্ত্র পড়িয়া আর্ট কি তাহা জানিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা—কারণ তাহার মধ্যে মতামতের জঙ্গল। সমস্ত বিশ্বভুবন জুড়িয়া যে সৌন্দর্য্যশাস্ত্র লেখা, তাহাকে প্রাণহীন দার্শনিক নাম ও সংজ্ঞার মধ্যে খুঁজিবার সার্থকতা নাই। তাই রস্কিন বলিয়াছেন, আর্টের মধ্যে যাহা মহৎ তাহা বিশ্বপ্রকৃতির স্তব। মানুষের চিত্রে, কাব্যে, সঙ্গীতে বিশ্বচিত্র বিশ্বকবিতা বিশ্বসঙ্গীতের স্তব কেবলি ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভেদ-রেখা টানিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল মহৎশিল্পে নয়, প্রয়োজনের শিল্পেও একটি অজ্ঞাত স্তব আছে। থালা ঘটীতে পুষ্পপল্লবের রেখায়, আকারের, হস্তপুটের আশ্চর্য্যনিবেদনের একটি পূজাঞ্জলি আছে। তেমনি, বিশ্বপ্রকৃতির শ্যামহরিৎবসনের অনুকারে সূক্ষ্ম বসনবয়নের নিশ্চয় উৎপত্তি। কিন্তু রস্কিনের এই সংজ্ঞাটি খুব চমৎকার হইলেও তাহার একটা দোষ এই যে ইহাতে মনে হইতে পারে যে আর্ট বুঝি তবে প্রকৃতির অনুকরণ মাত্র, তাহা স্বাধীন সৃষ্টি নয়। বস্তুত, বিশ্বপ্রকৃতির উপরেও আর্ট এক জায়গায় জিতিয়া আছে, সে সম্পূর্ণতার তত্ত্বে, আইডিয়ালে। বিশ্বপ্রকৃতিতে সমস্তই পরিবর্ত্তমান, সেখানে পূর্ণতার আদর্শকে পাওয়া যায় না। পূর্ণতার আদর্শ আইডিয়া রূপে আমাদের অন্তরে বিরাজমান। সুতরাং আমরা যখন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকি, তখন যে দৃশ্যটি চোখে দেখি, তদপেক্ষা সুন্দরতর দৃশ্যের আভাস দি। মানুষের ছবি আঁকিলে তাহার বাহ্যচেহারাটা আঁকি না, কিন্তু ভিতরের অদৃশ্য সম্পূর্ণতর মানুষটিকে আঁকি। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর ভারতবর্ষীয় আর্টের ইহাই বিশেষত্ব বলিয়াছেন। সঙ্গীতে, কাব্যেও এই সম্পূর্ণতার একটি আদর্শ আছে। কিন্তু আর্টকে বাস্তব-বিশ্বছবির প্রতিচ্ছবি করিয়া দেখা (Realism) ও আর্টকে অন্তরের সম্পূর্ণতার আদর্শের বাহ্যপ্রকাশ করিয়া দেখা (Idealism) এই দুই মতই একএকদিক্-ঘ্যাঁষা মত। কারণ বাহিরের জগতে সবই মায়া ছায়া, বাস্তবিক সত্তা কোথাও নাই বলিলে, ভিতরে বাহিরে চিরন্তন দ্বন্দ্ব খাড়া করিয়া রাখা হয়; বাস্তবিক সত্তা ভিতরেও যেমন বাহিরেও তেমনি। এই বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে আমাদের চেতনার অব্যবহিত যোগ নাই। সেইজন্য আধুনিক দার্শনিক বার্গসঁ বলেন যে আমরা সব জিনিসকেই শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়া দেখি, প্রত্যেকটি বস্তু যে অন্য যে-কোন বস্তু হইতে স্বতন্ত্র, তাহার পরিচয় পাইনা। তিনি বলেন, আর্টের উদ্দেশ্যই সাধারণের মধ্যে কিছু জড়াইয়া না রাখিয়া একেবারে প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত বাস্তবসত্তাকে অনাবৃত করিয়া প্রকাশ করা। ব্যার্গসঁর এই মত ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধেও খাটে। সকল জিনিসকেই অত্যন্ত একান্ত, স্বতন্ত্র ও অখণ্ড করিয়া দেখাই সে সাহিত্যের বিশেষত্ব। শেক্‌সপীয়র হইতে আরম্ভ করিয়া রবর্ট ব্রাউনিং পর্য্যন্ত সকল কবিরই মধ্যে বিশেষ বিশেষ আবেগের ঘূর্ণিপাক রচনার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু এই ঐকান্তিকতাকে বড় বলিয়া মানা চলে না। বিশ্বপ্রকৃতিতে যেমন প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, অথচ সকলের সঙ্গে অখণ্ডভাবে মিলিত, আর্টও তাহাই হওয়া চাই। আর্ট ভিতরের পরিপূর্ণতার আদর্শের দ্বারা বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া সকল জিনিসের অন্তরতর সত্তাকে দেখাইবে কিন্তু সে সত্তা একই কালে স্বতন্ত্র এবং মিলিত হইবে, সীম ও অসীম হইবে। কেন? না, জানিতে হইবে, যে, আর্টের ক্ষেত্র

সমস্ত মানুষ, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি,—মানুষের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চরিত্র, বুদ্ধি সকল দিকের সঙ্গে আর্টের মিলন অবারিত হওয়া চাই। কিন্তু সেই বড় মিলন কি হইয়াছে? মানুষ আজকাল আর্টকে সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে। ছবি যে আঁকে, সে বিশ্বছবির দিকে তাকায় না, গান যে গায় সে বিশ্বগান শোনে না। মানুষ জানেনা, যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি চিত্রকর, যিনি কবি, তাঁহার রচনায় প্রয়োজন-সৌন্দর্য্য, কর্ম্ম-আনন্দ সবই মিলিয়া আছে। মানুষের আর্টকেও আজ সব জায়গায় নামিতে হইবে—কর্ম্মে, ধর্ম্মে, নীতিতে—সকল চেষ্টায় এবং সকল বিষয়ে।

বেদান্তবাদ: শ্রীনিম্বার্ক-দর্শন — শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী —

ব্রহ্মের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, বন্ধ ও মোক্ষ সম্বন্ধে এই দর্শনের মত:—ব্রহ্ম চিদচিৎস্বরূপ, স্বাভাবিক অনন্ত ও অচিন্ত্য কল্যাণগুণ-সমূহের আশ্রয়; অতএব তিনি সগুণ সবিশেষ। ব্রহ্মকে যে নির্গুণ বলা হয় তাহার অর্থ এই যে ব্রহ্মে কোনো হেয় বা মিথ্যা গুণ নাই; ব্রহ্ম অজ্ঞেয় এই অর্থে যে তাঁহার স্বরূপ ও গুণের ইয়ত্তা করা যায় না; তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া জানিবার উপায় নাই বলিয়া তিনি অজ্ঞেয়। জীব দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-প্রাণ হইতে ভিন্ন চেতন পদার্থ। ইহা 'আমি' এই প্রত্যয়ের বিষয় ও জ্ঞানস্বরূপ। ইহার স্বরূপ স্থিতি ও প্রবৃত্তি পরমেশ্বরের অধীন, তিনিই ইহাকে সাধু ও অসাধু কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, স্বয়ং ইহার কোনো কর্ত্তৃত্ব নাই। ইহা অণুপরিমিত, অনন্তসংখ্যক ও প্রতি-শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। ইহার বন্ধ ও মুক্তি হয়। জীব অনাদি; পরমেশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা সম্পূর্ণ অভিন্ন নহে; ইহা তাঁহার অংশ, কিন্তু খণ্ডাংশ নহে। জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ, আর স্বয়ং ব্রহ্ম অংশী। এই জীব মায়া বা প্রকৃতি বা কর্ম্ম দ্বারা বেষ্টিত; এই অবস্থার নাম বন্ধ। সঙ্কোচ-কারণ প্রকৃতিসম্বন্ধ অপগত হইলে জীবের জ্ঞান যে নিজের স্বাভাবিক প্রকাশ লাভ করে তাহাই মোক্ষ। জীবের জ্ঞানসঙ্কোচরূপ বন্ধ স্বভাবত নহে; তাহা আগন্তুক নৈমিত্তিক মাত্র; এজন্য মুক্তিও তাহার আপেক্ষিক বা নৈমিত্তিক, বন্ধাবস্থায় জীব নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে না; জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে এবং ভগবানের অনুগ্রহে জানিতে পারা যাইবে। এই ভগবৎপ্রাপ্তিই মোক্ষ। মম-ত্ব বিনাশ হইলেই "আমি ভগবানের" এই বোধ আসে। সেই জন্য মুক্তির অপর নাম ভগবদ্‌ভাবাপত্তি।

কোহিনূর (মাঘ)।

অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—

শ্রীমোহম্মদ শহীদুল্লাহ্—

স-তারকা-নবচন্দ্রকলা-চিহ্নিত পতাকা তুরস্ক সাম্রাজ্যের জাতীয় পতাকা; ইহা বিজেতা তুরস্কগণ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীকগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ইলিরিয়া প্রভৃতি বহুদেশেও এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। ইহাকে ইসলামের চিহ্ন মনে করা ভুল। পারস্য, মরক্কো বা এসিয়ার মুসলমান রাজ্যের জাতীয় পতাকা ভিন্ন রূপ। হজরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে হাদিসে উক্ত আছে যে তাঁহার সঙ্গে দুইটি পতাকা থাকিত একটি শ্বেতবর্ণ ও একটি কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহাতে বিভিন্ন বর্ণের ফোটা। এদেশের মোগল পাঠান বাদশাহদিগের পতাকা কিরূপ ছিল তাহা বলা যায় না; তবে ইহা নিশ্চিত যে তুরস্কের পতাকার প্রতি ভারতীয় মুসলমানের সম্মান নূতন এবং তাহার প্রথম কারণ উহা রুমের সুলতানের পতাকা বলিয়া। যদি কেহ উহাকে ইসলামের চিহ্ন মনে করেন ত তিনি ভুল করিবেন।

ভারতমহিলা (ফাল্গুন)।

স্ত্রীশিক্ষা—শ্রীকাননকুমারী দেবী—

পুরুষশিক্ষার অনুপাতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা অকিঞ্চিৎকর। এজন্য সকল দেশের ন্যায় এ দেশেও পৃথক মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় আসিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী পুরুষশিক্ষার প্রণালী হইতে পৃথক হওয়া আবশ্যক। কারণ (১) স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য ও কর্ম্মক্ষেত্রের স্বতন্ত্রতা; (২) ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষা আবশ্যক, কিন্তু পুরুষসাধ্য শিল্প ও স্ত্রীসাধ্য শিল্প এক নহে; (৩) ব্যায়াম দ্বারা শারীরিক উন্নতিসাধন; (৪) এদেশের মেয়েদের অল্প বয়সেই বিবাহ হয়; সরকারী নিয়মে ১৬ বৎসরের আগে কোনো পরীক্ষা দিবার উপায় নাই; সুতরাং উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ; ইহার প্রতিকারের জন্যই দেশীয় প্রণালীতে দেশীয় প্রকৃতির অনুকূল মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যক। যদি মহিলারা নিজেদের স্বত্ব ও অধিকার পুরুষের নিকট হইতে দাবী করিয়া আদায় না করেন এবং উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষিত না হন, তবে কেবল মাত্র পুরুষের দয়ার দানে দুর্দ্দশা কখনো ঘুচিবে না ইহা মনে রাখিতে হইবে।

শিশুপ্রকৃতি—শ্রীশীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

শিশুপ্রকৃতিতে প্রধান গুণ দেখা যায়—(১) চঞ্চলতা; (২) অনু-সন্ধিৎসা; (৩) সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা; (৪) অঙ্কনপ্রিয়তা; গঠনেচ্ছা ও বস্তুর আকার পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা; (৫) অনুকরণপ্রিয়তা। এই লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিশুপ্রকৃতির অনুকূল উপায়ে শিশুর ভবিষ্য জীবন গঠন করিয়া তোলা উচিত।

নব্যভারত (মাঘ ও ফাল্গুন)।

ভক্তকবি সুরদাস —শ্রীরসিকলাল রায়—

কেহ বলেন সুরদাস সারস্বত ব্রাহ্মণকুলে দিল্লীর নিকট সিহীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা রামদাস ভিক্ষা দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করিতেন এবং গৌঘাট নামক স্থানে বাস করিতেন। কেহ বলেন চাঁদকবির বংশে সুরদাসের জন্ম; তাঁহার পিতা আকবর শাহের সভায় ভাট ছিলেন। কবির স্বয়ংদত্ত পরিচয় হইতে জানা যায় প্রার্থজ্ঞ গোত্রীয় জগাত বংশীয় ব্রহ্মরাব নামক একব্যক্তি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ; সেই বংশে চন্দ্রবর্দ্দৈ উৎপন্ন; তাঁহার ঊর্দ্ধতন বংশে অনেকেই অনেক রাজার সভাকবি ছিলেন। মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে সুরদাসের ছয় ভ্রাতা নিহত হন, এবং সুরদাস এক অন্ধকূপে পতিত হন। ছয় দিন প্রার্থনার পর শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহাকে দৃষ্টিদান করেন। সুরদাস ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; কাহারো মতে ১৫৮৩ সালে; সুরদাস স্বয়ং বলিয়াছেন যে তিনি বল্লভাচার্য্য ও বিঠ্ঠল দাসের সমসাময়িক। ইহা দ্বারা পূর্ব্বমতই সমর্থিত হয়। সুরদাস জন্মান্ধ কিনা সে বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন যে তিনি কোনো যুবতীর রূপের মোহে চঞ্চলচিত্ত হওয়াতে স্বয়ং চক্ষু বিদ্ধ করিয়া অন্ধ হন। সুরদাস বাল্যাবধিই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন। সেই ভাবোন্মত্ততা হইতে তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে সুরদাস লোকান্তরে যাত্রা করেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় কতকগুলি উক্তি প্রচলিত আছে, তাহার দ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ ভক্তকবি বলিয়া আজও সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া আছেন। এমন কি তাঁহাকে ভক্তকবি তুলসীদাসের উপরেও স্থান দেওয়া হয়। সুরদাসের প্রধান গ্রন্থ তিনখানি—সুরসাগর, সুরসারাবলী ও সাহিত্য-

লহরী। এতদ্ভিন্ন বহু খণ্ডকাব্যও আছে। রচনার বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও তাঁহাদের সহিত ভক্তের প্রেমবৈচিত্র্য। সুরদাস একেশ্বরবাদী বৈষ্ণব ছিলেন।

প্রতিভা (ফাল্গুন)।

ভারতীয় দ্বারা ইয়োরোপীয় বাণিজ্যের ও বর্ত্তমান ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূত্রপাত—

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—

বাইবেলে উল্লেখ আছে যে য়িহুদিদিগের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। ফিনিসীয়গণ বেদের পণিজাতি এবং তাহাদের নাম হইতেই বণিক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়। তাহারা কার্থেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রোমের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করে। তৎপরে আলেকজান্দ্রিয়া বাণিজ্যকেন্দ্র হয়। প্রাচ্যের মসলাসম্ভার লাভের জন্যই মুখ্যত প্রতীচ্যের ব্যবসায়চেষ্টার সূত্রপাত। এই সূত্রে ইতালীয় নাবিক হিপলাস ভারত সমুদ্রে বাণিজ্যবায়ুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তৎপরে ভেনিস ও জেনোয়া বাণিজ্যে প্রসিদ্ধ হয়। ইতালীয় নাবিকেরাই প্রথমে ভারত ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখে Indies. ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে য়ুরোপীয়দিগের চিন্তা হইল ভিন্ন পথে ভারতে যাওয়া যায় কিনা। পর্ত্তুগালের রাজকুমার হেনরি আফ্রিকা পরিবেষ্টন করিয়া পথ আবিষ্কারের জন্য অভিযান প্রেরণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর কলম্বাস ভারতের পথ আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন। তৎপরে ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতের পথ আবিষ্কার করেন। পরবর্ত্তী বাণিজ্য অভিযানে ক্রমে ক্রমে বহু দ্বীপ ও দেশ পর্ত্তুগীজগণ আবিষ্কার করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন যে তাঁহাদের অজ্ঞাত বহু দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক বিদ্যমান। এইসকল অভিযান-নেতার মধ্যে পেদ্রো আলভারেজ কোব্রাল, আলমেইদা, ও আলবুকার্ক প্রভৃতির নাম, ভারতের বন্দর ও ভারতসন্নিহিত দ্বীপ জয়ের জন্য, প্রসিদ্ধ। কলম্বসের পর আমেরিগো এবং তৎপরে মেগলে ভারত যাত্রা করিতে গিয়া আমেরিকা, মেগেলেন প্রণালী ও প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন। দেলকেনো প্রথম মসলাবাণিজ্যে যাত্রা করিয়া ভূপ্রদক্ষিণ করেন এবং সেইজন্য স্পেনরাজ তাঁহাকে পেন্সন মঞ্জুর করেন। ইহাদের সাফল্যের দেখাদেখি ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি মসলা দ্বীপ ও ভারতের উদ্দেশে দিকবিদিকে ছুটিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে ভারতে আপনাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। রুষের মধ্য দিয়া স্থলপথে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাও ইংরেজেরা করিয়াছিল এবং তাহার ফলে আরব দেশের বহু স্থানের সহিত য়ুরোপের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তৎপরে ভারতে আসিবার জন্য উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রপথ আবিষ্কার-চেষ্টা হইতে উত্তরমেরু আবিষ্কারের সূত্রপাত। দক্ষিণ সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিতে গিয়া অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির আবিষ্কার হয়। রুষরাজ পীটারের নিযুক্ত বেরিং এসিয়া ও আমেরিকার বিয়োজক প্রণালী বেরিং আবিষ্কার করেন এবং ঐ প্রণালী আবিষ্কারকের নামে পরিচিত হয়। তৎপরে বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক প্রভৃতি আবিষ্কারের চেষ্টায় বহু অভিযান প্রেরিত হইয়াছে ও হইতেছে।

মানসী (মাঘ)।

বিক্রম-সংবতের উৎপত্তি—শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—

ফার্গুসন সাহেবের মতে বিক্রমাদিত্য উপনামা উজ্জয়িনীর হর্ষনৃপতি ম্লেচ্ছদিগকে ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে কোরুর যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বিজয়চিহ্নস্বরূপ বিক্রমাব্দ সংস্থাপিত করেন। তৎপরে ডাক্তার বুহলর, ডাক্তার ফ্লীট, প্রভৃতি দ্বারা বহু শিলালিপি ও বিদেশী পরিব্রাজকদিগের উক্তি হইতে ঐ মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক কর্ণ বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া তাঁহাকে সংবৎ প্রবর্ত্তক না বলিয়া শকাব্দ প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন। অনেকের মতে বিক্রমাব্দের অপর নাম মালব সংবৎ। সাধারণত ৩০৪৮ কল্যব্দ হইতে বিক্রমাব্দের আরম্ভ গণনা করা হয়। কিন্তু বিক্রম সংবতের পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোনো পুস্তকে লিপিতে বা দানপত্রে সংবৎ সহ বিক্রমের নাম পাওয়া যায় নাই। ডাক্তার হর্নলে বলেন যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধন মিহিরকুলের হুন শক্তিকে পরাভূত করিয়া মালব অব্দ নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া বিক্রমাব্দ প্রচলিত করেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়া মালবাব্দ নাম বিক্রমাব্দ করেন। শালিবাহনের শক কণিষ্ক প্রচলিত করেন বলিয়া অনেকের ধারণা; ডাক্তার ফ্লীটের মতে কণিষ্ক বিক্রমাব্দের প্রবর্ত্তক। কীলহর্ণ বলেন মালবাব্দ পরবর্ত্তী কালে বিক্রমাব্দ বলিয়া পরিচিত। ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রভৃতির মত এইরূপ। কিন্তু ইহা শিলালিপি দ্বারা সমর্থিত হয় না। সি, ভি, বৈদ্য বলেন যে বিক্রমাব্দ মূলে মালবাব্দ বলিয়া যদিও থাকে এবং মালব জাতি বা মালব রাজাদের স্মরণার্থ প্রচলিত হইয়া থাকে তাহাতে এমন বুঝায় না যে উহা কোনো নির্দ্দিষ্ট রাজার প্রচলিত নয়; বিক্রমাদিত্য যে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর রাজা, হলের সপ্তশতীতে তাহার প্রমাণ আছে; প্রাচীন প্রবাদে কহ্লন তাঁহাকে শকারি বলিয়াছেন এবং অলবেরুনি বলেন কোরুরের যুদ্ধ তিনিই করেন। এইরূপ নানা প্রমাণে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে যে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য বিক্রমাব্দ ৫৭ খ্রীঃ পূঃ হইতে প্রচলিত করিয়াছেন।

তীর্থে—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ—

ভরপূর আজি গঙ্গার কূল ফুলচন্দনগন্ধে,
পুণ্যালোলুপ বঙ্গনিবাসী চলিয়াছে মহানন্দে;
ঐ যে সূর্য্যে লেগেছে গ্রহণ, 'চূড়ামণি যোগ' আজ,
দলে দলে দলে চলে নরনারী ফেলিয়া শতেক কাজ;
সংসার ভেসে পড়িয়াছে এসে গঙ্গার দুটী কূলে,
ভরিয়া উঠেছে জাহ্নবীজল প্রদীপে পত্রে ফুলে;
ডাকে ব্রাহ্মণ—"কে আছ কোথায় কর গো গঙ্গাস্নান,
আজ, দানধ্যানে হও মুক্তহস্ত, লভিবে পরিত্রাণ।"

কে আজ ধূর্ত্ত পথের সীমায় গঙ্গামূরতি গড়ি
পুরোহিতবেশে আছে সারাদিন তাহারি নিকটে পড়ি
পথিক-রক্ত শুষিতে; ভক্ত—পুলকাঞ্চিত বুক,
চেয়ে দেখ্ তোরা নয়নে আননে উছলে কি মহাসুখ!
কোথাও বা পথে 'যুগলমূর্ত্তি' কোথা বা 'জগন্নাথ',
তাম্রখণ্ড শোষণের আশে পাতিয়া রেখেছে পাত।
আয় তোরা আয়, ছুটে আয় ওরে, করে যা' মুক্তিস্নান
আর, গঙ্গার তীরে দাঁড়ায়ে দেখে যা' দেবতার অপমান!

বাসায় বাসায় কলেরার ধূম, মরে লোক দলে দলে,
বিদেশ হইতে এসেছে বিদেশী মরিতে গঙ্গাজলে!
চিরপরিচিত ঘরের নদীটী লভিয়াছে প্রাণ আজ,
হৃদয়-আবেগ পরায়েছে তা'রে মহিমাময়ীর সাজ!
ভক্তি-ধারায় ধন্য আজিকে গঙ্গার দুটী তীর—
'কলুষনাশিনী জাহ্নবীবারি' জানা গেছে আজ স্থির—
ছুটে আয় ওরে তটদেশবাসি! করে যা' মুক্তি-স্নান,
আজ, শত ভক্তের হৃদয়তীর্থে গঙ্গা অধিষ্ঠান!

ভক্তি তুলেছে উজ্জ্বল করি তীর্থের ছবিখান—
দুর্ম্মতি ! তোর পঙ্কিলতায় হয় কি সে কভু ম্লান ?
কোশাকুশি আর নামাবলা-তলে যত চঞ্চল চোখ,
ঘুরিয়া ফিরিয়া জনতার মাঝে জ্বালাময় হয় হোক্ ;—
তোদের লোভের আগুনে দগ্ধ দেবতার যত মুখ,
কৃষ্ণ বসনে ঢাকা পড়ে যাক্ পাষণ্ড বুভুক্ষ্ ।
আয় ধনীরা, চলে আয় ওগো করে যা' মুক্তিস্নান,
আজ, তোদেরি ভক্তি উজ্জ্বল করি তুলেছে তীর্থখান !

ওই যে কে আসে ভাগীরথী-পাশে বৃদ্ধার হাত ধরি,
কুঞ্চিত কেশ ফেলেছে কাটিয়া নিঃশেষে শেষ করি !
শুভ্রবসনে বেষ্টিত তা'র পুষ্পিত তনুখানি—
আঁখি দুটী, মরি, বিষাদ উদাস—তবু সে উষার রাণী !
জাহ্নবীজল পুলকে উছলি চরণ ছুঁইতে চায় !—
আয় তোরা ওগো তীর্থ দেখিয়া পুণ্য লভিবি আয় ;
বালিকা-বিধবা এসেছে করিতে দেবতা দর্পচুর—
আজ, ফুটিয়া উঠেছে গঙ্গার জলে তীর্থের কোহিনুর ।

সংসারে তা'র প্রবেশ নিষেধ, ভ্রুক্ষেপ তাহে নাই,
তীর্থে তীর্থে দিদিমার সাথে ফেরে সে সর্ব্বদাই ।
আঁখিদুটী তা'র পবিত্রতার বিচিত্র দরপণ ।
ফুটিছে সেথায় শত তীর্থের উজ্জ্বল বিবরণ ।
আনন তাহার বিনয়-কোমল শান্তিতে সুগভীর ।
শুভ্র বসনে করুণার ধারা গলিয়া হইছে ক্ষীর !
আসিয়াছে সে যে পুণ্য প্রতিমা তীর্থ-সভার মাঝে—
আজ, বিশ্ববাসনা চাহি তা'র পানে লুকাইতে চায় লাজে !

দাঁড়ায়েছ মাগো জুড়ি দুটী পাণি ঊর্দ্ধে নয়ন তুলি,
ঢেউগুলি বুঝি চরণ-পরশে বহিতে যায় বা ভুলি !
কুলু কুলু নাদে কাঁদে ভাগীরথী কচি পা দুটীর তলে ।
অঙ্গে অঙ্গে পবিত্রতার হিরণ কিরণ জ্বলে ।
দু'পাশে যাত্রী দেখিছে মুগ্ধ পুণ্যের প্রতিরূপ—
স্বর্গ হইতে তাকায়ে তো'মারে দেখিছে বিশ্বভূপ !
পলকে লভিনু মুক্তি-স্নানের অতুল পুণ্যরাজি,
ওগো, আনন্দ যাহা পাইনি জীবনে, তাই যে পেয়েছি আজি !

সন্ধ্যা উষার মিলন বাসরে সজ্জিত করি কায়া
প্রীতি করুণায় মহা গরিমায় দাঁড়ায়েছ মহামায়া !
নামিয়াছ এসে, বালিকার বেশে, আঁধার করিতে দূর—
আজ, গঙ্গার জলে খুঁজিয়া মিলেছে তীর্থের কোহিনুর !

আর্য্যাবর্ত্ত (ফাল্গুন) ।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস —শ্রীব্রজবল্লভ রায়

অথর্ব্ববেদ খৃঃ পূঃ ১৫১৬ অব্দে সংগৃহীত হয় । তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তৎপূর্ব্বের রচনা । ব্রাহ্মণযুগে বিলাসের ও আলস্যের স্বরূপ ব্যাধির পরিচয় পাওয়া যায় ; বৈদিক যুগে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না । এই সময় শল বৈদ্যগণ পশুচিকিৎসা, ব্রণচিকিৎসা, গর্ভিণীচিকিৎসা করিতেন । যজ্ঞনিহত পশুর শরীর ব্যবচ্ছেদ দ্বারা শরীরতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত । ঔষধের আন্তর ও বাহ্যিক প্রয়োগ হইত এবং কোনও কোনও ঔষধ ধারণ ও ঘ্রাণ করানো হইত । ক্ষেত্রিয় বা বংশগত রোগ, সর্পবিষ, প্রভৃতিরও চিকিৎসা হইত । জলমিশ্রিত যব (বার্লি) সর্ব্বরোগের পথ্য ছিল । এই যুগে জলচিকিৎসা বা হাইড্রোপ্যাথি উপলক্ষে ঔষধরূপে ঝরণার বা স্রোতের জল ব্যবহৃত হইত । সেকালে Psychopathyরও প্রচলন ছিল । কোষ্ঠবদ্ধে বস্তিযন্ত্র (পিচকারী) ও মূত্ররোধে শলাকা প্রয়োগ করা হইত । ঔষধির কাথ রোগীকে স্নান করানো হইত । পিত্তরসের সাহায্যে অন্নাদির পরিপাক হয়, এই সত্য ব্রাহ্মণ যুগেই আবিষ্কৃত হয় । এই সময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভূতপ্রেতের ভয় নিবারণের জন্য কাশ্যপঋষি প্রণীত কাশ্যপতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থও অপর দিকে সমাদৃত হইতেছিল ।

বিজ্ঞান (ফেব্রুয়ারি) ।

চা—ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু—

চায়ের ব্যবহার চীন দেশেই প্রথম প্রচলিত হয় । কনফুসিয়সের গ্রন্থে (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) চা-সদৃশ বৃক্ষপত্রের গুণের কথা বিবৃত আছে । কেহ কেহ বলেন ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে বোধিধর্ম্ম নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ হইতে চীনে গিয়া চা-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করেন । জাপানেও এই প্রবাদ আছে । ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে য়ুরোপে চায়ের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল । পরেও সৌখীন ধনীর বিশেষ বিলাসসামগ্রী হইয়াই বহুকাল ছিল । তখন এক পাউণ্ড চা ৯০৲ হইতে ১৫০৲ টাকায় বিক্রয় হইত । বৈজ্ঞানিক মতে আসামের বন্য চা পৃথিবীর সকল দেশের চায়ের আদি পুরুষ । আসাম ব্যতীত কুত্রাপি বন্য চা দেখা যায় না । চায়ের গাছ তিন হইতে ৬ ফুট, পাতা ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা হয় ; বন্য চা গাছ ১৫।২০ ফুট উচ্চ ও পাতা ৯ ইঞ্চিরও অধিক লম্বা হইয়া থাকে । ১৭৮০ সালে ডাক্তার কিড চীনে চা কলিকাতার বোটানিক্যাল বাগানে প্রথম রোপণ করেন । ১৮১৯ সালের পর আসামের বন্য চা মেজর ক্রস আবিষ্কার করেন । ১৮৩৫ সালে প্রথমে আসামে চীনে চায়ের চাষ আরম্ভ হয় । এখন আসামে ১০ লক্ষ বিঘা জমিতে চা চাষ হইতেছে ; সমগ্র ভারতের চায়ের জমির পরিমাণ ১৫।১৬ লক্ষ বিঘা জমি । আসামে প্রতি একার জমিতে ৪০০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয় ; বঙ্গের বাহির অন্যান্য প্রদেশে ২০০।২৫০ পাউণ্ড । সমস্ত ভারতবর্ষে ২৪ কোটী পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়, তাহার ১৬।০ কোটী পাউণ্ড আসামের উৎপন্ন । চায়ের মূলধন প্রায় সমস্তই বিলাতী । আসামের চা-বাগানে ৮ লক্ষ মজুর কাজ করে । আসামের চা ক্রমে চীনের চা-কে বাজার হইতে বিতাড়িত করিতেছে । চায়ের কচি পাতা বিশেষ উপায়ে শুকাইয়া ব্যবহৃত হয় ; যে চা-য়ে যত কচি পাতা ও পত্রমুকুল যত গোটা থাকে সে চা তত ভালো ও সুগন্ধি সুস্বাদু হয় । আসামের চা দুই প্রকারের—দেশজ ও বর্ণসঙ্কর । ডাঃ স্মিথের মতে চায়ের দ্বারা শরীরের ক্ষয় ত নিবারিত হয়ই না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কারণ চা উত্তেজক । তবে ইহা ভুক্ত দ্রব্যকে সহজে শরীরে গ্রহণের উপযোগী করে ; সুতরাং চা খাইতে হইলে উপযুক্ত পরিমাণ সারবান খাদ্য আহার আবশ্যক । অধিক চা ব্যবহারে অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধ হয় ; চায়ের ভিতরকার ট্যানিন বিষ হৃদরোগ ও হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি বায়ুরোগের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী । যেখানে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় না, সেখানে জলে চা সিদ্ধ করিয়া পান করিলে জলের দোষ অনেকটা কাটিয়া যায় । আহার করিবার সময় চা পান করা উচিত নয় ।

তাম্বূল—শ্রীশরৎচন্দ্র রায়—

পান ভারতের পূজায় পার্ব্বণে, উৎসবে বৈঠকে, ঔষধে আহারে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত । এই পানের সম্পর্কে ডিবা গঠনের শিল্পও ভারতে বিচিত্র ভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে । ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বহুপ্রকারের পান পাওয়া যায় । পানের লতা কতক যত্নে পালন

করিয়া ও কতক গাছের গায়ে উঠাইয়া পান সংগ্রহ করা হয়। নব্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে পান উষ্ণ, পাচক, পচননিবারক (antiseptic)। পান চোয়াইলে তৈল পাওয়া যায়; কফসম্বন্ধীয় পীড়ায়, পচননিবারণে এবং রোহিণী (diptheria) রোগে পান-তৈলের কবল ও ধুম বিশেষ উপকারী। ১ বিন্দু তৈলের বদলে ৪টি পানের রস দেওয়া যাইতে পারে। দেশীয় মতে পান বহু রোগের ঔষধ; গার্হস্থ্য টোটকা চিকিৎসায়ও ইহার প্রভাব যথেষ্ট। আহারান্তে পান চর্ব্বণ করিলে যেমন পরিপাকের সাহায্য হয়, অধিক সেবনে আবার অপকার হয়, দন্ত শিথিল হয়। পান উত্তেজক। পানের গাছের অংশ কাটিয়া চারা করিতে হয়; অধিকাংশ গাছই স্ত্রীপুষ্প-বিশিষ্ট। পান চাষের জন্য উচ্চ ভূমি এবং কৃষ্ণবর্ণ ঝুরো ও জান্তব-সার-যুক্ত মাটি উপযোগী। বিনা চাষে পান—প্রবাদটি কতক অংশে সত্য। একবার বরজ করিয়া ফেলিতে পারিলে ১০ হইতে ৩০ বৎসর পান পাওয়া যাইতে পারে। আষাঢ়ের চারা হইতে আশ্বিনে, এবং আশ্বিনের চারা হইতে জ্যৈষ্ঠে পান পাওয়া যায়; মাসে দুইবার পাতা তোলা যাইতে পারে। প্রত্যেক গাছ হইতে ২।৪টি পাতা প্রত্যেক বারে পাওয়া যায়। বর্ষায় ৫।৬।৭টি পর্য্যন্ত। এক বিঘা জমিতে বৎসরে ২৬ হইতে ৩০ লক্ষ পান উৎপন্ন হয়। গাছের ডগাছাঁটা ছোট ছোট পানও প্রচুর পাওয়া যায়। তিন বিঘা জমি চাষ করিয়া পানের বরজ করিতে আন্দাজ দশ বৎসরে ৪৬০০৲ টাকা, অর্থাৎ বৎসরে গড়ে ৪৬০৲ টাকা খরচ পড়ে। তিন বিঘা জমির উৎপন্ন ৮০ লক্ষ পানের দাম টাকায় ৩০০০ পান হিসাবে দাম ধরিলে ২৫০০৲ টাকা। ইহার অর্দ্ধেক কীট পতঙ্গ গুগলিতে নষ্ট করিলেও খরচখরচার সহিত মোট আয় ১৩০০৲ টাকা স্বচ্ছন্দে হইতে পারে।

বঙ্গদর্শন (ফাল্গুন)।

শিক্ষা, অশিক্ষা, ও কুশিক্ষা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল—

একদল স্বদেশহিতৈষী দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই চেষ্টার পশ্চাতে একটা অসত্য আছে। বর্ণপরিচয় ও শিক্ষা (literacy and education) এক বস্তু নহে; আমাদের দেশে বর্ণজ্ঞান নাই তবু শিক্ষা আছে; পাশ্চাত্য দেশে বর্ণজ্ঞান আছে কিন্তু শিক্ষা নাই। বর্ণজ্ঞান লইয়া পাশ্চাত্য জনসাধারণ তাহাদের বৈষয়িক ব্যাপার যতটুকু যেমন ভাবে বুঝে আমাদের দেশের বর্ণজ্ঞানহীন নিরক্ষর লোকেদের বুঝিবার শক্তি তদপেক্ষা কম নহে। বরং আমাদের দেশের লোক যেমন জটিল তত্ত্ব বুঝিতে পারে পাশ্চাত্য সাধারণের তাহা ধারণাতীত। অক্ষরপরিচয়ই যে শিক্ষা নয় তাহা আমাদের মাতৃস্থানীয়া ও কন্যাস্থানীয়াদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। প্রাচীনাদের শিক্ষা ছিল স্বদেশাভিমুখীন এবং নবীনাদের শিক্ষা হইতেছে বিদেশাভিমুখীন। এঁদের শিক্ষা বাহিরের বিষয় লইয়া বুদ্ধিকে বিচলিত করিতেছে, তাঁদের শিক্ষা ভিতরের বিষয় জাগাইয়া বুদ্ধিকে স্থির করিত। এখনো সেই শিক্ষাই থাকিবে এমন কথা নয়; তবে সেই শিক্ষা ছাড়িয়া নহে, তাহার সহিতই যুক্ত করিয়া, তাহারই স্বাভাবিক প্রসারণের দ্বারা নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাহিরের আদর্শে সমাজের উপরে সংস্কারের বোঝা চাপাইলে প্রয়োজনের পূর্ব্বে আয়োজন করিতে গেলে সমস্ত কৃত্রিম, বহির্মুখীন ও অকল্যাণকর হইতে বাধ্য। বর্ণজ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজন এখনো আমাদের দেশে হয় নাই। ভিতর হইতে প্রয়োজন বোধ হইলে জনসাধারণ আপনি লেখা পড়া শিখিবে; চেষ্টা দ্বারা বা জোর করিলে সুফল হইবে না। বিলাতে সাধারণের মধ্যে জোর করিয়া যে বর্ণজ্ঞান প্রচার করা হইতেছে তাহাতে একদিকে যেমন দেশের প্রায় সকলেই লিখিতে পড়িতে শিখিতেছে সেইরূপ অন্যদিকে সমগ্র সমাজের বিদ্যাবুদ্ধি ক্রমশঃ ম্রিয়মাণ হইয়া যাইতেছে। ইংরেজি সাহিত্যের বর্ত্তমানে যে অধোগতি দেখা যাইতেছে এই সার্ব্বজনীন লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা তাহার প্রধান কারণ। সাহিত্য পূর্ব্বকালে সাহিত্যিকের আত্মবিকাশেই চরম সার্থকতা অন্বেষণ করিত, সাহিত্য তখন সাধনা ছিল; যাঁহাদের কিছু বলিবার থাকিত, যাঁহারা অন্তরে বাগ্দেবীর প্রেরণা অনুভব করিতেন, বিদ্যার প্রতি যাঁহাদের অহেতুকী অকৈতব প্রেম জন্মিত সে কালে তাঁহারাই আপনাদের আত্মচরিতার্থতা লাভের জন্য গ্রন্থাদি রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এখন গ্রন্থরচনা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। এখনকার গ্রন্থকারেরা ভাবার সাধনা করে, ভাবের ধারে ধারে না; বাজারের রুচি অনুসারে গ্রন্থ রচনা হয়। ইহাতে সমাজের চিন্তাশক্তি হ্রাস ও রুচি বিকৃত হইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশেও লেখাপড়ার বাহুল্য বিস্তারে এইরূপ ফলেরই সম্ভাবনা।

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরে প্রকাশিত হইবে; এবার স্থানাভাব।

—মণিভদ্র।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গের নূতন গবর্ণর লর্ড কার্মাইকেল কলিকাতা মিউনিসিপালিটির অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে অনেকগুলি ভাল কথা সরল ভাবে বলিয়াছেন। সিভিলিয়ান সাহেবদের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহাদিগের প্রত্যেককে চিনিতে এবং তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন হইতে চেষ্টা করিবেন। হয়ত অনেক সময়ে তাঁহাকে তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইবে; কিন্তু "যদি এমন ঘটনা হয়, তবে একথা আমি তাঁহাদের জানাইয়া রাখিতেছি যে, তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব পোষণ জন্য তাহা ঘটিবে না।" তিনি আরও বলিয়াছেন:—

"আমি জানি এমনসকল বিষয় আছে যাহাতে ভারতবাসীতে ইংরাজে অনৈক্য ঘটে। কিন্তু এ রকম বিষয়ও অনেক আছে, যাহাতে আমাদের মধ্যে একতাপ্রবণতা জন্মিবার হেতু হয়। যাহাতে সকলের মধ্যে পরস্পরে একতা জন্মে, অনৈক্য ঘটিবার কারণসমূহ ঘুচিয়া যায়, গবর্ণর স্বরূপে সে পক্ষে আমার লক্ষ্য থাকিবে। আমি এইসকল করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছি। যেসকল বিষয় আমাকে বিবেচনা করিতে হইবে সেসকলের প্রকৃত তথ্য আমি বুঝিতে চেষ্টা করিব। কোন বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময় শাসনকর্ত্তারা যে দিক দিয়া উহা ভাবেন, তাহাও দেখিব, এবং প্রজালোকে যে দিক দিয়া ভাবিয়া থাকে, তাহাও দেখিব। ফলে আমার শিক্ষা ও জ্ঞান অনুসারে ঠিক মত কাজ করিতে যতদূর পারি করিব। যদি আমি ইহা করিতে পারি তাহা হইলে কলিকাতার সম্বন্ধে—

বাঙ্গালার সম্বন্ধে—ভারতের সম্বন্ধে, আমাদের সম্রাটের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য পালন করা হইবে। বেশী আর কিছু করিতে পারিব না, তাহা করিবার জন্য আপনারাও বলিবেন না; কিন্তু কমও আপনারা আশা করেন না এবং কম করিবারও অধিকার আমার নাই।"

কিন্তু সকলের চেয়ে পাকা কথা বলিয়াছেন এই যে, তাঁহাকে বঙ্গের প্রথম গবর্ণর নিযুক্ত করা ঠিক্ হইয়াছে কি না, তাহা স্থির করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে, সম্ভবতঃ অন্ততঃ পাঁচ বৎসর লাগিবে। আমরাও বলি, "ফলেন পরিচীয়তে" অপেক্ষা পাকা কথা এক্ষেত্রে হইতে পারে না।

বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণবের সম্বর্দ্ধনা করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যথাযোগ্য কাজ করিয়াছেন। বিশ্বকোষ নগেন্দ্র বাবুর ও বাঙ্গালীর একটি সাহিত্যিক কীর্ত্তি। যে ইংরাজ জাতি জীবনের ও বিদ্যার নানাবিভাগে অসংখ্য মহত্তর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার একাদশ সংস্করণ শেষ হওয়া উপলক্ষে একটা ভোজ সভার আয়োজন করিয়া লর্ড মর্লী প্রভৃতি সাহিত্যিকদিগের দ্বারা বক্তৃতা করাইয়াছিলেন।

সিন্ধু দেশের মুসলমান জমীদারদের অনুরোধ ও সম্মতিক্রমে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভুর্‌গ্রী বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে একটি আইনের পাণ্ডুলিপি পেষ করিয়াছেন, যে, ঐ জমীদারদিগের উপর একটি শিক্ষা-টেক্স বসান হউক, এবং তাহার আয় হইতে সিন্ধুদেশের মুসলমান রায়তদিগের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারিত হউক। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার হিন্দু মুসলমান সমুদয় বেসরকারী সভ্য ইহার সমর্থন করিয়াছেন। বড় আনন্দের সংবাদ। অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু মুসলমান জমীদারেরা দেখুন ও শিখুন।

আমেরিকার দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইজন ভারতবাসী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। একজনের নাম শ্রীযুক্ত হরদয়াল। ইনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত এম্‌-এ। অক্সফর্ডেও কিছু দিন পড়িয়াছিলেন। ইনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক। ইনি ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে



শ্রীসুধীন্দ্র বসু।

সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভারতবর্ষীয় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে ষ্ট্যানফোর্ডের মত ধনশালী বিশ্ববিদ্যালয় আর নাই। এখানে বিজ্ঞান, এঞ্জিনীয়ারিং ও চিকিৎসাবিদ্যা খুব ভাল শিখান হয়। ইহার অধ্যাপকেরা জগতের বিদ্বন্মণ্ডলীর পরিচিত। অপর ভারতীয় অধ্যাপকের নাম শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র বসু। ইনি আয়োআ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য রাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতা (Oriental Politics & Civilization) সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। ইনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতা, এবং আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-এ উপাধিধারী। ইনি সংবাপত্রের উপযোগী প্রবন্ধাদি বেশ লিখিতে পারেন।

খবরের কাগজে দেখা গেল যে গুণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন যুবক আমেরিকার সৈন্যদলে

লেফ্‌টেন্যাণ্ট বা নিম্নতম সেনানায়কের কাজ পাইয়াছেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আমেরিকার বাণিজ্যদৌত্য (consular) বিভাগে কাজ লইয়া চীনদেশে গিয়াছেন। জগন্মোহন তালুকদার একটি সমুদ্রগামী বৃহৎ জাহাজের দ্বিতীয় কর্ম্মচারী এবং হরিচরণ মুখোপাধ্যায় আপ্‌কার্‌ কোম্পানীর একটি সমুদ্রগামী জাহাজের চতুর্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন। নূতন নূতন অনভ্যস্ত রকম কাজে ভারতবাসী কৃতিত্ব দেখাইলে বড় সুখের বিষয় হয়।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু স্বাস্থ্য-সমাচার নামে একটি মাসিক পত্র বাহির করিতেছেন। ইহার বৈশাখ সংখ্যা পাইয়াছি। আমাদের মত রোগজীর্ণ দেশে যে এমন একখানি অতীব প্রয়োজনীয় কাগজ এতদিন ছিল না ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এখন প্রকাশিত হইয়াছে; আশা করা যায় যে ইহার খুব কাটতি হইবে। কারণ, ইহার লেখাও খুব সারবান্‌ এবং বিষয়বৈচিত্র্যও খুব আছে। অধিকন্তু ৪৮ পৃষ্ঠা পরিমিত কাগজের বার্ষিক মূল্য ও ডাকমাশুল এক টাকা সস্তাও বটে। বৈশাখ সংখ্যায় আছে—সূচনা, রোগ কি, ডাবের জল, নিরামিষ-ভোজীর বিপদ (গল্প), দন্ত, বায়ুর সহিত শরীরের সম্বন্ধ, শ্বাস প্রশ্বাস, ব্যায়াম, ম্যালেরিয়া, বিবিধ সংগ্রহ। আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও বহুল প্রচার কামনা করি।

ঢাকায় প্রধানতঃ কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারীকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য মেম শিক্ষয়িত্রী দ্বারা অন্তঃপুরে ইংরাজী ভাষা ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া। ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যও মঞ্জুর হইয়াছে। ঢাকার অন্তঃপুরে বোধহয় বাঙ্গলা শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে, উহার আর অধিকতর বিস্তৃতির দরকার নাই; সেই জন্য এখন ইংরাজী ভাষা না শিখাইলে আর চলিতেছে না। যাহা হউক, কোন প্রকারে কিছু শিক্ষা হইলে সুখের বিষয় হইবে। আর কিছু না হউক এক বা একাধিক মেমের জীবিকার সংস্থান হওয়া সুখের বিষয়। আর একটা পরোক্ষ সুফল এই হইবে যে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিবেন যে আমাদের অন্তঃপুরগুলিতে বোমা প্রস্তুতের কারখানা বা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের আড্ডা নাই। তাহাতে গবর্ণমেণ্টও নিশ্চিন্ত হইবেন, এবং আমরাও খানাতল্লাসী হইতে কতকটা নিষ্কৃতি লাভ করিব।—কিন্তু পরিতাপের সহিত এই প্রশ্নই মনে হইতেছে যে আমরা এমনই অক্ষম যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন একজন অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রীও নিয়োগ করিতে পারি না? অথচ আমরা কেহ কেহ স্বাধীন হইতে চাই, অন্ততঃ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ত চাইই। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্‌।

অর্দ্ধোদয় যোগের সময় বাঙ্গালীর ছেলের দলবদ্ধ হইয়া শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিবার শক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা স্বার্থত্যাগ, নারীকে মাতৃজাতি বলিয়া সম্মান করা, সাহস, এবং পরসেবার জন্য প্রাণকেও তুচ্ছ করা, ইত্যাদি গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি চূড়ামণিযোগ উপলক্ষে স্নানের সময়ও বাঙ্গালী যুবকদের এইসকল গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভগবানের নিকট এই ভিক্ষা করি যে আমাদের মধ্যে এইসকল গুণ বাড়িতে থাকুক।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান ছাত্রদের রাসায়নিক গবেষণার বহু দৃষ্টান্ত ও ফল প্রতিবৎসরই বৈজ্ঞানিক জগতের সম্মুখে উপস্থিত হয়। গতবৎসর এবং বর্ত্তমান বৎসরেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

চট্টগ্রাম প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি হইয়াছেন শ্রীযুক্ত আবদুর্‌ রসুল। বরিশালে যখন এই সমিতির অধিবেশন হয় তখনও রসুল সাহেব সভাপতি ছিলেন। তখন পুলিশের উপদ্রব ও ঠেঙ্গাঠেঙ্গিতে সমিতির কোন কাজ হইতে পায় নাই। এবার তাঁহাকে সভাপতি করা ঠিকই হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা বেশ সারগর্ভ হইয়াছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ব্ববঙ্গে স্বতন্ত্র শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেনের বক্তৃতাও বেশ হইয়াছিল।



শ্রীযামিনীকান্ত সেন।



শ্রীআবদুল রসুল।

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন এই অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের কাজ করিয়াছেন। দর্শক ও প্রতিনিধিতে সমস্ত মণ্ডপ ভরিয়া গিয়াছিল।

ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর যে উচ্চ স্থান, তাহার একটি প্রধান কারণ বিদ্যাশিক্ষা। এই বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ কমিয়া গেলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। শিবপুরের এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব বড় আশঙ্কার কারণ। আবার গবর্ণমেণ্ট এইরূপ একটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে বেসরকারী বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটটি উঠিয়া গিয়া সরকারী যে শিল্পবিদ্যালয় ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তাহাতে লয় প্রাপ্ত হউক। আমরা এই উভয় প্রস্তাবেরই সম্পূর্ণ বিরোধী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই বিশেষ কোন আন্দোলন হইতেছে না। অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য যে যে-কোন জাতিকে সর্ব্ববিধ অবনত অবস্থায় লইয়া যায় ও রাখে, তাহা কি আমরা জানি না, না, ভুলিয়া আছি?

চট্টগ্রামে রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সের পর সমাজ-সংস্কার সমিতিরও অধিবেশন হইয়াছিল। বাবু সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে সামাজিক উন্নতি ভিন্ন রাজনৈতিক উন্নতি হইতে পারে না, উভয়ে পরস্পর সাপেক্ষ। বালিকার বিবাহের বয়স অন্যূন ষোল বৎসর হওয়া উচিত; বালবিধবাদের পুনর্ব্বার বিবাহে কোন সামাজিক বাধা থাকা উচিত নয়; বিবাহে পণগ্রহণ-প্রথা রহিত হওয়া উচিত; নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতির জন্য শিক্ষা প্রভৃতির বন্দোবস্ত হওয়া উচিত; বালিকা ও নারীদের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত; এইরূপ অনেক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

অযোধ্যার ফয়জাবাদ শহরে কায়স্থদের বার্ষিক সমিতিতে এবার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

হিন্দুস্থানী কায়স্থদের সভায় বাঙ্গালী কায়স্থ সভাপতি নির্ব্বাচন এই প্রথম হইল। হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী কায়স্থদের একত্র ভোজও হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চালাইবারও চেষ্টা হইতেছে। আগামী বৎসর কলিকাতায় এই সভা বসিবে।

কামাখ্যায় উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গেল। সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় বাঙ্গালার একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখক। তাঁহার বক্তৃতায়, উপযুক্ত বরকন্যা নির্ব্বাচন দ্বারা জাতির উন্নতির প্রয়োজনীয়তা, এবং বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বিলাতের ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের আদর্শে একটি সভা স্থাপনের আবশ্যকতা, প্রধানতঃ এই দুটি বিষয়ের আলোচনা ছিল।

চিত্র-পরিচয়

পূর্ণিমার রাত্রে রাজকুমারী পরিচারিকার সঙ্গে বিজন অধিত্যকায় পূজা করিতে আসিয়াছেন। গিরিগাত্রে গুহার অভ্যন্তরে মহাদেবের মূর্ত্তি—সে মূর্ত্তি সর্ব্বান্তর্যামীর চিহ্নমাত্র, যাঁহার সত্তায় বনস্পতি গিরি সরিৎ প্রাণবান তাঁহারই চিহ্নমাত্র। এই স্থানে যেন মহেশ্বরের সাক্ষাৎ আবির্ভাব হইয়াছে—কৈলাস পর্ব্বতের একান্তে মহাদেবের আশ্রম; তিনি চন্দ্রচূড়, পূর্ণচন্দ্র মেঘাবরণে ধূর্জ্জটির ললাটিকা চন্দ্রকলার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছে; তিনি গঙ্গাধর, নারায়ণের চরণচ্যুতা ব্রহ্মার কমণ্ডলুস্খলিতা গঙ্গাধারা ধূর্জ্জটির জটাজালে আশ্রয় লইতেছে এবং ভগীরথের স্তবতুষ্টা পতিত-পাবনী ধারা জননীস্তন্যধারার ন্যায় শুভ্রশীতল প্রবাহে ধরাতল ধন্য করিয়া যাইতেছে—সেই ক্ষীণ জলধারাটি চিত্রে পর্ব্বতগাত্র হইতে ক্ষরিত হইয়া মূর্ত্তির মস্তকে পড়িয়া চিত্রের দক্ষিণ দিক দিয়া বক্রকুটিল রেখায় উপলবিষম গতিতে বহিয়া উদ্ভিদহরিতে দুইকূল মণ্ডিত করিয়া বহিয়া গিয়াছে। আর পূজারিণী যেন সাক্ষাৎ তপস্যানিরতা উমা, যোগীশ্বর মহাদেবের প্রসন্নতা লাভের জন্য পাদ্য অর্ঘ্য নৈবেদ্য পূজা লইয়া তদ্গতচিত্তা—তাঁহার আরত্রিকপ্রদীপের স্বর্ণশিখা শিবমন্দিরের দীপশিখার দিকে অকম্পিত উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; পূজারিণীর আরত্রিকদীপের শিখার আগুন আর পূজ্যজনের মন্দিরের দীপশিখার আগুন একই ভাবে একই দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, পূজারিণীর পূজা পূজ্যের চরণে গৃহীত হইয়াছে ইহা তাহারই সূচনা। তাঁহাদের মিলনানন্দে সমস্ত প্রকৃতি আলোকে আনন্দে উৎসবশিহরণে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

এই চিত্রখানির অন্তরের ভাবটি আমরা এইরূপই বুঝিয়াছি।

এই চিত্রখানি মোগল চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির প্রভাবগ্রস্ত রাজপুত চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহা খুব সম্ভব খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিদি

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিকার।

শীতের মধ্যাহ্ন। হিমবর্ষণসঙ্কুচিত গাছগুলি ফুলফলহীন ডাল-পালা ছড়াইয়া নির্ম্মেঘোজ্জ্বল রৌদ্রটুকু সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া লইতেছিল। গ্রামের ঘনছায়াচ্ছন্ন বনপথটীতে বৃক্ষব্যবচ্ছেদপথে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়া রুগ্ন মুখের ক্ষীণ হাস্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকাইয়া ঘুঘু তাহার করুণ তান অশ্রান্ত বর্ষণ করিতেছে। পক্কপত্রপূর্ণ দীর্ঘ সরল নিম্ব বৃক্ষের ডালে বসিয়া বন্য কপোতদম্পতী তাহাদের পরস্পরকে যাহা বলিবার আছে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তাই তাহাদের কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট কূজনে বৃক্ষতলাটি মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। পথের পার্শ্বে বিকসিত সজিনা বৃক্ষে মৌমাছিদলের আনাগোনা ও গুঞ্জনের বিরাম নাই, মধ্যে মধ্যে একটা একটা দমকা বাতাসে পক্ক পত্রগুলির সঙ্গে ফুলগুলি পথে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বনে দোয়েল, শালিক, ছাতার, বুলবুলি, হাঁড়িচাঁচা প্রভৃতি বন্য পাখীগুলি যথাসাধ্য গোলযোগ করিয়া তাহাদের মাধ্যাহ্নিক আরামটুকু

বেশ জমাইয়া তুলিয়াছিল। বনান্তরালে গ্রামখানি নীরব নিস্তব্ধ। পথের পার্শ্বে দরিদ্র গৃহস্থের বাটীর ক্ষুদ্র অঙ্গনটুকুতে গৃহপালিত কুক্কুরটী রৌদ্রে গা ছড়াইয়া আরামে ঘুমাইতেছিল। জীর্ণ চালের বাতায় ঝুলানো বংশপিঞ্জরে টিয়াপাখীটিও পাখা ছড়াইয়া রৌদ্র পোহাইতেছে।

গভীর বনমধ্য হইতে দুইটী শীকারী গ্রাম্যপথে আসিয়া পড়িল। দুইজনার স্কন্ধে বন্দুক, হস্তে কয়েকটা মৃত পক্ষী ঝুলানো। একজন অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দেবেন, এখনো চটেই আছ যে ?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরক্তিপূর্ণস্বরে ব'লল "একি কম আপ্‌শোষ অমর!—অতগুলো চখা! তার একটা বই মারতে পারলাম না!"

"কেন ? এতগুলো তিত্তির, বটের মারা গেছে, তবু"—

"তা হোক্‌না—আহা সেই ধাড়ী চখাটা! দোষটা কিন্তু তোরি অমর, শীকার কর্ত্তে গিয়ে আবার দয়া!"

"আহা" বলিয়া কথা আরম্ভ করিতে গিয়াই অমর থামিয়া গিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে পার্শ্বস্থ অঙ্গনে চাহিয়া রহিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দেবেনও সেইদিকে চাহিল।

ক্ষুদ্র অঙ্গনস্থ আম্রবৃক্ষতলে একটী বালিকা বসিয়া খেলা করিতেছিল। একজন বর্ষিয়সী বিধবা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সস্নেহে বলিতেছিলেন "ছি মা, এমনি ক'রে কি ধূলোয় খেলা করে, চুলগুলো যে ধূলোয় মাথামাখি"—বলিতে বলিতে তিনি বালিকার পশ্চাতস্থ কুঞ্চিত গুচ্ছ গুচ্ছ কেশগুলি তুলিয়া ধরিলেন। ক্ষুদ্র বালিকা তখন হাসি-হাসি মুখে মাতার পানে চাহিল। সে কি সুন্দর সরল মুখখানি, কি হাস্যময় স্বচ্ছ সুনীল চক্ষু, দরিদ্রের জীর্ণ অঙ্গনে যেন একটী গোলাপফুল ফুটিয়া উঠিল!

দেবেন অমরের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল "কি এত দেখ্‌ছিস্?"

অমর মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া উত্তর দিল "তুমিও যা দেখ্‌ছ।"

"আমার তো আর নূতন নয়। চারু আমার বোনের মত! আমাদের বাড়ী কত দিন যায়।"

"চারু বুঝি ওই মেয়েটীর নাম ?"

"হ্যাঁ। বেশ দেখ্‌তে, নয়?"

"হ্যাঁ। এখন একটু শীগ্‌গির বাড়ী চল দেখি। একটু চা না খেলে এখন আর কিছু ভাল লাগছে না।"

"হ্যাঁ চাএর কথা যা বলেছ—আঃ ঘুরে ঘুরে এমন পায়ে ব্যথা হয়েছে!"

কিছুদূর ঘুরিয়া উভয়ে একটী দ্বিতল গৃহে প্রবেশ করিল। দেবেন শীকার ফেলিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে ষ্টোভ জ্বালিয়া চা'র জল চড়াইয়া দিল, অমর ততক্ষণ খাটে হাত পা ছড়াইয়া জিরাইতে লাগিল। সহসা অমর বলিল "দেবেন, আর দেরী করা ভাল না ভাই, আমি কালই যাব, বাবা শেষে বক্‌বেন।"

দেবেন তাড়া দিয়া বলিল "কি এত বক্‌বেন, কাল পরশু দুটোদিন চোক্‌কান বুজে থাক্। কতদিন আর তোর সঙ্গে দেখা হবেনা সেটা বুঝি একবারও মনে পড়্‌ছেনা। যদি কখনো তুই সখ্ করে দেখা করতে আসিস্ বা আমি যাই তবেই ত। আমার তো কল্‌কাতা বাস শেষ হ'য়ে গেল।"

তারপরে যথারীতি উভয়ের চা পানাদি আরম্ভ হইল।

পরদিন বৈকালে অমর দেখিল দেবেন ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্‌স লইয়া উদ্বিগ্ন মুখে কোথায় যাইতেছে। অমর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাচ্ছ ?"

"আমাদের একটী প্রতিবাসীর বাড়ী; তার মেয়েটীর ভারি জ্বর হয়েছে তিনি আমায় ডাকৃতে এসেছিলেন।"

"ওষুধ দিয়ে আসবে বুঝি ?"

"হ্যাঁ, আমাদের মত এমন সব ডাক্তারকে সহায়-সম্পত্তিহীন ভিন্ন কে আর ডাকে? মেয়েটীর জ্বরটা কিন্তু একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছে, রেমিটেণ্ট ফিবারের মত ধরণটা।—হ্যাঁ হ্যাঁ অমর, তুমি ত সে মেয়েটীকে কাল দেখেছ—সেই মেয়েটী। চল্ অমর দুজনে মিলে দেখে ওষুধটার ঠিক করিগে, অবস্থাটা খারাপ, অন্য ডাক্তার ডাক্‌বার তাদের ত সাধ্য নেই।"

অমর আগ্রহ সহকারে সম্মত হইল। আহা অমন সুন্দর মেয়েটী! ঔষধের বাক্‌স লইয়া উভয়ে বাহির হইয়া গেল।

জীর্ণ গৃহের মধ্যে একখানি নীচু তক্তপোষের উপরে অৰ্দ্ধমলিন শয্যায় বালিকার জ্বরতপ্ত রাঙা মুখখানি বেশ দেখাইতেছিল। পার্শ্বে ম্লান মুখে তাহার মাতা বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। উভয় বন্ধু বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া রোগী দেখিতে লাগিল। বালিকা জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান অভিভূত। ঔষধ দিয়া, শুশ্রূষা সম্বন্ধে তাহার মাতাকে বেশ করিয়া উপদেশ দিয়া দুইজনে বাটী ফিরিল।

পরদিন সকালে অমরের কলিকাতা যাওয়া হইলনা। একটী বালিকার প্রাণটুকু তাহাদের হাতে। দেবেন একা সাহস করিতেছে না বা নষ্টামী করিয়া তাহাকে যাইতে দিতেছে না। যাহাই হোক্ অমর যাইতে পারিল না। দুইজনের অশ্রান্ত চেষ্টায় ও যত্নে সাতদিনে বালিকার জ্বরত্যাগ হইল। বিধবার অজস্র স্নেহাশীর্ব্বাদ উভয়ের মস্তকে বর্ষিত হইতে লাগিল। অমরের পরিচয় লইয়া বিধবা তাহাকে স্বজাতি জানিয়া অধিকতর আনন্দিত হইলেন। কন্যাকে বলিলেন "চারু এঁকে প্রণাম কর, ইনি তোর দাদা হন।" বালিশের উপর হইতে মাথা নোয়াইয়া বালিকা প্রণাম করিল। অমর হাসিমুখে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। চারুর বয়স এগার বৎসরের বেশী নয়।

অমর কলিকাতায় চলিয়া গেল। আবার কলেজ যাওয়া লেক্‌চার শোনা, বক্তৃতায় মাতা, থিয়েটর দেখা প্রভৃতিতে পল্লীর দুদিনের অবসর দীর্ঘ ভ্রমণের আমোদ ও অন্যান্য ঘটনা স্বপ্নের ন্যায় মনের এককোণে সরিয়া গেল।

অমরের পিতা হরনাথ বাবু মাণিকগঞ্জের জমিদার। প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রকাণ্ড ঘড়ী এবং প্রকাণ্ড ভুঁড়ির অধিপতি হরনাথ বাবুর নামে সকলে জড়সড় হয় কিন্তু মাতৃহীন পুত্র অমরনাথের নিকটে তিনি একাধারে পিতা মাতা উভয়ই। পুত্র যখন যে আব্দার ধরে স্নেহশীলা মাতার ন্যায় তিনি ব্যগ্রভাবে তাহা সম্পন্ন করিয়া পুত্রের হর্ষোৎফুল্ল মুখের পানে সস্নেহ নেত্রে চাহিয়া দেখেন। মাতার অভাব অমরনাথ কখনো অনুভব করে নাই। আবার তিনি অতি সদাশয় জমীদার। তাঁহার মুক্তহস্ততা এবং অপরিমিত ব্যয়শীলতায় তাঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ বন্ধুগোষ্ঠীও স্বীকার করিত যে এইসব কারণে এবং প্রজাদের কিছুমাত্র শাসন না করায় তাঁহার জমীদারীর আয় আর বাড়িতে পায় নাই। আত্মীয়পক্ষ বলিত যে তিনি নগদ টাকাও কিছুমাত্র জমাইতে পারেন নাই। বন্ধুগোষ্ঠী অবশ্য ইহা স্বীকার করিত না।

পূজার সময়—অমরনাথের বাটী যাইবার উদ্যোগের মধ্যে সহসা একদিন বন্ধু দেবেন্দ্র অমরনাথের কলিকাতার বাসায় আসিয়া উপস্থিত। পূজার বাজারের দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে অমরকেও সে প্রায় টানিয়া লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ীতে সেবার দুর্গোৎসব। দেবেন ডাক্তারি পাশ হইলে তাহার মাতা "মাকে" আনিবেন এই তাঁহার বড় সাধ ছিল। দেবেন এখন তাঁহার সেই সাধ পূরাইতে অমরনাথেরও সাহায্য চাহিল, তাহার ভাই নাই, অমরই তাহার ভ্রাতৃস্থানীয়—তাহার মাতার কার্য্যে অমরেরও একটু খাটিয়া দেওয়া উচিত। অমর আর আপত্তি করিতে পারিল না। যাহার মা নাই সে জগতের 'মা' শব্দ মাত্রে এমনি বিগলিত হইয়া পড়ে।

পূজার কয়দিন বড় আনন্দে কাটিল। অমর যদিও তাহাদের বাটীর পূজা হইতে এ গরীবের ঘরের উৎসবে অনেক ত্রুটি দেখিতে পাইতেছিল কিন্তু যাহাতে সব ত্রুটি ঢাকিয়া যায় সেই অনাড়ম্বর হৃদ্যতার পূত প্রভায় সমস্ত জিনিষই যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। সামান্য গ্রাম্য যুবকের মতন সেও মুগ্ধ হৃদয়ে যখন সকলেরই ফরমাসে ঘোরা ফেরা করিতেছিল তখন গ্রামস্থ মহিলাগণের আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না! কেহ এ বিষয়ে তাহাকে কিছু বলিলে তাহা কিন্তু তাহার অসঙ্গত লাগিতেছিল। সকলের সহিত তাহার প্রভেদ যে কোথায় নিজে সে তাহা কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

বিজয়ার রাত্রে প্রতিমা বিসর্জ্জনের পরে ঘরে ঘরে বৎসরের মঙ্গল, সম্ভাষণ প্রণাম আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গনের রূপে প্রবাহিত হইতেছিল। দেবেন অমরকে বাহুবেষ্টনে বাঁধিয়া বলিল "নিতান্তই আজ চল্‌লি?"—

"হাঁ ভাই!—বাবাকে যদিও লিখেছি সব, তিনি কিছু বল্‌বেন না, কিন্তু জানি আমি, পুজোয় আমায় না দেখ্‌লে তাঁর মন ভাল থাকে না, আর—"

"আর নিজেও খোকা আছ একটু, নিজেরও মনটা কেমন করে, না?"—

"তাও ঠিক ভাই!—বাঃ—মেয়েটিত ভারি সুন্দর! কাদের মেয়ে রে দেবেন?"—

দেবেন চাহিয়া দেখিল একদল বালিকা তাহাদের নিকটে অগ্রসর হইতেছে, তাহার মধ্যে নীলাম্বরীপরা বালিকাটিই যে বন্ধুর চক্ষু আকর্ষণ করিয়াছে দেবেন নিমেষে তাহা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল "বল দেখি কে?"—

"কোথায় যেন দেখেছি বোধ হচ্চে!—ওঃ—মনে পড়েছে—সেই যার অসুখ হ'য়েছিল"—বলিতে বলিতে অমর সহসা থামিয়া গেল।

বালিকার দল নিকটে আসিয়া তাহাদের একে একে প্রণাম করিতে লাগিল। দেবেন সকলকে হাসিমুখে সম্ভাষণ করিয়া বলিল "বাড়ীর ভেতরে যা, মা মিষ্টিমুখ না করাতে পেলে রাগ করবেন।"

দলের অগ্রবর্ত্তিনী বালিকা বলিল "আমরা আগে সব বাড়ী নমস্কার করে আসি!"

"তবেই আর তোরা খেয়েছিস্! সবাই আগে খাইয়ে দেবে। সে হবেনা।"

চারু মাথা হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে বলিল "দেবেন দা, মা আপনাদের একবার ডেকেছেন।"

দেবেন ব্যস্ত হইয়া বলিল "সে তো আমরা তাঁকে প্রণাম করতে যাবই! অমর চল্!"

অমর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "ট্রেনের সময় থাকবে ত?"—

"ঢের ঢের! চল্!"

উভয়ে গিয়া দেখিল সেই জীর্ণ গৃহের অঙ্গনে অম্লান চন্দ্র-কিরণে দরিদ্রা বিধবা দুইখানি আসন পাতিয়া যথাসাধ্য জলখাবার সাজাইয়া বসিয়া আছেন। অমর ও দেবেনকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার আনন্দ যেন আশার অধিক কৃতার্থতা লাভ করিল। অমর তাঁহার অতিরিক্ত আদরে যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে লাগিল। বিধবা দেবেনকে বলিলেন "বাবা দেবেন! তোমাদের ঋণ আমি শোধ করতে পারব না! তুমি যে তোমার গরীব কাকিমার কি উপকার করেছ—"

দেবেন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল "সে কি—সে কি কাকিমা! আপনাকে যে আমি কাকিমা বলেই জানি!—ও সব কথা থাক্ এখন, অমরের ট্রেনের সময় হ'য়েছে, আর দেরী করা নয়।"

বিধবা যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন দেবেন্দ্রের তাড়াতাড়িতে তাহা আর বলা হইল না।

উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। দশমীর শুভ্র জ্যোৎস্নায় গ্রাম্য পথ আলোকিত। গ্রাম্য বালক ও যুবাবৃন্দ তখনো আনন্দোচ্ছ্বাসে পথ ঘাট মুখরিত করিয়া বাড়ী বাড়ী নমস্কার করিয়া বেড়াইতেছিল। কোথায় কোন্ কৃষক যুবক ডুবকী বাজাইয়া গাহিতেছে—

"হর তুমি আরতো আমার পর নয়,
আমি মেয়ে দিয়ে ছেলে পেলাম জামাই আমার মৃত্যুঞ্জয়।
প্রাণ সমা উমা আমার, আজি হ'তে হ'ল তোমার,
আদরে রাখিবে জানি তবু মাকে বলতে হয়॥"

দেবেন সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল "ওঁর আর আপনার লোক কেউ নেই বলে আমাকে ছেলের মত ছাখেন, সব ভার দেন্, আমি কিন্তু কিছুই করতে পারি না। দেখতেই ত পাচ্চ আমারও অবস্থা। যাদের খেটে খেতে হয় রাতদিন নিজের সংসারের ভাবনায় ব্যস্ত থাকতে হয় তাদের কোন ভাল কাজ বা পরের উপকার করার উপায়ই নেই। কিন্তু বিধবাটি এমনি ভাল মানুষ যে তাঁর সঙ্গে একটু ভাল মুখে কথা কইলেও তিনি যেন তার কাছে নিজেকে ঋণী বোধ করেন।"

অমর বলিল "সত্যিই বড় ভাললোক! মুখে যেন একটা মাতৃভাব মাখানো! আমারও বড় ভাল লেগেছে। ওঁর অবস্থা খুব"—

বাধা দিয়া দেবেন বলিল "সেজন্য নয়। মেয়েটির বিয়ে দেওয়ার জন্যে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

"এখনি?—মেয়েটি তো এখনো ছোট!"

"ছোট আর কই? বছর এগার বয়স হবে। হিন্দুর ঘরের মেয়ে আর কতদিন রাখা চল্বে? বিশেষ সময় থাকতে না খুঁজলে যদি শেষে একটা অঘার হাতে মেয়েটিকে দিতে হয়। মা একটি ভাল পাত্রে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হন্ কিন্তু অবস্থা তো তেমন নয়। তোমায় একটু উপকার করতে হবে ভাই!"—

অমর সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল "অত সুন্দর মেয়ে, অবস্থা নাই বা ভাল হল, লোকে আদর করেই নেবে নিশ্চয়!"

"না অমর, তুমি এখনো নাবালক দেখছি! পৃথিবী

সম্বন্ধে বুঝি তোমার এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে? কোন বড় লোকের ঘরে বা ভাল ছেলের হাতে মেয়েটিকে দিতে পারা তুমি বুঝি খুব সহজ মনে করছ? রূপই বল আর গুণই বল সকলের মূল রূপচাঁদ! মেয়েটির রূপের চেয়েও গুণ এত বেশী, এত নরম সরল স্বভাব! কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই—ঘরে যে আদত জিনিষেরই অভাব!"

অমর একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল "বলকি দেবেন! তোমার এই বুঝি এত দিনের শিক্ষার ফল? জগতে সর্ব্বত্রই কি ঐ এক নীতি!"

দেবেন ব্যঙ্গের স্বরে বলিল "বিশেষ বড় লোকদের ঘরে। গরীব ভদ্রলোকও বা এক আধ জায়গায় মনুষ্যত্ব দেখিয়ে থাকে, কিন্তু বড় লোকদের ঘরে এ নীতি আবহমান কাল চল্‌ছে—চল্‌বে!"

"অন্যায় বল্‌ছ দেবেন! দু এক জায়গায় তাই বটে সত্য, কিন্তু—"

"তোমরা ওসব গ্রন্থের নজীর রেখে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে এস! কই ক'টা বড় লোকের ছেলে রূপ গুণ স্বভাবের আদর করে থাকে প্রমাণ দাও দেখি! ধর এই তুমি! তোমার জন্যে কত লক্ষপতির ঘর থেকে সম্বন্ধ আস্‌বে! তুমি কি সেখানে রূপ গুণের কথা বেশী মনে রাখ্‌তে পারবে?—রূপচাঁদের রূপই কি সেখানে সব চেয়ে বড় হবেনা?"

"এ কথাটা আরও অন্যায় বল্‌ছ দেবেন! বাপ মায়ের ইচ্ছা, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ, এসব কথা মনে না রেখে কেবল টাকার কথাই তুমি ভাব্‌ছ।"

"যাই হোক্ হরে দরে হাঁটু জল! তোমাদের সুবিধাই তাতে!"

"আঃ—আমাকে কেন এর মধ্যে জড়াও ভাই, আমি কি কর্‌লাম!"

"কেননা সকলের ওপর ঝাল ঝাড়্‌তে পারিনা, তোমার ওপর পারি!"

"এরই নাম ভবিষ্যতদর্শন। আমি ত এখনো বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করিনি, কর্‌ব যখন তখন বলো! যাক্ আমাকে কি কর্‌তে বলছিলে যে?"

"গরীবের একটু উপকার! মেয়েটি ত দেখলে! একটি ভাল পাত্র যদি সন্ধান করে দিতে পার।"

সম্মুখে মলের ঝুমুঝুমু শব্দ এবং কলগুঞ্জন শুনিয়া উভয়ে চাহিয়া দেখিল বালিকার দল তখনো বাড়া বাড়ী নমস্কার করিয়া ফিরিতেছে। দেবেন ডাকিয়া বলিল "চারু! তোদের বাড়ী আমরা খেয়ে এসেছি রে।"

সকৃতজ্ঞ নয়নে চাহিয়া চারু মস্তক নত করিল। কি সে সরল সুন্দর দৃষ্টি!

অমর নীরবে গিয়া শকটে আরোহণ করিল। শকট যখন ছাড়িয়া দিল তখন সহসা মুখ বাহির করিয়া দেবেনকে বলিল "তুমি যা বলেছ মনে থাকবে। পাত্রের চেষ্টা কর্‌ব"—বাকী কথাটা চাকার ঘর্ঘর শব্দে মিলাইয়া গেল।

দেবেন নিজ মনে মৃদু হাসিয়া বলিল "তা জানি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বীকার।

অমরনাথ পিতার স্নেহ কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে ভোগ করার পর শুনিল তাহার বিবাহের সম্বন্ধ। কন্যা কালীগঞ্জের জমীদার শ্রীরাধাকিশোর ঘোষের একমাত্র দুহিতা শ্রীমতী সুরমা দাসী, সুন্দরী এবং বয়স্থা। হরনাথ বাবু নিজে গিয়া কন্যা দেখিয়া পসন্দ করিয়া আসিয়াছেন। প্রবীণ দেওয়ান এই কথা বলিয়া বেশ করিয়া অমরনাথকে বুঝাইয়া শেষে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে, বড় লক্ষ্মী মেয়ে।"

অমরনাথের হাসি আসিল। বলিয়া ফেলিতেছিল "জমীদারি সেরেস্তার কাজও জানে নাকি?" পিতৃসম প্রবীণকে পরিহাসটা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া জিহ্বা সংবরণ করিল, কিন্তু তাহার মনে কেমন অশান্তি উপস্থিত হইতেছিল। পিতা নিজে দেখিয়া শুনিয়া সম্বন্ধ করিয়াছেন ইহাতে তাহার আপত্তি আর কি হইতে পারে? তবু মন কেমন খুঁত্ খুঁত্ করিতেছিল অথচ তাহার কোন সঙ্গত কারণও দেখিতে পাইতেছিল না। দু চারবার যেন মনে মনে বলিল এত শীগ্‌গির কেন, কিন্তু সামান্য এই অসন্তোষটুকুর জন্য নির্লজ্জ হইয়া পিতাকে কিছু বলিতে পারিল না। বড় লোকের মেয়েকে বিবাহ করার পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত বাধাও তো সম্মুখে উপস্থিত নাই, যে, সেই সূত্রে

পিতাকে নিজের কোন আপত্তি জানাইবে। কোন গরীবের কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ত পিতা ধনীর কন্যাকে বধূ করিতেছেন না। অনুপস্থিত কোন গরীবের উদ্দেশে এ নূতনতর ওকালতিতে সকলে হয় ত তাহার মস্তকে কোন স্নিগ্ধকর তৈল বা প্রলেপের ব্যবস্থা করিবে এবং পিতা ততোধিক বিস্ময়ে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া থাকিবেন। না, সুস্থ মস্তিষ্কে এ রকম খেয়ালের বশে চলা যায় না। অমরনাথ এ বিবাহে আপত্তি করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে কার্ত্তিক মাসের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটিয়া অগ্রহায়ণ মাস পড়িতেই খুব সমারোহে অমরনাথের বিবাহ হইয়া গেল। উভয় পক্ষেরই একমাত্র কন্যা পুত্র, ধুমধামটা অতিরিক্ত পরিমাণেই হইল। হরনাথ বাবু খুঁজিয়া খুঁজিয়া এ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বন্ধুগোষ্ঠী বলিল "বুড়ো এইবার বড় দাঁওটাই মারলে গো।" অমর কেবল দেবেনকে এ বিবাহের সংবাদ দিতে পারিল না। কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও দেবেনকে জানাইতে তাহার বড় লজ্জা করিল। সে যেন নিজেকে দেবেনের কাছে শপথ ভঙ্গের দোষে অপরাধী মনে করিতে লাগিল।

যথারীতি পাকস্পর্শ ফুলশয্যা সমস্ত হইয়া গেল। অমরনাথ ফুলশয্যার দিন জড়সড় ভাবে কোন রকমে খাটের এক পার্শ্বে শুইয়া রাত কাটাইয়া দিল। তাহার বড় লজ্জা করিতেছিল। কন্যাটী নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। তের চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে পারে। পুরুষের হিসাবে অমরনাথের এখনো বালকত্ব যায় নাই। ইহার পরে বধূ যে কয়েক দিন বাটীতে ছিল অমরনাথ সে কয়দিন পাশ কাটাইয়া বেড়াইল।

তারপরে বধূও বাপের বাড়ী গেল অমরনাথও পিতার নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় গেল। মধ্যে বন্ধু দেবেনের পত্র পাইল, সে তাহাকে তাহাদের গ্রামে একবার যাইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছে। অমর পত্রের উত্তর দিল না। পূজার সময় অমর বাটী গিয়া শুনিল বধূর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে তাই তাহাকে এখন আনা হইল না। পিতা অনেক দুঃখ করিলেন। অমরনাথের মনে হইল একখানা পত্র লেখা উচিত। কিন্তু যাহার সঙ্গে বাক্যালাপও হয় নাই সহসা তাহাকে কি বলিয়া পত্র লেখা যায়। অমরনাথ মনে মনে বধূর সহিত আলাপের অপেক্ষায় পত্র লেখা স্থগিত রাখিল।

বিবাহের পর দেড় বৎসর ঘুরিয়া গেল। অমরনাথ গ্রীষ্মাবকাশে বাটী যাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় বন্ধু দেবেনের এক সানুনয় পত্র পাইল "একবার যদি না এস তো চিরদিন অনুতাপ করিতে হইবে। নিশ্চয় আসিবে।"

অমরনাথ দেবেনের গ্রামে গিয়া পৌঁছিল। বাটীর সম্মুখেই দেবেনকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে বলিল "ব্যাপার কি?"

দেবেন ঈষৎমাত্র হাসিয়া বলিল "ব্যাপার আর কি, কিছুতেই আসিস না, তাই একটু জব্দ করে আনলাম।"

অমর একটু দম লইয়া বলিল, "এ ভারী অন্যায়—এ কি ছেলেমানুষী!"

"ওঃ এতই কি অন্যায়? কারু কাছে তো এখনো জবাবদিহি করতে হবে না, তার ভয় কি!"

অমরনাথের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, সে আর কিছুই বলিতে পারিল না।

বৈকালে দেবেন বলিল, "ওহে সেই মেয়েটীকে মনে আছে—সেই চারু?"

অমরের অন্তঃকরণটা আবার ধক্ করিয়া উঠিল, একটু থামিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "কেন? কি হয়েছে? মেয়েটী মারা গেছে নাকি?" বলিতে বলিতে বহুদিনদৃষ্ট সেই রোগপাণ্ডুর মুখখানির উপরে হাসিহাসি সরল চোখ দুটী মনে পড়িয়া গেল।

দেবেন অমরকে বিমনা দেখিয়া ঈষৎহাস্যমুখে বলিল "না, না, মেয়েটী না, তার মা মরমর, আমি তাঁর চিকিৎসা করি। চল্ দেখ্তে যাবি?"

"চল, আহা—মেয়েটীর বিয়ে হয়েছে তো?"

"বিয়ে? কই আর হ'য়েছে - যে গরীব, তোদের জাতে যে টাকা লাগে। তুই যে বলেছিলি পাত্রের খোঁজ দেখবি। তাই ত আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।"—

অমর লজ্জিত অনুতপ্তভাবে মস্তক নত করিল। এ কথা তাহার আর মনেই ছিল না।

দুই জনে সেই বহুদিনদৃষ্ট অধিক জীর্ণতর গৃহে প্রবেশ করিল। ক্ষীণা মলিনা বিধবা রুগ্নশয্যায়, পার্শ্বে সেই ক্ষুদ্র বালিকা, চারু। হাসি হাসি চোখ দুটীর উপরে গভীর কালির রেখা পড়িয়াছে, ম্লান শুষ্ক মুখ। অমর ভাবিল 'আহা'। বালিকা তাহাকে দেখিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া বসিল। ম্লান গণ্ড দুখানি একটু রাঙা হইয়া উঠিল। এমন সময়ে লজ্জা? মেয়েটী এমনি নির্ব্বোধ!

ক্ষণেক পরে যখন বিধবার সংজ্ঞা হইল, দেবেন তাঁহার সম্মুখে বসিয়া উচ্চস্বরে বলিল "কাকিমা অমর এসেছে।"

ক্ষীণস্বরে বিধবা বলিলেন "কই?"

"এই যে" বলিয়া দেবেন অমরকে সম্মুখে ঠেলিয়া দিল। অমর বিধবার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন নয়নের হর্ষোচ্ছ্বাসে বিস্মিত মুখে বসিয়া রহিল।

বিধবা অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন "চারু!"

ম্লান আরক্ত মুখখানি নীচু করিয়া চারু মাতার সম্মুখে আসিয়া বসিল। বিধবা কম্পিতহস্তে তাহার ক্ষুদ্র হস্তখানি লইয়া অমরের হস্তে স্থাপন করিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিলেন "তোমাকে দিয়ে গেলাম। আমার চারুলতা তোমার হল, ভগবান তোমাদের সুখী করবেন।"

অমরনাথ বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত। তাহার অবশ হস্তে শুভ্র ক্ষুদ্র হাতখানি কাঁপিতেছিল, শোকাচ্ছন্ন নয়ন হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু তাহার উপরে পড়িয়া মুক্তার মত টল টল করিতেছিল।

অমরনাথ বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল "আপনি এ কি বল্‌ছেন—জানেন না কি—"

দেবেন বাধা দিয়া বলিল "চুপ্‌ চুপ্‌ একটু ঘুম এসেছে, জাগিও না।"

অমর উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল "আমার যে অনেক বুঝাবার আছে—আমি যে"—

দেবেন বাধা দিয়া বলিল "এরপরে এরপরে অমর, তুমি অতি হৃদয়হীন!"

রাত্রে বিধবার শ্বাস আরম্ভ হইল। আর সময় নাই দেখিয়া অমর তাঁহার বক্ষের উপর লুণ্ঠিতা রোরুদ্যমানা বালিকাকে একপার্শ্বে সরাইয়া দিয়া তাঁহার মুখের নিকটে গিয়া উচ্চস্বরে বলিল "আমি বিবাহিত! আপনি কি শোনেন নি? আমি বিবাহিত!"

বিধবার শ্রবণশক্তি তখন সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে গিয়া মিশাইয়াছিল। প্রাণ তখন দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে সেই ধ্যানে মগ্ন।

বিস্মিত দেবেন বলিল "সে কি অমর! তুমি বিবাহিত!—সে কি? আমি কিছু জানি না!"

"হয় ত জান না। আমি তোমায় লিখি নি। কিন্তু এ কি বিভ্রাট বাধালে! যখন ওঁর জ্ঞান ছিল তখনো ওঁকে জানাতে দিলে না—প্রকারান্তরে ওঁর মৃত্যু-শয্যায় আমার কি শপথ করা হ'ল? দেবেন এ কি বিভ্রাট বাধালে!"

"ঈশ্বর সাক্ষী, আমি নির্দ্দোষ! তোমায় অবিবাহিত জেনেই ওঁকে আমি প্রলোভিত ক'রে রেখেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার বাপের অমতের কথা বল্‌ছিলে।"

প্রত্যূষে বিধবার প্রাণত্যাগ হইল। দেবেন লোকজন ডাকিয়া তাঁহাকে সৎকারার্থ লইয়া গেল। অমরনাথ শোকাচ্ছন্না বালিকাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবে স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে তাহার নিকট বসিয়া রহিল। আশ্রয়হীনা অসহায়া বালিকা মাটিতে লুটাইতেছে। হয় ত সে কিছু পূর্ব্বে নিজেকে এত অসহায়, এত অনাথা বিবেচনা করে নাই। এখন তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষে অসীম পৃথিবী ধূমাকার ধারণ করিয়াছে। অমর ভাবিতেছিল সে কি এই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে তাহার এই শোকের উপরেও নূতন করিয়া কিছু ব্যথা অনুভব করিয়াছে?

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। অমর বলিল "দেবেন, উপায়!"

"কি জানি" বলিয়া দেবেন নীরবে রহিল।

"তোমরা কি ওর বিয়ে দিতে পার না?"

"পাত্র কোথায় পাব? টাকা নইলে কি বিয়ে হতে পারে।"

অমর বলিল "টাকা আমি দিব।"

"মার অমতে কি ক'রে রাখি? তিনি বলেন স্বজাতের মেয়ে নয়, কোথায় পাত্র পাব! তুমি ভিন্ন এখন আর ওর গতি নেই। এই এক মাত্র উপায় দেখ্‌ছি, তুমি সঙ্গে

নিয়ে গিয়ে—ভাল পাত্র খুঁজে বিয়ে দিয়ে দাওগে। এখানে ফেলে গেলে তুমি যে দায়িত্বটা মনে রাখবে সে ভরসা আর কই করতে পারছি।"

দেবেনের শ্লেষ ইঙ্গিতে বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া এবং আর গত্যন্তর না দেখিয়া এবং নিজ কৃতকর্ম্মের ফল ভাবিয়া অগত্যা অমরনাথ চারুকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

(ক্রমশ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

পুস্তক-পরিচয়

কাব্যকথা—

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু প্রণীত। ঢাকা, আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ১৮০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১৲ টাকা। মনসার গান ও পাঁচালী বাংলার বিশেষ নিজস্ব ধন; সতী-শিরোমণি বেহুলা সংস্কৃত পৌরাণিক কল্পনার বিদেশিনী নহেন, তিনি আমাদের নিতান্তই আপনার ঘরের লোক; বেহুলার পুণ্যচরিত্র ও উপাখ্যান এবং তাহার বর্ণনা বাংলা দেশের একেবারে খাঁটি আপনার জিনিষ। মনসামঙ্গল ত্রিশজনেরও অধিক কবি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় নিজের মতো করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—তাহার উপাদানের জন্য তাঁহাদিগকে সংস্কৃত পুরাণের কাছে ভিক্ষার দীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই। এইজন্য মনসামঙ্গল আমাদের বাংলা দেশের খাস কাব্য; এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা বেহুলা সতীকে আপনার কন্যা বলিয়া দাবী করিতে আজ পর্য্যন্ত ব্যস্ত। সেই আমাদের বঙ্গবধূ বেহুলার পুণ্য-কাহিনী, বাণিজ্যবীর চাঁদ বেণের একনিষ্ঠ ভক্তি ও ধর্ম্মভাব, বাঙালীর সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য, দুলাই মাঝির সমুদ্রে নৌকাচালনা, প্রভৃতি বাঙালীর অধুনাদুর্লভ গুণের কাহিনী যে-মনসামঙ্গলের উপজীব্য, সেই মনসামঙ্গল কাব্যের আলোচনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগে মনসামঙ্গল-রচয়িতা প্রধান কয়েকজন কবির পরিচয়, সমসাময়িক ইতিহাস, তাঁহাদের রচনার বিশেষত্ব ও কবিত্ব, তাঁহাদের ভৌগোলিক জ্ঞান, রসপটুতা ও তৎকালীন সমাজচিত্রণ, কাব্যবর্ণিত নরনারীর চরিত্রবিশ্লেষণ ও বিশেষত্ব নির্দ্ধারণ, এবং মনসা-মঙ্গলের ইতিহাস ও মূল নির্ণয় প্রভৃতি বিষয় বহু অনুসন্ধান, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ এবং সহৃদয় বিচক্ষণতার সহিত বিবৃত ও সমালোচিত হইয়াছে। এই ভাগে বর্ণিত প্রাচীন বঙ্গের শিক্ষা সভ্যতা, রীতি নীতি, রন্ধন খাদ্য, নাম পরিচ্ছদ, ভূগোল ইতিহাস, কথা বার্ত্তা প্রভৃতি পাঠ করিতে বিশেষ কৌতূহল ও আনন্দ হয়। দ্বিতীয় ভাগে পাঁচালীর চিরমধুর উপাখ্যানটি গ্রন্থকার নিজের ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এই গ্রন্থ সাধারণ ও বিচক্ষণ উভয়শ্রেণীর পাঠকেরই উপভোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ও রচনারীতি ভালো। মুদ্রাঙ্কনও প্রায় নির্ভুল। কেবল মার্জিনের নোটগুলি অতিরিক্ত বাহুল্যে, লাইনে লাইনে নোটের ছড়াছড়িতে, পাঠের বিশেষ বিঘ্নের কারণ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ মার্জিনের নোটকণ্টক সমূলে বর্জ্জন একান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে এতদপেক্ষা একটি সুশৃঙ্খল বর্ণনাক্রম অবলম্বন করিলে গ্রন্থখানি বিশেষ উপাদেয় হইবে।

আমার জীবনের লক্ষ্য—

শ্রীরামলাল সরকার প্রণীত ও প্রকাশিত। ডিমাই অষ্টাংশিত ৩৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা। এখানি উপন্যাস। নায়কের উচ্চ ভাব ও মহৎবীরত্বপূর্ণ জীবন এমন সব ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে যে একদিকে যেমন নায়কের আদর্শ মনকে আনন্দ দেয় অপর-দিকে তেমনি দেশের বিবিধ কুপ্রথা, কুসংস্কার ও কাপুরুষতা সম্বন্ধে মনকে ভাবিয়া বুঝিবার যুক্তিচিন্তায় প্রবর্ত্তিত করে। পুস্তকখানি ঘটনাবৈচিত্র্যে আগাগোড়া কৌতূহল জাগাইয়া রাখে, নায়কের adventurous জীবনকাহিনী এক নিশ্বাসে শেষ পর্য্যন্ত জানিয়া লইবার আগ্রহ হয়। কিন্তু রচনার মধ্যে উপন্যাসের কোনো আর্ট নাই; বিচিত্র চরিত্রের লীলা, মনস্তত্বের বিশ্লেষণ বা ঘটনার অবশ্যম্ভাবিত্ব ইহাতে নাই; বর্ণনা স্থানে স্থানে বক্তৃতায় পরিণত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে নায়কের আত্মশ্লাঘায় পরিণত হইয়াছে। রচনার ভাষাও মধুর ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন নহে।

বার-ভূঞা—

শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। কলিকাতা ১৬ সাগর ধরের লেন হইতে শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ২৫২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৹, বাঁধা ১৸৹ টাকা। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী বাংলা দেশের গৌরবের যুগ। সেই সময় বঙ্গদেশ স্বাধীনতার মুকুটে মহিমান্বিত, বাঙালী রণপাণ্ডিত্যে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহার ফলে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট আকবর চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে বারো জন ভূস্বামী স্বদেশকে গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টিত ছিলেন তাঁহারা বার-ভূঞা নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই বার-ভূঞার মধ্যে অনেকেই কায়স্থ ছিলেন এবং এখনকার অনেক কায়স্থের পূর্ব্ব-পুরুষ। সুতরাং বারভূঞার ইতিহাস আমাদের আপনার ইতিহাস,—তাহা লজ্জার ইতিহাস নহে, আনন্দের ও গৌরবের ইতিহাস, তাহা পাঠ করিলে মনে আশার সঞ্চার হয়, আত্মপ্রত্যয় জন্মে, আপনাদের অতীত দেখিয়া ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় মন বললাভ করে। আনন্দবাবু ইংরেজি, বাংলা, ফার্সি যত রকম ভাষায় বারভূঞা সম্বন্ধে যত কিছু আলোচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে তৎসমস্তই সংগ্রহ করিয়া, তুলনা করিয়া, বিচার করিয়া নিজের স্বাধীন অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সত্য নির্ণয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বহু লেখকের সহিত তাঁহার মতভেদ হইয়াছে, তিনি অনেক নূতন মত স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা দম্ভে প্রতিষ্ঠিত নহে; গ্রন্থকার নিজের অক্ষমতা মানিয়া লইয়া সকল মতের তুলনায় সমালোচনা ও বিচারে সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য বিশেষজ্ঞগণকে ভার দিয়াছেন। পরিশিষ্টে ইতিহাসসংশ্লিষ্ট স্থানের ভূগোল পরিচয় দেওয়াতে গ্রন্থখানি অধিকতর উপাদেয় হইয়াছে।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ—

শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি কোম্পানী, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ১৩১ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৹। এই গ্রন্থে নয়টি সন্দর্ভ আছে—(১) ইতিহাসের উপদেশ, (২) বিপ্লব, (৩) গ্রীক ও হিন্দু, (৪) ইতিহাসে শিখ জাতি, (৫) আধুনিক ভারত, (৬) বীরত্ব, (৭) ইতিহাসবিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা; (৮) আলেক-জাণ্ড্রিয়ার সমৃদ্ধির যুগ, (৯) ইউরোপ ও ভারত। গ্রন্থপ্রারম্ভে মনীষী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর ভূমিকার একস্থলে এই পুস্তকের মূলসূত্রটি ধরিয়া দেখাইয়াছেন—"ইতিহাসকে কেবলমাত্র

ঘটনাপঞ্জী মনে করিয়া যাঁহারা ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁহারা দুর্ভাগ্য। বহু সহস্র বৎসরের মানবজাতির মর্ম্মকথা ইতিহাসমুখে প্রকাশ পায়; মানবজাতির বিরাট পুরুষের হৃৎস্পন্দন ইতিহাস দ্বারা কর্ণগত হয়; সেই পুরুষের তপ্তনিশ্বাস ইতিহাসমুখে বহির্গত হয়। স্থিরযৌবন মানব তাহার শত শতাব্দের বার্দ্ধক্য অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যে ভূয়োদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতার বলে গুরুগম্ভীর উপদেশবাণী প্রচারিত করে, তাহা ইতিহাসের মুখে শুনিতে পাই।" বাস্তবিক ঘটনাপরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে মানবজীবনের যে মূলসূত্রটি দেশকালের পরিবেষ্টনের মধ্যে এক একটি জাতিকে ঘিরিয়া বিচিত্র বুননে জাল রচনা করে তাহার দ্বারা মনুষ্যত্বের নিত্য সত্যটিকে ছাঁকিয়া তোলাই ঐতিহাসিকের কাজ—কেবলমাত্র ঘটনার নির্ঘণ্ট রচনা ঐতিহাসিকের কাজ নহে। বড়ই আনন্দের কথা যে, যে মাসে আমরা সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" প্রকাশ করিতেছি, সেই মাসেই আমরা বিনয়বাবুর "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" সমালোচনা করিতেছি। ইহা significant বলিয়া মনে হইতেছে। বিনয়বাবু ভূমিকায় বলিয়াছেন—

"বৈজ্ঞানিকের রীতিতে ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এই কয়টি সত্য আবিষ্কৃত হয়—

"প্রথমতঃ মানব কখনও কোনো দেশেই সার্ব্বজনীন চরম সত্যের উপলব্ধি করে নাই। সকল যুগেই মানবসমাজ কালোপযোগী সমস্যার মীমাংসা করিয়া সাময়িক ও প্রাদেশিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে মাত্র।

"দ্বিতীয়তঃ, কোনো জাতিই জগতে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে ও সম্পূর্ণ স্বাধীন শক্তিরূপে বিকাশ লাভ করে নাই। জাতীয় চরিত্র ও ভাগ্য বিভিন্ন জাতির পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতেই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনও এক জাতির উন্নতি অবনতিতে সমগ্র বিশ্বেরই ভারকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

"তৃতীয়তঃ মানবের জীবনীশক্তি সর্ব্বত্র এবং সকল যুগে একই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া দেখা দেয় নাই। ধর্ম্ম সমাজ রাষ্ট্র সাহিত্য কলা প্রভৃতি সভ্যতার বিচিত্র অঙ্গে মানবজীবনের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও এক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে সমগ্র জাতীয় জীবনই পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া যাইতে পারে।

"ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় এই কয়টি সত্যের প্রয়োগ আবশ্যক। * * * আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথমতঃ ভারতীয় মানবের ইতিহাস এখনও তাহার শেষ অধ্যায় প্রকটিত করে নাই; দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য সমাজের ন্যায় ভারতীয় সমাজও (প্রাচীন ও মধ্যযুগে এবং বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত) সমগ্র বিশ্বের শক্তিপুঞ্জ অস্বীকার করিয়া পৃথিবীর একপ্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে একাকী বিকাশ লাভ করে নাই; তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা যুগে যুগে বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্র ও ভাবসমষ্টির অভ্যন্তরে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছে।"

ইতিহাসের মর্ম্মজ্ঞ ও রসজ্ঞ পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করিলে আনন্দ লাভ করিবেন নিঃসন্দেহ।

রাজপূজা—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। নামেই বিষয়ের পরিচয়, রচনা পদ্যে। সাহিত্যে স্থায়ী হইবে না।

কবিতাগুচ্ছ—

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই আনা। অতি সাধারণ রকমের উপদেশ ও তত্ত্বমূলক পদার্থ ও জীবজন্তু সম্বন্ধীয় শিশুপাঠ্য রচনা।

প্রবন্ধকুসুম—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য চারি আনা। রাজপুত ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্র লইয়া লিখিত। বিশেষত্ব কিছু নাই। ছাপা বিশ্রী।

বর্ণশিক্ষা—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস বহুদর্শী প্রাইভেট টিচার কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য এক আনা। গ্রন্থকার স্বয়ং পুস্তকের সার্টিফিকেট দিয়া মলাটের ললাটে লাঞ্ছনা করিয়াছেন যে ইহা "সুকোমলমতি বালকবালিকাদিগের প্রথম শিক্ষার সুন্দর পুস্তক।" তিনি অপরের মতামতের অপেক্ষা রাখেন নাই। এবং উচ্চশিক্ষার কুবীজ হজমে অক্ষম বাবুভায়ার বিচারের উপর তাঁহার বড় আস্থাও নাই; তিনি বঙ্গের সুগৃহিণী ও চাষাভূষাদিগের আশা ভরসা করেন। তথাস্তু। ইহার দ্বারা তাহাদের বর্ণশিক্ষা হইতে পারিবে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। বর্ণসংযোজনা ও যুক্তাক্ষর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পদপাঠ দেওয়াতে বইখানি শিক্ষার্থীর প্রীতিকর হইবে আশা করা যায়।

গল্প চারিটি—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। ইহাতে রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা, দর্পহরণ ও মাল্যদান নামক গল্পচতুষ্টয় আছে। শেষের গল্প দুটি ১৩০৯ সালের বঙ্গদর্শনে, ও আগের দুটি সম্প্রতি ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রবিবাবুর গল্পের পরিচয় প্রদান, অনাবশ্যক। "রাসমণির ছেলে" গল্পের প্রশংসা অনেক নিন্দুকও করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ১২০ পৃষ্ঠা। মূল্য দশ আনা।

শিশির—

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বসিরহাট। ডঃ ফুলস্ক্যাপ ১৬ অংশিত ৩৮+৷০ পৃষ্ঠা। মূল্য চার আনা। এখানি কবিতা পুস্তক। মলিনা, তাম্রী, অমা, রঞ্জু, রাণী নামক পাঁচটি কল্পিত বালক বালিকার দুঃখকাহিনী কবিত্ব ও সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য ইহা বালক ও বয়স্ক উভয়েরেই উপভোগ্য। প্রকাশক মহাশয় একটি উপাদেয় ভূমিকায় এই গ্রন্থের বিষয় ও বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। আমরা সেই ভূমিকা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের পরিচয় বিশদ করিয়া বুঝাইব। —"শিশুর চক্ষে মৃণ্ময়ী প্রকৃতি চিন্ময়ী, ভাবময়ী জীবন্ত মূর্ত্তি;...প্রকৃতির মধ্যে হৃদয় আছে, তরুলতা ফলফুল নদীনির্ঝর সিন্ধুপর্ব্বত যে সত্যসত্যই মানবের সঙ্গে ভাববিনিময় করে, দুঃখে সান্ত্বনা দান করে এবং সুখে হর্ষ প্রকাশ করে......শিশুদিগের নিকট উহা স্বতঃসিদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য।......সবগুলির নায়ক, বা নায়িকা শিশু এবং সকল কবিতাই বিয়োগান্ত।......শিশুর হৃদয় পরের দুঃখে যখন বিগলিত হয়, তখন তাহার করুণার্দ্র চিত্তে অতি সহজে সদ্ভাবনিচয় মুকুলিত বিকশিত হইতে পারে এবং কালে তাহা সৎকর্ম্মরূপ মহাফলে পরিণত হইতে পারে।......শিশুর হৃদয় জড়ের মধ্যে চৈতন্যের সাক্ষাৎ করে বলিয়া শিশু মৃত্যুকে পার্থিব জীবনের শেষ বলিয়া গ্রহণ করিতে চায় না। বর্ত্তমান পুস্তকে বহুস্থলে এই ভাব অস্ফুটরূপে গৃহীত হইয়াছে। ...হাসিরাশি "রাণী" সমাজচিত্র...অবরোধের কঠিন কারাগারে প্রস্ফুটিত তাহার করুণ মূর্ত্তি বৃদ্ধের চক্ষেও জল আনিবে।" রচনা সরল ও হৃদয়গ্রাহী; ছন্দে লালিত্য ও গতি আছে—কিন্তু স্থানে স্থানে

আধুনিক মাত্রাবৃত্ত রীতি অনুসারে ছন্দ অল্প স্বল্প পঙ্গু হইয়াছে ; এই সামান্য ত্রুটি পরবর্ত্তী সংস্করণে সহজেই নিরাকৃত হইতে পারিবে।

আফগান-আমির-চরিত—

শ্রীআবু নাসের সইদুল্লা প্রণীত। প্রকাশক ইসলামিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, ঘোড়াশাল, ঢাকা। ডিমাই অষ্টাংশিত ৩৬২ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। ইহা আফগান স্থানের পরলোকগত আমির আবদুর রহমান খান মহোদয়ের স্বহস্তলিখিত আত্মজীবনীর অনুবাদ। ইহা হইতে আফগানস্থানের রাষ্ট্রীয় অবস্থা, ইংরেজ সরকারের সহিত সম্পর্ক ও সংঘর্ষ, দেশের রীতি নীতি সভ্যতা, আমির সাহেবের ন্যায়পরায়ণ সদাশয়তা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল এবং প্রায় বিশুদ্ধ বাংলা।

কুসুম-সংগ্রহ—

লেখিকা শ্রীমতী বঙ্গমহিলা। মূল্য ১।০। এখানি হিন্দী পুস্তক। ইহার মধ্যে চার প্রকারের বিষয় আছে—(১) আখ্যায়িকা বা গল্প ; (২) স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধী ; (৩) জাতিবর্ণন (৪) জীবনচরিত। এইসকল বিভাগের অধিকাংশ রচনাই রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ বাঙালী লেখকের রচনার অনুবাদ ; এবং কয়েকটি রচনা লেখিকার স্বরচিত। বাঙালী-মহিলা হিন্দী ভাষায় প্রবন্ধ ও গল্প অনুবাদ ও রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ইহা অতীব আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। লেখিকা হিন্দী সাময়িক পত্রিকার সমাদৃত প্রবন্ধরচয়িত্রী ; এবং সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এই গ্রন্থ ভারতেন্দু-স্মারক গ্রন্থমালিকার অন্তর্গত হইয়া প্রকাশ হওয়াতে।

মুদ্রা-রাক্ষস।

নব বর্ষে

(নোগুচি)

সংসারে হেরি নূতন মাধুরী,
　কালিকে ছিলনা এ তো !
নূতন বরষে নূতন হরষ !
　'শিন্নেন্ ওমেদেতো' !

প্রাচীন ধরার জীবনে আবার
　এসেছে শুভক্ষণ,
শুভ সময়ের শুভ্র সোপানে
　আজিকে পদার্পণ।

শ্বেত-শতদল-তীর্থে যাইতে
　মিলেছে নূতন 'সেথো',
নব বৎসর ! উৎসব নব !
　'শিন্নেন্ ওমেদেতো' !

কিরণ-সোপানে চরণ রাখিয়া
　উর্দ্ধে উঠিব সবে,
সূর্য্যের সাথে হ'য়ে মুখোমুখি
　দাঁড়াতে মোদের হবে।

অন্যায়ে আজি হাস্যের তোড়ে
　করিব বিসর্জ্জন,
তাজা এ হাওয়ায় শিস্ দিয়ে শুধু
　ফিরিব অনুক্ষণ !

এবার মোদের যাত্রার পথে
　হাসি আর আলো সাথী ;
জয় জয় জয় নূতন সূর্য্য !
　জয় সূর্য্যের ভাতি !

জাগে নব শোভা নবীন শকতি
　বিধির অভিপ্রেত
নূতন বরষে নূতন হরষ
　'শিন্নেন্ ওমেদেতো !'

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

রহস্য-চিত্র



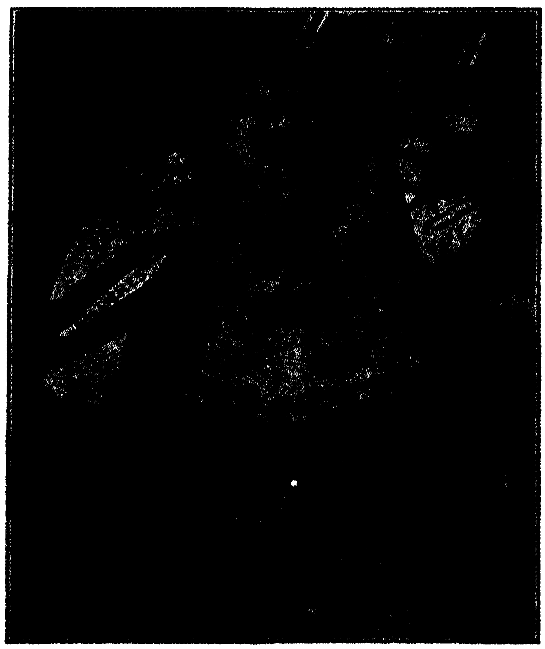
যীশু পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিতেছেন যে খৃষ্টীয় জগৎ কামান ও অন্যান্য যুদ্ধের সরঞ্জামে পূর্ণ।



রুস্-ভল্লুক ও ব্রিটিশ-সিংহের নিকট পারস্য-মার্জ্জার অভয় চাহিতেছে।

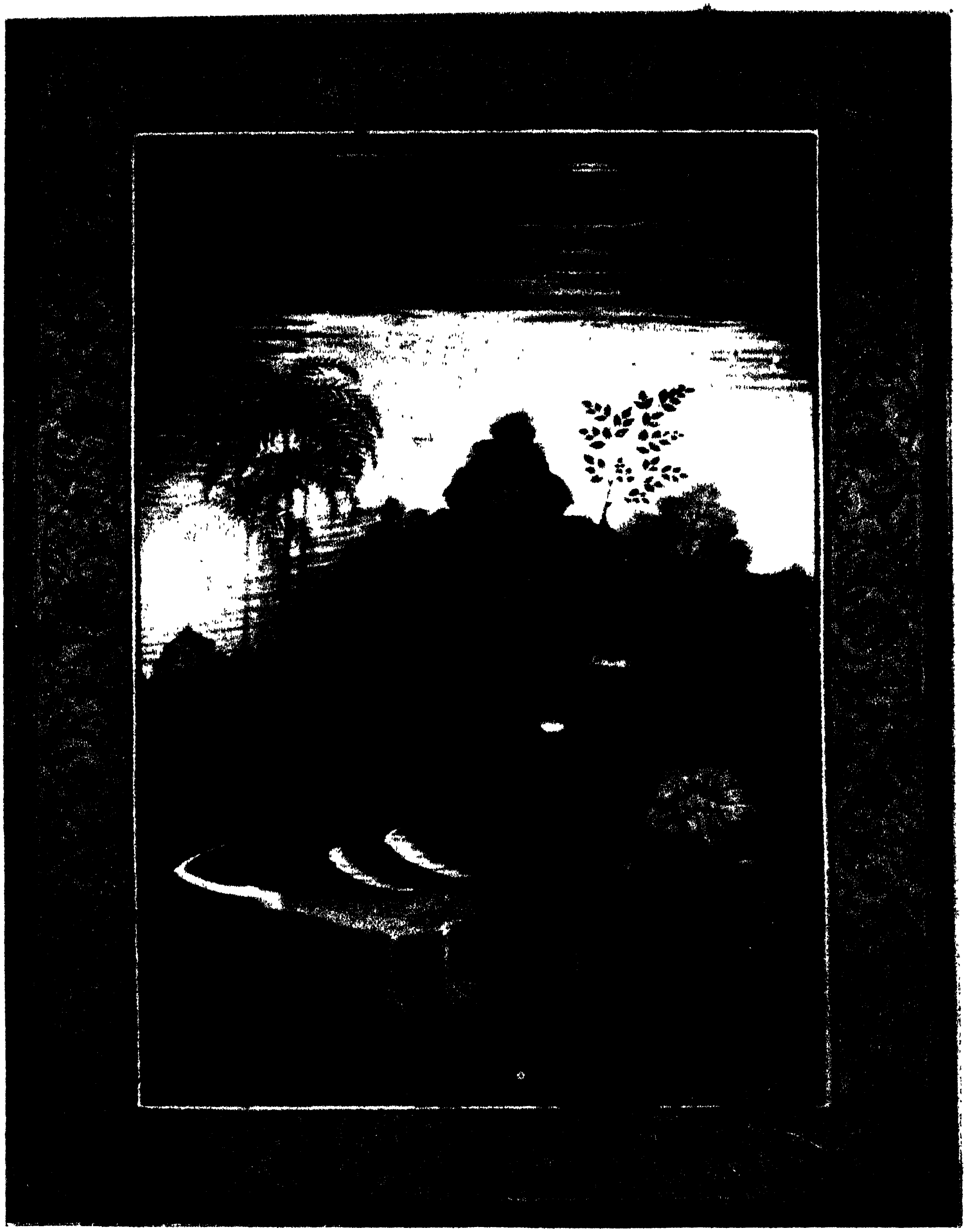


শান্তিদেবী ইংলণ্ড ও জার্ম্মেনীকে বন্ধুত্ব করিতে বলিতেছেন।



ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তপ্রদেশসমূহ, এবং চীন, এই তিন সাধারণতন্ত্রের সভাপতিত্রয়ের নৃত্য ও গীত।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



সরোবরতীরে হংস।

(একখানি প্রাচীন চিত্র হইতে)

Four colour blocks by U. Ray and Son *Kuntaline Press, Calcutta*

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯

২য় সংখ্যা

জীবনস্মৃতি

প্রভাত-সঙ্গীত।

গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যা-সঙ্গীত ছাড়া কিছু কিছু গদ্যও লিখিতাম। সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে—সেও এক-রকম যা-খুসি-তাই লেখা। ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এও সেই রকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোট ছোট স্বল্পায়ু রঙীন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম—মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কি লিখিব সে খেয়াল ছিলনা কিন্তু আমি লিখিব এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা। এই ছোট ছোট গদ্য লেখাগুলা এক সময়ে বিবিধ প্রসঙ্গ নামে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে—প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।

বোধ করি এই সময়েই বৌঠাকুরাণীর হাট নামে এক বড় নবেল লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম।

এইরূপে গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়া গেলে জ্যোতিদাদা কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গি জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এখানেও একটু একটু করিয়া বৌঠাকুরাণীর হাট ও একটি একটি করিয়া সন্ধ্যা-সঙ্গীত লিখিতেছি এমন সময়ে আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কি উলট্‌পালট্ হইয়া গেল।

একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্য্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্য্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল একি সায়াহ্নের আলোকসম্পাতের একটা জাদুমাত্র? কখনই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে—আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা-কিছুকেই দেখিতে-শুনিতে ছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছিলাম। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছে বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে স্বরূপ কখনই তুচ্ছ নহে—তাহা আনন্দময় সুন্দর। তাহার পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া জগৎকে দর্শকের মত দেখিতে চেষ্টা করিতাম, তখন মনটা খুসি হইয়া

উঠিত। আমার মনে আছে, জগৎটাকে কেমন করিয়া দেখিলে যে ঠিকমত দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে নিজের ভার লাঘব হয় সেই কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হই নাই তাহা জানি। এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম তাহা আজ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

সদরষ্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্য্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত; আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল, আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। সেইদিনই কিম্বা তাহার পরের দিন একটা ঘটনা ঘটিল তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। একটি লোক ছিল সে মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, আচ্ছা মশায় আপনি কি ঈশ্বরকে কখনো স্বচক্ষে দেখিয়াছেন? আমাকে স্বীকার করিতেই হইত দেখি নাই—তখন সে বলিত, আমি দেখিয়াছি। যদি জিজ্ঞাসা করিতাম, কিরূপ দেখিয়াছ? সে উত্তর করিত, চোখের সম্মুখে বিজ্ বিজ্ করিতে থাকেন। এরূপ মানুষের সঙ্গে তত্ত্বালোচনায় কালযাপন সকল সময়ে প্রীতিকর হইতে পারে না। বিশেষতঃ তখন আমি প্রায় লেখার ঝোঁকে থাকিতাম। কিন্তু লোকটা ভালমানুষ ছিল বলিয়া তাহাকে ব্যথা দিতে পারিতাম না, সমস্ত সহিয়া যাইতাম।

এইবার, মধ্য[illegible]ল সেই লোকটি যখন আসিল তখন আমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, এস, এস। সে যে নির্ব্বোধ এবং অদ্ভুত রকমের ব্যক্তি, তাহার সেই বহিরাবরণটি যেন খুলিয়া গেছে। আমি যাহাকে দেখিয়া খুসি হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম—সে তাহার ভিতরকার লোক—আমার সঙ্গে তাহার অনৈক্য নাই, আত্মীয়তা আছে। যখন তাহাকে দেখিয়া আমার কোনো পীড়া বোধ হইল না, মনে হইল না যে, আমার সময় নষ্ট হইবে—তখন আমার ভারি আনন্দ হইল—বোধ হইল এই আমার মিথ্যা জাল কাটিয়া গেল, এতদিন এই সম্বন্ধে নিজেকে বারবার যে কষ্ট দিয়াছি তাহা অলীক এবং অনাবশ্যক।

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গী, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিলসমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আরেক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরণা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।

সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহা সৌন্দর্য্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে,

শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর-একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম :—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,—

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

কিছুকাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা ছিল। এমন সময়ে জ্যোতিদাদারা স্থির করিলেন তাঁহারা দার্জ্জিলিঙে যাইবেন। আমি ভাবিলাম এ আমার হইল ভাল—সদরষ্ট্রীটের সহরে ভিড়ের মধ্যে যাহা দেখিলাম—হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাহাই আরো ভালো করিয়া গভীর করিয়া দেখিতে পাইব। অন্তত এই দৃষ্টিতে হিমালয় আপনাকে কেমন করিয়া প্রকাশ করে তাহা জানা যাইবে।

কিন্তু সদরষ্ট্রীটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপরে চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি আর সেই দৃষ্টি নাই। বাহির হইতে আসল জিনিষ কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধকরি আমার অপরাধ হইয়াছিল। নগাধিরাজ যত বড়ই অভ্রভেদী হোন না তিনি কিছুই হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না অথচ যিনি দেনে-ওয়ালা তিনি গলির মধ্যেই এক মুহূর্ত্তে বিশ্ব-সংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন।

আমি দেবদারুবনে ঘুরিলাম, ঝরণার ধারে বসিলাম, তাহার জলে স্নান করিলাম, কাঞ্চনশৃঙ্গার মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলাম—কিন্তু যেখানে পাওয়া সুসাধ্য মনে করিয়াছিলাম সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। পরিচয় পাইয়াছি কিন্তু আর দেখা পাই না। রত্ন দেখিতেছিলাম, হঠাৎ তাহা বন্ধ হইয়া এখন কৌটা দেখিতেছি। কিন্তু কৌটার উপরকার কারুকার্য্য যতই থাক্ তাহাকে আর কেবল শূন্য কৌটামাত্র বলিয়া ভ্রম করিবার আশঙ্কা রহিল না।

প্রভাত সঙ্গীতের গান থামিয়া গেল শুধু তার দূর প্রতিধ্বনি স্বরূপ "প্রতিধ্বনি" নামে একটি কবিতা দার্জ্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম। সেটা এমনি একটা অবোধ্য ব্যাপার হইয়াছিল যে একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থ নির্ণয় করিবার ভার লইয়াছিল। হতাশ হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন আমার কাছ হইতে গোপনে অর্থ বুঝিয়া লইবার জন্য আসিয়াছিল। আমার সহায়তায় সে বেচারা যে বাজি জিতিতে পারিয়াছিল এমন আমার বোধ হয় না। ইহার মধ্যে সুখের বিষয় এই যে, দুজনের কাহাকেও হারের টাকা দিতে হইল না। হায়রে, যে দিন পদ্মের উপরে এবং বর্ষার সরোবরের উপরে কবিতা লিখিয়াছিলাম সেই অত্যন্ত পরিষ্কার রচনার দিন কতদূরে চলিয়া গিয়াছে!

কিছু একটা বুঝাইবার জন্য কেহত কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এই জন্য কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে বুঝিলাম না তখন বিষম মুস্কিলে পড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া বলে কিছু বুঝিলাম না তাহাকে এই কথা বলিতে হয় ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ। উত্তর শুনি, সে ত জানি, কিন্তু খামকা গন্ধই বা কেন, ইহার মানেটা কি? হয়, ইহার জবাব বন্ধ করিতে হয় নয়, খুব একটু ঘোরালো করিয়া বলিতে হয় প্রকৃতির ভিতরকার আনন্দ এমনি করিয়া গন্ধ হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু মুস্কিল এই যে, মানুষকে যে কথা দিয়া কবিতা লিখিতে হয় সে কথার যে মানে আছে। এই জন্যই ত ছন্দবন্ধ প্রভৃতি নানা উপায়ে কথা কহিবার স্বাভাবিক পদ্ধতি উলট্‌পালট্ করিয়া দিয়া কবিকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, যাহাতে কথার ভাবটা বড় হইয়া কথার অর্থটাকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবটা তত্ত্বও নহে বিজ্ঞানও নহে, কোনো প্রকারের কাজের জিনিষ নহে, তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মত অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে—তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান কিম্বা আর কোনো বুদ্ধিসাধ্য জিনিষ মিলাইয়া দিতে পার ত দাও কিন্তু সেটা গৌণ। খেয়া নৌকায় পার হইবার সময় যদি

মাছ ধরিয়া লইতে পার ত সে তোমার বাহাদুরি কিন্তু তাই বলিয়া খেয়ানৌকা জেলে ডিঙি নয় - খেয়া নৌকায় মাছ রপ্তানি হইতেছে না বলিয়া পাটুনিকে গালি দিলে অবিচার করা হয়।

প্রতিধ্বনি কবিতাটা আমার অনেক দিনের লেখা—সেটা কাহারো চোখে পড়ে না সুতরাং তাহার জন্য কাহারো কাছে আজ আমাকে জবাবদিহি করিতে হয় না। সেটা ভালমন্দ যেমনি হোক্ এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি ইচ্ছা করিয়া পাঠকদের ধাঁধা লাগাইবার জন্য সে কবিতাটা লেখা হয় নাই এবং কোনো গভীর তত্ত্বকথা ফাঁকি দিয়া কবিতায় বলিয়া লইবার প্রয়াসও তাহা নহে।

আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি এবং কহিয়াছে—

ওগো প্রতিধ্বনি
বুঝি আমি তোরে ভালবাসি
বুঝি আর কারেও বাসি না।

বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি জাগিতেছে, প্রিয়মুখ হইতে বিশ্বের সমুদয় সুন্দরসামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া যাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। কোনো বস্তুকে নয় কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালবাসি কেন না ইহা যে দেখা গেছে একদিন যাহার দিকে তাকাই নাই আর একদিন সেই একই বস্তু আমাদের সমস্ত মন ভুলাইয়াছে।

এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি এই জন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অনন্তের কোন্ একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে —এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্য্যে ব্যাকুল করে। গুণী যখন পূর্ণ হৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন সেই এক আনন্দ; আবার যখন সেই গানের ধারা তাঁহারই হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তখন সে এক দ্বিগুণতর আনন্দ। বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটেকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে আমরা জগতের পরম পরিণামটিকে যেন অনির্ব্বচনীয় রূপে জানিতে পারি। যেখানে আমাদের সেই উপলব্ধি সেইখানেই আমাদের প্রীতি; সেখানে আমাদের মনও সেই অসীমের অভিমুখীন আনন্দস্রোতের টানে উতলা হইয়া সেই দিকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চায়। সৌন্দর্য্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য্য। যে সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দ্দিষ্ট, তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য্য তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘরছাড়া করিয়া দেয়। "প্রতিধ্বনি" কবিতার মধ্যে আমার মনের এই অনুভূতিই রূপকে ও গানে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে চেষ্টার ফলটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এমন আশা করা যায় না, কারণ চেষ্টাটাই আপনাকে আপনি স্পষ্ট করিয়া জানিত না।

আরো কিছু অধিক বয়সে প্রভাত-সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা পত্র লিখিয়াছিলাম, সেটার এক অংশ এখানে উদ্ধৃত করি।—

"'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্ব্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায় যেমন নবোদ্গত-দন্ত শিশু মনে করচেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে পূরে দিতে পারেন।

"ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায় মনটা যথার্থ কি চায় এবং কি চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সঙ্কীর্ণ সীমা অবলম্বন করে জ্বল্‌তে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বস্‌লে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোনো কিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়। প্রভাত-সঙ্গীত আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেই জন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচ বিচার নাই।"—

প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা সাধারণ ভাবের ব্যাপ্ত আনন্দ ক্রমে আমাদিগকে বিশেষ পরিচয়ের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়—বিলের জল ক্রমে যেন নদী হইয়া বাহির হইতে চায়—তখন পূর্ব্বরাগ অনুরাগে পরিণত হয়। বস্তুত অনুরাগ পূর্ব্বরাগের অপেক্ষা এক হিসাবে সঙ্কীর্ণ। তাহা এক গ্রাসে সমস্তটা না লইয়া ক্রমে ক্রমে খণ্ডে খণ্ডে চাখিয়া লইতে থাকে। প্রেম তখন একাগ্র হইয়া অংশের মধ্যেই সমগ্রকে, সীমার মধ্যেই অসীমকে উপভোগ করিতে পারে। তখন তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষ বিশেষের মধ্য দিয়াই অপ্রত্যক্ষ অশেষের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন সে যাহা পায় তাহা কেবল নিজের মনের একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাবানন্দ নহে—বাহিরের সহিত প্রত্যক্ষের সহিত একান্ত মিলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের ভাবটি সর্ব্বাঙ্গীন সত্য হইয়া উঠে।

মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাত-সঙ্গীতের কবিতাগুলিকে "নিষ্ক্রমণ" নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্ত্তা। তার পরে সুখদুঃখআলোকঅন্ধকারে সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে একে খণ্ডে খণ্ডে নানা সুরে ও নানা ছন্দে বিচিত্র ভাবে বিশ্বের মিলন ঘটিয়াছে—অবশেষে এই বহুবিচিত্রের নানা বাঁধানো ঘাটের ভিতর দিয়া পরিচয়ের ধারা বহিয়া চলিতে চলিতে নিশ্চয়ই আর একদিন আবার একবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া পৌঁছিবে, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি অনির্দ্দিষ্ট আভাসের ব্যাপ্তি নহে তাহা পরিপূর্ণ সত্যের পরিব্যাপ্তি।

আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। নর্ম্মাল ইস্কুল হইতে চারিটার পর ফিরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম ঘন সজল নীলমেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে—মনটা তখনি এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে আবৃত হইয়া গেল—সেই মুহূর্ত্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মত ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তেরোনদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্ত্তন সুরু হইল—চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুগ্ন হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম সন্ধ্যা-সঙ্গীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধদ্বার জানিনা কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন, যাহাকে হারাইয়াছিলাম, তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম। সহজকে দুরূহ করিয়া তুলিয়া যখন পাওয়া যায় তখনি পাওয়া সার্থক হয়। এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাত-সঙ্গীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্ম্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল। শেষ হইয়া গেল বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এই পালাটাই আবার আরো একটু বিচিত্র হইয়া সুরু হইয়া আবার আরো

একটা দুরূহতর সমস্যার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণামে পৌঁছিতে চাহিবে। বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে—পর্ব্বে পর্ব্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে—প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় কেন্দ্রটা একই।

যখন সন্ধ্যা-সঙ্গীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য "বিবিধ প্রসঙ্গ" নামে বাহির হইতেছিল। আর প্রভাত-সঙ্গীত যখন লিখিতেছিলাম কিম্বা তাহার কিছু পর হইতে ঐরূপ গদ্য লেখাগুলি আলোচনা নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

এই সময়ে, বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্ব্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সঙ্কল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকেই এই সভার সভাপতি করা হইয়াছিল। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন—আমি পরামর্শ দিতেছি আমাদের মত লোককে পরিত্যাগ কর—"হোমরা-চোমরা"দের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারো সঙ্গে কাহারো মতে মিলিবে না। এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না। বঙ্কিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।

বলিতে গেলে যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খস্‌ড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে প্রচলিত উচ্চারণঅনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্পও আমাদের ছিল।

বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল—হোমরা-চোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।

কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।

এপর্য্যন্ত বাংলা দেশের অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারো নহে।

মাণিকতলার বাগানে যেখানে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস ছিল সেখানে আমি যখনতখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে যাইতাম—দেখিতাম তিনি লেখা-পড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্পবয়সের অবিবেচনা-বশতই অসঙ্কোচে আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম। কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে মুহূর্ত্তকালও অপ্রসন্ন দেখি নাই। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন তিনি কানে কম শুনিতেন। এই জন্য পারৎপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড় প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিষ পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। বোধ করি তখনকার কালের পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন সমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যেসব বই পাঠানো হইত তিনি সেগুলি

পেন্সিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। এক এক দিন সেই রূপ কোন একটা বই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি রাংলা-ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে সম্বন্ধে তিনি ভাল করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহাকিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন। তখন যে বাংলা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত তবে বর্ত্তমান সাহিত্যপরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তিদ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।

কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে। তাঁহার মূর্ত্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার মত অর্ব্বাচীনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া ভারি একটি দাক্ষিণ্যের সহিত আমার সঙ্গেও বড় বড় বিষয়ে আলাপ করিতেন— অথচ তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। এমন কি, আমি তাঁহার কাছ হইতে "যমের কুকুর" নামে একটি প্রবন্ধ আদায় করিয়া ভারতীতে ছাপাইতে পারিয়াছিলাম; তখনকার কালের আর কোনো যশস্বী লেখকের প্রতি এমন করিয়া উৎপাত করিতে সাহসও করি নাই এবং এতটা প্রশ্রয় পাইবার আশাও করিতে পারিতাম না। অথচ যোদ্ধৃবেশে তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি বিপৎজনক ছিল। ম্যুনিসিপাল সভায় সেনেটসভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্য্যবান। বড় বড় মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙ্‌মুখ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না। এসিয়াটিক সোসাইটি সভার গ্রন্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার মনে আছে এই উপলক্ষ্যে তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায়, যে, যে ব্যক্তি যন্ত্রমাত্র ক্রমশ তাঁহার মনে হইতে থাকে আমিই বুঝি কৃতী, আর যন্ত্রীটি বুঝি অনাবশ্যক শোভা মাত্র। কলম বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন্ এক দিন সে মনে করিয়া বসিত—লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালী পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বাংলা দেশের এই একজন অসামান্য মনস্বীপুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনো সম্মান লাভ করেন নাই। ইহার একটা কারণ ইহার মৃত্যুর অনতিকালের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু ঘটে—সেই শোকেই রাজেন্দ্রলালের বিয়োগ-বেদনা দেশের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার আর একটা কারণ, বাংলা ভাষায় তাঁহার কীর্ত্তির পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না এই জন্য দেশের সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু

সম্প্রতি কেবল আমি জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুখাসনে বসিয়া শান্তিভোগ করিতেছি এমন সময়ে শুনিলাম "ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু" এই প্রশ্নটির মীমাংসা উপলক্ষে ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদিগের মস্ত একটা সভা বসিয়াছিল। আমার মতে ঐ সোজা কথাটার মীমাংসার জন্য ওরূপ বৃহৎ আড়ম্বরের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। সত্য কথা যদি বলিতে হয় তবে উহা এক প্রকার মশা মারিতে কামান পাতা। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটিকে উপলক্ষ করিয়া ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদিগের মধ্যে যেরূপ কর্ণ-বিভ্রান্তকারী বাদপ্রতিবাদের বাত্যোত্তম মেদিনী কম্পমান করিতেছে—সমস্ত গোল দুই কথায় মিটিয়া গিয়া নিমেষের মধ্যে দুধ-কে-দুধ জল-কে-জল হইতে পারে শুদ্ধ যদি কেবল হিন্দুশব্দের প্রকৃত

অর্থ এবং তাৎপর্য্য কি তাহা একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখা যায়।

পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশে ব্রহ্মাবর্ত্ত ছিল, আর্য্যাবর্ত্ত ছিল, দাক্ষিণাত্য ছিল, কিন্তু, তাহার মধ্যে কোন্ স্থানটা যে হিন্দুস্থান তাহা তখনকার ভারতবাসীরা চক্ষেও দেখে নাই —কর্ণেও শোনে নাই। পূর্ব্বে আমাদের দেশে হিন্দুস্থান বলিয়া যেমন কোনো স্থান ছিল না, তেমনি, হিন্দুজাতি বলিয়া কোনো জাতি ছিল না, তথৈব, হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কোনো ধর্ম্ম ছিল না। যদি ঘণ্টা-ডুঘণ্টা ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমরকোষ অভিধানের পাতা উল্টাইয়া দেখ—দেখিবে যে তাহার কোনো পত্রপৃষ্ঠার কোনো ছত্রে হিন্দু-শব্দের চিহ্নমাত্রও নাই। দেশীয় ভাষার ব্রাহ্মণ গুপ্ত দুর্গ-প্রাচীরে হিন্দুশব্দের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবার কর্ত্তা যে কে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাহার কর্ত্তা আর কেউ না—মুসলমান তলোয়ার! অতএব হিন্দুশব্দের প্রকৃত অর্থ যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় তবে একজন মস্‌জিদের মোল্লা-সাহেবকেই তাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত; তা বই, তাহার অর্থ কোনো টোলের ভট্টাচার্য্যচূড়ামণিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার উত্তর দ্যা'ন অতি চমৎকার! তিনি নস্য লইয়া বলেন "হীনং দূষয়তীতি হিন্দুঃ" হীন জাতিদিগের আচার ব্যবহার যাঁহাদের চক্ষে দূষ্য তাঁহারাই হিন্দু। তাই বলি যে, আগেভাগেই "হিন্দুশব্দের প্রকৃত অর্থ কি" জিজ্ঞাসা না করিয়া সর্ব্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমাদের দেশীয় ভাষার রাষ্ট্র মধ্যে হিন্দুশব্দটার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার কর্ত্তা কে? যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে তিনিই বলিবেন যে, তাহার কর্ত্তা মুসলমান বাহুবল। তা যদি হয়—মুসলমান অধিপতিরাই যদি দেশীয় ভাষার হাটে বাজারে হিন্দুশব্দের ব্যবহার চালাইয়া দিবার কর্ত্তা হ'ন, তবে, এ তো সোজা কথা যে, মুসলমানেরা হিন্দু বলিতে যাহা বোঝে তাহাই হিন্দুশব্দের প্রকৃত অর্থ।

মুসলমানদিগের মধ্যে একটি অনন্য-সাধারণ নূতন কাণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, তাঁহাদের ধর্ম্মবন্ধন জাতীয় বন্ধনকে একেবারেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত। এটা একটা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, পৃথিবীর আর আর সকল স্থানেই যে রকমের জাতিভেদ আছে, মুসলমানদিগের মধ্যে সে রকমের জাতিভেদ মূলেই নাই। মুসলমানদিগের মধ্যে সামাজিক দলাদলি যত কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই ধর্ম্মসম্প্রদায়-ঘটিত; তা বই তাহার কোনটাই দেশ-ঘটিতও নহে, বংশ-ঘটিতও নহে। একদল মুসলমান সিয়া, একদল মুসলমান সুন্নী, একদল মুসলমান ওয়াহাবী,—মুসলমানদিগের মধ্যে এইরূপ সাম্প্রদায়িক দলাদলি যতই থাকুক্ না কেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পৃথিবীস্থ সমস্ত মুসলমান্ জাতি একই জাতি। পারসী, আরবী, মোগল, তুর্কী, এইরূপ নানা দেশের নানা জাতি মুসলমান ধর্ম্মের টানা জালে আটক পড়িয়া গিয়া অর্দ্ধ পৃথিবী-জোড়া একমাত্র অখণ্ড মুসলমান জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মুসলমানদিগের শাস্ত্রমতে স্বধর্ম্মীই স্বজাতি, বিধর্ম্মীই বিজাতি; তা বই, কেবলমাত্র দেশভেদে বা বংশভেদে মুসলমানদিগের জাতিভেদ হয় না। আমাদের দেশের লোকেরা যদি মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হইত, তাহা হইলে দেশ হিসাবে মুসলমানেরা আমাদিগকে হিন্দু বলুক্ আর না বলুক্ জাতি হিসাবে আমাদিগকে হিন্দু বলিত না—মুসলমানই বলিত। মুসলমানেরা যেমন আপনাদের জাতি এবং ধর্ম্ম এই দুই পৃথক্ শ্রেণীর পদার্থকে একসঙ্গে জড়াইয়া আপনাদিগকে বলেন জাতিতেও মুসলমান, ধর্ম্মেও মুসলমান, তেমনি, আমাদের দেশের লোকেরও জাতি এবং ধর্ম্ম একসঙ্গে জড়াইয়া এ দেশীয় জনসাধারণকে মোটের উপরে বলেন জাতিতেও হিন্দু, ধর্ম্মেও হিন্দু; তা বই, হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দুজাতির শাখা প্রশাখা যে কত প্রকার এবং তাহার কোন্ শাখা যে কি প্রকার—এ সকল বিষয়ের খোঁজ খবর লইবার জন্য আকবর-সাহের পূর্ব্বের আমলের মুসলমানদিগের বিশেষ কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। মুসলমান সেনাপতিরা যখন দলবল সমভিব্যাহারে ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের আপনাদের ধর্ম্ম ছাড়া কেবলমাত্র আর তিনটি ধর্ম্মের যথাসম্ভব নিশ্চিত সমাচার অবগত ছিলেন; তাহার মধ্যে একটি ধর্ম্ম—খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, আর একটি ধর্ম্ম ইহুদী ধর্ম্ম, তৃতীয় আর একটি ধর্ম্ম অগ্নি উপাসকদিগের ধর্ম্ম, সংক্ষেপে—পার্সীধর্ম্ম; তা বই, এদেশীয়

লোকের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন না—কেবল তাঁহাদের মনোমধ্যে একটা অন্ধসংস্কারমূলক ধারণা ছিল এইরূপ যে, এদেশীয় লোকেরা প্রতিমাপূজক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা যে তাঁহাদের সেই অজ্ঞতার প্রতিবিধান-মানসে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মের প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন—তাঁহাদের শাস্ত্রে তাহা লেখে না;—তাঁহাদের শাস্ত্রে তাহা আবার লিখিবে! যে একটা বিকটাকার জন্তু তাঁহাদের শাস্ত্রের অস্থিমজ্জায় মিশাইয়া থাকিয়া শিকারের প্রতীক্ষায় দিবারাত্রি হাঁ করিয়া রহিয়াছে—তাহার নাম শুনিলেই জ্ঞানের রক্ত শুখাইয়া যায়! তাহার নাম গোঁড়ামি। মুসলমান দিগ্‌বিজয়ীরা ঐ ভয়ানক জন্তুটার রসদ যোগাইবার জন্য এরূপ কাজে-ব্যস্ত ছিলেন যে, এ দেশের ধর্ম্মবিষয়ক তথ্যের অনুসন্ধান দূরে থাকুক্—মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহারা যে তাঁহাদের তলোয়ার খাপে পূরিবেন, শতেক-দুইশত বৎসরের মধ্যেও তাহার অবকাশ তাঁহাদের হইয়া ওঠে নাই। কাজেই, এ দেশের লোকদিগের মধ্যে যাহারা ধর্ম্ম-হিসাবে মুসলমান ছিল না, খ্রীষ্টান ছিল না, ইহুদী ছিল না, পার্সী ছিল না, অর্থাৎ মুসলমান অধিনায়কদিগের জানাশুনা ধর্ম্মপথের অনুপন্থী ছিল না, সবাইকে তাঁহারা ঘোটের উপরে হিন্দুনামে সংজ্ঞিত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন; তা বই হিন্দুধর্ম্ম যে কিরূপ ধর্ম্ম তাহার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া জানিবার জন্য তাঁহাদের গরজ পড়ে নাই।

এখন কথা হইতেছে এই যে, ভারতীমাতার শুন্য দুগ্ধে হিন্দুশব্দের নাম গন্ধও ছিল না;—মুসলমান ধাত্রীরাই ভারতসন্তানদিগকে মাতৃক্রোড় হইতে টানিয়া লইয়া তাহাদিগকে হিন্দুশব্দটা গিলাইয়া দিয়াছে; আর, সেই জন্য মুসলমানেরা হিন্দু বলিতে যাহা বোঝে—হিন্দুশব্দের সেই অর্থটাই এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশে নিরবচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে এবং এখনো পর্য্যন্ত চলিতেছে। কাজেই—হিন্দুশব্দের মুসলমানী অর্থটাই হিন্দুশব্দের প্রকৃত অর্থ। সেই প্রকৃত অর্থটির প্রতি মূলেই দৃক্‌পাত না করিয়া মায়ামৃগের ন্যায় একটা মনঃকল্পিত মায়া-হিন্দু সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহার প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করিলে করা হয় আর কিছু না—মিছামিছি কেবল বাতাসের উপরে বলক্ষয়। যদি তর্কচ্ছলে মনে করা যায় যে, একজন লর্ড পদবীস্থ ইংরাজ নৈকষ্যশ্রেণীর নর্ম্মান্, অর্থাৎ যদি এরূপ মনে করা যায় যে, প্রথম উইলিয়মের আমল হইতে নর্ম্মান ঔরষ এবং নর্ম্মান্ রক্ত বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়া অবশেষে তাঁহার শরীরে চরম গতি লাভ করিয়াছে, সুতরাং অ্যাঙ্গলো স্যাক্‌সন রক্ত, সংক্ষেপে—ইঙ্গলিষ্ রক্ত, কোনো পুরুষেই তাঁহার শিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পথ পায় নাই, আর, তাঁহার সেই অনন্য-সাধারণ মহাকৌলিন্যের জোরে তিনি যদি তাঁহার প্রাসাদের দ্বারদেশে এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন লট্‌কাইয়া দ্যান্ যে, গৃহস্বামী ইঙ্গ্‌লিষ্‌ম্যান নহে, তাহা হইলে তাঁহার দেশস্থ ব্যক্তিরা তাঁহার সে কথা একটা পাগলের কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ছাড়া সে কথাটির সহিত সত্যের যে, কোনো প্রকার সম্পর্ক আছে, তাহা কখনই স্বীকার করিবেন না। কেননা ইংলণ্ডের মধ্যমাব্দীয় (mediæval) এড্‌ওয়ার্ড রাজাদিগের পূর্ব্বের আমলের অভিধান মতে তাঁহার কথা সত্য হইলেও, বর্ত্তমান কালের প্রচলিত অভিধান মতে তাঁহার কথা মূলেই সত্য নহে। তার সাক্ষী—বর্ত্তমান কালের ইংরাজি শাস্ত্রমতে ডিস্‌রাএলি, রথ্‌স্‌চাইল্‌ড্, প্রভৃতি বনিয়াদি ইহুদীবংশীয় ইংলণ্ডবাসীরাও ইঙ্গ্‌লিষ্‌ম্যান। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি, হিন্দুশব্দের সর্ব্ববাদিসম্মত প্রচলিত অর্থের বিরুদ্ধে তাহার একটা নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া আমরা যদি আমাদের সেই ঘরগড়া অর্থে বলি যে, "আমরা হিন্দু নহি" তবে আমাদের সে কথা মিথ্যা কথারই আর এক নাম হইয়া দাঁড়াইবে। প্রকৃত কথা এই যে, স্বদেশীয় ভাষার প্রচলিত শব্দার্থের পরিবর্ত্তে নূতন শব্দার্থ সৃষ্টি করিবার অধিকার যেমন কোনো দেশের কোনো ব্যক্তিরই নাই, তেমনি, কেবলমাত্র গায়ের জোরে এ দেশীয় ভাষার একটিও কোনো শব্দের প্রচলিত অর্থ উল্টাইয়া দিয়া সে শব্দটি নূতন অর্থে ব্যবহার করিবার অধিকার এ দেশেরও কোন ব্যক্তিরই নাই। তা'র সাক্ষী—ঘট শব্দকে কলস-অর্থে ব্যবহার করিবার অধিকার, কিম্বা গাধা শব্দকে ঘোড়া-অর্থে ব্যবহার করিবার অধিকার, এ দেশের মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশেরও নাই। যদি কোনো শান্তিপুরের লোক

কোনো বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান উপলক্ষে বিচারালয়ে আহূত হইয়া বিচারপতির সম্মুখে হলপ্ করিয়া বলে যে, "আমি কোনো পুরুষেই শান্তিপুরবাসী নহি"; আর, তাহা শুনিয়া বিপক্ষের ব্যারিষ্টার যদি তাহার প্রতি চক্ষু রাঙাইয়া বলেন যে, "তোমার পাড়া প্রতিবাসীরা এইমাত্র বলিল যে, তোমার পিতা শান্তিপুরবাসী, তোমার পিতামহ শান্তিপুরবাসী, আর, তুমি জন্মেও শান্তিপুর হইতে একপদও কোথাও নড়ো না; এরূপ স্থলে, তুমি এই প্রকট দিবালোকে সভার মাঝখানে কোন্ লজ্জায় বলিতেছ যে, 'আমি শান্তিপুরবাসী নহি'?" ইহার উত্তরে যদি শান্তিপুরের লোকটি বলে যে, "আমি যেস্থানে বাস করি তাহা যে, কিরূপ বিদ্‌ঘুটে স্থান তাহা আর কি বলিব! তাহার ত্রিসীমার মধ্যে শান্তির নামগন্ধও নাই! তাহা বিভ্রান্তির আলয়! আমার চারিদিকের দেশ-সুদ্ধ লোকেরা কেহ বা অন্নচিন্তায় বিভ্রান্ত, কেহ বা অর্থচিন্তায় বিভ্রান্ত, কেহ বা মাম্‌লা মোকদ্দমায় বিভ্রান্ত। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও যে-লোক তাহাকে বলে শান্তিপুর, সেই লোকই মিথ্যাসাক্ষ্যের অপরাধে রাজবিচারে দণ্ডনীয়। আমি যাহা সত্য বলিয়া জানি তাহাই বলি। আমি আমার বাসস্থানকে শান্তিপুর না বলিয়া ভ্রান্তিপুর বলি। এখনও আমি এই প্রকট দিবালোকে সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, আমার বাসস্থান কোনো হিসাবেই শান্তিপুর নহে, সুতরাং আমি শান্তিপুরবাসী নহি।" বিচারপতি শুনিয়া অবাক্! খুব সম্ভব যে, দয়াময় বিচারপতি লোকটিকে অন্য কোনো গারদে না দিয়া বহরমপুরের বা আলিপুরের গারদ-বিশেষের রক্ষকের হস্তে সমর্পন করিতে আদেশ প্রদান করিবেন! এ যেমন দেখা গেল, তেমনি—হিন্দুশব্দের প্রচলিত অর্থ অনুসারে আমি যখন সত্য সত্যই হিন্দু, তখন, আমার নিজের অভিধান-মতে আমি যদি বলি যে "আমি হিন্দু নহি," তবে আমার সে কথা একটা পাগলের কথা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। বর্ত্তমান স্থলে বেশী তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই—সহজ বুদ্ধিতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, এটা যখন স্থির যে, ইস্কুল-শব্দ যেমন ইংরাজি শব্দ—হিন্দুশব্দ তেমনি মুসলমানী শব্দ; আর এটাও যখন কাহারো অবিদিত নাই যে, ঐ মুসলমানী শব্দের মুসল্‌মানী অর্থটাই মুসলমানদের আমল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশে অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তখন সেই অর্থটি ছাড়া অন্য কোনো অর্থে হিন্দুশব্দের ব্যবহার আজিকের কালের লেখাপড়া-জানা লোকের পক্ষে নিতান্তই একটা বিসদৃশ ব্যাপার ইহা বলা বাহুল্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, সে অর্থটা কি? সে অর্থটা যে, কি, তাহার কতকমতক আভাস যদিচ আমি ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করি নাই, তথাপি তাহার স্বরূপ বৃত্তান্তটি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা আবশ্যক বিবেচনায় তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে; অতএব প্রণিধান করা হো'ক্:—

সাঁওতাল, ভীল, কোল, খাসিয়া, কুকী প্রভৃতি বন্য জাতিরা, এমন কি—কতক পরিমাণে মগেরাও, ভারতবাসী হইয়াও ভারতবাসী নহে; কেননা উহাদের বাসস্থান লোকালয় ছাড়াইয়া অনেক দূরে;—দুর্গম অরণ্যে, জনশূন্য প্রান্তরে, দুরারোহ পর্ব্বত অঞ্চলে, অথবা, বর্ম্মা এবং ভারতের মাঝামাঝি অর্দ্ধবন্য সীমান্ত-প্রদেশে। এই জন্য শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নির্ব্বাচন-কালে, আঁচিল, আব্, প্রভৃতি বাজে উপসর্গগুলা যেমন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে, তেমনি, ভারতবাসীদিগের ধর্ম্মঘটিত, জাতিঘটিত, ভাষাঘটিত, বা, আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতি-ঘটিত কোনো প্রকার ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের আলোচনাকালে উল্লিখিত বন্যজাতিরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। এইরূপ বিবেচনায় যদি ঐসকল বন্যজাতিকে গণনার মধ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যায়, তবে হিন্দুশব্দের প্রকৃত অর্থ যাহা মুসলমানদিগের আমল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশে নিরুপদ্রবে চলিয়া আসিতেছে তাহা কার্য্যতঃ (অর্থাৎ practically) ঘটিয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ:—যাহারা দেশ-হিসাবে এ দেশী এবং ধর্ম্ম হিসাবে মুসলমানও নহে, খ্রীষ্টানও নহে, ইহুদীও নহে, পার্সীও নহে, (অর্থাৎ মুসলমানদিগের পরিচিত-পূর্ব্ব কোনো প্রকার ধর্ম্মে দীক্ষিত নহে), সকলেই তাহারা মোটের উপরে হিন্দুনামে অভিধেয়।

এস্থলে আরেকটি কথা বিবেচ্য এই যে, ইংরাজেরা

যেমন জাতিতে ইংরাজ—ধর্ম্মে খ্রীষ্টান, মুসলমানেরা সেরূপ ধর্ম্মে একশ্রেণীভুক্ত এবং জাতিতে আর এক শ্রেণীভুক্ত নহে; মুসলমানেরা ধর্ম্মেও মুসলমান জাতিতেও মুসলমান। যাহার চক্ষু হলুদবর্ণ, তাহার চক্ষে সবই হলুদবর্ণ; যাহার মুখ তিক্ত, তাহার মুখে সবই তিক্ত;—অতএব মুসলমানেরা আপনারা যেমন জাতিতেও মুসলমান, ধর্ম্মেও মুসলমান, তেমনি, তাঁহাদের চক্ষে এ দেশের লোকেরাও জাতিতেও হিন্দু এবং ধর্ম্মেও হিন্দু হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। এখানে দুইটি বিষয় দ্রষ্টব্য :—

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, এ দেশের মধ্যে প্রচলিত যে কোনো ধর্ম্ম হউক্ না কেন - তা' সে শাক্তধর্ম্মই হো'ক, বৈষ্ণবধর্ম্মই হো'ক, আর ব্রাহ্মধর্ম্মই হোক্—সে ধর্ম্ম যদি মুসলমান খ্রীষ্টান ইহুদী এবং পার্সী এই চারিটি মুসলমান-জানিত ধর্ম্মের কোনোটিই না হয়, তবে মুসলমানদিগের শাস্ত্রে তাহারই নাম হিন্দুধর্ম্ম।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, আমাদের দেশের লোকদিগের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি ঐরূপ না-মুসলমান না-খ্রীষ্টান না-ইহুদী না-পার্সী-শ্রেণীর কোনো প্রকার ধর্ম্মে দীক্ষিত—মুসলমানদিগের শাস্ত্রে তিনি ধর্ম্মেও হিন্দু, জাতিতেও হিন্দু।

তবেই হইতেছে যে, হিন্দুশব্দটা কেবল দেশহিসাবেই ভাববাচক (অর্থাৎ conveying a positive meaning); তা বই, ধর্ম্ম-বা-জাতি হিসাবে তাহা অভাব বাচক (অর্থাৎ conveying a negative meaning)। তা'র সাক্ষী—এ দেশের লোকদিগকে যদি তাঁহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী ধর্ম্মের প্রকৃত কথাটির সমাচার জিজ্ঞাসা করা যায় তবে শাক্তেরা বলিবেন যে, শক্তির উপাসনাই শাক্তধর্ম্মের সার কথা, বৈষ্ণবেরা বলিবেন যে, বৃন্দাবনবিহারী রাধাকৃষ্ণের উপাসনাই বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথা, জৈনেরা বলিবেন যে, অহিংসাই জৈনধর্ম্মের সার কথা, ব্রাহ্মেরা বলিবেন যে, ঈশ্বরোপাসনাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সার কথা;—ইহাদের এইসকল কথাগুলি ভাববাচক তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, যদি কোনো নব্য হিন্দুধর্ম্মীকে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত কথাটির সমাচার জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে তিনি বলিতে পারিবেন না যে, বেদবিহিত ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম কেন না তন্ত্রোক্তধর্ম্ম নিতান্তই অবৈদিক; বলিতে পারিবেন না যে, তান্ত্রিকধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম যে হেতু তান্ত্রিকধর্ম্ম নিতান্তই অবৈদিক; বলিতে পারিবেন না যে, পৌরাণিকধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম, কেন না পৌরাণিকধর্ম্মে এমন অনেক কথা আছে যাহা বেদবিরুদ্ধ—যেমন উমা (যিনি ব্রহ্মবিদ্যার আরেক নাম) তিনি সিংহবাহিনী দশভুজা; বিষ্ণু ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ হইয়া জন্মিয়াছিলেন; এই সকল অবৈদিক কথা। বলিতে পারিবেন না যে, তান্ত্রিকধর্ম্মই বলো, পৌরাণিকধর্ম্মই বলো, আর বৈদিকধর্ম্মই বলো, সবই হিন্দুধর্ম্ম; কেন না ও তিন ধর্ম্ম যে, পরস্পর বিরোধী ইহা কাহারো অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহার ন্যায় স্পষ্ট আর কি হইতে পারে যে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে হিন্দুশব্দ নিতান্তই অভাব বাচক।

এখন ইহা কাহারো বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের উত্থাপিত প্রশ্নটি এক মুহূর্ত্তে মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবার মতো কষ্টিপাথর যদি কোনো থাকে, তবে তাহা হিন্দুশব্দের উপরি-উক্ত প্রকৃত অর্থটি। ঐ প্রকৃত অর্থটি—কোন্ জাতি হিন্দু, কোন্ জাতি হিন্দু নহে, এটারও যেমন; আর, কোন্ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম এবং কোন্ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নহে, এটারও তেমনি;—দুয়েরই কষ্টিপাথর। ঐ কষ্টিপাথরটিকে যদি কাজে খাটাইয়া উহার গুণাগুণ স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই—এখনি আমি তোমাকে তাহা দেখাইতেছি; অতএব চক্ষু মেলিয়া দেখ :—

☞ [কষ্টিপাথরের দুই পৃষ্ঠের দুই নাম; এক পৃষ্ঠের নাম ভাব-পৃষ্ঠ, আরেক পৃষ্ঠের নাম অভাব-পৃষ্ঠ। দুই পৃষ্ঠের নিকষ-রেখাই পরীক্ষিতব্য।]

(১) ভাবপৃষ্ঠের নিকষাঙ্ক।

বৈষ্ণব, শাক্ত, ব্রাহ্ম, শিখ, জৈন, সবাই এদেশী।

(২) অভাবপৃষ্ঠের নিকষাঙ্ক।

ধর্ম্মবিষয়ে, বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের লোকেরা না-মুসলমান, না-খ্রীষ্টান, না-ইহুদী, না-পার্সী।

(৩) অতএব

বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের লোকেরা জাতিতেও হিন্দু, ধর্ম্মেও হিন্দু।

প্রশ্নোত্তর।

নবকিশোর শাস্ত্রী।—তুমিই বলিতেছ যে, শিখেরা হিন্দু। শিখেরা আপনারা তো তা বলে না। কোনো শিখকে তাহার ধর্ম্মবিষয়ের বা জাতি বিষয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শুধুই সে বলে "আমি শিখ"; বলে না "আমি হিন্দু।"

সত্যকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য।—আমাকেও যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর "তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী" তবে আমিও বলিব না "আমি হিন্দু ব্রাহ্ম"; বলিব শুধু "আমি ব্রাহ্ম।" কোনো বৈষ্ণবকে যদি জিজ্ঞাসা কর "তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী", তিনিও বলিবেন না "আমি হিন্দু বৈষ্ণব"; বলিবেন শুধু "আমি বৈষ্ণব।" কোনো শাক্তকে যদি জিজ্ঞাসা কর "তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী" তিনিও বলিবেন না "আমি হিন্দু শাক্ত"; বলিবেন শুধু "আমি শাক্ত।" হিন্দু না বলিবার কারণ আর কিছুই না—কাষ্ঠের মধ্যে যেমন অগ্নি অন্তর্নিগূঢ় আছে, তেমনি সম্প্রদায়বাচক বৈষ্ণবাদি শব্দের মধ্যে জাতিবাচক হিন্দু শব্দটি অন্তর্নিগূঢ় আছে। আবার কাষ্ঠের মধ্য হইতে অগ্নি পদার্থটিকে প্রকাশ্যে টানিয়া বাহির করিলে কাষ্ঠখানার যেমন রূপান্তর ঘটে, তেমনি, জাতিবাচক হিন্দু শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ করিলে বৈষ্ণবাদি বিশেষণগুলির ভাবান্তর ঘটিয়া দাঁড়ায়। অশ্ব বলিলেই যেমন চতুষ্পদ অশ্ব বুঝায়, তেমনি, বৈষ্ণব বলিলেই হিন্দু বৈষ্ণব বুঝায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একজন নবশাস্ত্রী যদি বলেন যে, "আমি অমুক স্থানে একটা চতুষ্পদ অশ্ব দেখিয়াছি" তবে তাহাতে বুঝাইবে এই যে, যেন তিনি চতুষ্পদ ছাড়া আর কোনো প্রকার অশ্ব আর কোথাও দেখিয়াছেন। এই জন্য স্বজাতির পরিচয় দিবার সময় ইংরাজেরা বলে শুধু "আমি ইঙ্গ্লিষ্‌ম্যান", বলে না "আমি ব্রিটিষ ইঙ্গ্লিষম্যান";* স্কচেরা বলে "আমি স্কচ্‌ম্যান", বলে না "আমি ব্রিটিষ স্কচ্‌ম্যান"; আইরিষেরা বলে শুধু "আমি আইরিষ্‌ম্যান", বলে না "আমি ব্রিটিষ আইরিষ্‌ম্যান।" তবে যদি ঐ তিন ম্যানের কোনো ম্যান আরেক ম্যান হ'ন—ম্যাডম্যান হ'ন, আর সে অবস্থায় তিনি যদি বলেন, "আমি ব্রিটিষ ইংলিষ্‌ম্যান" বা "ব্রিটিষ স্কচ্‌ম্যান" বা "ব্রিটিষ আইরিষ্‌ম্যান" তাহা হইলে দণ্ডশাস্ত্রের বিধানমতে তাঁহার সাত খুন মাপ। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি স্বধর্ম্মের পরিচয় দিবার সময় শিখেরাও বলে না "আমি হিন্দু শিখ," বৈষ্ণবেরাও বলে না "আমি হিন্দু বৈষ্ণব", ব্রাহ্মেরাও বলে না "আমি হিন্দু ব্রাহ্ম" জৈনেরাও বলে না "আমি হিন্দু জৈন।" কিন্তু তাহাতে এরূপ প্রমাণ হয় না যে, কেহই তাঁহারা হিন্দু নহেন। উল্টা বরং- কোনো নব্য হিন্দুধর্ম্মী যদি বলেন "আমি হিন্দু ব্রাহ্ম" বা "হিন্দু শিখ" বা "হিন্দু শাক্ত" বা "হিন্দু বৈষ্ণব" তবে তাহাতে প্রমাণ হইবে কেবল এই যে, তিনি একজন সৃষ্টিছাড়া লোক।

নব শাস্ত্রী।—তবে কি এদেশীয় বৌদ্ধেরাও হিন্দু?

সত্যকিঙ্কর।—মাথা নাই তার মাথা ব্যথা! বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা যে, আমাদের দেশের কোন্‌খানে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে তাহা আমার ধ্যানের অগোচর! কিন্তু তোমার অসাধ্য কিছুই নাই! তুমি হয় তো একটা মগ্‌কে ধরিয়া আনিয়া আমার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিবে যে, "ইনি এ দেশীয় বৌদ্ধ!" ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, ভারতবর্ষ যেমন মগের মুলুক নহে, মগের মুলুকও তেমনি ভারতবর্ষ নহে। তবে, মগেরা যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ দেশীয় লোক—সেটা একটা সমস্যা বটে। গোয়ালার নিকট হইতে পয়সা দিয়া প্রাপ্ত পাংশু-বর্ণের তরল পদার্থটা দুধ কি জল, অথবা অশ্বতর নামক জন্তুটা (অর্থাৎ muleটা) অশ্ব কি গর্দ্দভ, এইরূপ দ্বৈধাত্মক শ্রেণীর প্রশ্নগুলার মীমাংসা যেমন এক কথায় "হাঁ" কিম্বা "না" বলিয়া তড়ি-ঘড়ি চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, মগ্ এ দেশীয় কি বর্ম্মাদেশীয় এ প্রশ্নের মীমাংসাও অবিকল সেইরূপ। এটা যেমন সত্য যে, মগেরা ভারতের পূর্ব্বসীমান্তবাসী (Eastern borderland বাসী), এটাও তেমনি সত্য যে, "ভারতের পূর্ব্বসীমান্তবাসী" বলিলে প্রকারান্তরে বলা হয়

* প্রচলিত প্রথামতে "ব্রিটিশ" না লিখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে "ব্রিটিষ" লেখা হইল কেন—তাহার কারণ এই যে, মূর্দ্ধণ্য ষ-এরই প্রকৃত উচ্চারণ sh; পক্ষান্তরে, তালব্য শ এর উচ্চারণ—s এবং sh—দু এর মাঝামাঝি নূতন এক প্রকার। তালব্য শ এর উচ্চারণ-জিজ্ঞাসুকে আমি তালব্য শ এর প্রকৃত উচ্চারণ মুখনিঃসৃত করিয়া অনায়াসে শুনাইতে পারি; তা বই, তাহা লিখিয়া দেখানো আমার সাধ্যাতীত।

যে, এদেশ এবং বর্ম্মাদেশের মাঝামাঝি-স্থানীয় মগের মুলুকের অধিবাসী। তাহা সত্ত্বেও তুমি যদি অশ্বতর'কে অশ্ব বলিতে ইচ্ছা কর, অথবা মগ্‌কে এ দেশী বলিতে ইচ্ছা কর, তবে দণ্ডবিধি-গ্রন্থে এমন কোনো আইন আজিও লিপিবদ্ধ হয় নাই যে, ওরূপ একটা অর্দ্ধমিথ্যা কথা বলিলে তোমাকে কোনো প্রকার অপরাধের দায়ে পড়িতে হইবে।

নব শাস্ত্রী।—কোনো মগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যদি দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া চট্টগ্রামবাসী হয়?

সত্যকিঙ্কর।—অর্থাৎ তাহা হইলে তোমার মতে তাহাকে এদেশী বলা উচিত। বিগত শতাব্দীর একজন টোলের ন্যায়রত্ন যখন বলিয়াছিলেন যে—

"কলুর বলদ্ যদি দাঁড়াইয়া ঘণ্টা নাড়ে?!"

তখন তাঁহার মুখে যদিচ উহা বিলক্ষণই শোভা পাইয়াছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া ওরূপ ধাঁচার কূটতর্ক তোমার আমার ন্যায় বি-এ এম্-এ ন্যায়রত্নের মুখে শোভা পায় না। কেন না ঐ যা তুমি বলিলে—যে, মগেরা দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া চট্টগ্রামে বাস করিতেছে, তোমার ও কথা যদি সত্য হয়, তবে বর্ত্তমান শতাব্দীতে চট্টগ্রাম মগে গিস্ গিস্ করিত। কেন না কান্যকুব্জের পাঁচটি মাত্র ব্রাহ্মণের ঔরসে আমাদের এই বঙ্গভূমি চাটুর্য্যে মুখুয্যেতে ছয়লাপ্ হইয়া গিয়াছে ইহা সকলেরই জানা কথা। ও সকল ফাল্‌তো কূটতর্কের অবতারণা না করিয়া তুমি যদি তোমার প্রকৃত প্রশ্নটির একটা সদুত্তর আমার নিকটে শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে আমি বলি এই যে, বৌদ্ধেরা যদি মগ্‌দিগের ন্যায় এদেশ এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যস্থানীয় সীমান্ত প্রদেশের লোক না হইয়া জৈনদিগের ন্যায় প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় হইতেন, তাহা হইলে অর্দ্ধবৌদ্ধ জৈনেরা যেমন লোকের নিকটে হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হ'ন, তাঁহারাও তেমনি হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতেন তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

নব শাস্ত্রী।—জৈনেরা যে লোকের নিকটে হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হয়, এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার খুবই সন্দেহ আছে।

সত্যকিঙ্কর।—সে বিষয়ে সন্দেহ তোমার খুবই আছে, তাহা তো দেখিতেই পাইতেছি; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখিতে পাইতেছি যে, ও তোমার সন্দেহ নিতান্তই অমূলক। তাহা যে অমূলক তাহার প্রমাণ এই যে কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে "হিন্দুদিগের মধ্যে কোন্ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা বাণিজ্য ব্যবসায়ে পটু?" তবে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিবেন "মাড়োয়ারি জাতি।" পূর্ব্ব হইতে যদি তাঁহার মনে এরূপ একটা ধারণা থাকিত যে, জৈনেরা হিন্দু নহে, তাহা হইলে তিনি ঐ প্রশ্নটির উত্তর দিতেন এইরূপ যে, বাণিজ্য ব্যবসায়ে উদ্যমশীল জাতি হিন্দুদিগের মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

নব শাস্ত্রী।—ও সকল কথা যা'ক্! এখন একটা কাজের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি:—একজন মুসলমান যদি ব্রাহ্ম হয়, তবে কি তাহাকে হিন্দু বলা সঙ্গত হইবে?

সত্যকিঙ্কর।—খুবই সঙ্গত হইবে যদি মুসলমানটি পাবনা জেলার মুসলমানদিগের ন্যায় এদেশী মুসলমান হয়। সত্য কি মিথ্যা—কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই হয়। অতএব দেখ:—

(১) ভাবপৃষ্ঠের নিকষাঙ্ক।

মুসলমান সন্তানটি ডাহা এদেশী।

(২) অভাবপৃষ্ঠের নিকষাঙ্ক।

মুসলমান সন্তানটি ধর্ম্মবিষয়ে মুসলমান নহে, খ্রীষ্টান নহে, ইহুদী নহে, পার্সী নহে।

(৩) অতএব

মুসলমান সন্তানটি ধর্ম্মেও হিন্দু জাতিতেও হিন্দু॥

এতদ্‌ব্যতীত, চৈতন্য মহাপ্রভুর পদানুরক্ত বৈষ্ণব মুসলমানসন্তান হরিদাস বাবাজি হিন্দু কি অহিন্দু তাহা যদি জানিতে ইচ্ছা কর, তবে জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সত্যাসত্য কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই প্রকৃত বৃত্তান্তটি তোমার নিকটে ঢাকা থাকিবে না। অতএব দেখ:—

(১) ভাবপৃষ্ঠের নিকষাঙ্ক।

চৈতন্য মহাপ্রভুর পদানুরক্ত হরিদাস নামক মুসলমান-সন্তানটি ডাহা এদেশী।

(২) অভাবপৃষ্ঠের নিকষাঙ্ক।

ধর্ম্মবিষয়ে হরিদাস বাবাজি মুসলমান নহেন, খ্রীষ্টান নহেন, ইহুদী নহেন, পার্সী নহেন।

(৩) অতএব

বৈষ্ণব মুসলমান-সন্তানটি ধর্ম্মেও হিন্দু, জাতিতেও হিন্দু।

ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, হরিদাস বাবাজি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের হিন্দুদিগের মধ্যে হিন্দু বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে মার্কিন দেশীয় ধর্ম্মযাজক পার্কর—নামে ব্রাহ্ম না হউন—কাজে ব্রাহ্মদিগের আদর্শ স্থানীয় সেরা ব্রাহ্ম ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই প্রকাশ পাইবে যে, তিনি জাতিতেও হিন্দু নহেন, ধর্ম্মেও হিন্দু নহেন। তার সাক্ষী :—

ভাবপৃষ্ঠের নিকষাঙ্ক।

পার্কর মার্কিন দেশীয় অতএব তিনি ধর্ম্মেও হিন্দু নহেন, জাতিতেও হিন্দু নহেন।

প্রশ্নোত্তর এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট ; এক্ষণে ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা মিছামিছি বাতাসের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত না হইয়া সকল দেশের সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীর সাধকেরা যাহা করিয়া থাকেন তাহাই করুন—অন্তরের রিপুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন্ এবং ঈশ্বরপ্রসাদে জয়যুক্ত হইয়া ব্রাহ্ম নামের সার্থক্য সম্পাদন করুন্ ; তাহা হইলে আমাদের দেশে সত্য এবং মঙ্গলের দ্বার আপন হইতেই উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে, এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকের উপরে বর্ষিত হইয়া আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া দিবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliereর ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

২

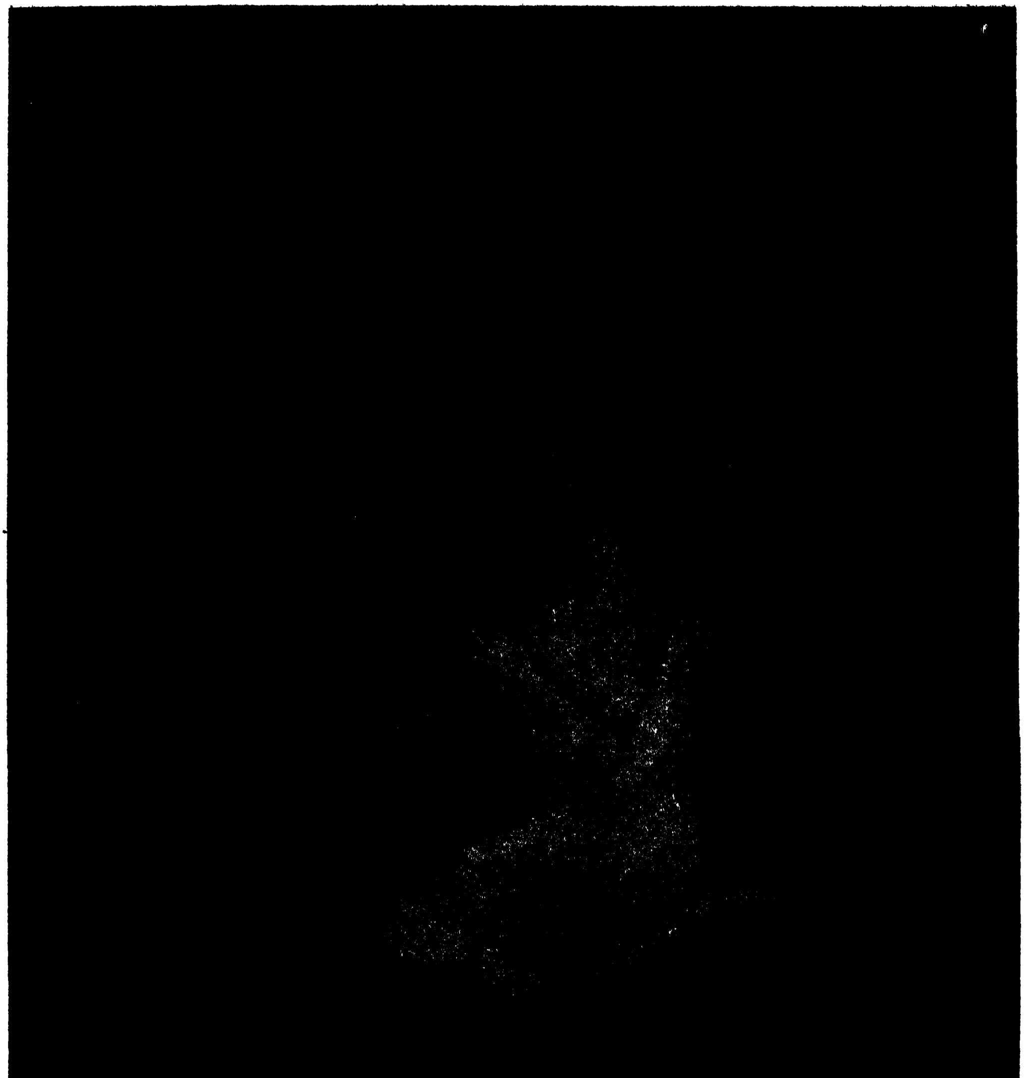
সামন্ততন্ত্রের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ।—আশ্রয়-আশ্রিত-তন্ত্র।—ভূমির অধিস্বামী।—ভারতীয় সামন্ততন্ত্র।—উরালীয়দিগের প্রথাসমূহ—ভারতীয় সমাজের মধ্যে অরাজকতা।—কি কারণে সামন্ততন্ত্র ভারতীয় সমাজকে রূপান্তরিত করিতে পারে নাই।—ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব ও বর্ণভেদপ্রথা সামন্ততন্ত্রকে প্রতিরোধ করে।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতার অনুশীলন কবিতে হইলে আর একটি উপাদানের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক।—সেটি সামন্ততন্ত্র। নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে, ভারত খণ্ড খণ্ড হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। কিন্তু এই-সকল রাজ্যের রাজাদিগের অনিয়ন্ত্রিত অসীম প্রভুত্ব ছিল। শাস্ত্রতঃ রাজাই ভূমির প্রকৃত অধিস্বামী ; তবে রাজাকে রাজস্ব দিয়া, গ্রামবিশেষ, বর্ণবিশেষ, ব্যবসায়ী-মণ্ডলীবিশেষ অথবা বংশবিশেষ ঐ ভূমির উপসত্ত্ব ভোগ করিতে পারিত। ইহার বিপরীতে, একাদশ শতাব্দী হইতে সামন্ততন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত পদমর্য্যাদার সোপান-পরম্পরা ও জাইগিরদারী স্বত্বাধিকারের প্রথা পরিলক্ষিত হয়। ইংরাজের ভারতবিজয় পর্য্যন্ত, এইরূপ পদমর্য্যাদার পর্য্যায় ও জাইগিরদারী স্বত্বাধিকারপ্রথা বজায় ছিল। এখনও রাজপুতানায়, এবং অযোধ্যা, পঞ্জাব, সিন্ধু ও কাথিয়াবারের কোন কোন অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

***

বিভিন্ন অতীত যুগে ও বিভিন্ন দূরদেশে সামন্ততন্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই, আশ্রয়-আশ্রিতসম্বন্ধমূলক সামাজিক গঠনই তাহার আদিম লক্ষণ। একজন মনুষ্য আর একজন মনুষ্যকে স্বকীয় প্রভু ও স্বকীয় সামরিক সর্দার বলিয়া স্বীকার করে ; ইহার বিনিময়ে সেই প্রভু, কোন সম্পত্তির উপসত্ত্ব ভোগ করিবার অধিকার সেই অধীনজনকে প্রদান করে, এবং সে তাহা নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পাইবে এইরূপ তাহার নিকট অঙ্গীকার করে। সে সম্পত্তি গো-মেষাদি হইতেও পারে,—যেমন, আইরিসদিগের মধ্যে ও তুর্কদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ইহা ভূসম্পত্তি ; কখনবা ইহা চুক্তিকারী প্রজার সহিত বন্দোবস্ত-করা ভূমি ; চুক্তিকারী প্রজা, আত্মরক্ষণের উপায়হীন স্বাধীন ভূমি অপেক্ষা, প্রভুর আশ্রিত ও সংরক্ষিত জাইগির ভূমিই অধিক পছন্দ করে।

যে দেশে সামন্ততন্ত্র পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, সেখানে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভূমির সত্ত্বাধিকারের সহিত স্বামিত্বের অধিকার আসিয়া পড়ে। অধীনস্থ প্রজার নিকট হইতে ভক্তিও সেবা ভূস্বামীর প্রাপ্য। কিন্তু আবার সেই প্রজার ভূমিতে সেই প্রজাই ভূস্বামী, সেখানে তাহার সম্পূর্ণ আধিপত্য। পরে, এই সামন্ততন্ত্রের ক্রম-বিকাশ হইতে অন্যান্য পরিণামও সমুৎপন্ন হয় :—রাজ্যের



ধ্রুব।

শ্রীমতী সুখলতা রাও কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতি অনুসারে।

বিশেষ বিশেষ কার্য্য বংশানুক্রমিক হইয়া পড়ে, ব্যক্তি-বিশেষের পদমর্য্যাদা অন্তর্হিত হয়, কেবল ভূমিসংলগ্ন পদমর্য্যাদাই রহিয়া যায়। যে-কেহ কিয়দংশ ভূমি রাখিতে পারে, সে-ই ভূমি-সংক্রান্ত পদমর্য্যাদারও অধিকারী হয়। যাহার অধিকারে কোন ভূমি নাই, ভূমিই তাহার অধিকারী হইয়া দাঁড়ায়, ভূমিই তাহাকে পোষণ করে—সে ভূমিরই দাস (serf), ভূমিরই মজুর হইয়া পড়ে।

সামন্ততন্ত্রের একমাত্র হেতু—অরাজকতা। যে জনসমাজ অবনতিগ্রস্ত বা যথোচিত পরিমাণে পরিপুষ্ট নহে, সেই জনসমাজে স্বভাবতই অরাজকতা উপস্থিত হয়। যেরূপ অসভ্যসমাজে আশ্রয়আশ্রিততন্ত্র সেইরূপ অবনতি-গ্রস্ত সমাজে সর্ব্বগ্রাসী অধিস্বামিত্বই পরিলক্ষিত হয়; কেননা, রাজস্বগ্রহণমূলক ভূস্বামিত্বের ধারণা কেবল উন্নত জনসমাজের মধ্যেই বিদ্যমান। তাই য়ুরোপ ও ল্যাটিন দেশগুলি ব্যতীত আর কোথাও সামন্ততন্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার কারণ কি?—কারণ,—কেবল গ্রীক-ল্যাটিনদিগের মধেই ভৌমিক স্বামিত্ব সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পরিদৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিকযুগের পুর্ব্বেও উহাদের এই ধারণা বিদ্যমান ছিল। উহাদের যেরূপ পারিবারিক গঠন-প্রণালী, উহাদের যেরূপ পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস, তাহাতে স্বকীয় বংশধর ব্যতীত আর কেহই পুর্ব্বপুরুষদিগের সমাধিমন্দিরের নিকটে গেলে পুণ্যস্থানকে অপবিত্র করা হয় এইরূপ উহারা মনে করিত। যখন অস্থাবর সম্পত্তিমূলক স্বত্বাধিকারের কোন ধারণা ছিল না তখনও যে ভূমিতে মৃতেরা কবরস্থ হইত, সেই ভূমিসংক্রান্ত স্বামিত্বের ধারণা গ্রীক ও ল্যাটিনদিগের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। শত্রুর শব-দেহের পরিচ্ছদাদি অপহরণ করা অধিকারের মধ্যে গণ্য হইত, কিন্তু তাহার সমাধিস্থানে অনধিকারপ্রবেশ করা অপরাধের মধ্যে ধর্ত্তব্য ছিল। ভূম্যধিকারের ধারণা ও ভূস্বামিত্বের ধারণা—এই দুয়ের মধ্যে যে কোন প্রভেদ আছে তাহা ল্যাটিনেরা কখনই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে নাই।

***

এক্ষণে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্র কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা আলোচনা করা যাউক।

মধ্য-এসিয়ার লোকেরা আশ্রয়-আশ্রিততন্ত্র অবগত ছিল:—সামন্ততন্ত্রের বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, অস্ত্রধারী পুরুষেরা সর্দ্দারদিগের অধীনে এবং সর্দ্দারেরা রাজার অধীনে একত্র সম্মিলিত হইত। ভারতে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া, শক্ ও তুর্কম্যানেরা রাজপুতজাতিভুক্ত হইল, এবং রাজপুতদিগের মধ্যে স্বকীয় সমাজপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিল। কিন্তু একস্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করায় ও ভূমির অধিকারী হওয়ায়, উহাদের সমাজ-পদ্ধতি একটু পরিবর্ত্তিত হইল। আর একটি পার্থক্যের কথাও আমরা নির্দ্দেশ করিব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর তুর্কদের সম্বন্ধে আমরা যেসকল প্রমাণলেখ্য পাইয়াছি তাহাতে দেখা যায়, উহাদের শাখাবংশগুলি পুর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; পরে সৈন্যদল লইয়া যে জনসঙ্ঘ গঠিত হয়, সেই জনসঙ্ঘ বিভিন্ন জাতিভুক্ত, বিভিন্ন দেশীয় লোকের অন্তর্ভূত ছিল। তদ্বিপরীতে, আজিকার রাজপুতদিগের মধ্যে, কোন-এক শাখার অন্তর্গত ব্যক্তিমাত্রই একই বংশের লোক বলিয়া পরিগণিত হয়। এই বৈসাদৃশ্যের দুইটি হেতু অনুমান করা যাইতে পারে:—হয়,—রাজপুতগণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তুর্কশাখাগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে, নয়—আর্য্যবংশ সম্বন্ধে যে একটা সাধারণ ধারণা ছিল সেই ধারণার প্রভাবে, বর্ণভেদপ্রথার প্রভাবে, একস্থানস্থায়ী বাস প্রভাবে, ভূসম্পত্তির প্রভাবে, বৈদেশিকদিগের মধ্যে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতির প্রভাবে, রাজপুত শাখাসমূহের অন্তর্ভুক্ত লোকদিগের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে উহারা সকলেই কোন এক সাধারণ পুর্ব্ব-পুরুষের বংশধর।

কিন্তু, ভারতে রাজপুতদিগের প্রতিষ্ঠাই কি সামন্ত-তন্ত্রের একমাত্র কারণ? রোমকদিগের ন্যায় হিন্দুরা কি করিয়া আশ্রয়-আশ্রিততন্ত্র অবগত হইল? নবম ও দশম শতাব্দীর অরাজকতার সময়ে, নিম্নবর্ণের লোকেরা, রাজার আশ্রয়, শক্তিমান ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয়, ধনশালী বণিক-দিগের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য কি চেষ্টা করিয়াছিল? হিন্দুদিগের অত্যাচারের ভয়ে, অসভ্যদিগের অত্যাচারের ভয়ে, ক্ষুদ্র রাজারা কি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছিল? প্রমাণলেখ্যগুলি হইতে এই সমস্যার

কোন সমাধান হয় না। সে যাহাই হউক, হিন্দুরা রাজপুতদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। পোর্টুগীজ রাজদূতের মুখে শুনা যায়, বিজয়নগরের রাজা তাঁহার অধীনস্থ ভূম্যধিকারীদিগকে একত্র করিয়াছিলেন; মার্কোপোলো বর্ণনা করেন, মালাবারাধিপতির বারাঙ্গণা ও সৈনিকেরা, তাঁহার চিতায় পুড়িয়া মরে। অধীন ভূম্যধিকারীদিগের এইরূপ আত্মহত্যা একটা তাতার-প্রথা। এই প্রথা চীন ও জাপানেও পরিলক্ষিত হয়। আরও কিছুকাল পরে, তুর্ক ও মোগোলেরা সমস্ত ভারতে সামন্ততন্ত্র প্রবর্ত্তিত করে। (১)

সম্ভবতঃ উহাদের জাতি হইতেই আশ্রয়-আশ্রিততন্ত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভারত খণ্ড খণ্ড হইয়া কতকগুলি জাইগিরে যে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার প্রধান হেতু—সমাজের ধ্বংসাবস্থা। ভারতে স্বাধীনরাজ্য কতগুলি ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। অধুনা, ইংরাজের কেন্দ্রীভূত শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইবার একশত বৎসর পরে,—এখনও ৬০০ মাত্র রাজ্যশাসনকারী রাজা আছে। আর পূর্ব্বে, জাইগিরদার ভূস্বামী অসংখ্য ছিল। মোগল সম্রাটদিগের আমলে, সহস্র সহস্র আমীর-ওমরা ছিল, মুনসব্দার ছিল, জমিদার ছিল। জমিদারদের অধিকার কিছু কম থাকিলেও, মুনসবদারদিগের সহিত তাহারা সমান কর্ত্তৃত্ব ভোগ করিত।

***

কতকগুলি উপকরণ সামন্ততন্ত্রের শক্তি ও স্থায়িত্ব বিধান কল্পে সহায়তা করিয়া থাকে, যথা:—দেশের আকার অভিজাত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে চারিত্রগত বৈলক্ষণ্য, জ্যেষ্ঠাধিকার-প্রথা সামন্ততন্ত্রানুযায়ী উচ্চনীচ পদমর্য্যাদার প্রতি লোকের অনুরাগ।

মোটের উপর ভারতভূমির আকৃতি ও সামাজিক গঠন সামন্ততন্ত্র স্থাপনের পক্ষে তেমন অনুকূল নহে। সে যাহাই হউক, হিন্দুরা রাজপুতদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু যে সমতল ভূমি লইয়া বড় বড় নদীর অববাহিকা গঠিত, তাহা কখন দীর্ঘকাল খণ্ডাংশে বিভক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। নবম শতাব্দীতে ক্ষত্রিয়জাতি বিলুপ্তপ্রায়; তখন শান্তপ্রকৃতি হিন্দুদিগের দুঃসাহসিক ব্যাপারে বা সৈনিক বৃত্তিতে আর অভিরুচি ছিল না। উহাদের ব্যবহার-গ্রন্থে জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম ছিল না, এবং যে বর্ণভেদ-পদ্ধতিতে, ব্রাহ্মণেরাই পদমর্য্যাদায় সর্ব্বপ্রধান সেই বর্ণগত পদমর্য্যাদা, সামন্ততন্ত্রগত পদমর্য্যাদার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল।

কেবল, যে সমাজ রাজপুতগণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই প্রকৃত সামন্ততন্ত্রানুযায়ী সমাজ:—সকলেই অভিজাতশ্রেণীর, সকলেই সৈনিক; সকলেই নিজ নিজ গৃহের ও নিজ নিজ ক্ষেত্রভূমির অধিস্বামী; সকলেই জাইগিরদারী-শপথসূত্রে স্বকীয় ভূস্বামীর অধীন। এবং সেই ভূস্বামী এরূপ আর

(১) Baden Powell প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থকারের মতে (Land System of British India) প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রিক গঠনপদ্ধতি,—সামন্ততন্ত্রমূলক: আর্য্যদিগের ভারত-বিজয়ের কালেই বোধ হয় এইরূপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মহাকাব্যের যুগে নিশ্চয়ই এ পদ্ধতি আর দেখা যায় না। প্রাচীন ইতালি, প্রাচীন গ্রীস, ও রোমীয় দিগ্‌বিজয়ের পূর্ব্বে গল্‌ ও গ্রেটব্রিটেনের ন্যায়, অবশ্য ভারত তখন অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু কি ধর্ম্মগ্রন্থ, কি সাহিত্যগ্রন্থ—কোথাও সামন্ততন্ত্রের কোনপ্রকার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ আমরা মনুসংহিতায় দেখিতে পাই যে, রাজার রাজ্যের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি পার্শ্ববর্ত্তী বিজিত রাজ্য থাকা চাই। কিন্তু উহা "বিজিত" রাজ্য—(vassal) "পেটাও" রাজ্য নহে। উহার একস্থানে মহৎ-বংশোদ্ভব ও বংশানুক্রমিক সচিবদিগের কথা আছে, কিন্তু তাহার পরেই আছে—রাজারই সর্ব্বময় প্রভুত্ব এবং তাঁহাকে একজন ব্রাহ্মণের পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহার আর এক স্থানে, কেন্দ্রীভূত শাসনকার্য্যের কথা;—সামন্ততন্ত্রের বিপরীত পদ্ধতির কথাই পাওয়া যায়।—"রাজা প্রত্যেক গ্রামের জন্য, দশটি গ্রামের জন্য, বিংশতি গ্রামের জন্য, একশত গ্রামের জন্য, সহস্র গ্রামের জন্য, এক একটি শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবেন।" এইরূপ পদ্ধতির প্রয়োগফলে সামন্ততন্ত্রের গোড়াপত্তন হওয়াই সম্ভব, কিন্তু বাস্তবপক্ষে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সত্বেও, ভারতে সেই সময়ে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। অনেকগুলি নাটকের কার্য্য রাজবাড়ীতেই সম্পন্ন হইয়াছে; সকল নাটকেই রাজারা মন্ত্রিগণ দ্বারা, ব্রাহ্মণ বয়স্যদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত। কোন নাটকেই অভিজাতবর্গের কথা, সামন্ততন্ত্রের হিসাবে কোন আশ্রিত ভূম্যধিকারীর (vassal) উল্লেখ নাই। যদিও হিউয়েন্-সিয়াং বলেন, দ্বিতীয় শিলাদিত্যের দরবারে, করদ ও মৈত্রীবদ্ধ রাজারা সমবেত হইত; কিন্তু তাহাদিগকে আশ্রিত রাজা (vassal) বলা যাইতে পারে না। পরে শিলাদিত্যের যুগে, বিশেষতঃ উত্তরপ্রদেশে, শক ও হুনদিগের কতকগুলি প্রথা হিন্দুদিগের উপর চাপানো হয়। তা'ছাড়া হিউয়েন-সাং যে শাসন-পদ্ধতির বর্ণনা করেন, তাহাতে সামন্ততন্ত্রের কোন লক্ষণই নাই। তিনি আমীর-ওমরার কোন উল্লেখ করেন না। তিনি বলেন, কৃষকেরা ভূমির মজুর (serf) ছিল না। আরও তিনি এই কথা বলেন:—"শাসনকর্ত্তারা, মন্ত্রীরা, নগরপালেরা এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীরা, স্বকীয় ভরণপোষণের জন্য কিছু কিছু ভূমি পাইত।" কিন্তু এমনও হইতে পারে, নবম ও দশম শতাব্দীর অরাজকতার সময়ে, এইসকল ভূমি জাইগিরে পরিণত হয়।

এক ভূস্বামীর অধীন—যে তাহা অপেক্ষাও শক্তিশালী। আবার এই শেষোক্ত ভূস্বামীর যে অধিস্বামী সে একজন হিন্দু রাজা, রাজপুত রাজা, বা মুসলমান রাজা।

ভারতের অধিকাংশ স্থানে, এই সামন্ততন্ত্রের প্রথা সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল না। য়ুরোপে এই সামন্ততন্ত্রপ্রথা তত্রত্য রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পদ্ধতিকে, খৃষ্টীয়সমাজের গঠনপ্রণালীকে, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনকে, রীতি-নীতিকে, লোকের ধারণা-সংস্কারাদিকে, হৃদয়ের অনুরাগ সমূহকে, সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করিয়াছিল। ভারতে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব ছিল, বর্ণভেদপ্রথাগত পদমর্য্যাদার পর্য্যায় ছিল, তাহাদের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহার ছিল এবং গ্রাম-সাধারণ ভূসম্পত্তির সহিত বংশগত ভূসম্পত্তির পদ্ধতিও ছিল। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী; এই সামন্ততন্ত্র উহাদিগকে ভূমির মজুর (serf) করিয়া তুলিয়াছিল এবং ভারতের অনেক প্রদেশে এখনও উহাদের অবস্থা এইরূপ মজুরের অবস্থা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

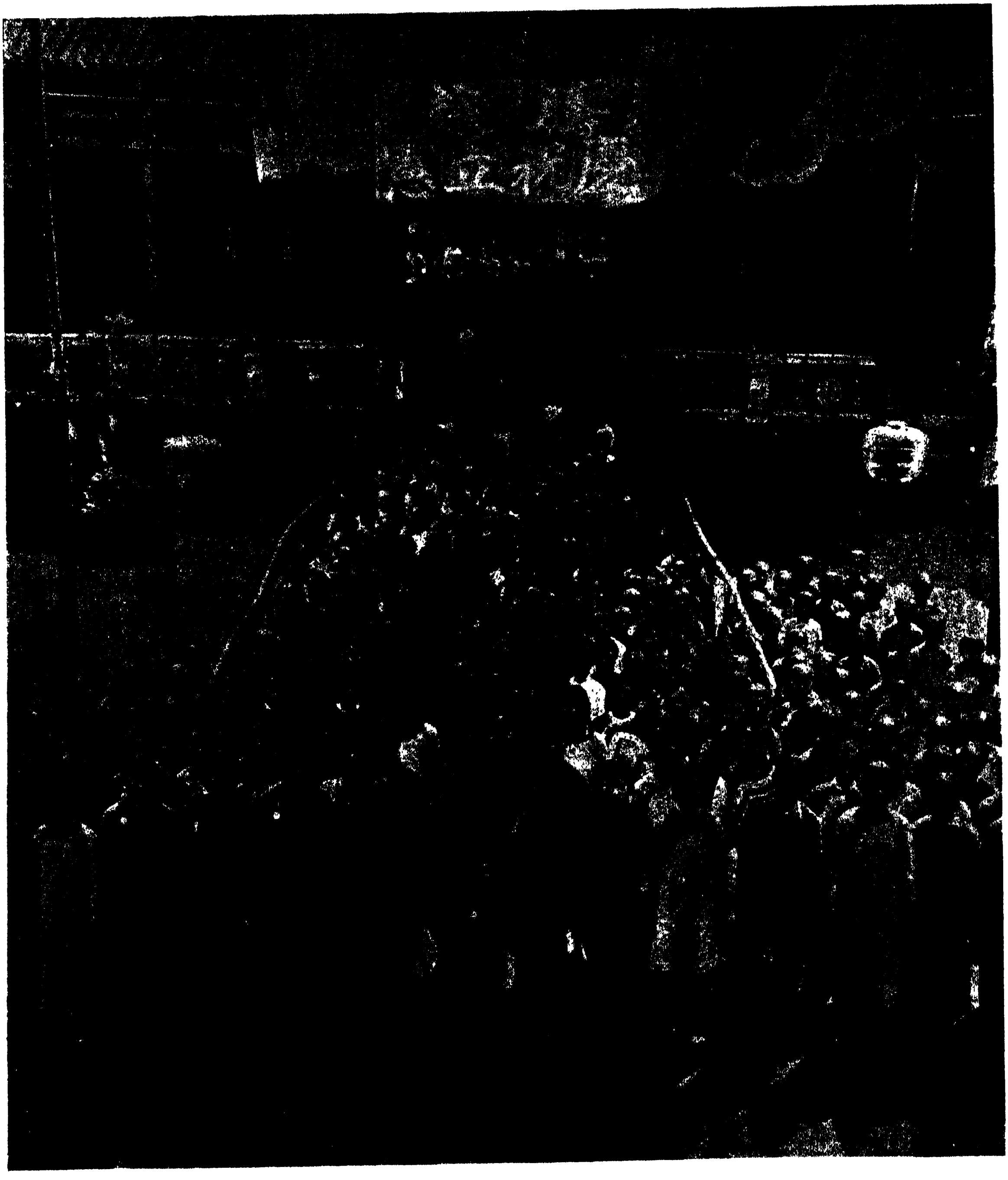
(ইউনান প্রদেশের কথা।)

(১)

আমরা সকলেই জানি যে রুষ-জাপান যুদ্ধের ফলে সমস্ত এসিয়ায় চেতনা সঞ্চার হইয়াছে। তাহারই ফলে চীনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিষম পরিবর্ত্তনের ঢেউ খেলিতেছিল। তাহারই ফলে তুর্কীর সুলতান আবদুল রহমানকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল এবং পারস্যের সা-কে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইতে হইল এবং সাহেবগণের মতে তাহারই ফলে তথাকথিত অশান্তি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু চীনে যে এরূপ অসম্ভব রাষ্ট্রবিপ্লব এত সত্বর উপস্থিত হইয়া এত শীঘ্র প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইবে তাহা চীনদেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়াও একদিনের জন্য মনে ধারণা করিতে পারি নাই।

গত বৎসর এপ্রিল মাসে আমি যখন রেঙ্গুন হইতে পরিবার আনিবার প্রস্তাব করি তখন এখানকার কোন বন্ধু ও তাঁহার পত্নী আমাকে গোপনে কহিলেন যে "আপনি সম্প্রতি পরিবার এখানে আনিবেন না, কারণ একটু গোলমালের আশঙ্কা আছে।" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে "কি প্রকার গোলমালের আশঙ্কা?" তাহাতে তিনি অনেক পীড়াপীড়ির পর কহিলেন যে "প্রজাগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে।" তখন আমি তাঁহার কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ করি নাই। কিন্তু মনে মনে একটু চিন্তার উদয় হইল। ইহার পর পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গেল, কোথায়ও কিছুর সন্ধান পাইলাম না। মাঝে মাঝে দুইএকজন সৈনিকপুরুষের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের মনের ভাব যাহা বুঝিতে পারিতাম তাহা কেবল মাঞ্চু রাজবংশের ও রাজকর্ম্মচারী-দিগের প্রতি বিদ্বেষ। তাঁহারা বলিতেন যে "বর্ত্তমান রাজবংশের দুর্ব্বলতার জন্য চীন অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। বিদেশীগণ যখন যে বিষয়ে আবদার করিয়া যাহা চায় পেকিন হইতে তাহাই মঞ্জুর করে। রাজকর্ম্মচারিগণ নিজেরা অত্যন্ত কলুষিত, তাহারা প্রজার মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি করেনা, কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও প্রজার অর্থে আপন পকেট-পূর্ণ করাই তাহাদের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য। মফঃস্বলের কর্ম্মচারিগণ কি করে, পেকিন গবর্ণমেণ্ট তাহার খোঁজ খবর রাখেন না। প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া রাজস্ব আদায় করিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। এ সম্বন্ধে তুং টিন্‌জে বা লাল বোতামধারী মাণ্ডারিনগণই দেশের প্রধান শত্রু।" এইরূপ কথায় প্রজাসাধারণের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

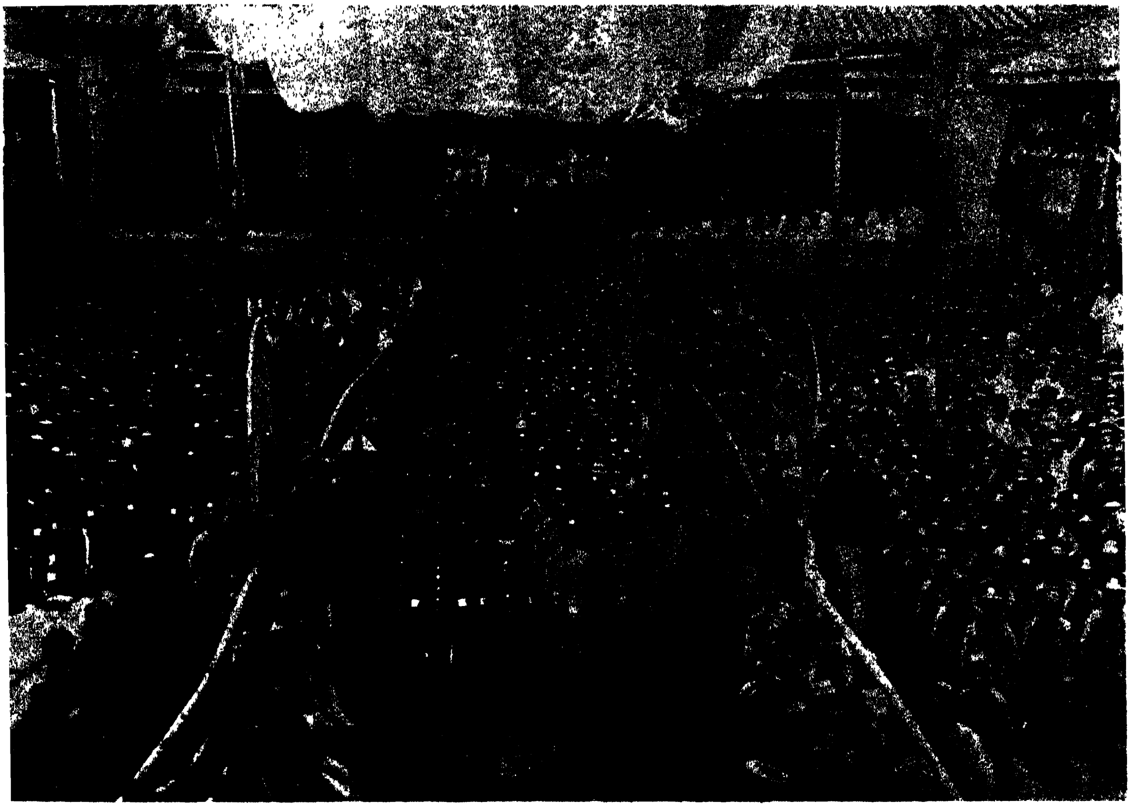
অপরদিকে মাণ্ডারিনগণ নিজেরা কলুষিত হইলেও, সমগ্র চীন রাজ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, যাহাতে প্রজাসাধারণ শক্তিশালী হইয়া উঠে সে চেষ্টায় তাঁহারা বিব্রত ছিলেন। গত বৎসর দেখিতাম একদিকে রাজকীয় সৈন্যগণ বিদেশী ধরণে যুদ্ধ শিক্ষায় সর্ব্বদা নিযুক্ত, অপরদিকে মাণ্ডারিনগণ শিক্ষাবিস্তার ও পার্লেমেণ্টের ধরণে শাসন-প্রণালী যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা শিক্ষা দিতে ব্যগ্র। টেঙ্গিয়ে-টিং বা টেঙ্গিয়ের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েন-লিয়াং-ইউর



চীনের বালিকা ছাত্রীদিগের রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদানের মিছিল,—টেঙ্গিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ।

যত্নে বহুসংখ্যক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতি গ্রামেই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বালক-

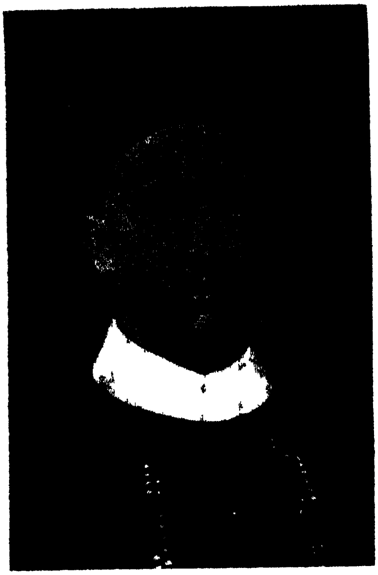
বিদ্যালয়ের ত কথাই নাই। এমন রক্ষণশীল চীন জাতি যাহাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা আদবেই ছিল না, সেই



চীনের বালকছাত্রদিগের রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদানের মিছিল।—টেঙ্গিয়ে স্কুলের নূতন উর্দ্দি বা ইউনিফর্ম্ম পরিহিত ছাত্রগণ।

জাতির মধ্যে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সুফল উৎপন্ন করা সহজ ব্যাপার নহে। আট বৎসর হইতে সতের বৎসরের বালিকা পর্য্যন্ত স্কুলে যাইবার নিয়ম। তদূর্দ্ধ বয়সের বালিকাদিগকে গৃহে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বালিকাদিগের লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমাজের নানা কুরীতির অপকারিতার বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদিগের পা বাঁধিয়া ক্ষুদ্র করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির প্রলোভন হইতে বিরত করার চেষ্টা হইতেছে। আমরা দেড়শত বৎসর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যাহা করিতে পারি নাই, চীনারা আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে সেই-সকল কার্য্য করিয়া তুলিল। আমাদের দেশের বালিকা-বিদ্যালয়ের অবস্থা কি প্রকার তাহা সকলেই জানেন। যেখানে যেখানে বালিকা-বিদ্যালয় হইয়াছে তথায় বারো বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের বালিকা পাওয়া কষ্ট। থাকিলেও সংখ্যা সামান্য।

গত বৎসর পার্লেমেণ্টের অনুকরণে প্রজার প্রতিনিধি-সভা স্থাপন উপলক্ষে তিন দিন উৎসব হয়। প্রথম দিন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া সভার অধিবেশন হইলে সভাপতি মিঃ ওয়েন সকলকে উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয় দিন সমস্ত বিদ্যালয়ের বালকদিগকে উপস্থিত করা হয়। এক এক গ্রাম হইতে বালকগণ নিশান ও ব্যাণ্ড (Band) সহ জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সমস্ত স্কুলের বালকগণ উপস্থিত হইল। সকলে একত্র হইলে নিয়ম ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বালকদিগের কোমল হৃদয়ে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর বীজ নিহিত করিয়া দেওয়া হইল। তৃতীয় দিনে সমস্ত স্কুলের বালিকাদিগকে উৎসবে আহ্বান করা হয়। যেমন বালকগণ



মিঃ ওয়েন, টেঙ্গিয়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও চীন পার্লামেণ্টের ভুতপূর্ব্ব অধিনায়ক। ইনি রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত সময়ে ২৭শে অক্টোবর রাত্রে উত্তর ফটক দিয়া ভিক্ষুকবেশে পলায়ন করেন।

শ্রেণীবদ্ধভাবে প্যারেডের ধরণে আসিয়াছিল, সেই মত বালিকাগণও নানা গ্রাম হইতে নির্শান-লইয়া মিছিলেব ধরণে আসিতে লাগিল। সে এক মনোহর দৃশ্য। এই দৃশ্য দেখিলে প্রত্যেক উন্নতিকামী ব্যক্তির হৃদয়ই আনন্দে পূর্ণ হয়। এই দিবস আমি এই উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। মিঃ ওয়েন এবং অন্যান্য সভ্যগণ আমাকে সঙ্গে করিয়া বক্তৃতা-হল, শিক্ষাবিভাগের আফিস প্রভৃতি দেখাইলেন। আমি ফটোগ্রাফ লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া স্থান নির্ব্বাচন করিতে বলিলেন। মিঃ ওয়েন নিজেও ফটোগ্রাফ লইয়া থাকেন। তিনি বালক ও বালিকাদিগের যে ফটো লইয়াছিলেন তাহারই প্রতিরূপ এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল। অবশ্য ফটো ভাল হয় নাই।

মিঃ ওয়েন আট বৎসর যাবৎ আমেরিকায় চীন লিগেশনের সেক্রেটারী ছিলেন। ইনি ইংরেজী বেশ বলিতে পারেন এবং লিখিতেও পারেন। ইঁহার সঙ্গে চীনের রাজনীতি সম্বন্ধে আলাপ হইলে ইনি বলিয়াছেন যে



মেজর চ্যাং, তোপখানার অধ্যক্ষ। বিদ্রোহী সৈন্যগণ ইঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া বক্ষ চিরিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া লয়। চীনাদের বিশ্বাস অত্যন্ত দুরন্ত লোকের হৃৎপিণ্ডের দ্বারা আঘাত-জনিত ক্ষত অব্যর্থ আরাম হয়।

"আমাদেব দেশেব শাসনপ্রণালী ইংলণ্ডের ধরণে করিতে হইবে। রাজা থাকিবেন কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া পার্লেমেণ্টের দ্বারা রাজ্য শাসিত হইবে।" চীন গবর্ণমেণ্ট এই আদর্শ লইয়াই ক্রমশ অগ্রসর হইতেছিলেন কিন্তু সুন ইয়াট-সেনের মনে যে আমেরিকার ধরণে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প ছিল তাহা কেহই তখন জানিত না।

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে এবং অক্টোবরের প্রথমে চীনের নানা প্রদেশ হইতে নানা প্রকার সংবাদ আসিতে লাগিল। তন্মধ্যে ছি-ছোয়ান প্রদেশের চেংঠো সহরের সংবাদ গুরুতর। তথায় রাজকীয় সৈন্যের সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লবকারী সৈন্যের বিষম যুদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়। এইসকল বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছি-ছোয়ান প্রদেশের রেলওয়ে



চীন রাষ্ট্রবিপ্লবে নিযুক্ত কয়েকজন সৈন্য, বালক হইতে প্রৌঢ় পর্য্যন্ত।

লাইন নাকি চীন গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। প্রজাগণ তাহাতে ভয়ানক আপত্তি করিয়া অবশেষে বিদ্রোহী হয়। এইসকল সংবাদও আমরা বড় গ্রাহ্য করি নাই। কারণ চীন দেশে সর্ব্বদাই কোন না কোন দেশে বিদ্রোহ প্রভৃতি অশান্তি লাগিয়া থাকেই। ইহা এদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বিশেষ। গত ২৭শে অক্টোবর রাত্রি ৯টার পর যথারীতি তোপ পড়ার পর কিছুকাল নিস্তব্ধ ভাবে কাটিল। প্রায় দশটার সময় পশ্চিমদিকে শহরের বাহিরে হঠাৎ ঘন ঘন কতকগুলি বন্দুকের আওয়াজ শুনা গেল, আমরা তাহা চীনাদের পটকার শব্দ মনে করিয়াছিলাম। ইহার কিছুকাল পরেই বাজারের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে আবার কতকগুলি বন্দুকের আওয়াজ হইল। ইতিমধ্যে আমার হস্পিট্যালের একজন গলা-কাটা চীনা সিপাইয়ের শুশ্রূষাকারী আর একজন সিপাই দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে তাহাদের উপরস্থ কর্ম্মচারী কর্ণেল ছাউকে সিপাইগণ হত্যা করিয়াছে। লোকটা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ইহার পরই নগরপ্রাচীরের ভিতর ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আমরা আহার করিয়া আগুনের পার্শ্বে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, তাড়াতাড়ি সদর দরজা খুলিয়া দেখি অনেক লোক নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে দৌড়িয়া পলাইতেছে। শহরের ও বাজারের সকল লোক, গ্রামাভিমুখে ছুটিয়াছে। কেহ পৃষ্ঠে ছেলে, কাঁধে ভার ও হাতে বিছানাদি লইয়া পড়ে কি মরে ভাবে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। চীনা রমণীগণও পৃষ্ঠে ছেলে করিয়া টিক টিক করিতে করিতে দ্রুত যাইতেছে। সকলেই নিস্তব্ধ, কাহারো মুখে কথাটী নাই। আমার

বাড়ীর পার্শ্বস্থ বাড়ীওয়ালা ছাড়া আর সকলেই পলাইতে আরম্ভ করিল। একএকবার সদর দরজা খুলিয়া দুই একজন লোককে কোথায় কি হইতেছে জিজ্ঞাসা করি আবার দরজা বন্ধ করি। ইতিমধ্যে একজন সংবাদ দিল যে নূতন সৈন্যের কর্ণেল চ্যাংকে তাঁহার অধীনস্থ সিপাইগণ হত্যা করিয়াছে। তাহার কারণ তিনি বিদ্রোহিগণের পরামর্শে যোগ দিতে নারাজ হইয়াছিলেন। ইনি বড় ভদ্রলোক ছিলেন। ইহাঁর জন্য অনেকেই দুঃখিত।

ইহার পরই নূতন সৈন্য পুরাতনের সঙ্গে একযোগে নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ সরকারী ইয়ামেন বা আফিসাদি আক্রমণ করিল। নগর মধ্যে তখন শত শত রাইফল-ফায়ার হইতে লাগিল। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, সমস্ত শহরে জনমানবের সাড়া নাই, হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ নাই, সকলেই আসন্ন বিপদ মনে করিয়া এবং ধনে প্রাণে মারা যাইবে আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। সে বিপদময় কালরাত্রির নিস্তব্ধতা কেবল রাইফল-ফায়ারের শব্দ দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হইতে লাগিল। এবং মাঝে মাঝে বিউগল বাজানর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। আমার একটি চীনা ভৃত্য আমার বিনা আদেশে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার মাতা ও স্ত্রীদিগকে লইয়া দূরে কোন গ্রামে পলাইয়া গেল, অপর একটি চাকরও তাহার পরিবার রক্ষার জন্য আমার বাটী পরিত্যাগ করিল। অপর একটি চাকর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; তাহার পলাইবার স্থান নাই, সে অন্য দেশের লোক, সুতরাং বাধ্য হইয়া আমার নিকটই থাকিতে বাধ্য হইল। আমাদের বিদেশীদিগের বাড়ী নগরপ্রাচীরের বাহিরে, পূর্ব্ব দরজার পার্শ্বে। চতুষ্পার্শ্বে রাইফলের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। তখন আমি ব্যস্ত ভাবে কিসে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এস্থলে আমার বাড়ীর একটু পরিচয় না দিলে কেহ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিবেন না। রাস্তার ধারে সদর বড় দরজা, তাহা পার হইয়া যাইতে বাম দিকে ডিস্পেনসারি এবং তাহার পার্শ্বে রোগী থাকিবার স্থান, সম্মুখে এক ক্ষুদ্র আঙ্গিনা তাহার দুই পার্শ্বে আস্তাবল। সেই আঙ্গিনা

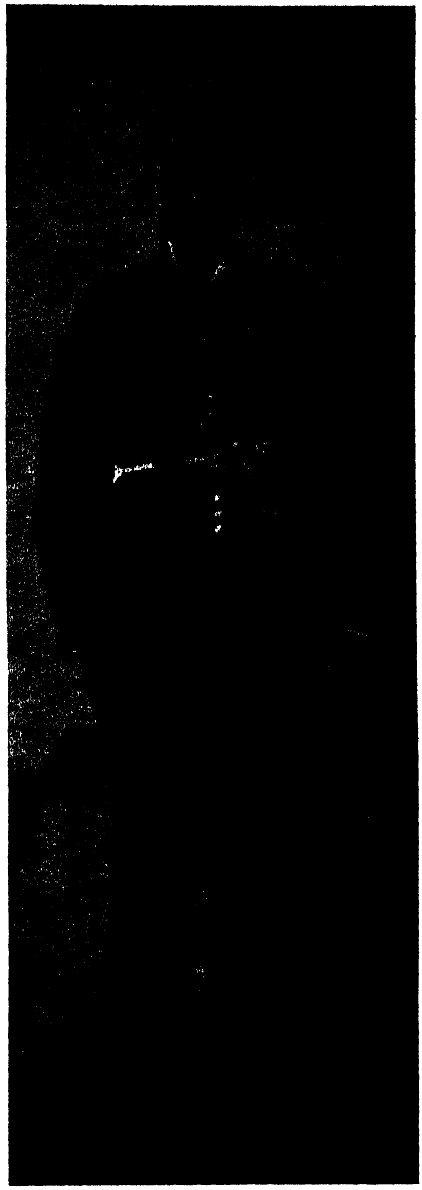


টেঙ্গিয়ে শহরের বাজার।

পার হইলে লম্বালম্বি এক গৃহ। তাহার মধ্য কক্ষে বৈঠকখানা, এক পার্শ্বের কক্ষে বিশেষ-দন্তচিকিৎসালয়, অপর পার্শ্বে রন্ধনশালা। সেই কক্ষ অতিক্রম করিলে আর এক আঙ্গিনা, তাহার এক পার্শ্বে স্নানাগার। সেই আঙ্গিনা পার হইলে সম্মুখে লম্বালম্বি আর একটি বৃহৎ গৃহ। সেই গৃহই আমার বাসস্থান। তাহার মধ্য কক্ষে আর একটি বৈঠকখানা। এক পার্শ্বের বড় কক্ষ দুই ভাগে বিভক্ত। তাহার একটি ভোজনাগার। অপরটি ফটোগ্রাফের ও অন্যান্য দ্রব্য রাখিবার জন্য। অপর পার্শ্বের বড় কক্ষটী আবার দুই ভাগে বিভক্ত। তাহার একটি আমার আফিস্, অপরটী শয়নকক্ষ। এই গৃহের মধ্য কক্ষের উপরে দ্বিতল গৃহ। এই মধ্য কক্ষ পার হইলে একটি ক্ষুদ্র আঙ্গিনায় ফুলের বাগিচা। তাহার সম্মুখে উচ্চ এক প্রাচীর। সেই প্রাচীর ভেদ করিয়া যে দরজা আছে, তাহা দ্বারা বাহির হইলেই আমার শাক শবজীর বাগিচা। সেই বাগিচার প্রাচীরগাত্র ভেদ করিয়া আর এক ক্ষুদ্র দরজা, সেই দরজা দিয়া বাটীর পশ্চাৎ দিক হইতে বাহিরে যাওয়া যায়। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে চীন দেশের সমস্ত বাড়ীই প্রাচীর-বেষ্টিত, আমাদিগের দেশের বাটীর ন্যায় ন্যাংটা বাড়ী নহে; সদর দরজা বন্ধ করিলে সহসা লোক ভিতরে যাইতে পারে না; প্রাচীর কিন্তু কাঁচা ইটের দ্বারা নির্ম্মিত।

এই বিপদের সময়ে কন্‌সাল (consul) এখানে ছিলেন না। কমিশনার ও তাঁহার এসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। এই রাস্তার ধারেই তাঁহাদের বাড়ী কিন্তু তাঁহাদের কোন

খোঁজ খবর জানিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে জেনারাল চাংকে বিদ্রোহিগণ গুলি করিয়া মারিয়াছে; এবং তাঁহার ইয়ামিনের যথাসর্ব্বস্ব লুট করিয়াছে। পরে টাওঠাইয়ের* (কমিশনারের) ইয়ামিন ও টিং বা মাজিষ্ট্রেটের ইয়ামিন লুট করিয়া উভয় কর্ম্মচারীকেই হত্যা করিয়াছে। ইংহাদের জন্য বড় দুঃখ হইল। ইহার কিছুকাল পরেই ইয়ামিন হইতে সহসা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নি জেলখানায়। জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদী খালাস করিয়া তবে জেলে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। ক্ষণকাল মধ্যে জেল ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাস্তায় যাইলে কেহ কেহ কহিল যে বিদ্রোহিগণ ইয়ামিন লুটিয়া পরে শহরের অন্যান্য সকল বাড়ী লুটিবে। এইরূপ আশঙ্কা ও উত্তেজনার সময় আমি বিন্দুমাত্রও ভীত বা আত্মহারা হই নাই। এখানে আমার জামাতা শ্রীমান্ নীতীশচন্দ্র রায় ছিল। সুখের বিষয় তাহার মুখেও কোন ভয়ের চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। একজন পাঞ্জাবী দরজী ছিল তাহার নাম তাজদীন। তাজদীন ভয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। চীনারা সকলেই ভীত। বাহির হইতে দুই একটী রমণী আসিয়া আমার বাড়ীর ভিতরে আশ্রয় লইয়াছে। আমি সকলকে কহিলাম "তোমরা ভীত হইও না। শত্রু আক্রমণ করিলে প্রথমত আত্মরক্ষার চেষ্টা প্রাণপণে করিব।" আমার দুইটী কার্ত্তুজের বন্দুক, তাহার একটী আমি, অপরটী শ্রীমান্ নীতীশকে দিলাম; একখানি কাচিন খড়্গ তাজদীনকে এবং গুরখা দা খানি চীনা ভৃত্যকে দিয়া কহিলাম যে বিপদ উপস্থিত হইলে সাহসে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। শত্রু যদি আক্রমণ করে, তবে সদর দরজা ভাঙ্গিয়া প্রথম আঙ্গিনায় আসিবে; তথা হইতে অপর একটী দরজা দিয়া ভিতরকার আঙ্গিনায় আসিতে আসিতে আমার ইঙ্গিত মতে তাহারা ফুলের বাগিচার দরজা দিয়া তরকারী বাগিচার মধ্যে যাইয়া তথা হইতে পশ্চাদ্দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া পলাইয়া যে স্থানে যাইবে তাহাও বলিয়া দিলাম। তাহারা পলাইতে পলাইতে আমি এদিকে বন্দুক ফায়ার করিয়া

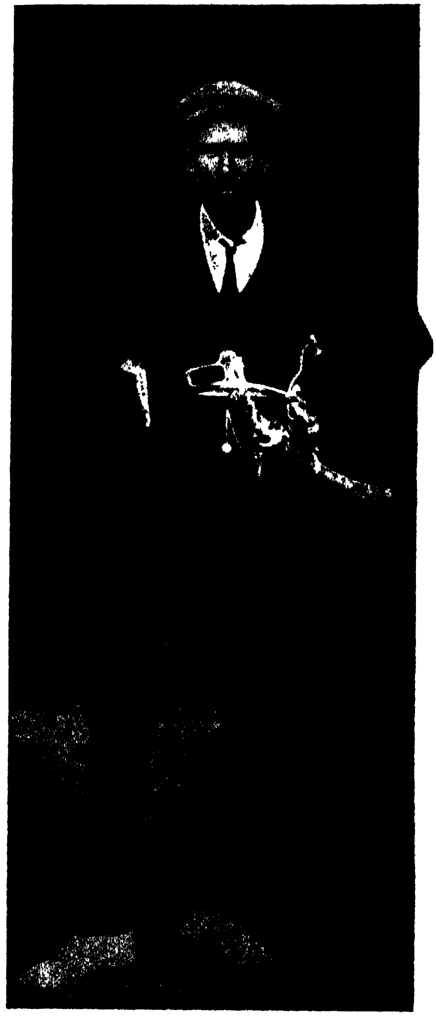


চ্যাং ওয়েন কোয়ান, চীন রাষ্ট্রবিপ্লবের টেঙ্গিয়ে দলের নেতা, চীনা পোষাকে।

শত্রুর গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতে করিতে হটিয়া পশ্চাতে যাইব। মূল কথা তাহারা নিরাপদ হইলে আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে। হয় আত্মরক্ষা করিতে পারিব, না হয় মৃত্যু। সকলে এক স্থানে গোলমাল করিয়া, আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিলেই

* টাওঠাই কমিশনারের মর্য্যাদাবিশিষ্ট কর্ম্মচারী।

সকলেরই মৃত্যু নিশ্চয়। আর যদি শত্রু বাটীর সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক দিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে বাগিচার ভিতর প্রাচীরগাত্রে যে মই ফেলিয়া রাখিয়াছি তাহার দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পার্শ্বের বাড়ীর বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে লুকাইতে হইবে। এই প্রকার আদেশ করিয়া আমরা পাঁচ ছয়জন লোক আমার মধ্য কক্ষে অগুনের পার্শ্বে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া কোন্ দিকে কোন্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল তাহার সন্ধান লইতে লাগিলাম। সম্মুখের তিন দরজা ও পশ্চাতের তিন দরজা বন্ধ। মাঝে মাঝে সম্মুখের সদর দরজার নিকট আসিয়া সংবাদ লই, আবার বাগিচার মধ্যে গিয়া শুনি। বাগিচার পশ্চাতের দরজা খুলিয়া মাঝে মাঝে দেখিতেছিলাম লোক জন বা বিদ্রোহিগণ যাইতেছে কি না। ইতিমধ্যে এক গুলি আসিয়া বাগিচার প্রাচীরগাত্রে লাগা মাত্র আমি দৌড়িয়া ভিতরে গেলাম। চীন সৈন্য বিদ্রোহী হইলে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-বিহীন হয়। তাহাদের নরহত্যার ভয় নাই। তাহাদের কেবল অর্থে লোভ, অর্থ পাইলে তাহারা সকল কার্য্যই করিতে পারে। বিদ্রোহিগণের মধ্যে লুঠের লোভে অনেক বদমাইস যোগ দিয়াছে। রাইফলধারী বিদ্রোহিগণ আক্রমণ করিলে আমার দুইটী কার্ত্তুজের বন্দুক দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য্য। তবু মন্দের ভাল। "প'ড়ে মরা অপেক্ষা ল'ড়ে মরা ভাল।" বিপদে সকলেই ভয়ে বিহ্বল হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দিলে ধনে প্রাণে নষ্ট হইবার কথা। বিপদে ধৈর্য্য চাই, সাহস ও দৃঢ়তা চাই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব চাই। এইসকল থাকিলে সহজেই লোকের অনিষ্ট হইতে পারে না। শত্রুর আক্রমণে হতাশ হইয়া পড়িলে মরণ অনিবার্য্য। আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারিলে অনেক সময় রক্ষা পাওয়া যায়, আর যদিই রক্ষার কোন উপায় না থাকে, তবুও "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।" লড়িয়া মরিলে পৌরুষ আছে, যে লড়িয়া মরিতে পারে শত্রুও তাহাকে সম্মান করে। এইসকল বিবেচনা করিয়া, মন দৃঢ় করিয়া, সাহসে নির্ভর করিয়া অটল অথচ সাবধান ভাবে রহিলাম। কেহ বলিতে পারেনা কোন্ মুহূর্ত্তে কি ঘটে। আজিকার রাত্রি যে প্রভাত হইবে এমন আশা কেহ করে নাই।



চ্যাং ওয়েন কোয়ান, চীন রাষ্ট্রবিপ্লবের টেঙ্গিয়ে দলের নেতা, য়ুরোপীয় পোষাকে।

রাত্রি প্রায় ২টার সময় অশ্বারোহণে কএকজন সৈনিকপুরুষ কতকগুলি সৈন্য সহ আসিয়া আমার সদর দরজায় আঘাত করিয়া দরজা খুলিতে বলিতে লাগিল। তখনকার সকলের মনের ভাব কি প্রকার হইল তাহা লেখা অপেক্ষা অনুমানে বুঝিয়া লইতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি। তখন আমার মনও কতক বিচলিত হইল। আমার লোকেরা বাহিরের সৈন্যদিগকে কহিল যে দরজা খুলিতে আমরা সাহস করি না। তাহারা পুনঃ

পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমরা দরজা না খোলায়, তাহারা কহিল যে "আমরা তোমাদের শত্রু নহি, আমরা তোমাদিগকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া কনসাল ও কমিশনারের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। নগর মধ্যে গুলির শব্দ ক্রমে কম হইতে লাগিল। যে সিপাইটী প্রথম সংবাদ দিয়াছিল সে ভয়ে পাগলের মত হইয়া গেল। সে কেবল বলিতে লাগিল বিদ্রোহিগণ আমার উপরস্থ কর্ম্মচারীকে মারিয়াছে, তাহারা জানে আমি এখানে আছি, আমাকে হত্যা করিবার জন্যই ঐ সিপাইরা আসিয়াছিল। আমি তাহাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিলাম না। অবশেষে আমি কহিলাম যে "যদি কেহ তোকে হত্যা করিতে আসে তাহা হইলে আমি অগ্রে গিয়া পড়িব, তুই এই অবসরে পলাইবি। আমার সম্মুখে তোকে কিছুতেই হত্যা করিতে দিব না।" ইহারই কিছু পর প্রাচীরের উপর কিসের শব্দ হইল, সে অমনি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়া কহিল "ঐ! পাচীর ডিঙ্গাইয়া সিপাই আসিতেছে।" বাহির হইয়া দেখি যে একটী বিড়াল লাফাইয়া অন্য প্রাচীরে গিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত রাত্রিটা এই লোকটা এই প্রকার আতঙ্কে কাটাইল।

আমরা প্রভাতের তারা দেখিবার জন্য বারে বারে বাহিরে যাইতে লাগিলাম কিন্তু মনে হইল যে প্রভাতের তারা বুঝি আজ আর উঠিবে না। তারা বুঝি বা বিদ্রোহিগণের ভয়ে লুকাইয়াছে। এই প্রকার উদ্বেগের সহিত ঘর বাহির করিতে করিতে অবশেষে প্রভাতের তারা দেখা গেল এবং ক্রমে প্রভাতের রশ্মি টেঙ্গিয়ে শহরে পতিত হইল। সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। তখন নিদ্রায় চক্ষু আঁটিয়া ধরিল। সকলে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কিছুকাল পরে সংবাদ পাইলাম যে কাষ্টম কমিশনার মিঃ হাওয়েল, তাঁহার এসিষ্টাণ্ট মিং জলি এবং নবাগত ইঞ্জিনিয়ার গ্রোভ সাহেব গত রাত্রিতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাইতেছে না। ইহাতে মনে বড় দুঃখ হইল কেন সাহেব আমাকে এ বিষয় কিছুই জানাইলেন না? কাষ্টম আফিস এখান হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে। তথায় দুইটী সাহেব এবং একটী মেম ছিলেন। মেমওয়ালা সাহেবের নাম মিঃ ক্রেগ। ক্রেগসাহেব ও মেম বড় ভীত হইয়া পলায়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু অপর সাহেব মিঃ নিসবেট্ খুব সাহসী। ইনি স্কট-হাইল্যাণ্ডার এবং বহুদিন যাবত নৌসেনাবিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহার সাহসের জন্য ইঁহারা কেহ পলায়ন করেন নাই। আমিও অনায়াসেই পলাইতে পারিতাম। সে রাত্রি পলায়নের কথা সহজে মনেও স্থান দিই নাই। তাহার কারণ আমি একে ভারতবাসী তাহাতে আবার বাঙ্গালী। প্রাণভয়ে পলাইলে লোকে কাপুরুষ ও ভীরু ছাড়া বলিত না।

শুনা গেল বিদ্রোহিগণ গত রাত্রিতে টাওঠাই বা কমিশনারের ইয়ামিন হইতে প্রায় দুই তিন লক্ষ টাকার রৌপ্য অপহরণ করিয়াছে। এই টাকার অধিকাংশ কাষ্টম আফিসের শুল্ক আদায়ের টাকা। একএক জন এত রূপা লইয়াছে যে অনেকে রূপার ভারে চলিতে অক্ষম হইয়াছিল। টাওঠাই হত হন নাই তিনি পলাইয়াছেন। মিঃ ওয়েনকে হত্যা করিয়াছে এরূপ কথা শুনা গেল, কিন্তু তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে পরে দেখা হইয়াছিল। ইয়ামিনের ভিতর আরো অনেক লোক হত হইয়াছিল। জেনারাল চ্যাংকে গুলি করিয়া মারিলে তাঁহার স্ত্রী এক বৎসরের একটী ছেলে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছেন। ছেলেটীকে বিদ্রোহিগণ দয়া করিয়া হত্যা করে নাই। জেনারাল চ্যাংর বন্ধু লবণ-বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ ফোং (Mr. Fong) ছেলেটীকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

টাওঠাইর কোমরে রসি বাঁধিয়া ত্রিশফুট উচ্চ নগর-প্রাচীর হইতে বাহিরে নামাইয়া দেওয়ায় তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং মিঃ ওয়েন ভিক্ষুকের বেশে নগরের উত্তর দরজা অতিক্রম করিয়া পলায়ন করেন।

বেলা আটটার সময় একজন আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে একজন বিদেশীলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। আমি বহির্ব্বাটিতে গিয়া দেখি যে কৃষ্ণবর্ণের একজন লোক অপেক্ষা করিতেছে, তাহার মাথায় ইংরেজী টুপি, গায়ে বড় ওভারকোট, পরিধানে



চ্যাং ওয়েন কোয়ানের শরীর-রক্ষী সৈন্ত।

একখানা বর্ম্মা লুঙ্গি, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া জুতা। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জানা গেল তাহার নাম আপল স্বামী ওরফে জন্ (John)। সে অল্প ইংরাজী বলিতে পারে, হিন্দি ও বর্ম্মা কথা বেশ জানে। সে বলিল "আমি গতকল্য মিঃ গ্রোভ, ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বর্ম্মা হইতে এখানে পৌছিয়া কন্‌সালের বাড়ীতে ছিলাম। রাত্রি দশটার সময় শহরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কমিশনার হাওয়েল সাহেব, এসিষ্টাণ্ট জলি সাহেব এবং আমার সাহেব দুইতিনজন চীনা চাকর সঙ্গে লইয়া পলায়ন করেন। ঘরের বাহির হইয়া কিছু দূর গেলে নিকটে একটা বন্দুক ফায়ার হয়, তাহাতে সকলেই ভীত হইয়াছিল এবং সাহেবদের কেহ কেহ আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। শহর ছাড়িয়া পাহাড়ের উপর যাইতে আমার মনে এই ভয় হইল যে চীনারা টের পাইলে সাহেবদিগকে ত মারিবেই সেই সঙ্গে আমাকেও হত্যা করিবে। আমি নিজেকে বাঁচাইবার জন্ত আস্তে আস্তে পাছে পড়িয়া অন্ধকারে সাহেবগণ হইতে কিছু দূরে গিয়া পড়িলাম। সাহেবগণ আমাকে তল্লাশ করিয়া আর পাইলেন না। আমি এদেশে নূতন, পথ ঘাট চিনি না, অন্ধকারে কোথায় যাই। তাই সমস্ত রাত্রি দুরন্ত শীতের মধ্যে এক কবরের পার্শ্বে বসিয়া কাটাইয়াছি। আজ প্রাতঃকালে পথ না জানিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাজারের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হই। চীনাকথা জানিনা, তাই বর্ম্মাকথায় জিজ্ঞাসা করিলাম যে গত রাত্রে তিন জন সাহেব যে পলাইয়াছিলেন তাঁহারা কোথায়? বাজারের মধ্যে গত রাত্রের বিদ্রোহি সিপাইগণ উন্মত্তের মত দলে দলে বেড়াইতেছে, অনেকেই মদ খাইয়া এবং রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত হইয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারিল না। আমি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইলাম যে তিন জন সাহেব। অবশেষে এক ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে করিয়া আপনার বাড়ী দেখাইয়া দিল। সাহেবদের পলাইবার কারণ এই যে

তাহাদের চাকর সংবাদ দিয়াছিল যে বিদ্রোহিগণ ইয়ামিন আক্রমণ করিয়া তাহাদের কর্ম্মচারিদিগকে হত্যা করিয়া পরে বিদেশীদিগকে হত্যা করিবে।"

আমি ইহাকে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া চা ও রুটি খাইতে দিয়া সুস্থ করিলাম। এবং কহিলাম তাহার মনিবকে খুঁজিয়া পাওয়া না গেলেও তাহার কোন আশঙ্কার কারণ নাই। আমি যখন এখানে আছি তখন তাহার কোন চিন্তার কারণ নাই।

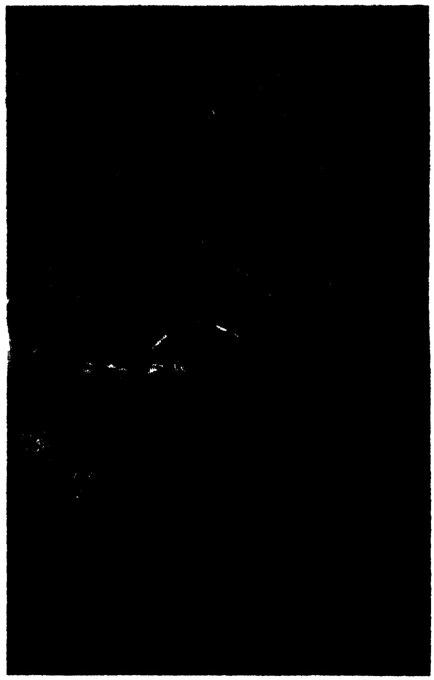
এ দিকে বিদ্রোহিগণের সর্দ্দার শহরে ঘোষণা করিয়াছে যে "প্রজাসাধারণের কোন ভয় নাই, বাণিজ্য ব্যবসা যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে। বিদেশী লোকের আমরা অনিষ্ট করিব না। আমরা কেবল কলুষিত মাঞ্চু রাজবংশ



টেঙ্গিয়ে শহরের কাষ্টম বা শুল্ক আপিস।

চাই না, এই রাজবংশ আজ ২৬৮ বৎসর রাজত্ব করিতেছে এখন তাহার শেষ। এবং তাহাদের কর্ম্মচারিগণকেও চাই না। আমরা প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিব।" বিদ্রোহিগণের সর্দ্দার চাং-ওয়েন-কোয়ানকে আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। তখন তাঁহাকে সাধারণ লোক মধ্যে গণ্য করিয়া গ্রাহ্য করি নাই। তাঁহার এমন অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল না যাহাতে তাঁহাকে দশের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। তবে হঠাৎ এ লোকটা এমন গণ্য মান্য হইল কি ক্ষমতায়? কাহার মধ্যে কি পদার্থ আছে তাহা বাহির হইতে দেখিয়া বিচার করা যায় না এবং সুযোগ উপস্থিত না হইলেও লোকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। লোকটা যে খুব সাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্বদেশপ্রেমিক তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

সাহেবদিগের খোঁজ না পাইয়া আমরা চিন্তিত হইলাম। বেলা দুই প্রহরের পর তাঁহাদের এক ভৃত্য তাঁহাদের ঘোড়া লইবার জন্য আসিয়াছিল। সেই লোক মারফত নিসবেট্ সাহেব তাঁহার নিজের পত্র ও বিদ্রোহী সর্দ্দারের পত্র পাঠাইয়া জানাইলেন যে তাঁহাদের কোন ভয় নাই। তাঁহারা নিশ্চিন্ত চিত্তে টেঙ্গিয়ে ফিরিয়া আসিতে পারেন। পত্র ও ঘোড়া সহ লোক চলিয়া গেল। সেই সঙ্গে আপন



চীনা ভিক্ষুক।

স্বামীর সংবাদ তাহার মনিব গ্রোভ সাহেবকে দিলাম। পর দিন বেলা ৪টার সময় অর্থাৎ ২৭শে রাত্রিতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, আর সেদিন ২৯শে অক্টোবর, তাঁহারা টেঙ্গিয়ে ফিরিলেন। তাঁহারা পলাইয়া প্রথমতঃ এক পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়াছিলেন এবং শীতে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। তৎপরে ষোল মাইল দূরে এক উষ্ণ প্রস্রবণের নিকটস্থ এক গ্রামে গিয়া আশ্রয় লন।

এদিকে গত রাত্রির ঘটনায় লোকের মনে এমন আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে যে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। লোকের

মনে ধারণা হইয়াছে যে যখন রাজকর্ম্মচারিগণ ধৃত হইয়াছেন বা পলায়ন করিয়াছেন তখন প্রজার রক্ষাকার্য্য এই বিদ্রোহীদের দ্বারা হইবে না। গত রাত্রিতে তাহারা ইয়াসিন লুটে ব্যস্ত ছিল, আজ তাহারা শহর লুট করিবে। এই ভয়ে যাহারা গত রাত্রিতে পলাইতে পারে নাই তাহারা আজ পলাইতেছে। মহাজনগণ আপন আপন টাকাকড়ি ও মালপত্র খচ্চরপৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছে। গুজব উঠিল আজ রাত্রে লুট ও হত্যা আরো ভয়ানক হইবে। প্রত্যেকের মনেই বিষাদের চিহ্ন। আমার কোন কোন চীনা বন্ধু কহিলেন যে "আপনি অদ্য রাত্রে কোন গ্রামে কোন পরিচিত লোকের বাড়ীতে গিয়া অবস্থান করুন।" বন্ধুটী আরো কহিলেন যে "এখানে বিদেশী-দিগের রক্ষক কনসাল সাহেব নাই, কমিশনার পলায়ন করিয়াছেন, সুতরাং আপনার একাকী আজ এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।" আমি কহিলাম যে "আমি অন্যত্র যাইব না, তবে আমার জামাতার জন্য একটু আশঙ্কা, তাহাকে অন্যত্র পাঠাইব।" কিন্তু আমার জামাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সাহসে ভর করিয়া রহিলাম কিন্তু মনে বড় আশঙ্কা রহিল। নিস্‌বেট সাহেবকে কহিলাম যে আজ রাত্রি বড় আশঙ্কার রাত্রি। আমাদের বাড়ীতে পাহারা থাকে তজ্জন্য বিদ্রোহীর সর্দ্দারকে অনুরোধ করিলাম। পাহারা আসিবে এমন অঙ্গীকার পাইলাম কিন্তু কোন পাহারা আসিল না। সন্ধ্যার সময় আহারাদি করিয়া বাড়ীর সমস্ত দরজা বন্ধ করিয় ভিতরে আমরা পূর্ব্ব রাত্রের মত আত্মরক্ষার সমস্ত আয়োজন করিয়া উদ্বেগের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কোন স্থানে একটু গোলমাল শুনিলে বা বন্দুকের আওয়াজ শুনিলে অমনি যেন প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আজ আমিও অনেকটা বিচলিত হইলাম। আপনাকে আপনি নিন্দা করিলাম যে আমার এরূপ দুঃসাহসে নির্ভর করা অন্যায়। ভয়েতে আপলস্বামী কাঁদিতে লাগিল যে সে কেন তাহার স্ত্রী পুত্র ফেলিয়া এখানে মরিবার জন্য আসিয়াছিল, সে মরিলে তাহাদের কি উপায় হইবে? তাজদীনও ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। এই ভাবে বসিয়া সমস্ত রাত্রি কাটিল। কিন্তু কোন প্রকার দুর্ঘটনা কোথায়ও ঘটে নাই। তাহা সর্দ্দার চাংএর বাহাদুরী বটে। তিনি এই রাত্রে সমস্ত রাস্তায় অস্ত্রধারী পাহারা রাখিয়া দিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে রাত্রি নয়টার তোপ পড়িবার পর কেহ যেন রাস্তায় বাহির না হয়। তখন যাহাকে রাস্তায় পাওয়া যাইবে তাহাকে গুলি করিয়া মারা হইবে। সুতরাং এই কড়া শাসনে বদমাইসগণ রাস্তায় বাহির হইতে সাহস পায় নাই।

কানসালের কেরাণী মিঃ হানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিদ্রোহীরা গত রাত্রিতে আঘাত করিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তাহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার লোক আসিয়া আমাকে অনুরোধ করিল। তিনি কেল্লার ভিতরে। তথায় বিদ্রোহিগণ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া বেড়াইতেছে। তথায় যাইতে আমাকে সকলে নিষেধ করিল। কিন্তু আমি তাহা না শুনিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে গেলাম। গিয়া দেখি মিঃ হানের সদর দরজার সম্মুখে রাস্তার ধারে একটী অল্পবয়স্ক লোককে বিদ্রোহীগণ কাটিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। এবম্বিধ অবস্থায় এমন স্থানে যাওয়া কতদূর বিপদসঙ্কুল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। হানের ভ্রাতাকে ঔষধ দিয়া ফিরিলাম।

এদিকে টেলিগ্রাফ পাঠান বন্ধ। বিদ্রোহিগণ গত রাত্রে টেলিগ্রাফ আফিসের সমস্ত সামগ্রী লুটিয়া লইয়া কল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এত বড় একটা ঘটনা হইল, তাহা টেঙ্গিয়ের বাহিরের লোকে কেহ জানিতে পারিল না। আমি ঘটনাটী সংক্ষেপে লিখিয়া ডাকে ভামো পাঠাইয়া আমার এজেন্টকে লিখিলাম তারে রেঙ্গুন গেজেটে এই সংবাদ যেন পাঠাইয়া দেয়।

কমিশনার ফিরিয়া আসিবার পরদিন বিদ্রোহীর সর্দ্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টকে এক টেলিগ্রাম পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম। এই টেলিগ্রাম না পাঠাইলে আন্তর্জাতিক বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে এই ভয়ে সর্দ্দার চাং নাকি উহা পাঠাইয়াছিলেন। সাহেবদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলাম যে গত রাত্রি অত্যন্ত আশঙ্কায় কাটিয়াছে। তাহাতে কমিশনার সাহেব কহিলেন যে আপনি যদি ভয় পান তাহা হইলে রাত্রিতে আমার বাড়ীতে আসিয়া শয়ন করিতে পারেন। আমি তাঁহাকে

ধন্যবাদ দিয়া কহিলাম যে আমি কিছুমাত্র ভীত নহি। আবার জলি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনিও ঐ কথা বলিলেন। তখন আমি কহিলাম "আপনারা নিজে ভয়ে পলাইলেন আবার আমাকে আপনার বাড়ীতে যাইয়া থাকিতে কহিতেছেন!" এখানে থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া ক্রেগ ও তাঁহার মেম, শ্রীমান নীতীশ ও দরজী তাজদীন, ইঞ্জিনিয়ার গ্রোভ ও আপল স্বামী প্রভৃতিকে বর্ম্মায় ১লা নবেম্বর পাঠান হইল। তাঁহাদের জন্য পাসপোর্ট পাওয়া গেল।

২রা নবেম্বর আমি ডিস্পেনসারিতে কার্য্য করিতেছি এমন সময় পাদ্রী ফ্রেজার সাহেব আসিয়া আমাকে কহিলেন যে "ডাক্তার, কমিশনার প্রভৃতি ভামো চলিলেন, আমিও চলিলাম, আপনিও চলুন।" আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলাম যে সেকি, আমি এক মুহূর্ত্তের নোটীশে টেঙ্গিয়ে ত্যাগ করিতে পারি না। তিনি কহিলেন "আমিও সমস্ত ফেলিয়া চলিলাম।" আমি কহিলাম "আপনার কার্য্য ও আমার কার্য্যে অনেক প্রভেদ। আপনার কার্য্য বক্তৃতা করা ও ধর্ম্মপ্রচার করা, আর আমার কার্য্য রোগ চিকিৎসা করা। কএকটী সম্ভ্রান্ত রোগী আমার হাতে, অনেকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদিগকে না বলিয়া বা তাঁহাদের অর্থ ফিরিয়া না দিয়া পলাইলে তাঁহারা কি মনে করিবেন? বিদেশীর নামে কলঙ্ক হইবে।" তিনি তখন কহিলেন যে "আপনি কাষ্টম হাউসে যান আমি তথায় চলিলাম।" আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া কাষ্টম আফিসে গিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন "You better come chop chop." তখন অনন্যোপায় হইয়া বাসায় ফিরিয়া চাকরদিগকে বেতন দিয়া কয়েকখানা বিস্কুট সঙ্গে লইয়া এবং একটী ওভারকোট লইয়া তাড়াতাড়ি কাষ্টম হাউসে উপস্থিত হইলাম। তথায় সর্দ্দার চাং ও বিদ্রোহী সৈন্যের দলপতিগণ সাহেবদিগের সঙ্গে তর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে টেঙ্গিয়ে পরিত্যাগ না করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন যে আপনাদিগকে আমরা রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি। আপনাদের কোন ভয় নাই। অনেক পীড়াপীড়ির পর হাওয়েল সাহেব রাজি হইলেন। সেদিন আর যাওয়া হইল না।

আবার পরদিন ৩রা নবেম্বর সাহেব আমাকে ডাকিয়া কহিলেন যে "আমরা আগামী কল্য টেঙ্গিয়ে পরিত্যাগ করিব। আপনি প্রত্যুষে ৬টার সময় প্রস্তুত থাকিবেন।" আমি কহিলাম "আমার সরকারী অস্ত্রশস্ত্র ঔষধপত্রাদি এবং নিজের মূল্যবান দ্রব্যাদির কি করিব?" তিনি কহিলেন যে "মূল্যবান দ্রব্যাদি মাটির নিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখুন। তাহাতে যদি কোন দ্রব্য খোয়া যায় তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ পাইবেন।" আমি তথাস্তু বলিয়া বাড়ী আসিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাত্রি কালে প্রস্তুত হইলাম। দুই জন চাকরকে বাড়ী রক্ষার জন্য এক মাসের অগ্রিম বেতন দিয়া রাখিয়া পরদিন প্রত্যুষে দেখি যে হাওয়েল সাহেব ও জলি আমার দরজায় হাজির। (ক্রমশঃ)

টেঙ্গিয়ে, চীন।			শ্রীরামলাল সরকার।

ভক্ত প্রকাশচন্দ্র

উপনিষদের প্রাচীন ঋষি ঈশ্বরকে বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ তিনিই রসস্বরূপ। তাঁহার সত্তার মধ্যে ডুবিয়া প্রেমের অমৃতরস পান করিতে পারিলেই জীবনের অনন্ত তৃষ্ণা নিবারণ হয়, প্রাণ তৃপ্তি লাভ করে।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে এই কথাটা আমাদিগকে বিশ্বাস করানো বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভ্রমর যেমন মধু-পানের জন্য ফুলে ফুলেই ঘুরিয়া বেড়ায়; আমরা তেমনি সুখের জন্য সংসারের ভোগের বস্তুর মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। চক্ষুর সম্মুখের এইসকল রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ব্যতীত আর যে কোন অদৃশ্য অনন্ত পুরুষের মধ্যে অসীম রূপ ও অমৃত রস আছে এবং উহার জন্যই যে জীবনের অনন্ত তৃষ্ণা ও অন্তরাত্মা ব্যাকুল, এ কথা কয় জন লোকই বা বিশ্বাস করে, কয় জন লোকই বা অনন্ত পুরুষের সত্তার মধ্যে ডুবিবার জন্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়?



পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী ও স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র রায়।

সুতরাং এই সংশয়ের যুগে যে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তাঁহার স্বরূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হন, তাঁহার প্রেমে ডুবিয়া অমৃতরসে জীবনকে মধুময় করেন এবং সেই জীবনের আকর্ষণে নরনারীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল পুরুষের সমীপে লইয়া যান, তিনি আমাদের সকলেরই সমাদরের পাত্র। ভক্ত প্রকাশচন্দ্র এই রকমের একজন সমাদরের পাত্র ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার জীবনের ভক্তির কাহিনী ও প্রেমের কথা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

প্রকাশচন্দ্র দেশের সমস্ত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত কোন বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করেন নাই; এক একটি ফুলের গাছ যেমন আপনার ফুলগুলিকে সবুজ পাতার মধ্যে ঢাকিয়া রাখে, তেমনি প্রকাশচন্দ্র তাঁহার সুন্দর জীবনটিকে ব্রাহ্মসমাজের গুটিকয়েক মণ্ডলীর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য বাঁকিপুর ব্যতীত দেশের অনেক স্থানের লোকেরাই তাঁহার বিষয় তেমন কিছুই জানেন না।



স্বর্গীয়া অঘোরকামিনী দেবী।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বিস্তর পুরুষ ও নারী তাঁহার জীবন-পুষ্পের মধুর সৌরভে আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের স্নেহের পাত্র, প্রতাপচন্দ্রের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরম সুহৃৎ এবং অনেক ব্রাহ্ম পুরুষ ও রমণীর পথ-প্রদর্শক ও পরম আত্মীয় ছিলেন। আমরা অনেকেই তাঁহার জীবনের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া ভক্তি শিক্ষা করিয়াছি। বলিতে কি, প্রকাশচন্দ্রের ন্যায় উদারচিত্ত, সরলহৃদয়, নিষ্কামকর্ম্মী, ঈশ্বরভক্ত ও মানব-প্রেমিক ব্রাহ্মসমাজে যে খুব বেশী আছে, তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আমরা আজ চোখের জল ফেলিতেছি এবং তাঁহার জীবনের কথা স্মরণ করিয়া ভক্তিতে আপ্লুত হইতেছি।

প্রকাশচন্দ্র ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে বহরমপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস চব্বিশপরগনার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে। তিনি ১৮৬৪ সালে হেয়ার স্কুল

হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮ বৎসর বয়সের সময়ই প্রকাশচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিধাতা তাঁহার হৃদয়পাত্র প্রেমে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে এই প্রেম ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তরুণ বয়সে এই প্রেম একমাত্র পত্নীর হৃদয়খানি অধিকার করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী দেশে থাকিতেন, আর তিনি কলিকাতায় থাকিয়া প্রেমমুগ্ধ চিত্তে পত্নীর কথা ভাবিতেন। এই রকম হইলে আর পড়াশুনা হয় কেমন করিয়া? প্রকাশচন্দ্র পরিণত বয়সে তরুণ জীবনের প্রেমস্মৃতি স্মরণ করিয়া বাল্যবিবাহের নিন্দা করিতেন। তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আর বেশি পড়া শুনা করিতে পারেন নাই। অর্থের অভাবও ইহার একটি কারণ ছিল।

প্রকাশচন্দ্রের বাল্যকালে দেবদেবতার প্রতি অতিশয় ভক্তি ছিল। কিন্তু কোন ঘটনায় সেই ভক্তি হ্রাস হইয়া গেল। তাহার পর খ্রীষ্টান ধর্ম্মের দিকেই তাঁহার মন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এক দিন কয়েকটি ব্রাহ্ম-যুবকের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দেওয়ায় তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"ঈশ্বর! তোমার নিকট সকলে প্রার্থনা করিল, আমি তোমাকে চিনিও না, জানিও না, যদি তুমি থাক এবং তোমার ইচ্ছা হয়, ত আমাকে দেখিতে ও চিনিতে দাও।"

প্রকাশচন্দ্রের বাহিরে কোন ধর্ম্ম নাই, কিন্তু অন্তরের ভিতর যে কি মহত্ত্ব ও মধুর ভাব লুকানো আছে, ব্রাহ্ম-যুবকেরা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রীতি ও সদ্ভাবে আকৃষ্ট করিয়া প্রকাশচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া আসিলেন।

এই সময় কেশবচন্দ্র ধর্ম্মের মহাশক্তিতে শক্তিশালী হইয়া শিক্ষিত যুবকদিগের অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। প্রকাশচন্দ্র তাঁহার উপাসনায় যোগদান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। শুধু তিনি নিজেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী অঘোরকামিনীকেও ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনাইলেন। এই সময় অঘোরকামিনীর বয়স অল্প, শিক্ষাও অতি সামান্য; কিন্তু শিক্ষা সামান্য হইলে হইবে কি? এই অসামান্যা নারীর ভিতরে যে বলিষ্ঠ আত্মা বিরাজ করিতেছিল, তাহার শক্তি ত নিতান্ত অল্প নহে। অল্প নহে বলিয়াই পরিণত বয়সে তিনি সেবা ও সাধনের দ্বারা বাঁকিপুরবাসী বাঙ্গালী ও বিহারী, হিন্দু ও ব্রাহ্ম সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই শ্রদ্ধার পাত্রী হইতে পারিয়াছিলেন। এই রমণী ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিয়া উহার মহত্ত্বাব হৃ করিতে পারিলেন; স্বামীর সঙ্গে তিনিও ব্রাহ্মধর্ম্মের রীতি নীতি মানিয়া চলিবার জন্য সংকল্প করিলেন। তিনি শাশুড়ীর সঙ্গে শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। এই জন্য সংকল্প রক্ষা করিতে গিয়া সকলের গঞ্জনা সহ্য করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি তাঁহার বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

অতঃপর প্রকাশচন্দ্র বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কিছুদিন পোষ্টাপিসের কার্য্য করিয়া ও প্রেস চালাইয়া হরিনাভি স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া উক্তস্থানে গমন করিলেন। তৎকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রকাশচন্দ্র স্বীয় পত্নীকে লইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসায় উঠিলেন। ইহার পূর্ব্বে অঘোরকামিনী দেবী কোন ব্রাহ্মপরিবারে মিশিবার সুযোগ পান নাই। এখন তাঁহারা দুই স্বামী স্ত্রী শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্ম্মভাব দেখিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে একত্র উপাসনা করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন. অঘোর-কামিনীর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। অবশেষে প্রকাশচন্দ্র সরকারি কর্ম্ম পাইয়া মতিহারি গমন করিলেন। এই স্থানে সাধু অঘোরনাথের সঙ্গে তাঁহার মিলন হইল। সাধু অঘোরনাথ ও ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ এই দুই বন্ধু ব্রাহ্মসমাজের দুই শক্তিশালী প্রচারক ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ভক্তিতে প্রমত্ত এবং অঘোরনাথ যোগে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইতেন। ইহাদের জীবনের সংস্পর্শে শত শত পুরুষ ও রমণীর চিত্ত ঈশ্বরোন্মুখীন হইয়াছে। প্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী, অঘোরনাথের বৈরাগ্য, কঠোর সাধনা এবং উন্নত জীবন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের অন্তরে সাধনের স্পৃহা বলবতী হইল। তাঁহারা বুঝিতে

পারিলেন, সংসারের কুসুমোদ্যান ও ভক্তির অমৃত-নির্ঝর ইহার মাঝখানে তপস্যার একটা মরুভূমি আছে। দৃঢ়সংকল্প, সংযম ও সহিষ্ণুতার সহিত সেই মরুভূমি পার হইতে না পারিলে প্রকৃত ভক্তি লাভ করা অসম্ভব। সেইজন্য দুজনেই কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সুখস্পৃহা খর্ব্ব করিতে লাগিলেন। একটু একটু করিয়া আসক্তির পাশ ছিন্ন হইতে লাগিল। তাঁহারা সূক্ষ্ম আত্মদৃষ্টির দ্বারা অন্তরের রিপুগুলিকে চিনিয়া লইলেন। বৈরাগ্যের অগ্নিতে সেগুলি ভস্ম হইতে লাগিল; আর তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের অন্তরে ভক্তিরস উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় উপাসনা, নামগান, ভক্তসঙ্গ ও ব্রহ্মোৎসব ইহাদের জীবনের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুই স্বামী স্ত্রী উপাসনায় বসিয়া প্রেমে ও পুলকে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। বাঁকিপুরে ব্রহ্মোৎসব ও ভক্ত সমাগম হইলে দুজনেই ব্যাকুল হইয়া সেখানে গমন করিতেন। তৎকালে তাঁহারা মায়ামোহের উপর কতটা জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে একটি ঘটনা বর্ণনা করিব। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় প্রকাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই সুবোধ মতিহারিতে তরুণবয়স্ক বালক ছিলেন। তাঁহার পড়াশুনার ক্ষতি হইবে বলিয়া প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী দেবী তাঁহাকে মতিহারি রাখিয়া বাঁকিপুর গমন করিলেন। তখন বাঁকিপুরে ব্রহ্মোৎসব। কলিকাতা হইতে খ্যাতনামা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য বাঁকিপুরে গিয়াছিলেন। প্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী উৎসবে যোগদান করিয়া নব নব ভাব লাভ করিতে লাগিলেন। উৎসবের শেষ দিন মতিহারি হইতে একটি টেলিগ্রাম আসিল; হঠাৎ সুবোধের কলেরা হইয়াছে। সুবোধের কাছে আপনার লোক কেহই নাই। সুতরাং মা বাপের প্রাণ সন্তানের জন্য কিরূপ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। সেই সময়ই মতিহারি যাইবার ট্রেন আছে। সেই ট্রেনে রওনা হইলে তাহার পরদিন সকালেই মতিহারি পৌঁছিতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহারা উৎসবের শেষ উপাসনায় যোগ দিতে পারেন না। উৎসবের শেষ উপাসনায় যোগ দিবার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান, তাহা কি সন্তানের জন্য অগ্রাহ্য করা যায়? সন্তানকে ঈশ্বরের করুণার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা উৎসবের উপাসনায় ডুবিয়া গেলেন। ভক্তের সন্তানকে স্বয়ং ভক্তবৎসল রক্ষা করিলেন।

এই সময় অঘোরকামিনী দেবী রমণীর আসক্তির সামগ্রী উত্তম বসন ভূষণ ত্যাগ করিলেন। অতি যত্নের স্বর্ণাভরণখানি দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে দান করিলেন। ইহার পর তিনি যে বেহারের তৈরী সামান্য বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন, আর তাঁহার অঙ্গে মূল্যবান বস্ত্র অথবা স্বর্ণাভরণ কেহ দেখিতে পাইল না। তিনি যখন সেবাব্রত গ্রহণ করিলেন, তখন বাঁকিপুরের কমিসনারের সম্মুখেও সেই সামান্য পোষাক পরিয়াই আসিতেন। সাহেবেরা তাঁহার সেবাব্রতের জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

প্রকাশচন্দ্র মতিহারি হইতে বাঁকিপুরে বদলি হইলেন। বাঁকিপুরেই তাঁহার কর্ম্মের উন্নতি হইল। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদলাভ করিলেন। এই স্থানেই তাঁহার সেবার ও সাধনের ক্ষেত্র নিরূপিত হইল।

এই বাঁকিপুরের সাধনক্ষেত্রে প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী দেবী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। এই সময় প্রকাশচন্দ্রের বয়স ৩৪ বৎসর এবং তাঁহার স্ত্রীর বয়স ২৬ বৎসর। তাঁহাদের তিনটি পুত্র, দুইটি কন্যা জন্মিয়াছে; আর অধিক সন্তান হইলে কিরূপে দীর্ঘকাল সাধনে কাটাইবেন? কিরূপে ঈশ্বরের প্রেমে আত্মসমর্পণ করিবেন? কিরূপে সেবাব্রত অবলম্বন করিবেন? সুতরাং তাঁহারা গৃহে থাকিয়াও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ শুধু কল্পনায় নয়। যে রাজগৃহকে মহাত্মা বুদ্ধদেব পবিত্র করিয়াছিলেন, ইহারা সেই রাজগৃহে গমন করিলেন। সেখানে স্বামী স্ত্রী উভয়ে মস্তক মুণ্ডন করিয়া "আধ্যাত্মিক বিবাহ" নামক নবসংহিতার লিখিত একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। কঠোর সাধনই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁহাদের পার্থিব সুখের লালসা যেন চরণতলে ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল এবং তাঁহাদের আত্মা শুভ্র কপোতের ন্যায় উর্দ্ধে প্রেম ও পবিত্রতার রাজ্যে উঠিয়া যাইতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই প্রকাশচন্দ্রের বড় মেয়ে সুসারের বিবাহ হইয়াছিল। সুসার ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। আমরা তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। এই সুসারের জন্য প্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নীকে ঘোর সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া উহাতে জয় লাভ করিতে হইয়াছিল। সেই জন্যই সুসারের জীবনের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিব। ইহা পাঠ করিয়া বিয়োগান্ত উপন্যাসের মর্ম্মান্তিক কাহিনী বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই ঘটনা সত্য। ব্রাহ্মসমাজের অনেক পুরুষ রমণী এই ঘটনা জানেন; সকলে জানেন বলিয়াই আজ লিখিতেছি।

সুসারের বিবাহের বয়স হইল; পিতা মাতা পরিণয় সম্বন্ধে তাঁহার মনের ইচ্ছা জানিতে চাহিলেন। সুসার একটুকু কাগজে লিখিয়া দিলেন—"আমি বৃন্দাবনকে ভালবাসি।"

এই বৃন্দাবন নিম্ন জাতির একটি সচ্চরিত্র যুবক। সে হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিয়াছিল। প্রকাশচন্দ্র বৃন্দাবনকে ভাল ছেলে বলিয়াই জানিতেন। সুতরাং তাঁহার সরল ও উদার চিত্ত বৃন্দাবনের হস্তেই কন্যা সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু আত্মীয় স্বজনেরা ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ করিলেন। প্রকাশচন্দ্র উচ্চ বংশের বঙ্গজ কায়স্থ; তাঁহার পত্নী রাজা প্রতাপআদিত্যের বংশের কন্যা; এখন কি না ছোট জাতির ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবেন! হিন্দুসমাজের আত্মীয়েরা কেমন করিয়া এই দৃশ্য দর্শন করিবেন? কিন্তু প্রকাশচন্দ্র কোমলহৃদয়া কন্যার অনুরোধই রক্ষা করিলেন; বৃন্দাবনের সঙ্গেই সুসারের বিবাহ হইয়া গেল।

ঈশ্বরের কি ইচ্ছা, তাহা কে বলিবে? এই বিবাহের পরিণাম অতি ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল। বৃন্দাবন ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমময়ী সাধ্বী পত্নীকেও ত্যাগ করিয়া সে পুনর্ব্বার প্রাচীন হিন্দুসমাজস্থ আর একটী বালিকার পাণিগ্রহণ করিল।

বৃন্দাবনের বিবাহ তিন আইন অনুসারে রেজিষ্টারী হইয়াছিল। আদালতে অভিযোগ উপস্থিত হইলেই তাহাকে কঠিন শাস্তি পাইতে হইত। কিন্তু সুসার কি সেই রকমের মেয়ে? তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করিলেন না, নিজের অদৃষ্টকেও ধিক্কার দিলেন না; স্বামীর প্রতি যে প্রেম এবং সেই প্রেমের প্রতি উপেক্ষায় যে ক্লেশ—এই উভয়কেই নিভৃত মর্ম্মস্থানে গোপন রাখিয়া ঈশ্বরের সেবিকা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি আপনার অঙ্গের আভরণ খুলিয়া রাখিয়া সুখের স্পৃহা বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মচারিণী হইলেন।

এই ঘটনায় প্রকাশচন্দ্রের অনেক পরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। অনেকেই বলিলেন, "আমরা ত আগেই এই বিবাহে বাধা দিয়াছিলাম; কিন্তু প্রকাশ বাবুর সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। তিনি আমাদের কথা ত শুনিলেন না; এখন তাহার ফল ভোগ করুন।"

বিশ্বাসী প্রকাশচন্দ্র লোকের এই তিরস্কারে কি অনুতাপ করিলেন? যাহা করিয়াছেন তাহা কি অন্যায় কার্য্য বলিয়া বুঝিলেন? একটি দিনের জন্যও নয়। এই ঘটনার মূলে যে ঈশ্বরের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, ঈশ্বর যে সুসারকে সেবার গৌরবে গৌরবান্বিতা করিবেন—প্রকাশচন্দ্র তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সুতরাং তাঁহার আর ক্ষোভের কারণ রহিল না। প্রকাশচন্দ্রের বিশ্বাসের বল ও হৃদয়ের শক্তি যে কত, তাহা আমরা এই ঘটনার দ্বারাই অনুমান করিতে পারি।

সৌভাগ্যবশতঃ সুসারের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। আমি তাঁহার মহত্ত্বের কথা জানি। বিধাতার গূঢ় কৌশলে অকল্যাণের মধ্য দিয়াই কল্যাণ উৎপন্ন হইয়াছিল। সুসার স্বামীর প্রেমে বঞ্চিতা হইয়া ঈশ্বরের প্রেমেই জুড়াইতে চাহিয়াছিলেন; তিনি জননীর মৃত্যুর পর ব্রতধারিণী হইয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্যকেই সমাপ্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। হায়, এমন সময় নির্দ্দয় মৃত্যু আসিয়া সুসারের জীবনকুসুম ছিন্ন করিল! এই সেবাপরায়ণা কন্যার মৃত্যুতে প্রকাশচন্দ্র ঈশ্বরকে কি বলিলেন? তিনি কন্যার শ্রাদ্ধের দিন বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া ভগবানকে বলিলেন—"আমার ডান হাতখানি * যখন লইয়া গিয়াছ, তখনও অভিযোগ করি নাই; এখন অপর হাতখানি লইয়া গেলে, তথাপি আমার কোন অভিযোগ নাই—"। আজ আর

* প্রকাশচন্দ্রের পত্নী।

প্রকাশচন্দ্রের সকল কথা মনে নাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসোজ্জল ও প্রেমোদ্দীপ্ত মুখচ্ছবিতে যে স্বর্গের শোভা দেখিয়াছিলাম, তাহা এখনও মনে আছে।

সুসারের বিবাহ ব্যাপারের পর প্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী বেহারের একটি বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বেহার অঞ্চলে স্ত্রীজাতির দুঃখের আর সীমা নাই। ভদ্র পরিবারের মহিলাগণও অশেষ নির্যাতন সহ্য করেন। তাঁহাদের মধ্যে একটুকু জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করে নাই। ঐসকল মহিলাগণের শিক্ষার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। কিন্তু প্রকাশচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের কার্য্যেই অধিক সময় ব্যস্ত থাকেন। এজন্য তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী দেবী অঘোরকামিনীই উক্ত কঠিন কার্য্যের জন্য কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন,—তিনি গৃহসংসার-স্বামী ও পুত্রকন্যা সকলই দূরে রাখিয়া লক্ষ্ণৌ চলিয়া যাইবেন; সেই প্রৌঢ় বয়সে লক্ষ্ণৌ খ্রীষ্টানদিগের বোর্ডিঙে থাকিবেন এবং ট্রেনিং স্কুলে উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিবেন; তাহার পর বাঁকিপুর আসিয়া মেয়েদের জন্য স্কুল ও বোর্ডিং খুলিবেন।

একটি বঙ্গমহিলার প্রৌঢ় বয়সের এই সংকল্পের কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। বাঁকিপুরের অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার এই সংকল্পে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"সে কি কথা? ঘর-সংসার ফেলিয়া কোথায় যাইবেন? এই বয়সেও কি মেমদের কাছে গিয়া লেখাপড়া শেখা সম্ভব?"

তাঁহারা তখনও এই মনস্বিনী নারীর শক্তির পরিচয় ভাল করিয়া পান নাই। প্রকাশচন্দ্র প্রেমের সাধন দ্বারা এই রমণীর হৃদয়ে এমন এক শক্তি উৎপন্ন করিয়াছিলেন, যে শক্তির সম্মুখে কোন বাধা বিঘ্ন দাঁড়াইতে পারিত না। দেবী অঘোরকামিনী একবার স্বামীর সঙ্গে দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। চিত্রকুট গমন করিয়া পাল্কী কি গাড়ী কিছুই পাইলেন না, অথচ পথ চলিতে হইবে অনেক। দুটি ঘোড়া পাওয়া গেল; কিন্তু অঘোরকামিনী ত কোন দিনই ঘোড়ায় চড়েন নাই। ঘোড়ায় না চড়িলেও সেদিন যে অবস্থায় পড়িলেন, সাহসের সহিত তাহারই মত ব্যবস্থা করিলেন; তিনি বীরাঙ্গনার ন্যায় অশ্বারোহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। এই তেজস্বিনী রমণী এখন আবার স্কুল চালাইবার মত শিক্ষা লাভ করিবার জন্য লক্ষ্ণৌ চলিলেন। লক্ষ্ণৌর বোর্ডিংএর কর্ত্রী একজন ইংরাজ মহিলা। তিনি এই নূতন রকমের বাঙ্গালী স্ত্রীলোকটির বৈরাগ্য ও সংকল্পের বল এবং আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব দেখিয়া ইহাঁর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে প্রকাশচন্দ্রের মহত্ত্বের বিষয় একবার চিন্তা করা আবশ্যক। তিনি ডেপুটি কালেক্টর; সরকারি কর্ম্মে প্রায়ই ব্যস্ত থাকিতে হয়। ধর্ম্মসাধনে সময় অতিবাহিত হয়; অথচ স্বয়ং সংসার ও সন্তানদিগের ভার গ্রহণ করিয়া পত্নীকে হিন্দুস্থানী নারীদিগের দুঃখ মোচনের জন্য লক্ষ্ণৌ পাঠাইয়া দিলেন। ঈশ্বর-প্রেমিক ধার্ম্মিক লোক ব্যতীত এ রকম কার্য্য কি যে-সে লোকের পক্ষে করা সম্ভব? এই সময় দেবী অঘোরকামিনী লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশচন্দ্রকে যেসকল পত্র লিখিতেন, তাহার একখানি পত্রের কিয়দংশ এখানে প্রকাশ করিতেছি:—

"তুমি যাহা বলিয়া দিবে, এ দাসী প্রাণ দিয়া তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। * * আর কি কঠিন কাজ মা দিবেন, যা আমরা করিতে পারিব না? না পারি করিতে করিতে তো যাইতে পারিব? * * যদি আমাদের দ্বারা তাঁহার করাইতে ইচ্ছা হয়, অবশ্যই পারিব। * * সমস্ত রক্ত দিলেও কি মার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না? * * তোমার সাধ পূর্ণ করিবার জন্য মা যে এ জীবন কিনিয়াছেন। যখন ভাবি, তখন যে কি সুখ পাই, তোমাকে কি বলিব? * * যতই নিকট হইতেছি, ততই আরও নিকট হইতে ইচ্ছা করে। নৈকট্যের কি শেষ নাই?"*

অঘোরকামিনী দেবীর লক্ষ্ণৌর শিক্ষাও শেষ হইতে লাগিল, আর কার্য্যকল্পনায় তাঁহার এবং প্রকাশ-চন্দ্রের চিত্ত আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। ভবিষ্যতের কার্য্য সম্বন্ধে ইহাঁরা কি রকম কল্পনা করিতেন, তাহা "অঘোর-প্রকাশ" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। দেবী অঘোরকামিনী তাঁহার ডায়েরিতে লিখিতেছেন:—

"এই ত কাজের বুনিয়াদ পড়িল। কত কাজ যে করিতে হইবে, তাহাও জানিনা; কিন্তু করিতেই হইবে। একটি উপাসনা-গৃহ, একটি মেয়েদের স্কুল, একটি পীড়িতাশ্রম, একটি ছাত্র-আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। স্কুল ত অতি শীঘ্র করিতে হইবে। খরচ আপাততঃ মাসে প্রায় ১০০৲ শত টাকা করিয়া লাগিবে।"

অবশেষে অঘোরকামিনী দেবী লক্ষ্ণৌ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। বাঁকিপুরের খ্যাত

* অঘোর-প্রকাশ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

নামা উকিল গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় অঘোরকামিনী দেবীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বাঁকিপুরের পুরাতন বালিকা স্কুলটির ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় পনেরটি হিন্দুস্থানী বালিকা আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইল। ধীরে ধীরে দেবী অঘোরকামিনী মেয়েদের জন্য একটি বোর্ডিং খুলিলেন। স্কুলটি এন্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত হইল। এই সময় প্রকাশচন্দ্রের উপার্জ্জিত অর্থ হইতে কিছু কিছু টাকা দিয়া বোর্ডিংএর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। প্রকাশচন্দ্র ও দেবী অঘোরকামিনীর কার্য্যের চিহ্ন-স্বরূপ স্কুল ও বোর্ডিংটি এখনও বাঁকিপুরে রহিয়াছে। বোর্ডিংএর মেয়েদের জন্য প্রকাশচন্দ্র তাঁহার নয়াটোলার বাড়ীর একটি অংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন বোর্ডিং অন্য বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে।

ইঁহারা শুধু স্কুল ও বোর্ডিং করিয়াই সেবার কার্য্য সমাপ্ত করেন নাই। দুঃখী ও পীড়িত লোকেরা ইঁহাদের গৃহে আশ্রয় পাইত। প্রকাশচন্দ্র মধুর ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা দুঃখীদিগকে সান্ত্বনা দান করিতেন; তাঁহার পত্নী সেবা দ্বারা রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে সুস্থ করিয়া তুলিতেন। আমি বহু বৎসর পূর্ব্বে বাঁকিপুর গমন করিয়া প্রকাশচন্দ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। তৎকালে একজন যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ভদ্রলোক সপরিবারে প্রকাশচন্দ্রের গৃহে বাস করিতে-ছিলেন। বলিতে গেলে প্রকাশচন্দ্র দুঃখী, পাপী ও জীবন-সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত এবং শান্তিহারা নরনারীমাত্রেরই পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতেন। কিন্তু তাঁহাকে ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে দেখি নাই। তিনি শোকার্ত্ত ও শান্তিহারা একদল পুরুষ ও রমণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাদের চোখের জলের সঙ্গে নিজের চোখের জল মিশাইয়া দিতেন।

প্রকাশচন্দ্রের এইসকল সেবার কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় ব্যারিষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন—

"পিতৃদেবের সমগ্র জীবন ঈশ্বরচরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। যত দিন গবর্ণমেন্টের চাকুরী করিয়াছেন সমুদয় অবসর সময় ধর্ম্ম সাধনে, ধর্ম্ম প্রসঙ্গে, সাধুসঙ্গ সম্ভোগে, ব্রাহ্মসমাজের ও জনসমাজের সেবায় ব্যয় করিয়াছেন। এসকলের জন্য শরীরকে শরীর, অর্থকে অর্থ জ্ঞান করেন নাই। সরকারি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য একটি দিনও অপেক্ষা করেন নাই; বরং শীঘ্র ঈশ্বরের সেবায় গৃহীত হইবার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিলেন।"*

প্রকাশচন্দ্র মৃত ও জীবিত দুই জন মহাপুরুষের জীবনের আদর্শ আপনার হৃদয়-পটে আঁকিয়া লইয়াছিলেন। মহাত্মা যিশু তাঁহার ধর্ম্মগুরু ও ঋষি কাউন্ট টলষ্টয় তাঁহার জীবনের পরম বন্ধু ছিলেন। সকলে জানেন উক্ত দুই মহাত্মা পাপী ও অসহায়ের পরম সুহৃৎ। যিশু শিষ্যদিগকে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন—"আমি দুঃখী পাপীর জন্যই এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। লোকের সেবা পাইতে আমি আসি নাই, কিন্তু আমিই লোকের পরিচর্য্যা করিব। নরনারীর মুক্তির মূল্য স্বরূপ আমিই আমার জীবন দান করিব।"

এই মহতী বাণী ভক্ত ও সেবাপরায়ণ খ্রীষ্টানদিগের অন্তরে কিরূপ করুণা ও সেবার ভাব জাগ্রত করিয়াছে, তাহা আমরা সকলেই জানি। এই মহতী বাণী প্রকাশ-চন্দ্রের অন্তরে করুণা ও প্রীতি উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিত। আমি যখন বাঁকিপুরে বাস করিতাম, তখন পাপপঙ্কে পতিতা এক অভাগিনী নারী প্রকাশচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই স্ত্রীলোককে আশ্রয় দেওয়ায় প্রকাশচন্দ্রের বন্ধুগণ তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশচন্দ্র করুণায় আর্দ্র হইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিয়াছিলেন—"আমি পাপীদের জন্য। আপনারা আমাকে দুঃখী ও পাপীদের দলেই রাখিয়া দিবেন। আমি যেন তাহাদের জন্যই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে পারি।"

আমরা জানি প্রকাশচন্দ্র পাপীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া বন্ধুদিগের সহানুভূতি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন। দুঃখী ও শান্তিহারা নরনারীর প্রতি প্রকাশচন্দ্রের সহানুভূতি কিরূপ প্রবল ছিল সে বিষয়ে আমি স্থানে স্থানে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

একবার শীতকালে বাঙ্গলাদেশের একটি সার্কাসের দল বাঁকিপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। ভয়ঙ্কর শীতে ঐ দলের একটি যুবকের নিউমোনিয়া রোগ জন্মিল। যুবকটি বিদেশে অসহায় অবস্থায় রোগে পড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিল। এই অসহায় যুবকের কঠিন পীড়ার কথা প্রকাশ-চন্দ্র ও তাঁহার পত্নী শুনিতে পাইলেন। আর কি তাঁহারা

* ব্রাহ্মসভায় পঠিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

স্থির থাকিতে পারেন? যুবক কোথাকার কে? কি রকম চরিত্র? সেসকল বিষয়ে চিন্তা না করিয়া যুবকটিকে নিজেদের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন; এবং চিকিৎসা ও সেবা দ্বারা তাহাকে সুস্থ করিলেন। যুবকটি সবল হইলে পর তাহাকে পাথেয় খরচ দিয়া তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রকাশচন্দ্রের পত্নী বাঁকিপুরের কোন অসহায় লোকের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের ও শিশুদের পীড়ার সংবাদ পাইলেই সেবার জন্য সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি এমন কোমল স্নেহে পূর্ণ হইয়া রুগ্না রমণীদিগের সেবা করিতেন যে তাহারা তাহাদের অন্তরস্থিত ভাবাবেগে আকুল হইয়া তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিত। দেবী অঘোরকামিনার সেবা ও সাধনা সম্বন্ধে খ্যাতনামা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তৎপ্রণীত "স্ত্রীচরিত্র" গ্রন্থে লিখিয়াছেন:

"অঘোরকামিনী অতি শীঘ্রই পরোপকার ব্রতে এতাধিক অনুরাগিণী ও উৎসাহী হইয়া উঠিলেন যে, অন্যের সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। * * একদিন সমাচার আসিল বাঁকিপুরের কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর পত্নী প্রসবশয্যায় পীড়িত অবস্থায় পড়িয়া আছেন, তাঁহাকে এবং তাঁহার রুগ্ন শিশুকে সেবা করিবার লোক নাই, কিন্তু শুনিবা মাত্র তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন। এবং যদিও এই পরিবার তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি সমস্ত দিন ইঁহাদের সেবা করিলেন। কিন্তু শিশুটিকে বাঁচাইতে পারিলেন না। তিনি আর এক দিন শুনিলেন একটি অতি নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক প্রসবান্তে অতিশয় রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। দ্রুতগতি সেখানে গিয়া দেখেন * * ঘরে ভয়ানক দুর্গন্ধ, শয্যা নাই, বস্ত্র নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই। উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি নিজ পরিচিত চিকিৎসকের জন্য লোক পাঠাইলেন, নিজের গৃহ হইতে শয্যা ও বস্ত্র আনাইলেন এবং স্বহস্তে ঝাঁটা লইয়া মলিন ঘর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত হইলেন। * * অঘোরকামিনী প্রতি বৎসর অনেকগুলি আত্মীয় বন্ধু সঙ্গে করিয়া রাজগৃহ-নামক বৌদ্ধতীর্থ পর্য্যটন করিতে যাইতেন। ধর্ম্মসাধন করাই এই পর্য্যটনের এক মাত্র লক্ষ্য। দুই তিন দিন সেখানে প্রবল উৎসাহে ধর্ম্মোৎসব করিতেন, গম্য পথে লোকদিগের নিকট প্রকাশ্য উপদেশ ও নগর সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে তিনি ধর্ম্মাত্মা স্বামীর সঙ্গে নিগূঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও উচ্চতর ব্রত পালন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরোপাসনায় অঘোরকামিনীর অসামান্য ভক্তি দেখিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। * * শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী রূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, তিনি প্রকাশচন্দ্রকে পতিরূপে পাইয়া ধন্যা হইয়াছিলেন এবং আমরা তাঁহাদের উভয়কে শ্রদ্ধা প্রীতি অর্পণ করিয়া সুখী হইয়াছি, উপকৃত হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি।"

আমার এই রচনার মধ্যে সকলেই হয় ত একটি বিষয় লক্ষ্য করিবেন। আমি সর্ব্বত্র প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পত্নীর কথাও লিখিয়া যাইতেছি। লেখাই প্রয়োজন হইয়াছিল। কারণ, প্রকাশচন্দ্র তাঁহার প্রেমময়ী পত্নীর জীবনের সঙ্গে আপনার জীবন এক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেহ মনে করিবেন না যে এইসকল উপন্যাসের কল্পিত কথা অথবা কাব্যের ভাবময় কবিত্ব। প্রকাশচন্দ্র ও দেবী অঘোরকামিনী এক হৃদয় হইয়া দুজনেই দুজনের সাহায্যে ভক্তির সাধনা এবং সেবার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সুতরাং পত্নীর সমস্ত কথা ত্যাগ করিয়া শুধুই স্বামীর কথা বলা এক রকম অসম্ভব।

কিন্তু আর আমাকে সেই পুণ্যবতী নারীর কথা লিখিতে হইবে না; কঠোর বৈরাগ্য এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম দেবী অঘোরকামিনীর সহ্য হইল না; শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল; তিনি স্বামী ও কন্যার হস্তে তাঁহার কার্য্যভার অর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রকাশচন্দ্র তাঁহার জীবনসঙ্গিনীকে হারাইয়া কি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন? তাহা নহে। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের অর্দ্ধাঙ্গ কাড়িয়া লইয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিলেন। তিনি মৃত্যুর আলোকে প্রকাশচন্দ্রের নিকট অমৃতলোক উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। প্রকাশচন্দ্র এই ঘটনার পর করুণাময়ের আশ্চর্য্য কৃপায় ধর্ম্মরাজ্যের অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেলেন।

অতঃপর প্রকাশচন্দ্র কয়েক বৎসর চাকুরি করিয়া, সন্তান ও আশ্রিত লোকদিগের প্রতি যে কিছু কর্ত্তব্য ছিল, তাহা সম্পন্ন করিলেন। অবশেষে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রচার-ব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি বিশেষ কোন সমাজের প্রচারক ছিলেন না বটে কিন্তু প্রচারকের কার্য্য করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রকাশচন্দ্র নিজে যে ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিয়া দুঃখ ও প্রলোভনকে জয় করিয়াছিলেন এবং আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন, নরনারীর নিকট সেই প্রেমের কাহিনী প্রকাশ করিবার জন্য আকুল হইয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশই বা জানে কে, আর আসামই বা জানে কে? যেখানেই ধর্ম্মের জন্য তৃষিত নরনারীর সংবাদ পাইতেন, সেইখানেই প্রেমের সমাচার লইয়া উপস্থিত হইতেন। রুগ্ন শরীরের দিকে একবারও দৃকপাত করিতেন না। তিনি যখন ভক্তিতে বিগলিত হইয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে

প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন, তখন কোন্ পুরুষ কোন্ নারী অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন? তাঁহার মত মিষ্ট উপাসনাও খুব কম লোককেই করিতে দেখা যায়। বাঙ্গালা বই অতি অল্পই পড়িতেন, তবুও তাঁহার উপাসনা ও উপদেশের ভাষা যেন মধু বর্ষণ করিত। এইসমস্ত কারণেই তিনি তৃষিত নরনারীর চিত্ত অমৃতরসে পূর্ণ করিতে পারিতেন।

প্রকাশচন্দ্র শান্তিহারা নরনারী ও শোকার্ত্তদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। যেসকল পুরুষ ও রমণী জীবনের পরীক্ষায় ভীত ও হৃদয়ের সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইতেন, এবং শান্তিহারা হইয়া মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করিতেন, প্রকাশচন্দ্র তাঁহাদের মনের ভাব অবগত হইতে পারিলেই প্রেম লইয়া তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হইতেন। পুরুষই হউন আর স্ত্রীলোকই হউন প্রকাশচন্দ্রকে আপনার লোক মনে করিয়া নিঃসঙ্কোচে মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। প্রকাশচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গে উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া তাঁহাদের চিত্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া দিতেন। তখন ঈশ্বরের প্রীতির অমৃতধারায় তাঁহাদের হৃদয় জুড়াইয়া যাইত। আমি আট বৎসর বাঁকিপুরে বাস করিয়াছিলাম; ঐ সময়ে দেখিতাম কোন ব্রাহ্মপরিবারে মৃত্যু এবং শোক উপস্থিত হইলেই প্রকাশচন্দ্র ছুটিয়া সেই পরিবারে গমন করিতেন। তাঁহার উপাসনা ও ধর্ম্মোপদেশের এমনই একটি মোহিনী শক্তি ছিল যে, শোকার্ত্ত ব্যক্তিরা সহজেই সান্ত্বনা লাভ করিতেন।

প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই অল্পদিন হইল শিলংপ্রবাসী ব্রাহ্মগণ ঢাকায় তাঁহার শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। ঐ দিবস কতিপয় ব্রাহ্ম এবং একটি শ্রদ্ধেয়া নারী তাঁহার সান্ত্বনাদানের কথা বলিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। সেদিন একজন বি-এ উপাধিধারী যুবক বলিতেছিলেন "প্রকাশচন্দ্র আমার পিতা, আমার গুরু এবং আমার বন্ধু ছিলেন।" যথার্থই প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে কোন কোন পুরুষ ও নারীর এই রকম সম্বন্ধই স্থাপিত হইয়াছিল। সেই জন্য আজ আমরা কত লোক তাঁহার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছি।

প্রকাশচন্দ্রের হৃদয় যে কি উদার ও মহৎ ছিল, আমি তাহা সকলকে বুঝাইতে পারিব না। তিনি সাধারণ ও নববিধান এই উভয় সমাজের লোকদিগকেই সমান ভাবে ভালবাসিতে পারিতেন। তিনি সাধারণ ও নববিধানের মতভেদের গণ্ডি অতিক্রম করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে। তিনি হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান, বেহারবাসী ও বাঙ্গালী সকল লোককেই উদার ভাবে ভালবাসিতে চেষ্টা করিতেন। "মিলনই" তাঁহার জীবনের মহামন্ত্র ছিল। তিনি তাঁহার পতাকায় "নববিধান" এই সাম্প্রদায়িক শব্দটি অঙ্কিত না করিয়া "মিলন" শব্দটি অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও মুসলমান এই সকল সম্প্রদায়ের লোক ঈশ্বরপ্রেমে একপ্রাণ হইয়া কবে প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে—ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল।

প্রকাশচন্দ্রের পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"প্রেম তাঁহার জীবনের যেন মূল মন্ত্রস্বরূপ ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রেম। এই সম্পদে তিনি কিরূপ ধনী ছিলেন যাঁহারা তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন, সকলেই জানেন। কিরূপ আকুল প্রেমের সহিত তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর, বন্ধুজনের ও তাঁহার সম্পর্কিত প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক সেবা করিতেন, তাঁহাদের মুখে সামান্য দুঃখের কথা শুনিলে তিনি কিরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রেমের খাতিরে তিনি সকল লাঞ্ছনা, সকল কঠোরতা, সকল পরিশ্রম অনায়াসে সহ্য করিতেন। যেখানে দুইটি হৃদয় কোনও কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেইখানেই তিনি তাঁহার আকুল প্রার্থনা ও অশ্রুজল লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। * * বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি যেখানে যেখানে ভ্রমণ করিয়াছেন, কত আত্মাকে সাহায্য ও সান্ত্বনা দিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের পত্র পাইয়া মনে হয়, আজ পিতৃদেবের তিরোধানে তাঁহাদের শোক আমাদের অপেক্ষাও গভীর।"

অনেক বৎসর পূর্ব্বেই প্রকাশচন্দ্রের বহুমূত্র রোগ জন্মিয়াছিল। এবার সেই রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তিনি জীবনের শেষ পঁচিশ দিন কঠিন পীড়ায় একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করিয়া প্রসন্ন মুখে থাকিতেন। তাঁহার পুত্র ব্যারিষ্টার সুবোধচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন -

"অসুখের শেষ পঁচিশ দিন তিনি প্রায় কোন কথা বলিতে পারিতেন না। কিন্তু যে দু-একটি কথা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার জীবন্ত ব্রহ্মানুরাগ ও অপরের কল্যাণের জন্য ব্যাকুলতারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অভিযোগের কিম্বা শারীরিক যন্ত্রণার পরিচায়ক একটি

কথা, একটি অক্ষর, একটি কাতরধ্বনিও কখনও মুখ হইতে বাহির করেন নাই। মুখের ভাবেও কখনও কোন যন্ত্রণার পরিচয় দেন নাই। তাঁহার গম্ভীর প্রসন্ন মূর্ত্তি যেন সে রোগশয্যাকে এক দেব-আভায় আলোকিত রাখিত। * * এইরূপে পিতৃদেব পৃথিবীতে নিত্য ঈশ্বর সহবাসের ও মধুর প্রেমের জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, শান্তি ও আনন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে গত ৭ই ডিসেম্বর পূর্ণিমা রজনীর অবসান সময়ে ধীরে ধীরে এ মর্ত্ত্যধাম হইতে চলিয়া গেলেন; অমরধামে গিয়া জীবনের দেবতার সহিত, সাধুভক্তগণের সহিত ও জননীদেবীর সহিত চির-মিলনে মিলিত হইলেন।" *

এ সংসারে প্রকাশচন্দ্র এক কন্যা ও তিন পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবোধচন্দ্র রায় কলিকাতা হাই-কোর্টের ব্যারিষ্টার। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র রায় বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় ইংলণ্ড হইতে এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহারা তাঁহাদের ধার্ম্মিক পিতার একখানি জীবনচরিত প্রকাশ করিবেন। উহা যে সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট আদৃত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

প্রশ্ন

(জাপানি কবিতা)

আবার কবে মিলন হবে?
 প্রশ্ন করে বঁধু—ধরিয়া দুই কর;
আকাশ পানে চাহিয়া থাকি
 কহিতে নারি, শুধু নয়ন ঝর ঝর!

অশ্রুধারা মুছায়ে দিয়ে
 কহিল বঁধু ধীরে—হবেই সে মিলন;
কিন্তু কোথা কত সে দূরে
 জানি না হায় কোন সে শুভক্ষণ!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

---

* ব্রাহ্মসভায় পঠিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

পরভৃত

কোকিলের সংস্কৃত নাম পরভৃত, পরপুষ্ট, অন্যপুষ্ট, ও কাকপুষ্ট। কোকিলশাবক ভিন্নজাতীয় পাখী দ্বারা পালিত হয় বলিয়া পরভৃত নাম পাইয়াছে, আর কাক দ্বারা পালিত হয় বলিয়া কাকপুষ্ট নাম পাইয়াছে। কোকিলের পরভৃত ও কাকপুষ্ট প্রভৃতি নাম কাল্পনিক নহে।

Darwin লিখিয়াছেন "* * * instinct impels the cuckoo to migrate and to lay her eggs in other birds' nests."

কুকু অন্য পাখীর বাসায় ডিম পাড়িয়া যায়, নিজে কোন বাসা প্রস্তুত করে না, শাবককে মোটেই পালন করেনা, ডিম মাটিতে পাড়ে, Wagtail, Hedge Sparrow প্রভৃতি পাখীর বাসায় ডিম রাখিবার সুবিধা প্রতীক্ষা করিতে থাকে, সুবিধা পাইলে তাহাদের বাসায় ডিম রাখিয়া আসে, এক বাসায় দুইটা ডিম রাখে না ইত্যাদি অনেক বিষয় কুকু সম্বন্ধে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

কোকিল কুকু জাতীয় পাখী। আমাদের দেশের কোকিলের ব্যবহার কুকু পাখীর ব্যবহারের মতন কিনা তাহা দেখিতে হইবে।

কোকিল বার মাস আমাদের দেশে থাকে না ইহা ন[illegible]ই স্বীকার করিতে হইবে। উহারা কোথা হইতে আসে, আর কোথায়ই বা চলিয়া যায় তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। সকলেই মনে করেন যেখানে বসন্তের রাজত্ব সেইখানেই কোকিল থাকে। বসন্তকালে কোকিল আমাদের দেশে আসে তাই কোকিলের অন্য নাম বসন্ত-দূত। ইংরেজেরাও কুকুকে messenger of the spring বলিয়া থাকেন। কুকু এপ্রেল মাসের মধ্যভাগে ইংলণ্ডে আসিয়া থাকে এবং জুলাই কি অগষ্ট মাসে ইংলণ্ড ছাড়িয়া চলিয়া যায়। আমাদের কোকিলও তাহাই করে, মার্চ্চমাসে এদেশে আসিয়া জুলাই মাসে এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। উৎকল দেশে ও মধ্যপ্রদেশে কোকিলকে কোইলি বলিয়া থাকে। আমের আঁটির ভিতরকার শাসকেও কোইলি বলে। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে



কুকু-শাবক পালকপক্ষীর ডিম পিঠে তুলিয়া তুলিয়া বাসা হইতে ফেলিয়া দিতেছে।



কুকু-শাবক বাসার নিকট কাহাকেও আসিতে দেখিলে সাপের মতো গর্জ্জন করে।

আমের মধ্যে কোইলি না হইলে কোকিলের কুহুস্বর শ্রুতিগোচর হয় না; বস্তুত তাহাই সত্য। মার্চ্চমাসের মধ্য বা শেষ ভাগে আমের কোইলি হইয়া থাকে, আর প্রায় সেই সময়েই কোকিল এদেশে দেখা দেয়।

কুকু ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইবার সময়ে Hedge Sparrow, Wagtail প্রভৃতি পাখীর বাসায় ডিম রাখিয়া যায়, আর আমাদের দেশের কোকিল কাকের বাসায় ডিম রাখিয়া যায়। কাক ডিমের উপর তা দেয়, শাবক হইলে যত্ন সহকারে পালন করে ও সযত্নে উহাদিগকে আহার দেয়। কোকিল-শাবক সবল ও পুষ্ট হইলে এবং বহুদূর উড়িয়া যাইতে ও নিজের আহার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলে পালনকর্ত্রীকে ত্যাগ করতঃ জন্মস্থান ছাড়িয়া বসন্তলীলান্বিত স্থানে পলায়ন করে। পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী অধিকাংশ লোকেই কাক দ্বারা কোকিল-শাবককে পালিত হইতে দেখিয়াছে। পুষিবার অভিপ্রায়ে অনেককে কাকের বাসা হইতে কোকিল-শাবক আনিতে দেখা গিয়াছে। আমার বাড়ীতে একটী নারিকেল গাছ আছে। তাহার উপরে প্রতি বৎসর কাকে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। দুই বৎসর যাবৎ উক্ত বাসায় কোকিল ডিম পাড়িয়া যাইতেছে। গত বৎসর যখন কাকের ছানাগুলি বড় হইল, বাসা হইতে বাহির হইয়া বৃক্ষের শাখায় বসিতে আরম্ভ করিল তখন আমরা দেখিতে পাইলাম উহাদের একটী কাক ও একটী কোকিল-শাবক। কিন্তু কাক উভয় শাবককেই অতিশয় যত্ন সহকারে পালন করিতেছিল। এক দিন কোকিল-শাবকটী কোথায় পালাইয়া গেল আর আমরা দেখিতে পাইলাম না। এবারেও তাহাই ঘটিয়াছিল। যখন কাক শাবক দুইটীকে বাসা হইতে বাহির করিল, তখন দেখিলাম একটী কাক আর একটী কোকিল-শিশু। উহারা উভয়ে অনেক সময় বৃক্ষশাখায় বসিয়া থাকিত, কাক যত্নসহকারে উভয়কেই খাওয়াইত। পরে কিছু দিন শাবক দুইটী কাকের সঙ্গে সঙ্গে ইতস্তত উড়িয়া বেড়াইল। একদিন কোকিলটী কোন দিকে উড়িয়া গেল আমরা আর দেখিতে পাইলাম না। কাক-শাবক এখনও তাহার মার সঙ্গে উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহার মা এখনও তাহাকে আহার দিয়া প্রতিপালন করিতেছে। ছেলেরা এখনও এই কাক-শাবককে কোকিলের ভাই বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, কোকিল কাক ভিন্ন অপর কোন পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে না। নিম্নোক্ত কারণ দৃষ্টে তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইবে।

কোকিল আমাদের দেশে মার্চ্চ হইতে জুলাই পর্য্যন্ত অবস্থান করে। এই সময়ে যে সব পাখী বাসা নির্ম্মাণ করে ও ডিম্ব প্রসব করে, তাহাদের বাসায় কোকিলের ডিম্ব রাখিয়া যাওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইতে পারে। যেসকল মাংসাশী পাখী ঐ সময়ে বাসা প্রস্তুত করে, তাহাদের বাসায় কোকিল ডিম পাড়িবে এরূপ মনে করা অসঙ্গত। বুলবুল, পাপিয়া প্রভৃতি যে কয়েকটী পাখী

মে মাসে বা তৎপূর্ব্বে ডিম পাড়িয়া থাকে, তাহাদের বাসা এত ছোট ও এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে তাহাতে প্রবেশ করিয়া ডিম পাড়িয়া আসা কোকিলের পক্ষে অসম্ভব। অধিকন্তু কোকিল-শাবক ঐসমস্ত পাখী অপেক্ষা বড়, কাজেই কোকিল এরূপ ছোট বাসায় ও অক্ষম পালনকর্ত্রীর উপর নিজের শাবকের পালনের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, সুতরাং বুলবুলের মতন পাখীর বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে বলিয়া মনে করা অসঙ্গত। বড় জাতীয় টিয়াপাখী আকারে কোকিলের মত। তাহারা মার্চ্চ মাসে ডিম পাড়ে। কিন্তু টিয়াপাখী বৃক্ষের কোটরে ডিম পাড়ে সুতরাং সেখানে কোকিলের প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে।

কোকিল মার্চ্চ মাসে আমাদের দেশে আসে, সুতরাং আসিবামাত্র টিয়া পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে বলিয়া মনে করা অসঙ্গত। এক প্রকার ময়না আছে তাহারা চৈত্র মাসে ডিম পাড়ে, সুতরাং তাহাদের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ধনেশ পাখী বৃক্ষকোটরে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া মে মাসের মধ্যেই ডিম পাড়ে। ভিমরাজ পাখী আকারে ও বর্ণে কতকটা কোকিলের মতন; ইহারা মে ও জুন মাসে ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহাদের বাসায় কোকিল ডিম রাখে বলিলে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এদেশে এত অল্প ও এরূপ নিভৃত স্থানে ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে যে কোকিল ইহাদের বাসায় ডিম পাড়ে বলিয়া অনুমান করা যায় না। কেহ কখনও কোকিল-শাবককে ভিমরাজ পাখী কর্ত্তৃক পালিত হইতে দেখে নাই।

কাক বাসা নির্ম্মাণ করিবার অল্পদিন পূর্ব্বে শলিক পাখী বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহারা আকারে কোকিল হইতে বেশী ছোট নয়; সুতরাং ইহাদের বাসায় কোকিল ডিম রাখিতে পারে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু কোকিল তাহা করে না। হয়ত যখন শালিক পাখী বাসা নির্ম্মাণ করে তখন ইহাদের ডিম পাড়িবার সময় হয় না, কিম্বা ইহাদের বাসায় ডিম রাখিয়া যাইতে কোকিল আদৌ ইচ্ছা করে না, কেন না ইহাদের সহিত কোকিলের বর্ণের সামঞ্জস্য নাই। বহুসংখ্যক শালিকের বাসা দেখিয়াছি, কিন্তু কখনও শালিকের বাসায় কোকিল-শাবক দেখিতে পাই নাই কিম্বা শালিককে কোকিল-শাবক পালন করিতে কেহ দেখে নাই।

কাক বর্ষার প্রারম্ভে জুন মাসের মধ্যভাগে বাসা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। তখন গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব কমিতে থাকে, আর কোকিলও আমাদের দেশ ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। তখন অন্য কোন পাখীর বাসা থাকে না। কিন্তু কাকের বাসা অনেক থাকে। তখন কোন কাক বাসা নির্ম্মাণ করিতে থাকে, কেহ বা ডিম পাড়িতে থাকে। সুবিধা বুঝিয়া কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া যায়। অন্য কোন পাখীর বাসায় ডিম না পাড়িয়া কাকের বাসায় ডিম রাখিয়া যাইবার নিম্নোক্ত কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১। কাকের সহিত কোকিলের বর্ণবৈষম্য কিছুই নাই, আকারেও সামান্য পার্থক্য বলিলে চলে।

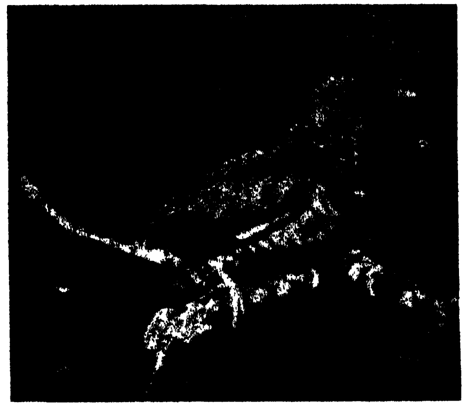
২। কুকু দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে ডিম পাড়ে। কোকিলও পেটে ডিম লইয়া এদেশে আসে না কিছুকাল এদেশে অবস্থানের পর ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। কাক ভিন্ন কোকিল-শাবক পালন করিতে পারে এমন কোনও পাখী সে সময়ে বাসা নির্ম্মাণ করে না কিম্বা ডিম পাড়ে না, কাজেই কোকিল কাকের বাসায় ডিম রাখিয়া যায়।

৩। মুরগী ও পাতিহাঁস কিম্বা মুরগী ও কবুতরের ডিমের মধ্যে আকারের যতটা পার্থক্য কোকিল ও কাকের ডিমের মধ্যে ততটা পার্থক্য নাই; বর্ণেরও বিশেষ কোন তারতম্য আছে বলিয়া অনুভব করা যায় না। ডিমের বর্ণ ও আকার দেখিয়া পালনকর্ত্রীর মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হয় তৎপ্রতি কোকিলের প্রধান লক্ষ্য থাকা সম্ভব। বর্ণ ও আকারের সাদৃশ্য দেখিতে গেলে কাক ও কোকিলের ডিমের মধ্যে যেরূপ সদৃশ্য দেখা যাইবে অন্য কোন পাখীর ডিমের মধ্যে ততটা দেখা যাইবে না। সুতরাং কোকিল কেবল কাকের বাসায় ডিম পাড়িতেই পছন্দ করে। ক্রমে তাহাই উহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৪। Darwin লিখিয়াছেন—"That the common



উড়ন্ত কুকু-শাবক।



পরিপুষ্ট কুকু-শাবক দেশত্যাগ করিয়া যাইবার উপযুক্ত।

cuckoo * * lays only one egg in a nest so that the large and voracious young bird receives ample food."

পালনকর্ত্রী ক্ষুধার্ত্ত শাবককে খাওয়াইতে সক্ষম হইবে বলিয়া কুকু একটী মাত্র ডিম এক বাসায় রাখিয়া যায়; আমাদের কোকিলেরও এ বিবেচনাটুকু থাকিতে পারে; সুতরাং শাবককে যে পাখী ভালরূপ খাওয়াইতে ও পালন করিতে পারিবে তাহার বাসায় ডিম রাখিয়া যাইতে অবশ্যই চেষ্টা করিবে। অন্যান্য পাখী অপেক্ষা কাক ক্ষুধার্ত্ত শিশুকে খাওয়াইতে অধিকতর সক্ষম দেখিয়া কোকিল কাকের বাসায়ই ডিম রাখিয়া যাইতে অভ্যাস করিয়াছে।

৫। আমাদের দেশ কাকবহুল দেশ। এদেশে যত কাক আছে অন্য কোন পাখী তত নাই। যে স্থানে ১০০ জোড়া কাক বাস করে সে স্থানে ৫ জোড়া কোকিল অবস্থান করে কিনা সন্দেহ। কোকিল দেশ ছাড়িয়া যাইবার সময় যে স্থানে ডিম রাখিবার জন্য পাঁচটী বাসার প্রয়োজন সেখানে ১০০টী কাকের বাসা মিলিতে পারে সুতরাং কাকের বাসা ছাড়িয়া অন্য পাখীর বাসায় কোকিল ডিম পাড়িবে কেন? কাক যে-কোন গাছে বাসা নির্ম্মাণ করে, নিভৃত স্থান খুঁজিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না, কোকিলের পক্ষে কাকের বাসা যত সুলভ এমন আর কোনও বাসা নয়।

৬। "That there is a reasonable probability of each cuckoo most commonly putting her eggs in the nest of the same species of bird and of this habit being transmitted to her positively, does not seem to be a very violent supposition."

যে পাখীদের অপর পাখীর বাসায় ডিম রাখিয়া যাওয়ার প্রয়োজন তাহারা স্বশ্রেণীর পাখীদের বাসায় ডিম রাখিতে সম্ভবতঃ প্রথমে যত্নশীল হইয়া থাকে। যেখানে বর্ণ ও আকারে সদৃশ স্বশ্রেণীর পাখী রহিয়াছে সেখানে পরভৃতদের বাসা নির্ব্বাচন করিতে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। আর যেখানে আকার ও বর্ণে সদৃশ সমশ্রেণীর পাখীর অভাব সেখানে পরভৃতদিগকে আকার ও বর্ণে বিসদৃশ স্বশ্রেণীর পাখীর বাসা খুঁজিয়া লইতে হইয়াছে এবং তাহাই অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাক ও কোকিল এক শ্রেণীর পাখী, সুতরাং কোকিলকে আকার ও বর্ণে সদৃশ স্বশ্রেণীর পাখী পাইয়া অন্য বিসদৃশ পাখীর আশ্রয় অন্বেষণ করিতে হয় নাই। বাসা যদৃচ্ছা-ক্রমে পাওয়া যায় বলিয়া কোকিলের পক্ষে আরও সুবিধা হইয়াছে।

কুকু একটী বাসায় দুইটী ডিম রাখে না। আমাদের দেশের কোকিলও তাহাই করে। যেখানেই কাকের বাসায় কোকিলশাবক দেখা গিয়াছে সেখানেই একটী কাক-শিশু আর একটী কোকিল-শিশু দেখা গিয়াছে। এক বাসায় দুইটী কোকিল-শিশু কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর অতীত হইল আমি একজন



কুকু-শাবকের রাক্ষসী ক্ষুধা ও পালকপক্ষীর "আধার" আহরণ।

লোকের নিকট হইতে দুইটা কোকিল-শাবক এক সঙ্গে ক্রয় করিয়াছিলাম। একবাসায় ঐ দুইটা শাবক পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া সে প্রকাশ করিয়াছিল।

একবার একটা কাককে দুইটা কাক-শিশু ও একটা কোকিল-শিশুকে খাওয়াইতে আমি স্বয়ং দেখিয়াছি। সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস যে কোকিল একবাসায় একটী মাত্র ডিম পাড়ে এবং কাক দুইটী ডিম পাড়িয়া থাকে—কাক যখন বাসায় না থাকে তখন কোকিল যাইয়া একটা কাকের ডিম ফেলিয়া দিয়া নিজে একটা ডিম পাড়িয়া রাখিয়া আসে।

একথা নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না, কারণ যে বাসায় কোকিল-শিশু থাকে সেখানে একটী বই কাক-শিশু প্রায় দেখা যায় না। কাকের ডিম নীচে পড়িয়া থাকে বলিয়া অনেকের মুখে শুনিয়াছি কিন্তু নিজে কখনও দেখি নাই। ক্বচিৎ এক বাসায় দুইটী কোকিল-শাবক পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই বলা যাইতে পারে যে কাক হয় ত বাসা প্রস্তুত করিতেছে শেষ হয় নাই, কিম্বা শেষ হইয়াছে তখনো ডিম পাড়িবার দুএক দিন বিলম্ব আছে, এমন সময়ে কোকিল আসিয়া এক বাসায় উপর্য্যুপরি দুই দিন ডিম পাড়িয়া গেল, কিম্বা শূন্য বাসায় একটা কোকিল একটা ডিম পাড়িয়া গেলে পরে আর একটা কোকিল আসিয়া আর একটী ডিম পাড়িয়া গেল, তার পরে কাক ডিম পাড়িয়া তা দিতে বসিল। বাসা নির্ম্মাণের পর পক্ষীদের এত মমতা জন্মে যে পরের ডিমকেও তাহারা ফেলিয়া দেয় না। আপন ডিম বলিয়া মনে করে। আর একটী কোকিল ও দুইটী কাক-শিশু যে স্থলে দেখা যায় সে স্থলে কাক একটী ডিম পাড়ার পরে কোকিল ডিম পাড়ে, তারপর কাক আর একটী ডিম পাড়িয়া তা দেয়।

কুকু মাটিতে ডিম পাড়ে আর তাহা মুখে করিয়া লইয়া অন্য পাখীর বাসায় রাখিয়া আসে। বোধ হয় আমাদের কোকিল এমন করে না। কোকিল যেন মাটিতে বসিতেও ঘৃণা করে। প্রায় সকল পাখীকে মাটির উপর বসিতে দেখিয়াছি কিন্তু জীবনে একবারও কোকিলকে মাটিতে বসিতে দেখি নাই।

কুকু-শাবকের প্রবল ক্ষুধা নিবারণ করিতে বিলাতের পাখীদিগকে যত কষ্ট পাইতে হয়, আমাদের কাককে তত কষ্ট পাইতে হয় না। যে কাক-শিশুর ক্ষুধা নিবারণ করিতে সক্ষম সে কোকিল-শাবকের ক্ষুধা অনায়াসে নিবারণ করিতে পারে, ইহারা পালনকর্ত্রীকে বিশেষ কষ্ট দেয় না।

কাক-শিশু অপেক্ষা কোকিল-শিশু শীঘ্র সবল ও পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠে—শৈশবাবস্থা হইতেই তাহাদিগকে নিজের খাদ্য অন্বেষণ করিতে হইবে, বহুদূর যাইতে হইবে বলিয়া কাকশাবক অপেক্ষা তাহার সবল ও পূর্ণাবয়ব হওয়া আবশ্যক। শৈশবকালীন আত্মনির্ভরতা ক্রমে পরম্পরাগত অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য কোকিল-শাবক অল্প দিনের মধ্যে পালনকর্ত্রীকে ছাড়িয়া বহু দূরে চলিয়া যায়, আর কাক-শিশু প্রায় দুই মাস যাবত খাদ্যের জন্য মার মুখাপেক্ষী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। দুইটী কারণে কোকিল আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করিয়াছে। (১) বৃষ্টির সময় এদেশে থাকিতে পারে না। (২) অন্যান্য কাকেরা যখন কোকিলকে কাকের দলে মিশিতে দেখে তখন ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে কাকের



কুকু-শাবককে পালকপক্ষী কর্ত্তৃক "আধার" দান।

দলে থাকিতে দেয় না। ঠোকরাইয়া তাড়াইয়া দেয়।

পাখীরা নিজে বাস করিবার জন্য বাসা নির্ম্মাণ করে না। ডিম পাড়িয়া শাবক রক্ষা করিবার জন্য বাসা নির্ম্মাণ করে। সুতরাং যে বাসায় ডিম নাই অর্থাৎ যে বাসার শাবকেরা বড় হইয়া উড়িয়া গিয়াছে সে বাসায় যদি কুকু বা কোকিল ডিম পাড়িয়া আসে তবে তাহা নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে, কারণ অন্য কোনও পক্ষী ঐ ডিমে তা দিবে না। কিন্তু যদ্যপি কোন পাখী বাসা নির্ম্মাণ করিতেছে কিম্বা বাসা তৈয়ার হইয়াছে অথচ তখনো ডিম পাড়ে নাই এরূপ সময়ে কুকু বা কোকিল ডিম পাড়ে, তাহা হইলে বাসা-নির্ম্মাণকর্ত্রী তা দিয়া উক্ত ডিম ফুটাইয়া দেওয়া সম্ভব। হয়ত কেহ একবার কি দুইবার দেখিয়াছে কোন পাখী-মাতা একটী কুকু-শাবককে পালন করিতেছে, বাসায় একটীও নিজের শাবক নাই। ইহা হইতে এরূপ বিবেচনা করা সঙ্গত নহে যে কোন ত্যক্ত বাসায় কুকু ডিম পাড়িয়া গিয়াছিল আর পাখী-মাতা তাই দেখিয়া আগ্রহ সহকারে ডিমের উপর তা দিয়া ডিম ফুটাইয়া শাবক প্রতিপালন করিতেছিল। হয়ত পক্ষী-মাতার নিজের ডিম নষ্ট হইয়া গিয়াছে আর সে সুধু কুকু-শাবককে পালন করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে শূন্য বা পরিত্যক্ত বাসায় কুকু বা কোকিল ডিম পাড়িয়া আসিলে অন্য পাখী সে ডিমে তা দিবে ইহা কখনও সম্ভবপর নহে।



কুকু-শাবকের পিঠে চড়িয়া পালকপক্ষী কুকু-শাবকের দুরন্ত ক্ষুধা শান্ত করিতেছে।

পাখীদের ডিমের উপর যত মমতা শিশুর প্রতি ততটা মমতা নাই। মনে কর দুইটী ডিম ফুটিবার উপযুক্ত হইয়াছে তাহা হইতে একটী ডিম স্থানান্তরিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী নূতন ডিম রাখিয়া দিলে পক্ষিণী তাহা বুঝিতে পারিবে না, পূর্ব্বের ডিমটি ফুটিয়া গেলেও সে নূতন ডিমটীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না, তা দিতে থাকিবে। শাবককে উড়াইবার পূর্ব্বে বাসায় ডিম দিলে পক্ষী মাতা তা দিতে পারে, কিন্তু বাসা ত্যাগ করিয়া গেলে সেই পরিত্যক্ত বাসায় ডিম দেখিয়া আবার তা দিতে আসিবে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পাখীরা বাসা ত্যাগ করিলে পুনরায় সেখানে যায় না। তবে হাঁস মুরগী সম্বন্ধে ভিন্নরূপ ঘটিয়া থাকে। মনে কর এক সঙ্গে দুইটী হাঁস ডিম দিতেছে, আমি প্রত্যহ ডিম লইয়া আসি। একটী হাঁস সাত দিন ডিম দিল, অপরটী নয়দিন ডিম দিল, আমি নয়দিনের পর কয়েকটী ডিম বাসায় রাখিয়া দিলাম, তখন দেখা যাইবে উভয় হাঁস ডিমগুলিকে তা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিবে। উভয়েই উহাদিগকে নিজের ডিম বলিয়া মনে করিবে। এ স্থলে নির্দ্দিষ্ট বাসা আছে বলিয়া এইরূপ ঘটিল কিন্তু বৃক্ষবাসী পক্ষীদের মধ্যে তাহা নাই। বাসা হইতে ডিম দুইটী

লইয়া আসিলে পক্ষিণী ও পক্ষী বাসা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে আর সে বাসার মুখো হইবে না। আবার যদি উহাদের ডিম পাড়িবার সময় থাকে তাহা হইলে নূতন বাসা নির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু পুরাতন ত্যক্ত বাসায় আর যাইবে না।

ডিমের সঙ্গে অপর ডিমের আকার ও বর্ণের সাম্য না থাকিলেও পাখীরা নিঃসন্দেহচিত্তে ডিমে তা দেয় ও শাবককে প্রতিপালন করিয়া থাকে। কাক ও কোকিলের ডিমের মধ্যে তাদৃশ বৈষম্য নাই, সুতরাং কাক নিঃসন্দেহে কোকিলের ডিম ফুটাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? তবে বিলাতের পাখীরা যেমন বিসদৃশ ও আকারে বড় কুকু-র ডিম ফুটাইয়া দেয় সেইরূপ অপর কতকগুলি পাখীকে আকারে ও বর্ণে বিসদৃশ ডিম তা দিয়া ফুটাইতে আমি দেখিয়াছি। কবুতর দ্বারা পাতিহাঁসের ডিমে তা দেওয়াইয়াছি, মুরগী দ্বারা পাতিহাঁসের ডিম তা দেওয়াইয়া ফুটাইয়াছি। মুরগী ময়ূরের ডিম তা দিয়া ফুটাইয়াছে।

একটী কবুতর দুইটী ডিম পাড়িয়াছিল, আমি তাহার সঙ্গে একটী পাতিহাঁসের ডিম রাখিয়া দিলাম, কবুতর নিঃসন্দেহে তা দিতে লাগিল; কিছু দিনের পর পায়রার ডিম দুইটী ফুটিল, পক্ষী-মাতা তখনও হাঁসের ডিমে তা দিতে লাগিল। একটী পায়রাশিশু মরিয়া গেল, আমার আর ধৈর্য্য রহিল না, ডিম ফুটাইয়া দেখিলাম ভিতরে হাঁসের শাবক জীবিত ছিল। আর সাত আট দিন অপেক্ষা করিলে বোধ হয় ডিম ফুটিতে পারিত। ইহার পর আর কখনও এ পরীক্ষা করি নাই। প্রতি মুরগীর ডিমের সহিত হাঁসের ডিম দেই, মুর্গী তাহা তা দিয়া ফুটাইয়া দেয়। আমি হাঁস দ্বারা কখনও হাঁসের ডিম তা দেওয়াই না। একবার তিনটী ময়ূরের ডিম পাইয়াছিলাম। ঐ ডিম আনিয়া একটী মুর্গী দ্বারা তা দেওয়াইলাম এক সঙ্গে তিনটী মুর্গীর ডিম ও তিনটী ময়ূরীর ডিম দিলাম। ঘটনাক্রমে প্রায় এক সঙ্গে ডিমগুলি ফুটিল। মুর্গী নিঃসন্দেহে ও আহ্লাদের সহিত ছয়টী শাবককে সঙ্গে করিয়া বেড়াইত। রাত্রে সকলকে ডানায় নীচে রাখিত। চরিবার সময়ে কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে বা চিল দেখিলে সকলকে পেটের ও ডানার নীচে রাখিত। অপর মুরগীর শাবক নিকটে আসিলে তাড়া দিত অথচ ময়ূর-শাবকগুলিকে অতি যত্নে রাখিত। লোয়া (সংস্কৃত লাব) কুক্কুট জাতীয় অতি ক্ষুদ্র পাখী। তাহাদের ডিমও মুরগীর কাছে দিয়াছিলাম, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মুরগী অতি ক্ষুদ্র লোয়ার ডিম ফুটাইয়া শিশুটিকে পালন করিত। কবুতর যখন পাতিহাঁসের ডিম, মুরগী পাতিহাঁস ময়ূর ও লোয়ার ডিম তা দিয়া ফুটায় তখন বিলাতের Wagtail, Pipit, Hedge-sparrow প্রভৃতি কুকু-র ডিম ফুটাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রীজলন্ধর দেব।

সাপুড়িয়া

কে গো তুমি বিদেশী!
সাপ-খেলানো বাঁশী তোমার
বাজালো সুর কি দেশী?
নৃত্য তোমার দুলে দুলে,
কুন্তলপাশ পড়চে খুলে,
কাঁপচে ধরা চরণে।
ঘুরে ঘুরে আকাশ জুড়ে
উত্তরী যে যাচ্চে উড়ে
ইন্দ্রধনুর বরণে।
আজকে ত আর ঘুমায় না কেউ,
জলের পরে জেগেছে ঢেউ,
শাখায় জাগে পাখীতে।
গোপন গুহার মাঝখানে যে
তোমার বাঁশী উঠছে বেজে
ধৈর্য্য নারি রাখিতে।

মিলিয়ে দিয়ে উঁচু নীচু
সুর ছুটেছে সবার পিছু,
রয়না কিছুই গোপনে।
ডুবিয়ে দিয়ে সূর্য্য চন্দ্রে
অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
পশিছে সুর স্বপনে।

নাটের লীলা হায় গো একি,
পুলক জাগে আজকে দেখি
নিদ্রাঢাকা পাতালে।
তোমার বাঁশি কেমন বাজে।
নিবিড় ঘন মেঘের মাঝে
বিদ্যুতেরে মাতালে!
লুকিয়ে রবে কে গো মিছে,
ছুটিল ডাক মাটির নীচে,
ফুটাল ভুঁইচাঁপারে।
রুদ্ধ ঘরের ছিদ্রে ফাঁকে
শূন্য ভরে তোমার ডাকে,
রইতে যে কেউ না পাবে।

কত কালের আঁধার ছেড়ে
বাহির হয়ে এল যে রে
হৃদয়-গুহার নাগিনী!
নত মাথায় লুটিয়ে আছে
ডাক' তারে পায়ের কাছে
বাজিয়ে তোমার রাগিণী!
তোমার এই আনন্দনাচে
আছে গো ঠাঁই তারো আছে,
লওগো তারে ভুলায়ে।
কালোতে তার পড়বে আলো,
তারো শোভা লাগবে ভালো,
নাচবে ফণা দুলায়ে।
মিলবে সে আজ ঢেউয়ের সনে,
মিলবে দখিন-সমীরণে,
মিলবে আলোর আকাশে।
তোমার বাঁশি বশ মেনেছে,
'বিশ্বনাচের রস জেনেছে
রবে না আর ঢাকা সে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন ঐতিহ্য

ভারতবর্ষের প্রাচীন অলঙ্কৃত কাব্যশাস্ত্রের মধ্যে অশ্বঘোষ-রচিত বুদ্ধচরিত কাব্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন কাব্য পাওয়া যায় না। উহার পূর্ব্বেও যে বহুতর কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে; কিন্তু সেগুলির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অশ্বঘোষ-প্রণীত বুদ্ধ-চরিত সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে আমি ঐ কাব্যখানির কিঞ্চিৎ পদ্য অনুবাদ "নব্যভারতে" মুদ্রিত করিয়াছিলাম। তথাপি ঐ কাব্যের প্রতি পাঠকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি নাই।

একটি বিশেষ বিষয়ে পাঠকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য আজ আবার ঐ কাব্যের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া একটি কথার বিচার করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছি। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর কাব্যে সাহিত্য-বিষয়ক যে প্রবাদ বা ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল, তাহার যে অনেক মূল্য, এ কথা অস্বীকৃত হইবে না। প্রথম সর্গের ৪৭ শ্লোকে আছে :—

> সারস্বতশ্চাপি জগাদ নষ্টং বেদং পুনর্যং দদৃশুর্ন পূর্ব্বং।
> ব্যাসস্তথৈনং বহুধা চকার ন যং বশিষ্ঠঃ কৃতবানশক্তিঃ॥

অর্থাৎ—

> অন্য কেহ যাহা পূর্ব্বে খুঁজিয়া পান নাই, সারস্বত সেই নষ্ট বেদ গান করিয়াছিলেন। এই বেদকে ব্যাস বহুধা বিভক্ত করিয়া-ছিলেন, যদিও বশিষ্ঠ তাহা করিতে পারেন নাই।

কেবল এই শ্লোকটি নয়; যে কয়েকটি শ্লোক উদাহরণ দিব, তাহার সকলগুলিতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষমতাশালী লোক দ্বারা যাহা সাধিত হয় নাই, তাহা যে পরবর্ত্তী লোক দ্বারা হইয়াছে, এরূপ কথার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। বেদ পূর্ব্বকালে এক সময়ে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা বেদমন্ত্র হারাইয়া ফেলিয়া-ছিলেন, এ প্রবাদ পৌরাণিক সাহিত্যে আছে; কিন্তু কোন বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন বংশের ব্রাহ্মণদিগের গৃহে হয়ত অসম্পূর্ণভাবে বেদমন্ত্র রক্ষিত ছিল, এবং পরে সেকালের প্রত্নতত্ত্ববিদের হাতে উহার উদ্ধার হইয়াছিল; এই শ্লোকের মর্ম্ম হইতে এইরূপই অনুমিত

হয়। ঋষি সারস্বতের নাম বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মনস্বী দ্বারা নষ্ট বেদের উদ্ধার হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদটি পাইতেছি, তাহাতে নূতনত্ব আছে। "পূর্ব্ববর্ত্তী বশিষ্ঠ যাহা করিতে পারেন নাই, ব্যাস সেই বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন," এই প্রবাদটিও একটু নূতন বেশে উপস্থিত। বশিষ্ঠ বংশের কোন ঋষি সারস্বত কর্ত্তৃক পুনঃপ্রচারিত বেদমন্ত্রগুলিকে একবার শ্রেণীবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহার পর ব্যাস উহা বহু ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, এইরূপই এই শ্লোক হইতে অনুমিত হইতেছে। সারস্বত এবং বশিষ্ঠ-সম্বন্ধের প্রবাদবিষয়ে বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায়ে কয়েকটি কথা আছে। বিষ্ণুপুরাণের উল্লেখটি দেখিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে এই উল্লেখ অশ্বঘোষের কাব্যের উল্লেখের যে কেবল পরবর্ত্তী তাহাই নহে; যখন বিষ্ণুপুরাণের ঐ উল্লেখটি হইয়াছিল, তখন মূল প্রবাদটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উল্লিখিত হইয়াছে যে যুগে যুগে বেদবিভাগ চলিতেছিল এবং অষ্টাবিংশতিবার দ্বাপর যুগ আসিয়াছিল এবং আঠাশটি বেদব্যাস ভিন্নভিন্নবার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেদবিভাগ করিয়াছিলেন। এই গণনায় অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠরূপী ব্যাস এবং নবমে সারস্বতরূপী ব্যাস বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন বর্ণিত আছে। ইহাতে এ কথাও আছে যে চতুর্ব্বিংশ দ্বাপরে সুপ্রসিদ্ধ বাল্মীকি বেদব্যাস হইয়াছিলেন, এবং অষ্টাবিংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐ উপাধি পাইয়াছিলেন। ভবিষ্য দ্বাপর যুগে অশ্বত্থামা বেদব্যাস হইয়া জন্মিবেন, লেখা আছে, কিন্তু তিনি ইউরোপে কি ভারতবর্ষে জন্মিবেন, তাহা লেখা নাই।

৪৬ শ্লোকে আছে:—

যদ্‌রাজশাস্ত্রং ভৃগুরঙ্গিরা বা ন চক্রতুর্বংশকরাবৃষী তৌ।
তয়োঃ সুতৌ তৌ চ সসর্জতুস্তৎ-কালেন শুক্রশ্চ বৃহস্পতিশ্চ ॥

অর্থাৎ—

বেদে ভৃগু এবং অঙ্গিরা ঋষি বংশপ্রবর্ত্তক ঋষিদ্বয়; এমন কি যজ্ঞের অগ্নি অঙ্গিরা ঋষি হইতে উৎপন্ন। উঁহাদের বংশজাত শুক্র এবং বৃহস্পতি রাজশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

মহাভারতে শুক্র এবং বৃহস্পতির প্রণীত ভিন্ন ভিন্ন রাজশাস্ত্রের কথা ধ্বনিত হইয়াছে। এখন শুক্রনীতি বলিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা যে মহাভারতে উল্লিখিত শুক্রের রাজশাস্ত্র নহে, তাহার প্রমাণ এই যে মহাভারতে শুক্রের নামে যেসকল শ্লোক উদ্ধৃত আছে, শুক্রনীতিতে তাহার একটিও পাওয়া যায় না। চাণক্যের নামে প্রচলিত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের বিচারে এই ঐতিহ্যটির অনেক মূল্য আছে।

৪৮ শ্লোকটি রামায়ণের সময়বিচারে উপযোগী হইতে পারে। ঐ শ্লোকটি এই:—

বাল্মীকিনাদশ্চ সসর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ।
চিকিৎসিতং যচ্চ চকার নাত্রিঃ পশ্চাত্তদাত্রেয় ঋষির্জগাদ ॥

সুবিধার জন্য প্রথমতঃ শেষ ছত্রটির কথা বলিব। এই ছত্রে চিকিৎসিত কথা লইয়া pun আছে। অত্রি ঋষি যাহা করিতে পারেন নাই, আত্রেয় বা অত্রি-পুত্র তাহা পরে রচনা করিয়াছিলেন বা গাহিয়াছিলেন। বৈদ্য শাস্ত্র বা চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি আত্রেয় হইতে বলিয়া এ দেশের প্রাচীন প্রবাদ আছে। এবং ঐ প্রবাদ চরকসংহিতার ভূমিকাতেও পাওয়া যায়।

প্রথম ছত্রে আছে যে মহর্ষি চ্যবন যাহা করিতে পারেন নাই, বাল্মীকির 'নাদ' সেই পদ্য সৃষ্টি করিয়াছিল। বেদে চ্যবন ঋষির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু বাল্মীকির নাম পাওয়া যায় না। বাল্মীকি যে চ্যবনের পুত্র, সেই চ্যবন যে আধুনিক, তাহা মনে করিতে পারি। কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি।

বল্মীক এবং বাল্মীকি শব্দের বিচার করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের ভাষা যত দিন প্রচলিত ছিল, ততদিন ঐ শব্দের ব্যবহারই হইতে পারিত না। বেদের ভাষায় 'বম্র,' 'বম্রক,' 'বম্রী' শব্দের অর্থ পিপীলিকা এবং উই। পরবর্ত্তী সময়ের ভাষায় বর্ণব্যত্যয় (metathesis) হইয়া 'বম্র' স্থলে 'বল্ম' হইয়াছিল। কাজেই বাল্মীকি নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। প্রথম বেদবিভাগ যখন কলির প্রথমভাগে ব্যাস কর্ত্তৃক হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত, তখন বেদের টীকায় যেসকল ব্রাহ্মণসাহিত্য হইয়াছিল, তাহা কলিযুগ কিছুদূর অগ্রসর না হইলে হয় নাই। কাজেই অন্ততঃপক্ষে স্বীকার করিতে হইবে যে, বাল্মীকি নামে কোন লোকের উৎপত্তি কলিযুগের কিঞ্চিৎ প্রসারের

পরে হইয়াছিল; তিনি ত্রেতাযুগের ঋষি বা কবি হইতে পারেন না।

বাল্মীকি আদিকবি বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, অশ্বঘোষের গ্রন্থে তাহার প্রাচীনতম উল্লেখ পাইলাম। যে সাহিত্য বেদশাস্ত্রের টীকার জন্য রচিত হইয়াছিল, তাহারও অনেকগুলিতে অবৈদিক অর্থাৎ নূতন ধরণের অনুষ্টুপ ছন্দের রচনা আছে। ঐ রচনা বাল্মীকি নামধারী ব্যক্তির পূর্ব্ব সময়ের হইতেই হইবে। এ স্থলে ক্রৌঞ্চবধ দেখিয়া প্রথম অবৈদিক অনুষ্টুপ ছন্দে বাল্মীকি পদ্য রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করা যায় না। অশ্বঘোষের নির্দ্দেশ হইতে মনে হয় যে, যাহাকে লৌকিক পদ্য বা কাব্য বলা যায়, তাহার প্রথম রচনা বাল্মীকির হাতে। পদ্য, কাব্য প্রভৃতি শব্দ খুব প্রাচীন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। অন্ততঃ চারিশত খৃঃ পূঃ গ্রন্থে সাধারণলোকচরিত্রের কথায় কাব্য রচনা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। বাল্মীকি আদিকবি বলিয়া যে প্রবাদটি আছে, তাহা অতি প্রাচীন বলিয়া এই কথা মনে হয় যে ঐ কবি কর্ত্তৃক বহু পূর্ব্বকালে যে রচনা হইয়াছিল, হয় ত বা তাহা আর নাই। প্রচলিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া হইলেও উহা যে আদি কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, সে কথা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইতে যাওয়াই অন্যায়। যাহা হউক, এ বিষয়ে নানা সময়ে নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছি বলিয়া সে কথার আর উল্লেখ করিব না।

অশ্বঘোষের সময়ের অনেক পূর্ব্ব হইতে যে শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে জানা যায়। ব্রাহ্মণেরা লোকশিক্ষক হইলেও ক্ষত্রিয় জনক ভারতবর্ষে যোগবিধি স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং সুরগণের পক্ষে যাহা সম্ভবপর হয় নাই, শৌরী (কৃষ্ণ) তাহা সাধন করিয়াছিলেন। শ্লোকটি এই :—

আচার্য্যকং যোগবিধৌ দ্বিজানামপ্রাপ্তমন্যৈর্জ্জনকো জগাম।
খ্যাতানি কর্ম্মাণি চ যানি শৌরেঃ শূরাদয়স্তেষবলা বভূবুঃ॥

আর্য্য সমাজে কৃষ্ণপূজার সময় সম্বন্ধে প্রবাসীতে পূর্ব্বে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছি। এখন উহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। কয়েকটি ঐতিহ্য সম্বন্ধে যেসকল নিদর্শনের উল্লেখ করিলাম, এ দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবেন আশা করি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

গোঁপ-খেজুরে

[আলফন্স দোদে লিখিত "লা ফিগ্ এ ল্য পায়েস্যঁ" নামক মূল ফরাসী গল্প অনুসরণে]

কুড়েমির বাথান আর আরাম আয়েসের আড্ডা ছিল সেই ব্লিদা শহরটি। সেখানে একজন মুর ভদ্রলোকের বাস ছিল,—বাপে মায়ে তাহার নাম রাখিয়াছিল সিদি লাকদার, আর শহরের সবাই তাহার নাম রাখিয়াছিল 'আলসে কুড়ে'।

পৃথিবীর মধ্যে অলজেরিয়া কুড়েমির জন্য নামজাদা; তাহার মধ্যে ব্লিদা শহরটি বিশেষ; আর তাহার মধ্যে সিদি লাকদার সবিশেষ। এই মহামহিমান্বিত ব্যক্তিটি আলস্যকেই নিজের আসল পেশা করিয়া তুলিয়াছিল;—অন্য লোকেরা কেউ বা দরজি কেউ বা ভিস্তি কেউ বা সরাইখানার বাবর্চি, কিন্তু সে, সিদি লাকদার, আলসে কুড়ে;—এতেই তাহার গৌরব!

পিতার মৃত্যুর পর সিদি লাকদার ওয়ারিস-সূত্রে একখানি বাগান-বাড়ীর মালিক হইল। সংসার অসার ও অনিত্য, এখানে মেহনত করা মিথ্যা—এই মহাতত্ত্বটি সিদি লাকদারের বেশ মালুম হইয়াছিল। সে হাত পা এলাইয়া বাড়ীর মধ্যে পড়িয়া থাকাটাই উপযুক্ত মনে করিল। তাহার কুড়েমির তাড়সে অল্পদিনের মধ্যেই অতি সহজে বাড়ীটির মাটির দেহ মাটিতে মিশাইল; বাগানের চুনকাম-করা নীচু প্রাচীরটিও খসিয়া খসিয়া এলাইয়া পড়িতে লাগিল; বাগানের দরজা আগাছার আক্রমণে আটক হইয়া অচল হইয়াই রহিল;—কুড়েমির এমনি ছোঁয়াচে মহিমা! বাগানে বাঁচিয়া রহিল এত অযত্নেও গোটাকত আঞ্জীর আর খেজুর গাছ, আর ঘাসের মাঝে গোটা দুই তিন ঠাণ্ডা জলের নহর। বাড়ী যখন দেহত্যাগ করিল, তখন নির্ব্বিকারচিত্তে সিদি লাকদার আসমানের সামিয়ানার তলে ঘাসের ফরাশের উপর হাত পা ছড়াইয়া অনড় অচল নির্ব্বাক

জড় পড়িয়া পড়িয়া জীবনের মেয়াদ কাটাইয়া দিবে সঙ্কল্প করিল।

ক্ষুধা লাগিলে সিদ্দি লাকদার হাতড়াইয়া এক আধটা পাকিয়া-পড়া আঞ্জীর কি খেজুর মুখে তুলিয়া অতি কষ্টে নাচার ভাবে গিলিয়া ফেলিত; ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরিবার মতন হইলেও গা তুলিয়া আপনার এত কষ্টের অর্জ্জিত নাম হাসাইত না। বাগানে আঞ্জীর আর খেজুর, গাছে পাকিয়া গাছেই শুকাইত; ছোট ছোট পাখীর ঝাঁক ফললোভে গাছে কলরব করিত, ঝটাপটি করিত, তাহাতেই যে দুই চারিটা পাকা ফল খসিয়া ঝরিয়া পড়িত তাহাই সিদ্দি লাকদারের ভোগে লাগিত; আর লাল লাল ক্ষুদি পীঁপড়ে মিষ্ট রসে আকৃষ্ট হইয়া তাহার বিপুল দাড়ির কাঁদির ভিতর গাঁধি লাগাইত।

এই অপূর্ব্ব রকমের বাদশাহী কুড়েমি লাকদারকে দেশবাসীর কাছে সমাদৃত সম্মানিত করিয়া তুলিয়াছিল। দেশে তাহার খ্যাতি আর খাতির সাধু সন্ত নবী পয়গম্বরের চেয়ে কম ছিল না। তাহার আস্তানার সম্মুখ দিয়া কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইত না, তাহার আস্তানার কাছাকাছি আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পথিক পদব্রজে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া চলিত; এমন কি তাহার আস্তানার কাছে শহুরে মেয়েরাও ঘোমটা টানিয়া চাপা গলায় ঝগড়া করিত; মকতব মদরসার পড়ুয়ারা পাঠশালার ছুটির পর ক্ষুধা খেলা বাড়ীঘর সব ভুলিয়া ডুরে ছিটের চাপকান আর লাল লাল টুপি পরিয়া উৎসুক কৌতুকে তীর্থযাত্রীর মতো দলে দলে আসিয়া পাঁচিলের উপর চড়িয়া এই মহাপুরুষকে দর্শন করিত।

ছোঁড়ারা কিন্তু এই মহাপুরুষের মর্য্যাদা অধিকক্ষণ রক্ষা করিতে পারিত না; তাহারা তাহার নিশ্চল শয়ন লক্ষ্য করিয়া হাসিত, নাচিত, কলরব করিয়া হাততালি দিত, লাকদারের আটপৌরে ডাকনাম ধরিয়া ডাকিত, নেবু খাইয়া তাহার খোসা ছুড়িয়া তাহাকে মারিত। পণ্ডশ্রম! আলসে কুড়ের নড়নও নাই চড়নও নাই। মাঝে মাঝে সে ঘাসের ভিতর হইতে অতি কষ্টে গেঙাইয়া শাসাইত বটে "রোস ত ছোঁড়ারা, আমি যদি উঠি ত..." কিন্তু ওঠা তাহার কখনো ঘটিয়া উঠিত না।

ভবিতব্যের লিখন আর খোদাতালার মর্জ্জি, পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে একটা ছোঁড়ার উপর আল্লার নেকনজর পড়িল,—তাহার মনে হঠাৎ খেয়াল হইল যে সিদ্দি লাকদারের মতন সেও সটান শুইয়া জীবনটাকে ফাঁকি দিয়া ফুঁকিয়া দিবে। সকাল বেলা উঠিয়া সে বাপের কাছে এত্তেলা করিল যে সে অতঃপর আর পাঠশালের চৌহদ্দি মাড়াইবে না, সে আলসে কুড়ে হইবে।

তাহার পিতা পরিশ্রমী শিল্পী, গুলি গাঁজা খাইবার হুকার নল তৈরি তাহার ব্যবসা। সে মোরগের সঙ্গে জাগিয়া আপনার খরাদকলে নলের গায়ে নক্সা কোঁদে। সে বেটার বায়না শুনিয়া ত অবাক! সে বলিল,—ইয়া আল্লা! আলসে কুড়ে হবি, তুই? ...... তোফা মতলব! বহুত আচ্ছা বাচ্চা! জিতা রহ!

—হাঁ বাবা, আমি সিদ্দি লাকদারের মতন নাম করব!

—আরে তোবা তোবা! এও কি একটা কথা! তুই হলি আমার বেটা, তুই বাপের ব্যবসা শিখে খরাদ করবি, গুলিগাঁজার নল কুঁদবি। আমরা দুনিয়ার লোককে আলসে কুড়ে বানাই, আর তোর সাধ গেল কিনা নিজে আলসে কুড়ে হতে? পৈত্রিক ব্যবসা তোর ভালো না লাগে, তুই তোর আলি চাচার মতন কাজির দপ্তরখানায় দস্তুর মতো দপ্তরী হবি! কিন্তু আলসে কুড়ে, সে কখনো না। .... যা যা, মকতবে যা, নইলে দেখেছিস এই আনকোরা কোড়া, এই দিয়ে তোকে পিটিয়ে লাল করে দেবো।

কোড়ার কড়াকড়িতে পড়িতে যাওয়ায় কড়ার করা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর রহিল না। সে পড়িতে গেল, মকতবে নহে, বাজারের এক রাস্তায়,—একটা গালিচার দোকানের গাঁটরির আড়ালে সটান চিতপাত হইয়া। চিতপাত পড়িয়া পড়িয়া মুর-বাজারের লণ্ঠনের গায়ে রোদের ঝলকানি, নীল রঙের টাকার তোড়ার ঝনঝনানি, বুকের উপর জরির কাজ-করা জামা জোব্বার ঝকমকানি দেখিয়া শুনিয়া, আর গোলাপ জলের কার্ব্বার আর ভেড়ার লোমের বস্তার মিঠে কড়া গন্ধ শুঁকিয়া দিনের পর দিন সে ফুঁকিয়া দিতে লাগিল।

কয়েক দিন পরেই পুত্রের কীর্ত্তিকাহিনী পিতার নিকট

পৌঁছিল। সে চীৎকার করিয়া আস্ফালন করিয়া আল্লার নামে গালাগালি করিয়া দোকানের পুঁজিপাটা নল কঞ্চি একে একে সমস্ত ছেলের পিঠে পিটিয়া পিটিয়া ভাঙিল। পণ্ডশ্রম! মহাজনের সংকল্পের দৃঢ়তা অসাধারণ! বালক পিতাকে বেদনাকতর তারস্বরে বলিতে লাগিল—আমি আলসে কুড়ে হব .... আমি আলসে কুড়ে হব!

এত সাজার পরেও হররোজ সে আপনার কুড়েমির কোণটিতে হাজিরি দিতে লাগিল।

নাচার হইয়া পিতা পুত্রকে বলিল—চল্, নেহাতই যখন আলসে কুড়েই হবি, তখন চল্ তোকে সিদি লাকদারের সাগরেদ করে দিয়ে আসি। সে তোকে কুড়েমিতে তালিম করে দেবে। যতদিন তুই শিক্ষানবিশ থাকবি ততদিন আমিই তোর খোরপোষ চালাব।

পুত্র আনন্দে লম্ফ দিয়া বলিল—সাবাস! বাহবা! তোফা! এই ত আমার বাবার মতন কথা! ভালা মোর বাপরে!

পরদিন প্রভাতেই দুজনে সেই মহাপুরুষ দর্শনে যাত্রা করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল; ক্ষুর দিয়া আচ্ছা করিয়া টাটকা সদ্য মাথা চাঁচিয়া, একটু নেবুর তেলে তুলা ভিজাইয়া কানে গুঁজিয়া, আঙুলে আতর মাখাইয়া মধ্যছাঁটা দীর্ঘ-প্রান্ত গোঁপে চাড়া লাগাইয়া, দীর্ঘ দাড়িতে মেহেদি পাতার রং মাখাইয়া দুজনে ফিটফাট হইয়া যাত্রা করিল।

বাগানের দ্বার অবারিত। অভ্যাগত পিতাপুত্র অবাধে ঝোপঝাড় কঁটাখোঁচা ডিঙাইয়া বাগানে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু বাগানের মালিকের সন্ধান লম্বা ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে অনেক চেষ্টায় তবে মিলিল; তাহারা দেখিল আঞ্জীর গাছের তলে, উপরে পাখীর নীচে পীঁপড়ের ঝাঁকের মাঝে, আগাছার বিছানায় একটা জরদা রঙের ছেঁড়া কাপড়ের পুঁলন্দা পড়িয়া আছে—সেটা তাহাদিগের আগমনে গেঙাইয়া অভ্যর্থনা করিল। যেখান হইতে আওয়াজ আসিল সেখানটা লালচে কালো কি কালচে লাল, সূক্ষ্ম দর্শনে জানা গেল সেটা সিদি লাকদারের বিপুল দাড়ি আর পীঁপড়ের গাধি।

খরাদগর মাজা দুমড়াইয়া কপালে করতল ঠেকাইয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া বলিল—হুজুর মেহেরবান ও কদরদান! এই আমার বেটা, খেয়াল ধরেছে আলসে কুড়ে হবে; এ-কে কত ক'য়ে বুঝিয়ে বললাম আলসে কুড়ে হওয়া কেবলমাত্র সিদি লাকদার আপনাকেই সাজে, গরীবের ছেলের পক্ষে এমন দুরাশা ঘোড়ারোগের চেয়েও সর্ব্বনেশে! কিন্তু এ একেবারে নাছোড়বান্দা! তাই হুজুরের দরবারে নিয়ে এসেছি, আপনি মেহেরবানি করে' পরীক্ষা করে' দেখুন এর আলসে কুড়ে হবার মতন হিম্মত ও হুনর আছে কি না।

সিদি লাকদার কোনো কথা না বলিয়া তাহাদিগকে ঘাসাসনে বসিতে ইসারা করিল। পিতা বসিল, পুত্র ঘাসের উপর একেবারে শুইয়া পড়িল! বাঃ! কি চমৎকার সিদ্ধির সঙ্কেত! ইহাই তাহার সফলতার প্রথম প্রধান ও প্রবল লক্ষণ! বায়নার নমুনাতেই সিদি লাকদার সাগরেদের উপর খুসি হইয়া গেল।

তিন জনেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ। ঠিক দুপুর বেলা। ঝাঁ ঝাঁ রোদ, আর কাঠফাটা গরম। কমলা আর বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রার মতো বহিয়া আসতে-ছিল। আগাছার ডগায় ডগায় শুষ্ক সুঁটীগুলি বাতাসে নাড়া পাইয়া ঝম ঝম ঝুনুর ঝুনুর করিয়া বাজতেছিল আর মাঝে মাঝে একএকটা ফট ফট করিয়া ফাটিয়া বীজগুলি ঝর ঝর করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গাছে গাছে পাখী পাখা মেলতেছিল বুজিতেছিল। পাকা পাকা আঞ্জীর আর খেজুর ডালে ডালে ঠেকিয়া ঠেকিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল। জলের নহর ঘাসের বনে কুল কুল করিয়া বহিতেছিল। চারিদিকে ঘুমের আলস্যের আরামের বিশ্রামের যেন একটা ঘোর লাগিয়া-ছিল। খরাদগর বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল। সিদি লাকদার হাত বাড়াইয়া যে ফলটার নাগাল পাইতেছিল তুলিয়া তুলিয়া মুখে পুরিতেছিল। ছোঁড়া কিন্তু নির্ব্বিকার উদাসীন নিশ্চল নিস্পন্দ! একটা গাছপাকা ডগডগে আঞ্জীর ছোঁড়ার কানের কাছে পড়িল, মুখ ফিরাইলেই তাহা মুখে যায়, কিন্তু সে তবু নিশ্চল। ওস্তাদ শুইয়া শুইয়া মুগ্ধ নেত্রে সাগরেদের এই নবাবী ধরণের আশ্চর্য্য মধুর কুড়েমি উপভোগ করিতে লাগিল।

এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা এমনি ভাবেই চুপচাপ কাটিয়া

গেল। কর্ম্মকুশল খরাদগরের নিকট এই "বৈঠক" (?) নিতান্তই দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তবু সে নীরব নিশ্চল, আসনপীঁড়ি হইয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে পড়িতে পড়িতে এক একবার জাগিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখে ওস্তাদ-সাগরেদের লীলা আর মহাভাব! ওস্তাদের আস্তানায় গরম বাতাস পাকা ফলের গন্ধভারে অলস মন্থর, আপনার চারিদিকে আলস্য ছড়াইতেছিল।

হঠাৎ একটা মস্ত বড় খুব পাকা আঞ্জীর টপ করিয়া ছোকরার ঠোঁটের উপর পড়িয়া চেপ্টা হইয়া গেল। ইয়া আল্লা! এক গণ্ডূষ মধুর মতো আঞ্জীরটির কিবা রং, কিবা স্বাদ, আর কিবা চমৎকার গন্ধ! জিভ বাহির করিয়া মুখের মধ্যে টানিয়া লওয়ার ওয়াস্তা! কিন্তু ছোকরার ঠোঁটের উপর মাধুর্য্যের প্রলেপের মতো আঞ্জীরটি লাগিয়াই রহিল, জিভ দিয়া টানিয়া লইতেও তাহার ক্লেশ বোধ হইতেছিল। থাকিতে থাকিতে লোভ যখন প্রবল হইয়া উঠিল তখন সে পিতাকে চোখের ইসারা করিয়া গেঙাইয়া গেঙাইয়া বলিল—"বাবা, 'গোঁপের ওপর আঞ্জীরটি নামিয়ে দাও ত খাই'!"

এই কথা শুনিবামাত্র সিদি লাকদার মুখের গ্রাস হাতের মুঠার পাকা আঞ্জীরটি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বালকের পিতাকে সক্রোধে তর্জ্জন করিয়া বলিল—"বে-আক্কেল আহাম্মক! এই ছেলেকে এনেছিস আমার সাগরেদ করে দিতে!"

তারপর ছোকরার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া তাহার চরণতলের মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সবিনয়সম্ভ্রমে বলিল—"প্রভু, গুরু, তুমি কুড়ের বাদশা, আলসের ওস্তাদ, এই সাগরেদের প্রণাম গ্রহণ কর!……"

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুমেরু জয়

নরওয়েবাসী ক্যাপ্টেন্ রোয়াল্ড্ আমাণ্ড্সেন্ দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করিয়া সভ্যজগৎকে চমৎকৃত ও স্বদেশকে ধন্য করিয়াছেন। তিনি গত ১৪ ডিসেম্বর (১৯১১) দক্ষিণ মেরুতে পৌছিয়া ১৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

তাঁহার পূর্ব্বে বহুলোক বহুবার দক্ষিণ মেরু পৌছিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহাদের সেই সব চেষ্টা অদম্য উৎসাহ, প্রাণ-পাত পরিশ্রম ও অসীম অধ্যবসায়ের কথা; তুষার-সমুদ্রের পিচ্ছিল পথের উপর দিয়া অনাহারে অনিদ্রায়, ঝড়ঝঞ্ঝার মুখে অগ্রসর হইবার সুদীর্ঘ কাহিনী। দারুণ শীতে তাঁহাদের দেহ কম্পিত হইয়াছে কিন্তু হৃদয় টলে নাই; অনাহার তাঁহাদিগকে ক্লিষ্ট করিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের অগ্রগমনে বাধা দেয় নাই; অকৃতকার্য্যতা তাঁহাদিগকে পদে পদে ব্যথিত করিয়াছে কিন্তু তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। সাধনার জয় অবশ্যম্ভাবী, অবশেষে দক্ষিণমেরু আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দক্ষিণমেরু আবিষ্কারের চেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অতি প্রাচীনকালে গ্রীক ভূগোলজ্ঞেরা বুঝিয়াছিলেন যে তখনকার-জানিত পৃথিবী উত্তর গোলকার্দ্ধের অত্যল্প অংশই অধিকার করিয়া আছে। দক্ষিণ গোলকার্দ্ধের সমস্তটারই আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন। ১৪১৮ সালে পর্ত্তুগালের রাজকুমার প্রিন্স্ হেন্‌রি গ্রীষ্ম-মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া ও আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে পৌছিবার অভিপ্রায়কে উৎসাহিত করেন। এই সময় হইতে দক্ষিণ গোলকার্দ্ধ অনুসন্ধানের আরম্ভ। এই দক্ষিণ মহাদেশের অনুসন্ধানই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের আবিষ্কারকদের প্রধান চেষ্টা ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোনো নাবিকই কুমেরু-বৃত্তে পৌছিতে পারেন নাই। ১৭০০ সালের জানুয়ারি মাসে হ্যালি ৫২° (দ) পৌছিয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী নাবিক ৫৫° (দ) পৌছিয়াছিলেন। জেমস কুক্ ও অপর এক জন ১৭৭২ সালে দুইখানি জাহাজে যাত্রা করিয়া ১৭৭৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি সর্ব্বপ্রথম কুমেরু-বৃত্ত অতিক্রম করিয়া ৬৭° ১৫′ (দ) পৌছিলেন। এই স্থানে বরফ তাঁহাদের গতিরোধ করিল। ১৭৭৪ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁহারা ৭১° ১০′ (দ)


ক্যাপ্‌টেন আমাণ্ড্‌সেন্।

পৌঁছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার দক্ষিণে আর কেহ যাইতে পারেন নাই। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স্ ওয়েড্‌ল্ ৭৪° ১৫′ (দ) পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি কুমেরু দেশস্থ জীবসংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ সালে রস্ ৭৮° ১০′ (দ) পৌঁছিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী নরওয়ে দেশের "য়্যাণ্টার্‌টিক্" নামক জাহাজের কাপ্তেন্ সর্ব্বপ্রথম কুমেরু-মহাদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। "সাদারন্ ক্রস্" নামক জাহাজে আর একটি অভিযান ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি কেপ্ য়্যাডেয়ার পৌঁছিয়াছিল। এই অভিযানে প্রায় পঞ্চাশটি কুকুর লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা দশজন এক বৎসর কুমেরু-দেশে বাস করিয়াছিলেন। ইহাই মানবের কুমেরু-দেশে বাস করার প্রথম উদাহরণ। কুকুরটানা গাড়ী চড়িয়া মেরু আবিষ্কারের চেষ্টা করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন না, কেবল জীবজন্তুর বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ফিরিলেন। ১৯০১ সালের শরৎ-কালে কমাণ্ডার স্কটের অধীনে আর একটি অভিযান প্রেরিত হইল। লেফটন্যাণ্ট্ য়্যাক্‌ল্‌টন্‌ও এই দলে ছিলেন। ৭৭° ৪৯′ (দ) জাহাজ রাখিয়া তীরে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। কুকুরটানা গাড়ী চড়িয়া তাঁহারা ভূমি আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিলেন। পথে মাঝে মাঝে ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া আহার্য্য দ্রব্য সংরক্ষিত হইল। পথে তাঁহারা নেকড়ে, ভল্লুক বা শেয়ালের সাক্ষাৎলাভ করেন নাই, শীকারও দুষ্প্রাপ্য ছিল। তাঁহারা গাড়ীতে খাদ্যদ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। ১৯০২ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাঁহারা ৮২° ১৭′ (দ) পৌঁছিয়াছিলেন। ৫৯ দিনে তাঁহারা ৩৮০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁহারা জাহাজে আসিয়া পৌঁছিলেন। য়্যাক্‌ল্‌টনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত একখানি জাহাজে দেশে ফিরিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা দ্বিতীয় বৎসর শীতের অন্ধকার মাসগুলো য়্যাসেটিলিন্ গ্যাস জ্বালাইয়া অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিলেন। ১৯০৮ সালের ১ জানুয়ারি য়্যাক্‌ল্‌টন্ পুনরায় যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে য়্যাসেটিলিন্ গ্যাস ও মাঞ্চুরীয় টাটু ঘোড়া ছিল। এবার ঘোড়াগুলি সঙ্গে থাকাতে গাড়ীটানা দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হইয়াছিল। পথে অগ্রসর হইবার সময় কোনো ঘোড়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে সেটিকে গুলি করিয়া মারিয়া তাহার মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। ১৯০৮ সালের বড়দিনে তাঁহারা ৮৫° ৫৫′ (দ) ও ১৯০৯ সালের ৯ জানুয়ারি ৮৮° ২৩′ (দ) পৌঁছিলেন। এস্থানটি সমুদ্র হইতে ১১,৬০০ ফুট উচ্চ। আরো কিছু আহার্য্য থাকিলে মেরু পর্য্যন্ত অবশিষ্ট ৯৭ মাইল যাওয়া অসম্ভব হইত না। কিন্তু খাদ্যাভাবে দারুণ দুর্গতি ভোগ করিয়া ৭০০ মাইলের উপর পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা জাহাজে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

য়্যাক্‌ল্‌টনের প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ক্যাপ্টেন্ আমাণ্ডসেন্ মেরু আবিষ্কারের সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করেন। ক্যাপ্টেন্ আমাণ্ড্‌সেনের দলে উনিশ জন লোক ছিল। তাঁহার জাহাজের নাম 'ফ্র্যাম্'—এই জাহাজ উত্তরমেরু আবিষ্কার-যাত্রী প্রসিদ্ধ ন্যান্‌সেনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাঁহার শেষ মেরু-অভিযানে তিনি এই জাহাজ ব্যবহার করিয়া-ছিলেন।

আমাণ্ডসেন্ তাঁহার শীতের আড্ডা হইতে কুকুরটানা গাড়ী চড়িয়া দক্ষিণ মেরুর অভিমুখে ছয় সাত শত মাইল পথ গিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের আরো চারিটি অভিযান এই একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল। ইংরাজ অভিযান ক্যাপ্টেন্ স্কটের অধীনে "টেরা নোভা" নামক জাহাজে প্রেরিত হইয়াছিল। এ দলে ষাট জন লোক ছিল। স্থলপথে ভ্রমণের জন্য কুকুর, টাটুঘোড়া ও "মোটর স্লেজ্" ছিল। অপর অভিযানগুলির মধ্যে একটি জার্ম্মান্, একটি জাপানী ও একটি অষ্ট্রেলীয়।

আমাণ্ডসেনের বয়স চল্লিশ বৎসর মাত্র। তিনিই সর্ব্বপ্রথম (১৯০৩-০৫) আট্ল্যাণ্টিক্ মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে উত্তর-পশ্চিম পথ দিয়া জাহাজ লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই পথটিই খুঁজিতে খুঁজিতে কলম্বাস দৈবক্রমে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আমাণ্ডসেনের (১৯০৩-০৫ সনের) অভিযানে লক্ষ টাকার বেশী খরচ হয় নাই। তিনি মাছ ধরিবার ৭০ ফুট লম্বা এক ক্ষুদ্র পোতে আরোহণ করিয়া তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আমাণ্ডসেন্ নিজ মুখে দক্ষিণ মেরুযাত্রার যে বিবরণ বলিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"স্কট্ যে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছিয়াছিলেন তাহার কোনো নিদর্শন দেখিতে পাই নাই। হয়ত তিনি সেখানে পৌঁছিয়া এমন কোনো সামান্য নিদর্শন রাখিয়া আসিয়াছিলেন যাহা ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এরূপ ঘটনা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, কারণ যে তিন দিন আমি সেখানে ছিলাম সে কয় দিনই বায়ুর অবস্থা বেশ শান্ত ছিল। ইহাই সেখানকার বায়ুর সাধারণ অবস্থা বলিয়া বোধ হয়। চারিদিকেই অসীম তুষারমণ্ডিত সমতলভূমি, সে হেতু সেখানে প্রস্তরস্তূপ স্থাপন করা অসম্ভব।

"প্রথম প্রথম প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টায় পনের মাইল গিয়া দুই ঘণ্টা নিজেরা আহার করিতে ও কুকুরগুলোকে খাওয়াইতে ব্যয়িত হইত; বাকি ১৭ ঘণ্টা ঘুমাইয়া কাটাইবার চেষ্টা করা হইত। বিশ্রামের সময়টা আমাদের পক্ষে ও কুকুরদের পক্ষে নিতান্ত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হওয়াতে স্থির করা গেল, প্রায় ছয় ঘণ্টায় পনের মাইল যাওয়া হইবে; তৎপরে দুই ঘণ্টা আহার করিতে ও কুকুরগুলোকে আহার করাইতে যাইবে; তৎপরে ছয় ঘণ্টা নিদ্রা, তৎপরে পুনরায় ভোজন ও যাত্রা। এইরূপে ফিরিবার সময় আমরা দিনে বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছি। শেষাশেষি প্রায় ছয় সপ্তাহ খুব উচ্চে কাটাইয়াছি কখনো কখনো ১৬ ৭৫০ ফুট উচ্চে। এখানে নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইয়াছিল, উঠিবার সময় খুব হাঁপাইয়াছিলাম। ঠিক মেরু স্থানটি ১০,৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

"পথিমধ্যে কখনো আমাদের আহার্য্যের অনাটন হয় নাই। কিন্তু অনাটন হয় নাই বলিলে ইহা বুঝিবেন না যে আমরা পেট ভরিয়া খাইতাম, কারণ কুকুরটানা গাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় ক্ষুধাটা মাত্রা ছাড়াইয়া ওঠে। ফিরিবার সময় কিন্তু ৮৬° পার হইয়া তবে আমরা ভাণ্ডার হইতে পেট ভরিয়া খাইয়াছিলাম। মেরু যাইবার সময় ৮৫½°তে প্রথম কুকুরের মাংস খাওয়া হইল। এইখানে ২৪টি কুকুর মারা হইয়াছিল। সর্ব্বদা পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলেও তাহারা খুব হৃষ্টপুষ্ট ছিল; কুকুরের মাংস খাইতে অতি সুস্বাদু; সে মাংস খাইতে কোনো কষ্টই বোধ হয় নাই। ৮৫½°তে দুইটি 'স্কুয়া গাল' পাখী দেখিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় পথ চিনিবার জন্য একটা স্তূপ স্থাপনা করিয়াছিলাম। আমরা যেই যাত্রা করিয়াছি অমনি পাখীগুলো উড়িয়া আসিয়া স্তূপের উপর বসিল। তিনটি ভাল কুকুর ৮৩°তে আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিল। ৮২½°তে আমরা একটি কুকুরীকে মারিয়াছিলাম, কুকুরগুলো তাহারই সন্ধানে গিয়াছে। আমাদের ভাবনা হইল যে কুকুরগুলো আমাদের ভাণ্ডার লুট করিয়া খাইবে। মেরু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৮৩°তে পৌঁছিয়া ভাণ্ডার-চাপা বরফের স্তূপের চারিধারে কুকুরের পদচিহ্ন দেখা গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় ভাণ্ডার মধ্যস্থ পেমিক্যান্ (মাংসের বড়া) কিছুতে স্পর্শও করে নাই, যেমনকার তেমনি আছে। কুকুরগুলোর পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ৮২½°তে যাওয়া গেল। এখানে কুকুরীটিকে মারিয়া একটা বরফের গাদার উপর আহারের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কুকুরগুলো সেটিকে আহার করিয়া ৮২°তে ভাণ্ডারে গিয়া একটা 'পেমিক্যানের' বাক্স সাবাড় করিয়াছে; তদুপরি খাওয়ার জন্য আরো দুইটি কুকুর মারিয়া রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেগুলাও

খাইয়াছে, এমন কি চামড়ার দড়ি ও অন্যান্য দুষ্পাচ্য বস্তুও বাদ দেয় নাই। মাত্র এগারোটা কুকুর আমাদের সঙ্গে জাহাজে ফিরিয়াছিল।

"মেরুর অদূরে উঁচু পাহাড়ের উপর আমি ও আমার চারজন সঙ্গী ক্রিষ্টমাস উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলাম। সে দিনকার ভোজে কিছু বেশী বিস্কুটের বরাদ্দ ছিল। নরওয়ের ক্রিষ্টমাসের সহিত কত প্রভেদ, কিন্তু আনন্দের কমতি ছিল না। ফিরিবার সময় আমরা এক দিনও বিশ্রাম করিতে পাই নাই, এমন কি ক্রিষ্টমাসের দিনও নয়। দিনের পর দিন বায়ুর সকল অবস্থাতেই চলিয়াছি। আমাদের কোনো বিপদ ঘটে নাই, কিন্তু খুব কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

"আমার সহচরেরা ও কুকুররা আমার কৃতকার্য্যতার মূল। 'ফ্র্যাম্' জাহাজে কুকুরগুলোকে যথেষ্ট সাবধানতার সহিত রাখা হইয়াছিল, সেই হেতু তাহারা যখন কুমেরুদেশে পদার্পণ করিল তখন তাহাদের স্বাস্থ্য অটুট ছিল। মেরু-যাত্রায় আহারের কষ্ট হয় নাই বরং তাহার বিপরীত; কারণ আমার সঙ্গীরা যখন জাহাজে ফিরিলেন তখন তাঁহারা মোটা হইয়াছেন বলিলেও চলে। যাত্রা করিবার সময় তাঁহারা যে পরিমাণ আহার করিতেন এখন আর তেমন পারেন না। কুকুরগুলোও মোটা হইয়াছিল। তাঁবুর গোড়ায় অনেক শীল-মাংস পড়িয়া ছিল তাহারা তাহা স্পর্শ করে নাই। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যাত্রার শেষভাগে তাহাদের আহারের কোনো কষ্ট হয় নাই। স্নান বা দাড়ি কামানো কখনো ঘটিয়া উঠে নাই। দাড়ি লম্বা হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে দাড়ির উপর বরফ জমে বলিয়া দাড়ি ছাঁটিয়া ফেলা হইত; আমাদের সঙ্গের দাড়িছাঁটা কলটি খুব কাজে লাগিয়াছিল। আর একটি যন্ত্র আমাদের সঙ্গে ছিল; এটি দাঁত উপড়াইবার যন্ত্র। একটি লোকের দাঁত খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সেটি উপড়ান নিতান্ত প্রয়োজন; যন্ত্রটি না থাকিলে এটি উপড়াইবার জো ছিল না। আমাদের দলের কয়েকজন একরকম নূতন জাতের পাখী দেখিতে পাইয়াছিল।"

"কুমেরু-দেশ প্রধানত স্থলদ্বারাই গঠিত। এ দেশে আগ্নেয়গিরির উৎপাত বর্ত্তমান। সেখানে প্রবল তুষার-ঝটিকা বহে; ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ৪০—৬০ মাইল হয়। যখন তুষার-ঝটিকা বহে তখন আকাশ হইতে তুষারপাত হইতেছে, কি ভূমি হইতে তুষার উড়িতেছে তাহা বলা অসম্ভব। অনাবৃত স্থানে শৈবাল, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। ফুলের গাছ একেবারেই নাই। জলজন্তু নানাপ্রকার আছে। নানাপ্রকার তিমি ও শীল দেখা যায়। জলে স্থলে পাখীও যথেষ্ট আছে, তন্মধ্যে পেঙ্গুইন্ উল্লেখযোগ্য। স্থলচর জন্তু নাই—কেবল একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র পক্ষবিহীন পোকা দেখা যায়।"

বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে মেরু আবিষ্কার হওয়াতে আমাদের অনেক লাভ হইবে। বায়ুবিজ্ঞান, ভূগোল ও ভূকম্পবিজ্ঞান—বিজ্ঞানের এই তিনটি শাখার অন্তত প্রভূত লাভ হইবে। বায়ুর অবস্থা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আরো নির্ভুল হইবে। ঝটিকার আগমনবার্ত্তা সময় থাকিতে নিরূপিত হইবে ও দেশে দেশে প্রচারিত হইয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিবে। মেরুদেশের ভূকম্পের ধারা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যই কুমেরুতে জাপানী অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। পৃথিবীর এই কঠিন আবরণের বিকম্পন পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তুষারময় দেশে ভূকম্প-নিরূপণযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। একটা কথা উঠিয়াছে যে কুমেরুদেশে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ আছে; একজন ফরাসী না কি সোনারও সন্ধান পাইয়াছেন। পারী "নেশন্" বলেন যে কুমেরুদেশ ঐশ্বর্য্যের খনি। ইহা যদি সত্য হয় ত ভবিষ্যতে জাতি-সমূহের মধ্যে ইহার জন্য বিবাদ বিসম্বাদ, এমন কি রক্তারক্তিও অসম্ভব নহে। ন্যানসেন্ বলেন :—

"মেরুদেশের জলস্থলের অবস্থার সঠিক পরিচয়ের উপর বায়ুবিজ্ঞান, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি, সামুদ্রিক স্রোত ও ভূমণ্ডলের প্রাকৃত ইতিহাস সম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে।"

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিদি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ প্রথমে মনে করিয়াছিল চারুকে কোনো বন্ধুর বাটীতে রাখিয়া দিবে কিন্তু দেবেন তাহার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার না করায় আর কোনো বন্ধুর নিকট সাহায্য চাহিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কে কি বলিবে, হয়ত কত কৈফিয়ৎ সাক্ষ্য সফিনার তলব পড়িবে। শেষে হয়ত তাঁহারা বলিবেন - না বাপু! পরের বালাই কে ঘাড়ে করে! বিশেষ হিন্দুর ঘরের বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া কন্যা! এত বড় বালাই আর নাই। অগত্যা অমর চারুকে নিজের বাসাতেই লইয়া গেল। গ্রীষ্মাবকাশ অমরের এই ব্যাপারেই কাটিয়া গেল, বাটী যাওয়া হইল না। হরনাথবাবু কৈফিয়ৎ চা হয়া পাঠাইলেন। অমর কোনো রকমে তাহা কাটাইয়া দিল।

অমরের বৃহৎ বাসাবাটীতে চারুর জন্য কোনো নূতন বন্দোবস্তের দরকার হইল না। কেবল তাহার জন্য একটী বর্ষীয়সী ঝি রাখিতে হইল। চারুকে নানারূপ সস্নেহ বাক্যে ঈষৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া অমর নিজে যথারীতি কলেজ যাইতে আরম্ভ করিল এবং তাহার পাত্রানুসন্ধানের জন্য সচেষ্ট রহিল। কি জানি কেন পিতাকে এসব কথা বলিতে তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল। সে ভাবিয়াছিল শীঘ্রই একটী সুপাত্রের সহিত চারুর বিবাহ দিয়া ফেলিয়া তারপরে পিতাকে সে অনাবশ্যক কথা বলিলেও চলিবে, না বলিলেও ক্ষতি হইবে না। এখন সকলের কৌতূহলী কৃপাদৃষ্টির উপরে অসহায়া চারুকে ভিখারিণীর ন্যায় দাঁড় করাইতে তাহার অন্তর পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই মৃত্যুশয্যা-শায়িনীর সম্মুখে প্রকারান্তরের অঙ্গীকারও মধ্যে মধ্যে তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিতেছিল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া শেষে সে উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততার সহিত পাত্রই খুঁজিতে আরম্ভ করিল। দেবেন মধ্যে একখানা পত্রে চারুর কি ব্যবস্থা সে করিয়াছে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিল,—বিরক্তি ও ক্রোধভরে অমরনাথ তাহার কোনো উত্তর দেয় নাই।

নববর্ষা সমাগমে মহানগরী নবীন শ্রী ধারণ করিল। সৌধমালা তাহা। জানালা দরজা রুদ্ধ করিয়াও নববর্ষার আগমন-সংবাদকে লুকাইতে পারিতেছিল না। খোলা ছাদের উপরে গাঢ় কজ্জল আকাশ, মুক্তাধারার ন্যায় তাহা হইতে অশ্রান্ত মৃদুধারা বর্ষিত হইতেছে, পার্শ্বে কদম্ব ও শিরীষ গাছ দুটী ফুলে ফুলে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। ছাদের টবে চারুর অচেনা ফুলগুলি হইতে মৃদু মৃদু গন্ধ মুক্ত গবাক্ষপথে প্রবেশ করিতেছিল। খোলা জানালার সুমুখে চারুলতা দাঁড়াইয়া। মৃদু বারিকণা গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখের বন্ধন-বিস্রংস কুঞ্চিত কেশে সঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

চারু ভাবিতেছিল তাহাদের গ্রামের কথা। এই বর্ষায় সে তাহাদের চালের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বারি বর্ষণ দেখিত। সম্মুখে ঝম্ ঝম্ শব্দে অশ্রান্ত বারিপতনের সঙ্গে চারিধারে ভেক ও ঝিল্লির গম্ভীর শব্দ, চারিধারে বনফুলের কেমন মধুর গন্ধ উত্থিত হইত। একএকবার মেঘ গড়্ গড়্ করিয়া ডাকিয়া উঠিত, অমনি মা ঘরের ভিতর হইতে ডাকিতেন 'ওমা চারু, ঘরে আয়।'

পশ্চাৎ হইতে অমরনাথ বলিল, "একি চারু ভিজ্‌ছ কেন?"

চারু মুখ ফিরাইয়াই এক পাশে সরিয়া গেল। অমর ঘুরিয়া সম্মুখে গিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

"চারু কাঁদ্‌ছ?"

চারু নীরব রহিল।

"কেন কাঁদ্‌ছ? এখানে কি তোমার কোনো কষ্ট হচ্চে?"

চারু ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "না।"

"তবে কেন কাঁদ্‌ছ? বল্‌বে না? মার জন্যে মন কেমন কর্‌ছে?"

"হাঁ।"

অমরনাথ জানালার নিকটে গিয়া শাসি বন্ধ করিল। তার পরে নিজে একখানি চেয়ারে বসিয়া অন্য একখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "বোস।"

চারু সঙ্কুচিত ভাবে যথাস্থানে উপবেশন করিল।

"চারু, এখনো তুমি মার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদ?"

"না।"

"এই যে কাঁদ্‌ছিলে ?"

"আজ হঠাৎ কেমন মন কেমন কর্‌ছিল।"

"কেন মন কেমন কর্‌ল চারু ?"

"কি জানি, এই বর্ষা দেখে মন কেমন কর্‌ছিল।"

"কেন ?"

"বাইরে থাক্‌লে মা আমায় ঘরে যেতে ডাকতেন। আর—" বলিতে বলিতে চারু অশ্রুধৌত মুখখানি নীচু করিল।

অমর সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল—"আর কেউকি তোমায় তেমন ভাল বাসেনা চারু ?"

চারু নীরবে অশ্রু মুছিতে লাগিল।

"আর কেউ কি তোমার জন্যে তেমন ভাবেনা চারু ?"

চারু অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল -"আমার আর কে আছে ?—আপনি ছাড়া !"

অমর চারুকে একটু প্রফুল্ল করিবার জন্য হাস্তমুখে বলিল—"এ আপনি ছাড়া কথাটা বুঝি এখনি ভেবে নিলে ? যখন কাঁদছিলে তখন মনে ছিলনা - না ?"

চারু মুখ তুলিল—ঈষৎ আনন্দ ও লজ্জার আভাসে পাণ্ডু মুখখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিল। মৃদুস্বরে বলিল,—"না।"

অমর আবার হাসিয়া বলিল—"কথাটা এখুনি ভেবে বলনি, সেই না, না, মনে ছিলনা, সেই না ?"—

চারু আরও একটু প্রফুল্লস্বরে নত মুখে বলিল, "আমার কথা আপনি ভাবেন - আমায় ভালবাসেন—সেকথা আমার সর্ব্বদাই মনে থাকে। মা যে আমায় আপনাকেই দিয়ে গেছেন ?"—

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল!—অমরের বুকে আবার একটা আঘা লাগিল। সরলা বালিকা হয়ত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে জানেনা বলিয়াই কথাটা এমন ভাবে বলিয়া ফেলিয়াছে। অমরনাথ সেটুকু মন হইতে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় চেয়ারখানা চারুর নিকট হইতে একটু দূরে লইয়া গিয়া কিছুক্ষণ তাহাতে স্থির ভাবে বসিয়া রহিল।

চারুও তেমনি নতমুখেই বসিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে অমরনাথ গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া ধীর স্বরে বলিতে লাগিল—"আমিও সেই জন্যেই একটা যার তার হাতে তোমায় ফেলে দিতে পার্‌ছি না; এত দিন খুঁজে খুঁজে এখন একটি ভাল পাত্র পেয়েছি, উপযুক্ত পাত্রে দিয়ে তোমায় সুখী দেখ্‌তে পেলেই আমি এখন ঋণ থেকে মুক্ত হই। চারু অত লজ্জিত হয়োনা, তুমি ত বড় হয়েছ, সব ত বুঝ্‌তে পার, বুঝে ছাখ, এসব কথা তোমার সাক্ষাতে না বলে আর কাকে বল্‌তে পারি এমন তোমার কে আছে? কেমন চারু, তোমার বোধ হয় অমত হবে না ?"

অমরনাথ বেশ বুঝিতে পারিতেছিল যে এগুলা তাহার অনর্থক বকা মাত্র হইতেছে, কেন না এসব কথার চারু যে কিছু উত্তর দিবে ইতিপূর্ব্বে সে এমন কোনো প্রমাণ পায় নাই—বিবাহের প্রসঙ্গ মাত্রেই চারু মূকের মত মৌন হইয়া পড়ে। বালিকাসুলভ লজ্জা ?—কিম্বা কি এ ?—অমরনাথের মনে কেমন একটা কৌতূহলও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

"চারুলতা !—যা বল্‌লাম বুঝতে পার্‌লে ত ? কোনো অমত নেই ত তোমার ?"

চারু নিস্পন্দ হইতে ক্রমে নিস্পন্দতর হইয়া যাইতে লাগিল। অমরনাথের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। তাহার ভাবের ব্যতিক্রমে অমরনাথের মনে একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। বিবাহ সম্বন্ধে চারুর এ নীরবতা যেন কি এক রকমের,—ইহাকে ঠিক লজ্জার সঙ্কোচও বলা যায় না। এ যেন মৃতবৎ নিশ্চেষ্টতা। অমরনাথ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল কিন্তু কোন উপায়ও দেখিতে পাইতেছিল না। সহসা অমরনাথের মনে হইল চারু ভালবাসা সম্বন্ধীয় কথায় বেশ উত্তর দেয়, এবং সে প্রসঙ্গে বেশ একটু প্রফুল্লও হইয়া উঠে, অতএব সেই দিক দিয়াই কথাটা আরম্ভ করিলে যদি এ সমস্যার মীমাংসা হয় তো চেষ্টা দেখা যাক। অমর গল্প জুড়িয়া দিল।—

"আচ্ছা চারু! তুমি তোমাদের গ্রামের কাকে কাকে খুব ভাল বাসতে ?"

চারু প্রথম উত্তর দিল না; অমরনাথ আরও দু একবার সে প্রশ্ন করায় শেষে অতি মৃদুকণ্ঠে কাসিয়া কাসিয়া বলিল—"কাকে কাকে ? মাকে, ভুলো কুকুরকে,

টিয়াটীকে, দেবেন দাদার বোন সুখুকে, দেবেন দাদাকে, আপনাকে— ”

“আমাকে? সে কি চারু? তোমাদের গ্রামে আমায় কোথায় পেলে?”

“কেন? আপনি যে দুবার গিয়েছিলেন। আমাকে সেবার অসুখ থেকে ভাল করেছিলেন। মাও আপনাকে কত ভাল বাস্‌তেন, কত আপনার নাম কর্‌তেন, দেবেন দাদা কত আপনার গল্প, আপনাদের বাড়ীর গল্প বল্‌তেন।”

অমরনাথ দেখিল সে যাহা এড়াইতে গিয়াছিল সেই ঘটনাই সম্মুখে আসিয়া পড়িল। মনে মনে আবার একবার দেবেনের অবিমৃষ্যকারিতার নিন্দা করিয়া অমর আবার গল্প করার মত ভাবে প্রশ্ন করিল—

“আচ্ছা চারু! আমার মতন এই রকম কিম্বা আমার চেয়ে ভালো একটী লোকের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে দিয়ে দিই তো কেমন হয়? তাকে খুব ভালবাসবে?”

“না।”

অমরনাথ শিহরিয়া উঠিল। “কেন চারু”?

“আপনি যে আমায় ভালবাসেন।”

“সেও তোমায় আমার চেয়ে বেশী ভাল বাস্‌বে।”

চারু আবার কাঠের মত শক্ত হইয়া গেল। অমরনাথ নীরবে থাকিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। আবার বলিতে লাগিল—

“হ্যাঁ লতা, সে তোমায় নিশ্চয় খুব ভাল বাস্‌বে। সে খুব বড় লোক। তার মস্ত বাড়ী, কত চাকর চাকরাণী। তোমার খেলার সঙ্গী বোধ হয় সেখানে অনেক পাবে। বিয়ে হয়ে গেলেই সেখানে সে নিয়ে যাবে। শুনে বেশ আহ্লাদ হচ্চে, না চারু? সে দেখ্‌তেও খুব সুন্দর,—খুব ভাল লোক।” —অমর সহসা চাহিয়া দেখিল চারু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারের হাতায় মাথা রাখিয়াছে। অস্ফুট রোদনধ্বনি তাহার কণ্ঠ হইতে ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেছে। অমর তাড়তাড়ি তাহার নিকটে গিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া সস্নেহ ভৎর্সনার স্বরে বলিল “ওকি চারু ওকি ওকি!”

চারু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—“আমি যাব না, আমি যাব না।”

“সেকি? কেন? চারু”—

“আমি তা হলে মরে যাব।”

অমর স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইল। যাহা এতক্ষণ সবলে নিজের মন হইতে তাড়াইতেছিল এই তো তাহা স্পষ্ট ভাবে তাহার সম্মুখে। আর তো তাহাকে অলীক সন্দেহ বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে পারা যায় না। ঐ তো বেদনা-ক্লিষ্টা ক্রন্দনকম্পিতা অশ্রুমুখী বালিকা নীরব নতমুখে জানাইতেছে তাহারই সে, সে অন্য কাহারও হইতে পারিবে না।

একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেও অমরনাথ কি ইহাতে দুঃখিত হইল? দুঃখ? এমন সরল স্নিগ্ধ অস্ফুটন্ত পুষ্পের মত কিশোর হৃদয়ের এমন দেবভোগ্য প্রথমোত্থিত শুভ্র প্রণয়ের আভাসটুকু কি সে অনাদর করিতে পারে? এমন ভালবাসা সে কাহার নিকটে পাইয়াছে বা কাহাকে এমন ভালবাসিয়াছে যে তাহার জন্য প্রণয়ের প্রতিদান করিতে পারিবে না বলিয়া সে দুঃখিত হইবে? আর সেও কি এখন পর্য্যন্ত তাহার কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিয়াছিল? নিজের বিবাহের কথা, পিতার ক্রোধ, এইসব নানা কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া সে পাত্র খুঁজিতেছিল সত্য, কিন্তু সেই স্বচ্ছ নীল সরল চক্ষু দুটী কি একএকবার সব গোলমাল করিয়া দিতেছিল না? তথাপি হয় ত অমর নিজের কর্ত্তব্য একরকমে করিয়া ফেলিত। কিন্তু এখন? এখন আরও বিভ্রাট। বিভ্রাট বটে, তবু সেই বিভ্রাটটুকুতেই কি তাহার শোণিত-সমুদ্র সুখোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল না? চারু চারুলতা তাহারই! চারু তাহাকেই ভালবাসে! সে কি আর জানিয়া শুনিয়া তাহার সে ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? মানুষের যখন মনের ইচ্ছা কর্ত্তব্যের ভাবে প্রকাশিত হয় তখন সে তাহার পায়ে পৃথিবী বলি দিতে পারে। অমর বুঝিল চারু তাহাকে বরাবরই ভালবাসে। তাহা অসম্ভবও নয়, কেন না মাতার নিকটে অমরের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবে এইরূপই সে বরাবর শুনিয়া আসিতেছিল। অমরনাথ তাহার জন্য পাত্র খুঁজিতেছে কিন্তু সে এখনো হয় ত

তাহাকেই স্বামী ভাবে। আর সে অন্তিমশয্যাশায়িনীর নিকট প্রতিজ্ঞাও অমরনাথের মনে হইল।

প্রতিজ্ঞা বই কি! আপত্তি তো তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তিনি অমরের বিস্মিত ভাবকে সম্মতি বুঝিয়াই অন্তিমশয্যায় কত আরাম পাইয়া গিয়াছেন। সেই সত্য এখন অমরনাথ তাঁহার স্নেহের ধনকে কষ্ট দিয়াও ভাঙিতে চাহিতেছে? অমরনাথ নিমেষে আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। বহু বিবাহ! হিন্দুসমাজে তাহা এমনই কি দূষণীয়? আধুনিক সমাজ দোষ দিতে পারে? তাহাতে অমরের এমন কি ক্ষতি! এক ভয় পিতা আর স্ত্রী ক্ষুণ্ণ হইবেন! তবু কর্ত্তব্যই সকলের উপরে। পিতা ও স্ত্রী হয় ত ঘটনা শুনিয়া অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে ক্ষমাও করিতে পারেন। সে ত আর ইচ্ছা-সুখে কোন অপকর্ম্ম করিতেছে না। কর্ত্তব্যের কঠিন অনুরোধে সে ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে।—ইহার জন্য তাঁহারা রাগ করিবেন কেন? যদি করেন অমরনাথ নাচার! অমরনাথ তখন দুই হাতে চারুর মুখ ধরিয়া তুলিয়া স্নেহগদগদকণ্ঠে ডাকিল, "চারু!"

চারু সজল চক্ষে তাঁহার পানে চাহিল।

"চারু আমায় তুমি খুব ভালবাস, না?"

চারু সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে বলিল "হ্যাঁ।"

"আমায় ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবে না, না?"

"হ্যাঁ।"

"তবে আমায় বিয়ে করবে? তা' হলে আর কোথাও যেতে হবে না।"

চারু নীরবে ঘাড় নাড়িল, বিবাহ করিবে। অমর গম্ভীর মুখে বলিল—"জান চারু, আগে আর একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে—আমার স্ত্রী আছে?"

"জানি। আপনি দেবেন দাদাকে বল্‌ছিলেন।"

"তবু আমায় ভাল বাস? তবু বিয়ে করতে চাও?"

"আপনি যে আমায় ভাল বাসেন।"

"ভাল বাসি, তবু দেখ আমি অন্যের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করছি, সেখানেই তুমি বেশি সুখী হবে। আমার আগের স্ত্রীর সঙ্গে তোমার যদি না বনে তা হলে যে তোমার বড় কষ্ট হবে, আমিও তাতে সুখী হব না। তুমি একলাই যার ঘরের লক্ষ্মী হবে তার কাছেই ত তোমার যাওয়া ভালো। তার ভালবাসা পেয়ে সহজেই আমায় তুমি ভুলে যেতে পারবে।"—

চারু আবার চেয়ারের হাতার মধ্যে মুখ লুকাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—"আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না,—তাহ'লে আমি মরে যাব।"

"বিয়ে না হ'লে কি চিরদিন একসঙ্গে থাকা যায় পাগ্‌লী?"

"তবে বিয়েই হোক্। মা তো আমায় আপনাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন।"

"আমার একবার বিয়ে হয়েছে, অন্য স্ত্রী আছে, তবু আমায় ভালবাস্‌তে, বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে?"

চারু ঘাড় নাড়িল।

"তবে তাই হোক্। চিরদিন আমায় এমনি ভাল বাস্‌বে তো চারু? সংসারে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও আমায় এমনি প্রসন্ন মুখে সকল দুঃখ সহ্য করেও ভাল বাসতে পারবে ত' চারু?"—বলিতে বলিতে অমরনাথ দুই হাতে তাহার পুষ্পোপম মুখখানি আর একটু তুলিয়া ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়া স্থির সপ্রেম দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে জিজ্ঞাসু হইয়া চাহিয়া রহিল।

চারু আবার মুখ লুকাইয়া মৃদুস্বরে বলিল "হুঁ্যা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুসজ্জিত কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। ঈষৎমুক্ত গবাক্ষপথে উদ্যানস্থ সান্ধ্য সেফালীর গন্ধ মৃদু ভাবে কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল। ঠাকুরবাড়ীর বোধন নবমীর সানাইয়ের মৃদু সুর কর্ণে প্রবেশ করিয়া তন্দ্রাজড়িত একটি অপূর্ব্ব সুখের আবেশ বিতরণ করিতেছিল। একখানা কৌচে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া অমরনাথ।

অমর সেইদিন মাত্র বাটী আসিয়াছে। চারুকে অনেক বুঝাইয়া কলিকাতাতেই রাখিয়া আসিয়াছে। এখন পিতা ও স্ত্রীকে তাহার শপথের গুরুত্বটা বুঝাইয়া সম্মত করিতে পারিলে আর কোন বাধা নাই। এ বিষয়ে স্ত্রীরই অনুমতির বেশী প্রয়োজন, তাই পিতাকে এখনো কিছু

জানায় নাই, অগ্রে স্ত্রীর নিকটে কথাটা পাড়িবার জন্য অমরনাথ তাহার অপেক্ষা করিতেছে।

নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল, অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত একটী যুবতী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া গালিচা-মোড়া মেজের নিঃশব্দ পদক্ষেপে পালঙ্কের নিকট গিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তার পরে আস্তে আস্তে যেখানে অমরনাথ অর্দ্ধশায়িত ভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন রহিয়াছে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। অমরনাথের তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল; চক্ষু খুলিবামাত্র দেখিল একজন অপরিচিতা তাহার বৃহৎ কৃষ্ণতারক উজ্জল চক্ষুতে তাহার পানে চাহিয়া আছে। অমরনাথ ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিল। অজ্ঞাতসারে অস্ফুট স্বরে মুখ হইতে বাহির হইল "কে?" যুবতী চক্ষুনত করিয়া এবং অমরনাথের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া সহসা আনত মুখে আর একটু অবগুণ্ঠন টানিয়া ঈষৎজড়িত মৃদুকণ্ঠে বলিল "আমি।" একটু থামিয়া সে আবার অমরনাথের পানে চাহিয়া তদপেক্ষা পরিষ্কার স্বরে বলিল "আমি সুরমা।"

সুরমা! সে তো তাহার স্ত্রীর নাম! সেই ফুলশয্যার রাত্রে দেখা সুরমা এখন এত বড় হইয়াছে। অমরনাথ একটু নড়িয়া চড়িয়া ব'সল। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব ঘটনার অত্যন্ত বৈপরীত্য দেখিয়া স্বপ্ন হইতে সদ্যজাগ্রত ব্যক্তি যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে অমরনাথ তেমনি চঞ্চল হইয়া পড়িল। এতক্ষণ সে তন্দ্রাচ্ছন্ন নেত্রে যেন দেখিতেছিল এই সুসজ্জিত কক্ষে, এমনি সেফালীর গন্ধ ও সানাইয়ের মৃদু তানের মধ্যে একটী মুগ্ধা কিশোরী লজ্জাকম্পিত পদে, তাহার সুনীল চক্ষুতে তাহার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। সহসা জাগিয়া দেখিল তাহা নহে, একটী সঙ্কোচহীনা যুবতী তাহার অচঞ্চল অসহনীয় জ্যোতিপূর্ণ কৃষ্ণতার চক্ষুতে স্থির ভাবে তাহার পানে চাহিয়া আছে এবং এখানে তাহারই স্থির অধিকার, আর সেই লজ্জানম্রা বালিকা এখানে অপরাধিনী অভিসারিকা মাত্র।

অমরনাথ গম্ভীর মুখে স্থির ভাবে বসিয়া রহিল।

সুরমা কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যেন কার্য্য ব্যপদেশে সজ্জিত টেবিলের নিকটে সরিয়া গেল। সেখানে এটা সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া যেন সে কি করিবে তাহা স্থির করিয়া লইতে লাগিল। তাহার পরে তাহাকে দ্বারাভিমুখে যাইতে দেখিয়া অমরনাথ বলিল—"শোন।"

সুরমা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

"বোস।"

এদিক ওদিক চাহিয়া শেষে সুরমা অমরনাথের অধিকৃত কৌচেরই এক পার্শ্বে সসঙ্কোচে বসিল। বহুক্ষণ স্বামীকে নীরব দেখিয়া তাহার সেই অচঞ্চল চক্ষে আবার অমরের পানে চাহিয়া বলিল—"আমাকে তুমি ডেকেছিলে?"

অমরনাথ তথাপি নীরব।--

কিছুক্ষণ পরে সুরমা বলিল—"আমাকে তোমার কি কোন কথা বল্‌বার আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কি?"

অমরনাথ তথাপি নীরব।

আবার সুরমা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল—"কোন সঙ্কোচের কথা কি?"

এবার অমরনাথের কথা ফুটিল। "আমি ত তেমন কিছু সঙ্কোচ বোধ কর্‌ছিনা।"

"তবে আমারই সঙ্কোচজনক কোন কথা কি?"

"না। তোমার নয়। আমারি কথা বটে, তবে সঙ্কোচের নয়—কর্ত্তব্যের। তোমার বেশ মন দিয়ে শোনার দরকার। ঠিক ভাবে বোঝার দরকার।"

"বল।"

তখন অমরনাথ ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল। অবশ্য যতটা বলা যাইতে পারে। প্রথমবার গ্রামে গিয়া চারুর ব্যারাম আরোগ্য করা; আবার দেবেনের অনুরোধে একবার পূজায় সময় যাওয়া; তখনকার কথাবার্ত্তা; পরে বাটী আসিয়া সুরমার সহিত বিবাহ; ওদিকে তাহাদের ভ্রান্ত আশা পোষণ এবং শেষে চারুর মাতার মৃত্যুশয্যায় প্রকারান্তরে তাহাকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করান; এই সমস্ত ঘটনা অমরনাথ একে একে স্ত্রীর নিকটে বলিয়া গেল।

সুরমা নীরবে শুনিল। অমরনাথ নীরব হইলে ক্ষণেক পরে সুরমা বলিল—"সে মেয়েটী এখন কোথায়?"

"মেয়েটী? চারু! সে আমার কলকাতার বাসায়।"

"কলকাতার বাসায়? তা হলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস থেকেই সে সেখানে আছে! কই এতদিন তো আমরা এর কিছুই জানি না?"

অমরনাথ একটু গরম হইয়া উঠিল। সুরমার কথাটায় যেন একটু কেমন কর্ত্তৃত্ব ও তিরস্কারের ভাব মিশানো বলিয়া অমরনাথের মনে হইল।

"তা না জানানতে বেশী অন্যায়ের বিষয় কিছুই হয়নি। তখনো জানানো যা এখনো তাই।"

"ঠিক তা নয়। চারু—চারু বুঝি সেই মেয়েটীর নাম? —তাকে এখানে এনে রাখলেও ত পারতে।"

অমরনাথ আরও একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল "সেখানে রাখলেও যা, এখানে রাখাও তাই। একই কথা নয় কি?"

"এক কথা নয়। এখানে তোমার বাপ আছেন, স্ত্রী আছে।"

"যাকে আমি বিয়ে করতে পারি তাকে আগে থেকে কাছে রাখলেও কোন দোষ হয় না।"

"দোষ হয় বইকি একটু। যাক্ সে কথা। এখন, তুমি তাকে বিয়ে করবে স্থির?"

"এখন স্থির করা নয় তখনি এটা স্থির ছিল। এস্থলে বিয়ে করা ভিন্ন কি কর্ত্তব্য হতে পারে?"

"এখন হয়ত বিয়ে করাই কর্ত্তব্য! কিন্তু তখন অন্য কোনো সুপাত্রে বিয়ে দিতে পারতে।"

"তখন আর এখনে কি প্রভেদ?"

যুবতী দীপ্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল,— "এখন তুমি তাকে ভাল বাস।"

অমরনাথ সক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল,— "নিতান্ত স্বার্থপরের মত কথা! আমি, আমি না হয় তাকে ভাল বাসি, কিন্তু তাকে বিবাহ করা আমার তখনো কর্ত্তব্য ছিল এবং এখনো কর্ত্তব্য।"

"বেশ। তবে তুমি কি আমার সম্মতি চাইতে এসেছ? এটাও কি তোমার কর্ত্তব্যের অঙ্গ?"

"আমি এত নির্ব্বোধ নই। তবে তোমায় জানান আমার কর্ত্তব্য।"

"ভাল। বাবাকে বোধ হয় এখনো জানাওনি। সেটাও একটা কর্ত্তব্য।"

"সে তোমায় স্মরণ করিয়ে দেবার অপেক্ষা করছে না।"

"তুমি কি আশা কর তিনি সম্মত হবেন?"

"না হোন, তবু আমার কর্ত্তব্য আমি করব।"

"তিনি সম্মতি না দিলেও তোমার মূল কর্ত্তব্য তা হলে স্থির?

"নিশ্চয়ই।"

"বেশ। তবে এখন আমি যেতে পারি?"

"তোমার খুসী" বলিয়া অমরনাথ পরিত্যক্ত কৌচে শুইয়া পড়িল। সুরমা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল; তারপরে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বেলা দ্বিপ্রহর। কর্ত্তা হরনাথবাবু ভোজনে বসিয়াছেন, পার্শ্বে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী পুত্রবধূ সুরমা তালবৃন্ত হস্তে ব্যজন করিতেছে। হরনাথ বাবু অতিশয় উন্মনা ভাবে আহার করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সহসা বধূর পানে চাহিয়া ডাকিলেন "মা!"

বধূ মুখ তুলিয়া শ্বশুরের দিকে চাহিল।

হরনাথ বাবু একটু থামিয়া বলিলেন "অমর বাড়ী এসেছে জান ত মা?"

বধূ মুখ নত করিল দেখিয়া শ্বশুর বুঝিলেন বধূ সে সংবাদ জানে।

"কাল তোমার সঙ্গে সে দেখা করেছিল কি?"

সুরমা নতমুখে নীরবে রহিল।

হরনাথ বাবু পুনর্ব্বার প্রশ্ন করায় অগত্যা বলিল "হ্যাঁ।"

"কিছু বলেছে?"

বধূ নীরবে শুধু মাথা নাড়িল।

হরনাথ বাবু আবার কিয়ৎক্ষণ থামিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন —"তুমি তাহ'লে সব শুনেছ?"

সুরমা মৃদুস্বরে নতমুখে বলিল—"শুনেছি।"

সহসা পরুষ কণ্ঠে হরনাথ বাবু বলিয়া উঠিলেন— "হতভাগাটার লজ্জাও কি করেনি! বুদ্ধিশুদ্ধির মাথা একেবারে খেয়ে ফেলেছে। নিজের মাথা খেয়ে বুঝি এমনি ক'রে প্রতিজ্ঞা রাখে? ব্যাটা একেবারে ভীষ্মদেব হয়ে উঠেছেন। ওসব কলকাতার দোষ! ওকে একা পড়তে

দেওয়াটাই আমার অন্যায় হয়েছিল। যাক্! আমি বেশ করে' বুঝিয়ে দিয়েছি যদি সে সে কাজ করে তো তাকে নিঃসন্দেহ ত্যাজ্যপুত্র করব। তার মুখও কখনো দেখ্‌ব না। আর যদি সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে চিন্তা মনে রাখে তো যেন এখনি আমার বাড়ী থেকে চলে যায়, আর জানে যেন যে সেই সঙ্গে আমার সঙ্গেও জন্মের মত সম্বন্ধচ্ছেদ হবে।"

বধূ নীরবে ব্যজন করিতে লাগিল। আবার হরনাথ বাবু ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে বধূকে যেন সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিতে লাগিলেন,—"এত সাহস সে করবে না বোধ হয়। আমি তাকে আজই কলকাতা গিয়ে মেয়েটীকে নিয়ে আস্‌তে বলে দিয়েছি। একটা পাত্র দেখে মেয়েটার বিয়ে দিলেই সব আপদ চুকে যাবে।"

সুরমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপরে মৃদুস্বরে বলিল—"তা আর হবার জো নেই বাবা!—আপনি তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করা কি বিষয় থেকে বঞ্চিত করার ভয় না দেখালেই ভালো হত।"

"সেকি? বল কি মা?"

"আপনার নিষেধের চেয়ে কি বিষয়ের দাম বড়! ও ভয়টা না দেখালেই ভাল হ'ত বাবা।"

কর্ত্তা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিলেন—"যে সে সম্মান রাখে তার পক্ষেই ওটা খাটে মা!"

"সে সম্মান যে না রাখে সে যা ইচ্ছা তাই করুক না কেন বাবা।"

"না মা। একথা তুমি এখন বল্‌তে পার বটে কিন্তু যখন আমার মত হ'বে তখন বুঝবে আজন্মের স্নেহের ধনকে কি তুচ্ছ মান অপমান নিয়ে এত বড় একটা ভুল করতে দিতে পারা যায় মা? সে যদি সমুদ্র দেখে শিশুর মত লাফিয়ে তাতে ঝাঁপ দিতে যায়, আমি কি তাকে প্রাণপণ বলে বুকে চেপে ধরে নিবারণ না ক'রে থাক্‌তে পারি? হয় ত সে সে বেষ্টনে পীড়িত হচ্ছে, বেদনা পাচ্ছে, তবু আমি তাকে ছেড়ে দোব' না। আদর ক'রে না পারি, কাঁদিয়ে, ভয় দেখিয়ে তাকে চেপে রাখতে চেষ্টা করব।"

সুরমা রুদ্ধস্বরে বলিল—"বাবা, আমায়ও আপনি স্নেহ কর্‌তেন—"

"কর্‌তেম কি মা—এখনো কি করি না? তুমি যে এখন আমার তার চেয়েও বড়, তুমি অসুখী হবে বলেই তো আরও"—

"আমিও সেই জন্যেই বল্‌ছি বাবা,—মা নেই তাই এসব কথা আপনাকেই বল্‌তে হচ্চে।—আপনার কথায় স্পষ্ট বোঝাচ্চে যেন আমিই প্রধান বাধা। আমি কি সত্যি এতই স্বার্থপর?"

"তোমায় যদি কেউ তা ভাবে বা বলে তো সেই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থপর। বড় দুঃখ হচ্চে মা আমি হয়ত তোকে এনে সুখী কর্‌তে পারলাম না। তা যদি হয়—"

"কই আপনি কিছুই খেলেন না যে? মাছটা কি ভাল হয়নি! বাবা ওটা আমি নিজে রেঁধেছি। একটুও খাননি—ডাল্‌নাটাও ভাল লাগ্‌ল না?"

"এই যে খাচ্চি মা। না, বেশ হয়েছে, কিন্তু শোন মা-"

"দুধটা নিয়ে আসিনি এখনো। হয়ত বেশী গরম হয়ে গেল।" সুরমা উঠিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। অনতিবিলম্বে দুগ্ধ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া হাস্যমুখে বলিল "না, ঠিক আছে। বাবা আপনাকে আজ দুধ খেয়ে বল্‌তে হবে মিষ্টি দিয়েছি কি না।"

বধূর হাস্যোৎফুল্ল মুখ পুনঃ পুনঃ মলিন করিতে হরনাথ বাবুর আর ইচ্ছা হইতেছিল না। তিনি বুঝিলেন সুরমা এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাহিতেছে। তিনিও কথাটা চাপা দিয়া দুগ্ধের বাটিতে চুমুক দিয়া বলিলেন—"নিশ্চয় আজ বেশী মিষ্টি দিয়েছিস বেটী। জ্বালও বেশী দিয়ে ফেলেছিস নিশ্চয়।"

"না বাবা মোটে না, জ্বালও বেশী দিইনি।"

"তবে এত মিষ্টি আর ঘন হ'ল কি ক'রে?"

"ঐ নতুন কেনা গাইটার দুধ আপনার জন্যে জ্বাল দিতে নিয়েছিলাম।"

সহসা হরনাথ বাবু বলিলেন—"সে—সে বুঝি না খেয়েই কল্‌কাতা চলে গ্যাছে?"

বধূ নীরবে রহিল। কর্ত্তা বাহ্যিক কোপভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"গ্রহ আর কি।"

কর্ত্তা আহারান্তে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। সুরমা

ধীরে ধীরে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। হয়ত সে স্থান ভাল লাগিল না, অন্য একটা কক্ষে গিয়া রেশম স্থচ মথমল প্রভৃতি লইয়া গবাক্ষের নিকটে বসিয়া নিবিষ্ট মনে সেলাই করিতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে সেদিন পূজার ষষ্ঠী তিথি। সুরমা ঠাকুরবাড়ীর একটা কক্ষে বসিয়া নিপুণ ভাবে বরণের ডালা সাজাইতেছিল। চারিধারে নানা আত্মীয় কুটুম্বিনী-গণ, নানা কার্য্যে ব্যস্ত। সকলেই সুরমার আজ্ঞাক্রমে ফিরিতেছে ঘুরিতেছে। মুক্ত বাতায়নের সম্মুখপথে অদূরস্থিত পল্লবপতাকাময় তোরণে মধুর শব্দে নহবতে আগমনী বাজিতেছিল। প্রাঙ্গণে মিষ্টান্নলোভী বালকবালিকার হাস্য চীৎকার উঠিতেছিল। ঠাকুরদালানে মালাকরে ও কুমারে ঘোর বিবাদ বাধিয়াছে। কুমারনন্দন সাড়ম্বরে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে, মালাকরের রাংতার আঁচলা ও গহনার শ্রীহীনতার জন্যই তাহার প্রতিমার তেমন 'খোল্‌তাই' হইতেছে না। কুমারের এই মতে বাধা দিয়া মালাকর বলিতেছে, "আরে তুমি কেহে বাপু! তোমার বাপ আমায় চিন্‌ত। আমার 'ডাকে'র গহনা এ পৃথিমিতে না জানে কে? চন্দরমালীর নাম এ সাতখানা গাঁয়ের মধ্যে কে না জানে। আব এই জমীদাংবাড়ীর ঠাকুরুণ সাজিয়ে আমি বুড়ো হয়ে গেলাম, তুমি কিনা এসেছ আজ দোষ ধরতে।" মাতব্বর মুরুব্বীরা মধ্যে পড়িয়া উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেছেন। পরিচারকেরা সামিয়ানার তলে ঝাড় লণ্ঠন লইয়া ব্যস্ত। কেহ টাঙাইতেছে, কেহ তেল ভরিতেছে, কেহ সাফ করিতেছে, ঝাড়ের কাচময় ফলকের আন্দোলনে বেশ শ্রুতিমধুর টুং টাং শব্দের মধ্যে কোন সর্দ্দার খানসামার হস্ত হইতে কোন ছবি বা দেয়ালগির পড়িয়া গিয়া ঝন্ ঝনাৎ শব্দটি কোমল সুরে কড়িমধ্যমের মত মিশাইতেছে। কয়েক জন শুভ্রউপবীতধারী ভট্টাচার্য্য বৃহৎ বৃহৎ টিকী নাড়িয়া 'বার বেলা' লইয়া মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিয়াছেন। গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা কেহ বা বন্ধুগোষ্ঠীর বাড়ীর যাত্রার আয়োজনের সালঙ্কার বর্ণনা করিতেছেন, কেহ বা অন্যকে বলিতেছেন "হাঁ হে বল্‌তে পার এবার যাত্রা কেন আনা হ'লনা?" পুরোহিত রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে ওসব তো তামসিক ব্যাপার। উত্তমরূপে মহামায়ার ভোগ পূজাদি ও বলিদানাদি দেওয়া এই হচ্ছে সাত্ত্বিক পূজা! নাচ গান ওসব তামসিক তামসিক!" "আরে বলেন কি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, একি একটা কথা হ'ল? দেবী পুরাণেই তো লিখ্‌ছে 'বাদ্যভাণ্ড নৃত্য গীত'"—"আরে রাখ রাখ বাপু! যা বোঝনা তাতে বাক্যব্যয় করতে যাও কেন?" একটী ধৃষ্ট যুবক বলিয়া ফেলিল "ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাংসাহার করেন না কি? সেটা খুব সাত্ত্বিক, না?" তৎক্ষণাৎ তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ দেওয়ানজী আসিয়া তখন তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। একজন বলিলেন "হ্যাঁহে, অমরকে দেখছিনা যে? সেকি আসেনি?" দেওয়ানজী জড়িত স্বরে বলিলেন "পড়ার ক্ষতি হবে বোধ হয়। কর্ত্তাকে পত্র দিয়েছেন।"

এমন সময় একজন দাসী আসিয়া সুরমাকে বলিল "মা, কর্ত্তাবাবু ডাক্‌ছেন আপনাকে।"

সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া দাসীকে বলিল,—"কেন বল্‌তে পারিস্?"

"না।"

সুরমা ধীরে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বারান্দা ছাড়াইয়া সিঁড়ীর নিকটে আসিতেই দেখিল সম্মুখে শ্বশুর। তাঁহার মুখ ঘনান্ধকারময়, হস্তে একখানি পত্র। সুরমা চকিত ভাবে বলিল "বাবা?"

"এই পত্র পড়ে দেখ, বুঝ্‌তে পারবে!"

"পত্র আর কি পড়্‌ব! আপনি বলুন।"

"না, না, পড়ে ত্থাখ সে কুলাঙ্গার কি লিখেছে।"

শ্বশুরের ক্রোধ কম্পিত হস্ত হইতে পত্র লইয়া সুরমা পাঠ করিল—

"শ্রীচরণেষু বিবাহ করা ভিন্ন আমি আর উপায়ান্তর দেখি না। আপনার আদেশ রাখিতে পারিলাম না আমি এমনি অধম। ইতি।—হতভাগ্য অমর।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া সুরমা শ্বশুরকে পত্রখানি ফিরাইয়া দিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল।

"কিন্তু সে হতভাগা মনে করেনা যেন যে আমি তাকে

ক্ষমা করব। এই আগমনীতে আমার এই বিসর্জ্জন।” পত্রখানা শতছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিয়া হরনাথ বাবু সবেগে চলিয়া গেলেন।

সুরমা ধীর পদে ফিরিয়া গিয়া আপনার আরব্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

যাত্রাগান

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার “বঙ্গদর্শনে” যাত্রাগানের সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যাত্রাগানের কিরূপ উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে তাহার খতিয়ান করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

আমি যাত্রাগানের একজন ভক্ত। আমার মতে যাত্রাগানের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয় আমোদ আর নাই। কথকতার ন্যায় যাত্রাগান লোকশিক্ষার এক প্রধান উপায়। যাত্রাগানে একসঙ্গে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির অনুশীলন এবং ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা হয়। একাধারে কাব্য ও সঙ্গীতকলার চর্চ্চার সহিত জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাত্রাগানের এখন আর সে দিন নাই। সঞ্জীব বাবুর সমালোচনা পাঠে জানা যায়, তাঁহার সময়ে যাত্রা বলিতেই সাধারণতঃ বিদ্যাসুন্দরের পালা বুঝাইত, নচেৎ কালীয়-দমন কিম্বা রাম-বনবাস। তখন যাত্রাগান নিতান্ত crude (অপরিণত) অবস্থায় ছিল। সেই অতীতের সহিত তুলনায় এখন যাত্রাগানের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সঞ্জীব বাবুর সমালোচনার পর যাত্রাগানের দুইটি যুগ অতীত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী যুগকে পৌরাণিক যুগ বলা যায়। এই পৌরাণিক যুগেই যাত্রাগানের প্রকৃত উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মতি রায়, ব্রজ রায়, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি যাত্রার অধিকারিগণ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার অক্ষয়ভাণ্ডার রামায়ণ ও মহাভারত হইতে বাছিয়া বাছিয়া পালারচনা করিতেন। তাঁহাদের রচিত “ভীষ্মের শরশয্যা,” “দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,” “অভিমন্যুবধ,” “দক্ষযজ্ঞ,” “সাবিত্রী সত্যবান,” “লক্ষ্মণের শক্তিশেল,” “সীতার বনবাস,” প্রভৃতি পালা একসময়ে বাঙ্গালীর চিত্ত মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদের সময়েই যাত্রাগানের চরম উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেইসকল গুণবান্ ও রসজ্ঞ অধিকারিগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার ক্রমেই অবনতি হইতেছে। যাত্রাগানের বর্ত্তমান যে যুগ চলিতেছে, তাহাকে “নাটকীয় যুগ” বলা যাইতে পারে। এযুগে যাত্রা হইতেছে নাটকের ব্যর্থ অনুকরণ। এখন যাত্রা আর “গান” নাই, এখন যাত্রা হইতেছে “অভিনয়” বা “অপেরা,” অথবা ষ্টেজ-বিহীন থিয়েটার। যেমন যাত্রা থিয়েটারে পরিণত হইতেছে, সেইরূপ থিয়েটার আবার সার্কাসে পরিণত হইতেছে। কালে সার্কাস্‌ই সকলের আরাধ্য দেবতা হইবে, এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি কলিকাতার থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম হাতীর নাচ। তখন মনে হইল, থিয়েটার দেখিতেছি না সার্কাস দেখিতেছি? অবশ্য আমি যাহাকে হাতীর নাচ বলিতেছি, অনেক দর্শক তাহাকে শৈবলিনীর প্রতাপের সহিত গঙ্গা গর্ভে সন্তরণ অথবা চৈতন্যলীলায় নিত্যানন্দের হরিপ্রেমে নৃত্য মনে করিয়া করতালি দ্বারা রঙ্গভূমি মুখরিত করিয়াছিলেন। আমার কিন্তু সেই সন্তরণ ও নৃত্য দেখিয়া সার্কাসের কথা মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু শুধু এ কারণে নহে, আধুনিক থিয়েটারকে আমি অন্য কারণে সার্কাস্ বলিতেছি। আধুনিক থিয়েটার ও যাত্রায় যে নাচ ঢুকিয়াছে, তাহাকে সার্কাসের জিমন্যাষ্টিক্ (Gymnastic) ভিন্ন আর কি বলিব? আর থিয়েটারে আজকাল নাচেরই প্রাধান্য দেখা যায়, সুতরাং থিয়েটার সার্কাসে পরিণত হওয়ার বাকী কি?

সঞ্জীব বাবু পুরাতন যাত্রার নৃত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

“যে কোন সমাজেই হউক, নৃত্য বলিলে পদদ্বয়ের সঞ্চালনজনিত দেহের মনোহর আন্দোলন বুঝায়, কিন্তু বঙ্গসমাজে কেবল দেহের * * * * যে ঘৃণিত আন্দোলন, তাহাকেই নৃত্য বলে।”

কিন্তু এখন আর সে দুঃখ নাই! এখনকার নৃত্য দেহের অঙ্গবিশেষের সঞ্চালন নহে, এখনকার নৃত্য কোন অঙ্গের

সঞ্চালন না হইয়াও সাধিত হইতে পারে। এখনকার নৃত্য শুইয়া হয়, বসিয়া হয়, অৰ্দ্ধেক শুইয়া অর্দ্ধেক বসিয়া হয়, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হয়, হেলিয়া দাঁড়াইয়া হয়, আবার একজনের ঘাড়ের উপর আর একজন চড়িয়া হয়— ঠিক যেন মহিষমর্দ্দিনী, সিংহ ও অসুরের উপর দণ্ডায়মান। এখনকার নৃত্যে সিস দেওয়া, বাঁশি বাজান, পাখীর ডাক ও আরও কত কিছুর অস্ফুট ধ্বনি শুনা যায়। সে কালের নৃত্য কেবল দেহের অঙ্গবিশেষের ঘৃণিত আন্দোলন ছিল, এখনকার নৃত্য বহুবিধ হাবভাব সহকারে যুগল মিলন! ইহাই নাকি সভ্যসমাজের সুরুচিসঙ্গত প্রকৃষ্ট রীতি। সুতরাং এ সম্বন্ধে কাহারও কথা কহিবার অবসর নাই। সেই নৃত্যের যে তাল, তাহা আবার গাছ হইতে পাকাতাল পড়ার শব্দকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অর্থাৎ কথা নাই বার্ত্তা নাই, একটা সুর হঠাৎ "থপ্" করিয়া থামিয়া পড়িল। যাহাদের কান সুরগ্রামের ক্রমিক আরোহ ও বিলয় শুনিতে অভ্যস্ত তাহাদের কাছে হঠাৎ এই থপ্ করিয়া থামিয়া যাওয়াটা যেন কেমন বর্ব্বরতা মনে হয়। কে যেন হঠাৎ একটি কলনাদী কোকিলকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিল, তাহার অর্দ্ধোচ্চারিত কলকূজন আকাশের মধ্যপথে থামিয়া গেল।

এই বিলাতী নাচের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, আমি সেই পূর্ব্বতন খেমটা নাচকে আবার আসরে আনিতে বলিতেছি। খেমটা নাচ খাঁটী স্বদেশী জিনিষ নহে। সঞ্জীব বাবু বলেন উহা আধুনিক আমদানী জিনিষ। তিনি যে পৌরাণিক মহারাষ্ট্রীয় নৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন, আমি উড়িষ্যাদেশে তাহা এখনও প্রচলিত দেখিয়াছি। আমার উড়িষ্যার চিত্র গ্রন্থে তাহার একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। সে নৃত্যে কিছুমাত্র সুরুচিবিগর্হিত হাবভাব নাই, তাহা যেমন সুন্দর তেমন গম্ভীর। আমাদের যাত্রায় সেই নৃত্য প্রচলিত করিলে ভাল হয়।

সঞ্জীব বাবুর সময়ে যাত্রায় নৃত্যই প্রবল ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

"এক্ষণকার যাত্রার নৃত্যই প্রবল, সকলেই নৃত্য করে। কি মেহতর কি ভিস্তী, কি মালিনী কি বিদ্যা, সকলেই নৃত্য করে। কৃষ্ণ নৃত্য করেন, রাধা নৃত্য করেন, রাবণ নৃত্য করেন, সীতা নৃত্য করেন, কৈকেয়ী নৃত্য করেন,—বোধ হয় বৃদ্ধ রাজা দশরথও নৃত্য করিতেন কিন্তু তিনি প্রায় সকল যাত্রার দলে "বেহালাওয়ালা"। নৃত্য করিতে গেলে বেহালা বন্ধ হয়, নতুবা তাহার ত্রুটি ঘটিত না।"

এখনকার যাত্রা এবিষয়ে অনেক সভ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই, এখন এই নৃত্যরোগের তেমন বাড়াবাড়ি নাই। তবে এভাব যে বেশী দিন থাকিবে তাহারই বা ভরসা কি? যাত্রার খোদ ওস্তাদ যে থিয়েটার তাহার মধ্যেও যখন সময়ে অসময়ে নৃত্যের বাহুল্য দেখা যাইতেছে, তখন যাত্রাও তাহার অনুকরণ না করিয়া ছাড়িবে কি? সঞ্জীব বাবু বৃদ্ধ রাজা দশরথকে নৃত্য করিতে দেখেন নাই কিন্তু আধুনিক থিয়েটারে এক বৃদ্ধাকে তাহার পুত্রের সহিত একত্র নাচিতে দেখিয়াছি। আবুহোসেনের বৃদ্ধা জননীর সহিত তাহার নৃত্য ও গানের সুরে কথোপকথন সেই প্রাচীন যাত্রাকেও হার মানায়। অথচ সেই আবু হোসেনের এখনকার শিক্ষিত সমাজে কত আদর! লাট বেলাটের অভ্যর্থনায় তাহার অভিনয় হইতেছে। আজকাল অনেক শ্রোতার মত এই—যদি নাচগান না শুনিলাম তবে থিয়েটারে গিয়া ফল কি? সেইসকল শ্রোতার মনোরঞ্জন করিতে গিয়া থিয়েটারের পালা লেখকগণও আজকাল নৃত্যের বাড়াবাড়ি করিতেছেন। এই শ্রেণীর নাটককার সাবিত্রী নাটকের মধ্যেও নাচ না ঢুকাইয়া পারেন নাই। সাবিত্রী নাটকেও যাঁহারা নাচ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের সে নাটক না দেখাই ভাল।

নাচের সঙ্গে গানের কথাও আলোচ্য। কিন্তু নাচই বলুন আর গানই বলুন আমি এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমার এসম্বন্ধে উপদেশ দিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা। তবে আমি যাহা বলিতেছি তাহা কেবল দর্শক বা শ্রোতার ভাবে বলিতেছি, সমজদারের ভাবে নহে। পূর্ব্বকালে যাত্রায় গানের বড় দৌরাত্ম্য ছিল। কথায় কথায় গান, সময়ে অসময়ে গান, অভিনেতার গান, ছোকরার গান, জুড়ীর গান। ইহাতে অভিনেতব্য বিষয়ের রসভঙ্গ হইত। শ্রোতাদিগের কান ঝালাপালা হইত। যাত্রার শেষ পর্য্যন্ত দেখা বা শুনা অসম্ভব হইয়া উঠিত। এই গান সম্বন্ধে সঞ্জীব বাবু একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন,—

"শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে জানকীকে বনে পাঠাইলেন। জানকী পূর্ণগর্ভা, পদব্রজে কতদূর গমন করিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—লক্ষ্মণ, আর যে আমি চলিতে পারি না।

লক্ষ্মণ। কি বলিলেন, মা জানকী, আর আপনি চলিতে পারেন না?
জানকী। না লক্ষ্মণ, আর আমি চলিতে পারি না। আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়াছে।
লক্ষ্মণ। সে কিরূপ? প্রকাশ করিয়া বলুন।
সে কিরূপ, তাহা ত জানকী প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আবার কি অধিক প্রকাশ করিয়া বলিবেন?"

প্রকাশ করিয়া বলার অর্থ গীত গাইয়া বলুন। অমনি গীত আরম্ভ হইল—"গর্ভবতী নারী, চলিতে না পারি, হইয়াছে অঙ্গ অবশ।" ইত্যাদি।

এখন নাটকের অনুকরণে যাত্রা হওয়াতে এই গীতের উৎপাত অনেক কমিয়াছে। এখন আর কথায় কথায় জুড়ী নামধারী চোগা-চাপকান-পরা পিরালী-পাগড়ী-মাথায় "মোক্তার লোক" (এক দলে দেখিয়াছি হাতকাটা গাউন-পরা ডাক্তার লোক) উঠিয়া দাঁড়ান না, এবং একজনের পর আর একজন ক্রমাগত রাগিণী ধরিয়া শ্রোতৃবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটান না। ছোকরার দলও এখন ঘন ঘন উঠিয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া কান ঝালাপালা করে না। কোন কোন দলে এমন সুন্দর নিয়ম দেখিয়াছি, একটি গায়ক একলা দাঁড়াইয়া আগে গানটি গাহিয়া যায়, পরে ছোকরার দল কি জুড়ীর দল উঠিয়া সেই গানটি গায়। ইহাতে গানটি কি তাহা বেশ বুঝা যায়। আর অধিকাংশ ভাল গানই এখন থিয়েটারের ন্যায় অভিনেতা নিজে গাইয়া থাকে।

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? এখনকার গানের সুর তেমন মর্ম্মস্পর্শী হয় না। যাত্রার পৌরাণিক যুগে এক একটি ভাল গান শুনিয়া শ্রোতাদিগের অজস্র অশ্রুপাত হইত, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই গান বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে প্রতিধ্বনিত হইত, ও ক্রমে তাহা সাহিত্যের স্থায়ি-সম্পদে (classics) পরিণত হইত। এখনকার গানে না আছে ভাব, না আছে মর্ম্মস্পর্শী সুর। অনেক গানের সুরই থিয়েটারের অনুকরণে মিশ্রিত রাগিণীতে (জঙ্গলা) বাঁধা। বিশুদ্ধ ভৈরবী, পূরবী, খাম্বাজ, বেহাগ, বিভাস প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সুর এখন যাত্রার আসর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। যে সুর গাম্ভীর্য্যে অম্ভোধিনির্ঘোষ, মাধুর্য্যে পিককূজন, উচ্চতায় পাপীয়ার স্বরলহরী, কোমলতায় চাতকের ফটিকজল, লালিত্যে সলিলের কুলু কুলু ধ্বনি এখনকার যাত্রাগানে তাহা আর শুনা যায় না। যে সুর শ্রোতার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া জন্মজন্মান্তরের সুখদুঃখের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, যাহা মর্ম্মে মর্ম্মে জড়িত হইয়া ভাবী সুখের সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখে, এখনকার যাত্রায় সে সুর নাই। তাই এখনকার যাত্রার আসরে শ্রোতাদিগকে আর বড় কাঁদিতে দেখি না। সঞ্জীব বাবুও এ বিষয়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"বাঙ্গালার আর বড় শোকের সুর নাই। কুচিহ্ন। শোকে সহৃদয়তা জন্মে। ঐক্য হয়। আন্তরিক শোক সকলের অদৃষ্টে ঘটে না; শোক পবিত্র; শোক স্বর্গীয়; শোক আবশ্যক।"

এখন অধিকাংশ সুরেই গাম্ভীর্য্য নাই, প্রায় সুরই হাল্‌কা। যেমন দৈনন্দিন জীবন-ব্যাপারে আমরা গাম্ভীর্য্য হারাইতেছি, সঙ্গীতেও তাই। জীবন আমাদের কেবল "ফূর্ত্তিতে" ভরা, তরল উল্লাসে মাতোয়ারা, আমাদের আমোদ প্রমোদও সেইরূপ। কেহ হয় ত বলিবে, —আমোদ করিতে গিয়া কাঁদিব কেন? কিন্তু যাঁহার কাঁদিবার উপযুক্ত হৃদয় আছে, তিনি হাসিতে হাসিতে কাঁদেন আবার কাঁদিতে কাঁদিতে হাসেন। নিরবচ্ছিন্ন হাসি ও নিরবচ্ছিন্ন কান্না কোথায় আছে?

নাচ ও গানের পর অভিনয়। বলা বাহুল্য অভিনয়ই আধুনিক যাত্রার প্রাণ। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাত্রা এখন "গান" নহে, অভিনয় অর্থাৎ নাটকের অনুকরণ। উৎকৃষ্ট যাত্রার দলে এখন অনেক ভাল অভিনেতা দেখা যায়। এ বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। আর অভিনেতাদিগের পোষাক পরিচ্ছদের পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। সঞ্জীব বাবুর সময়ে পরিচ্ছদের বড় দৈন্য ছিল। তিনি বলেন,—

"যাত্রার রাণী পরিচ্ছদে মেতরাণী।"......"রাজার পরিচ্ছদ আরও চমৎকার; ছিন্ন ইজার, মলিন চাপকান, আর তৈলাক্ত জরির টুপি। যে পরিচ্ছদে নকিব বা জমাদার সাজিয়া আসিয়াছিল, আবার সেই পরিচ্ছদে স্বয়ং রাজাও আসিলেন।"

এখনকার যাত্রায় রাজার পোষাকের পারিপাট্য অনেক খেতাবী মহারাজাকেও হারি মানায়। রাণী কিম্বা রাজকন্যার অঙ্গে বেনারসী সাড়ী শোভা পায়। এখনকার "নৃসিংহ দেব" কি "হনুমান" আর চাপকান পরেন না। তবে তাঁহারা গেঞ্জি না পরিয়া পারেন না। আবার পাড়া-কোঁদলী বালবিধবা "বিধি নাপতিনী"ও এই গেঞ্জির মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এখন জুড়ীদিগের অঙ্গে

"ভাকীলের" গাউন উঠিয়াছে। এখন বাকী কেবল জজের "কলার"। তবে সেই গাউনপরা হাত যখন কল্‌কী ধরিয়া টান দেয় তখন শ্রীরাধিকার তামাক খাওয়ার মতনই বীভৎস দেখায়। হাল ফেসনের রাধিকার কিন্তু সে বালাই নাই। কারণ সিগারেট এখন খুব সস্তা এবং সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

অভিনয়ের প্রধান অঙ্গ হইতেছে কথাবার্ত্তা। কিন্তু সেই কথাবার্ত্তার জন্য অভিনেতার দোষ দেওয়া যায় না, যত দোষ পালাপ্রণেতা কবির। এইসকল কবিপুঙ্গবের বিরুদ্ধে আমার অনেক অভিযোগ আছে, ক্রমে তাহা বলিতেছি।

আমার মতে এইসকল পালা-লেখকই যাত্রা-গানের পরম শত্রু। সম্প্রতি আমার কলিকাতায় দুইটি প্রধান দলের গান শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি দলের একটি পালাও তেমন জমিল না। সেসকল দলে ভাল অভিনেতার অভাব ছিল না, ভাল গায়কও যথেষ্ট ছিল, আবার উৎকৃষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ আসবাবও বিস্তর ছিল। গান জমিল না কেবল পালা রচনার দোষে। এইসকল দলের স্বত্বাধিকারিগণ আমার মতে বৃথা অর্থব্যয় ও শক্তির অপচয় করিতেছেন। আর যাঁহারা এইসকল দল বায়না করেন তাঁহাদেরও দুর্ভাগ্য; সাত আট শত বা হাজার টাকা দিয়া এইরূপ যাত্রা গান না দিয়া সেই অর্থে অনেক সৎকাজ হইতে পারে। যাত্রাগানের প্রধান উদ্দেশ্য যে লোকশিক্ষা (mass education) তাহা আর এখনকার যাত্রাগান দ্বারা সাধিত হয় না। বরং উল্টা উৎপত্তি হয়। এইসকল যাত্রা দ্বারা পল্লীর সর্ব্বসাধারণের রুচি দূষিত হয়। সহরবাসীদিগের রুচি ত থিয়েটারের সংস্পর্শে অনেক কালই দূষিত হইয়াছে। এইসকল যাত্রাগান দিয়া পল্লীর পবিত্রতা আর কলুষিত করা কেন?

মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্যে লিখিয়াছেন—

> "কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী
> কাল পঞ্চবটী বনে, কালকূট ভরা
> এ ভুজগে? কি কুক্ষণে, (তোর দুঃখে দুঃখী)
> পাবকশিখারূপিণী জানকীরে আমি
> আনিনু এ হৈম গেহে?"

আমরাও সেইরূপ বলিতে পারি—

> "কি কুক্ষণে, মাইকেল, রচেছিলে তুমি
> মেঘনাদবধ কাব্যে, অমিত্র অক্ষরে;
> কি কুক্ষণে, তোমা অনুকরি,
> বরিলা গিরিশ ঘোষ,
> সেই ছন্দে
> রঙ্গালয় মাঝে!"

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সুতরাং নাটক রচনা করিতে হইলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োজন। আর যাত্রা যখন সুধু যাত্রা নামে সন্তুষ্ট না থাকিয়া নাটক হইতে বাঞ্ছা করেন, তখন যাত্রার পালাও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত না হইলে তাহাকে লোকে নাটক বলিয়া মানিবে কেন? তাই যাত্রার রাজা মন্ত্রী সেনাপতি ইঁহারা সকলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথোপকথন করেন। ইঁহাদের মুখে কতকটা সে ছন্দ মানায়, কারণ ইঁহারা প্রায়ই বীররসের অভিনয় করেন। কিন্তু রাজা যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন রাণীর সঙ্গেও সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথোপকথন? হবে না কেন? বাঙ্গালীর বীরত্ব অনেক সময়ে অন্তঃপুরেই প্রকাশ পায়। রাজা রাণী রাজকন্যা নারদঋষি ইঁহারা সকলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথোপকথন করুন ক্ষতি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যাহাদের শুনাইবার জন্য তাঁহাদের এই শ্রম স্বীকার তাহাদের অধিকাংশ লোকেই এই কটমট বুলি বুঝিতে না পারিয়া হা করিয়া তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা প্রায়ই দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃতশব্দবহুল। বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগেরও সময় সময় তাহার অর্থ বুঝা কষ্টকর হয়। গ্রাম্য শ্রোতা গোবিন্দ সরকার, মুকুন্দ সাহা, জগা তেলী, পরাণ নাপিত, মধো ধোপা, ক্ষেমী, বামী, রামীর ত কথাই নাই। এমন কি আমাদের মাসী পিসী মামীদিগেরও সে ভাষা বোধগম্য নহে। বাঙ্গালা-নভেল-পাঠনিরতা নব্য মহিলাগণ অবশ্য কতক কতক বুঝিতে পারেন। তাহা হইলে হইল কি? পৌরাণিক যুগের যাত্রা গান শুনিতে শুনিতে যেসকল স্ত্রীপুরুষের গণ্ডস্থল অশ্রুপ্লাবিত হইত, তাঁহারা এখনকার যাত্রাগানের কিছুমাত্র রস গ্রহণ করিতে পারেন না। তবে কাহাদের জন্য যাত্রাগান?

আধুনিক যাত্রার ভাষা যেমন দুর্বোধ্য, পালার প্লট ততোঽধিক জটিল। অনেক পালা পৌরাণিক নামে প্রচলিত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক আখ্যায়িকার অতি অল্প অংশই বিদ্যমান আছে। হুঁকার নলিচা ও খোল দুইই বদলাইয়া গিয়াছে। কারণ পালা-রচয়িতা মৌলিকতা দেখাইয়া কবি নাম সার্থক করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু র'সো, দাদা, একটু থাম দেখি। কালিদাস ত একজন কবি ছিলেন? সেই কালিদাস স্বয়ং কবিযশঃ-প্রার্থী হইয়া উপহাসকে কত ভয় করিয়াছিলেন, আর তুমি কি একেবারেই "নিরঙ্কুশ"? স্বয়ং বাল্মীকি ব্যাস যে আখ্যায়িকা রচনা করিয়া গিয়াছেন তুমি কোন্ সাহসে তাহার উপর কলম ধরিতে যাও? মহাকবি কাশীরাম ও কীর্ত্তিবাসও যতদূর সম্ভব সেই ঋষিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

পৌরাণিক পালা যদি বা কতক লোকে বুঝিতে পারে, তথাকথিত ঐতিহাসিক ও মনগড়া পালার প্লট আরও দুর্বোধ্য। আর তাহার সবগুলিই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। এখানে একটা নমুনা দিতেছি। ছিলেন এক রাজা, ছিল তাঁহার এক সেনাপতি ও এক মন্ত্রী। রাজা থাকিলেই তাঁহার এক বা ততোঽধিক রাণী থাকেন। সেনাপতির সহিত ছোট রাণীর জন্মিল প্রেম। সেনাপতি ইচ্ছা করিলেন রাজা হইতে। রাজা ছোট রাণীর বাধ্য—যেমন হইয়া থাকে। তিনি ছোট রাণী ও সেনাপতির চক্রান্তে পড়িয়া মন্ত্রীর কথা না মানিয়া বড় রাণীকে পাঠাইলেন বনবাসে। বড় রাণীর এক শিশুপুত্র ছিল, সে প্রহ্লাদ বা ধ্রুবের ন্যায় হরিভক্ত। ব্যাধেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া কালীর কাছে বলি দিতে গেল। এদিকে সেনাপতি অন্য দেশের এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিল। রাজাও কাঁদিতে কাঁদিতে বনে গেলেন। সেনাপতি ও ছোট রাণী রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। রাজার সেই হরিভক্ত শিশুকে স্বয়ং হরি আসিয়া উদ্ধার করিলেন। রাজা ও বড় রাণী ঘুরিতে ঘুরিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার খুব অনুতাপ হইল। মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া রাজা হরির কৃপায় আবার নিজরাজ্য উদ্ধার করিলেন। সেনাপতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইল। ছোট রাণী বিষ খাইয়া মরিলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মন্ত্রীর একটি বয়ঃস্থা অনূঢ়া কন্যা ছিল। সে হয় সেনাপতি না হয় আর কাহারও প্রেমে পড়িয়া চিরকুমারী থাকিল, নয় বিষ খাইয়া মরিল। এই যে সেনাপতিকে হত্যা করা হইল, তাহার কাটামুণ্ডটা আসরে আনিয়া সকলকে একবার দেখান হইল। কেবল মুণ্ড দেখাইয়াই নিস্তার নাই, সেনাপতি রাজা হইয়া যেসকল লোককে অন্যায় করিয়া বধ করিয়াছিল, তাহাদের কয়েক-জনের প্রেতাত্মা আসিয়া সেই কাটামুণ্ডুর রক্তপান করিতে লাগিল। হরিঠাকুর তাঁহার ভক্ত শিশুকে উদ্ধার করিবার সময় একবার মাত্র দেখা দিয়া থাকেন যদি তুমি মনে কর, তবে তুমি হরিকে চিনিতে পার নাই। হরি কি তেমন নিষ্ঠুর? তিনি কথায় কথায় যখন তখন শ্রীরাধিকাকে বামে লইয়া যুগল মূর্ত্তিতে দেখা দেন। এই আখ্যায়িকার মধ্যে হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা ও কিং লিয়ার নাটকের সেই পাগলকে যে বসান হইল না, সে কেবল আমার নিজের ত্রুটি বশতঃ, পালালেখকগণের সে বিষয়ে কোন ত্রুটি লক্ষিত হয় না।

যাত্রার পালার এই যে নমুনা দিলাম ইহাই যথেষ্ট। ইহাতেই পালারচকগণের কবিত্ব সুপরিস্ফুট। একটা "নূতন কিছু" না করিলে কবিকীর্ত্তি স্থায়ী হইবে কেন?

কিন্তু এদেশের নরনারী নূতন কিছু চায় না। তাহারা চায় পুরাণকাহিনী শুনিতে। পুরাণকাহিনী তাহাদের অস্থিমজ্জার সহিত বিজড়িত। রাম-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণার্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যু, সুভদ্রা-দ্রৌপদী, সীতা-সাবিত্রীর লোক-পাবন কাহিনী সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন হইলেও তাহা নিত্য নূতন। কারণ যাহা উচ্চতম আদর্শ, যাহা লোকে আয়ত্ত করিতে পারে না, তাহা চিরদিনই নূতন। হিমালয়ের উচ্চচূড়া দুরধিগম্য বলিয়া চিরদিনই অভিনব ভাবের romanceএর রাজ্য থাকিবে। তুমি যাত্রাকর, লোকশিক্ষার মহাব্রত যদি তুমি গ্রহণ করিয়া থাক, তবে সকল মজ্জাগত ভাবের স্ফুরণ করিতে পারিলেই তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। তুমি নাটকের অনুকরণে মনগড়া কুৎসিত চিত্র দেখাইয়া সরলপ্রাণ

পল্লীবাসীর চিত্ত কলুষিত করিও না। জগতে কবিত্বশক্তি বড়ই দুর্লভ বস্তু, নূতন আখ্যায়িকা গঠন ও নূতন চরিত্র অঙ্কনের ক্ষমতা একমাত্র কবিরই আছে। পয়ারের চৌদ্দ অক্ষর মিল করিতে পারিলেই যেমন কেহ কবি হয় না, দুই একটি গান রচনা করিতে পারিলেই কেহ উত্তম পালা রচনা করিতে পারে না। উত্তম পালা রচনা করিতে হইলে কবিত্বশক্তির প্রয়োজন। যাত্রার অধিকারিগণ অনধিকারীর হাতে পালা রচনার ভার দিয়া তাঁহাদের শক্তির অপচয় করিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও অপকার করিতেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত লোকের দ্বারা পালা রচনা সম্ভব না হয় ততদিন সেই পৌরাণিক যুগের পালাই চলুক। এখনও দেশে সেই-সকল ভক্তি ও করুণরসাত্মক পালার শ্রোতার অভাব হয় নাই। এইসকল পালায় প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেয়। আমার মনে পড়ে একদিন "দণ্ডীপর্ব্বের" সুভদ্রা-চরিত্রের মহিমায় আমি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, স্নানাহার পরিত্যাগ করিয়া বেলা দুইটা পর্য্যন্ত সেই যাত্রাগান শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এখন সেসব পালা আর শুনি না। এখন আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমাদের রুচির এই নাটকাভিমুখী গতি রোধ করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের খাঁটী স্বদেশী জিনিষ এই যাত্রাগানকে অধোগতি হইতে রক্ষা করিবার আবশ্যক হইয়াছে। কারণ যাত্রাগান লোকশিক্ষার এক প্রধান উপায়। কলিকাতার প্রধান প্রধান দলের অধিকারিগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যাত্রাগানকে এই অধোগতি হইতে উদ্ধার করুন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

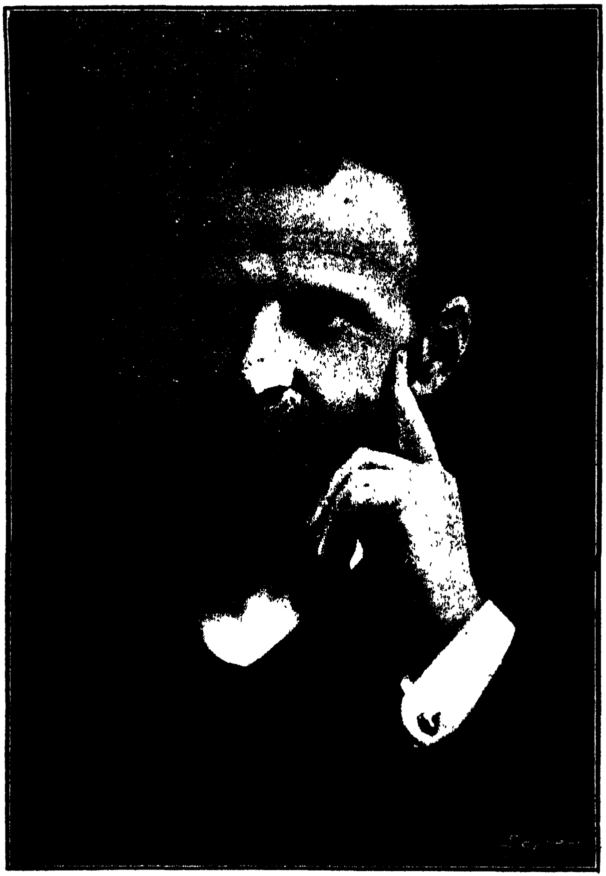
বিদায়

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি, রবে না আর ঘরের দাবী,
সবার আমি প্রসাদবাণী চাই।
অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি, নিবিয়া গেল কোণের বাতি
পড়েছে ডাক চলেছি আজি তাই॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জগতের বন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মা স্টেড্

যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের নিয়ম জীবজগতের সর্ব্বত্রই খাটে। যাহার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা আছে, জীবন-সংগ্রামে দশজনকে ধ্বংস করিয়া যে সেই যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, সেই এই জগতে টিঁকিয়া থাকিবার অধিকারী। আর, যাহার সে শক্তি নাই, তাহার জন্য বিনাশের মুক্তদ্বার অনন্ত প্রসারিত রহিয়াছে, সে সেই পথে যাইবে, কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। ইতর জীব যখন মানবের পদবীতে প্রথম প্রবেশ করে তখনই যে হঠাৎ এই নিয়ম স্থগিত হইয়া যায়, তাহা নহে। তাহা যদি হইত তবে 'দারৈরপি' আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে পারিত না। সুতরাং মানুষ কোনো অবস্থাতেই উক্ত নিয়মের অতীত নহে। কিন্তু, স্বাভাবিক মানুষ (Natural man) ও নৈতিক মানুষে (Moral man) একটা অনতিক্রমণীয় পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেবল এই নৈতিক মানুষেই ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। এই মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিকশিত হয় যাহার আলোকে দেখিতে পাওয়া যায়, যে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের নিয়ম নীচ পড়িয়া গিয়াছে, তাহার রাজত্বের অবসান হইয়াছে। এমন যদি কোন স্থান থাকে যেখানে দাঁড়াইয়া জড় বলিতে পারে, যে, সে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অতিক্রম করিয়াছে, তাহা হইলে যেরূপটি হয়, নৈতিক জীবনে প্রবেশ করিয়া মানবও সেইরূপ জীবজগতের এই মাধ্যাকর্ষণী শক্তির অতীত হইয়া যায়। এখানে আসিয়া মানব যেন একটা বিপরীত ভাবাপন্ন নিয়মের অধীন হইয়া পড়ে। যে 'অযোগ্য,' শক্তিতে যে হীন অর্থাৎ রুগ্ন, দুর্ব্বল, আহত, অক্ষম —ইহাদিগেরই যেন বাঁচিবার দাবী বেশী দাঁড়াইয়া যাইতেছে।



স্বর্গীয় মহাত্মা ষ্টেড্।

স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুলতাতে নহে, কিন্তু আত্মত্যাগের জন্য যে স্পৃহা, তাহারই মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত।

স্ব স্ব জীবন রক্ষার উদ্যমে পরস্পরের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নিয়মের বাহ্যপ্রকাশ। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট। তাহাতে সহসা মনে হইতে পারে যে, সভ্যতার শ্রেণীবিভাগে উক্ত সভ্যতা সভ্যতার নিম্নস্তরে অবস্থিত। কিন্তু "টাইটানিক নিমজ্জন" আমাদিগকে অন্য বার্ত্তা শুনাইতেছে। অদৃষ্টবাদী যখন হঠাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তখন সে ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ আত্মসম্বরণ করিতে সমর্থ হয়। তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য হইবার নাই। উহাতে তাহার শিক্ষার মর্য্যাদাই রক্ষিত হয়। কিন্তু দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত আজন্ম সুখের ক্রোড়ে লালিত পুরুষকারবাদী যখন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় অকস্মাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও আত্মহারা হয় না, পরন্তু আত্মরক্ষার সামর্থ্য সত্ত্বেও আনন্দিত মনে দুর্ব্বলের জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়া নির্ভীকচিত্তে "আমি আমার

সমর্থের সমস্ত শক্তি অক্ষমেব উদ্ধারে নিয়োগ করিতে হইবে; নতুবা ক্ষমতার সার্থকতা হইল না, তাহার অপব্যবহারই হইল! মানুষের মনে এ ভাব এতই প্রবল যে সে ইহার ব্যভিচার সহ্য করিতে পারে না। সেই জন্যই দুর্ব্বলের জন্য সবলের আত্মত্যাগ এমন করিয়া মানুষের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। তাই তো, যাঁহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াও, আত্মরক্ষায় অসম্পূর্ণ অপারগ নারী ও শিশুদিগের জন্য স্থান করিয়া দিয়া, সে দিন 'টাইটানিকে'র সঙ্গে অতলান্তিক মহাসাগরের অতল গর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহাদিগকে মানুষ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। উঁহারা প্রাকৃতিক নিয়ম অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়া

কর্ত্তব্য করিলাম" এই আত্মপ্রসাদের মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে, তখন বুঝিতে হয় যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাহ্যাবরণ লইয়াই শিক্ষা ও সভ্যতা মনুষ্যত্বের অতি উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। কি নারী কি পুরুষের মধ্যে দেশকালের বিচারের অতীত হইয়া যেসমস্ত সুকুমার বৃত্তির বিকাশ হইলে মানুষকে আমরা মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, 'টাইটানিক' যদি চকিতে তাহা দেখাইবার অবসর দিয়া মানুষের মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করিয়া দিয়া থাকে, তবে য়ুরোপ ও আমেরিকা কোটি কোটি টাকা তাহার জন্য বৃথায়ই ব্যয় করে নাই।

এই টাইটানিকের নিমজ্জনে জগৎময় একটা মহা হাহাকার উত্থিত হইয়াছে। এ হাহাকার কিসের জন্য?

কত লক্ষপতি ক্রোড়পতি আপনাদের অর্থের স্তূপের মধ্যে বসিয়াই ডুবিয়া গেলেন তাহাতেই কি এই শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে? মানুষ আসে মানুষ চলিয়া যায় ইহা নিত্য ঘটনা। নিত্য ঘটনা হইলেও এত বড় একটা দুর্ঘটনায় মানুষ শোক না করিয়া পারে না। কত অর্থ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেল। শোক কি সেই জন্য? ক্রোড়পতি লক্ষপতি গিয়াছেন, আবার কত ক্রোড়পতি লক্ষপতি রহিয়াছেন, অর্থ গিয়াছে সে ক্ষতি পূরণ হইতে বেশী দিন লাগিবে না। মানুষের জন্য মানুষের ক্রন্দনও থামিবে। কিন্তু টাইটানিক এক জনকে লইয়া সাগরগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে যাঁহার দোসর আর চক্ষে দেখিতেছি না। আর যে সত্বর দেখিব সে আশাও হইতেছে না। তাই শোক সম্বরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মনের মধ্যে এ ক'দিন একটা হাহুতাশ লাগিয়াই রহিয়াছে। মানুষ তো সকলেই। কিন্তু সময়ে সময়ে একএকজন এমন মানুষ দেখিতে পাই যাঁহারা সাধারণ জনমণ্ডলী হইতে একটু উচ্চ ভূমিতে বাস করেন। আর্কিমিডিস্ বলিয়াছিলেন, আমায় পৃথিবীর বাহিরে একটু স্থান দাও আমি পৃথিবীটা উণ্টাইয়া দিতেছি। যাঁহারা পৃথিবীর গায়ে ধাক্কা দেন, যাঁহারা পৃথিবীকে নাড়াচাড়া দেন, তাঁহারা যে পৃথিবী ছাড়িয়া একটা স্বতন্ত্র স্থানে উপবিষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাঁহারা কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারেন না। টাইটানিকের মধ্যে এমনই একজন লোক ছিলেন। সুতরাং সমস্ত জগৎ আজ শোক-বসন পরিধান করিয়াছে। আর্ত্তের বন্ধু, নিপীড়িতের সহায়, জগৎবিখ্যাত Review of Reviews পত্রের সম্পাদক মহামনা ষ্টেড্ সাহেব এই জাহাজে ছিলেন। যখন কাগজে পড়িলাম 'কার্পেথিয়া' একদল যাত্রীকে উদ্ধার করিয়া আনিতেছে, তখন ক্ষণকালের জন্য একটা আশার ক্ষীণ রশ্মি হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত হইল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল অসম্ভব! যতক্ষণ না শেষ কুকুরটি পর্য্যন্ত জীবনরক্ষার বোটে নিরাপদে আশ্রয় পাইতেছে, ততক্ষণ ষ্টেড্‌কে কেহ জাহাজ হইতে বাহির করিতে পারিবে না, তাহা নিশ্চিত! যিনি সমস্ত জীবন অন্যের জন্য জীবনপাত করিলেন, তিনি আসন্নকালে অন্যের উপরে আপনার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইবেন, তাহা একেবারেই অসম্ভব। তখনই বুঝিলাম কোন আশা নাই। পরে তাহাই প্রমাণিত হইল। ভিড়ের মধ্যে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। একবার মাত্র তিনি স্বীয় কামরার দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। ব্যাপার বুঝিয়া নিঃশব্দে নির্ভীকচিত্তে স্বীয় বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তারপর সব ফুরাইয়া গিয়াছে। শেষ খবর যাহাদের নিকট পাওয়া গিয়াছে, তাহারা তাঁহাকে সমুদ্রগর্ভে ভগ্ন কাষ্ঠাবলম্বনে ভাসমান দেখিয়াছে। আত্মরক্ষার চেষ্টা তো করিতেই হয়। "আত্মানমেব সততং গোপায়িত" তাহা সত্য, কিন্তু 'দারৈরপি' নহে।

এবার যখন এপ্রিল মাসের Review of Reviews হাতে আসিল, অতর্কিতে হাতটা কাঁপিয়া উঠিল, নেত্রকোণে অশ্রুবিন্দু আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তো শেষ বার ষ্টেডের লেখা পড়িতেছি। অত্যাচারীর মস্তকের উপর উদ্যতবজ্র সেই সতেজ লেখনীর জ্বালাময়ী ভাষা আর তো পড়িতে পাইব না! ভাষার তেজ অনেকেরই থাকিতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের রক্ত দিয়া না লিখিলে তাহা হৃদয়কে আঘাত করে না। Review of Reviewsএর প্রথম কয় পৃষ্ঠার মন্তব্যের মধ্যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রের সকল কথাই থাকিত, যাহা অন্য কাগজেও থাকিতে পারে; কিন্তু ভাষা ও বিষয়ের অন্তরালে এমন কিছু থাকিত যাহা অন্য কোনও কাগজে পাই না। কি তেজ, কি বীর্য্য! যেন বিশ্বেশ্বরের প্রধান সেনাপতি, হটিবার সম্ভাবনাই নাই। যাঁহার সত্যের জয়ে ধ্রুববিশ্বাস নাই, যাঁহার বিশ্বাস নাই যে সত্যের পশ্চাতে বিশ্বপতির অনন্তশক্তি কার্য্য করিতেছে, তাঁহার লেখনী এরূপ ভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। ষ্টেড্ সাহেবের কলমের সম্মুখে কোন বাধা বিঘ্নই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই। সত্যের পক্ষ সমর্থনে, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষায় তাঁহার লঘুগুরু জ্ঞান ছিল না। যেখানে অত্যাচার, অত্যাচারী যতই বড় হউক না, ষ্টেড্ সেখানে বজ্রহস্তে উপস্থিত। নিপীড়িত যতই ক্ষুদ্র হউক না, ষ্টেডের সহানুভূতি হইতে সে বঞ্চিত নয়। অত্যাচার-পীড়িত যিনিই কেন হউন না,—মহামহিমান্বিত "রুমের বাদ্‌শা" অথবা সামান্য "বিপিন পাল"—ষ্টেডের সহানুভূতির কাছে সকলেই সমান।

তিনি সর্ব্বদাই মনুষ্যত্বের উচ্চভূমিতে বিচরণ করিতেন, তাই কোন দিন ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় স্বার্থ কখনও তাঁহার দৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্যায় সর্ব্বাবস্থাতেই অন্যায়। তিনি কখনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে বিরত হন নাই। সাংসারিক লোকে ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সুবিধার (Expediency) খাতিরে সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় স্বার্থের জন্য অন্যায়কে চাপা দিতে চেষ্টা করে, অসত্যকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের এই চিহ্নিত পুরোহিত, সত্যের সেবক ও ন্যায়ের অনুচর কখনও এই সংসারিকতার দোষে দুষ্ট হন নাই। তাঁহার মত দুর্ব্বলের এমন প্রবল সহায় আর কে ছিল। তাই বলিয়া তিনি দুর্ব্বলের অন্যায় কখনও সমর্থন করেন নাই। শ্রীমতী এনি বেশান্ত এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনকেই পরিহার করিতে উপদেশ দিয়াও বিলাতে যাইয়া রাজনৈতিক-অধিকার-প্রয়াসিনী রমণীদিগের জানালা আর মাথা ভাঙ্গা সমর্থন করিতে বসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ষ্টেড্ নারীজাতির সর্ব্বপ্রকার অধিকার সম্প্রসারণের এক প্রধান পাণ্ডা হইলেও রমণীগণের এই কার্য্য তিনি সমর্থন করেন নাই। যাহা ন্যায়, যাহা সত্য তাহারই সমর্থন করিতে হইবে, যাহা অন্যায়, যাহা অসত্য তাহারই প্রতিবাদ করিতে হইবে, কাহার দ্বারা কৃত তাহা দেখিবার অবসর তাঁহার ছিল না। সেই জন্যই তিনি ভারতবাসীর স্বায়ত্বশাসনের দাবী সমর্থন করিয়াছেন কিন্তু আমাদের সামাজিক অন্যায়ের সমর্থন করেন নাই। তিনি পারস্যে অবিচারের প্রতিবিধানের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, কিন্তু ভারতীয় মুসলমান-গণের সাম্প্রদায়িক স্বার্থপ্রণোদিত অন্যায় আবদার কখনও সমর্থন করেন নাই। রুসিয়ার প্রতি অবিচার না হয় সেজন্য তিনি সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া 'পোলিস্'দের উপর রুসিয়ার ব্যবহার কখনও তিনি মার্জ্জনীয় মনে করেন নাই। তিনি যাহা সত্য বুঝিয়াছেন তাহারই সমর্থন করিয়াছেন, যাহা ন্যায় বুঝিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন—ধনীর ভ্রুকুটী বা দরিদ্রের গালাগালি কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি একবার সামাজিক দুর্নীতি দমন করিতে যাইয়া জেলে গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের বড়লোকেরা কেমন করিয়া রমণীদিগকে কুপথে লইয়া যায় তাহার বিরুদ্ধে তিনি একবার ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত করেন। মানুষ চুরি করা কেমন সহজ তাহা হাতে কলমে দেখাইতে যাইয়া তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। কেন না, যিনি মানবজাতির মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, নিজের কথা ভাবিবার তাঁহার অবসর কোথায়? বুয়ার যুদ্ধের সময় যখন তাঁহার সমস্ত দেশবাসী একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল, যাঁহারা পূর্ব্বে বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহারাও যখন যুদ্ধের পক্ষপাতীদিগের সঙ্গে যোগ দিলেন, তখন একমাত্র ষ্টেড্ সাহেব তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। কোন দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। তিনি যখন বুঝিয়াছেন এ যুদ্ধ অন্যায়, তখন আর কে তাঁহাকে প্রতিবাদ হইতে নিরস্ত করে? স্বজাতির সম্ভ্রম বা ব্যক্তিগত লাভালাভ কিছুই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। Cecil Rhodesএর উত্তরাধিকারী বুয়র যুদ্ধের প্রতিবাদ করিয়া বার ক্রোড় টাকা হইতে বঞ্চিত হইলেন। যাঁহারা কি সত্য, কি ন্যায় তাহা জানিয়া সুবিধার (Expediency) অনুরোধে অগ্রসর হইতে অসমর্থ তাঁহারা মানবজাতির এই অগ্রজ (first-born) ভ্রাতার তর্পণের অধিকারী নহেন। এবং যাঁহারা ষ্টেডের অশৌচ গ্রহণ করিতে অসমর্থ তাঁহা-দিগকে নিতান্তই কৃপাপাত্র মনে করিতে হইবে।

মাতা বসুন্ধরা এমন পুত্ররত্ন হারাইয়াছেন! মানবাকাশ হইতে এমন উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে! মনুষ্যত্বের অগ্রদূত আজ চলিয়া গিয়াছেন। সে বীর্য্য, সে তেজ আজ অতলান্তিক মহাসমুদ্রের বিশাল বক্ষে বিশ্রামলাভ করিয়াছে। ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। সে বহ্নি মহা-সাগরের বারিরাশি ভিন্ন আর কিছুতে নির্ব্বাপিত হইলে বুঝি তাহার যথেষ্ট সম্মান হইত না! সে তেজ যিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার সম্বরণ করিলেন, তাঁহারই নাম ধন্য হউক!

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

জাহাজ ডুবি

নবনির্ম্মিত যাত্রীজাহাজ টাইটানিকের প্রথম সমুদ্রযাত্রা মহাযাত্রায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। আরামপ্রিয়ের লোহার বাসর, ধনকুবেরের অর্ণব-প্রাসাদ, নৌগঠনবিদ্যার চরম চেষ্টার ফল টাইটানিক চলন্ত বরফের পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া দুই টুকরা হইয়া গিয়াছে। বরফের মৈনাক! স্বয়ং ইন্দ্র ইহাদের দমন করিতে পারেন নাই; স্রোতের মুখে ইহারা এখনও উড়িয়া বেড়ায়, যাত্রী জাহাজের সর্ব্বনাশ সাধন করে, মানুষের অনিষ্ট ঘটায়।

তিন শ' গজ বহরের টাইটানিক ইংলণ্ড হইতে প্রায় আড়াই হাজার যাত্রী লইয়া আমেরিকার অভিমুখে যাইতেছিল। পথে ঝড়ঝঞ্ঝার নাম গন্ধও ছিল না। হঠাৎ গায়েবী তারে খবর আসিল "সাবধান! সম্মুখে বরফের পাহাড়।" কাপ্তেন অম্‌নি দূরবীণ্ সহ লোক মোতায়েন্ করিয়া দিলেন "দেখ, বরফের পাহাড় কোন্ দিকে, কোন্ মুখে তাহার গতি।"

আকাশ নির্ম্মেঘ, বাতাস পরিষ্কার, তত্রাচ লোকটা কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না। যখন ঠাহর হইল তখন বরফের স্তূপ একেবারে জাহাজের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে; জাহাজ থামাইবার আর অবসর নাই। ধাক্কার পর আবার ধাক্কা, আঘাতের উপর পুনর্ব্বার আঘাত। লক্ষীন্দরের লোহার বাসরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছিদ্র হইয়া পড়িল; ইঞ্জিনঘরে জল ঢুকিল, জাহাজ আর চলিতে পারিল না।

বিপদসূচক ঘণ্টা কাপ্তেনের হুকুমে ঘন ঘন বাজিতে লাগিল; রাত্রি তখন প্রায় দশটা, যাত্রীরা অনেকেই তখন জাগিয়া; কেহ গান গাহিতেছে, কেহ তাস খেলিতেছে কেহ চুরুট ফুঁকিতেছে। ঘণ্টা শুনিয়া অনেকেই বাহিরে আসিল। উহারা বিপদের কথা মোটেই বুঝিতে পারে নাই। শেষে কাপ্তেনের কথায় ক্রমে সকলে বাহিরে আসিয়া ডেকের উপর জমায়েৎ হইল। প্রায় শতখানেক খালাশীও ঐসঙ্গে জটলা করিতেছিল, জাহাজের কর্ম্মচারীরা বন্দুক দেখাইয়া তাড়া দিতে উহারা আবার নিজের নিজের জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল।

এই সময়ে, লাইফ্-বোটগুলা জলে নামাইতে না নামাইতে, জাহাজের সমস্ত আলোক নিবিয়া গেল এবং শীতল জলের সংস্পর্শে তপ্ত বয়লার ফাটিয়া টাইটানিক্ দুই টুকরা হইয়া গেল।

যে লোকটি তারঘরে ছিল সে কিন্তু নড়ে নাই, সে ক্রমাগত তারহীন তাড়িত যন্ত্রের সাহায্যে চতুর্দ্দিকে খবর পাঠাইতেছে "টাইটানিক ডুবিল, বাঁচাও, বাঁচাও।"

তিন শ্রেণীর যাত্রীই কর্কের কোমরবন্ধ পরিয়া জলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত। হঠাৎ কাপ্তেনের হুকুম হইল, "পুরুষেরা পিছাইয়া যান্, প্রথমে বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে বাঁচাইতে হইবে।"

ধনকুবের ষ্ট্রস্ এবং গগন্‌হীম্, কর্ণেল আষ্টর এবং জগদ্বিখ্যাত ষ্টেড্ সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী পর্য্যন্ত সমস্ত পুরুষ পিছাইয়া দাঁড়াইল।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই নীরবে যন্ত্রচালিতের মত নৌকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; কেবল কয়েক জন সধবা কোনোমতেই স্বামীকে ছাড়িয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইতে সম্মত হইল না; তাহারা সহমৃতা হইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। ইহাদের মধ্যে আবার দুই একজন, গৃহস্থিত সন্তানের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায়, স্বামীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ও সস্নেহ অনুযোগে, অশ্রুনেত্রে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া নৌকার অভিমুখে চলিল।

এই সময়ে ব্যাণ্ডে বাজিতে লাগিল—

"আরো কাছে, প্রভু! তোমার আরো কাছে!" কেহ হৈ চৈ করিল না, হুড়াহুড়ি করিল না; কেহ কাঁদিল না, আর্ত্তনাদ করিল না! ধীরে ধীরে টাইটানিক ডুবিতে লাগিল। আর, দেড় হাজার বলবান পুরুষ উন্মুক্ত মস্তকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বীরের মত ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ওদিকে তার-ঘরে জল ঢুকিয়াছে, তারের সাহেব তবুও চেয়ার ছাড়ে নাই; কাপ্তেন বলিলেন "তুমি কর্ত্তব্য তো পালন করিয়াছ, এখন নিজের প্রাণ বাঁচাও।" বেচারা তবু নড়িল না, শেষে একটা ঢেউ আসিয়া উহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। কাপ্তেনেরও শেষে ঐ গতি। তিনি একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় পড়িয়া গিয়া পুনর্ব্বার উঠিয়া

দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু, তাহার পর যখন আর একটা ঢেউ আসিল তখন আর সাম্‌লাইতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে জাহাজও ডুবিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে দেড়হাজার মূল্যবান জীবন অকাল-বর্ষণে দীপান্বিতার আলোকমালার মত নিঃশব্দে নির্ব্বাণ লাভ করিল।

আতঙ্ক উহাঁদিগকে অভিভূত করিতে পারে নাই এই উহাঁদের গৌরব, উহাঁরা সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। উহাঁরা মরণভয় জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন। আমরা বিদেশী, আমরাও উহাঁদের আত্মার কল্যাণে অশ্রু-তর্পণ করিতেছি।

যাঁহারা বাঁচিয়া ফিরিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বালক এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। প্রথম শ্রেণীর একশত চুয়াল্লিশ জন যাত্রিণীর মধ্যে ফিরিয়াছেন একশত উনচল্লিশ জন; শিশু পাঁচটিই ফিরিয়াছে এবং পুরুষ যাত্রী একশত বায়াত্তর জনের মধ্যে বাঁচিয়া ফিরিয়াছেন মোটে উনষাট জন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিণী মোট তিরানব্বই জন, ফিরিয়াছেন আটাত্তর জন; চব্বিশটি শিশু, সকল গুলিই ফিরিয়াছে; পুরুষ যাত্রীর সংখ্যা এক শত ষাট, ফিরিয়াছে মোটে তের জন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিণীর সংখ্যা এক শত উন-আশী, জীবিত মোট আটানব্বই; পুরুষ যাত্রীর সংখ্যা চারি শত চুয়ান্ন, জীবিত মোট পঞ্চান্ন জন। তৃতীয় শ্রেণীতে শিশুর সংখ্যা মোট ছিয়াত্তর অথচ বাঁচিয়া ফিরিয়াছে মোট তেইশটি। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল শিশুকেই বাঁচান হইল অথচ তৃতীয় শ্রেণীর অর্দ্ধেক শিশুকেও যে কেন বাঁচান গেল না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রিপোর্টে তো দেখিতেছি উদ্ধারের সময়ে ঐশ্বর্য্যের তারতম্য হিসাবের মধ্যেই ধরা হয় নাই। তিন শ্রেণীর হিসাব মিলাইয়া দেখিলে রিপোর্টারের ঐ কথাটার খুব যে বেশী মূল্য আছে তাহা মনে হয় না। যাক্ সে কথা, ধনী যখন আপনার জীবন বাঁচাইবার দাবী ভুলিয়া দরিদ্রকে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া মৃত্যুস্বীকার করিয়াছে, বলবান যখন অবলা স্ত্রীলোক এবং দুর্ব্বল শিশুদিগকে বাঁচাইবার জন্য জীবনের চরম সময়েও নিজেকে সংযত করিতে পারিয়াছে, এবং ষ্টেডের মত সমাজের পরম উপকারী জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি যখন কোন এক অখ্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য নিজের ন্যায্য দাবী অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তখন ওরূপ একটা বেতালা আলোচনা নাই করিলাম। যাহা দেখিলাম যাহা পাইলাম তাহার তুল্য জিনিস তো এ সংসারে বড় বেশী মেলে না।

প্রায় তের শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরে এমনি একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন চীন জাপান, শ্যাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি নানাদেশ হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ভারতবর্ষে তীর্থ করিতে আসিতেন। ভারতবর্ষ তখন এসিয়ার হৃদয়কেন্দ্র। সেই সময়ে কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে 'ডুড়ি' বা উড়ুপে চড়িয়া সাগর লঙ্ঘন করিতেছিলেন। মগ্ন শৈলের চূড়ায় ঠেকিয়া হঠাৎ ডুড়ি ভাঙ্গিয়া গেল। জাহাজ ডুবুডুবু এমন সময়ে আর এক খানা ডুড়ি আসিয়া পৌঁছিল। ডুড়ির মালিক সকলের আগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করিতে চাহিল, উহাঁরা বলিলেন "আগে আর সকলে উঠুক, তাহার পর দেখা যাইবে। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, জগতের ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত যতক্ষণ না মোক্ষলাভ করে ততক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। আমরা বৌদ্ধ হইয়া নিজের প্রাণ আগে বাঁচাইব? অসম্ভব।"

যখন আর সকলে উঠিল তখন আর ডুড়িতে জায়গা নাই। সন্ন্যাসীরা বোধিদ্রুমমূলে যেসমস্ত সামগ্রী উৎসর্গ করিবেন বলিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন তাহা অন্য যাত্রীদের হাতে সঁপিয়া দিয়া প্রসন্নমনে 'অমিতাভ' নাম জপ করিতে করিতে অনায়াসে তনুত্যাগ করিলেন। দুইটি ঘটনার মধ্যে তেরশত বৎসরের ব্যবধান। একটি ঘটনার প্রাণ জলন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস অপ্রমেয় মৈত্রী করুণা ও জীবহিতৈষা; আরএকটি ঘটনার মূলতত্ত্ব—ঠিক এক কথায় প্রকাশ করা যায় না।

হয় তো উহা জাতিগত শৌর্য্যজনিত সংযম, হয়তো উহা বৃহৎ ব্যাপারে সংলিপ্ত থাকার মাহাত্ম্য,—গৌণ মহত্ত্ব হয় তো অন্যকিছু। ঠিক যে কী, তাহা জোর করিয়া বলিবার জো নাই। কেহ মরিয়াছেন মহাত্মা ষ্টেডের মত পরলোকে আস্থাবশতঃ; কেহ মরিয়াছেন কাপ্তেন স্মিথের

মত আন্তরিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠাবশতঃ ; কেহ মরিয়াছে ইঞ্জিনের কয়লাবাহী কুলির মত উপরওয়ালার রিভল্ভারের ভয় বশতঃ। আবার নীরোর সমসাময়িক অতি গর্ব্বিত পেট্রোনিয়সের মত, কেবল 'গোলা' লোকের প্রতি তাচ্ছিল্যবশতঃ,—বাজে লোকের সম্মুখে প্রাণের মায়া প্রকাশ করিবার গভীর অনিচ্ছাবশতঃ যে একজনও মরে নাই এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। আবার মহৎ দৃষ্টান্ত সময়ে সময়ে সংক্রামক। এইসমস্ত নানা সন্দেহ সত্ত্বেও, মনস্তত্ত্বের এইসমস্ত পাংশুল প্রশ্ন সত্ত্বেও এই আত্মদানের অবদান মানবেতিহাসে স্মরণীয়।

টাইটানিক ডুবিয়াছে। লতামণ্ডপ, ব্যায়াম-গৃহ, সুবৃহৎ সন্তরণকুণ্ড, বিসর্পিত অর্দ্ধক্রোশব্যাপী পাদচারণার সু-নির্ম্মিত বর্ত্ম, সুসজ্জিত ভোজনমন্দির, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহস্র উপকরণ বুকে করিয়া টাইটানিক ডুবিয়াছে। গরম জলের ফোয়ারা, ঠাণ্ডা জলের ঝর্ণা, মেহগ্নির সজ্জাগৃহ, দর্পণখচিত নৃত্য গৃহ, এই সমস্ত লইয়া, এবং তদ্ভিন্ন দেড়হাজারের উপর নরনারী, আশাপ্রলুব্ধ স্নেহপ্রীতিবিশিষ্ট, স্নেহপ্রীতির আধারস্বরূপ দেড়হাজার নরনারীকে লইয়া টাইটানিক ডুবিয়াছে। তবুও ইহা ভরাডুবি নয়। যে সাত শত লোক বাঁচিয়া ফিরিয়াছে আমরা তাহাদের কথা বলিতেছি না। টাইটানিক ডুবিল, কিন্তু উহার যাত্রীরা যে মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেল তাহাতে য়ুরোপ ধনী হইয়া উঠিবে, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবজাতি ধন্য হইবে।

উন্মত্ত শোক যে একমাত্র শূদ্রের পক্ষে—তথা দাসের পক্ষে শোভনীয় তাহা এতদিনে স্পষ্ট বুঝিলাম। 'বিপদি ধৈর্য্যম্' কথাটা যে পাঠশালায় পড়িবার এবং পাঠশালার বাহির হইয়াই ভুলিবার জিনিস নয়, তাহাও জাজ্জ্বল্যমান দেখিলাম।

রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি করিতে গিয়া হার মানিয়াছিল। অনেকের মতে প্রাকৃতিক শক্তির উপর প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা মানুষের পক্ষে, রাবণের স্বর্গসোপান গড়িবার মত দুশ্চেষ্টা মাত্র ; ওরূপ ধৃষ্টতা দেবতারা সহ্য করেন না। এইতো টাইটানিক জাহাজ—মানুষ গড়িয়াছিল, বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছিলেন "সোলা জলে ডুবিবে, তবু টাইটানিক্ ডুবিবে না।" কোথায় রহিল সে গর্ব্ব ? মানুষের গর্ব্বের এই মূল্য। আমরা একথার উত্তর দিব না, শুধু, এই বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, যে মানুষ টাইটানিক গড়ে সেই তো তারবিহীন তারের খবর আবিষ্কার করে এবং তাহারি বলে তো 'কার্পেথিয়া' আকৃষ্ট হইয়া আসিল, এবং সাতশত মানবের জীবন রক্ষা করিল। নহিলে সবই তো গিয়াছিল।

গ্রীসের জুপিটর মর্ত্তলোকে অগ্নি-স্থাপনের অপরাধে প্রমিথিয়ুস্‌কে অশেষরূপে নির্য্যাতিত করেন। আর ভারত-বর্ষের ইন্দ্র শ্যেনরূপে স্বয়ং নরলোকে অগ্নি আনিয়া দেন। আমাদের দেবতা হিংসুক দেবতা নহেন। মানুষের মধ্যে যে শক্তি কাজ করিতেছে, যাহার ফলে সে পঞ্চভূতের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে তাহা কখনই দেবতার অনভিপ্রেত নহে, তাহা দৈবশক্তিরই স্ফুলিঙ্গ। ইহাই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বিশ্বাস।

তবে 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' সিদ্ধির পথ দুর্গম। যবদ্বীপে হিন্দু-অধিকার-সময়ে একটি গণেশমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, মূর্ত্তিটি বহুসংখ্যক নরকপালের উপর প্রতিষ্ঠিত। কল্পনাটি চমৎকার। প্রাণপাত ভিন্ন সিদ্ধিলাভ করা যায় না, অনেকের হাড় মাটি হইয়া না গেলে সিদ্ধিদাতার পীঠ নির্ম্মাণ হয় না। সত্য কখনো সস্তা দরে বিকায় না। তা' সে বৈজ্ঞানিক সত্যই হোক আর আধ্যাত্মিক তত্ত্বই হোক। জীবন দিয়া সত্য কিনিতে হয়। টাইটানিকের যাত্রীরা জীবন বিসর্জ্জন দিয়া যে সত্য শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গেল তাহার ফলে য়ুরোপের অনেক অমঙ্গল কুণ্ঠিতধার কুঠারের মত নিস্তেজ হইবে, বহু কল্যাণ বর্দ্ধিত হইবে। ইহা পরম লাভ এবং ইহাই পরম সান্ত্বনা।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

বিশ্ববন্ধু

(ষ্টেড্ সাহেবের মৃত্যু উপলক্ষে)

গ্রহণ-বর্জ্জিত শুচি সূর্য্যসম নিত্য-নির্ণিমেষ
নিয়ন্তার নেত্রবিভা পশেছিল ও তব পরাণে,
তাই জ্ঞান নাই শঙ্কা, তাই তুমি মান নাই ক্লেশ,
বিবাদ, বিপদ, বিঘ্ন ; টল নাই নিন্দা অপমানে।

হে তেজস্বী! অগ্নিদ্বাত্ত! হে তপস্বী! স্বদেশ বিদেশ
ভিন্ন নহে তব চোখে; তোমার নাহিক আত্মপর;
ঘোষণা করেছ শুধু নিত্য সত্য; চিত্ত স্বার্থলেশ-
শূন্য তব চিরদিন; ধৃতব্রত তুমি ঋতম্ভর।

"জাতির প্রতিষ্ঠা বাড়ে ন্যায়-নিষ্ঠ শুচি অনুষ্ঠানে"
এ তোমার মূলমন্ত্র, এ তোমার প্রাণের সাধনা;
জয়ডঙ্কা নাদে তাই আতঙ্কিত হ'তে তুমি প্রাণে
দুর্ব্বলের পীড়া ভয়ে। বিশ্বমানবের আরাধনা;—

সনাতন ন্যায় ধর্ম্ম,—তুমি তার ছিলে পুরোহিত,
কত অভিচার মন্ত্র নষ্টবীর্য্য তব শঙ্খরবে,
হে বিশ্বাসী! বিশ্ববন্ধু! ওগো কর্ম্মী উদারচরিত!
নিঃস্ব নির্জ্জিতের পক্ষে একা তুমি যুঝেছ গৌরবে।

হে ধর্ম্মিষ্ঠ! আত্মনিষ্ঠ! লভিয়াছ সমুদ্র-সমাধি
অন্তে তুমি সমুদার! মানুষের রাজ্যের বাহিরে;
উর্দ্ধে শুধু নীলাকাশ, সীমাহীন অনন্ত অনাদি
নিয়ে লীলায়িত নীল, উচ্ছ্বসিত চন্দ্রমা মিহিরে।

তোমার সমাধি ভঙ্গ করিবে না তরঙ্গ দুর্জ্জয়,
আত্মপ্রাণ দানে তব আর্ত্তত্রাণ ঘটেছে সুক্ষণে;
কীর্ত্তনীয় তব নাম, কীর্ত্তি তব অমর অক্ষয়,
ক্ষাত্রধর্ম্ম মূর্ত্ত তুমি হে যশস্বী জীবনে মরণে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলোচনা

পৌষ সংক্রান্তি।

পূর্ব্ববঙ্গবাসিনী কোন বৃদ্ধা মহিলা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছিলেন, তাঁহাদের দেশীয় আজকালকার ছেলেরা দেশপ্রচলিত "কুলাই"র গীত প্রভৃতি ছড়াগুলি ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছে। এবং তাহা জানে না বলিতেই বেশী গৌরব বোধ করে। ভবিষ্যতে সেসব ছড়া একেবারে লুপ্ত হইবে মনে হয়। তাঁহাকে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত, "পৌষ-সংক্রান্তির" উপলক্ষে গীত ছড়াগুলি পড়িয়া শুনাইলাম। বলিলাম, তাহাদের দেশীয়েরা "বাঙ্গালিয়া" কথা ও ছড়া ভুলিতে চায় বলিয়াই পশ্চিমবঙ্গবাসিগণ তাহা সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, এদেশীয় ভাষা ঠিক রাখিয়া প্রকাশিত হওয়াতে বিদ্রূপ মনে হয়। যাহা হউক, সাধারণতঃ "কুলাইর" গানে আরও দুইটী পদ গায়, যথা:—

"ঠাকুর কুলাই ভোঁ।
হরসিয়া, পরশিয়া,
লড়া বাইগুন তরাসিয়া।
লড়া বাইগুন খল পাতে,
ভিখ্ দ্যাও আন্যা (আনিয়া) লক্ষ্মীর হাতে।
দ্যাও ভিখ, ল্যাও বর,
ধানে চাউলে বরুক্ গর।
হরুয়া নালের চাছ কলাই, মাণিকনালের বেড়া,
লক্ষ্মীর হাতে দ্যাও ভিখ যাই আল্যা (হালিয়া-কৃষক) পাড়া,
আল্যা পাড়া যাইতেরে গাঙ্গে লাগ্‌ল ঠোস্,
(কোরস্) ঠাকুর কুলাই ভোঁ।

(২)

অটি, অটি,
সোনায় বান্ধা লাড়ি (লাঠি)।
সোনাও বালো (ভাল) রূপাও বালো,
এগর হান (ঘরখানি) ছাইছে বালো,
এগর হান্ ছাইছে ছোনে,
লক্ষ্মী বইছেন চারি কোণে,
বইছেন লক্ষ্মী দিছেন বর,
ধানে চাউলে বরুক্ গর (ভরুক ঘর)॥
হরুয়া নালের চাছ কলাই, মাণিকনালের বেড়া
লক্ষ্মীর হাতে দ্যাও ভিখ যাই আল্যা পাড়া,
আল্যা পাড়া যাইতেরে গাঙ্গে লাগ্‌ল ভাড়ি, (ভাটি)
এদেশের মানুষগুলা অক্ষয় লোয়ার (লোহার) কাড়ি (কাঠি)।"

কুলাইর গীত আরও আছে। বাহুল্য ভয়ে দুইটী মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। এ উৎসবে ভদ্র ইতর সকল শ্রেণীর বালকেরাই যোগ দিয়া থাকে।

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

ফরিদপুরের গ্রাম্য ছড়া।

গত বৎসর চৈত্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত পূর্ব্ব-বঙ্গে—প্রধানতঃ ফরিদপুরে—গীত কৃষকবালকদিগের একটি সুখশ্রাব্য ছড়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ছড়াটি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

নলিনী বাবুর উদ্ধৃত ছড়াটাতে কয়েকটা ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হইল। ছড়াটি কোন সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল এ কথা নলিনী বাবু স্বীকার করিয়াছেন, আমরাও এইরূপই শুনিয়া আসিতেছি। তবে নলিনী বাবু যে বলিয়াছেন - 'অথচ নামগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে' ইহা ঠিক নহে। মূল ছড়াটির মধ্যে কোন মিথ্যা নাম স্থান পায় নাই আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি। নলিনী বাবুর নিজের উদ্ধৃত ছড়াটিতে মূল ছড়াটির নাম-গুলি নাই। মূল ছড়াটি আমরা বহুদিন যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি এবং বেশ সুন্দর ভাবেই মনে আছে।

নলিনী বাবু যেখানে যেখানে "মহিম বাবু" লিখিয়াছেন সেখানে সেখানে "ললিত বাবু" হইবে এবং "ওস্‌মান ওরে ভাই" না হইয়া "ঈশান ওরে ভাই" হইবে।

ফরিদপুর সদরের অন্তর্গত মাণিকদহ ইতঃপূর্ব্বে বেশ একখানি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী ছিল। এই পল্লীতে জমিদার ৺মহিমচন্দ্র রায় ওরফে মহিম বাবু বাস করিতেন। ইনি সম্ভিকা বিবাদের ফলে তাঁহার জাতি

ললিত বাবু কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে হত হন। ৺ললিত বাবু ৺মহিম বাবুকে হত্যা করিয়া পুলিশের চক্ষু এড়াইয়া বহুদিন পলাতক ভাবে কলিকাতার নাকি কোন্ জমিদারভবনে ছদ্মবেশে বাস করিতেছিলেন—পরে সেখানে ধৃত হইয়া ফরিদপুরে আনীত হন। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া ছড়াটি রচিত হইয়াছিল—প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে।

মাণিকদহের এই জমিদার-বংশ বেশ খ্যাতনামা এবং কীর্ত্তিমান। এই ৺মহিম বাবুরই পোষ্যপুত্র ৺বিপিন বাবু একজন বদান্য ও উদারচেতা ব্রাহ্মনেতা ছিলেন। মহিম বাবুর স্ত্রী ৺ধনমণি চৌধুরাণী ফরিদপুর সহরবাসীদের পানীয়জলের সুবিধা করণার্থে সহরতলীতে "Dhanamani Chaudhurany Filtration" স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। ইতি—

রাজশাহী কলেজ।　　শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌষ সংক্রান্তি।

গত চৈত্রের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বরিশালের বাস্তুপূজার কয়েকটি ছড়া প্রকাশিত করিয়াছেন। কার্ত্তিক বাবু নলিয়াপূজার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন বিবরণ প্রকাশ করেন নাই। আমরা যতদূর জানি নলিয়াপূজা এবং বাস্তুপূজা অভিন্ন।* কার্ত্তিকবাবুর প্রকাশিত ছড়া কয়েকটি ভিন্ন আরও ছড়া পৌষ-সংক্রান্তিতে বরিশালের গ্রামে গ্রামে গীত হয়; একব্যক্তির পক্ষে তাহার সকল জানা সম্ভব নহে। নিম্নে কয়েকটি ছড়া প্রদত্ত হইল,—

আয়রে নলিয়া।
অস্তি (হস্তি) ঘোড়ায় চড়িয়া ॥
অস্তি ঘোড়ায় কি কাজ করে।
রাজার মায়না (বেতন) খাইয়া লড়ে ॥
রাজার বাড়ী হাজার বাঁসা ॥
তা দেখ্যা (দেখিয়া) ওড়ে হাঁসা ॥
হাঁসা ওড়ে দিয়া মোড়া।
পায়রা ওড়ে বত্রিশ জোড়া ॥
ও পায়রা তরাসিয়া (ত্রাসিত)।
লোয়ার (লোহার) বাইগন (বেগুন) তরাসিয়া ॥
লোয়ার বাইগন সরল পথে।
ভিখ দেও আন্যা (আনিয়া) লক্ষ্মীর আতে (হাতে) ॥

বাস্তুপূজা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কৃষকগণ খোলা (পূজার স্থান) পরিষ্কার, ছড়াঝাঁট দিবার এবং ফুল তুলিবার নিমিত্ত স্বর্গের হাড়িকে নিম্নলিখিত গান গাহিয়া আহ্বান করে।

স্বর্গের হাড়িয়া হাড়িয়া, হাড়িয়া রে।
মঞ্চে (মর্ত্ত্যে) লামিয়া (নামিয়া) খোলা চাঁচ্যা (চাঁচিয়া) দে।
বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা খোলা চাঁচা দে।
স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া রে।
মঞ্চে লামিয়া ছড়াঝাট দে।
বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা ছড়াঝাট দে।
স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া রে।
মঞ্চে লামিয়া ফুল তুল্যা (তুলিয়া) দে।
বাস্তুদেবী খাইবেন পূজা ফুল তুল্যা দে।

আর একটি ছড়ার কিয়দংশ এইরূপ—

সোনা বালো (ভাল) না রূপা বালো।
এই ঘর হানি (খানি) ছাইছে বালো।
ঐ ঘর হানি ছোনে বোনে।
লক্ষ্মী বইছেন (বসিয়াছেন) চাইর (চারি) কোণে।
আইছেন লক্ষ্মী দিহুন (দেন) বর।
ধানে চাউলে বরুক (ভরুক্) গর (ঘর)।

পৌষের শেষে বাখরগঞ্জের প্রতি গৃহ সোনার শস্যে যখন ভরিয়া উঠে, তখন বরিশালের কৃষকগণ প্রতি গৃহ হইতে ধান ভিক্ষা করিয়া বাস্তুপূজার আয়োজন করে। এই পূজা উপলক্ষে বাখরগঞ্জ জিলার বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছড়া গীত হয় সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন লোকের চেষ্টা ভিন্ন সকল ছড়া সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

দ্রষ্টব্য—পৌষ সংক্রান্তি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত লেখা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাই ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া প্রকাশিত হইবে, আর নূতন লেখা গৃহীত হইবে না।—প্রবাসী-সম্পাদক।

বৈজ্ঞানিক সীতানাথ।

গত ১২৪৮ সনের ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যশোহরের অন্তর্গত রায়গ্রাম নামক প্রাচীন পল্লীর ঘোষবংশে ৺গিরিধর ঘোষ মহাশয়ের ঔরসে এবং ৺আনন্দময়ীর গর্ভে সীতানাথ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকাল হইতেই সীতানাথের মস্তক অস্বাভাবিক বৃহদাকারের ছিল।

কিছুদিন গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া, সীতানাথ তাঁহার পিতৃদেবের চাকুরীস্থল নোয়াখালিতে গমন করেন এবং তত্রস্থ জিলাস্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়াতে পিতা গিরিধর তাঁহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেন। স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর সীতানাথ নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবুদের ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। সাধারণ ক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ লাভ নাই জানিয়া এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের স্পৃহা থাকাতে, তিনি ডাক্তারী পড়িবার জন্য মেডিকাল কলেজে যোগদান করেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ, বারংবার বাত রোগে আক্রান্ত হওয়াতে, তিনি কালেজ পরিত্যাগ করিয়া রায়গ্রামে প্রত্যাগমন করেন। রোগমুক্ত হইলে, তিনি কিছুদিন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন; কিন্তু কি কারণে তাহাও শীঘ্র ছাড়িয়া দেন।

সীতানাথ তৎপরে স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হন এবং গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে কিছুদিনের জন্য চাকুরী করেন। যখন তিনি কলিকাতাস্থ কণ্ট্রোলার আফিসে কার্য্য করিতেন, তখন একদিবস কার্য্যালয়ে যাইবার পথে চাকুরীরূপ দাসত্ব-বৃত্তির উপর ঘৃণা হওয়ায়, সেই-দিনই কার্য্যে ইস্তফা দেন।

চাকুরী ত্যাগ করিয়া সীতানাথ বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন। কিছুদিন 'হিন্দুপত্রিকা' নামক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত নূতন মাসিক পত্রিকার সম্পাদন করিতে থাকেন। এই পত্রিকায়

---

* বাস্তুপূজা ও নলিয়াপূজা মূলতঃ এক হইলেও, উহাদের উৎসব-প্রণালী এক নহে। নলিয়াপূজায় অগ্নিক্রীড়ার যে অনুষ্ঠান হয়, বাস্তুপূজায় তাহার সম্পূর্ণ অভাব। অথচ, ঐ অগ্নিক্রীড়া নলিয়াপূজার একতম প্রধান অঙ্গ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দু একটী বিষয়েও উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।　　শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

বিদ্যুৎ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠে প্রীত হইয়া শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ১৮৭২ সনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকত্ব প্রদান করেন।

ইহার একবৎসর পূর্ব্বে ১৮৭১ সালে সীতানাথ National Societyর দুইটী সভায় বিদ্যুৎ সম্বন্ধে দুইটী গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।* এই বক্তৃতার পরে, তিনি ১৮৭২ সনে পত্রিকা সম্পাদন কালে উহার ৩৫১, ৩৫২ ও ৩৫৩ সংখ্যায় বিদ্যুৎ ও চুম্বকের গুণাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ৩৬৫ সংখ্যায়ও অন্য একটা প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধগুলিতে সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ চারিখানি চিত্র দেওয়া হয় কিন্তু সাধারণ পাঠক এই প্রবন্ধগুলির সার অনুধাবন করিতে পারেন নাই।† সাধারণ পাঠক সীতানাথকে উৎসাহ না দিলেও শ্রীমন্মহর্ষি ও মনীষিগণ এইসকল প্রবন্ধ পাঠে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

সম্পাদকতা করিতে করিতে হঠাৎ তিনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এস্থলে বলা যাইতে পারে, যে সীতানাথ অর্থবান ছিলেন না কিন্তু পরের ক্লেশ মোচনের জন্য তিনি সদাসর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন এবং এই জন্যই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহর্ষি তাঁহাকে ৭০০০ টাকা দিয়া সাহায্য করেন, এ সংবাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি" নামক প্রবন্ধে (প্রবাসী; মাঘ, ১৩১৮) উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সময় সীতানাথ একটী নূতন ধরণের বস্ত্রবয়নের কল আবিষ্কার করেন। তৎকালে এই কল যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জ্জন করিয়াছিল; এমন কি বেথিয়ার মহারাণী সাহেবা অর্দ্ধ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই কল খরিদের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সীতানাথ বিক্রয়ও করিলেন না কিন্তু অর্থাভাবে উহা চালাইতেও পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে সীতানাথ গম চূর্ণ করিবার নূতন ধরণের একটী কল ও পরে কলের লাঙ্গল প্রস্তুত করেন। শেষোক্ত কলে, একটী মাত্র গো-সাহায্যে লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ হইত। একখানি কলের নৌকাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। লিখিবার এবং মুদ্রাযন্ত্রের জন্যও কয়েক প্রকার কালি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার বাল্য-বন্ধু শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় মহাশয়কে এই কালি প্রস্তুতের প্রক্রিয়া শিক্ষা দেন। আজকাল A. L. Royর কালির বাজারে বেশ নাম আছে এবং রায় মহাশয় কালি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছেন; কিন্তু প্রস্তুতকারক ইচ্ছা করিয়াই উহাকে লাভের ব্যবসায়ে পরিণত করেন নাই। সীতানাথের অকালমৃত্যুতে তাঁহার উদ্ভাবিত অন্যান্য যন্ত্রগুলির দ্বারা দেশ ও দেশবাসীর কোনই উপকার হয় নাই। সীতানাথের উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক মাদুলি বিক্রয় করিয়া ব্রজমোহন কর (Late B. M. Kerr) মহাশয়ও যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থলাভ করিয়াছিলেন।

নিজ গ্রামের উন্নতিকল্পে সীতানাথ প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সীতানাথই গ্রামে মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়, লাইব্রেরী এবং পোষ্টাফিস স্থাপিত করেন। স্কুলটীকে উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ অকালে দিব্যধামে গমন না করিলে ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন। সীতানাথেরই উদ্যোগে রায়গ্রামে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইত। মেলাস্থলে তিনি ভাটীখানা খুলিতে বা বেশ্যাদের আসিতে বা থাকিতে দিতেন না। এক সময়ে কয়েকজন বেশ্যা মেলাস্থলে থাকিবার জন্য তাঁহার নিকট দরবার ও এক সহস্র মুদ্রা প্রণামী বাবদ দিবার প্রার্থনা করে। সীতানাথ ঘৃণাভরে তাহাদের 'মোক্তারকে দূরীভূত করেন। বর্ত্তমানে অপর সকল স্থানের প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ সীতানাথের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিলে অনেক উপকার হইবে সন্দেহ নাই। যখন এই প্রদর্শনী খোলা হইত, তখন নদীর ঘাট হইতে প্রদর্শনী কার্য্যালয়ে সীতানাথ টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেন। খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ ঘাটে উপস্থিত হইলেই কার্য্যালয়ে সংবাদ যাইত এবং উপযুক্ত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত ভদ্র মহোদয়ের সম্মান করিতেন। সীতানাথ একাই এ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ ও তত্ত্বাবধান করিতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সীতানাথকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের কাল। সীতানাথ শ্রীমন্মহর্ষির সংসর্গে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমান হইয়াছিলেন। যখন গ্রামে প্রদর্শনী হইত, তখন সীতানাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। সীতানাথেরই যত্নে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় রায়গ্রামে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বক্তৃতাদিও প্রদান করিয়াছিলেন।

সীতানাথ ১২৯০ বঙ্গাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর সাত দিবস পূর্ব্বে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার আর অধিক সময় নাই। হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সীতানাথ Magnetic Healer নামক যে যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া দেশ মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, আমরা সেই যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পাঠকগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। সীতানাথ "Medical Magnetism" নামক যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে আমরা এইসকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

কোন শিশুকে উত্তরাস্য করিয়া শয়ন করাইলেই, সীতানাথের মাতা গৃহের বধূগণকে তিরস্কার করিতেন। সীতানাথ প্রথমতঃ এ প্রথা দেশাচার বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে আহ্নিকতত্ত্বে নিম্নোদ্ধৃত দুইটী শ্লোক দেখিতে পাইলেন—

* "In summer of the year 1871, being requested by some of my friends, I delivered two successive addresses at the National Society's meeting in the Calcutta Training Academy's Hall on the ideas I conceived about the electrical and magnetical importance of the said practices."—*Medical Magnetism by S. N. Ghosh.*

† "The Essays were illustrated by four engraved plates *viz.* (1) A temple with an iron *Trisul*; (2) A naked man with a long trifurcated iron bar in his right hand and a buffalo-horn bugle on his left shoulder, making in fact, the picture of a *Silary* or hailstone preventer; (3) An asthmatic patient with a *manduli*; (4) A man lying down on the surface of the northern sphere of the earth with his head placed southward. The singularity of the explanations combined with the oddness of the plates, excited, as I learnt, laughter and ridicule among the ordinary readers and applause and admiration mingled with doubts among the more intelligent class of readers."

প্রথম　　স্বগৃহঃ প্রাক্‌শিরাঃ শেতে
আয়ুষ্যে দক্ষিণা শিরাঃ,
প্রত্যেক শিরাঃ প্রবাসে তু,
ন কদাচিদুদক শিরাঃ।

অর্থাৎ স্বগৃহে পূর্ব্ব দিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইবে, কিন্তু দীর্ঘজীবন লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিবে। প্রবাসে পশ্চিমে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে পারা যায়। কিন্তু কদাপি উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইবে না।

দ্বিতীয়—　　প্রাক্ শিরাঃ শয়নে বিদ্যাৎ,
বলমায়ুশ্চ দক্ষিণে,
পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং,
হানিং মৃত্যুমথোত্তরে।

অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে মনুষ্য জ্ঞানী হয়, দক্ষিণে রাখিলে বলবান ও দীর্ঘজীবী হয়, পশ্চিমে রাখিলে দুশ্চিন্তা হয় এবং উত্তর দিকে রাখিলে মৃত্যু আনয়ন করে।

সীতানাথ পরে বিষ্ণুপুরাণেও উপর্য্যুক্ত মর্ম্মের একটী শ্লোক পাইয়াছিলেন, যথা—

প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং,
যাম্যায়ামথবা নৃপ,
সদৈব স্বপতঃ পুংসঃ,
বিপরীতন্তু রোগদং।

অর্থাৎ হে রাজন, পূর্ব্ব বা দক্ষিণে মস্তক ন্যস্ত করিয়া শয়নই প্রশস্ত। যে ব্যক্তি অপর দিকে মস্তক ন্যস্ত রাখিয়া শয়ন করে, সে ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

সীতানাথ অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, যে, শাস্ত্রকারগণ বিদ্যুৎ ও চুম্বকের গুণ অবগত থাকাতেই এইসকল তত্ত্ব অবগত ছিলেন। এবং এই কারণেই তাঁহারা মন্দিরাদির শীর্ষদেশে ত্রিশূল স্থাপনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, অনুরুদ্ধ হইয়া ১৮৯১ সনে তিনি দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তৎপরে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকতা কালে পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ কয়টী লেখেন। নানারূপ প্রক্রিয়া অন্তে তিনি স্থির করিলেন যে মনুষ্য-শরীরেও চুম্বকের গুণ আছে* এবং চুম্বক ও বিদ্যুতের ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্যশরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮০ সনে তিনি ৫৪নং মাছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে চিকিৎসাগার স্থাপন করেন এবং বিলাত হইতে ৬০০০ ফুট তাম্রনির্ম্মিত (insulated) 'অপরিচালক' তার আনয়ন করেন। এবং একটি Magnetic Healer যন্ত্র প্রস্তুত করেন। কাষ্ঠের ফ্রেমের উপর এই $\frac{1}{16}$ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট তার চারিবার জড়ান হয়। এই তারের দুই প্রান্ত ফ্রেমস্থ পিতলের ইস্ক্রুপের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়। ফ্রেমের অভ্যন্তরে পাটী (মাদুর) বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং ফ্রেমের বহির্দ্দেশে তারের উপর চট, মোমজাম ও চর্ম্মের আবরণী দেওয়া হয়। যন্ত্রটী ২৬ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং দুই পার্শ্বের পরিধি ১০ ও ২৪ ইঞ্চি। সীতানাথ পরে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ আকারের অন্য একটী যন্ত্রও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত যন্ত্রটী ৪ ফুট দীর্ঘ এবং উহার দুই পার্শ্বের পরিধি ১৪ ও ২১ ইঞ্চি ছিল। দশ সহস্র ফুট তার দিয়া ইহা জড়ান হইয়াছিল। যন্ত্রস্থ পিতলের ইস্ক্রুপের সহিত গ্যালভানিক ব্যাটারীর (Galvanic battery) তার দুটী যোগ করিয়া দিলে, যন্ত্রটি চুম্বকশক্তি লাভ করে। এই যন্ত্র মধ্যে রোগীকে শয়ন করান হইত। উদ্দেশ্য যে যন্ত্রমধ্যস্থ রোগীর শরীরে তাড়িত-প্রবাহ কার্য্য করিবে। সীতানাথ বলিয়াছেন যে এই প্রকারে রোগীকে চিকিৎসা করিলে সকল রোগ আরোগ্য করান যাইতে পারে।*

ব্যাটারীর 'ধনপ্রান্ত' ও 'ঋণপ্রান্ত' তাড়িত তার যন্ত্রে যে ভাবে যোগ করিয়া দেওয়া হইত তাহাতে রোগীর মস্তক দক্ষিণ দিকে থাকিলে রোগ উপশম হইত, কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম করিলেই রোগ বৃদ্ধি পাইত। ইহার কারণ অন্য কিছুরই নহে। পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ ধরিতে গেলে মনুষ্যের মস্তক উত্তরমেরু এবং হস্তপদাদি দক্ষিণমেরু বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে। এ জন্য ব্যাটারীর তার ধনপ্রান্তের দিকে ঋণপ্রান্ত ও ঋণপ্রান্তের দিকে ধনপ্রান্ত যোগ করিয়া দিলে স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যতিরেক হইত এবং সে জন্য রোগী আরও যাতনা ভোগ করিত।

সীতানাথের যে পুস্তকখানির কথা আমরা কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছি উহাতে তিনি প্রায় দুই শত রোগীর চিকিৎসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মাত্র দুই বৎসরের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে; এই তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সীতানাথ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে আরও অনেক লোকের উপকার করিতে পারিতেন। শ্রীমন্মহর্ষি সীতানাথকে চিনিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে অম্লানবদনে সাত হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

কবিজননী ও বীরজননী যশোহর তাঁহার সুসন্তানকে অকালে কালের ক্রোড়ে দিয়া যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহা নিবারণের আর কোনই উপায় নাই। আমাদের আবার এমনি দেশ যে আমরা "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি না।" শ্রীমন্মহর্ষির ন্যায় যদি আরও কেহ কেহ সীতানাথকে সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে কে বলিতে পারে, সীতানাথও বর্ত্তমান বঙ্গ-গৌরব বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় সভ্যজগৎকে চমৎকৃত না করিতে পারিতেন ?

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

সমুদ্র-প্রেম

১

দুলাও দুলাও মোরে।
বিশ্বজননি, আবার পরাণ ভরে',
দুলাও দুলাও মোরে।
লাখো বাহু দিয়ে কল্লোল তানে,
স্নেহবাণী ফিরে বাজাইয়ে কানে,
বহু দিবসের ছিন্ন মালিকা
বেঁধে দিয়ে নব ডোরে,
দুলাও দুলাও মোরে।

* It has been found by experiments that the human body is a magnetizable object, though far inferior to iron or steel.—*Medical Magnetism*, p. 17.

* "Every description of indisposition known or unknown, felt or sighted by the patient, is partially or entirely removed, as it is slight or serious,"

২

তোমার দোলার সুখ
ভুলিয়া গিয়াছি, তাই স্নেহময়ি,
প্রেম ভরা নহে বুক।
জীবন মরণ সীমা বাঁধা তাই,
যেই জ্বলে' উঠি, সেই নিভে যাই,
তুমি ধরে' তোল—দেখিবারে দাও
তোমার প্রসাদ-মুখ,
সসীম হইতে অসীম পুলকে
ভরে' দাও মোর বুক।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

কষ্টিপাথর

ভারতী (বৈশাখ)।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৌলিকতা—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী—

পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইতে ধর্মের তত্ত্ব যাঁহারা লাভ করেন তাঁহারাই ঋষি। ইঁহাদের ধর্ম লোকাচারে নহে, শাস্ত্রাদেশে নহে, গুরু-উপদেশে নহে, কিন্তু ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে। দেবেন্দ্রনাথের মৌলিকতা তাঁহার ঋষিত্বের অপর প্রমাণ। তাঁহার পিতামহীর মৃত্যুর পর শ্মশান-দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে বিষয়ের অসারতা ও অনিত্যতা জাগিয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে যে আনন্দবার্ত্তা তিনি পাইলেন তাহাতে তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন; যখন এই আনন্দময়তা হইতে ভ্রষ্ট হইতেন তখন যে বিষাদ অনুভব করিতেন তাহা এমনি তীব্র যে রৌদ্র কৃষ্ণবর্ণ দেখাইত। এই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় তাঁহার প্রথম মৌলিকতা। ব্যাকুল চিত্তে ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করিয়া তিনি কোনও গুরুর শরণাপন্ন হইলেন না, সাধননিষ্ঠা ও স্বাবলম্বন তাঁহার দ্বিতীয় মৌলিকতা। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার যুগে বঙ্গসমাজ যখন পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত সেই সময়েও তাঁহার দৃষ্টি স্বদেশ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই, তিনি ধর্ম্মসাধনের জন্য উপনিষদের ঋষিদিগের শরণাপন্ন হইলেন। ইহাই তাঁহার তৃতীয় মৌলিকতা। তিনি উপনিষদের শরণাপন্ন হইয়া জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিয়াও উপনিষদের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিলেন না; জ্ঞানানুগা ভক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেন। উপনিষদের সহিত হাফেজ ও বাবা নানক প্রভৃতি সকল দেশের সকল কালের মহাপুরুষদিগের উক্তিতে তাঁহার সমান পুলক ও ভাবাবেশ হইত। ইহা তাঁহার চতুর্থ মৌলিকতা। সমাজবিমুখতা আমাদের দেশের প্রাচীন জ্ঞানমার্গের একটি প্রধান লক্ষণ। তিনি জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী হইয়াও সমাজ ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া স্বীয় জীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় করিয়া পঞ্চম মৌলিকতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র ছিল না; ভাবুকতা ভক্তি নহে; ভাবুকতা ক্ষণিক, তাহাতে জোয়ার ভাঁটা আছে, কিন্তু ভক্তি অবিচলিত; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভক্তি জ্ঞানপ্রসূত। এই তাঁহার ষষ্ঠ মৌলিকতা। তাঁহার ভক্তি যে নীতি উৎপন্ন করিয়াছিল তাহা লৌকিক মতামতের অপেক্ষা রাখিত না; তাঁহার নীতি ছিল পারমার্থিক; ইহাই তাঁহার সপ্তম মৌলিকতা। ধর্ম্মসাধনে নিমগ্ন ব্যক্তিগণ জগতের সৌন্দর্য্য ও মানবজীবনের সুখদুঃখের প্রতি প্রায়ই উদাসীন হইয়া পড়েন; মহর্ষির ভক্তি জগৎকে ও মানবকে তাঁহার নিকট সুন্দর ও মনোরম করিয়া দিয়াছিল। ইহা তাঁহার অষ্টম মৌলিকতা। তাঁহার প্রধান মৌলিকতা ছিল এই যে ধর্ম্ম তাঁহার সাধনের সামগ্রী ছিল, প্রদর্শনের সামগ্রী নহে; এজন্য গেরুয়া বসন প্রভৃতি ধার্ম্মিকের ভেক তাঁহার ছিল না। লোকে কি চায় তাহা না দেখিয়া ঈশ্বর কি চান তিনি তাহাই দেখিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এইসকল কারণে আধুনিক যুগের ধর্ম্মসাধকদিগের আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন।

মহাকবি দণ্ডী—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল—

দণ্ডী বাল্মীকি ও ব্যাসের পরেই সম্মানিত। তিনি তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়; কাব্যাদর্শ ও দশকুমারচরিত নামক গ্রন্থদ্বয় এখনো প্রচলিত আছে; তাঁহার তৃতীয় ও অধুনা লুপ্ত গ্রন্থের নাম খুব সম্ভব ছন্দোবিচিতি। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মত যে তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক; কিন্তু তাঁহাদের প্রমাণ ভ্রান্ত বলিয়া দেখা যাইতেছে।

শারীর-স্বাস্থ্য-বিধান—শ্রীচুনীলাল বসু—

শরীর ধর্ম্মসাধনের আদি উপায়, অতএব স্বাস্থ্যবিধি পালন ধর্ম্মানুমত। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে প্রধান সুঅভ্যাস প্রাতরুত্থান। প্রত্যূষে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া শীতল জল পান করিয়া ভ্রমণ করিলে শরীর ও মন সুস্থ হয়। যাঁহারা প্রত্যূষে উঠেন তাঁহারা এক হিসাবে যাঁহারা বেলায় উঠেন তাঁহাদের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। শুধু যে প্রাতরুত্থানকারী ব্যক্তি অধিক দিন জীবিত থাকেন তাহাই নহে, প্রত্যহ দেড় ঘণ্টা অতিরিক্ত সময়ের সদ্ব্যবহার করিবার সুবিধা পান বলিয়া তিনি প্রতিমাসে দুই দিন, সম্বৎসরে ২৪ দিন এবং ৭০ বৎসর জীবনের সীমা ধরিলে ৫ বৎসর অধিক জীবন ভোগ করিতে সমর্থ হন। সুতরাং প্রাতরুত্থান অবহেলার বিষয় নহে।

গণনাপদ্ধতির মূল সংখ্যা—শ্রীশচন্দ্র সিংহ—

সংখ্যাগণনার জন্য নানাদেশে নানারূপ পদ্ধতি প্রচলিত। প্রত্যেক গণনাপদ্ধতিতে একটি সংখ্যা মূলরূপে গণ্য হয়। বহু জাতির মধ্যে দশমিক গণনাপদ্ধতি প্রচলিত। মানুষের গণনার সাধন হস্তাঙ্গুলি; দশাঙ্গুলি হইতেই দশমিক প্রথার প্রচলন হইয়া থাকিবে। অনেক জাতি আবার ১২ মূল সংখ্যা ধরিয়া গণনা করে; ২/১, ৩/১, ৪/১, ৬/১, ১২/১ প্রভৃতি প্রধান ভগ্নাংশগুলি ১২ দ্বারা বিভাজ্য বলিয়া এই দ্বাদশক গণনা পদ্ধতি অনেকে সুবিধাজনক মনে করে; য়ুরোপে ব্যবসায়ক্ষেত্রে ডজন, গ্রোস প্রভৃতি গণনায় এই দ্বাদশক গণনারই প্রাধান্য দেখা যায়। প্রাচীন রোমক জাতি হইতে আধুনিক টিউটন জাতি পর্য্যন্ত সকলেই এই দ্বাদশক গণনার পক্ষপাতী। আফোস জাতি ১২ পর্য্যন্ত গণিতে পারে, তদূর্দ্ধ গণনা ১২ এক, ১২ দুই, ১২ তিন ইত্যাদি ভাবে ব্যক্ত করে। মিশর দেশে জরিপ কার্য্যে ২ মূলসংখ্যা রূপে ব্যবহৃত হইত। ইংরেজি ভাষায় Couple, brace, pair ও আমাদের ভাষায় জোড়া জুড়ি প্রভৃতি শব্দ ইহার অনুকূল। চীনদেশেও এই দ্বিমূলক গণনার পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার জিঙ্গু (Xingu) প্রদেশে বাকারাইবি জাতি মাত্র ছয় পর্য্যন্ত গণিতে পারে; তাহারা ৪—২=২; ৫—২=২+১; ৬—২=২+২ এই ভাবে ব্যক্ত করে। অষ্ট্রেলিয়ার অনেক অসভ্য জাতিও এইরূপ গণনা করে। কলোরেডোর কুচাউস জাতির মধ্যে ত্রিমূলক গণনার প্রচলন; ইহারা

৬=২×৩, ৯=৩×৩ এই ভাবে ব্যক্ত করে; ইহাদের মধ্যে চতুর্মূলক গণনারও প্রচলন দেখা যায়, ৮ প্রকাশ করিতে হইলে ২×৪ দ্বারা প্রকাশ করে। দক্ষিণ আমেরিকার লুলোট্রিটন্‌বে, এণ্ডি পলিনেশীয় জাতি ৪ পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে; তদূর্দ্ধ সংখ্যা ৪+১, ৪+২ ইত্যাদি রূপে ব্যক্ত করে। এণ্ডি-পলিনেশীয় জাতি ৮ সংখ্যাদ্যোতক একটি শব্দ ব্যবহার করে যাহার অর্থ ২×৪। ওয়ালাসীয়ান জাতি ১৮কে দিউ-ম (২×৯) বলিয়া প্রকাশ করে। ব্রেটানেরা ১৮কে ট্রায়নসে (৩×৬) বলিয়া প্রকাশ করে। পশ্চিম আফ্রিকার বোলান জাতির মধ্যে ৬ মূল সংখ্যা। নিউজিলাণ্ডের মাওরি জাতির মধ্যে একাদশক গণনাপদ্ধতির প্রচলন। ১১ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংখ্যার জন্ম পৃথক পৃথক শব্দ আছে; তদূর্দ্ধ কোন সংখ্যা ১১ এক, ১১ দুই—ইত্যাদিরূপে ব্যক্ত করে। বাবিলোনীয়দিগের মধ্যে ৬০ মূল সংখ্যা; বোধ হয় এই দৃষ্টান্তের অনুসরণে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই গণনাপদ্ধতি প্রচলিত। সাধারণতঃ দেখা যায়, যেসকল জাতির গণনার সংখ্যা পাঁচের বেশি তাহারা গণনাপদ্ধতিতে প্রায়ই ৫, ১০, অথবা ২০ মূল সংখ্যা রূপে ব্যবহার করে। অনেক অসভ্য জাতি ৫ সংখ্যা "একহাত", "হাতের শেষ" বা "হাত" বলিয়া প্রকাশ করে; সেইরূপ ৬, ৭, ৮, যথাক্রমে "হাত এক", "হাত দুই", "হাত তিন" বলিয়া ব্যক্ত করে; ১০ "দুইহাত"; দশ গণনা করিয়া হাতের অঙ্গুলি শেষ হইয়া গেলে পায়ের অঙ্গুলির বা অপরের হস্তাঙ্গুলির শরণাপন্ন হয়। ১১=পায়ের এক; ২০= এক মানুষ। এই ভাবে অনেক জাতি ১০০ পর্য্যন্ত গণনা করিয়া থাকে; ৪০, ৬০, ৮০, ১০০ যথাক্রমে ২ মানুষ, ৩ মানুষ, ৪ মানুষ, ৫ মানুষ। পঞ্চমূলক গণনারীতি সাইরিয়াবাসী, কামস্কাটকাবাসী, আলিউট জাতি, নিউ হেব্রিডিসবাসী, আফ্রিকার ওলোফ জাতি, কাম্বুরি, টেমনি, আইফিক, কিইয়াউ, কি-নিয়াসা প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত। দিঙ্কু, ফুলবি ও পিগমি জাতির মধ্যে পঞ্চক ও দশক উভয় রীতিই প্রচলিত। অষ্ট্রেলেসীয় ও পলিনেসীয় দ্বীপবাসীদের মধ্যে পঞ্চক-পদ্ধতির প্রচলন। এস্কিমো ও আমেরিকার অনেক জাতির মধ্যেও ৫ মূল সংখ্যা। অনেক জাতি সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে ৫ ছাড়িয়া ১০ মূল সংখ্যা করিয়াছে তাহার পরিচয় তাহাদের ভাষায় পাওয়া যায়। হোমরের সময় গ্রীকদিগের মধ্যে পঞ্চকগণনার পরিচয় পাওয়া যায়; সেইরূপ রোমকদিগের মধ্যেও। বিশুদ্ধ পঞ্চকপদ্ধতি কোনো জাতি অবলম্বন করে নাই, পঞ্চকের সহিত দশক বা বিংশক রীতি মিশ্রিত রাখিয়াছে। আমেরিকা ও আফ্রিকার অনেকজাতির মধ্যে বিংশক-গণনাপদ্ধতি দেখা যায়, তবে ইহা পঞ্চক ও দশক প্রথার সহিত মিশ্রিত। আজটেক, বোগোটের মুইস্কাস ও উত্তর স্পেনের বাস্ক জাতি দশক প্রথার সহিত বিংশকপদ্ধতি ব্যবহার করে। উত্তর সাইবেরিয়ার আইনাস ও অনেক ককেসীয় জাতির গণনা বিংশকপদ্ধতিতে। ফিনিসীয়া ও কার্থেজবাসীর সংসর্গে পশ্চিম য়ুরোপের অনেক কেল্টিক জাতির মধ্যে বিংশকপদ্ধতি চলিত; ব্রেটনেরা Unnek ha tringent অর্থাৎ এগার এবং তিনকুড়ি বলিয়া ৭১ প্রকাশ করে; ফরাসীরা quatre vignt বা ৪ কুড়ি বলিয়া ৮০ প্রকাশ করে; ওয়েলশ, গেলিক মান্‌স্ক প্রভৃতি কেল্টিক জাতির ভাষাতে এই বিংশক গণনার নিদর্শন আছে। আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকেরা এককুড়ি দুকুড়ি, দুকুড়ি সাত বলিয়া থাকে; অনেক সামগ্রী কুড়ি ধরণে বিক্রয় হয়, অনেক সামগ্রী ৫ কুড়ি অর্থাৎ শ ধরণে বিক্রয় হয়, অনেক সময় এই শ ১০০ নয়, ১২০। ইংলণ্ডেও এক কালে Long hundred বা Great hundred বলিলে ১২০ বুঝাইত। ইংরেজি Score শব্দটি বিংশতি-মূলক সভ্যদেশে দশমিক গণনার প্রচলন। অনেক অসভ্য দেশেও দশমিক গণনা দেখা যায়। শূন্য-পৃষ্ঠ দশমিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা এই ভারতবর্ষ। অনেক জাতির মধ্যে এরূপ গণনাপদ্ধতি দেখা যায় যাহাতে কোনো মূলসংখ্যা নাই; সংখ্যাগুলির পরস্পরের মধ্যে সেজন্য কোন সম্পর্কও নাই, প্রত্যেক সংখ্যাই স্বতন্ত্র। এরূপ গণনারীতি বিরল।

লেখক এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের মধ্যে একটি বিষয় ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা পূরণ করিয়া দিতেছি। অনেক দেশে টাকা পয়সা গণনা করে দুই দুই বা চার চার করিয়া; অনেক য়ুরোপীয় ও মাদ্রাজী তিন তিন করিয়া গণনা করে। অনেক জিনিষ গণনা হয় গণ্ডা হিসাবে—সে গণ্ডা কখনো চারটিতে কখনো বা পাঁচটিতে।

নীল ভূধর—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়—

পুরী শহরের মধ্যস্থলে যে উচ্চ ভূমির উপর জগন্নাথের মহামন্দির প্রতিষ্ঠিত তাহার উচ্চতা ২০ ফুট হইলেও তাহার নাম নীল ভূধর। রাজা অনঙ্গদেব ১১১৯ শকে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন; (কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়)। ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়; ১৪ বৎসর সময় ও ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। মন্দির-বেষ্টন প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ৬৫২ ফুট, প্রস্থে ৬৩০ ফুট, ও উচ্চে ২০ ফুট। প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে ছোট বড় ১২০টি মন্দির আছে। চারিদিকে চারিটি তোরণ। উত্তর তোরণে হস্তীপৃষ্ঠে মাহুত গঠিত আছে, আকার ৫ ফুট, ইহার নাম হস্তিদ্বার। দক্ষিণ তোরণে ঘোড়া আছে, তাহার নাম অশ্বদ্বার। পূর্ব্ব তোরণে সিংহ আছে, তাহার নাম সিংহদ্বার, এই তোরণটি কারুকার্য্যময় সুন্দর। পশ্চিম তোরণে কোনো মূর্ত্তি নাই, তাহার নাম খাঞ্জাদ্বার। মন্দিরের বেষ্টনী দুটি। ভোগমণ্ডপ পর্য্যন্ত ধরিয়া সমস্ত মন্দিরের অখণ্ড বিস্তার প্রায় ৩০০ ফুট। মন্দিরে তিনটি প্রকাণ্ড কুলঙ্গী আছে, তাহার পশ্চিমেরটিতে নৃসিংহ, উত্তরে বামন ও দক্ষিণে বরাহ মূর্ত্তি আছে। মন্দিরগাত্রে অনেক মূর্ত্তি খোদিত, তাহার অধিকাংশই অশ্লীল। জগমোহনের দিকে দরজার সম্মুখেই মার্ব্বেল গঠিত রত্নবেদীর উপর ত্রিমূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের উচ্চতা ২০০ ফুট। মূলমন্দিরের সন্নিহিত নাটমন্দির, ভোগমণ্ডপ প্রভৃতি। কনারক মন্দিরের নবগ্রহ মূর্ত্তি মহারাষ্ট্রগণ আনিয়া এখানে সংলগ্ন করিয়াছে। রাজা প্রতাপরুদ্রের সময় (১৫০৪—৩২) মন্দির প্রথম মেরামত হয়। ১৬৪৭ সালে নৃসিংহদেব পুনরায় মেরামত করেন। মুসলমান অত্যাচারের পর কৃষ্ণদেব (১৭১৬-১৮) দেবালয় সংস্কার করেন। ৫০ বৎসর পরে বীরকেশর দেবের পত্নী মেরামত করেন। প্রসাধনের প্রলেপে মন্দিরের আদিম শিল্পসৌন্দর্য্য ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। অরুণ স্তম্ভটিও কনারক হইতে আনা; ইহার মূলের পরিধি ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি; সমগ্র স্তম্ভটি ৩২ ফুট ৮ ইঞ্চি; স্তম্ভের মাথায় বানরের মূর্ত্তি; স্তম্ভটি সাদাসিধা হইলেও সুকুমার শ্রীসম্পন্ন। নরেন্দ্রতলাও বা চন্দনসরোবর মন্ত্রী নরেন্দ্র মহাপাত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, চারিদিকে বাঁধাঘাট, মধ্যস্থলে কৃত্রিম ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে; পুরীর অপর দুটি বিখ্যাত বৃহৎ পুষ্করিণীর নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন ও মার্কণ্ডেয় সরোবর; এ দুটিরও চারিদিকে বাঁধা ঘাট। পুরীর নিকটে আঠারনালা নামক সেতু, জগন্নাথের গ্রীষ্মাবাস গুণ্ডাবাড়ী বা গুণ্ডিচাগড়, বেঙ্কটাচারীর মঠ, শঙ্করাচার্য্যের মঠ, প্রভৃতি দর্শনীয়। জগন্নাথদেবের রথের মাপ প্রস্থে ৩৫ ফুট ও উচ্চতায় ৪৮ ফুট, ১৬ খানি চাকা, ব্যাস ৭ ফুট; সুভদ্রা ও বলরামের রথ তদপেক্ষা ছোট। সাগর এখানকার জাগ্রৎ ঠাকুর, তাহার তীরে বসিলে জগন্নাথকে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

কোহিনূর (ফাল্গুন)

বাঙ্গালী জীবনে কোল ও মুসলমান প্রভাব—

শ্রীমোহম্মদ শহীদুল্লাহ—

বঙ্গ নামটি আমরা বাংলার আদিম অধিবাসীর নিকট হইতে পাইয়াছি। এখনও ময়মনসিংহের প্রান্তে বং নামক অসভ্য জাতি বাস করিতেছে; বোধ হয় এক সময়ে তাহারা সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তৃত ছিল, পরে বিতাড়িত হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছে।

বাঙ্গালার পশ্চিম ও পশ্চিম-উত্তর কোণে কোল ও সাওতালগণের বাস; তাহাদের নিকট হইতেও অনেক দ্রব্য বাঙ্গালী পাইয়াছে। কদলী (মুণ্ডারি, কাদ্‌লা), নারিকেল (মু—নরিয়র) ও ময়ূর (মু—মর) সংস্কৃতের আমলেই ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের 'পুসি' কোলদিগেরই। নৌকার প্রচলন মিলিত আর্য্যগণের সময় হইতেই আছে। সংস্কৃত—নৌ, আস্তেস্তিক- নাজি, গ্রীক—নৌস (naus), লাটিন—নাভিস (navis), প্রাচীন উচ্চজর্ম্মান—নাকো (nacho), কেণ্টিক- নৌ (nau)। কিন্তু 'ডোঙ্গা'র (মু—ডোঙ্গা) ব্যবহার আমরা কোলদিগের নিকট শিখিয়াছি। 'লড়াই' শব্দ কোলদিগের। প্রাচীনকালে বর্ম্ম শরীরে বেষ্টিত হইত (বৃ-ধাতু আবরণ অর্থে) কিন্তু হাতে করিয়া লড়িবার 'ঢাল' আমরা কোলদিগের নিকট হইতে লইয়াছি। আর্য্যদিগের দুর্গ দুর্গম স্থানে নির্ম্মিত হইত। কিন্তু 'গড়' নির্ম্মাণ প্রণালী কোলদিগের নিকট হইতে শেখা। হিন্দুর প্রাচীন গৃহস্থালির জিনিস উখ্‌লি (সং—উদুখল); এখনও তাহাই বাঙ্গালার বাহিরে প্রচলিত। বাঙ্গালী কিন্তু উখ্‌লি ছাড়িয়া অসভ্যদিগের নিকট হইতে 'ঢেঁকি' (মুং—ডিংকি) গ্রহণ করিয়াছে।

মুসলমানের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ দান 'হিন্দু' এই নাম। আব্রাহ্মণ চণ্ডাল আর্য্য-অনার্য্য—ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মাশ্রিত সকলের 'হিন্দু' এই এক আখ্যা প্রদান করিয়া মুসলমান হিন্দুর জাতীয়তা গঠনে সাহায্য করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন জীবনযাত্রার অনেক দ্রব্যের নাম ও ব্যবহার বাঙালী মুসলমানের নিকট শিখিয়াছে তাহার প্রমাণের অসদ্ভাব নাই।

বিজ্ঞান (মার্চ)

নক্ষত্রের সংখ্যা গণনা—

খালি চোখে একেবারে আকাশে যতগুলি নক্ষত্র দেখা যায় তাহা ৩ হাজারের বেশী নহে। দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের ধারণা ছিল যে নক্ষত্রের সংখ্যা ঐ রকমই; ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে টাইকো বাহির নক্ষত্রচিত্রে ১০০৫টি নক্ষত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গ্যালিলিও যে দূরবীক্ষণ আবিষ্কার করেন তাহা আধুনিক অপেরা গ্লাস বা বাইনকুলার সদৃশ; তাহা দ্বারাই এক লক্ষ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয়। পরে যন্ত্রের উন্নতি হওয়াতে এখন নক্ষত্র অগণ্য হইয়াছে বলিলেও চলে। আমেরিকার লিক-দূরবীক্ষণ দ্বারা ১০ কোটি নক্ষত্র দেখা যায়; ইয়ার্কিস, লর্ড রোজ, ও মেলবোর্ন দূরবীক্ষণে আরো অধিক সংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়; সেগুলি আকারে সূর্য্য সদৃশ বা তাহাদের তুলনায় সূর্য্যও নগণ্য। নক্ষত্রের অবস্থিতির স্থান নিরূপণ জন্য জ্যোতির্ব্বিদেরা মধ্যে মধ্যে চিত্র অঙ্কিত করেন। হিপারকাস কৃত (১৫০ পূঃ খৃঃ) চিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। তাঁহার পরে আলমাগেষ্ট, টলেমি, পারস্য পণ্ডিত অলসুফী, তাইমুর লঙ্গের পৌত্র উলাঘ বেগ, প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে নক্ষত্রের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। তৎপরে বিখ্যাত জ্যোতিষী হ্যালি পরিশিষ্টরূপে চিত্র সংস্কার করেন। এক্ষণে নক্ষত্র-মানচিত্রের অভাব নাই। এক্ষণে ফটোগ্রাফীর সাহায্যে নক্ষত্র ধূমকেতু প্রভৃতিরও চিত্র সংগৃহীত হইতেছে। এইসমস্ত বিভিন্ন সময়ের মানচিত্র তুলনা করিয়া নক্ষত্রের গতি ও স্থান পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ধরা পড়িতেছে। সমস্ত নক্ষত্রই গতিমান; কিন্তু খালি চোখে হাজার বৎসরেও সে গতির কোনো চিহ্ন ধরা পড়ে না। খুব সম্ভব এমন কোনো সূর্য্য কেন্দ্র হইয়া আছে যাহার চারিদিকে আমাদের মতন শত শত সৌরজগৎ সপরিবার গ্রহ উপগ্রহ লইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

শিবের গাজন—শ্রীহরিদাস পালিত—

গাজন বৌদ্ধ উৎসবের অঙ্গ। ধর্ম্মপূজকদের উৎসবের গর্জ্জন শব্দের অপভ্রংশ। বৌদ্ধ উৎসব বলিয়া তাহার মন্ত্র সংস্কৃত না হইয়া বাংলা ভাষায় রচিত। সেন রাজগণের সময় ইহা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সর্ব্বত্র ধর্ম্মপণ্ডিত রামাইয়ের শূন্যপুরাণের পূজাপদ্ধতি পালিত হয়। গাজন ও গম্ভীরা সমার্থক; গম্ভীরা শব্দ এখন মালদহ জেলায় প্রচলিত আছে; গম্ভীরা মানে দেবগৃহ বা চণ্ডীমণ্ডপ, তাহার প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থে যথেষ্ট আছে। গম্ভীরা বৌদ্ধদের ভজনগৃহ ছিল; সেখানে আদ্যাদেবী নামক বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবীর পূজা হইত; ইনি ক্রমশ পৌরাণিক দুর্গা ও পার্ব্বতীতে পরিণত হইয়াছেন; এবং ক্ষীণ বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশ শৈবধর্ম্মে আত্মবিলোপ করিয়াছে; ধর্ম্মপূজকগণ হিন্দুদিগের কৌশলে এক্ষণে ডোম ও অস্পৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধ প্রভাবে এখনো সকল জাতিই স্ত্রীপুরুষ অভেদে গাজনে সন্ন্যাসী হইতে পারে।

ব্যবসা ও ব্যাণিজ্য (বৈশাখ)।

আমরা এই নবপ্রকাশিত মাসিকপত্রখানিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতেছি "স্বাগত"। এই সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে—(১) সম্পাদকের নিবেদন, (২) আলোচ্য বিষয়, (৩) মূলধন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (৪) সাবান ও সাবান প্রস্তুতপ্রণালী—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, (৫) জাপানের কৃষি, ও শিল্প- শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, (৬) ব্যবসায়ে জুয়াচুরী (ট্যাবলয়েড্‌ কুইনাইন, স্যাণ্টোনাইন, কলিকাতার দোকানের তৈরী চা)—তীক্ষ্ণদর্শী, (৭) ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রণ ও ফটোগ্রাফ তোলা শিক্ষা (সচিত্র)—শ্রীসুকুমার মিত্র, (৮) কয়েকটি পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ, (৯) আমার কর্ম্মভূমি (হাসির কবিতা)—শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক; এ কবিতাটি পূর্ব্বে ভারতীতে একবার প্রকাশিত হইয়া গেছে; (১০) বৈঠকী (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাসির গল্প)—শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (১১) গৃহহারা (গল্প) (১২) পরলোকগত জামশেদজী টাটার জীবনী (সচিত্র)—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (বৈশাখ)।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র—

ভারতবর্ষের হিন্দু ইতিহাস ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য বা সম্পূর্ণতা মানিয়া চলে নাই। মুসলমান হইতেই ধারাবাহিক ইতিহাসের আমদানি। একই সময়ের ঘটনা একাধিক ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করাতে সত্যাসত্য বিচারের সুবিধা হইয়াছে। স্যর হেনরী ইলিয়ট ভারতবর্ষীয় মুসলমান ইতিহাসগুলির অবিকল প্রতিলিপি করিবার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের নিকট করেন; বাহুল্য ভয়ে শুধু তালিকা, গ্রন্থকারের পরিচয় ও গ্রন্থের বিষয় নির্দ্দেশ, রচনার আদর্শ ও টীকা টিপ্পনী সংগৃহীত হয়। এই তালিকায় ১৫৯ জন গ্রন্থকারের মধ্যে ১৩৮ জন মুসলমান, ২০ জন হিন্দু, ১ জন ইংরাজ। সাধারণ ইতিহাস

৩৮, বিশেষ স্থান বা রাজত্বের ইতিহাস ৭৮, ঐতিহাসিক উপন্যাস ১, ভূগোল ও ভ্রমণকাহিনী ১২, অনুবাদ ২, জীবনী ২০, আত্মচরিত ৪, বিবিধ ৪, মোট ১৫৯ খানি। ইহার পরেও অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও অনুবাদিত হইয়াছে। অসংখ্য মুসলমান ঐতিহাসিকের মধ্যে দ্বাদশ জন বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য—(১) তারিখ-উল্-হিন্দ্ নামক গ্রন্থপ্রণেতা আল্‌বিরুণী। (২) তবকাৎ-ই-নাসিরী প্রণেতা মীন্‌হাজ্-উস্-সিরাজ। (৩) তারিখ-ই-আলাই প্রণেতা আমীর খসরু। (৪) তবারিখ-ই-রসিদীর গ্রন্থকার মীর্জা হাইদর। (৫) তবকাৎ-ই-আকবরী প্রণেতা নিজামউদ্দীন বক্সী। (৬) মুন্তখাব্-উৎ-তারিখ প্রণেতা আবদুলকাদির বদাউনী। (৭) আকবরনামার গ্রন্থকার আবুলফজল। (৮) ওয়াকিয়াৎ প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিত সেখ ফৈজী। (৯) তারিখ-ই-ফেরিস্তার গ্রন্থকার মহম্মদ কাসেম হিন্দ্ সাহ ফেরিস্তা। (১০) সাহ-জাহান-নামার গ্রন্থকার ইনায়েৎ খাঁ। (১১) মুন্তাখাবুল্-লুবাব প্রণেতা মহম্মদহাসিম কাফি খাঁ। (১২) সৈয়র-উল্-মুতাক্ষরীণ প্রণেতা গোলাম হোসেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবনীর সহিত তৎসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

গৌড়কবি মদন-বালসরস্বতী—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—

মালবের পরমার-রাজগণের রাজধানী ধারনগরে কমল-মৌলা নামে একটি মসজিদে একখানি প্রস্তরফলকের অপরপৃষ্ঠে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহা গৌড়কবি মদন-বিরচিত পারিজাত-মঞ্জরী নামক নাটিকার অর্দ্ধাংশ প্রথম দুই অঙ্ক; অবশিষ্টাংশ এখনো অনাবিষ্কৃত আছে। এই নাটিকার অপর নাম বিজয়শ্রী। এই বাঙালী কবি কেবল রাজকবি ছিলেন না, রাজগুরুও ছিলেন। ইনি অর্জ্জুনদেব নামক রাজার সভাকবি ও গুরু। অর্জ্জুন-দেব সুভটবর্ম্মার পুত্র; ১২১১, ১২১৩ ও ১২১৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত ইঁহার তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে—সেগুলি রাজগুরু-মদন-বিরচিত বলিয়া উল্লেখ আছে। অর্জ্জুনবর্ম্মা অমরুশতকের রসিক-সঞ্জীবনী নাম্নী টীকা রচনা করিয়া তাহাতে মদন-বালসরস্বতীর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখা যায়। পারিজাতমঞ্জরী নাটিকা রূপকার সিংহাকের পুত্র রামদেব নামক শিল্পীর যত্নে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ হইবার কথা দ্বিতীয়াঙ্কের শেষ শ্লোকে আছে। শিল্পী বকারের রূপভেদ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকেও গৌড়ীয় বলিয়া মনে হয়।

—মণিভদ্র।

বিফলতা

আসিতেছে সন্ধ্যা চয়ে ধূসর আকাশ,
কোথাও ঈষৎ শ্রান্ত আরক্ত আভাস,
তরুলতা বনশ্রেণী নিস্পন্দ নীরব,
সাঙ্গ দিবসের কাজ, সমাপ্ত উৎসব!
উড়ে চলিয়াছে পাখী দুএকটি করে
অতি ধীরে, ভেঙে যেন পড়ে ক্লান্তি ভরে
পক্ষ দুটি তার। ঘিরে আসে অন্ধকার
ছায়াচ্ছন্ন ত্রিভুবন, মৌন চারিধার
প্রশান্ত বৈরাগ্যে, যেন অসীম আকাশ
ব্যাপ্ত করি আছে তব বিষণ্ণ উদাস
গম্ভীর করুণ দৃষ্টি, হায় প্রিয়তম,
হে আমার ব্যথিত বল্লভ, স্নেহ মম
নিয়তপ্রবাহ, তবু সমুদ্রের প্রায়
পিপাসার বারি দিতে নারিল তোমায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্গদেশে শিশুপ্রতিপালন—

ভারতবাসী প্রবীণ চিকিৎসক কর্ত্তৃক লিখিত। ব্যাপ্টিষ্ট মিশন যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশক ম্যাকেঞ্জি লায়াল কোম্পানি। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য মেলিন্স ফুডের উপকারিতা ও গুণপ্রচার; এবং সেই প্রসঙ্গে সন্তান-পালন, জননীর কর্ত্তব্য, শিশুর খাদ্য ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্বন্ধে সতর্কতা, টীকা দেওয়া, সহজ চিকিৎসা, প্রভৃতি বহু আবশ্যকীয় বিষয়ে মোটামুটি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভাষায় সাহেবী বংলার ছাপ সুস্পষ্ট—যেমন, বোতলপায়ী শিশু, মাতৃস্তন্যের স্থানীয়স্বরূপ প্রভৃতি; তথাপি ভাষা সহজবোধ্য। ছাপা কাগজ পরিষ্কার; বিশেষতঃ বাঁধাইটি। মুল্যের কোন নির্দ্দেশ নাই।

জৈন ধর্ম্ম—

প্রকাশক কুমার শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈন, মন্ত্রী—বঙ্গীয় সার্ব্বধর্ম্ম-পরিষৎ, কাশী। ইহা লোকমান্য পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের মহারাষ্ট্র বক্তৃতার অনুবাদ। বিনামুল্যে বিতরিত। জৈনধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মই এবং কোনো কোনো বিষয়ে (যেমন জীববলি ও বর্ণাধিকার তারতম্য প্রভৃতি বিষয়ে) ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহাই বক্তৃতার প্রতিপাদ্য। অনুবাদের ভাষা একটুখানি ইংরেজী ছাঁচে ঢালা।

নবাব হরেকৃষ্ণ—

শ্রীসারদাচরণ ধর প্রণীত। কলিকাতা ১৯।২০ বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ পত্রিকা প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। প্রায় সহস্র বৎসর পুরাতন শ্রীহট্ট শহর এককালে বিশেষ সমৃদ্ধ বাংলার ১৯ সুবার এক সুবা ছিল; এখানে বহু বাণিজ্যদ্রব্য ও সমুদ্রগামী নৌকা উৎপন্ন ও নির্ম্মিত হইত। এখানকার মোগল শাসনকর্ত্তারা ফৌজদার আমিল বা নবাব নামে অভিহিত হইতেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কায়স্থকুলপ্রদীপ মহাত্মা সমসের-উল-মুলক হরেকৃষ্ণ দাস ঔরঙ্গজেবের প্রপৌত্র বাদশাহ মহম্মদ শাহের নিকট হইতে শ্রীহট্টের নবাবীর সনদ প্রাপ্ত হন; আড়াই বৎসর পরে তিনি গুপ্ত শত্রুর দ্বারা নিহত হন; কারণ ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল শ্রীহট্টে হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপন করা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সেই স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমিকের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে এই দস্তিদার বংশের এক বংশতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বদেশী-প্রচার—

শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত। মূল্য দুই পয়সা মাত্র। গ্রন্থকারের নিকট কালনা, জেলা বর্দ্ধমান ঠিকানায় পাওয়া যায়। এই পুস্তিকায় স্বদেশী সামগ্রী ব্যবহার করিতে সকলেরই যে কেন অটলপ্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত, দেশী জিনিষ বিদেশী জিনিষ অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য হইলেও দেশী জিনিষ কিনিয়া দেশের পয়সা দেশে রাখা উচিত, কোন কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে স্বদেশী দ্রব্যের অভাব মোচন হইতে পারে এবং বিদেশী দ্রব্যের আমদানি কম হইতে পারে তাহাই সহজভাবে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভাব ও গাথা—

শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা পুস্তক; ইহাতে গণেশাদি পঞ্চদেবতা ও গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার মধ্যে অনেকের স্তব এবং খোকা ও ফুল, ঊষারাণী সম্বন্ধীয় ছড়া ও পদ্য আছে।

বনতুলসী—

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বিরচিত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি কোম্পানী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা। ইহা আধ্যাত্মিক ভাব ও তত্ত্বমূলক কবিতাকণার সমষ্টি; তাই নামটি বেশ উপযুক্ত ও কবিত্বময় হইয়াছে। ছাপা কাগজ পরিষ্কার। তত্ত্ব ও উপদেশ হিসাবে কবিতাগুলি ভালই হইয়াছে; তবে সর্ব্বত্র কবিত্ব স্ফূর্ত্তি পায় নাই; স্থানে স্থানে ছন্দ (যদিও আগাগোড়া পয়ার) ও রচনা আড়ষ্ট হইয়াছে। মোটের উপর বইখানি সুখপাঠ্য।

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়—

শ্রীনলিনীরঞ্জন মিত্র কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাগবত পুরাণ হইতে পদ্যে স্বাধীন ভাবে অনুবাদিত। প্রাপ্তিস্থান ৩৪ নং নিকাশীপাড়া লেন কলিকাতা, গ্রন্থকারের নিকট। মূল্য চার আনা। কেবল কথার মালায় ছন্দ ও মিলের গাঁথনিতে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, কদাচিৎ এক এক স্থানে একটু কবিত্বের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে না আছে মূলের গম্ভীর-রস-লালিত্য; আর না আছে স্বাধীন কবিত্বের স্ফূর্ত্তি।

নিবেদন—

শ্রীনলিনীরঞ্জন মিত্র প্রণীত। মূল্য চার আনা। এখানিও পদ্য পুস্তক; ৩৪টি সনেটের সমষ্টি; সনেটগুলি হয় তত্ত্বমূলক, নয় ভগবদ্-ভক্তি বিষয়ক; সকলগুলিই কবিত্ব বর্জ্জিত।

সিদ্ধার্থ—

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার প্রণীত। ২৪নং মিডিল রোড ইটালী, কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। এখানি কাব্য নাটিকা। সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের আহত হংস সম্বন্ধীয় কাহিনী ও সিদ্ধার্থের জরামৃত্যু দর্শনে মনোবিকার সম্বন্ধীয় কাহিনী অবলম্বনে বিরচিত; নাটিকার কেন্দ্রগত ভাবটি এই যে করুণা-বিগলিত চিত্ত নিখিল ধরণীর দুঃখ দৈন্য মোচনে ব্যগ্র ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। তখন "বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর!" মিত্র ও অমিত্র ছন্দে রচিত। রচনা তৃপ্তিকর ও কবিত্বময় হয় নাই।

ইডেন হিন্দু হোস্টেল কবিসম্মিলনী—

কবিতা-প্রতিযোগিতায় রচিত পুরস্কৃত সনেট-সমষ্টি। অধিকাংশ কবিতাই অতি সাধারণ; কোনোটির মধ্যে ভাবী কবির প্রতিভাগুঞ্জন শ্রুত হয় না। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কোনো লেখকই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

চিড়িয়াখানা—

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক সিটি বুক সোসাইটী। মূল্য চার আনা। ইহাতে বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ প্রভৃতি অনেক প্রকার পশুর আকৃতি প্রকৃতি বর্ণিত ও চিত্র দ্বারা উদাহৃত হইয়াছে। রচনা প্রাঞ্জল; চিত্রগুলি সুন্দর। শিশুগণ এই পুস্তক আনন্দে পাঠ করিয়া জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনায়াসে জ্ঞান অর্জ্জন করিবে। এই পুস্তকখানি সমালোচনার জন্য পাওয়া মাত্র শিশুমহলে কাড়াকাড়ি লাগিয়া গিয়াছিল; অনেক কষ্টে দু মাস পরে ইহার ছিন্ন কলেবর সমালোচকের হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে; এখন ইহার অঙ্গে অঙ্গে শিশুর আদর-চিহ্ন অঙ্কিত।

মুদ্রা-রাক্ষস।

তীর্থ-যাত্রা

এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর ত গতি নাহিরে মোর নাহিরে।
যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে সূর্য্য ছুটে, সে পথ-তলে পড়িব লুটে,
সবার পানে রহিব শুধু চাহিরে।

তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো—
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো—
জলের ঢেউ তরল তানে, সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে,
ঘিরিয়া তারে ফিরিব তরী বাহিরে।

যে বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধু পবনে,
তাকায়ে রব দ্বারের পানে, সে তানখানি লইয়া কানে,
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহিরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চড়কে বাণ ফোঁড়ার ইতিবৃত্ত

গম্ভীরা বা গাজনে সন্ন্যাসিগণ 'বাণফোঁড়া' নামক অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। 'বাণ' বলিতে ধনুকের সাহায্যে যে তীর বা বাণ নিক্ষিপ্ত হয় তাহা বুঝায় না। এক্ষেত্রে 'বাণ' আকারে ও ব্যবহারে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে।

গাজনে যে কয়েক প্রকার বাণ ব্যবহার হইয়া থাকে তন্মধ্যে (১) কপাল বাণ (২) ত্রিশূল বা অগ্নিবাণ (৩) * জিহ্বা বা সর্পবাণ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(১) কপাল বাণ—ইহা ক্ষুদ্র, প্রায় এক হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম সূচীর ন্যায়, এক প্রান্ত সূক্ষ্মাগ্র ও এক প্রান্ত স্থূল বা ভোঁতা। লৌহনির্ম্মিত। এই বাণের সূচ্যগ্র প্রান্তে স্বতন্ত্র চুঙ্গী ও তাহাতে ক্ষুদ্র লৌহের প্রদীপ সংবদ্ধ থাকে।

ব্যবহার—কপাল বাণ কপালে বিদ্ধ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম 'কপালবাণ' হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান রাত্রে হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী স্থিরভাবে দেবতার সম্মুখে উপবেশন করিলে, কর্ম্মকার (কামার) বাণটি দুই ভ্রুর মধ্যভাগে কপালের চর্ম্মে বিদ্ধ করিয়া দেয় এবং চর্ম্ম হইতে অগ্রভাগ দুই ইঞ্চি আন্দাজ বাহির করিয়া রাখে। তৎপরে একখানি কচি কলাপাতের অগ্রখণ্ড (আগুটপাতা) দিয়া সন্ন্যাসীর মুখ আবৃত করিয়া উক্ত বাণাগ্রে সংবদ্ধ করিয়া দেয়। তৎপরে স্বতন্ত্রচুঙ্গীযুক্ত লৌহপ্রদীপটী ঘৃত ও সলিতাসহ, বাণাগ্রভাগে পরাইয়া দেয়। বাণের অগ্রভাগস্থ চুঙ্গীর উপর বাণের সামান্য অগ্রাংশ বাহির হইয়া থাকে, বাণের উক্ত অংশে একটি জবাফুল বিদ্ধ করিয়া দেয়। অপর কোন সন্ন্যাসী বাণসংলগ্ন প্রদীপটী জ্বালিয়া দেয়।

(২) ত্রিশূল বা অগ্নিবাণ। লৌহনির্ম্মিত, কপাল বাণের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, দীর্ঘে কপাল বাণ হইতে অর্দ্ধ হস্ত অধিক। কপাল বাণে যদ্রূপ স্বতন্ত্র চুঙ্গীবদ্ধ লৌহপ্রদীপ আবদ্ধ থাকে ইহাতে তাহা না থাকিয়া একটি লৌহ-ত্রিশূলবৎ অংশ থাকে। ইহার আকৃতি ত্রিশূলের মত বলিয়া ইহাকে ত্রিশূলবাণ বলে।

ব্যবহার—এই অনুষ্ঠান কোথাও রাত্রে কোথাও দিবসে শোভাযাত্রার সময় হইয়া থাকে। দুই বাহুর নিম্নে পাঁজরের উভয় পার্শ্বে, বাণদ্বয়ের অগ্রভাগ সম্মুখের দিকে রাখিয়া পার্শ্বভেদ করে, এবং সূক্ষ্মাগ্রভাগে চুঙ্গীবদ্ধ ত্রিশূলবৎ অংশ পরাইয়া দেয়। সন্ন্যাসী দুইটি বাণের অগ্রভাগ সম্মুখে কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া ধরিয়া দুইটি বাণের অগ্রভাগ একত্র সংযুক্ত করিয়া দুই হাতে দুইটি বাণ ধারণ করে। তৎপরে ঘৃতসিক্ত বস্ত্রখণ্ড ত্রিশূলাংশে জড়াইয়া দিয়া অগ্নি সংযোগ করে। সন্ন্যাসী উহা লইয়া পূজা করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে ধুনাচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে থাকে।

জিহ্বা বা সর্পবাণ* লৌহনির্ম্মিত, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূল, দীর্ঘে ছয় হাত হইতে নয় হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গাজন উৎসবে জিহ্বাবাণ ফোঁড়া শালেভর দিবসে প্রাতঃ-কালে অনুষ্ঠিত হয়। এই বাণের এক প্রান্ত সর্প-ফণার ন্যায়, অপরাংশ সূক্ষ্ম অথচ অতি সূক্ষ্ম নহে, অগ্রভাগ ভোঁতা, এই বাণ জিহ্বা ভেদ করিতে ব্যবহার করে।

ব্যবহার ও প্রয়োগ—পূর্ব্ববর্ণিত বাণের ন্যায় ইহা বিদ্ধ করা হয় না। প্রথমে জিহ্বা ঘৃতসিক্ত করিয়া কামার জিহ্বাটির নিম্নদিক উল্টাইয়া ধরে তৎপরে শিরার সংস্থানাংশ ত্যাগ করিয়া 'বেলকাঁটা' নামক স্বতন্ত্র একটি তীক্ষ্ণাগ্র প্রেকবৎ লৌহশলাকা দিয়া জিহ্বার এক পার্শ্বে নিম্নদিক দিয়া বিদ্ধ করে; তৎপরে সেই বিদ্ধ অংশের ছিদ্র পথ দিয়া 'জিহ্বাবাণ'টির ভোঁতা সূক্ষ্মাগ্র প্রবেশ করাইয়া বাণটির ঠিক মধ্যভাগ মুখগহ্বরে রাখে। এই বাণটির উভয় প্রান্ত সমতুল-ভার বিশিষ্ট রাখিতে হয়।

এই সর্পফণাকৃতি প্রান্ত সিন্দুরলিপ্ত ও অপর প্রান্তে কোন প্রকার ফল বিদ্ধ করে। সন্ন্যাসী উভয়হস্তে বাণের উভয় পার্শ্ব ধরিয়া নাচিতে থাকে। এই সময়ে বাদ্যভাণ্ড বাজিতে থাকে। এইপ্রকারে অনেকেই জিহ্বাবাণ বিদ্ধ করিয়া নাচিতে থাকে। সময়ে সময়ে দর্শকগণের নিকট জিহ্বার মধ্য দিয়া বাণ চালাইয়া নৃত্য করে।+

* এই বাণ পার্শ্ববাণ বা পাশবাণ নামেও খ্যাত হইয়া থাকে।

* 'বড় বাণ' নামেও কোথাও কোথাও খ্যাত আছে।

+ আমি বাল্যকালে এই ভীষণ উৎসব একবার মাত্র দেখিয়াছি। তৎপরে রাজাদেশে ইহার ব্যবহার নিবারণ হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে কেবল মুখে কামড়াইয়া বাণফোঁড়া দেখান হইত। এক্ষণে তাহাও হয় না। কেবল বাণের পূজা হয় মাত্র।

সেই সময় দর্শকমণ্ডলী কর্ত্তৃক টাকা, পয়সা, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি পুরস্কার প্রদত্ত হয়।

বাণ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম—ব্যবহারের পূর্ব্বে বাণগুলি মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়, যেন কোন প্রকার মরিচা না থাকে। তৎপরে ঘৃতদ্বারা প্রলেপ দেয়। বাণের পূজা হয়। তৎপরে কর্ম্মকার স্নান করিয়া, দেবতার পুষ্প লইয়া, কার্য্যে ব্রতী হয়। 'বেলকাঁটা' কর্ম্মকার নিজ গৃহ হইতে লইয়া আসে। ইহারও পূজা হয় ও ঘৃতপ্রলেপ দিতে হয়। দেহে বাণ বিদ্ধ করিবার সময় প্রয়োগাংশটি ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করে; তৎপরে কর্ম্মকার হাতে ঘুঁটের ছাই লইয়া উক্ত স্থানে ও নিজ অঙ্গুলীতে মাখিয়া বাণ বিদ্ধ করে। বাণ খুলিবার সময় কর্ম্মকার নিজহস্তে বাণ খুলিয়া ক্ষতস্থানে ঘৃতসিক্ত তুলা লাগাইয়া দেয়; ও ক্ষণকাল টিপিয়া ধরে। জিহ্বা হইতে বাণ খুলিবার সময়ও ঘৃতের ব্যবহার করে। বাণ খুলিয়া মুখগহ্বর ঘৃতপূর্ণ করিয়া দেয়। কোথাও কোথাও তিলচূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশাইয়া মুখগহ্বরে ধারণ করিতে হয়। সন্ন্যাসী এক দিবস কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে না। এক বৎসর জিহ্বার যে অংশে বাণ বিদ্ধ করা হয়, পর বৎসর সেই অংশ বাদ দিয়া ফুঁড়িতে হয়।

এই অনুষ্ঠান চড়কের সময় হয়। পূর্ব্বে বঁড়শী আকারের দুইটি বা একটি লৌহবাণে পৃষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া উহার সহিত রজ্জু বদ্ধ করিয়া চড়কে ঘুরিবার ব্যবস্থা ছিল।

পৃষ্ঠের মধ্যভাগে মেরুদণ্ড বাদ দিয়া উভয় পার্শ্বের স্থূল চর্ম্ম 'বেলকাঁটা' নামক অস্ত্র দিয়া ভেদ করিয়া বঁড়শীবাণ পরান হইত। পৃষ্ঠদেশ ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া তৎপরে ঘুঁটের ছাই দিয়া পৃষ্ঠের চর্ম্ম উন্নত করিয়া ধরিয়া 'বেলকাঁটা' বিদ্ধ করিত, সেই ছিদ্রপথে বঁড়শী পরান হইত। এক্ষণে চড়ক আইন অনুসারে নিষিদ্ধ।

মহাভারতে ভীষ্মের শরশয্যায় বাণফোঁড়ার কথা মনে হইলেও উহা প্রকৃত বাণফোঁড়া নহে। কিন্তু ঐ প্রকারের বাণ ফোঁড়া হইতেই এই বাণফোঁড়া প্রচলিত হইয়াছে।

হরিবংশে বাণরাজার উপাখ্যানে বাণবিদ্ধ অবস্থায় শোণিতাপ্লুত দেহে শিবের নিকটে গমন ও নৃত্যের কথা আছে।

উষা ও অনিরুদ্ধ ব্যাপার লইয়া শোণিতপুরাধিপতি বাণরাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘোর যুদ্ধ হয়। তাহাতে বাহুচ্ছেদ ও বাণবিদ্ধ হওয়ার পর শোণিতাপ্লুত দেহ লইয়া বাণ শিবের নিকটে নৃত্য করিয়াছিলেন। তাহাতে শিব বাণকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। শিব বাণকে অমর বর প্রদান করেন এবং বাণ শিবভক্তগণের জন্যও একটি বর প্রার্থনা করেন।

'দেব। আমি যেমন ব্রণ-পীড়িত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে আপনার সম্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এইরূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে।

'মহাদেব বলিলেন, বৎস! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে তাহার এইরূপ ফললাভ হইবে।'*

এই ধর্ম্মসংহিতার বাণোপাখ্যান হইতে সন্ন্যাসিগণ শিবপ্রীত্যর্থে বাণবিদ্ধ শোণিতাপ্লুত দেহে শিবসকাশে নৃত্য করে। 'বাণ রাজা' ইহার পথপ্রদর্শক বলিয়া, তাঁহার নামে এই উৎসবের নাম 'বাণফোঁড়া' হইয়াছে। গাজনে দেহ হইতে যে কোন উপায়ে শোণিতপাত করিলেই তাহাকে বাণফোঁড়া বলে।

সংহিতা মধ্যে শিবপূজা উপলক্ষে 'বাণ' পূজারও প্রসঙ্গ দেখিতে পাই 'শিবপূজায় ঈশান কোণে শ্রীমান্ ত্রিশূলের, পূর্ব্বদিকে বজ্রের, অগ্নি কোণে পরশুর, দক্ষিণে সায়কের, নৈঋতে খড়্গের, পশ্চিমে পাশের, বায়ু কোণে অঙ্কুশের, ও উত্তর দিকে পিনাকের পূজা করিবে।'

রামাই পণ্ডিতের বর্ণিত হরিচন্দ্রের ধর্ম্মপূজা ব্যাপারে বাণ উপাখ্যানের ন্যায় কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"করাত ভেজাএ দিল রামর মাথে।
চেরা না জায় রাম সওরে করতায়॥"১০
—যমপুরাণ।

'চন্দ্রহাস খাঁড়া হাথত চন্দ্র কোটাল॥'৪
—যমদূতসংবাদ।

'সেল ডকবুস হাতে সুরজ কোটাল॥'১০
—ঐ

'ঝাটি ঝগড়া হাথ গরুড় কটাল॥'১৩
—ঐ

'জীবনাম চুড় হাথ উলুক কটাল॥'১৬
—ঐ

'ধর্ম্ম-পূজা-পদ্ধতি' নামক পুঁথি রামাই পণ্ডিতের প্রণীত বলিয়া লিখিত আছে। ইহাতে বাণফোঁড়ার কথা আছে।

* ধর্ম্মসংহিতা—বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত 'কুণ্ডসেবা,' হিন্দোলন, জিহ্বা-ভেদ, পঞ্চ ভেদের কথা উক্ত পুঁথির 'গ্রহভরণ' অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

জিহ্বা-ভেদ ও পঞ্চ ভেদ, জিহ্বাবাণ ফোঁড়া, ও অপরাপর পঞ্চ প্রকার ভেদনের কথায়, ক্ষুদ্র বাণফোঁড়ার কথা বলা হইয়াছে।

গাজন ও গম্ভীরা উৎসবে আজিও 'বাণফোঁড়া' উৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু এখন জিহ্বাবাণ ফোঁড়া ও চড়কে পৃষ্ঠ-ফোঁড়া হয় না। ক্ষুদ্র কপালবাণ, ত্রিশূলবাণ, ইত্যাদি ফুঁড়িতে দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া বেলকাঁটা শরীরের বহুস্থানে বিদ্ধ করিয়া তাহা জবা পুষ্প দ্বারা শোভিত করাও বাণ-ফোঁড়ার অন্য রূপ বলিয়া মনে হয়।

বাণ ফোঁড়া ব্যাপার বীরত্বপ্রকাশক। বর্ত্তমান গম্ভীরা ও গাজনে তরবারি, বল্লম, ইত্যাদি লইয়া ভক্তগণ নৃত্য করে। কুটীচক নামক শৈব পন্থিগণ আজিও খনিত্র ও কৃপাণ ধারণ করিয়া থাকে। শৈব নাগা সন্ন্যাসীগণ প্রকৃত প্রস্তাবে যৌধেয় জাতি; তাহারাও কৃপাণ খনিত্র ব্যবহার করে। বীরকর্ম্মে সমাজকে প্রবুদ্ধ রাখিবার জন্য জলাচরণীয় সমাজেও এই প্রশংসাসূচক বীরকর্ম্ম বাণফোঁড়ার প্রচলন ছিল। এই সকল জাতিরাই তখন হিন্দু জমিদারগণের পদাতিক দলভুক্ত ছিল। সময়ে সময়ে এই দলই দেশে ডাকাতি করিত।

শ্রীহরিদাস পালিত।

সাধারণ কৃষির সহিত গোপালন ও গব্য ব্যবসায়ের তুলনা

১। কৃষি।

"স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যু পাস্তেঽন্নবতো বৈ স লোকান্
পানবতোঽভিসিদ্ধতি।"

'অন্নকে ব্রহ্মজ্ঞানে যে তাহার পূজা করে, সে অন্নযুক্ত এবং পানযুক্ত লোকসকল অধিকার করে'—২—৯—৭ম প্রপাঠক—ছান্দোগ্য॥

বিশুদ্ধ উপায়ে যাহাতে আমাদের যুবকগণ অন্ন সঞ্চয় করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের শাস্ত্র বলে চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্মের মূল। সেই সঙ্গে আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে অন্নশুদ্ধিই চিত্তশুদ্ধির মূল। অন্ন ব্রহ্ম, অন্ন চতুর্বর্গ লাভের উপায়। বিশুদ্ধ উপায়ে যে পরিবারে অন্ন সংগ্রহ না হয়, সে পরিবারে ধর্ম্ম বিকাশ লাভ করিতে পারে না। আমাদের দেশের পক্ষে বিশুদ্ধ উপায়ে অন্ন সংগ্রহের জন্য কৃষিই সনাতন রাজপথ।

"বার্ত্তায়াং নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ পশুনাঞ্চৈব রক্ষণে।"
(৩২১—৯—মনু)।

দেশের জন্য অন্ন উৎপাদন করিবার অধিকার দেবলোকেরও বাঞ্ছনীয়। কৃষকই দেশের হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ। শরীরের রক্ত যেমন হৃৎপিণ্ড দ্বারাই সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া শরীরকে সজীব রাখে, সেইরূপ অন্নও কৃষক দ্বারা উৎপন্ন এবং দেশময় বিস্তৃত হইয়া দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। নিশ্চয়ই কৃষক আমাদের সকলেরই নমস্য। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইলে রক্তাভাবে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ যেরূপ দুর্ব্বল হয়, সেইরূপ কৃষকশ্রেণী দুর্ব্বল হইলে সমস্ত দেশ উৎসন্ন হয়। ইংলণ্ডবাসীরা ইহা বেশ জানে। তাহাদের পরস্পরের মতদ্বৈধের সীমা নাই কিন্তু আমাদের ন্যায় যাহাতে তাহাদেরও কৃষিজমির জন্য রাজস্ব দিতে না হয় সেই জন্য তাহারা সকলেই বদ্ধপরিকর। কৃষিই ভারতের প্রধান অবলম্বন। কৃষিই রাজ্যের ধনাগমের মূলীভূত কারণ। রাম-বনবাসের পর ভরত যখন রামের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন রাম সস্নেহে ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:—

কচ্চিৎ তে দয়িতাঃ সর্ব্বে কৃষি গোরক্ষজীবিনঃ।
বার্ত্তায়াং সাম্প্রতং তাত লোকোঽয়ং সুখমেধতে॥ ৪৭॥
অ ১০০—অযোধ্যা—রামায়ণ॥

কৃষক এবং গোপালনজীবিগণ তোমার উপরে সন্তুষ্ট আছে ত? বৎস, সত্যই কৃষির উপরে জনসাধারণের সুখ সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

ঠিক এই কথাই আবার নারদও যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কচ্চিৎ স্বনুষ্ঠিতা তাত বার্ত্তা তে সাধুভির্জনৈঃ।
বার্ত্তায়াং সংশ্রিতস্তাত লোকোঽয়ং সুখমেধতে॥"
৮৩—অ ৫—সভা—মহাভারত।

আমরা যত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকি, তাহার উৎপত্তি অধিকাংশই কৃষি হইতে। জমিদার বল, তালুকদার বল, মহাজন বল, উকিল বল, আর কর্ম্মচারীই বল, সাক্ষাৎভাবেই হউক বা গৌণভাবেই হউক কৃষক হইতেই তাহাদের সকলের ধনাগম। কৃষিজন্য ফলের বিনিময়েই তাহাদের ধনের উৎপত্তি। ভগীরথ জলধারা প্রবাহিত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন—কৃষকগণও অন্নপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। কৃষিই আমাদের উন্নতির প্রধান সাধন—এবং সর্ব্বপ্রযত্নে কৃষিশিক্ষা বিস্তার করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

২। কৃষি নানাবিধ।

কৃষিযোগ্য জমি নানা প্রকার। কোন কোন স্থান বর্ষাতে জলমগ্ন থাকে এবং কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই আবার শুষ্ক হয়। কোন কোন জমি বর্ষাকালেও জলমগ্ন হয় না। অনেক জমি টিলা, অনেক জমি জলের অভাব প্রযুক্ত শস্য উৎপাদনের অযোগ্য, অনেক জমি জঙ্গলাকীর্ণ। আবার অনেক জমিতে পুকুর, দীঘি, বিল, ঝিল ইত্যাদি জলাশয় আছে। জমির এইসকল প্রকার ভেদ অনুসারে তাহার উপযোগী কৃষিও নানা প্রকার, যথা:—(১) শস্য কৃষি (২) গব্য কৃষি, (৩) গো, মেষ, ছাগ, অশ্ব, মহিষাদি পশুপালন কৃষি, (৪) গৃহপালিত হংস, কপোত, কুক্কুটাদি পক্ষীর কৃষি, (৫) মৎস্য কৃষি, এবং (৬) মৌমাছি, লাক্ষা বা রেশমের কৃষি ইত্যাদি। কৃষি শব্দের ধাত্বর্থ যাহাই হউক এসকলই কৃষি ব্যবসায়ের অন্তর্গত। জমির উপযোগিতা দৃষ্টে কৃষককে এইসকল হইতে একটি কি দুইটি বাছিয়া লইয়া কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিতে হয়। অতি নিকৃষ্ট জমি—যাহাতে জল সেচনের কোন সুবিধা নাই, যেমন টিলা প্রভৃতি—পশুপালনেরই যোগ্য। মধ্যম শ্রেণীর জমি যাহা বর্ষার জলে ডুবিয়া না যায় এবং যাহাতে পানীয় জলেরও সুবিধা আছে, তাহা গব্য ব্যবসায়ের বিশেষ উপযোগী। উৎকৃষ্ট জমি যাহাতে গ্রীষ্মকালেও জলাভাব হয় না, অথচ বর্ষাকালেও হাজা লাগিয়া শস্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা না থাকে তাহাই শস্যকৃষির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ক্ষুদ্রাকারে কৃষিকার্য্য পরিচালন করিবার পক্ষে মিশ্রকৃষিই বিশেষ উপযোগী। এসকল কৃষি সম্বন্ধীয় সাধারণ সূত্র। উল্লিখিত নানা শ্রেণীর কৃষির মধ্যে শস্যকৃষি এবং গব্যকৃষিই প্রধান। আমাদের বিশেষ ভাবে দেখা আবশ্যক এই দুয়ের মধ্যে কোনটি গরিব ভদ্রসন্তানদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাহাদের অবস্থা দৃষ্টে আমরা শস্যকৃষির সহিত গব্যকৃষির তুলনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব—যে, তাহাদের জন্য গব্যকৃষিই বিশেষ উপযোগী এবং তাহার সঙ্গে কতক পরিমাণ শস্যকৃষি মিশ্রিত থাকা সম্ভব হইলে আরও বিশেষ।

৩। শস্যকৃষি।

শস্যকৃষি বলিতে আমাদের দেশে প্রধানতঃ ধান এবং পাটের চাষকেই বুঝায়। ধান বা পাটের চাষে যেরূপ পরিশ্রম এবং বর্ষাতপ সহ্য করিতে হয়, বা কাদা এবং জলে নামিয়া কার্য্য করিতে হয় ভদ্রসন্তানদের পক্ষে তাহা প্রায় অসহ্য। চাকরের উপরেই তাহাদিগকে অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। মান্ধাতার আমলের বিশ্বস্ত পরিশ্রমী চাকর আজকাল দুর্লভ। আবার ঠিক প্রয়োজন হইলেই যে উপযুক্ত সংখ্যক চাকর পাওয়া যায় তাহাও নয়। শস্যকৃষিতে সময় বিশেষে অনেক লোকের প্রয়োজন হয়, অনেক সময়ে আবার চাকরের কোন দরকারই থাকে না। এরূপ অবস্থায় সারা বৎসর বেতন দিয়া উপযুক্তসংখ্যক চাকর নিযুক্ত রাখা কোন মতেই পোষাইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন চাষা চাকরেরাও নিজেদের এবং পরিবারের সারাবৎসরের অন্নের জন্য আমাদের দেয় সামান্য অনিশ্চিত বেতনের উপরে নির্ভর করিতে পারে না। তাহারা সকলেই বৎসরের খোরাকীর জন্য কিছু কিছু জোৎ জমি রাখিয়া থাকে। এবং 'যো' বা 'যুক্ত' লাগিলে যে মুহূর্ত্তে তোমার জমিতে লোকের প্রয়োজন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সম্ভবতঃ চাষার নিজ জোত জমিতেও লোকের প্রয়োজন। তখন কোন চাষাই নিজের জমি ফেলিয়া তোমার দেয় ২।৫ দিনের বেতনের লোভে তোমার জমিতে কার্য্য করিতে সম্মত হইবে না। তাহার নিজ জমি শেষ করিতেই হয়ত 'যো' চলিয়া গিয়াছে। ঠিক 'যো' মত তোমার জমির কার্য্য হইতে পারিল না। 'যো' মত

কৃষিকার্য্য না হইলে যে কত ক্ষতি কৃষক ভিন্ন অপরে তাহার কি বুঝিবে? ধান বা পাটের চাষে ভদ্রসন্তানদের ক্ষতির ইহাই একটি প্রধান কারণ। আবার চাষী চাকরেরা নিজের জমিতে কিম্বা পরস্পরের জমিতে যেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত মন দিয়া কার্য্য করে, ভদ্রলোকদের কৃষিবিষয়ক অজ্ঞানতা বা ঔদাসীন্য বশতঃই হউক, অথবা নিজেদের আলস্য বশতঃই হউক, ভদ্রলোকদের জমিতে মজুরী করিবার বেলা সেরূপ স্ফূর্ত্তি বা মনোযোগের সহিত কার্য্য করে না। এদৃশ্য সচরাচরই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। আর এক কথা এই, লাভ সম্বন্ধে ধান এবং পাটের তুলনা করিলে দেখা যায় ধান অপেক্ষা পাটের চাষেই লাভ কিছু বেশী, কিন্তু তাহাও প্রতি বিঘা ১০৲ টাকার বেশী হইবে না। এরূপ অবস্থায় বেশী পয়সা খরচ করিয়া প্রয়োজন মত এক সময়েই বেশী লোক সংগ্রহ করিয়া নিযুক্ত করিলে লাভ প্রায় থাকিবে না। অথবা "গুড়ের লাভ পিঁপড়ায়" খাইয়া যাইবে। ধান সম্বন্ধেও ঐ কথা। অতএব মোটের উপরে বলা যায় ধান বা পাটের চাষ দ্বারা গরিব ভদ্রসন্তানদের পক্ষে লাভবান্ হওয়া অসম্ভব।

আলু, কপি, ইক্ষু, কলা, তামাক প্রভৃতির চাষে ধান বা পাট অপেক্ষা বেশী লাভ হয় বটে। তাহাতে বর্ষাতপের কষ্ট অথবা জলে বা কাদায় থাকিয়া কার্য্য করিবার কষ্টও নাই। লাভ প্রতি বিঘা ২০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা। গড়ে ৩০৲ টাকা বৎসরে লাভ হইতে পারে। একজন ভদ্রসন্তানের কিন্তু মাসিকই ৩০৲ টাকার কমে চলে না। বৎসরে ৩৬০৲ বা ৪০০৲ টাকার প্রয়োজন। শস্যকৃষি দ্বারা এই ৪০০৲ টাকা বৎসরে লাভ করিতে হইলে প্রায় এক দ্রোণ জমির আবশ্যক। সে জমি স্বাস্থ্যকর স্থানে হইবে, কথঞ্চিৎ উচ্চ হইবে, অথচ জলসেচনের উপযোগী উপযুক্তসংখ্যক জলাশয় থাকিবে। উদ্ভিন্ন মাল বিক্রীর জন্য নিকটে বড় বাজার থাকিবে কিংবা মাল রপ্তানীর জন্য নিকটে রেলষ্টেশন, নদী কিংবা গাড়ী চলাচলের রাস্তা থাকা আবশ্যক। আরও চাই,—গরু ছাগলের উৎপাত হইতে শস্য রক্ষা করিবার ব্যবস্থা। সেজন্য বেড়া দেওয়ার সুবিধা চাই অর্থাৎ ঐ এক দ্রোণ জমি সমস্ত এক চাপে* হওয়া আবশ্যক।

"৯ মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না।" উল্লিখিত সমস্ত সুবিধা আছে, এইরূপ জমি একচাপে এক দ্রোণ পাওয়া একরূপ অসম্ভব। তারপর জমি পাইলেও এক দ্রোণ জমি একজন ভদ্রলোকের ভালরূপে চাষ আবাদ করিতে প্রায় ১০০০৲ টাকার মূলধনের প্রয়োজন। এইরূপ নানাদিক পর্য্যালোচনা করিলে সাধারণ গরিব ভদ্রসন্তানদের পক্ষে শস্যকৃষি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। একদিকে দেখা যাইতেছে কৃষিই আমাদের দেশে ধনাগমের প্রধান সাধন; অপরদিকে দেখা যাইতেছে যে দেশের মস্তিষ্কস্বরূপ শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের জন্য বিস্তীর্ণ আকারে শস্যকৃষির দ্বার রুদ্ধপ্রায়। সভ্যজগতে নানাবিধ নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য এবং নূতন কলকৌশল আবিষ্কৃত হইয়া বিশেষতঃ যৌথখরিদবিক্রী ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে শস্যকৃষির আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় লাঘব সাধিত হইতেছে। শিক্ষিত কৃষক ভিন্ন সেসকল সুবিধা গ্রহণ করা অপরের পক্ষে অসম্ভব। দেশের হৃদ্‌পিণ্ডস্বরূপ ভারতের শস্যকৃষি মূর্খ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দরিদ্র কৃষকদিগের হাতে ন্যস্ত হওয়াতে সমাজদেহ নিতান্ত রক্তশূন্য দুর্ব্বল এবং রুগ্ন। অবস্থা যথার্থই শোচনীয়।

৪। গোপালন ও গব্য ব্যবসায়।

এখন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের পক্ষে গোপালন এবং গব্য ব্যবসায়ে কিরূপ সুবিধা তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। গোপালন সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে জমি দুষ্প্রাপ্য হইলে অতি যৎসামান্য জমিতেই এ ব্যবসায় চলিতে পারে। এমন কি এক একটি গাই গরুর জন্য ঘরের ভিতরে ৬ হাত দীর্ঘ এবং চারি হাত প্রশস্ত একটু দাঁড়াইবার এবং শুইবার স্থানই যথেষ্ট—অর্থাৎ ১৬ হাত

* ১৫ কি ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ন্যায় জাপানী কৃষকদিগের জমি ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত এবং নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু তাহারা চেষ্টা করিয়া সরকারের সাহায্যে পরস্পরের সহিত জমি বিনিময় করিয়া সে দোষ সংশোধন করিয়া লইয়াছে। আমাদের পক্ষে কি তাহা সম্ভব?

দীর্ঘ এবং ৬ হাত প্রশস্ত একটি ঘরে চারিটী গাই বেশ আরামে থাকিতে পারে। স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য বাহিরেও ঐরূপ একটু স্থান প্রয়োজন—অর্থাৎ ১৬ হাত দীর্ঘ এবং ৬ হাত প্রশস্ত একটু উঠান বা আঙ্গিনা হইলেই চারিটী গাই তথায় সময় সময় দাঁড়াইতে পারে। অর্থাৎ ৩২ × ৬ হাত জায়গায় ৪টী গাই থাকিতে পারিলে ৮০ × ৮০ = ১ বিঘা স্থানে ১২০টী থাকা সম্ভব হয়। যাহা হউক জমি দুষ্প্রাপ্য হইলে ১ বিঘা মাত্র জমিতেই সময়ে সময়ে ৪০।৫০টী গাই গরুর স্থান করা যায়। অপর দিকেও আবার জমি সুলভ হইলে গরুর খাদ্যব্যয় লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গাই গরুর জন্য ৩ বিঘা পর্য্যন্ত চরিবার জমি দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে দুধের পরিমাণ বাড়িবে এবং দুধে মাখনের ভাগও বেশী থাকিবে। গোপালন এবং গব্য ব্যবসায়ের জমি সম্বন্ধে ইহাই বিশেষ সুবিধা। বেশী জমিই হউক আর কম জমিই হউক তাহাতে এ ব্যবসায়ের বড় কিছু আসে যায় না।

জমি সম্বন্ধে ত এই কথা। গব্য ব্যবসায়ের মূলধন সম্বন্ধে কথা কি? গরুর সেবা যত্ন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়াছে এরূপ একজন ভদ্রসন্তান মাসিক পূর্ব্বোক্ত ৩০৲ টাকা স্থলে যদি ৫০৲ টাকাও লাভ পাইতে চায় তবে তাহার কি পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন? সকলেই জানেন যে গাইগরু নানাশ্রেণীরই আছে। আমাদের দেশে সচরাচর একটি গাই দৈনিক ২ সেরের বেশী দুধ বড় দেয় না। তাহার দামও ৩০৲।৪০৲ টাকা। এসকল গরু দ্বারা গব্য ব্যবসায় চলিতে পারে না, কারণ তাহারা যখন দুধ দেয় তখন যাহা লাভ হয়, দুধ ছাড়াইলে তাহাদের খোরাকী খরচেই তাহা প্রায় কাটিয়া যায়। অপর পক্ষে আমাদের দেশেই নানাশ্রেণীর পশ্চিমা গাই আছে যাহারা দৈনিক ১০ সের পর্য্যন্তও দুধ দেয়। অষ্ট্রেলিয়াদেশীয় গাইও সময়ে সময়ে কলিকাতাতে পাওয়া যায় তাহারা দৈনিক আধমণেরও বেশী দুধ দেয়। যাহা হউক পশ্চিমা গাই সচরাচরই উপযুক্ত সেবা যত্ন পাইলে দৈনিক ৬ সের হারে দুধ দিয়া থাকে। কলিকাতার চিৎপুর বাজারে ঐরূপ একটী গাই প্রতি সের ২০৲ টাকা হিসাবে ১২০৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। তাহা আনাইবার রেলভাড়া প্রভৃতি খরচও আরও ২০৲ টাকা লাগিবে। মোটের উপর একটী ৬ সেরি দুধের গাই গরুর দর ১৪০৲ টাকা ধরা যায়। কুমিল্লার মত ক্ষুদ্র শহরেই দুধের দর টাকাতে ৬ সের, তাহাও অনেক সময় "দুধে জল, কি জলে দুধ" ক্রেতাগণ গভীর গবেষণা দ্বারাও ঠিক করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, একটি ছয় সেরি দুধল গাই রোজ এক টাকার এবং মাসিক ৩০৲ টাকার দুধ দিবে। উপযুক্ত সেবা যত্ন করিতে জানিলে এবং করিলে এই দুধ সাধারণতঃ প্রসবের এক সপ্তাহ পর হইতে গাভীন হওয়ার পর আরও ৪।৫ মাস কাল পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে। অবশ্য শেষভাগে পরিমাণে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। উপযুক্ত রূপ যত্ন পাইলে বাঙ্গলার যেরূপ জল বায়ু 'নাগরা' কি 'মুলতানি' এমন কি অষ্ট্রেলিয়া দেশের শর্টহর্ন্ (short-horn) গরুরও তাহা বেশ সহ্য হয়। আমরা চট্টগ্রামে মেস্তর গুড্ নামক জনৈক ভদ্রলোকের অনেকগুলি অষ্ট্রেলিয়াদেশীয় গরু দেখিয়াছি। সেগুলি বেশ সুস্থ ছিল। যাহা হউক ১৪০৲ টাকা দামের একটী ছয় সেরি দুধের গাই উপযুক্তরূপ সেবা যত্ন পাইলে প্রসবের ২।১ সপ্তাহ পর হইতে গাভীন হওয়ারও ৪।৫ মাস পর্য্যন্ত গড়ে দৈনিক ৬ সের হিসাবে দুধ দিবে। গরু গাভীন হওয়া সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র এই যে প্রসবের ছয় সাত মাস পরে গাই গাভীন হয়। তবে দেশীয় গাই সম্বন্ধে অনেক স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। কোন কোন গাই 'দোয়াশ' যায়। যাহা হউক সাধারণ সূত্র অনুসারে ভালরূপ দেখিয়া শুনিয়া গাই খরিদ করিতে পারিলে এবং উপযুক্তরূপ সেবা যত্ন করিতে পারিলে একটী ছয় সেরি দুধল গাই প্রায় ১১ মাস কাল গড়ে দৈনিক ৬ সের হিসাবে দুধ দিবে। মফঃস্বল শহরে ঐরূপ দুইটী গাই ২৮০৲ টাকা মূল্যে খরিদ করিলে ঐ ১১ মাস কাল প্রত্যেক গাই মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ৬০৲ টাকার দুধ দিবে। মাসিক খোরাকী কত লাগিবে দেখা যাক। মফঃস্বল শহরে সস্তার সময়ে বৎসরের খুদ, কলাই, খড়, কি তুলার বিচি প্রভৃতি গরুর খাদ্য খরিদ করিয়া রাখিলে প্রত্যেক গরুর জন্য মাসিক ছয় টাকাই যথেষ্ট—দুইটীতে

মাসিক ১২৲ টাকা। চাকর সম্বন্ধে কি হইবে? "শ্ববৃত্তিং ন কদাচন"—মনুর এই ইঙ্গিত শিরোধার্য্য করিয়া যাহারা বিশুদ্ধ উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমেই সম্মান বোধ করেন, তাঁহারা অবশ্য নিজেই গাই দুহিতে শিখিবেন এবং নিজ হাতে তাহার সেবা যত্নও করিবেন। এমন কি দৈনিক বার সের দুধ নিজ হাতে বিলি করিতেও অপমান বোধ করিবেন না। তবে যাঁহারা প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা অপেক্ষা বাবুগিরিই বেশী মূল্যবান্ মনে করেন তাঁহারা চাকর দ্বারাই গো-দোহন এবং গরুর যত্নাদি করাইবেন, নিজে মাত্র তত্ত্বাবধান করিবেন এবং তদুপযোগী শিক্ষা অবশ্য গ্রহণ করিবেন। একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে একটি আট টাকা বেতনের চাকর পশ্চিমা গাই ছয়টির এবং দেশী ছোট গাই নয়টীর সেবা যত্ন এবং দুগ্ধ বিক্রী প্রভৃতি করিতে পারে। দুইটী গাইএর উপরে তাহার সমস্ত বেতন চাপান অন্যায় হইবে। হার মত ৬ সেরি দুধাল দুইটী গাইএর চাকরের বেতন ৩৲ টাকার বেশী ধরা যায় না। এই হিসাবে দেখা যায় চাকর রাখিলে ১১ মাসে মাসিক ৩৮৲ টাকা এবং চাকর না রাখিলে মাসিক ৪৫৲ টাকা লাভ থাকে, তাহাতে মূলধন মাত্র ২৮০৲ টাকা দরকার। এখন প্রশ্ন এই—গাই দুইটীর দুধ বন্ধ হইলে কি হইবে? একটী গাই গড়ে নয় দশ মাস কাল গর্ভধারণ করে। গর্ভসঞ্চারের পরেও ৪।৫ মাস কাল দুধ দেয়। বাকি পাঁচ মাস কাল প্রায়ই দুধ দেয় না। তখন পূর্ব্বের মতন ২৮০৲ টাকা খরচ করিয়া আরও দুইটী নবপ্রসূতা ছয় সেরি দুধের গাই খরিদ করিতে হইবে। যদি মালিক পূর্ব্বে ১১ মাসের আয় হইতে ২৮০৲ টাকা সঞ্চয় করিয়া থাকেন তবে ত কথাই নাই। যদি কতক কর্জ্জ করিতে হয় এবং মালিকের এক আধ বিঘা জমি বন্ধক দিবার থাকে তবে ৷৵০ বার আনা কি এক টাকা শতকরা সুদে টাকা ধার করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। যেরূপেই হউক ২৮০৲ টাকা খরচ করিয়া আরও দুইটী ছয় সের দুধের গাই ক্রয় করিলে সেই গাই দুটী দ্বারা পূর্ব্বের মত মাসিক ৬০৲ টাকা আয় বাহাল রাখা যাইবে। তবে পার্থক্য এই যে এখন হইতে পাঁচ মাস কাল পূর্ব্বের দুধ-ছাড়ান গাই দুইটীর খোরাকী খরচ মাসিক ১২৲ টাকা হিসাবে বহন করিতে হইবে। পাঁচ মাস পরে ঐ গাই দুইটী আবার প্রসব করিলে ঐ ক্ষতি সহজেই পূরণ হইবে, কারণ তখন দৈনিক ১২ সের স্থলে ২৪ সের দুধ হইবে এবং মাসিক আয় ৬০৲ টাকা স্থলে ১২০৲ টাকা হইবে। এইরূপে দুধ বন্ধ হইলে যে সামান্য ক্ষতি হইবে, প্রসবের পর তাহা পূরণ হইয়া আয় বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইবে। উপরে আমরা যে হিসাব দিলাম তাহাতে দেখা যায় ৫৬০৲ টাকা মূলধন—অথবা মোটামুটী ৬০০৲ টাকা মূলধন এবং সুবিধামত স্থানে যৎসামান্য কিঞ্চিৎ জমি হইলেই গোপালন এবং গব্য ব্যবসায় দ্বারা গড়ে মাসিক ৫০৲ টাকা লাভ পাওয়া যাইতে পারে। জমির সুবিধা থাকিলে মিশ্রকৃষি দ্বারা লাভ আরও বৃদ্ধি করা যাইবে। শস্যের পরিত্যক্ত অংশগুলি গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং গরুর মলমূত্র শস্যের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদ্‌ভিন্ন বিস্তীর্ণ আকারে গব্য ব্যবসায় করিলে তাহার জন্য যেসকল চাকর নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে সময়ে সময়ে তাহাদের দ্বারা শস্যকৃষির বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। এইসকল নানা কারণে গব্যকৃষি এবং শস্যকৃষি পরস্পর সংযুক্ত হইলে উভয় কৃষিরই ব্যয় লাঘব এবং আয় বৃদ্ধি করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। এ বিষয়ে অধিক বলা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন।

৫। গব্য ব্যবসায়ে শিক্ষা।

যাহা হউক যদিও ৬০০৲ টাকা মাত্র মূলধন এবং যৎসামান্য জমিখণ্ড লইয়া গোপালন ও গব্য ব্যবসায় আরম্ভ করিলে মাসিক ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, তথাপি একথা সকলেরই জানা আবশ্যক যে অশিক্ষিত অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই যে এই ব্যবসায় করিয়া কৃতকার্য্য হইবে তাহা বলা যায় না। এ ব্যবসায়ের মূলই শিক্ষা। ব্যবসায় মাত্রেই শিক্ষার প্রয়োজন। বিশেষতঃ এ ব্যবসায় জীবন্ত প্রাণীদেহ লইয়া, মানুষেরই মত শরীরবিশিষ্ট গরু লইয়া। "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"—মানুষেরও যতদূর ইহাদেরও প্রায় ততদূর। খাদ্যের দোষে, কিংবা বর্ষায় ভিজিলে, কিম্বা ভিজা দুর্গন্ধময় ঘরে বাস করিলে মানুষের

মত ইহাদেরও জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ হয়। মাত্রা অতিক্রম করিয়া পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইলে, অথবা অপরদিকে কম খাওয়াইলে দুধ কমিয়া যায়। সামান্য অযত্নে বাছুর মরিয়া যায়, বাছুর মরিলে দুধ কমিবার কথা, তাহার প্রতিকার আবশ্যক। গরুরও গর্ভ নষ্ট প্রভৃতি দোষ ঘটে কিংবা জননশক্তি হ্রাস হয়। তখন কি কর্ত্তব্য তাহা জানা আবশ্যক। দুগ্ধবতী গাভীর কি কি লক্ষণ অথবা গাই গাভীন কিনা তাহার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আবার যে দুগ্ধ লইয়া গব্য ব্যবসায় চলিবে, সে দুগ্ধ যে উৎপন্ন হইবা মাত্র সকল সময়েই বিক্রি হইয়া যাইবে তাহা বলা যায় না; অথচ ৪।৫ ঘন্টা কাল থাকিলেই দুধ নষ্ট হয়। কি উপায়ে দুধ অনেকক্ষণ ভাল থাকে, অথবা নানাপ্রকার দীর্ঘকালস্থায়ী গব্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী কি, এ সকলও বিশেষ জ্ঞাতব্য। গব্য ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে এইরূপ নানা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। "সব্ জান্তা" মনে করিয়া যাহারা নিজেদের জ্ঞানাভিমানেই বিভোর সেই শ্রেণীর ভদ্রসন্তানেরা গব্য ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে সামান্য জ্ঞানে তুচ্ছ করিয়া এই ব্যবসায় গ্রহণ করিলে পরিণামে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবেন। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক ঘটিয়াছে। তাহাতেই এই ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেকের মনে কিঞ্চিৎ বিভীষিকারই উদয় হয়। কৃষি যদিও দেশের উন্নতির মূল, তথাপি বর্ত্তমান অবস্থাতে ভদ্রসন্তানদের পক্ষে শস্যকৃষির দ্বার রুদ্ধ। স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক স্থানে জমি মেলা যেরূপ দুর্ঘট তাহাতে মিশ্রকৃষিরও অনেক সময়ে সুবিধা হয় না। এরূপ অবস্থায় গোপালন এবং গব্যকৃষিতেই ভদ্রসন্তানদিগের বিশেষ আশা। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ভিন্ন সে আশা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যুবকদিগের জন্য সেই শিক্ষার সুবিধা করা জনসাধারণেরই প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু এ বিষয়ে জনসাধারণ যেন এখনও নিদ্রিত। আমরা আপাততঃ আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব সেই শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কুমিল্লাতে একটী গোপালন এবং গব্য বিদ্যালয় খুলিতেছি। তাহার শিক্ষা-তালিকা (Syllabus) সহ অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা আমাদিগকে জানাইবেন।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

চিত্রপরিচয়

সরোবরতীরে হংস।

সন্ধ্যার স্বর্ণচ্ছটায় আকাশ ও ভূমি যখন অনুলিপ্ত তখন গৃহাভিমুখী হংস সরোবর ত্যাগ করিয়া তীরে উঠিয়াছে, কেবলমাত্র এই ভাবটিই এই চিত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে। চিত্রে বর্ণবৈচিত্র্য, বস্তুগত সাদৃশ্য, স্বর্ণচ্ছটার দীপ্তি এমন একটি কোমল শান্ত উজ্জ্বল ভাবের সংমিশ্রণে অঙ্কিত হইয়াছে যে শিল্পীর পর্য্যবেক্ষণ ও তুলিকা-কুশলতা মনকে বিস্ময়প্রশংসায় পূর্ণ করিয়া তুলে। এই চিত্রখানি প্রাচীন, ভারত-চিত্রকলার সুন্দর নিদর্শন।

ধ্রুব।

অসহায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভক্তিমান শিশুর তপস্যার ভাবটি চিত্রে চমৎকার ফুটিয়াছে। এ চিত্রখানি ভারত-চিত্রকলা পদ্ধতিতে অঙ্কিত।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধপ্রসঙ্গ

শাসনকর্ত্তারা রাজ্যশাসনকার্য্যে কি পরিমাণে আমাদের মত অনুসারে চলেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু আমাদের মত তাঁহাদিগকে জানাইতে দোষ নাই। তাহা জানাইতে গেলে দেশবাসী সকলকেও জানাইতে হয়; এবং সকলের মত যাহাতে এক হয়, এবং সেই মত যাহাতে ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহারও চেষ্টা করিতে হয়। এই প্রকারে শাসনপ্রণালী ও শাসনকার্য্য সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের পরোক্ষভাবে শিক্ষার সাহায্য হয়। শাসনকর্ত্তারা যদি আমাদের মত দ্বারা একটুও চালিত না হন,



শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন, চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির মুখপাত্র।



হাজি আলি, পারস্য দেশীয় সংবাদপত্র-সম্পাদক। ইনি স্বদেশে স্বায়ত্তশাসননীতি প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সমর্থন করিয়া আন্দোলন করিতেছিলেন বলিয়া রুশীয়েরা ইঁহাকে ফাঁশী দিয়া হত্যা করিয়াছে।

তাহা হইলেও দেশবাসীর শিক্ষালাভ কম লাভ নহে। এই জন্য দেশের হিতাহিত যাহাতে হইতে পারে, এরূপ বিষয়ের আলোচনা সর্ব্বদা হওয়া দরকার। কিছুদিন পূর্ব্বে এরূপ কতকগুলি বিষয়ের আলোচনার জন্য টাউনহলে সভা হইয়াছিল, চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর আবার দেশবাসী সকলে যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছেন। এ সময়ে খুব সজাগ ও কর্ম্মিষ্ঠ ভাবে ভারতসভার কাজ করা উচিত।

পারস্যদেশে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে রুশিয়া বাণিজ্যব্যপদেশে ও অন্যান্য উপায়ে আর সেই দেশের ঐশ্বর্য্য লুটিয়া খাইতে পাইবে না। এই জন্য অনেক দিন হইতে রুশিয়া নানাপ্রকারে পারস্যে গোলযোগ ঘটাইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে পারস্যের নেতৃস্থানীয় কতকগুলি স্বদেশপ্রেমিক লোককে রুশীয়েরা ফাঁসি দেয়। তন্মধ্যে হাজি আলি নামক একজন সংবাদপত্র-সম্পাদক উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ে তাব্রিজ ও অন্যান্য সহরের নিকট পারসীক ও রুসীয় সৈন্যদের মধ্যে অনেকগুলি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এইরূপ একটি যুদ্ধের ছবি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

"টাইটানিক্"জাহাজের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিগণ মনে করিয়াছিলেন যে উহা কখনই জলমগ্ন হইতে পারে না। কিন্তু একটি তুষারশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া উহা সামান্য একটি নৌকার মত ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া গেল। প্রাকৃতিক শক্তির নিকট মানুষের নৈপুণ্য এতই অকিঞ্চিৎকর! অতএব মানুষের দম্ভ করা ভাল নয়। এই পর্য্যন্ত সকল জাতির

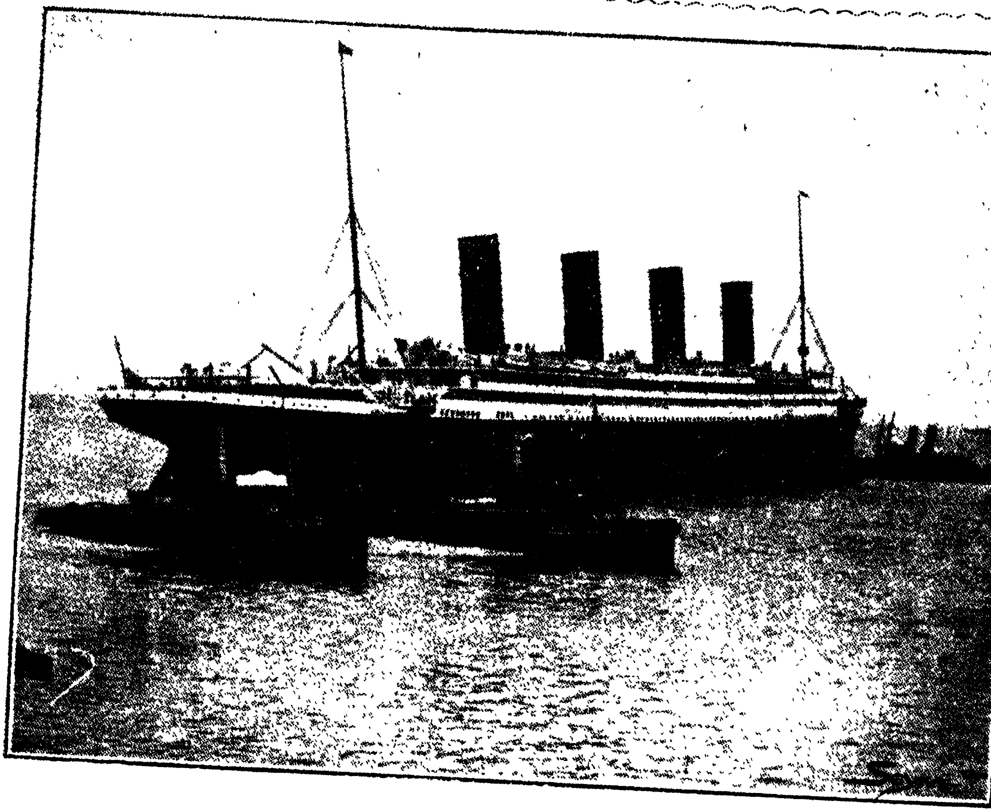


পারস্য সৈন্যেরা অত্যাচারী রুশীয় কসাক সৈন্যদিগকে তাব্রিজের সন্নিহিত প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মত এক হইবে। কিন্তু পুরুষ ও কাপুরুষের মধ্যে ইহার পর মতভেদ ও আচরণভেদ দৃষ্ট হইবে। পুরুষ বলিবে, প্রাকৃতিক শক্তি অপরাজেয় বটে, কিন্তু উহারই সাহায্যে উহাকে বশে আনিয়া কতদূর পর্য্যন্ত স্বকার্য্য সাধন করিতে পারি তাহা দেখিব; নতুবা জন্মই বৃথা, বাঁচিয়াই বা লাভ কি? কাপুরুষ বলিবে, 'বিপদের মুখে আপনাকে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; যে ক' দিন পরমায়ু আছে, কোন প্রকারে আরামে কাল কাটানই ভাল। কাপুরুষ বলিবে, যখন মরিতেই হইবে, যে ক' দিন পারা যায়, বাঁচা ভাল; মরিবার সময় নিজের বিছানায় শুইয়া আত্মীয়স্বজনের সেবা লইতে লইতে মরা ভাল। পুরুষ বলিবে, যদি মরিতেই হয়, রোগে ভুগিয়া, আত্মীয়স্বজনকে ভোগাইয়া মরায় কি লাভ? পুরুষের মত যুঝিতে যুঝিতে মরায় তীব্র আনন্দ আছে;—তা সে যুদ্ধ মানুষের সঙ্গেই হউক, হিংস্রজন্তুর সহিতই হউক, বা প্রাকৃতিক শক্তির সহিতই হউক।

কথিত আছে, একবার একজন ডাঙার মানুষ এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ভাই, তোমার প্রপিতামহ কিরূপে মারা যান? "সমুদ্রে জাহাজ ডুবি হওয়ায়।" তোমার পিতামহ? "সমুদ্রে জাহাজ ডুবিতে।" "তোমার পিতা?" "সমুদ্রে জাহাজ ভাঙিয়া যাওয়ায়।" তখন সেই ডাঙার মানুষ বলিল, "তবু তুমি নাবিক হইয়াছ?" নাবিক জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার সাত পুরুষ কিরূপে মরিয়াছে?" ডাঙার মানুষ বলিল, "কেন, ঘরের মধ্যে, বিছানায় শুইয়া, কোন না কোন রোগে।" তখন নাবিক বলিল, "তবুও তুমি প্রতিদিনই ঘরে থাক, ও বিছানায় শোও? ভয় করে না?"

যে জাতির পৌরুষ আছে, শত জাহাজ ডুবিয়া লক্ষ লোক মরিলেও তাহারা সমুদ্রযাত্রা ছাড়িবে না। আরও ভাল জাহাজ তৈয়ার করিবে, আরও সুদক্ষ নাবিক হইতে চেষ্টা করিবে, জাহাজ ডুবিবার পর প্রাণরক্ষার জন্য শত উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিবে। পৌরুষে তত মানুষ মরে না; সুমেরু, কুমেরু, নানা অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কারের চেষ্টায় তত মানুষ মরে না; আকাশে উড়িবার চেষ্টায় তত মানুষ মরে না; যত মরে নিরুদ্যম, মূর্খ, অলস, পৌরুষহীন জাতির মধ্যে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, প্লেগ ও অনাহারে। উনবিংশ শতাব্দীর সমুদয় যুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীতে যত মানুষ মরিয়াছে, শুধু ভারতে ঐসময়ে তার চেয়ে বেশী মানুষ মরিয়াছে প্লেগ আদি নিবার্য্য (preventible) রোগে ও



টাইটানিক জাহাজ।

দুর্ভিক্ষে। অতএব, হে ভারতবাসী, টাইটানিক্ জাহাজ ডুবিয়া ১৫০০ লোক মরিয়াছে বলিয়া, শোক করিও, কিন্তু ভয় পাইও না। যাহাদের আত্মীয়স্বজন ডুবিয়া মরিয়াছে, সেই শ্বেতকায়েরা ভয় পায় নাই। তুমি গৃহকোণে বসিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইও না, সমুদ্রযাত্রা হইতে বিরত হইও না। শ্বেতকায়দের মত যদি তোমরা পুরুষ হও, উদ্যমশীল হও, তাহা হইলে, তাহাদের দেশে যেমন এখন আর প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ নাই, তোমাদের দেশেও তেমনি থাকিবে না। জাহাজ ডুবি, অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কার, পুরুষোচিত ক্রীড়া, আকাশে উড্ডয়ন, ইত্যাদিতে যদি ২০০।৫০০ লোক মরা সহিতে পার, তবেই তোমরা বড় জাতি হইতে পারিবে।

টাইটানিক জাহাজে দুই হাজারের উপর পুরুষ নারী শিশু ছিল। তাহাদের মধ্যে ২।৪ জন ভীরু নিজপ্রাণরক্ষায় ব্যগ্র লোক পাছে জীবনতরী (life-boat) গুলিতে লাফ দিয়া পড়িয়া সেগুলি উল্টাইয়া দিয়া শত শত লোকের প্রাণহানির কারণ হয়, তজ্জন্য জাহাজের কর্ম্মচারীদিগকে রিভল্ভার হস্তে পথ আগ্লাইতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু এই ২।৪ জন ভীরুর কাপুরুষতায় অবশিষ্ট শত শত বীর পুরুষ ও বীরনারীর স্থিরচিত্ততা, সাহস ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী নিষ্প্রভ হইতে পারে না। হে টাইটানিকের বীর মাঝি মাল্লা ও বীর কর্ম্মচারিগণ, হে টাইটানিকের বীরহৃদয় পুরুষ ও নারীযাত্রিগণ, তোমাদিগকে প্রণাম করি, তোমাদের বন্দনা করি। ধন্য তোমরা, ধন্য তোমাদের জননীগণ!

কি কারণে কতকগুলি নারী ও বালকবালিকা এবং দরিদ্র লোকের প্রাণরক্ষা হয় নাই, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে স্ত্রীলোক এবং শিশুদের প্রাণরক্ষার চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় যে দরিদ্র লোকদিগকে বাদ দিয়া আগে লক্ষপতিদের

প্রাণরক্ষার কোন চেষ্টা হয় নাই, অজ্ঞাতনামা, যশোহীন লোকদিগকে বাদ দিয়া বিখ্যাত লোকদের প্রাণ রক্ষার কোন চেষ্টা হয় নাই। অনেক নারীকে জোর করিয়া তাঁহাদের স্বামীদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবনতরীতে ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল, অনেক নারীকে স্বামিসঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল; তাঁহারা স্বামীর সঙ্গে সমুদ্রগর্ভে প্রাণত্যাগ করিয়া জগতে সতীধর্ম্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কর্ণেল আষ্টরের মত ক্রোড়পতি অনেক গরিব লোককে, অনেক সদ্যবিবাহিতা বধূকে জীবনতরীতে তুলিয়া দিয়া, নিজে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিলেন। তাঁহারা বিলাসসুখ ভোগে অভ্যস্ত, ভোগের কোন বস্তু তাঁহাদের আয়ত্তের বহির্ভূত ছিল না, কিন্তু তাঁহারা আসন্ন মৃত্যুতে ভীত হইলেন না, নিজের প্রাণ বাঁচাইতে ব্যস্ত হইলেন না, অন্যের প্রাণরক্ষাতেই জীবনের শেষ মুহূর্ত্তগুলি ক্ষেপণ করিলেন। ষ্টেড্ সাহেবের মত ভুবনবিখ্যাত কর্ম্মবীর, পাছে জীবনতরীতে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইলে আর একজন সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়, সম্ভবতঃ এই কারণেই অপর অনেকের প্রাণরক্ষাকার্য্যে সাহায্য করিয়া, শেষে নির্ব্বিকার চিত্তে নিজ কক্ষে গিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জাহাজের কাপ্তেন অবিচলিত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য করিতে করিতে, এক ঢেউ খাইয়া পড়িয়া গিয়া আবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া যাত্রীদের প্রাণরক্ষায় সচেষ্ট হইলেন। পরক্ষণেই আর এক ঢেউ তাঁহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল! বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের কর্ম্মচারীকে যখন কাপ্তেন বলিলেন, তুমি নিজ কর্ত্তব্য করিয়াছ, এখন আত্মরক্ষা কর, তখন জাহাজের উপর সমুদ্রের জল উঠিয়াছে, সমুদ্রের ঢেউ খেলিতেছে; তখনও যুবক নিজের কর্ত্তব্য করিতেছেন! কাপ্তেন মরিবার সময়ও মাঝিমাল্লাদিগকে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"তোমরা ব্রিটিশ হও," অর্থাৎ ব্রিটিশ জাতি যেমন আত্মোৎসর্গপরায়ণ বীর হয়, তাহাই হও।

মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া যে আত্মহারা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় সে মানুষ নামের অযোগ্য; যে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, সে উচ্চতর শ্রেণীর অধিকারী; যে গত্যন্তর নাই জানিয়া স্থির চিত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করে, সে মানুষ নামকে কলঙ্কিত করে না। কিন্তু মানুষের মত মানুষ তিনি যিনি মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, নিরুদ্বেগ থাকেন, এবং আপনার কথা না ভাবিয়া অপরের প্রাণরক্ষার জন্যই ব্যস্ত হন।

শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে বলিয়াছেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাগুলি দ্বারা আরও ভাল কাজ হইতে পারে, যদি আরও অধিক সংখ্যক স্বাধীনচেতা, যোগ্য ও অবসরবিশিষ্ট লোক সভ্য হন। তাঁহার মতে এরূপ স্বাধীনচেতা, যোগ্য লোকের অভাব নাই। কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ব্যবসার জন্য, এই কাজে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। তাঁহারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্ব সাধারণের হিতার্থে ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যে সমস্ত সময় যদি নিয়োগ করেন, তাহা হইলে খুব ভাল কাজ হয়।

ইহা অতি সত্য কথা। দুকূল রক্ষা, কোন কাজেই, কোন কালেই হয় না।

পিতৃস্মৃতি

(৩)

পিতামহ প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বেলগাছিয়ার বাগান য়ুরোপের ধনীদের প্রমোদকাননের অনুকরণে সাজাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। বহুমূল্য ছবি, মূর্ত্তি, গৃহসজ্জা এবং ঝিল, কৃত্রিম পাহাড় ও চিড়িয়াখানায় তাহার সমতুল্য বাগান কলিকাতায় বোধ হয় আর ছিল না। এই বাগানে প্রতি শনিবার রাত্রে পিতামহ শহরের বড় বড় সাহেব মেমদের ভোজ দিতেন, অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুও গোপনে তাহার ভাগ লইয়া যাইতেন। তখনকার কাগজে বিদ্রূপ করিয়া একটা কবিতা বাহির হইয়াছিল তাহার এক অংশ আমার মনে আছে:—

"বেলগেছের বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝন্‌ঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা আমরা কি জানি!
জানেন ঠাকুর কোম্পানি।"

পিতামহের মৃত্যুর পরে এই বাগানে মেজকাকা এবং কাকীমা প্রায় থাকিতেন। তখন আমরা সেখানে এক-একদিন বেড়াইতে যাইতাম। সেখানে সেই ঝিলের মধ্যে

পদ্মবন ও চিড়িয়াখানায় পশু পাখী আমার স্বপ্নের মত মনে পড়ে।

কিন্তু পিতৃদেব এই বাগানের জাঁকজমকের মধ্যে থাকিতে ভালবাসিতেন না। পলতায় গঙ্গার ধারে একটা বাগান ছিল। সেটা একটা বৃহৎ আম্রবন। সেখানে সাজসজ্জা কিছুই ছিল না, কেবল সামান্য একটি ছোট বাড়ি ছিল। সেই আমবাগানে গিয়া তিনি প্রায় থাকিতেন। গ্রীষ্মের সময় সেখানে তিনি বন্ধুবান্ধবদের লইয়া গঙ্গায় স্নান করিতেন ও গাছ হইতে আম পাড়িয়া খাইতেন ও খাওয়াইতেন। ঐশ্বর্য্যভোগ তাঁহার মনের সঙ্গে মিলিত না, অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যভোগেই তাঁহার আনন্দ ছিল।

পিতামহ দ্বিতীয়বার বিলাতে যাওয়ার পর বেলগেছের বাগানে সাহেবের ভোজ বন্ধ হইয়া গেল। তখন শহরের অনেক খানালোলুপ সম্ভ্রান্ত লোক পিতার ডিনার টেবিল আশ্রয় করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেন এবং জাতি বজায় রাখিয়া চলিতেন। যখন য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে অকস্মাৎ ঋণ-সমুদ্রের মধ্যে পড়িতে হইল তখন এক রাত্রেই পিতা ডিনারের সমারোহ বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজনারায়ণ বাবু প্রায় তাঁহার সঙ্গে খাইতেন। সেদিন তিনি আসিয়া দেখিলেন টেবিলে ডাল রুটি ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, এই খাইয়া আপনার চলিবে কি করিয়া? পিতা কহিলেন, ঈশ্বর যখন যে অবস্থার মধ্যে ফেলেন তখন সেই অবস্থার মত চলিতে পারিলে তবেই সব ঠিক চলে। এখন হইতে পিতা সংসারের সকল প্রকার খরচ সম্বন্ধেই অত্যন্ত টানাটানি করিয়া চলিতে লাগিলেন—পুরাতন চাল বজায় রাখিয়া লোকসমাজে অভিমান বাঁচাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না—এবং পিতামহ তাঁহার উইলে দরিদ্র অন্ধদের সাহায্যের জন্য যে লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ শোধ করিয়া দিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তিনি সামান্য পরিমাণ দেনাকেও অত্যন্ত ভয় করিতেন। তাঁহার ছেলেরা কেহ ঋণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্যের জন্য ধরিলে তিনি বলিতেন আমি কি চিরজীবন কেবল ঋণ শোধই করিব? সীতানাথ ঘোষ মহাশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া যখন তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষা চাহিতে গিয়াছিলেন তখন তিনি এককালে সাত হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন—ঋণের দুঃখ যে কত বড় তাহা তিনি জানিতেন বলিয়াই ঋণীর প্রতি তাঁহার সমবেদনা এত প্রবল ছিল।

পিতৃদেব ছোট বড় সকল কাজেই শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার নিজের আহার নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত কাজই ঘড়ি ধরিয়া সম্পন্ন হইত। তিনি যখন পাহাড়ে ছিলেন আমাদের বাড়িতে বাঙালী ঘরের প্রচলিত নিয়ম অর্থাৎ অনিয়ম অনুসারে নিত্যকর্ম্মে সময়রক্ষার কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সেইসমস্ত বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য বাড়িতে ঘণ্টা বাজাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইবার জন্য ছয়টার ঘণ্টা বাজিত। দালানে গিয়া প্রাত্যহিক উপাসনায় যোগ দিবার জন্য সাতটার ঘণ্টার আহ্বান পড়িত। স্নান করিবার সময় জানাইতে বেলা দশটার সময় ঘণ্টা বাজিত। সেই সময়ে কাছারির কর্ম্মচারীরা আসিয়া কাজে নিযুক্ত হইত। মধ্যাহ্নে বারোটার ঘণ্টায় আমাদের আহারের সময় জ্ঞাপন করিত। চারিটার ঘণ্টায় জানা যাইত এইবার ছেলেরা স্কুল হইতে আসিয়া আহারাদি করিবে। পাঁচটার সময় কাছারি বন্ধ হইত। অবশেষে রাত্রি দশটার ঘণ্টায় শয়নের জন্য ডাক পড়িত। এইরূপে পরিবারিক কর্ম্মের তালটি বেতালা হইয়া না দাঁড়ায় সেই জন্য তিনি এইরূপ তালরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ভৃত্যদের মধ্যেও কর্ম্মবিভাগ ছিল। যাহার প্রতি যে কর্ম্মের ভার থাকিত, কেবল সেইটের সম্বন্ধেই তাহার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ছিল। এলোমেলো দায়িত্ববিহীন ভাবে কাজ হইবার জো ছিল না।

কোনো বিষয়ে তিনি কোনোপ্রকার অপব্যয় ভালবাসিতেন না। কারণ, অপব্যয় একটা প্রধান অব্যবস্থা, এবং অব্যবস্থা মাত্রই তাঁহার কাছে কুৎসিত ঠেকিত; সেইসমস্ত শৈথিল্যে জীবনযাত্রার যে ছন্দভঙ্গ করে তাহা তাঁহার কাছে পীড়াজনক ছিল। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন বৎসরে আমাদের যে কয় জোড়া কাপড় বরাদ্দ ছিল তাহা পুরাতন হইলে সেই পুরাতন কাপড় সরকারকে দেখাইয়া তবে আমরা নূতন কাপড় পাইতাম। এমন কি পুরাতন সাবানের টুক্‌রা সরকারকে না দিয়া

আমরা নূতন সাবান পাইতাম না। তখনকার কালের প্রথামত পাতলা শাড়ি পরিবার হুকুম আমাদের ছিল না। আমাদের জন্য বিশেষ করিয়া ফরমাস দিয়া ফরাসডাঙ্গা হইতে কাপড় তৈরি করাইয়া আনা হইত। জমকালো জরিজড়াও কাপড়ের বিলাসিতা পিতা পছন্দ করিতেন না—ভদ্রতারক্ষার উপযোগী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজই তাঁহার মনঃপূত ছিল। পিতামহের আমলে পূজার সময় বৎসরে বৎসরে ছেলে মেয়ে ও বধূরা খুব দামী দামী জরি দেওয়া কাপড় পাইতেন। দুই তিন মাস আগে হইতে বাড়িতে দর্জ্জি কাজ করিতে বসিয়া যাইত। প্রত্যেক ছেলের জরির টুপি, একটি সুট চাপকান ইজার ও একখানি রেশমী রুমাল প্রতিবৎসর বরাদ্দ ছিল। পিতামহের মৃত্যুর পরেও এই বরাদ্দ কিছু কাল চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর পিতার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না বলিয়া এসকল প্রথা অধিককাল টিঁকিতে পারে নাই। অথচ যাহা যথার্থ আবশ্যক তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছিল। তখন শীতকালে গায়ে গরম কাপড় পরার রীতি মেয়েদের মধ্যে ছিল না, আমরা পাতলা কাপড় পরিয়াই শীত যাপন করিতাম। মিশনরি মেমরা শীতের সময় আমাদের সেই পাতলা কাপড় পরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইত—তাহারা বলিত, তোমাদের কি শীত করে না? পিতা আমাদের জন্য রেশমের রেজাই তৈরি করাইয়া দিলেন। কিন্তু এমনি আমাদের অভ্যাস, সে রেজাই আমরা পরিতে পারিতাম না, গরম হইত, খুলিয়া ফেলিতাম। একবার শীতে আমাদের জন্য শালের জামিয়ার তৈরি করাইয়া দিলেন—কিন্তু সেও আমরা গায়ে দিতে পারিতাম না। তাহার পরে জামার ব্যবস্থা হইল। মা একবার আমার ছোট দুই ভগিনীর নাক বিঁধাইয়া দিয়া বলিলেন, যাও, কর্ত্তাকে দেখাইয়া নোলক চাহিয়া আন। তিনি নাক বেঁধান দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, এ কি সং সাজিয়াছ! যাও যাও খুলিয়া ফেল! বন্য বর্ব্বররাই ত নাক কান ফুঁড়িয়া গহনা পরে—এ কি ভদ্রসমাজের যোগ্য! মা তাহাই শুনিয়া লজ্জায় মেয়েদের নোলক পরাইবার সাধ মন হইতে দূর করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীতে মেয়েদের কর্ণবেধের সময় সমারোহপূর্ব্বক মেয়েদের ডাকিয়া খাওয়ানো হইত। এই কান বিঁধাইবার উৎসব পিতা উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের বাড়িতে যখন দুর্গোৎসব ছিল ছেলেরা বিজয়ার দিনে নূতন পোষাক পরিয়া প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত - আমরা মেয়েরা সেই দিন তেতালার ছাদে উঠিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিতাম। তখন বৎসরের মধ্যে সেই একদিন আমরা তেতালার ছাদে উঠিবার স্বাধীনতা পাইতাম। তখন বন্ধন এমন কঠিন ছিল যে পুরাতন চাকর ছাড়া বাহিরের অন্য কোন পুরুষ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইত না। মেজদাদা সেই বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি যে দিন সিভিলসার্ভিসের জন্য বিলাতে যাত্রা করিবেন সেই রাত্রে আমাদের অন্তঃপুরের উপাসনা-ঘরে আমরা পরিবারের সকলে মিলিয়া উপাসনা করিয়াছিলাম। সেই উপাসনা-সভায় কেশব বাবু যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমাদের সকলের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাহার পর মেজদাদা সিভিলিয়ান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেজদাদা সিংহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। ছেলেবেলা হইতেই মেজদাদা অবরোধ-প্রথার বিরোধী ছিলেন, বিলাত হইতে ফিরিয়া তাঁহার উৎসাহ আরো প্রবল হইয়া উঠিল। মেজবৌঠাকুরাণী স্বভাবতই অত্যন্ত বেশি লজ্জাবতী ছিলেন; তাঁহার সেই চিরদিনের সঙ্কোচ দূর করিয়া দেওয়াই মেজদাদার বিশেষ অধ্যবসায় হইল। বাড়ির ছেলেমেয়েরা সকলে একসঙ্গে বসিয়া খাইবে মেজদাদার এই ইচ্ছা জানিতে পারিয়া পিতৃদেব একটি বড় ঘরে খাইবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের সকলের একত্রে খাওয়া নিয়ম করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম আমরা লজ্জায় খাইতেই পারিতাম না—অল্প কিছু মুখে দিয়া বসিয়া থাকিতাম, ক্রমে ক্রমে আমাদের লজ্জা ভাঙিল। মেজবৌঠাকুরাণীই বম্বাই ধরণের শাড়ি পরা আমাদের মেয়েদের মধ্যে প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

আমাদের বাড়িতে নাচ বা সুরুচিবিরুদ্ধ যাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদে পিতৃদেব কোনো দিন বাধা দেন নাই। বাড়ির ছেলেমেয়েরা মিলিয়া আপনা আপনির মধ্যে অভিনয় করিবার

উদ্দেশ্যে বাহিরের বড় ঘরে ষ্টেজ বাঁধিবার জন্য যখন তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইল, তখন আমাদের মনে আশঙ্কা ছিল, কি জানি পাছে তিনি বিরক্ত হন। তিনি সম্মতি প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলে পর সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন। একবার এইরূপ পারিবারিক অভিনয় দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে যখন দেখা করিতে গেলাম তিনি আমাকে সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার একটি নাৎবৌ পুরুষ সাজিয়াছিলেন ও সেই সজ্জায় তাঁহাকে সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল শুনিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রতিপালিত আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কতবার কত অপরাধই করিয়াছে, সেসমস্ত তিনি গম্ভীরভাবে সহ্য করিয়াছেন। বাহির হইতে বল-পূর্ব্বক কাহাকেও কোন বিষয়ে প্রতিরোধ করা তাঁহার স্বভাবসঙ্গত ছিল না। যে আদর্শ অন্তরের মধ্যে থাকিয়া মানুষকে সত্যভাবে নিয়মিত করে তাহারই প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কৃত্রিম উপাসনাপ্রথা যেমন তিনি পরিহার করিয়াছিলেন কৃত্রিম শাসনপ্রথা তেমনি তাঁহার রুচিকর ছিল না। অথচ তিনি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সহিষ্ণুতা অক্ষমের দুর্ব্বল সহিষ্ণুতা নহে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তাঁহার ক্ষমতার কোথাও কোনো ব্যাঘাতের কারণ ছিল না, তাঁহারই প্রসাদের উপর সকলের নির্ভর ছিল; তাঁহাকে সকলে যথেষ্ট ভয়ও করিত। তিনি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার অনভিপ্রেত সকল কর্ম্মকেই অনায়াসে সম্পূর্ণ নিরস্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্ম্মের বল ছাড়া অন্য বলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল না, এই জন্য তিনি নিজের শুভইচ্ছা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য অন্যের শুভবুদ্ধির অপেক্ষা করিতেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে দেশের ধর্ম্ম ও সমাজনীতির প্রতি যখন শিক্ষিত লোকের অশ্রদ্ধা সঞ্চার হইয়াছিল তখন অনেক ভদ্র হিন্দুঘরের ছেলে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমাদেরই কোনো আত্মীয় যুবক এইরূপে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আমার পিতা স্বয়ং গিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইয়া পুনরায় তাহার মতি ফিরাইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার উপদেশে দৃষ্টান্তে ও ধর্ম্মোৎসাহে যে তখনকার অনেক যুবকের দ্বিধা দূর করিয়াছিল ও স্বদেশীয় ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার হিন্দুসমাজের যেখানে দুর্গতির কারণ আছে সেখানেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। একদিন আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমাদিগকে আমি ব্যবসায়ী গুরুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছি। যাহারা অর্থলোলুপ হইয়া ধর্ম্মকে পণ্যরূপে ব্যবহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, মন্ত্র পড়ায় কিন্তু মন্ত্রের অর্থই জানে না, শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি যাহাদের কোনো লক্ষ্যই নাই, তাহাদিগকে ভক্তি করিয়া ভক্তির অবমাননা করা হইতে আমি তোমা-দিগকে উদ্ধার করিয়াছি।

স্ত্রীলোকদিগকে তিনি বিশেষভাবে সম্মান করিতেন। যে কোনো মহিলা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন সকলকেই মাতৃসম্বোধন করিয়া অত্যন্ত যত্ন আদর করিতেন। তাঁহারা যে যেমন কথা শুনিতে আসিতেন সকলকে তাহা বুঝাইয়া বলিয়া সকলের হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিতেন। একবার আমি কোনো আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন তুমি সেখানে গেলে তিনি কি করিতেছিলেন? আমি বলিলাম, তিনি শুইয়া ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন না? আমি বলিলাম, না। তাহাতে তিনি বিষণ্ণ হইলেন। সেই আত্মীয়টি স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই বলিয়াই পিতার মনে ক্ষোভ জন্মিল।

শ্রীসৌদামিনী দেবী।

হেমকণা

(১)

আমার নবযৌবন দেখিয়া বা নবীন রাজমুদ্রা দেখিয়া ভাবিও না যে আমি গত বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি যদি তোমাকে এখন বলি যে আমি তোমা অপেক্ষা প্রাচীন, তোমাদিগের অতি বৃদ্ধ অপেক্ষাও প্রাচীন, তাহা

হইলে তুমি বিশ্বাস করিবে না, হাসিবে, বলিবে নবীন যৌবনে মস্তিষ্কবিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে। যদি সমস্ত কথা বলি তাহা হইলে হয়ত উহা উন্মাদের প্রলাপ হইবে। তুমি ভাবিবে যে আমার উজ্জ্বল হেমকান্তি, সুগঠিত দেহ, তাহার উপর সুন্দর রাজমুদ্রা আমার নবীনত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, রাজমুদ্রার তারিখে আমার জন্মপত্রিকা রহিয়াছে, সুতরাং আমার বয়স সম্বন্ধে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। আমি বলিব তুমি বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিয়াছ, অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছ না। গত বৎসর আমি নূতন অবয়ব পাইয়াছি মাত্র, যে রাজমুদ্রা আমার নবীন যৌবনের কারণ তাহা গত বৎসর জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি বহু প্রাচীন, এমন কি তোমাদিগের মানবজাতি অপেক্ষাও প্রাচীন। তুমি যদি বিশ্বাস কর তাহা হইলে আমার জন্মকথা বলি, তুমি শুনিয়া যাও।

অনেক দিন পূর্ব্বে দিন, মাস, বৎসর, কাল প্রভৃতি নামকরণ হইবার বহু পূর্ব্বে, ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করিলাম। জন্মের পরে বহুকাল অস্তিত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কিছু বোধ করিতে পারিতাম না, চারিদিকে নিশ্চলতা ও অন্ধকার আমাকে বেষ্টন করিয়া ছিল। যুগব্যাপী নিশ্চলতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুযুগ তদবস্থ ছিলাম। আমার পার্শ্ববর্ত্তী কণাসমূহের মুখে শুনিতাম, দূরে বহুদূরে কণাসমূহ আলোক দেখিতে পায়; যাহাদিগকে আলোক স্পর্শ করিয়াছে তাহারা জল, বায়ু প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দেখিতে ও স্পর্শ করিতে পায়। তাহারা বলে যে দূরে কণাসমূহের উপর দিয়া একটী ক্ষুদ্র জলস্রোত বহিয়া যায়। প্রতিদিন শত শত কণা জলের স্রোতে ভাসিয়া যায়। যে পাষাণ মধ্যে কণাসমূহ আবদ্ধ আছে তাহার বিশাল বক্ষের উপর দিয়া নির্ম্মলসলিলা নির্ঝরিণী দ্রুতগমনকালে ঘর্ষণে তাহাকে ক্ষয় করিয়া থাকে ও প্রতিদিন শত শত কণাকে কারামুক্ত করিয়া দেয়। পাষাণে ছিদ্র পাইলেই তাহার মধ্যে জল প্রবেশ করে ও সমগ্র পাষাণকে স্নিগ্ধ ও শীতল করিয়া রাখে। মধ্যে মধ্যে স্রোতস্বিনী কঠিন স্বচ্ছ পদার্থে পরিণত হয়, তখন আর আমাদিগের কারামুক্তি হয় না। বহু দিবস, বহু রজনী নির্ম্মল জলরাশি স্বচ্ছ তুষার মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। ইহাতে আমাদিগের একটী মহদুপকার সাধিত হইত। পাষাণের মধ্যে ছিদ্রপথে যে যে স্থানে জল প্রবেশ করিত তাহাও এই সময়ে তুষারে পরিণত হইত, জলকণাগুলি তুষারকণায় পরিণত হইবার সময়ে আকারে বর্দ্ধিত হইত ও সেই সময়ে কঠিন পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ইহাতে আমাদিগের বড়ই আনন্দ হইত, যে নিষ্ঠুর পাষাণ আমাদিগকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া রাখিত, যাহাতে আবদ্ধ হইয়া আমরা চির অন্ধকার মধ্যে অসহায় অবস্থায় পতিত ছিলাম, তাহাও ক্ষুদ্র জলকণার শক্তিতে শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এইরূপে আমরা ক্রমশঃ আলোকের নিকটে আসিতাম, কারণ যখন তুষার গলিয়া যাইত, সূর্য্যোত্তাপে হিমরাশি জলস্রোতে পরিণত হইত, তখন অর্দ্ধগলিত চূর্ণীকৃত তুষারখণ্ডের সহিত বিদীর্ণ পাষাণখণ্ডগুলি মহাশব্দে নিম্নাভিমুখে গমন করিত, জলস্রোত ক্রমশঃ আমাদিগের নিকট সরিয়া আসিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমাদিগেরও মুক্তির দিন অগ্রসর হইতেছিল।

একদিন ক্ষুদ্র বৃহৎ শত সহস্র পাষাণখণ্ডের পতনে আমার মস্তকের নিকট পর্য্যন্ত একটী ক্ষীণ ছিদ্র হইল; তাহার পর ধীরে ধীরে ছিদ্রপথে জলকণার পর জলকণা প্রবেশ করিতে লাগিল; একটী জলকণা আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিল, তাহার কোমল শীতল স্পর্শ আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিল; আমি আজীবন কঠিন পাষাণের মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম, জলকণার ন্যায় কোমল পদার্থ কখনও দেখি নাই বা স্পর্শ করি নাই, সুতরাং আমি অতি সহজেই মুগ্ধ হইলাম।

জলকণা কত কথা কহিত। সে বলিত, তারকামণ্ডিত নীল আকাশে শুভ্র মেঘপুঞ্জের মধ্যে তাহার জন্ম হইয়াছিল, তাহার জন্মের দিন শুভ্র মেঘপুঞ্জ নীলাকাশে স্তূপীকৃত হইয়াছিল, ইন্দ্রধনু শুভ্র স্তূপকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল, ইন্দ্রের বজ্রের আলোক নীল লোহিত আভায় জগৎ উজ্জ্বল করিয়াছিল, জন্ম হইবামাত্র সে সহস্র সহস্র বারিকণার সহিত স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মর্ত্ত্যে আসিয়া সমস্ত জলকণা একত্র হইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে বেগে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতেছিল। পথে বেগসম্বরণ করিতে না পারিয়া সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়াছে। জলকণা অনেক দিন আমার মস্তকের পার্শ্বে ছিল, সে কত কথা কহিত। আমাদিগের উপরে পর্ব্বত-শৃঙ্গে লক্ষ লক্ষ বৎসরের তুষার সঞ্চিত আছে, তুষারের ভার অধিক হইলে কিয়দংশ পর্ব্বতস্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া নিম্নাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করে। পর্ব্বতের পার্শ্বে একটী তুষারের নদ আছে, সে স্থানে তরুলতা বা জীবজন্তু কিছুই নাই। বহু নিম্নে আসিয়া তুষারময় নদ নির্ঝরিণীতে পরিণত হইয়াছে, যে স্থানে তুষার গলিতেছে সে স্থানে শত শত তরুলতা জন্মগ্রহণ করিয়া স্থানটীকে উদ্যানে পরিণত করিয়াছে। পর্ব্বতের পার্শ্বে একটী গভীর ক্ষত আছে, স্থানটী অতি রমণীয়, ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত বৃক্ষ ক্ষতস্থান পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, প্রতিদিন সহস্র সহস্র বৃক্ষে ও লতায় নানা বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া ক্ষুদ্র বনটীকে সুসজ্জিত করিয়া রাখে। পর্ব্বতস্কন্ধ হইতে রজতধারা নির্গত হইয়া অবিরাম পর্ব্বতের সানুদেশে যে পাষাণখণ্ডে আমরা আবদ্ধ আছি তাহার উপর নিপতিত হইতেছে, শত শত জলকণা পথচ্যুত হইয়া কাননটিকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জলরাশি পতনের শব্দ বহুদুর হইতে শ্রুত হয়, ভয়ে রজনীতে কোন জীবজন্তু নির্ঝরিণীর নিকট আসে না। সময়ে সময়ে নির্ঝরিণী তুষারে পরিণত হয়, জলরাশি তুষার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গগনস্পর্শী স্ফটিকস্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে, তরুলতা পত্রশূন্য হইয়া যায় ও রমণীয় কানন মরুভূমিতে পরিণত হয়। জলকণা আরও বলিত যে আমি অধিক দিন এখানে থাকিব না, আমাকে লইয়া যাইতে মেঘরাজ্যের শত শত জলকণা প্রতি দিন আসিতেছে, তাহারা যে দিন তুষারে পরিণত হইবে সে দিন আমিও তুষারে পরিণত হইব, তাহার পর একত্র হইয়া চলিয়া যাইব। আমরা ভাবিতাম সে দিন আসিলে আমরাও বন্ধনমুক্ত হইব।

দিন আসিল, জলকণা স্ফীত হইতে লাগিল, ক্রমে স্বচ্ছ কোমল জলকণা ধূসরবর্ণ কঠিন তুষারে পরিণত হইল। সেই সময়ে পাষাণের শত ছিদ্রে শত শত জলকণা তুষারে পরিণত হইয়া আকারে বর্দ্ধিত হইল, সহসা ভীষণ শব্দের সহিত পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। হঠাৎ কোথা হইতে উজ্জল আলোক আসিয়া আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দিল, অনুমানে বুঝিলাম আমরা মুক্ত হইতে চলিয়াছি। তখনও জলরাশি তুষার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নিশ্চল রহিয়াছে, উজ্জল আলোক শুভ্র তুষারে প্রতিফলিত হইয়া হেম-আভায় দিগন্ত প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে, চতুর্দ্দিকে মহা শান্তি বিরাজিত।

একদিন দূর হইতে শ্বেতবর্ণের একটী ক্ষুদ্র পক্ষী উড়িয়া আসিল, তাহা দেখিয়া আমার প্রতিবেশীরা কহিল যে এইবার বসন্ত আসিতেছে, জলরাশি মুক্ত হইয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিবে, কানন পুনরায় পত্রপুষ্পে শোভিত হইবে। তাহার সহিত আমরাও চলিতে আরম্ভ করিব, আমাদিগের কারাগৃহের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইয়াছে, পুরতান স্থান পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেখিতে হইবে, প্রতিদিন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবাসী-বাঙ্গালী

ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত জাঠাগ্রামের জমিদার, পণ্ডিত রাধাকান্ত শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহোদর বাবু গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য, সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে হইতে এলাহাবাদ-প্রবাসে ছিলেন। তিনি তথায় সেক্রেটারিএটে কর্ম্ম করিতেন। শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র বাবু কুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেই সূত্রে বাল্যকালেই প্রয়াগ-প্রবাসে আসিয়াছিলেন। এখানে এবং আগ্রায় তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। লক্ষৌএর গবর্ণমেণ্ট-এডভোকেট প্রসিদ্ধ প্রবাসী-বাঙ্গালী পরলোকগত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু, এম-এ, মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কুমারচন্দ্র বাবু শীঘ্রই কলেজ ত্যাগ করিয়া একটী এণ্ট্রান্স স্কুলের হেডমাষ্টার হন এবং অল্পদিন পরেই অযোধ্যার অন্তর্গত প্রতাপগড়ের রাজা চিৎপাল সিং (এফ, সি, এস্) মহাশয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এই কার্য্য করিবার কালে কুমারচন্দ্র বাবু গৃহে আইন অধ্যয়ন করিতে থাকেন এবং অল্পকালের মধ্যে হাইকোর্ট প্লীডারশিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতাপগড় জেলা আদালতে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী জেলা খেরীতে গিয়া বাস করেন। খেরীর আদালত আপিস প্রভৃতি সমস্ত ইহার প্রধান শহর লখীমপুরে অবস্থিত। "আউধ-রোহিলখণ্ড" রেলপথে এখানে আসিতে হয়। জেলাটী ক্ষুদ্র, শিক্ষা সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে এস্থান এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে; কুমারচন্দ্র বাবুর আগমন কালে ত নিতান্তই অনুন্নত ছিল। ১৫।১৬ বৎসর এখানে চিনির কারখানা, কাগজ, মাদুর, চাটাই প্রভৃতি প্রস্তুত করণোপযোগী ঘাসের কারবার, ও কৃষি, গবাদি পশুপালন ও বৃদ্ধি এবং বন বিভাগীয় কর্ম্মের সূত্রপাত হওয়ায় ইহার উন্নতিলক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইলেও তখন ইহা নিবিড়বনজঙ্গলপরিপূর্ণ ও হিংস্রজন্তুসমাকুল ছিল। যদিও সেই সময় জঙ্গল হইতে শালকাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত এবং এখনও তাহার বিস্তৃত ব্যবসায় রহিয়াছে, তথাপি সেখানে প্রবাসী বাঙ্গালীর আকর্ষণের বস্তু বিশেষ কিছুই ছিল না। এই কারণে সময়ে সময়ে

প্রথানকার উৎকৃষ্ট আবাদী জমি নাম মাত্র খাজনায় পাওয়া যায় দেখিয়া বহু পূর্ব্ব হইতে কোন কোন বাঙ্গালী এখানে ভূসম্পত্তি করিয়া স্থায়ী বাস স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াও কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একমাত্র কুমারচন্দ্র বাবুই এখানে প্রথম স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। স্থানীয় আদালতে তাঁহার প্রসার বৃদ্ধি ও প্রখ্যাতি, জনসাধারণের মধ্যে সম্ভ্রম প্রতিপত্তি এবং স্থানীয় ভূস্বত্তালুকের তালুকদারদিগের সহিত সৌহৃদ্যই তাঁহার পক্ষে প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল এবং তাহাই তাঁহার খেরী-প্রবাসের মূল। তিনি যখন লখীমপুরে আগমন করেন, তখন এখানে বাবু প্রসাদী নারায়ণ নামে জনৈক ডেপুটী পোষ্ট-মাষ্টার ছিলেন। তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিশ্বস্ত ডাকপেয়াদাদিগের দ্বারা গোপনে বিপন্ন রাজপুরুষদিগের নিকট বিদ্রোহিগণের গতিবিধির সংবাদ প্রেরণ করিতেন। দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ "রঞ্জীৎনগর" জমিদারী দান করেন। কুমারচন্দ্র বাবু তাঁহার নিকট হইতে এই জমিদারী ক্রয় করিয়া স্থানীয় জমিদারগণের অন্যতম হইয়াছিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর সুযশের সহিত ওকালতী করিয়া ১৮৯৯ অব্দে কুমারচন্দ্র বাবু পরলোক গমন করেন। তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র তখন রঞ্জীৎনগরের জমিদারী বিক্রয় করিয়া সপরিবারে প্রবাসবাস উঠাইয়া স্বীয় ভ্রাতাদিগের নিকট পূর্ব্ববঙ্গের আদি বাসস্থানে চলিয়া যান। প্রবাসী কুমারচন্দ্র বাবুর স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকা মাত্র এক্ষণে লখীমপুরে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম তথায় জনৈক স্থানীয় উকীল ভাড়া ছিলেন। আর কোন বাঙ্গালী এখানে স্থায়ী অধিবাসী হন নাই বটে, কিন্তু রেল ও গবর্ণমেণ্টের বিবিধ বিভাগে কর্ম্ম লইয়া বহু বাঙ্গালী মধ্যে মধ্যে খেরী লখীমপুরে প্রবাসবাস করিয়া যান। তন্মধ্যে চিকিৎসা বিভাগেই তাঁহাদের আবির্ভাব কিছু ঘন ঘন। কুমারচন্দ্র বাবু এখানে ওকালতী করিতে আসিয়া একজন বাঙ্গালী ডাক্তারকে দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার বেণীমাধব দাস বহুকাল সিভিল মেডিকেল অফিসরের কর্ম্ম করিয়া ডাক্তার বিনোদবিহারী ঘোষকে কার্য্যভার দিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। বিনোদ বাবুর পর ডাক্তার বনমালী পাল সিভিল মেডিকেল অফিসর হইয়া আসিয়া সাত বৎসর খেরী-প্রবাসে অবস্থিতি করেন এবং ১৮৯৯ অব্দে কুমারচন্দ্র বাবুর মৃত্যুর সময় বনমালী বাবু স্থানান্তরে গমন করিলে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আগমন করেন। পাঁচ-বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন খেরী গিয়াছিলাম, তখনও লখীমপুর হাঁসপাতালে বাঙ্গালী ডাক্তারকেই দেখিয়াছিলাম। এবং সেই সময় দেখিয়াছিলাম খেরীজেলার অন্তর্গত 'ঝিঙিপুরুয়া" তালুকের ম্যানেজার জনৈক বাঙ্গালী। তাঁহাকে কার্য্যোপলক্ষে অধিকাংশ সময় সদরে অর্থাৎ লখীমপুরে থাকিতে হয়। তাঁহার সহিত আলাপ প্রসঙ্গেই কুমারচন্দ্র বাবুর জমিদারী লাভ ও প্রবাসবাসের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি কুমারচন্দ্র বাবুরই ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি খেরীপ্রবাসী হইয়া আছেন। খেরী জেলার অধীন "ভুর" নামে একটী তালুক আছে। তাহার বার্ষিক আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। পূর্ব্বে উহা 'মাঝগাই' ও 'জগদেবপুর' নামে দুই অংশে বিভক্ত ছিল। চৌহান রাজপুতবংশীয় রাজমিলাপ সিং ও তাঁহার ভ্রাতা রাজদিল্লীপৎ সিং তাহার অধিকারী ছিলেন। মিলাপ সিং এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিলে নিঃসন্তান দিল্লীপৎই ভুর ষ্টেটের একাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার তিনজন জ্ঞাতিভ্রাতা দেবীবক্স, রঘুবর ও মঙ্গল সিং সমান তিন অংশে উহা ভোগ করিতে থাকেন। রাজদেবীবক্স এক কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে মাজ-গাইএর তালুকদার মৃত মিলাপ সিংহের কন্যা পিতার উত্তরাধিকার স্বত্বের দাবী করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গৃহ-বিবাদসূত্রে দেবীবক্সের অন্য দুই ভ্রাতা রঘুবর সিং ও মঙ্গলসিং এই মকদ্দমার ইংরাজী কাগজপত্র পরিরক্ষণের জন্য বিপিন বাবুকে নিযুক্ত করেন। ইহার তিন বৎসর পরে দেবীবক্সের বিধবা পত্নী রাণী চন্দ্রপাল কুঁঅর মকদ্দমার অধিক অগ্রসর না হইয়া স্বামীর পরিত্যক্ত এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির পরিবর্ত্তে স্বীয় ভরণপোষণের উপযোগী বার্ষিক ৩২ হাজার টাকা আয়ের কয়েকখানি মাত্র গ্রাম লইয়াই আপোষে মকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। ঐ অংশই 'ঝিঙিপুরুয়া' তালুকের ছোট অংশ। ভুরষ্টেটের বর্ত্তমান নাম 'ঝিঙিপুরুয়া'। এই ছোট তালুক তিন জন জিলাদার বা তহশীলদারের অধীনে তিনটি চাকলা বা জিলায় বিভক্ত। কোর্ট অব ওয়ার্ডের কার্য্যপদ্ধতিতে ইহার কার্য্য পরিচালিত হয়। পূর্ব্বে অন্যান্য সামন্ত রাজ্যের ন্যায় ভুরষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী "দেওয়ান" নামে অভিহিত হইতেন। তালুক খণ্ডীকৃত হইয়া উক্ত পদে এক্ষণে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া থাকেন। রাণী চন্দ্রপালকুঁঅর সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়াই বিপিন বাবুকে স্বীয় ষ্টেটের 'ম্যানেজার' মনোনীত করিয়া খেরীর ডেপুটী কমিশনর সাহেবকে লিখিয়া পাঠান। কমিশনর বাহাদুরের নিয়োগে ১৯০৬ অব্দ হইতে বিপিনবাবু যোগ্যতার সহিত "ঝিঙিপুরুয়া" ছোট ষ্টেটের ম্যানেজারী করিতেছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

৬১ ও ৬২নং বোবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



মশাল-আলোকে।

(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি।)

Three colour blocks by U. Ray & Sons. *Kuntaline Press, Calcutta.*

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩১৯

৩য় সংখ্যা

জীবন-স্মৃতি

কারোয়ার।

ইহার পরে কিছুদিনের জন্য আমরা সদর ষ্ট্রীটের দল কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম।

কারোয়ার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ অংশে স্থিত কর্ণাটের প্রধান নগর। তাহা এলালতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমি মলয়াচলের দেশ। মেজদাদা তখন সেখানে জজ ছিলেন।

এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর এখানে নাগরীমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই। অর্দ্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্ত্তিমতী ব্যাকুলতা। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড় বড় ঝাউগাছের অরণ্য; এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূলরেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। মনে আছে একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোট নৌকায় করিয়া আমরা এই কালানদী বাহিয়া উজাইয়া চলিয়াছিলাম। এক জায়গায় তীরে নামিয়া শিবাজির একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ দেখিয়া আবার নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। নিস্তব্ধ বন পাহাড় এবং এই নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ নদীর স্রোতটির উপর জ্যোৎস্নারাত্রি ধ্যানাসনে বসিয়া চন্দ্রলোকের জাদুমন্ত্র পড়িয়া দিল। আমরা তীরে নামিয়া একজন চাষার কুটীরে বেড়া-দেওয়া পরিষ্কার নিকানো আঙিনায় গিয়া উঠিলাম। প্রাচীরের ঢালু ছায়াটির উপর দিয়া যেখানে চাঁদের আলো আড় হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে তাহাদের দাওয়াটির সামনে আসন পাতিয়া আহার করিয়া লইলাম। ফিরিবার সময় ভাঁটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

সমুদ্রের মোহানার কাছে আসিয়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়তমর্ম্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূরবিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরুশ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ, দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল। সেই রাত্রেই যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহা সুদূর প্রবাসের সেই সমুদ্রতীরের একটি বিগত রজনীর সহিত বিজড়িত। সেই স্মৃতির সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠকদের কেমন লাগিবে সন্দেহ করিয়া মোহিতবাবুর প্রকাশিত

গ্রন্থাবলীতে ইহা ছাপানো হয় নাই। কিন্তু আশা করি জীবনস্মৃতির মধ্যে তাহাকে এইখানে একটি আসন দিলে তাহার পক্ষে অনধিকারপ্রবেশ হইবে না।

যাই যাই ডুবে যাই, আরো আরো ডুবে যাই
বিহ্বল অবশ অচেতন।
কোন্ খানে কোন্ দূরে, নিশীথের কোন্ মাঝে
কোথা হয়ে যাই নিমগন।
হে ধরণী, পদতলে দিয়োনা, দিয়োনা বাধা,
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও!
অনন্ত দিবসনিশি এমনি ডুবিতে থাকি
তোমরা সুদূরে চলে যাও!
তোমরা চাহিয়া থাক, জ্যোৎস্নাঅমৃতপানে
বিহ্বল বিলীন তারাগুলি;
অপার দিগন্ত ওগো থাক এ মাথার পরে
দুই দিকে দুই পাখা তুলি!
গান নাই, কথা নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই,
নাই ঘুম নাই জাগরণ,—
কোথা কিছু নাহি জাগে, সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না লাগে,
সর্ব্বাঙ্গ পুলকে অচেতন।
অসীমে সুনীলে শূন্যে বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে,
তারে যেন দেখা নাহি যায়;
নিশীথের মাঝে শুধু মহান একাকী আমি
অতলেতে ডুবিরে কোথায়!
গাও বিশ্ব গাও তুমি সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও তব নাবিকের গান,
শতলক্ষ যাত্রী লয়ে কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান।
অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই নিবে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে—
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে মিলায়ে মিশায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

একথা এখানে বলা আবশ্যক কোনো সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভাল হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদগদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রং ফোটে ভাল। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে—কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না। শুধু কবিত্বে নয় সকলপ্রকার কারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটি নির্লিপ্ততা থাকা চাই—মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্ত্তা আছে, কর্ত্তৃত্ব তাহারি হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয় প্রতিমূর্ত্তি হয় না।

প্রকৃতির প্রতিশোধ।

এই কারোয়ারে "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্য্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে সেখানে সেই প্রত্যক্ষ-বোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কি করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-

সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাসদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর মধ্যে একদিকে যতসব পথের লোক যতসব গ্রামের নরনারী—ত'হারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দ্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্য রকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার ত মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম :—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

তখনো "আলোচনা" নাম দিয়া যে ছোট গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এককণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কিনা, এবং কাব্যহিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর স্থান কি, তাহা জানি না—কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্য্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড় একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

হ্যাদেগো নন্দরাণী—
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও—
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালের সূর্য্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকরা মাঠে যাইতেছে,—সেই সূর্য্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না,—সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে,—সেইখানেই অসীমের সাজপরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়;—সেইখানেই মাঠে ঘাটে বনে পর্ব্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দূরে নয় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য—পীতধড়া ও বনফুলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট—কেননা, সর্ব্বত্রই যাহার আনন্দ, তাহাকে কোনো বড় জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১২৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয় তখন আমার বয়স ২২ বৎসর।

ছবি ও গান।

ছবি ও গান নাম ধরিয়া আমার যে কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।

চৌরঙ্গির নিকটবর্ত্তী সার্কুলররোডের একটি বাগান-বাড়িতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানলার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ,

বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভাল লাগিত, সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মত হইত।

নানা জিনিষকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। একএকটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভাল লাগিত। সে আর কিছু নয়, একএকটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিষকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রং দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলি রং ছড়াইয়া পড়িত। তা হউক, তবু ছেলেরা যখন প্রথম রঙের বাক্স উপহার পায় তখন যেমন-তেমন করিয়া নানাপ্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া ওঠে; আমিও সেইদিন নবযৌবনের নানান্ রঙের বাক্সটা নূতন পাইয়া আপন মনে কেবলি রকম-বেরকম ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশ বছর বয়সের সঙ্গে এই ছবিগুলাকে আজ মিলাইয়া দেখিলে হয়ত ইহাদের কাচা লাইন ও ঝাপ্সা রঙের ভিতর দিয়াও একটা কিছু চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি প্রভাতসঙ্গীতে একটা পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। ছবি ও গান হইতে পালাটা আবার আর একরকম করিয়া সুরু হইল। একটা জিনিষের আরম্ভের আয়োজনে বিস্তর বাহুল্য থাকে। কাজ যত অগ্রসর হইতে থাকে তত সেসমস্ত সরিয়া পড়ে। এই নূতন পালার প্রথমের দিকে বোধ করি বিস্তর বাজে জিনিষ আছে। সেগুলি যদি গাছের পাতা হইত তবে নিশ্চয় ঝরিয়া যাইত। কিন্তু বইয়ের পাতা ত অত সহজে ঝরে না, তাহার দিন ফুরাইলেও সে টিঁকিয়া থাকে। নিতান্ত সামান্য জিনিষকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই "ছবি ও গান"-এ আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন শাদা কথাকেও গভীর করিয়া তোলে তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা ছবি ও গান-এ ফুটিয়াছে। না, ঠিক তাহা নহে। নিজের মনের তারটা যখন সুরে বাঁধা থাকে তখন বিশ্বসঙ্গীতের ঝঙ্কার সকল জায়গা হইতে উঠিয়াই তাহাতে অনুরণন তোলে। সেদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরে কিছুই তুচ্ছ ছিল না। একএকদিন হঠাৎ যাহা চোখে পড়িত দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার প্রাণের একটা সুর মিলিতেছে। ছোট শিশু যেমন ধূলা বালি ঝিনুক শামুক যাহা খুসি তাহাই লইয়া খেলিতে পারে কেননা তাহার মনের ভিতরেই খেলা জাগিতেছে; সে আপনার অন্তরের খেলার আনন্দ দ্বারা জগতের আনন্দ-খেলাকে সত্যভাবেই আবিষ্কার করিতে পারে, এই জন্য সর্ব্বত্রই তাহার আয়োজন; তেমনি অন্তরের মধ্যে যেদিন আমাদের যৌবনের গান নানা সুরে ভরিয়া উঠে তখনি আমরা সেই বোধের দ্বারা সত্য করিয়া দেখিতে পাই যে, বিশ্ববীণার হাজার লক্ষ তার নিত্য সুরে যেখানে বাঁধা নাই এমন জায়গাই নাই—তখন যাহা চোখে পড়ে, যাহা হাতের কাছে আসে তাহাতেই আসর জমিয়া ওঠে, দূরে যাইতে হয় না।

বালক।

ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল-এর মাঝখানে বালক নামক একখানি মাসিকপত্র এক বৎসরের ওষধির মত ফসল ফলাইয়া লীলাসম্বরণ করিল।

বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজবৌঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে

বলেন। দুই এক সংখ্যা "বালক" বাহির হইবার পর একবার দুইএকদিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণ বাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল, ভাল করিয়া ঘুম হইতেছিল না,—ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালক-এর জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল; স্বপ্ন দেখিলাম, কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা, এ কি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া "রাজর্ষি" গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালক-এ বাহির করিতে লাগিলাম।

তখনকার দিনগুলি নির্ভাবনার দিন ছিল। কি আমার জীবনে কি আমার গদ্যেপদ্যে কোনোপ্রকার অভিপ্রায় আপনাকে একাগ্রভাবে প্রকাশ করিতে চায় নাই। পথিকের দলে তখন যোগ দিই নাই, কেবল পথের ধারের ঘরটাতে আমি বসিয়া থাকিতাম। পথ দিয়া নানা লোক নানা কাজে চলিয়া যাইত, আমি চাহিয়া দেখিতাম—এবং বর্ষা শরৎ বসন্ত দূর প্রবাসের অতিথির মত অনাহূত আমার ঘরে আসিয়া বেলা কাটাইয়া দিত। কিন্তু শুধু কেবল শরৎ বসন্ত লইয়াই আমার কারবার ছিল না। আমার ছোট ঘরটাতে কত অদ্ভুত মানুষ যে মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত তাহার আর সীমা নাই; তাহারা যেন নোঙর-ছেঁড়া নৌকা—কোনো তাহাদের প্রয়োজন নাই কেবল ভাসিয়া বেড়াইত। উহারই মধ্যে দুইএকজন লক্ষ্মীছাড়া বিনা পরিশ্রমে আমার দ্বারা অভাবপূরণ করিয়া লইবার জন্য নানা ছল করিয়া আমার কাছে আসিত। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিতে কোনো কৌশলেরই প্রয়োজন ছিল না—তখন আমার সংসারভার লঘু ছিল এবং বঞ্চনাকে বঞ্চনা বলিয়াই চিনিতাম না। আমি অনেক ছাত্রকে দীর্ঘকাল পড়িবার বেতন দিয়াছি যাহাদের পক্ষে বেতন নিষ্প্রয়োজন এবং পড়াটার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই অনধ্যায়। একবার এক লম্বা-চুলওয়ালা ছেলে তাহার কাল্পনিক ভগিনীর এক চিঠি আনিয়া আমার কাছে দিল। তাহাতে তিনি তাঁহারই মত কাল্পনিক এক বিমাতার অত্যাচারে পীড়িত এই সহোদরটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। ইহার মধ্যে কেবল এই সহোদরটিই কাল্পনিক নহে তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাইলাম। কিন্তু যে পাখী উড়িতে শেখে নাই তাহার প্রতি অত্যন্ত তাগবাগ করিয়া বন্দুক লক্ষ্য করা যেমন অনাবশ্যক—ভগিনীর চিঠিও আমার পক্ষে তেমনি বাহুল্য ছিল। একবার একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল সে বি-এ পড়িতেছে কিন্তু মাথার ব্যামোতে পরীক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। শুনিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলাম কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই ন্যায় ডাক্তারিবিদ্যাতেও আমার পারদর্শিতা ছিল না সুতরাং কি উপায়ে তাহাকে আশ্বস্ত করিব ভাবিয়া পাইলাম না। সে বলিল, স্বপ্নে দেখিয়াছি পূর্ব্বজন্মে আপনার স্ত্রী আমার মাতা ছিলেন তাঁহার পাদোদক খাইলেই আমার আরোগ্যলাভ হইবে। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, আপনি বোধহয় এ সমস্ত বিশ্বাস করেন না। আমি বলিলাম, আমি বিশ্বাস নাই করিলাম, তোমার রোগ যদি সারে ত সারুক্। স্ত্রীর পাদোদক বলিয়া একটা জল চালাইয়া দিলাম। খাইয়া সে আশ্চর্য্য উপকার বোধ করিল। ক্রমে অভিব্যক্তির পর্য্যায়ে জল হইতে অতি সহজে সে অন্নে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে আমার ঘরের একটা অংশ অধিকার করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকাইয়া সে তামাক খাওয়াইতে লাগিল। আমি সসঙ্কোচে সেই ধূমাচ্ছন্ন ঘর ছাড়িয়া দিলাম। ক্রমেই অত্যন্ত স্থূল কয়েকটি ঘটনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতে লাগিল তাহার অন্য যে ব্যাধি থাক্ মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা ছিল না। ইহার পরে পূর্ব্বজন্মের সন্তানদিগকে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা আমার পক্ষেও কঠিন হইয়া উঠিল। দেখিলাম এ সম্বন্ধে আমার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন

চিঠি পাইলাম আমার গতজন্মের একটি কন্যাসন্তান রোগশান্তির জন্য আমার প্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছেন। এইখানে শক্ত হইয়া দাঁড়ি টানিতে হইল, পুত্রটিকে লইয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছি কিন্তু গতজন্মের কন্যাদায় কোনোমতেই আমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম না।

এদিকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রায় আমার সেই ঘরের কোণে তিনি এবং প্রিয়বাবু আসিয়া জুটিতেন। গানে এবং সাহিত্যালোচনায় রাত হইয়া যাইত। কোনো কোনো দিন, দিনও এমনি করিয়া কাটিত। আসল কথা, মানুষের "আমি" বলিয়া পদার্থটা যখন নানাদিক হইতে প্রবল ও পরিপুষ্ট হইয়া না ওঠে তখন যেমন তাহার জীবনটা বিনা ব্যাঘাতে শরতের মেঘের মত ভাসিয়া চলিয়া যায় আমার তখন সেইরূপ অবস্থা।

বঙ্কিমচন্দ্র।

এই সময়ে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত হয়। তাঁহাকে প্রথম যখন দেখি সে অনেক দিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বোধকরি তিনি আশা কবিয়াছিলেন কোনো এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব—সেই ভরসায় আমাকেও মিলনস্থানে কি একটা কবিতা পড়িবার ভার দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার যুবা বয়স ছিল। মনে আছে, কোনো জর্ম্মান যোদ্ধৃকবির যুদ্ধকবিতার ইংরেজি তর্জ্জমা তিনি সেখানে স্বয়ং পড়িবেন এইরূপ সংকল্প করিয়া খুব উৎসাহের সহিত আমাদের বাড়িতে সেগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবিবীরের বামপার্শ্বের প্রেয়সী সঙ্গিনী তরবারীর প্রতি তাঁহার প্রেমোচ্ছ্বাসগীতি যে একদিন চন্দ্রনাথ বাবুর প্রিয় কবিতা ছিল ইহাতে পাঠকেরা বুঝিবেন যে, কেবল যে এক সময়ে চন্দ্রনাথ বাবু যুবক ছিলেন তাহা নহে তখনকার সময়টাই কিছু অন্যরকম ছিল।

সেই সম্মিলনসভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র, তিনি কে, ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড় বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গনাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট পৃথক্ হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটি ছোট ঘটনা ঘটিল তাহার ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম বাবু ঘরে ঢুকিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে, অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় যেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি বঙ্কিমবাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।

তাহার পরে অনেকবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু উপলক্ষ্য ঘটে নাই। অবশেষে একবার, যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন

সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ আমি যে নিতান্তই অর্ব্বাচীন সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই।

তাহার পরে বয়সে আরো কিছু বড় হইয়াছি; সে সময়কার লেখকদলের মধ্যে সকলের কনিষ্ঠ বলিয়া একটা আসন পাইয়াছি—কিন্তু সে আসনটা কিরূপ, ও কোন্‌খানে পড়িবে তাহা ঠিকমত স্থির হইতেছিল না;—ক্রমে ক্রমে যে একটু খ্যাতি পাইতেছিলাম তাহার মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধা ও অনেকটা পরিমাণে অবজ্ঞা জড়িত হইয়াছিল; তখনকার দিনে আমাদের লেখকদের একটা করিয়া বিলাতী ডাকনাম ছিল, কেহ ছিলেন বাংলার বায়রন, কেহ এমার্সন, কেহ আর কিছু; আমাকে তখন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেটা শেলির পক্ষে অপমান এবং আমার পক্ষে উপহাসস্বরূপ ছিল; তখন আমি কলভাষার কবি বলিয়া উপাধি পাইয়াছি; তখন বিদ্যাও ছিলনা, জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প, তাই গদ্য পদ্য যাহা লিখিতাম তাহার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশি, সুতরাং তাহাকে ভাল বলিতে গেলেও জোর দিয়া প্রশংসা করা যাইত না। তখন আমার বেশভূষা ব্যবহারেও সেই অর্দ্ধস্ফুটতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল; চুল ছিল বড় বড় এবং ভাবগতিকেও কবিত্বের একটা তুরীয় রকমের সৌখিনতা প্রকাশ পাইত; অত্যন্তই খাপছাড়া হইয়াছিলাম, বেশ সহজ মানুষের প্রশস্ত প্রচলিত আচার-আচরণের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়া সকলের সঙ্গে সুসঙ্গত হইয়া উঠিতে পারি নাই।

এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয় "নবজীবন" মাসিকপত্র বাহির করিয়াছেন—আমিও তাহাতে দুটা একটা লেখা দিয়াছি।

বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচার বাহির হইতেছে। আমিও তখন প্রচার-এ একটি গান ও কোনো বৈষ্ণব পদ অবলম্বন করিয়া একটি গদ্য ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছি।

এই সময়ে কিম্বা ইহারই কিছু পূর্ব্ব হইতে আমি বঙ্কিম বাবুর কাছে আবার একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তখন তিনি ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশী কিছু কথাবার্ত্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক কিন্তু সঙ্কোচে কথা সরিত না। এক-একদিন দেখিতাম সঞ্জীব বাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড় খুসি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে সে লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া; এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে; তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিম বাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে প্রথমটা বঙ্কিম বাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন। সেই সময়ে হঠাৎ হিন্দুধর্ম্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীন্য প্রমা করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু বঙ্কিম বাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার প্রচার পত্রে তিনি যে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া

পড়িতেছিলাম, আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে, কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার সঞ্জীবনী কাগজে পত্র আকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচার-এ তাহার ইতিহাস রহিয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliere র ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩

মুসলমানধর্ম্ম।—মুসলমানধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ:—একেশ্বরবাদ, পিতৃশাসনতন্ত্র, সাম্যনীতি।—মুসলমান সভ্যতা।—কালিফ্-শাসনের ইতিহাস।—মুসলমানধর্ম্মের উপর সেমিটিক ও আর্য্যগণের প্রভাব।—মুসলমানধর্ম্মের পরিপুষ্টি, যোগবাদ, সুফিসম্প্রদায়।—রীতিনীতি।—শাসনতন্ত্র।—আইন।—দর্শন:—সোটাজেলাইট্, ফরাবী, অভিসেন। বিজ্ঞানশাস্ত্র—সাহিত্য।—আরব-কবিতা:—প্রাচীন কবিগুরুবৃন্দ, আবুনুবাস।—ফার্সি-কবিতা:—ফর্দ্দুসী, সাদি, হাফিজ।—মুসলমানদিগের শিল্পকলা।

মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজের মধ্যে আর একটি উপাদান প্রবেশ লাভ করে—সেটি মুসলমানধর্ম্ম। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক যে সভ্যতা ভারতে আনীত হয়, তাহার বিশেষ লক্ষণগুলি পরিস্ফুটরূপে নেত্রসমক্ষে আনিতে পারিলে আলোচনার পক্ষে সুবিধা হইবে।

***

আরব রীতিনীতি, ইহুদিধর্ম্ম, ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মহম্মদ যেরূপ মুসলমানধর্ম্মের আদর্শ কল্পনা করিয়াছিলেন, প্রথমে আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

একেশ্বরবাদ—কোরানের তৃতীয় বচনে এইরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে:—

"ঈশ্বর ব্যতীত আর ঈশ্বর নাই—তিনি জীবন্ত, স্বয়ম্ভূ স্বপ্রকাশ... পৃথিবীতে, আকাশে যাহা কিছু অবস্থিতি করে—তিনি সমস্তই জানিতেছেন, কিছুই তাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন নাই; তিনিই স্বেচ্ছাক্রমে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই; তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান।"

"বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ সেই ঈশ্বর স্বকীয় আত্মজরূপে কাহাকে উৎপাদন করেন নাই"

মহম্মদ ত্রিত্ববাদকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অনন্তস্বরূপ ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট জগৎ হইতে তিনি পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বেও জড়প্রকৃতি যে বিদ্যমান ছিল, কোরানের কোন কোন বচন হইতে তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে।

একেশ্বরবাদ হইতে উৎপন্ন দুইটি মতবাদ মুসলমান-সভ্যতার বিশেষ লক্ষণগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

অদৃষ্টবাদ।—Mazdeisme ও খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় কোরানও, পুণ্যবানের জন্য স্বর্গ ও পাপীর জন্য নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করে। নরকের রাজা ইব্লিস্ (গ্রীক্‌শব্দ diabolos হইতে উৎপন্ন)।

কোরানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে:—

এইরূপ কথিত হয়:—"আমরা যখন ভূগর্ভে শয়ন করিব, তখন নূতন জীবের ন্যায় আবার কি পুনর্জ্জীবিত হইব?"

পুনরুত্থানের দিনে, প্রভুর সহিত সাক্ষাৎকার উহারা অস্বীকার করে...

"যদি আমরা (অর্থাৎ ঈশ্বর, এইরূপই স্থির করিয়া থাকি, তাহা হইলে প্রত্যেক আত্মাই আমাদিগের হইতে নিজ নিজ গতি লাভ করিবে; কিন্তু আমার বাক্য সুসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক:—বস্তুত, কি দানব কি মানব—আমি উভয়ের দ্বারাই নরক পূর্ণ করিব" (XXXII)।

এই বচনটি হইতে মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্যেরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঈশ্বর যখন ভবিষ্যৎদর্শী তখন তিনি মুসলমান ধর্ম্মজ্ঞানের জন্য, মুক্তির জন্য, কতকগুলি বিশেষ অধিকার এবং অপর ব্যক্তিদিগের জন্য নরক পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

এবং এই ধর্ম্মমূলক অদৃষ্টবাদ হইতে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে একপ্রকার অন্ধ অদৃষ্টবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

তাই, "সহস্র-একরজনী"তে ধীবর আব্‌দুল্লা এইরূপ বলিতেছে:—"আল্লার দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া,

আজ সমুদ্রে আমার জাল ফেলিতে যাইব। আমার জালে আজ যে মাছ পড়িবে, তাহা হইতে আমার নব-জাত শিশুর ভাগ্য—তাহার ভাবী সুখের পরিমাণ জানা যাইবে।"

"চাহার দর্বেশ" নামক আখ্যায়িকায়, কোন এক বন্ধুর সম্মানার্থ প্রদত্ত ভোজে, এক বণিকযুবক সুরাপানে বিহ্বল হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। তাহার পর সে জাগিয়া দেখিল, গৃহটি জনশূন্য, দাসবৃন্দ ও আস্‌বাবসামগ্রী সমস্তই অন্তর্হিত, কেবল দুইটি কাটামুণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে,—একটি তাহার বন্ধুর, এবং অপরটি তাহার প্রেয়সীর। পরে একজন খোজাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিল—"একি কাণ্ড?"—খোজাঃ—"আর কি, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, তার জন্য চিন্তা কিসের?"—তখন বণিক-যুবক চুপ করিয়া রহিল, ভাবিল, খোজা ঠিক্ কথাই বলিয়াছে।

কালক্রমে এই অদৃষ্টবাদ নিশ্চেষ্টতাবাদে (quietism) পর্য্যবসিত হইল। যেসকল কারণে মুসলমান-সভ্যতার অবনতি হয় তন্মধ্যে ইহাও একটি।

তাছাড়া, একেশ্বরবাদ হইতে মূর্ত্তি পূজার প্রতি একটা বিষম বিদ্বেষ উপস্থিত হয়; এই বিদ্বেষ এত দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, যে কোন সৃষ্ট জীবের প্রতিমা বা চিত্র রচনা করাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মরুভূমির সন্তান এই আরব-দিগের মূর্ত্তি-গঠন কলায় কোন কালেই রুচি ছিল না:—মহম্মদ আসিবার পূর্ব্বে উহারা সাকারবাদী ছিল; উহারা 'জিন'দিগেব আরাধনা করিত; বিচিত্র আকারধারী, নামহীন দৈত্যদিগের আরাধনা করিত, এবং যেসকল দেবতা প্রস্তরাদির মধ্যে অবস্থিতি করেন, সেইসকল দেবতার আরাধনা করিত। কাবার কৃষ্ণশিলা ঐরূপ একটা প্রস্তর।

ইহুদিধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় যেসকল ধর্ম্মে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ আছে, সেইসকল ধর্ম্ম ছাড়া মহম্মদ আর কোন ধর্ম্মকেই প্রশ্রয় দিতেন না। হিন্দু-দেবতার মূর্ত্তিদর্শনমাত্রেই মুসলমানদিগের একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইত। মুসলমানের চক্ষে, ঐসকল মূর্ত্তি শুধু নিরর্থক প্রতিকৃতি নহে—উহা জঘন্য নারকী রচনা; ব্রাহ্মণদিগকে উহারা দানবতুল্য মনে করিত। কিন্তু ধর্ম্মমাত্রেরই একটা স্থূল বহিরাবরণ থাকা আবশ্যক। তাই মহম্মদ, ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।—যথা, রমজানের উপবাস, শুক্রবারে মস্‌জিদে গমন, দিনের মধ্যে চারিবার ও রাত্রি-কালে একবার নমাজ পাঠ। একটা উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া মুয়াজ্জিন্ কোরানের এই প্রথমাংশটি আবৃত্তি করে:—

জগতের অধিপতি সেই ঈশ্বরের জয় হউক, দয়াময় ঈশ্বরের জয় হউক, সেই বিচার-দিনের মহাপ্রভুর জয় হউক। আমরা সাষ্টাঙ্গে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগকে সরল পথে লইয়া যাও; যাহাদের প্রতি তুমি প্রসন্ন, যাহারা তোমার কোপদৃষ্টির আশঙ্কা করে না, যাহারা বিপথে চলে না, তাহাদের পথে আমাকে লইয়া যাও—স্বস্তি।

মুসলমানমাত্রকেই এই কথাগুলি আবৃত্তি করিতে হয়। সতরঞ্চি-আসনের উপর দাঁড়াইয়া উহারা মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে; পরে হাঁটুগাড়িয়া মাটির উপর ললাট স্থাপন করে; তাহার পর শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ উত্তোলন করিয়া, দুলিতে দুলিতে নমাজ পড়ে; পরে আবার দণ্ডায়মান হয়।

মুসলমানদিগের স্নান ও উপবাসাদি দেখিয়া হিন্দুরা বিস্মিত হয় নাই, কেননা ঐ প্রকার অনুষ্ঠান হিন্দুদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। উহাদের ভূমিষ্ঠ-প্রণতি, উহাদের নমাজ-পাঠ হিন্দুদের চক্ষে হাস্যজনক বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া মনে হইত। যেসকল আখ্যায়িকায় কোন হিন্দু রাজকুমারী কোন রূপবান মুসলমানের প্রেমে মুগ্ধ,—তাহাতে দেখা যায়, ঐ রাজকুমারী স্বকীয় নায়ককে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিতে দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছে না; পরে ভয় পাইয়া পশ্চাতে হটিয়া যাইতেছে। সে ভাবে, বুঝি তাহার নায়ক কোন এক প্রকার যাদু-মন্ত্র পাঠ করিতেছে। মুসলমানদিগের অন্যান্য আচরণও হিন্দুদিগের নিকট অদ্ভুত ঠেকিত:—যথা কুকুরের প্রতি ঘৃণা, শূকরমাংস আহারে নিষেধ, ত্বক্‌ছেদন-অনুষ্ঠান, গোর-দেওয়া-প্রথা। কেবল মুসলমানদিগের একটি প্রথা হিন্দুদের উপর কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। হিন্দুরা নিঃসঙ্গ ব্যক্তিগত উপাসনা ছাড়া আর কোন উপাসনাপদ্ধতি জানিত না। পক্ষান্তরে মুসলমানধর্ম্ম

সমবেত-উপাসনার পক্ষপাতী। পরে অনেকগুলি হিন্দু-সম্প্রদায়ও এই পদ্ধতির অনুসরণ করে।

মুসলমানধর্ম্মের আর একটি লক্ষণ—পিতৃশাসনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা; এই পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা আরবদিগের স্বভাব-সিদ্ধ।

এই পদ্ধতি হইতে অনেকগুলি ফল প্রসূত হয়। পিতার কর্ত্তৃত্ব।—পুত্র ও পৌত্র, পিতা ও পিতামহের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবেক। ক্রমে এই পরিবার বিস্তৃত হইয়া, বংশ ও শাখা-জাতিতে পরিণত হয়। এমন কি আজিকার দিনেও, আরব-শাখাজাতিগণ তাহাদের সর্দ্দারকেই মানিয়া চলে, তাহাদের উপর সুলতানের কর্ত্তৃত্ব নাম মাত্র।

নারীজাতির নিকৃষ্ট অবস্থা। আরবেরা চারিটি ধর্ম্মপত্নী ও যত ইচ্ছা উপপত্নী গ্রহণ করিতে পারে, এইরূপ কোরানের বিধি। পত্নী অন্তঃপুরে বাস করিবে, এবং অবগুণ্ঠিতা না হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইবে না,—এইরূপ কোরানের আদেশ। কিন্তু আরব-দেশে এই বিধিনিষেধগুলি যথাযথরূপে পালিত হইত না; সমাজ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে পর, তখন এইসকল নিয়মের বেশী কড়াকড় হয়।

দিগ্‌বিজয়ের পর, পারস্যদেশীয় শা-দিগের ন্যায়, কালিফ ও আরব-প্রধানদিগেরও অসংখ্য উপপত্নী ছিল। Ctesiphon ও Byzancia উহাদিগকে খোজা প্রদান করিত।

পিতৃশাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি সমাদৃত হইয়া থাকে :—

যথা,—সমবেত ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ, অবিভক্ত সম্পত্তি, বৃদ্ধগণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, আদব-কায়দার গাম্ভীর্য্য, আরবদিগের যাহা অতীব প্রিয় সেই আতিথ্যসৎকার এবং কোরানের আদিষ্ট দানধর্ম্ম।

সম্ভবতঃ এইসকল উপদেশ, হিন্দুদিগের উপরে নানা-প্রকারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আরবদিগের পিতৃশাসনতন্ত্র, আর্য্যসমাজের নিয়মপদ্ধতির সহিত সহজে মিশিয়া যাইবারই কথা। স্ত্রীলোকদিগের অবরোধপ্রথা, যেরূপ মুসলমানদিগের মধ্যে, সেইরূপ হিন্দুদিগের মধ্যেও সমাদৃত; কিন্তু হিন্দুরা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহাকেও দান করে না। ব্রাহ্মণেরা অন্যবর্ণের লোককে স্বগৃহে গ্রহণ বা আশ্রয় দান করিতে পারে না।

মুসলমানধর্ম্মের তৃতীয় লক্ষণ—সাম্য-ব্যবহার। সকল মুসলমানের সম্বন্ধেই, একই কর্ত্তব্য, একই অধিকার। কি পদবী, কি জন্ম, কি সৌভাগ্যসম্পদ—উহার সহিত কোন বিশেষ অধিকার সংযোজিত নাই। অবশ্য, মহম্মদ মুসলমানকে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন নাই। তিনি এইমাত্র বলিয়াছেন :—অবিশ্বাসী প্রভু অপেক্ষা, বিশ্বাসী দাসও ভাল। কিন্তু ওমার মুসলমানদিগের একটা স্বতন্ত্র পদমর্য্যাদা দিয়াছিলেন। উহারা কেবলই সৈনিক হইবে, সকলেই সৈনিক হইবে। সকলেই কর হইতে মুক্ত হইবে, উহারা সকলেই অবসরবৃত্তি পাইবে, বেদুইন আরবদিগের মতে, কালিফ একজন সর্দ্দার—একজন লোকনির্ব্বাচিত সর্দ্দারমাত্র। সকল সময়েই উহারা রাজপ্রাসাদে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিত, এবং কালিফের নিকট মুক্তভাবে সমস্ত কথা জানাইত। কিন্তু পারস্য ও বৈজয়ন্তীর আদব-কায়দার দৃষ্টিতে, এইরূপ ব্যবহার দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। তাই এই আদব-কায়দার প্রভাব বেদুইন ও অন্যান্য মুসল-মানদিগের মধ্যেও সময়ে সময়ে প্রকাশ পাইত। "সহস্র এক রজনী"তে এই সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একজন ধীবর হারুন-অল-রসিদের নিকট আনীত হইল; একটা পাত্রের মধ্যে কতকগুলা চিহ্নিত কাগজের টুকরা রাখিয়া তাহার মধ্যে হাত ঢুকাইতে তাহাকে বলা হইল। ঐসকল কাগজের টুকরায়, বেত্রাঘাত, মস্তকচ্ছেদন, ফাঁসি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দণ্ড এবং সামান্য ভিক্ষামুষ্টি হইতে রাজ-সিংহাসন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার দান সূচিত হইয়াছে। ধীবর এই খেলা খেলিতে রাজি হইল। কিন্তু ধীবর রাজসভায় এরূপ গ্রাম্যশব্দ প্রয়োগ করিয়া মন খুলিয়া আবেগভরে কথা বলিতে লাগিল যে তাহাতে হারুন বা তাঁহার সভাসদ্‌-গণ কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না।

মুসলমানধর্ম্ম আভিজাত্যও স্বীকার করে না, ধর্ম্মযাজক বা পুরোহিতের কোন বিশেষ শ্রেণীকেও স্বীকার করে না(১)।

(১) কিন্তু ব্যবহার-ক্ষেত্রে মুসলমানধর্ম্ম একটি যাজক সম্প্রদায় সংগঠন করিয়াছে। "উলেমা"রা (মুসলমান ভট্টাচার্য্য) ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা

কালিফই ইমান, অর্থাৎ ভক্তদিগের সর্দ্দার; প্রত্যেক নগরে, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কর্ম্মচারীকে মস্‌জিদের জন্য তিনিই নির্দ্দেশ করেন। অব্রাহ্মণ হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা করা বা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করা নিষিদ্ধ; কিন্তু কোরান পাঠ করা ও তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করা মুসলমানের অধিকার আছে।

মুসলমানধর্ম্মের উপদেশ অপেক্ষা, মুসলমানধর্ম্মের মর্ম্মভাবটি অধিকতর প্রবল। ইহুদী সিদ্ধপুরুষগণের ন্যায় কোরান, মুসলমান কবি ও মুসলমান তত্ত্বজ্ঞানীরাও ধনশালী ব্যক্তিদিগের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। Renan যে বলিয়াছেন, সেমিটিক জাতিই পৃথিবীতে গণতন্ত্রনীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত করে, একথা ঠিক্। Nietzsche বলেন,— যে বিদ্রোহী জাতি স্বকীয় প্রভুদের প্রাচীন নীতিতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, শক্তিশালী পুরুষদিগের নীতির পরিবর্ত্তে, দাসের নীতি স্থাপন করে, তাহারাই গণতন্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক।

সুল্‌তান জাজিদ্ (Jazyd) যিনি স্বকীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও দ্বিতীয় ওয়ালিদ্‌কে (Walyd II) (২) হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন, তিনি এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন:—

"আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি। উচ্চাভিলাষের দ্বারা বা অর্থলিপ্সার দ্বারা চালিত হইয়া, বা রাজ্যশাসনকর্ত্তৃত্বের লোভে উত্তেজিত হইয়া আমি বিদ্রোহকার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। আপনাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্যও আমি এ কথা বলিতেছি না। ঈশ্বরের দয়া না থাকিলে, আমি একজন পাপী ভিন্ন আর কিছুই নহি। আমি মনুষ্যদিগকে অনুনয় সহকারে বলিয়াছি, তাহারা ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া আসুক, তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের নিকট ফিরিয়া আসুক, তাঁহার প্রবক্তার উপদেশের নিকট ফিরিয়া আসুক। অত্যাচারী রাজা, কঠিন হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিল; সর্ব্ব প্রকার পাষণ্ডমতের প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল। তার না-ছিল বিশ্বাস কোরানে—না-ছিল বিশ্বাস অন্তিম-বিচার-দিন সম্বন্ধে......তাই আমি সেই দুর্বৃত্ত রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলাম। আমার নিজের বলে, আমার নিজের পরাক্রমে আমি অত্যাচারীকে পরাভূত করি নাই, ঈশ্বরের মহাশক্তিই, ঈশ্বরের অসীম পরাক্রমই অত্যাচারীর হস্ত হইতে, দেশের লোককে উদ্ধার করিয়াছে। তোমরা সবাই শোন! আমি তোমাদের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, আমি কখনই পাথরের উপর পাথর তুলিয়া, ইঁটের উপর ইঁট তুলিয়া কোন রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিব না। আমার পত্নীদিগকে, আমার সন্তানদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিব না। প্রতি বৎসর, তোমাদের স্থাপিত বৃত্তির অর্থদানে ও প্রতি মাসে করস্বরূপ ফসলের অংশদানে তোমাদের অধিকার আছে। মুসলমানদিগের মধ্যে যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দতার বিস্তার হয় তাহাই করা আবশ্যক। যাহারা রাজধানী হইতে দূরে অবস্থিতি করে, তাহাদিগের স্বার্থ রাজধানীর অধিবাসীদিগের স্বার্থের সহিত সমানভাবে আমরা দেখিব। আমি যদি আমার অঙ্গীকার পালন করি, তোমরাও তাহা হইলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে, বিপদাপদে আমাকে সাহায্য করিবে, আমাকে রক্ষা করিবে। যদি আমার অঙ্গীকার পালনে কোন ত্রুটি হয়, তাহা হইলে আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার তোমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু একটা কথা,—তোমরা আমাকে পূর্ব্বেই তাহা জানাইবে, এবং যদি আমি প্রতীকার করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবে। যদি তোমরা এমন কোন যোগ্য লোক পাও, যে আমার ন্যায় অকুণ্ঠিতচিত্তে তোমাদের হিতসাধনের জন্য অঙ্গীকার করে, তোমরা অবাধে তাহাকেই তোমাদের রাজারূপে নির্ব্বাচন করিও—এবং সর্ব্বপ্রথমে আমিই তাহাকে প্রভু বলিয়া সম্মান করিব—তাহার সেবায় নিযুক্ত হইব। তোমরা এ কথা মনে রাখিও, যে ভাল-রকম সর্দ্দারি করিতে পারে না, তাহার হুকুমও কেহ মানে না। এক্ষণে আমার জন্য ও তোমাদের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমার কথা শেষ করি।" (৩)

অবশ্য, সমস্ত মুসলমান রাজ্যগুলিই যথেচ্ছাতন্ত্রমূলক। যে জনসমাজ সম্যক্‌রূপে বিকাশলাভ করে নাই সেই সমাজে, সাম্যনীতি হইতে অত্যাচার উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং যেসকল বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণী, যেসকল ধর্ম্মসংঘ, যেসকল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সম্মিলনী ঐ অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ, অত্যাচারী রাজা অগ্রে তাহাদিগেরই উচ্ছেদসাধন করেন। কিন্তু মুসলমান রাজ্য যাহাই হউক, মুসলমান ধর্ম্ম যেমন সার্ব্বভৌমিক,

ও ব্যবস্থাদাতা উভয়ই। মুসলমানের সমস্ত অধিকারই ধর্ম্মমূলক। ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবস্থাশাস্ত্রের যুগল পত্তন ভূমি:—একটী, কোরান; আর একটি, ঐতিহ্য ("সুন্ন")। হদিশ-নামক কোন এক বিশেষ সাহিত্যের মধ্যে এই ঐতিহ্য রক্ষিত হইয়াছে। মুবত্তার গ্রন্থকার মালিক-বের-এনাস ইহার সংস্থাপক; ৭৯৫ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এইসকল সংকলন-গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বুচারি-কৃত এল্-জামি ও সাহি (৮৪০ অব্দের কাছাকাছি)। উলেমারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত:—কাজি বা বিচারকর্ত্তা; মুফ্‌তি বা ব্যবস্থাদাতা; এবং ইমান্ বা ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাভাজন। যাহারা নিকৃষ্ট পদবীর ইমান্ তাহারাই প্রকৃতপক্ষে ইমান্-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহারাই মসজিদের নমাজ-পাঠক, তাহারাই "ওয়াইজ" বা প্রচারক, তাহারাই "খোজা" বা উপদেষ্টা, তাহারাই মুয়েজ্জিন্ বা উপাসনার সময়-ঘোষণাকারী (শাস্ত্রতঃ কালিফই প্রকৃত ইমান্ এবং মসজিদের ইমান্ তাঁহারই প্রতিনিধি)। তুর্কেরা মুফ্‌তিদিগের মধ্য হইতে, মুসলমানধর্ম্মের একজন প্রধান অধ্যক্ষ বাছিয়া লয়। তিনিই প্রধান মুফ্‌তি বা সেখ্-উল্-ইসলাম। সকল মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মাশ্রম আছে।

(২) A. Von Kremer, Kulturgeschichte des Orients (I. P. 387)

(৩) এই বক্তৃতাটি প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না;—তবে, ইহা যে খুব প্রাচীনকালের তাহাতে সন্দেহ নাই।

তেমনই সাম্যবাদী ও গণতন্ত্রমূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল দেশের লোকই এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারে। এই ধর্ম্ম, বর্ণভেদপ্রথার স্থানে সামন্ত-তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অতএব বর্ণভেদপ্রথার উচ্ছেদসাধনে এই ধর্ম্মই উপযোগী, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম যে কার্য্যে সফল হয় নাই, এই ধর্ম্ম আবার সেই কার্য্য আরম্ভ করিলে অসঙ্গত হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের পূর্ব্বাভিমুখী পথযাত্রার নূতন একটি প্রমাণ

(১) পূর্ব্ব দিকের আর এক নাম প্রাচী। প্র-উপসর্গের টান সম্মুখের দিকে ইহা খুবই স্পষ্ট। তার সাক্ষী—প্রয়াণ কিনা সম্মুখের দিকে গমন; প্রসারণ কিনা সম্মুখদিকে লম্বিত করা। pro উপসর্গেরও ঐদিকে টান; তার সাক্ষী proceed progress ইত্যাদি। তা ছাড়া পূর্ব্ব শব্দের দেশ-ঘটিত অর্থও সম্মুখের দিক; তার সাক্ষী—পূর্ব্ব পশ্চাৎ এবং অগ্রপশ্চাৎ এ দুই কথা একই কথা। প্রাচীন যেমন কালঘটিত পূর্ব্ব, প্রাচী তেমনি দেশঘটিত পূর্ব্ব।

(২) পশ্চিম দিক্ কিনা পশ্চাৎ দিক্। পশ্চিম দিক্ পূর্ব্ব দিকের বিপরীত দিক্ এই অর্থে তাহার আরেক নাম প্রতীচী। প্রতিপক্ষ বলিতে বিপরীত পক্ষ বুঝায় ইহা সকলেরই জানা কথা।

(৩) উত্তর দিক্ অর্থাৎ উপর অঞ্চল (কিনা highland—পার্ব্বত্য প্রদেশ)। উত্তর দিকের আর এক নাম উদীচী। উৎ উপসর্গের টান উপরদিকে ইহা বলা বাহুল্য। তার সাক্ষী—উত্তোলন কিনা উপরে তোলা, যেমন হস্তোত্তোলন; উদ্গম কিনা উপরদিকে নির্গমন—যেমন অঙ্কুরোদ্গম।

(৪) দক্ষিণ দিক্ কিনা দক্ষিণ হস্তের দিক্। দক্ষিণ দিকের আর এক নাম অবাচী। অব উপসর্গের টান নিম্নাভিমুখে; তার সাক্ষী—অবতরণ শব্দের অর্থ নীচে নাবা, অবাঙ্মুখ-শব্দের অর্থ অধোমুখ। অবাচী কিনা নিম্নভূমি (lowland)।

এইরূপ আমরা পাইতেছি যে, "পূর্ব্ব দিক্" কথাটার অর্থ সম্মুখের দিক্; প্রাচী-শব্দের অর্থও তাই। পশ্চিম-শব্দের অর্থ পশ্চাৎ; প্রতীচী-শব্দের অর্থও তাই। "উত্তর-প্রদেশ" কথাটার অর্থ উপর-অঞ্চল অর্থাৎ পার্ব্বত্য-প্রদেশ (highland); উদীচী শব্দের অর্থও তাই। "দক্ষিণ দিক্" কথাটার অর্থ দক্ষিণ হস্তের দিক্। অবাচী শব্দের অর্থ নিম্নভূমি (lowland)। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, এক দল আর্য্যের ভারত-যাত্রাকালে তাঁহাদের সম্মুখের পথ ক্রমাগতই পূর্ব্বদিকে প্রসারিত হইয়া চলিতেছিল, আর, সেই গতিকে তাঁহাদের পশ্চাতের পথ পশ্চিমদিকে পড়িয়া যাইতেছিল; হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশ তাঁহাদের উত্তরদিকে দণ্ডায়মান ছিল; এবং তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্বের (অর্থাৎ ডাহিন পাশের) নিম্ন ভূমি দক্ষিণ দিকে প্রসারিত ছিল। তবেই হইতেছে যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রয়াণ করিয়াছিলেন।

এই সঙ্গে আর একটি কথা আমার বক্তব্য এই যে, pro-উপসর্গ এবং ob-উপসর্গ দুয়েরই টান সম্মুখের দিকে। প্রভেদ কেবল এই যে, pro-উপসর্গের বিশেষ দৃষ্টি সম্মুখ-প্রবর্ত্তিত ক্রিয়ার প্রতি (যেমন proceed, progress, propel), ob-উপসর্গের বিশেষ দৃষ্টি সম্মুখস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতি (যেমন object, obtain, observe)। লাটিন্ ভাষার ob উপসর্গ এবং সংস্কৃত ভাষার অভি-উপসর্গ দোঁহে দোঁহার সহোদর ভ্রাতা। তার সাক্ষী—অভ্যাগত অতিথি কিনা সম্মুখাগত অতিথি; পর্ব্বতাভিমুখে—কিনা পর্ব্বত'কে সম্মুখ করিয়া তাহার দিকে; object অর্থাৎ সম্মুখবর্ত্তী বিষয়। Object শব্দের আর এক অর্থ—মনশ্চক্ষুর সম্মুখবর্ত্তী লক্ষ্য বিষয়; অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি শব্দের অর্থও তাই। এখন কথা হইতেছে এই যে, লাটিন ভাষায় occident শব্দে পশ্চিম বুঝায়। সেঞ্চুরি ডিক্‌ষনারিতে* Occident শব্দের অর্থ ভাঙ্গিয়া বলা হইয়াছে এইরূপ:-
Occiden(t)s=(ob, before)+(cadere, fall...(ক)

* Century Dictionary edited by Professor W. D. Whitney of Yale University.

.... (গ)

Quarter of the setting sun.................. (খ)

পরন্তু occident শব্দের অবয়ব দ্বয়ের ধাত্বর্থ হইতে (ক-হইতে) উহার মোট অর্থটি (খ-অর্থটি) কিরূপে আসিল, অভিধান থানায় তাহার মূলেই কোনো উল্লেখ নাই। ক-খ'র মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থানটিতে (গ-স্থানটিতে) যদি এই ভাবের একটি কথা বসাইয়া দেওয়া যায়

☞ "ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে লাটিন্ আর্য্যদিগের পথযাত্রাকালে তাঁহাদের সম্মুখের পথ পশ্চিম দিকে পড়িয়াছিল,* (খ দেখ)" তবে তাহা দিব্য থাপ খায়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিদি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। অনাহার, অনিদ্রা, ভাবনা, সবগুলা মিলিয়া তাহার মস্তক বিশৃঙ্খল ভাবে আলোড়িত করিতেছিল।

অমর হাবড়া হইতে গাড়ী করিয়া বাসার অভিমুখে চলিল। বড়বাজারের মাড়োয়ারীদের দোকানে দোকানে তখন উজ্জ্বল শোভা চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দিতেছিল। বড় বড় জমীদার ও ভাগ্যবন্তের দ্বারে দ্বারে মঙ্গলকলস, আম্রপল্লবের মালা ও কদলী বৃক্ষ; কোথাও নহবৎ বা সানাইয়ে মধুর আগমনীর সূচনা গাহিতেছিল। অমরনাথের মনে পড়িতেছিল তাহাদের সেই বৃহৎ পূজামণ্ডপ, পূজার সেই ধুমধাম, চারিদিকের সেই আনন্দকল্লোল। প্রবাস হইতে আগত পুত্রের প্রতি পিতার সেই সস্নেহ ব্যবহার, চারিদিকে কেবল সসম্ভ্রম প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি। শৈশবের খেলাধূলাও মনে পড়িতেছিল। পূজা আসিলে যাত্রার ধুমে আহার-নিদ্রা ত্যাগ, সঙ্গীদল লইয়া মধ্যে মধ্যে প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া তাহার দোষগুণের বিচার করা, রৌদ্রে রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইয়া পিতার সস্নেহ তিরস্কার লাভ। আর আজ? বাড়ীতে সেই পূজা, সেই পিতা; কেবল বাড়ীতে নাই সেই অমরনাথ; সেই পূজার মধ্যেই তাহার অপরাধের বিচার করিয়া তাহার দোষের ভার মাথায় বহিয়া লইয়া তখনি তাহাকে চলিয়া আসিতে পিতার আদেশ হইল। দুইদিন তাঁহার দেরীও সহ্য হইল না।

নিশ্বাস ফেলিয়া অমরনাথ ভাবিতেছিল "কিসে এমন হয়? নিজের প্রাধান্য সামান্য আহত হইলেই মানুষ তখনি আঘাতকারীকে শতগুণ বলে আঘাত করিতে চায়। যাহাকে প্রাণাধিক বলিয়া ভাবি, কই তাহার উপরেও তো সে আঘাতটা করিতে সঙ্কোচ বোধ হয় না? অকপট অসীম স্নেহও যখন প্রতিশোধস্পৃহার বিষে এমন জর্জ্জরিত হইয়া যায় তখন জগতে প্রতিশোধেরই রাজত্ব? যখন মানবের আত্মাভিমান অক্ষুণ্ণ থাকে তখনই বুঝি সে ক্ষমা স্নেহের দৃষ্টান্ত দেখাইতে সক্ষম হয়!"

নিজের কথাও মধ্যে মধ্যে মনে পড়িতেছিল। পিতা অসন্তুষ্ট হইবেন, এই মাত্র ভাবিতেই এক সময়ে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত, আর এখন পিতার বাহ্যিক ক্রোধাচ্ছাদনের ভিতরে তাঁহার দারুণ বেদনা-চাঞ্চল্য দেখিয়াও কই অমরনাথ এখনো তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। সেই পিতা, যাঁহার অধীনে, যাঁহার স্নেহের আদেশের উপর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর রাখিয়া বালক অমরনাথের সুখ দুঃখ কখনো নিজেদের অস্তিত্ব তাহাকে বুঝিতে দেয় নাই; আজ অমরনাথের সেই বৃদ্ধ পিতা, অন্তরে তেমনি স্নেহশীল, তথাপি সেই পিতাকে অতিক্রম করিয়া অমরনাথ তাহার এখনকার সুখদুঃখের বিদ্রোহ-পতাকা উড়াইতে ত কিছুমাত্র পশ্চাদ্‌পদ নয়। হায়! যৌবনলালসাই কি জগতের সাধনার ধন? তাই কি আজন্মের সঞ্চিত স্নেহের ভাণ্ডার তুচ্ছবোধে শূন্য করিয়া ফেলিয়া দিয়া নবজীবন-সমুদ্রের কূলে, আশালোকিত উষার প্রারম্ভে নবীন রত্নের সঞ্চয় করিতে উৎসুক? জীর্ণ পুরাতন খাতা ফেলিয়া দিয়া নূতন বৎসরে নূতন খাতায় নূতন ব্যাপারীদের সঙ্গে দেনাপাওনার হিসাব খুলিবে? হয়ত পুরাণ-খাতা টানিয়া বাহির করিলে সে মূলধনগুলা কাহারো দত্ত "হাতকর্জ্জার"মধ্যেই গিয়া পড়ে! তাই নূতন ব্যবসায়

* পতন শব্দের অর্থ শুধুই যে কেবল নীচে পড়া, তাহা নহে। তার সাক্ষী—Accident = Ad + cident অর্থাৎ যাহা be-"falls" (হঠাৎ) এসে পড়ে। (আ × পৎ) আপৎশব্দের অর্থও তাই।

খুলিতে হইলে সে পুরাতন খাতাখানা টানিয়া ফেলিয়া দেওয়ার বেশী প্রয়োজন ?

অমরনাথ বাসায় গিয়া পৌঁছিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়াই দেখিল সম্মুখে বৃদ্ধা ঝি।

"আঃ বাবু এসেছেন, বাঁচা গেল, এমন ভাবনা হয়েছিল—"

"কেন বল দেখি? চারু কোথায়? সে ভাল আছে তো?"

"তাই ত বল্‌ছি বাবু, ভালই যদি থাক্‌বে তবে আর ভাবনা বল্‌ছি কেন?"

"কেন কি হ'য়েছে?"

"জ্বর হয়েছে আর কি। এমন মেয়ে কিন্তু বাপু বাপের জন্মে দেখিনি। একি ন্যাকা বাপু! মাথার জান্‌লাটা খোলা আছে তা হুঁস নেই; রাত্রে না হয় বন্ধ করতে ভয় কর্‌ল সকালে বন্ধ ক'রে রাখ, কি আমায় বল,—তা নয়, দু রাত্তির হিম লাগিয়ে জ্বর হয়েছে, মরি ভেবে। হরেকে দিয়ে নরেশ ডাক্তারকে ডেকে আন্‌লু, ওষুধ দেয়ালু, আর আমি কি করব—"

"যাক্ যাক্ জ্বর ছেড়েছে তো? কবে জ্বর হ'ল?"

"কাল হয়েছে। ডাক্তার বল্লে জ্বর এখনো ছাড়েনি।"

অমরনাথ নিঃশব্দপদবিক্ষেপে চারুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। আরক্ত মুখে চক্ষু মুদিয়া চারু শুইয়া আছে, বোধ হয় ঘুমাইতেছে। অমরনাথ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়িয়া গেল। এমনি আরক্ত মুখে সে জ্বরের ঘোরে অচেতন হইয়া সেই জীর্ণ গৃহের মলিন শয্যায় পড়িয়া ছিল। এখন দেখিতে ও বয়সে তাহা অপেক্ষা বড় হইলেও সেই চারুই এই "পল্লবিনী লতেব" কিশোরী চারুলতা। কিন্তু এ গৃহ জীর্ণ নয়, এ শয্যা মলিন নয়। ত্রিতলস্থ উত্তম সজ্জিত গৃহ, উচ্চ পালঙ্কে কোমলশুভ্রশয্যায়, বসনভূষণে সজ্জিতা চারু। কিন্তু সেই চারু কি ইহার অপেক্ষা অনাথা, ইহা অপেক্ষা অধিক পরদয়াপ্রত্যাশী, অধিক সহায়হীনা ছিল? যে অমঙ্গল-শঙ্কা-কাতর অটুটস্নেহপূর্ণ মাতৃহৃদয় তাহার পার্শ্বে বসিয়া রুগ্ন মুখখানির পানে চাহিয়া ছিল, সেই স্নেহ-কাতর দৃষ্টি কি তাহাকে বিশ্বঐশ্বর্য্যের উপরে স্থান দান করে নাই? তিনি কি জানিতেন তাঁহার স্নেহের ধন একজন নিঃসম্পর্ক কঠোর-হৃদয় বিচারকের সম্মুখে অনাথা ভিখারিণীর ন্যায় দাঁড়াইবে? সে ইচ্ছা করিলেই ইহাকে পদদলিত করিতে পারিবে? অমরনাথের চক্ষে জল আসিল। আবার মনে পড়িল, কোথায় সে ক্ষুদ্র বনফুল বনে ফুটিয়া বাঁচিত কি ঝরিয়া পড়িত কে জানে? তাহাকে ছিঁড়িয়া এরূপ লোকালয়ে আনিয়া বিশ্বের সম্মুখে তাহাকে উপহসিত করার কারণ অমর স্বয়ং। যদি সে সেখানে না যাইত বা তাহাদের প্রতি ক্ষণিকের হৃদ্যতা না দেখাইত তাহা হইলে তো তাঁহারা তাহার সম্বন্ধে এ আশা পোষণ করিতেন না। তাঁহাদের সাধ্যমত সুপাত্রে চারুকে তাহার মাতা নিশ্চয়ই সমর্পণ করিয়া যাইতেন। চারুর এ অবস্থার কারণ অমরনাথ।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অমরনাথ জ্বর আছে কি না জানিবার জন্য চারুর ললাট হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেই চারু চমকিত ভাবে চাহিল। অমরকে দেখিবামাত্র ত্রস্তে শয্যায় পাশ ফিরিয়া বলিল, "আপনি! কখন এসেছেন?"

অমর গম্ভীর মুখে বলিল, "এখনি।"

"এখনি! গাড়ীর শব্দ কই পাইনি তো? আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"হ্যাঁ। তোমার জ্বর হয়েছে শুন্‌লাম, কই ছাড়েনি তো জ্বর?"

"হ্যাঁ। আপ্‌নি যে পূজোর পর আস্‌বেন বলেছিলেন, এখনি এলেন—আর যাবেন না তো?"

"যাব।"

"আবার যাবেন, তাহ'লে কবে আস্‌বেন?"

"আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী যাবে চারু?"

"আপনাদের বাড়ী? আমায় নিয়ে যাবেন?"

"তোমায় নিয়ে যেতে বাবা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

হর্ষের আতিশয্যে চারু শয্যায় উঠিয়া বসিল।

"উঠ না উঠ না এখনো খুব জ্বর রয়েছে।"

"ডাক্তার বলেছে শীগ্‌গির সেরে যাবে। কবে যাব আমরা সেখানে?"

"কাল্ গেলেই হ'বে। তোমার সেখানে যেতে আহ্লাদ হচ্ছে চারু?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আপনাদের বাড়ী যে।"

"আমাদের বাড়ী হ'লেই কি তোমার পক্ষে সেজায়গা সম্পূর্ণ নিরাপদ চারু? আমাদের বাড়ী ব'লেই তোমার সেটা আরও ভয়ের জায়গা!"

"ভয়ের জায়গা? কেন?"

"কেন? তুমি আমি সেখানে কত দোষী তা কি বুঝ্তে পার না?"

বিবর্ণ কম্পিত মুখে চারু ধীরে ধীরে বালিশের উপরে মাথা রাখিল। একটু থামিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমি তো বুঝ্তে পারছি না, তাঁরা কি আমায় খুব বক্‌বেন?"

"বক্‌বেন না হয় ত। হয় ত বেশ আদর ক'রেই জায়গা দেবেন।"

"তবে ভয় কিসের? তবে আমি যাব।"

"যেও। আমার সমস্ত অপরাধ মাথায় ক'রে নিয়ে সেখানে অপরাধিনীর মত থাক্‌তে পারবে তো? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি করতে পারবে তো চারু?"

"আমি কিছু বুঝ্তে পাচ্চি না। বড্ড ভয় করছে আপনার কথা শুনে। আপনি সেখানে থাক্‌বেন তো?"

"আমি?" মনস্তাপব্যঞ্জক ক্ষীণ হাসি হাসিয়া অমর আবার বলিতে লাগিল "চারু, তুমি কি কিছু বুঝ্তে পার না? জগতের কাছে এমন কৃপা ও অবহেলা পাবার জন্যেই কি তুমি এমন হয়েছিলে? তুমি আমার কে যে তোমার কাছে আমি থাক্‌ব? আমি হয় ত সেখানে স্বচ্ছন্দে থাক্‌ব কিন্তু তোমার সেখানে স্থান হ'বে না, তোমাকে অন্যের কাছে তাড়িয়ে দেবার জন্যেই তো সেখানে নিয়ে যাচ্চি।" অমরনাথ সবেগে চারুর নিকটস্থ হইয়া দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল "যেতে পার্‌বে তো চারু? আমি মরে যাচ্চি আমায় বাঁচাও—তুমি যেতে পারবে তো? তাহ'লে বাবা আমায় ক্ষমা করবেন, জগতের চক্ষে আমি নিরপরাধী হ'তে পার্‌ব! তুমি অন্যকে বিয়ে করতে পারবে তো? অন্যের ঘরে যেতে পার্‌বে তো?"

আবেগটা ঈষৎ প্রশমিত হইলে অমরনাথ দেখিল চারু নিস্পন্দ আড়ষ্ট ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছে; চাহিয়া আছে কিন্তু চক্ষু স্পন্দহীন, বক্ষের স্পন্দন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, নাসাপথে হাত দিয়া দেখিল অতি মৃদু বহুবিলম্বী শ্বাস পড়িতেছে।

"চারু—চারু—অমন ক'রে রইলে কেন? ভয় পেয়েছ? চারু—চারু!"

চারু তাহার পানে চাহিল।

"বড় কি ভয় পেয়েছ?"

জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চারু ক্ষীণস্বরে বলিল, "হ্যাঁ।"

"ভয় কি!—জ্বরটা এখনো ছাড়েনি। একটু ঘুমোও দেখি।"

চারু পাশ ফিরিয়া শুইল। অমরনাথ জানালার নিকটে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে ঝি আসিয়া বলিল "বাবু খাওয়া হয়েছে তো?"

"খাওয়া?—কই হয় নি তো।"

ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল "ওমা তা এতক্ষণ এসেছ বাছা তা খাওয়ার নামটী নেই? তুমিই বা কেমন মেয়ে বাপু, পুরুষ মানুষ কি এসব আপনি বলে? খোঁজ খবর নিতে হয়। এস বাছা খাবে এস, আহা মুখটী শুকিয়ে গ্যাচে।"

আহার করিবার জন্য অমরনাথ কক্ষ হইতে বাহিরে যাওয়া মাত্র চারু ভয়ার্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল "আমার একলা থাক্‌তে বড্ড ভয় করছে; ঝিকে একটু ডেকে দিন।"

অনুতপ্তভাবে অমরনাথ তাহার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—"একলা কই চারু—এই তো আমি এসেছি—ভয় কি। আমি বসে আছি—তুমি ঘুমোও।"

"না না আপনি খেতে যান।" বলিয়া চারু বালিশে মুখ লুকাইল। অমরনাথ নীরবে বসিয়া রহিল।

রাত্রে চারুর জ্বর ১০৫ ডিগ্রী উঠিল। যাতনায় বালিকা চীৎকার করিতে লাগিল। অমরনাথ সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে তাহার মস্তকের নিকটে বসিয়া মাথায় বরফ ও অ-ডি কলোন সিঞ্চন করিল। ঝি সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়া মাথায় বাতাস করিল। বালিকা মধ্যে মধ্যে আর্ত্তকণ্ঠে

কাঁদিয়া উঠিতেছিল "আমি যাব না—আমি যাব না—তা'হলে আমি ম'রে যাব।"

প্রভাতে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এর বোধ হয় রেমিটেণ্ট ফিবারের ধাত। কাল এটা ভাল বোঝা যায় নি; কিন্তু আমি আশঙ্কা করেছিলাম। আজ দেখছি যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটেছে।"

জ্বর কমিল না। উত্তরোত্তর কুলক্ষণই প্রকাশ পাইতে লাগিল। অমরনাথ বৈকালে পিতাকে পত্র লিখিল—"শ্রীচরণেষু, বিবাহ করা ভিন্ন আমি আর উপায়ান্তর দেখি না। আপনার আদেশ রাখিতে পারিলাম না আমি এমনি অধম। ইতি।—হতভাগ্য অমর।"

তারপরে অচেতন চারুর মাথা ধরিয়া তুলিয়া বলিল "চারু—চারু আমি তোমায় বাড়ী নিয়ে যাবনা—আর কোথাও যেতে হবে না, তুমি আমার, তুমি আমার কাছেই থাক।"

চারু তাহা কিছুই শুনিতে পাইল না, সে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান, কিন্তু অমরনাথ পিতাকে পত্রখানা পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে তাহার শয্যার এক পার্শ্বে পড়িয়া কয়দিন পরে আজ একটু আরামে ঘুমাইয়া লইল। আজ তাহার মন হইতে সমস্ত দ্বিধা সকল দ্বন্দ্ব কাটিয়া গেছে।

চতুর্দ্দশ দিন পরে চারুর জ্বর ত্যাগ হইল। বলকারক ঔষধ পথ্যের গুণে সে পরদিনই অমরনাথের সঙ্গে ক্ষীণস্বরে কয়েকটা কথা কহিল। ক্রমে সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ম্লান ওষ্ঠের ক্ষীণহাস্যে অমরনাথকে আশান্বিত করিল।

তারপরে ঝি ও হরি চারুর রাত্রে পালা ক্রমে জাগিবার ভার লইলে অমর দুই দিন খুব ঘুমাইল ও তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিল। চারুর যাহা শুশ্রূষা তাহা সত্য কথা বলিতে গেলে তাহারাই করিয়াছিল। অমর কেবল নিজের চিন্তার ভার মাথায় লইয়া অনাহার অনিদ্রায় তাহার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিত মাত্র। যাহাকে কখনো নিজের যত্ন করিতে হয় নাই, সে অন্যের যত্ন কিরূপে শিখিবে!

ক্রমে চারু অন্ন পথ্য পাইল। বৈকালে অমরনাথ তাহার কক্ষে গিয়া দেখিল চারু যথাস্থানে শুইয়া খোলা গবাক্ষপথে নীলোজ্জ্বল আকাশের পানে চাহিয়া আছে; মুখখানি বিবর্ণ, শুষ্ক; সায়াহ্ন সূর্য্যের হেমাভ রশ্মি তাহার রুক্ষ কেশে ম্লান ললাটে পতিত হইয়া বিবাহবাসরে লজ্জাপাণ্ডু নববধূর ললাটে সিন্দূরশোভার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। রাস্তার অপর পার্শ্বস্থ নিম্ব বৃক্ষে পাখী-গুলা তাহাদের যতদূর সাধ্য গোলমাল বাধাইয়াছে, নিম্নে জনসংঘের কোলাহলের বিরাম নাই। চারু এক মনে সেই সহস্রকণ্ঠোত্থিত বিচিত্র রাগিণী শুনিতে-ছিল। কঠিন পীড়ার পরে যেন মানুষ অন্য জগত হইতে ফিরিয়া আসে, চারিদিকের উদ্বেলিত আনন্দ বা দুঃখের তরঙ্গ কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সে যেন এখন সে সকলের অনেক উঁচুতে রহিয়াছে; সব শুনিতেছে অথচ কিছুই ভাল বোধগম্য হয় না, কেবল অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে মাত্র।

অমরনাথ মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া দেখিয়া বলিল—"এখন কেমন আছ চারু? কোন অসুখ করছে না তো?"

"না। ভাল আছি।" বলিয়া চারু তাহার পানে চাহিল।

অমরনাথ নিকটে বসিয়া বলিল—"ডাক্তার বল্‌লে ভালো করে সারতে এখনো মাস খানেক লাগ্‌বে।"

চারু ক্ষণেক নীরবে রহিয়া বলিল—"এখন আমি সেরেছি তো, কিন্তু উঠ্‌লে মাথা ঘোরে।"

অমরনাথ সস্নেহ নেত্রে চাহিয়া বলিল "যে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছ। ভাল হ'বে তা কি আর আমার আশা ছিল? কটা দিনরাত্রি যে কি ভাবে কেটেছে জান্‌তেও পারিনি।"

চারু অনেকক্ষণ পরে ভীত চক্ষু দুটি তাহার মুখে স্থির করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল -"আমার তখন মনে হ'ত আপনি যেন আমায় একলা ফেলে রেখে বাড়ী চলে গিয়েছেন। তখন আপনি এখানে ছিলেন? যান্‌নি?"

"সেকি চারু? তোমায় ব্যারামে ফেলে আমি চলে যাব—তোমার এমন বিশ্বাস হয়?"

"তখন আমার তাই মনে হ'য়েছিল।"

অমরনাথ একটু সরিয়া আসিয়া তাহার ক্ষীণ হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া তরল কণ্ঠে বলিল—"এখনো কি তোমার সে ভয় আছে লতা?"

"একটু একটু আছে।"

"কেন লতা ?"

চারু চকিত কণ্ঠে বলিল—"সেদিন যেমন রাগ করেছিলেন আবার যদি তেমনি করেন।"

"রাগ ? রাগ না লতা। তোমার ওপর কি রাগ হ'তে পারে ? তবে নিজের ওপর হয়েছিল। কেন আমি দুর্ব্বলতার বশে নিজের কাছে রেখে তোমার তরুণ মনে যে ভুল ধারণা ছিল তাকে আরও দৃঢ় ক'রে তুলেছি। তখনি বাড়ী নিয়ে গিয়ে বাবার কাছে তোমায় দিলে তুমি কোন দিন আমায় ভুলে যেতে, সুখী হ'তে। তা না নিজের দুর্ব্বলতায় চারি দিকে অশান্তির সৃষ্টি করলাম, তোমাকে কতখানি কষ্ট দিলাম—তোমায় তো মেরেই ফেলছিলাম।"

"আপনি বাড়ী যান, আমার যেতে বড় ভয় করবে, আমি যাব না।"

"এখনো তাই ভাবছ লতা ? আর আমি বাড়ী যাব না, তোমাকেও যেতে হবে না। যদি কখনো বাবা আমাকে তোমাকে এক সঙ্গে মাপ করেন তবেই যাব, নইলে দুজনে এমনি সকলের পরিত্যক্ত হ'য়ে সুধু পরস্পরের হ'য়ে থাকব। লতা বুঝতে পারলে তো ?"

"আমায় আর কোথাও পাঠিয়ে দেবেন না ?"

"পাঠিয়ে দেবো ? চিরদিন আমার কাছে এমনি ক'রে রাখব।" বলিয়া অমরনাথ চারুকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

কিছুক্ষণ পরে অমরনাথ দেখিল চারু তেমনি অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হাতে হাত দুখানি তেমনি বদ্ধ। গভীর স্নেহে অমর তাহার মস্তকে চুম্বন করিয়া আস্তে আস্তে বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

একমাসের মধ্যে চারু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। তাহার পাণ্ডুর গণ্ডে রক্তের সঞ্চার হইয়া সে দুটীকে আবার পূর্ব্বের মত কোমল লোহিত শোভায় ভরিয়া তুলিল। তাহার করুণ চক্ষুদুটীতে আবার পূর্ব্বের মত সুনীল হাসি ফুটিয়া উঠিল। সহসা একদিন প্রভাতে উঠিয়া সে শুনিল তাহার বিবাহ।

বিবাহের পর সে বাসা ছাড়িয়া দিয়া অমরনাথ ভাল একটী ক্ষুদ্র বাগানবাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাদের মিলন-মধুর দিবারাত্রিকে অব্যাহত করিয়া তুলিল। অশ্রান্ত কর্ম্মকোলাহল ও আনাগোনার মধ্যে এ নিভৃত নিশ্চিন্ত প্রেম যেন আশ্রয় পায় না। চারিদিক হইতে শ্রুতিকঠোর শব্দ আসিয়া সে নীরব মৌন ভাষাকে সময়ে সময়ে প্রসঙ্গান্তরে চিন্তান্তরে লইয়া ফেলে। এ কর্ম্মহীন মিলনকে জড় বলিয়া উপহাস করিয়া কর্ম্মরথ তাহার ঘর্ঘরনাদী রথচক্রের নির্ঘোষে সুখালস প্রাণকে চমকিত করিয়া দিয়া যায়; কোথায় কি সামান্য অভাব আছে তাহা বড় করিয়া চক্ষের উপর আনিয়া ফেলে। সময়ে সময়ে এক-একটা ঘটনায় জানাইয়া দেয় এমন মধুর মিলনও নিশ্চিন্ত ভাবে উপভোগ করিবার যথেষ্ট বাধা আছে, সংসার তাহার তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া সময়ে সময়ে এমন তীক্ষ্ণ উপহাসের হাসি হাসিয়া উঠে যে কর্ণমূল ও গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠে। সংসারের মধ্যে সংসার বাদ দিয়াও তো চলিবার উপায় নাই।

আর এখানে ? এখানে শব্দহীন নিভৃত নিলয়ের মধ্যে এক সুর ছাড়া কেহ অন্য কোন কথা বলে না। শিশিরের শীর্ণদেহা গঙ্গা নিতান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে মধুর রাগিণী গাহিয়া উদ্যানের পশ্চাত দিয়া দিবস রজনী এক ভাবেই চলিয়াছে। যায় কোথায় বলা যায় না কিন্তু গতিরও শেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘনসন্নিবিষ্ট তরুবীথি, তাহাদেরও কোন চাঞ্চল্য নাই। প্রভাতে যখন তরুণ দম্পতী উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়া'য় তখন দুই পার্শ্বে শ্যাম দূর্ব্বাদলে শিশিরবিন্দু অনেকগুলি একত্রে জমিয়া শীতের নবোদিত নিস্তেজ সূর্য্যকিরণে চারুর অভিমানাশ্রুর মতই ঝল্ ঝল্ করিতে থাকে। পরিষ্কার আকাশে ঊষার লোহিতচ্ছটা তাহার শুভ্র কপোলের ভাবাবেগজনিত লোহিত রাগের মতই ফুটিয়া উঠে। নিহারাচ্ছন্ন কুন্দকলিকাগুলি তাহারই মত সরমসঙ্কোচে নতমুখে প্রাণপণে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সৌরভটুকু রুদ্ধ করিয়া রাখে, সূর্য্যের সোহাগতপ্ত উজ্জ্বল কর অনেক চেষ্টায় তবে তাহাদের মুখ খুলে। মধ্যাহ্নের শাসিরুদ্ধ রৌদ্রতপ্ত গৃহে নবদম্পতীর মিলনগুঞ্জনই কেবল জাগিয়া থাকে মাত্র। সন্ধ্যায় রাত্রে তাহাদের আলোকিত কক্ষে সে মিলন আনন্দে পরিপূর্ণ।

বৈকালে খোলা বারান্দায় একখানা লৌহাসনের উপরে

চারু বসিয়া নিবিষ্ট মনে কি দেখিতেছিল। অমরনাথ তখন নিকটে নাই, কক্ষের মধ্যে কি করিতেছিল। চারু জানিত এখনি অমর তাহাকে নিকটে না দেখিয়া বাহিরে আসিবে, তাই চারু যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার জন্য সম্মুখের টবের গোলাপ গাছে তাহার সঙ্কুচিত কুঁড়িটির উপর মনোনিবেশ করিয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণে অমরনাথের সহিত তাহার বড় ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল তথাপি অমরনাথ আসিল না। চারু ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া চুরি করিয়া পশ্চাতস্থ উন্মুক্ত দ্বারপথে গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল কাহাকেও দেখা গেল না। তখন ধীরে ধীরে দ্বারের নিকটস্থ হইয়া গৃহের সমস্তটা দেখিবার জন্য উঁকি দিল, ভয় হইতেছিল যদি অমরনাথ এখনি কোন গোপন স্থান হইতে বাহির হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

পশ্চাত হইতে কে একরাশ কুন্দ ফুল মাথার ও মুখের উপরে ফেলিয়া দিল। চারু চমকিত হইয়া ফিরিল। পশ্চাতে অমরনাথ। অতর্কিত আনন্দে সমস্ত মুখটী হাসিয়া উঠিল, রাগপ্রকাশ করা আর ঘটিল না।

"ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে কি দেখা হচ্ছিল ?"

"যাঃও !"

"এখনো রাগ পড়েনি বুঝি ?"

চারু মুখখানি ভারি করিয়া বলিল "না।"

"দেখ কতগুলো ফুল তুলেছি। এস দুজনে দুছড়া মালাগাঁথি, যার ভাল হ'বে তারই জিত, যার ভাল হবেনা তার হার ; সে আর আমার ওপরে রাগ করতে পাবে না।"

"আচ্ছা বেশ। আমায় কিন্তু ভাল ফুলগুলো দিতে হ'বে।"

"বাঃ তা দেবনা। দাঁড়াও সূচ সূতো আনি। ভালগুলো চুরি করো না যেন।"

"আমি বুঝি চোর ?"

"নয়ত কি ?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে অমরনাথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সূচ সূতা লইয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল —"আগে হ'তে মুখ ভার করলে চল্‌বেনা, মালা গাঁথা চাই।"

"আমি বুঝি তাতেই ভয় পাচ্চি ? আমার মালা নিশ্চয় তোমার চেয়ে ঢের ভাল হ'বে।"

"দেখা যাক্ !"

তখন দুইজনে মাল্য গ্রন্থনে নিযুক্ত হইল। উভয়েই প্রায় সমান শিল্পী, তবু অমরনাথ বয়সগুণে এক রকমে মালাটা গাঁথিয়া তুলিতেছিল কিন্তু চারুরই পূরা মুস্কিল। অনভ্যস্ত অঙ্গুলীতে সূচ কেবলই কাঁপিতে থাকে, কখনো হাতে ফুটিয়া যায়, ফুল যেটা বিদ্ধ হইতেছে সেটা সূত্রের মধ্যে এড়ো হইয়া ঝুলিতে থাকে, পছন্দ হয় না কাজেই খুলিয়া ফেলিতে হয়। দু তিন বার খুলিতে খুলিতে পরাইতে পরাইতে ফুলগুলিও বেশীর ভাগ ম্লান ও ছিন্ন হইয়া যায়। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল তথাপি চারুর সূত্রে আটটির বেশী ফুল পরানো হইল না। অমরনাথ মালার মুখে গ্রন্থি দিয়া হাস্যমুখে বলিল "এইবার কার জিত হ'ল ? আর লাগ্‌বে আমার সঙ্গে ?"

মালাটা হাতে করিয়া লইয়া অমরনাথ একবার হাসিমুখে তাহার পানে চাহিয়া কি ভাবিল, তারপরে ঝুপ করিয়া চারুর মাথার উপরে ফেলিয়া দিল। মালা মাথা গলিয়া গলায় পড়িল। চারু অভিমানে মুখ অন্ধকার করিয়া মালা খুলিয়া অমরের গায়ে ফেলিয়া দিয়া বলিল "চাইনে।"

"হেরে আবার উল্টে রাগ ? চাইনে বই কি !" বলিয়া অমরনাথ তাহাকে বুকে টানিয়া লইল। তারপরে বাম হস্তে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে অনাদৃত মালাটি কুড়াইয়া লইয়া তাহার কণ্ঠে পুনরায় পরাইয়া দিয়া লোহিত কপোল চুম্বন করিয়া বলিল "এই শাস্তি।"

"যাও আমি এ মালা নেব না।"

"কেন ?"

"আমারটা তবে গেঁথে দাও।"

"কতক্ষণ ধরে যে কষ্টে একটা গাঁথ্‌লাম, আবার ? তুমি এইটেই নাও, তোমার গাঁথা মনে ক'রে নাও।"

"তবে যাও আমি নেব না।'

"খুলে ফেল দিকিনি কত জোর আছে।"

উভয়ে টানাটানি করিতে করিতে মালা গাছটী ছিঁড়িয়া গেল। অমরনাথ হাসিয়া বলিল—"যাঃ আপদ গেল।"

চারু অপ্রতিভ হইয়া সেই ছেঁড়া মালাটাই অমরনাথের গলায় জড়াইয়া দিল।

এমন সময় উভয়ে বর্ষীয়সী পরিচারিকাকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া সংযত হইয়া বসিল। বৃদ্ধা আসিয়া অভিভাবিকার ন্যায় পরম গম্ভীর মুখে বলিল,—"না বল্লেও তো নয় বাছা, বল্লে তুমি বেরক্ত হও তাই আমি এতদিন কিছু বলিনি, বলি মরুকগে চল্‌ছে যখন কোনো রকমে তা মাঝথেকে ছেলেটাকে কেন তাক্ত করি, এর পরে আপনিই কিছু উপায় করবেই। তা খেলা করা ছাড়া তোমাদের তো আব কিছু করতে দেখিনে। ও বাড়ী থাক্‌তে ঘড়ী চেন আংটি যা যা দিয়েছিলে হরিকে দিয়ে তা বেচিয়ে এতদিন ত খরচ চালাম্নু। টাকা কমে বই তো আর বাড়েনা, এখন যা হয় একটা উপায় কর।"

বেদনার স্থানে আঘাত পাইলে যেমন লোকে বিবর্ণ মুখে শিহরিয়া উঠে অমরনাথ সেইরূপ চমকিত হইয়া উঠিল, বিশেষ চারুর সম্মুখে একথাগুলা হওয়ায় সে লজ্জা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। একথা শুনিয়া চারুর মুখ কিরূপ হইয়াছে চাহিয়া দেখিতেও তাহার সাহস হইল না, নত মুখে রহিল।

"হরির কাছে শুনমু বাছা তুমি বড় লোকের ব্যাটা, তা বাপ কি খরচপত্র দেয় না? রাগারাগি করেছ বুঝি? তা অমন কত ঘরে হয়, দুটো খোসামুদী করলেই তো হয়, বাপের রাগ বই তো আর নয়—"

"চুপ কর, চুপ কর ঝি। বাবাতে আমাতে সাধারণের মত রাগারাগি খোসামোদের সম্বন্ধ নয়। ও কথা নয়, তবে অন্য যদি কোন উপায় থাকে তো—"

"উপায় আর কি? ব্যাটা ছেলে একটা কিছু চাকরী বাকরী করলেও ত হয়।"

"চাকরী? আমি তো কিছুই জানিনা, মেডিকেল কলেজে আরও দুবছর পড়তে হত।"

"চেষ্টা কর বাছা চেষ্টা কর, ঘরে বসে থাক্‌লে কি হয়?"

"তাহলে কল্‌কাতা যেতে হয়। চারুর কাছে কে থাক্‌বে?"

"কেন আমরা রয়েছি। আর, চাকরী করলে কি দিবেরাত্তিরই মানুষ আপিসে থাকে?"

"আচ্ছা দেখি ভেবে চিন্তে। তুমি এখন যাও।"

ঝি চলিয়া গেল। অমরনাথ ক্ষণেক পরে চারুর পানে চাহিয়া দেখিল, সে নত মুখে দাঁড়াইয়া পা দিয়া মাটী খুঁটিতেছে। তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া অমর বলিল "কি ভাব্‌ছ চারু?"

চারু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল—"তুমি একবার বাবার কাছে যাও।"

"বাবার কাছে? তিনি যে আমার উপর রাগ ক'রে আছেন।"

চারু ক্ষণেক অপলকনেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া শেষে ক্ষীণস্বরে বলিল,—"সত্যি তিনি রাগ করেছেন?—কেন? তুমি তাঁর কাছে গেলেই হয়ত তাঁর সে রাগ কমে যাবে। তুমি যাও তাঁর কাছে।"

অমরনাথ ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল—"যদি না ক্ষমা করেন? আর, আমিও কি তাঁর ওপর অভিমান করতে পারি না?" তারপরে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "ঝি যা বল্‌লে, আমি একটা চাকরীর চেষ্টা দেখব, তাই ভেবে কি ওকথা বল্‌ছ?"

চারু তাহার পানে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া বলিল—"ঝি কি বল্লে? বাবা তোমার ওপর হয় ত রাগ করেছেন এই তো বল্‌লে সে। বাবা তোমার ওপর কেন রাগ করেছেন? কি এত দোষ করেছ তুমি?" বলিতে বলিতে চারুর গলার স্বর বুজিয়া আসিল।

অমরনাথ চারুকে তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝাইতে ইচ্ছুক হইল না বা পিতা যে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন তাহাও তাহার জানাইতে ইচ্ছা হইল না। যে এত সরল তাহার মনে কেন আর গরল মাখানো। অমর সহজ স্বরে বলিল "আমি যদি দিনকতকের জন্যে বিদেশে যাই, কল্‌কাতায় চাকরী করতে পারব না, তুমি থাক্‌তে পারবে তো?"

চারু সত্রাসে বলিল—"আমি একা থাকতে পার্‌বনা, আমায় নিয়ে চল।"

অমর একটু বিরক্তির স্বরে বলিল—"কবে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি হবে চারু? যাক্ এখুনি যাচ্চি না, তোমার ভয় নাই।"

চারু ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জমীদার হরনাথবাবু তাঁহার সাবেক চাল সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। তাঁহার জীবনে যে কোন' অশান্তির কারণ আছে একথা বাহিরের কোন' লোক ঘূণাক্ষরেও সন্দেহ করিতে পারিত না। যেমন পূর্ব্বে রাত্রি শেষে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া সন্ধ্যাহ্নিকে তিন চারি ঘণ্টা কাটাইয়া বেলা প্রায় আটটার সময় জমীদারী সেরেস্তায় আসিয়া বসিতেন এখনো সেই নিয়মে কাজ চালান। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় যথারীতি স্নান করিয়া অন্দরে বধূ সুরমার নিকটে আহার করিতে বসেন। সেখানে সস্নেহ হাস্যে বধূর নিকটে অনেক আদর আবদার করিয়া তাহার রন্ধনের দোষ গুণ বিচার করিয়া আহার করিতে পূরা এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগে। তারপর ঘণ্টাদুই বিশ্রাম ও একটু নিদ্রান্তে বধূর সহিত সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে কথপোকথন করিয়া পুনর্ব্বার বহির্ব্বাটীতে চলিয়া যান। তখন অনেক বিদ্যালঙ্কার তর্কালঙ্কার নৈয়ায়িক বৈদান্তিক প্রভৃতি তাঁহার বৈঠকখানার শোভাবর্দ্ধন করেন। তর্কে তর্কে রাত্রি হইয়া যায়, খানসামা আসিয়া পুনঃ পুনঃ অন্দরের অনুরোধ জানাইয়া যায় যে সন্ধ্যাহ্নিকের সময় অতীত হইতেছে। শেষে মীমাংসা শেষে পণ্ডিতগণের একবাক্যে ধন্য ধন্য ধ্বনি ও আশীর্ব্বচনের মধ্যে, তাঁহাদের রজঃশূন্য পদের ধূলি গ্রহণ ও পণ্ডিতদের প্রণামী গ্রহণের মৃদু মধুর ঝুন ঝুন শব্দের মধ্যে হরনাথবাবু সভাভঙ্গ করেন। তখন পুনর্ব্বার সন্ধ্যাহ্নিকান্তে বধূর মৃদু মধুর সস্নেহ অনুযোগ তিরস্কারের মধ্যে মাঝে মাঝে নিজের বিলম্বের কারণ দেখাইতে দেখাইতে তাঁহার জলযোগ শেষ হয় এবং অন্দরে শয়নগৃহে বিশ্রাম করিতে করিতে ধূমপানের মধ্যে দেওয়ানের সহিত জমীদারী ও সংসারের নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে কথপোকথন হইয়া থাকে। বধূর প্রতিও সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকিবার আদেশ দেওয়া আছে।

সেদিনও হরনাথবাবু সান্ধ্য জলযোগের পরে শয্যায় শুইয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। সম্মুখে মোড়ার উপরে সম্মুখে বসিয়া কথপোকথন করিতেছেন প্রবীণ দেওয়ান শ্যামাচরণ রায়। তিনি বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা গিয়াছিলেন, বৈকালে বাটী আসিয়াছেন। সেই কর্ম্মান্তর্গত বিষয়েরই আলোচনা চলিতেছিল। কর্ত্তার শয্যাপ্রান্তে একখানি পাখা হাতে লইয়া সুরমা উপবিষ্টা, শুধু শুধু বসিয়া থাকাটা মেয়েমানুষের পক্ষে অশোভন, অছিলার মত হাতে একটা কার্য্য থাকার দরকার, নহিলে বাতাসের তখন কোন প্রয়োজন ছিল না। হরনাথবাবু বলিলেন "যাক্ ওরা চির দিনটাই জ্বালাতে ছাড়্‌ছে না। আর আপিল টাপিল করবে না তো?" দেওয়ান গম্ভীর মুখে বলিলেন "এটায় আর ট্যাঁ ফোঁ কিছু করতে পারবে না বলেই তো বিশ্বাস কিন্তু বসু মহাশয়ের নতুন একটা ছুতো খুঁজ্‌তে কতক্ষণ? আর ওদের জমীদারীর সীমানা আমাদের সীমানার সঙ্গে এমনি জড়াজড়ি বাধান' যে নির্ব্বিবাদে চল্‌বার জোটী নেই। আপনি আর আমি এই দুটো বুড়োর অবর্ত্তমানে অন্য নতুন লোকে হয়ত এসব ভাল করে বুঝেই উঠ্‌তে পারবে না। আমাদের কিন্তু উচিত আগে হতেই।" কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন "তাইত আমার মাকে সব কথা শোনাতে ইচ্ছে করি শ্যামাচরণ, আমরা থাক্‌তে থাক্‌তে না বুঝতে দিলে শেষে মাকেই তো কষ্ট পেতে হবে। সব বেশ মন দিয়ে শোন ত' মা? শুনে বুঝ্‌তে চেষ্টা কোরো।"

শ্যামাচরণ রায় কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন হরনাথবাবুও সজোরে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেওয়ান হরনাথবাবুর পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমার ইচ্ছা করে আপনার সঙ্গে গোটাকতক কথা কই, যদি আপনি—"

"সেকি শ্যামা? তুমি এরকম ভাবে তো আমার সঙ্গে কখনো কথা কও না, ছোটভাইয়ের অধিকার চিরদিন তোমার কি অক্ষুণ্ণ নেই?"

"আছে। কিন্তু ভেবে দেখুন ঈশ্বর-দত্ত অধিকার যদি সামান্য মনোমালিন্যে লুপ্ত হয় তা হ'লে এ জগতে কোন্ অধিকারের গর্ব্ব থাকে?"

হরনাথবাবু কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন, শেষে বলিলেন— "অপ্রাসঙ্গিক কথা ছেড়ে দাও শ্যামাচরণ, মিছামিছি মনটা ওল্‌ট পালট করবার দরকার কি? তারপরে কলকাতায় তোমার বেহাইয়ের বাড়ী গিয়েছিলে? তারা সব ভাল আছে?"

"আজ্ঞে হাঁ। কল্‌কাতায় অনেক লোকেরই সঙ্গে দেখা হ'ল।"

হরনাথবাবু আবার থামিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"অনেক কে কে?"

"এই রাধাচরণ—শশিকান্ত—আমাদের অমরের সঙ্গেও দেখা হ'ল।"

হরনাথবাবু প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিলেন তথাপি তাঁহার অবাধ্য কণ্ঠ হইতে মৃদুভাবে নির্গত হইল "কি দেখ্‌লে?"

দেওয়ান মুখ অবনত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"কি আর দেখ্‌ব? যা আপনারা দেখাতে ইচ্ছা করেন সেই রকমই দেখলাম।"

"বুঝ্‌তে পারলাম না শ্যামা, শরীর খুব খারাপ বুঝি?"

"শরীর যত না হোক্‌ অন্যান্য অবস্থা তাই। চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছে দেখ্‌লাম।"

"চাকরী খুঁজে? আর পড়া হয় না বুঝি?"

"পড়বে কিসে? আর তো তাকে কিছু দেওয়া হয় না।"

হরনাথবাবু সজোরে গড়গড়া টানিতে আরম্ভ করিলেন। সহসা হাসিয়া সুরমাকে বলিলেন—"মা, পাখাটা রাখ, অত জোরে বাতাস দিওনা।"

সুরমা কুণ্ঠিত ভাবে পাখা রাখিয়া দিয়া উঠিল।

"বোস, উঠ্‌ছ কেন মা?"

আবার সে বসিয়া পড়িল।

হরনাথবাবুকে নীরব দেখিয়া দেওয়ান একটু কাশিয়া পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন—"এতে কিন্তু আপনার নিজেকে খর্ব্ব করা হচ্চে। আপনার স্নেহহারা হ'য়ে তার যে অনুতাপ না হয়েছে হয়ত অর্থাভাবে তাই হবে। তখন হয়ত আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে আস্‌বে। তার মূল কারণ কিন্তু সামান্য অর্থের প্রাধান্য!"

হরনাথবাবু কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—"তা ঠিক্‌। সে কিছু বলেছে?"

"বল্‌বে আর কি? আমিই বল্‌লাম যে চল আমার সঙ্গে, তিনি যদিই সম্পূর্ণ ক্ষমা না করেন তবু আংশিক ভাবে করতে পারেন হয়ত। তাতে সে বল্‌লে যে বাবা যদি আমায় তেমন ক্ষমা করেন তা আমি চাইনা। তা যদি করি তবে আমি তাঁর কুপুত্র। তিনি যদি কখন' তেমনি ক'রে 'অমর' বলে ডাকেন তবেই তাঁর কোলে যাব নইলে সে কোলের পরিবর্ত্তে তাঁর দয়া আমি চাই না।"

হরনাথবাবু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তেজটুকু খুব আছে।"

"সে আপনারই ছেলে। সেটুকু থাকা তার দরকার।"

"যাক্‌। তবে যে বল্‌লে অর্থের জন্যে সে ক্ষমা চাইবে?"

"ভবিষ্যতের কথা বল্‌ছি। আরও দেখুন, আপনার ছেলে চাকরীর চেষ্টায় অনাহার অনিদ্রায় সেই কল্‌কাতার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায় এটা আপনার সম্ভ্রমের হানিকর। ঘরের বিবাদ পরকে জানাবার কি দরকার? সে আপনাকে উপেক্ষা করেছে এটা লজ্জারই বিষয়, বাইরে সেটা লোক জানাজানি না ক'রে নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে তাকে উচিত মত সাহায্য ক'রে নিজের মান অক্ষুণ্ণ রাখুন। তার পরে তাকে আপনি মনে ক্ষমা না করতে পারেন কখনো তার মুখ দেখবেন না। যে অধিকার সে চেয়েছে তা তাকে কখনো দেবেন না। এই তো তার উপযুক্ত শাস্তি! টাকা বন্ধ ক'রে তাকে মনে বেশী বেদনা দিতে পারবেন যদি ভেবে থাকেন সেটা ভুল কর্‌ছেন। সে আপনার ছেলে—তার শাস্তি অন্য রকম।"

হরনাথবাবু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—"কথায় কথায় অনেক রাত্রি হ'য়ে গেল, আর দরকার নেই। যাও তুমি একটু বিশ্রাম কর গে পথশ্রমে ক্লান্ত আছ।......বৌমা, আর আজ কিছু খাবনা, তুমিও শোওগে মা। রামাকে একবার ডেকে দিতে বল, আলো টালো গুলো সরাবে।"

সুরমা দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"কিছু খাবেন না বাবা? একটু দুধ?"

"না,......আচ্ছা, দাওগে রামাকে দিয়ে পাঠিয়ে। শ্যামাচরণ, তুমি এখনো খাওনি হয়ত?"

"আজ্ঞে না, সে জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি শোন।"

শ্যামচরণ রায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হরনাথবাবু সুরমাকে তখনো দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া

বলিলেন "যাও মা, খেয়ে দেয়ে শোওগে।" শ্বশুরের আদেশসূচক কণ্ঠস্বরে বধূ আর বাক্যব্যয় না করিয়া ধীর পদে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

হরনাথবাবু চাকরকে আলো সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ করিতে আদেশ দিয়া শয়ন করিলেন। যথাকর্ত্তব্যান্তে চাকর চলিয়া গেল।

অন্ধকার কক্ষে শয্যার উপর পড়িয়া তিনি নিদ্রাদেবীর যথাসাধ্য উপাসনা করিলেও নিদ্রাদেবী নিতান্ত অকৃপা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিনিদ্র মুদ্রিত চক্ষের উপর দিয়া সে কালের অনেক চিত্র ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিতেছিল। নিজের প্রথম যৌবন, সেই অমল পত্নীপ্রেম, সে ভালবাসার মধ্যেও পুত্রাভাবে মধ্যে মধ্যে বিষাদ, শেষে সেই স্নেহপ্রতিমার ক্রোড়ে সেই অমল শুভ্র স্নেহপুত্তলটির আবির্ভাব যেন চক্ষের উপর নূতন হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেদিনের সেই হর্ষোচ্ছ্বাসের স্মৃতি আজও তাঁহার সর্ব্বশরীর তেমনি কণ্টকিত করিয়া তুলিল। কোমল শয্যায় আপনাকে সম্পূর্ণ মগ্ন করিয়া দিয়া হরনাথ বাবু সেই সুখস্পর্শ আজও যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

মানুষ স্মৃতি লইয়া এমনি পাগল। হয়ত সে সুখের বা দুঃখের মেলা কোন দিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ধুলাকাদা ধুইয়া মুছিয়া সংযত ভাবে মানুষ তখন নিজের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া সম্পূর্ণ নূতন জীবন আরম্ভ করিয়া নিজের দেনা পাওনা হিসাব নিকাশের কারবার চালাইতেছে, তথাপি সেই নূতন জীবনের মধ্যেই স্মৃতি তাহাকে কোন সময় হাসিবার স্থানে হয়ত চক্ষে জল আনিয়া দেয়, কাঁদিবার সময় হয়ত তাহাকে হাসাইয়া দর্শকের কাছে অধিক হাস্যাস্পদ করিয়া তুলে।

তার পরে মনে আসিতে লাগিল সেই গভীর আনন্দের হিল্লোলে কালচক্রনেমির আবর্ত্তন হইতে না হইতেই প্রকাণ্ড এক প্রস্তরখণ্ড অকস্মাৎ আসিয়া সবলে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল। মুহ্যমান তিনি দ্বিগুণ আবেগে মাতৃহীন শিশুকে বক্ষের নিকটে টানিয়া ধরিলেন; এত দিন দুইজনে তাহার সুখ দুঃখের ভাগ লইতেছিলেন এখন হইতে তিনি তাহার একা, সেও তাঁহার একা। সে দিনের বেদনার স্মৃতিতে হরনাথবাবু আজও তেমনি শয্যায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। শেষে অতি কষ্টে বহুক্ষণ পরে নিদ্রা আসিল। সে নিদ্রাটুকুও স্বপ্নময়, স্বপ্নও সেই শিশুর বাল্যস্মৃতিময়।

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। মধ্যাহ্নে যথারীতি আহার করিলেন। সুরমা তাঁহার অসাধারণ গম্ভীর মুখ দেখিয়া কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া গেল। সমস্ত দিন তিনি কাহার' সহিত ভাল করিয়া কথা কহিলেন না। দেওয়ানও সমস্ত দিন তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইল না।

সন্ধ্যাকালে নিয়ম মত সন্ধ্যাহ্নিক ও জলযোগান্তে হরনাথ বাবু দেওয়ানকে ডাকাইলেন। আদেশ মত বধূও পাখা হস্তে শয্যাপ্রান্তে স্থান গ্রহণ করিল। দুই একটা কথাবার্ত্তার পর হরনাথবাবু দেওয়ানের পানে না চাহিয়া একখানা খবরের কাগজ দেখিতে দেখিতে বলিলেন—"আমি এখন ভেবে চিন্তে দেখ্‌লাম নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে তাকে আমার মাসহারা দেওয়া উচিত।"

দেওয়ান কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন—"বেশ। শুধু এইটুকু মাত্র যদি কর্ত্তব্য বোঝেন তবে তাই করুন। তার পরে সে আপনার দান নিতে স্বীকার হয় না হয় সে পরের কথা।"

"পরের কথা নয়। আমার সম্ভ্রমের জন্যে তাকে বাধ্য হয়ে নিতে হবে। বৌমা, তোমার মত জানতে চাই, লজ্জা না ক'রে স্পষ্ট কথা বল। মাসহারা দেওয়া ঠিক কিনা?"

সুরমা ধীরে ধীরে তাহার নতমুখ শ্বশুরের দৃষ্টির সম্মুখে উন্নমিত করিল, তার পরে স্থির কণ্ঠে বলিল—"না।"

"না? তাকে কিছু দেওয়া উচিত নয়? তুমি এমন বল্‌বে আমি আশা করিনি।"

"না বাবা, ক্ষমা যদি করতে পারেন তাই করুন। মনে করলেই আপনার পক্ষে তা সহজ।"

"ওঃ—তাই বল্‌ছ? না, তত সহজ নয়। আমি আরও শাস্তি তাকে দিতে চাই?"

দেওয়ান বলিয়া উঠিলেন—"এটা আপনার মত বাপের ঠিক হচ্চে না।"

"আমার মত বাপেরই ঠিক হচ্চে, এ আমারই পক্ষে সম্ভবে।" তার পরে বধূর পানে ফিরিয়া বলিলেন—"মা, তুমি তাকে ক্ষমা করতে পার? বল তুমি তাকে ক্ষমা করেছ, এখনি আমিও তাকে ক্ষমা করছি। কিন্তু মিথ্যা বলোনা, যথার্থ যা সত্য তাই তোমায় বলতে বল্‌ছি।"

দৃঢ়পদবিক্ষেপে সুরমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। তাহার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে 'না' শব্দ ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল।

পরদিন অমরের নামে দেওয়ান একশত টাকা কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। দিন চারেক পরে তাহা ফেরত আসিল। অমর ইনসিওর লেফাফার পশ্চাতে এই কয়টি কথা লিখিয়া দিয়াছে—"কাকা, আপনার স্নেহ চিরদিন স্মরণ থাকিবে, আপনি আমার জন্য বাবার দ্বারা এই বন্দোবস্ত করাইয়াছেন বুঝিয়াছি। আপনাকে ধন্যবাদ, আমি এ স্নেহের অযোগ্য।" সজল চক্ষে দেওয়ান পত্রখানি কর্ত্তার হস্তে দিলেন।

তৎক্ষণাৎ হরনাথবাবু এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিলেন। "আমি জমীদার হরনাথ মিত্র, আমার পুত্র তুমি, ইহা সকলেই জানে। কাজেই আমার সম্ভ্রম কতকটা তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। তুমি কোন ছোট চাকরী করিলে সে অপমান আমায়ও পৌছিবে। অতএব যতদিন না তুমি তোমার অবস্থা সচ্ছল করিতে পারিতেছ ততদিন তোমার খরচ কারণ একশত টাকা মাসে মাসে যাইবে এবং তুমি তাহা লইতে বাধ্য। ইহা ভিন্ন তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন' সম্বন্ধ নাই। ইতি। শ্রীহরনাথ মিত্র।"

কয়েক দিন পরে হরনাথবাবু অমরনাথের একখানি পত্র পাইলেন। আবেগকম্পিত হস্তে খুলিয়া পড়িলেন। "আপনার সম্মানের জন্য আমার মস্তকে যে শাস্তিভার প্রদান করিলেন তাহা আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম। আপনার ত্যক্ত হইয়াও আপনার অর্থেই আমি এখনো পরিপুষ্ট হইতে থাকিব, ইতি। অমর।"

পত্রখানি বহুবার পাঠ করিয়া সযত্নে তাহা ক্যাশ বাক্‌সের মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া হরনাথবাবু বহুকালের শুষ্ক প্রশান্ত চক্ষু হইতে বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

বাঙ্গালা শব্দকোষ

[সাঙ্কেতিক শব্দ—ও°—ওড়িয়া, গ্রা° গ্রাম্য, বা°—বাঙ্গালা, সং - সংস্কৃত, স° প্রা°—সংস্কৃত-প্রাকৃত, হি° - হিন্দী]

নিজের বিষয়ে নিজের কাজের সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে একদিকে যেমন অহমিকা প্রকাশ পায়, অন্যদিকে পাঠকের নিকট তেমন 'বিজ্ঞাপন' মনে হয়। কিন্তু যে বিষয়ে লিখিতে বসিতেছি, ঘুরাইয়া লিখিলেও তাহাতে অহমিকা প্রকাশের আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া, বিষয়টা ঠিক নিজের নয়। বাঙ্গালা শব্দ বাঙ্গালীর; তাহাতে কেবল তোমার আমার সম্বন্ধ নাই। বিশেষতঃ সাহিত্য-পরিষদ গত কয়েক বর্ষের পত্রিকায় আমার বাঙ্গালা শব্দকোষ সঙ্কলনের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। কেহ কেহ ভাবিয়াছেন আমি রাঢ়ের গ্রাম্য-শব্দ সংগ্রহ করিতেছি, এই সংগ্রহে কৌতুহলীর দুর্ব্বহকালকর্ত্তনের সুবিধা হইবে, বাঙ্গালা ভাষার ইষ্ট সাধিত হইবে না। ইহারও একটা উত্তর আবশ্যক।

আমার বাঙ্গালা ভাষা-চর্চার ইতিহাস কৌতুকাবহ। ইহার আরম্ভ খেলায়; এখন খেলা গিয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে শতবার মনে হইয়াছে শেষ হইলে বাঁচি। আট দশ বৎসর পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই, বাঙ্গালা ভাষার শব্দ অক্ষর প্রভৃতি লইয়া কালক্ষেপ করিতে হইবে, কিংবা বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার যোগ্যতা হইবে। বর্ষাকালে একদিন অপরাহ্ণে অনেকক্ষণ ধরিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, নিত্য লেখা-পড়ায় মন গেলনা। সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রাপ্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের সঙ্কলিত 'বাঙ্‌লা ক্রিয়াপদের তালিকা' চোখে পড়িল। দুই-এক পৃষ্ঠা উলটাইতে উলটাইতে মনে হইল আরও ক্রিয়াপদ আছে। তালিকার শেষে অনুরোধপত্র ছিল যে নূতন ক্রিয়াপদ মনে হইলে তালিকায় লিখিতে হইবে, বাঙ্গালা শব্দ একত্র করিতে হইবে। যাঁহারা জানেন তাঁহারা লিখিবেন, পরিষদের সম্পাদকের অনুরোধ পালন করিবেন; আমি খেলাচ্ছলে নূতন ক্রিয়াপদ লিখিতে বসিলাম। লিখিতে বসিলাম, কিন্তু কলম চলিল না। ক্রিয়াপদটা এই না অই? বানানে ই না এ, স না শ?

ইত্যাদি সন্দেহে পড়িয়া ভাবিলাম, যার কর্ম তারে সাজে—কথাটা সত্য। ইতিমধ্যে ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তের দুই বন্ধু বাঙ্গালাভাষা শিখিবার মানসে আমায় দুই তিন বার পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে বসিয়া কি বই পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতে পারিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। 'পরে জানাইব' লিখিয়া, কথাটা চাপা দিলাম। বাঙ্গালা ভাষা শেখা সহজ কিনা, এ প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ মনে উঠিতে লাগিল। একদিন মনে হইল, দেখি কতগুলা বাঙ্গালা শব্দ জানি। বলা বাহুল্য লিখিতে বসিয়া সে দিনও নিজের অযোগ্যতা বুঝিতে কাল-বিলম্ব হইল না। পরে, বানানের ভাবনা ছাড়িয়া যেমন-তেমন করিয়া শব্দ লিখিতে বসিলাম। এখানেও বিপত্তি। শব্দগুলা এলা মেলা আসিতে লাগিল। এমন ভাবে শব্দ একত্র করিয়া ফল নাই। শব্দগুলা ঠিক কি বে-ঠিক তাহাও জানি না, অর্থও স্পষ্ট জানি না। পর বৎসর বৈশাখ-মাসে অসহ্য গ্রীষ্মের তাড়নায় পুরীতে প্রবাস করি। পুরীর বায়ুতে দেহ অবসন্ন নিশ্চেষ্ট হয়। মধ্যাহ্ন-আহারের পর সময় কাটানা দুষ্কর হইয়া উঠিল। একখান খাতা লইয়া আবার বাঙ্গালাশব্দ-খেলা আরম্ভ করিলাম। তখন বুঝিলাম সূতা দিয়া গাঁথিতে না পারিলে শব্দের ক্রম থাকিবে না, কত শব্দ জানা আছে, তাহাও জানিতে পারা যাইবে না। আমাদের জ্ঞানের বিভাগ কল্পনা করিলাম, অমর-কোষের বর্গের ন্যায় বর্গ ধরিলাম। এখন সূত্র পাওয়া গিয়াছে, বানানের বিচার নাই, দুই সপ্তাহে প্রায় সাত হাজার শব্দ একত্র হইল! গণিয়া আশ্চর্য্য হইলাম; এত শব্দ মাথার ভিতর লুকাইয়া ছিল, জানিতাম না। অনেক শব্দ অদ্যাপি ছাপায় উঠে নাই। কোন্ ছেলেবেলা গ্রামে একবার শুনিয়াছি, দেখি সে শব্দ আসিয়া উপস্থিত! চিরকাল প্রবাসী হইয়াও আমরা মাতৃভাষার এত শব্দ—মূল শব্দ—মনে রাখি, না গণিলে বিশ্বাস হইত না। এইখানে খেলা শেষ হয়, খাতা পড়িয়া থাকে। পরে শব্দগুলা গুছাইয়া অর্থ দিয়া সাহিত্য-পরিষদে পাঠাইবার কল্পনা হয়। তখন সেই বানান-সমস্যা আবার প্রকট হইয়া উঠিল। প্রকৃতিবাদ, প্রকৃতি-বোধ অভিধান ঘাঁটিলাম। আমার সঙ্কলিত শব্দের অত্যল্প শব্দ বাঙ্গালা অভিধানে আছে। প্রকৃতি-বাদে আথ পরিবর্তে 'আউক' লেখা দেখিয়া ভাবিলাম কোষকার কোন্ দেশের শব্দ লিখিয়াছেন। ইহার পর বাঙ্গালা ছাপা অভিধান ব্যাকরণ হইতে সাহায্যের আশা ছাড়িয়া দিয়া শব্দশিক্ষা আরম্ভ করিলাম। দুইখান সংস্কৃতকোষ আদ্যন্ত পড়িতে পড়িতে মনে হইতে লাগিল আমার সঙ্কলিত শব্দের অনেকগুলা সংস্কৃতের অপভ্রংশ। ফ্যালোন সাহেবকৃত হিন্দুস্থানী অভিধান পড়িয়া বাঙ্গালাভাষায় চলিত যাবনিক (আর্বী ফার্সী) শব্দগুলা চিনিতে শিখিলাম। অনুমান ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল যে এতকাল যে শব্দ 'দেশজ' অর্থাৎ আর্যভাষাসম্ভূত না হইয়া প্রাচীন বঙ্গীয় অনার্যভাষা হইতে প্রাপ্ত বলিয়া রটিয়াছিল, সে শব্দ 'দেশজ' নহে, সংস্কৃতমূলক। প্রকৃতিবাদে লেখা আছে বাপ শব্দ তুর্কী-ভাষা হইতে আসিয়াছে! কেবল প্রকৃতিবাদ নহে, যে অভিধানে বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় আছে, তাহাতেই—'দেশজ' 'দেশজ'—এই এক মন্ত্রে শ্রমলাঘব করা হইয়াছে। আমি শব্দের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া একেবারে বিপরীত প্রকৃতি ধরিলাম। ধরিলাম, বাঙ্গালা-ভাষায় 'দেশজ' শব্দ নাই। যেহেতু শব্দটির মূল বুঝিতে পারিতেছি না, কোন্ সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ বোধ হইতেছে না, অতএব ইহা 'দেশজ'—এইরূপ যুক্তির কুহকে ভুলিলে চলিবে না।

ধরিলাম, শব্দটা সংস্কৃতের অপভ্রংশ। যদি অপভ্রংশ, তবে সে সংস্কৃত শব্দটা কি? বিজ্ঞানে বলে, জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে যাইতে হয়। যে যে বাঙ্গালাশব্দের সংস্কৃত মূলে সন্দেহ নাই, সে সে শব্দ-পরিবর্তনের সূত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম এক এক শব্দের উচ্চারণে প্রাচীনরূপের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। গোড়ার দিকে না গেলে সংস্কৃতরূপ পাওয়া যায় না। এই হেতু কয়েকখানি প্রাচীন পুস্তক মনোযোগ পূর্বক পড়িতে লাগিলাম। এক অঞ্চলে পরে পরে রচিত পুস্তক পড়িলে ভাষার পরিবর্তন-ক্রম বুঝিতে পারা যায়। এ কারণ পুস্তকরচনার কালও স্থূলতঃ জানা আবশ্যক হয়। কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণদাস পড়িলাম। সব সমানভাবে পড়িতে পারি নাই। কৃত্তিবাস

ও কবিকঙ্কণ পড়িতেই তিনমাস লাগিয়াছিল। এই সময় সাহিত্য-পরিষদ হইতে মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল প্রচারিত হয়। ইহার ভূমিকায় লেখা ছিল এই ধর্ম্মমঙ্গল প্রায় তিনশত বৎসরের পুরানা। দুই এক পৃষ্ঠা পড়িতে না পড়িতে ভূমিকার ভুল বুঝিতে পারিলাম। কিছু দিন পরে পরিষদ হইতে প্রকাশিত শূন্যপুরাণ পাইলাম। বলা বাহুল্য তাহা প্রাচীন বলিয়া বিশেষ করিয়া পড়িতে হইয়াছে। এই সব পুরাতন পুস্তক হইতেও শব্দ সংগ্রহ করিতে করিতে কোষের শব্দ বাড়িতে লাগিল।

শব্দের বর্তমান উচ্চারণ এবং স্থানবিশেষে রূপান্তর-প্রাপ্তি—দুই-ই শিক্ষা করা আবশ্যক। শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় পক্ষে বিভিন্ন স্থানীয় রূপান্তর আলোচনায় ফল আছে। দুঃখের বিষয়, এই পথ আমার নিকট রুদ্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কয়েক স্থানের গ্রাম্য শব্দের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব তালিকার একটা দোষ এই যে সংগ্রাহক নিজের ইচ্ছামত বানান দিয়াছেন। একই শব্দ বিভিন্নবানান-হেতু বিভিন্ন বোধ হয়। শব্দের ধ্বনিটাই আসল। প্রচলিত বানানের সহিত মিলাইয়া লিখিলে পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হয় বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ জানিতে না পারিলে সংগ্রাহকের নিজের পরিকৃতির পরিমাণ পাওয়া যায় না। আরও এক কথা, বর্ণানুক্রমিক শব্দতালিকা না করিয়া বর্গানুক্রমিক করিলে জ্ঞাতব্য শব্দ শীঘ্র পাওয়া যায়।

শব্দের মূল ধরিবার পক্ষে সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণশিক্ষা অত্যাবশ্যক। যে সং-প্রাকৃতভাষা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, ঠিক তাহার ব্যাকরণ নাই। তথাপি দেশের সং-প্রাকৃতভাষার মধ্যে কতক সাম্য ছিল বলিয়া যে-সে প্রাকৃত-ব্যাকরণ হইতে সাহায্য পাওয়া যায়। আশ্চর্য এই যে, যাহাকে আমরা গ্রাম্য শব্দ গ্রাম্য উচ্চারণ বলি, তাহা প্রায়ই প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত। যাঁহারা কাগ বগ শাগ কম্ম ধম্ম জন্ম প্রভৃতি শব্দ 'গ্রাম্য' 'অশুদ্ধ' 'প্রাদেশিক' প্রভৃতি ভাবিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা বাঙ্গালা-ভাষার সংস্কৃত অঙ্গমাত্র দেখিয়া অ-সংস্কৃত অঙ্গ বিস্মৃত হয়েন। শব্দের বানানে সংস্কৃত আকার দেখাইয়া অজ্ঞের চোখে ধূলিনিক্ষেপে কৃতিত্ব নাই। বাঙ্গালাভাষার অস্থি-মজ্জায় সং-প্রাকৃতভাষার প্রভাব বিদ্যমান। সে প্রভাব অতিক্রম করিয়া সংস্কৃতের সমাদর করিতে গেলে বাঙ্গালা নামে ভাষাই থাকিবে না। যাঁহারা বানানে শব্দের ইতিহাস দেখিতে চাহেন, যাঁহারা মনে করেন বানানে সংস্কৃতমূল দেখাইতে পারিলে ভাষাশিক্ষায় পরম লাভ হয়, তাঁহারা তুলসী-চন্দন দিয়া ভাষাই উপাস্য জ্ঞান করেন। পরে এ বিষয় দেখা যাইবে।

শব্দের মূল পাইবার আর এক পথ, ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী সংস্কৃতমূলক ভাষার শব্দবিচার। এখন প্রথম প্রশ্নের আর এক আকার দাঁড়াইল। যদি বাঙ্গালা ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী—এই চারি ভাষায় একটা শব্দের অনুরূপ আকার পাই, তবে সে শব্দ সংস্কৃতমূলক। কারণ দূরবর্তী স্থানের বিভিন্নজাতির পক্ষে 'বঙ্গদেশজ' শব্দ-গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল না। অবশ্য শব্দটা যাবনিক (ফার্সী কিংবা আর্বী) হইলে ভারতের সব প্রদেশে স্বকীয় আকারে কিংবা রূপান্তরে থাকিতে পারে। উর্দু শব্দের কি উর্দু ভাষার পৃথক অস্তিত্ব নাই। কিন্তু যাবনিক শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ মূলে এক না হইলে চারি ভাষায় থাকিবে কেন? সে ল যে সংস্কৃত, তাহাতেও সন্দেহ কি? যাহা হউক, সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রচারিত 'বাঙ্গালা ভাষা'র ২য় অধ্যায়ে—শব্দশিক্ষাধ্যায়ে পাঠক এই ত্রিবিধ ক্রম দেখিতে পাইবেন।

একবার সূত্র ধরিতে পারিলে কাজ কতক সোজা হইয়া দাঁড়ায়। এখনও কিন্তু অনেক বাকি। গোটা শব্দের যেন মূল দেখিলাম, শব্দের ডালপালা দেখিবার উপায় কি? ব্যাকরণ। এই হেতু বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ লিখিতে হইয়াছে। শব্দকোষ লেখা অসম্ভব, শুধু ব্যাকরণ লেখা অস । দুই একত্র করিলে ভাষা বুঝিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, ব্যাকরণ-রচনাতেও তুলনাত্মকপদ্ধতি প্রচুর অবলম্বিত হইয়াছে।

শব্দ সংগৃহীত হইল, অনেক শব্দের মূলও নির্ণীত হইল। এখন গুছাইয়া লিখিবার কথা। এখানে এক ক্ষুদ্র বিষয় বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল। শব্দগলা খাতায় লেখা ছিল; লিখিতে লিখিতে খাতায় স্থান হয় না, যে শব্দের পরে যে শব্দ বসার প্রয়োজন, সে শব্দের স্থান

হয় না, অ আ বর্ণানুক্রমে শব্দবিন্যাস দুষ্কর হইল। আশ্চর্য এই, অন্য পুস্তকের সূচী লিখিতে যে উপায় ধরিয়াছি, তাহা মনে হইল না, শব্দের জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে বসিলাম।

বাঁধা খাতা ফেলিয়া খোলা আ-বাঁধা খণ্ড খণ্ড কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। অনেক সময় অ ব্যবসায়ীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে এইরূপ ঘোর পথে ঘুরিতে হয়, জানা উপায় নূতন আবিষ্কার করিতে হয়। যখন কূল পাইয়াছি, তখন স্মরণ হইল মেক্‌সমুলর সাহেব তাঁহার এক বহিতে এইরূপ খণ্ড খণ্ড কাগজে শব্দ লিখিতে উপদেশ করিয়াছেন। এখনও আমার টেবিলের এক পাশে এক গাদা কাটা কাগজ আছে, যখন কোন্ শব্দ মনে আসে কিংবা কোন্‌টার ব্যুৎপত্তি মনে আসে অমনই তাহা লেখা হইয়া আর এক পাশে পড়ে। অবসর হইলে লেখা কাগজগুলা পরে পরে গুছাইতে অধিক সময় লাগে না। এখানেও একটা ক্ষুদ্র কথা শিখিবার আছে। কাগজ অনেক হইলে যথাস্থানে বসাইতে সময় লাগে। শব্দের আদ্যক্ষর দেখিয়া প্রথমে বর্গে বর্গে ভাগ, তার পর অক্ষরের স্বর দেখিয়া স্বরে স্বরে ভাগ করিবার পর যথা স্থানে আনা সহজ হয়। ঠেকিয়া শেখায় জ্ঞান, মস্ত জ্ঞান। যাঁহারা কোষ-সঙ্কলনাদি কর্মে কর্মী হইয়াছেন, আমার এই কাহিনী শুনিয়া হয়ত তাঁহারা হাসিবেন। ইহার উপর যখন শুনিবেন যাবতীয় কর্ম নিজে করিতে হইয়াছে ও হইতেছে, লিপিকার নিযুক্ত করিয়া শ্রম দুনা হইয়াছে, তখন হয়ত গভীরভাবে এ কর্ম ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিবেন। লিপিকারের অপরাধ নাই; একদিনে একমাসে এক বৎসরে যাহা সিদ্ধ হয় নাই, তাহা দুই দশটা মৌখিক উপদেশে কোথায় হইবে।

কোষের নিমিত্ত উল্লিখিত চতুর্বিধ ক্রমও পর্য্যাপ্ত হয় না। মূলের সহিত বাঙ্গালা শব্দের অর্থের সাম্য না হইলে মূলনির্ণয়ে সন্দেহ হয়। শব্দশিক্ষার সূত্রানুসারে মূল আসিল, কিন্তু বাঙ্গালা শব্দের অর্থ দূরে থাকিল, এমনও ঘটিয়াছে। এ রকম স্থলে আর এক সূত্র পাইয়াছি। দেখা যায়, সে শব্দের অনুরূপ শব্দ অন্য তিন ভাষাতে নাই, তখন বুঝিতে হয়, মূল সংস্কৃত শব্দের অর্থ-সম্প্রসারণে বাঙ্গালা শব্দের অর্থ আসিয়াছে।

এই পঞ্চবিধ ক্রমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যথা, (১) অ'ল-তলা একটা শব্দ আছে। অর্থ, ঘরের ছাঁচার তলা। সংস্কৃত মূল কি? অ'ল-তলা উচ্চারণ হইতে বুঝিতেছি, অইল শব্দের সংক্ষেপে অ'ল। স্বরবর্ণ বিপ্রকৃষ্ট হইতে পারে। অতএব শব্দটি অলি হইতে পারে। কিন্তু, সংস্কৃত অলি শব্দের অর্থ বাঙ্গালা হইতে ভিন্ন। অতএব সংস্কৃত শব্দের দুই এক বর্ণ লুপ্ত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত কোষে দেখি, বলীক শব্দের অর্থ ঘরের চালের প্রান্ত (যথা, অমরে, বলীক নীধ্রে পটলপ্রান্তে)। শব্দশিক্ষায় পাইয়াছি ব ক লুপ্ত হইতে পারে। অতএব সং বলীক হইতে বাং অলি অইল—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ঘটনাক্রমে ওড়িয়া ও হিন্দীতেও অনুরূপ শব্দ আছে। ওং-তে উলী, হিং তে ওলতী শব্দের অর্থ বাং অলিতলা। অতএব আমার কোষে অলিতলা শব্দ মূল, অ'লতলা সংক্ষিপ্ত কিংবা ভ্রষ্ট বিবেচিত হইয়াছে। (২) আমরা ইচড় জানি। শব্দটা যাবনিক কিংবা ম্লেচ্ছ নহে। ইহার অনুরূপ শব্দ অন্য তিন ভাষায় নাই। প্রশ্ন এই, যদি শব্দটা সংস্কৃত হইতে আসিয়া থাকে, তবে সে সংস্কৃত শব্দটা কি হইতে পারে? ই-চ-ড়—শেষের ড় মূলশব্দে টবর্গের বর্ণ হইতে পারে। ইচট, ইচড, ইচণ ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ নাই। ত স্থানে চ হইতে পারে। ইতট, ইতড ইত্যাদি শব্দও নাই। হয়ত দুই একটা বর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত-কোষে দেখি ইৎকট, উৎকট শব্দ আছে, অর্থ বিষম। ইহা হইতে অর্থ ওকড়া গাছ। এখন মনে হইল ওকড়া ফলের গায়ে যেমন কাঁটা কাঁটা আছে, কাঁচা কাঁঠালের গায়েও তেমন আছে। এই হেতু ইৎকট হইতে ইচড় নাম আসিয়া থাকিবে। শব্দশিক্ষায় দেখিতে পাই, ত স্থানে চ হইতে পারে, ক লুপ্ত হইতে পারে। অতএব সং ইৎকট হইতে বাং ইচড় শব্দ আসিয়াছে। (৩) একটা শব্দ, (রাঢ়ের গ্রাং উচ্চারণে) এবড়ো-খেবড়ো আছে। ইহার সংস্কৃত মূল কি? দেখা যায়, অনেক শব্দের আদ্য আ রাঢ়ীয় বিকারে এ হইয়া গিয়াছে। খাজুর-কে রাঢ়ে বলে খেজুর, বুড়া-কে বলে বুড়ো। অতএব শব্দটা আবুড়া-খাবুড়া হইতে পারে। শেষের ড় সং তশব্দে অবশ্য নাই। টবর্গ

কিংবা তবর্গের বর্ণ স্থলে ড় আসিয়া থাকিবে। আরও জানি, বাঙ্গালা শব্দের আদ্য আ সংস্কৃতমূলে প্রায়ই অ থাকে, এবং অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃত শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ সংযুক্তবর্ণ থাকে। ওং-তে আবুড়া-খাবুড়া আছে, হিং-তে উবড়-খাবড়। অতএব মূলে সংস্কৃত আছে। সং অর্বুদ হইতে আবুড়া এবং সং খর্পর হইতে খাপরা—খাবড়া হইতে পারে। অর্থে দেখিতেছি, আবুড়া-খাবুড়া—অর্বুদ ও খর্পরাদির তুল্য। শব্দটি আব্ড়া-খাব্ড়া লেখা যাইতে পারে, কারণ আকারান্ত শব্দের উপান্ত স্বর লুপ্ত হইতে পারে। তথাপি বুড়া লিখিলে শব্দটি পূর্ণ হয়, এবং অক্লেশে রাঢ়ের উচ্চারণ পাওয়া যায়। (৪) আমরা সময়ে সময়ে ঝঞ্ঝাটে পড়ি। ঝঞ্ঝাটের সং মূল কি? ঝঞ্ঝাটের রাঢ়ীয় গ্রাং রূপ ঝঞ্জট। ঝ স্থানে জ হইতে পারে এবং কখন কখনও ঝঞ্জাট শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব শব্দটা ঝঞ্ঝাট ধরা গেল। সং-তে ঝঞ্ঝা-বাত শব্দ আছে। ব লুপ্ত হইতে পারে, এবং ত স্থানে ট আসা বিচিত্র নয়। অতএব সং মূল ঝঞ্ঝাবাত—কিনা প্রচণ্ডপবন। বাং-তে অর্থ-সম্প্রসারণে পবন অর্থ গিয়া আসিয়াছে দুর্যোগ, গোলোযোগ, ফের ইত্যাদি। ব্যাকরণের সাহায্যের দৃষ্টান্ত লই। (৫) একটা শব্দ আছে যেটা নেন্জাড় লেন্জাড় নান্জাড় শুনি। শেষাংশ জাড়, প্রথমাংশের (নেন্ লেন্) একার কুটিল বা বক্র শুনিতে পাই। অতএব একার না হইয়া আকার শুদ্ধ হইতে পারে। ল স্থানে ন আসিতে পারে, বিশেষতঃ পরে ন্ আছে বলিয়া প্রথম ল সহজে ন হইতে পারে। হয়ত শব্দটা লান্জাড়। লাঙ্গুল—লেজকে ওং-তে বলে লান্জ্। অতএব লাঞ্জ শব্দে ব্যাকরণের আড় প্রত্যয় যুক্ত হইয়া লাঞ্জাড় শব্দ হইয়াছে। লাঞ্জাড়ে পড়া শব্দের অর্থ দীর্ঘসূত্রে, যেন দীর্ঘ লেজের পাকে পড়া, যখন কাজের শেষ পাওয়া যায় না তখন বলা যায় লাঞ্জাড়ে পড়া। ইহার সহিত ঘুড়ীর লেঞ্জুড়, কাজের 'নেতাড়' তুলনা করা যাইতে পারে। (৬) রাঢ়ে সকলেই আমানি জানে। কাঞ্জিকে আমানি বলে। আমানি শব্দ কবিকঙ্কণে আছে। আমানি শব্দের মূল কি? দেখা যায়, চোঁয়ানি, ধোয়ানি, ক্ষারানি প্রভৃতি অনেক শব্দে আনি আছে। এ সকল শব্দের অর্থে জল বা পানি আছে। এই হেতু ব্যাকরণে পানি (সং পানীয়) হইতে আনি প্রত্যয় স্বীকার করিয়া কোষে অম্ল+পানি—আমলানি—আমানি ধরিয়াছি। (৭) সময়ে সময়ে বাঙ্গালা শব্দের শেষের ই ঈ লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে দেখা যায়। কেহ ই কেহ ঈ স্বচ্ছন্দে বসাইতেছেন যেন ই ঈ একই, যেন বাঙ্গালাভাষা লা-ওয়ারীশ মাল। ব্যাকরণ আলোচনা করিয়া আমি নিম্নলিখিত স্থলে ঈ দিতেছি; (১) হ্রস্বার্থে ঈ, যেমন বড়া-বড়ী, থালা-থালী; (২) করণার্থে ঈ, যেমন, চালনী সেচনী; (৩) বিশিষ্ট, সম্বন্ধীয়, জাত, দক্ষ প্রভৃতি অর্থে ঈ, যেমন দামী, দাগী, কটকী; (৪) স্ত্রীলিঙ্গে ঈ, যেমন, বুড়ী, মাসী, বামনী। হ্রস্বার্থে সকল স্থলে ঈ পূর্বাবধি চলিত নাই; একারণ কোন্ কোন্ স্থলে ই দিতে হইতেছে। যেমন গুঁড়া—গুঁড়ী, গলা গলী বানান না করিয়া গুঁড়ি, গলি (সমূহ) লিখিতে হইতেছে। এইরূপ, ব্যঞ্জনে যুক্ত না হইলে ই বসে, যেমন কলিকাতাই, জেঠাই। তুলনা কর, সই, বউ।

কোষের যাবতীয় শব্দ দৃষ্টান্তের মতন কঠিন নহে। অনেক শব্দ সোজা; অনেক শব্দ এমন কঠিন যে মূল অনুমান করিতে পারিলেও প্রমাণাভাবে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। যে শব্দের প্রাচীন রূপ, বিভিন্ন স্থানীয় বিকার, কিংবা অন্য তিন ভাষায় অনুরূপ পাই নাই, সে শব্দের মূল নির্ণয়ে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য কোষে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তিবিচার সম্ভবপর নহে। কিন্তু একবার অবলম্বিত ক্রম হৃদয়ঙ্গম হইলে সহস্র সহস্র শব্দ সেই ক্রমের অন্তর্গত দেখা যাইবে।

বাঙ্গালা-শব্দকোষ—যাহা ছাপা হইতেছে—সে সম্বন্ধে সাধারণের একটা ভ্রান্তি হইয়াছে। এই ভ্রান্তির কতক কারণ, আমি। প্রথমে লক্ষ্য নিকটে ছিল; রাঢ়ের চলিত কথাবার্তার শব্দ লক্ষ্য ছিল। এ কারণ কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এটা গ্রাম্য শব্দকোষ, রাঢ়ের 'প্রাদেশিক' শব্দকোষ।*

কিন্তু কোন্ শব্দ গ্রাম্য? কোন্ শব্দ নহে? গ্রাম্য শব্দের বিপরীত কি? গ্রামের বিপরীত নগর বলা যাইতে

* ভাষায় ভাষা শব্দ থাকিতে কেন যে 'প্রাদেশিক' নামকরণ হইল, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত। বাঙ্গালা একটা প্রদেশের ভাষা, মরাঠী আর এক প্রদেশের ভাষা। এই অর্থ ভিন্ন প্রাদেশিক শব্দের আর কি অর্থ হইতে পারে?

পারে। নাগরিক ভাষায় কি অতিভ্রষ্ট শব্দ নাই? যাহাঁরা সংস্কৃত বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাহাঁরাও কি গ্রাম্য অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষা প্রয়োগ করেন না? এ বিষয় 'বাঙ্গালাভাষা'র প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা গিয়াছে। যদি গ্রাম্যভাষার বিপরীত ভাষার নাম সাধুভাষা বলি, তাহা হইলেও এই দুই-এর প্রভেদ নির্ণয় দুরূহ। তথাপি স্থূলতঃ গ্রাম্য ও সাধু শব্দের একটা প্রভেদ ধরা যাইতে পারে। (১) একটা শব্দের দুই তিন রূপ থাকিলে যে রূপ মূলের যত দূরবর্তী তাহা তত গ্রাম্য। (২) মূলের দূরবর্তী হইলেও যে রূপ শিক্ষিত-সমাজে প্রচলিত, ভাষাজ্ঞ সাহিত্যিকের সম্মত, তাহা সাধু। (৩) শব্দের একটি রূপ থাকিলে তাহা সাধু। দুই পাঁচটা উদাহরণ লওয়া যাউক। সং ভগিনী ভগ্নী হইতে বইন, ব'ন, বোন, বুন শব্দ হইয়াছে। বইন সাধু; ব'ন গ্রাম্য; বোন, বুন ভাখা। শাগ, কাগ, দিগ গ্রাম্য নহে; তবে, শাক কাক দিক অপেক্ষা গ্রাম্য। শ্বাশুড়ী শব্দ সাধু, শাউড়ী গ্রাম্য। চিঁড়া চিঁড়ে খোঁজ খুড়ো মতো ভালো ভাঙা ঝিঙা রাঙা বের (বাহির) ন্যাকা জ্যাস্ত প্রভৃতি ভাখা। যখন শব্দের বিকারে অর্থান্তর ঘটিয়াছে, তখন বিকৃত শব্দও গ্রাহ্য। যেমন মাছের লেজ। এখানে মৎস্যের লাঙ্গুল বলিলে বস্তুটা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ শাগ শব্দ। সং শাক ও বাং শাগ অর্থে এক নহে। কার্য কর্ম রাত্রি কীর্তি প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তনে কাজ কাম রাতি কীত্তি শব্দ হইয়াছে। গ্রাম্যজন (রাঢ়ে) শুদ্ধ করিয়া বলে কাজ্জ কম্ম রাত্তি কীত্তি। যদিও সংস্কৃত-প্রাকৃতের অনুরূপ তথাপি শব্দগুলিকে গ্রাম্য বলা যায়। এইরূপ, তিন্ (তৃণ্), মিগ্ (মৃগ), না (সং-প্রাং নাবা—সং নৌ), নই, লই (সং-প্রাং ণঈ নঈ—সং নদী), ভমর (সং-প্রাং ভমরো—সং ভ্রমর), ইত্যাদি শব্দ গ্রাম্য বলা যায়। কিন্তু টগর (সং তগর, সং-প্রাং টগর), লাঠী (সং যষ্টি, সং-প্রাং লট্‌ঠী), পইঠা (সং প্রতিষ্ঠা, সং-প্রাং পইট্‌ঠা), দাগ (সং দাহ, সং-প্রাং দাঘ), মাছি (সং মক্ষিকা, সং-প্রাং মচ্ছিআ), প্রভৃতি শব্দ গ্রাম্য নহে। এইরূপ, 'এক' 'দুই' 'তিন' ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ সংস্কৃত হইতে বহু বিকৃত হইলেও গ্রাম্য নহে। কবিদিগের নিঠুর হিয়া, বৈষ্ণবদিগের উচ্ছব, শিল্পীদিগের বাঁট (সং বৃন্ত, সং-প্রাং বেণ্ট), নাটাই (সং নর্তকী, সং-প্রাং নট্টঈ) প্রভৃতি শব্দ গ্রাম্য বলিলে চলিবে কেন। অসংখ্য ক্রিয়াপদে সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশের উদাহরণ বিদ্যমান। কোথায় সং ভবতি, কোথায় পালী হোতি, আর কোথায় বাং হয়! হোই লিখিব কি? সং যাতি স্থানে যাই লিখিলে মূলের নিকটবর্তী হয় বটে, কিন্তু যায় অর্থে যাই পদ কে বুঝিবে? এই যে জায় উচ্চারণ, ইহাতেই সংস্কৃতের যা (যা) ধাতুর বিকার ঘটিয়াছে।

বস্তুতঃ দুই দশটা শব্দ লইয়া এটা শুদ্ধ ওটা অশুদ্ধ বলা এক কথা, আর ঝুড়ি ঝুড়ি (সং ভূরি) শব্দের বানান-নির্দেশে কোন্‌টা টিকিবে, তাহা না দেখিলে শ্রম ব্যর্থ হয়। বর্ণন বাণান, পর্ণ পাণ, কর্ণ কাণ, কার্য কায ইত্যাদি সহজ শব্দ; কিন্তু যেখানে মূল শব্দ নিরূপণ করিতে ভাবাইয়া দেয়, ভাবিয়া মাথা কুটিয়াও নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না, সেখানে সাগরে শুদ্ধাশুদ্ধ ভাসিয়া যায়। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধ্বনিসংবাদী বানানই আশ্রয় করিতে হয়।

এই হেতু ভাখা একেবারে ত্যাগ করিয়া লিখিতে পারা যায় না। যত সাবধান হউন, ভাখা-ছাড়া কাদম্বরী হইলেও হইতে পারে, সীতার বনবাসও লেখা চলে না। নাটক গল্প উপকথা প্রভৃতির ভাষায় চলিত কথাবার্তার ভাষা থাকিবেই; অন্য লেখায় রস-সঞ্চার করিতে হইলে ভাখা আসিবেই আসিবে। যাহা চলিত বাঙ্গালা, তাহা বঙ্গের সর্বত্র চলিত নহে, এবং এ অঞ্চলে যাহা চলিত, তাহার কিয়দংশ অন্য অঞ্চলের পক্ষে ভাখা। কানে শুনিলে ভাখার পরিমাণ বাড়িয়া উঠে; লেখাতেও লেখককে চিনিতে পারা যায়। শব্দের রূপান্তর আছে; লেখক স্বভাবতঃ নিজের জানা রূপের পক্ষপাতী হন। সং লবণ, কোথাও লোন, কোথাও লুন, কোথাও বা নুন হইয়াছে। এক অঞ্চলে বেগুন খেজুর ঠিক, অন্য অঞ্চলে বাগন বা বাগুন খাজুর ঠিক। এখানে রক্ষা এই, এক শব্দের রূপান্তর শীঘ্র বুঝিতে পারা যায়। যেখানে এক বস্তুর নামান্তর ঘটিয়াছে, সেখানে শব্দ হইতে বস্তুজ্ঞান হয় না। খড় খেড় (সং খড়; সং খেট—খেড়) নাড়া (সং

নল, নড) বুঝিতে পারি ; খড়ের এক নাম বিচালী তাহা হিন্দী হইতে শিখিতে হইয়াছে।

এক শব্দ, এবং শব্দের এক রূপ কিসে সর্বত্র চলিত হইতে পারে ? বোধ হয়, বাঙ্গালা-শব্দকোষ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। প্রথমে শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শব্দ সুপ্রাপ্য করিতে হইবে ; তিনি গ্রহণ করিলে অশিক্ষিতে শিখিবে। বাঙ্গালা-শব্দকোষ না থাকাতে ইচ্ছা হইলেও ভ্রমের শঙ্কায় বাঙ্গালা শব্দ ছাড়িয়া সংস্কৃত শব্দ বসাইতে হইতেছে। অন্যদিকে, যাঁহারা চলিত শব্দ বসাইতেছেন, তাঁহারা নানাবিধ আকার দিয়া একটাকে স্থায়ী করিতে পারিতেছেন না।

বাঙ্গালা-শব্দ বিচার করিলে দেখা যায়, প্রায় সাড়ে পনর আনা সংস্কৃতমূলক, আধ আনা অন্য-দেশজ। সংস্কৃতমূলক শব্দ দ্বিবিধ ; (১) সংস্কৃত-সম শব্দ, (২) সংস্কৃত-ভব শব্দ। 'সংস্কৃত', 'সম', 'শব্দ', 'ভব' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত বলা হয়। বাস্তবিক, এই শ্রেণীর সকল শব্দ অবিকল সংস্কৃতরূপে বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই। 'শ্রেণী', 'সকল', 'অবিকল', 'রূপ', 'প্রচলিত'—শব্দগুলি দেখিতে সংস্কৃত শুনিতে বাঙ্গালা। যাহা হউক, যখন দেখিতে সংস্কৃত কিংবা প্রায় সংস্কৃত, তখন এগুলি সংস্কৃত শব্দ বলা যাউক। যে শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, তাহা সংস্কৃত ভব। যেমন, যে, হইতে, তাহা। অন্যদেশজ শব্দও দুইভাগ করিতে পারা যায়। (১) যাবনিক, (২) ম্লেচ্ছ। সংক্ষেপে বলিবার পক্ষে যাবনিক ও ম্লেচ্ছ নাম সুবিধাজনক। আর্বী ও ফার্সী শব্দ যাবনিক, এবং পর্তুগীজ ও ইংরেজী প্রভৃতি ইয়রোপীয় শব্দ ম্লেচ্ছ।

অতএব চারি শ্রেণী এই—

১। সংস্কৃত
২। সংস্কৃত-ভ্রষ্ট
৩। যাবনিক
৪। ম্লেচ্ছ।

কিন্তু বঙ্গের সকল স্থানের উচ্চারিত শব্দ এই চারি শ্রেণীতে ধরিবে না। পূর্বে দেখা গিয়াছে, যে শব্দ আকারে সংস্কৃত, তাহা সংস্কৃত বলা রীতি। এরূপ শব্দ সংস্কৃতকোষে পাওয়া যায়। একারণ, চলিত থাক আর না থাক, ভাষার প্রভাবে শব্দের আকারের পরিবর্তন হইতে পারে না। যাবনিক ও ম্লেচ্ছ শব্দও বঙ্গের সর্বত্র প্রায় এক। ইস্তেহার, এস্তেহার ; লোকসান, নোকসান, লোসকান ; মকদ্দমা, মকর্দমা ; রেল, রেইল ; ইষ্টিসেন, ষ্টেসন, ইষ্টিসান প্রভৃতি বিভিন্ন উচ্চারণ আছে। সম্প্রতি এই প্রভেদ অগ্রাহ্য করা যাউক। বস্তুতঃ সংস্কৃত-ভ্রষ্ট শব্দের তুলনায় যাবনিক ও ম্লেচ্ছভ্রষ্ট শব্দ অল্প। চলন ধরিলে সংস্কৃত-ভ্রষ্ট শব্দ দ্বিবিধ, (১) শব্দের মূল এক, কিন্তু ভাষাভেদে ভ্রষ্ট-শব্দের ভেদ জন্মিয়াছে ; (২) শব্দের মূল এক সংস্কৃত শব্দ নহে, এই হেতু স্থানভেদে একই বস্তুর বিভিন্ন নাম প্রচলিত আছে। বেগুন, বাগুন, বাগন, বায়গন ; কাতলা, কাতল ; কাঁচ, কাচ ; প্রভৃতি শব্দে ভাষাভেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু আখ ও কুশইর, ছেলে ও পোলা, শালুক ও নাল, ঝাঁটা ও ঝাড়ুন, বারুন প্রভৃতি শব্দের মূল সংস্কৃত কিন্তু বিভিন্ন। অতএব বঙ্গের সর্বত্র যে সকল শব্দ চলিত আছে সে সমুদায় নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়।

(১) সংস্কৃত
- (ক) শুদ্ধ সংস্কৃত
- (খ) ভ্রষ্ট সংস্কৃত
  - ।০ এক-মূল
  - ।/০ অনেক-মূল

(২) যাবনিক
- (গ) শুদ্ধ যাবনিক
- (ঘ) ভ্রষ্ট যাবনিক

(৩) ম্লেচ্ছ
- (চ) শুদ্ধ ম্লেচ্ছ
- (ছ) ভ্রষ্ট ম্লেচ্ছ

এখন দেখা যাইবে, বঙ্গের সর্বত্র শব্দসাম্যঘটানা কত দুরূহ ব্যাপার। শব্দকোষের অভাবে ভ্রষ্ট শব্দের বাহুল্য হইয়াছে। আদর্শ না পাইলে সকল বিষয়েই এইরূপ ভ্রংশ ঘটিয়া থাকে। যখন আমরা বলি, এটা ঠিক নয়, তখন স্বীকার করিয়া লই যে অন্ততঃ একটা ঠিক আছে কিংবা ছিল। যেটাকে ঠিক জ্ঞান করি, সেটাই আদর্শ। বাস্তবিক এই আদর্শে বাঙ্গালা শব্দের সংরক্ষণের (standardisation) নিমিত্ত সাহিত্য-পরিষদের মহামন্ত্রী শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর-ত্রিবেদী-মহাশয়ের উত্তেজনায় এই অ-ব্যবসায়ী লেখক বামনের চাঁদ-ধরা কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। একাজ আমার নিজের মনে করি না ; মনে করি সাহিত্য-পরিষদের কাজ, মনে করি বাঙ্গালীমাত্রেরই কাজ। এই হেতু বাঙ্গালা-শব্দকোষের

ভূমিকার কিয়দংশ হইতে এই প্রবন্ধ সংক্ষেপে মুদ্রিত করাইতে পারিলাম।

কিন্তু বাঙ্গালাশব্দকোষ নাম দিয়া কোষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলেই কি কোষের প্রমাণ গ্রাহ্য হইবে? হইবে, যদি (১) শব্দে ভাষার দোষ না থাকে, (২) ব্যুৎপত্তির সহিত শব্দের নৈকট্য থাকে, (৩) অর্থ পরিস্ফুট থাকে, এবং (৪) প্রাচীন প্রয়োগ থাকে। প্রত্যেক শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ দেওয়া যাইতে পারে না, এবং বর্ত্তমান রূপও প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না। তথাপি শব্দটা পাইলে লেখক দোষগুণ বিচার করিতে পারিবেন এবং ইচ্ছানুসারে গ্রহণও করিতে পারিবেন। এখন শব্দটা লেখকের নিজের কানে ও স্বগ্রামবাসীর মুখে আছে। সুতরাং তাহা জানিবার সকলের সুবিধা নাই। কোষে থাকিলে সকলেই জানিতে পারিবেন।

এখানে আর এক কথা উঠিতেছে। আমি যে শব্দ জানি, অর্থাৎ লোকের মুখে শুনিয়াছি, সাহিত্যে পাইয়াছি, সে শব্দ বাঙ্গালা-শব্দকোষে উঠিয়াছে। যে শব্দ জানি না, অর্থাৎ যে শব্দের ব্যুৎপত্তি কিংবা অর্থ প্রয়োগ পাই নাই সে শব্দ উঠে নাই। জানা শব্দের কোষ হইতে পারে, অ-জানা শব্দের হইতে পারে না। একারণ বঙ্গের সকল স্থানের চলিত শব্দ এই কোষে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু তা বলিয়া যে কোন্ শব্দের প্রতি কোষকারের অবজ্ঞা আছে, তাহা কেহ মনে করিবেন না। ব্যুৎপত্তি অর্থ প্রয়োগ সহ শব্দ পাইলেই তাহা এই কোষে স্থান পাইবে।

বস্তুতঃ উপরে যে আদর্শের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারও প্রমাণ আবশ্যক। উপস্থিতক্ষেত্রে সে প্রমাণ অপর কিছু নয়, সকলের কিংবা অভিজ্ঞ অল্পের সম্মতি। সকলের অনুমোদন অসম্ভব; যাঁহারা ভাষার বিচারে অধিকারী, যাঁহারা শাব্দিক, তাঁহাদের সম্মতিই সম্মতি। কিন্তু প্রথমে শব্দ না পাইলে সম্মতি আশা করা যাইতে পারে না।

যখন এত লিখিলাম, তখন কথাটা সম্পূর্ণ করি। আবার বলি, ভাষা এড়াইতে পারেন, এমন কোষকার সম্ভবে না। বিশেষতঃ প্রথম চেষ্টায়, অন্যের দৃষ্টির অভাবে, ভাষাদোষ কিছু থাকিবার সম্ভাবনা। মূল দেখাইলেও, সূত্রে গাঁথিলেও, সাহিত্যে প্রয়োগ থাকিলেও প্রথম প্রথম কোন্ কোন্ শব্দে কোষকারের খেয়াল মনে হইতে পারে। এই আশঙ্কা ঘুচাইবার উপায় নাই। যে শব্দ স্পষ্ট সংস্কৃত, সে শব্দ এই কোষে প্রায় নাই। কারণ সংস্কৃতকোষের অভাব নাই। আর সংস্কৃত-শব্দকোষ-রচনার যোগ্যতাই বা কোথায়? অতএব বাঙ্গালাভাষার শব্দ পাইতে হইলে একখানা সংস্কৃত-শব্দকোষ, যেমন ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত শব্দসার, কিংবা প্রকৃতিবাদ অভিধান—রাখিতে হইবে। সংস্কৃতকোষে শব্দটা না থাকিলে বাঙ্গালা শব্দকোষে থাকিবে; ইহাতেও না থাকিলে, শব্দটা সম্প্রতি অজ্ঞাত মনে করিতে হইবে। কোষ কখনও সম্পূর্ণ হয় না, বাঙ্গালাশব্দকোষও সে নিয়মের অতীত নহে।

কখনও কখনও আবশ্যক শব্দ মনে আসে না, প্রচলিত কোষের রীতিতে লিখিত কোষে খুঁজিয়া পাইবার সুযোগ থাকে না। এই অসুবিধা দূর করিতে ইচ্ছা আছে, বাঙ্গালা-শব্দকোষের শেষে প্রধান কয়েকটা বর্গের শব্দ একত্র দেওয়া যাইবে। মনে করুন, ঢেঁকীর অঙ্গবিশেষের নাম জানিতে চাই। তখন 'ঢেঁকী' শব্দ দেখিলে সে নাম পাওয়া যাইবে। কিন্তু মনে করুন একটা মাছের নাম জানা আবশ্যক। তখন পরিশিষ্টে মাছ-বর্গ দেখিলে হয়ত সে নাম পাওয়া যাইবে। পরে কোষের মধ্যে সে নাম দেখিলে ব্যুৎপত্তি অর্থ প্রভৃতি পাওয়া যাইবে। অধিকাংশ কোষে অর্থ থাকে, 'বৃক্ষবিশেষ', 'জন্তুবিশেষ'। কিন্তু এই রকম অর্থ হইতে বৃক্ষ ও জন্তু চিনিতে পারা যায় না। অথচ সাধারণের নিমিত্ত রচিত ক্ষুদ্রকোষে পরিচয়-লক্ষণও দেওয়া যাইতে পারে না। এই সঙ্কটে পড়িয়া মধ্যপথ অবলম্বন করা গিয়াছে। বৃক্ষের ও জন্তুর এমন দুই একটা বিশেষ প্রদর্শিত হইতেছে, যদ্দ্বারা বঙ্গদেশবাসী তাহা সহজে চিনিতে পারিবেন। ঠিক চিনিতে না পারুন, এক জন্তুকে অপর জন্তু, এক বৃক্ষকে অপর বৃক্ষ মনে করিতে পারিবেন না।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, বাঙ্গালা-শব্দকোষ এই নাম সার্থক হইয়াছে কি না। যাহাতে কোষখানি সর্ব্বজন-গ্রাহ্য হইতে পারে সে বিষয়ে যত্নের ত্রুটি হইতেছে না। সিদ্ধিলাভ অবশ্য গ্রন্থকারের হাতে নাই।

কটক। শ্রীযোগেশচন্দ্র-রায় বিদ্যানিধি।

ঢাকা জেলার কয়েকটি প্রাচীন স্থান

১। বাজাসন ও নান্না।

ঢাকা জেলার চন্দ্রপ্রতাপ পরগণায় নান্না নামক একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কতকগুলি উচ্চ "ঢিবি" বা মৃৎস্তূপ দৃষ্ট হয়। এক সময় এই "ঢিবি"-গুলি ৫০।৬০ ফুট উচ্চ ছিল। গত ২৫।৩ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত বর্ষার জল বৃদ্ধি পাওয়াতে সেগুলি অনেকটা বসিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও যখন বর্ষাকালে নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থান জলমগ্ন হইয়া যায়, যখন গ্রাম্য তরুরাজি তাহাদের নগ্ন দেহের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া হাঁটুজলে দাঁড়ানো কৃষকের মত দেখায়, তখনও এই "ঢিবি"গুলি জলের অনেকটা উপরে মাথা জাগাইয়া থাকে।

এই ঢিবিগুলিকে দেশের লোকেরা "বাজাসনের ভিটা" কহে। এক সময়ে প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যাপিয়া "বাজাসনের ভিটার" প্রসার ছিল। বাজাসন শব্দ "বজ্রাসনের" অপভ্রংশ। বজ্রাসন বৌদ্ধ যোগী ও তান্ত্রিকগণের সুপরিচিত আসন। বুদ্ধদেব স্বয়ং এই আসন অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। নাগার্জ্জুন প্রবর্ত্তিত মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বজ্রাচার্য্যগণ এক সময় এই "আসন" তান্ত্রিক সাধনের বিশেষ উপযোগী জ্ঞান করিতেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রাম এই বজ্রাচার্য্যগণের আর একটি প্রধান আড্ডা ছিল।

এই "বাজাসনের ভিটাকে" স্থানীয় হিন্দুগণ খুব ভক্তির চক্ষে দেখেন না। নিকটবর্ত্তী কোনো গ্রামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাদিগকে প্রাচীন লোকেরা "বাজাসনের ঠাকুর" বলিয়া জানেন। বাজাসন-সংশ্লিষ্ট আর একটি বিশিষ্ট ভদ্র পরিবার সেখানে আছেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই বাজাসনের সহিত সংস্রবে আপনাদিগকে অপমানিত মনে করেন। "বাজাসনের ভিটা" ভূত ও দানাগণের প্রধান আড্ডা, ইহাই নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসিগণের ধারণা। হিন্দুরা উহার সহিত কোনোরূপ সংস্রব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা কেন যে এই সংস্রব স্বীকার করেন না, তাহার সদুত্তর দিতে পারেন না। অথচ এ বিষয়ে তাঁহাদের বিরক্তি সুস্পষ্ট; যেন বাজাসন-সংশ্লিষ্ট হইলে তাঁহারা সমাজের চোখে নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িবেন ইহাই আশঙ্কা করেন। বৌদ্ধ-বিদ্বেষের শেষ শিখা এখনও হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জায় জ্বলিতেছে! এক সময়ে যাঁহারা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ছিলেন কিন্তু এখন হিন্দুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহারাও সে পূর্ব্বস্মৃতি একেবারে লোপ করিতে ইচ্ছুক।

বাজাসনের পশ্চিম সীমায় ½ মাইল দূরে, সুয়াপুর নামে একখানি সমৃদ্ধ গ্রাম আছে। সেই গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ নবীন করাতি ও হরিচরণ প্রামাণিক বলিয়া থাকে যে ঐ বাজাসনের ভিটার নিম্নভাগে ৬।৭টি প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ ছিল, এখন সম্ভবতঃ তাহা মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছে; তাহারা শৈশবে সেই স্তম্ভের উপর বসিয়া বিশ্রামলাভ করিয়াছে। এই প্রদেশ নিম্নতল এবং ইহার বহু ক্রোশের মধ্যেও কোন পর্ব্বত নাই। দূর দূরান্তর হইতে এই প্রস্তর আনিয়া যাঁহারা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশেষ সমৃদ্ধ ও প্রতাপশালী ছিলেন সন্দেহ নাই। "বাজাসনের ভিটা" খুঁড়িলে বহুসংখ্যক ইষ্টক পাওয়া যায় কিন্তু নানা প্রকার প্রবাদ শুনিয়া লোকে ঐ স্থান খুঁড়িতে ভয় পায়। এই প্রবাদগুলি ভাল করিয়া অনুধাবন করিলে মনে হয় বাজাসনের ভিটা এক সময়ে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের আশ্রম ছিল, এই জন্য লৌকিক সংস্কার উহাকে ভূত ও প্রেতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের প্রাচীন দলিলপত্রে প্রকাশ যে এই গ্রামগুলি এক সময়ে "বাজাসন তালুকের" অন্তর্গত ছিল। ইহাও এই বৌদ্ধাশ্রমের প্রাচীন সমৃদ্ধির অন্যতর প্রমাণ।

মুণ্ডিতমস্তক পুরুষকে এই অঞ্চলের লোকেরা এখনও "নাইন্না মুন্না" বা শুধুই "নাইন্না" এবং উক্তরূপ স্ত্রীলোককে "নান্নী মুন্নী" বা শুধুই "নান্নী" বলিয়া থাকে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে "নাণ্ডা মুণ্ডা" শব্দ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। আধুনিক চলিত ভাষায় 'নাড়া মুড়া'। "নান্না" ও "নান্নী" শব্দ ঐ অপভ্রংশ 'নাণ্ডা মুণ্ডা' শব্দের বিকৃতি। আমি অনুমান করি বাজাসনের পার্শ্ববর্ত্তী নান্না গ্রাম



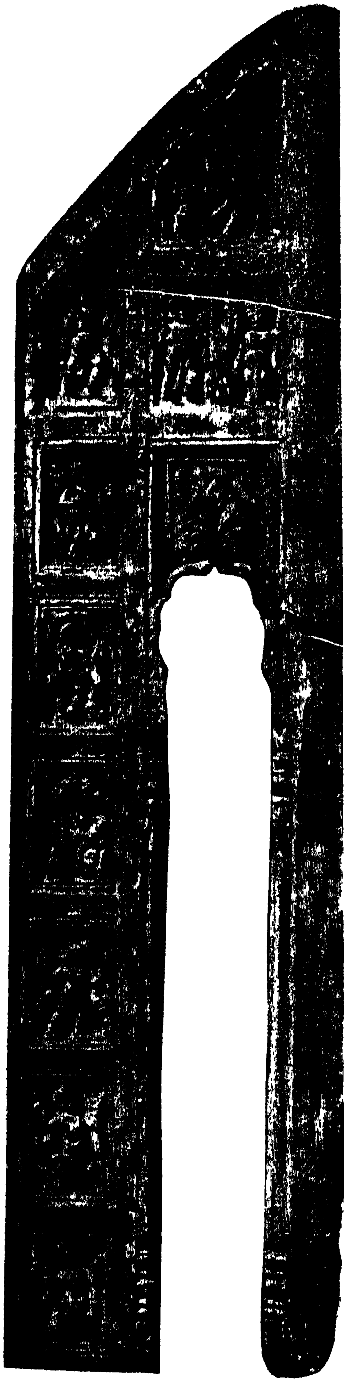
ব্রজলীলা।

মুণ্ডিতশীর্ষ বৌদ্ধভিক্ষুর বাসস্থান ছিল। অনেক প্রকার বৌদ্ধাচার এখনও নান্নাগ্রামে প্রচলিত আছে। তথাকার প্রাচীন কালীবাড়ীতে এখনও শূকর বলি পড়িয়া থাকে! বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ এক সময়ে যে সুরা দেবীকে সমগ্র প্রাণ ঢালিয়া পূজা করিতেন, এখনও তৎসম্বন্ধে প্রবাদ আছে। সেই দেশের লোকেরা সুয়াপুর বা নান্নার পরিচয় স্থলে বলিয়া থাকেন, :—"সুয়াপুর—নান্না। মদেভাতে পান্না॥" সুয়াপুর গ্রামে যে স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া তান্ত্রিক চক্রে বসিতেন তাহার প্রবাদ এখনও আছে। সুয়াপুর সুরাপুরের অপভ্রংশ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

বাজাসনের প্রাচীন সমৃদ্ধির আর একটি নিদর্শন এই যে ভিটার সান্নিধ্যে একদা অত্যন্ত বড় রকমের একটা মেলা বসিত। সেই স্থানে "জিয়স" পুকুর নামে একটা পুকুর আছে। এই পুকুরের জলের অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি শোনা যায়। বঙ্গদেশের নানা স্থানেই "জিয়স" পুকুর নামধেয় দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। এই নামের পুকুর যেখানে যেখানে দৃষ্ট হয়, সেই সেই স্থানে ইহাদের সম্বন্ধে বিচিত্র প্রকারের অলৌকিক কথা প্রচলিত আছে। এই জিয়স পুকুরগুলি যে এককালে বৌদ্ধজগতের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীয় ছিল তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

মালদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার গৌড়ের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে ঢাকা জেলার বাজাসন নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। ঢাকা জেলায় আমাদের বর্ণিত স্থানটি ব্যতীত বাজাসন নামধেয় আর কোনো স্থান নাই। আমরা বাজাসনের ভিটার যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছি তাহাতে এই স্থানে যে সেই বৌদ্ধ বিহার ছিল তাহা অনুমিত হয়।

সুপ্রসিদ্ধ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বজ্রতান্ত্রিকগণের শীর্ষস্থানীয়; ইহার নাম বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত। তিব্বতে এই বৌদ্ধাচার্য্যের স্মৃতি শত শত নরনারী কর্ত্তৃক পূজিত। দীপঙ্কর বিক্রমপুরের রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে ইহার জন্ম, এবং ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার রচিত বিবিধ গ্রন্থ বৌদ্ধ শাস্ত্রের অঙ্গীয়। শ্রীযুক্ত রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই, ই, মহাশয় তিব্বত হইতে দীপঙ্করের যে জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে বজ্রাসনের পূর্ব্বস্থিত বিক্রমপুরে বৌদ্ধগুরু দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন; এবং তিনি দ্বাদশবর্ষকাল "বজ্রাসন বিহারে" অধ্যয়ন করেন। এতদ্দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে বাজাসন বিহারে শিক্ষাপদ্ধতি এতদূর উৎকৃষ্ট ছিল যে দীপঙ্করের ন্যায় ব্যক্তিও দ্বাদশ বর্ষ কাল সেখানে অধ্যয়নের সুবিধা পাইয়াছিলেন, এবং "বাজাসন বিহার" এতদূর প্রসিদ্ধ ছিল যে বিক্রমপুরকে ইহারই নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিতে হইত। বুদ্ধগয়ার যে স্থানে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন তাহাকেও সেকালে বজ্রাসন বলিত, কিন্তু বিক্রমপুর হইতে তাহা এতদূরে অবস্থিত যে "বাজাসনের পূর্ব্বস্থিত বিক্রমপুর" বলিয়া বিক্রম-পুরের পরিচয়ে যে বাজাসনের উল্লেখ তাহা যে বুদ্ধ-



দশ-অবতারের চিত্র।

গয়ার সন্নিহিত বাজাসন তাহা মনে হয় না। যে বাজাসন হইতে বিক্রমপুর মাত্র ১০।১২ মাইল দূরে অবস্থিত, সেই বাজাসনের অস্তিত্ব না জানিয়াই রায় শরৎ চন্দ্র দাস বাহাদুর বুদ্ধগয়ার কল্পনা করিয়াছিলেন। এই ভ্রম স্বীকার করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"In my *Indian Pundits in the Land of Snow* I remember to have alluded to a place called Vajrasana lying to the west of the Vikramapura, the birth-place of Dipankara Srijnana, the famous Atisa of Tibet. Had I then any knowledge of the existence of any locality called Vajasana close to Vikrampura, I would hardly have conjectured that Vajasana to have been Gya and not Bajasana. Bajasana is evidently a corruption of the name Vajrasana. In the mounds of Bajasana, it is said, there existed ruins of a Buddhist Bihar of old and there Atisa must have got his early education."

অর্থাৎ যদি বিক্রমপুরের কয়েক মাইল পশ্চিমস্থিত বাজাসন নামক স্থানের অস্তিত্ব আমি জানিতাম, তবে কখনই আমার ইণ্ডিয়ান পণ্ডিতস্ ইন্ দি ল্যাণ্ড অব্ স্নো নামক পুস্তকে অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া বিক্রমপুরের পশ্চিমস্থিত বাজাসনের উল্লেখ না করিয়া বুদ্ধগয়ার কল্পনা করিতাম না। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি এই বাজাসনের স্তূপেই একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহার অবস্থিত ছিল এবং তথায় দীপঙ্কর তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

সুতরাং নান্না এবং সুয়াপুরের সন্ধিস্থলে যে সমুচ্চ মৃৎস্তূপসকল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে এক সময়ে সুবৃহৎ বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত ছিল। এই বিহারের নাম ছিল "বাজাসন বিহার"। বহুসংখ্যক মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ ভিক্ষু ইহার নিকটবর্ত্তী নান্নাগ্রামে বাস করিতেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ভিক্ষুরাজ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই বিহারে শিক্ষালাভ করেন। বিশাল প্রস্তরস্তম্ভ-মালা-শোভিত যে হর্ম্ম্যরাজি একদা এই বিহারের শোভা বর্দ্ধন করিত, এখনও মৃত্তিকানিম্নে তাহার নিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধজগতের চক্ষে "বাজাসন বিহারের" বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষ ঐতিহাসিক সম্পদে সমৃদ্ধ।

বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নগরে যেসকল মুসলমান দপ্তরী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই চন্দ্রপ্রতাপ পরগণার ও তৎসন্নিহিত মাণিকগঞ্জ মহকুমার লোক। একথা সহজেই মনে উদিত হয় যে এই বহুসংখ্যক দপ্তরী যেস্থান হইতে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ছাইয়া পড়িয়াছে সেস্থান নিশ্চয় এক সময়ে বিদ্যাচর্চ্চার একটা প্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল।



দেবী-যুদ্ধ।

মুসলমানগণের সময়ে এই অঞ্চলে তেমন কোন বিদ্যার কেন্দ্রের কথা শোনা যায় না। কোন প্রসিদ্ধ "মখ্‌তব মদর্‌সা" বা আরবি ফারসী পড়ার পাঠশালা এই অঞ্চলে থাকিলে তাহা অনেকেরই জানা থাকিত; কারণ মুসলমান প্রভাব এদেশে বেশি দিনের কথা নহে। এদেশে যদিও মুসলমানের সংখ্যা বেশী, তথাপি সম্ভ্রান্ত বা শিক্ষিত মুসলমান এখানে অতি বিরল। এত দপ্তরী এখানে কোন্ বিদ্যাকেন্দ্র আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের সুবিধা পাইয়াছিল? এইসকল দপ্তরীর পূর্ব্বপুরুষগণ ইরান তুরান হইতে আসে নাই, ইহারা মোগল পাঠান নহে, ইহা নিশ্চয়। এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াও তাহাদের পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করে নাই। এমন কি যেসকল নিম্নশ্রেণীর হিন্দু 'লক্ষীর পাঁচালী' গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাহারাও মুসলমান হইয়া সে ব্যবসায় ছাড়ে নাই। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে পুস্তকসংগ্রহ ও পুস্তকরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইত। সম্ভবতঃ "বাজাসন বিহারের" বিরাট পুস্তকসংগ্রহ রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক দপ্তরীর প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই বাজাসনের নিকটবর্ত্তী রউয়া, ইর্ত্তা, সুয়াপুর, পিপুলিয়া, বাত্রাপুর, প্রভৃতি গ্রামে দপ্তরীদের সংখ্যা এত বেশী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে বৌদ্ধ বিহার এককালে এরূপ সমৃদ্ধ ছিল, তাহার পৃষ্ঠপোষক কাঁহারা ছিলেন? যাঁহাদের অর্থ ও অন্যান্য প্রকারের সহায়তায় বিরাট-প্রস্তরস্তম্ভ-সমন্বিত বিদ্যানুশীলনের এই অসামান্য কেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল তাঁহারা কে? য়ুরোপে যেরূপ সাধারণের ব্যয়ে এরূপ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে এদেশে তাহা হইত না। কোন রাজন্য বা অর্থসম্পত্তিশালী ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া শিল্প ও বিদ্যা বিকাশ পাইত; জনসাধারণ বিনা ব্যয়ে সেই বিদ্যা ও শিল্প চর্চ্চার সুবিধা লাভ করিত।

২। সুয়াপুর।

বাজাসনের নিকটবর্ত্তী সুয়াপুর গ্রামের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুয়াপুর গ্রামে "বাজাসনের ঠাকুর" অভিধেয় কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ আছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহারা এই নামে পরিচিত হইতে অনিচ্ছুক। কয়েক ঘর 'দাশ'-সংজ্ঞক বৈদ্য একদা এই গ্রামে "বাজাসনের দাশ" নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদেরও এই নামে এপর্য্যন্ত বিশেষ আপত্তি ছিল। সম্প্রতি বাজাসনের অতীত গৌরবের কথা শুনিয়া তদ্বংশীয় বৈদ্যগণের কেহ কেহ এই উপাধিতে আর আপত্তি করেন না।

আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন হস্তাক্ষরে লিখিত রাঘব-পঞ্জী নামক কুলগ্রন্থ আমার নিকট রক্ষিত আছে। সেই পঞ্জীতে দৃষ্ট হয় দিগম্বর, নীলাম্বর ও বিষ্ণুদাস ফৌজদার নামক দাশবংশীয় তিন ব্যক্তি খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুয়াপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহারাই "বাজাসনের দাশ"।

এই তিন ব্যক্তি সামান্য বা নগণ্য ছিলেন না। ইহার

প্রসিদ্ধ পদ্মদাশের বংশধর, এবং পদ্মদাশ হইতে দশম স্থানীয়। পদ্মদাশ মহারাজ বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন; চন্দ্রপ্রভায় ইঁহার সম্বন্ধে এই ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়;—

"সংগ্রামজঙ্কো হতবৈরিপঙ্কো গৌড়েশ-সেবার্জ্জিত-পৌরুষঃ শ্রীঃ।
দাতা বিনীতঃ পরিপাল্য লোকান্ স বালিনহাাং বসতিং চকার ॥"
(মুদ্রিত চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ৩১৫)

এই বংশীয় ভূতপূর্ব্ব পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কলিকাতা-নিবাসী জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে বল্লালসেন কর্ত্তৃক পদ্মদাশকে প্রদত্ত সনন্দ সেদিনপর্য্যন্ত রক্ষিত ছিল। সুয়াপুরগ্রাম নিবাসী তমোনাশ দাশ এই পদ্মদাশ হইতে



দেবী-যুদ্ধ।

২৫ পর্য্যায়ের। পদ্মদাশকে বল্লাল সেন মহাকুল প্রদান করেন। কিন্তু চণ্ডালিনী-দোষ-সম্পৃক্ত বল্লালের প্রদত্ত কুল বৈদ্যগণ প্রথমতঃ স্বীকার করেন নাই।

"বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লালের কুল না লইল তিন জন।"

এই প্রবাদ অতি প্রাচীন। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বৈদ্যগণ কুল গ্রহণ করেন কিন্তু সে সময়েও বল্লালী কুল এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাচীনতর-আভিজাত্য-দৃপ্ত বরেন্দ্র দেশবাসীরা এই নূতন কুলীন সৃষ্টির বিপক্ষে প্রবল প্রভাবে বাধা দিয়াছিলেন। বল্লালী কুল ক্রমে সেই বাধা অতিক্রম করিয়া দেশময় সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল। কিন্তু বল্লালী কুলের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিপত্তি লক্ষ্মণসেনের প্রায় সার্দ্ধশতবৎসর পরে বঙ্গদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল। পদ্মদাশ হইতে নবম স্থানীয় চণ্ডীবর এইভাবে স্বজাতি-সমাজে অবিসম্বাদ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রাঢ়দেশে যৌড়েশ্বর গ্রামে বাস করিতেন। বিদ্যা বুদ্ধি এবং মর্য্যাদায় যাঁহারা তৎকালে বৈদ্য সমাজের অগ্রণী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীবর অন্যতম। চণ্ডীবরের প্রপিতামহী সেনভূমের রাজা চন্দ্রসেনের কন্যা ছিলেন। চণ্ডীবরের পিতামহের দুই সহোদরা বিক্রমপুরের বৈদ্যরাজবংশে বিবাহিতা হন। বিক্রমপুরের ২য় বল্লালসেন (যিনি পোড়াবাজা নামে খ্যাত হন) এই দুই সহোদরার জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করেন।* দ্বিতীয় সহোদরা উক্ত রাজবংশের কাহনু



দেবী-যুদ্ধ।

খাঁর সহিত পরিণীতা হন। ২য় বল্লালের এই মহিষীই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বামীর অগ্রগামিনী হন। সকলেই অবগত আছেন, নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় বল্লাল তাঁহার মহিষী ও অপরাপর পরিবারবর্গের সহিত জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। ১৩৫০ খৃঃ অব্দের কিছু পূর্ব্বে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। চণ্ডীবরের আত্মীয়গণ এইরূপ উচ্চ সম্মান ও প্রতাপশালী ছিলেন। চণ্ডীবর

* চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ৩৩২।



গোষ্ঠলীলা।

স্বয়ং শুধু প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন না, তিনি সমাজে সর্ব্ববিষয়েই একজন শ্রেষ্ঠব্যক্তি ছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার পুত্রগণ রাঢ় দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্তে স্থিত সুয়াপুরের ন্যায় গ্রামে কেন আসিয়া আবাস স্থাপন করেন? বৈদ্যের কুলীনগণ স্থান ত্যাগ করিলেই অনেকটা মর্য্যাদাহীন হন। এজন্য তাঁহারা সহজে কুলস্থান ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইতেন না। কি প্রলোভনে পড়িয়া বিষ্ণুদাস ফৌজদার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বীয় সমাজের সহিত একরূপ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া এক সুদূর পল্লীতে বাস স্থাপন করিলেন ইহাই অনুসন্ধান করিতে যাইয়া পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাপার আমরা জানিতে পারিয়াছি। সুয়াপুর যে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধরাজার রাজধানী ছিল এবং তাহা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই বিনষ্ট সাম্রাজ্যেই বিষ্ণুদাস ফৌজদার প্রভৃতি ভ্রাতারা রাজপ্রতিনিধি হইয়া সমাগত হন তাহাও জানা যাইতেছে।

সুয়াপুর গ্রামে এখন যে স্থানে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় প্রভৃতি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জমিদারগণের বাড়ী সেই পাড়াটির প্রাচীন নাম ছিল "রাজার পাড়া"। সেই পাড়ারই একটি স্থানে—শ্রীযুক্ত শতদল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতুলালয়ের ভিটার নীচে—ভূপ্রোথিত বৃহৎ অট্টালিকার চিহ্ন আছে। জনশ্রুতি এই যে ঐ গৃহে এক সময়ে কোন বাদশাহ বাস করিতেন। তাহার অদূরে শ্রীযুক্ত রেবতী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ী যে স্থানটিতে অবস্থিত তাহাকে পূর্ব্বে "পীলখানা" বা "হাতীর পীলখানা" বলিত এবং আর একটু পূর্ব্বে একটা ঢিপি ও তৎসংলগ্ন কতকটা উচ্চ স্থান আছে তাহার নাম "কোটবাড়ী"। হিন্দুরাজত্ব কালে দুর্গকে "কোট" বা "গড়" বলিত। সুতরাং এই কোটবাড়ীতে প্রাচীনকালে কোন দুর্গ অবস্থিত ছিল। গ্রামের উত্তর সীমান্তে একটি পাড়া আছে তাহার নাম "ইদগড়"। সমস্ত গ্রামটি বেষ্টন করিয়া যে একটি পরিখা ছিল, এখনও বর্ষাকালে তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন উপলব্ধ হয়। "রাজার পাড়ায়" একটি পুকুরের মধ্যে সম্প্রতি একটা সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা এখনও জলের ভিতরে আছে, ভাল করিয়া পরীক্ষা করা হয় নাই। উহার নিকটবর্ত্তী কোন পুকুর হইতে বাসুদেবের একখানি প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা অত্যাচারীর নির্ম্মম অস্ত্রাঘাতে ভগ্ন। ঐ মূর্ত্তি বহুদিন করুণা নাম্নী কোন নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের গৃহে পূজা পাইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর ঐ দেবতা রঘু সেনের আম্রবাটিকায় কয়েক বৎসর অনাদৃত অবস্থায় একটি নারিকেল বৃক্ষের মূলদেশে পড়িয়াছিলেন, এখন উহা নিকটবর্ত্তী রোয়াইল গ্রামে অভয় ঠাকুরের গাছতলায় আছেন। এই মূর্ত্তি ভিন্ন আর দুইখানি প্রস্তরমূর্ত্তি গ্রামসান্নিধ্যে পাওয়া গিয়াছে, একখানি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর একখানি সুয়াপুর সংলগ্ন বউয়া গ্রামে কোন মুসলমানের বাড়ী আশ্রয় করিয়া আছেন। এই দুই মূর্ত্তির একখানি বৌদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি ন্যূনাধিক সহস্র বৎসরের প্রাচীন। সুয়াপুরে শ্রীযুক্ত



গোঠলীলা

দেবীচরণ দাস মহাশয়দের দেড় শত বৎসরের প্রাচীন ইষ্টকালয় ভাঙ্গিয়া গেলে, উক্ত গৃহের ভিত খুঁড়িতে খুঁড়িতে বহু নিম্নে একটি প্রাচীরের অগ্রভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুয়াপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাশ মহাশয় জানাইয়াছেন যে ঐ প্রাচীর সমসূত্রে মৃত্তিকা খুঁড়িলেই পরিদৃষ্ট হয়, উহা একটা সুবৃহৎ পাড়ার সমস্তটা জুড়িয়া আছে। এই দাশ বংশীয়েরাই গ্রামের প্রাচীনতম জমিদার বিষ্ণুদাস ফৌজদার প্রভৃতির বংশধর, এবং একসময়ে ইঁহারা সুবিস্তৃত ভূভাগ শাসন করিতেন। তাঁহাদের প্রাচীন দলিলপত্রে, ভগ্নগৃহ এবং মন্দিরাদিতে সেই প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় আছে। পদ্মদাশ হইতে দ্বাদশ স্থানীয় দিবাকর দাশের নামে একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা গ্রামের পশ্চিমে বিদ্যমান ছিল, এখন তাহা ভরাট হইয়া গিয়াছে। ঐ দীঘির অনেকগুলি ঘাট ছিল। তাহাদের নাম এখনও চলিত কথায় শোনা যায়,—"আয়ান ঘাট" "শয়ান ঘাট" ইত্যাদি।

উপরি লিখিত বিবরণ হইতে আমরা এই কয়েকটি তথ্য উদ্ধার করিতে পারি। সুয়াপুর গ্রাম এক সময়ে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল; ঐ গ্রামেই তাঁহাদের দুর্গ বা কোটবাড়ী ছিল; রাজপ্রাসাদ যে পাড়ায় ছিল তাহার নাম "রাজার পাড়া" এবং তৎসন্নিহিত হস্তীশালার নাম এখনও চলিয়া আসিতেছে; তাঁহারা বিষ্ণু ও বুদ্ধ উভয়েরই পূজা করিতেন; তাঁহাদের প্রস্তর-স্তম্ভ-পরিশোভিত মন্দির এবং তন্মধ্যস্থ বিগ্রহ মুসলমানেরা বিনষ্ট করেন; সেই ভগ্নমূর্ত্তি ও ভগ্নস্তম্ভ ভিন্নধর্ম্মীর লাঞ্ছনা অঙ্গে ধারণ করিয়া এখনও বিরাজ করিতেছে; হিন্দু-রাজার গড়ে মুসলমানেরা বিজয়োল্লাসে "ইদ্" উৎসব সম্পাদন করেন, এই জন্যই সেই গড় যে স্থানে ছিল শেষে তাহা "ইদ্ গড়" নামে পরিচিত হয়; যে মুসলমান সম্রাট হিন্দুরাজধানী ধ্বংস করেন তিনি কিছুকালের জন্য সেই রাজপ্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন, এই জন্যই গ্রামে "বাদশাহের বাড়ী" বলিয়া এখনও তাহা উক্ত হইয়া থাকে; হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজাদের অধিকারে "বাজাসন বিহার" বিদ্যা ও ধর্ম্মগৌরবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; মুসলমান বিজয়ের পরে এই লুপ্তপ্রায় বিহারের অধিকার



গোষ্ঠলীলা।

মুসলমান-রাজপ্রতিনিধি দাশবংশীয়দের হস্তে ন্যস্ত হয়; "বাজাসন বিহারের" নাম ও প্রতিপত্তি এত বেশী ছিল দাশবংশীয়গণ এখনও "বাজাসনের দাশ" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; "ফৌজদার" উপাধি ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদের সে অঞ্চলে বিস্তৃত অধিকার (যাহা প্রাচীন দলিলপত্র হইতে জানা যাইতেছে) পর্য্যালোচনা করিলে অনুমিত হয় ইহারাই প্রাচীন বিনষ্ট সাম্রাজ্যে মুসলমান-রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ সুয়াপুর গ্রামে আগমন করেন। সুয়াপুরের হিন্দু বা বৌদ্ধ নৃপতি কোন্ বংশীয় ছিলেন তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে এই গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী আর কয়েকটি গ্রামে অনেক সময়ে প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়। সেই-সকল মুদ্রা আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া এখনও হস্তগত করিতে পারি নাই। তাহা পারিলে সুয়াপুরের প্রাচীন রাজবংশের কোন না কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে আশা করি।

যেসকল মুসলমান ভাওয়ালে ও চন্দ্রপ্রতাপে হিন্দু রাজত্ব ধ্বংস করেন তাঁহাদের মধ্যে ভাওয়াল পরগণার চেরাগ্রাম নিবাসী পহ্লন শা গাজী ও তাহার বংশধরগণ বিশেষ বিখ্যাত। পহ্লন শা ও তৎপুত্র কারফর্ম্মা গাজী সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সুয়াপুরের ধ্বংস সাধন করেন। সুয়াপুর যে নদীর উপরে অবস্থিত তাহা ধলেশ্বরীর একটি শাখা। টেলরের ঢাকার টপোগ্রাফি নামক পুস্তকে যে মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় ধলেশ্বরীর এই শাখার প্রাচীন নাম ছিল কানাই নদী। গাজীগণের প্রভাবের সময়ে উহা "গাজীখালি" নামে অভিহিত হয়।

৩। ধামরাই।

কানাই ও বংশাই এই দুই শাখানদী হিন্দু রাজত্বের বিলীন গৌরবগাথার স্মৃতি বহন করিতেছে। বংশাই নদীর তীরে সুপ্রসিদ্ধ ধামরাই গ্রাম। এই গ্রাম অতি প্রাচীন। সাভার, সুয়াপুর, বাজাসন, ও নান্না—ধামরাই গ্রাম হইতে বহুদূরে নহে। "বাজাসন বিহারে" অতীশ অধ্যয়ন করিতেন। উহা দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কথা। ঐ



গোধূলি।

বিহার সম্ভবতঃ আরও দুই চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুয়াপুরের বুদ্ধ বিগ্রহ ও প্রস্তরস্তম্ভ ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া মনে হয়। ভাওয়াল পরগণার সাভার ও কাপাসিয়া প্রভৃতি স্থান অতি প্রাচীন। কাপাসিয়ার সূক্ষ্মবস্ত্রের কথা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনির গ্রন্থে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। ধামরাই গ্রাম এই চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে কম প্রাচীন নহে। এই অঞ্চলটি সম্ভবতঃ দু হাজার কিংবা ততোধিক বর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নীরবে বহন করিতেছে। ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়, ধামরাই নাম শুনিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন উহা সম্ভবতঃ ধর্ম্মরাজিকা শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে। মহারাজ অশোক তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যে ৮৪ হাজার ধর্ম্মরাজিকা বা কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন,—ধামরাই সেই ৮৪ হাজারের একটি হইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই অনুমানের ৬।৭ বৎসর পরে সম্প্রতি ধামরাইবাসী শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ বসু বি, এল, মহাশয় একখানি ৩০০ বৎসরের প্রাচীন দলিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় ধামরাই গ্রামের প্রাচীন নাম ধর্ম্মরাজী-ই ছিল। এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্র বাবুর মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বহুদিবস হইল সুহৃদ্বর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ধামরাই নামক প্রাচীন গ্রামের নাম শুনিয়া তৎকালে বলিয়াছিলাম যে ঐ স্থান ধর্ম্মরাজিকা শব্দের অপভ্রংশ। মৌর্য্য সম্রাট অশোক ৮৪,০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে অশোকাবদান হইতে এইরূপ প্রমাণ পাইয়াছি।—'অশোকো নামা রাজা বভূবেতি। তেন চতুরশীতি ধর্ম্মরাজিকা সহস্রং প্রতিষ্ঠাপিতং। যাবৎ ভগবচ্ছাসনং প্রাপ্যতে তাবৎ তস্য যশঃ স্থাস্যৎ।"

উক্ত অশোকাবদান হইতে জানিতে পারি যে সম্রাট অশোক যেসকল ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন পুষ্যমিত্র সেইসকল ধ্বংস করেন। ধামরাই গ্রামে এইরূপ কোন ধর্ম্মরাজিকা বিদ্যমান ছিল তাহা হইতেই এই স্থানের ধর্ম্মরাজিকা নামকরণ হইয়া থাকিবে। ধামরাইবাসী শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ বসুর নিকট যে আড়াইশত বর্ষের প্রাচীন দলিল দেখিয়াছি তাহাতে এই স্থানের "ধর্ম্মরাজী" নামই যখন পাইয়াছি তখন ইহা নিশ্চয় যে এই "ধর্ম্মরাজী" চলিত ভাষায় হইয়াছে "ধামরাই"।

৪। সাভার।

ধামরাই ও সুয়াপুর হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে ধলেশ্বরীর রক্তবর্ণ প্রাকারাকার প্রায় ক্রোশব্যাপক তীরদেশ আশ্রয় করিয়া সাভার গ্রাম অবস্থিত। এখানে ধলেশ্বরীর ভৈরবী মূর্ত্তি পদ্মাকেও পরাস্ত করিয়াছে। ঝড় থাকুক বা না থাকুক এই নদীতে উত্তাল তরঙ্গের বিরাম নাই। কিন্তু সাভারের রক্তবর্ণ ও সুদৃঢ় তীর তরঙ্গের এই উৎকট আঘাত সহ্য করিয়া অটুট রহিয়াছে। এই সুরঞ্জিত উচ্চ তটভূমির উপর গুবাক ও নারিকেল বৃক্ষের পঙ্‌ক্তি সূর্য্যাস্তের প্রভায় বড় সুন্দর দেখায়; সমস্ত দৃশ্যটি যেন চিত্রাঙ্কিত বলিয়া মনে হয়। সাভারের মতন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বোধ হয় বঙ্গদেশের আর কোথায়ও নাই। সুপ্রসার নদীতীরে অবস্থিত এই পল্লী স্বভাবতঃই যেন বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি হইবার যোগ্য। প্রকৃতি যেন স্বয়ং রাজরাণীর সিন্দূর ইহার ললাটে পরাইয়া দিয়াছেন। দূর হইতে এই স্থান সিন্দূরমণ্ডিত বলিয়া ভুল হয়। সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজার কোটবাড়ীর অর্থাৎ দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। এই হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা অদুনা ও

পদুনাকে পটিকানগরের রাজা বিখ্যাত গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচন্দ্র) বিবাহ করেন।* ইঁহারা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। যে অদুনা পদুনার নাম এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভাট যোগী ও চারণগণের গাথায় প্রচারিত হইত, সেদিনও বোম্বাই হইতে যাঁহাদের চিত্র রবিবর্ম্মা অঙ্কন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে যে বঙ্গীয় রাজা ও তাঁহার মহিষীদের করুণ প্রসঙ্গ লইয়া এখনও নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়া থাকে, এবং উত্তর-পশ্চিমে লক্ষ্মণদাস প্রমুখ বহুসংখ্যক কবি যাঁহাদের গুণ-গাথা গাহিয়াছেন, এবং যাঁহাদের সম্বন্ধীয় গীতি এক সময়ে বাঙ্গলাদেশ ও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে শ্রুত হইত, সেই গোপীচন্দ্র ও তাঁহার মহিষীদ্বয়ের প্রথম প্রেমমিলন এই সাভারেই হইয়াছিল। এই স্থানে রক্তবর্ণ ধূলিতে এক সময়ে অদুনা ও পদুনা বাল্যক্রীড়া করিতেন। হরিশ্চন্দ্র রাজা রঙ্গপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহাকে অনেকে হরিশপাল বলিয়া জানেন। হরিশ্চন্দ্রের সমাধি এখনও বিদ্যমান। অদুনা ও পদুনার ন্যায় রূপবতী তখন ভারত-বর্ষে আর কেহই ছিলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহাদের পুত্র হবচন্দ্র নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য প্রবাদস্থানীয় হইয়া আছেন। সাভারে হরিশ্চন্দ্র পালের বাড়ী ছাড়াইয়া আরও উত্তরে শিশুপালের বাড়ী। ধামরাই হইতে ৬।৭ মাইল দূরে যশোপালের রাজধানী মাধবপুর, এখন গাজীবাড়ীতে পরি-ণত হইয়াছে। আরও উত্তরে কামদেব নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। পালবংশের ধ্বংসের পর এই স্থানে চণ্ডাল জাতীয় প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক ভ্রাতৃদ্বয় কতক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মহাপ্রতাপশালিনী ভগিনীর নাম ছিল মোগ্‌গী। সাভারে এখনও "খাইডা ডোস্কা" নামক রাজার নাম শোনা যায়। কলিকাতা সিমলা, ১৬ নং সাগরধর লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, এই "খাইডা ডোস্কা" রাজার সম্বন্ধে ভাটের গান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি "কায়েৎ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু জনশ্রুতি ও নাম পর্য্যালোচনায় ইনি যে তিব্বত দেশীয় ছিলেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।



গোষ্ঠলীলা।

"খাইডা ডোস্কা" কায়স্থ জাতির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, ভাটপরিচয়ে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ভাওয়াল ও চন্দ্রপ্রতাপের ইতিহাস বিক্রমপুরের ইতিহাস হইতেও প্রাচীনতর। যেখানে সেন রাজারা রাজত্ব করি-য়াছেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজগণের কীর্ত্তি অধিকাংশই ভূপ্রোথিত হইয়া গিয়াছে। ভাওয়াল ও চন্দ্রপ্রতাপ পরগণার বহুসংখ্যক স্তূপের ভগ্নাবশেষ, পুষ্করিণী, দুর্গ ও গড়খাইয়ের চিহ্ন প্রাচীনতর রাজকুলের কীর্ত্তিগাথা মৌনভাবে প্রচার করিতেছে। পাল রাজগণ কোন জাতীয় ছিলেন বলা যায় না। তাঁহারা যে জাতীয় থাকুন না কেন পরে যে ইঁহারা রাজবংশী ও কোচগণের সঙ্গে স্থানে স্থানে মিশিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সাভারের হরিশ্চন্দ্র পালের বংশধর ভারত চন্দ্র রায় এখন নিকটবর্ত্তী কোণ্ডা গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহারা মাহিষ্য বলিয়া পরিচয়



নায়িকার ভগ্নহস্ত।

দিতে প্রয়াসী। ভাওয়ালের কাপাসিয়া খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জগৎপ্রসিদ্ধ মস্‌লিনবস্ত্রের জন্মভূমি ছিল। যে রাজগণ এই বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন

* See Martin's Eastern India.

তাঁহাদের রাজধানীর চিহ্ন ভাওয়াল ও চন্দ্রপ্রতাপের সর্ব্বত্র পড়িয়া আছে। "বায়ার বাজার ও তেপায় গলি-" যুক্ত প্রাচীন "বাঙ্গলা" নামক নগর সম্ভবতঃ ইহাদের অন্যতম রাজধানী ছিল। এখনও ঢাকার "বাঙ্গালা বাজার" সেই লুপ্ত রাজধানীর নাম বহন করিতেছে। হে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত যুবক, একবার সচেষ্ট হইয়া এই প্রদেশের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান কর। যেসকল সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ও বিলয় হইয়াছে, তাহাদের গৌরবের শেষ শিখা তোমারও ললাট স্পর্শ করিতেছে, বুঝিতে পারিবে। ইতিহাসের মৌন ভারতী অনেক সাধ্য সাধনায় তোমার সহিত কথা কহিবেন; তখন বুঝিবে তুমি যে স্থানকে নগণ্য ভাবিয়া উপেক্ষা করিতেছ তাহা এক সময়ে পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী বীর, সমুদ্র-যাত্রী নাবিক ও শত শত জগদ্‌বিহারী বণিকের লীলাক্ষেত্র ছিল; সেখানে জগদ্‌গুরু ধর্ম্মপ্রচারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের কথা প্রতি ধূলিরেণুতে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

এই প্রবন্ধ মধ্যে যে চিত্রগুলি দেওয়া হইল, তাহা সুয়াপুরের দাশ বংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহের একখানি কাষ্ঠসিংহাসনে খোদিত ছিল। এই খোদিত চিত্র বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত ছিল। তিন শত বৎসর কিংবা তদূর্দ্ধ কাল পূর্ব্বে এই সিংহাসন নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে কয়েকটী অতি সুন্দর বড় বড় কাষ্ঠ-পুত্তলিকা সংলগ্ন ছিল। সিংহাসনের যাহা শোভা তাহা গত ৪।৫ বৎসরের মধ্যে প্রায় সমস্তই ধ্বংস পাইয়াছে। দুইচারিখানি ভগ্ন কাষ্ঠ যাহা উদ্ধার করা গিয়াছে, তাহাদের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। প্রথমখানি ব্রজলীলা। কদম্ব-বৃক্ষমূলে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ও দুই পার্শ্বে সখীগণ। সখীদের পরিচ্ছদ মুসলমানীদের অনুরূপ। তাহাদের কাহারও হস্তে ভৃঙ্গার, কাহারও হস্তে সনাল অর্দ্ধ-বিকশিত পদ্মপ্রসূন, কাহারও হস্তে ব্যজনী, কাহারও হস্তে চামর, কাহারও হস্তে বা পুষ্পমাল্য। দুই পার্শ্বে আর দুই খানি কৃষ্ণলীলার চিত্র। মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণমূর্ত্তির নিম্নে চিত্রশিল্পী "রামপ্রসাদের" নাম খোদিত। প্রতিলিপিতে এ নাম পড়া যায় না। দ্বিতীয় চিত্র একটী মন্দিরের দ্বার,—তাহাতে দশ অবতারের মূর্ত্তি খোদিত। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম চিত্র দেবীযুদ্ধের। ইহাদের মধ্যে একটীতে কোন এক অসুরের হস্তে বন্দুক দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম চিত্র গোষ্ঠের, তাহাতে গাভীগণের মূর্ত্তি অতি কৌশলের সহিত খোদিত। কিন্তু প্রতিলিপিতে তাহা একেবারেই শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। একাদশ চিত্র একটী নায়িকার ভগ্ন হস্তের। এই চিত্রশিল্পে মুসলমান প্রভাব অতি সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই খোদিত কাষ্ঠফলক বিচিত্র সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত ছিল, এখনও উহাতে তাহার চিহ্ন দেখা যায়। তিনি চারি শত বৎসর পূর্ব্বে অঙ্কিত কয়েকখানি বঙ্গীয় চিত্র দর্শন করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক সুপ্রসিদ্ধ ভিনসেণ্টস্মিথ সাহেব আমাকে লিখিয়াছিলেন যে ঐ ছবিগুলি দেখার পূর্ব্বে তাঁহার ধারণাই ছিল না যে অজন্তা গুহার চিত্ররাশির পরে ও আকবরের সময় পর্য্যন্ত হিন্দু চিত্রশিল্প বলিয়া কিছু ছিল।

মুসলমান বিজয়ের পরেও যে হিন্দু-চিত্রশিল্প ভারতবর্ষে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তাহার নিদর্শন এ দেশের অনেক প্রাচীন পল্লী খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

অজ্ঞ

(হাইনের কবিতা হইতে)।

যাহার সন্ধানে ফির
সমগ্র ধরণী
নিশিদিন পাগলের বেশে,
মর্ম্মকোণে সঙ্গোপনে
অশ্রু সনে তা'রে
দেখেছ কি?—আলো করে কে সে?
সৌভাগ্য-মঙ্গল-শঙ্খ
দুয়ারে দুয়ারে
ফুকারিছে দিবস রজনী;
কামনা—সাধনা যা'র
সেই লভে তারে!
তা'র প্রাণে বাজে সে' রাগিণী।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।



কবিগুরু বাল্মীকি রামায়ণে বানরজাতিকে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-কৌশলে মানবের অনুরূপ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ত্রেতাযুগের সে বর্ণনা, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের অভাবে, বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বজন-গ্রাহ্য না হইলেও, ডারুইনের মতে সায় দিয়া একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, নর ও বানরের শারীরিক গঠনপ্রণালী অনেকাংশে অভিন্ন। চিন্তা ও বুদ্ধিশক্তির আধার মস্তিষ্কেও ইহাদের অধিকার নিতান্ত কম নহে,—স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে তাই ইহারা মানবসমাজের ক্রিয়াকলাপ অনুকরণ করিয়া অনেক সময়ে অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড করিতে পারে।

বানরসমাজে শিম্পাঞ্জী ও বনমানুষ সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। স্বভাবতঃ ইহারা মানবোচিত বহু হাবভাব ও আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত; উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, অন্যান্য অনেক বিষয়েও ইহাদের লীলা অনেকাংশে নরলীলারই অনুরূপ হইয়া উঠিতে পারে। সংপ্রতি লণ্ডনের চিড়িয়াখানা হইতে এ বিষয়ের কয়েকটী দৃষ্টান্তও পাওয়া গিয়াছে। ঐ স্থানের বানর-বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ বা রক্ষক মিঃ ম্যান্‌স্‌ব্রিজ (Mansbridge) আপনার অধীনস্থ কয়েকটী প্রাণী দ্বারা ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। মিঃ ম্যান্‌স্‌ব্রিজ নিজে বানরজাতির একজন উপযুক্ত শিক্ষক। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত চিড়িয়াখানায় কাজ করিয়া তিনি এই শিক্ষকতা-কার্য্যে অপরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই চিড়িয়াখানায় স্যালী (Sally) নামক একটী শিম্পাঞ্জী ছিল। অধ্যক্ষ ম্যান্‌স্‌ব্রিজ তাহাকে এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যাগুলি গণনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। দর্শকবৃন্দ স্যালীকে ঐরূপ গণনা সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, সে পদনিম্নস্থ তৃণ একগাছি করিয়া মুখে তুলিয়া রাখিত এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হওয়া মাত্র সমস্তগুলি একত্র করিয়া প্রশ্নকারীর হস্তে অর্পণ করিত। স্যালীর পূর্ব্বে বানরসমাজে আর কোন ব্যক্তির গণনা-চর্চ্চায় এরূপ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই।

সংপ্রতিও ঐ দক্ষ শিক্ষকের অধীনস্থ দুইটী শিম্পাঞ্জী ও তিনটী বনমানুষ অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশলের সঙ্গে অসাধারণ শিক্ষালাভের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে।

শিম্পাঞ্জী দুইটীর নাম জেরী (Jerry) ও ফেনী (Fanny)। জেরী পুংজাতীয় ও ফেনী স্ত্রীজাতীয়। আকৃতিতে ফেনীই একটু বড় বটে; কিন্তু বয়সে জেরী অপেক্ষা ছোট—উহাদের বয়স যথাক্রমে পাঁচ ও সাত বৎসর। উভয়েই তিন চারিবৎসব যাবত এই চিড়িয়াখানার অধিবাসী।

ফেনী ও জেরী ম্যান্‌স্‌ব্রিজের অত্যন্ত প্রিয়। বলিতে কি, ইনি উহাদিগকে নিজের সন্তানেরই ন্যায় জ্ঞান করেন। অনেক সময়ে উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চিড়িয়াখানার খোলা রাস্তায়ও বেড়াইয়া বেড়ান। ঐ সময়ে দর্শকগণ এই প্রাণীদ্বয়ের মানবোচিত বহু লীলা দর্শনের সুযোগ পান। উহাদের এই লীলাখেলার কয়েকটী দৃষ্টান্ত অদ্য আমরা পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।



ফেনী দুধ খাইয়াছে বলিয়া জেরীর রাগ।

একদিন দর্শকগণ ম্যান্‌স্‌ব্রিজের সঙ্গে বানরাবাসের সম্মুখে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জেরী ও ফেনীর

গৃহ হইতে ভয়ানক চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, জেরীর হস্তে মার খাইয়া ফেনী প্রাণপণে চাঁচাইতেছে, কিন্তু জেরী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দাঁতমুখ খিচাইয়া দ্বিগুণ চীৎকার করিয়া যেন তাহাকে শাসাইয়া বলিতেছে—'অঃ! আবার কান্না হচ্ছে! ও সব আমি গ্রাহ্য করিনে--চুপ রও!'

ম্যান্‌স্‌ব্রিজ ধমক দিয়া উঠিলেন। নিমেষমধ্যে কান্না-কাটি সোরগোল সমস্তই থামিয়া গেল। ফেনী এমনভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল, সে যেন বলিতে চায়—'মাষ্টার মশায়! আমার কোন দোষ নেই—এসব জেরীর কাজ।' জেরী নিজেও ভাব-গতিক বুঝিয়া লজ্জায় অধোবদন হইল।

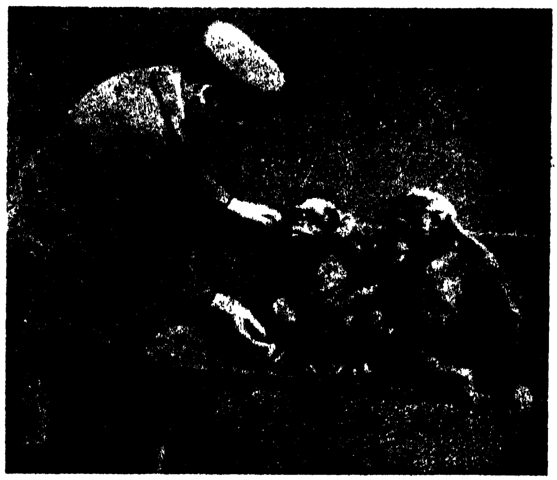
ম্যান্‌স্‌ব্রিজ ডাকিয়া বলিলেন—'ফেনী, তুমি বাইরে এস, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। জেরী বড় দুষ্ট হয়েছে, তাকে আজ আর বেড়াতে নিয়ে যাব না।' শিক্ষকের এই বাক্যের মধ্যে অজস্র তিরস্কারের বেদনা অনুভব করিয়া জেরী বস্তুতঃই ভারী বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তাহার কাতর দৃষ্টিতে তীব্র অনুতাপের পরিচয় পাইয়া ম্যান্‌স্‌ব্রিজ তাহাকে ক্ষমা করিলেন।



জেরী ও ফেনী সেলাম করিতেছে।

বাদবিসম্বাদ সকল ভুলিয়া এবার জেরী ও ফেনী উৎফুল্লচিত্তে বাহিরে আসিল। অধ্যক্ষ বলিলেন—'এখন তোমরা একখানা বিস্কুট পাবে; মনে রেখো, একখানা বই দুখানা মিলবে না; কিন্তু ঐ একখানাই আমাদের সকলের খেতে হবে।' একজন দর্শক একখানা বিস্কুট বাহির করিয়া ধরিলেন। অধ্যক্ষের ইঙ্গিতক্রমে ফেনী উঠিয়া দাতাকে সেলাম করিয়া উহা গ্রহণ করিল। কতক্ষণ পরে ম্যান্‌স্‌ব্রিজ নিজে উহা ফেরত চাহিলে, ফেনী অম্লান বদনে তাহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। ম্যান্‌স্‌ব্রিজ বিস্কুটখানিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া একখণ্ড বৃহৎ ও একখণ্ড ক্ষুদ্রের সমবায়ে একএকভাগ ফেনী ও জেরীকে প্রদান করিলেন; অতঃপর উহাদের নিকট স্বীয় অংশ চাহিবামাত্র ফেনী নিজের জন্য ছোটখানি রাখিয়া বড় বিস্কুট খণ্ড তাঁহাকে দিল। জেরী কিন্তু ঠিক ইহার উল্টা করিল। জেরীর ভাবস্বভাব বস্তুতঃই "দুষ্ট, ছেলের" মত!

ইহার পর ম্যান্‌স্‌ব্রিজ জেরীকে কাছে ডাকিয়া তাহার খাঁদা নাকের উপর একটা আঙুর রাখিয়া দিলেন এবং হাতের কোনরূপ সাহায্য ব্যতীত উহা তাহাকে খাইতে বলিলেন। জেরী আস্তে আস্তে ঘাড় নীচু করিয়া নীচের ঠোঁটখানি বাড়াইয়া নাকের উপর হইতে আঙুরটীকে মুখে



জেরীর নাকের উপর আঙুর রক্ষা।

টানিয়া লইল। অতঃপর অধ্যক্ষ ফেনীর হাতে একটী আঙুর দিয়া জেরীকে তাহা খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন;—ফেনী অবিলম্বে রক্ষকের আদেশ পালন করিল। শেষোক্ত এই কার্য্যটী নির্ব্বাহ করিবার বেলা জেরী কিন্তু এত

বড় স্বার্থত্যাগের নিমিত্ত আন্তরিক ক্লেশের যথোচিত পরিচয় দিতে কসুর করিল না।

ম্যান্‌স্‌ব্রিজ ফেনীকে ডাকিয়া বলিলেন—'ফেনি, চোক বুজে' হাঁ কর, তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি।' তৎক্ষণাৎ ফেনী হাঁ করিয়া চোক বুজিবার ভাণ করিল; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে অলক্ষ্যে ডান চোকটী দিয়া মিটির মিটির করিয়া তাকাইতেও লাগিল। অধ্যক্ষ তাহার দুষ্টুমি বুঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—'সয়তান! এই বুঝি তোমার চোক বোজা?—



"চোক বুজে হাঁ কর, তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি।"

ান চোক দিয়ে ও কি হচ্ছে?—বোজ—বোজ—ও চোকটাও শীগ্‌গীর বোজ।' এবার ফেনী সত্য সত্যই দৃঢ়ভাবে দৃষ্টি বন্ধ করিল। ম্যান্‌স্‌ব্রিজ ঐ অবস্থায় উহার নাকের ডগায় একটা আঙুর রাখিয়া দিলেন,—মুখের হাঁ সার্থক করিতে শিম্পাঞ্জীও গপ্ করিয়া তাহা গিলিয়া ফেলিল।

ভেল্‌কীওয়ালাদের ন্যায় ম্যান্‌স্‌ব্রিজের পকেটগুলি সর্ব্বদাই নানা দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ থাকে। তিনি তাঁহার একটী পকেট হইতে একখানা ছুরি ও একটী আপেল ফল বাহির করিয়া ফেনীকে তাহা কাটিতে দিলেন। ফেনী যথানিয়মে তাহা কাটিয়া রক্ষকের আদেশে একখণ্ড নিজে খাইল এবং অপর একখণ্ড ছুরির বাঁটে ফুঁড়িয়া জেরীকে খাওয়াইয়া দিল; ফলটীর অবশিষ্টাংশ ম্যান্‌স্‌ব্রিজ নিজে গ্রহণ করিয়া 'পকেটস্থ' করিলেন। মুখের গ্রাসের এইরূপ



ফেনী নিজের আপেলের ভাগ জেরীকে খাওয়াইতেছে।

অসাময়িক অপব্যবহার দেখিয়া জেরীর কিন্তু ক্ষোভের সীমা রহিল না। সে আপেলের অবশিষ্টাংশ পাইবার জন্য হাউ মাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। অধ্যক্ষ বলিলেন—'যাঃও! এখন আমাকে বিরক্ত করো না। আজ আর কিছু হচ্ছেনা, যা পাওয়ার আবার কাল পাবে।' কিন্তু সে কথা শুনে কে?—জেরী তিন বৎসরের খোকাটীর মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ম্যান্‌স্‌ব্রিজ শেষে তাহাকে পকেট হইতে উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বলিলেন। আদুরে খোকার কান্না-কাটি অমনি থামিয়া গেল—অভিপ্রেত জিনিস লাভের আশায় জেরী মহা উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া রক্ষকের পকেট অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল এবং এ-পকেট ও-পকেট করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে এক পকেটে আপেলটী পাইয়া অতি আনন্দে উদরসাৎ করিল।

বাহিরের খেলা এইভাবে শেষ করিয়া ঘরের ভিতরের ব্যাপার দেখাইবার জন্য ম্যান্‌স্‌ব্রিজ্ অতঃপর জেরী ও ফেনীকে গৃহে রাখিয়া আসিলেন। উহাদের একজন অধ্যক্ষের কোলে চড়িয়া ও অপরজন তাঁহার হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

ম্যানস্‌ব্রিজ ফিরিয়া আসিয়া দর্শকগণকে উহাদের গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। এই গৃহ বানরাবাসের মূল খাঁচার পশ্চাতে সংস্থিত এবং তিনখানি ক্ষুদ্র কামরায়



জেরী রক্ষকের পকেটে হাত ঢুকাইয়া আঙর খুঁজিতেছে।

বিভক্ত। একটী বারান্দাপথ কামরাগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। উহার টালির আচ্ছাদন ও কাঁচের বেড়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী প্রবেশদ্বার মূল গৃহগুলিতে যথেষ্ট আলো ও বায়ু সঞ্চারের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। ম্যানস্‌ব্রিজ দর্শকগণকে লইয়া এই বারান্দাপথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখের একটী কামরা দেখাইয়া বলিলেন—'এইটী ওদের রান্নাঘর। এই ঘরের সমস্ত জিনিসই ওরা নিজেদের বলে মনে করে এবং এখানে এসে নিজেদের জিনিস নিজেরা পেলে কোন বিষয়েই ঝগড়াঝাটি থাকে না।' ফেনীদের এই রান্নাঘরখানি নানাবিধ খাবার বাসনে সজ্জিত। উহার মধ্যে কয়েকপ্রকার ঔষধও রক্ষিত আছে। স্বাভাবিক বন্যাহারের অভাবে পেটের পীড়া জন্মিবার আশঙ্কায় এই ঔষধ উহাদের জন্য ব্যবস্থিত। জেরী ও ফেনী প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই প্রত্যহ ইহার এক এক ডোজ পান করে। এই প্রকার ঔষধ সেবনে ইহাদের কোন প্রকার বিরক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

রান্নাঘরে দুইখানি কেদারা সাজাইয়া রাখিয়া ম্যানস্‌ব্রিজ অতঃপর ফেনীদের অন্দরাভিমুখে চলিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত কামরা তিনটীর সর্ব্বশেষ গৃহখানিই উহাদের এই অন্দরমহল। মহলটীর সম্মুখাংশ অর্দ্ধকাচাবৃত কপাট-সংযুক্ত। ম্যানস্‌ব্রিজ এই কপাটে ধাক্কা দিয়া প্রথমতঃ গৃহস্থকে সজাগ করিয়া লইলেন, তারপর ফেনীকে ডাকিয়া দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। ফেনী ভিতরের হাতল ঘুরাইয়া কবাট খুলিল এবং মুখ বাড়াইয়া আগন্তুকের উদ্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরে স্বীয় রক্ষককেই দ্বারসান্নিধ্যে দেখিতে পাইয়া মহা আনন্দে দরজার উপর লাফাইয়া উঠিয়া বিচিত্রগতিতে দোল খাইতে আরম্ভ করিল। ম্যানস্‌ব্রিজ তাহাদিগকে অবিলম্বে রান্নাঘরে আসিতে বলিলেন। বাধ্য ও সুবোধ ছেলেটীর মত জেরী এবার মহা চট্‌পটে হইয়া উঠিল—ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ সে রক্ষকের হস্ত ধারণ করিল। ফেনীর কিন্তু তখনও দোল খাইবার সখ মিটে নাই—সে পূর্ব্বের ন্যায় ভারী স্ফূর্ত্তিতে দরজার উপর দুলিতে লাগিল। ম্যানস্‌ব্রিজ ডাকিয়া বলিলেন—'বেশ! তুমি তোমার দোল নিয়েই তবে থাক! আমরা কিন্তু চল্লুম; শেষে তোমায় একলা একলা যেতে হবে, তা বলে রাখ্‌ছি।' এই কথা শুনিয়া ফেনীর চমক ভাঙিল—তৎক্ষণাৎ সে নামিয়া পড়িয়া গজেন্দ্র-গমনে হেলিয়া দুলিয়া রক্ষকের অনুবর্ত্তিনী হইল।

রান্নাঘরে পঁহুছিয়াই উভয়েই স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া পড়িল। ম্যানস্‌ব্রিজ পকেট হইতে এক থোকা কালো আঙুর বাহির করিলেন এবং তাহার একটা ছিঁড়িয়া ফেনীর নাকের উপর রাখিতে গেলেন। ফেনী দুষ্টুমি করিয়া আঙুরটী নীচে ফেলিয়া দিল। ম্যানস্‌ব্রিজ বলিলেন—'একার্য্যে দুষ্টুমিটা ওর চিরাভ্যস্ত। আর একটা আঙুরের লোভেই দুষ্টু এটাকে ফেলে দেয়।' বাস্তবিক কার্য্যেও ঘটিল তাই। অধ্যক্ষ দ্বিতীয়বার যখন আর একটা আঙুর উহার নাকের ডগায় স্থাপন করিলেন, তখন সে অনায়াসে তাহা রাখিতে পারিল। এবারের কৃতকার্য্যতার পুরস্কারস্বরূপ অধ্যক্ষ তাহাকে আঙরটী খাইতে দিলেন।

ফেনীর খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় ম্যানস্‌ব্রিজ, অকস্মাৎ স্মরণ করিবার ছলে, চ্যাঁচাইয়া উঠি-লেন—'আহা, ওর খোসাটা খেয়ো না, ওদিয়ে আমার দরকার আছে।' কিন্তু তখন একটু আধটু শাঁসও যাহা বাকী ছিল, তাহাও ফেনী তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিয়া ঠোঁটের উপর একটা থুথুর বুদ্বুদ উঠাইয়া দেখাইল—এখন বলা বৃথা, আগেই সব শেষ হইয়া গিয়াছে। ম্যানস্‌ব্রিজ তখন আর একটী আঙর তাহাকে খাইতে

দিয়া তাহার খোসা রাখিতে বলিলেন। ফেনী চুষিয়া চুষিয়া রসটুকু খাইয়া এবার সত্য সত্যই খোসাখানি বাহির করিয়া রক্ষকের নিকট দিল এবং সমস্তটুকুই যে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রমাণার্থ আর একটা থুথুর বুদ্বুদ উঠাইয়া দেখাইল—মুখ একেবারে খালি।

ইহার পর জেরীর পালা। ফেনীকে খাইতে দেখিয়া একেই জেরীর লোভসম্বরণ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল, তার উপর খাওয়ার জিনিস লইয়া অধ্যক্ষ যদি ফেনীর মত উহার সহিত খেলা করিতেন, তাহা হইলে বেচারার আর দুঃখের সীমা থাকিত না। অধ্যক্ষ উহার স্বভাব বুঝিয়াই সে দিকে না গিয়া ফেনীর সহিত বণ্টন করিয়া খাইবার জন্য বাকী আঙুরগুলি উহার হাতে দিলেন। আন্তরিক দুঃখের সহিতই জেরী ফেনীকে এই খাদ্যদ্রব্যের অংশীদার করিল।

এই সময়ে ম্যানস্‌ব্রিজ এক পেয়ালা দুধ আনিবার জন্য পেছন ফিরিলেন, ফেনীও এই সুযোগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কেদারার তলে হাত বাড়াইয়া পূর্ব্বনিক্ষিপ্ত আঙুরটী তুলিয়া লইল। তারপর টুপ্ করিয়া তাহা গালে পুরিয়া যথাস্থানে পুনরায় "ভদ্রলোকটী" হইয়া বসিল।

ইতিমধ্যে ম্যানস্‌ব্রিজ দুগ্ধ-পেয়ালা আনিয়া ফেনীর হস্তে দিলেন এবং জেরীকে উহা খাওয়াইয়া দিতে আদেশ করিলেন। ফেনী ডান হাতে পেয়ালা রাখিয়া বাঁ হাত দিয়া চাম্‌চে ধরিয়া আস্তে আস্তে জেরীকে দুগ্ধপান করাইতে লাগিল; কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেও সতৃষ্ণ ও অধীরভাবে বারংবার দুগ্ধের প্রতি চাহিতে লাগিল। ভাবগতিক বুঝিয়া ম্যানস্‌ব্রিজ তাহাকে বাকী দুধটুকু পান করিবার হুকুম দিলেন। তাঁহার মুখের কথা ফুটিতে না ফুটিতে ফেনী এক নিশ্বাসে সমস্ত দুধ নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

এই প্রকারে আহারাদি সমাধা হইলে ম্যানস্‌ব্রিজ শিম্পাঞ্জীদ্বয়কে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিলেন। ফেনী কেদারা হইতে উঠিয়া আসিয়া অধ্যক্ষের হস্ত ধারণ করিল। জেরীর কিন্তু তখনও খাওয়ার আশা মিটে নাই; সে পেটুক ছেলের মত ঠায় খাবার আসনে বসিয়া রহিল। কিন্তু অধ্যক্ষ যখন তৎপ্রতি বিশেষ দৃকপাত না করিয়া ফেনীকে লইয়া হাঁটিয়া চলিলেন, তখন সে-ও নিতান্ত অনিচ্ছায় চলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ঘরে পঁহুছিয়াই



ফেনী জেরীকে দুধ খাওয়াইতেছে।

একগাছা দড়ির উপর উঠিয়া গোসাভরে গোঁজ হইয়া রহিল। অধ্যক্ষ তাহাকে দোল খাওয়ার জন্য কত সাধ্যসাধনা করিলেন, কিছুতেই তাহার রাগ পড়িল না।

শিম্পাঞ্জীদের গৃহ হইতে অতঃপর ম্যানস্‌ব্রিজ বন-মানুষের আড্ডায় চলিলেন। এই স্থান ফেনীদের গৃহেরই নিকটবর্ত্তী, গৃহশোভায়ও ইহা শিম্পাঞ্জীদেরই মহল্লার অনুরূপ। দর্শকগণ এই স্থানে যাইয়াই সর্ব্বপ্রথম দুইটী শ্বেতবর্ণ দীর্ঘবাহু মর্কটের সাক্ষাৎ পাইলেন। মর্কটদ্বয় আফ্রিকার বনমানুষ সমাজের প্রাণী। উহাদের মধ্যে একটী একেবারে দুগ্ধপোষ্য, অপরটী চারি বৎসর বয়স্ক। শেষোক্তটী প্রায় এক বৎসর যাবৎ এই চিড়িয়াখানায় আছে—উহার নাম জিমি (Jimmy)। জিমি বড়ই অশান্ত। তাই অনিষ্টের আশঙ্কায় ইহার নিকট খোকা-বনমানুষটীকে ঘেঁষিতে দেওয়া হয় না।

স্বভাবতঃ লম্ফে ঝম্পে হাঁটা চলায় বনমানুষগুলি অতি পটু। তার উপর কুস্তি শিখিয়া জিমি তো এক পাকা পালোয়ান হইয়া উঠিয়াছে! হরাইজেণ্টাল্ বারে (Horizontal Bar) ঘুরপাক খাইতে ইহার সমান ওস্তাদ চিড়িয়াখানায় নাই। মানুষের মত থপ্ থপ্ করিয়া দুই পায়ে হাঁটিতেও ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য ম্যানস্‌ব্রিজ্ ইহাকে আহ্বান করিলেন—অমনি জিমি মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া দুই পায়ে দাঁড়াইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিল।



কপিল মুনি।

(সিংহলের একটি প্রস্তরমূর্ত্তির প্রতিরূপ।)

জিমির গৃহাভ্যন্তরে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী হরাইজেণ্টাল্ বার্ আছে। গৃহের দেওয়াল হইতে মধ্যদেশ পর্য্যন্ত উহা প্রসারিত এবং ছাদের সন্নিকটস্থ। হাঁটাহাঁটির পরীক্ষা সমাপনান্তে ম্যান্‌স্‌ব্রিজ্ জিমিকে এই বার্‌টির উপর ঘুরপাক খাইতে আদেশ দিলেন। অমনি জিমি বার্ ধরিয়া কুমারের চাকের মত ঘুরিতে লাগিল। আশ্চর্য্য এই, এই ব্যায়ামের সময় ছাদ-সন্নিকটে যেস্থানে তাহার পা বাধিবার সম্ভাবনা আছে, নিয়মিত ভাবে তাগ বুঝিয়া সেস্থানে উহা সঙ্কুচিত করিয়াও রাখিতে লাগিল। হঠাৎ ম্যান্‌স্‌ব্রিজ্ বলিয়া উঠিলেন--'থাম।' অমনি কলের পুতুলের মত জিমিও নিস্পন্দ হইয়া বার্‌টির উপর উঠিয়া বসিল। তারপরে আবার অধ্যক্ষ উহার পুনরাভিনয় করিতে বলিলে, পূর্ব্বের ন্যায় যথানিয়মে ঘুরপাক খাইতে আরম্ভ করিল।

ইহার পর এখন ওরাং ওটাং জাতীয় বনমানুষের পালা। এই প্রাণীর বাসস্থান বানরাবাসের সম্মুখপ্রান্তে অবস্থিত। সেণ্ডি (Sandy) ও (Jacob) নামক দুইটী বনমানুষের ক্রিয়াকলাপই এ বিভাগের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। সেণ্ডি ১৯০৫ সাল হইতে এই চিড়িয়াখানার অধিবাসী; কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও আরো সাত বৎসর সিঙ্গাপুরে পালিত হইয়াছিল। জেকব ১৯০৮ সালে এস্থানে আসে। সেণ্ডির বয়স বছর যোল, জেকবের বয়স আট। উভয়ের বাসগৃহ স্বতন্ত্র।

শক্তিমত্তায় জেকব সেণ্ডি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেণ্ডির উদ্ভাবনীশক্তি স্বভাবতঃই প্রখর, কিন্তু ঐ শক্তির উৎকর্ষ-সাধনে জেকবেরই তৎপরতা বেশি।

ফেনী ও জেনীর ন্যায় সেণ্ডি ও জেকবও ম্যান্‌স্‌ব্রিজের প্রিয়পাত্র। কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বলবান ও দুর্দ্দান্ত বলিয়া তিনি ইহাদিগকে কাছে ডাকিয়া খেলা করিতে সাহস পান না। খাদ্যাদি প্রদানের সময়ও তিনি উহাদের গৃহের পশ্চাদ্দিগস্থ দ্বারপথেই যাতায়াত করেন।

সেণ্ডির কাণ্ড দেখাইবার জন্য ম্যান্‌স্‌ব্রিজ একথালা খাদ্য আনিলেন; এবং পশ্চাৎদ্বার দিয়া সেণ্ডির খাঁচার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিলেন। সেণ্ডি হর্ষভরে অধ্যক্ষের দিকে ছুটিয়া আসিল; কিন্তু আহার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আগুপিছু হাঁটিতে লাগিল। ম্যান্‌স্‌ব্রিজ দুইবার করিয়া সেণ্ডিকে খাবার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাহার হর্ষোচ্ছ্বাস প্রশমিত না হওয়ায়, আস্তে আস্তে কানের উপর একটা ঘুসি মারিলেন। এবারে সেণ্ডির সত্যসত্যই চেতনা হইল। সে ভাবিল, অধ্যক্ষ বুঝি রাগ করিয়াছেন; তাই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিল এবং ম্যান্‌স্‌ব্রিজকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার গালে একটা চুমা খাইল। বনমানুষের এই চুম্বনের দৃশ্য বাস্তবিক বড়



ফেনী তাহার রক্ষককে চুম্বন করিতেছে।

আশ্চর্য্য। ইহারা পায়ের উপর খাড়া হইয়া দুই হাত দিয়া গলা জড়াইয়া মানুষেরই মত চুমা খায়। শিম্পাঞ্জীর মধ্যে ফেনীও তাহার অধ্যক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া সময়ে সময়ে এরূপ চুমা খায় বটে; কিন্তু উহা তাহার শিক্ষার ফল। বনমানুষদের চুম্বনপ্রবৃত্তি স্বভাবজাত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উদ্ভাবনী শক্তিতে সেণ্ডি শ্রেষ্ঠ হইলেও, উহার উৎকর্ষসাধনে জেকবের ক্ষমতা অধিকতর। ম্যান্‌স্‌ব্রিজ নিজেই ইহার সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন—একবার সেণ্ডি একগাছা খড় জলে ডুবাইয়া তাহা চুষিয়া জলপান করিবার পন্থা আবিষ্কার করে; জেকব তৎক্ষণাৎ ঐ প্রক্রিয়া নকল করিয়া একগাছা স্থলে চারিগাছা খড় লইয়া তৎসাহায্যে অধিক পরিমাণে জলপানের উপায় নির্দ্ধারণ করে। এবিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শনার্থ তিনি তখন

দুই আঁটি খড় আনিয়া উহাদের গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং গৃহসম্মুখস্থ ক্ষুদ্র গবাক্ষদ্বারের বাহিরে এক এক পাত্র জল রাখিয়া দিলেন। সেণ্ডি উহা পাইয়া তৎক্ষণাৎ একগাছি খড় দ্বারা জলপানের প্রণালী প্রদর্শন করিল; কিন্তু জেকব চারিগাছি খড় বাছিয়া লইয়া, খড় সমেত উভয় হস্ত জানালাপথে গলাইয়া দিয়া এক হাত দ্বারা খড় ভিজাইতে ও অপর হাত দ্বারা তাহা ধরিয়া জলপান করিতে আরম্ভ করিল। একার্য্যে জেকব পূর্ব্বাপর এইরূপ চারিগাছি খড়েরই সহায়তা লইতে অভ্যস্ত। বোধ হয়, অঙ্কশাস্ত্রের চারি সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা করিবার পক্ষে ইহারও একটী স্বাভাবিক শক্তি জন্মিয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তটীই সেণ্ডি ও জেকবের উদ্ভাবনী শক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন নহে। অন্যান্য দুইটী বিভিন্ন ঘটনায়ও ইহাদের বুদ্ধি-কৌশলের আরো আশ্চর্য্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সেণ্ডি ও জেকবের বাসগৃহের সম্মুখাংশে দুইটী করিয়া ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে, উহার চতুঃসীমা সূক্ষ্ম লৌহতারে আবদ্ধ। একদিন ভোরে ম্যান্‌স্‌ব্রিজ্‌ দেখিতে পাইলেন, জেকব একটী যন্ত্র লইয়া ঐ গবাক্ষমুখে কি এক কার্য্যে



জেকব তাহার খাঁচার জাল ছিঁড়িতেছে।

ব্যস্ত! তিনি উৎসুকভাবে ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তো তাঁহার চক্ষু স্থির! জেকব কোথা হইতে একটা মোটা তার সংগ্রহ করিয়া তাহার গোড়ার দিকটা বাঁকাইয়া হাতলের মত এবং মাথার দিকটা বঁড়শীর ন্যায় করিয়াছে এবং ঐ যন্ত্র সাহায্যে গবাক্ষসীমার সূক্ষ্ম তার খুলিয়া ফেলিতেছে! বনমানুষের নির্ম্মিত যন্ত্রের কথা আর কোথায়ও, বোধ হয়, কেহ শুনেন নাই—কোনদিন যে আর শুনিবেন, এমন আশাও করা যায় না।

জেকব সম্বন্ধে যেমন একটী ঘটনা উল্লিখিত হইল, সেণ্ডি সম্বন্ধেও একবার তদনুরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। বহুদিন হইতে সেণ্ডির গৃহে একটী মোটা শিকল পড়িয়া ছিল। একদিন সেণ্ডি উহার কিয়দংশ ছিঁড়িয়া লইয়া একদিক খাঁচার ছাদ গলাইয়া পুনরায় ভিতরে টানিয়া আনিল এবং তদবস্থায় শিকলের দুই মুখ ধরিয়া করাতের মত করিয়া তারের উপর টানিতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে শব্দ শুনিয়া, যথাসময়ে ম্যান্‌স্‌ব্রিজ সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; অন্যথা, ঐ প্রকারে সেণ্ডি আর কতক্ষণ করাত টানিবার সুযোগ পাইলে, অধ্যক্ষকে সেদিন জেলখানার পাহারার মত 'কয়েদী ভাগ্‌তা হ্যায়' বলিয়া ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হইত!

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

যাত্রী

ওগো পথিক, দিনের শেষে
যাত্রা তোমার সে কোন দেশে,
এ পথ গেছে কোন্ খানে?
কে জানে ভাই কে জানে!
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারার
আলোক দিয়ে প্রাচীর ঘেরা
আছে যে এক নিকুঞ্জবন নিভৃতে;—
চরাচরের হিয়ার কাছে
তারি গোপন দুয়ার আছে,
সেইখানে ভাই করব গমন নিশীথে।

ওগো পথিক দিনের শেষে
চলেছ যে এমন বেশে,
কে আছে বা সেইখানে ?
কে জানে ভাই কে জানে !
বুকের কাছে আমার সেতার
গুঞ্জরি নাম কহে যে তার,
শুনেছি নাম জ্যোৎস্না রাতের স্বপনে।
অপূর্ব্ব তার চোখের চাওয়া,
অপূর্ব্ব তার গায়ের হাওয়া,
অপূর্ব্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে।

ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে এমন হেসে,
কিসের বিলাস সেইখানে ?
কে জানে ভাই কে জানে !
জগৎজোড়া সেই যে ঘরে
কেবল দুটি মানুষ ধরে,
আর সেখানে ঠাঁই নাহিত কিছুরি !
সেখানেতে ঘন মেঘে
আর ত কেহই নাইক জেগে,
একটি নাচে আনন্দময় বিজুরী।

ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে, কেইবা এসে
পথ দেখাবে সেইখানে ?
কে জানে ভাই কে জানে !
শুনেছি সেই একটি বাণী
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি
লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো !
সে মন্ত্র এই প্রাণের পরে
অনাহত বীণার তারে
গভীর সুরে বাজে সকাল সাঁঝে গো !

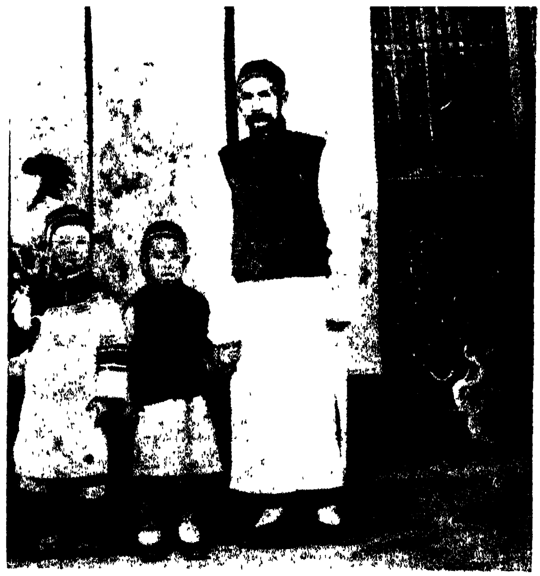
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

২

আমাদিগের পলায়ন

সাহেবদ্বয়ের সঙ্গে অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বারোহণ করিলাম। এবং কাষ্টম আফিসে গিয়া পাদ্রি ফ্রেজার সাহেবের ও নিস্‌বেট সাহেবের সঙ্গে মিলিত হইলাম। কয়েক জন চীনা কেরাণীও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। পোষ্টাফিসের কেরাণীদ্বয় সপরিবারে এবং কমিশনরের বড় কেরাণী মিঃ টাইয়ের ডবল পরিবার আমাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। আমরা সঙ্গে মাত্র একটী ওভারকোট



কমিশনারের বড় কেরাণী মিঃ টাই-লুং-সিন ও তাঁহার পুত্রকন্যা।
(ডাক্তার রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।)

ও একটী করিয়া কম্বল লইয়াছিলাম। রাস্তায় আহারের জন্য কুলির স্কন্ধে কিছু বিস্কুট, রুটি, চা, চিনি, দুধের টিন মাত্র সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। কারণ মালবহা খচ্চর দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। আমাদিগের মূল্যবান যথাসর্ব্বস্ব এই প্রকারে টেঙ্গিয়ে ফেলিয়া যাইতে হইল। বিদ্রোহীর সর্দ্দারগণ হইতে আমরা যত জন লোক যাইব তাহার এক পাশ-পোর্ট এবং কয়েকজন রাইফলধারী সেপাই আমাদিগের শরীররক্ষকরূপে পাইলাম। সকলে মিছিলের ধরণে

শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে পার্ব্বত্য পথে ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলাম। হাউয়েল সাহেব আমাদিগের নেতা কিন্তু তিনি নিজে রাস্তায় চলিতেও ভয় পাইতে লাগিলেন। পাহাড়ের উপর উঠিতে আমি সামান্য একটু পিছে পড়িয়াছিলাম অমনি তিনি ঘোড়া হাঁকাইয়া আসিয়া কহিলেন, "ডাক্তার, পাছে থাকিবেন না সকলের একসঙ্গে থাকা কর্ত্তব্য।" আবার কিছু দূর যাইতে যাইতে আমি একটী অগ্রবর্ত্তী লোকের সঙ্গে কোন কথা বলিবার উদ্দেশ্যে কিছু অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলাম, অমনি ফ্রেজার সাহেব কহিলেন যে "ডাক্তার, কমিশনার সাহেব আপনাকে অগ্রে যাইতে নিষেধ করিতেছেন। তিনি সকলের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।" আমি তৎক্ষণাৎ পিছে হটিয়া সকলের সঙ্গে একত্র হইলাম। হাওয়েল সাহেব যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ ধারণা হয় নাই। সাহেবের এই ভয় দেখিয়া মনে মনে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

আমরা টেঙ্গিয়ে পরিত্যাগ করিব এই সংবাদে এখানকার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সপরিবারে টেঙ্গিয়ে পরিত্যাগ করিয়া ভামো যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কারণ সকলেরই মনে একটা বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। কেহই এই স্থানে ধন প্রাণ নিরাপদ মনে করেন না। এইসকল সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত জেনেরাল চাংএর সমস্ত পরিবারবর্গ ও লবণবিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ ফোং প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য। এইপ্রকার প্রায় শতাধিক রমণী বালক বালিকা আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে চলিল। তাহার কারণ এই যে বিদ্রোহিগণ রাষ্ট্র করিয়া দিল যে ভামোর ভারতীয় "বড়পাগড়িওয়ালা" সেপাইগণ বিদ্রোহী হইয়া তাহাদিগের অফিসারদিগকে হত্যা করিয়াছে। তথায় কাহারো ধন প্রাণ নিরাপদ নহে। অধিকন্তু ব্রহ্ম ও চীন সীমান্তের পার্ব্বতীয় অসভ্য কাচিনগণ পথিকদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠ করিয়া লইতেছে। এই কারণ বশতঃ চীনারা বর্ম্মায় যাইতে হইলে আমাদিগের সঙ্গে যাওয়া নিরাপদ মনে করিয়া এত লোক আমাদিগের পিছে চলিল। কিন্তু



অবসরপ্রাপ্ত জেনেরাল চাং ও তাঁহার পুত্র।
(ডাক্তার রামলাল সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।)

রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদিগের নিতান্তই অনিচ্ছা যে এদেশ ছাড়িয়া বর্ম্মায় কোন লোক চলিয়া যায়। কারণ তাহা হইলে এস্থানের দুর্ণাম হইবে।

প্রায় বেলা দুই প্রহরের সময় টেঙ্গিয়ে হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে পথের ধারে এক উষ্ণ প্রস্রবণের নিকট আমরা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর উপবেশন করিয়া বিশ্রামান্তে দুই একটী কলা ও দুইএকখানি বিস্কুট দ্বারা মাধ্যাহ্নিক ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। এই স্থান হইতে হাওয়েল সাহেব নিশ্চিন্ত মনে ও নির্ভয়ে চলিতে লাগিলেন।

টেঙ্গিয়ে হইতে ২৬ মাইল দূরে নাণ্ডিয়ান নামক প্রসিদ্ধ স্থানের এক দেবমন্দিরে গিয়া উঠিলাম। তথায় খড় বিছাইয়া উত্তম শয্যা রচনা করা হইল এবং মাত্র একটী করিয়া কম্বল দারুণ শীতে আচ্ছাদনের



চীনা মন্দিরের পুরোহিত।
(ডাক্তার রামলাল সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।)

কার্য্য করিল। অবস্থানুসারে আহারের ব্যবস্থা করা হইল।

পর দিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া চা ও রুটি খাইয়া নাগুিয়ান পরিত্যাগ করিলাম। আজকার পথ বড় দুর্গম। গতকল্য যেসকল পাহাড় অতিক্রম কবিতে হইয়াছিল তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। অদ্যকার উচ্চ পর্ব্বত ও দুর্গম গিরিপথসকল অতিক্রম করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। পর্ব্বতশীর্ষদেশে পথিকগণের বিশ্রামের একটী আড্ডা আছে। বেলা একটার সময় তথায় গিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম। এই স্থানের তিন চার মাইলের মধ্যে কোন বসতি নাই। এখানে কতকগুলি গরিব স্ত্রীলোক খাদ্যের দোকান খুলিয়া দিবাভাগে অবস্থিতি করে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামে চলিয়া যায়। ইহারা ভাত, শূকরের মাংস, ডিম্ব, গৃহজাত সুরা প্রভৃতি দোকানে রাখে। আর কতকগুলি স্ত্রীলোক ঘোড়ার ঘাস আনিয়া বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত রাখে। এখানে উপস্থিত হইলে এই-সকল স্ত্রীলোক কলিকাতার চীনা বাজারের দোকান-দারগণের মত যাত্রীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। আমরা কখনই ইহাদের কোন খাদ্য ব্যবহার করি নাই। আমাদের খাদ্য সঙ্গেই ছিল। তবে ইহাদের দোকানে বসিয়া সঙ্গের খাদ্য খাইতে হইত। ইহারা আমাদের বিস্কুট দোবারা চিনি প্রভৃতি দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কেহ কেহ চাহিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমাদিগের ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্যগুলি দিলে ইহারা মহাসুখী হইল।

এই স্থানে আমাদিগের ও ঘোড়াগুলির টিফিন খাওয়া হইলে পুনরায় অশ্বারোহণ করিলাম। এখান হইতে প্রায় তিন মাইল পথ পাহাড়ের নিম্নে নামিতে হয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই পতনের শঙ্কা হয়। এই পর্ব্বত হইতে নিম্নাব-তরণের পর টাইপিং নদীর বিখ্যাত প্রকাণ্ড গর্জ্জ বা গিরি-সঙ্কটে উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতের পার্শ্ব কাটিয়া যে রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া কখনও বা নিম্নগামী কখনও বা উর্দ্ধগামী হইয়া চলিতে হইল। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। অতিবৃষ্টিতে স্থানে স্থানে পর্ব্বতপার্শ্ব ধ্বসিয়া পড়িয়া যাওয়ায় রাস্তা কোন কোন স্থানে অতি সংকীর্ণ হইয়াছে। তথায় অশ্বারোহণে চলা অতি সংকট। অশ্বপদ কিঞ্চিৎ স্খলিত হইলে দুই তিন শত বা ততোধিক গজ নিম্নে পতিত হইবার ভয়। ইহার মধ্যে আর এক বিপদ এই, যে, সম্মুখ হইতে ঐ পথে যদি শতাধিক অশ্বতর বোঝাই মাল সহ আসিয়া জমা হয় তাহা হইলে সেখানে না যায় পিছে হঠা না যায় সম্মুখে যাওয়া। চীনেরা এই জন্য সম্মুখের আগন্তুকদিগকে সাবধান করিবার জন্য অশ্বতরের দলের অগ্রে অগ্রে এক ঘণ্টা পিটাইতে পিটাইতে যায়। তাহার দ্বারা দূর হইতে জানা যায় যে সম্মুখে মাল সহ খচ্চর আসিতেছে। সেই জন্য কোন ফাঁকা প্রশস্ত স্থানে ইহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। এই প্রকার কষ্টে এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া কাঙ্গাই নামক প্রসিদ্ধ উপত্যকায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপস্থিত হইলাম।

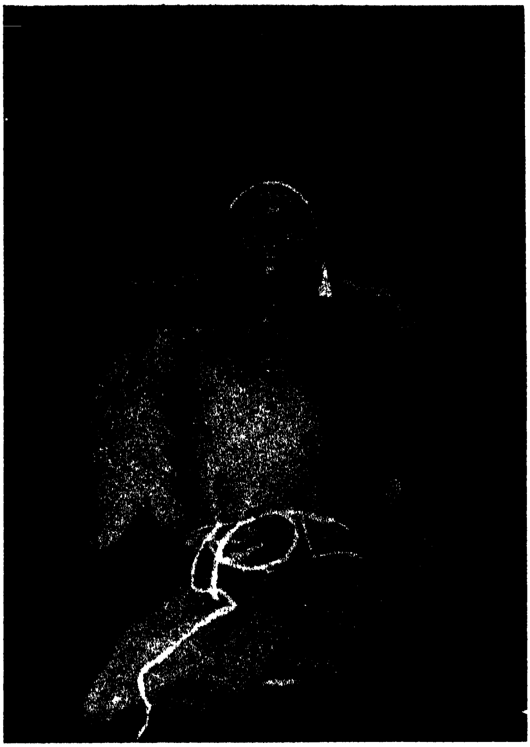
কাঙ্গাই উপত্যকায় অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পথে তরবারিস্কন্ধে বহুশত শান জাতীয় লোককে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে

টেঙ্গিয়ের দিকে যাইতে দেখা গেল। তখনই বোধ হইল যে ইহারা বিদ্রোহীদিগের সৈন্যদলভুক্ত হইবার জন্য গমন করিতেছে। তাহাদের সর্ব্বপশ্চাতে জাপানী ধরণের সৈনিক ইউনিফরম-পরিহিত অনেকগুলি সৈন্য সহ এক ব্যক্তি সিডান চেয়ার বা বাঁশের দোলার মত যানে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহারও খাকী ইউনিফরম এবং মাথায় সোলার বড় টুপি। আমি, নিস্‌বেট্ ও ফ্রেজার সাহেব একসঙ্গে যাইতেছি, অপর দুইজন কিঞ্চিৎ পশ্চাতে। আমরা নিকটবর্ত্তী হইলে যানারূঢ় ব্যক্তি হঠাৎ ব্যস্ত ভাবে মাথার টুপি তুলিয়া আমাকে নমস্কার করিলেন, আমিও তাদৃশ দ্রুত ভাবে তাঁহাকে প্রতিনমস্কার জানাইলাম এবং ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কোথায় যাইতেছেন। তিনি কিন্তু আমায় ইংরেজী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার চেহারা দেখিয়া চেনা লোকের মত বোধ হইল কিন্তু স্মৃতি-শক্তির দুর্ব্বলতাবশতঃ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিলাম না। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই উভয়েই উভয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম। সাহেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনি কে?" তাঁহাদের কথার উত্তরে আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না, কেবল কহিলাম যে "এই ব্যক্তিকে আমি চিনি বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু ঠিক বলিতে পারিলাম না ইনি কে।" সকলেই প্রথমে অনুমান করিয়াছিলাম, যে, ইনি বুঝি কোন জাপানি সৈনিক কর্ম্মচারী হইবেন। কিন্তু আমাদিগের সঙ্গের একটী সেপাই কহিল যে "ইনি কাঙ্গাইয়ের বর্ত্তমান সুভা; তাওফেই-সিন।" তখন আমার চৈতন্য হইল এবং মনে মনে পরিতাপ হইল যে কেন ইঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করি নাই। ইনি আমার অতি পরিচিত পুরাতন বন্ধু। ইনি জাপানে গিয়া কয়েক বৎসর থাকিয়া নানা বিষয় দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছেন। কয়েকটী সান বালিকাকে জাপানে লইয়া গিয়া নানা বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। এবং জাপান হইতে পুরুষ ও রমণী কারিগর আনাইয়া নিজের এলাকায় জাপানি ধরণের তাঁতের কার্য্য ও নানা শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিতেছিলেন। ইঁহার বিষয় পূর্ব্বে প্রবাসীতে লিখিত হইয়াছিল। আমি তিন চারি বৎসর ইঁহাকে দেখি নাই। ইঁহার মুখে গোঁপ ছিল না, মাথায় লম্বা বেণী ছিল এবং পরিধানে চীনা পোষাক। কিন্তু এখন তাহার কিছুই নাই, অধিকন্তু বড় সোলার টুপি পরায় চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ইঁহার পিতার ফটোগ্রাফ পূর্ব্বে প্রবাসীতে* ছাপা হইয়াছিল। ইঁহার পিতা আমার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপনের জন্য তাঁহার শেষ পক্ষের একটী ছোট কন্যা ধর্ম্মপিতারূপে আমাকে বরণ করেন। সেই হইতে ইঁহারা আমার কুটুম্ব। এ প্রথা চীনদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত।

কাঙ্গাইয়ে দুটী শহর। একটী পুরাতন অপরটী নূতন। পথিকদিগের থাকিবার স্থান পুরাতন শহরে। নূতন শহর পুরাতন হইতে তিন মাইল দূরে। তথায় সুভার রাজধানী। পুরাতন শহরে আমরা সুভা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ডাকবাঙ্গালায় অবস্থিতি করিলাম। এই স্থানের প্রত্যেক বাড়ীতে ও বাজারে সাধারণতন্ত্রের পতাকা (Republican flag) উড়িতে দেখা গেল। লোকের কথাবার্ত্তায় চাল চলনে ভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। বোধ হইল সকলেই যেন স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া বক্ষ প্রসারিত করিয়াছে। এখানে একরাত্রি বাস করিয়া পরদিন ছিয়াও-সিং-কাই নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তথাকার কাষ্টম হাউসে পৌঁছিলাম। কাষ্টম হাউস জনশূন্য। তথাকার টাকাকড়ি সব বিদ্রোহীদিগের সর্দ্দারের লোকে লইয়া গিয়াছে এবং কর্ম্মচারীরা পলায়ন করিয়াছে। তথাকার একজন পরিচিত লোক হাওয়েল সাহেবকে সংবাদ দিল যে চীনব্রহ্মের সীমান্তের অসভ্য কাচিনগণ পথিকের সর্ব্বস্ব লুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাতে সাহেব শঙ্কিত হইলেন, কারণ সঙ্গে একটী বড় বাক্সে বহু-টাকার রূপা ছিল। কুলিগণ তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সেই লোকটীর সাহায্যে একজন গুপ্তচরকে ১০৲ দশ টাকা দিয়া ব্রহ্মদেশের সীমান্তের মিলিটারী পোষ্টের নেটিব অফিসারের নিকট এক পত্র পাঠান হইল যে তথা হইতে কতক সেপাই আসিয়া আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়।

পরদিন আমরা মানসীয়ান নামক চীন সীমান্তের শেষ

* প্রবাসীর পঞ্চম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা।



গলাকাটা সিপাহী ও তাহার শুশ্রূষাকারী সিপাহী।
(ডাক্তার রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।)

আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইলে বাজারের মধ্যে এক ঘোষণাপত্র পাঠ করিলাম। তাহা ইংরাজিতে, চীনা ও শান ভাষায় লিখিত এবং কাঙ্গাই সুভা তাও-ফেই-সিনের দস্তখতযুক্ত। তাহার মর্ম্ম এই যে "মাঞ্চু রাজবংশ আমরা চাই না, প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তিত হইল, ব্যবসায় বাণিজ্য যে ভাবে চলিতেছে সেই ভাবে শান্তিতে চলিবে। বিদেশী লোকের প্রতি সম্মান দেখাইতে হইবে এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। তিনি নিজে সমস্ত ইউনান প্রদেশের সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।" ঘোষণার ইংরেজি তরজমায় কিন্তু লেখা হইয়াছে যে তিনি গবর্ণর জেনারাল নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু চীনাতে লেখা হইয়াছে "তু-তু" বা প্রধান সেনাপতি। নিশ্চয় ইহা ইংরেজী তরজমাকারীর ভুল।

মানসীয়ানে আমরা এক রাত্রি বাস করিলাম। তথাকার প্রধান ব্যক্তি (Mr. Maw) ম নামক এক পুরাতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি কহিলেন যে "আপনাদিগের সীমান্ত প্রদেশে কোন ভয় নাই। আমি সঙ্গে কাচিন প্রহরী দিব।" প্রাতঃকালে দেখি দশবার-জন কাচিন তরবারি স্কন্ধে এবং বল্লম হাতে করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। সাহেব তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ফেরত দিলেন। মাত্র একজন লোক পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে রাখিলেন। তাহার দুই অর্থ মনে হইল। প্রথম বোধ হইল সাহেব বর্ম্মা হইতে সেপাই আসিবে মনে করিয়া কাচিন প্রহরী লইলেন না, আর এক অর্থ এই হইতে পারে যে পাছে এইসকল দুর্ব্বৃত্ত কাচিন দস্যুগণই রক্ষক হইয়া শেষে বা ভক্ষকের কার্য্য করে।

এখান হইতে ১২ মাইল দূরে ব্রিটীশ বর্ম্মার সীমানা। সেই সীমানায় ফুলিমা নামক ক্ষুদ্র নদী পার হইলেই বর্ম্মার সীমানা। আমরা প্রায় বেলা বারটার সময় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি ব্রিটিশ কন্সাল স্মিথ সাহেব আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। এই স্থানে এক ভগ্ন গৃহের মঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া মাধ্যাহ্নিক ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তথা হইতে ৯ মাইল দূরে এক ডাকবাঙ্গালায় গিয়া অবস্থিতি করিলাম। কন্সাল ও তাঁহার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার গ্রোভ রীতিমত স্বতন্ত্র ডিনার খাইলেন। আমরা কদলীফলের সাহায্যে অন্নমণ্ড সেবন করিয়া জঠরানল নির্ব্বাপিত করিলাম। কিন্তু শীতের প্রকোপে বড় অস্থির হইলাম। এই স্থানের পাহাড়ের হাওয়া এত বদ ও অসহনীয় যে নূতন লোক এখানে আসিলে সহসাই পীড়িত হয়। এই হাওয়া ও টাপেইং নদীর জলপ্রপাতের শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। এবং শীতে শরীর কাঁপিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক টেলিগ্রাম কন্সালের নিকট পৌঁছিল। সে টেলিগ্রাম কন্সাল পড়িয়া হাওয়েল সাহেবকে দিলেন। তিনি পড়িয়া আমাকে দিলেন। আমি টেলিগ্রাম পড়িয়া মনে মনে হাসিলাম এবং পাদ্রি ফ্রেজার সাহেবকে দিলাম। ভামোর ডিপুটি কমিশনার এ টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। ইহা আমারই প্রেরিত সেই টেলিগ্রাম যাহা আমি টেঙ্গিয়ে হইতে ডাকে

ভামো পাঠাই। সেই বিদ্রোহের রাত্রির ঘটনা। ইঁহারা কেহই জানেন না কে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে।

কেহ তক্তার মেঝের উপর শুইলেন, কেহ ইজীচেয়ারে শুইয়া রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন আমরা ভামো অভিমুখে রওনা হইলাম এবং কন্‌সাল চীন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি যে কোথায় যাইবেন তাহা কাহাকেও বলিলেন না। আমরা কলংখা নামক ডাক-বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে তিন মাইল দূরে পাহাড়ের উপর টংহং নামক স্থানে মিলিটারি পুলিষের ফাঁড়ি। তথায় অনুসন্ধান করা হইল যে আমাদের প্রেরিত কোন চর তথায় পৌছিয়া কোন পত্র দিয়াছিল কি না। প্রেরিত চর পত্র ঠিক দিয়াছিল, এবং পোষ্টকমাণ্ডাণ্ট নেটিব অফিসার ভামোর ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডাণ্টের নিকট সেপাই পাঠাইতে অনুমতি চাহিয়া পাঠায়। তথা হইতে কোন জবাব না আসায় আমাদের সাহায্যের জন্য সৈন্য সীমান্তে যায় নাই।

কলংখা হইতে ২০ মাহিল দূরে মোমক নামক স্থানের ডাকবাঙ্গালায় পরদিন উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে আমরা উদর পুরিয়া আহার করিতে পারিয়াছিলাম। এখান হইতে ভামো ১০ মাইল দূরে। পরদিন ১১ই নবেম্বর ঘোড়ার গাড়িতে আমরা ভামো পৌছিলাম। ভামোর পরিচিত লোকেরা সংবাদ শুনিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং টেঙ্গিয়ের বিপদের কথা শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

আমি টেঙ্গিয়ে হইতে ২৯শে অক্টোবর যে তারের সংবাদ ডাকে ভামো পাঠাই তাহা আমার এজেণ্ট সরকারি টেলিগ্রাফ আফিসে না লইয়া মিলিটারি পুলিষের পাঞ্জাবী হেডক্লার্ক বাবু উগ্রসেনকে দেখান। উগ্রসেন বাবু উহা ব্যাটালিয়ান-কমাণ্ডাণ্ট ক্যাপ্টেন অরমণ্ডকে দেখাইয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন যে "ডাক্তার সরকার এই টেলিগ্রাম কাগজে পাঠাইতে পারেন কি না।" তাহাতে ক্যাপটেন অরমণ্ড নাকি বলিয়াছিলেন যে "He must, it is his duty to do so." অতঃপর এজেণ্ট মহাশয় টেলিগ্রামটী, টেলিগ্রাফ আফিসে প্রদান করেন। টেলিগ্রাফ মাষ্টার রোজারিও সাহেব আবার উহা ভামোর ডেপুটী কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। ডেপুটী কমিশনার এই অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ তৎক্ষণাৎ বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টকে পাঠান এবং ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ইন্‌টেলিজেন্স অফিসার আবার সেই সংবাদ তৎক্ষণাৎ শিমলা প্রেরণ করেন। অবশেষে টেলিগ্রাফ মাষ্টার এই সংবাদটী রেঙ্গুন গেজেটে পাঠান। ৬ই নবেম্বর ঐ সংবাদ রেঙ্গুন গেজেটে প্রকাশিত হইলে পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্রে তারযোগে উহা প্রেরিত হয়। বেঙ্গলি প্রভৃতি কাগজে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহা রেঙ্গুন গেজেটের নকল।

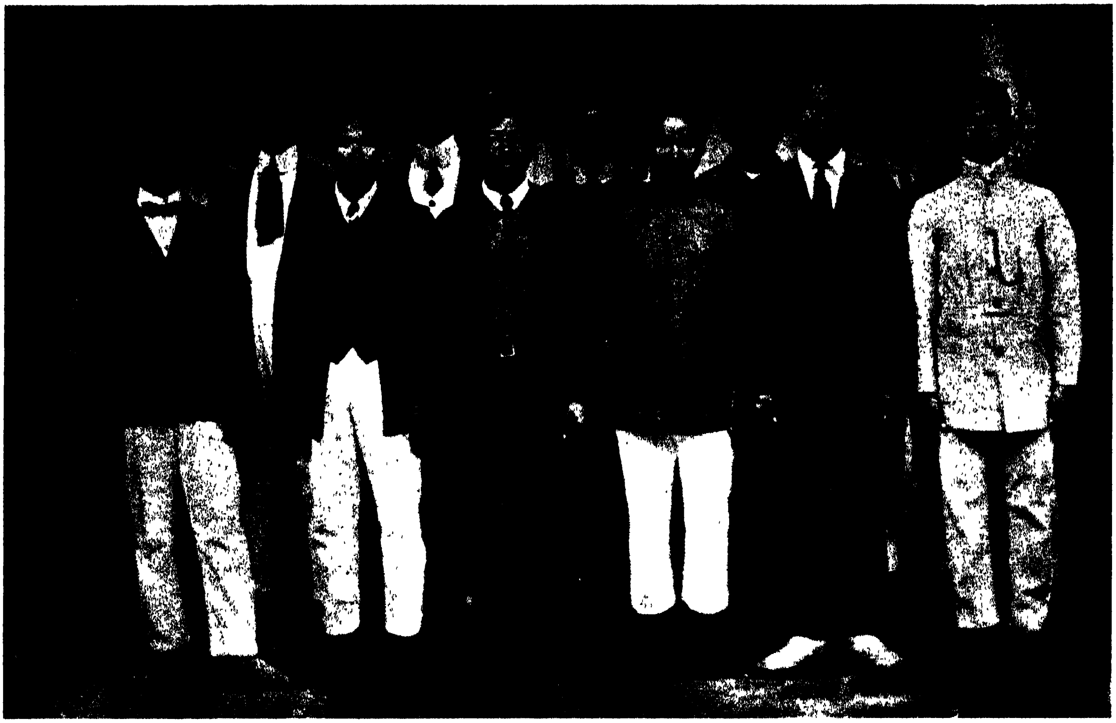
উগ্রসেন বাবু ভামোতে একজন নামজাদা ও প্রতিপত্তিশালী লোক এবং আমার একজন বন্ধু। তিনি কহিলেন যে "আপনার সাহসের ও দৃঢ়তার প্রশংসা করি। ইংরেজরা যখন ভয়েতে পলায়ন করিলেন আপনি তখন সাহসে নির্ভর করিয়া ছিলেন এবং ধীর চিত্তে বহির্জগতে টেঙ্গিয়ের দুর্ঘটনার সংবাদ প্রেরণ করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। প্রকৃত পক্ষে এই কার্য্য সাহেবদিগের কর্ত্তব্য ছিল।" তিনি আরো কহিলেন যে "বাঙ্গালীরা যে সর্ব্বত্রই সাহসের ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতেছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়।" ইনি এক সময়ে বড় বাঙ্গালীবিদ্বেষী ছিলেন।

সেবার ১৯০৮ খৃঃ যখন দেশে যাই তখন ভামোতে ইঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইনি বলিলেন যে ব্যাটালিয়ান-কমাণ্ডাণ্ট বাঙ্গালীদিগের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, "বর্ত্তমান বাঙ্গালী বংশ আর ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে গ্রাহ্য করে না। ক্রমে ইহারা ইউরোপিয়ানদিগকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে।" কি উপলক্ষে এই প্রকার রিপোর্ট হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধানে যতদূর জানা গেল তাহাতে জানা গেল যে এই জেলার মিলিটারি পোষ্টের কয়েক জন বাঙ্গালী ডাক্তার ঐ রিপোর্টের কারণ। তন্মধ্যে একজনের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জেলার কোন মিলিটারি পোষ্টে যে বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন তাঁহার চার্জ্জে তথাকার ক্ষুদ্র ডাকঘরটী ছিল। সুতরাং তিনি একাধারে পোষ্টমাষ্টার ও ডাক্তার ছিলেন। উক্ত

পোষ্টের কমাণ্ডাণ্ট (Commandant) ছিলেন একজন ইউরোপীয় লেপ্টেনাণ্ট। সাহেবের নাকি ২০০৲ টাকা মূল্যের এক ভিঃ পিঃ পার্শেল যায়। সাহেব আরদালি পাঠাইয়া পার্শেল লইয়া যান কিন্তু ভিঃ পিঃ মূল্য দেওয়ার সময় বলেন যে একমাস পরে বেতন পাইলে পার্শেলের টাকা দিবেন। বাবু তাহাতে কখনই রাজি হইতে পারেন না। কারণ, পোষ্টাল বিভাগের নিকট তিনি ঐ টাকার জন্য দায়ী। সুতরাং তিনি মহাবিপদে পড়িলেন। পরে চালাকি করিয়া কোন সূত্রে পার্শেলটী পুনরায় আনাইয়া আর ফেরত দিলেন না। সাহেবের আরদালি যাইয়া পার্শেল চাহিলে তিনি কহিলেন "টাকা আন ত পার্শেল দেই।" আরদালী গিয়া সাহেবকে রিপোর্ট করিল, সাহেব রাগে গড় গড় করিতে করিতে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া ডাক্তারকে পার্শেলি দিতে কহিলেন। এবং বলিলেন যে "তুমি যদি পার্শেল না দেও তবে তোমাকে পিস্তল দ্বারা গুলি করিব।" বাবু কহিলেন যে "আপনি যে প্রকার অভদ্র ব্যবহার করিতেছেন তাহা ভদ্রলোকের অসহনীয়। আপনি যদি পুনরায় এই প্রকার ভাষা ব্যবহার করেন তবে আমি আপনার বক্ষে এই ছুরিকা দ্বারা আঘাত করিব।" এই বলিয়া দীর্ঘ একখানি ছোরা দেখাইলেন। সাহেব দেখিলেন যে এপ্রকার মাথা-ভাঙ্গা লোকের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করিলে হয় ত ক্রোধের বশে একটা দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। এবিষয়ে আগাগোড়া তাঁহারই ত্রুটি। সুতরাং কুবুদ্ধি অপসৃত হইয়া তাঁহার মস্তকে সুবুদ্ধির আবির্ভাব হইল, যেমন ক্রোধে অস্থির ছিলেন সেইমত ক্রোধে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই বিষয়টী তখন ভামোর বন্ধুদিগের নিকট শুনিয়াছিলাম। শোনা কথায় কোন ভ্রম থাকিলে তজ্জন্য আমি দায়ী নহি।

ভামো পৌছিয়াই টেঙ্গিয়ের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া রেঙ্গুন গেজেটে পাঠাইলাম। তাহা ১৭ই ডিসেম্বরের গেজেটে প্রকাশিত হইলে সকলেই খুসি হইলেন। কেবল কাষ্টম কমিশনার হাওয়েল সাহেব বড় দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখ ও লজ্জায় আমারও দুঃখ বোধ হইল, কেন না তাঁহার মনে দুঃখ হইবে এ ধারণা আমার আদবেই ছিল না। যাহা সত্য বলিয়া জ্ঞান বিশ্বাস মতে জানি তাহাই লিখিয়াছিলাম। কোন বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া লেখা আমার অভ্যাস নহে। আমি তাঁহার নিকট এই জন্য মাপ চাহিয়া বলিয়াছিলাম যে তিনি যদি বলেন, আমি আমার প্রবন্ধের মর্ম্ম প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি কহিলেন, যে সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছে তাহা প্রত্যাহারে ফল কি? তাঁহার নামটা উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত। রেঙ্গুন গেজেট আমাকে এই প্রবন্ধের দক্ষিণা স্বরূপ ৪০৲ টাকা দিলেও এই কারণে তাহাতে আমার মনে শান্তি স্থাপিত হইল না।

এদিকে কন্‌সাল ধীরে ধীরে গিয়া টেঙ্গিয়েতে উপস্থিত হইয়াছেন সংবাদ পাওয়া গেল। কাষ্টম কমিশনার ভামো পৌছিয়া প্রায় সাত আট শত টাকার টেলিগ্রাম পেকিনের কাষ্টম ইনস্পেক্টর জেনারালের নিকট পাঠান। তথা হইতে ভামোতেই অবস্থান করিবার জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ আসে। সুতরাং দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ভামো থাকিতে তিনি বাধ্য হইলেন। আমার উভয়সঙ্কট হইল। আমি একদিকে কনসাল অপর দিকে কাষ্টম কমিশনার উভয়েব আফিসেই চাকরি করি। কনসাল টেঙ্গিয়ে গিয়াছেন, আমারও পুনরায় টেঙ্গিয়ে যাইবার জন্য আগ্রহ জন্মিল। তাহার কারণ দীর্ঘকাল ভামো থাকিতে হইলে আমাকে হয় ত হাঁসপাতালে গিয়া কার্য্য করিতে হইবে। তাহা হইলে আমার সারভিস্ ফরেন ডিপার্টমেণ্ট হইতে পুনরায় ব্রহ্মদেশের মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে বদলি হইবে। এই প্রকার হইলে পুনরায় চীন সারভিসে বদলি হইতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরের প্রয়োজন। আমার বাঙ্গালী বন্ধুরা যাহাতে আর চীনে না যাই সেই পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আমার আগ্রহ যে চীনের ঘটনাসকল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিব এবং স্বদেশবাসীকে তাহা জ্ঞাত করিব। এপ্রকার সুযোগ কোথায় মেলে? অবশ্য প্রাণের আশঙ্কা থাকিলেও আমি তাহা গ্রাহ্য করি না। কমিশনার সাহেবকে আমার অসুবিধার কথা বলাতে তিনি পরামর্শ দিলেন যে "কন্‌সালকে টেলিগ্রাম দাও। তিনি যাইতে আদেশ করিলে টেঙ্গিয়ে যাইতে পার।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত মুসাবিদা করিয়া দিলেন।



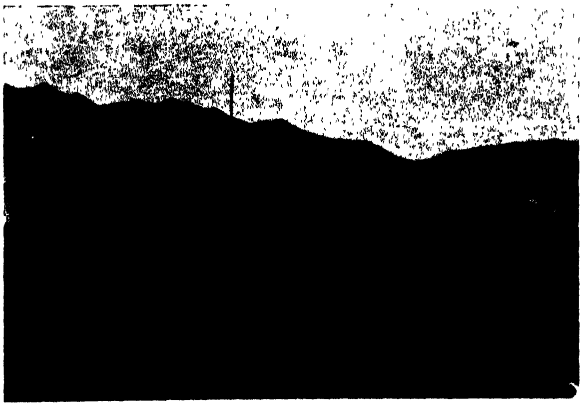
ক্যাণ্টনি স্বেচ্ছাসৈনিক বা ভলাণ্টিয়ার।
(ডাঃ রামলাল সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ)

"Britain.
May I return.
Sircor."

কন্‌সাল টেলিগ্রামের উত্তরে কহিলেন You may return. কিন্তু পাদ্রী ফ্রেজারকে ফিরিতে অনুমতি দিলেন না। গ্রোভ সাহেবকে যাইতে তার দিলেন।

উপসংহারে ভামোর চীনা মহাল্লার কথা কিঞ্চিৎ জ্ঞাতব্য মনে করি। আমরা ভামো পৌঁছিবার পূর্ব্বে ফলংখার ডাক-বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলাম যে প্রায় ৪০ জন ভদ্র চীন যুবক অশ্বারোহণে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে টেঙ্গিয়ে অভিমুখে যাইতেছে। তাহাদের অধিকাংশই ক্যাণ্টনি। তাহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে জাপানি বলিয়া বোধ হইল। ইহারা সকলেই ভলাণ্টিয়ার। রেঙ্গুন চীনা ক্লাব খরচ দিয়া ইহাদিগকে পাঠাইয়াছেন। ইহাদের মুখে শুনিলাম যে সাংহাই হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে "মাঞ্চু সম্রাট পেকিনের রাজপাট ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং সমস্ত দেশ রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদিগের হস্তগত হইয়াছে।" এই সংবাদ পাইয়া ভামো ও মাণ্ডালের চীনারা জাতীয় নিশান উড়াইয়া সহস্র সহস্র পুরাতন পতাকা পোড়াইয়া মহা উৎসব করিয়াছে। দীপমালার দ্বারা প্রত্যেক গৃহ আলোকিত করিয়াছিল। ভামোতে টিকি কাটার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। একদল লোক জবরদস্তি করিয়া লোকের টিকি কাটিয়া ফেলিতেছে। যাহাদের এখনও সন্দেহ আছে, সম্রাট পলায়ন করিয়াছেন কি না, তাহারা "রামভজি বা রহিমভজি" ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া কেহ একসপ্তাহের জন্য, কেহ দশ দিনের জন্য মাপ চাহিয়া উদ্ধার পাইয়াছে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে টেঙ্গিয়ের মাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েল এবং টাওঠাইর সঙ্গে দেখা হইল। টাওঠাই এত ভীত হইয়াছিলেন যে তিনি ছদ্মবেশে ভামো ডেপুটি কমিশনারের শরণাপন্ন হন। ডেপুটি কমিশনার তাঁহাকে মিলিটারি পুলিশের কেল্লার ভিতর রাখিয়া সেপাইয়ের



চীনা কেল্লা - ইহার ভারপ্রাপ্ত কর্ণেল ছাউ বিদ্রোহের রাত্রিতে নিহত হন।

প্রহরী রাখিয়াছিলেন। এবং কোন চীনা তাঁহার নিকট যাইতে না পারে তজ্জন্য কড়া আদেশ জারি করিয়া ছিলেন। কারণ তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে পাছে কোন বিদ্রোহী তাঁহাকে হত্যা করে। প্রায় সপ্তাহকাল এই প্রকারে কাটিলে ভামোর প্রধান প্রধান চীনসদাগরগণ দায়ী হইয়া ডেপুটি কমিশনারের আদেশ লইয়া তবে তাঁহাকে চীনাদের মন্দিরে আনয়ন করেন। তিনি দুঃখে এত বিমর্ষ যে কাহারো সঙ্গে প্রসন্নবদনে কথা বলেন না। কারণ এই বিদ্রোহে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব গিয়া তিনি কাঙ্গাল হইয়াছেন। তাঁহার কোমরে চোট লাগায় বেদনায় কাতর, তাই আমার নিকট ঔষধ চাহিলেন। আমি আঘাতের কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন যে টেঙ্গিয়ে হইতে বিদ্রোহের রাত্রিতে পলায়নের কালে জলে পড়িয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য তিন বার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নদীর জল গভীর না থাকায় ডুবিতে পারেন নাই। লাভের মধ্যে পাথরের আঘাতে কোমরে বেদনা হইয়া কষ্ট পাইতেছেন।

মিঃ ওয়েলও যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া কহিলেন "আমি মাঞ্চু নহি, আমি খাস চীনা, চীনা হইয়া স্বজাতির যথাসর্ব্বস্ব লুট করিল এই আমার আক্ষেপ।" এইসকল কর্ম্মচারীর নিবাস ক্যাণ্টন ও সাংহাই প্রদেশে।

ভামোতে এত চীনা স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা আসিয়া জমা হইয়াছে যে তথায় ঘর ভাড়া পাওয়া কঠিন হইয়াছে। চীনা মহাল্লায় প্রস্তুত খাদ্যের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। রেঙ্গুন ও মাণ্ডালে হইতে দলে দলে চীনা ভলাণ্টিয়ার টেঙ্গিয়ে অভিমুখে চলিয়াছে। ভামো হইতে রাস্তায় আবার নানা গোলযোগের গুজব রাষ্ট হইতেছে। তাহাতে অনেকের মনে ভীতি সঞ্চার হইতেছে।

এইসকল ভয়ের কারণ সত্ত্বেও আমি ও গ্রোভ সাহেব পুনরায় টেঙ্গিয়ে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ২২শে নবেম্বর যাত্রা করা হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামলাল সরকার।

শ্যামসুন্দর

তব অনন্ত-শয়ন, মাধব !
সাগরে কখনো নয়,
ধরণীরে বুকে জড়ায়ে ধরিয়া
রয়েছ ভুবনময় !
শ্যামল তোমার দেহের কান্তি
তাই চারি দিকে রাজে,—
পল্লবদলে তৃণ শাদ্বলে
ধান্যলহরী মাঝে !
পাষাণ শিখর তরল সাগর
শ্যাম শৈবাল বহে ;
গোপন গুহার নিবিড় আঁধারে
দূর্ব্বা নীরবে রহে !
সুকুমার শ্যাম কোমল মাধুরী
তবুও নিয়ত নব,
বাসব বরুণ বহ্নি অরুণ
মানিয়াছে পরাভব !
প্লাবন-লেহন অনল-দহন
বজ্র-বেদন আর,
শ্যামল তৃণের মৃদুল প্রভাবে
ঢাকা পড়ে বার বার !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস*

আজকাল বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে নব নব স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। জাহ্নবীর নানা শাখায় প্লাবিত শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির ন্যায় আমাদের সাহিত্য-মাতাও শত ধারায় অভিষিক্তা হইয়া উঠিতেছেন। সেইসমস্ত স্রোতোধারার মধ্যে ইতিহাসচর্চ্চার একটি ধারা ক্রমে বেগবতী হইয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। বাস্তবিক আজকাল আমাদের মধ্যে ইতিহাস আলোচনার কিছু ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কেবল তাহা নহে, এই আলোচনা যে কতক পরিমাণে স্বাধীন ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাও বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ কেবলমাত্র অনুবাদ অবলম্বন না করিয়া স্বাধীন গবেষণায় যে মনোনিবেশ করিয়াছেন, ইহা যারপরনাই আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে। যিনি এই স্বাধীন পথের প্রদর্শক তিনি যে বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া আমরা যতদূর অবগত হই, তাহাতে স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্তকে এই পথের প্রদর্শক বলিয়া আমাদের মনে হয়। বাস্তবিক রজনীকান্ত ভগীরথের ন্যায় শঙ্খনিনাদ করিয়া বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিকী গঙ্গার অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার শঙ্খধ্বনি দুন্দুভিনিনাদকেও পরাজিত করিয়াছিল, এবং তাহা আজিও আমাদের হৃদয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার আনীত ঐতিহাসিকী গঙ্গা বঙ্গসাহিত্যকে প্লাবিত করিয়া যেরূপ উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় বোধ হয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যাঁহারা বাঙ্গলার ঐতিহাসিক সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ সকলেই তাহা অবগত আছেন। অনেকে এক্ষণে সেই স্রোতে তরণী বাহিয়া চলিয়াছেন। এবং নিজ নিজ তরণীবক্ষে পতাকা উড়াইয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের দৃষ্টি কিন্তু পতাকা অপেক্ষা স্রোতের দিকেই ধাবিত হইতেছে। বাস্তবিক রজনীকান্ত যে স্রোতের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি যদি স্বাধীন ইতিহাসচর্চ্চার পথ প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গলার ঐতিহাসিক সাহিত্য এত শীঘ্র সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। সুতরাং বাঙ্গলার ঐতিহাসিক সাহিত্যে রজনীকান্তের স্থান কত উচ্চে অবস্থিত তাহা বোধ হয় সকলে অনুমান করিতে পারিতেছেন।

ভারতের ইতিহাস-সমুদ্র মন্থন করিয়া রজনীকান্ত বঙ্গসাহিত্যকে যে-সমস্ত রত্নে ভূষিত করিয়াছিলেন, আজিও তাহারা আপনাদের উজ্জ্বল কিরণ বিকিরণ করিয়া সাহিত্যমন্দিরকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার আর্য্যকীর্ত্তি, ভারতকাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থরত্নের আলোকে বঙ্গসাহিত্য যে সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি সাহিত্য-মুকুটে যে কোহিনুর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অদ্য তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস যে বঙ্গসাহিত্য-মুকুটে কোহিনুররূপে বিরাজ করিতেছে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বাস্তবিক সিপাহীযুদ্ধের ন্যায় একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস আজিও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হয় নাই। ইহা যে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সাহিত্যে অদ্বিতীয় সে কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

আজকাল বঙ্গসাহিত্য নানাপ্রকার ঐতিহাসিক গ্রন্থে সমৃদ্ধ হইলেও সিপাহীযুদ্ধের ন্যায় একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থ আজিও আমাদের নয়নপথে নিপতিত হয় নাই। সেইজন্য আমরা ইহাকে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সাহিত্যের মুকুটমণি বলিয়া অভিহিত করিতেছি। আমরা আশা করি, অনেকেই এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবেন।

যে সময়ে বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক সাহিত্য বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকায় ও কয়েকখানি অনুবাদ গ্রন্থে ভারগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছিল সেই সময়ে রজনীকান্ত স্বাধীন গবেষণার বলে সিপাহীযুদ্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস ব্যতীত আর কোন স্বাধীন গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে অনেক স্বাধীন গবেষণার পরিচয় থাকিলেও তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও বিদ্যালয়পাঠ্য হওয়ায় সাধারণ পাঠক-বর্গের নিকট তাদৃশ সমাদৃত হয় নাই। কিন্তু সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস যেরূপভাবে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই তাহা পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্যে ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং আমরাও তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। পঠদ্দশায় রজনীকান্তের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ও যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের রাজস্থানের অনুবাদ ব্যতীত আর কোন পাঠোপযোগী ইতিহাসগ্রন্থ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তন্মধ্যে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস যে স্বাধীনভাবে লিখিত হইয়াছিল একথা আমরা বারম্বার বলিয়া আসিয়াছি। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল যে বাঙ্গালা ভাষাতেও স্বাধীন ভাবে ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। এবং এক্ষণে অনেকেই যে অল্পবিস্তর তাহার অনুকরণের চেষ্টা করিতে-ছেন তাহাও দেখিতে পাইতেছি।

সিপাহীযুদ্ধের বিবরণ সাধারণ ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সেই দিগ্দাহকারী মহাগ্নি বাঙ্গালার শ্যামল প্রান্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু কিরূপে তাহার উৎপত্তি হইল, এবং কি ভাবেই বা তাহা উত্তর ভারতবর্ষকে দগ্ধ করিবার জন্য প্রধাবিত হইয়াছিল, পরিশেষে তাহা কেমন করিয়া নির্ব্বাপিত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকের অবগত হওয়ার সুবিধা ঘটে নাই। রজনীকান্ত ইতিহাসানুরাগী বাঙ্গালীদিগকে তাহাই জানাইবার জন্য সিপাহীযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি তাৎকালিক রাজনৈতিক ব্যাপার-সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া তাঁহার অমর গ্রন্থে সিপাহীযুদ্ধের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। ইতিহাসানুরাগী পাঠকমাত্রে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে তৎসমস্তই অবগত হইতে পারিবেন। ডালহৌসীর বিশ্বগ্রাসিনী রাজ্যলালসা কিরূপে দেশমধ্যে অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলে, কিরূপে প্রত্যাখ্যাত দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিগণ সিপাহিদিগের সহিত যোগদানে প্রবৃত্ত হন, কিরূপে ধর্ম্মনাশ ভয়ে সিপাহীগণ উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহের সূচনা করে, কিরূপেই বা সেই বিদ্রোহানল বারাকপুর, বহরমপুর হইতে আরম্ভ হইয়া আরা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মিরাট, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং কিরূপে নানাসাহেব, কুমারসিংহ, ত্যাত্যাটোপে, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি স্ব স্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া সেই বিপ্লবানলকে প্রজ্বালিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অবশেষে কিরূপেই বা নীল, হাবলক, আউট্রাম, উইলসন প্রভৃতি ইংরেজ সেনাপতি এই অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, রজনীকান্ত তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধের ছত্রে ছত্রে তাহার লোমহর্ষণ কাহিনী

* ৺রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। অভিনব সংস্করণ, বৃহদাকার দুইখণ্ডে সমাপ্ত। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৪৲ টাকা। প্রথম খণ্ডে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ। দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ সন্নিবেশিত। ৩০ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে প্রকাশিত।



স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত।

হত্যাকাণ্ড, হ্যাবলকের বীরত্ব, ফতেপুর, কানপুর প্রভৃতির যুদ্ধ, বিথুরে নানাসাহেবের প্রাসাদ ধ্বংস, নীলের প্রতিহিংসা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থভাগে পঞ্জাব, দিল্লী ও পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানের বিবরণ, বিহারের আরা প্রভৃতি স্থানের ব্যাপার, কুমারসিংহের সাহসিকতা, জগদীশ-পুরের ধ্বংস প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এবং পঞ্চমভাগ পাঠ করিলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গোয়ালিয়র, ইন্দোর, রাজপুতনা, আগরা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতির ভয়াবহ ঘটনার বিবরণ, তাঁত্যাটোপে ও ঝান্সীর লক্ষ্মীবাইয়ের অদ্ভুত বীরত্ব সুস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে রজনীকান্ত কিরূপ বিস্তৃত ভাবে সিপাহীযুদ্ধের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। এই পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত বিরাট ইতিহাস-গ্রন্থে রজনীকান্ত যে কিরূপ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ না করিলে জানা যায় না, যাঁহারা ইতিহাসানুরাগী পাঠক তাঁহারা সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমাদের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে সকলে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের পরিচয় কতক পরিমাণে জ্ঞাত হইতে পারেন। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ পাঠ না করিলে রজনীকান্তের প্রতিভা অবগত হওয়া যায় না। বাস্তবিক রজনীকান্ত তাঁহার এই বিরাট গ্রন্থে ছত্রে ছত্রে আপনার অমানুষী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তিনি ইহাতে তাঁহার স্বাধীন গবেষণার ফল ব্যক্ত করিয়াছেন। কে প্রভৃতি ইংরেজ

বিবৃত হইয়াছে, দেশীয় ও ইউরোপীয়ের অদ্ভুত সমরক্রীড়া এই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় চিত্রিত হইয়াছে।

রজনীকান্তের সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পাঁচভাগে বিভক্ত। প্রথম-ভাগে তিনি ডালহৌসীর শাসনকালের সমালোচনা করিয়া কিরূপে দেশমধ্যে অশান্তির অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং সিপাহী সৈন্যের উৎপত্তির বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগে নূতন রাইফল বন্দুক ও বসাযুক্ত টোটার প্রচলনে কিরূপে সিপাহীগণের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হয় ও বারাকপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে কিরূপে সিপাহীগণের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব অঙ্কুরিত হয়, পরে লক্ষ্ণৌ, মিরাট ও দিল্লীর সিপাহিগণ কিরূপে উত্তেজিত হইতে আরম্ভ করে তাহা বিশেষরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৃতীয়ভাগে কলিকাতার অধিবাসিগণের বিভীষিকা, দিল্লীর অভিমুখে ইংরেজ সৈন্যগণের যাত্রা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বারাণসী, আজিমগড়, জৌনপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের গোলযোগের বিবরণ, নানাসাহেব কর্ত্তৃক কানপুরের

ঐতিহাসিকের গ্রন্থ প্রধানতঃ তাঁহার অবলম্বন হইলেও তিনি অনেক কাগজ পত্র ও দেশীয় প্রবাদ জনশ্রুতি প্রভৃতি আলোড়ন করিয়া স্বাধীন মন্তব্যের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের মতের সমালোচনা করিয়া নিজ মত পরিব্যক্ত করিয়াছেন। সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া তিনি যে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, অকুতোভয়ে সেইসমস্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ গুণ এই যে, তিনি নিরপেক্ষভাবে সমস্ত বিষয়ের বিচার করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং আমাদের মতে ঐতিহাসিক মাত্রেরই নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা তাঁহার বর্ণনাকে শ্রুতিসুখকরী করিয়া রাখিয়াছে। যে ভাষায় ইতিহাস লিখিত হইলে তাহা দুন্দুভিনিনাদের ন্যায় পাঠকের হৃদয়কন্দরকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে, রজনীকান্ত সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে সেই ভাষার বিস্ময়করী লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভাষায় লিখিত ঘটনাবলী পাঠ করিতে করিতে শরীর

রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ফলতঃ ঘটনাসমাবেশে, স্বাধীন সিদ্ধান্তে ও ভাষার গাম্ভীর্য্যে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস যে বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয় একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বাঙ্গলার প্রত্যেক নরনারীর এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

রজনীকান্ত তাঁহার সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস শেষ করার অব্যবহিত পরে এ জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ মোহিনীকান্ত পিতার এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শনের জন্য সিপাহীযুদ্ধের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। কাশীমবাজারের মুক্তহস্ত মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র এই সংস্করণের ব্যয়বহনে সাহায্য করিয়া বাঙ্গালী মাত্রকেই উপকৃত করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য যে কতরূপে মহারাজের সাহায্যে সমৃদ্ধ হইতেছে তাহার বোধ হয় নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। মোহিনীকান্ত পিতার এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রক্ষার জন্য যে সচেষ্ট হইয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতার চিত্র সংযুক্ত করিয়া এই অভিনব সংস্করণটিকে সাধারণের নিকট অধিকতর আদৃত করিয়া তুলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত রজনীকান্তের জীবনীও এ সংস্করণের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। মুদ্রণ-আদিতেও সংস্করণটী সুন্দর হইয়াছে। আমরা সাহিত্যানুরাগী পাঠক-মাত্রকেই এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। কৃতী পুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন সভ্যজাতির একটি লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী যদি জাতীয়তার গৌরব রাখিতে চাহে, তাহা হইলে জাতীয় কৃতীপুরুষদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইজন্য বাঙ্গালার অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক রজনীকান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার অমূল্যগ্রন্থ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করার জন্য আমরা বাঙ্গালী মাত্রকেই আহ্বান করিতেছি।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

নাঙ্গী পন্থীর গান

(পঞ্জাব)

অরূপ গুরু।

ওগো ঝগড়া বড় সহজ নয়,
ও সে সম্‌ঝে যদি সুজন হয়।
পুত্র, পিতা, পুরুষ, নারী,—
একাই সে যে সমুদয়!
বাজীকরের এম্‌নি বাজী
ফাঁস গলে দেয় ক'রে রাজী!
লোভের মোহের কঠিন ডোরে
ফাঁস পড়েছে জগৎময়।
পাখোয়াজে কি বাদ্য বাজে
মানস-রূপা কন্যা নাচে!
দুর্ম্মতি হয় মর্ম্মে উদয়,
তৃষ্ণা করে ত্রিলোক জয়;
সম্‌ঝে যদি সুজন হয়!

মায়া আর মমতা দু'জন
পিচ্‌কারী দে রাঙায় গো মন।
তালিম মানুষ মিলেছে যার
তাকেই মজা মালুম হয়;
সম্‌ঝে যদি সুজন হয়।

আট পহরই ভজন চলে
গুল্‌তানে মন যায় রে গলে;
পলক ভরও হয় নাক' ভুল,
পলকে হয় কল্প ক্ষয়!
সম্‌ঝে যদি সুজন হয়।

ভৈরোঁ সাধু মাতাল হ'য়ে
বস্‌ল চ'ড়ে রূপের মৈ-এ!
মৈখানা শেষ পায়ে ঠেলে
গাইলে অরূপ গুরুর জয়।
সম্‌ঝে যদি সুজন হয়।

আত্ম নিবেদন।

আমি একান্ত তোমারি যে তাহা
হয়না গো যেন ভুল;
ডালে ডালে আর পাতায় পাতায়
তুমি সে রঙীন ফুল।
বান্দা তোমার ফুল দেয় তারে,—
বুকে যে বিঁধায় শূল;
জানে সে,—নিখিলে ফুলে ফুল মিলে
কাঁটায় কাঁটারি হুল।
মক্কা মদিনা সকলি ঢ়ুঁড়িনু
প্রেমিকের দেখা নাই,
শ্যামলী লুকাল ধবলী আসিল
এইবারে ছুটি চাই।
ওরে দিল্! তুই থাকিস্ নে আর
দুনিয়াতে মশ্‌গুল্।
সাঁইয়ের বান্দা শা হুসেন খুঁজে
পেয়েছে তত্ত্বমূল।

কফিন আমার প্রমোদ-কক্ষ
কবর আমার গ্রাম,
কর্দ্দম মম চন্দন লেপ
ধূলি শেষ মোর নাম।
কৌপীন কেহ ধরেছে লুঙ্গি
কেহ মখ্‌মল্ খাসা,
একদিন তবু সবাই রে ভাই
ধূলিতে লইবে বাসা।
কেন যোগী! দেহ ভস্মে মাজিছ?
ও দেহ তো হবে মাটি,
ধূলার গাঁঠরি বাতাসে ফুলিয়া
হ'য়ে আছে পরিপাটি!
কুমার কখনো ধূলারে ছানিছে,
কুমারে ছানিছে ধূল্।
ঝুলনের দোল লেগেছে রে ভাই
উঁচু নীচু সমতুল!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মহাপুরুষের উক্তি

(মহম্মদ)

জীবে যাহার দয়া নাই ভগবান তাহাকে দয়া করিবেন না।

জীব মাত্রেই ভগবানের পরিবার-ভুক্ত; যে ব্যক্তি জীব মাত্রেরই মঙ্গল বিধানের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করে সেই ভগবানের প্রিয়তম সেবক; শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

যে জ্ঞানের বর্ত্তি প্রজ্বালিত করে তাহার মৃত্যু নাই।

জ্ঞান-লিপ্সা মুসলমানের চক্ষে ভগবৎ-প্রেরণা; জ্ঞান-শিক্ষা ভগবানের আদেশ।

যে ব্যক্তি জ্ঞানের পথ অবলম্বন করে স্বয়ং ভগবান তাহাকে স্বর্গের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দ্যান্।

পূর্ণিমার চন্দ্রে ও ক্ষুদ্র নক্ষত্রে যে প্রভেদ জ্ঞানী উপাসক এবং অজ্ঞ উপাসকে প্রভেদ তদপেক্ষাও অধিক।

জ্ঞানীর লেখনী-মুখস্থিত মসীবিন্দু ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শহিদের রক্ত অপেক্ষাও পবিত্র জিনিস।

জ্ঞান শিক্ষার্থে যাহাকে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে হয় সে স্বর্গপথের পথিক।

কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রত্যেক মুসলমানের বিদ্যাচর্চ্চা অবশ্য-কর্ত্তব্যের অন্তর্গত।

সর্ব্বপ্রযত্নে বিদ্যালাভ কর। বিদ্যা ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য স্ফুটতর করিয়া তোলে; স্বর্গের পথ সুগম করিয়া দ্যায়। বিদ্যা নির্জ্জনে সঙ্গী, মরুভূমিতে সহচর। বিদ্যা সুখের মূল, দুঃখের পরম ঔষধ। বিদ্যা বন্ধুসমাজে অলঙ্কার-স্বরূপ; শত্রুর ব্যূহে বর্ম্ম।

যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে সৎ হওয়া সহজ, সম্মানিত হওয়াও সহজ। জ্ঞানী ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও ইহলোকে রাজার সঙ্গলাভ করিয়া থাকে এবং পরলোকে অনন্ত আনন্দের অধিকারী হয়।

উপাসনা বিশ্বাসীর পক্ষে সাযুজ্য-লাভ।

নির্জ্জনে ভগবানকে স্মরণ কর; অনাহারই তোমার শ্রেষ্ঠ আহার, উপাসনাই তোমার শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম।

যে নমাজে হৃদয় নম্র না হয় সে নমাজ ভগবানের গ্রাহ্য নয়।

উপাসনা যাহাকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারে সে মশাল হাতে করিয়া পথ হারায়। এরূপ উপাসনায় কাহারও পুণ্য বৃদ্ধি হয় না, প্রতিদিন কেবল পরমাত্মা ও তাহার পতিত আত্মার মধ্যে ব্যবধানই বৃদ্ধি পায়।

শ্রেষ্ঠ দানের উৎস হৃদয়ে, তাহা রসনায় উৎসারিত হয় এবং ব্যথিতের হৃদয়-ক্ষতে অমৃত বর্ষণ করে।

যে খাটিয়া খায় অথচ ভিখারীকে ফিরায় না তাহার দানই শ্রেষ্ঠ দান।

রোষ প্রকাশ করিবার সুবিধা থাকিলেও যে তাহা দমন করে ভগবান তাহাকে পুরস্কৃত করিবেন।

মানুষকে যে অনায়াসে আছাড় দিয়া ফেলিতে পারে সে বলবান নয়, যে ক্রোধ দমন করিতে পারে সেই ক্ষমতাবান্।

ভগবানকে স্মরণ করিয়া যে রোষের আগুন নীরবে গলাধঃকরণ করিতে পারিয়াছে তাহার মত ভাগ্যবান আর কেহ নাই; সে যে উৎকৃষ্ট সরবৎ পান করিয়াছে তাহা এ জগতে আর কেহই পান করে নাই।

একজন বেশ্যা কুয়ার ধার দিয়া যাইবার সময় একটা তৃষ্ণার্ত্ত কুকুরকে দেখিতে পায়। তৃষ্ণায় উহার জিহ্বা লোলায়মান। স্ত্রীলোকটি নিকটে কোনো পাত্র না পাইয়া নিজের ওড়নায় নিজের একপাটি পায়জার বাঁধিয়া কুয়া হইতে জল তুলিয়া কুকুরটির তৃষ্ণা নিবারণ করে। এই একটি মাত্র অনুষ্ঠানে তাহার অতীত জীবনের সমস্ত কলঙ্ক নিঃশেষে ক্ষালিত হইয়া গিয়াছে।

পরপীড়নের জন্য যে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতে সাহস করে তাহার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই; স্বজাতিকে অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত জানিয়াও যে স্বজাতির পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করে তাহার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নাই; অন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অধর্ম্ম যুদ্ধে যে প্রাণ হারায় মহম্মদ তাহাকে স্বদলভুক্ত বলিয়া গণ্য করিবেন না।

তোমরা আমার অযথা গৌরব বৃদ্ধি করিয়ো না; খ্রীষ্টানেরা যেমন মেরীর পুত্র যীশুকে 'ভগবানের একমাত্র পুত্র'—এমন কি 'স্বয়ং ভগবান' বলিয়া থাকে তেমন বলিয়ো না। আমি ভগবানের ভৃত্য মাত্র, আমাকে তাঁহার ভৃত্য বলিয়ো, ভগবানের দূত বলিয়ো।

তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে যেমন বিশেষ অন্তর নাই, স্বর্গরাজ্যে তেমনি চীরধারিণী দুঃখমলিনা অপোগণ্ড সন্তানের পালয়িত্রী বিধবার সঙ্গে আমার সম্মানের কোনো ইতর-বিশেষ থাকিবে না। সে কেমন বিধবা জান? যে একদিন পরমা সুন্দরী ছিল, শেষে, বিধবা হইয়া নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সৌন্দর্য্য সমস্ত তুচ্ছ করিয়া কেবল সন্তান পালনের পরিশ্রমে আপনার দেহ পাত করিয়াছে।

ঐশ্বর্য্যের বোঝা যাহার স্কন্ধে, দুরারোহ স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠা তাহার পক্ষে দুষ্কর।

ভিক্ষার দরজায় যে মাথা গলাইয়াছে দারিদ্র্যের দরজায় দাঁড়াইতে তাহার বিলম্ব নাই।

যে ব্যভিচারী ধর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করেন; তাই বলিয়া জন্মের মত পরিত্যাগ করেন না। কুপথ ছাড়িয়া সুপথে চলিতে পারিলে, সংযত হইলে, ধর্ম্ম আবার ফিরিয়া আসেন।

ইমানের তিনটি লক্ষণ; প্রথম, যে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে স্বীকার করে তাহাকে কষ্ট না দেওয়া; দ্বিতীয়, একটা মাত্র দুর্ব্বলতার জন্য কাহাকেও অধার্ম্মিক না বলা; তৃতীয়, কেবল একটা মাত্র দুষ্কার্য্যের জন্য কাহাকেও সমাজ-বহিষ্কৃত না করা।

যে ব্যভিচার করে, যে মদ্যপান করে, যে পরস্বাপহারী, যে দস্যু এবং যে বিশ্বাসঘাতক সে কখনো মুমিন্ (বিশ্বাসী) নামের যোগ্য হইতে পারে না। সাবধান, সাবধান।

যে ব্রহ্মপরায়ণ এবং পরলোকে বিশ্বাসী, সে, হয় ভাল কথার আলোচনা করুক; না হয় তো চুপ্ করিয়া থাক্।

আত্মজয়ের জন্য যে যুদ্ধোদ্যম সেই জগতে শ্রেষ্ঠ জেহাদ্।

সংবৎসরব্যাপী নামকীর্ত্তন অপেক্ষা প্রহর-ব্যাপী ধ্যান ধারণাই শ্রেয়স্কর।

জীবের প্রতি যে সদয়, ভগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন। মানুষ ভালই হোক আর মন্দই হোক সদয় ব্যবহার করিতে কার্পণ্য করিয়ো না। অসতের প্রতি সদ্ব্যবহারই মানুষকে মঙ্গলের পক্ষে চালাইবার একমাত্র উপায়। ইহার বাড়া শিক্ষা নাই।

অনাথ শিশু যে বাড়ীতে আশ্রয় পায় সেই ভাল মুসলমানের বাড়ী। আর যেখানে অনাথের অনাদর, সেই বাড়ী মুসলমানের বাড়ী হইলেও অবিশ্বাসী বিধর্ম্মীর বাসেরও অযোগ্য।

শিষ্টাচার ভদ্রলোকের শ্রেষ্ঠতম পৈতৃক সম্পত্তি। যে পিতা পুত্রকে শিষ্টাচার শিখাইয়াছেন তিনি উহাকে শ্রেষ্ঠ বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন।

সিংহদ্বার দিয়া যে স্বর্গে প্রবেশ করিতে চায় সে আপনার পিতা মাতার তুষ্টিসাধন করুক।

পিতা কিম্বা মাতা যদি সন্তানের অহিত সাধনও করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করা সন্তানের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

পিতার তুষ্টিতে ভগবান সন্তুষ্ট। পিতার অসন্তোষে ভগবানের রোষবহ্নি ইন্ধনসংযুক্ত হইয়া ওঠে।*

মানুষ মরিলে তাহার দোষের উল্লেখ করিতে নাই।

আমি পরম জ্যোতির দর্শন পাইয়াছি, জ্যোতিতে আমার বসতি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

* হজরত মহম্মদের এইসকল সুস্পষ্ট উক্তিসত্ত্বেও পিতৃদ্রোহী ঔরঙ্গজেবকে ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা কি করিয়া পরম ধার্ম্মিক বলেন?

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্য্যা কি "বস্তুতন্ত্রতাহীন ?"

মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বঙ্গদর্শনে গত বৎসরের চৈত্র সংখ্যায় কবিবর রবীন্দ্রনাথের চরিত্রচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার আলেখ্যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টি, সমাজ সংস্কারের প্রয়াস ও ধর্ম্মসাধনা হাওয়ায় দালানবাড়ী হইয়া ফুটিয়াছে—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টিই যে বস্তুতন্ত্রতাহীন ইহাই তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই চিত্র যদি সাহিত্য-সমালোচনার বিশুদ্ধ রীত্যনুসারে লিখিত হইত, তবে তাহা বিচারবিতর্কের বিষয় হইত সন্দেহ নাই। সাহিত্যের ভালমন্দ সাহিত্যের দিক্ দিয়াই আলোচ্য, সাহিত্যরচয়িতার জীবনের ভালমন্দের সহিত তাহার একান্ত সম্বন্ধ নাই। অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের কোন যোগই নাই, যোগ খুবই আছে—কারণ উভয়েই পরস্পরাপেক্ষী। সাহিত্য জীবনের ভিতর হইতে আপনার সৃষ্টির উপযোগী বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করে, কিন্তু জীবন আপনাকে সাধারণত যেমন ভাবে প্রকাশ করে, সাহিত্যের প্রকাশ তাহার অনুরূপ হয় না। সাহিত্যে জীবনচিত্রণে সুখে হউক দুঃখে হউক পরিণামে একটি বৃহৎ শান্তির আদর্শ থাকা চাই। মানুষের মন নদীর মত—দীর্ঘপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া আপনাকে বিচিত্রতার মধ্য দিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইতে তাহার আপত্তি নাই কিন্তু শেষকালটায় একটা সুখসরোবর কিম্বা দুঃখের সমুদ্রের মধ্যে তাহার একটা বড় পরিণামের মধ্যে মেশা চাই—কিন্তু মানবজীবনে সংসারের ক্ষেত্রে মানুষের মনের এই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিটি কি সকল সময় দেখা যায়? না। সেই জন্যই তো জীবন এবং সাহিত্য এক জিনিস নয়—জীবনের বাস্তবিকতা সাহিত্যে নাই এবং সাহিত্যের ভাবসম্পূর্ণতা জীবনে নাই—অথচ সেই জন্যই আবার পরস্পরকে পরস্পরের এতই প্রয়োজন। এই কারণে ম্যাথু আরনল্ড কবিতাকে জীবনের সমালোচনা বলিয়াছিলেন—জীবনকে সে এক বিশেষ ভাবদৃষ্টির দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেখা, যাহা জীবনের নিজস্ব জিনিস নয়।

বাস্তবজীবন এবং ভাবময় সাহিত্য এই উভয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকিলে কোন কবির জীবনের ভালমন্দ আলোচনা করিয়া তাঁহার কাব্যকে সেই কারণেই ভাল বা মন্দ স্থির করিবার প্রবৃত্তি হয় না। শেক্স্পীয়রের চরিত্র উত্তম বা মাঝারি বা নিকৃষ্ট ছিল কি না, তাঁহার সম্বন্ধে যে চৌর্য্যের অপবাদ আছে তাহা সত্য কি না তাহা জীবনচরিত আলোচনাহিসাবে কৌতূহলোদ্দীপক হইতে পারে, কিন্তু শেক্সপীয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে তাঁহার যে মহান্ চিত্তশক্তি, মানবের বিচিত্র সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে তাঁহার যে অসামান্য অদ্ভুত প্রবেশের পরিচয় প্রদান করে—জীবনের এইসকল তুচ্ছঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় সে পরিচয়কে বাড়ায়ও না কমায়ও না। শেক্সপীয়র ঘোড়ার সহিস ছিলেন, কি কোন্ দিন কার বাগানে শেয়াল চুরি করিতে গিয়াছিলেন, তিনি ব্যভিচার দোষে দুষ্ট ছিলেন কি না, ইহা তো সেই বৃহৎ বিপুল তাঁহার মানস-জীবনের পরিস্ফুটনে কোন সাহায্য করে না। যেখানে তাঁহার নাট্যে, তিনি উদ্দাম মানব-প্রবৃত্তির ঝড় তুলিয়াছেন, হেগেল যাহাকে আন্তর দ্বন্দ্ব 'geist'-এর দ্বন্দ্ব বলিয়াছেন,—মানুষের আপনারি ভিতরের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, এক স্বার্থের সঙ্গে অন্য স্বার্থের, উচ্চ প্রকৃতির সঙ্গে নিম্নপ্রকৃতির যে অবশ্যম্ভাবী অহেতুক বিরোধ রহিয়াছে—যেখানে শেক্সপীয়র আশ্চর্য্য ঘটনার সমাবেশে সেই বিরোধের প্রবলতাকে দেখাইয়াছেন—সেখানে ঐসকল তুচ্ছ ঘটনার সহিত তাহার সম্বন্ধ কোথায়? তবে কেমন করিয়া শেক্সপীয়র মানবচরিত্রের এত অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন, শেক্সপীয়রের জীবনচরিত হইতে যদি তাহা দেখাইতে পারা যাইত তবে তাহা যথার্থ জীবন হইত। কারণ তিনি যে কবি, তাঁহার জীবনই যে ভাব-জীবন—তাঁহার অন্য জীবন যেখানে আছে, সেখানে অনেক আত্মবিরোধ, অনেক দুর্ব্বলতা ও গ্লানি হয়ত লুক্কায়িত হইয়া আছে—না হয় তাহারা সত্যই হইল, তথাপি সে সত্য তো কবিজীবনের সত্য নয়। এমন কোন কবির নাম করাই শক্ত—বোধ হয় দুতিন-

জন ছাড়া—যাঁহাদের জীবন এবং কবিতা সম্পূর্ণরূপে এবং সর্ব্বতোভাবে মেলে। কিন্তু সে জন্য তো জগৎ তাঁহাদের কবিত্বের শ্রেষ্ঠতাকে অস্বীকার করে নাই। শেলি এপিসিকিডিয়ন্ লিখিয়াছেন, কিন্তু এমিলিয়া ভিভ্যানি কি সেই প্রেমের অলকাপুরী, সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সত্যই? কখনই নয়। শেলি নিজেই কি বলেন নাই—

"In many mortal forms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought"

অর্থাৎ অনেক মানবরূপের মধ্যে আমি ব্যাকুল ভাবে আমারি চিন্তার মানসী প্রতিমার ছায়াকে অন্বেষণ করিয়াছি।

কিন্তু শেলির জীবনে বরাবর কি সেই আদর্শপ্রতিমার সঙ্গে মানবপ্রতিমার অমিল হয় নাই? আর তখন শেলির অস্থিরচিত্ততা,—অনেক সময়ে নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা কি সর্ব্বাংশেই প্রশংসার্হ? ওয়াল্ট হুইটম্যান্ যৌবনে উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া চিরকাল অবিবাহিত থাকা সত্ত্বেও ছয়টি সন্তানের জনক হইয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি যখন মানব দেহকে আত্মার মন্দির বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের শরীরকে "আত্মার প্রবেশদ্বার" বলিয়াছেন, শরীরকে আত্মাকে এক করিয়া অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, তখন এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবনচরিতের অংশবিশেষের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সেইসকল ভাবুকতায় কি অবিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে? জীবন যেমনি হউক্, সাহিত্যের ভাবপ্রকাশ যদি পূর্ণ হয়, তবেই তাহা মানবের চিরন্তন কালের আদরের জিনিস হইয়া থাকিবে। সাহিত্য ও জীবন এক জিনিস নয়।

আর তা ছাড়া, বাহিরের ঘটনার দিক্ দিয়া কোন মানুষকেই বিচার করাটাই অন্যায়, কবিকে বিচার করা আরও অন্যায়,—কারণ তাঁহার জীবনটাই ভাবময় জীবন। অনেক সময় এই বাহিরের জীবনের সঙ্গে আর ভাবময় আন্তর জীবনের বিরোধই কবির কবিত্বকে আবার উৎসারিত করিয়া দেয়, কারণ দ্বন্দ্ব ভিন্ন সৃষ্টিই সম্ভবে না। এই জন্য শেলি এক জায়গায় লিখিয়াছেন :—

Most wretched men are cradled into poetry by wrong
They learn in suffering what they teach in song.

অর্থাৎ অনেক হতভাগ্য লোক অন্যায়ের তাড়নাতেই ছন্দের দোলা আশ্রয় করে—তাহারা দুঃখের মধ্যে যাহা শিখে, সঙ্গীতে তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে।

কিন্তু কবির জীবনের রহস্য যেমনই হউক, ইহা সত্য যে তাঁহার জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্য তাঁহার সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা ঘটিবার কোন কারণ নাই। সেই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে বিপিন বাবু ঠিক্ সাহিত্যের দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখেন নাই, তিনি তাঁহার জীবনকে ও সাহিত্যকে মিলাইয়া পড়িতে গিয়াছেন এবং জীবনের এমন সকল ভাগ এমন সকল ঘটনার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গিয়াছেন, যাহার সঙ্গে সাহিত্যের কোন যোগই নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে বস্তুতন্ত্রতাহীন বলিতে চাহেন, অথচ তাঁহার প্রমাণ এই যে রবীন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান। তিনি জমিদার, অতএব বাংলা পল্লীজীবনের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার ভিতর প্রবেশলাভের সাধ্য তাঁহার হয় নাই। তিনি অধ্যাত্ম সত্যের অন্বেষী, কিন্তু তিনি গুরুকরণ করেন নাই বলিয়া অধ্যাত্ম সত্য তাঁহার অনায়ত্ত থাকিয়া যাইতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব ধনীর গৃহে লালিত-বর্দ্ধিত হইয়াছেন এবং তিনি আপন জমিদারীতে "আত্মবিস্মৃত" ভাবে তাঁহার প্রজাদের সঙ্গে মিশামিশি করিতে পারিয়াছেন কি না, এসকল ঘটনার সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যের বাস্তবচিত্র-অঙ্কনের কি যোগ আছে তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথ যদি অসাধারণ চরিত্র বা মহাপুরুষত্বের দাবী করিতেন, তবেই এসকল প্রশ্নের সার্থকতা ছিল। কারণ সেরূপ দাবীর ক্ষেত্রে, জীবনকেই বড় করিয়া দেখিতে হয়, তাহার লেশমাত্র অভাব-অসম্পূর্ণতা সেই দাবীকেই খর্ব্ব করিয়া আনে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাহিত্যের দাবী স্বতন্ত্র। শেক্সপীয়রের গভীর নৈতিকদৃষ্টি, মিল্টনের আশ্চর্য্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, শেলির মানবপ্রেম ও মানবের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস—এসমস্তের জীবনহিসাবে মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু কাব্যহিসাবে কোন মূল্য নাই। কাব্যে যখন এইসকল গুণই কল্পনার সম্পদে ভূষিত হইয়া রসরূপ ধারণ করিয়া দেখা দেয়—কবির ভাবের সঙ্গে কবিতার প্রকাশের মাখামাখি যোগ হইয়া যায়, কোথাও বিচ্ছেদ আর থাকে না, তখনই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। জীবনের শ্রেষ্ঠতার উপর এই জন্য কাব্যের শ্রেষ্ঠতার কিছু মাত্র

নির্ভর নাই। মিল্টন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া কবি নাও হইতে পারিতেন এবং কবি হইয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নাও হইতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার কবিত্বের কি হ্রাসবৃদ্ধি হইত তাহা তো দেখি না। অবশ্য কবিতার সঙ্গে সঙ্গে মিল্টন ওয়ার্ডস্বার্থের মত যদি জীবনেরও মহত্ত্ব ফোটে, সে তো সোনায় সোহাগা—কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কবিত্বের বিচারকালে জীবনের ঘটনার দিক্ হইতে বিচার করা অন্যায়। কবিত্বকে রসের আদর্শের দিক্ হইতে, তাহার আপনার দিক্ হইতেই বিচার করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ ধনিসন্তান বলিয়াই যে কবি হইয়াছেন তাহা যেমন কোন মূঢ়ও বলিবে না, তেমনি কবি হইয়াছেন বলিয়া ধনের কোন বন্ধন তাঁহাকে জড়াইয়া থাকিবেনা এমনি কি মানে আছে? লর্ড টেনিসনের আভিজাত্য ছিল না? তিনি আইল অব্ ওয়াইটের "প্রাসাদকক্ষে বসিয়া কর্দ্দমমর্দ্দিত পিচ্ছল পল্লীপথ প্রত্যক্ষ করিয়া" তাঁহার Idylls, গ্রাম্যগাথাগুলি লেখেন নাই? কিন্তু সেই কারণেই কি কেহ তাঁহার চিত্রবাজিকে বস্তুতন্ত্রতাবিহীন বলিয়াছে? ব্রাউনিংকে তো কোনদিন উদরান্নের জন্য চেষ্টা করিতে হয় নাই, তিনি তো দিব্য ফ্লোরেন্সের "ক্যাসাগিডি"র সুরম্য হর্ম্ম্যে জীবন কাটাইয়াছিলেন, চিত্রকলার লীলাক্ষেত্র ইতালীর প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিনের পর দিন যাপন করিয়াছিলেন, ক্যাসাগিডির দালান হইতে রাজপথে লোক চলাচল দেখিয়াছেন এবং Pippa Passes লিখিয়াছেন। তথাপি কোন বিজ্ঞ সমালোচক কি সেই জন্য ব্রাউনিংয়ের চিত্রকে মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে? বরং অনেক স্থূলদৃষ্টি সমালোচক তো সেই মহাকবিকে এ দোষও দিয়া থাকে যে বাস্তব জীবনের "ভালটুকুই তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে, মন্দটুকু পড়ে নাই"—তিনি সাধারণ দুঃখদারিদ্র্যময় জীবনের "মধুটুকুই আস্বাদন করিয়াছেন, তার তীক্ষ্ণ হুলটা গায়ে বিঁধে নাই"। তিনি বলিয়াছেন—"All's right with the world!" কিন্তু মন্দের অন্তরতর স্থানে ভাল'র মহিমাকে তিনি অমন নিঃসংশয়ে দেখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তো তিনি কবিসমাজে রাজমুকুট প্রাপ্ত হইয়াছেন। অবশ্য বিপিন বাবু তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিবেন তাহা জানি না।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার এ যেমন তাঁহার এক অপরাধ, যাহার জন্য তিনি বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিতে পারেন নাই শোনা গেল, তেমনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি গুরুকরণ করেন নাই, ইহাও তাঁহার আর এক অপরাধ। তাঁহার "ঐকান্তিকী অন্তর্ম্মুখীনতা" আছে বটে, কিন্তু তিনি অধ্যাত্মসত্যোপলব্ধির জন্য কেবল স্বানুভূতির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন, শাস্ত্র এবং গুরুর বহিঃপ্রামাণ্যের অপেক্ষা রাখেন না বলিয়া রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসাধনাকেও বিপিন বাবু বস্তুতন্ত্রবিহীন বলিয়াছেন।

আমি এই দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এসকল কথা নিতান্তই অবান্তর হইয়াছে। কেন হইয়াছে তাহা পরে বলিতেছি।

সত্য যে বাহির এবং ভিতর এই দুইকে লইয়া, সুতরাং একদিকে যেমন স্বানুভূতি অবলম্বনে অধ্যাত্ম সত্যসকলকে আপনার ভিতর হইতে উপলব্ধি করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি শাস্ত্র ও ইতিহাসের প্রামাণ্য সংগ্রহ করিয়া সেই স্বানুভূতিকে তাহার উপর প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে, এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ এবং আধুনিক যুগের ধর্ম্মসংস্কারক রামমোহন রায় এবং আংশিকভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহাই করিয়াছেন স্বীকার করি। তবে গুরুগ্রহণ করাও যে শাস্ত্র-ইতিহাস আলোচনার ন্যায় তুল্য আবশ্যক, ইহা আমি মানিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। কারণ ব্যক্তিগত অনুভূতিকেই যদি ভয় কর, তবে গুরুর অনুভূতিই বা সে ভয়কে দূর করিবার পক্ষে কি সাহায্য করে? গুরু কি অভ্রান্ত? তিনিও তো একজন ব্যক্তিবিশেষ? না হয়, তিনি তোমা অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং তোমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিতে পারেন—তথাপি তাঁহার হাতে আত্মসমর্পণ করিলেই কি একেবারে নিঃসংশয় নিশ্চিন্ত হওয়া যায়?

শাস্ত্র বলিতে কোনো-একজন ব্যক্তির রচনা বুঝায়না—তাহা অনেক ঋষির অনেক কালের সাধনালব্ধ ঈশ্বরানুপ্রাণিত পরীক্ষিত প্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্ম সত্যের সমষ্টি—তাহা এমন একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার যেথান হইতে সকল

সাধককেই রসাকর্ষণ করিয়া আপনার পুষ্টি সংগ্রহ করিতে হইবে। এক এক দেশের এক এক সভ্যতার শাস্ত্র মানে সে দেশের race culture, যাহাকে না বুঝিয়া এবং না জানিয়া কোন ধর্ম্মসংস্কারক শুদ্ধমাত্র ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর ও কল্পনার উপর কোন ধর্ম্মমত স্থাপন করিতে পারেন না, ইহা সত্য। কারণ ইতিহাসকে অস্বীকার করা, যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই জাতির সকল বিশিষ্টতাকে অস্বীকার করাও যা, আর যে-গাছে বসিয়াছি সেই গাছের মূলে কুঠারাঘাত করাও তাই। বিজ্ঞানেও কোন নূতন সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে ঐ বিষয়ে কি কি সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে, ও কি পন্থায় হইয়াছে তাহা সম্যক্ জানা চাই—বিধিব্যবস্থা প্রণয়নেও একান্ত নূতনত্বের স্থান নাই—ধর্ম্মেও নাই। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে এসকল আলোচনা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ইহাঁদের সম্বন্ধে বেশ খাটে, কারণ ইহারা সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়াছেন, ইহারা ধর্ম্মসংস্কারকের দলে পড়েন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো তাহা নহেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানীও নহেন, ধর্ম্মসংস্কারকও নহেন—তিনি আপনার কবিত্বের ভিতর হইতে যেটুকু অধ্যাত্ম প্রেরণা লাভ করেন তাহা কবির ভাষাতে কবির মতনই প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাকে কি থিয়লজির মত করিয়া কেহ পাঠ করে না আলোচনা করিয়া দেখিবার কল্পনা করে? তিনি যদি ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতেন বা নববিধান প্রচার করিতেন বা অন্য কোন ধর্ম্মমত বা তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি করিতে যাইতেন, তবে যত ইচ্ছা তর্ক বিতর্ক করিয়া তাঁহার স্বানুভূতিকে তাঁহার ঐকান্তিকী অন্তর্ম্মুখীনতাকে, তাঁহার শাস্ত্রপ্রামাণ্যের উপর ভর না করিবার অপরাধকে (কিন্তু গুরুকরণ না করিবার অপরাধকে নয়) ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলা যাইতে পারিত। অবশ্য ইহাও জানি যে স্বানুভূতি যদি সত্য হয়, যদি তাহা উচ্ছৃঙ্খল আত্মপ্রতিষ্ঠার ছল মাত্র না হয়, তবে সে আপনিই আপনার শাস্ত্র হইয়া বসে, আপনিই আপনার প্রমাণ হয়—তাহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির গভীরতাকে বাহিরের কোন মানদণ্ডই তখন নাগাল পাইয়া উঠে না। খৃষ্ট বুদ্ধ মোহম্মদ প্রভৃতি বড় বড় মহাপুরুষগণ তার সাক্ষী। তাঁহারা যে তাঁহাদের রেস্-কালচারকে অর্থাৎ নিজ নিজ জাতির অধ্যাত্মজ্ঞানকে আত্মসাৎ করিয়া লন্ নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার জন্য তাঁহাদিগকে ছাপার অক্ষরে লেখা বা মানুষের কাছে শোনা শাস্ত্র পাঠ করিতে হয় নাই। তাঁহারা যে শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন—সে এই প্রত্যক্ষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাশাস্ত্র, যাহা অপেক্ষা আর বড় শাস্ত্র কোথাও নাই। ততখানি টাট্‌কাটাট্‌কি ভাবে সত্যলাভ যাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে না, তাঁহাদিগকেই ব্যক্তিগত মতামতের উচ্ছৃঙ্খল অনিয়ন্ত্রতা হইতে বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে নানা শাস্ত্র নানা ইতিহাসের মধ্য দিয়া তিলে তিলে সত্যকে যাচাই করিয়া লইতে হয়—এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরাই তত্ত্বজ্ঞানী, মহাপুরুষ নহেন।

যাহাই হউক্ ধর্ম্মের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বিপিন বাবুর মতামতের আলোচনা হইতেই এতটা কথা আসিয়া পড়িল। আমি বলিলাম যে কোন একজন কবির কবিতা বা রচনা হইতে যে অধ্যাত্ম সত্যের আভাস পাওয়া যায় তাহাকে এইসকল তত্ত্বজ্ঞানের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া, ইহাদিগকে যে ভাবে বিচার করিতে হয়—সেই ভাবেই বিচার করিতে যাওয়া একেবারেই নিরর্থক। এখানেও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সাহিত্যকে সাহিত্যের দিক্ হইতে না দেখিয়া অন্যদিক্ হইতে দেখিবার চেষ্টা করার জন্য লেখক কতগুলি ব্যর্থ কথার জাল সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। ওয়ার্ডস্বার্থ, ব্রাউনিং, হুইট্‌ম্যান প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের মধ্যেও অধ্যাত্ম সত্যের অনেক আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা খৃষ্টান্ ধর্ম্মতত্ত্ব উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না, হিব্রুতে গ্রীকে বাইবেলের পাঠান্তরসকল তুলনামূলক প্রণালীতে যাচাই করিয়া কোন্‌গুলি গ্রহণীয় কোন্‌গুলি বর্জ্জনীয় তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন কি না, কিম্বা কোন পুরোহিতের শরণাপন্ন হইয়া ব্যক্তিগত ভুলভ্রান্তির পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, কৈ এ পর্য্যন্ত তো সে দেশের কোন বড় সমালোচককে এ জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

অথচ লেখক যে তত্ত্বের সঙ্গে সাহিত্যের বিভেদ অস্বীকার করেন এবং উভয়কে যে একই প্রণালীতে বিচার

করিতে হইবে এমন কথা বলেন তাহা তো বোধ হয় না। কারণ আরম্ভে তিনি লিখিতেছেন :—

"প্রকৃত কবি তর্ক করেন না, যুক্তি করেন না, বিচার করেন না, আলোচনা করেন না, কেবল আপনার অন্তশ্চক্ষুতে সত্য ও সৌন্দর্য্য দেখেন আর এইরূপে যাহা দেখেন, তাহাই ভাষার তুলিকায় আঁকিয়া লোকসমক্ষে ধারণ করেন। এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিই কবির প্রাণ। এইজন্য ঋষিদিগের ন্যায় কবিও দ্রষ্টা কিন্তু দার্শনিক নহেন, জ্ঞাতা কিন্তু বৈজ্ঞানিক নহেন। দার্শনিক সম্যক্ বিচারের উপরে আপনার সিদ্ধান্তকে স্থাপন করেন। কবি শুদ্ধ আত্মানুভূতির উপরে সত্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিচারের জন্য চারিদিক্ দেখা আবশ্যক। শুদ্ধ অনুভূতির জন্য এরূপ সম্যক্ দর্শন নিষ্প্রয়োজন। * * * বৈজ্ঞানিক যেরূপ বস্তুতন্ত্রতা চাহেন, কবির সেরূপ বাহ্যবস্তুতন্ত্রতার একান্তই প্রয়োজনাভাব। বৈজ্ঞানিক বহির্ম্মুখীন ও বিষয়াভিমুখীন্। কবি অন্তর্ম্মুখীন ও আত্মাভিমুখীন্। বৈজ্ঞানিক বাহিরের প্রামাণ্য না পাইলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কবি ভিতরের ভাবের, রসের, আত্মানুভূতির প্রামাণ্যকেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট মনে করিয়া বাহিরের প্রামাণ্যের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন।"

অথচ তাহারি কিছু পরে লেখক লিখিতেছেন :—

"রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টিই মায়িক। উর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতে অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তুসকল বাহির করিয়া, আপনার অদ্ভুত কাব্যসকল রচনা করিয়াছেন। তাঁর কাব্য যেমন কচ্চিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন, দুচারখানি বৃহদাকার উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর চিত্রিত চরিত্রের প্রতিরূপ বাস্তবজীবনে কচ্চিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।"

আমি নিরপেক্ষ পাঠকবর্গকেই জিজ্ঞাসা করি এই পাশাপাশি উদ্ধৃত লেখাগুলি কি পরস্পরবিরুদ্ধ নয়? "কবি শুদ্ধ আত্মানুভূতির উপর সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন" এবং লেখক বলিতেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাহাই করিয়াছেন। তবে কেন সেই কারণেই তিনি তাঁহার অধিকাংশ রচনাকে বস্তুতন্ত্রতাবিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন? কবির সঙ্গে দার্শনিকের বৈজ্ঞানিকের কোথায় কতটুকু প্রভেদ তাহা নিজেই একরূপ স্থির করিয়া তারপর নিজেরই সিদ্ধান্তকে প্রয়োগের বেলায় লেখক কি বেমালুম অস্বীকার করিতেছেন না? বস্তুবিচ্ছিন্ন (abstract) ভাবে লেখক কবির যথার্থ স্বরূপ ঠিক্ দেখিতে পান্—কিন্তু বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ (concrete) কবির বেলাতেই তাঁহার স্বরূপ ভুল হইয়া যায়—ভাবে ও বাস্তবে এতটা গোলযোগ বস্তুতন্ত্রপোষক লেখকের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমি কোনমতেই মনে করিব না।

কিন্তু আমি হয়ত লেখকের ঠিক বক্তব্য কথাটি বুঝিতে পারি নাই। তিনি সাধারণ ভাবে কবির যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে হয়ত রবীন্দ্রনাথের স্বরূপের কোন বিভিন্নতা নাই। অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মানুভূতির দ্বারা যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নহে তাহাকেই প্রত্যক্ষ করিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপরসের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া এক আশ্চর্য্য কল্পলোক ও মায়াপুরী নির্ম্মাণ করা,—ইহাই তো সাধারণত কবির স্বরূপ এবং খুব সম্ভব এ স্বরূপের বিদ্যমানতা রবীন্দ্রনাথেও আছে ইহা লেখক অস্বীকার করেন না। তাঁহার মতে এ শ্রেণীর কাব্য মায়িকই, কারণ—তাহা

"কানে মধু ঢালে, প্রাণে গিয়া সাড়া দেয়, বুদ্ধিকে জাগাইয়া তোলে কিন্তু পাঠককে কচ্চিৎ কোন স্থির সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়।" "যেখানে কবি শুধু কবি নহেন, কিন্তু সাধকও, সাধনা বলে কবি যেখানে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই নিগূঢ় তত্ত্বের উপরেই আপনার কবিকল্পনাকে গড়িয়া তোলেন, সেখানে তাঁর প্রতিভা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া যায়, সেখানে কবি ঋষিত্ব লাভ করেন।"

সুতরাং মনে হইতেছে যে হয় তো বা রবীন্দ্রনাথকে বিপিন বাবু শুধু কবিত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে চাহিতেছেন না, তাঁহার মধ্যে ঋষিত্ব আছে কিনা অর্থাৎ তিনি কল্পনার লীলাখেলা লইয়াই আছেন, না কোন সুদৃঢ় সত্যকে কোন জীবনের তত্ত্বকে জীবনের ভিতর হইতে লাভ করিয়াছেন এবং সমস্ত কবিতার মর্ম্মস্থলে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, ইহাই তিনি হয়ত অনুসন্ধান করিতেছেন।

আমি বলিয়া আসিলাম যে সাহিত্যকে যেমন জীবনের ভালমন্দের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখা অন্যায়, তেমনি তাহার ভিতরে কোন জীবনের তত্ত্ব পাওয়া যায় কি না এবং না পাইলেই যে সাহিত্য মাটী হইয়া গেল এমন মনে করিবারও কোনই হেতু নাই। সাহিত্যে ভাব এবং প্রকাশ এমন অব্যবহিত ভাবে এক হইয়া মিলিয়া থাকে যে দর্শনে যেমন আমরা ভাবকে স্বতন্ত্র করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি, সাহিত্যে তাহা পারিই না—কারণ প্রকাশ ভিন্ন সেখানে ভাবের কোন সত্যই নাই। তত্ত্বকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে যাওয়াই সাহিত্যের পক্ষে প্রাণনাশক ব্যাপার। অবশ্য আমি এ কথা খুবই মানি যে বড় কবি মাত্রেরই জীবনের ভিতরকার একটি তত্ত্ব থাকে, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Philosophy of life এবং সে তত্ত্বটি কি,

তাহা একবার ধরিতে পারিলে কবির সমস্ত কাব্য তাহার সমস্ত বিচিত্রতা লইয়া একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যের মধ্যে ধরা দেয়। তাহার অভাবে কবির নানা বয়সের নানা ভাবের ও রসের বিচিত্র রচনার মধ্যে অনেক সময় ঐক্য পাওয়া যায় না। তথাপি ইহা মনে করা ভুল যে এই জীবনের তত্ত্বকে কবি কোথাও সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া যান্। তাহা কেমন করিয়া তিনি যাইবেন, —তিনি তো তত্ত্বকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারেনই না, তাহা যে জীবনের জিনিস এবং জীবনের সঙ্গে একেবারে মেশানো।* যেমন, জীবন জিনিসটাকেই কি আমরা শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি? সুতরাং কবির সকল সময়ের সকল কাব্যে একই তত্ত্বের নানা আভাস ইঙ্গিত নিশ্চয়ই আমরা পাইব এবং তাঁহার সমস্ত রচনাকে সেই তত্ত্বের দ্বারা ওতপ্রোত করিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে যেমন আমরা শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ভাগবিভাগকে এক অখণ্ড শরীর করিয়া দেখি।

ব্রাউনিং বল, গ্যয়টে বল, ওয়ার্ডস্বার্থ বল, সকলেরি মধ্যে এই একটি জীবনের তত্ত্ব অন্তর্নিহিত ভাবে তাঁহাদের সকল বয়সের সকল রচনার তলে তলে জাগিয়া রহিয়াছে। এখানে সে আলোচনার স্থান নহে এবং প্রয়োজনাভাব। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এইরূপ একটি জীবনের তত্ত্ব আছে, আর সেই জন্যই তাঁহার কবিতাকে কেবল ক্ষণিক আত্মগত অনুভূতির প্রকাশমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। যিনি তাঁহার সমস্ত কবিতা আগাগোড়া পাঠ করিয়াছেন, এবং তাঁহার জীবনের সকল বাহিরের আপাতঃ-বিরোধ সত্ত্বেও প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে প্রত্যেক অবস্থার ভাবের দিক্ হইতে একটি গভীরতর যোগ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই এ কথার সাক্ষ্য দিবেন। আমি আমার "রবীন্দ্রনাথ" (গত বৎসরের প্রবাসী—আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রবন্ধে সেই জীবনের তত্ত্বটি কবির সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া অনুসরণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি—এখানে আবার সেই কাজে প্রবৃত্ত হইলে ততবড়ই একটি প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইবে। আমি বলিয়াছি তাঁহার কাব্যের ভিতরকার কথাটি হইতেছে, সর্ব্বানুভূতি বা বিশ্ববোধ—অর্থাৎ তিনি খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে, রূপের মধ্যে অপরূপকে, সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করিবার একটি আশ্চর্য্য স্বাভাবিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি খণ্ডতা অর্থাৎ যাহাকে আমরা বলি বাস্তব তাহাকে খুবই মানেন এবং তাহার সমস্ত স্বাদ ও সমস্ত অভিজ্ঞতা না লাভ করিয়া ক্ষান্ত হন্ না। কিন্তু তিনি সেই খানেই দাঁড়ি টানেন না—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার দৃষ্টি যেখানে তাহার সত্যতা, তাহার অখণ্ডতা, সেইখানে গিয়া পৌছায়। সৌন্দর্য্য বল, প্রেম বল, স্বাদেশিকতা বল, তাঁহার অনুভূতি সর্ব্বত্রই অতি প্রবল; কিন্তু সেই প্রবলতাই তাঁহার সত্য নয়। সত্য—যখন সেইসকল খণ্ড আবেগকে তিনি অখণ্ড বিশ্বানুভূতির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া সত্য করিয়া দেখিতে পান্ তখনই। তাঁহার যৌবনের সৌন্দর্য্যবিলাস ছবি ও গানে, কড়ি ও কোমলে, চিত্রাঙ্গদায় কি আবেগতীব্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ফুটিয়াছে, কিন্তু সেই দীপ্তজ্বালাময় প্রকাশের মধ্যেই যে তাঁহার সত্য তা নয়। সত্য—যখন তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত করিয়া বড় করিয়া দেখিতেছেন, যখন বলিতেছেন—

> "যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস
> যারে ভালবাস তারে করিছ বিনাশ।"

যখন বলিতেছেন—

> "সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
> মনোহর মায়াকায়া ধরি, তার পরে
> সত্য দেখা দেয়, ভূষণবিহীন রূপে
> আলো করি অন্তর বাহির।"

তেম্নি তাঁর প্রেমের কবিতায়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেম কেবল ব্যক্তিগত ভোগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে—সমস্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত কল্যাণে নানা বিচিত্রভাবে আপনাকে সার্থক করিতেছে না,—ততক্ষণ পর্য্যন্ত কি তীব্র বেদনা! কারণ "আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের!" কারণ "আঁখি যে অপরাধী"—

* এখানে পাছে কেহ ভুল বুঝেন এই জন্য বলিয়া রাখি যে কবিত্বের আলোচনায় আমরা জীবন বলিতে কি বুঝি তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জীবন মানে এখানে বাহিরের বাস্তব জীবন নয়, কিন্তু নিগূঢ় ভাবজীবন। সাহিত্যকে যে আমরা বাহিরের বাস্তব জীবনের প্রতিবিম্ব মনে করিনা তাহা প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছি।

"এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই ফুটেছে মর্ম্মতলে
নির্ব্বাণহীন অঙ্গার সম নিশিদিন শুধু জ্বলে।"

একবার সেই আঁখির জগৎ সেই বাসনার জগৎ বিলুপ্ত হইলে, তারপর যে নূতন জগত জাগিবে—

"সে নব জগতে কালস্রোত নাই, পরিবর্ত্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হ'য়ে চিরদিন রবে চাহি।"

"মানসী" পর্য্যন্ত এই যে তত্ত্বের আভাস, যে, সমস্ত খণ্ড অনুভূতিকে একটি অখণ্ড বিশ্বানুভূতির মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পর্য্যবসিত না করা পর্য্যন্ত ইহাদের আপনাদের কোন পরিতৃপ্তি নাই, কোন সত্যতা নাই—সেই তত্ত্বই "সোনার তরী" "চিত্রা" ও "চৈতালী"তে পরিস্ফুট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। দেউল, আকাশের চাঁদ, পরশ-পাথর, বৈষ্ণব কবিতা, স্বর্গ হইতে বিদায়, এসকল কবিতা কল্পনায় গড়া মায়ালোক হইতে বাস্তববিশ্বলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবারই কথা সজোরে ঘোষণা করিয়াছে। বিপিন বাবু কি এই-সকল কবিতাকেও বস্তুতন্ত্রতাবিহীন ও মায়িক বলিতে চান্? বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইল এইসকল কবিতার চেয়ে অধিক বস্তুতন্ত্র, কারণ তাঁহারা মোহান্তগুরু মানিতেন কিন্তু এ কথা লেখক একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না যে বৈষ্ণব কবির

"সে গীত-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে।"

কারণ—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।
* * *
সে সঙ্গীতরসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা।"

"রবীন্দ্রনাথের কবিতা কচ্চিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে" এ মত বিপিন বাবু কেমন করিয়া সমর্থন করিতে পারেন তাহা তো আমি ভাবিয়া পাই না। এ একেবারে বহিঃ-প্রামাণ্যহীন শুদ্ধ স্বানুভূতির উক্তি। যেখানে ক্রমাগতই কবি ভাবগত (subjective) অনুভূতিকে অবিশ্বাস করিয়া বস্তুগত বিশ্বসত্তাকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, মানবপ্রেমে, মানবের সুখে দুঃখে কল্যাণকর্ম্মে সকল দিক দিয়া জাগাইয়া তুলিতেছেন—যেখানে বারম্বার বাস্তবভ্রষ্ট দেশকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন:—

"লক্ষ কোটী জীব ল'য়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা।"

এই কথাই সজোরে বলিতেছেন:—

"চাহিনা ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর
লক্ষ কোটী প্রাণী সনে এক গতি মোর।

সেখানে হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কি করিয়া হয় যে "রবীন্দ্রনাথের কবিতা কচ্চিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে" এবং "বাংলার পল্লীজীবন এবং বাঙালীর সাচ্চা প্রাণটা চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আছে"?

বাংলার পল্লীজীবন কবিতায়, গল্পে, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে এত প্রচুর রকমে, এত অনায়াস স্ফূর্ত্তিতে আর কে আঁকিয়াছেন আমি তো তাহা জানি না! কবিতাতে—"চিত্রা"র পুরাতন ভৃত্য, দুইবিঘা জমি, "চৈতালী"তে মধ্যাহ্ন, দিদি, পরিচয়, পুঁটু প্রভৃতি কবিতা বাংলা-পল্লীজীবনের ও পল্লীপ্রকৃতির সাঁচ্চা প্রাণের চিত্র নয়? সমস্ত "ক্ষণিকা" কাব্যখানি সোনার ছন্দের ফ্রেমে বাঁধানো বাংলার পল্লীচিত্রমালা বই আর কি বলিব? গল্পে—খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তনে রাইচরণ ভৃত্যের চিত্র; পোষ্টমাষ্টার গল্পে রতনমণির চিত্র; ছুটি গল্পের সেই ফটিক ছেলেটির চিত্র; দানপ্রতিদানে রাধামুকুন্দের বিশ্বাসঘাতকতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা শশিভূষণের নীরব ক্ষমার সেই করুণ গল্পটি; অতিথি—যে গল্পটিতে তারাপদ'র চিত্রে বাংলার গ্রাম্যপ্রকৃতিকেই মানবরূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র; শাস্তি গল্পে অতি নিম্ন পল্লীজীবনের চিত্র, দৃষ্টিদানে, সমাপ্তিতে বাঙালী পল্লীস্ত্রীর চিত্র—কত নাম করিব! সমস্ত গল্পগুচ্ছটিকে গল্পগুচ্ছ নাম না দিয়া বাংলার পল্লীচিত্রমালা নাম দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। বাংলার যথার্থ পল্লীচিত্র, পল্লীজীবনের যথার্থ মানুষের সুখ দুঃখের এমন করুণ-নিপুণ অঙ্কনে আর কে এমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন জিজ্ঞাসা করি? বাঙালীকে তাহার আপন দেশের এমন ঘরের খবর এমন বুকের খবর আর কোন্ কবি কোন্ গল্পলেখক দিয়াছেন? এসকল গল্প যদি বাস্তবচিত্র না হয়, তবে বাস্তবচিত্র কোথায় আছে তাহা বিপিন বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক বাঙালী পাঠকসমাজকে দেখাইয়া দিলে সুখী হইব।

তবে লেখক বলিবেন যে এসকল চিত্রে "দারিদ্র্যের

মধুটুকুই আমরা আস্বাদন করিয়া থাকি, তার তীক্ষ্ণ হুলটা গায়ে বিঁধে না।" তা সত্য। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্রাউনিংয়ের ভাবুকতা সম্বন্ধে অনেক স্থূলদৃষ্টি সমালোচক ঐ একই কথা বলিয়া থাকে যে তিনি পাপের চিত্রের ভালটুকুই দেখান্, মন্দটুকু দেখান্ না এবং সে জন্য তিনি পাপকে অনেক জায়গায় প্রশ্রয় দেন্। অর্থাৎ ইহাদের অভিযোগ এই যে ব্রাউনিং কেন এমিলি জোলা নন্ বা হেন্‌রিক্ ইব্‌সেন নন। তিনি কেন The Ghosts না লিখিয়া Pippa Passes লিখিয়াছেন। অবশ্য এহেন সমালোচনার জবাব আমি প্রবন্ধারম্ভেই দিয়াছি যে সাহিত্য আর সংসার উভয়ের প্রকাশ একই ভাবের হইতে পারে না—সংসারের বাস্তবিকতা সাহিত্যে নাই, সাহিত্যের ভাবসম্পূর্ণতা সংসারে নাই। Pippa Passes কিছু সংসারে ঘটে না। Ottimaর ন্যায় ব্যভিচারিণী ও Sebaldএর ন্যায় সেই পাপে তাহার সাহায্যকারী সংসারে যথেষ্ট আছে এবং অটিমার সাহায্যে সিবাল্ড তাহার স্বামীকে যেরূপে হত্যা করিয়াছিল তাহাও খবরের কাগজ ঘাঁটিলে প্রায়ই পড়া যাইতে পারে। কিন্তু যে বিশেষ একটি মানস অবস্থায় ব্রাউনিং তাহাদিগকে ফেলিয়াছেন সে অবস্থা তো-সংসারে এসকল লোকের ভাগ্যে ঘটেনা। দারুণ অন্যায়ের জন্য যখন ভিতরে ভিতরে তাহারা পরস্পর হইতে পরস্পর ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং তাহা বুঝিয়া অটিমা আপনার সৌন্দর্য্যের কুহকজাল সিবাল্ডের উপর বিস্তার করিবার ব্যর্থ চেষ্টা পাইতেছে ঠিক সেই সময় পিপার গান—

> God's in His Heaven
> All's right with the world!

বজ্রের মত তাহাদের কানে আসিয়া পড়িল এবং উভয়েই মোহের ঘুম হইতে উত্থিত হইয়া দেখিল যে কি মিথ্যার উপর তাহারা মিলিবার প্রয়াসী।—এমনটি ঘটনা তো সংসারে ঘটেনা। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে অসম্ভব ও মায়িক বলিবার কোন হেতু নাই। "ঘটে যা তা সব সত্য নহে।" সুতরাং প্রত্যক্ষ সংসারে যে হুলটুকুই পাওয়া যায়, সাহিত্যে সে হুলটুকুই ঢাকা পড়ে এবং দেখান হয় যে হুল আছে বটে কিন্তু মধুটাই আসল। সাহিত্যে যদি সেই সম্পূর্ণতার আদর্শ না থাকিত, তবে সংসার তাহাকে এত আদর করিত না।

বাংলাদেশের যে চিত্রটুকু বিপিনবাবুর কয়েক ছত্রে পাওয়া গিয়াছে, রবিবাবু যদি তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সেই চিত্রসহায়ে গল্পগুচ্ছ ও কবিতা রচনা করিতেন তবে বাংলাদেশকে এমন সত্য করিয়া চিনিতে ও ভালবাসিতে বাঙালীর ছেলে আজ পারিত কিনা সন্দেহ! বিপিনবাবু লিখিতেছেন—

> "প্রমোদপ্রাসাদ হইতে কল্পনার দূরবীক্ষণ সহায়ে, দূরস্থিত পর্ণ-কুটীরের অনাবিল প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করাতে যে আনন্দ জাগিয়া উঠে, সেই পর্ণকুটীরের জীর্ণকন্থার কীটাণুলীলা ও শীর্ণদেহ, দীর্ণপ্রাণ কুটীর-বাসীদিগের কলহকোলাহল প্রত্যক্ষ করিলে আর সে আনন্দটুকু থাকে না।"

বাঙালী পাঠক মাত্রেই জানেন যে এ চিত্রও রবিবাবুর মধ্যে প্রচুর আছে কিন্তু কি ভাগ্য যে রবিবাবু কেবল এই চিত্রই আঁকিয়া আমাদের গায়ে হুল ফুটাইয়া দেন নাই! "সমাপ্তি" গল্পে যখন ষ্টীমার কোম্পানীর কেরাণী ঈশানচন্দ্র তাহার একমাত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে ছুটি প্রার্থনা করিয়া ছুটি পায় নাই এবং "টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা কাচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোট ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা মস্তখাতা রাখিয়া" অনাবৃত দেহে টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিল, সে সময়ে হঠাৎ একদিন তাহার কন্যা ও জামাতা সেই আফিসে আসিয়া উপস্থিত। সে কি চমৎকার আনন্দ-সম্মিলনের চিত্র! একদিকে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কি নিরানন্দময় খাটুনিতে সেই বৃদ্ধ নিযুক্ত, অথচ অন্যদিকে সে স্নেহময় পিতা, তাহার হৃদয় বাৎসল্যের রসে ছলছল করিতেছে! যদি তাহার সেই একদিকটাই দেখান হইত, তবে হুলই ফুটিত—কিন্তু অন্য দিক্‌টা দেখিতে পাওয়া গেল বলিয়া সমস্ত দারিদ্র্যের উপরেও কি একটি মধুর-গভীর আলো পড়িল যাহাতে সেই বৃদ্ধটি এক নিমেষেই আমাদের সমস্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া লইল! "কাবুলিওয়ালা" গল্পটিতেও একটা কয়েদখাটা খুনী যে একজায়গায় কতখানি স্নেহপ্রেমের অধিকারী সেটুকু কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখান হইয়াছে—তাহাকে খুনী করিয়া রাখিলেই কি কাহিনীটি খুব বস্তুতন্ত্র হইত?

কেবল দৃষ্টান্তের উপর দৃষ্টান্ত বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। বিপিন বাবুর সমস্ত আলোচনাটি যে কোন উচ্চ দরের সাহিত্য সম্বন্ধে খাটেনা, আমি তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলাম।

বিপিনবাবু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিকেই শুধু বস্তুতন্ত্র-বিহীন বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই,—অবশেষে লিখিয়াছেন –

'যেমন তাঁর কাব্যে ও গল্পে এই মায়ার প্রভাব বেশী, সেইরূপ তাঁর সমাজসংস্কারের প্রয়াস, ও ধর্ম্মের শিক্ষাও বহু পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়াছে। তিনি একটা কল্পিত স্বদেশ রচনা করিয়া, তাহারই উপরে একটা সত্য স্বদেশী সমাজ গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলেন। সে মায়ার সৃষ্টি কিছুদিন পরে আপনাতে আপনিই মিলাইয়া গিয়াছে। * * * আর আজ তিনি যে এক বিশাল "বিশ্বমানব" কল্পনা করিয়া তাহারই উদার প্রেমে আত্মসমর্পণ করিতেছেন,—তাহারও প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষেও নয়, আগমেও নয়—কিন্তু তাঁর অলৌকিক কবিপ্রতিভার অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তিতে।"

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা মায়িক ইহা খুবই স্বীকার করি—কারণ, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আত্মশক্তির মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন কিনা এবং তারপর তাঁহারই বাক্যের প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতে শুনিতে দেশের কর্ণ বিভ্রান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এবং ইহাও সত্য যে তিনি কোন দিন অটনমি বা কলোনিয়ল সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট নামক অপূর্ব্ব বস্তুতন্ত্রতাকে ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। তিনি স্বদেশী সমাজ হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিয়াছেন তাহা এই যে, সমাজের ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের মঙ্গল করিবার একটী বৃহৎ ক্ষেত্র রহিয়াছে, সেখানে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা ধর্ম্ম সমস্ত যোগাইবার ভার আমাদিগকেই লইতে হইবে, দেশের মধ্যে যাহাতে ব্যূহবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিবার শক্তি এবং অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে, তজ্জন্য আমাদের সকলকেই কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। তিনি নিজে শিক্ষার জন্য যৎসামান্য একটু আয়োজন করিয়াছেন এবং একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার জন্য নিজের শ্রম, অর্থ, ও অমূল্য সময় সমস্ত উৎসর্গ করিয়া, সকল বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়া তাহাকে সফলতার দিকে তিলে তিলে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছেন এবং সামান্য একটি কাজকেও এ দেশে সফল করিয়া তোলা যে কি সুকঠিন ব্যাপার তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। সুতরাং তাঁহার দেশচর্য্যাকে বস্তুতন্ত্রতা বিহীন ভিন্ন আর কি নাম দেওয়া যাইতে পারে?

সত্য কথা বলিতে কি, বস্তুতন্ত্রসম্পন্ন প্রকৃত দেশচর্য্যা যে কি পদার্থ তাহা স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে একদল লোকের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি। আমার ভাষায় তাঁহাদের পরিচয় না দিয়া বস্তুতন্ত্রবিহীন রবীন্দ্রের ভাষাতেই দিলাম:—

"যাহারা সহজ অবস্থায় কোন দিন স্বাভাবিক অনুরাগের দ্বারা দেশের হিতানুষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হয় নাই, যাহারা উচ্চ সংকল্পকে বহুদিনের ধৈর্য্যে নানা উপকরণে নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে নিজের প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে নাই, অনেক দিন ধরিয়া রাষ্ট্রচালনার বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্র হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুসরণে সঙ্কীর্ণভাবে জীবনের কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা হঠাৎ বিষম রাগ করিয়া এক নিমেষে দেশের একটা মস্ত হিত করিয়া ফেলিবে ইহা কোন মতেই সম্ভবপর হয় না। ঠাণ্ডার দিনে নৌকার কাছেও ঘেঁসিলাম না, তুফানের দিনে তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া অসামান্য মাঝি বলিয়া দেশ বিদেশে বাহবা লইব এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব। অতএব আমাদিগকেও কাজ একেবারে সেই গোড়ার দিক্ হইতেই সুরু করিতে হইবে। তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে—বিপরীত উপায়ে অনেক বেশি বিলম্ব হইবে।

* * * *

"আসল কথা, মাতাল যেমন নিজের এবং মণ্ডলীর মধ্যে নেশাকে কেবলি বাড়াইয়া চলিতেই চায় তেমনি উত্তেজনার মাদকতা আমরা সম্প্রতি যখন অনুভব করিলাম তখন কেবলি সেটাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া উঠিল। অথচ এটা যে একটা নেশার তাড়না সে কথা স্বীকার না করিয়া আমরা বলিতে লাগিলাম, গোড়ায় ভাবের উত্তেজনারই দরকার বেশি; সেটা রীতিমত পাকিয়া উঠিলে আপনিই তাহা কাজের দিকে ধাবিত হয়—অতএব দিনরাত যাহারা কাজ কাজ করিয়া বিরক্ত করিতেছে, তাহারা ছোট নজরের লোক—তাহারা ভাবুক নহে—আমরা কেবলি ভাবে দেশকে মাতাইব। * * চেষ্টা নহে, কর্ম্ম নহে, কিছুই গড়িয়া তোলা নহে, কেবল ভাবোচ্ছ্বাসই সাধনা, মত্ততাই মুক্তি।"

এইবার "বিশ্বমানব" সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ আজিকার মত সমাপ্ত করিব।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যজীবনের ভিতরকার তত্ত্বই আমরা দেখিলাম এই যে বরাবরই তিনি খণ্ড অনুভূতিকে বিশ্বানুভূতির দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন, আপনার অবস্থাকে আপনি অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার স্বাদেশিক অনুভূতির বেলাতেও সেই একই ব্যাপার ঘটিয়াছে। স্বদেশকে তিনি স্বদেশেরই মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিতে পারেন নাই, তাহার মধ্যে বিশ্বমানবের প্রকাশকে দেখিয়াছেন। শুধু নিজের দেশকেই নহে, তিনি কোন দেশকেই বিশ্বমানব হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখেন না, তাহারই অঙ্গ বলিয়া জানেন। বিশ্বমানবকেই দান করিবার, তাহারি বিরাট অভিপ্রায়কে বহন করিবার ও সফল করিবার জন্য নানা-

দেশের নানা উদ্ভাবনীশক্তি লাগিয়া আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার বড় দুঃখ এই যে "এখানে আমাদের জ্ঞান কর্ম্ম আমাদের সর্ব্বপ্রকার আদানপ্রদানের বড় বড় রাজপথ এক একটা ছোট মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের হৃদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর, নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে আপনাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার অবসর পায় নাই।" কিন্তু এই অবস্থাতেই ভারতবর্ষ ঠেকিয়া থাকিবে ইহাও তিনি কোন দিনই বিশ্বাস করেন না। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে ভারতবর্ষে যে এত বিভিন্ন জাতি এত আচার আচরণ ভাষা ধর্ম্ম প্রভৃতির বৈষম্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে ইহা একটি লক্ষণ—কিসের?- না, বিশ্বমানবের প্রকাণ্ড একটি সমস্যার মীমাংসা যে এখানেই হইবে, ইহা তাহারই লক্ষণ। এই ভারতবর্ষে সকল পার্থক্য বিলুপ্ত বা নির্ব্বাসিত হইবেনা কিন্তু মিলিবে।

এইখানেই আমার প্রবন্ধ শেষ করি। আমি অনেকক্ষণ আমার পাঠকদিগের সময় ও ধৈর্য্যের উপরে অত্যাচার করিলাম তাঁহাদিগের নিকট সে জন্য মার্জ্জনা চাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক বিবেচনাতেই এই প্রতিবাদ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং প্রবন্ধের কলেবরও এত দীর্ঘ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যিনি আমাদের দেশের গৌরবস্থল এবং যাঁহার নিকট দেশ এখনও অনেক আশা করিতে পারে, তাঁহাকে ভুল বুঝিলে আমরা আপনাদিগকেই নানা বিষয়ে বঞ্চিত করিব, ইহাই আমার আশঙ্কা।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

জৈন কবিতা

চৈত্য-বন্দনা।

সর্ব্বশুভবর্ষী মেঘ, সনাতন মঙ্গল-বল্লরী,
অর্থী জনে কল্পতরু, সংসার-সাগর-জলে তরী,
পাপ-অন্ধকার নাশি যেই ভানু করেন প্রভাত
শ্রেয়ের নিদান তিনি, শান্তিদাতা জিন্ শান্তিনাথ।

ধূপারতি।

আগুন দহিছে ধূপের শরীর
সৌরভ তায় উঠে,
আরতি পূজায় লাগিয়া ধূপের
করম-বন্ধ টুটে।
ধূপের মতন নিজ দেহ মন
করিতে যে জন পারে,
প্রভু-আগে সেই পায় বহুমান
অন্তে অমরাগারে।

নমস্কার।

যত কিছু আছে তীর্থ পাবন
মর্ত্ত্যে, পাতালে, স্বর্গদেশে,
যত আছে জিন-বিম্ব জগতে
আমি সবে নমি নির্ব্বিশেষে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলোচনা

আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান।

পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, ২০ বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ দার্শনিক সীতানাথ বাবুর গ্রন্থের এই অবস্থা দেখিয়া বুঝা যায় যে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত দার্শনিক গ্রন্থের পাঠকসংখ্যা প্রচুর নহে।

প্রথম সংস্করণের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পাঠ করিয়া আমার মনে যেসকল সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠ করিয়াও সেইসকল সন্দেহই রহিয়া গিয়াছে, তাই এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি।

আমার সন্দেহভঞ্জনের জন্য আমি সীতানাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে আলাপ করিতে পারিতাম কিন্তু তাহাতে আমার মতন আরও যেসকল লোকের সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহাদের সন্দেহভঞ্জনের উপায় থাকিত না, সেরূপ লোকের সংখ্যাও অপ্রচুর নহে, এই জন্যই প্রকাশ্য-ভাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সীতানাথ বাবু যদি প্রকাশ্য-ভাবে সন্দেহভঞ্জন করেন তবে অনেকের সংশয় দূর হইবে। আমি আশা করি সীতানাথ বাবুর ন্যায় একজন সাধনশীল দার্শনিক পণ্ডিত আমার এই আলোচনায় বিরক্ত হইবেন না।

একটী তত্ত্বের উপর তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার সমগ্র গ্রন্থের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, যদি সেই তত্ত্বটী মিথ্যা হয় তবে তাঁহার ব্রহ্মনিরূপণ, ব্রহ্মজ্ঞান ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাধন-প্রণালী সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। সে তত্ত্বটী এই, "বিষয়জ্ঞান ভিন্ন আত্মজ্ঞান থাকিতে পারে না এবং

আত্মজ্ঞান ভিন্ন বিষয়জ্ঞান থাকিতে পারে না।" "বিষয়জ্ঞান অবলম্বন না করিয়া আত্মজ্ঞান থাকিতে পারে না" এই তত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তত্ত্বভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন "যদি কোন পাঠক বলেন আমি কোনও বিশেষ সময়ে কেবল আপনাকে জানিয়াছি, অন্য কোনও বিষয়কে জানি নাই" তবে আমরা বলি এ কথার প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ অবশ্য স্মৃতি। পাঠকের স্মরণ হইতেছে যে সেই সময় তিনি কেবল আপনাকেই জানিতেন আর কোন বিষয়কে জানেন নাই, তবেই হইল যে তাঁহার তখনকার সমস্ত জ্ঞানটুকু এই ছিল, "আমি কেবল আপনাকে জানিতেচি আর কিছু জানিতেছি না। * * * এই জ্ঞান যে নিরবচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান নহে, ইহার মধ্যে যে একটী স্পষ্ট বিষয়-জ্ঞান রহিয়াছে, তাহাও সহজেই দেখা যাইতেছে। সে বিষয়টী—আত্মার অতিরিক্ত অন্য বস্তুর অভাব বোধ।"*

আমার বক্তব্য এই যে লেখক ধ্যানীর নিকট হইতে আপন ইচ্ছামত উত্তর বাহির করিয়াছেন। ধ্যানী এই উত্তর করিতে পারেন যে, যদি তাঁহার ধ্যানকালে বিষয়জ্ঞান ছিল, তবে তাহা ত তাঁহার মনেই থাকিত, যখন আত্মজ্ঞানের কথা মনে আছে এবং অন্য জ্ঞানের কথা মনে নাই তখন কিরূপে বলা যায় যে তাঁহার বিষয়জ্ঞান ছিল? বস্তুত তখন তাঁহার বিষয়জ্ঞান বা বিষয়ের অভাবজ্ঞানও ছিল না, থাকিলে এখন তাঁহার উহা মনে থাকিত। নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে আত্মার কিরূপ অবস্থা হয় তাহা অন্যকে বুঝান যায় না, তাই বলিয়া অন্য লোকের একথা বলিবার কি অধিকার আছে যে সমাধিভঙ্গে যাহা ধ্যানীর মনে নাই তাহাও নিশ্চয়ই তাঁহার মধ্যে ছিল?

"পঞ্চদশীতে" একটী অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে যথা,—যদি কোনো ব্যক্তি নিদ্রা হইতে জাগিয়া বলে যে সে অতিশয় সুখে নিদ্রা গিয়াছিল, তখন বুঝিতে হইবে যে সে ব্যক্তি নিদ্রাকালে সুখ অনুভব করিয়াছিল, নতুবা এখন তাহার সে সুখের স্মৃতি কোথা হইতে আসিল? এ দৃষ্টান্তটী নিখুঁত, কেননা যদি কোনো ব্যক্তি নিদ্রাকালে সুখদুঃখ সম্ভোগ করে তবে সেই সুখদুঃখ তাহাকে সম্ভোগকালের স্মৃতির সাহায্যে প্রকাশ করিতে হয়, কিন্তু যদি কিছু সম্ভোগ না করিয়া থাকে সে বিষয়ের প্রমাণের জন্য গত-স্মৃতির সাহায্য অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না, বর্ত্তমান কালের স্মৃতিই স্পষ্ট বলিয়া দেয় যে সে কিছু সম্ভোগ করে নাই, সম্ভোগ করিলে ত তাহার মনেই থাকিত। যদি কোন পাঠক বলেন যে তিনি বেহুঁস হইয়া ঘুমাইয়া ছিলেন, নিদ্রাকালে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না, তাহাতে সীতানাথ বাবু যদি বলেন যে তুমি স্মৃতি হইতে একথা বলিতেছ, তবে বলিতে হইবে যে তাহার অজ্ঞান অবস্থায়ও জ্ঞান ছিল। ইহা একান্তই স্ববিরোধী। মনে করুন একজন চিকিৎসক তাঁহার রোগীকে ক্লোরোফরম করিয়া তাহার একখানি পা কাটিয়া ফেলিয়াছেন, জ্ঞান লাভ করিয়া সে ব্যক্তি যদি বলে যে তাহার পা কাটার সময় সে অজ্ঞান হইয়াছিল, তবে কি বলিতে হইবে যে সে যখন অজ্ঞান হইয়াছিল তখন তাহার এই জ্ঞান ছিল যে সে অজ্ঞান হইয়া আছে, নতুবা এখন সে কোথা হইতে এ জ্ঞান পাইল যে সে অজ্ঞান হইয়া ছিল? বস্তুত কিছু একটা সম্ভোগ করিলেই তাহা পূর্ব্বস্মৃতির সাহায্যে টানিয়া আনিতে হয়; যাহা আদৌ সম্ভোগ করা হয় নাই, অনুভব করা হয় নাই, যাহার অস্তিত্ব নাই পূর্ব্বস্মৃতি তাহা কোথায় পাইবে?

ধ্যানী ব্যক্তি কেবল আত্মজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন, বিষয়-জ্ঞান কি বিষয়ের অভাব-জ্ঞানও তখন তাঁহার থাকে না। সীতানাথ বাবুর লেখা পড়িয়া মনে হয় তাঁহার মনের মধ্যে যেন এইরূপ একটা ভাব আছে যে ধ্যানী ব্যক্তি যখন আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন হন তখন "আর কিছু দেখ্‌ছি না আর কিছু দেখ্‌ছিনা" এইরূপ একটা জ্ঞানও তাঁহার মধ্যে থাকে অর্থাৎ তাঁহার মনটী তখন ঘড়ির পাণ্ডুলমের মতন একবার আত্মজ্ঞানের দিকে ও একবার অভাবাত্মক বিষয়-জ্ঞানের দিকে দুলিতে থাকে। অনেক উচ্চ সাধকেরও যে এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে তাহা আমি অস্বীকার করি না কিন্তু এরূপ যাঁহার চিত্তের গতি তাঁহার কখনই বিশুদ্ধ সমাধি লাভ হয় না, যাঁহার চিত্ত আত্মজ্ঞানেই মগ্ন জগৎব্রহ্মাণ্ড আছে কি না আছে এ চিন্তা তাঁহার মনে আসেনা। এ বিষয়ে সমাধিস্থ ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্যই বিশিষ্ট প্রমাণ, যুক্তি তর্ক এখানে ব্যর্থ। সীতানাথ বাবু যে যুক্তি দিয়াছেন তদ্দ্বারা ইহা মোটেই প্রমাণিত হয় নাই যে, আত্মজ্ঞান বিষয়-জ্ঞান ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে,—

সীতানাথ বাবু বলিতেছেন যে তুমি যে বলিতেছ শুধু আত্মজ্ঞানে ডুবিয়া ছিলে, তোমার অন্য কোনো বিষয়-জ্ঞান ছিল না, একথা সত্য নহে, কেননা তুমি তোমার স্মৃতি হইতে যখন একথা বলিতেছ, তখন তোমার অন্তত: অন্য বিষয়ের অভাবাত্মক জ্ঞান ছিল, নতুবা তুমি কি করিয়া জানিলে যে তোমার তখন বিষয় জ্ঞান ছিল না? আমার উত্তর এই যে আমার যে বিষয়-জ্ঞান ছিলনা তাহা আমি পূর্ব্বস্মৃতি হইতে টানিয়া আনিয়া বলিতেছি না, আমার বর্ত্তমান স্মৃতিই বলিয়া দিতেছে যে তখন আত্মজ্ঞান ভিন্ন আমার অন্য কোনো জ্ঞান ছিল না, থাকিলে ত মনেই থাকিত।

আর এক কথা, মনের এরূপ ধর্ম্ম নয় যে সে একই সময়ে দুইটী বস্তুতে বা দুইটী বিষয়ে অবস্থান করিতে পারে। মন এতই দ্রুতগামী যে, সে যখন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনাগমন করে আমরা তাহার আসা যাওয়া ধরিতে পারি না, মনে করি বুঝি মন একই সময়ে একাধিক বিষয়ে বিচরণ করিতেছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। একটা রজ্জুতে একটী অগ্নিময় গোলক বাঁধিয়া ঘুরাইলে যেমন একটী অগ্নিময় বৃত্ত হয় এবং ঐ বৃত্তের সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা অগ্নিগোলক আছে বলিয়া মনে হয় সেইরূপ দ্রুতগামী মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনাগমন করিলেও অতি দ্রুত গমনাগমন হেতু আত্মজ্ঞানে ও বিষয়-জ্ঞানে তাহার নিয়ত অবস্থানরূপ ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে কিন্তু নিরুদ্ধ চিত্তের এরূপ চাঞ্চল্য থাকে না, তখন সে আত্মজ্ঞানে মগ্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে তদাকারাকারিত হয়, কি ভাব পক্ষে কি অভাব পক্ষে অন্য কোনো জ্ঞানই তাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না। দুইটী বিষয়ে একত্র অবস্থান করা মনের ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য; তা, সে ভাব পক্ষেই হউক আর অভাব পক্ষেই হউক। যতক্ষণ চাঞ্চল্য থাকে ততক্ষণ মন এমনই দ্রুতবেগে আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানে গমনাগমন করে যে মনে হয় আত্মজ্ঞানের সঙ্গেই বিষয়জ্ঞান রহিয়াছে। কিন্তু মন যখন নিরুদ্ধ হয় তখন সে ডানা-ভাঙ্গা প্রজাপতির মতন এক ফুলেই পড়িয়া থাকে, পুষ্পান্তরে যাইতে পারে না। মনের সংকল্প বিকল্প থাকিতে অর্থাৎ মন সর্ব্বতো-ভাবে আত্মজ্ঞানকে আত্মসমর্পণ না করিলে সমাধি হয় না। নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না? সবিকল্প পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ থাকে, সে অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞানীচূড়ামণি শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে "সমাধির ভিতর দিয়া ভিন্ন চিৎব্রহ্মের প্রকাশ হয় না"। এই যে কথাগুলি বলিলাম ইহা যোগীদিগের সাক্ষ্য, আমার মনগড়া কথা নহে, পরন্তু যুক্তিও ইহার প্রতিকূল নহে।

তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের দ্বিতীয় তত্ত্ব এই যে আত্মজ্ঞান ছাড়িয়া বিষয়জ্ঞান থাকিতে পারে না, আসল কথাটা এই যে "জ্ঞান"-নিরপেক্ষ হইয়া "বিষয়" থাকিতে পারে না। এই তত্ত্বের উপর তিনি ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার কথার সারমর্ম্ম এই যে জড়বস্তু জ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে উহা জ্ঞানসাপেক্ষ, সুতরাং এই অনন্ত সৃষ্টিতে জীবের জ্ঞানের

* ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।

অগোচর যেখানে যাহা আছে অথবা যেখানে যখন যাহা থাকে তাহা এক অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত থাকে, এই জ্ঞানই ব্রহ্ম, ইনি নিরাকার সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বজ্ঞ।

প্রথম কথা এই যে জীবশূন্য কোনো স্থান আছে কিনা? যদি না থাকে তবে ত সৃষ্টিকে প্রকাশিত রাখিবার জন্য এক অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় কথা এই যে নিমপাতায়ও তিক্তত্ব নাই, শর্করায়ও মিষ্টত্ব নাই, এইসকল বস্তুর সঙ্গে আমাদের রসনার সংযোগ হইলে স্নায়ুরাজির ভিতর দিয়া আমাদের মস্তিষ্কে যে একপ্রকার বোধের উদয় হয় তাহাকেই আমরা তিক্তত্ব ও মিষ্টত্ব বলিয়া থাকি। যেখানে রসনা নাই সেখানে তিক্তও নাই মিষ্টও নাই। এইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সমস্তই আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উৎপন্ন হয়, একথা সীতানাথ বাবুও বলিয়াছেন। এক্ষণ কথা এই যে, রক্ত-মাংসপেশী-নির্ম্মিত ইন্দ্রিয়-যন্ত্রগুলির সাহায্য ভিন্ন যে কোনো বিষয় ভোগ করা যায় এরূপ অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। নিরাকার জ্ঞান কিরূপে থাকিতে পারে তাহা আমরা ভাবিতেও পারি না। মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-শৃঙ্খলা (nervous system) রহিত হইয়া জ্ঞান যে থাকিতে পারে ইহা যুক্তির বিরুদ্ধ কথা। সুতরাং যদি কোনো অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানকে এই জগতের সাক্ষী-চৈতন্যরূপে থাকিতে হয় তবে তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক থাকা চাই, কেননা এইসকল ইন্দ্রিয়ের অভাবে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া আমরা জানিনা। সীতানাথ বাবু যদি আপ্তবাক্য বিশ্বাস করিতেন তবে তাঁহার নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলিতে অধিকার থাকিত। ঋষিরা ধ্যানযোগে নিরাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; সে সময় দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হয় নাই। প্রখরবুদ্ধি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হিন্দুশাস্ত্র হইতে বচন তুলিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন, উহা তিনি "হুকুম" পাইয়া অর্থাৎ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া করিয়াছেন, সে "হুকুম" বিচারোৎপন্ন জ্ঞান বা সহজ জ্ঞান নহে। উহা সাক্ষাৎ ভাবে "হুকুম"। সীতানাথ বাবু এইসকল মহাজনগণের পন্থা অতিক্রম করিয়া "অতর্কপ্রতিষ্ঠ" ব্রহ্মকে তর্কমুখে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু তিনি যাহা করিতে চাহিয়াছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই।

সীতানাথ বাবু আপ্তবাক্য ও সহজজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়াছেন, শুধু উপেক্ষা করেন নাই, অবজ্ঞা করিয়াছেন। কাহারও নিকট কিছু শুনিয়া মানিয়া লওয়া এবং সহজজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করাকে তিনি "অন্ধবিশ্বাস" বলিয়াছেন এবং অন্ধবিশ্বাসীদিগকে তাঁহার সহিত চলিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি "অন্ধবিশ্বাস" ও "জ্ঞানগত" বিশ্বাসের যেরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা বড়ই অস্পষ্ট, পাঠ করিয়া বুঝা যায়না যে উক্ত উভয় প্রকার বিশ্বাসের মধ্যে তিনি কিরূপ পার্থক্য করিয়াছেন। এখানে সে প্রসঙ্গ তুলিয়া প্রবন্ধ-কলেবর বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে উহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল। এখানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে সীতানাথ বাবু বিনাযুক্তিতে কিছুই গ্রহণ করিতে রাজি নহেন সুতরাং তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে স্থূল দেহের আশ্রয় ভিন্নও জ্ঞান থাকিতে পারে, এবং আরও প্রমাণ করিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়-সাহায্য ভিন্নও সেই জ্ঞান, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ অনুভব করিতে পারে, অন্যথায় সৃষ্টি রহিল না। কেননা পঞ্চতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টির অস্তিত্ব কিরূপে থাকে তাহা মানববুদ্ধির অগম্য, আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া পঞ্চত্ব কিরূপে প্রকাশ পাইতে পারে তাহাও মানবধারণার অতীত। সুতরাং কাহারও জ্ঞানে-শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধযুক্ত এই সৃষ্টিকে প্রকাশিত রাখিতে হইলে তাঁহার পাঁচটী ইন্দ্রিয় থাকা আবশ্যক। সীতানাথ বাবু যুক্তিমুখে এই অনন্তচরাচরের সাক্ষী-চৈতন্যরূপে এক নিরাকার ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যে প্রয়াস পাইয়াছেন, আমার মনে হয় তাহা বিফল হইয়াছে।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা গ্রন্থের মধ্যে আমাদের আপত্তির কথা অনেক রহিয়াছে। আত্মা, মন, স্মৃতি প্রভৃতি শব্দ গ্রন্থকার যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন এবং আমাদের সুষুপ্তি কালে আমাদের জ্ঞান ও স্মৃতি প্রভৃতি ঈশ্বরে গচ্ছিত থাকে, আমরা জাগ্রত হইলে তিনি উহা আমাদিগকে ফিরাইয়া দেন ইত্যাদি যেসকল কথা বলিয়াছেন সেসকল কেবল যে আপত্তিজনক তাহা নহে অত্যন্ত দোষজনক বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে। কিন্তু সেসকল কথা এখন রাখিয়া দিয়া যাহার উপর তিনি তাঁহার সমগ্র গ্রন্থের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন সেই মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জনের আশা করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে নিরাকার ব্রহ্মসত্তা অথবা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু সীতানাথ বাবু উহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন সেই যুক্তিরূপ অস্ত্রে তাঁহার মতগুলিও যে খণ্ডিত হইতে পারে ইহা প্রদর্শন করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় এই প্রবন্ধটী আমার নিকট উত্তরের জন্য পাঠাইয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু নানা কারণে আমি ইহার উত্তর দিতে অনিচ্ছুক। একটী কারণ এই যে প্রবন্ধটী পড়িয়া বোধ হইল লেখক 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ভাল করিয়া পড়েন নাই। তার একটী প্রমাণ এই যে তিনি আমার ব্যাখ্যাত দুটী মূলতত্ত্বের মধ্যে প্রথমটীকে দ্বিতীয় আর দ্বিতীয়টীকে প্রথম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমার ধারণা এই যে তিনি পুস্তকখানি কয়েকবার ভাল করিয়া পড়িলে পুস্তকের মধ্যেই তাঁহার আপত্তিগুলির উত্তর পাইবেন। যেমন, জ্ঞানের ইন্দ্রিয় সাপেক্ষতা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তার উত্তর প্রথমাধ্যায়ের "জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়" নামক পরিচ্ছেদে আছে। দ্বিতীয় মূলসূত্র সম্বন্ধে যেসকল আপত্তি তুলিয়াছেন, সেসকলের উত্তর দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'জ্ঞানের দ্বৈতাদ্বৈতভাব' নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে, ইত্যাদি। পুস্তকখানি ভাল করিয়া পড়িয়াও যদি সন্দেহ না যায়, তবে সে সন্দেহ সাময়িক পত্রের আলোচনায় দূর হইবে না।

'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'-লেখক।

"ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা"

বিগত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের পর্য্যালোচিত "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা" পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে, প্রাচীন ভারতের রহস্যপূর্ণ ইতিহাসের নানা রঙের বহিরাবরণের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহার ভিতরের কথাটি যাহা এতদিন সহস্র চেষ্টা করিয়াও আলোকাভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়া উঠিতেছিল না, এইবার তাহার সে চেষ্টা বাঞ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিবে তাহার অরুণোদয় দেখা দিয়াছে; তবে যে, চতুর্দ্দিকে কর্কশ কা কা ধ্বনি হইতেছে—রজনী প্রভাতের সমসমকালে তাহা হইবারই কথা। এতদিনের ধস্তাধস্তির পরে ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের এই যে একটা সম্ভবমতো পাকা রকমের গোড়াপত্তন হইল, ইহা বঙ্গ-সরস্বতীর ভক্ত সন্তানদিগের কত না আনন্দের বিষয়। গোড়াপত্তন হইয়াছে যেরূপ

সুন্দর, তাহার উপরে তদনুরূপ ভিত গাঁথিয়া তুলিতে হইলে আরো নানাপ্রকার ইষ্টক প্রস্তর এবং মালমসলার জোগাড় করা আবশ্যক. তা ছাড়া পুরাতন ইতিহাস-ভারতীর নূতন দেবালয়ের নির্ম্মাণ কার্য্যে বাছা-বাছা কারীকরদিগের সমবেত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের নূতন প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন আপাতত যাহা আমার মনে উত্থিত হইতেছে তাহা সংক্ষেপে এই :—

মহাদেবের আদিম পীঠস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে কি উত্তর অঞ্চলে ?

রবীন্দ্রনাথের লেখার আভাসে আমার এইরূপ মনে হয় যে, তাঁহার মতে মহাদেবের আদিম পীঠস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে। তিনি যাহা আঁচিয়াছেন তাহা একেবারেই অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে, যেহেতু বাস্তবিকই রাক্ষসাদি ক্রূর জাতিদিগের মধ্যে বিষ্ণুর স্নিগ্ধমূর্ত্তি উপাস্য দেবতার আদর্শ পদবাতে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত ; দুর্দান্ত রাক্ষস জাতিদিগের মনোরাজ্যের সিংহাসন শিবের রুদ্রমূর্ত্তিরই উপযুক্ত অধিষ্ঠান-মঞ্চ। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমরা দেখিতে পাই যে, একদিকে যেমন রক্ষঃ, আর একদিকে তেমনি যক্ষ। প্রাচীন ভারতের দক্ষিণ-অঞ্চল যেমন রক্ষদিগের দলবলের প্রধান সঙ্গমস্থান (Head quarter) ছিল—উত্তর অঞ্চল তেমনি যক্ষদিগের দলবলের প্রধান সঙ্গমস্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের চক্ষে দক্ষিণের দ্রাবিড়াদি জাতিরা যেমন রাক্ষস বানরাদি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, উত্তরের মোগলাদি জাতিরা তেমনি যক্ষকিন্নরাদি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল—ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। বিকটাকারবিষয়ে দক্ষিণের রক্ষ এবং উত্তরের যক্ষের মধ্যে যেমন মিল আছে, কিম্ভূতকিমাকার-বিষয়ে তেমনি দক্ষিণের বানর এবং উত্তরের কিন্নরের সঙ্গে মিল আছে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, যক্ষদিগের রাজধানীতে কুবের-পুরীতে—মহাদেবের অধিষ্ঠানের কথা কাব্যপুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়োভূয় উল্লিখিত হইয়াছে। তা ছাড়া কৈলাস-শিখর মহাদেবের প্রধান পীঠস্থান।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠে একটি বিষয়ে আমার চক্ষু ফুটিয়াছে ; সে বিষয়টি এই যে, জনক রাজা যে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে তিনি ভারতে কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তনের প্রধান নেতা ছিলেন ; আর, তাঁহার গুরু ছিলেন বিশ্বামিত্র। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই যে, হিমালয় প্রদেশের কিরাত জাতিরা ব্যাধ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত—তাহারা কৃষিকার্য্যের ধারই ধারিত না। কিরাত জাতি মোগল এবং তাতারদিগের সহোদর জাতি ইহা বলা বাহুল্য। এটাও দেখিতেছি যে, হিমালয়ের উপত্যকায় মহাদেব অর্জ্জুনকে কিরাত বেশে দেখা দিয়াছিলেন। মহাদেব কিরাতদিগের দলে মিশিয়া কিরাত হইয়াছিলেন। মহাদেব পশুহন্তাও বটেন, পশুপতিও বটেন। মহাদেব যে অংশে কিরাতদিগের ইষ্ট দেবতা ছিলেন, সেই অংশে তিনি পশুহন্তা ; আর, যে অংশে তিনি খাস্ মোগলদিগের ইষ্ট দেবতা ছিলেন, সেই অংশে তিনি পশুপতি। পুরাকালের মোগল এবং তাতার জাতিরা জীবিকালাভের একমাত্র উপায় জানিত—পশুপালন, তা বই, কৃষিকার্য্যের ক অক্ষরও তাহারা জানিত না—ইহা সকলেরই জানা কথা। তবেই হইতেছে যে, মোগল এবং তাতার জাতিরা—সংক্ষেপে যক্ষেরা—একপ্রকার পশুপতির দল ছিল ; সুতরাং পশুপতি-মহাদেব বিশিষ্টরূপে তাহাদেরই দেবতা হওয়া উচিত ; আর, পুরাণাদিকে যদি শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হয়, তবে ছিলেনও তিনি তাই। যক্ষরাজ কুবেরের রূপ ছিল অনার্য্যোচিত ; আর, তিনি ধনপতি নামে বিখ্যাত। প্রাচীনভারতে ধন-শব্দে বিশিষ্টরূপে গো মেষাদি পশুধনই বুঝাইত। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পশুজীবী মোগল-তাতার প্রভৃতি জাতিরাই প্রাচীন ভারতের আর্য্যদিগের ইতিহাসে যক্ষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কি পশুহন্তা কিরাত জাতি—কি পশুপালক মোগল জাতি—উভয়েই কৃষিকার্য্য বিষয়ে সমান অনভিজ্ঞ ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ধনুর্ভঙ্গের ব্যাপারটিকে কোন্ প্রকার বিঘ্ন-ভঙ্গ বলিব ? কিরাতদিগের পশুঘাতী ধনুর্ভঙ্গ বলিব ? না রাক্ষসদিগের বিপরীত ভঙ্গ বলিব ? আমার বোধ হয় প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর দক্ষিণের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক যোগ সেতু বর্ত্তমান ছিল ; কেননা লঙ্কাপুরী প্রথমে কুবেরের ছিল, পরে তাহা রাবণ বলপূর্ব্বক হস্তগত করিয়াছিল। রাবণ এবং কুবের যে একই পিতার পুত্রদ্বয় ইহা কাহারো অবিদিত নাই।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আমার বলিবার আছে—সেটাও বিবেচ্য। কথাটি এই :—

নেপাল প্রদেশে বুদ্ধমন্দির এবং শিবমন্দির পাশাপাশি অবস্থিতি করে। গুর্খারাও শৈবধর্ম্মাবলম্বী। খুব সম্ভব যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে বৌদ্ধ সাধকেরা হিমালয় প্রদেশে নির্জ্জনে যোগ সাধন এবং তপস্যা করিতেন। উমা যেমন উপনিষদের সুনির্ম্মলা ব্রহ্মবিদ্যা, পার্ব্বতী তেমনি তন্ত্রশাস্ত্রের বিভীষিকাময়ী দশমহাবিদ্যা। ভক্তের দেবতা যেমন বিষ্ণু, যোগীতপস্বীদিগের দেবতা তেমনি মহাদেব। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে বৌদ্ধ সাধকেরা বিশিষ্টরূপে যোগী তপস্বী ছিলেন। মহাদেব সেইসকল পর্ব্বতবাসী বৌদ্ধ যোগী তপস্বীদিগের আদর্শ-প্রতিমা—এরূপ মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং আর্য্যধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত নামক পুস্তিকায় এই বিষয়টির সম্বন্ধে আমি যাহা সবিস্তরে লিখিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই :—

পৌরাণিক শাস্ত্রকারেরা আশ্চর্য্য নূতন প্রণালীতে বৌদ্ধ বিপ্লবের প্রতিবিধান চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ যোগী তপস্বীদিগকে আর্য্য যোগী তপস্বীদিগের দলে টানিয়া লইলেন, আর, মহাদেবকে সেইসকল অবৈদিক যোগীতপস্বীদিগের ইষ্টদেবতার পদবীতে আসন গ্রহণ করাইলেন। পাছে লোকে মনে করে—যোগীশ্বর মহাদেব বুদ্ধেরই আর এক অবতার—এই আশঙ্কায় পৌরাণিক শাস্ত্রকারেরা তাঁহার গলায় পৈতা দিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ করিয়া গড়িয়া লইলেন।

রবীন্দ্রনাথের মোট কথাটির সহিত আমার মতের একটুও অনৈক্য নাই। যে দুই একটি কথা আমি উপরে ইঙ্গিত করিলাম তাহার সহিত ভারতের ইতিহাস-ধারার কথাগুলির সমন্বয় মতে প্রবন্ধটির অঙ্গপূরণ করা হইলে ভাল হয়—ইহাই আমার মনোগত অভিপ্রায়। আমার বিশ্বাস এই যে, এই সমন্বয় কার্য্যটি রবীন্দ্রনাথ মনে করিলেই ঈশ্বর প্রসাদে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে সুনিষ্পন্ন করিতে পারেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরভৃত।

জ্যেষ্ঠমাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত জলধর দেব মহাশয় 'পরভৃত' শীর্ষক প্রবন্ধে বিলাতী 'কুকু' পাখীর স্বভাবের সহিত আমাদের চির-পরিচিত প্রতিবেশী কোকিল পাখীর স্বভাব মিলাইতে যাইয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"কোকিল বারমাস আমাদের দেশে থাকে না, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। উহারা কোথা হইতে আসে আর কোথায়ইবা চলিয়া যায়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। * * * বসন্তকালে কোকিল আমাদের দেশে আসে তাই কোকিলের অন্য নাম বসন্ত-দূত।

* * * আমাদের কোকিল * * মার্চ্চমাসে এ দেশে আসিয়া, জুলাইমাসে এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।"

জলন্ধর বাবুর এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এবং তাহা স্বীকার করিবার প্রকৃষ্ট কোন যুক্তিও তাঁহার প্রবন্ধে নাই। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিকট অনুমান কখনও দাঁড়াইতে পারে না। কোকিল যে আমাদের দেশের চিরস্থায়ী পাট্টাই স্বত্বের অধিবাসী, সে বিষয় আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি; আমাদের গ্রাম অঞ্চলে বারমাসই কোকিল দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় অনেকেই জানেন, নানা জাতীয় পক্ষীর প্রভাতী কোলাহলের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কোকিলের অস্পষ্ট কলরবও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

আমার আটচল্লিশ বর্ষ ব্যাপী জীবনের অধিকাংশ সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে অতিবাহিত হইয়াছে; বর্ত্তমান সময়েও পার্ব্বত্য অঞ্চলেই বাস করিতেছি। গিরিকিরীটিনী-ত্রিপুরার উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী প্রকৃতির রম্যকুঞ্জ। সেখানে এমন অনেক নূতন পাখী দেখিয়াছি, যাহা আমাদের অঞ্চলে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই পার্ব্বত্য প্রদেশেও বারমাস কোকিল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বসন্তকাল ভিন্ন অন্য সময়ে কুহুরবে কাননভূমি মুখরিত করেনা—ইহা কোকিলের স্বভাব। পেঁচা, বাদুড় প্রভৃতি নিশাচর পক্ষিগণ যেমন আঁধারের মুখ না দেখিলে পত্রের অন্তরাল হইতে বাহির হয় না, ময়ূরগণ যেমন মেঘ না দেখিলে সাধারণতঃ পুচ্ছ বিস্তার করে না, ভেকগণ যেমন বর্ষার বারিসম্পাত না হইলে উচ্চরব করে না, তদ্রূপ কোকিলের কণ্ঠও ঋতুরাজ বসন্তের আগমন ব্যতীত উন্মুক্ত হয় না—ইহাই কোকিলের স্বভাব। বারমাস কুহুধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই কোকিলকে আমাদের দেশের প্রবাসী-পক্ষী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথাই নাই।

বসন্তকালে আমাদের দেশে আসে বলিয়াই কোকিলের নাম 'বসন্তদূত' হইয়াছে এই কথাটী যুক্তিযুক্ত বলিয়া মানিয়া লইবারও বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না। বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কোকিলের কণ্ঠস্বর প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে. এবং তাহার কলকণ্ঠনিঃসৃত কুহুতান আমাদের নিকট বসন্তের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে, এই কারণে কবিগণ কোকিলকে বসন্তের দূত পদের সনন্দ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই উপাধি প্রদানের কোনও গূঢ় কারণ আছে বলিয়া সাব্যস্ত করিবার প্রমাণ নাই।

জলন্ধর বাবু আপন মত সমর্থনের নিমিত্ত বলিয়াছেন,—

"উৎকল দেশে ও মধ্য প্রদেশে কোকিলকে কোইলি বলিয়া থাকে। আমের আঁঠির ভিতরকার শাঁসকেও কোইলি বলে। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, আমের মধ্যে কোইলি না হইলে, কোকিলের কুহুস্বর শ্রুতিগোচর হয় না; বস্তুত তাহাই সত্য। মার্চ্চমাসের মধ্যে বা শেষভাগে আমের কোইলি হইয়া থাকে, প্রায় সেই সময়েই কোকিল এ দেশে দেখা যায়।"

সংগৃহীত প্রমাণ দ্বারাও জলন্ধর বাবুর মত সমর্থিত হইতেছে না। "আমের মধ্যে কোইলি না হইলে কোকিলের কুহুস্বর শ্রুতিগোচর হয় না" এই প্রবাদবাক্য দ্বারা, 'কোইলি' হইবার পূর্ব্বে কোকিল এ দেশে আসে না, এ কথার কোনও আভাস পাওয়া যাইতেছে না। বরং কোইলি না হওয়া পর্য্যন্ত কোকিলের কণ্ঠ স্ফুরিত হয় না ইহাই বুঝা যাইতেছে। কোকিল বসন্ত আগমনের পূর্ব্বে ডাকে না বলিয়াই দেশ ছাড়া হইয়া যায়, একথা ঠিক নহে। জলন্ধর বাবু যদি দেখিতে চাহেন, তবে তাঁহার ঠিকানা পাইলে, বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে জীবিত না পাইলেও অন্ততঃ মৃত একটী কোকিল তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে। ধাড়ি কোকিল জীবিত অবস্থায় ধৃত করা কষ্টসাধ্য।

আমাদের দেশের বসন্ত ভিন্ন অন্য ঋতুগুলি কোকিলের পক্ষে অসহনীয় বা অতৃপ্তিকর, এরূপ সাব্যস্ত হইলে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত অথবা মানসিক বৃত্তিনিচয়ের স্ফূর্ত্তিবিধান জন্য তাহাদের দেশান্তরে যাওয়া আবশ্যক বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে। কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ কোকিলগণ বারমাসই এদেশে থাকে। সাধারণতঃ কোন ঋতুবিশেষে তাহাদিগকে অসুস্থ বা স্ফূর্ত্তিহীন হইতে দেখা যায় না। সকল পাখীর ন্যায় ইহারাও স্বচ্ছন্দে আহারাদি করে এবং বসন্তের সমাগমে স্বভাব-সিদ্ধ কুহুতানে বিমানপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে। অথচ শীঘ্র মরিতেও দেখা যায় না। এইসকল আবদ্ধ পাখীকে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, আমাদের দেশের কোন ঋতুই কোকিলের পক্ষে অসহনীয় বা অতৃপ্তিকর নহে। সুতরাং 'কুকু' পাখীর ন্যায় ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের স্থান পরিবর্ত্তন করিবার বিশেষ কোনও কারণ আছে বলিয়া বুঝা যায় না।

আমি প্রাণীতত্ত্ববিদ্ নহি, সুতরাং জন্তুতত্ত্ব বিষয়ে আমার জ্ঞান অতি অল্প। কিন্তু স্বাভাবিক কৌতূহলপ্রযুক্ত কোন কোন বিষয়ে সন্ধান লইয়া এবং সর্ব্বদা নানা জাতীয় পালিত ও বন্য পক্ষী দর্শন করিয়া যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তদ্দ্বারা বুঝিতেছি, জলন্ধর বাবু কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়িবার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যেসকল কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা না করিলেও চলিত। অবয়বের বা বর্ণের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, কিম্বা কাক সেই কারণেই নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ডিমে তা দেয় ও ছানা পালন করে, এমন নহে; ইহা তাহাদের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক। কোকিল কখনও কাকের বাসা ভিন্ন অন্য জাতীয় পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে না, ইহা কোকিলের স্বভাব। কাকও আপন ছানার ন্যায় দেখে বলিয়াই কোকিলের ছানাকে পোষণ করে ইহা নহে; ছানাগুলি বিভিন্নবর্ণের বা বিভিন্ন আকারের হইলেও কাক তাহাদিগকে পালন করিত দ্বিধা করিতে না, পাখীর স্বভাব আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায়। জলন্ধর বাবুও পাখীর এরূপ ব্যবহারের কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং একজাতীয় পাখীর ডিম ও ছানা অন্য জাতীয় পাখীর দ্বারা রক্ষিত হওয়ার কয়েকটী দৃষ্টান্তও প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দেশের আর এক জাতীয় পরভৃত পাখীর বিষয় আলোচনা করিলে এবিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

'বৌকথাকও' পাখী কোকিলের ন্যায় অন্য জাতীয় পাখীর দ্বারা আপন ডিম ফুটাইয়া ও ছানা পালন করাইয়া লয়। কোকিল যেমন এই কার্য্যের ভার কাকের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, বৌকথাকও পাখী তদ্রূপ ফিঙ্গার উপর এই গুরুতর ভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করে; ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। বৌকথাকও পাখীর ছানার সহিত ফিঙ্গার ছানার আকৃতি বা বর্ণগত কোনও সাদৃশ্য নাই। ফিঙ্গার ছানা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, বউকথাকও পাখীর ছানা মূত্র বর্ণের উপর কালছিট বিশিষ্ট। আকারেও ফিঙ্গার ছানা অপেক্ষা কিছু বড়। এত পার্থক্য সত্ত্বেও ফিঙ্গা বৌকথাকও পাখীর ছানা পোষণ করিতে দ্বিধা করে না। অথচ ফিঙ্গার বাসা ভিন্ন অন্য জাতীয় পাখীর বাসায় বউকথাকও পাখীর ছানা কখনও দেখা যায় নাই। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, এক এক জাতীয় পরভৃত পাখী অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় পাখীর দ্বারা আপন আপন ডিম ফুটাইয়া ও শাবক পালন করাইয়া লয়। এবং শেষোক্ত জাতীয় পাখীরাও সযত্নে সেইসকল ডিম ও ছানা পোষণ করে, ইহাই তাহাদের স্বভাব। এই কার্য্যে তাহাদের চিন্তা বা বিবেচনা শক্তির পরিচায়ক কিছু নাই। ভিন্ন জাতীয় পাখীর বাসায়

তাহার অগোচরে ডিম পাড়িয়া যাওয়া চতুরতার কার্য্য বটে, কিন্তু ইহাও তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণ বলিয়াই মনে হয়।

বোকথাকও পাখী গ্রীষ্মাবসানে অন্য দেশে চলিয়া যায় বলিয়া প্রবাদ আছে, কোকিলের সম্বন্ধে এদেশে তদ্রূপ কোনও প্রবাদ নাই। উক্ত প্রবাদবাক্য সমূলক কি অমূলক, ভালরকম অনুসন্ধান না করিয়া তদ্বিষয়ে কোন কথা বলা যাইতে পারে না। তবে ইহা দেখা গিয়াছে যে,—উপযুক্ত যত্ন সত্বেও কোকিলের ন্যায় অবরুদ্ধ বোকথাকও পাখী দীর্ঘজীবী হয় না। ইহার অবশ্যই একটা কারণ আছে।

এতৎসম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিবার ছিল; প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, সুতরাং—আর অগ্রসর হওয়া গেল না। আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করিলে আমাদের দেশে আরও কোন কোন জাতীয় পরভৃত পাখীর সন্ধান পাওয়া যাইবে।

আগরতলা। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

অবসান

এবার ভাসিয়ে দিতে হ'বে আমার
এই তরী!
তীরে বসে যায় যে বেলা
মরি গো মরি!
ফুল ফোটানো সারা করে
বসন্ত যে গেল সরে!
নিয়ে ঝরা ফুলের বোঝা
এখন কি করি
মরি গো মরি!
জল উঠেছে ছলছলিয়ে
ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্ম্মরিয়া ঝরে পাতা
বিজন তরুমূলে।
শূন্য মনে কোথায় তাকাস্
সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাঁশীর সুরে
উঠে শিহরি—
মরি গো মরি!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন ন্যায়*

উপক্রমণিকা।

এই প্রবন্ধে দুইটী নূতন কথা থাকিবে। যাহাতে এই দুইটী বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য ঐ দুইটী বিষয় কি তাহা অগ্রেই বলিতেছি।

(১) ন্যায়সূত্র প্রথমে অধ্যাত্মবিদ্যা বা মোক্ষশাস্ত্র বলিয়া প্রণীত হয় নাই। উহা সামান্য তর্কের গ্রন্থমাত্র ছিল। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা উহাকে মোক্ষশাস্ত্রে পরিণত করিয়াছেন।

(২) বর্ত্তমান-ন্যায়-সূত্রকার ন্যায়ের মূলতত্ত্ব জানিতেন না। ব্যাপ্তি তাঁহার অবিদিত ছিল।

অন্য যেসকল আপাতনূতন কথা এই প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে, তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং প্রবন্ধকারের লিখিত আসিয়াতিক-সমিতির পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে।

প্রাচীন ও নব্য ন্যায়।

ন্যায়বিদ্যা দুইভাগে বিভক্ত। (১) প্রাচীন ন্যায় এবং (২) নব্য ন্যায়। এই প্রবন্ধে প্রাচীন ন্যায়ই প্রধানতঃ সমালোচিত হইবে।

সূত্র ও সূত্রকার।

অধুনা ন্যায়ের যেসকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ন্যায়সূত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই ন্যায়সূত্র মহর্ষি অক্ষপাদ বা গোতম-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে পাঁচটী অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিক আছে। পণ্ডিতসমাজে ঋষি-প্রণীত বলিয়া ইহার যথেষ্ট নাম আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল ইহা টোলে নিয়ম-পূর্ব্বক অধীত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের, এবং সংস্কৃত দ্বিতীয় ও উপাধি পরীক্ষার খাতিরে, ইহার একটু অধ্যাপনা হইয়া থাকে মাত্র। ফলে শতকরা নব্বই জন নৈয়ায়িক ন্যায়সূত্র চক্ষুগোচরও করেন নাই। ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ বেদের প্রামাণ্য, ন্যায়বিষয়ে ঠিক্ সেইরূপ অক্ষপাদ-সূত্রের প্রামাণ্য।

* প্রবন্ধকারের "ভারতীয় দর্শন" গ্রন্থের এক অংশ।

সূত্রকারের সময়।

ন্যায়সূত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ। চীন, জাপান এবং মঙ্গোলিয়া দেশে অদ্যাপি তত্তৎ দেশের ভাষায় অক্ষপাদীয় ন্যায় অ-ীত হইয়া থাকে। চীন গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, অক্ষপাদ বুদ্ধেরও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে (২.৫।৫) এবং সাঙ্খ্যসূত্রে (৫।২৭) ন্যায়দর্শনোক্ত পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্যের উল্লেখ আছে।

সূত্রের আলোচ্য বিষয়।

বর্ত্তমান ন্যায়সূত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে। (১) প্রমাণ (২) প্রমেয় (৩) সংশয় (৪) প্রয়োজন (৫) দৃষ্টান্ত (৬) সিদ্ধান্ত (৭) অবয়ব (৮) তর্ক (৯) নির্ণয় (১০) বাদ (১১) জল্প (১২) বিতণ্ডা (১৩) হেত্বাভাস (১৪) ছল (১৫) জাতি (১৬) নিগ্রহস্থান। এই তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ন্যায়সূত্র প্রধানতঃ তর্কবিদ্যারই গ্রন্থ (dialectics), ইহা দর্শন (philosophy) নহে।

উপরোক্ত তালিকাটী ন্যায়শাস্ত্রের ১ম সূত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঐ সূত্রটী এই—

'প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্তাবয়ব তর্ক নির্ণয় বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বাভাস ছল জাতি নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। ১।১।১।

ইহার অর্থ এই যে প্রমাণাদি ষোলটী পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। গ্রন্থকার স্বকীয় গ্রন্থের সূচীপত্র দিয়া বলিলেন যে এইসকল পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইলে মানব "নিশ্চিত মঙ্গল" লাভ করে। আজকালকার গ্রন্থেও তর্কশাস্ত্রের উপযোগিতা কি, তাহা দেখান হইয়া থাকে (কারবেত্ রীড্ কৃত লজিক দেখুন)।

নিঃশ্রেয়স কি?

সূত্রে 'নিঃশ্রেয়স' লাভের কথা আছে। এ নিঃশ্রেয়স কি? অনেকে মনে করেন যে, নিঃশ্রেয়স অর্থে মুক্তি বা অপবর্গ। কিন্তু ঐমত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পাণিনির ব্যাকরণের ৫ম অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে অচতুরাদি সূত্রে নিঃশ্রেয়স শব্দটী ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বলেন "নিশ্চিতং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সম্"। অবশ্য, নিশ্চিত শ্রেয় বলিতে অপবর্গ বুঝাইতে পারে, কিন্তু অপবর্গই যে নিশ্চিত শ্রেয়, অন্য কোনও শ্রেয় যে নিশ্চিত শ্রেয় নহে, ইহা বলা চলে না। মহাভারতে নিঃশ্রেয়স শব্দ বহুবার সাংসারিক মঙ্গল অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

নৈঃশ্রেয়শৌ তু তৌ জ্ঞেয়ৌ দেশকালৌ ইতি স্থিতিঃ। ১।১৪০।৮৫।
ক্রিয়াস্বিশ্রেয়সং নাম কথং কুর্য্যাৎ সতাং মতম্। ১।২০৪।১৪।
ময়া নিবেদিতং সর্ব্বং পথ্যং নিঃশ্রেয়সং পরম্। ২।৭৩।৩।

"নিঃশ্রেয়সং তু কল্যাণ মোক্ষয়োঃ শঙ্করে পুমান্।" এইরূপ অভিধানও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অতএব নিঃশ্রেয়স শব্দের অর্থ সাধারণ কল্যাণ বলা অযৌক্তিক নহে।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন--

সর্ব্বাসু বিদ্যাসু তত্ত্বজ্ঞানমস্তি নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চ। ত্রয্যাং তাবৎ কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ইতি। তত্ত্বজ্ঞানং তাবৎ অগ্নিহোত্রাদি সাধনানাং স্বাগতাদি পরিজ্ঞানম্ অনুপহতাদি পরিজ্ঞানং চ। নিঃশ্রেয়সাধিগমোঽপি স্বর্গপ্রাপ্তিঃ তথাহি অত্র স্বর্গঃ ফলং শ্রূয়তে ইতি। বার্ত্তায়াং কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি। ভূম্যাদি পরিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ভূমিঃ কণ্টকাদ্যনুপহতেত্যেতত্তত্ত্বজ্ঞানং কৃষ্যাদ্যাধিগমশ্চ নিঃশ্রেয়সমিতি তৎফলাৎ। দণ্ডনীত্যাং কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি। সামদানদণ্ডভেদানাং যথাকালং যথাদেশং যথাশক্তি বিনিয়োগস্তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পৃথিবীজয়ঃ ইতি। ইহত্বধ্যাত্মবিদ্যায়ামাত্মজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমোঽপবর্গপ্রাপ্তিরিতি।

অর্থাৎ "সকল বিদ্যারই তত্ত্বজ্ঞান আছে এবং নিঃশ্রেয়স লাভও আছে। বেদে অগ্নিহোত্রাদি করিতে হইলে যেসকল জিনিষের প্রয়োজন, তাহারা সুষ্ঠু অর্জ্জিত কি না, অনুপহত কি না প্রভৃতির জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান এবং স্বর্গপ্রাপ্তি "নিঃশ্রেয়সাধিগম।" 'বার্ত্তা'য় ভূমি প্রভৃতির জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান আর কৃষিলাভ নিঃশ্রেয়সাধিগম। দণ্ডনীতিতে সাম দান ভেদ ও দণ্ডের যথাকাল যথাশক্তি যথাদেশ প্রয়োগ তত্ত্বজ্ঞান, আর পৃথিবীজয় নিঃশ্রেয়স। এই অধ্যাত্ম বিদ্যার আত্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান এবং অপবর্গ নিঃশ্রেয়স।"

উদ্ধৃত উদ্দ্যোতকরের লেখা অনুসারে যে বিদ্যা দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহাই সেই বিদ্যার নিঃশ্রেয়স। স্বর্গ, কৃষি, পৃথিবীজয় ইহারা যথাক্রমে ত্রয়ী, বার্ত্তা, এবং দণ্ডনীতিশাস্ত্রের নিঃশ্রেয়স। ন্যায়শাস্ত্রের নিঃশ্রেয়স কি? ন্যায়শাস্ত্র পড়িলে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত অবয়ব তর্ক নির্ণয় বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বাভাস ছল জাতি নিগ্রহস্থানের তত্ত্ব জানিলে কি লাভ হয়? ভাষ্যকার বলেন—

"সেয়মান্বীক্ষিকী……
প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। *
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥

ন্যায়শাস্ত্র সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, ইহা সর্ব্বকর্ম্মের উপায়, এবং সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়।

অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় এবং যুক্তির সাধুত্ব অসাধুত্ব নির্ণয়ের শক্তি জন্মে এবং এই জন্যই অন্যান্য বিদ্যায় অনায়াসে প্রবেশ করা যায়, সকল কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে গোলযোগ ঘটে না। এই সকলগুলিই ন্যায়শাস্ত্রের নিঃশ্রেয়স। ন্যায়শাস্ত্রকে অধ্যাত্মবিদ্যায় পরিণত করিয়া মোক্ষকে উহার নিঃশ্রেয়স বলা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ভ্রম বলিতে হইবে। বাৎসায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল টীকাকারই এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অক্ষপাদের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাত্মবিদ্যা নহে। উহা সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Science of Sciences, উহা তর্কবিদ্যা,—দর্শন নহে।

অক্ষপাদের ষোড়শপদার্থ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রমাণাদি ষোলটী পদার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, উহারা ন্যায়সূত্রে আলোচিত বিষয়ের নির্ঘণ্ট মাত্র। এই ষোড়শ পদার্থকে বৈশেষিকদের দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ের সহিত বা আরিষ্টটলের Substance attribute প্রভৃতির সহিত তুলনা করা বড়ই অযৌক্তিক। অবশ্য বৈশেষিকদের ষট্‌পদার্থও যদি এইরূপ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের তালিকামাত্র হয়, তবে কোনও আপত্তিই নাই, কিন্তু উহারা সাধারণতঃ বিশ্বস্থ পদার্থের বিভাগ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন ভৌতিক পদার্থ কঠিন তরল ও বাষ্পীয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, তেমনি বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থ দ্রব্যগুণাদি ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত। এই হিসাবে অক্ষপাদকে ষোড়শ পদার্থ-বাদী বলা নিতান্ত অযৌক্তিক।

নিম্নে এই ষোলটী বিষয়ের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

প্রমাণ।

যাহা দ্বারা পদার্থজ্ঞান বা প্রমা জন্মে তাহাকে প্রমাণ বলে। আমরা চক্ষু দ্বারা বস্তুর যথার্থ আকার, আয়তন, বর্ণ প্রভৃতি জানিয়া থাকি; অতএব চক্ষু একটী প্রমাণ। চন্দ্রের গতি আমরা চক্ষে দেখিনা, কিন্তু এক সময়ে চন্দ্র আকাশের একস্থানে এবং ঐ সময়ের দুই প্রহর পরে চন্দ্রকে আকাশের আরএকস্থানে দেখি। ইহা দ্বারা অনুমান করি যে চন্দ্র গতিমান্। অতএব অনুমান একটী প্রমাণ।

প্রমাণ কয়টী? বর্ত্তমান ন্যায়সূত্রে চারিটী প্রমাণের উল্লেখ আছে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শাব্দ।

প্রত্যক্ষ।

ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ হইলে, অশাব্দ, অব্যভিচারী এবং নিশ্চয়াত্মক যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রত্যক্ষ। সকল রকমের জ্ঞান হইবার সময়ই আত্মা মনের সহিত যুক্ত হয়, এবং সকল প্রত্যক্ষেই মন ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হয়। এই আত্মমনঃসংযোগ এবং মনইন্দ্রিয়-সংযোগ প্রত্যেক প্রত্যক্ষে থাকিলেও প্রত্যক্ষের লক্ষণে উহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেননা ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সংযোগ হইয়া জ্ঞান হইলে তাহাতে ঐ দুইটী থাকিবেই থাকিবে।

অশাব্দ।

প্রত্যেক বস্তুরই একটী নাম আছে। ঐ নাম দ্বারা ঐ বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। উহাকে শব্দজ্ঞান বলা যাইতে পারে। লবণ মুখে দিয়া তাহার স্বাদের যে জ্ঞান হয় তাহা প্রত্যক্ষ, আর 'লবণ' এই শব্দ শুনিয়া তাহার স্বাদের যে জ্ঞান হয় তাহা শাব্দ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান শাব্দ নহে।

অব্যভিচারী।

মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শনস্থলে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ আছে, অপিচ উহা শাব্দজ্ঞান নহে। তথাপি ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমা নহে, কেননা অব্যভিচারী না হইলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজ জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না। যে জ্ঞান এখন একরূপ, অপরক্ষণে আর একরূপ, তাহাকে ব্যভিচারী জ্ঞান বলে।

নিশ্চয়াত্মক।

দুইটী পরস্পরব্যভিচারী জ্ঞানের মধ্যে একটী জ্ঞান ভ্রম হইবেই। একটী জিনিস দেখিয়া যখন আমাদের মনে এইরূপ ভাব হয় যে উহা স্তম্ভ না মানুষ—তখন ঐ জ্ঞান সংশয় বলিয়া পরিচিত। প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক হইয়া থাকে। এইজন্য সূত্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণ করিলেন:—

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন অশাব্দ অব্যভিচারী নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান প্রত্যক্ষ। ১।১।৪

অনুমান।

অনুমান কি? সূত্রকার অনুমানের লক্ষণ করেন নাই। তিনি বলিলেন :—

"তারপর প্রত্যক্ষজন্য পূর্ব্ববৎ শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট এই তিন রকম অনুমান।"

প্রত্যক্ষজন্য।

অনুমান প্রত্যক্ষজন্য, অর্থাৎ অনুমান প্রত্যক্ষ হইতে জন্মিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে মূল করিয়া অনুমান হইয়া থাকে। আকাশে মেঘ উঠিতে প্রত্যক্ষ করিয়া পরে 'বৃষ্টি হইবে' এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে। টীকাকারেরা বুঝাইয়াছেন যে প্রত্যেক অনুমানেই লিঙ্গ-দর্শন এবং লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন আবশ্যক, এবং ইহারা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান

পূর্ব্ববৎ।

অনুমান তিন রকম,—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট। পূর্ব্ববৎ অনুমানে কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান করা হয়। কারণ কার্য্যের পূর্ব্বে থাকে বলিয়া এখানে পূর্ব্বশব্দে কারণ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ববৎ কিনা কারণবৎ, অর্থাৎ যে অনুমানে কারণটী উপস্থিত আছে মেঘ হইতে দেখিলে, মেঘরূপ কারণের দ্বারা বৃষ্টিরূপ কার্য্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ অনুমান।

শেষবৎ

শেষবৎ অনুমানে কার্য্য দ্বারা কারণের অনুমান হইয়া থাকে। শেষ কি না কার্য্য। শেষবৎ অনুমানে শেষ অর্থাৎ কার্য্যটী হাতে আছে, উহা দ্বারা অনুপস্থিত কারণের অনুমান করা হইয়া থাকে। নদীর জল বাড়িয়া গিয়াছে, ঘোলা হইয়াছে, রাস্তা ঘাট সিক্ত হইয়াছে, ইত্যাদি কার্য্য দেখিয়া উহাদের কারণীভূত বৃষ্টির অনুমান শেষবৎ অনুমান।

সামান্যতোদৃষ্ট।

যখনই আমরা একটী জিনিস এখন একস্থানে এবং তারপর আরএকস্থানে দেখি তখনই বুঝি যে উহা পূর্ব্বস্থান হইতে শেষস্থানে গিয়াছে। গতি ভিন্ন জিনিসের স্থানপরিবর্ত্তন দেখি না। চন্দ্র এখন একস্থানে, দুই ঘণ্টা পরে আরএকস্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব চন্দ্রেরও গতি আছে। এইরূপ অনুমানের নাম সামান্যতো-দৃষ্ট অনুমান। ইহাকে কেন সামান্যতোদৃষ্ট বলে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই।

নানান্ ব্যাখ্যা।

উপরে পূর্ব্ববৎ শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্টের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইল, তাহা ন্যায়ভাষ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। ন্যায়ভাষ্যে এতদ্ভিন্ন অন্যএকরকম ব্যাখ্যাও আছে। সাঙ্খ্যকারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ ইহার আর-একরকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই তিন ব্যাখ্যার কোনটী সূত্রকারের অভিপ্রেত ছিল, তাহা জানা যায় না। বস্তুতঃ এমনও হইতে পারে যে, এই তিনটীই সূত্রকারের অনভিপ্রেত বা ভুল ব্যাখ্যা।

নব্য ন্যায়ের ব্যাখ্যা।

ইহা ছাড়া, নব্য ন্যায়ের আচার্য্যগণ ইহার আরও একপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্ববৎ কেবলান্বয়ী, শেষবৎ কেবলব্যতিরেকী, এবং সামান্যতো-দৃষ্ট অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানের নামান্তর মাত্র।

ব্যাপ্তি, সাধ্য, লিঙ্গ বা হেতু, পক্ষ, সপক্ষ, বিপক্ষ।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি। একজন লোক রান্নাঘরে, মাঠে, গৃহপ্রাঙ্গণে বা বনে, যেখানেই ধূম দেখিয়াছে, সেখানেই আগুনও দেখিয়াছে। এইরূপ দেখিতে দেখিতে তাহার মনে একটী সংস্কার হইয়াছে যে, ধূম বহ্নিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, ইহাদের মধ্যে নিয়ত সাহচর্য্য আছে। এই সাহচর্য্য-নিয়মের নাম ব্যাপ্তি। ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি স্থির হইয়া গেলে পরে, যদি সে কোনও স্থানে ধূম দেখে, তবে তথায় তাহার বহ্নির অনুমান হয়।

মনে কর যেন সে একটী পর্ব্বতে ধূম দেখিল। এখন "পর্ব্বত ধূমবান্" এই জ্ঞানটী এবং "ধূম ও বহ্নির সাহচর্য্য-নিয়ম বা ব্যাপ্তি আছে" এই জ্ঞানটী, এই দুইটী জ্ঞান হইতে "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই জ্ঞানটী হইল। এখানে পর্ব্বতকে পক্ষ, বহ্নিকে সাধ্য এবং ধূমকে হেতু বা লিঙ্গ

বলে। যেখানে সাধ্য আছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়, তাহাই পক্ষ। পর্ব্বতে ধূম দেখিতেছি, কিন্তু বহ্নি আছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়, অতএব পর্ব্বত পক্ষ। যেখানে সাধ্য আছে বলিয়া নিশ্চয়ই জানা আছে, তাহা সপক্ষ, যেমন মহানস, মাঠ, বন ইত্যাদি। যেখানে সাধ্য নাই বলিয়া নিশ্চিত জানা আছে তাহা বিপক্ষ, যেমন জলহ্রদ; জলহ্রদে বহ্নি নাই ইহা নিশ্চিত।

যে অনুমানে কেবলমাত্র সপক্ষ আছে বিপক্ষ নাই তাহাকে কেবলান্বয়ী, যে অনুমানে কেবলমাত্র বিপক্ষ আছে সপক্ষ নাই তাহাকে কেবলব্যতিরেকী, এবং যেখানে সপক্ষ বিপক্ষ উভয় আছে তাহাকে অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান বলে। যথা ঈশ্বর জ্ঞেয়—যেহেতু তদ্বোধক শব্দ আছে। এখানে জ্ঞেয়ত্ব সাধ্য। জ্ঞেয়ত্বহীন কোন পদার্থ নাই, অতএব ইহা কেবলান্বয়ী অনুমান। পৃথিবী অন্যান্য ভূত হইতে ভিন্ন, যেহেতু পৃথিবীতে গন্ধ আছে। ইহা কেবলব্যতিরেকী অনুমান। এখানে সপক্ষ নাই, কেন না অন্যান্য ভূত হইতে ভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই। পর্ব্বত বহ্নিমান্ যেহেতু উহা ধূমবান্, এটী অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান, কারণ এখানে সপক্ষ (মহানস, গোষ্ঠ, চত্বর) ও বিপক্ষ (জলহ্রদ) উভয়ই আছে।

সমালোচনা।

কিরূপে পূর্ব্ববৎ শব্দে কেবলান্বয়ী, শেষবৎ শব্দে কেবলব্যতিরেকী, এবং সামান্যতোদৃষ্ট শব্দে অন্বয়ব্যতিরেকী বুঝায় তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বস্তুত সূত্রকার যে কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকী অনুমানের কথা জানিতেন, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ। ভাষ্যাদি প্রাচীনতর গ্রন্থে উহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ "ব্যাপ্তি"বাদ জানা না থাকিলে, কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এইরূপ বিভাগ নিরর্থক হইয়া পড়ে।

ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তি কি? যেখানে যেখানে ধূম আছে সেইখানে সেইখানে বহ্নি আছে, এইরূপ সাহচর্য্য-নিয়মকে ব্যাপ্তি বলে। সহচর শব্দ হয় সাহচর্য্য। যাহারা একত্র থাকে তাহাদিগকে সহচর বা সমানাধিকরণ বলে। বহ্নি ও ধূম একত্র থাকে, অতএব উহারা সহচর বা সমানাধিকরণ। সহচর বা সমানাধিকরণ পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সাহচর্য্য বা সমানাধিকরণ্য। অতএব বহ্নি ও ধূমের মধ্যে সাহচর্য্য বা সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে। কিন্তু সাহচর্য্য বা সামানাধিকরণ্য মাত্রই ব্যাপ্তি নহে। কোন্‌রূপ সাহচর্য্যকে ব্যাপ্তি বলে তাহা বুঝাইবার জন্য সাহচর্য্যের একটু বিশেষণ দেওয়া হইল। যেখানে যেখানে ধূম অর্থাৎ হেতু সেখানে সেখানে বহ্নি অর্থাৎ সাধ্য। এইরূপ সাহচর্য্যই ব্যাপ্তি এবং এইরূপ সাহচর্য্য হইতেই অনুমান হইয়া থাকে। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি স্থির হইয়া গেলে পরে কুত্রাপি হেতু দেখিলে সেখানে সাধ্যের অনুমান হয়।

পৃথিবী অন্যান্য ভূত হইতে ভিন্ন, কেননা পৃথিবীতে গন্ধ আছে। এখানে পৃথিবী পক্ষ, অন্যান্য-ভূত-হইতে-ভিন্নত্ব সাধ্য এবং গন্ধ হেতু। এখানে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি খাটে না। কেননা যেখানে যেখানে হেতু অর্থাৎ গন্ধ, সেখানে সেখানে সাধ্য অর্থাৎ অন্যান্য-ভূত-হইতে-ভিন্নত্ব আছে, এইরূপ বলা চলে না। একমাত্র পৃথিবীতেই গন্ধ আছে। পৃথিবী অন্যান্য ভূত হইতে ভিন্ন কিনা ইহা বিচারের বিষয়। কাজেই এখানে পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাপ্তি রহিল না। এই দোষ নিবারণের জন্য আরএকরকমের ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। যেখানে যেখানে সাধ্যাভাব আছে, সেখানে সেখানে হেত্বভাব আছে; এইরূপ ব্যাপ্তির নাম ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তি এখানেও রহিয়াছে। অতএব এখানে অনুমান হইতে পারিল। আবার, ঈশ্বর জ্ঞেয়, যেহেতু তদ্বোধক শব্দ আছে; এখানে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি খাটে না—এখানে মাত্র প্রথমোক্ত অর্থাৎ অন্বয়ব্যাপ্তি আছে। পর্ব্বত বহ্নিমান্ যেহেতু উহা ধূমবান্; এখানে অন্বয় ও ব্যতিরেক এই উভয়বিধ ব্যাপ্তিই খাটে। যেখানে যেখানে ধূম (মহানস, চত্বর, গোষ্ঠ) সেখানে সেখানে বহ্নি (অন্বয় ব্যাপ্তি) এবং যেখানে যেখানে বহ্নির অভাব (জলহ্রদাদি) সেখানে সেখানে ধূমের অভাব (ব্যতিরেক ব্যাপ্তি)। অন্বয় ব্যাপ্তি, ব্যতিরেক ব্যাপ্তি এইরূপ দুইপ্রকারের ব্যাপ্তি আছে বলিয়াই কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই তিন রকম অনুমান হইল।

অক্ষপাদ ব্যাপ্তি জানিতেন না।

বর্ত্তমান ন্যায়সূত্রে ব্যাপ্তির কোনও উল্লেখ নাই। বস্তুত ন্যায়সূত্রকার যে ব্যাপ্তি কি তাহা জানিতেন না, এই পক্ষেও দুই একটী যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

(১) ন্যায়সূত্রে বা ন্যায়সূত্রভাষ্যে ব্যাপ্তি বা তদর্থক কোনও শব্দ উপলব্ধ হয় না।

(২) ন্যায়সূত্রকার বলিলেন কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমিত হয় (শেষবৎ), কারণ দেখিয়া কার্য্য অনুমিত হয় (পূর্ব্ববৎ) এবং এতদ্ভিন্ন সামান্যতোদৃষ্ট নামে আর এক রকমের অনুমানও আছে। যদি ব্যাপ্তি কি তাহা জানা থাকিত তবে তিনি বলিতেন যে ব্যাপ্য দেখিয়া ব্যাপকের অনুমান হয়।

এইরূপে বৈশেষিক সূত্রকার বলিলেন ;—

"ইহা ইহার কার্য্য, কারণ, সংযোগী, বিরোধী, সমবায়ী ইহাই লৈঙ্গিক জ্ঞান" (৯।২।১) অর্থাৎ কার্য্য, কারণ, সংযোগী, বিরোধী, সমবায়ী দেখিয়া যথাক্রমে কারণ, কার্য্য, সংযোগী, বিরোধী এবং সমবায়ী সম্বন্ধের অনুমান হয়।

এখানেও ব্যাপ্য দেখিয়া ব্যাপকের অনুমান হয় একথা সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎভাবে উল্লিখিত হইল না। বস্তুত ন্যায় ও বৈশেষিক সূত্রকারেরা যে সময়ে বিদ্যমান ছিলেন সে সময়ে "ব্যাপ্তিবাদ" আবিষ্কৃতই হয় নাই। কেবলমাত্র সাংখ্যসূত্রে (৫।২৯) ব্যাপ্তির লক্ষণ ও পরীক্ষা আছে এবং ঐ প্রসঙ্গে পঞ্চশিখের মতও উদ্ধৃত হইয়াছে। সাংখ্য-সূত্রকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া ধরিলেও, যে জন-শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সাংখ্যসূত্রকার পঞ্চশিখকে ব্যাপ্তিবাদজ্ঞ বলিয়াছেন, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। পঞ্চশিখ অতি প্রাচীন সাঙ্খ্যাচার্য্য। মহাভারতে তাঁহার উল্লেখ আছে। অতএব বর্ত্তমান ন্যায়সূত্র বা উহার প্রাচীনতম অংশগুলিকে পঞ্চশিখ হইতেও প্রাচীন বলা যায়।

(৩) ন্যায়সূত্রের পঞ্চম অধ্যায় ও তাহার ভাষ্য মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে স্বতঃই এইরূপ সন্দেহ হয় যে, সূত্রকার ব্যাপ্তি কি তাহা জানিতেন না। জাতি ও নিগ্রহস্থান সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা ব্যাপ্তিবাদজ্ঞের পক্ষে নিরর্থক। ব্যাপ্তিবাদজ্ঞ নব্যনৈয়ায়িকগণ স্বকীয় গ্রন্থে জাতি ও নিগ্রহস্থানের আলোচনা আদৌ করেন নাই।

(৪) ভাষ্যকার ন্যায়ের উদাহরণ দিতেছেন—(১।১।৩৫) যাহার উৎপত্তি নাই তাহা নিত্য। শব্দের উৎপত্তি আছে, অতএব শব্দ অনিত্য।—এই উদাহরণটী ভ্রমাত্মক। ব্যাপ্তি-বাদ ভাল করিয়া জানা থাকিলে, এরূপ ভ্রম হওয়া সম্ভব নহে।

এইসকল কারণে মনে হয়, যে, অক্ষপাদ বা বাৎসায়ন কেহই ব্যাপ্তিবাদ পরিজ্ঞাত ছিলেন না। এবং ব্যাপ্তিবাদ জানা না থাকিলে অনুমানকে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকীরূপে ভাগকরা যায় না। তাই নব্য-ন্যায়ের ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলিয়াছি।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যাখ্যাত হইল। উপমান ও শব্দ কি তাহা বলিতেছি।

উপমান।

'গবয় গোসদৃশ' এই কথাটী শুনিয়া, পরে গবয় দেখিলে, মনে হয় যে এই পরিদৃশ্যমান জন্তুটীর নাম গবয়। এই-রূপে শব্দের সহিত তাহার অভিধেয় বস্তুর সম্বন্ধনির্ণয় উপমানের ফল।

সমালোচনা।

এই ব্যাখ্যা ভাষ্যবার্ত্তিক ও নব্যন্যায়-সম্মত। কিন্তু আধুনিকদের নিকট কতকগুলি শব্দের অর্থনির্ণয়ের জন্য একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজিতে যাহাকে এনালজি (Analogy) বলে, উপমান কি তাহাই? এসম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে একটীমাত্র পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মীমাংসকেরা উপমানের আরএকরকম ব্যাখ্যা করেন, উহা মীমাংসাদর্শন আলোচনার সময় প্রদর্শিত হইবে।

শব্দ।

সুদৃঢ় প্রমাণবলে যাঁহারা অর্থের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আপ্ত (আপ্—লাভ করা+ক্ত) বলে। আপ্তেরা যে উপদেশ দেন তাহাই শাব্দপ্রমাণ। অর্থাৎ যে বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ সেই বিষয়ে তিনি আপ্ত। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে আপ্তেরা মিথ্যাবাদী নহেন, তাঁহারা যথার্থ জ্ঞান প্রদান করিবার জন্যই বাক্য প্রয়োগ

করিয়া থাকেন। যাস্ক নিরুক্তে ঋষির যে লক্ষণ করিয়াছেন, (সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মানো ঋষয়ো বভূবুঃ) ভাষ্যকার সেই লক্ষণকেই আপ্তের লক্ষণ বলিয়া লিখিয়াছেন।

আপ্তেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (১) অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ ও (২) লৌকিকগণ। উভয়ই সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা হইলে আপ্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ঋষিগণের উপদিষ্ট পদার্থ প্রত্যক্ষযোগ্য না হইলেও উঁহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে। এইরূপে ন্যায়সূত্রকার স্বর্গাদিপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য মানিয়া লইলেন। বার্ত্তিককার হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকে শব্দের অনুরূপ অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা নব্যন্যায়ের প্রস্তাবে প্রতিপাদিত হইবে।

ন্যায়সূত্রে আলোচিত ষোলটী বিষয়ের মধ্যে প্রথমটী প্রমাণ, দ্বিতীয়টী প্রমেয়। প্রমাণ কি তাহা দেখান হইয়াছে, এখন প্রমেয় আলোচিত হইবে।

প্রমেয়।

আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ—ইহারা প্রমেয়। (১।১।৯)

জগতে যে কেবলমাত্র এই দ্বাদশটী প্রমেয় বা জ্ঞাতব্যবিষয় আছে তাহা নহে। তবে এই দ্বাদশটীর তত্ত্ব জানিলে অপবর্গ হয় এবং ইহাদের মিথ্যাজ্ঞানের ফল সংসার, এইজন্য ইহারা বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

দুঃখ।

প্রমেয়ের পরিসংখ্যানে "দুঃখের" উল্লেখ আছে কিন্তু সুখের নাম নাই। ষড়দর্শনসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে নৈয়ায়িকদর্শনের বর্ণনার মধ্যে নিম্নলিখিত পংক্তিটী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রমেয়ং চাত্মদেহার্থবুদ্ধীন্দ্রিয় সুখানি চ। (২৪)।

অর্থাৎ আত্মা, দেহ, অর্থ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, সুখ প্রভৃতি প্রমেয়। এখানে দুঃখের বদলে সুখের নাম আছে। চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালায় মুদ্রিত ষড়দর্শনসমুচ্চয় হইতে উপরোক্ত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় আসিয়াতিক সমিতির পক্ষ হইতে বলোনা নগরের ডাক্তার সুয়ালি (Luigi Suali Ph. D. of Balogna) ষড়দর্শনসংগ্রহের যে সংস্করণ করিয়াছেন তাহাতে একটু সামান্য পাঠভেদ দৃষ্ট হয়, যথা—

প্রমেয়ং ত্বাত্মদেহাদ্যং বুদ্ধীন্দ্রিয় সুখাদি চ। (২৪)।

এখানেও "সুখ" আছে, দুঃখ নাই। অতএব 'সুখ' যে একসময়ে প্রমেয়সূত্রে ছিল তাহার সন্দেহ নাই। ইহা দেখিয়া সুধী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ নৈয়ায়িকেরা অতি প্রাচীনকালে (ভাষ্যকারেরও পূর্ব্বে) সর্ব্বাশুভবাদী বা পেসিমিষ্ট (pessimist) ছিলেন না। এই অনুমান অতি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার সপক্ষে একটী যুক্তি মাধবাচার্য্যের 'সংক্ষেপ শঙ্করজয়ে' পাওয়া যায়।

তত্রাপি নৈয়ায়িক আত্তগর্ব্বঃ কণাদ পক্ষাচ্চরণাক্ষপক্ষে।
মুক্তির্বিশেষং বদ সর্ব্ববিচ্চেৎ নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্ব্ববিত্ত্বে॥
অত্যান্তনাশে গুণসঙ্গতে র্যা স্থিতি র্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে।
মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দ সংচিৎ সহিতা বিমুক্তিঃ॥
(১৬।৬৮।৬৯)

শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের সময়ে নৈয়ায়িক তাঁহাকে বলিলেন "যদি তুমি সর্ব্ববিৎ হও, তবে কণাদ ও অক্ষপাদের দর্শনে মুক্তির কি ভেদ আছে তাহা বল, আর যদি তাহা না বলিতে পার, তাহা হইলে তুমি যে সর্ব্ববিৎ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা পরিত্যাগ কর।" (১৬।৬৮)। আধুনিক নৈয়ায়িকেরা কণাদ ও অক্ষপাদের দর্শনকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন।

বস্তুত নব্যন্যায়ের দর্শন বৈশেষিক দর্শন, তবে ভাষা তাহার নিজস্ব। এইজন্য আমরা নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক মুক্তিতে কোন তফাৎ দেখি না। শঙ্করাচার্য্যের (অথবা মাধবাচার্য্যের) সময়েও সাধারণ দার্শনিকেরা, আমাদেরই মতন,নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মুক্তিকে এক বলিয়া বুঝিতেন। কিন্তু তৎকালে সুদূর কাশ্মীরের পণ্ডিতদিগের নিকট ন্যায় ও বৈশেষিকের মুক্তিতে পার্থক্য অবিদিত ছিল না। তাই তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে ঠকাইবার জন্য উক্তরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য উত্তর দিলেন "আত্মার সহিত গুণের সম্বন্ধের অত্যন্ত নাশ হইলে আকাশের মত [সুখ-দুঃখরহিত] আত্মার যে অবস্থা হয় কণাদের মতে তাহাই মুক্তি।"

অক্ষপাদের মতে মুক্তিতে "আনন্দসংচিৎ" থাকে। এই প্রমাণানুসারে অক্ষপাদ-দর্শনে মোক্ষে আনন্দের সত্তা স্বীকার করিলে, প্রমেয়সূত্রেও সুখের উল্লেখ সম্ভবপর হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পক্ষিলস্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন

নৈয়ায়িকই "সুখ"কে প্রমেয়সূত্রে স্থান দেন নাই। বস্তুতঃ দুঃখের পরীক্ষার জন্য একটী সূত্রও আছে, সুখের জন্য সূত্র নাই। তবে ষড়দর্শনসমুচ্চয়ে, তাহার টীকাদ্বয়ে, এবং সংক্ষেপ শঙ্করজয়ে এইরূপ বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বাক্য রহিল কেন? এসকল অতি গুরুতর কথা। বঙ্গীয় পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি এইসকল বিষয়ে আকৃষ্ট করিবার জন্যই এত কথা লিখিলাম।

অর্থ।

এখন প্রমেয়গুলির পরিচয় দিতেছি। আত্মা, শরীর ও ইন্দ্রিয় কি তাহা সকলের মোটামুটি জানা আছে। অর্থ-শব্দে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ বুঝায়। ইহারা যথাক্রমে পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের গুণ, এবং নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্‌ ও কর্ণ দ্বারা ইহাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

বুদ্ধি।

বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান শব্দ একার্থ বাচক। সাঙ্খ্যেরা বুদ্ধি বলিয়া একটী (অন্তঃ—) করণ স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে বুদ্ধি দ্রব্যপদার্থ। নৈয়ায়িকের মতে বুদ্ধি দ্রব্য নহে, উহা গুণ।

শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ।

বিরহাতঙ্ক

(লখিমা দেবী)

মৃণাল ভাঙিয়া করিতে ভোজন
জ্যোৎস্না ভাবিয়া শিহরি উঠে!
তৃষিত সে, তবু, তারকা ভাবিয়া
না ছোঁয় সলিল পত্রপুটে!
নিশি না আসিতে দেখে সে আঁধার
কমলে নিরখি' ভ্রমর-বীথি!
দিবসে করিল দুখ-শর্ব্বরী
চক্রবাকের বিরহ-ভীতি!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

হেমকণা

(২)

সূর্য্যোত্তাপে কঠিন তুষাররাশি যখন গলিতে আরম্ভ হইল তখন আমাদিগের তুষারকণায় পরিণত জলকণাও গলিয়া স্রোতে মিশ্রিত হইল। পর্ব্বতশীর্ষ হইতে নিম্নাভিমুখে ধাবমান জলস্রোতের বেগে আকাশস্পর্শী শুভ্র তুষারস্তম্ভ চূর্ণীকৃত হইল। রাশি রাশি চূর্ণ তুষারের সহিত শত শত বজ্রপাতের ন্যায় আকাশভেদী শব্দের মধ্যে আমরা নিম্নাভিমুখে পতিত হইলাম। পতনের সময়ে পর্ব্বতের সানুদেশে চূর্ণ তুষারের লক্ষ লক্ষ কণা উল্লম্ফনে শত শত তুষারউৎসের সৃষ্টি হইয়াছিল। সূর্য্যালোক উৎসরাশির উপর পতিত হইয়া শত শত ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করিয়াছিল। পতনকালে আমি যে পাষাণখণ্ডে আবদ্ধ ছিলাম তাহা অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শিলাখণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, শ্বেত তুষারউৎসসমূহের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য একটী ধূসর বর্ণের উৎস দৃষ্ট হইয়াছিল, ক্ষণেকের জন্য আমি মেঘমধ্যস্থ তারকার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিলাম, কারণ শৈলনিগড়মুক্ত হইয়া আমি উৎসের বালুকারাশির মধ্যে সূর্য্যালোকে পতিত হইয়াছিলাম এবং হেমাভ আলোক আমার মসৃণ হেমগাত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। মুক্ত হইয়া স্রোতস্বিনীবক্ষে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছিলাম; তদ্ব্যতীত আমার গত্যন্তরও বোধ হয় ছিলনা। কিয়দ্দূরে সমগ্র তুষাররাশি শীতল জলে পরিণত হইয়াছিল, স্বচ্ছ সলিলরাশি অতি দ্রুতবেগে রাশি রাশি পাষাণ ধৌত করিয়া নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। প্রবল স্রোতের তাড়নে বালুকা-কণাটী পর্য্যন্ত নদীগর্ভে স্থান পাইতেছিলনা। নদীর উভয় কূলেই গভীর বন, দীর্ঘ দীর্ঘ তরুরাজি মস্তক উন্নত করিয়া আকাশ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতে-ছিল, দূরে নীলাভ গিরিরাজি যতদূর দৃষ্টি ধাবিত হয় ততদূর পর্য্যন্ত সমান্তরালে বিস্তৃত ছিল, জলমগ্ন পাষাণখণ্ডের আঘাতে নদীবক্ষে শত শত ক্ষুদ্র তরঙ্গের উৎপত্তি হইতেছিল ও উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মিগুলি তাহার উপর ক্রীড়া করিতেছিল। এইরূপে নদীবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে

নিম্নাভিমুখে যাইতেছিলাম, ক্রমে সূর্য্যরশ্মিগুলি ক্ষীণশক্তি হইয়া আসিতেছিল, দূরে ধূসরবর্ণ কুজ্ঝটিকা পর্ব্বতমালাকে আচ্ছন্ন করিতেছিল, বনমধ্যে অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিল। জলকণার কাছে শুনিয়াছিলাম এইরূপে দিবস অতীত হইয়া রাত্রি আসিয়া থাকে, অনুমানে বুঝিলাম অন্ধকার আসিতেছে, শীঘ্রই দৃশ্যমান জগতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। নিমেষের মধ্যে নদীবক্ষস্থিত সুবর্ণরঞ্জিত তরঙ্গগুলি নীল হইয়া গেল; উভয়কূলবর্ত্তী বনরাজি গাঢ় কালিমায় আবৃত হইয়া গেল, আলোক ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে হইতে পরিশেষে হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তখনও নদীর জলরাশি সমভাবে ছুটিতেছিল; আমি ভাবিয়াছিলাম পথ তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়া জলরাশি স্তম্ভিত হইয়া আলোকের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিবে, কিন্তু তাহাব পরিবর্ত্তে মৃদু মধুর ধ্বনি করিতে করিতে সমভাবে জলস্রোত নিম্নাভিমুখে চলিল। তখন শীতল নৈশবায়ু দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইতেছিল ও বায়ুচালিত বনানী ঈষৎ শব্দায়মান হইতেছিল। সমভাবে নদীবক্ষে চলিতেছিলাম, ক্রমে স্রোত মন্দীভূত হইতেছিল. জলের শীতলতার হ্রাস হইতেছিল। বহুদূরে পর্ব্বতশীর্ষে ক্ষীণ আলোক দৃষ্ট হইল, ধূসরবর্ণ মেঘ ও কুজ্ঝটিকার মধ্যে ক্ষীণ শুভ্রবর্ণ আলোকের রেখামাত্র দৃষ্ট হইল, ধূসরবর্ণ আবরণ মুক্ত হইয়া গিরিশৃঙ্গগুলি নীলাভ হইয়া উঠিল। উপত্যকার অপরপ্রান্তে নীলাকাশে রমণীর কেশদামে জড়িত মণিমালাব ন্যায় তারকাপুঞ্জ শোভা পাইতেছিল, বনমধ্যে তরুশীর্ষে ধূসরবর্ণ কুজ্ঝটিকা ক্রমে তুষারশুভ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, বিহঙ্গমকুল উল্লাসে নানাবিধ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল, শুভ্র স্বচ্ছ আলোক রজনীর অন্ধকার ধৌত করিয়া ফেলিতে লাগিল, নদীর জল পুনরায় স্বচ্ছ হইয়া উঠিল, দেখিতে পাইলাম নদীবক্ষ ক্ষুদ্র বৃহৎ উপলখণ্ডে আচ্ছন্ন ও স্থানে স্থানে শুভ্র ধূসর বালুকাক্ষেত্রে আবৃত। দূরস্থিত গিরিশীর্ষ হঠাৎ উজ্জ্বলবর্ণ হইয়া উঠিল, দ্রুতবেগে একটি সূর্য্যরশ্মি আসিয়া তরুশীর্ষসমূহ কাঞ্চনবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিল, রজনীর শিশিররাশি সহস্র সহস্র শুভ্র মুক্তার ন্যায় শ্যামলপত্ররাশিতে সঞ্চিত ছিল, সূর্য্যালোক আসিয়া তাহাদিগকে সহস্রবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিল। একটীর পর দুইটী করিয়া এইরূপে সহস্র সহস্র কোটি কোটী সূর্য্যরশ্মি আসিয়া শুভ্র শ্যামল ও ধূসরবর্ণ জগতকে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিল, স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ সলিল হঠাৎ গলিত সুবর্ণের ধারায় পরিণত হইল। নদীর বেগ মন্দীভূত হইয়াছে, ধীরে ধীরে জলরাশি বালুকাস্তরের উপর বহিয়া চলিয়াছে, উভয় কূলে বহুদূর পর্য্যন্ত ধূসর বালুকাস্তর ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, উপকূলবর্ত্তী বনরাজি বহুদূরে পড়িয়াছে, গিরিরাজি আরও দূর-জগতের প্রান্তে ক্ষুদ্র নীল রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। শত শত হেমকণা নদীগর্ভে উপলখণ্ডের পার্শ্বে বা বালুকামধ্যে আশ্রয়লাভ করিতেছিল, আমিও ভাবিতেছিলাম বহুদূর পর্য্যটন করিয়া দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম আবশ্যক। আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন স্রোতস্বিনী আমাকে দূরে নিক্ষেপ করিল, বায়ুর তাড়নে কয়েকটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ একত্রিত হইয়া আমাকে শীর্ষে লইয়া বালুকাস্তরের উপর লম্ফ প্রদান করিল, আমি বালুকাক্ষেত্রে আশ্রয়গ্রহণ করিলাম, জলরাশি পলায়ন করিল, আর্দ্র বালুকাসৈকত আমার বাসভূমি হইল।

বালুকাসৈকতে কতদিন অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, দিনের পর দিন আসিত, শুভ্র বালুকাক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া সময় অতিবাহিত করিতাম। বালুকাক্ষেত্রে আমার ন্যায় শত শত হেমকণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, সূর্য্যকিরণ আসিয়া যখন বালুকাক্ষেত্র আলোকিত করিত তখন হেমকণাগুলি প্রজ্জলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, বালুকাক্ষেত্রখানি কোন বরবর্ণিনীর সুবর্ণখচিত শুভ্র কাষায় বস্ত্রের ন্যায় নদীবেলায় বিস্তৃত ছিল। কখনও কখনও দুষ্ট বালকের ন্যায় বায়ু আসিয়া বালুকাকণাগুলির কর্ণে কি অদ্ভুত মন্ত্র প্রদান করিত, তাহার বলে সমগ্র বালুকাক্ষেত্র উন্মত্ত হইয়া উঠিত ও তাণ্ডব নৃত্যে ক্ষুদ্র উপত্যকার শান্তিভঙ্গ করিত, বায়ু ঈষৎ হাস্য করিয়া সরিয়া যাইত, তখন হতাশভাবে বলুকাকণাগুলি ভূপৃষ্ঠে পতিত হইত। কোন কোন দিন মৃগযূথ রজনীযোগে জলপান করিতে আসিত, সন্ধ্যার শীতলতায় প্রফুল্ল হইয়া শুভ্র বালুকাক্ষেত্রে মৃগশিশুগণ উল্লাসে নৃত্য করিত, তখন

বালুকাকণাগুলি তাহাদিগের পদক্ষুণ্ণ হইয়া বড়ই লাঞ্ছিত হইত। কোন কোন গভীর নিশীথে সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকগণ ধীরে ধীরে আসিয়া জলপান করিয়া যাইত, পরদিন মৃগযূথ তাহাদিগের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া দূরে পলায়ন করিত।

একদিন প্রভাতে গৌরবর্ণ খর্ব্বাকৃতি মৃগচর্ম্মাচ্ছাদিত মনুষ্যদ্বয় বনমধ্য হইতে বালুকাক্ষেত্রে আসিল, তখন উজ্জ্বল সূর্য্যালোক হেমকণাগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা দেখিয়া মহানন্দে একজন অপরকে কহিল "পাইয়াছি," দ্বিতীয় মনুষ্যও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া মস্তকচালনা করিল। উভয়ে আসিয়া নদীজলসিক্ত বালুকাক্ষেত্রে পৃষ্ঠস্থিত মৃগচর্ম্ম উন্মোচন করিল ও বেতস নির্ম্মিত পাত্রে বালুকারাশি গ্রহণ করিয়া নদীজলে ধৌত করিতে লাগিল ও ক্ষিপ্রহস্তে কণ্টকাকার ধাতুনির্ম্মিত শলাকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া বালুকামধ্যস্থিত হেমকণাগুলি চর্ম্মনির্ম্মিত আধারে সঞ্চয় করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা দিবস অতিবাহিত করিল। সন্ধ্যা আগত হইলে বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বৃক্ষতলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিল ও শিশিরসিক্ত শষ্পশয্যায় রজনী যাপন করিল। পরদিন মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত হেমকণা আহরণ করিয়া নিজ নিজ চর্ম্মপেটিকা পূর্ণ করিল, তাহার মধ্যে আমিও বদ্ধ হইলাম। আমার সহিত একটি পাষাণখণ্ডে আবদ্ধ বহু হেমকণা মনুষ্যদ্বয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। পরে চর্ম্মাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহারা নদীর শীতলজলে অবগাহন করিল, বেতস পাত্রদ্বয় ধৌত করিল ও নিজ নিজ চর্ম্ম পরিধান করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। বনমধ্যে বহুদূর গমন করিয়া সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইল। পথিমধ্যে তাহারা দেখিতে পাইল একটি হরিণী তাহার শাবকদ্বয় লইয়া নদীতীরে আসিতেছে। তন্মধ্যে একটি শাবক মনুষ্যদ্বয়কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শরে নিহত হইল, হরিণী অপর শাবক লইয়া দ্রুত পলায়ন করিল। তখন মনুষ্যদ্বয় একটি বৃক্ষ হইতে দীর্ঘ শাখা ছেদন করিয়া নিহত হরিণশিশুকে তাহাতে আবদ্ধ করিল ও উভয়ে তাহাকে বহন করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইল ও একটী বৃহৎগুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। গুহার দ্বারে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া নিহত হরিণশিশুর কিয়দংশ রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিল ও অগ্নির পার্শ্বে শয়ন করিয়া রজনী যাপন করিল। প্রভাতে আমাদিগকে লইয়া মনুষ্যদ্বয় পর্ব্বতে আরোহণ করিল ও সমস্ত দিবস পথ চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পর্ব্বতের অধিত্যকায় তাহাদিগের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। পর্ব্বতের অধিত্যকায় বৃহৎবৃক্ষসমূহের ছায়ায় পাষাণখণ্ড ও কাষ্ঠনির্ম্মিত কয়েকখানি ক্ষুদ্র কুটীর দেখিতে পাইলাম। গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া মনুষ্যদ্বয় হরিণশিশু দ্বিখণ্ড করিয়া লইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল ও যে মনুষ্য আমাকে অধিকার করিয়াছিল সে তাহার বাসস্থানে প্রবেশ করিল। গৃহমধ্যে তাহার স্ত্রী ও দুই তিনটি বালক বালিকা উপবেশন করিয়া ছিল, তাহারা গৃহস্বামীকে দেখিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। বালকবালিকারা পিতার পৃষ্ঠস্থিত ধনুর্ব্বাণ, চর্ম্ম ও নিহত মৃগশিশুর অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে রক্ষা করিল, গৃহস্বামী কটীদেশ হইতে হেমকণাপূর্ণ চর্ম্মপাত্র গ্রহণ করিয়া তাহার স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিল। তাহাদিগের কথোপকথনে বুঝিলাম গৃহস্বামী পূর্ব্ব বৎসর মৃগ অন্বেষণে গমনকালে নদীতীরে বালুকাক্ষেত্রে বহু সুবর্ণকণা দেখিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু পরে অনুসন্ধান করিয়া স্থান নির্ণয় করিতে পারে নাই। মৃগয়া ও সুবর্ণসঞ্চয় তাহাদিগের গ্রামস্থ সকলের একমাত্র উপজীবিকা। পূর্ব্ব বৎসরে গৃহস্বামী আবশ্যকমত সুবর্ণকণা সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহারা আবশ্যকমত তণ্ডুল, লবণ ও কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র ক্রয় করিতে পারে নাই। শীতকালে মৃগয়ালব্ধ মাংসে জীবনধারণ করিয়াছে, মৃগচর্ম্মে দেহ আচ্ছাদিত করিয়াছে ও বহুকাল লবণ আস্বাদন করে নাই। তাহারা তৎক্ষণাৎ স্থির করিল পরদিন গৃহস্বামী সংগৃহীত সুবর্ণ লইয়া দূরে উপত্যকায় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যাইবে। স্ত্রী আহার্য্য প্রস্তুত করিল, সকলেই একাসনে একপাত্র হইতে আহার করিল ও গৃহমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সুষুপ্তিমগ্ন হইল। পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গৃহস্বামী পরিবারবর্গের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিতে লাগিল ও তৃতীয় প্রহরে পর্ব্বতপাদমূলস্থিত এক বৃহত্তর গ্রামে উপস্থিত হইল। সেই গ্রাম

হইতেও বহু খর্ব্বাকৃতি মনুষ্য পণ্য বিনিময়ের জন্য উপত্যকাস্থিত বিপণিসমূহে গমন করিতেছিল, কেহ সুবর্ণকণা, কেহ গজদন্ত, কেহ মৃগচর্ম্ম, কেহ বা গন্ধদারু পৃষ্ঠে লইয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিতেছিল। আমার অধিকারী তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া গমন করিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পর্ব্বতের পাদমূলস্থিত অরণ্যপ্রান্তে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সকলে রজনী যাপন করিল ও প্রভাতে যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নে অরণ্যের অপর প্রান্তে নদীতীরে একখানি ক্ষুদ্রগ্রামে উপস্থিত হইল। বক্রগতি নদীতীরে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহের ছায়ায় বৃক্ষশাখা ও শুষ্ক তৃণের সাহায্যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তরুতলে পরিষ্কৃত ভূখণ্ডে চারি পাঁচখানি বিপণি বসিয়াছে। কোন বিপণিতে তণ্ডুল, লবণ, তৈল, ঘৃত ও শর্করা, কোন বিপণিতে নানাবর্ণে রঞ্জিত রাশি রাশি কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র এবং একটি বিপণিতে উজ্জ্বল লৌহ-নির্ম্মিত নানাপ্রকার অস্ত্র বিক্রীত হইতেছিল। আমার অধিকারী নীল ও রক্তবর্ণ কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রখণ্ডের পরিবর্ত্তে বিক্রেতাকে একমুষ্টি সুবর্ণ প্রদান করিলে বিক্রেতা সুবর্ণমুষ্টি গ্রহণ করিয়া পিত্তলনির্ম্মিত তুলাদণ্ডে পরিমাণ নির্ণয় করিয়া আমাদিগকে তাহার কটিদেশস্থ ক্ষুদ্র চর্ম্মপেটিকায় নিক্ষেপ করিল ও আমার ভূতপূর্ব্ব অধিকারীকে তাহার অভীপ্সিত বস্ত্রখণ্ডগুলি প্রদান করিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখিলাম দলে দলে পর্ব্বতবাসিগণ বিপণিসমূহে আসিয়া বহুআয়াসলব্ধ সুবর্ণকণা, গজদন্ত, মৃগচর্ম্ম ও চন্দন প্রভৃতি গন্ধকাষ্ঠের বিনিময়ে তাহাদিগের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া গেল এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিপণিসমূহের দ্রব্যাদি নিঃশেষিত হইল। বিক্রেতাগণ বিনিময়ে সংগৃহীত দ্রব্যাদি নিজ নিজ পর্ণকুটীরে রক্ষা করিয়া রজনীতে বিশ্রাম-লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল, ক্রেতাগণও বৃক্ষতলে তাহাদিগের পার্ব্বত্য রীতি অনুসারে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহার পার্শ্বে নিদ্রিত হইল। প্রভাতে বণিকগণ অশ্ব ও উষ্ট্র ও বলীবর্দ্দসমূহের পৃষ্ঠে বিনিময়লব্ধ দ্রব্যাদি স্থাপন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল ও পার্ব্বতীয়গণ ক্রীত দ্রব্যাদি পৃষ্ঠে বহন করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। যিনি আমাকে বস্ত্রবিনিময়ে লাভ করিয়া-ছিলেন, তিনি স্বীয় বাসস্থান হইতে তিনটি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে স্বীয় পণ্য লইয়া আসিয়াছিলন। তাঁহার সমুদয় পণ্য বিক্রীত হওয়ায় উষ্ট্রত্রয় শূন্যপৃষ্ঠে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল। একদিন বিশ্রামলাভ করিয়া ও বনমধ্যে যথেচ্ছা আহারলাভ করিয়া উষ্ট্রত্রয় সুদীর্ঘ পাদক্ষেপে ভারবাহী অপরাপর পশুগণকে পশ্চাতে রাখিয়া অপরাহ্নে আমার নূতন অধিকারীর বাসস্থানে উপস্থিত হইল। তাঁহার বাসস্থান গ্রামে নহে, নগরে। দূর হইতে রক্তবর্ণ প্রাচীরবেষ্টিত শুভ্রহর্ম্ম্যাদি-শোভিত নগর রক্তবস্ত্র-পরিহিতা সুন্দরী কামিনীর ন্যায় অপরাহ্নের ক্ষীণ সূর্য্যালোকে শোভা পাইতেছিল। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম পাষাণ-আচ্ছা-দিত পথ নগরের সম্মুখে পাষাণনির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া রক্তবর্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত অন্ধকার গহ্বরবিশেষে প্রবেশ করিয়াছে। নগরপ্রাচীরের বহির্দ্দেশ বেষ্টন করিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়াছে, পরে শুনিয়াছি তাহার নাম পরিখা। এই পরিখার উপরে পাষাণনির্ম্মিত সেতু ও তাহার পরপারে রক্তবর্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত অত্যুচ্চ অন্ধকার গহ্বরবিশেষ, তাহার নাম নগরতোরণ। তোরণের বহির্দ্দেশে উজ্জ্বললৌহে আচ্ছাদিত বহু অস্ত্রধারী মনুষ্য দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত ছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন নূতন অধিকারীকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইতে বুঝিলাম যে, নগরতোরণে প্রবিষ্ট হইতে হইলে পরিচয় দিয়া অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। উষ্ট্রত্রয় তোরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, দেখিলাম তোরণ মধ্যে ভীষণ অন্ধকার ও তোরণের উভয়পার্শ্বে লৌহনির্ম্মিত সুদৃঢ় দ্বার। বহির্দ্দেশে আসিয়া দেখিলাম পথ উভয়পার্শ্বে প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্য দিয়া দ্বিতীয় তোরণে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার সম্মুখেও কয়েকজন অস্ত্রধারী রক্ষী দণ্ডায়মান ছিল, তাহারাও পূর্ব্ববিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিল। দ্বিতীয় তোরণ অতিক্রম করিয়া উষ্ট্রত্রয় নগরে প্রবেশ করিল। নগর মধ্যে পাষাণাচ্ছাদিত সরল রাজপথ দৃষ্টির সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহার উভয়পার্শ্বে গগনস্পর্শী অট্টালিকাসমূহ। প্রতিগৃহের নিম্নতলে আলোক-মালায় সজ্জিত বিপণিসমূহ। দলে দলে স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় মনুষ্যসমূহ ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে, গো, অশ্ব ও

উষ্ট্রবাহিত রথ ও শকটসমূহ দ্রুতবেগে চালিত হইতেছে। এই রাজপথের কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়া উষ্ট্রত্রয় একটী সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় পথের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ও কিয়ৎক্ষণ পরে একটি নাতিক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ গৃহের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল। জনৈক পরিচালক আসিয়া উষ্ট্রত্রয়ের বল্গাধারণ করিল, আমাদিগের নূতন স্বামী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রথম গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়া একটি ক্ষুদ্র লৌহনির্ম্মিত পেটিকা উন্মুক্ত করিয়া কটিবদ্ধ চর্ম্মপেটিকার সহিত আমাদিগকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। পুনরায় গভীর অন্ধকার মধ্যে পতিত হইলাম, অনুভবে বুঝিলাম সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু চর্ম্মপেটিকা আবদ্ধ আছে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নষ্টোদ্ধার

(ফ্রাঁসোয়া কপ্‌পে লিখিত 'ল্য-আঁফাঁ প্যারদি' নামক মূল ফরাসী গল্প অনুসরণে)

১

খ্রীষ্টমাসের আগের দিন সকালবেলা দুইটি অসাধারণ ঘটনা একই সঙ্গে ঘটিয়াছিল—সূর্য্যদেব আর ম্যস্‌সিয় জঁা-বাপ্তিস্ত গোদফ্রয় সকালবেলাই উঠিয়াছিলেন।

নিঃসন্দেহ, ভরা শীতের মাঝখানে, পনরদিনের কোয়াসা আর মেঘলা আকাশ ঝাঁটাইয়া যখন সৌভাগ্যক্রমে উত্তুরে বাতাস বহিয়া দিনটিকে শুক্‌না ও স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছিল তখন সূর্য্যদেবকে অকস্মাৎ তাঁহার তপ্ত রক্তরাগে পুরাতন বন্ধুর মতো প্রাভাতিক প্যারীশহরকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া সকলেই খুসি হইয়া উঠিয়াছিল। সূর্য্যদেব হাজার হোক বড় কেউ-কেটা ত নহেন—তিনি দেবতা বলিয়া বহুকাল হইতেই পূজা পাইয়া আসিতেছেন। এ দিকে ম্যস্‌সিয় জঁা-বাপ্তিস্ত গোদফ্রয়, তিনিও বড় কেউ কেটা লোক ছিলেন না—তিনি ধনবান মহাজন, সরকারী সুদী কারবারের বড় সাহেব, অনেক কোম্পানির ডিরেক্‌টার, কত সভা সমিতির মেম্বর, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনি বরং সূর্য্যদেবের চেয়েও একগুণ সেরা—সূর্য্যদেবকে তাঁহার উদয়কালের নির্দ্দিষ্ট সময়ে আকাশে দেখা আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, কিন্তু সেই সময় ম্যস্‌সিয় গোদফ্রয়ের জাগরণ নিতান্তই আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে সেই দিন সকালবেলা পৌনে আটটার কাছাকাছি শ্রীযুক্ত সূর্য্যদেব আর শ্রীযুক্ত গোদফ্রয় এক সঙ্গেই উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু এই লক্ষ্মীর বরপুত্রটির জাগরণ সূর্য্যদেবের জাগরণ হইতে ভিন্ন ধরণের হইয়াছিল। সেই চিরন্তনকালের অতিপুরাতন তবু লোকপ্রিয় সূর্য্য উদয়মাত্রেই যাদুকরের মতো চারিদিকে মায়ার খেলা জুড়িয়া দিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ঝুরো চিনির মতো চূর্ণ তুষার পল্লবহীন বৃক্ষগুলিকে ঢাকিয়া চিনির খেলনার মতো সাজাইয়া রাখিয়াছিল; যাদুকর সূর্য্য উদয় হইবামাত্র সেগুলিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাপী প্রবালের তোড়া করিয়া তুলিল। এই ইন্দ্রজাল রচনা করিতে গিয়া সূর্য্য তাহার তৃপ্তিপ্রদ তপ্ত কিরণ প্রাভাতিক পথিকদের গায়ে অপক্ষপাতে ঢালিয়া ঢালিয়া দিতেছিল। তাহার হাসি জামাজোড়া-আঁটা আপিসযাত্রী বড় সাহেবের প্রতি, কম্পিতকলেবর কেরাণীর প্রতি, ছিন্নচীর দিনমজুরের প্রতি, ট্রামগাড়ীর ক্লান্ত কণ্ডাক্‌টারের প্রতি, কিংবা নিজে শীতে কাঁপিয়া পরকে গরম করিতে অভিলাষী গরম গরম চীনেবাদামওয়ালার প্রতি সমভাবেই বর্ষিত হইতেছিল। তাহার হাসিতে বিশ্বজগৎ খুসি হইয়া উঠিয়াছিল। অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত গোদফ্রয়ের যে জাগরণ সে শুধু অসন্তোষ আর ফসাদে ভরা। রাত্রে তিনি কৃষিসচীবের প্রাসাদে ভোজের নিমন্ত্রণে সুরু হইতে পায়েস পর্য্যন্ত চাখিয়া আসিয়াছেন, সেসব এখন সাতচল্লিশ বছরের পুরাতন পাকস্থলীতে হুলস্থূল বাধাইয়া তুলিয়াছে; অম্বলে আর বুকজ্বালায় তাঁহার মেজাজটাও জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত গোদফ্রয় যে ধরণে ডাকঘণ্টার দড়ি টানিলেন, তাহা শুনিয়াই তাঁহার খাস খানসামা শার্ল তাঁহার দাড়ি কামাইবার গরম জল তাড়াতাড়ি লইয়া যাইতে যাইতে রান্নাঘরের ঝিকে চোক ঠারিয়া বলিয়া গেল—"হাঁ হাঁ!... বাঁদরটা আজ সকালবেলাই মারমার করতে করতে উঠেছে...ওলো গ্যারত্রিদ্, হাঁ করে আর ভাবছিস্ কি, আজকে কপালে অনেক দুঃখু অনেক ভোগান্তি আছে।..."

শার্ল ঘরের চৌকাঠের নিকট পৌঁছিয়া ভালো মানুষটির মতো পরম নম্রতায় দৃষ্টি নত করিল, এবং সসম্ভ্রমে মুনিবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া জানালার পর্দাগুলি একে একে খুলিয়া দিল, আগুন জালিল এবং মুনিবের প্রসাধনের সকল আয়োজন এমন শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে করিতে লাগিল যেন মন্দিরের পূজারী ঠাকুরপূজার জো করিতেছে।

গোদফ্রয় কোটের বোতাম লাগাইতে লাগাইতে কড়া মেজাজে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কটা বেজেছে রে ?"

শার্ল উত্তর করিল—"আজ্ঞে আজ বড় শীত। ছ'টার সময় ত কনকনে ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু এখন হুজুর আকাশ সাফ হয়ে রোদ্দ্,র উঠেছে, আজকের দিনটা সুভালাভালি কেটে যাবে বোধ হয়।"

গোদফ্রয় ক্ষুর শানাইতে শানাইতে জানালার কাছে উঠিয়া গিয়া পর্দা সরাইয়া দেখিলেন, পথচত্বর আলোয় স্নান করিয়া উঠিয়াছে, বরফের উপর মিঠে রৌদ্র তরুণীর অধরে স্মিত হাস্যের মতো দেখাইতেছে। ও হরি, সত্যই ত !

মানুষ যতই কেন দেমাকী আর চালদুরুস্ত হোক না, চাকরবাকরের সামনে কোনো রকম ভাবের আতিশয্য প্রকাশ করা যতই কেন বে-আদবী লাগুক না, ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি সূর্য্যমুখ দেখিয়া মনের আনন্দ চাপিয়া রাখিবার শক্তি খুব অল্প লোকেরই থাকে। গোদফ্রয় তাই অনুগ্রহ করিয়া আজ একটু হাসিলেন। বদ্ধজলে বায়ুস্পর্শে কুঞ্চনের মতো সেই হাসিটুকু আর কাহারো মুখে দেখিলে তিনি নিশ্চয়ই খুব স্তম্ভিত হইতেন। যাহোক তবু তিনি হাসিয়াছিলেন; এবং একমিনিটের জন্যও তিনি তাঁহার আপিস আদালত কার-কারবার সব ভুলিয়া বালকের ন্যায় অবাক প্রসন্ন মুখে দেখিতে লাগিলেন সকল পথচারী লোক ও গাড়ীঘোড়া সোনালি কোয়াসার ভিতর দিয়া কেমন আনন্দে আনাগোনা করিতেছে।

কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এ ভাব তাঁহার এক মিনিটের বেশি টিঁকিতে পারে নাই। সূর্য্যের মতো শুভ্র কিরণের দন্তবিকাশ করিয়া হাসা শোভা পায় তাহাদের যাহারা নিষ্কর্ম্মা ফাজিল,—শোভা পায় স্ত্রীলোকের, শিশুর, ছোটলোকের, আর কবির। শ্রীযুক্ত গোদফ্রয়ের কি হাসিবার অবসর আছে, বিশেষ ত আজকার দিন তাঁহার কাজের ভিড় বিস্তর আর গুরু। সাড়ে আটটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত তাঁহাকে সমাগত বহু ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশেষ জরুরি কারবারী পরামর্শ করিতে হইবে—যাঁহারা আসিবেন তাঁহারাও বড় কেউকেটা লোক নন, তাঁহারাও হাসেন না, তাঁহাদেরও একমাত্র চিন্তা শুধু টাকা আর টাকা। আহারের পরই তাঁহাকে আবার গাড়ী করিয়া অনেক মহাশয় ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অনেক কথা পাকা করিয়া আসিতে হইবে,—তাঁহারাও তাঁহারই মতন মহাজন, কাহারো সহিত সরস্বতীর সদ্ভাব নাই, সকলের সেই একই ধান্দা লক্ষ্মী ঠাকরুণের প্রসন্নতা। সেখান হইতে একমিনিটও লোকসান করিবার যো নাই, শ্রীযুক্ত গোদফ্রয়কে আপিসে গিয়া সবুজ-বনাত-মোড়া বড় বড় দোয়াত-ভরা টেবিলে গিয়া বিরাজ করিতে হইবে, সেখানে আবার আরএকদল নূতন মহাজনের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে সেই একই গুরু বিষয়ে—টাকা রোজগার, অর্থসঞ্চয়, লক্ষ্মীলাভ। তাহার পর খুব সম্ভব তাঁহাকে তিন চারটা কমিশনে বাহির হইয়া এমন সব লোকের সংসর্গে থাকিতে হইবে যাহারা অর্থ-উপার্জ্জনের অতি তুচ্ছ সুযোগটিও ছাড়ে না অথচ ফ্রান্সের গর্ব্বগৌরবের আলোচনায় অনুগ্রহ করিয়া ঘণ্টাখানেক সময় অপব্যয় করিবার উদারতাও যাহাদের আছে। নিত্য ক্ষৌরী হইলেও গোদফ্রয় বরাবর এমন দুচারগাছা দাড়ির খোঁচ ছাড়িয়া দেন যে দেখিলে মনে হয় যেন রাঁধা শিককাবাবের উপর নুনমরিচের বুকনি ছড়ানো; তাহাতে তাঁহাকে চাষাড়ে মন্দ বা বড় জাতের বানরের মতন দেখায়। ক্ষৌরী হইয়া জোয়ান-বয়সীর ক্ষিপ্রগতিতে একটা প্রভাত-পরিচ্ছদ গায়ে টানিয়া তিনি আপনার আপিস-কামরায় নামিয়া গেলেন। সেখানে যাহারা সারবন্দি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের সকলেরই এক ধান্দা, নিজের পুঁজিটিকে পুঞ্জিত পুষ্ট করিয়া তোলা। ইহারা টাকা রোজগারের কত রকমের ফন্দি আঁটিয়া গোদফ্রয়ের পরামর্শ লইতে আসিয়াছেন;—কেহ চাহেন জনমানবশূন্য মরুভূমির উপর দিয়া একটা নূতন রেলপথ খুলিতে, কেহ চাহেন প্যারী শহরের

কাছাকাছি দেশটাতে কোথাও একটা প্রকাণ্ড কারখানা খুলিতে, কেহ বা চাহেন দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দেশে একটা খনি খনন করিতে। গোদক্রয় গম্ভীর হইয়া সব শুনিলেন; কিন্তু তিনি এক মুহূর্ত্তও ইহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন না যে ভবিষ্য বেললাইনে বিশেষরকম প্যাসেঞ্জার বা মাল বহনের সম্ভাবনা আছে কি না, কারখানায় চিনি না সুতি টুপি তৈরি হইবে, এবং খনি হইতে খাঁটি সোনা অথবা রদি তামা উঠিবে। না, এসব বিষয়ে উচ্চবাচ্য নয়! কারবারীদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত গোদক্রয়ের যে কথাবার্ত্তা হইল তাহা শুধু তাঁহার দক্ষিণার দরদস্তর—তিনি যে এইসব কঠিন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আটদিন ধরিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ফন্দি ফিকির আবিষ্কার করিবেন তাহার জন্য তিনি এখন পাইবেন কি। এইসব অর্থলাভের নূতন পথের কল্পনা হয়ত নক্সার কাগজে কাগজ-চাপার তলে বা ফাইলের ফোঁড়ে চরম গতি লাভ করিবে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহার ফিয়ের টাকা ত মারা যাইতে পারে না।

ঠিক বেলা দশটা পর্য্যন্ত অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা চলিল; দশটা বাজিবা মাত্র সুদী কারবারের ম্যানেজার সাহেব সকলকে নির্ম্মম ভাবে বিদায় করিয়া দিয়া আপিসের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর খাবার-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত কাজই তাঁহার ঘড়িধরা, এক মিনিটের নড়চড় হইবার জো কি।

খাবার-ঘরখানি খুব জমকালো। টেবিলে দেরাজে যত সব রূপার বাসন সাজানো ছিল তাহা দিয়া একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা সহজেই হইতে পারে! অনেকখানি সোডা গিলিয়াও গোদক্রয়ের গলাজ্বালা কমে নাই, তাই তিনি অজীর্ণ রোগীর যোগ্য খাবার জোগাড় করিতে বলিয়াছিলেন। এই বাহুল্য আড়ম্বরের মধ্যে বসিয়া দুই শত টাকার মাহিনার বাবুর্চির পরিবেষণে তিনি আহার করিলেন বিরস বিষণ্ণ মুখে দুটি ডিম সিদ্ধ আর একখানি কাটলেট। তারপর সেই লক্ষ্মীমন্ত লোকটি চাখিলেন দুতিন পয়সা দামের একটু পনির।

এমন সময় ঘরের দরজা খুলিয়া হঠাৎ প্রবেশ করিল সুন্দর ও কৃশ নীল-মকমলের-পোষাকপরা পালক-ওলা টুপির তলে হাসিমুখে ডিরেক্‌টার সাহেবের চার বৎসরের শিশুপুত্র রাউল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জার্ম্মানী আয়া।

ইহা প্রতিদিন পৌনে এগারটার সময়কার নিয়মিত ঘটনা। তখন সাহেবের জুড়ি-জোতা ব্রুহাম গাড়ী গাড়ী-বারান্দায় অপেক্ষা করে, আর অসহিষ্ণু জুড়ি ঘোড়া পথের উপর খুর ঠুকিয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করিতে থাকে। মহামহিম লক্ষ্মীমন্ত মহাজন দশটা বাজিয়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট হইতে ঠিক এগারটা পর্য্যন্ত পুত্রের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া থাকেন, এর এক মিনিট বেশিও নয়, কমও নয়। বাৎসল্যের পরিতুষ্টির জন্য তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পনরটি মিনিট নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহার কারণ ইহা নহে যে তিনি পুত্রকে ভালো বাসেন না; তাহার মতন লোকে যতদূর পারে তিনি পুত্রকে ততদূরই ভালো বাসিতেন। কিন্তু ভালো বাসিলে কি হয়, কারবার! ...

বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি বেশ বৃদ্ধ এবং কতকটা জরাগ্রস্ত, তখন কেবলমাত্র ফ্যাশানের খাতিরে তিনি নিজেকে নিতান্তই প্রেমিক বলিয়া জাহির করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদেরই দলের লোক মার্ক ইস ব্ল্যাকস্তেনের কন্যার সহিত প্রেমে পড়িলেন। কন্যার পিতা ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও, বিষয়বুদ্ধিতে পরিপক্ব বলিয়া আপনার বিরক্তি তিনি বেমালুম চাপিয়া গেলেন; তিনি এই লক্ষ্মার বাহনটির শ্বশুর হইয়া উহাকে কৃতার্থ করিবেন এবং তাহার বিনিময়ে তাহাকে দিয়া নিজের ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবেন; তিনি যে বুড়ো জামাই করিতে রাজি হইবেন তাহার একটা প্রতিদান পাওয়া চাই ত। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই গোদক্রয় বিপত্নীক হইলেন এবং তাঁহার শিশু-পুত্র রাউলকে তিনি সসম্ভ্রমে সসম্মানে লালন করিতে লাগিলেন, কারণ সে যে বাঁচিলে একদিন লক্ষ লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারী হইবে! তাহাকে খাতির না করিবে কে? সোনার দোলনায় রাজপুত্রের হালে খোকা রাউল দিনে দিনে মানুষ হইতে লাগিল। কেবল তাহার বাবা কাজের ভিড়ে, কর্ত্তব্যের চাপে, লোকের জ্বালায় ছেলের চিন্তায় পনর মিনিটের বেশি ব্যয় করিতে পারিতেন না;

তারপর বাকি তেইশ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ছেলে থাকিত ঝি চাকরের জিম্মায়।

— সুপ্রভাত রাউল।

—ছুপ্ ভাত বাবা।

শ্রীযুক্ত গোদফ্রয় তাড়াতাড়ি হাতের তোয়ালে ফেলিয়া পুত্রকে কোলে তুলিয়া বাম উরুর উপর বসাইলেন এবং আপনার প্রকাণ্ড থাবার মধ্যে শিশুর কচি ক্ষুদে হাতখানি ধরিয়া তাহাকে বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সত্যসত্যই তখন সেই সুদী কারবারের মহাজন ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে শতকরা তিন টাকা সুদের কোম্পানির কাগজের দর সেদিন পঁচিশ পয়সা চড়িয়াছে, কিংবা এখনি তাঁহাকে শম্পহরিৎ টেবিলের উপর কোলা ব্যাঙের মতো দোয়াতের কালি ছড়াইয়া কোম্পানির কাগজের সুদের হিসাব কষিতে হইবে।

—বাবা, কালকে ত বড় দিন? ... কালকে বড়দিন বুড়ো আমাকে কি খেলনা এনে দেবে বাবা?

বুড়া বাবা বুড়া বড়দিনের বদলে একটু ভাবিয়া বলিলেন—হুঁ, দেবে বৈ কি ... খেলনা ... আচ্ছা তুমি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকলেই পাবে।

বুড়া আপনার হাজার-মহলা স্মৃতির একটা কোঠায় টুকিয়া রাখিলেন খোকার জন্য বাজার হইতে খেলনা কিনিতে হইবে। তারপর জার্ম্মানী ধাইয়ের দিকে ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা মাদ্‌মোয়াজেল্ ব্যার্ত্তা, রাউলের ওপর তুমি খুসি আছ ত?

জার্ম্মানী ঈষৎ হাসিয়া আপনার খুসি জানাইয়া খোকার বাপের কৌতূহল একেবারে শান্ত করিয়া দিল।

মহাজন বলিলেন—আজকে বড় খাসা দিনটি, না? কিন্তু বড় শীত। যদি তুমি রাউলকে নিয়ে কোম্পানির বাগানে বেড়াতে যাও, তা হলে আজ বেশ হয়, না ব্যার্ত্তা? কিন্তু খবরদার, খুব ঢেকেঢুকে নিয়ে যেয়ো, বুঝলে?

আয়া শুধু একবার ঘাড় নাড়িয়া মুনিবকে নিশ্চিন্ত করিয়া সকল উপদেশ পালন করিবার অঙ্গীকার করিলে শ্রীযুক্ত গোদফ্রয় শেষবার পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া টেবিল হইতে উঠিলেন—অমনি তাকের উপর ঘড়ীতে এগারটা বাজিতে সুরু করিল—এবং তিনি ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইতেই খানসামা শার্ল তাঁহার গায়ে ওভারকোট চাপাইয়া দিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর সেই নিমকের চাকর মাতাল-পাড়ার গলিতে মদের দোকানে প্রস্থান করিল—সেখানে আজ দোকানের সামনের ব্যারনের বাড়ীর চাকর বাকরদের আড্ডা জমিবার কথা আছে।

২

বাঁচিয়া সুস্থ থাকুক জরদা রঙের জুড়ি ঘোড়া, তাহাদের প্রসাদে সুদী কারবারের কর্ত্তার সকল কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে যথাসময়েই সম্পন্ন হইয়া গেল, কোথাও একটুও বিলম্ব ঘটিল না। মহাজনটোলা ঘুরিয়া তিনি দেশপতির নির্ব্বাচনে ভোট দিয়া ফ্রান্স তথা যুরোপকে আশ্বস্ত করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

পথে তাঁহার মনে পড়িল যে তিনি রাউলকে বলিয়া আসিয়াছেন যে বড়দিন বুড়ো তাহাকে খেলনা উপহার দিবে; তখন তিনি খেলনার দোকানে গাড়ী লইয়া যাইতে কোচমানকে আদেশ করিলেন। খেলনার দোকানে গিয়া তিনি দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া ছেলের জন্য সওদা করিলেন একটা কাঠের ঘোড়া চাকার উপর চড়ানো; এক বাক্স সীসার সৈন্য, সবগুলির চুল কালো আর নাকগুলি উল্টানো, যেন সব যমজ ভাই কিংবা রুষ রেজিমেণ্টের সৈন্য; এমনি আরো বিশ রকমের খেলনা, চকচকে আর চমৎকার। খেলনাগুলি গাড়ীতে তুলিয়া তিনি গাড়ীর গদিতে সুখাসীন হইয়া গতির তালে তালে নাচিতে নাচিতে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, পুত্রের ভাবী আনন্দের ছবি আঁকিয়া তাঁহার পিতৃহৃদয় বাৎসল্যের সুখে গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

খোকা বড় হইবে, রাজার হালে তাহার শিক্ষা সহবৎ হইবে, এবং একদিন সে বিশ, পঁচিশ, চাই কি, ত্রিশ লক্ষ টাকার মালিক হইয়া গ্যাঁট হইয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া বসিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইবে। রাষ্ট্রবিপ্লবের দৌলতে এখন টাকার সংখ্যাতেই খাতির, টাকার পরিমাণেই মানের মাপ, বংশের বড়াই একেবারে মাটি! রাউলের বাপ, সামান্য একজন পাড়াগেঁয়ে, সামান্য একজন মোক্তারের বেটা; রাউলের বাপ ছাত্রদের মেসে থাকিয়া

এককালে সাড়ে পাঁচ আনা রোজ হিসাবে খোরাকী দিয়া মানুষ; তাহার তখন না ছিল একটা ভালো পোষাক, না ছিল কিছু মান সম্ভ্রম। সেই লোক যদি অগাধ সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া থাকিতে পারে, প্রজাতন্ত্রের দৌলতে যদি সে রাজশক্তির ভাগ পাইতে পারে, অবশেষে যদি বিবাহে বড় ঘরানার মেয়ে পর্য্যন্ত জোগাড় করিতে পারে, তবে তাহার ছেলে রাউল, সে না পারিবে কি? শিশুকাল হইতেই যে রাজার হালে মানুষ, মাতৃবংশের দিক দিয়া যাহার শরীরে আভিজাত্যের গর্ব্বিত শোণিত প্রবাহিত, যাহার বুদ্ধি বিস্তা দুষ্প্রাপ্য পুষ্পের মতো চমৎকার হইবে, যে দোলনায় শুইয়াই বিদেশী ভাষায় তালিম হইতেছে, এক বৎসর পরেই যে পনি ঘোড়ায় সোয়ার হইবে, একদিন যে নিজের নামে মাতৃবংশের পদবী যোগ করিয়া হইবে শ্রীল শ্রীযুক্ত গোদক্রয় ম্যাফস্তেন, গোদক্রয় বংশের নামে এমন উপাধি যোগ, আহা সে কী উপাধি, একেবারে রাজকীয়, অতি প্রাচীন, একেবারে ক্রুজেডের গন্ধযুক্ত উপাধি যে যোগ করিবে, সেই রাউল না পারিবে কি? কী উজ্জ্বল তাহার ভবিষ্যৎ! কী আশাপ্রদ তাহার জীবনযাত্রা! ... সাধারণতন্ত্র ভালো বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ত বলা যায় না, আবার হয়ত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে; তখন আমার রাউল, না না, রাউল কেন, আমার গোদক্রয় ম্যাফস্তেন হয়ত রাজকন্যা বিবাহ করিবে, আর কে বলিতে পারে যে তখন আমার রাউল একেবারে রাজার সিংহাসন ঘেঁসিয়া না বসিবে, রাজপারিষদের উর্দ্দি সোনালি রূপালি জরির কাজ-করা কিংখাবের পোষাক তাহার গায়ে ঝলমল না করিবে; নিশ্চয় তাহার ফেটিং গাড়ীর হাতল হইবে সোনার, পা দান রূপার, আর থাকিবে সহিস কোচমানের পাগড়ীতে তকমা, বুকে চাপরাস, গাড়ীর গারে জমকালো মর্য্যাদাচিহ্ন।

হায় মূঢ় টাকার যক্ষ! আজ নিজের শিশুর আনন্দের জন্য যে শিশুর জন্ম-উৎসব-উপলক্ষে এত টাকার খেলনা কিনিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছ, সেই শিশু একদিন দীনহীন জনকজননীর ক্রোড়ে আস্তাবলের আবর্জ্জনার মধ্যে জন্মলাভ করিয়া জগৎকে আজ জয় করিয়াছে, সে কথা ত একবারও মনে পড়িল না! শুধু অর্থের চিন্তা, সম্পদের স্বপ্ন!

চিন্তায় বাধা দিয়া গাড়ী বাড়ীর গাড়ীবারান্দায় সিঁড়ির সামনে আসিয়া থামিল। গোদক্রয় সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে দেখিতে পাইলেন দালানে তাঁহার সমস্ত চাকর দাসী ভীতিপাংশুলমুখে তাঁহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং এক কোণে জার্ম্মানী আয়াটা জড়োসড় হইয়া পড়িয়া আছে। জার্ম্মানী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চীৎকার করিয়া দুই হাতে তাহার মুখ ঢাকিল, আঙুলের ফাঁক দিয়া তাহার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এইসব দেখিয়া শুনিয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় গোদক্রয়ের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

—কি রে?...ব্যাপার কি?...অ্যাঁ?...

খাস খানসামা শার্ল চোখে বেদনা ও মুখভাবে ভয় ভরিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—আজ্ঞে রাউল!...

—খোকা?

—আজ্ঞে হারিয়ে গেছে! এই নচ্ছার জার্ম্মানী মাগীই ত যত নষ্টের মূল! .. হারিয়ে গেছে বিকেল চারটের সময় থেকে ..

সৈন্যের বুকে গুলি লাগিলে সে যেমন কাঁপিতে কাঁপিতে হটিয়া যায়, ব্যথিত পিতাও তেমনি দুই পা হটিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং জার্ম্মানী তাঁহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া কেবলি আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিল—মাপ করুন! আমায় মাপ করুন!

সকল চাকরেরা একসঙ্গে গোলমাল করিয়া বলিতে লাগিল—এই মাগী কোম্পানির বাগানে যায়নি হুজুর! ও কি কোনো দিন রাউলকে আর কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায়? রোজ রোজ ঐ গুণ্ডাপাড়ায় যায়, সেখানে একটা লোকের সঙ্গে ওর ভাব আছে! কি সর্ব্বনাশ! কচি ছেলে নিয়ে গুণ্ডাপাড়ায় যাওয়া! সেখানে ছেলে হারাবে না ত হারাবে কোথায়? ও মাগীর কি ছেলের দিকে নজর থাকে, একেবারে গল্পে মেতে যান গিয়ে। এখন ছেলে কোথায় চলেই গেল না গুণ্ডারাই চুরি করলে তা কে জানে? .. আমরা ঢের তল্লাস কর্‌ছি হুজুর, কোথাও ত কিছুর কিনারা পাওয়া গেল না ......

খোকা! হারাইয়া গিয়াছে! গোদক্রয়ের কানে শুধু এই দুটি কথা প্রলয়ের মূর্চ্ছার বিষাণ বাজাইতেছিল। তিনি

লাফাইয়া জার্ম্মানীর ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িলেন, কিল উঁচাইয়া তাহাকে মারিতে গেলেন, তার পর দুই হাতে তাহার দুই বাহু ধরিয়া জোরে ঝাঁকানি দিতে দিতে দাঁত কড়মড় করিয়া ক্রুদ্ধগর্জ্জনে বলিতে লাগিলেন—বল মাগী বল, কোথায় খোকাকে হারালি? বল হারামজাদী, নইলে তোকে মেরে গুঁড়ো করে ফেলব।… কোথায়? কোথায়? আমার খোকা কোথায়? …

কিন্তু সেই ঝি বেচারী শুধু কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষমাই চাহিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না।

খোকা! তাঁহার খোকা। সে হারাইয়া যাইবে, চুরি যাইবে! ইহা অসম্ভব। যা যা সকলে মিলিয়া খোঁজ্। খোকাই যদি না থাকিল ত টাকা কাহার জন্য? মুঠা মুঠা টাকা ছড়াইয়া গলিতে গলিতে বাড়ীতে বাড়ীতে জনে জনের পিছু পুলিশ লাগাইয়া দিতে হইবে। আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা নয়।

—শার্ল, দেখ তোরা এই মাগীকে পাহারা দিবি। আমি পুলিশে খবর দিতে চল্লাম ··

গোদক্রয়ের বুক যেন ভাঙিয়া পড়িবার মতন ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল, ভয়ে ভাবনায় সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তিনি পুনরায় গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন, ঘোড়া ক্রুদ্ধ পাগলের মতো পুলিশের থানার দিকে ছুটিয়া চলিল, অদৃষ্টের কি পরিহাস! গাড়ীর গদি ভরিয়া চকচকে সব খেলনা পড়িয়া আছে; পথের ধারের সারবন্দি গ্যাসের আলো, দোকানে দোকানে আলোর রোসনাই, ছুটন্ত জানালা দিয়া বার বার সেইসব চকচকে খেলনার উপর পড়িয়া হাজার চোখে যেন আগুন হানিতেছিল। আজ এক দেবশিশুর জন্মদিন, আজ বিশেষ করিয়া শিশুদেরই আনন্দ-উৎসব, কিন্তু তাঁহার শিশু আজ তাঁহার ঘরে নাই, একথা চারিদিকের পুলক-আয়োজন কিছুতেই তাঁহাকে ভুলিতে দিতেছিল না।

এই উৎসব-প্রমত্ত শহরের পথে পাগলের মতো ছুটিতে ছুটিতে দুঃখে-ম্রিয়মাণ পিতা আপন মনে বার বার বলিতেছিলেন—"আমার রাউল! আমার খোকা! ·· বাবা আমার! তুই কোথায় গেলি · কোথায় আছিস?" আর অধৈর্য্যে উত্তেজিত হইয়া গাড়ীর গদির উপর আঙুলগুলা চাপিয়া চাপিয়া মটকাইতেছিলেন। আজ এখন তাঁহার কাছে পদমর্য্যাদা, খেতাব সম্মান, কোম্পানির কাগজ, টাকার সিন্দুক, সুদ, আসল, সমস্তই মিথ্যা বোধ হইতেছিল। একমাত্র চিন্তা আগুনের শিখার মতো তাঁহার উত্তাল মস্তিষ্কের মধ্যে জাগিতেছিল—আমার খোকা, কোথায় আমার খোকা!

ঐ ঐ পুলিশের থানা। জোরসে জোরসে গাড়ী হাঁকো ··· রোকো রোকো, গাড়ী রোকো! ··· যাঃ, থানায় যে কেহই নাই, উৎসব-আনন্দে সকলে যে-যার দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ··· কোই হ্যায়, কোই হ্যায়? ··· এই কনেষ্টেবল, এই এই, শোন ... আমি ভাঁ-বাপ্তিস্ত গোদক্রয়, সরকারী সুদী কারবারের কর্ত্তা, ·· আমার ছেলে, খোকা, শহরের রাস্তায় হারাইয়া গেছে · চার বছরের আমার খোকা, ·· দারোগা সাহেব কাহা, দারোগা সাহেব কাঁহা। ··· গোদক্রয় তাড়াতাড়ি কনেষ্টেবলের হাতে একটা মোহর গুঁজিয়া দিলেন।

সেই কনষ্টেবলটি বৃদ্ধ, প্রকাণ্ড-পাকা-গোঁফ-ওয়ালা ভদ্রলোক; সে গিনির সুপারিশে যত না হোক বিপন্ন পিতার কাতরতা দেখিয়া তাঁহাকে দারোগা-সাহেবের খাস কামরায় লইয়া গেল। সে ঘরে দারোগা সাহেব এক চোখে চশমা দিয়া পেঁচার মতো গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিলেন।

গোদক্রয় আবেগকম্পিত চরণে ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে নিজের দুঃখকাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন।

দারোগা সাহেবও ছেলের বাপ; এই করুণ দৃশ্যে তাঁহার মন গলিয়া গেল। কিন্তু তিনি পুলিশের বড় সাহেব, কোমলতা প্রকাশ করা তাঁহার শোভা পায় না, এইজন্য কষ্টে মনোভাব দমন করিয়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর হইয়াই বসিয়া রহিলেন।

--আচ্ছা, মশায়, আপনি বলছেন চারটের সময় ছেলে হারিয়েছে, না?

—হাঁ, দারোগা সাহেব।

—হুঁ, তারপরই অন্ধকার হয়ে গেছে ... বয়সও ত তেমন বেশি নয় যে পথ চিনে বাড়ী ফিরবে; লোকেও

জিজ্ঞেস করতে পারবে না, কেউ জিজ্ঞেস করলেও জবাব দিতে পারবে না ... এখনো ভালো করে' হয়ত কথাই ফোটে নি, বাপ পিতমর নামও ত সে জানে না, কেমন কিনা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ দারোগা সাহেব, হ্যাঁ! ...

—হুঁ, হারিয়েছে মেছোবাজারের দিকে? ... হুঁ, পাড়াটা বদ বটে, ... গুণ্ডা চোর বাটপাড়ের আড্ডা ঐ মহল্লায়। ... তা আপনি ভাববেন না, ওপাড়ায় খুব হুঁসিয়ার দারোগা আছে ... আমি তাকে এক্ষুণি টেলিফোঁ করে বলছি ...

হতভাগ্য পুত্রহারা পিতা পাঁচ মিনিট একলা বসিয়া। কী সে ভয়ানক দুঃসহ সুদীর্ঘ সময়! পাগল হৃদয়ের তখন কী ব্যাকুল আর্ত্তনাদ!

দারোগা সাহেব তাড়াতাড়ি হাসি মুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—ছেলে পাওয়া গেছে!

ও! আশ্বস্ত পিতার উদ্দাম আনন্দের কী ব্যগ্র প্রকাশ! তিনি দারোগার হাত ধরিয়া আবেগভরে ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন।

—আপনার ছেলে পাতলা রকমের ফর্সা ফুটফুটে, কেমন কি না? একটু রোগাটে-রকম চেহারা, না? ... নীল মকমলের পোষাক পরা? টুপির ওপর সাদা পালক দেওয়া, কেমন?

—হাঁ হাঁ দারোগা-সাহেব, ঐ আমার ছেলে, আমার খোকা। ... সেই সেই আমার বাউল।

—বেশ বেশ! তা সে ছেলে ঐ পাড়ার একজন গরীব লোকের বাড়ীতে আছে। সে থানায় এসে এজেহার দিয়ে গেছে! ... হুঁ, এই তার ঠিকানা—পিয়েরোঁ, পাথ্‌রে গলি, রাজার বাগান। গাড়ীতে গেলে এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনি আপনার ছেলে দেখতে পাবেন। তবে আপনি কি সে কদর্য্য জায়গায়, সেই নোংরা গলির কুঁড়ে ঘরে যেতে পারবেন? সে লোকটা তরিতরকারীর ফেরিওলা! কিন্তু হলে কি হয়, লোক ভালো, নয়?

আ! সে লোক নিশ্চয় খুব ভালো! গোদফ্রয় উচ্ছ্বসিত আবেগে দারোগা সাহেবকে ধন্যবাদ জানাইয়া চার-চারটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন; সে সময় সেই তরকারীর ফেরিওলা সেখানে থাকিলে সরকারী সুদী কারবারের বড়সাহেব তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতেন। সত্যসত্যই, শ্রীযুক্ত গোদফ্রয়, সরকারী সুদী কারবারের বড় কর্ত্তা, সেই চাষাটার দেখা পাইলে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন! তবে কি এই লক্ষ্মীর দাস দাম্ভিক ধনীর অন্তরে টাকার মমতা ছাড়া অন্য ভাবও আছে? এই মুহূর্ত্তে তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে তিনি পুত্রকে কি পরিমাণ ভালো বাসেন। কোচমান কোচমান, জোরসে হাঁকো, চাবুক লাগাও! এখন আর তাঁহার অর্থসঞ্চয়ের চিন্তা ছিল না, পুত্রকে রাজপুত্রের ধরণে মানুষ করিয়া তুলিবার কল্পনাও আসিতেছিল না; তিনি ভাবিতেছিলেন বেতনভোগী চাকরদাসীর মিথ্যা মমতার কথা! ভবিষ্যতে তিনি সুদের হিসাবে জবাব দিয়া নিজেই ছেলের খবরদারি করিবেন; তাঁহার বুড়ী পিসির খোঁজ খবর এতদিন তিনি কিছুই লইতে পারিতেন না, এখন তাহাকে আনিয়া বাড়ীতে রাখিবেন তা হোক সে পাড়াগেঁয়ে। পিসির পাড়াগেঁয়ে কথার টান আর সেকেলে ধরণে তাঁহাকে সৌখীন মহলে লজ্জা পাইতে হইবে, তা হোক, বুড়ী মানুষ কোথায় একলাটি পড়িয়া আছে, কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে দেখাও ত কর্ত্তব্য। আর সে এবাড়ীতে আসিয়া থাকিলে আদর যত্ন করিয়াই তাহার নাতিটিকে প্রাণের টানে মানুষ করিয়া তুলিবে। চাবুক লাগাও কোচমান, চাবুক লাগাও! এই মহাজনের সময়ের টানাটানি রোজই, আর দেনাদার খাতকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে রোজই তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকাইতে হয়। কিন্তু আজ টাকা রোজগারের ধান্দা একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও আজ ত্বরার অবধি ছিল না—আজ জীবনে প্রথম তাঁহার সহিত তাঁহার পুত্রের প্রকৃত বাৎসল্যের পরিচয় ঘটিবে। চাবুক লাগাও কোচমান! জোরসে হাঁকাও!

এই কনকনে শীতের রাত্রে সেই গাড়ী সমস্ত প্যারী শহরের বুকের উপর দিয়া অতিবেগে দীর্ঘপথ পান করিতে করিতে উদ্বেগের মতো ছুটিয়া চলিতেছিল, এবং সরকারী আপিস আদালত, সওদাগরী কুঠি কারখানা, হোটেল সরাই পিছে ফেলিয়া অন্ধকার সরু গলির গোলকধাঁধায় গিয়া পড়িল। একটা নোংরা পাড়ার নোংরা গলিতে গাড়ী

থামিল। শ্রীযুক্ত গোদক্রয় গাড়ীর লণ্ঠনের আলোতে পথ দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন; দেখিলেন সেখানে এক চত্বর খোলার বাড়ী, ভাঙাচোরা ঝুপসী ছাপ্পর। এই ত সেই নম্বর যে-বাড়ীতে সেই তরকারী-ফিরি-ওলা থাকে। আবেগকম্পিত হস্তে তিনি দরজার কড়া নাড়িলেন। বাড়ীর দরজা খুলিয়া একজন লোক বাহির হইয়া আসিল, সে প্রকাণ্ড লম্বাচৌড়া জোয়ান, তে-এঁটে তালের মতো তাহার মাথা, আর চৌকো মুখের মাঝে একজোড়া প্রকাণ্ড কটা গোঁফ। সে নুলো, তাহার ডুরে কাপড়ের পশমী জামার বাঁ-হাতটা এক পাশে ঝলঝল করিয়া ঝুলিতেছিল। সে সেই চকচকে গাড়ী আর সুন্দর-ওভারকোট-পরা গাড়ীর অধিকারীকে দেখিয়া সানন্দ সম্ভ্রমে বলিল—"আসুন, মশায়, আসুন। আপনি বুঝি ছেলের বাবা? ··· কিছু ভয় নেই ··· খোকার কিছু হয়নি ··· সে বেশ আছে।"

সে দরজার এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুককে বাড়ীতে প্রবেশের পথ ছাড়িয়া দিল এবং নিজের মুখের উপর একটি আঙুল রাখিয়া বলিল—"আস্তে মশায় আস্তে! খোকা ঘুমুচ্ছে।"

৩

কুঁড়ে ঘর। সত্যই কুঁড়ে! ঘরের এক কোণে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলিতেছিল—তাহাতে আলো হইতে-ছিল অল্প, গন্ধ উঠিতেছিল বিষম, এবং ধোঁয়া হইতেছিল প্রচুর। সেই ধূসর আলোয় গোদক্রয় দেখিলেন ঘরের আসবাব একটা পায়া-ভাঙা দেরাজ, খানকতক হাতাভাঙা চেয়ার, একখানা ময়লা গোল টেবিল আর তার উপর রাত্রের সামান্য আহারের উচ্ছিষ্ট বাসন পড়িয়া আছে; দেয়ালের গায়ে দুখানা সস্তা ছাপা ছবি টাঙানো।

কিন্তু সেই নুলো ফেরিওলা তাঁহাকে অধিক কিছু দেখিবার অবসর না দিয়া কুপিটা উঠাইয়া লইয়া ঘরের এক পাশে গেল। সেখানটা একটু আলো হইয়া ওঠাতে দেখা গেল একটি বিছানার উপর দুটি ছেলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। উহারই মধ্যে বড় ছেলেটি ছোটটিকে আদর করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গোদক্রয় চিনিলেন সেই ছোট ছেলেটি তাঁহারই খোকা রাউল।

ফেরিওলা তাহার চাষাড়ে কথা যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিল—"দুই ছোঁড়াই ঘুমে যেন মরে রয়েছে! আমি ত জানতাম না যে এই ছোট রাজাকে কে কখন খুঁজতে আসবে, তাই আমি ওদের আমার বিছানায় ঘুম পাড়িয়েছি আর ওরা চোখ বুজতেই পুলিশে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছি। ······ অন্য দিনে জিদোর আলাদা ছোট বিছানায় শোয়; আজকে ওদের আমার বিছানায় শুইয়ে আমি জেগে রয়েছি—আমাকে ত ভোরে উঠে গঞ্জের হাটে যেতেই হবে ··· ··"

এত কথা গোদক্রয়ের কানে গেল কিনা সন্দেহ। তিনি সেই ঘুমন্ত ছেলে দুটিকে দেখিতেছিলেন। উহারা একটা ভাঙা খাটিয়ায় ময়লা বিছানায় তাঁহার ঘোড়ার গায়ের কম্বলের চেয়েও অধম একখানা মোটা কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে! কিন্তু তবু এই দৃশ্য কি সুন্দর, কি চমৎকার! রাউল তাহার নূতন চকচকে মকমলের পোষাক পরিয়া ছেঁড়া-কাপড়-পরা তাহার সঙ্গীর কোলের কাছে কেমন স্বচ্ছন্দ নির্ভয়ের সহিত শুইয়া আছে! রাউলের রক্তহীন ফ্যাকাশে ছোট মুখখানির পাশে এই ছোটলোকের ছেলেটির স্বাস্থ্যসুন্দর কালো কুৎসিত মুখখানিও দর্শনীয় বলিয়া মনে হইতেছিল!

গোদক্রয় দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ফেরিওলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এটি? তোমার ছেলে? ······

—না, মশায়। আমি বিয়ে করি নি, বিয়ে হবারও আর সম্ভাবনা নেই। দু বৎসর হবে আমার একজন পড়শী মজুরনি, সে মারা গেল; আহা মাগী বড় গরিব ছিল, খেটে খেটে প্রাণ বা'র করত তবু তার আর তার ছেলের পেট ভরা খাবার এক বেলাও জুটত না। এমনি করে পাঁচ বৎসর চলল, কিন্তু তার পর তার প্রাণে আর সইল না, সে মারা গেল। মাওড়া ছেলেটিকে ভগবান আমার হাতেই ফেলে দিলেন,—মায়েদের নিজের বাছারাই খেতে পায় না তা পরের ছেলেকে কি খাওয়াবে, তাই মায়েরাও এই মাওড়া ছেলেটির ভার নিতে পারলে না, তখন ভগবান এই হতভাগার ওপরই ভার দিলেন। এভার আমার লাঠির ভারের মতন হয়েছে,—এ আমার অবলম্বন, আমার সহায়, আমার বল ভরসা। এমনি করেই ভগবান তাঁর

দেওয়া বোঝা সোজা করে তোলেন। রোজ ইস্কুল থেকে এসে সে তুলদাঁড়ি আর ওজন-বাটখারা মাথায় নিয়ে ঠেলা-গাড়িতে তরিতরকারি সাজিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়—আমি এই মুলো হাত নিয়ে যা পারি না, জিদোর তা সহজেই করে দেয়। সাত বছরের ছেলে, কিন্তু এরি মধ্যে ও এমনি চালাক! ওই ত খোকাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল!

—কি রকম? এই বালক? …

—ওর বড় বুদ্ধি মশায়। ও ইস্কুল থেকে আসবার সময় দেখলে যে খোকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যালকা-মুখো হয়ে হাপুস-নয়নে কাঁদছে। ও খোকার সঙ্গে ভাব করে চুপ করিয়ে ভুলিয়ে আমার কাছে নিয়ে এল—আমি সেখান থেকে নিকটেই আমার তরিতরকারি ফেরি করে ফিরছিলাম। দেখতে দেখতে আমাদের ঘিরে লোক জমে গেল, আর সবাই কত কি জিজ্ঞাসা করে' করে' খোকাকে ডরিয়ে তুলতে লাগল। খোকার কথা আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না, ভালো করে' একে কথা বলতেই শেখেনি, যা দু একটা বলে তারও কতক ইংরিজি কতক জার্ম্মান। তখন কেউ কেউ বল্লে খোকাকে থানায় দিয়ে আসতে। কিন্তু জিদোর রাজি হল না, সে বল্লে পুলিশ দেখে খোকা ভয় পাবে। আরো, আপনার খোকা জিদোরকে ছেড়ে কোথাও যেতেও চাচ্ছিল না। তখন আমি গাড়ীর বেসাত বাড়ী এনে থুয়ে, খোকাকে জিদোরের কাছে রেখে থানায় খবর দিতে গেলাম। রাত্রে ওরা একসঙ্গে কত-কালের চেনা বন্ধুর মতো আনন্দে খাবার খেয়ে ঘুমুচ্ছে; … খোকাকে কে কখন খুঁজতে আসবে বলে আমি জেগে আছি।

আশ্চর্য্য! শ্রীযুক্ত গোদফ্রয়ের মনে যাহা হইতেছিল তাহা তাঁহার অন্তরাত্মাই জানে। বাড়ীতে আসিতে আসিতে তিনি সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহার খোকার রক্ষাকর্ত্তাকে বকশিস দিয়া বেশ করিয়া খুসি করিয়া দিবেন—খাতকদের রক্তশোষা সুদের আমদানি হইতে এক মুঠো সোনার মোহর! কিন্তু আজ তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যে যবনিকা সরিয়া গেল তাহার অন্তরালে দারিদ্র্যের এ কী জীবন লুকায়িত ছিল!—দারিদ্র্যের মধ্যে সততা, দুঃখের মধ্যে আনন্দ, অভাবের মধ্যে আতিথ্য! সেই মজুরনি মাতার সন্তান পালনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, এই মুলো লোকটির স্বাবলম্বন ও অনাথের প্রতি বাৎসল্য, আর এই ছোটলোকের ছোট ছেলের এতখানি দয়া আর বুদ্ধি সেই ধনকুবেরকে অচিন্তিতপূর্ব্ব ভাবনায় ভাবাইয়া তুলিল। এই যে বালক তাঁহার খোকাকে ছোট ভাইটির মতন বুকে করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুম পাড়াইয়াছে, অচেনাকে চিরপরিচিত বন্ধুর মতো নিজের খাবারের ভাগ দিয়া নিজের ঘরে রাখিয়াছে, পুলিশের নির্ম্মম হেফাজতে ছাড়িয়া দিতে রাজি হয় নাই, এ ত বকশিসের লোভে মোটেই নয়। তবে শুধু মনিব্যাগের বন্ধ খুলিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইবার নহে—তিনি জিদোর আর তাহার পালকপিতা মুলো ফেরিওলার ভবিষ্যৎ একেবারে নিশ্চিন্ত করিয়া দিবেন, তাঁহার কৃতজ্ঞ সামর্থ্য চিরদিন তাহাদিগের অনুসরণ করিলে তবেই তিনি সন্তোষ লাভ করিবেন। সরকারী সুদী কারবারের বড় সাহেবের মজলিসে যেসব ভাবুকতাহীন মহাজনদের দহরম-মহরম, তাহারা তাহাদের আদর্শ এই বড় সাহেবের মনের এখন-কার অবস্থা জানিতে পারিলে নিশ্চয় খুব আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। বাস্তবিক সুদী কারবারের বড় কর্ত্তা আজ তাঁহার জীবনের এক নূতন অধ্যায়ের পরিচয় দিলেন, তিনি সদাশয় আন্তরিকতা মুক্ত করিয়া ধরিতে উদ্যত! সত্যই তিনি এই দরিদ্র ছোটলোককে বকশিস দিতে গিয়া টাকার থলির বন্ধ না খুলিয়া একেবারে হৃদয়ের বন্ধ খুলিয়া দিতে প্রস্তুত! এই মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইল এই ফেরিওলা ছাড়া জগতে আরো অনেক দরিদ্র পঙ্গু আছে, জিদোর ভিন্ন অনেক অনাথ শিশু আছে, অনেক মাতা সন্তান পালন করিবার সংগ্রামে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। আরো আশ্চর্য্য যে তাঁহার মনে হইল অর্থ যদি অভাবই মোচন না করিল তবে ত সে অর্থ নয়, ব্যর্থ,—সে ধাতু, খনির মধ্যে থাকিলেও যা সিন্দুকে পড়িয়া পচাও তা। এইসব চিন্তা তাঁহাকে উতলা করিয়া তুলিতে লাগিল।

ঘুমন্ত দুটি শিশুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পুত্রহারা পিতা এইরূপ চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে যখন চমক ভাঙিয়া ফেরিওলার মুখের দিকে তাকাইলেন তখন

তাহার বিনয়নম্র স্বাধীন ভাব আর আনন্দে উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

গোদক্রয় বলিলেন—ভাই, আজ থেকে তোমরা আমার বন্ধু। তুমি আর তোমার পোষ্যপুত্র আমায় উপকার দিয়ে কিনে নিয়েছ ··· আমিও দেখাব যে আমি অকৃতজ্ঞ নই ·· বন্ধু, আজ থেকেই ··· বন্ধু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার অবস্থা সচ্ছল নয়, ... আমি তোমায় আমার কৃতজ্ঞতার প্রথম নমুনা দেখাতে চাই।

ফেরিওলা তাহার একখানি হাত দিয়া বড় সাহেবের নোটের-তাড়া-ভরা হাত ঠেলিয়া ধরিয়া বলিল—না, না, মশায় না, ওসব হবে না। আমরা পাবার প্রত্যাশা করে কিছু করি নি; আপনি কিছু মনে করবেন না, আমরা কিছু নিতে পারব না। আমরা সোনাদানার মুখ দেখিনি বটে, কিন্তু এমন দিন আমার চিরকাল ছিল না। আমি সৈন্য ছিলাম, আমার এখনো মেডাল আছে; তারপর আমি কারিগর মিস্ত্রী ছিলাম; হাতের ওপর দিয়ে একদিন গাড়ী চলে গিয়ে আমায় অকর্ম্মণ্য নুলো করে দিয়ে গেছে, কিন্তু তবু এখনো আমি নিজের রোজগারই খাচ্ছি, কারু এক পয়সার ধার ধারিনে।

—তবু ·········

সেই নুলো ফেরিওলা গোদক্রয়ের কথার আরম্ভেই সরল হাস্যে তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—তবু যদি আপনি আমায় দয়া করবেনই, তবে এই গরিবকে স্মরণ রাখবেন তা হলেই যথেষ্ট হবে।

অর্থপিশাচ কুচক্রীর কাছে আজ এসব কী বিস্ময়কর ব্যাপার! সুদী কারবারের বড় সাহেব আজ একটা নুলো ফেরিওলার কাছে একেবারে অবাক হতভম্ব এতটুকু!

গোদক্রয় আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু জিদোর, জিদোরের জন্যে আমায় কিছু করতে দাও।

ফেরিওলা আনন্দে উত্তর করিল—ওর জন্যে? আহা ও অনাথ! আমি অনেক সময় ভাবি যে আমি ছাড়া জগতে ওর কেউ নেই, তখনই আবার ভাবি, ভাবনা কি, আমাকে যিনি জুটিয়ে দিয়েছেন, তিনিই আবার কাউকে জুটিয়ে দেবেন ··· ইস্কুলের মাষ্টারেরা ত ওকে বড়ই তারিফ করেন, ভালো বাসেন।

সে হঠাৎ থামিয়া গেল। তারপর বলিল—আপনি অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছেন—খোকাকে গাড়ীতে নিয়ে চলুন ··· ও অঘোরে ঘুমুচ্ছে এখন কোলে নিলে জাগবে না, ······ দাঁড়ান, আগে ওর পায়ে জুতো জোড়া পরিয়ে দি, ঠাণ্ডা লাগবে ·····

ফেরিওলার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া গোদক্রয় দেখিলেন যে অগ্নিকুণ্ডের ধারে দুজোড়া ছোট ছেলের জুতা রহিয়াছে—চকচকে নূতন জোড়া রাউলের, আর নাল-বাঁধানো ছেঁড়া নাগরা জোড়া জিদোরের, আর কি জুতার মধ্যে দু-পয়সানে এক একটা পুতুল ও এক এক মোড়ক মেঠাই আছে।

ফেরিওলা লজ্জিত হইয়া বলিল—ওদিকে দৃষ্টি দেবেন না মশায়; ওসব জিদোরের কাণ্ড! শোবার আগে নিজের জুতোয় আর আপনার খোকার জুতোয় ঐসব বড়-দিনের সওগাত রেখে তবে সে ঘুমুতে গেছে ··· আমি থানায় খবর দিয়ে ফেরবার পথে ঐসব ছাইপাঁশ কিনে এনেছিলাম ছেলে ভুলোতে ···

বড় সাহেব ভাবমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার স্তাবকেরা তখন দেখিলে তাঁহাকে চিনিতে পারিত কিনা সন্দেহ। গোদক্রয়ের চক্ষুতে আজ জল!

হঠাৎ তিনি সেই খোলার ঘরের গলি হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং মিনিট খানেক পরে আবার ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার দুই হাত তখন নানা খেলনায় ভরা—এগুলি তিনি নিজের খোকার জন্য কিনিয়াছিলেন, এতক্ষণ গাড়ীতেই অযত্নে গড়াগড়ি যাইতেছিল। তিনি সেইসব সোনালি-বার্নিশ-করা চকচকে খেলনা সেই ছোট দুজোড়া জুতার মধ্যে ভাগ করিয়া রাখিয়া দিলেন। ফেরিওলা অবাক হইয়া তাঁহার কাণ্ড দেখিতে লাগিল।

গোদক্রয় ফেরিওলার হাতখানি নিজের আবেগব্যগ্র হাতের মধ্যে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া ভাবগদগদ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—বন্ধু, আমার বন্ধু, এইসব খেলনা বড়দিন-বুড়ো খোকাদের জন্যে নিয়ে এসেছে। আমার ইচ্ছে যে রাউল জিদোরের সঙ্গে জেগে তার বন্ধুর সঙ্গে একত্র খেলনা পাওয়ার আনন্দ ভাগ করে নেবে। ... রাউল আজ তোমার বাড়ীতেই থাক। ··· আজ থেকে বন্ধু, তোমরা আমার

আপনার, তোমাদের ভার সে আমার। আজ তোমরা আমায় শুধু আমার হারাণো ছেলে ফিরে দিলে না, আমার হারাণো মনুষ্যত্বও ফিরে দিলে।… আমি এই দুটি ঘুমন্ত শিশুর শপথ ক'রে বল্‌ছি একথা আমি জন্মে ভুলব না।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক-পরিচয়

ব্রাহ্মগণ হিন্দু কি না ?

শ্রীবটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। মূল্য এক আনা। কলিকাতা, ১৭ নং ভুবনমোহন সরকারের লেন হইতে লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল-ক্রাউন ষোলপেজী ২০ পৃষ্ঠা।

লেখকের মত যে ব্রাহ্মগণ হিন্দু নহেন, ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্ম। এই পুস্তিকাটি বিশেষ কোন একটি যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া লিখিত হয় নাই। এই জন্য ইহার সমালোচনা করা সুসাধ্য নহে। লেখক নানা স্থানে যেসকল হৃদয়োচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তিনি যে দুই একটি অপ্রকৃত কথা লিখিয়াছেন, তাহারই সংশোধন আবশ্যক। তিনি বলেন, অনেক ব্রাহ্ম আপনাদিগকে হিন্দু বলায় "প্রধানতঃ এই কারণেই সেন্সসে ব্রাহ্মের সংখ্যা এত কমিয়া যাইতেছে।" প্রকৃত কথা এই যে ব্রাহ্মদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে; কোন সেন্সসেই কমিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তিনি বলেন, "উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে দিন দিন হিন্দুয়ানীর দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করাতেই মোসলমান সমাজ প্রভৃতির ভগবদ্ভক্ত সরলবিশ্বাসী সাধুব্যক্তিগণ প্রাণ খুলিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে পারিতেছেন না।" কিন্তু আমরা বলি যখন "ব্রাহ্মেরা হিন্দু" একথা উঠে নাই, তখন কি মোসলমান, খৃষ্টান, প্রভৃতি দলে দলে ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন? লেখকের কথার কোন প্রমাণ নাই। তিনি বলেন "আর্য্যসমাজে হিন্দুয়ানীর বড়াই নাই।" অথচ "আর্য্যসমাজে"র শীর্ষস্থানীয় ৺লালা লালচাঁদ প্রভৃতিই পঞ্জাবে "হিন্দুসভা" স্থাপনের প্রধান উদ্‌যোগী। তদ্ভিন্ন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বেদকে আর্য্যসমাজ অভ্রান্ত বলেন। সত্যের যাহা বিপরীত লেখক তাহাই বলিয়াছেন। লেখককে কোন মুসলমান নাকি বলিয়াছেন, যে, ব্রাহ্মেরা "বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের সিংহাসনে আর্য্য ঋষিদিগকে বসাইয়াছেন।" লেখক বা এই মুসলমান ভদ্রলোক এই কথাটির কণামাত্র প্রমাণ দিতে পারেন কি ?

লেখক আত্মমত সমর্থনার্থ অনেক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মের নানা বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু লেখক ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি যাঁহাদিগকে স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য সালিস মানিতেছেন তন্মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, প্রভৃতি অনেকে ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুই মনে করেন।

"আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু একজন নিষ্ঠাবান্ পরম ভক্ত ব্রাহ্ম ডাক্তার কাজি আব্‌দাল গফ্‌ফার।" ইহা লেখকের কথা। ডাক্তার কাজি আব্‌দাল গাফ্‌ফার মহাশয়ের কন্যা যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন মুসলমানকন্যা বলিয়া ডাক্তার মহাশয় কন্যার নিমিত্ত বিশেষ বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করেন, এবং কন্যা উহা প্রাপ্ত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ডাক্তার মহাশয় ব্রাহ্ম হইয়াও মুসলমানের দাবী ছাড়েন নাই। কিন্তু লেখক মহাশয়ের মতে হিন্দুসন্তান ব্রাহ্ম হইলে তাহার পক্ষে হিন্দুত্বের ছায়া মাড়ানও মহাপাপ!

আমাদের নিজের ধারণা এই যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সত্য যাহা তাহা হিন্দুধর্ম্মেও আছে; এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীনতার ধর্ম্ম। সুতরাং কোন ব্রাহ্ম যদি আপনাকে হিন্দু বলিতে চান, ত, তাহাতে কোন বাধা নাই। হিন্দুধর্ম্ম প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রেই আবদ্ধ নয়। মুসলমান রাজত্বকালে যেসকল হিন্দু ধর্ম্মসংস্কারক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতাবলম্বী উপাসকসম্প্রদায়গুলিও হিন্দু বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে একেশ্বরবাদী, এবং জাতিভেদ বা মূর্ত্তিপূজার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। অনেক মুসলমানও এইসকল হিন্দু উপাসকসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। এইসকল সম্প্রদায় যদি হিন্দু হন ত, ব্রাহ্মেরা কেন হইবেন না? হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মের মত ক্রম-বিকাশশীল এবং ক্রমপরিবর্ত্তনশীল। ইহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ব্রাহ্মধর্ম্ম। ভবিষ্যতে ইহার আরও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভবপর। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম চিরকালের জন্য কতকগুলি শাস্ত্র বা সাধুবাক্য দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য নহে। ইহাও স্বীকার্য্য নহে যে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অংশ যে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মের নিরাকার উপাসনা, প্রভৃতি, তাহা হিন্দুধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না, কেবল মূর্ত্তিপূজা, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার, খাদ্যাখাদ্যবিচার, জাতিভেদ, ইত্যাদি অংশই ঐ হিন্দুনামে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়া আছে। ফলতঃ, পাশ্চাত্য য়ুনিটেরিয়ানগণ যেমন ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদিগের নানা ভ্রান্তমত ত্যাগ করিয়াও আপনাদিগকে খৃষ্টান বলেন, তেমনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মগণও আপনাদিগকে হিন্দু বলিতে পারেন। তবে কেহ জোর করিয়া ঐ নাম তাঁহাদিগকে দিতে চান না, দিতে পারেনও না।

লেখক হিন্দু নামটিকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। খৃষ্টান নামটি প্রথমে অবজ্ঞাসূচক ছিল, এখনও অনেকে অবজ্ঞার সহিত উহা ব্যবহার করেন। "মোছলমান" কথাটিও অনেকে অবজ্ঞার সহিত ব্যবহার করেন। তাই বলিয়া মোসলমান বা খৃষ্টানগণ নিজনিজ নাম কেন পরিত্যাগ করিবেন?

আমরা গ্রন্থপরিচয়ের সংকীর্ণসীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। সুতরাং এইখানেই ক্ষান্ত হই।

ব্রহ্মবিদ্যালয়—

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। মূল্য ।/০। আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫, অপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা। ৫৯ পৃষ্ঠা।

এই বহিখানিতে বোলপুর শান্তিনিকেতনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বাহ্য ইতিহাস ব্যতীত, ইহার কেন্দ্রগত মূলভাব, প্রভৃতিও বিবৃত হইয়াছে। কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলে পুস্তকখানির কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"কবি রবীন্দ্রনাথ যখন এই শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপনের সংকল্প করিলেন, তখন মহর্ষি তাঁহাকে এই কার্য্যে খুবই উৎসাহ দিলেন। আমি কবির সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে তাঁহার মনে হঠাৎ এরূপ সঙ্কল্পের উদয় হইল কেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাঁহার কাব্যজীবনের ভিতর দিয়াই তাঁহার একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল,—পদ্মাবক্ষে নৌকাবাসে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে গূঢ়নিবিষ্ট কেবলমাত্র ভাবময় জীবন তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্তি দিতেছিল না; আপনার বেষ্টন ছাড়াইয়া একটা বড় ত্যাগের জীবনের জন্য তাঁহার বেদনা জাগিতেছিল। কাব্যের পথ দিয়াই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে, সমাজতত্ত্বে, ধর্ম্মনীতিতে প্রবেশ করিলেন; সর্ব্বত্রই দেখিলেন আপনাকে ক্রমাগত খর্ব্ব করিয়া পূর্ণরূপে

ত্যাগের আদর্শই কেবলি প্রকাশ পাইয়াছে।" "তাঁহার মনে হইল যে ভারতবর্ষের প্রাচীন চতুরাশ্রমের আদর্শের মত জীবনযাত্রার পূর্ণাদর্শ আর হইতেই পারে না। এ আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্ম্মলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া তোলা যায়। বাল্যে গুরুগৃহবাস ও ব্রহ্মচর্য্য-পালনের দ্বারা জীবনের সুর বাঁধা, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম-ভাবে মিলিয়া বাড়িয়া উঠা, সমস্ত জিনিসকে সেই বড় দিক্ হইতে আনন্দের দিক হইতে দেখিতে শিক্ষা করা—যৌবনে সংসারে প্রবেশ ও মঙ্গলসাধন, বার্দ্ধক্যে শরীরের ও মনের শক্তি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারবন্ধনকে ধীরে ধীরে মোচন করিয়া অধ্যাত্মলোকের জন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়া, বনবাস ও শিক্ষাদান, তাহার পর মৃত্যুর সময় একাকী পরলোকে প্রয়াণ—শিক্ষাকে, সংসারকে, বিষয়ভোগকে এমন মুক্তির সোপান করিয়া তোলার মত আদর্শ আর কোথায়? সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানে বানপ্রস্থ জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রৌঢ় বয়সে কবিকে পাইয়া বসিল। আদর্শ কেবল কল্পনায় নয়, প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে তিনি উৎসুক হইলেন।"

পুরাকালে যেসকল ঋষি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে বিদ্যার্থীদের অশেষ কল্যাণের উপায় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা উভচর ছিলেন না। তাঁহারা সংসারিক ঐশ্বর্য্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এবং পারমার্থিক ঐশ্বর্য্য ও উচ্চকাঙ্ক্ষা, এই উভয়ের মধ্যে শেষোক্তকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং অধুনা সেই আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, আশ্রমসংসৃষ্ট সকলকে সংসারিক ঐশ্বর্য্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বতন ঋষিদের ভাব অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। লেখক যে ইহা বিস্মৃত হন নাই, তাহার পরোক্ষ প্রমাণ পুস্তকের নানা স্থানে আছে।

"ইয়োরোপে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের কোন বিরোধ নাই; সমাজের মধ্যে নানা ভাবে যেসকল চেষ্টা ও চিন্তা জাগিতেছে, বিদ্যালয়ে তাহাই স্থান পাইয়া বিদ্যালয় শিক্ষার্থিগণকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া তৈরি করিতেছে। ইহা দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে আমা-দেরও ভিতর হইতে একটা বিদ্যালয় ঠিক্ তেমনি করিয়া জাগে। সে আধুনিক বিদ্যালয়ের ন্যায় বাহিরের পুঁথি পড়াইবার ও পরীক্ষা পাশ করাইবার একটা যন্ত্রমন্ত্র না হোক,—সে আমাদের দেশের ভাবে রসে চিন্তায় কল্পনায় উদ্বোধিত করিয়া অনুকরণ বৃত্তি হইতে আমা-দিগকে নিষ্কৃতি দিয়া আমাদের সমাজকে একটি বিশেষ শক্তি দিক! বাস্তবিক, এই ইচ্ছাই আমাদের এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠার ভিতরকার ইচ্ছা ছিল।"

পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমুদয় ব্যাপারের শিক্ষানবিশী বিদ্যালয়েই করান চলে। আমাদের দেশে প্রকৃত স্বায়ত্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাপার বাস্তবিক কিছুই নাই। সুতরাং বিদ্যালয়কে ভবিষ্য জীবনের শিক্ষানবিশীর ক্ষেত্র সকল দিক্ দিয়া করা যায় না। কেবল সমালোচনা ও প্রতিবাদের দিক্ দিয়াও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সঙ্গে সংস্রব রাখিবার যো নাই; এবং তাহা মানব প্রকৃতির সুস্থতারও হানি করে। তথাপি বিদ্যালয়কে সংসারের কোন বিভাগ হইতে নিঃসম্পর্ক রাখা যে বাঞ্ছনীয় নয়, ইহা বুঝিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করা বিধেয়।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যেসকল ছাত্র থাকেন, তাঁহাদের ও তাঁহাদের অভিভাবকদের এই পুস্তকখানি পড়া উচিত। শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিরও ইহা পঠনীয়।

পুস্তকখানিতে কিছু ছাপার ভুল আছে।

নেপালে বঙ্গনারী—

শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। উৎকৃষ্ট মসৃণ কাগজে ছাপা। আর্ট পেপারে ছাপা ১৪ খানি উৎকৃষ্ট ছবি সম্বলিত।

মানুষ যদি দেশে ও কালে আপনার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে শিক্ষিত বলা যায় না। এই কূপমণ্ডূকতা দূর করিবার জন্য ভূগোল ও নানা দেশের ইতিহাস পাঠ একান্ত আবশ্যক। তাহার পর স্বদেশে ও বিদেশে ভ্রমণ না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের দেশে এবম্বিধ শিক্ষার আয়োজন বড় কম। অন্য দেশের কথা দূরে থাক, আমরা ভারতবর্ষকেই ভাল করিয়া জানি না। ভারতের সকল প্রদেশের ভূগোল ইতিহাস আমাদের অনেকের অজ্ঞাত। আমরা কাগজে পড়ি, "বাঁকুড়া ভ্রমণ," বা "কাটোয়া ভ্রমণ", বা তদ্বিধ কিছু। খুব বেশী যাঁহারা বেড়ান, তাঁহারা করেন উত্তর-পশ্চিম ভ্রমণ। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটাদি দেশ বা রাজপুতানা বেশী লোকে দেখেন না। নেপালের মত দুর্গম দেশে যাওয়া দূরে থাক, তাহার বিষয়ে ভাল করিয়া কিছু জানিবার উপায়ও এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না। শ্রীমতী হেমলতা দেবী স্বয়ং নেপালে গিয়া বাস করিয়া, নিজ পর্য্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের ফলস্বরূপ বাঙ্গালীদিগকে এই সুন্দর বহিখানি উপহার দিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় প্রাণ আছে, এবং বর্ণনাশক্তি আছে।

নেপালযাত্রা, কাটমণ্ডু, নেপালের অধিবাসিগণ, প্রধানতীর্থ-পশুপতি-নাথ, নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম, নেপালের বৌদ্ধমন্দির, নেপালের পূজাপার্ব্বণ ও জাতীয় উৎসব, নেপালের প্রাকৃতিক বিবরণ, নেপালের কয়েকটী প্রসিদ্ধ স্থান, নেপালের পুরাবৃত্ত, গুর্খা বিজয়, নেপালের বর্ত্তমান গুর্খারাজগণ, এবং নেপালের আদর্শ সতী স্বর্গীয়া বড় মহারাণী,—লেখিকা তাঁহার পুস্তকে এই কয়েকটি বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইহা পড়িলে নেপাল সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ হয়। আমাদের অনুরোধ এই যে দ্বিতীয় সংস্করণে লেখিকা নিজ অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণের ফল আরও অধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিবেন। তাহা হইলে এই পুস্তক বর্ত্তমান সংস্করণে যেরূপ চিত্তা-কর্ষক হইয়াছে, তদপেক্ষা আরও মনোরম হইবে।

পুস্তকখানিতে জানিবার ও ভাবিবার বিষয় এত আছে, যে, দু একটির উল্লেখ করিলে তৃপ্তি হয় না। "এখন কাটামণ্ডুতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে! সহর এখন উজ্জ্বল।" কিন্তু নেপালের মানুষগুলির মন জ্ঞানালোকে কখন উজ্জ্বল হইবে? কাটমণ্ডু সহরের "এই সীমার মধ্যে কোন নীচজাতীয় ব্যক্তির বাস করিবার অধিকার নাই।" যে দেশের প্রত্যেক অধিবাসীর আত্মসম্মান বোধ করিবার ও বজায় রাখিবার উপায় নাই, সে দেশ কখন বড় হইতে বা থাকিতে পারে না। "ইন্দ্রচক কলিকাতার বড়বাজার বলিয়া ভ্রম হয়। বিলাতী পণ্যদ্রব্যে ইহা সুশোভিত।" সুতরাং নেপাল স্বাধীন হইয়াও পরাধীন। বিদেশী বণিক্ ইহা শোষণ করিতেছে। কাটমণ্ডুতে বীর হাঁসপাতাল, দরবার স্কুল, বীর লাইব্রেরী, ড্রেন ও জলের কল আছে। কিন্তু নেপালে দেশব্যাপী কোন শিক্ষার আয়োজন নাই। নেপালবাসীদের "বাহ্যাকৃতি চালচলন কোনরূপ বীরত্ব বা গৌরবব্যঞ্জক নহে।" যাঁহারা বাঙ্গালীর চেহারা ও চালচলন দেখিয়া বাঙ্গালীর সম্বন্ধে নিরাশ, এই কথাটি তাঁহাদের চিন্তনীয়। নেপালে "কুমারী, সধবা, কি বিধবা কাহারও মস্তকে আবরণ নাই।" অতএব, প্রমাণ হইতেছে যে অবগুণ্ঠনের মধ্যে জড়সড় না হইলেও হিন্দুনারী হিন্দুনারী থাকিতে পারেন। "বেণীতে লালসূতা বাঁধা ভিন্ন সধবাদের আর দুইটি লক্ষণ আছে। হাতে কাচের চুড়ি, গলায় পুঁতির মালা। এই দুইটাই কিন্তু বিজাতি জিনিষ। সধবাদিগের প্রধান লক্ষণ এই দুইটি বিজাতি



নেপালের প্রধান রাজমন্ত্রী—

মহারাজ সার চন্দ্র শামসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর।

["নেপালে বঙ্গনারী" হইতে গৃহীত]

জিনিষ কিরূপে হইল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।" "উচ্চ পরিবারের রমণীগণ সর্ব্বদা জুতা মোজা পরিধান করিয়া থাকেন, তাহাতে হিন্দু আচারের কোন ব্যতিক্রম হয় না। পূজা কিম্বা আহারের সময় জুতা মোচন করিলেই চলে।" "ভারতবর্ষের ন্যায় নিরন্ন ব্যক্তির বাহুল্য এখানে নাই। গৃহে গাভী কিম্বা মহিষ, ক্ষেত্রে মোটা চাউল, মক্কা, গম, শাক তরকারী অধিকাংশের গৃহেই থাকে।" "নেপালের প্রজাবর্গ দরিদ্র বটে, কিন্তু ইহারা অর্থহীন দরিদ্র; নিরন্ন, অনাহারক্লিষ্ট, করভারে প্রপীড়িত, জীর্ণদেহ, মনুষ্যকঙ্কাল নহে। ইহারা দৃঢ়, বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও প্রসন্নমূর্ত্তি।" "নেপালের দাসত্বপ্রথা ইউরোপীয়দিগের দাসত্বপ্রথার ন্যায় নহে। এখানে দাসদাসীগণের কোন কষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা সন্তাননির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হয়।" "গোহত্যা ব্রাহ্মণহত্যা করিলে তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হয়।" লেখিকা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন:— "নেপালের রাজ্যে পদার্পণ করিয়া, একদিন এই বলিয়া আনন্দ করিয়াছিলাম, যে আজ স্বাধীন দেশের স্বাধীন বায়ু আসিয়া আমার দেহকে আলিঙ্গন করিল। এমন দিন আমার জীবনে আসিবে ভাবি নাই ত। দুই বৎসর নেপালে বাস করিয়া, দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে হইল, এ যে আমার স্বাধীন রাজ্যের স্বপ্ন। স্বাধীনতায় এ জাতি কি লাভ করিয়াছে হায়! আমি তাহা দেখিতে পাইলাম না।" বাস্তবিক 'স্বাধীন' থাকিয়া নেপাল সুবিচার, সুশাসন, সভ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞানধর্ম্মে উন্নতি, সর্ব্বজনভোগ্য স্বচ্ছল অবস্থা লাভ করে নাই; প্রজাবর্গ মানুষ হইতে পারে নাই। লাভ মাত্র এইটুকু হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ন্যায় নিরন্ন জীর্ণদেহ লোকের বাহুল্য এখানে নাই। একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পরাধীনতা দুই প্রকারের; (১) বিদেশীর অধীনতা, এবং (২) আদিতে বিদেশবাসী কিন্তু বর্ত্তমানে স্বদেশবাসী বিজয়ী শ্রেণীর অধীনতা। দ্বিতীয় প্রকারের অধীনতায় স্বাধীন হইবার আশা ও সম্ভাবনা অধিক থাকে। দৃষ্টান্ত তুরুস্ক ও চীন। নেপালেরও এই সৌভাগ্য ঘটিতে পারে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকার থাকিলে তাহাকেই প্রকৃত স্বাধীনতা বলে। আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। পাঠকপাঠিকাগণ নিজে সমগ্র বহিখানি পড়িয়া জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করুন। ছবিগুলির জন্য লেখিকা স্বয়ং ফোটোগ্রাফ তুলাইয়াছিলেন। ছবিগুলি হইয়াছেও ভাল। ছবির ছাপাও বেশ হইয়াছে। কিন্তু লেখার ছাপা নির্ভুল হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য অর্থবোধে ক্লেশ হয় না।

গৌড়বিবরণ—

[বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি-সঙ্কলিত।] শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত। প্রথম ভাগ—প্রথম খণ্ড। গৌড়রাজমালা—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ্র প্রণীত। রাজসাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি হইতে শ্রীসুরেশ্বর বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৯। মূল্য দুই টাকা।

দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রমুখ স্বদেশপ্রেমিক, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়া একটি অক্ষয় কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গের ধনী জমীদারবর্গ, সকলে না হউক, অধিকাংশ, কুমার শরৎকুমার রায়ের মত সুশিক্ষিত ও বিদ্যাবিলাসী হইলে দেশের কি সৌভাগ্য হইত, কি উন্নতি হইত!

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্যের গুরুত্ব কিরূপ, ইহা কিরূপ সুফলপ্রদ হইবে, তাহা এই "গৌড়রাজমালা" হইতেই বুঝা যায়। ইহার লেখক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র অতি যোগ্য ব্যক্তি। তিনি যে এই পুস্তক প্রণয়নে কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কিরূপ নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রমাণ প্রয়োগে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা পুস্তকখানি পড়িলেই বুঝা যায়। তিনি যেসকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিঃ

হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষজ্ঞদিগের বিচার্য্য। আমরা পল্লবগ্রাহী, সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশে অধিকারী নহি। তবে একথা আমরাও বুঝিতে পারিতেছি এবং অসঙ্কোচে বলিতেছি যে এখন হইতে যদি কেহ বঙ্গের ইতিহাস জানিতে বা লিখিতে চান, তাহা হইলে তিনি তাঁহার অধীতব্য গ্রন্থতালিকা হইতে এই পুস্তক বাদ দিতে পারিবেন না।

এই গ্রন্থে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ অনেক পণ্ডিতের মত আলোচিত হইয়াছে। এইজন্য ইহার সিদ্ধান্ত ও প্রমাণগুলি ইংরাজীতেও প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে তৎসমুদয় উক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারিবে। স্বদেশপ্রেমের পক্ষপাতিত্ব অনেক সময়ে অলক্ষিতে আমাদিগকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে লইয়া যায় বলিয়াও আমাদের সিদ্ধান্তসকল ইংরাজীতে লিখিত হইয়া বিদেশীদের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া ভাল।

আজকাল যাঁহারা ইতিহাসের আলোচনা করেন, তাঁহারা যখন ছাত্র ছিলেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তখন ইতিহাসচর্চ্চায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি এখনও সমান উৎসাহে সেই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি তাঁহাকে গৌড়বিবরণ গ্রন্থাবলীর সম্পাদক নির্ব্বাচন করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থাবলীর রাজমালা প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে যথাক্রমে শিল্পকলা, বিবরণমালা, লেখমালা, গ্রন্থমালা, জাতিতত্ত্ব, শ্রীমূর্ত্তিতত্ত্ব ও উপাসকসম্প্রদায় প্রকাশিত হইবে। অক্ষয় বাবু আলোচ্যগ্রন্থের যে উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, তাহা সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত, ও সারবান্। ফেনাইয়া লিখিলে তাহা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু অক্ষয় বাবু তাহা করেন নাই। উপক্রমণিকার ঠাস্ বুনন পাকা হাতের পরিচয় দিতেছে। উহা হইতে আমরা কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। উহাতে সমগ্র গ্রন্থের সমুদয় সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

"বিগত একশত বৎসরের অনুসন্ধান-লব্ধ ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবামাত্র বুঝিতে পারা যায়,—মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বকালবর্ত্তী বরেন্দ্রমণ্ডলের ইতিহাসের মধ্যেই সমগ্র বঙ্গবাসীর ইতিহাসের মূলসূত্রের সন্ধান লাভের আশা করা যাইতে পারে। বরেন্দ্র-ভূমি প্রাচীন ভূমি বলিয়া,—বরেন্দ্রভূমি দেবমাতৃক বলিয়া,—(মহানন্দার পূর্ব্ব তীর হইতে করতোয়ার পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত) নানাস্থানে এখনও অনেক রাজদুর্গের, অনেক রাজভবনের, অনেক দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু বিস্ময়বিজড়িত ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।"

"এইসকল কারণে,—বাঙ্গালীর ইতিহাসের উপাদান-সঙ্কলনের আশায়,—বরেন্দ্রমণ্ডলে ধারাবাহিক রূপে তথ্যানুসন্ধানের আয়োজন করিবার অভিপ্রায়ে,—দীঘাপতিয়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম্-এ, (১৯১০ খৃষ্টাব্দে) একটি 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি' গঠিত করিয়া, তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহার অকাতর অর্থব্যয়, অক্লান্ত অধ্যবসায়, এবং প্রশংসনীয় ইতিহাসানুরাগ, অল্পকালের মধ্যেই, অনুসন্ধান-সমিতিকে সকলের নিকট সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে। অনুসন্ধান-ক্ষেত্র এবং অনুসন্ধানের অবসর অল্প হইলেও, অনুসন্ধানের ফল নিতান্ত অল্প হয় নাই।" "বাঙ্গালীর ইতিহাসে উল্লিখিত হইবার যোগ্য অনেক স্থান আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছে, অনেক চিত্র সংকলিত হইয়াছে, এবং অনেক পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনও সংগৃহীত হইয়াছে। এইসকল নিদর্শন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য,—(১) পুরাতন স্থাপত্যের নিদর্শন, (২) ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, (৩) পুরাতন জ্ঞানধর্ম্মসভ্যতার নিদর্শন [অপ্রকাশিত ও অপরিজ্ঞাত হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ]।"

ইতিহাস-রচনায় "কিরূপ বিচারপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য," তদ্বিষয়েও সংকীর্ণতার অভাব নাই। জ্ঞাননিষ্ঠ বিচারপদ্ধতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদ্ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস-লেখকের প্রধান চেষ্টা, তাহা ভাল করিয়া আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয় না। কবি কহ্লণ 'রাজতরঙ্গিনী'র উপোদ্ঘাতে লিখিয়া গিয়াছেন,—

শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষ-বহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী॥

"আমাদিগের সাহিত্যে এই উপদেশবাক্য এখনও সম্যক্ মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগ, আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে। পালবংশের এবং সেনবংশের নরপালগণের শাসনসময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা যেন তুচ্ছ কথা,—তাঁহাদিগের জাতি কি ছিল, তাহাই এখনও আমাদিগের নিকট প্রধান আলোচ্য হইয়া রহিয়াছে।"

"পক্ষান্তরে 'গৌড়রাজমালা'য় দেখিতে পাওয়া যাইবে,—পাল-নরপালগণের অভ্যুদয় লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে, সমগ্র দেশ বহুসংখ্যক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল; সমগ্র দেশের উপর কাহারও কোনরূপ আধিপত্য বিদ্যমান ছিল না; বাহুবল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; সবলের কবলে দুর্ব্বলদল নিপীড়িত হইতেছিল; দেশ একেবারে 'অরাজক' হইয়া পড়িয়াছিল! সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ অবস্থার নাম 'মাৎস্য ন্যায়'। তাহাকে বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে, প্রজাপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। তিনিই পাল-নরপালবংশের প্রথম ভূপাল,—ইতিহাসে "প্রথম গোপালদেব" নামে উল্লিখিত।

"এদেশের প্রজাপুঞ্জ, অরাজকতা দূর করিবার জন্য, একবার একজনকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া, প্রজাশক্তির বিধিদত্ত অমোঘবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল,—ইহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে, কোন্ কোন্ সময়ে, প্রজাশক্তির এরূপ উন্মেষ লক্ষিত হইয়াছে, তাহার আলোচনার সময়ে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি স্মরণ করিবার যোগ্য।"

মহাবলপরাক্রান্ত পাল সম্রাটগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, বরেন্দ্রমণ্ডলে সংস্থাপিত গরুড়স্তম্ভের দ্বিতীয় শ্লোকে তাহার অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুস্তকের কাগজ, ছাপা ও ছবি ভাল। ছাপা নির্ভুল না হওয়া দুঃখের বিষয়। এইরূপ একখানি বহিতে অনেক ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। পুস্তকের শেষে একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী দেওয়া উচিত ছিল।

সম্পাদক।

মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায় —

গৌহাটী কটন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীরামলাল বেদান্ততীর্থ বিদ্যারত্ন, এম্-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ডি, এন, ভট্টাচার্য্য (ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১১+৮৪+২৮+১৬; মূল্য ১৷০।

দুইখানা হস্তলিপি এবং ছয়খানা মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে বেদান্ততীর্থ মহাশয় কুল্লুক ভট্টের টীকা সহ মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পাদন করিয়াছেন। পাদটীকায় পাঠান্তর এবং পরিত্যক্ত অংশ দেখান হইয়াছে। কুল্লুক ভট্টের টীকাতে যে যে অংশ অপরাপর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয় তাহার মূল নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন। যে সমুদয় স্থলের মূল নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয় নাই, গ্রন্থের শেষে তাহার এক তালিকা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকা ইংরাজীতে লেখা এবং ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। সম্পাদক-মহাশয়-প্রদত্ত টীকাও (২৮ পৃঃ,) মূল্যবান। বি-এ, পরীক্ষার্থী এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। একটা অনুবাদ দিলে গ্রন্থের মূল্য আরও বর্দ্ধিত হইত।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

শিক্ষা-সমালোচনা—

কলিকাতা, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম্-এ প্রণীত। পৃঃ ২+।২+১২৪ ; মূল্য ১৲

এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে—

(১) মনুষ্যত্ব লাভের সোপান, (২) চিন্তায় মৌলিকতা, (৩) চরিত্র-গঠনের উপাদান—মানবসেবা, (৪) আরোহপদ্ধতির অধ্যাপনাপ্রণালী, (৫) জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে ? (৬) ভাষাশিক্ষাপ্রণালী, (৭) শিক্ষার আন্দোলন ও প্রচারক, (৮) আদর্শ-শিক্ষা-পদ্ধতি, (৯) বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা।

প্রত্যেক অধ্যায়ই সুলিখিত। শিক্ষকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন; সাধারণ পাঠকের পক্ষেও ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র এম্-এ, সি-এস্, এই গ্রন্থের এক ভূমিকা লিখিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে তরলতার পরিচয় না দিলেই ভূমিকার মূল্য বর্দ্ধিত হইত।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।



মহাত্মা উইলিয়ম ষ্টেড্।
ইনি সমস্ত জগতের হিতৈষী বন্ধু ও নির্ভীক ন্যায়নিষ্ঠ বীর ছিলেন; টাইটানিক জাহাজ ডুবির সময় ইনি স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

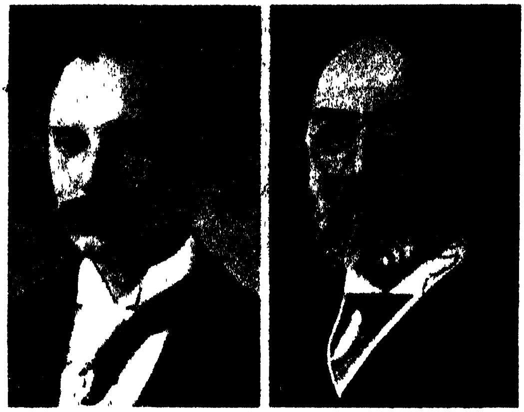
বিবিধ-প্রসঙ্গ

"টাইটানিক" জাহাজ ডুবির সময় মৃত্যু আসন্ন জানিয়াও অনেক ইংরাজ ও মার্কিন্ পুরুষ নারী অবিচলিত চিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়াছেন। অনেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে চেষ্টা না করিয়া অপরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন এবং স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই যে নির্ভীকতা ও আত্মোৎসর্গ, ইহা কোন কোন জাতিতে যতটা দেখা যায়, অন্য কোন কোন জাতিতে তত দেখা যায় না; তাহার কারণ কি? একজন ফরাসী নাট্যকার "ফিগারো" নামক ফরাসী কাগজে লিখিয়াছেন যে ফরাসী জাতি নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সকল অবস্থায় নারীকে রক্ষা করিবার যে ভাবে (chivalry) ইউরোপকে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাহা এই নির্ভীকতা ও আত্মোৎসর্গের একটি কারণ। অপর কারণ, ফলাফল সুখদুঃখ বিচার না করিয়া কর্ত্তব্যপালনে যে দৃঢ়তা আধুনিক যুগে জন্মিয়াছে (modern stoicism)। এগুলি অবশ্য কারণ বটে; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা কতকগুলি ব্যবসায়ে, কার্য্যে ও নৈসর্গিক অধিকার ভোগে অভ্যস্ত থাকায় সমুদয় কারণ ঠিক ধরিতে পারেন না। স্বদেশ রক্ষা বা বিদেশ আক্রমণ জন্য ঐসকল দেশে স্থলসৈন্য ও জলসৈন্য আছে। সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরই ঐসব দেশে স্থলসৈনিক বা জলসৈনিক হইবার অধিকার বা সম্ভাবনা আছে। তজ্জন্য এমন কোন গ্রাম নাই, যাহা হইতে কেহ না কেহ সৈনিক না হইয়াছে। এইজন্য মুহূর্ত্তমধ্যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া, প্রাণটি হাতে লইয়া যুদ্ধ করা, সে দেশের লোকদের কাছে অসাধারণ ব্যাপার নয়। ঐসব দেশে অস্ত্র-আইন না থাকায়, যাহার ইচ্ছা অস্ত্র রাখিতে পারে, স্বদেশে বিদেশে ভীষণ হিংস্র জন্তু শিকার করিতে অভ্যস্ত হইতে পারে। তাহাতে তাহাদের পৌরুষ বৃদ্ধি হয়, মৃত্যুভয় কম হয়। ঐসব দেশের লোকেরা নানাবিধ পুরুষোচিত বিপদসম্ভাবনাসঙ্কুল ব্যায়াম



কাপ্তেন স্মিথ।

টাইটানিক জাহাজের অধ্যক্ষ। ইনি স্বীয় জাহাজের সহিত বীরের ন্যায় সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছেন।



জন জেকব এষ্টর ও ইসিদোর ষ্ট্রস।

ইঁহারা ধনকুবের, আত্মরক্ষা অপেক্ষা পরের প্রাণ রক্ষায় ধর্ম্ম, গৌরব ও আনন্দ বোধ করিয়া স্বেচ্ছায় সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছেন।

ও ক্রীড়া করে। আজকাল কত লোক যে এরোপ্লেন্ নামক আকাশযানের সাহায্যে আকাশে উঠিতেছে এবং তন্মধ্যে যে কত লোকে অকস্মাৎ আকাশ হইতে পড়িয়া মারা পড়িতেছে, তাহা মনে করিয়া রাখা যায় না। অথচ এরোপ্লেন্ আরোহণ হইতে কেহ নিবৃত্ত হওয়ার চিন্তা মনে স্থান দিতেছে না। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা বাণিজ্যের জন্য, যুদ্ধের জন্য, নানাদেশ ভ্রমণের জন্য, স্বাস্থ্যলাভ বা আনন্দের জন্য, তিমি, কড্ মৎস্য প্রভৃতি ধরিবার জন্য, প্রবলাদি মূল্যবান্ দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য, টেলিগ্রাফের তার সমুদ্রতলে বসাইবার জন্য, বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য, সুমেরু কুমেরু বা তন্নিকটবর্ত্তী দেশ আবিষ্কার ও অধিকার করিবার জন্য, জাহাজে করিয়া মহাসাগরবক্ষে যাতায়াতে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জনে অভ্যস্ত। ইহা বড় বিপৎসঙ্কুল। কিন্তু এইরূপ বিপৎসম্ভাবনায় অভ্যস্ত হওয়ায় লোকেরা সাহসী ও মৃত্যুভয়ে অবিচলিত হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাও আফ্রিকার অনেক অজ্ঞাত প্রদেশ, মরুভূমি ও অরণ্যানী অতিক্রম ও আবিষ্কার করিয়া মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করিতে শিখিতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা কত বিষাক্ত বাষ্প, কত বিপজ্জনক বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার বা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন, ও তৎসমুদয়ের গুণাগুণ পরীক্ষা করেন। তাহাতেও মৃত্যু-সম্ভাবনা আছে। তাঁহারা প্লেগ আদি ভীষণ মহামারীর বীজ অনুসন্ধান করিতে গিয়াও মৃত্যুর সম্মুখীন হন। উচ্চ পর্ব্বত আরোহণ, উচ্চ পর্ব্বতমালার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে পদক্ষেপ ইত্যাদি চেষ্টার দ্বারাও পাশ্চাত্য অনেক পর্য্যটক নিজ নিজ কষ্টসহিষ্ণুতা ও পৌরুষের পরিচয় দেন। ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির ধাতু-নিঃস্রাবী গহ্বরমুখেও ইঁহারা অবতরণ করিতে ইতস্ততঃ করেন না।

"টাইটানিক" জাহাজ ডুবির সময় আর একটি দৃশ্য এই দেখা গিয়াছিল যে যিনি ক্রোড়পতি, বা উচ্চপদস্থ বা সাহিত্যজগতে প্রসিদ্ধ, এরূপ লোকও অতি দরিদ্র, নগণ্য লোকের জন্য প্রাণ দিলেন। তাহার কারণ এই যে পাশ্চাত্য জগতের এক এক দেশে লোকেরা প্রায় এক জাতের লোক। সত্য বটে তথায়ও ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত ও নিরক্ষর, অভিজাত ও সাধারণ লোকদের মধ্যে সর্ব্বদাই সামাজিক নিমন্ত্রণাদিতে একত্র আহার আমোদ বা বৈবাহিক আদান প্রদান হয় না। কিন্তু এইসকল শ্রেণীর মধ্যে কোন অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের মত বংশগত পার্থক্য নাই। কেহ স্পৃশ্য জাতির লোক, কেহ অস্পৃশ্য জাতির লোক, একের স্পৃষ্ট জল বা খাদ্য অন্যের অব্যবহার্য্য, একের পক্ব অন্ন অপরের অখাদ্য, এরূপ কোন বিভাগ ঐসকল

দেশে নাই। সুতরাং যে-কোন শ্বেতকায় মনুষ্য, হীন বা দরিদ্র বংশে জন্মিয়াও যথেষ্ট ধন বা বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারিলে, সাহিত্য শিল্প আদিতে যথেষ্ট প্রতিভা দেখাইতে পারিলে, যুদ্ধে শৌর্য্য দেখাইতে পারিলে, তাহার সামাজিক পদবী ও প্রতিষ্ঠা উচ্চতম শ্রেণীর লোকদের সমান হইবার একটা সম্ভাবনা আছে। এইজন্য ঐসকল দেশে, শ্বেতকায়দিগের মধ্যে দয়া ও সহানুভূতি বংশ বা রক্তের অলঙ্ঘ্য সীমায় গিয়াও বাধা পায় না। বংশ, ধনশালিতা ও বৃত্তির প্রভেদ সত্ত্বেও তথায় মনুষ্যত্বের সাধারণ ভূমিতে সকলেই দাঁড়াইতে পারে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, উহার অঙ্গীভূত হইবে কেবল ঢাকা সহরের কলেজ ও স্কুলগুলি, উহা সাক্ষাৎ ভাবে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবে, এবং ছাত্রগণকে বিশ্ববিদ্যালয়েই বাস করিতে হইবে, তাহারা নিজ বাটী বা বাসা হইতে আসিয়া স্ব স্ব শ্রেণীতে পড়িয়া যাইতে পারিবেনা। এইরূপ স্থির করিয়া দিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে একটি কমিশন বসাইয়া স্থির করিতে বলিয়াছেন, যে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ হইবে, কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, ছাত্রবেতনাদি কিরূপ হইবে, উহার অধ্যক্ষসভা কিরূপ হইবে, ইত্যাদি। ঢাকাতে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেই লোকের আপত্তি ছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনিলেন না। ঢাকায় একজন শিক্ষা-কর্ম্মচারী বঙ্গের ডিরেক্টরের আদেশ বা তাঁহার সহিত পরামর্শের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া মৃত পূর্ব্ববঙ্গ-গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিদুষ্ট শিক্ষানীতি অনুসারে কাজ করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গ-গবর্ণমেণ্টের দেহ লয় পাইয়াছে, কিন্তু উহার প্রেতাত্মা এখনও কতকগুলি রাজকর্ম্মচারীর ঘাড়ে চাপিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতেছে। সুতরাং শিক্ষা ও শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নীতি সম্বন্ধে বাঙ্গালীদিগকে এখনও সন্দিহান থাকিতে হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা আমাদের মনঃপূত হয় নাই। সভাপতি ও কোন কোন সভ্য সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। কিন্তু এখন, কাহার কাহার বিরুদ্ধে আপত্তি, তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া কোন লাভ নাই। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভ্যপদ গ্রহণ করিলে হয়ত কিছু সুফল ফলিতে পারিত। সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কমিশনের অঙ্গীভূত হইলে ভাল হইত। বঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আর কাহারও নাই। তদ্ভিন্ন, তর্কযুদ্ধে তিনি নিজমত বজায় রাখিতে সুনিপুণ। সুতরাং তিনি কেবল কমিশনের পরামর্শদাতা হওয়ায় আমরা সন্তুষ্ট হই নাই।

গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন বটে, যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের খরচ যেন এরূপ হয়, যাহাতে গরীব ছাত্রেরাও তথায় শিক্ষালাভ করিতে পারে। ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু ইহা সকলেই জানেন যে, যে সহরে কোন শিক্ষালয় অবস্থিত থাকে, তথাকার বাসিন্দারা গরীব হইলেও কোন প্রকারে মাসিক বেতনটা দিয়া ছেলেদের শিক্ষাবিধান করেন। ছেলেদের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ীভাড়া দিতে হয় না; রন্ধনের সময় অল্প চাল ডাল বেশী লইলেই ছেলেদের খাওয়াটা চলিয়া যায়। কিন্তু শিক্ষালয়ের ছাত্রাবাসে তাহাদিগকে খুব কম বাড়ীভাড়া ও খুব কম খাইখরচ দিতে হইলেও, ইহার জন্য স্বতন্ত্র নগদ টাকা দিতে হইবে বলিয়া, ইহা অনেক গরীব পরিবারের সাধ্যাতীত হইবে। এইজন্য আমাদের মনে হয় যে, সকল ছাত্রকেই বিশ্ববিদ্যালয়-সংসৃষ্ট ছাত্রাবাসে থাকিতে হইবে, এরূপ নিয়ম না করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলে নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়। যেমন, কোন ছাত্র যদি তাহার পিতা, মাতা, খুড়া, জেঠা, মামা, দাদা, প্রভৃতির গৃহে বাস করে, তাহা হইলে তাহাকে ছাত্রাবাসে থাকিতে হইবে না, এইরূপ নিয়ম করা উচিত। আর আমাদের এই প্রস্তাবটা নূতন রকমেরও নয়। বিলাতের প্রাচীন ও নূতন সাশ্রম (residential) বিশ্ববিদ্যালয়সকলে, কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে বাস করে না, অন্য বাসায় থাকে, এরূপ ছাত্রদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

রাজপুরুষদের শাসনাধীন ছাত্রাবাস সম্বন্ধে আমরা দুটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি, যদিও কোন ফললাভের আশা আমরা করি না।

ভারতবাসীদের ধর্ম্ম ও সমাজনিয়ম সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষতা ও নির্লিপ্ততা যে সকল সময়ে দেখান, তাহা নয়, কিন্তু ছাত্রাবাস সম্বন্ধে ইহা দেখাইতে যাওয়ায়, হিন্দু সমাজে যেসকল ভেদনিয়ম অনেক পরিমাণে রহিত হইয়া আসিতেছে, তাহাকে খুব কঠিন ভাবে প্রচলিত করিয়া বসেন। যেমন ছাত্রদের নিজেদের ভাড়া-করা বাসায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি জাতির এক কামরায়, ও অনেক স্থলে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করা, এবং ব্রাহ্ম ছাত্রদের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করা, চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছাত্রাবাসে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের স্বতন্ত্র স্থানে আহারের ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টায় আবার পুরাতন মনোমালিন্য এবং তুচ্ছ অবজ্ঞা দ্বেষের পুনরাবির্ভাব হইতেছে। ইহাকে আমরা একটি কুফল মনে করি।

ছাত্রগণ পিতামাতা বা অন্য স্বাভাবিক অভিভাবকের গৃহে এবং নিজেদের ভাড়া-করা বাসায় সংবাদপত্র ও

মাসিকপত্র পাঠ সম্বন্ধে এবং অরাজনৈতিক বক্তৃতাদি শ্রবণ সম্বন্ধে যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে, রাজপুরুষদের অধীনস্থ ছাত্রাবাসসকলে তাহা পায় না; বিশেষতঃ যে-সকল স্থানে পূর্ব্ববঙ্গের মত শিক্ষানীতি চলিত আছে। ইহাতে ছাত্রদের চরিত্রগঠন, প্রকৃতির বিকাশ এবং জ্ঞানবৃদ্ধির বিশেষ অন্তরায় ঘটে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে; পরীক্ষা কিরূপ ভাবে গৃহীত হইবে; ইত্যাদি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কিছু নির্দ্ধারণ করিয়া দেন নাই। কিন্তু কমিশনটি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সভাপতি ও সম্পাদক সরকারী তরফের প্রস্তাব যে ভাবে পেশ্ করিবেন, তাহাই অধিকাংশ সভ্য কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে, বোধ হয়। তথাপি কোন কোন বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে বলি।

পরীক্ষায় কেহ কোন বিষয়ে উত্তীর্ণ না হইলে, পরবর্ত্তী পরীক্ষায় তাহাকে কেবল সেই বিষয়েই পরীক্ষা করা উচিত। এইরূপ নিয়ম করিয়া, পাশের নম্বর শতকরা ২৫ হইতে ৩৩ না রাখিয়া, শতকরা ৪৫ রাখিলেও ক্ষতি নাই। পাশ্চাত্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বৎসরের মধ্যে একাধিক বার পরীক্ষা লওয়া হয়। আমাদের এখানে এক পরীক্ষায় কেহ অকৃতকার্য্য হইলে এক বৎসর পরে তবে আবার তাহার পরীক্ষা দিবার সুযোগ হয়। অথচ হয়ত সে কয়েকমাসের পরিশ্রমের পরেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। তজ্জন্য আমাদের দেশেও বৎসরের মধ্যে একাধিক বার পরীক্ষা গৃহীত হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন পরীক্ষায় কেহ উত্তীর্ণ হইয়াছে কিনা, তাহা স্থির করিবার সময়, পরীক্ষার্থী সম্বৎসর নিজশ্রেণীতে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক আদি পরীক্ষায় কিরূপ কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছে, তাহাও বিবেচনা করা উচিত। নতুবা, অনেক নিয়মিত পরিশ্রমী মনোযোগী ছাত্র, পরীক্ষার সময় পীড়িত হইয়া পড়িলে তাহাদের সম্বৎসরের পরিশ্রম নিষ্ফল হয়। ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্রদের এইরূপ সারাবৎসরের সাপ্তাহিক আদি পরীক্ষার ফল গণনার মধ্যে সম্ভবপর নহে এইজন্য যে ভিন্ন ভিন্ন কলেজের অধ্যাপকদের উৎকর্ষ-নির্ণায়ক মাপকাঠি এক নয়। কিন্তু যখন ঢাকায় শিক্ষাপ্রধান (teaching) বিশ্ববিদ্যালয় হইতেছে তখন আর এ বাধা থাকিবে না। সুতরাং আমাদের প্রস্তাবমত ব্যবস্থা করা সুসাধ্য ও সমীচীন হইবে।

শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে নানাবিধ প্রস্তাব সাধারণের সমক্ষে রহিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি উৎকৃষ্ট শিল্পশিক্ষালয় করা হউক। ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই। ইহা ভালই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশের জন্য একটি শিল্পশিক্ষালয়ের প্রস্তাব রহিয়াছে। ঢাকায় শিল্পশিক্ষালয় করিতে হইলে, হয় ঐ বঙ্গীয় শিল্পশিক্ষালয়টিকে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, কিম্বা সেখানে দ্বিতীয় একটি শিল্পশিক্ষালয় খুলিতে হইবে। ইহার মধ্যে কোন প্রস্তাবই গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বর্ত্তমানে ঢাকা সহরে যে যে স্কুল ও কলেজে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইগুলিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, গবর্ণমেণ্ট ইহা স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে কমিশনের কোন মতামত খাটিবে না। এইসব সাধারণ শিক্ষালয়গুলিকে শিল্প-শিক্ষালয়ে পরিণত করা নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। তাহা করিলে, ঢাকা সহরে সাধারণ শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কলেজও রাখিতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই দুদিকে খরচ করিবেন না। যদি করেন ত ভালই।

আমাদের বিবেচনায় বিলাতের কোন কোন (যেমন লীড্স্) আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে সম্ভবপর কৃষি আদি শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ধান ও পাটের চাষ পূর্ব্ববঙ্গের লোকদের একটি প্রধান জীবনোপায়। চা প্রাকৃতিক হিসাবে পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভূত কোন কোন জেলার এবং আসামের একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। অতএব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধান্য পাট ও চার চাষ শিখান উচিত। তদ্রূপ এণ্ডি রেশম উৎপাদন ও তাহা হইতে বস্ত্রবয়ন, কমলালেবুর চাষ, আসামের খনি হইতে কেরোসিন তৈল সংগ্রহ ও তাহা হইতে বাতি বস্তুত করা, ইত্যাদিও শিখান উচিত। ঢাকার চিকিৎসা-বিদ্যালয়টিকে মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করা উচিত, এবং উচ্চ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষারও বন্দোবস্ত করা উচিত। জীবনবিদ্যা (Biology), রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট যন্ত্রসংগ্রহ ও পরীক্ষাগার থাকা উচিত। মনস্তত্ত্ব আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সকলে যেমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিখান হয়, তদ্রূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাস একটি প্রধান অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া উচিত। এইজন্য মানববিজ্ঞান (anthropology) শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; ভারতবর্ষে প্রাপ্ত প্রাচীন ও নবীন প্রস্তর (palæolithic and neolithic) যুগের নানা অস্ত্রশস্ত্র ও কঙ্কালাদি এবং বর্ত্তমানে ভারতবাসী নানা অসভ্য জাতির অস্ত্রশস্ত্র পরিচ্ছদাদি বিশ্ববিদ্যালয়-সংসৃষ্ট মুজিয়মে সংগৃহীত ও রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য; নানা প্রদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রা ও তাম্রশাসনাদির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া তাহা পাঠ ও তাহা হইতে ঐতিহাসিক তথ্যোদ্ধার শিখান উচিত; ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে অধ্যাপকদের

নেতৃত্বে বার্ষিক তীর্থযাত্রার বন্দোবস্ত করা উচিত। পুরাতন ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও সাধারণ সাহিত্য হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। এইসমস্ত পুস্তক প্রধানতঃ সংস্কৃত, পালি, ফারসী, তিব্বতীয় ও চীন ভাষায় লিখিত। এইসকল ভাষা শিখাইবার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন জর্ম্মান্ ও ফরাশিশ ভাষায় ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এইসকল ভাষা শিক্ষার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

মনে হইতে পারে, যে, আমরা বড় লম্বা-চৌড়া বরাত করিতেছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন বলিতেছেন যে বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার সমুচিত বন্দোবস্ত করিবার জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তখন পাশ্চাত্য ভাল ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটা কিছু না করিলে সে কথার কোন অর্থই হয় না। কেবল বা প্রধানতঃ ছাত্রদিগকে কড়া পাহারার মধ্যে রাখিবার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলে তাহার দ্বারা বাঙ্গালীর খুব উচ্চশিক্ষা হইতেছে, ইহা কেহই মনে করিবেনা।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত, উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে ব্যায়ামগৃহ থাকা উচিত। তাহাতে জাপানী কুস্তি (জিউজিৎস্ু), সেণ্ডোর ব্যায়ামপ্রণালী, লাঠিখেলা, ঘুসোঘুসি, প্রভৃতি শিখান উচিত। নৌচালনও শিখান কর্ত্তব্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসে, যে, ছাত্রদের শিক্ষালয়-সংস্পৃষ্ট ছাত্রাবাসে থাকিয়া শিক্ষা করা ভাল, না নিজ পিতামাতার নিকট থাকিয়া শিক্ষা করা ভাল। আমাদের বিবেচনায় পিতা মাতার নিকট থাকিয়া শিক্ষা করাই ভাল। কারণ তাহাতে ছাত্রগণ পারিবারিক কার্য্যে অভ্যস্ত হয়, পরিবারের সুখদুঃখের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া পরিবারে রোগীর পরিচর্য্যাদি করিয়া, পারিবারিক জীবনের সম্যক লাভ করে, ও ভবিষ্যতে গার্হস্থ্য জীবন যাপনের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। অনেকে বলিবেন, যে, অনেক পরিবার সুশিক্ষার আলয় নহে। ইহা সত্য; কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে, যে ছাত্রাবাসসকলের অধ্যক্ষ ও পর্য্যবেক্ষকগণ অনেক স্থলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্নেহশীল, বিবেচক, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং মহচ্চরিত্র নহেন? প্রাচীনকালে গুরুগৃহে বাস করিয়া শিক্ষালাভের নিয়ম ছিল বটে। কিন্তু সেই গুরুগণ সপরিবারে আশ্রমে বাস করিতেন, ছাত্রগণ তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইয়া একদিকে যেমন সংযম শ্রমশীলতা সহিষ্ণুতাদিতে অভ্যস্ত হইত, অপরদিকে তেমনি পারিবারিক জীবনের স্নেহ ও মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিত। বর্ত্তমান ছাত্রাবাসগুলি গুরুগৃহ নহে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নহে, এবং ঐগুলির দারোগা ও প্রহরী মহাশয়েরাও প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ জ্ঞানধর্ম্মান্বেষী গুরু নহেন। সুতরাং প্রাচীনকালের আশ্রম চতুষ্টয়ের কথা এই প্রসঙ্গে না তোলাই ভাল।

সুখের বিষয় দেশের নানাস্থানে জনসাধারণের শিক্ষার চেষ্টা হইতেছে। অনেক স্থান হইতে এই অভিযোগ শুনা যায় যে যথেষ্ট ছাত্র পাওয়া যায় না, পাইলেও কোন কোন ছাত্র কিছুদিন আসিয়া তাহার পর আর আসে না। সকল দেশেই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টায় এই বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশে ছুতার, কামার, রাজমিস্ত্রী, প্রভৃতির কাজ চিরাগত প্রথা অনুসারে চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য দেশের নূতন প্রণালী শিখাইবার মত বহি বাংলা ভাষায় লিখাইয়া সেইগুলিকে অবলম্বন করিয়া যন্ত্র ও হাতিয়ারের সাহায্যে শিক্ষা দিতে পারিলে হয়ত আরও বেশী ছাত্র পাওয়া যাইতে পারে। ছুতার, কামার, রাজমিস্ত্রী, সেকরা প্রভৃতির কাজে রেখাঙ্কণ (drawing) বেশ কাজে লাগে। রেখাঙ্কণ শিখাইবার বন্দোবস্ত করিলে কেমন হয়? সোজা চাষের বহি ছাত্রদিগকে দিলে কেমন হয়?

সুইডেন্ নরওয়ে প্রভৃতি দেশে স্লইড্ (sloyd) নামক এক প্রকার শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহাতে চোখের পর্য্যবেক্ষণশক্তি, দেখিয়াই দৈর্ঘ্যাদি নিরূপণ ও বস্তুর আকৃতি নির্দ্ধারণ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে হাতের দক্ষতাও জন্মে। ইহা মহীশূরে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। তৎসম্বন্ধে তদ্দেশবাসী শ্রীযুক্ত ভাভা একটি রিপোর্ট লিখিয়াছেন। জনসাধারণের শিক্ষাবিধানপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের তাহা পাঠ করা উচিত।

এই বৎসর বাঁকিপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। প্রথমে শুনা গিয়াছিল যে উহার আয়োজনকারী সমিতিতে কোন বেহারবাসী বাঙ্গালী যোগ দেন নাই। তৎপরে দেখিলাম দুজন যোগ দিয়াছেন। এইরূপই হওয়া উচিত। বাঙ্গালী যেখানেই থাকুন, তথাকার লোকদের সঙ্গে একযোগে দেশহিতকর কাজ করা উচিত। যত বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী অবাঙ্গালী বাঙ্গলা দেশে আসিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের রোজগারের সমষ্টি, বঙ্গবাসী অবাঙ্গালীদের রোজগারের সমষ্টি অপেক্ষা অনেক কম। খাস্ বেহারে যত বাঙ্গালী আছেন, খাস্ বঙ্গে তাহার চেয়ে অনেকগুণ বেশী বেহারী আছেন। কেহ কাহারও প্রদেশ লুটিয়া খাইতেছেন, এইরূপ মনে

করিয়া ঈর্ষ্যা বা সঙ্কোচ অনুভব করা কর্ত্তব্য নহে। যাহার শক্তি আছে, সে যেখানে পারে, করিয়া খাইবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

কুমারী যামিনী সেন, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-উপন্যাস-লেখক স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা এবং 'আলো ও ছায়া'-রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের ভগিনী। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া পূর্ব্বে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শেষ



ডাক্তার শ্রীমতী যামিনী সেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রয়্যাল ফ্যাকল্টি অব ফিজিশিয়ান্স্ এণ্ড সার্জ্জনসের ফেলো হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও নারী এই সম্মান লাভ করেন নাই। কুমারী সেন অনেক বৎসর নেপাল রাজ-দরবারের চিকিৎসক ছিলেন। তথায় তিনি প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য ও নির্ম্মলতা, স্বল্পভাষিতা, বিলাসবিমুখতা, দৃঢ়চিত্ততা ও নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্য, প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অধিকন্তু সুচিকিৎসক বলিয়াও তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল। নেপালের প্রধান রাজমন্ত্রী মহারাজ সার চন্দ্রশামসের জঙ্গকে যে কথা কেহ বলিতে সাহস করিত না, তিনি তাহা বলিতেন। নেপাল হইতে তিনি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া আসেন; বিপৎসঙ্কুল অস্ত্রচিকিৎসার পর আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু ডাক্তারেরা বলেন যে তাঁহাকে চিরজীবন রোগীর মত সাবধান থাকিতে হইবে, কঠিন পরিশ্রমের যোগ্যতা তাঁহার আর হইবে না। এই অবস্থাতেও তিনি বিদেশে গিয়া গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বজাতীয়া নারীদের মধ্যে প্রথমে এই উচ্চসম্মান লাভ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী সংশোধিত হইতেছে। যাহারা ম্যুনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্‌ট্ বোর্ডের সভ্য নহেন বা কখনও ছিলেন না, এরূপ লোকেও তাহাদের প্রতিনিধি হইবার অধিকার পাইলে ভাল হয়। তদ্ভিন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের মত যাহাতে তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ব্যবস্থাপক সভায় ব্যক্ত হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। অর্দ্ধশিক্ষিত বা "জোহুকুম"-বাদী লোক অধিকাংশস্থলে সভ্যপদ পাইলে ব্যবস্থাপক সভাগুলি নিতান্তই অকেজো হইয়া থাকে।

চিত্র-পরিচয়

মশাল-আলোকে।

প্রতীচ্য শিল্পকলায় প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্রের যেমন প্রাধান্য আছে, প্রাচ্যকলায় তেমন নাই; তাহার মধ্যে আবার চীন ও জাপানের চিত্রকলায় যতটুকু আছে ভারতীয় চিত্রকলায় আবার তাহাও নাই। ভারতীয় চিত্রশিল্পে প্রাকৃতিকদৃশ্য মূর্ত্তিচিত্রের পারিপার্শ্বিক মাত্র। এই পারিপার্শ্বিক দৃশ্য-চিত্রও বোধ হয় খাঁটি ভারতীয় নহে, চীন প্রভাবে পরিগৃহীত। কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্পে প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিকল্পনা যতটুকু দেখা যায় সেইটুকু প্রকৃতই কলাসম্মত—ইহা সুন্দরকে সুন্দরতর করে, প্রকৃতির কবিত্বটুকু ছানিয়া প্রকাশ করে, মানব-অন্তরে যাহা সত্য শিব সুন্দর তাহারই উদ্বোধনের সহায়তা করে। ইহা হইতে আমরা যে আভাস পাই তাহাতে অন্ধকারের অন্ধকারত্ব ও আলোকের আলোকত্ব সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। এমাসন প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রণের ইহাই প্রকৃত

উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিশেষজ্ঞ হ্যাভেল তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কৃত্রিম আলোক সম্পাতে যে উজ্জ্বলমধুর স্নিগ্ধ ভাবটি ফুটে তাহাই প্রকাশ করিতে ভারতীয় শিল্পীরা খুব ভালো বাসিতেন বলিয়া মনে হয়।

মুখপত্ররূপে মুদ্রিত চিত্রখানি কোনো প্রাচীন শিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত; কলিকাতা আর্ট গ্যালারীতে সংরক্ষিত; এবং বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার মহোদয়ের অনুমতি-অনুসারে মুদ্রিত। এই চিত্রখানির বিষয়—এক রাজপুত রাজদম্পতি অশ্বারোহণে রাত্রিকালে মশালের আলোকে গিরিপথ অতিক্রম করিতেছেন; সঙ্গে লোকলস্কর, মশালচি পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। রাত্রির অন্ধকার যাত্রীদলকে ঘিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু মশালের আলোকে সম্মুখে যেমন তাহা সরিয়া সরিয়া যাইতেছে পশ্চাতে আবার তেমনি ঘন হইয়া ঘিরিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে। রমণী অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইতেছেন গন্তব্যস্থান আর অধিকদূরে নাই, অন্ধকার আর প্রগাঢ় থাকিবে না, গিরিঅন্তরালে চন্দ্রকলা উঁকি মারিয়াছে, তাহার ক্ষীণ আলোকে গিরিনদী ইস্পাতের ছুরির মতো বিচ্ছুরিত হইতেছে।

এই চিত্র আলোকছায়া সম্পাতে অর্দ্ধস্ফুট সুষমায় বর্ণিত বিষয়টিকে মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দিতেছে।

কপিল মুনি।

কপিল মুনি পাতালে তপস্যামগ্ন ছিলেন; তপস্যাবিঘ্ন করাতে সগররাজার অশ্বমেধতুরঙ্গ-অন্বেষণকারী ষাটহাজার পুত্র তাঁহার ক্রোধে ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই ব্যাপারের অব্যবহিত অবস্থা এই মূর্ত্তিটিতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

কপিলমুনি ধ্যানভঙ্গে সগরসন্তান ভস্ম করিয়া 'মহারাজলীলা' আসনে বসিয়া আছেন; তাঁহার দক্ষিণহস্তে অশ্ববল্গা বিধৃত, কিন্তু মুখ সেদিক হইতে পরাবর্ত্তিত—তাঁহার সহিত অশ্ব সম্বন্ধীয় ঘটনা একদিকে সংযুক্ত অথচ তিনি তাহাতে নিরিপ্ত বিরক্ত, ইহাই সূচিত হইয়াছে। মুনির মুখভাব প্রশান্ত অথচ গর্ব্বিত, সরল এবং বাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ। মূর্ত্তিটি শিল্পীর চরম কুশলতার নিদর্শন।

এই মূর্ত্তিটি সিংহলের অনুরাধপুরে ঈশুরমুনিয় বিহারে প্রাচীরগাত্রে কুঁদিয়া বাহির করা। ইহা শীগিরিয়-প্রতিষ্ঠাতা পিতৃহন্তা প্রথম কাশ্যপের প্রায়শ্চিত্ত-কর্ম্মের একতম বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। তাহা হইলে ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ।

এই মূর্ত্তির চিত্রটি ও গতবারের মুখপত্র "সরোবর-তীরে হংস" চিত্রটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের A History of Fine Art in India and Ceylon নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

কষ্টিপাথর

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা (জ্যৈষ্ঠ)।

ছুটি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

কোলাহল ত বারণ হল
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবল মাত্র গানে গানে।
রাজার পথে লোক ছুটেছে,
বেচাকেনার হাঁক উঠেছে,
আমার ছুটি অবেলাতেই
দিনদুপুরের মধ্যখানে।
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই বা জানে।

মোর কাননে অকালে ফুল
উঠুক তবে মঞ্জরিয়া।
মধ্যদিনের মৌমাছিরা
বেড়াক মৃদু গুঞ্জরিয়া।
মন্দ ভালোর দ্বন্দ্বে খেটে
গেছে ত দিন অনেক কেটে,
অলস বেলার খেলার সাথী
এবার আমার হৃদয় টানে।
বিনা কাজের ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই বা জানে।

রোগীর নববর্ষ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

একটু দূরে আসিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে কোনো বড় জিনিষকে ঠিক বড় করিয়া দেখা যায় না। যখন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকি তখন সকল জিনিষকে নিজের পরিমাণেই খাটো করিয়া লই। তাহা না করিলে প্রতিদিনের কাজ চলে না। এইজন্য বর্ত্তমানের ছোট ছোট নিমেষগুলির বোঝা মানুষের কাছে যত ভারি এমন অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ নহে। শাস্ত্রে তাই বলে আমাদের সমস্ত আবরণ আসক্তিরই অর্থাৎ আকর্ষণেরই রচনা। কিছু একটা করিতেই হইবে, ফল একটা পাইতেই হইবে, আমার হাতের কাজ আমি না হইলে সম্পন্নই হইবে না, এই চিন্তায় নিজেকে একটু অবসর দেওয়া অপরাধ বলিয়া মনে হয়। কর্ত্তব্যপরতা যত মহৎ জিনিষই হোক সে যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে তখন সে আপনি বড় হইয়া মানুষকে খাটো করিয়া দেয়। কিন্তু মানুষের আত্মা মানুষের কাজের চেয়ে বড়। রোগ যখন মানুষকে কাজ হইতে ছুটি লইতে বাধ্য করে তখন এই সত্যটি স্পষ্ট হয় তখন বিশ্ববীণা সুন্দর হইয়া বাজে, সমস্ত রূপরসগন্ধ মানুষের কাছে স্বীকার করে যে তোমারি মন পাইবার জন্য আমরা বিশ্বের প্রাঙ্গনে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি। মৃত্যুর পরিপূর্ণতা যে কি সুগভীর তাহা তখনই আস্বাদন করা যায়। তখনই দেখা যায় মৃত্যুর পটে আঁকা জীবনের ছবি; যেখানে বৃহৎ, যেখানে বিরাম, যেখানে নিস্তব্ধ পূর্ণতা, তাহারি উপরে সুন্দরী চঞ্চলতার নূপুর-নিক্কণ, তাহার নানা রঙের আঁচলখানির এই উচ্ছ্বসিত ঘূর্ণ্যগতি। রোগশয্যায় শুইয়া তাইত আমি দেখিতেছি বাহিরের দরজায় লক্ষ লক্ষ চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা আলো হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে;

আমি দেখিতেছি মানুষের ইতিহাস জন্মমৃত্যু উত্থানপতন ঘাতপ্রতিঘাত উচ্চকলরবে উতলা হইয়া ফিরিতেছে—কিন্তু সেও ত ঐ বাহিরের প্রাঙ্গণে। আমি দেখিতেছি ঐ যে রাজার বাড়ি তাহাতে মহলের উপর মহল উঠিয়াছে, তাহার চূড়ার উপরে নিশান মেঘভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে আর চোখে দেখা যায় না। কিন্তু চাবি যখন লাগিল, দ্বার যখন খুলিল—ভিতর বাড়িতে এ কি দেখা যায়! সেখানে আলোয় ত চোখ ঠিকরিয়া পড়ে না, সেখানে সৈন্যসামন্তে ঘর জুড়িয়া ত দাঁড়াইয়া নাই। সেখানে মণি নাই মাণিক নাই, সেখানে চন্দ্রাতপে ত মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে না। সেখানে ছেলেরা ধূলাবালি ছড়াইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতেছে, তাহাতে দাগ পড়িবে এমন রাজআস্তরণ ত কোথাও বিছানো নাই। সেখানে যুবক-যুবতীরা মালা বদল করিবে বলিয়া আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিতেছে কিন্তু রাজোদ্যানের মালী আসিয়া ত কিছু-মাত্র হাঁকডাক করিতেছে না। বৃদ্ধ সেখানে কর্ম্মশালার বহু-কালিমা-চিহ্নিত অনেক দিনের জীর্ণ কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিয়া পট্টবস্ত্র পরিতেছে। কোথাও ত কোন নিষেধ দেখিনা। ইহাই আশ্চয্য যে এত ঐশ্বর্য্য এত প্রতাপের মাঝখানটিতে সমস্ত এমন সহজ, এমন আপন। ইহাই আশ্চয্য, পা তুলিতে ভয় হয় না, হাত তুলিতে হাত কাঁপে না। ইহাই আশ্চর্য্য যে এমন অভেদ্য রহস্যময় জ্যোতির্ম্ময় লোক-লোকান্তরের মাঝখানে এই অতি ক্ষুদ্র মানুষের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ খেলাধূলা কিছুমাত্র ছোট নয়, অসঙ্গত নয়—সে জন্য কেহ তাহাকে একটুও লজ্জা দিতেছেনা। সবাই বলিতেছে তোমার ঐটুকু খেলা, ঐটুকু হাসিকান্নার জন্যই এত আয়োজন—ইহার যতটুকু তুমি গ্রহণ করিতে পার ততটুকুই সে তোমারি;—যতদূর পর্য্যন্ত তোমার মন দিয়া বেড়িয়া লইতে পার সে তোমারি মনের সম্পত্তি। তাই এত বড় জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমার গৌরব ঘুচিল না—ইহার অন্তবিহীনভারে আমার মাথা এতটুকুও নত হইল না।

কিন্তু ইহাও বাহিরে। আরো ভিতরে যাও—সেখানেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য। সেইখানেই ধরা পড়ে, কৌটার মধ্যে কৌটা, তাহার মাঝখানে যে রত্নটি সেই ত প্রেম। কৌটার বোঝা বহিতে পারিনা কিন্তু সেই প্রেমটুকু এমনি যে, তাহাকে গলার হার গাঁথিয়া বুকের কাছে অনায়াসে ঝুলাইয়া রাখিতে পারি। প্রকাণ্ড এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝ-খানে বড় নিভৃতে ঐ একটি প্রেম আছে—চারিদিকে সূর্য্যতারা ছুটাছুটি করিতেছে, তাহার মাঝখানকার স্তব্ধতার মধ্যে ঐ প্রেম, চারিদিকে সপ্তলোকের ভাঙাগড়া চলিতেছে, তাহারি মাঝখানকার পূর্ণতার মধ্যে ঐ প্রেম। ঐ প্রেমের মূল্যে ছোটও যে সে বড়, ঐ প্রেমের টানে বড়ও যে সে ছোট। ঐ প্রেমই ত ছোটর সমস্ত লজ্জাকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, বড়র সমস্ত প্রতাপকে আপনার মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ঐ প্রেমের নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই বিশ্বজগতের সমস্ত সুর আমারই ভাষাতে গান করিতেছে—সেখানে একি কাণ্ড! সেখানে নির্জ্জন রাত্রির অন্ধকারে রজনীগন্ধার উন্মুখগুচ্ছ হইতে যে গন্ধ আসিতেছে সে কি সত্যই আমারই কাছে নিঃশব্দচরণে দূত আসিল! এও কি বিশ্বাস করিতে পারি! হাঁ সত্যই। একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না মাঝখানে যদি প্রেম না থাকিত। সেইত অসম্ভবকে সম্ভব করিল! সেই এতবড় জগতের মাঝখানেও এত ছোটকে এত বড় করিয়া তুলিল। বাহিরের কোনো উপকরণ তাহার যে আবশ্যক হয় না, সে যে আপনারই আনন্দে ছোটকে গৌরব দান করিতে পারে।

এই জন্যই ত ছোটকে তাহার এতই দরকার। নহিলে সে আপনার আনন্দের পরিমাণ পাইবে কি করিয়া? ছোটর কাছে সে আপনার অসীম বৃহত্ত্বকে বিকাইয়া দিয়াছে; ইহাতেই তাহার আপনার পরিচয়, ইহাতেই তাহার আনন্দের পরিমাণ। সে জন্য এমন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি, এই তারাখচিত আকাশের নীচে এই পুষ্পবিকশিত বসন্তের বনে, এই তরঙ্গমুখরিত সমুদ্রবেলায় ছোটর কাছে বড় আসিতেছেন। জগতে সমস্ত শক্তির আন্দোলন, সমস্ত নিয়মের বন্ধন, সমস্ত অসংখ্য কাজের মাঝখানে এই আনন্দের লীলাটিই সকলের চেয়ে গভীর, সকলের চেয়ে সত্য। ইহা অতি ছোট হইয়াও ছোট নহে, ইহাকে কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিল না! দেশকালের মধ্যে তাহার বিহার; প্রত্যেক তিল পরিমাণ দেশকে ও পল পরিমাণ কালকে অসীমত্বে উদ্ভাসিত করা তাহার স্বভাব;—আর, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুকে নানা আড়ালের ভিতর দিয়া নিবিড় সুখেদুঃখে আপন করিয়া লওয়া তাহার পরিপূর্ণতা!

জগতের গভীর মাঝখানটিতে এই যেখানে সমস্ত একেবারেই সহজ, যেখানে বিশ্বের বিপুল বোঝা আপনার সমস্ত ভার নামাইয়া দিয়াছে, সত্য যেখানে সুন্দর, শক্তি যেখানে প্রেম, সেইখানে একেবারে সহজ হইয়া বসিবার জন্য আজ নববর্ষের দিনে ডাক আসিল। যেদিকে প্রয়াস, যেদিকে যুদ্ধ, সেই সংসার ত আছেই—কিন্তু সেইখানেই কি দিন খাটিয়া দিনমজুরী লইতে হইবে? সেইখানেই কি চরম দেনাপাওনা? এই বিপুল হাটের বাহিরে নিখিলভুবনের নিভৃত ঘরটির মধ্যে একটি জায়গা আছে যেখানে হিসাবকিতাব নাই, যেখানে আপনাকে অনায়াসে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারাই মহত্তম লাভ, যেখানে কলাফলের তর্ক নাই, বেতন নাই, কেবল আনন্দ আছে। কর্ম্মই যেখানে সকলের চেয়ে প্রবল নহে, প্রভু যেখানে প্রিয়—সেখানে একবার যাইতে হইবে, একেবারে ঘরের বেশ পরিয়া, হাসি মুখ করিয়া। নহিলে প্রাণপণ চেষ্টায় কেবলি আপনাকে আপনি জীর্ণ করিয়া আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে? নিজের মধ্যে অন্ন নাই গো অন্ন নাই—অমৃত হস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে। সে অন্ন উপার্জ্জনের অন্ন নয়, সে প্রেমের অন্ন—হাত খালি করিয়া দিয়া অঞ্জলি পাতিয়া চাহিতে পারিলেই হয়। সহজ হইয়া সেইখানে চল্—আজ নববর্ষের পাখী সেই ডাক ডাকিতেছে, বেলফুলের গন্ধ সেই সহজ কথাটিকে বাতাসে অযাচিত ছড়াইয়া দিতেছে। নববর্ষ যে সহজ কথাটি জানাইবার জন্য প্রতিবৎসর দেখা দিয়া যায়, রোগের শয্যায় কাজ ছিলনা বলিয়া সেই কথাটি আজ স্তব্ধ হইয়া শুনিবার সময় পাইলাম্—আজ প্রভাতের আলোকের এই নিমন্ত্রণপত্রটিকে প্রণাম করিয়া মাথায় করিয়া গ্রহণ করি।

ভারতী (জ্যৈষ্ঠ)।

বজ্রলেপ—শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী—

বজ্রলেপ বা বজ্রের ন্যায় কঠিন সিমেণ্ট বা আস্তর প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত হইত। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ইহার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। বৌদ্ধ যুগেও এই পদার্থ সৌধনির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত। বজ্রলেপ তিন প্রকার—ভেষজ, প্রাণিজ, ও ধাতুজ। (১) ভেষজ বজ্রলেপের উপাদান—গাবের আঠা, শিমুলফুল, শালই বীজ, ধন্বন বৃক্ষের ছাল, বচ, তার্পিন তেল, বোল, গুগ্‌গুলু, দেবদারুর আঠা, শালনির্য্যাস বা ধুনা, মসিনা বা তিসি, বেল আঠা প্রভৃতি। প্রকার ভেদে—লাক্ষা, দেবদারুর আঠা, গুগ্‌গুলু, ঝুল, কয়েৎবেল ও বেলের মধ্যভাগ, নাগফল, নিম্ব, গাব, মদনফল বা নটফল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, ধুনা, বোল, আমলকী প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইত। (২) প্রাণিজ বজ্রলেপ বা বজ্রতল শিরীশ আঠার ন্যায় পদার্থ। তাহার উপাদান—গো, মহিষ ও ছাগলের শৃঙ্গ, গর্দ্দভের রোম, মহিষ ও গরুর চর্ম্ম, নিম, কয়েৎবেল, বোল হইতে প্রস্তুত তৈলসংযুক্ত কল্ক। (৩) ধাতুজ বজ্রলেপ বা বজ্রসজ্ঘাত একপ্রকার মিশ্র ধাতু। উপাদান—৮ ভাগ সীসক, ২ ভাগ কাঁসা, ১ ভাগ পিতল।

রাং ঝাল, তামার ঝাল, পিতল ঝাল, রূপার ঝাল, সোনার ঝাল প্রভৃতির ন্যায় ইহাও একরূপ ঝাল। কোনারকের মন্দিরাদিতে এই ধাতুলেপে পাথর গাঁথার নিদর্শন দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান হয়, চুন-সুরকি বালি দিয়া ইমারত গাঁথার প্রথা পরবর্ত্তী কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরে প্রাচীন ভারতে ঘুটিং চূনের আস্তর প্রচলিত হয়। অশোকস্তম্ভের বাহ্যিক চাকচিক্য এই বজ্রলেপের জন্যই সহস্রাবৃতবর্ষস্থায়ী হইয়াছে।

আমার বাল্যকথা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

ছেলেবেলায় আমরা বাবামশায়ের কাছে বড় ঘেঁসতাম না, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ইংরেজি পরীক্ষা আর ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার বেলায়। তখন ১১ মাঘের উৎসব খুব ধুমধামে সম্পন্ন হত, পলতার বাগানে ছোটয় বড়য় মিলে আনন্দভোজ হত—তার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন জগমোহন গাঙ্গুলী। তিনি খুব সৌখীন আমুদে অথচ কর্ম্মঠ ছিলেন। তিনি এমন বলশালী ছিলেন যে একবার পুলিশ ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসে আমাদের একটা গাড়ী বলপূর্ব্বক টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তিনি একলা সেই গাড়ী ধরে রেখেছিলেন, এ আমার স্বচক্ষে দেখা। আমাদের পলতায় বোটযাত্রায় বিদূষক ছিলেন নবীনবাবু, তিনি বাবু শব্দের এক ছড়া বেঁধেছিলেন এক হাবুবাবুকে লক্ষ্য করে—

বাববো বহবঃ সন্তি বাবুয়ানা-পরায়ণাঃ।
হাবুবাবু সমোবাবু ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥

তাঁর একটা গান ছিল—

ব্যাটাছেলের মুখে কড়ি সর্ব্বলোকে কয়
সাহসের কার্য্যে ব্যাটাছেলের পরিচয়।
কলম্বস নাবিক ছিল, সাহসে আমেরিকা গেল,
দেশের বার্ত্তা জেনে শেষে দেশটি করলে জয়;
ব্যাটাছেলে হবে যদি, সাহস কর আজ অবধি
বিধবাবিবাহে কর আনন্দ উদয়।

বাবামশায় পারিবারিক উপাসনার পর উপদেশচ্ছলে আমাদের দোষ শুধরে দিতে চেষ্টা করতেন। আমি বিলাত থেকে ফিরে এসে ইংরিজি চালচলনের বাড়াবাড়ি করেছিলাম, তাঁর উপদেশ আমায় সাবধান করেছিল। বাবামশায় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে conservative ছিলেন না, বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় সাবধানে পা ফেলে মাটি পরীক্ষা করে চলতে চাইতেন। আমি ছিলুম ঘোর radical, তথাপি তিনি আমার স্বাধীন মতে বাধা দিতেন না। আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে ধমকে বলতেন "তুই মেয়েদের নিয়ে মেমেদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি না কি?" অবরোধপ্রথা আমার বড়ই অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হত। আমি গোপনে আমার এক বন্ধুকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য কত ফন্দী করতুম্। বিলেত থেকে ফিরে এসে পর্দ্দা উচ্ছেদের স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠল। আমায় কর্ম্মস্থান বোম্বাই যেতে হবে; আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। জাহাজে ওঠবার সময় বাড়ী থেকে কিন্তু কিছুতেই গাড়ী করে যাওয়া ঘটল না, আমার স্ত্রী পাল্কী করে অসূর্য্যম্পশ্য হয়ে জাহাজে উঠলেন। বোম্বাই থেকে ফিরে এসে আমার স্ত্রীকে গভর্ণমেণ্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেখানে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ঘরের বৌকে প্রকাশ্য স্থানে দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। ক্রমে স্বাধীনতার পথ সহজ হয়ে এল।

ব্যবসায়ী (চৈত্র ও বৈশাখ)।

কাগজ—

কাগজ সর্ব্বদেশে সুপরিচিত, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার নাম অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন। ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে কলাপাতে, তালপাতে, তেরেট (তাল জাতীয়) পাতে, ভূর্জ্জপত্রে লেখার কার্য্য চলিত। ধাতু ও প্রস্তরফলকও প্রচলিত ছিল। অনেক স্থানে চামড়ায় কাগজের কাজ হইত। প্রাচীন যোনজাতি পুস্তককে ডেপ্টেরি বা চর্ম্ম বলিত। গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়ড ও অডেসি সর্পচর্ম্মে লিখিত হইয়াছিল। ভারতবাসী ঘৃণা করিতেন বলিয়া ভারতে চর্ম্ম প্রচলিত হয় নাই। কথিত আছে পণ্ডিতপ্রবর সক্রেটিসকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তিনি পুস্তক লিখেন না কেন? তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, আমি জীবন্ত প্রাণীর জ্ঞান মৃতের চর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করিতে চাহি না।

কাগজ প্রথমে কোন্ জাতি প্রস্তুত করে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় খ্রীষ্টীয় ৯৫ অব্দে চীনেরাই প্রথম কাগজ প্রস্তুত করে। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে, ভোজরাজার লিখনপ্রণালীতেই প্রমাণ—১১ শতাব্দীতে কাগজের ব্যবহার ছিল। ভোজরাজা ১১০৬ সাল হইতে ১১৪২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত মামুদ গজনীর সংঘর্ষণ হয়। পাঞ্জাববিজয়ী গ্রীকসম্রাট আলেকজেন্দারের সেনাপতি "নিয়ারকস" লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এক প্রকার তুলা-চাপড়ান জিনিসের উপর বাণিজ্যাদির হিসাব লেখা হইয়া থাকে। এই তুলা-চাপড়ান সম্ভবতঃ তুলট কাগজ। এই তুলট কাগজ মালদহ জেলায় বহু পরিমাণে প্রস্তুত হইত। দেশ বিদেশে এই কাগজ রপ্তানী হইত। বাঙ্গলায় কাগজ প্রস্তুত একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে ইহা বেশ চলিয়াছিল। হাবড়া জেলার আমতা ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে ময়না গ্রামে এখনও ইহার প্রচলন আছে। জঙ্গিপুর সবডিবিশনে থানা সমসেরগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণপুর ও সীতারামপুরে এখনও এই কার্য্য বর্ত্তমান আছে। মুসলমান জাতির মধ্যে কাগজী (কাগজ প্রস্তুত-কারক) সম্প্রদায়ের হাতে এই কার্য্য ন্যস্ত আছে। মুসলমান তাঁতীরা যেমন "জোলা", মৎস্যজীবীরা যেমন "নিকারী" ইত্যাদি আখ্যা পাইয়াছিল, সেই প্রকার তাহাদের এই কাগজী আখ্যাও হইয়াছিল। এখনও কাগজী মুসলমান ঢাকা অঞ্চলে কাগজ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, কলিকাতায় ১৮৮৩।৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যে শিল্পপ্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক প্রকার পাটের কাগজ, ঢাকা মুন্সীগঞ্জের "মেঘু কাগজীর" প্রস্তুত একপ্রকার কাগজ, শাহাবাদ সসেরাম হইতে ৪ প্রকার দেশী কাগজ এবং ভূটান হইতে এক প্রকার বৃক্ষের ছালের কাগজ প্রদর্শিত হয়। ভূটিয়া কাগজে প্রায় পোকা ধরে না। এই কাগজ বেশ সুদৃশ্য ও মসৃণ। ভূটানীরা তদ্দেশজাত "ডিয়া" নামক একপ্রকার গাছের ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। ইহারা গাছের ছালগুলিকে বেশ লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া কাঠের ছাইয়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া প্রস্তরের উপর রাখিয়া মুদ্গর দিয়া পিটিয়া মণ্ড প্রস্তুত করে, তৎপরে জাপানী কাগজের প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত করে। জাপানে তুঁত গাছের ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বিশ্বামিত্র।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে অঙ্কিত চিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতিক্রমে।

Three Colour Blocks by U. Ray and Sons. *Kuntaline Press, Calcutta*

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩১৯

৪র্থ সংখ্যা

জীবন-স্মৃতি

জাহাজের খোল।

কাগজে কি একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে হইবে!

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায়, কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশালাই কাঠি জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশালাই কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল, কিন্তু সেই তাঁতের কল একটিমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, সে খোল একদা ভর্ত্তি হইয়া উঠিল, শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে, ঋণে এবং সর্ব্বনাশে। কিন্তু তবু একথা মনে রাখিতে হইবে এইসকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবী অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতিবহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যুর পরবর্ত্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।

একদিকে বিলাতী কোম্পানী আর একদিকে তিনি একলা—এই দুই পক্ষে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমশই কিরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা খুলনা বরিশালের লোকেরা এখনো বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল,—বরিশাল খুলনার ষ্টীমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনাভাড়ায় যাতায়াত সুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনা-মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল! ইহার উপরে বরিশালের ভলন্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্ত্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়া গেল। সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না কিন্তু আর সকল প্রকার অভাবই

বাড়িল বই কমিল না। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশ-হিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না;—কীর্ত্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গাণত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না—সুতরাং তিন-ত্রিক্‌খে-নয় ঠিক তালে তালে ফড়িঙের মত লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না; অথচ তাঁহারা যে চেনেন না এইটুকুমাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয় এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহজীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্ম্মচারীরা যে তপস্বীর মত উপবাস করিতেছিল এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই, অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কর্ম্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার—সে তাঁহার এই সর্ব্বস্ব-ক্ষতিস্বীকার।

তখন খুলনা বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই জয়পরাজয়ের সংবাদ আলোচনায় আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না। অবশেষে একদিন খবর আসিল তাঁহার স্বদেশী নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রিজে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে। এইরূপে যখন তিনি তাঁহার নিজের সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলেন, নিজের পক্ষে কিছুই আর বাকি রাখিলেন না, তখনি তাঁহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুশোক।

ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্ব্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মার যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প। অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্য্যন্ত যে ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়—তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কি সর্ব্বনাশ হলরে!" তখনি বৌঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল কিন্তু কি হইয়াছে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মার মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর, সে দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না;—সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনি শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্ব্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে বিচ্ছেদের

প্রতিকার নাই তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ ;—শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না, এই জন্ম জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড় হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া ক্ষ্যাপার মত বেড়াইতাম—তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত ;—আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুল-গুলির মধ্যে নির্ম্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ; জগতে তাহার আর অন্ত নাই—তা আমরা ভুলিই, আর মনে রাখি।

কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড় বড় মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়—কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে তাহা তখন জানিতাম না ; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল তখন মনটার মধ্যে সে কি ধাঁধাই লাগিয়া গেল! চারিদিকে গাছপালা মাটি জল চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মত বিরাজ করিতেছে অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মত যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশী সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল এ কি অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া!

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতল-স্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি যাহা গেল তাহার পরিবর্ত্তে কি আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা—যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এই জন্যই যাহা দেখিতেছিনা, তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাই-তেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না। চারা গাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে—তেমনি, মৃত্যু, যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা "নাই"-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলি "আছে"-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায়না তখন তাহার মত দুঃখ আর কি আছে!

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদী নহি এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে

ছাড়িতেই হইল এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণ-পূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবেনা—একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না—এই কথাটা আশ্চর্য্য নূতন সত্যের মত আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আরও গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছু দিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড় মনোহর।

সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্যপদার্থের মত মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্ব্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সেসমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কি মনে করিবে কিছুদিন এ দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে থাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতালায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হইতে পারিত এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

এসমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা, সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোট ছোট শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে কি আর সরকারী রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিতে ইচ্ছা করে? নিশ্চয়ই তাহা হইলে হ্যারিসন রোডের চারতলা পাঁচতলা বাড়িগুলা বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙাইয়া চলি, এবং ময়দানে হাওয়া খাইবার সময় যদি সামনে অক্টর্লনি মনুমেণ্টটা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ঐটুকুখানি পাশ কাটাইতেও প্রবৃত্তি হয় না, ধাঁ করিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া পার হইয়া যাই। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল—পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো একটা অক্ষর কিম্বা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মত দুইহাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার সকাল বেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।

বর্ষা ও শরৎ।

এক এক বৎসরে বিশেষ এক একটা গ্রহ রাজার পদ ও মন্ত্রীর পদ লাভ করে, পঞ্জিকার আরম্ভেই পশুপতি ও হৈমবতীর নিভৃত আলাপে তাহার সংবাদ পাই।

তেমনি দেখিতেছি জীবনের এক এক পর্য্যায়ে এক একটি ঋতু বিশেষভাবে আধিপত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি। বাতাসের বেগে জলের ছাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড় ঝুড়িতে তরীতরকারী বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জল কাদা ভাঙিয়া আসিতেছে, আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর মনে পড়ে ইস্কুলে গিয়াছি; দরমায় ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিয়াছে;—অপরাহ্নে ঘনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে;—দেখিতে দেখিতে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল; থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকার শব্দ; আকাশটাকে যেন বিদ্যুতের নখ দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কোন্ পাগ্‌লী ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে; বাতাসের দমকায় দরমার বেড়া ভাঙিয়া পড়িতে চায়, অন্ধকারে ভাল করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না—পণ্ডিত মশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; বাহিরের ঝড় বাদলটার উপরেই ছুটাছুটি মাতামাতির বরাত দিয়া বন্ধ ছুটিতে বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মনটাকে তেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দৌড় করাইতেছি। আরো মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝমঝম শব্দ মনের ভিতরে সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জমাইয়া তুলিতেছে; একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া যেন দেখিতে পাই, আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপও আর জাগিয়া নাই।

কিন্তু আমি যে-সময়কার কথা বলিতেছি সে সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই তখন শরৎঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়—সেই শিশিরে-ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন গুন করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি—সেই শরতের সকালবেলায়।

"আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে
কি জানি পরাণ কি-যে চায়।"

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে—বাড়ির ঘণ্টায় দুপুর বাজিয়া গেল—একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজকর্ম্মের কোনো দাবীতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না; সেও শরতের দিনে।

"হেলাফেলা সারাবেলা
এ কি খেলা আপন মনে।"

মনে পড়ে দুপুর বেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি-আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে—সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল কিছুমাত্র আঁকা গেল না সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ। এদিকে সেই কর্ম্মহীন শরৎ-মধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা সহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মত আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে। জানিনা কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে আকাশ যে আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চাষীদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ,—সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা বোঝাই-করা শরৎ—আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।

সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা বাদ্য লইয়া মহা সমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোটির মধ্যে যে

উৎসব, তাহা মানুষের। মেঘরৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখের আন্দোলন মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রং মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাবেগ নিঃশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।

আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে ত একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকুমাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, শানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপোষ, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেইসব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।

"কড়ি ও কোমল" মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই!"

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের এই আত্মনিবেদন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী।

দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার জন্য যখন যাত্রা করি তখন আশুর সঙ্গে জাহাজে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ পাস করিয়া কেম্ব্রিজে ডিগ্রি লইয়া বারিষ্টর হইতে চলিতেছেন। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত কেবল কয়টা দিনমাত্র আমরা জাহাজে একত্র ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল পরিচয়ের গভীরতা দিনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। একটি সহজ সহৃদয়তার দ্বারা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন যে, পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে যে চেনাশোনা ছিলনা সেই ফাঁকটা এই কয়দিনের মধ্যেই যেন আগাগোড়া ভরিয়া গেল।

আশু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তখনো বারিষ্টরী ব্যবসায়ের ব্যূহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া ল-য়ের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই। মক্কেলের কুঞ্চিত থলিগুলি পূর্ণ বিকশিত হইয়া তখনো স্বর্ণকোষ উন্মুক্ত করে নাই এবং সাহিত্যবনের মধুসঞ্চয়েই তিনি তখন উৎসাহী হইয়া ফিরিতেছিলেন। তখন দেখিতাম সাহিত্যের ভাবুকতা একেবারে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনের ভিতরে যে সাহিত্যের হাওয়া বহিত তাহার মধ্যে লাইব্রেরি-শেল্ফের মরক্কো চামড়ার গন্ধ একেবারেই ছিলনা। সেই হাওয়ায় সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিঃশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোন একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।

ফরাসী কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেইসকল লেখায় তিনি ফরাসী কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে এই কথাটাই কড়ি ও কোমল-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক্ দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলির মূল কথা।

আশু বলিলেন, তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্য্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব। তাঁহারই পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"—এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্মকথাটি আছে।

অসম্ভব নহে। বাল্যকালে যখন ঘরের মধ্যে বদ্ধ ছিলাম, তখন অন্তঃপুরের ছাদের প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বাহিরের বিচিত্র পৃথিবীর দিকে উৎসুকদৃষ্টিতে হৃদয় মেলিয়া

দিয়াছি। যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবনালোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিলনা, আমি প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলাম। খেয়া নৌকা পাল তুলিয়া ঢেউয়ের উপর দিয়া পাড়ি দিতেছে—তীরে দাঁড়াইয়া আমার মন বুঝি তাহার পাটনিকে হাত বাড়াইয়া ডাক পাড়িত। জীবন যে জীবনযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে চায়।

কড়ি ও কোমল।

জীবনের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার পক্ষে আমার সামাজিক অবস্থার বিশেষত্ববশত কোনো বাধা ছিল বলিয়াই যে আমি পীড়াবোধ করিতেছিলাম সে কথা সত্য নহে। আমাদের দেশের যাহারা সমাজের মাঝখানটাতে পড়িয়া আছে তাহারাই যে চারিদিক হইতে প্রাণের প্রবল বেগ অনুভব করে এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। চারিদিকে পাড়ি আছে এবং ঘাট আছে, কালো জলের উপর প্রাচীন বনস্পতির শীতল কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে; স্নিগ্ধ পল্লবরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কোকিল পুরাতন পঞ্চম-স্বরে ডাকিতেছে—কিন্তু এ ত বাঁধাপুকুর, এখানে স্রোত কোথায়, ঢেউ কই, সমুদ্র হইতে কোটালের বান ডাকিয়া আসে কবে? মানুষের মুক্ত জীবনের প্রবাহ যেখানে পাথর কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগর-যাত্রায় চলিয়াছে তাহারই জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কি আমার ঐ গলির ওপারটার প্রতিবেশীসমাজ হইতেই আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল? তাহা নহে। যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল সুখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলা ঘরের প্রাণটা কাঁদে।

যে মৃদু নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্নতন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে সেখানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে এমন একটা অবসাদে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অবসাদের জড়িমা হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। তখন যে সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে দেশানু-রাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—আমার মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিত না। আপনার সম্বন্ধে আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড় একটা অধৈর্য্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত; আমার প্রাণ বলিত "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়ীন!"

"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে—
হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।"

এ ত আমার নিজেরই কথা। যে সব সমাজে ঐশ্বর্য্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানে শানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র—সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই?

মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্র ভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিমসীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম্য দূরবর্ত্তী। কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, সেখান হইতে হাওয়া যদি না আসে, স্রোত যদি না বহে, পথিকের অব্যাহত আনাগোনা যদি না চলে, তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভগ্নাবশেষকে কেহ সরাইয়া লয় না, তাহা কেবলি জীবনের উপরে চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরৌদ্রের খেলা আছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই, এদিকে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ্গ নহে,

সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব-সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যেসমস্ত ভালমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মত করিয়া হাল্কা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন! এইসমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবন-দেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায় তবে আর যাহা কিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানই হইবে। মূর্ত্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্য্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূজার ঘণ্টা

[জুল্ লেমেৎর্ লিখিত "লা ক্লশ" নামক মূল ফরাসী গল্প অনুসরণে]

ছোট গাঁ খানিতে একটি পুরাণো মন্দির আর একজন পুরাণো পূজারী ছিল। মন্দিরের পূজা-আরতির ঘণ্টাটি ছিল ফাটা; তাহাতে শব্দ হইত ঠিক যেন বুড়ীর কাশির মতন। সেই শ্রুতিকটু শব্দ শুনিলে ক্ষেতের কাজে কৃষাণের আর উৎসাহ থাকিত না; অকারণ দুঃখের ভারে মন দমিয়া যাইত।

পূজারীর বয়স হইলেও চেহারাটি ছিল বেশ আঁটো-সাঁটো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট। শিশুর মতো সদানন্দ তাঁহার চেহারাটি; বুড়ো থুরথুরো, তবু মুখখানিতে দেহ মনের স্বাস্থ্যের লালিমা মাখানো; গাঁয়ের মেয়েদের হাতের যত্নে পাকানো সূতার নুটিগুলির মতো কোঁকড়া কোঁকড়া শাদা ধবধবে চুলের গুচ্ছে তাঁহার মুখখানি ঘেরা।

তাঁহার অমায়িক ব্যবহার আর দয়াযত্নের জন্য যজমানেরা তাঁহাকে বড় ভালো বাসিত, ভক্তি করিত।

পূজারীর দীক্ষা লওয়ার বাৎসরিক দিন। পঞ্চাশ বৎসর আগে বৃদ্ধ তাঁহার ভরা যৌবনে এই ত্যাগের ব্রত স্বীকার করিয়া দীক্ষা লইয়াছিলেন। যজমানেরা স্থির করিল এই বিশেষ দিনে তাহাদের পূজারীকে বিশেষ কিছু উপহার দিবে।

গোপনে বাড়ী বাড়ী চাঁদা তুলিয়া একশ টাকা জোগাড় করিয়া তাহারা পূজারীকে আনিয়া দিয়া কহিল—বাবা-ঠাকুর, শহরে গিয়ে আপনি নিজে দেখে পছন্দ করে একটা নতুন ঘণ্টা কিনে নিয়ে আসুন।

পূজারী বলিলেন—বাবা, তোমাদের কল্যাণে...... ভগবানের আশীর্ব্বাদে......নতুন ঘণ্টা......

বৃদ্ধ গুছাইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্ত আনন্দে ভাবে ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি শুধু আপন মনে বলিতে লাগিলেন—দয়াল ঠাকুর, তোমার সেবা করতে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছ, ধন্য করেছ!

***

পরদিন প্রভাতে পূজারী ঘণ্টা কিনিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। পথের দুধারে বিচিত্র বৃক্ষলতাগুল্ম ও পশুপক্ষীর প্রাণহিল্লোল রবিকিরণে ঝলমল করিতেছিল—চারিদিকে শুধু প্রাণের, আনন্দের, বর্ণগন্ধ-গানের মেলা লাগিয়া গিয়াছে—পথের ধূলি পর্য্যন্ত প্রাণে স্পন্দিত!

আর তাহার মধ্যে সেই বৃদ্ধ পূজারীর কানে নূতন ঘণ্টার ভবিষ্যৎ মধুর সঙ্গীত থাকিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। ভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের আনন্দে মুগ্ধমনে ভজন গাহিতে গাহিতে বৃদ্ধ পথ হাঁটিতে-ছিলেন।

শহরে পৌঁছিবার মাঝামাঝি পথে পূজারী দেখিলেন একটা ঘোড়া মরিয়া পড়িয়া আছে, আর তাহার কাছে বসিয়া একজন বুড়া ও একজন বুড়ী হাপুস নয়নে ঘোড়ার শোকে কাঁদিতেছে।

তাহারা বেদে। তাহাদের কাপড় ময়লা, আগাগোড়া তালি আর রিফুর নক্সা-কাটা।

পাশের পগার হইতে একটি তরুণী বেদিনী, পাতাল হইতে নাগকন্যার মতো, হঠাৎ বাহির হইয়া পূজারীর নিকট আসিতে আসিতে বলিতে লাগিল—বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুর, দান কর বাবা, কিছু দান কর, পুণ্যি হবে, পুণ্যি হবে!

তরুণীর কণ্ঠের স্বর বড় মধুর বড় মোলায়েম; বলার ভঙ্গিটি গানের মতো তালে তালে। বেদিনীর গায়ের রং টাটকা-মাজা তামার পুষ্পপাত্রের মতো। পোষাক পরিচ্ছদ বুড়াবুড়ীর চেয়ে কিছু ভালো নয় কিন্তু তবু তাহার ঐশ্বর্য্যের কমি ছিল না—চোখের তারা দুটি তার কালো মখমলের টুকরা, গাল দুটি তাহার ননীর ডেলা, আর ঠোঁট দুখানি পাকা পচ; তার যৌবন নিটোল বুকের উপর নীল উল্কির পত্রলেখা, তামার তারে কালো চুলের রাশি পেখম তুলিয়া চূড়া করিয়া বাঁধা—পাপড়ির বেষ্টনে পদ্মকোষের মতন আতাম্র মুখখানি তাহার মধ্যে টুলটুল করিতেছে।

পূজারী গতি স্থগিত করিয়া টাকার গেঁজে বাহির করিলেন। গেঁজে হাতড়াইয়া একটা ডবল পয়সা তুলিয়া তরুণীকে দিতে গেলেন। তাহার মুখ দেখিয়া আর তাহাকে পয়সা দেওয়া হইল না। বুড়া তরুণীর পরিচয় লইতে লাগিলেন।

তরুণী বেদেনী বলিল—বাবাঠাকুর, আমরা বড় গরিব গো বড় গরিব। পেট ভরে খেতে পাই না, শীতে কাপড় পাই না। আমার এক ভাই ছিল, তাকে ধরে কয়েদ করেছে, সে না কি একটা মুরগী চুরি করেছিল। সেই আমাদের রোজগার করে খাওয়াত। সে নেই—আমাদের দুদিন খাবার জোটেনি।

পূজারী ডবল পয়সাটি গেঁজেতে রাখিয়া একটা টাকা তুলিলেন।

বেদেনী বলিয়াই যাইতেছিল—আমি বাজি করতে জানি; আমার মা হাত গুণতে পারে। কিন্তু চৌকিদার গাঁয়ে কিংবা শহরে কোথাও আমাদের খেলা দেখাতে দেয় না, আমাদের কষ্টের একশেষ হয়েছে। তারপর আবার আমাদের ঘোড়াটা মরে গেল—আমরা যে কি করে' কি করব?

পূজারী জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, তা তোমরা কোথাও চাকরি বাকরি করনা কেন?

—লোকেরা যে আমাদের বিশ্বাস করে না। আমাদের ঘরে ঠাঁই দিতে ভয় পায়; ঢেলা ছুঁড়ে তাড়া করে। আর আমরাও ত কোনো কাজ জানিনে; ভবঘুরে আমরা, জানি শুধু এ গাঁ ও গাঁ করে ঘুরে বেড়াতে। যদি আমাদের একটা ঘোড়া থাকত আর কাপড় চোপড় কেনবার কিছু টাকা থাকত, তা হলে আমরা বাঁচবার একটা পথ করতে পারতাম। এখন মরা ছাড়া আর উপায় নেই।

পূজারী টাকাটি গেঁজেয় রাখিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানাও?

বেদেনী বলিল—কেন জানাব না? সে ভদ্রলোক যদি আমাদের সাহায্য করে অবিশ্যি তাকে ধন্যবাদ জানাব।

পূজারী জামার বুকের মধ্যে হাত ভরিয়া অতি সঙ্গোপনে রক্ষিত তাঁহার যজমানের দেওয়া একশ টাকার তোড়াটি হাতে তুলিয়া তাহার ভার আন্দাজ করিতে লাগিলেন।

বেদেনী তাহার কোমল চোখের তরল দৃষ্টি পূজারীর মুখ হইতে একবারও নামায় নাই, সেই নাগিনীর মতো যাদুকরা তাহার দৃষ্টি!

পূজারী প্রশ্ন করিলেন—তুমি ধর্ম্মশীলা ত?

—ধর্ম্ম?—বলিয়া বেদেনী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

পূজারী বলিলেন—আচ্ছা বল—"ভগবান, তোমায় আমি ভালো বাসি।"

তরুণী দুই চোখে জল ভরিয়া লইয়া বলিল—না না, বুড়ো বাবাঠাকুর, আমি তোমায় ভালো বাসতে পারব না, আমি আর একজনকে যে ভালো বাসি।

পূজারী মের্জাইয়ের বন্ধ খুলিয়া বুকের ভিতর হইতে টাকার তোড়াটি বাহির করিলেন।

বেদেনী চিলের মতো ছোঁ মারিয়া তোড়াটি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিয়া পলাইতে পলাইতে বলিয়া গেল—বুড়ো ঠাকুর, তোমায় ভালো বাসব গো, খুব ভালো বাসব। তুমি খাসা লোক।

বুড়াবুড়ী তখনো পগারের আলের উপর বসিয়া ঘোড়ার শোকে হাপুস নয়নে কাঁদিতেছিল।

***

পূজারী শহরের দিকেই চলিতে লাগিলেন। কোথায় কেন যাইতেছেন সে হুঁস তাঁহার ছিল না; তিনি তখন ভাবিতেছিলেন যে ভগবানের এ কী নিয়ম, তাঁহারই সৃষ্ট কত প্রাণী কী বিষম দুঃখে কষ্টে নিমজ্জিত হইয়া আছে। পূজারী ভগবানের কাছে মনে মনে এই প্রার্থনা করিতেছিলেন যে, এই যে ধর্ম্মজ্ঞানহীনা বেদেনী, ইহার অন্তর হে ঈশ্বর, তোমার প্রকাশে উজ্জ্বল আলোকিত করিয়া তোলো। 'যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক!' আহা অমন সুন্দর মেয়েটি!

হঠাৎ পথের মাঝে তাঁহার হুঁস হইল যে তাঁহার শহরে যাওয়ার কষ্ট বেদেনী টাকার ভার হরণ করিয়াই লাঘব করিয়া দিয়া গিয়াছে—তাঁহার শহরে যাইবার আর প্রয়োজন নাই।

ধুলা পায়েই বৃদ্ধ আবার গৃহের দিকে ফিরিলেন।

এখন তাঁহার ভাবনা হইল, একটা বেদেনী ভিখারিণীকে কেমন করিয়া তিনি একেবারে অত টাকা দিয়া ফেলিলেন। সে টাকা ত তাঁহার নিজেরও নয়।

তিনি পা চালাইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিতে লাগিলেন; বেদেনীর দেখা পাইলে টাকা ফিরাইয়া লইবেন। সেই জায়গায় ফিরিয়া দেখিলেন শুধু সেই মরা ঘোড়াটা ঠ্যাং উঁচু করিয়া পড়িয়া আছে—বেদেরা একেবারে অন্তর্ধান।

এখন করা যায় কি। তিনি যে ভয়ানক পাপ করিয়াছেন তাহাতে ত আর কোনো সন্দেহ নাই। যজমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, গচ্ছিত ধন অপহরণ, দেবতার ধন অপব্যয়!

এই ব্যাপারের পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়ে তাঁহার শরীর মন শিহরিয়া উঠিতেছিল। ব্যাপারটা এখন ঢাকা যায় কেমন করিয়া? কি উপায়ে এই অন্যায়ের প্রতিকারই বা করা যায়? একশ একশ টাকা কেমন করিয়াই বা জোগাড় হইবে? লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে তখনই বা কি বলা যাইবে? আর নিজের আচরণই বা কেমন করিয়া লোকের কাছে প্রকাশ করা যাইবে?

মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। কালো মেঘের গায়ে ঝাপসা গাছগুলো দানবের মতো দাঁড়াইয়া আছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামিল। জগতের দুঃখচিন্তায় পূজারীর প্রাণ কাতর হইয়া উঠিল।

পূজারী গাঁয়ে ফিরিয়া গেলেন, ভাগ্যে ভাগ্যে কেহ তাঁহাকে দেখিল না।

মন্দিরের বুড়ী ঝি জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবাঠাকুর, এর মধ্যে ফিরে এলে? শহরে গেলে না?

পূজারী মিথ্যা বলিলেন।—না, যাবার গাড়ী পেলাম না, আর এক দিন যাব এখন।……কিন্তু, একটা কথা, আমি যে ফিরে এসেছি একথা এখন কাউকে বোলো না, বুঝলে?

পরদিন প্রভাতে পূজারী মন্দিরে পূজা করিলেন না। নিজের ঘরটিতে বন্ধ হইয়া রহিলেন।

পরদিন ভিন্ গাঁ হইতে যজমান আসিল, মুমূর্ষুর প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পূজারীকে যাইতে হইবে।

ঝি বলিল—বাবাঠাকুর শহরে গেছেন, এখনো ত তিনি ফেরেন নি।

—ঝি জানে না; এই যে আমি ফিরে এসেছি।—পূজারী দ্বার খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

***

ভিন্ গাঁয়ে যাইবার পথে দুএকজন যজমানের সঙ্গে পূজারীর দেখা হইতে লাগিল।

—বাবাঠাকুর যে! আজ্ঞে প্রাতঃপ্রণাম হই। শহরে যেতে আসতে কোনো ক্লেশ হয়নি ত?

পূজারী আবার মিথ্যা বলিলেন—ক্লেশ? না বাবা, পথে কোনো ক্লেশই হয়নি।

—আর সেই ঘণ্টাটা? সে কেমন হল?

পূজারী আবার মিথ্যা বলিলেন; তখন তাঁহার আর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান ছিল না।

—ঘণ্টা? সে আর কি বলব বাবা, সে চমৎকার!

আওয়াজ, সে আর কি বলব, যেন রূপোর বাদ্য। একটি টুসকি মারলে অনেকক্ষণ তার আওয়াজ বাজে, শিগ্‌গির থামতে চায় না, আর সে আওয়াজ তেমনি মিঠে।

—কবে আমরা দেখতে পাব ?

—শিগ্‌গিরই দেখতে পাবে বাবা, শিগ্‌গিরই দেখতে পাবে। কিন্তু ঘণ্টার গায়ে একশ আট ঠাকুরের নাম খুদতে হবে, পঞ্চগব্য দিয়ে শোধন করে, ভূতশুদ্ধি আসনশুদ্ধি করে তবে ত টাঙানো হবে, অমনি টাঙালেই ত আর হল না।

***

পূজারী মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়াই ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন—আচ্ছা ঝি, আমার এই আসন বাসন, চৌকি টৌকি যা কিছু আসবাব পত্তর আছে সব যদি বেচে ফেলি, তাহলে কি একশ টাকা হয় না ?

—হ্যাঃ একশ টাকা! তোমার ত ভারি ঐশ্বর্য্যি, বেচলে একশ পয়সাও দাম হবে না।

—তবে ঝি, আজ থেকে আমি আর হবিষ্যিতে ঘি দুধ খাব না ; পেটে সহ্য হয় না।

বুড়ী ঝি আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—বাবাঠাকুর তুমি কি বলছ ? দিনান্তে এক মুঠো হবিষ্যি তাতে ঘি দুধ খাবে না ? এও কি একটা কথা হল ? ··· তোমার ব্যাপারখানা কি খুলে বল দেখি ? হয়েছে কি ? সেই যেদিন থেকে শহরে যেতে যেতে ফিরে এসেছ, সেদিন থেকে কি হয়েছে তোমার ?

ঝি প্রশ্ন দিয়া পূজারীকে এমন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে বৃদ্ধ তাহার নিকট হইতে আর কিছুই গোপন রাখিতে পারিলেন না।

—আ! এ আর আশ্চর্য্য কি ? তোমার যে দয়ার শরীর, তাইতেই তোমায় খেয়েছে। তা এর জন্যে ভেব না বাবাঠাকুর। যতদিন না টাকার জোগাড় হয় লোককে ঠেকিয়ে রাখবার বোকা বোঝাবার ভার আমার রইল। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

শীঘ্রই গ্রামময় রটিয়া গেল—ঘণ্টার গায় একশ আট ঠাকুরের নাম খোদাই করিতে গিয়া ঘণ্টা ফাটিয়া গিয়াছে ; এজন্য তাহা গলাইয়া আবার ঢালাই করিতে হইবে। তারপর ঢালা খোদা হইলে প্রধান মোহান্তকে দিয়া শোধন করাইতে হইবে ; নূতন ঘণ্টা প্রতিষ্ঠা সে ত আর অমনি মুখের কথা খসাইলেই হয় না।

ঝিয়ের রটনায় পূজারী বাধা দিলেন না, কিন্তু অন্তরে তাঁহার বেদনা জমিতেছিল। একে ত নিজের মিথ্যা কথার বোঝা তাঁহার মনকে অহরহ পীড়া দিতেছিল, তাহার উপর এইসব মিথ্যা রটনার জন্য তিনি নিজেকেই দায়ী বলিয়া বোধ করিতেছিলেন। যজমানের ন্যস্ত ধন নষ্ট করার সঙ্গে এই সব মিথ্যা প্রবঞ্চনা পাপের পর্ব্বতের মতো তাঁহাকে চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। বৃদ্ধ এতদিনে জরার ভারে ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিলেন ; স্বাস্থ্য ও আনন্দের লালিমা হারাইয়া শূন্য গাল দুটি বসিয়া গেল, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

***

পূজারীর দীক্ষাদিন নিরুৎসবেই কাটিয়া গেল ; ঘণ্টা প্রতিষ্ঠাও কৈ হইল না। যজমানেরা সকলেই আশ্চর্য্য হইতেছিল। হরিধন কামার চুপি চুপি সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল-- আমি শহরের শড়কে পূজারী ঠাকুরকে এক বেদেনী ছুঁড়ির সঙ্গে রঙ্গরস কবতে স্বচক্ষে দেখেছি। আমি যা বলি তোমরা তা কান পেতে শোন, পূজারী ঠাকুর ঘণ্টার টাকাটা একেবারে নষ্ট করেছেন, এ একেবারে নিয্যস !*

ক্রমে ক্রমে কামারের পোর দল পুরু হইয়া উঠিতে লাগিল। পথে পূজারীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারা আর তাঁহাকে প্রণাম করে না, পূজারীকে শুনাইয়া শুনাইয়া তাহারা ফিস ফিস করিয়া তাঁহারই আচরণ আলোচনা করে।

বৃদ্ধ পূজারী অসাধ্য ভাবনায় ভাঙিয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত অপরাধ গুরু হইয়া তাঁহার মন একেবারে পিষিয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু যাহা করিয়াছেন তাহার জন্যও বিশেষ পরিতাপ অনুভব করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল না।

তিনি দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়াছেন, এতে তাঁহার এত কি অপরাধ ? সেই দান হয় ত সমীচীন হয় নাই। সে টাকাও ছিল পরের গচ্ছিত সম্পত্তি। তা তখন তাঁহার বিচার

করিবার কি অবসর ছিল? আর এক কথাও ত ভাবিবার আছে—এই অপ্রত্যাশিত লাভ সেই ধর্ম্মজ্ঞানহীনা বেদেনীর অন্তরে হয়ত ভগবানের বোধ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে পারে; ভগবান তাহার অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারেন।—ভাবিতে ভাবিতে পূজারীর মনে পড়িয়া যাইত তরুণী বেদেনীর সেই পাকা জামের মতো কালো ডাগর চোখের অশ্রুভরা মুগ্ধকরা স্নিগ্ধ দৃষ্টি!

মন কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানে না, অন্তরাত্মার ধিক্কার অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন পূজারী বহুক্ষণ ধরিয়া পূজা প্রার্থনা শেষ করিয়া যখন উঠিলেন তখন তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়া গিয়াছে—যজমানদের কাছে নিজের সমস্ত পাপ অকপটে প্রকাশ করিয়া ধরিতে হইবে—চুরি প্রবঞ্চনা আর নয়, যজমানদের ভক্তি কুড়ানো আর নয়।

***

পরদিন পূজারী মন্দিরে গিয়া পূজার আসনে বসিলেন, বৃদ্ধ তখন বিবর্ণ পাণ্ডুর আড়ষ্ট, খাঁড়ার সম্মুখে যেন বলি। তিনি দৃঢ় অকম্প কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—বৎস, তোমরা সকলে শোন…

এমন সময় তরল মধুর উচ্চস্বরে পূজার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ঘণ্টাধ্বনির মধুর মূর্চ্ছনায় পূজার মন্দির একেবারে ভরিয়া গেল।……সকল পূজার্থী সবিস্ময়ে উৎকর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—নূতন ঘণ্টা! নূতন ঘণ্টা!

পূজারী ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—ভক্তবৎসল, তোমার এ কী অসম্ভব অতিপ্রাকৃত লীলা! হে ভগবান! তোমার দীন হীন দাসের কলঙ্ক-মোচনের জন্য এ কী আশ্চর্য্য আয়োজন!

সকল যজমানের পশ্চাতে এক পাশে দাঁড়াইয়া বুড়ী ঝি আনন্দ-দীপ্ত অপলক নেত্রে পূজারীর উপাসনা দেখিতেছিল। সে যে তাহার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়া পূজারীর অতি দয়ার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

ইহার পর পূজারীর আর আত্ম-অপরাধ প্রকাশ করা আবশ্যক হইল না।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিকটের যাত্রা

অনেক কালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে।
বাহির হলেম প্রথম দিনের
প্রথম আলোর রথে।
গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে,
কত যে লোক লোকান্তরের
অরণ্যে পর্ব্বতে।

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড় কঠিন সাধনা, যার
বড় সহজ সুর।
পরের দ্বারে ফিরে এসে
আসে পথিক আপন দেশে,
বাহির ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর।

"এই যে তুমি" এই কথাটি
বল্‌ব আমি বলে'
কত দিকেই চোখ ফেরালেম,
কত পথেই চলে!
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
"আছ আছ'র স্রোত বহে যায়
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের
নয়নজলে গলে'।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(De La Mazeliereর ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

মুসলমানধর্ম্মেরই সংশ্লিষ্ট এই সকল নীতিসূত্রের সঙ্গে, ভারত-আক্রমণকারীরা, মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতি হইতে গৃহীত একটা জটিলধরণের সভ্যতা ভারতে আনয়ন করিল।

কেবল মধ্য-এসিয়ার বর্ব্বরেরা ও আরবেরা ইতিপূর্ব্বে প্রাচীন মহাদেশের সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে। মহম্মদ, বিভক্ত আরব-শাখাদিগকে একত্র সম্মিলিত করেন। ওমার আরবদিগকে লইয়া দিগ্‌বিজয়ে প্রবৃত্ত হন এবং এই দিগ্‌বিজয়ের দ্বারা আরব-প্রতিভা উদ্‌বোধিত হয়। যে সকল বিরাট্ উদ্যম বিশ্বমানবের ক্রমোন্নতিকল্পে সহায়তা করিয়াছিল, মুসলমানদিগের আক্রমণ তাহার মধ্যে অন্যতম। যত সদ্‌গুণই থাকুক না কেন, কোন জাতিই অন্য জাতির দৃষ্টান্ত ব্যতীত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। যেরূপ সাইরস্, সেকন্দর-শা ও রোমকদিগের বিজয়াভিযানের ফলে, পুরাকালের বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে একটা যোগ স্থাপিত হয়, সেইরূপ মধ্যযুগেও আরব-দিগের অভিযানের ফলে বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে একটা যোগ নিবদ্ধ হইয়াছিল।

কালিফ্-আধিপত্যের ইতিহাস চারিযুগে বিভক্ত। (১) ধর্ম্ম-যুগ।—মেদিনার চারিজন কুলপতি-প্রতিম কালিফ্ঃ— আবু বেকর্, ওমার, অথমান, আলি;—ইহাঁরা নব-ধর্ম্মের প্রধানাচার্য্য ও স্বকীয় সৈন্যমণ্ডলীর সেনাপতি। প্রজা কেহই নহে, সকলেই সহধর্ম্মী। আরবমাত্রই সৈনিক। এই কালটি বৃহৎ দিগ্‌বিজয়ের কাল। তাহার পর, মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলি, এবং বিদ্রোহী ওম্মেইয়াদ্-শাখা-বংশ—এই উভয়ের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধ। আলি গুপ্ত ঘাতকের হস্তে এবং তাঁহার সমস্ত বংশধরগণ প্রকাশ্য-ভাবে নিহত হয়।

আরব-রাষ্ট্রনীতির যুগ।—দামাসের ওম্মেইয়াদ্-বংশের কালিফেরা—মহম্মদের শত্রুপক্ষীয় কোন এক বংশের কুলপরম্পরাগত অধিপতি এবং মুসলমানধর্ম্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। ক্রমাগত দিগবিজয়ের দ্বারা রাজ্যবিস্তার হওয়া সত্ত্বেও, এবং Byzance ও গ্রীক্‌ভাবাপন্ন সিরীয়-দিগের প্রভাবসত্ত্বেও, কালিফদিগের এই রাজ্যশাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে আরব-শাসনপ্রণালীই ছিল।

আরব-বর্জ্জিত রাষ্ট্র-নীতির যুগ। বাগ্‌দাদের আব্বাসিদ্-বংশীয় কালিফেরা পারসীকদিগের দ্বারা বিশেষ-রূপে সেবিত হয়। একাধিপত্য ও কেন্দ্রগত শাসনতন্ত্র উহাদের রাজ্যশাসনের বিশেষ লক্ষণ। এই কালিফদিগের সময়ে বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের অনুশীলন চূড়ান্তসীমায় উপনীত হয়।

অবনতি।—সাম্রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। স্পেন্-দেশ, কর্দ্দুর ওম্মেইয়াদ্‌বংশীয়দিগের রাজত্ব কালে এবং ইজিপ্‌ট্, কেরোর ফতিমাবংশীয়দিগের রাজত্বকালে স্বাধীনতা লাভ করে। গজ্‌নির মহম্মদ, ইরান্ ও আফগানি-স্থানের অধিপতি হইলেন। সেল্‌জুকিডি বংশের তুর্কেরা অ্যানাটলি দখল করিল। সকল শাসনকর্ত্তাই নিজ নিজ প্রদেশে স্বাধীন হইয়া পড়িল। বাগ্‌দাদেও কালিফের কর্ত্তৃত্ব আর রহিল না। পরিশেষে, মোগলদিগের অভিযানে কালিফের আধিপত্য অপসারিত হইল। এই ধ্বংসাবশেষের উপর দুইটি বৃহৎসাম্রাজ্য স্থাপিত হইল:—অটোমান-সাম্রাজ্য ও পারস্য-সাম্রাজ্য। (২)

(১) হেজিরা ৬২২। মহম্মদ (৫৭১—৬২৩)। মেকা অধিকার (৬৩০)। আবু বেকার (৬৩২—৩৪)। ওমার (৬৩৪—৪৪)। অথমান (৬৪৪—৫৬)। আলি (৬৫৬—৬১) দামাসের ওম্মেইয়াদ-কালিফ-গণ (৬৬১—৭৫০), কর্দ্দুর কালিফগণ (৭৫৫—১০৩১)। বাগ্‌দাদের আব্বাসাইডিস-কালিফ্‌গণ (৭৫০-১২৫৮)। সেলজুকাইডিদিগের সাম্রাজ্যকাল ১০০০ হইতে ১০৯২ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।—তাহার পর এই সাম্রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। গজনেবাইডেরা (৯৬০—১১৮৬)।

(২) অটোমান-সাম্রাজ্যঃ—একদল তুর্কের সর্দ্দার সুলেমান ১২২৫ অব্দের অভিমুখে আর্মেনিয়া-প্রদেশে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহার পুত্র এর্ত্তোগ্রুল (১২৩—১'৮) ফ্রিজিয়া-প্রদেশে সেল্‌জুক্‌দিগের নিকট হইতে একটা জাইগির প্রাপ্ত হয়। ওস্‌মান্ (১২৮৮—১৩২৬) সুল্‌তান নাম গ্রহণ করিয়া, ঐ নাম স্বকীয় বংশকে প্রদান করে। তাহার পর, এসিয়ামাইনর্, থ্রেস, সর্ব্বিয়া ও বল্‌গেরিয়া দেশজয়। প্রথম বাজেসিদ্ (১৩৮৯-১৪০৩, তামরলেন্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বন্দি-অবস্থাতেই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। অরাজকতা। প্রথম মহম্মদ (১৪১৩—২১) অটোমান-তুর্ক-সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় মহম্মদ (১৪৫১—৮১) ১৪৫৩ অব্দে ইস্তাম্বুল দখল করেন। মোগলদিগের পারস্যবিজয়ের

মুসলমান-সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান-সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল। শেমিটিকবংশীয় আরবেরা এবং আর্য্যবংশীয় পারসীকেরা—উভয়েই এই সভ্যতার সংগঠনে সমান সাহায্য করে।

ইরাণের মর্ম্মভাবটি প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে পারসীকেরা জোরোয়াস্তার-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। এই ধর্ম্মে দুইটি মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে:—একটি মঙ্গল, আলোক, অমজ্‌দ (অহুরমজ্‌দ্) ও অন্যটি অমঙ্গল, অন্ধকার, (আহরিমান)। জীব-সমূহের সোপান পরম্পরার দ্বারা মনুষ্য, দেবতাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। একদিকে জ্যোতির দেবগণ (অম্‌শাস্পন্দ); আর একদিকে, অন্ধকারের দেবগণ (dev)। জগতের আরম্ভ হইতেই মঙ্গল অমঙ্গলের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। অর্ম্মজদ্ কর্ত্তৃক শুভজনক কোন জগতের সৃষ্টি হইবামাত্র তাহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ আহরিমান, অশুভ-জনক জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মৃত্যুর পরে অর্ম্মজদ পুণ্যবান্‌দিগকে স্বর্গে লইয়া গিয়া পুরস্কার দেন এবং আহরিমান পাপীদিগকে নরকে লইয়া গিয়া যন্ত্রণা প্রদান করেন।

বর্ত্তমান যুগের সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে (৩)জোরোয়াস্তার এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। ব্যাবিলন-বাসীরা এই ধর্ম্মকে উৎপীড়ন করে। সাইরস্ ইহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। গ্রীকেরা ইহাকে অবজ্ঞা করিত। পার্থীয়েরা ইহার প্রতি উদাসীন ছিল। sassanides বংশের রাজত্বকালে ইহা আবার পারস্যরাজ্যের খাস ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই এই ধর্ম্ম দুই প্রকারে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তত্ত্বজ্ঞানীরা অমজ্‌দ ও আহরিমানের উপরে আর এক উচ্চতর দেবতা স্বীকার করিলেন। আর সমস্ত দেবতা তাঁহারই অধীন। সেই দেবতা—"জর্ব্বন-অকরণ" অর্থাৎ—মহাকাল। এবং সাধারণ লোকেরা অর্মজদের সৃষ্ট দেবতা একমাত্র মিত্রকেই (সূর্য্য, অগ্নি) পূজা-অর্চ্চনা করিতে লাগিল।

মুসলমানদিগের দিগ্‌বিজয়ে, জোরোয়াস্তার-ধর্ম্মের জীবনলীলা শেষ হইল। অত্যাচার উৎপীড়নে পরাভূত হইয়া পারসীকেরা নবধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

অগ্নি উপাসকদিগের কতকগুলি উপনিবেশ, কাসপিয়েনের তটদেশে ও দক্ষিণ-পারস্যে কোনপ্রকারে টিকিয়া রহিল এবং কতকগুলি অগ্নি-উপাসক গুজরাটে চলিয়া গেল। ইহারাই এখনকার পার্সি। কিন্তু বলের দ্বারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও, পারসীকেরা আরবদিগের পূজা-পদ্ধতিহীন একেশ্বরবাদকে কখনই স্বীকার করে নাই। সুন্নিসম্প্রদায়ের প্রচলিতমতাবলম্বী মুসলমানদিগের হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহারা সিয়া-নামক এক রাজনৈতিক ও ধর্ম্মমূলক সম্প্রদায় গঠন করিল। একাধিপতি-শাসন-তন্ত্রের প্রতি উহাদের আন্তরিক প্রবণতা থাকায়, উহারা প্রার্থনা করিল যাহাতে মহম্মদের বংশেই কালিফ-আধিপত্য চিরস্থায়ী হয়। ইরাণ্, আলি ও তাহার উত্তরাধিকারীদিগের অধিকার সমর্থন করিল। পরে যখন উহারা অসির আঘাতে বা বিষপ্রয়োগে নিহত হইল, তখন পৌত্তলিকভাবে উহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইল এবং কোন কোন স্থানে উহারা দেবতার ন্যায় পূজিত হইতে লাগিল।(৪) আলির দৃষ্টান্ত-অনুসারে, মুসলমান বীরপুরুষেরা ও পীরপায়গম্বরেরাও এইরূপভাবে পূজিত হইতে লাগিল। উহাদের সমাধির উপর স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইল। আত্মার মুক্তি ও দৈহিক আরোগ্যলাভের উদ্দেশে শতসহস্র যাত্রী সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে কতকগুলি ধর্ম্মাশ্রমও স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে কতকগুলির উদ্দেশ্য—ধ্যান-ধারণা; আর কতক-গুলির উদ্দেশ্য—ধর্ম্মপ্রচার। মুসলমানধর্ম্মের মধ্যে দর্ব্বেশ নামক তাপস সম্প্রদায়ও ছিল। ইহারা কঠোর তপশ্চর্য্যা

পর, ১৫০২ অব্দে সিয়া-মতাবলম্বী ইস্মায়েল সফি কর্ত্তৃক পারস্যের রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। পারস্য আফ্‌গানদিগের বশীভূত হয় (১৭২২—৩৬)। তুর্ক নাদির-শা (১৭৩৬—৪৭)। অভিনব রাজ্যবিভ্রাট। ১৭৯৪ হইতে কাদ্‌শার-কুলের বর্ত্তমান তুর্ক-রাজবংশ।

(৩) Zoroastre—শাস্ত্রীয়ভাষায় Zarathushtra; আধুনিক পারস্য-ভাষায় Zerdusht। ধর্ম্মশাস্ত্রঃ—Zendavesta। প্রাচীন-ভাষা Zend। মধ্যযুগের ভাষা-পহ্লবী।

(৪) ওমিয়াদ্-বংশের পক্ষাবলম্বী-লোকেরা যাহাদিগকে গুপ্তহত্যা করে, আলির সেই পুত্রদ্বয় হাসন ও হোসেনের উদ্দেশে একটা বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটা সমারোহ-যাত্রা করিয়া এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে ভক্তেরা অসির দ্বারা আপনার শরীরকে আঘাত করিতে থাকে। এই হাসেন হোসেন পারস্যদেশের মুখ্য শোক-নাট্যের প্রধান নায়ক।

করিত; এমন কি উহারা অসি ও ছুরিকার দ্বারা আপনার শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করিত। কেহবা যোগানন্দে স্তিমিত-নেত্র হইয়া, চীৎকার করিতে করিতে বা নাচিতে নাচিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। এইরূপ ধর্ম্মোন্মাদ হইতে কতকগুলা বদ্মায়েসের সম্প্রদায়ও উৎপন্ন হইয়াছিল; যথা "পর্ব্বতবাসী বৃদ্ধদিগের" সম্প্রদায়ভুক্ত "গুপ্তঘাতকের" দল; ড্রুস্-নামক আর এক সম্প্রদায়, যাহারা ইজিপ্টের কালিফ্ হাকিনের উপাসক। এই কালিফ্ একজন যোগী, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ও উন্মাদগ্রস্ত। বিরুদ্ধসম্প্রদায়ের দেখাদেখি সুন্নিবাও কতকগুলি ধর্ম্মাশ্রম স্থাপন করিল এবং কতকগুলি পীরকে আবাহন করিয়া আনিল।

সিয়াসম্প্রদায়ের যতগুলি মতবাদ আছে তন্মধ্যে সুফি-দিগের বৈরাগ্যবাদই সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক। সুফিরা সংসারের প্রতি উদাসীন, ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের জ্বলন্ত অনুরাগ; এতটা অনুরাগ যে, বিধাতা-প্রেরিত দুঃখ ক্লেশেও তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে; যদি ঈশ্বর তাহা-দিগকে অনন্তকাল যন্ত্রণা দেন, তবু তাহারা কল্পনাতে তাহাই পরমানন্দের বিষয় বলিয়া মনে করে:—এইরূপে প্রেমের খাতিরে প্রেমিক, স্বকীয় প্রণয়িনীপ্রদত্ত সমস্ত যন্ত্রণাই সহ্য করিয়া থাকে।(৫)

পারস্যভাষার লেখক সাদি এইরূপ সুফি-মতাবলম্বী ছিলেন।

"যাহারা ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত তাহারাই ধন্য! ... এমন সুরা নাই যাহা চিত্তকে বিহ্বল করে না; এমন গোলাপ নাই যাহার কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইতে হয় না। এমন প্রেম নাই যাহা লাভ করিবার জন্য যন্ত্রণা পাইতে হয় না। কিন্তু এই সকল বাতুলেরা পরম সৌন্দর্য্যকেই ভাল বাসে; সেই দিব্য হস্তকেই ভাল বাসে যে হস্ত বিষকে সুধায় পরিণত করে ... তোমার মত যে জীব কাদামাটি দিয়া নির্ম্মিত তাহার উপর প্রেম স্থাপন করা! কিন্তু সে প্রেম যন্ত্রণার নামান্তর। তাহার মুখের সুন্দর তিলগুলি, তোমার দিবসকে বিক্ষুব্ধ করিবে, তাহার স্বপ্ন তোমার রাত্রিকে শান্তিহীন করিয়া তুলিবে। কিন্তু সেই পরমসুন্দরের চরণে

(৫) এইরূপভাবের কথার সহিত কার্লাইলের উক্তির তুলনা করা যাইতে পারে। কার্লাইল বলিতে চাহেন যে, নরকস্থ হইবার যোগ্য হইলে, পাপী নরকস্থ হইতে সম্মত হয়:—"আমার যেন অনন্ত মৃত্যু হয়; কেন না, আমি এইরূপ দণ্ডভোগ করিবার উপযুক্ত! আমার বিভৎস দুষ্কৃতির ফলে অনন্ত ন্যায়ের জয় হউক। আমি এইরূপ কাজ না করিলে, অনন্ত ন্যায়ের জয় হইত না। আত্মবিলোপই সকল ধর্ম্মাচরণের আরম্ভ। যে অতিবড় পাপিষ্ঠ তাহারও পক্ষে ধর্ম্মের এই উচ্চতম অবস্থা সুগম।" (Latter-day pamphlets, Jesuitism.)

নতজানু হইলে সমস্ত জগৎকে ভুলিয়া যাওয়া যায় ... অন্যের সহিত একত্র বাস করা!—উহা অসম্ভব। তোমার অন্তরে একটিমাত্র প্রাণ—সেই প্রাণস্বরূপ স্বয়ং সেখানে অধিষ্ঠিত। তোমার নেত্র উন্মীলিত কর, তাঁহার প্রতিবিম্ব তোমার হৃদয়ের মধ্যেই অধিষ্ঠিত ... তিনি কি চান? তোমার প্রাণকে চান? এই ত তোমার ওষ্ঠাধর রহিয়াছে। তিনি তোমার নিশ্বাস পান করুন না! তিনি, কি চান? তোমার মৃত্যু চান? এই ত তোমার স্কন্ধ রহিয়াছে। তিনি তাঁহার অসি দ্বারা তোমার স্কন্ধ ছিন্ন করুন না! মিথ্যা হইতে উজ্জ্বল একটা প্রেমলালসা এইরূপ যন্ত্রণা দিয়া থাকে ... "

এইরূপ দুঃখসন্তাপে, জ্বলন্ত বাসনানলে দগ্ধ হইয়া এই যোগীরা দিবারাত্রির ভেদ উপলব্ধি করিতে পারে না স্রষ্টার সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে এমনি তাহাদের জ্বলন্ত আগ্রহ যে, সৃষ্ট জগৎ তাহাদের নিকট বিলুপ্তপ্রায়। স্থূল "অস্থিমাংসের" প্রেম সুফির নিকট অপরিচিত। এইরূপ প্রেম বাতুলতার নামান্তর। সুফি, বিশুদ্ধ প্রেমসুরাপানে মত্ত হয়; অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হয়। এই মত্ততার আস্বাদ পাইতে হইলে, ইহলোক পরলোক ভুলিয়া যাইতে হয়। (৬)

ঈশ্বরকে প্রিয়তমা সম্বোধন করিয়া সাদি এইরূপ একটি গজল লিখিয়াছেন:—

"আকাশের বজ্র। উচ্চচূড়ায় অবস্থিত একটি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ আমার জানা আছে: মৃদুমন্দ সমীরণও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস পায় না। ঐ গৃহে গিয়া আমার প্রিয়তমার সংবাদ আমাকে আনিয়া দিবে। এই অধিত্যকার উপর আমার পুত্তলী, আমার পরী, আমার সুন্দরী বাস করেন। যাও পক্ষি, এই প্রিয় বন্ধুদিগের সংবাদ তাহার নিকট লইয়া যাও।"

এই সুন্দরী যিনি সূর্য্য অপেক্ষাও জ্যোতির্ম্ময়ী—

"তিনি যদি কৃপা করিয়া আমাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন—তাঁহাকে উত্তর দিবে:—"মূল্যস্বরূপ তাহাদের প্রাণ দিয়াও, তোমার নিকট হইতে একটি অনুগ্রহ তাহারা ক্রয় করিতে চাহে।"

আরও এই কথা বলিবে:—

"তাহারা মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া আছে, তৃষ্ণায় তাহাদের কণ্ঠাগত প্রাণ। আর তুমি কি না শান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছ—তোমার স্বপ্ন-গুলির মধ্যে একটি মূর্ত্তি ছাড়া আর কোন মূর্ত্তি নাই।"

"হে ইন্দুনিভাননে, হে সুন্দরি,—তুমি সর্ব্বদাই বিদ্যমান, আবার সর্ব্বদাই অবিদ্যমান,—এমন একদিনও যায় না যেদিন তোমার স্মৃতি আমার হৃদয়ের মধ্য দিয়া গমন না করে। সুন্দরী তুমি যে লুকাইয়া আছ—তাহাই আমার দুঃখ যন্ত্রণার হেতু:—আমাদের এমন যোগ্যতা নাই যে আমরা তোমার দর্শনলাভ করি। তোমার অনল আমাদিগকে দগ্ধ করিবে।"

"আমরা তোমারই; তোমার শক্তির সীমা নাই; অতএব কৃপা করিয়া আমাদিগকে ভালবাসো; নতুবা তোমার ভালবাসাকে আমাদের হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিয়া দেও।"

(৬) বুস্তাঁ। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) Graff ও Ruckert-এর জর্ম্মান অনুবাদ এবং Barbier de Meynard-এর ফরাসী অনুবাদ।

সুন্দরি, তোমার কি জ্বলন্ত জ্যোতি—কেন না, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তোমার জ্যোতির দ্বারা তুমি আমাদিগকে পরিপ্লাবিত করিতেছ।

"সাদি তুমি কে যে এই প্রেমের কথা তুমি বলিতেছ? আমি কে? আমি তাঁর ক্রীতদাস। এই দাস সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর একান্ত অনুগত ও ভক্ত সেবক।"(৭)

M. Barbier de Meynardএর সুন্দর অনুবাদ হইতে সাদির ঈশ্বরের প্রেম সম্বন্ধে এই রচনাটি গৃহীত হইল:—

"একদিন রাত্রে আমার নিদ্রা হইতেছিল না,—অমি শুনিলাম প্রজাপতি মোম্‌বাতিকে এই কথা বলিতেছে:—আমি ভালবাসি, অতএব পুড়িয়া মরাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু তুমি কি জন্য তপ্ত অশ্রু মোচন করিতেছ? মোম্‌-বাতি উত্তর করিল:—আমি হতভাগ্য প্রেমিক, আমার প্রিয় সহচর মধু হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইয়াছি; আর সেই অবধি ফেরহাদের ন্যায় আমি পরিতাপে দগ্ধ হইতেছি।" মোম্‌-বাতি এই কথা বলিয়া স্বকীয় পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর কতকগুলি অশ্রুবিন্দু মোচন করিল; তাহার পর আরও এই কথা বলিল:—প্রবঞ্চক তোমার না-আছে আত্মবিসর্জ্জন, না-আছে অধ্যবসায়। আমার শিখার প্রথম-সংস্পর্শেই তুমি পলায়ন কর; কিন্তু দেখ আমি, স্থির হইয়া থাকি এবং সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হই। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ, ১৭০)

যোগবাদসম্বন্ধে মুসলমান ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের মিল হইতে পারে। সাদি তাহার প্রণয়িনী ঈশ্বরকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী কবি জয়দেব দেখাইয়াছেন,—প্রণয়িনীর ন্যায় ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছেন।

বিশ্বব্রহ্মবাদে পৌঁছিয়া এই দুই ধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে। আরব ধর্ম্মাচার্য্যেরা বলিয়াছিল,—শূন্য হইতে, কিছু না হইতে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন; যোগবাদীরা ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিলেন, ঈশ্বর আত্মস্বরূপ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এইরূপে উহারা সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে এক করিয়া ফেলিল। যোনি-ভ্রমণপথে রুমি কিরূপে পর্য্যায়ক্রমে প্রস্তর, বৃক্ষ, পশু ও পরিশেষে এঞ্জেল হইয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া, পরে আরও এই কথা বলিয়াছেন:—

"আমি এঞ্জেলেরও উপরে আপনাকে উন্নীত করিব, সকলই অপসৃত হয়, কিন্তু ঈশ্বর কখনই অপসৃত হন না। এঞ্জেলকেও অতিক্রম করিয়া আমি এমন কিছু হইব যাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবে না। কিছুই নয়! কিছুই নয়! শ্রবণ কর, অহংকার বজ্রনাদে বলিতেছে; আমরা সকলেই ঈশ্বরের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিব।"(৮)

রুমির আর একটি কবিতা দেখ:—

"যখন কোন নাম ছিল না, রূপের চিহ্নমাত্রও ছিল না, তখনও আমি ছিলাম। কেবল মাত্র সেই সখা, সর্ব্বাধিপ স্রষ্টা। আমা হইতে সকল রূপ সকল নাম নিঃসৃত হইয়াছে। যখন মেরি, মুক্তিদাতাকে গর্ভেও ধারণ করেন নাই, তখনও আমি ঈশ্বরের আরাধনা করিতাম। যখন দেবমন্দির ও মঠাদির না-ছিল বর্ণ না-ছিল রূপ, তখনও আমি মন্দির মঠাদিতে গমন করিতাম। যখন কাবায় শিশুও ছিল না বৃদ্ধও ছিল না, তখনও আমি কাবাকে সম্বোধন করিয়া আবেগভরে প্রার্থনা করিয়াছি......আমি সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত ধরা অতিক্রম করিয়াছি...আমার হৃদয়ের মধ্যেই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং ইহাও জানিতে পারিআছি যে তিনি হৃদয়েই থাকেন, আর কোথাও থাকেন না।"(৯)

আর একস্থলে এইরূপ আছে:—

"আমিই সন্ধ্যা, আমিই প্রভাত...আমিই নৌকা, আর সেই নৌকাচূর্ণকারী শৈলও আমি...আমিই শান্তি, আমিই সংগ্রাম...আমিই হরিণ আমিই সিংহ, আমিই ব্যাঘ্র, আমিই মেষ, এবং যে মেষ-পালক মেষশালায় মেষদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে, সেই মেষ-পালকও আমি। আমিই জীব-শৃঙ্খল, সংসার-চক্র, সৃষ্টি-সোপান।"(১০)

এই প্রকার মতবাদের সংস্পর্শে হিন্দুদিগের যোগবাদ আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। হিন্দুরা সেই সময়ে বৌদ্ধদিগের অতিসূক্ষ্ম তত্ত্বজালের মধ্যে এবং মাতৃকাপূজার বিভৎস ও ভীষণ ব্যাপারের মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

ও

আমার প্রত্যাবর্ত্তন।

ইঞ্জিনিয়ার গ্রোভ্ সাহেব, হাওয়েল সাহেব প্রভৃতির সঙ্গে আমেরিকান মিশনরি রবার্ট সাহেবের গির্জ্জার আঙ্গিনার ভিতরস্থ একটি বাঙ্গলায় বাস করিতেন। আমি তথায় গিয়া মিলিত হইলে তথা হইতে মোমক অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে ব্রহ্মসীমান্তে মিলিটারি পুলিশের ক্যাপ্টেন অরমণ্ড ও সুবাদার-মেজরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। কাপ্তান কৌতুক করিয়া কহিলেন যে "Take care, the rebels may kill you." তাহাতে আমি কহিলাম যে

(৭) অধ্যাপক Pizziর ইটালীয় অনুবাদ অনুসারে Storia dilla poesia Persiana (1. p. 314).

(৮) (Sure, II, 154) Paul Harnএর জর্ম্মাণ অনুবাদ, "Geschichte der persischen Letteratur," P. 163.

(৯) অধ্যাপক Pezziর ইটালীয় অনুবাদ।

(১০) Divanএর Ruckert কৃত অনুবাদ।

I am quite prepared for that, sir. তথা হইতে যথাক্রমে পূর্ব্বোল্লিখিত আড্ডায় আড্ডায় আমরা ব্রহ্মদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া চতুর্থ দিবসে চীন সীমান্তের আড্ডা মানসীয়ানে উপস্থিত হইলাম। তথায় যত চীনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল দেখিলাম সকলেরই ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে বিদেশী লোকের প্রতি ইহাদের নম্রতা ও ভদ্রতা দৃষ্ট হইত কিন্তু এক্ষণে সেই নম্রতার পরিবর্ত্তে তাহাদের স্বভাব উদ্ধত ভাব ধারণ করিয়াছে।

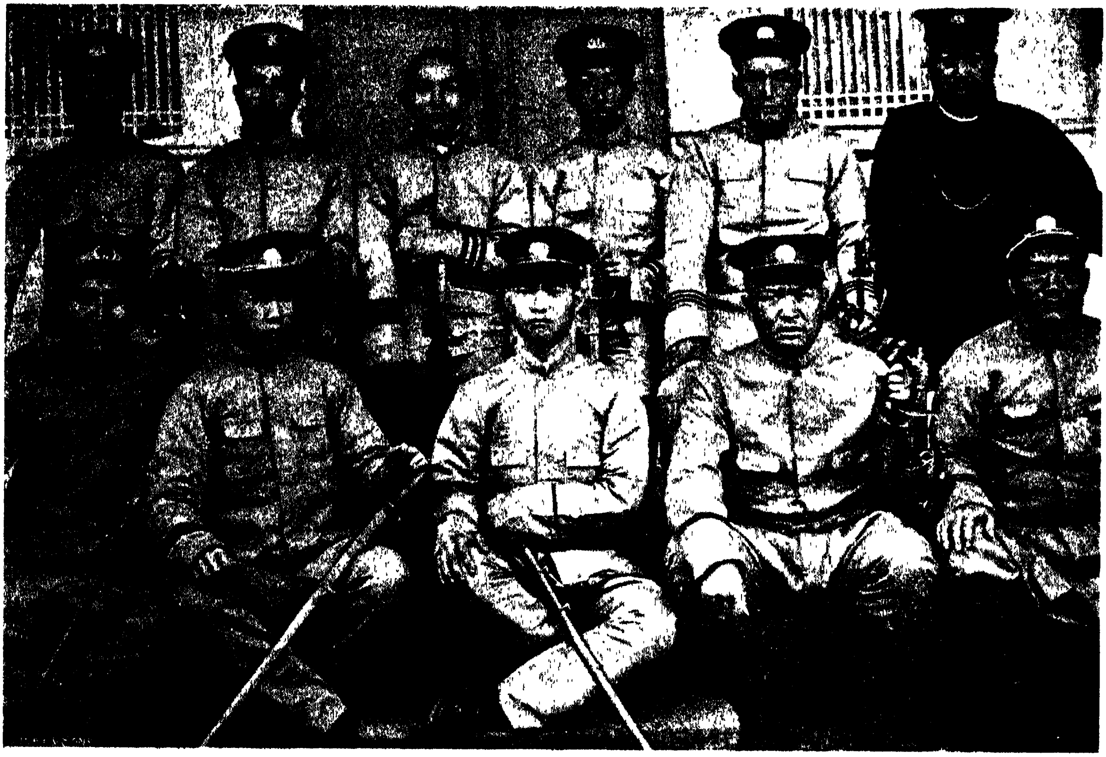
মানসীয়ানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত মিঃ ম-র বাড়ীতে রাত্রিকালে বাস করিব সংকল্প করিলাম। তাঁহার কাঠের ঘরের দ্বিতল গৃহে গিয়া আমরা শয্যা রচনা করিতেছি, এমন সময় একদল লোক আসিয়া প্রথমতঃ মিঃ মর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, পরে আমাদিগের কক্ষে গিয়া অভদ্রভাবে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ কেহ আমাকে চিনিত। একজন জিজ্ঞাসা করিল যে "ডাক্তারের বাড়ী ভারতবর্ষ, সত্য কিনা?" আমি কহিলাম যে "হাঁ সত্য।" তাহাতে সে কহিল "আপনারা আমাদের পীত জাতির মধ্যে গণ্য। আপনাদের দেশ এখন ইংরেজের অধীন?" আমি কহিলাম "হাঁ, তাহাও সত্য।" তখন সেই ব্যক্তি কহিল "কেন আপনারা ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দেন না?" আমি তখন বড় লজ্জিত হইলাম এবং সেই লোকটীকে কহিলাম যে "তোমার এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা বলা বড় অন্যায়।" এই কথা বলিয়া ইঙ্গিতে বুঝাইলাম যে আমার সঙ্গী গ্রোভ সাহেব একজন ইংরেজ, ইহার সম্মুখে এই প্রকার কথাবার্ত্তা বলা নিতান্ত অভদ্রের কার্য্য। গ্রোভসাহেব চীনাকথা জানেন, অবশ্য তিনি তাহা সম্পূর্ণ বুঝিলেন। লোকগুলি চলিয়া গেলে তাঁহাকে কহিলাম, "দেখুন, অল্প দিনের মধ্যে চীনাদিগের ব্যবহারে কেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" তিনি কহিলেন, "কালের গতিতে এ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।" এখানকার নূতন সৈনিক কর্ম্মচারিগণের কথায় ভাবে তাহাদের ইংরেজবিদ্বেষের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল।

আসিবার পথে গুজব শুনিয়াছিলাম এবং এখানেও শুনিলাম যে টেঙ্গিয়েয় লোক বড় ভীত হইয়াছে, তথায় লড়াই হইবার আশঙ্কা আছে। এই কারণে টেঙ্গিয়ে ও



লি-কেন-ইয়ে—ইউনান প্রদেশের সাধারণতন্ত্রী জেনেরাল কমাণ্ডিং অফিসার। ইনি ছয় বৎসর জাপানে যুদ্ধ শিক্ষা করিয়া আসিয়া ইউনানফু শহরের সৈনিক বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। বিদ্রোহের পর এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন।

তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা বালকবালিকা লইয়া বর্ম্মায় পলাইতেছে। তাহার কারণ ইউনানফু শহর ইউনান



টাও-টাইয়ের পুত্রগণ ও কর্ম্মচারিগণ।

প্রদেশের রাজধানী। তথাকার জেনেরাল লী, টেঙ্গিয়ের বিদ্রোহী সর্দ্দার চাং-ওয়েন-কোয়ানের উপর বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কেননা তিনি সান জাতীয় কাঙ্গাই সুভাকে সমস্ত সৈন্যের সেনাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সান্ চীনার উপর কর্তৃত্ব করিবে ইহা চীনারা সহ্য করিতে পারিবে না। টেঙ্গিয়ে ক্ষুদ্র স্থান। ক্ষুদ্র স্থান হইয়া সমস্ত ইউনান প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিতে গেলে ইউনানফুর ও টালিফুর সৈন্যের সঙ্গে টেঙ্গিয়ের লড়াই অনিবার্য্য হইবে, লোকের এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে।

আমরা যথাক্রমে টেঙ্গিয়ে পৌঁছিলাম। টেঙ্গিয়ে পৌঁছিয়া দেখি আমার বাড়ীর সদর দরজা বিদ্রোহিগণের সর্দ্দারের আদেশে শীলমোহরযুক্ত হইয়াছে। তবে আমার দুই জন চাকর বাড়ীর একটী গুপ্ত দরজা দিয়া ভিতরে যাইত, আসিত। আমি দরজা খুলিয়া ভিতরে গেলাম। দেখিলাম আমার কোন দ্রব্য চুরি হয় নাই। আমাকে দেখিয়া আমার পাড়াপড়শিরা বড়ই আনন্দিত হইল, তাহারা যেন আমাকে পাইয়া অনেক আশ্বস্ত হইল। কারণ বিপদের সময় তাহারা আমার বাড়ীতে আশ্রয় লইলে অনেকটা নিরাপদ মনে করে।

কাষ্টম আফিসের সাহেবদিগের বাড়ীও ঐ প্রকারে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ঘরের পার্শ্বের চীনা কেরানীদিগের বাড়ীর সমস্ত মাল বিদ্রোহিগণ অপহরণ করিয়াছে। বিদেশীদিগের সমস্ত সম্পত্তিও বিদ্রোহীরা লুট করিয়া লইত, কেবল ক্ষতিপূরণের ভয়ে একার্য্য করিতে সাহস পায় নাই। কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনায় বিদেশীদিগকে চীনগবর্ণমেণ্টের বহু লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। যাহার হাজার টাকার মাল অপহৃত হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ পাঁচগুণ কি দশগুণ দিতে হয়। এই কারণে চীনারা এবার বড় সতর্ক হইয়াছে। বিদেশীর সম্পত্তির প্রতি সম্মান দেখাইয়াছে। সাহেবগণেরও ধারণা ছিল যে সমস্ত ফেলিয়া গেলে চীনারা নিশ্চয়ই লুট করিবে এবং তাঁহারা যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ লইবেন। কিন্তু



টেঙ্গিয়ের প্রজাতন্ত্র গভর্মেন্টের টাওটাই বা কমিশনার।
লি-কেন-ইয়ের অধীনস্থ কর্ম্মচারী।

এবার এবিষয়ে তাঁহারা বড় নিরাশ হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও যে নিরাশ হই নাই তাহা নহে। বড় রকম একটা দাবি করিবার সুযোগ চলিয়া গেল।

আবার কাঙ্গাই সুভার কথা।

টেঙ্গিয়ে আসিয়া দেখি রাস্তা ঘাট হাট বাজার প্রায় লোকশূন্য। স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা প্রায় দেখা যায় না। কেবল সৈন্যগণই বেশির ভাগে দৃষ্ট হয়। যাহারা পলায়ন করে নাই বা যাহাদের পলায়নের স্থান নাই, তাহারা দিবা রাত্রি অশান্তিতে কাটাইতেছে। এক এক দিন এক এক প্রকার গুজব। কোন কোন গুজবের মূলে কোন সত্যই নাই। আমরা আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে কাঙ্গাই সুভা ও সর্দ্দার চাং-ওয়েন-কোয়ানের মধ্যে এত মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে যে উভয়ের সৈন্যই পরস্পর লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সংবাদে দুই রাত্রি লোকে ভয়ে উদ্বেগে কাটাইয়াছে যে কোন সময় কি হয়। কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম যে টালিফু হইতে কাঙ্গাই সুভার নিকট এক টেলিগ্রাম আসিয়াছিল তাহার মর্ম্ম এই যে "তোমার রাস্তা শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার কর।" টেলিগ্রাফ আফিসে পৌঁছিলে তথাকার সিগনেলার তাহা গোপনে বিদ্রোহী-সরদারকে দেখায়। সরদার চাং তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মনে মনে ঠিক করিলেন যে সুভা তাও-কেই-সীন্ বুঝি ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া সমস্ত কর্তৃত্ব নিজে লইতে মানস করিয়াছেন। তাই তিনিই সুভাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবেন এই আয়োজন হইল। সুভা শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন যে ব্যাপারখানা কি? তিনি অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ অনুসন্ধান করিলেন এবং যখন কোন মীমাংসাকারক উক্ত টেলিগ্রাম তাঁহাকে দেখাইল তখন তিনি কহিলেন যে তিনি উহার কিছুই জানেন না। কোনো ব্যক্তি চাং-ওয়েন-কোয়ানের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ বাধাইয়া উভয়কেই নষ্ট করিবার জন্য এই কল্পনা করিয়াছে। বাস্তবিকও তাহাই। টালিফু হইতে চাং-এর কোন শত্রু এই প্রকার করিয়াছিল। অবশেষে দুই জনের বিবাদ মিটিল কিন্তু মনের মিল আর হইল না।

সুভা তাও-কেই-সীন্ আপন অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। চীনাদের সঙ্গে এক মিল হইয়া তিনি দেশের মঙ্গলের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু চীনারা সে প্রকৃতির লোক নহে। তাহারা সানদিগকে অনুন্নত জাতি মনে করিয়া ঘৃণা করে। এ বিষয়ে সানদিগের অবস্থা কতক আমাদিগের মত। স্বাধীন জাতি ও অধীন জাতিতে যে প্রভেদ তাহা এখানেও বর্ত্তমান। এই কারণ বশতঃ চীনা সৈন্য সকলেই সান সুভার অধীনে চাকরী করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ

করিয়াছিল। সেই কারণেই তাও-কেই-সীন্‌কে সরদার চাং-এর অধীন হইয়া দ্বিতীয় কর্ম্মচারীরূপে এথানে থাকিতে হইল। তাহাও নাম মাত্র, তাঁহার কোন ক্ষমতাই রহিল না। কিন্তু ধরিতে গেলে এই বিদ্রোহের আদিতে কাঙ্গাই সুভা। তাঁহার আবাসেই যত মন্ত্রণা হয়। চাং-ওয়েন-কোয়ান্ কাঙ্গাই গিয়া মন্ত্রণা করিতেন। বিদ্রোহের দুই দিন পূর্ব্বে চাং তথায় গিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া আসেন। বিদ্রোহের পর সুভাকে সমস্ত সৈন্যের নেতৃত্ব দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া তবে এথানে আনিয়াছিলেন। এবং সেই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই বোধ করি তিনি নিজ দস্তখতযুক্ত ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছিলেন যে তিনি সমস্ত ইউনান প্রদেশের কমাণ্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত হইয়াছেন। সরদার চাং কাঙ্গাই সুভার মত একজন নব্য ধরণে শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী বড় জমিদারের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এবং তাহাতে ফলও পাইয়াছিলেন। কেননা বিদ্রোহের পূর্ব্বে চাং একজন নগণ্য লোক ছিলেন। আমার এথানে কথনো আসিলে সাধারণ লোকের সঙ্গে যে প্রকার ব্যবহার করিতাম, ইহার সঙ্গেও তাদৃশ ব্যবহার করিয়াছি। কোন একটা বিষয়ের ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে চাং-এর কোনো ক্ষমতা ছিল না। কাঙ্গাই সুভার নামের গুরুত্বে অনেক ফল ফলিয়াছিল। এদিকে অন্যান্য সান সুভাগণ কিন্তু বিদ্রোহিগণের সঙ্গে যোগদান করেন নাই। তাঁহারা এযাবত নিরপেক্ষভাবে থাকিয়া আপন আপন এলাকা রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। এমতঅবস্থায় কাঙ্গাই সুভা আপন জাতীয় আত্মীয় সুভাগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চীনাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া তেজস্বিতা ও স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন কিন্তু চীনাদিগের কার্য্যে তাঁহার মনে আঘাত লাগিল, শেষে তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

আমরা যেদিন টেঙ্গিয়ে পৌছি, সেইদিন পথে কাঙ্গাই সুভার পঞ্চম ভ্রাতা তাও-কেই-আড়, তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রসহ অনেকগুলি রাইফলধারী সান সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া টেঙ্গিয়ে যাইতেছিলেন। তাঁহারা আমার পূর্ব্বপরিচিত, তাঁহাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলাপ হইল। ইহাদের সকলেরই বিদেশী ধরণে মিলিটারি ইউনিফরম পরা। ইহারা টেঙ্গিয়ে পৌছিলে দুইদিন পরে সুভা তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহার নামমাত্র কার্য্যের ভার দিয়া এস্থান পরিত্যাগ করিলে শুনিলাম তিনি হু-পে প্রদেশে ডাঃ সুন-ইয়াট-সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। তিনি ব্রহ্ম দেশ হইয়া সমুদ্রপথে সাংহাই দিয়া যাইবেন এমন কথা শুনিতে পাইলাম। আমার মনে মনে সন্দেহ ছিল যে ইনি বুঝি অসন্তুষ্ট হইয়া অপমানের প্রতিহিংসা স্বরূপ বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য যাইতেছেন। আমি তাঁহাকে "কৃষ্ণচন্দ্র" মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু যথন শুনিলাম যে তিনি আনাম হইয়া (Anam) ইউনানফু শহরে উপস্থিত হইয়াছেন তথন আমার সে ভ্রম ঘুচিল। চীনদেশের শিক্ষারই এমন গুণ যে স্বদেশ ও স্বজাতি-দ্রোহিতা কি ইহারা তাহা জানে না।

আমার বোধ হইল তিনি তাঁহার মনোদুঃথের (Grievances) কথা ইউনানফুর প্রজাতন্ত্রীয় গবর্ণর-জেনারেল ছাই-অ মহাশয়কে জানাইবার জন্য তথায় গিয়াছেন। কিন্তু তথায় গিয়া নাকি নজরবন্দী কয়েদীরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এথন তথা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নাংকিন শহরে সুন-ইয়াট-সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কোন সৈন্যের নেতৃত্ব লাভ করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন।

সুভার ভ্রাতাও অল্পদিন পরে এথান হইতে আপনার এলাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

টেঙ্গিয়ে আসার পর প্রায় একমাস যাবত ডাক ও টেলিগ্রাম বন্ধ ছিল; সুতরাং আমরা কোনো সংবাদই ঠিক সময়ে পাইতাম না; ইহাতে মহা অসুবিধায় থাকিতে হইয়াছিল।

লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন।

বিদ্রোহের পর হইতেই বহু লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যত অলস, ভবঘুরে, জুয়াবাজ, আফিংথোর লোক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাদের বেতন ৬ টেল্ বা ১৩৲ টাকা করিয়া মাসিক হিসাবে



প্রজাতন্ত্রীয় প্রধান সেনাপতি।

ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং কুলি মজুর ও ভৃত্যাদি পাওয়া কঠিন হইয়াছে। সোয়ারি বাহক বেহারা দুষ্প্রাপ্য। যে বেহারাটী ভামো যাইতে পূর্ব্বে সাত আট টাকায় পাওয়া যাইত, সেই লোক এখন ত্রিশ চল্লিশ টাকা চাহিয়া বসে। এখান হইতে একটী খচ্চর পাঁচ কি ছয় টাকায় ভাড়া পাওয়া যাইত। তাহা বিদ্রোহের পরে কিছুদিন ধরিয়া বিশ পঁচিশ টাকার কমে পাওয়া যাইত না।

রাজকীয় ছোট বড় কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ হত হইয়াছে, কেহ প্রাণভয়ে পলাইয়াছে, কেহবা চাকরী পরিত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে যেসকল গ্রাম্য ভদ্রলোককে পূর্ব্বে কেহ গ্রাহ্যই করিত না, তাহারা বিদ্রোহী সরদারের অনুগ্রহে এবং অধীনে নানা প্রকার চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ সৈনিক কর্ম্মচারী, কেহ কেহ কেরাণী, কেহ কেহ ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। সরকারী আফিস আদালত লুটের অর্থে কেহ কেহ ধনী হইয়াছে। কেহ কেহ নিজের অর্থ অপহৃত হওয়ায় একেবারে গরীব হইয়া পড়িয়াছে। নূতন সৈন্যের ব্যয় বহনের জন্য সদাগর ও প্রজাবর্গের নিকট হইতে বহু অর্থ জোর করিয়া আদায় করা হইয়াছিল।

পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন।

সর্ব্বাগ্রে মাথার বেণী কাটার বড় ধুম পড়িয়া গেল। সরদার চাং ঘোষণা করিলেন যে পনরদিনের মধ্যে যে মাথার বেণী না কাটিবে তাহাকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া হইবে। শাস্তির পরও যে তাহা মাথায় রাখিবে তখন তাহার শিরশ্ছেদ করা হইবে। সুতরাং ২৬০ বৎসর পূর্ব্বে বিজয়ী মাঞ্চু সম্রাটের আদেশে বহু জুলুমে যে বেণী চীনার মাথায় সৃষ্ট হইয়াছিল, আজ বিদ্রোহী সরদারদিগের আদেশে সেই প্রকার জুলুমের সহিত লোকের মস্তক হইতে তাহা অপসৃত হইতে লাগিল। মাঞ্চু গবর্ণমেণ্টের আমলে মাথায় বেণী না রাখিলে বিদ্রোহী মনে করিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করা হইত। এক্ষণে নিরীহ অজ্ঞ পল্লীবাসিগণ অতি অনিচ্ছার সহিত অতি যত্নে রক্ষিত বেণী কাটিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। যাহারা কিঞ্চিৎ আপত্তি করিল অমনি তাহাদের পশ্চাৎদেশে পুলিশ ২০০ দুইশতবার একখানি ক্ষুদ্র তক্তার দ্বারা আঘাত করিয়া চর্ম্ম ও মাংস দলিত করিতে লাগিল। যেমন ব্রাহ্মণের উপবীত, বৈষ্ণবের টিকি, চীনাদের টিকিও সেই প্রকার পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিল; যদিও প্রকৃত পক্ষে ইহা পরাধীনতার চিহ্ন বলিয়াই প্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বিদ্রোহের পর এখানকার সৈন্য ও সিভিল কর্ম্মচারিগণ কিছুদিনের জন্য মাথায় নীলবর্ণের পাগড়ি ব্যবহার করিতে লাগিল। পরে ক্রমে পোষাকের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতে লাগিল। একমাস মধ্যে সৈন্যগণের পোষাক

আবার নূতন আকার ধারণ করিল। মাথায় জাপানী ধরণের টুপি, গায়ে ছোট কোট, পায়ে পাজামা, পটি, এবং বুট। স্কন্ধদেশে এবং আস্তানিতে পটি দ্বারা কোন্ শ্রেণীর সৈন্য তাহা চিহ্নিত করা হইল। যেমন পল্টনের নায়ক, হাবিলদার, জমাদার, সুভাদার সেইমত ইহাদের সিপাহিগণের উপরস্থ কর্ম্মচারীর পদক্রম সৃষ্ট হইল। ইহা পূর্ব্বেও ছিল কিন্তু এখন নূতন ধরণের হইল। নায়ক হাবিলদারদিগের বিদেশী পল্টনে কিরিচ বা তরবারি নাই কিন্তু চীন সৈন্যের উপরস্থ যত কর্ম্মচারী সকলেই কিরিচ ঝুলাইয়া সর্ব্বদা চলে। ইহার উপর জাহাজের খালাসী-দিগের বা নৌ সৈন্যের বড় বড় পিতলের দুই সারি বোতাম-যুক্ত কালো ওভারকোট প্রত্যেকের অঙ্গে শোভিত হইল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কোটের আমদানি কোথা হইতে হইল। এ সমস্তই পুরাতন কোট। বৎসরান্তে পল্টনের বা জাহাজের গোরা-দিগের পুরাতন কোট যত নিলাম হয় তাহাই বোধ করি খরিদ করিয়া চীনা সদাগরগণ নানা দেশ হইতে এদেশে চালান দিয়াছে।

এবার যত রকমের পোষাক পরা সৈন্য দেখিলাম পূর্ব্বে কখনো সেরূপ দেখি নাই। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যের ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পরিচ্ছদের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। হাওপিন—শানাই বা বিউগল বাদ্যকর। পীত-বর্ণের পরিচ্ছদ ও টুপি। পিন মানে সেপাই বা সৈন্য।

২। লু-পিন মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণীষ। ইহারা কোন কর্ম্মচারীকে অভ্যর্থনা করিয়া আনে বা সঙ্গে গিয়া অন্যত্র পৌঁছাইয়া দেয়।

৩। ছেঙ্ পিন—মাথায় জাপানি ধরণের সৈনিক টুপি। ইহারা লড়াই করে।

৪। মা-পিয়ান—অশ্বারোহী সৈনিক দূত। ইহারা মাথায় পাগ্‌ড়িও ব্যবহার করে, টুপিও পরিয়া থাকে।

৫। চিন পিন—কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে আরদালিরূপে থাকে। ইহাদের পরিচ্ছদ লালবর্ণের।

৬। ওয়ে-টোয়ে-পিন—সৈন্যাধ্যক্ষের শরীররক্ষক—ভায়লেট্ রঙের ইউনিফরম।

৭। ফাও-টোফে-পিন—তোপখানার সৈন্য—আস্তা-নিতে পীতবর্ণের পটি ও পীতবর্ণের উত্তরীয়।

৮। ফুং-ছেন-টোয়ে—শত্রু শিবিরে সুড়ঙ্গ খনক (Sapper and miner)—আস্তানিতে শ্বেতবর্ণের চিহ্ন।

৯। চি-নিং-চুয়েন—ভগান্টিয়ার সৈন্য—আস্তানিতে লালবর্ণের চিহ্ন।

১০। চিন ছা-জু-পিন—পুলিশ সৈন্য—ইহাদের মাথার টুপিতে ধূসরবর্ণের চিহ্ন।

সৈন্যগণের পরিচ্ছদ প্রতি তিন মাসে পরিবর্ত্তিত হয়। ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে পীতবর্ণের পরিচ্ছদ। মে, জুন ও জুলাই মাসে শ্বেতবর্ণের। আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর নীলবর্ণের। এবং নবেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে তুলাভরা নীলবর্ণের পোষাক।

বিদ্রোহের পূর্ব্বে জেনারাল ও তন্নিম্নস্থ সৈনিক কর্ম্ম-চারিগণ কোথাও যাইতে হইলে, বা কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইলে পাল্কী আরোহণে যাইতেন এবং অগ্রপশ্চাতে নিশানধারী সৈন্য চলিত। কিন্তু এক্ষণে সে সমস্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন ছোট বড় সকলেই অশ্বারোহণ করিয়া যাতায়াত করে। পূর্ব্বের সমস্ত পরিচ্ছদ এককালে বর্জ্জিত হইয়াছে। ময়ূরপুচ্ছ ও জেড প্রস্তরের নলযুক্ত গ্রীষ্ম ও শীতকালীন টুপি প্রভৃতি আর এখন ব্যবহৃত হয় না।

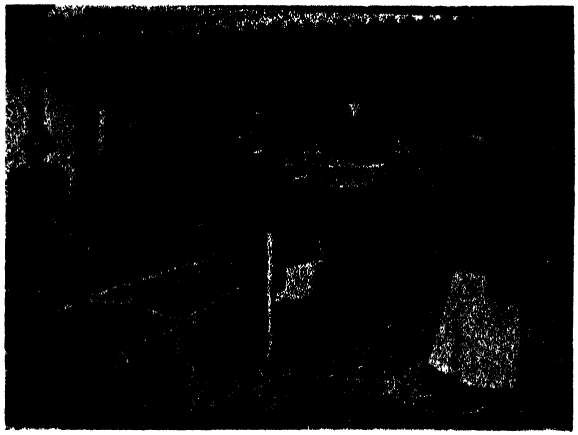


রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে চীন কর্ম্মচারীর পাল্কী চড়িয়া শোভা যাত্রা।

এই ত গেল মোটামুটি সৈন্য ও সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের কথা। এখন সিভিল কর্ম্মচারী ও প্রজাসাধারণের পরিচ্ছদ

পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিব। সিভিল কর্ম্মচারীদিগের আর পূর্ব্বের জাঁকজমকবিশিষ্ট লম্বা চোগা, মূল্যবান স্বর্ণ-খচিত বড় কোট, স্বর্ণ ও হীরক গুটিকাযুক্ত মুকুট, মোতি ও নানা মূল্যবান প্রস্তরের মালা প্রভৃতি নাই। এসমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই প্রকার মূল্যবান পরিচ্ছদের ব্যবহার উঠিয়া যাওয়ায় সমগ্র চীন দেশে কোটি কোটি টাকার দ্রব্য অব্যবহার্য্য হইয়াছে। তবে মঙ্গলের কথা এই যে ভবিষ্যতে আর ইহার জন্য জাতীয় অর্থ নষ্ট হইবে না। কি সৈনিক কি সিভিল কর্ম্মচারী সকলেই গৃহে সাধারণ ধরণের লাল গুটিকাযুক্ত টুপি পরিতেন। কিন্তু ঐ টুপিও মাঞ্চুগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত টুপি মনে করিয়া এখন সকলেই বিলাতী সায়ংকালীন টুপি (Evening Cap) পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত রাজকীয় কর্ম্মচারীই বর্ত্তমান জাপানি ধরণের সৈনিক টুপি, বড় বড় সোলার টুপি, কম্বলের টুপি (Felt cap) প্রভৃতি ধরিয়াছেন। এবং সেই দেখাদেখি প্রজা সাধারণ বিলাতি ধরণের নানা প্রকার টুপি ব্যবহার করিতেছে। এবার এই অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ টুপির আমদানি হইয়াছে। একদল লোকে বেশ লাভজনক ব্যবসা করিয়াছে। কর্ম্মচারিগণ মাথার টুপি হইতে পায়ের বুট পর্য্যন্ত সমস্ত পরিচ্ছদ বিদেশী ধরণের পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘোড়ার সরঞ্জামও সমস্ত বিদেশী। দেশী জিন লাগাম আর ব্যবহার হয় না। ইংলিশ কোট, নেকটাই, কলার, দস্তানা প্রভৃতি অনেকের নিত্য ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ হইয়াছে। চীনাদের বর্ণ পরিষ্কার বলিয়া ইংরেজী পরিচ্ছদ পরিধান করিলে সহসা ইউরোপীয় বলিয়া বোধ হয়। বিলাতি ধরণের টুপির প্রতি লোকের কেমন ঝোঁক্ পড়িয়াছে তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইব। আমার বাটীর পার্শ্বে এক বাড়ীতে বিবাহ হয়। সেই বিবাহে আমার ভৃত্যগণের আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। দুই জন ভৃত্য কিছুতেই নিমন্ত্রণের মজলিসে যাইতে রাজি হইল না, কেননা তাহাদের বিলাতি ধরণের টুপি ছিল না। সাবেক টুপি পরিয়া মজলিসে যাইতে লজ্জা বোধ করিল। অবশেষে আমার দুইটী টুপি ধার করিয়া তাহাই মাথায় দিয়া তবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল।

এই রাষ্ট্রবিপ্লব-ঘটিত পরিচ্ছদ-বিপ্লবে ইউরোপীয় পাদ্রিগণের বড় মুস্কিল হইয়াছে। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া যুগপৎ দুঃখ ও হাসির উদ্রেক হয়। দুঃখ হয় কেননা তাঁহারা চীনাদিগকে ভুলাইবার জন্য বহুযত্নে মাথায় সুদীর্ঘ বেণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই বহু যত্নের ধন এখন কাটিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছেন। হাস্যের কারণ এই যে তাঁহারা যতই কপটতা করিয়া নিজকে চীনার সঙ্গে মিলাইবার চেষ্টা করিয়া আপন কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করুন না কেন ভবী ভুলিবার নয়।



চীনের বিদেশী কনসাল বা কমিশনারের পাল্কী।

চীনের উচ্চ কর্ম্মচারিগণ এখন যখন অশ্বারোহণে কনসাল ও কমিশনারদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন ইহাদেরও এখন পাল্কী চড়িয়া চীনকর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতে হইতেছে। তবে তাঁহাদের পাল্কী চড়িয়া যাওয়া চীনাদের ভুলান মাত্র, এ তাঁহাদের জাতীয় রীতি নহে।

পরিচ্ছদ-বিপ্লবের যে চারিখানি ছবি প্রদত্ত হইল এবং তাহার যে সামান্য বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা মাত্র সাধারণ ভাবে বুঝিতে হইবে। অবশ্য ইহার মধ্যে অনেক ব্যতিক্রম আছে। এ প্রবন্ধে সে সকলের বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

ধর্ম্মবিপ্লব।

ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার যে এত বড় একটা প্রাচীন কুসংস্কারাপন্ন রক্ষণশীল জাতির ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন



রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বেকার চীন ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ
গ্রীষ্মকালীন টুপি ও বেণী।
ডাঃ রামলাল সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত।



রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে চীন ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ
ও শীতকালীন শিরোভূষণ।
ডাঃ রামলাল সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত।

এত সত্বর এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল। ইহাদের এই পরিবর্ত্তনের বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদিগের নিজের সামাজিক ও ধর্ম্মের অবস্থার সঙ্গে যখন তুলনা করি তখন লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হয়। আজ আমরা দেড়শত বৎসরের অধিককাল ইংরেজের অধীন থাকিয়া, ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া যাহা করিতে সমর্থ হইলাম না, চীনারা তাহা অতি সত্বর সম্পন্ন করিল। এতকাল পরে চীনারা আবিষ্কার করিয়াছে যে মন্দিরের যত দেবমূর্ত্তি তাহার পেটে কেবল বাঁশ খড় ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এই বাঁশ খড় ও মাটীর নির্ম্মিত দেহে কি করিয়া দেবত্ব থাকিতে পারে? সে প্রকার কল্পনা করা কেবল মূর্খতার পরিচায়ক। এই কারণে তাহারা অনেক মন্দিরের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। কোন কোন দেবমন্দিরকে মূর্ত্তিরূপ আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত করিয়া তথায় তাঁতের আয়োজন করিয়া কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে যাহাতে জাতীয় উন্নতি হয়। কোন কোন স্থলের দেবমন্দিরে মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাদের আর লোকে পূজা করে না। সেদিন যমরাজার চিরপূজ্য দেবমূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, কোন কোন মূর্ত্তির পেটের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ড পাওয়া যাওয়ায় সেপাইগণ ধনলোভে অন্যান্য মূর্ত্তিও আগ্রহের সহিত চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক একটী দেবমন্দির অতিশয় প্রকাণ্ড; কত লক্ষ লক্ষ টাকা সেই সকল মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ব্যয় হইয়াছে। মূর্ত্তিসকল কত শিল্পকৌশলে

নির্ম্মিত। এখন পরিত্যক্ত হইতেছে। সেদিন এক প্রসিদ্ধ বুদ্ধমন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দিরটী পর্ব্বতের গাত্রে নির্ম্মিত। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশলের সঙ্গে স্বাভাবিক দৃশ্য মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। সেই মন্দিরে এক হো-সাং বা পুরোহিত থাকেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে "মন্দিরের এখন এমন ছাড়া ছাড়া ভাব কেন?" তাহাতে তিনি কহিলেন যে "এখন আর এখানে কেহ পূজা করিতে আসে না।" এইরূপ প্রায় সকল মন্দিরের দশা হইয়াছে।

পূর্ব্বে প্রবাসীর কোন কোন প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে "চীনার বসন্তোৎসব" বা তৃতীয় মাসিক উৎসবে "যমরাজার শ্বশুরবাড়ী যাত্রা" উপলক্ষ্যে কত ধুমধামের সহিত পূজা ও মিছিল বাহির হইত, শরৎকালে রাজকর্ম্মচারিগণ মন্দিরে গিয়া লক্ষ্মীদেবীর বা ফসলের দেবতাকে পূজা দিতেন, সে সকল আর এখন নাই। তাহা এখন অতীত ঘটনার মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

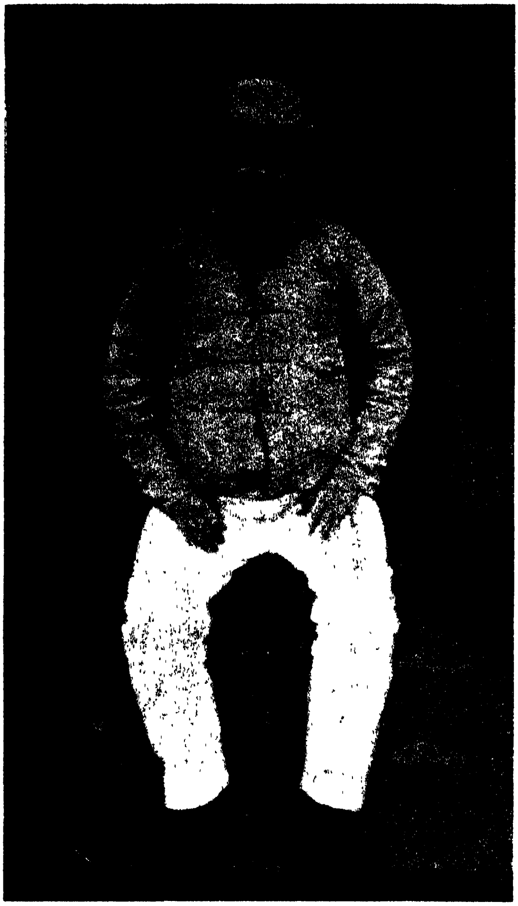
এই উপলক্ষ্যে আমার স্বদেশবাসীদিগকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে আমাদিগের ধর্ম্মের নানা আবর্জ্জনাগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে একবার পবিত্র করা উচিত নয় কি? বাস্তবিকই সভ্য সমাজে এজন্য লজ্জা পাইতে হয়। এই কারণেই আমরা "হিদেন" বা "আইডলেটার" আখ্যা পাইবার যোগ্য। আমরা যে ইংরেজ উপনিবেশ সকল হইতে তাড়িত হই, ইহা তাহার বহু কারণের মধ্যে একটী কারণ বলিয়া বোধ হয়। চীন দেশে যে এত শীঘ্র ধর্ম্ম ও সমাজের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সে অনেকটা তরবারির জোরে। কারণ দলপতিগণ যখন যাহা ঘোষণা করিবেন প্রজাসাধারণকে তাহা মানিতে হইবে। যে বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিয়া শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করা হইবে। আমা-দিগের মানসিক ও নৈতিক বলের দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে। সেই জন্য বঙ্গীয় নব্য শিক্ষিত যুবকদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন আপন আপন গৃহে সৎসাহসের সহিত এই প্রকার সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হন। অথবা সভাসমিতি করিয়া আন্দোলনের দ্বারা আবর্জ্জনাগুলি দূর করেন। তাহা হইলে তাঁহাদের দেখাদেখি অপর সাধারণ লোকে তাঁহাদের পথানুসরণ করিবে। আমি আজ এই কয়েকটা কথা এমন করিয়া লিখিতেছি তাহার কারণ দূরদেশে ৬০০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর বসিয়া দূরে থাকিয়া দেশের অবস্থা যেমন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয়, দেশে থাকিলে তাদৃশ বোধ হয় না।



রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বেকার চীন মাণ্ডারিনের পরিচ্ছদ, শিরোভূষণ—
হাতে চীনা হুকা ও জ্বলন্ত পলিতা।
ডাঃ রামলাল সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত।

সমাজবিপ্লব।

সমগ্র চীন সাম্রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, এবং বহু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পুরুষের পরিচ্ছদের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাও লিখিয়াছি। বালিকা-দিগের পদবন্ধন ধীরে ধীরে মুক্ত হইতেছে। পুরুষের মাথায় টিকির পরিবর্ত্তে মুখে গোঁপের সৃষ্টি হইতে



রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে চীন জাতীয় পরিচ্ছদ ও বিদেশী শিরোভূষণ।
ডাঃ রামলাল সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত।



লিউ-ই-পিয়াও—হেয়ো-সেনইওং নামক বিখ্যাত আড়তের মালিক।

আরম্ভ হইয়াছে। মাঞ্চু গবর্ণমেণ্টের সময় চল্লিশ বৎসর বয়সের নিম্নে দাড়ি গোঁপ রাখার নিয়ম ছিল না। কিন্তু এইক্ষণ বিংশ বৎসরের যুবকগণ গোঁপ রাখিয়া দিতেছে। মুখে গোঁপ মাথায় টেড়ি, বিদেশী-পরিচ্ছদপরিহিত কোন চীন যুবককে হঠাৎ চীনা বলিয়া ঠিক করিবার সাধ্য এখন আর কাহারও নাই।

গত জানুয়ারী মাসে সুন-ইয়াট-সেনের টেলিগ্রাম দ্বারা আদেশ জারি হইবামাত্রই চীন দেশের সর্ব্বত্রই জানুয়ারী মাস হইতে বৎসর গণনার চলন হইয়াছে। চীন দেশের নববর্ষ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রায় মধ্যভাগে আরম্ভ হয়। কিন্তু হঠাৎ জানুয়ারীর প্রথমভাগে চীন রাষ্ট্রবিপ্লবকারিগণের নববর্ষের উৎসবের আয়োজন হইল। পরস্পরের মধ্যে প্রীতিসম্ভাষণ প্রভৃতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ অনুসন্ধান করিয়া যাহা ব্যাপার জানিলাম ;—চীনে খ্রীষ্টীয় নববর্ষ হইল অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী হইতে চীন নববর্ষ গণনা করা হইবে। কিন্তু খন খ্রীষ্টাব্দ ১৯১২, অথচ চীন সন ৪৬০৯ বৎসর বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সুতরাং ভবিষ্যতে ৪৬০৯ বৎসর হইতে সনের হিসাব চলিবে। নূতন গবর্ণমেণ্টের পুলিশ,

সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণ জানুয়ারী মাসেই নববর্ষের উৎসব সাঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু প্রজাসাধারণ তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা আবার জাতীয় নববর্ষ পালন করায় একবর্ষে দুইটী নববর্ষের উৎসব হইল। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর সর্ব্বসাধারণের নববর্ষে যে প্রকার আমোদ আহ্লাদ ও তামাশা হইত এবার তাহার প্রায় কিছুই দেখা যায় নাই। এবার নববর্ষে বা বিবাহাদি উপলক্ষ্যে পটকা পোড়ানর শব্দও শুনা যায় নাই। পূর্ব্বে দিবারাত্রি পটকার আওয়াজে কর্ণ বধির হইত। এবার ঘোষণা দ্বারা পটকা পোড়ান রহিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা হাজার হাজার টাকা বাঁচিয়া গেল। আমার বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে ৬০৲ টাকার পটকা পোড়ান হইয়াছিল। সেইসকল পটকার শব্দ বোমের আওয়াজের মত। যত বারুদ এই বৃথা আমোদে ব্যয়িত হইত তাহা এক্ষণে স্বদেশ রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইবে।

বিবাহে পূর্ব্বে ঢোল বা কাড়া বাজিত, এখন তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। এখন অনেকে আমাদিগকে সেলাম করিতে হইলে মাথার টুপি তুলিয়া সেলাম করে এবং সম্ভ্রান্ত লোকের আগমনে করমর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিদ্রোহের পূর্ব্বে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অবনত ভাবে অভিবাদন করিবার নিয়ম ছিল।

এখন চীনাদের সাহেবী ধরণে আহার করিবার লালসা হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে একজন কর্ম্মচারী সরদার চাং প্রভৃতিকে ভোজ দিলেন। সেইজন্য আমার নিকটে কাঁটা চামচ ও প্লেট প্রভৃতি সরঞ্জাম চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

শাসন-প্রণালী।

যদিও নামে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু কার্য্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা ত স্বেচ্ছাচার বলিয়াই বোধ হয়। তবে ইহাকে সৈনিক-শাসন বা মার্শাল ল বলা যাইতে পারে। কিন্তু মার্শাল ল দ্বারা শাস্তি বিধান করিতে হইলে কোর্ট মার্শাল দ্বারা অপরাধীর অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তার পর তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে অর্থাৎ টেঙ্গিয়ে অঞ্চলে সে প্রকার কোন



চীনের মুসলমান।

কোর্ট নাই। বিদ্রোহী সরদারের মুখের কথাই আইন বলিয়া গণ্য হইতেছে। এই শাসনপ্রণালীর কয়েকটা নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন কি প্রকারের শাসনপ্রণালী এখানে চলিতেছে।

১। লিউ-ই-পিয়াওর কথা—এখানকার হোয়া-সেন-ইওং নামক বিখ্যাত আড়তের মালিক এই ব্যক্তি। ইনি খুব ধনী সওদাগর, চীন ও ব্রহ্ম দেশের বহুস্থানে ইঁহার কারবার আছে। বিদ্রোহের পর এই ব্যক্তি পলাইয়া ভামো গিয়াছিলেন। ইঁহাকে সরদার চাং ফাঁকি দিয়া টেঙ্গিয়ে আনান। আমরা যখন আসি সেই সঙ্গে ইনিও আসেন। এখানে আসিবামাত্র ইঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া শিরশ্ছেদের ভয় দেখান হয়। অবশেষে প্রায় ৭৫,০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া তবে ছাড়িয়া দিয়া এক প্রকার নজর-বন্দী ভাবে ইহাকে রাখা হইয়াছে। অপরাধ, কেন তিনি পলাইয়া ভামো গেলেন। এইটী হইল প্রকাশ্য অপরাধ। গোপন অপরাধ ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা লওয়া। সরদার

চাংএর পিতার ঔষধের দোকান ও বাড়ী ছিল। সেই বাড়ী দেনার জন্য লিউ-ই-পিয়াওব নিকট প্রথমে বন্ধক থাকে পরে দেনার দায়ে উহা বিক্রয় হইয়া যায়। এই বাড়ীতেই ইঁহার আড়ত। সেই জন্য চাংএর ক্রোধ।

পরে জেনারাল লি-কেন-ইয়ে আসিলে ইঁহার বিরুদ্ধে আর এক প্রকাশ্য অপরাধ আবিষ্কৃত হয়, তাহা চোরাই মাল রাখা। গোপনীয় অপরাধ চীনাদের মুখেই শুনিতে পাই। ইনি ঐ জরিমানার টাকার কতক রেহাই পাইবার জন্য গোপনে নাকি কন্সালের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই অপরাধে ইঁহার শিরশ্ছেদ করিবার আয়োজন হইয়াছিল। ইনি তাহার সন্ধান পাইয়া রাত্রিকালে পলাইয়া পাহাড় জঙ্গল দিয়া ভামো গিয়া প্রাণে বাঁচিয়াছেন কিন্তু ইঁহার ভাইকে অদ্যাবধি বন্দিদশায় রাখিয়াছে। ইঁহার কারবার বন্ধ, বাড়ীর পরিবারবর্গ দেশছাড়া হইয়াছে, পুলিষে সব শিল মোহর দিয়া বন্ধ রাখিয়াছে। জরিমানার অর্দ্ধেক টাকা ইনি পূর্ব্বেই দিয়াছিলেন।

২। লোং-লিং-টিং বা লোং-লিংএর মাজিষ্ট্রেট। লোং-লিং এখান হইতে তিন দিনের পথ। তথা হইতে নাকি ইনি এক টেলিগ্রাম লিখিয়া ইউনানফুর জেনেরালের নিকট পাঠান। তাহাতে নাকি সরদার চাং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। টেলিগ্রাফ আফিস হইতে ঐ টেলিগ্রাম সরদারের হাতে পড়ে। তিনি লোং-লিংএর ম্যাজিষ্ট্রেটকে ফাঁকি দিয়া আনাইয়া তাঁহাকে কয়েদ করেন এবং তাঁহার শিরশ্ছেদ করিবেন এমন আয়োজন হয়। পরে অবসর-প্রাপ্ত বৃদ্ধ জেনেরাল চাং জামিন হইয়া ইঁহাকে মুক্ত করেন। কিন্তু আবার কোন কথায় উত্তেজিত হইয়া ইঁহাকে এক মন্দিরের আঙ্গিনার ভিতর বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সম্মুখে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা হয়। এই ঘটনায় বহু লোকের প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল।

৩। টু-ইন্-লিয়াল—এই ব্যক্তি মুসলমান। বিদ্রোহের পর টেঙ্গিয়ের সৈন্য যখন ইউনটাং-ছ-ফু শহর আক্রমণ করে, তখন তথাকার সৈন্যের সেনাপতি মিঃ ল'র বিরুদ্ধাচরণ করায় এই ব্যক্তি শঠতা দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করে। সরদার চাং এই কার্য্যে খুসি হইয়া টু-ইন-লিয়ালকে ঐ স্থানের ৫০০ সৈন্যের অধিপতি নিযুক্ত করেন। ইহার পর টু-ইন-



কর্ণেল ছেন-চির-থোয়ে।

লিয়ালকে শোয়েলিন্-ফু নামক স্থানের যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। টু নাকি পথে লোকের উপর বড় অত্যাচার করিয়াছিল এবং লোকের অর্থ ও সম্পত্তি হরণ করিয়াছিল এই বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। সরদার চাং মা-তে-ইন্ নামক অপর এক মুসলমানকে লিখিয়া ফাঁকি দিয়া টুকে আনিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। টু কিছুতেই টেঙ্গিয়ে যাইতে স্বীকৃত হয় না। অবশেষে মা-তে-ইন ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া রাজি করে। টুকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য মা-চাং-পিয়াও নামক আর এক মুসলমানকে টেঙ্গিয়ে হইতে

পাঠান হয়। টেঙ্গিয়ে হইতে এক দিনের পথে কাং-লাং-চাই নামক স্থানে ইহাদের সাক্ষাৎ হয়। সরদার চাং মা-চাং-পিয়াওকে গুপ্ত আদেশ দিয়াছিলেন যে টুকে হত্যা করিয়া তাহার মাথা টেঙ্গিয়ে লইয়া আসিবে। কাং-লাং-চাই নামক স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর শিষ্টাচারের পর, মা-চাং-পিয়াও হঠাৎ পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া টুকে গুলি করে। গুলি টুয়ের পশ্চাৎ-দেশ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, এবং টু ধরাশায়ী হইবামাত্র মা-চাং-পিয়াও শিকার মিলিয়াছে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া মুণ্ড লইবার জন্য তরবারি আনিতে যায়। যেই মা তরবারি লইয়া টুয়ের গলায় কোপ মারিতে উদ্যত অমনি টু শায়িত অবস্থাতেই আপন পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া এক গুলিতে মা-চাং-পিয়াওকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে। পিস্তলের গুলি ইহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। অবশ্য এই কাণ্ডের পরে অন্যান্য লোকে টুর শিরশ্ছেদ করে। অবশেষে টুর মাথা ও মা-চাং-পিয়াওর লাশ টেঙ্গিয়ে প্রেরিত হয়। মা-চাং-পিয়াওর লাশ মুসলমানদিগের মস্‌জিদে আনীত হইয়াছিল; আমরা গিয়া দেখিয়াছিলাম।

এইরূপে প্রায় প্রত্যহ দুই একটী লোকের মাথা কাটা যাইতে লাগিল। তাহারা তখন চাংকে নৃশংস ও বিশ্বাস-ঘাতক মনে করিয়া নানা নিন্দা করিতে লাগিল। তখন ইউনান-ফু হইতে জেনেরাল লি-কেন-ইয়ে এখানে পৌঁছিবার কথা শুনা গেল। সকলে মনে করিলাম যে জেনেরাল লি আসিলে অনেকটা আসান হইবে। লোকে সুবিচার পাইবে।

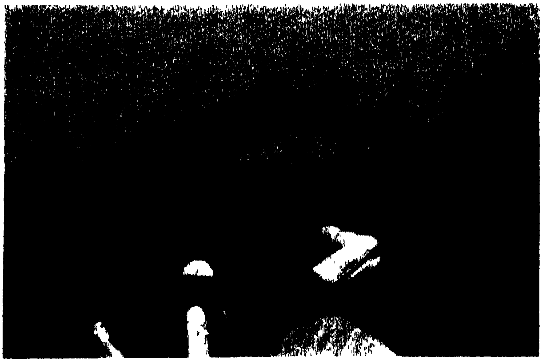
১লা ফেব্রুয়ারী জেনেরাল লি-কেন-ইয়ে অতি আড়ম্বরের সহিত বহু সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া এখানে পৌঁছিলেন। তাঁহার পৌঁছিবার দুই দিন পূর্ব্বে টালিফুর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী, কর্ণেল ছেন-চির-খোয়ে পলাইয়া বর্ম্মায় যান। কারণ লি-কেন-ইয়ে ইহার শিরশ্ছেদ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির বিষয় পরে উল্লেখ করা যাইবে।

লি-কেন-ইয়ে আসিবার কয়েকদিন পরেই তাঁহার হুকুমে চণ্ডু খাওয়ার অপরাধে দুইজন লোকের উপরকার ওষ্ঠ কাটিয়া দেওয়া হয়, দুই একজন লোকের শিরশ্ছেদ হয়, এবং তের জন লোকের জুয়া খেলার জন্য কান কাটিয়া দেওয়া হয়।



তৌ-ছোয়েন-ইয়ে— ছোয়ে-ইয়েন-চী নামক প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কের একজন মালিক।

৪। তৌ-ছোয়েন-ইয়ে—এই ব্যক্তি এখানকার ছোয়ে-ইয়েন-চী নামক প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কের একজন মালিক। কাষ্টম আফিস ও কনসালের টাকাকড়ির কার্য্য এই ব্যাঙ্কে হয়। কাষ্টম আফিসের সাহেবেরা কার্য্য বন্ধ করিয়া যখন ভামো যান তখন আয়ের হানি হইল মনে করিয়া সরদার চাং-ওয়েন কোয়ান ইহাকে কাষ্টম শুল্ক আদায়ের ভার দিয়া কমিশনারের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইনি কিছুদিন মহাগর্ব্বে হ্যাট কোট ও বুট পরিয়া কমিশনার সাজিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে কাষ্টম আফিসের সাহেবগণ আসিয়া পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তখন



শবাধার বহন।

মিঃ তৌঁয়ের কার্য্য গেল। ইহার কয়েকদিন পরেই শুনিতে পাইলাম যে লি-কেন-ইয়ের আদেশে ইহাকে কারাবদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ আমার একটী ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে তৌঁ-ছোয়েন-ইয়েকে ইয়ামিন হইতে বাজারের মধ্যে লইয়া শিরশ্ছেদ করিবার আয়োজন হইয়াছিল এবং তাঁহার কফিন বা শবাধার পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যে সরদার চাং দৌড়িয়া গিয়া জামিন হওয়ায় প্রাণদণ্ড হইল না। ইহার পর এই ব্যক্তিকে এক কাঠের খাঁচার মধ্যে বসাইয়া গলা আবদ্ধ করিয়া বাজারের মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে রাখা হইয়াছে। রৌদ্র বৃষ্টি সমস্তই ইহার মাথার উপর দিয়া যাইতেছে। স্বচক্ষে লোকটার এই দুরবস্থা দেখিলাম। ইনি লজ্জায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামলাল সরকার।

কবির দুঃখ

(হাইন হইতে)

আমি যদি পার্ত্তাম হ'তে মস্ত একটা শিল্পীরে,
এম্নিধারা আঁক্‌তাম সব ছবি,
যে সাজিয়ে তাই রাখ্‌ত সবাই রাজপ্রাসাদে, মন্দিরে,—
ঘুচে যেত দৈন্য দুঃখ সবি'।

বেহালা আর বাঁশী নিয়ে পার্ত্তাম যদি তুল্‌তে তান,
তুলতাম আমি এম্নিতর সুর,
যে রাজারাজড়া মিলে সবে বাড়িয়ে দিত আমার মান,—
দৈন্যদশা হ'ত আমার দূর।

কিন্তু হায় কবিতা, সুখের মুখ দেখ্‌তে আমায় হবে নাগো,
তোমায় যখন সার করেছি আজ,—
এম্নি হায় বিশ্বমাঝে তুষ্টিহীনা তুমি মাগো,
এম্নি তোমার আপ্‌খোরাকী কাজ!

সবাই যখন খাচ্ছে মদ—খাচ্ছে বেশ গ্লাসভরা,*
তখন—(লাজের কথা বল্‌ব আমি কারে?)—
আমায় খুসী থাক্‌তে হবে একেবারেই মদছাড়া,
নেহাইৎ যদি খেতে হয়ত—ধারে!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

দনুজমর্দ্দন দেব

গত কয়েক বৎসরাবধি আমি যশোর-খুল্‌নার ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের কার্য্যে ব্রতী আছি। তজ্জন্য প্রাচীন কীর্ত্তির অনুসন্ধানার্থ আমাকে মাঝে মাঝে সুন্দরবনেও যাইতে হইয়াছে। গত বৎসর পৌষমাসে বড়দিনের বন্ধে আমি স্বনামধন্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্যোগ ও সাহায্যে একবার সুন্দরবনে যাত্রা করি। ডাক্তার রায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় কৃপা করিয়া আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমরা ১১ জনে ছোট বড় ২ খানি নৌকায় পর্য্যাপ্ত আহার্য্য ও অন্যান্য সরঞ্জাম লইয়া যাত্রা করি এবং চাঁদখালি দর্শন করিয়া কাল্‌কীর খাল ও চেউটী নদী দিয়া খোলপেটুয়া নদীতে পড়িয়া গত ১৯১১ অব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে বিছটগ্রামে পৌঁছি। এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড ডক বা পোতাশ্রয় ও অন্যান্য কীর্ত্তিচিহ্ন আছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি ঐ দিন প্রাতে নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুর গ্রামে গিয়াছিলাম। তথায় একটি মুসলমান কবর খনন করিবার সময়ে একটি প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। মুদ্রাটি সে উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়কে দেয়।

* আহা, কি দুঃখ গো!



শ্রীমহেন্দ্রদেব নামাঙ্কিত পাণ্ডুনগরের মুদ্রা।



দনুজমর্দ্দনদেব নামাঙ্কিত পাণ্ডুনগরের মুদ্রা।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু দয়া করিয়া উহা আমাকে দিয়াছিলেন। তখন উহার লেখা পড়িতে পারা যায় নাই। পরে দৌলতপুরে আসিয়া মুদ্রাটি পরিষ্কার করিয়া উহার পাঠোদ্ধার করা হয়।

মুদ্রাটির এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে:—"শ্রীদনুজমর্দ্দন দেব।" এবং অপর পৃষ্ঠায় আছে—"শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ—শকাব্দা ১৩৩৯—চন্দ্রদ্বীপ"। ইহার মধ্যে "শকাব্দা"র "শ"টির কতকাংশ ও চন্দ্রদ্বীপের "প"টি মাত্র কাটা গিয়াছে। অন্য অক্ষরগুলি বেশ পড়িতে পারা যায়। শীঘ্রই ইহার ফটো প্রকাশিত করিব। এই মুদ্রাটির প্রকৃত অবস্থা ও অকৃত্রিমতা বিষয়ে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের বিশিষ্ট কর্ম্মাধ্যক্ষ, মুদ্রাতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, মহাশয় স্বীয় অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া জানাইবেন। আমি উহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলিব।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে বা তদনুরূপ অন্য কোন স্থানে এরূপ মুদ্রা সংগৃহীত হয় নাই। মালদহনিবাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে "পাণ্ডুনগরের মুদ্রা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ঐ প্রসঙ্গে যে দুইটি রৌপ্যমুদ্রা প্রদর্শন করেন তাহার একটি সম্বন্ধে তিনি বলেন "২৩৯ শকাব্দায় বা ৩১৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুনগরের রাজা দনুজমর্দ্দন দেব রাজত্ব করিতেন।"* আমি সে মুদ্রাটি দেখি নাই, সম্ভবতঃ উহার কোন ফটো এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমার বিশ্বাস উক্ত মুদ্রায় পাণ্ডুনগরের কোন উল্লেখ নাই; ৺রাধেশবাবু শকাব্দার নির্দ্দেশে "২৩৯" এইরূপ পাঠোদ্ধার করিবার সময় একটি ৩ কেও ২এর মত পড়িতে পারেন এবং উক্ত ২ এর বামভাগে একটি ১ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়াও বিচিত্র নহে। সুতরাং সে মুদ্রারও তারিখ ১৩৩৯ শকাব্দা ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি। অন্য কুত্রাপি দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

মালদহের মুদ্রায় যাহাই থাকুক, আমার মুদ্রায় ১৩৩৯ শকাব্দা, দনুজমর্দ্দন দেব এবং চন্দ্রদ্বীপ এই তিনটি বিষয়ই সুস্পষ্ট ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে দেখা যায়। মুদ্রাটি অকৃত্রিম তাহা শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু সপ্রমাণ করিবেন এবং মুদ্রার প্রমাণ যে অকাট্য তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। দনুজমর্দ্দনের "দেব" উপাধি কায়স্থবাচক; এখনও তাঁহার কায়স্থ বংশধরগণ বরিশালের সন্নিকটে দীনভাবে দিন যাপন করিতেছেন। "চণ্ডীচরণপরায়ণ" —বিশেষণে দনুজমর্দ্দন যে হিন্দু এবং শাক্ত নৃপতি ছিলেন, তাহার প্রমাণ দিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান মুদ্রা হইতে সহজেই নির্দ্দেশ করিতে পারি যে দনুজমর্দ্দন দেব নামক একজন প্রবল প্রতাপান্বিত শাক্ত কায়স্থ নৃপতি ১৩৩৯ শকে বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়া স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়েরা যে মুদ্রা ছাপিতেন না, তাহা সত্য নহে। দনুজমর্দ্দনের নিজেরই মুদ্রা পাওয়া গেল।†

এক্ষণে এই দনুজমর্দ্দন কে? তিনি কোথা হইতে

* শ্রীহরিদাস পালিত প্রণীত "মালদহের রাধেশচন্দ্র"—২৯ পৃঃ।
† বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—১৫৯ পৃঃ।

আসিয়া রাজ্যস্থাপন করিলেন? এ সম্বন্ধে অনেকগুলি মত আছে। আমরা এক একটি করিয়া সংক্ষেপে সবগুলি বিচার করিব।

(১) "বল্লালসেনের কায়স্থজাতীয়া উপপত্নীজাত পুত্র কালু রায়কে তিনি চন্দ্রদ্বীপে করদ রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দনুজদমন রায় তাহার বংশধর।"* (অবশ্য এস্থলে দনুজমর্দ্দন ও দনুজদমন অভিন্ন ব্যক্তি ধরিয়া লওয়া হইতেছে)। এই মতের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। যদিও এই মতের পরিপোষক গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে শপথ করিয়া বলিতেছেন যে তাহার পুস্তকে "সম্পূর্ণ অমূলক কোন বৃত্তান্ত নাই", তবুও আমরা ইহার প্রমাণের সন্ধান পাইলাম না। বিশেষতঃ ইহাতে চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। প্রমাণ অভাবে আমরা এমত পরিত্যাগ করিতে পারি।

(২) বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন সমগ্র বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজা। লক্ষ্মণসেনের কয়েকটি পুত্র ছিলেন—মাধবসেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন। খিলিজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন পুরুষোত্তম প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলেন। মাধবসেন হিমালয় অঞ্চলে পলায়ন করেন; কুমায়ুনে কেদারনাথ তীর্থে মাধবসেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।† বিশ্বরূপ পূর্ব্ব হইতে বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। কেশবসেন বঙ্গবিজয়ের কিছুদিন পরে পলায়ন করিয়া বিশ্বরূপের নিকট যান। বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর কেশবসেন অল্পকাল রাজত্ব করেন।‡ পরে বিশ্বরূপের পুত্র দনুজমাধব রাজা হন। কেহ আবার অনুমান করেন, লক্ষ্মণসেনের আর এক পুত্র ছিল তাহার নাম সদাসেন। দনুজমাধব কাহার পুত্র যখন স্পষ্ট জানা যায় না তখন তিনি সদাসেনেরই পুত্র।** আবার কেহ বলেন লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধবসেনেই রাঢ়ীয় কুলজীগ্রন্থে দনৌজা মাধব নামে উক্ত হইয়াছেন।* পরে দেখা যাইবে একথা সত্য হইতে পারে না। যাহা হউক, দনুজমাধব যাহারই পুত্র হন, তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিকদিগের দ্বারা নানা নামে পরিচিত হইয়াছেন। দনুজ, দনৌজা, ধিনুজ রায় (Stewart), নোজা (Raja Nodja, Tieffenthaler), নৌজা (আবুল ফজল), দনুজ রায় (Jiad-din Barni and Elliot), দনৌজামাধব বা দনুজমর্দ্দন দেব রায়, ও দনুজদমন—এসকলই অনেকের মধ্যে একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম। অর্থাৎ বিক্রমপুরের দনুজমাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন অভিন্ন ব্যক্তি।† দনুজমাধব বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর বিক্রমপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার রাজত্বকালে ১২৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর বুলবন পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মঘিসুদ্দীন তোগরলের দমন জন্য স্বয়ং বঙ্গদেশে আসেন। এসময়ে দনুজমাধব সৈন্য দিয়া নৌপথে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।‡ দনুজরায়ের সহিত বুলবনের সন্ধি হয়। কিন্তু তৎপরে অল্পদিন মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থান মুসলমান অধিকার ভুক্ত হইলে, দনুজমাধব চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক নূতন সিংহাসন পাতিয়া বসেন। তিনি তাঁহার গুরুদেব চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীর নির্দ্দেশানুসারে যে নবোত্থিত দ্বীপে রাজ্যস্থাপন করেন, উহার নাম তিনি গুরুদেবের নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ রাখিয়াছিলেন।** চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়গণ সকলেই এই দনুজমাধব বা দনুজমর্দ্দনের বংশধর। এই রাজবংশীয় কেহ কেহ এখনও বর্ত্তমান আছেন। তাহারা গোষ্ঠীপতি কায়স্থ। সুতরাং

* শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—১১৯ পৃঃ এবং গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।

† Journal of the Asiatic Society, of Bengal Vol. Lxv, part I, p. 28 এবং বিক্রমপুরের ইতিহাস, p. 43.

‡ আর্য্যাবর্ত্ত, চন্দ্রদ্বীপ প্রবন্ধ, ফাল্গুন, ১৩১৮—৮০৯ পৃঃ।

** N. N. Vasu—J. B. A. S, Vol, LXV, part I, p. 32.

* বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২১ পৃঃ।

† "The Emperor occupied Sonargaon having been joined in advance by Dhinwaj Rai, Zamindar of the city, with all his troops. This is probably the same person as Dhinaj Madhub who is believed to have been a grandson of Ballal Sen"—Dr. Wise, I. R. A. S. 1874, No. 1, p. 83,

"It is not improbable that the founder of this family (Chandradwip family) is the same person as the Rai of Sonargaon by name Dhanuj Rai"—Dr. Wise, J. R. A. S., 1874, No. 3, p. 206,

See also N. N. Vasu, J. R. A. S. 1895, No. 1, p. 35, শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, বঙ্গীয়-সমাজ, ৭৯ পৃঃ।

‡ Stewart's History of Bengal (Bangabasi Edition, p. 82), Elliot Vol III. p. 116,

** শ্রীব্রজসুন্দর মিত্র কৃত "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ"।

এতদ্দ্বারা বল্লালসেন যে কায়স্থ তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। এইরূপ প্রমাণ-বলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সুবিখ্যাত "বিশ্বকোষে" বল্লালের কায়স্থত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বল্লালসেন কায়স্থ ছিলেন কিনা তাহা প্রতিপন্ন করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তিনি কায়স্থ ছিলেন না, একথাও আমি এখানে বলিতেছি না। তবে আমরা এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে বিক্রমপুরের দনুজমাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন এক ব্যক্তি নহেন।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে দনুজমাধব কাহার পুত্র তাহাই স্থির হইতেছে না। কেহ বলেন তিনি লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধবসেন; কিন্তু ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিজয়ের সময়ে যিনি পরিণত বয়স্ক, তিনি তাহার ৮২ বৎসর পরে বুলবনের সময়ে জীবিত থাকিতে পারেন না। আবুলফজল লক্ষ্মণের পুত্র সদাসেনের নাম করিয়াছেন,* দনুজ যে সদাসেনের পুত্র তাহা অনুমান মাত্র। আবার হরিমিশ্রের কারিকার প্রমাণ হইতে দনুজের পিতামহ বলিতে লক্ষ্মণসেনকে না বুঝাইয়া বল্লালকে বুঝান বিচিত্র নহে†। বিশ্বরূপের পরে তিনি পূর্ব্ব বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি বিশ্বরূপের পুত্র তাহাও দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। সেন বংশেই যখন দনুজমাধবের পুত্রত্ব এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ, তখন তাঁহার উপর আবার অন্য একবংশের পিতৃত্ব আরোপ করা সমীচীন নহে।

দ্বিতীয়তঃ নগেন্দ্রবাবু ঘটককারিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দনুজমর্দ্দনের বংশীয় জয়দেবকে "চন্দ্রদ্বীপস্থ ভূপালো দেববংশ সমুদ্ভবঃ" বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, পরে "পুনশ্চ" দিয়া ফরিদপুরের এক বৃদ্ধ ঘটকের লিখিত বংশাবলী হইতে দেখাইতেছেন যে উক্ত পংক্তি "চন্দ্রদ্বীপস্থ ভূপালো সেনবংশ সমুদ্ভবঃ"—এইরূপ হইবে।‡ সেনকে দেব করিবার চেষ্টার মত "দেব" ও যে দৈবাৎ "সেন" হইয়া পড়িতে পারে, তাহা বিচিত্র নহে। মোটকথা শেষোক্ত পংক্তিতে "সেন" শব্দ যে প্রক্ষিপ্ত হইতেই পারে না, ইহা বলিতে পারি না।

* Tarret, Ain-i-Akbari, Vol. II, p. 146.

† J. R. A. S, 1896, No. 1. p. 32 ; বারভূঞা, আনন্দনাথ রায়, ১১৮ পৃঃ

‡ J. R. A. S., 1896, No. 1, p. 33 37.

তৃতীয়তঃ নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বলিতেছেন যে ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বুলবনের আক্রমণের পর ২০ বৎসরের মধ্যে দনুজমাধব চন্দ্রদ্বীপে গিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের মতেও ১৩০০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশের রাজ্য শেষ হয়। তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া যাউক যে দনুজমাধবও ১৩০০ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পর ক্রমে ৪ জন চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। পঞ্চম রাজার নাম পরমানন্দ রায়। ৪ জনের রাজত্বকাল মোট ১৫০ বৎসর ধরা যাইতে পারে।* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দনুজ মাধব ১২৫০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন, সুতরাং তিনি ১৩০০ খৃষ্টাব্দের পর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। যদি তাঁহার রাজত্ব আরও ১৫ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে পরমানন্দের রাজত্ব ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু আইন-আকবরিতে পাইতেছি যে আকবরের রাজত্বের ২৯শ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বাক্‌লায় (চন্দ্রদ্বীপে) যে জলপ্লাবন হয়, তখন পরমানন্দ রায় অল্প বয়স্ক যুবরাজ†। তাহা হইলে এই ১২০ বৎসর কালের কি গতিবিধান করা যায়, বুঝিতে পারিতেছি না।

চতুর্থতঃ, পরমশ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় দেখাইতেছেন যে লক্ষ্মণসেনের পলায়নের পর তাঁহার বংশীয়গণ ১২০ বৎসর বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন। পরে তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন‡। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ১৩১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে সেন রাজত্ব ছিল। তাহা হইলে ৬৮ বৎসর রাজত্বের পর অতিবৃদ্ধ দনুজমাধব চন্দ্রদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন বলিতে হয়। ইহা সম্ভবপর কিনা বিবেচ্য। ইহা গ্রাহ্য হইলেও পরমানন্দ রায়ের রাজ্যারম্ভ ও জলপ্লাবনের মধ্যবর্ত্তী ১০২ বৎসরের সমন্বয় করা যায় না।

পঞ্চমতঃ, কেহ কেহ বলিতেছেন দনুজমাধব সেনবংশীয় শেষ স্বাধীন নৃপতি। তাঁহার পর সেনবংশীয়েরা কেহ বিক্রম-

* আর্য্যাবর্ত্ত, ১৩১৮ ফাল্গুন, ৮১৪ পৃঃ

† Gladwin's Ain-i-Akbari published by I. P. Society, p. 304.

Beveridge, Bakargunj, p. 27.

‡ প্রতাপাদিত্য (শ্রীনিখিলনাথ রায়) উপক্রমণিকা ৬৭ পৃঃ

Article on Bengal (Imperial Gazetter, Revised Edition.)

পুরে রাজত্ব করেন নাই। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বাবা আদম নামক একজন ক্ষমতাশালী দরবেশ রামপালের নিকটবর্ত্তী আবদুল্যাপুরে আসিয়া গোহত্যা প্রভৃতি দ্বারা যখন হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন, তখন সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন ক্রোধান্ধ হইয়া বাবা আদমকে হত্যা করেন। রামপালে বাবা আদমের মসজিদ আছে। উক্ত সেনরাজ দনুজরায়ের বংশধর পোড়ারাজা বা দ্বিতীয় বল্লালসেন। গোপাল ভট্ট নামক তাঁহার একজন শিক্ষক বল্লাল-চরিত নামক পুস্তকে এই দ্বিতীয় বল্লালের চরিতকথা লিখিয়াছেন। এই পুস্তক ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।* যে দনুজরায়ের বংশধরগণ সপ্রতাপে ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তিনি তাহার প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপে চন্দ্রদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করিলেন ও চন্দ্রদ্বীপে তাঁহার বংশীয় রাজগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন, ইহা বুঝিতে পারিলাম না।

ষষ্ঠতঃ, সমস্ত সন্দেহের নিরসন পক্ষে আমার নবাবিষ্কৃত মুদ্রাই অকাট্য প্রমাণ। এ মুদ্রায় দনুজমর্দ্দনের তারিখ ১৩৩৯ শকাব্দা বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দা স্পষ্ট রহিয়াছে। যে দনুজমাধব ৩০ বৎসর রাজত্বের পর ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ বুলবনকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি আর ১৩৭ বৎসর পরে বাঁচিয়া থাকিয়া চন্দ্রদ্বীপ হইতে যে মুদ্রা প্রচলন করিতে পারেন না, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

সুতরাং নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ হইল যে বিক্রমপুরের দনুজমাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। বিক্রমপুরের সেনবশীয়দিগের সহিত চন্দ্রদ্বীপের বঙ্গজ কায়স্থকুলোদ্ভব দেববংশীয় দনুজমর্দ্দনের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। "নামের সাদৃশ্য ব্যতীত দনৌজমাধব ও দনুজমর্দ্দনের একব্যক্তি হওয়ার কোন বলবৎ প্রমাণ নাই।"† সুতরাং যাহারা এই দুইজনকে একই ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া সেনবংশীয়দিগকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করতঃ বঙ্গীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রম ব্যর্থ হইবে এবং মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতে হইবে। মানুষের জীবনে মতের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। মত থাকিলেই তাঁহার পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং আশা করি, সহৃদয় ঐতিহাসিক মহাত্মাগণ আমার নবাবিষ্কৃত মুদ্রাটির প্রকৃত তথ্য নির্ণয় পূর্ব্বক উহার প্রমাণ বলে স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব মতের প্রত্যাহার করিবেন।

(৩) চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও যে কয়েকটি প্রবাদ আছে, তন্মধ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। একদা চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামক একজন যোগশক্তি-সম্পন্ন সন্ন্যাসী গুরু তাঁহার প্রিয় ভৃত্য দনুজমর্দ্দন দেবকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হন এবং রাত্রিকালে বর্ত্তমান বরিশালের সন্নিকটে অতি প্রশস্ত সুগন্ধা নদীর মধ্যে নৌকা বাঁধিয়া থাকেন। নিশীথে তাঁহার স্বপ্নাদেশ হয় যে সেইস্থানে জলমধ্যে কয়েকটি দেববিগ্রহ আছে, উহা যেন তিনি তুলিয়া লন। পরদিন প্রাতে গুরুর আদেশে দনুজমর্দ্দন ঐস্থান হইতে দুইটি দেবমূর্ত্তি উত্তোলন করেন, এখনও চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশীয়েরা উহার সেবা করিতেছেন। গুরুদেব দনুজমর্দ্দনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক বলিলেন যে ঐস্থানে শীঘ্রই এক দ্বীপের উদ্ভব হইবে এবং দনুজমর্দ্দন তথায় রাজা হইবেন। অচিরে মহাযোগীর আশীর্ব্বাদবাণীর সত্যতা প্রমাণিত হইল। ভাগ্যপুষ্ট ভক্ত শিষ্য গুরুদেবের নামানুসারে ঐ দ্বীপের নাম রাখিলেন—চন্দ্রদ্বীপ। এই দনুজমর্দ্দনই সুবিখ্যাত চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের স্থাপয়িতা। তিনি প্রবল প্রতাপে বহু বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনিই বাকলা সমাজকে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয় করেন। তিনি বঙ্গের একাংশে এক প্রকার স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিয়া স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

* শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাস, ৫২ পৃঃ ও ৭৫ পৃঃ, J. R. A.S. Vol. XIII, part I. page 285.

† গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১১৮ পৃঃ।

দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব

পূর্ব্ব প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যে নব আবিষ্কৃত মুদ্রাটির কথা প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মালদহে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে স্বর্গগত স্বনামধন্য রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় দুইটি রজত নির্ম্মিত মুদ্রা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি দনুজমর্দ্দনদেবের ও অপরটী মহেন্দ্রদেবের। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রাটির আলোচনা করিতে হইলে রাধেশ বাবু কর্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রাদ্বয়ের আলোচনাও করা উচিত। স্বর্গীয় রাধেশ বাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখার পত্রিকায় মুদ্রাদ্বয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এবং উহাদিগের আলোক চিত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। গত ১৩১৭ সালের ২৬শে পৌষ তারিখে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগের সহিত আমি এই মুদ্রাদ্বয় পরীক্ষা করিয়াছিলাম। রাধেশ বাবু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে রাধেশ বাবু মুদ্রাদ্বয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় উপহার প্রদান করিবার জন্য কলিকাতায় আনিয়াছেন। ইহার দুই তিন দিন পরেই রাধেশ বাবুর মৃত্যু হয় এবং তাহার পর হইতেই মুদ্রাদ্বয়ের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার, এম, এ, মহাশয় ও মালদহের উকীল শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষ, বি, এল, মহাশয়ের নিকট সন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে উক্ত মুদ্রাদ্বয় রাধেশ বাবু কর্তৃক কোন স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। গত্যন্তর না থাকায় রাধেশ বাবু কর্তৃক প্রকাশিত আলোক চিত্র অবলম্বনে মুদ্রাদ্বয়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে। এই মুদ্রা দুইটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখার তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে ১৩১৭ সালের ১৯শে ভাদ্র রবিবারে প্রদর্শিত হইয়াছিল। রাধেশ বাবু লিখিয়াছেন "এই দুইটি মুদ্রা পাণ্ডুয়ার আদীনা মসজিদের উত্তর-পূর্ব্বাংশে ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ মধ্যে সাঁওতাল কৃষকের হলমুখে হলচালকের দৃষ্টিপথে পড়ে এবং সাঁওতাল কৃষক তাহা গাজোল হাটে বিক্রয় জন্য লইয়া গেলে, পুরাতন মালদহের একজন দোকানদার তাহা খরিদ করে। দোকানদারের নিকট মালদহের "গৌড়দূত" নামক সাপ্তাহিক পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে দেন।"* রজত মুদ্রা দুইটি গোলাকৃতি, দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রার ওজন ১৬৭ গ্রেণ ও পরিধি ৩¼ ইঞ্চি এবং মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার ওজন ১৭০ গ্রেণ ও পরিধি ৩¼ ইঞ্চি।

(১) দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা :—

আকার প্রায় গোল, ওজন ১৬৭ গ্রেণ, পরিধি ৩¼ ইঞ্চি।

প্রথম পৃষ্ঠ :—

বৃত্ত মধ্যে বঙ্গাক্ষরে (১) শ্রীশ্রীদ
(২) নুজমর্দ্দ
(৩) ন দেব

বৃত্তের বহির্ভাগে যে স্থান আছে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখায় পরিপূর্ণ। বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা নাসিরউদ্দিন মহমুদ শাহের একটি রৌপ্য মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠে বৃত্তমধ্যে এইরূপ খোদিত লিপি ও তদ্বহির্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখাঙ্কণ আছে।† এই, পৃষ্ঠের খোদিত লিপি সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই, কেবল স্থানাভাবে প্রথম পংক্তির "দ" বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ :—

চতুষ্ক মধ্যে (১) শ্রীচণ্ডী
(২) চরণ প
(৩) রায়ণ
চতুষ্কের উর্দ্ধে "পাণ্ডু"
চতুষ্কের বামে "নগর,"

* রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৭০-৭৪,

† Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, Part II, p. 164—66, No. 131, Pt. IV.



শ্রীদনুজমর্দ্দনদেবের নামাঙ্কিত চন্দ্রদ্বীপের মুদ্রা-শকাব্দা—১৩৩৯।

নিম্নে "শকাব্দা"

ও দক্ষিণে "৩৩৯" আছে।

এইগুলি বৃত্তের বহির্ভাগস্থিত অংশে লিখিত আছে।

(২) মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা :—

গোলাকৃতি, ওজন ১৭০ গ্রেণ, পরিধি ৩¼ ইঞ্চি।

প্রথম পৃষ্ঠ :—

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তার্দ্ধ বৃত্তাকারে যুক্ত (Scallopped circle)

তন্মধ্যে (১) শ্রীশ্রী ম

(২) হেন্দ্র

(৩) দেবস্য

বাঙ্গালার স্বাধীন মুসলমান নরপতিগণের অনেকের মুদ্রাতেই এইরূপ বৃত্তাকারে যুক্ত বৃত্তার্দ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা সৈফুদ্দিন হামজা শাহ্, সাহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ্, জলালুদ্দিন মহম্মদ শাহ্, সামসুদ্দিন মুজঃফর শাহ্ ইত্যাদি। ‡

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ :—

চতুষ্কমধ্যে (১) শ্রীচণ্ডী

(২) চরণ প

(৩) রায়ণ

চতুষ্ক নিম্নে "পাণ্ডু"

চতুষ্কের দক্ষিণে "নগর,"

উর্দ্ধে "শকাব্দা"

ও বামে "৩৩৬"।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র যে নূতন মুদ্রাটি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা খুলনা জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক একটি কবর খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় উক্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া অধ্যাপক মিত্র মহাশয়কে দিয়াছিলেন। মুদ্রাটি গোলাকার ও সর্ব্ববিষয়ে স্বর্গীয় রাধেশ বাবু কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রার অনুরূপ।

(৩) দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা :—

গোলাকৃতি, ওজন ১৬০ গ্রেণ, পরিধি ৩¼ ইঞ্চি।

প্রথম পৃষ্ঠ :—

সমভুজ সমান্তরাল ষট্‌কোণদ্বয় মধ্যে :—(১) শ্রীশ্রীদ

(২) নুজমর্দ্দ

(৩) ন দেব।

বাঙ্গালার স্বাধীন মুসলমান নরপতিগণের মুদ্রায় সমভুজ ষট্‌কোণ মধ্যে খোদিত লিপি পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, ইলিয়াস্ শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের একটি মুদ্রায় এইরূপ একটি ষটকোণ আছে*।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ :—

বৃত্তমধ্যে ক্ষুদ্র বৃত্তখণ্ডসমূহ যোজিত করিয়া বৃত্ত।

তন্মধ্যে (১) শ্রীচণ্ডী

(২) চরণ প

(৩) রায়ণ।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃত্তের মধ্যে "শকাব্দা ১৩৩৯ চন্দ্র দ্ব (ী) প।"

স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রার তারিখ ২৩৯ ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার তারিখ ৩৩৬ শকাব্দা পাঠ করিয়াছেন ও তদনুসারে দনুজমর্দ্দনের তারিখ ৩১৭ ও মহেন্দ্রদেবের তারিখ ৪১৪ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু রাধেশ বাবু কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত দুইটি মুদ্রাতেই তারিখ কাটিয়া গিয়াছে, ইংরাজী মুদ্রাতত্বে, ইহার নাম Marginal deletion. Deleted margin অর্থাৎ মুদ্রার পার্শ্বে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাটিয়া গেলে সেরূপ মুদ্রার পাঠোদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু সেই জাতীয় বা সেই রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে উভয়কে মিলাইয়া অস্পষ্ট অক্ষরগুলির পাঠোদ্ধার করিতে হয়। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রাটিতে

‡ Ibid, No. 160. No. 88. No. 161. No. 92. No. 96. No. 171. No. 163.

* Ibid. Pt. II. P. 155. No. 51,

যে অংশে তারিখ আছে তাহা কাটিয়া যায় নাই, সুতরাং তারিখ সুস্পষ্ট আছে, এইরূপ স্থলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে রাখেশ বাবু কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রাটির তারিখও ১৩৪৯ শকাব্দা। মহেন্দ্রদেবের আর কোন মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং ইহার তারিখ নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে রাখেশ বাবুর মতানুসরণ করিয়া যদি ইহার তারিখ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে সুধীসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে বঙ্গাক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে বলিলেই শোভা পাইত। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের সিংহবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মার খোদিত লিপিতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যদি বঙ্গাক্ষর দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে ভরসা করি শীঘ্রই তিনি মত পরিবর্ত্তন করিবেন। খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে অক্ষর ছিল বটে এবং হয় ত তৎকালে তাহা বঙ্গাক্ষর নামে পরিচিত ছিল কিন্তু খৃষ্টীয় ২০শ শতাব্দীর মধ্যভাবে যাহা বঙ্গাক্ষর নামে পরিচিত তাহার সহিত শুশুনিয়া পাহাড়ের খোদিত লিপি সমূহের কোনই সাদৃশ্য নাই। অনুমান হয় মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার সম্পূর্ণ তারিখ ১৩৩৬ শকাব্দা, তন্মধ্যে সহস্রক সংখ্যাটি কাটিয়া যাওয়ায় বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে দেখিতে পাইবেন যে মহেন্দ্রদেব খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর লোক, ৫ম শতাব্দীর নহে। দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রাদ্বয়ের তারিখ শকাব্দ ১৩৩৯+৭৮=১৪.৭ খৃষ্টাব্দ ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার তারিখ শকাব্দ ১৩৩৬+৭৮=১৪১৪ খৃষ্টাব্দ।

মুদ্রাত্রয় হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহেন্দ্রদেব নামক জনৈক হিন্দু শাক্ত রাজা মুসলমান রাজধানী গৌড়ের অতি সন্নিকটে রাজত্ব করিতেন। ইনি মুসলমান রাজার অধীনতা স্বীকার করিতেন না, কারণ তাহা হইলে কখনই নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ করিতে পারিতেন না। মুসলমান রাজসমাজে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ ও শুক্রবারে সাধারণ প্রার্থনাগৃহে নিজ নামে সঙ্কল্প করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা স্বাধীন রাজার চিহ্ন। মুসলমান ইতিহাসে ইহা "খুতবা ও সিক্কা জারি" নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার তারিখের তিন বৎসর পরে দনুজমর্দ্দনদেব নামধেয় অপর একজন হিন্দু রাজা গৌড়ের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুনগরে ও সমুদ্রউপকূলবর্ত্তী চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন। মুসলমান হিন্দু বা ইংরাজ ঐতিহাসিক কেহই বঙ্গের এই স্বাধীন হিন্দু রাজদ্বয়ের নাম গ্রহণ করেন নাই, দনুজমর্দ্দনদেব চাঁদরায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য রায় ও সীতারাম রায় প্রমুখ ভূস্বামিগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছেন মাত্র। যে সময়ে বরেন্দ্রভূমিতে মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনদেবের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, সে সময়ে উত্তরাপথে প্রথম মুসলমান বিজেতৃগণের বিশাল সাম্রাজ্য গৃহবিবাদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে পরিণত হইতেছিল। মহমুদ তোগলক সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লিনগর শাসন করিতেন মাত্র ও আলাউদ্দিন খিলিজি এবং মহম্মদ তোগলকের আসনে বসিয়া মোঙ্গল-সম্রাট তৈমুরের ভয়ে কম্পিত হইতেন। পঞ্চনদে সৈয়দবংশীয়গণ, অন্তর্ব্বেদীতে শার্কীবংশীয়গণ ও গৌড়বঙ্গে ইলিয়াসশাহী রাজগণ স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। গুজরাটে, মালবে ও দাক্ষিণাত্যে স্বতন্ত্র স্বাধীন মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গে ইলিয়াস্‌শাহের বংশের অধিকার শেষ হইয়া আসিতেছে। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে সমসুদ্দিন ইলিয়াস্ শাহ গৌড়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন ও বহুকষ্টে সম্রাট ফিরোজ তোগলকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। উনবিংশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ বিজিত হইয়া উত্তরবঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ একত্রিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করেন। সিকন্দর শাহের পুত্র আজম শাহ সাত বৎসর ও পৌত্র হামজা শাহ দশবৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীনকার বলেন যে হমজা শাহের দত্তক পুত্র সমসুদ্দিন ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে উত্তর বঙ্গের ভাটুরিয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ বা কংস (পারসিক অক্ষরে ইহার নাম কান্‌স্ লিখিত হইয়া থাকে) অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ১৪০৯

খৃষ্টাব্দে স্বয়ং বিদ্রোহী হইয়া মুসলমান রাজাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহার পর পাঁচ বৎসরকাল রাজধানী ফিরোজাবাদ অর্থাৎ পাণ্ডুয়া নগরে সাহাবুদ্দিন বায়াজিদ্ সাহের নামে মুদ্রাঙ্কণ হইত। কেহ কেহ বলেন যে পদচ্যুত রাজার পুত্র বায়াজিদ শাহকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহার নামে গণেশ বা কংসনারায়ণ বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। অপরাপর ঐতিহাসিকেরা বলেন যে রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সাহাবুদ্দিন বায়াজিদ্ শাহ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বায়াজিদ শাহের পরে রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণের পুত্র যদু মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জালালুদ্দিন মহম্মদশাহ নাম গ্রহণ করেন ও ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। যদুর রাজত্ব পূর্ব্বে মুয়জ্জমাবাদ (ময়মনসিংহ) ও চাটগাঁও (চট্টগ্রাম) ও দক্ষিণে সাতগাঁও অর্থাৎ সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জলালুদ্দিন মহম্মদ শাহের নিম্নলিখিত টাঁকশালগুলিতে মুদ্রিত রৌপ্যমুদ্রা কলিকাতার যাদুঘরে আছে :—

(১) ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া বা পাণ্ডুনগর)।
(২) সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম)।
(৩) ময়ুজ্জমাবাদ (ময়মনসিংহ)।
(৪) ফতেহাবাদ (ফরিদপুর)।
(৫) চাটগাঁও (চট্টগ্রাম)।

যে বৎসরে রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণের মৃত্যু হয় সেই বৎসরেই মহেন্দ্রদেবের মুদ্রাটি প্রস্তুত হইয়াছিল। কথিত আছে গৌড়ের বিখ্যাত পীর নুর কুত্ব আলম্ জৌনপুরের মুসলমান রাজাকে (সম্ভবতঃ ইব্রাহিম শাহ) বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে আহ্বান করেন। কথিত আছে যে রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ সপুত্র মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে স্বীকৃত হওয়ায় নুর কুত্ব আলমের আদেশে ইব্রাহিম শাহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনুমান হয় রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণের মৃত্যুর পর যদু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে মহেন্দ্রদেব বিদ্রোহী হইয়া পাণ্ডুনগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করেন। ইতিহাসে কথিত আছে যদু পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী পুনরায় গৌড়ে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহাও হইতে পারে যে মহেন্দ্রদেবের ভয়ে যদুকে ফিরোজাবাদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মহেন্দ্রদেব সম্ভবতঃ দনুজমর্দ্দনদেবের পিতা। দনুজমর্দ্দনদেব সম্ভবতঃ পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াই যদু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছিলেন ও সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পাণ্ডুনগরে ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে দনুজমর্দ্দনদেবের যে মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। দনুজমর্দ্দনদেবের রাজত্ব বরেন্দ্রভূমি হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল না, তাহার প্রধান কারণ এই যে ১৩৩৯ শকাব্দে=১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে=৮২১ হিজিরাব্দে ফতেহাবাদ ও সাতগাঁও জলালুদ্দিন মহম্মদ শাহের হস্তগত ছিল, কারণ উক্ত বৎসরে পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ে মুদ্রাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দনুজমর্দ্দনদেব বোধ হয় তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির বৎসরেই চন্দ্রদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করিয়া স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া হস্তচ্যুত হইলেও সাহাবুদ্দিন বায়াজিদ্ শাহ ও জলালুদ্দিন মহম্মদশাহের অনেক মুদ্রা, খোদিত-লিপিতে ফিরোজাবাদে মুদ্রিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। হিজরী ৮১৬ হইতে ৮১৯ পর্য্যন্ত (১৪১৩—১৬ খৃষ্টাব্দ) মুদ্রিত মুসলমান মুদ্রা ফিরোজাবাদে মুদ্রিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যদুর সহিত মহেন্দ্রের বা দনুজমর্দ্দনদেবের, বিবাদের কথা অদ্যাপি ইতিহাসে স্থানলাভ করে নাই। বঙ্গের এই স্বাধীন নরপতিদ্বয় অদ্যাবধি অজ্ঞাত ছিলেন, স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ইহাদিগের নাম আবিষ্কার করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

উপসংহারে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দনদেবের তারিখযুক্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া সেনরাজবংশের কায়স্থত্ব নিরসন করিয়াছে। সেনরাজবংশীয় দনুজমাধব দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বলবনের সমসাময়িক, সুতরাং তিনি ১২৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সহিত ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপ হিন্দুরাজ্য স্থাপনকারী দনুজমর্দ্দনদেবের সহিত অভিন্নত্ব ধরিয়া লওয়া অসম্ভব। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের সহিত সেনরাজবংশের কোনও

সম্পর্ক প্রমাণ করা যায় না, প্রমাণ করিতে হইলে নূতন কুলগ্রন্থ আবিষ্কার করিতে হইবে। সুতরাং সেনরাজগণ যে দাক্ষিণাত্যবাসী চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ রাজবংশের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্পর্ক ছিল না ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে সম্রাট বলবনের সময়ে দনুজরায় নামক একব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা জিয়াউদ্দিন বার্ণী প্রণীত "তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী" নামক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি সেনবংশীয় ছিলেন কি না বা তাঁহার নাম দনুজমাধব ছিল কি না তাহার প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কুলগ্রন্থের প্রমাণ ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বঙ্গদেশে কৌলীন্যপ্রথা সৃষ্টির পর ব্যক্তিবিশেষের আবশ্যকমত বহু কুলগ্রন্থ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঝড়

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো,
তারে রাখতে নারি টানি।

আমার রইল না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচল গো সাজসজ্জা,
তুমি দেখলে আমারে
এমন প্রলয় মাঝে আনি,
আমায় এমন মরণ হানি॥

হঠাৎ আকাশ উজলি
কারে খুঁজে কোথায় চলে
চমক লাগায় বিজলি
আমার আঁধার ঘরের তলে।

তবে নিশীথগগন জুড়ে
আমার যাক সকলি উড়ে,
এমন দারুণ কল্লোলে
বাজুক আমার প্রাণের বাণী
বাঁধা- বাঁধন নাহি মানি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেকালের অতিকায় জন্তু

(সংকলিত)

সত্যকালের মানুষ কিরূপ লম্বা ছিল আমাদের পুরাণে তাহার বিবরণ আছে, কিন্তু সেকালে পশু কিরূপ ছিল তাহার বোধ হয় কোনো খবর নাই। আজকাল বিজ্ঞানের কৃপায় আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। অবশ্য কেহ মনে করিবেন না যে বিজ্ঞানের বর্ণনাগুলি পুরাণের ন্যায় কল্পিত।



টি সেরাটপ—সেকালের ভয়ঙ্কর জন্তুদের মধ্যে অন্যতম। ইহাদের ৭।৮ ফুট দীর্ঘ প্রকাণ্ড মুণ্ডে তিনটা করিয়া শিং থাকিত, সমস্ত দেহটা প্রায় ৩০ ফুট লম্বা হইত; চেহারা দেখিলেই বুঝা যায় যে ইহারা কিরূপ ভয়ঙ্কর যোদ্ধা ছিল।

সকলেই জানেন আমাদের পৃথিবীর উপরিভাগে কত পরিবর্ত্তন চলিতেছে, এক সময়ে হয়ত যে জায়গা সমুদ্র বা নদীর তলদেশ ছিল এখন তাহা অনেক উচ্চে অবস্থিত, এই সমস্ত স্থানই প্রকৃতিরাণীর যাদুঘর। কোন্ সুদূরকালে কোনো বন্যায় হয়ত কতকগুলি ভীষণাকৃতি জন্তু ভাসাইয়া

লইয়া গিয়াছিল। তাহারা জলে ডুবিয়া ক্রমে মাটিতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তারপরে কত যুগ ধরিয়া তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ক্রমে শক্ত হইয়া হইয়া পাথর হইয়াছে, আজ আমরা সেই অবস্থায় তাহাদের পাইয়াছি। অনেক স্থলেই খালি কঙ্কালটা এইরূপ পাথর আকারে পাওয়া যায়—কারণ শরীরের অপর অংশগুলি শীঘ্রই পচিতে আরম্ভ করে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছোট ছোট পোকা এবং মাছের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অংশগুলির ছাপ পাহাড়ের গায়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। এই সমস্ত কথা যে কাহারো মনগড়া নয় তাহা একবার যাদুঘরে গেলেই বুঝা যায়।



অ্যাটলাণ্টোসরাস—উত্তর আমেরিকার অধুনাবিলুপ্ত বৃহদায়তন সরীসৃপ। ইহারা ৮০ ফুটেরও অধিক লম্বা হইত এবং সম্ভবতঃ পিছনের পায়ে ভর রাখিয়া চলিত।

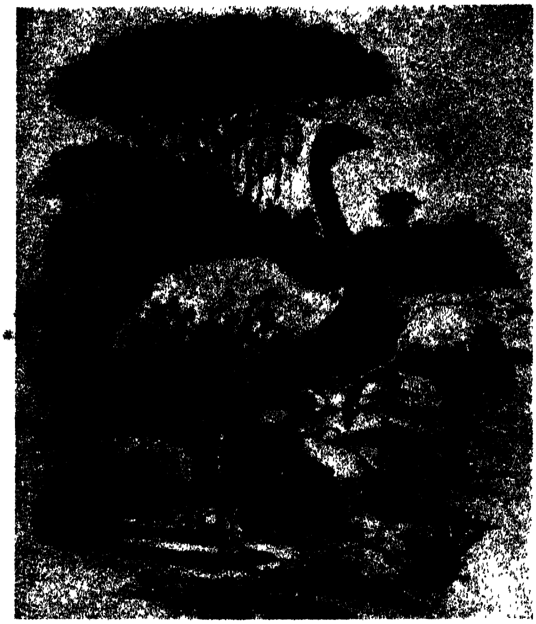
পৃথিবীতে মনুষ্য জন্মের বহুশত বৎসর পরেও ম্যামথ্ নামে একপ্রকার জন্তু ছিল, তাহারা এখন লোপ পাইয়াছে, কিন্তু উত্তর সাইবেরীয়ার বরফের নদীতে তাহাদের সম্পূর্ণ শরীরটা পাওয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকায় একটি বৃহদাকার জন্তুর চর্ম্মের কতকটা অংশ এইরূপভাবে রক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, লণ্ডন শহরের নিম্নস্থ মাটিতে এখনো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুমীরের দেহাবশেষ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু সে সব কুমীর এখন আর টেম্‌স্ নদীতে দেখা যায় না।



ম্যামথ—দেখিতে অনেকটা হাতীর মতো কিন্তু ইহারা হাতীর চেয়ে অনেক বড় হইত এবং ইহাদের দেহ লম্বা লম্বা লোমে আবৃত থাকিত। সাইবেরিয়ার বরফের মধ্যে ইহাদের সম্পূর্ণ দেহ সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

মানুষের আদিম পুরাণাদিতে অনেক রকম ভীষণ প্রাণীদের বৃত্তান্ত পড়া যায়। আজকাল অনেকেই তাহা গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দেন। অবশ্য উহার অধিকাংশই যে পল্লবিত সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু কতকটা সত্যও আছে। প্রাচীন পুরাণাদিতে বর্ণিত জন্তুদের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল এমন অনেক প্রকাণ্ডকায় অদ্ভুতাকৃতি জন্তু এক সময়ে পৃথিবীতে বাস করিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে ইহাদের মধ্যে কোনো কোন জন্তু মনুষ্যাগমের পরেও কিছুদিন জীবিত ছিল এবং তাহাদের হইতেই পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, এই অনুমানটি অবশ্য বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ তাহারা মনুষ্যজন্মের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য লোপ পাইয়াছে।

মনে কর আমরা কোনো নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছি, এমন সময়ে যদি ৬০ ফুট্‌ লম্বা এবং সেই আন্দাজে চওড়া একটা টিকটিকি-জাতীয় জন্তু আসিয়া উপস্থিত হয় ত আমাদের মনে কি হয়! জন্তুটির ওজন ২০ টনের কম হইবে না (১ টন=২৭ মণ)। এইরূপ জন্তু সত্যসত্যই এক সময়ে উত্তর আমেরিকায় বাস করিত, ইহার নাম রাখা হইয়াছে ব্রণ্টোসরাস্‌। ইহার পিছনের পা দুখানি হাতীর পায়ের ন্যায় প্রকাণ্ড ছিল কিন্তু সম্মুখের পা ছোট



মোয়া পাখী—নিউজিলণ্ডের অধুনাবিলুপ্ত প্রাচীন অধিবাসী, উটপাখীর সদৃশ, কিন্তু প্রায় ১৪ ফুট উচু হইত, এখনো ইহাদের ডিম প্রায়ই যেখানে সেখানে পাওয়া যায়।

ছিল, এই জন্তুর দৈর্ঘ্যের একচতুর্থাংশই ছিল ঘাড়টা, এই সরু, লম্বা ঘাড়টার ডগায় একটা ছোট্ট সাপের মতন মাথা বসান ছিল। চেহারাটা কেমন মানানসই হইল! ইহার এক একটি পায়ের ছাপ ছিল এক বর্গগজ লইয়া। ব্রণ্টোসরাস্‌ বিল এবং জলাজমিতে বাস করিত। কারণ নানাপ্রকার জলীয় উদ্ভিদই ছিল ইহার খাদ্য, মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র আকার এবং মেরুদণ্ডের সূক্ষ্মতা হইতেই বুঝা যায় যে এই জন্তুর বুদ্ধিটা তত সূক্ষ্ম ছিল না এবং গতিবিধিও তেমন দ্রুত ছিল না, ইহার দেহে শিং বা খড়্গ প্রভৃতি কোনো প্রকার আত্মরক্ষণোপযোগী অস্থির চিহ্ন পাওয়া যায় নাই; কাজেই মনে হয় এই জন্তু অত্যন্ত ভীরু এবং শান্তপ্রকৃতিবিশিষ্ট ছিল।

অ্যাট্‌ল্যাণ্টোসরাস্‌ নামে আর একপ্রকার জন্তু ব্রণ্টোসরাসের চেয়েও প্রকাণ্ড। ইহার সুবিস্তৃত দেহটি আশি ফুট লম্বা, ইহা যখন পশ্চাদ্দিকের পায়ে ভর করিয়া চলিত তখন ইহার মাথাটি মাটি হইতে অন্তত ত্রিশ ফুট উচ্চে অবস্থান করিত। ইহার উরুতের হাড়খানাই ছয় ফুট দুই ইঞ্চি অর্থাৎ একটি মানুষের চেয়েও লম্বা। কলোরাডোতে ইহাদের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে এবং এই জাতীয় আরো



প্লিসিয়োসোরাস—অতিকায় জলচর জীব, ইহাদের বিশাল দেহের তুলনায় মাথা অতি ক্ষুদ্র ছিল, গলা খুব লম্বা হইত।

অনেক জন্তুর দেহ উক্ত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের কাহারো কাহারো দৈর্ঘ্য চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ ফুট।

এই শ্রেণীর অন্তর্গত সেটিয়োসরাস নামক এক প্রকার জন্তু ইংলণ্ডে বাস করিত। ঐ দেশের ছয়টি প্রদেশে উহার দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মুণ্ড কোথাও পাওয়া যায় নাই। মাথা বাদ দিয়া খালি ধড় এবং লেজের দৈর্ঘ্য প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট। সম্ভবত সমস্ত দেহটা অন্তত চল্লিশ ফুট লম্বা হইবে। ইহার উরুতের একখানা হাড়ের দৈর্ঘ্য চার ফুট তিন ইঞ্চি এবং ওয়েমাউথ্‌ নামক একস্থানে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা একখানা হাতের হাড় পাওয়া গিয়াছে।

গ্রেট্‌ ব্রিটেনে ইহার চেয়েও ভয়ঙ্কর একটি অধিবাসী

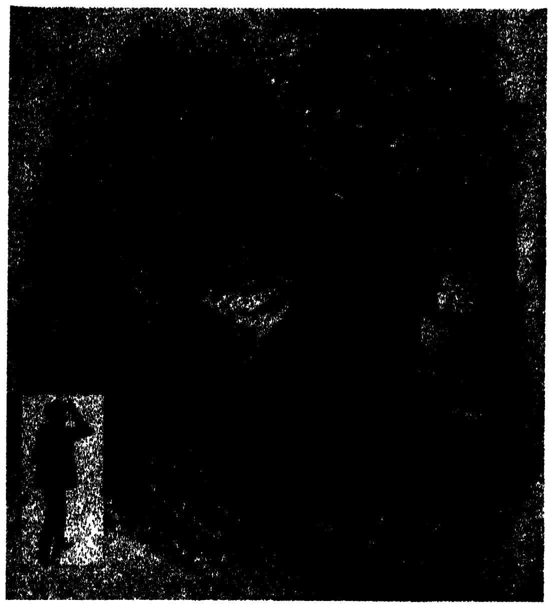
ছিলেন, তাঁহার নাম মেগালোসরাস। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ত্রিশ ফুট এবং চালচলনও খুব দ্রুত ছিল। ইহার দাঁত দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে ইনি মাংস খাইতেন। ইহার পায়েও ভয়ঙ্কর নখর ছিল। ইনিও পিছনের পায়ে ভর করিয়া চলিতেন এবং চলিবার সময়ে ইহাকে কতকটা ক্যাঙ্গারুর মত দেখাইত।

রেভারেণ্ড হাচিন্‌সন্ নামক একজন বিখ্যাত লেখক বলেন "মেগালোসরাসেরা কি করিয়া শীকার করিত তাহা কল্পনা করা কিছু শক্ত নয়, মনে কর যেন একটা মেগ্যা-লোসরাস্ একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকাভুক প্রাণীর উপরে আড়ি পাতিয়াছে, পিছনের দিকটাকে একেবারে শরীরের নীচে গুটাইয়া লইয়াছে, দেখিতে দেখিতে সেই লম্বা পাদুখানায় ঠেলা দিয়া এক প্রকাণ্ড লাফ মারিল এবং বেচারা শিকারটিকে নখর-ওয়ালা সামনের হাত দুখানায় ধরিয়া ফেলিল, তারপরে সেই খাঁড়ার মত দাঁত বাহির করিয়া জন্তুটার অস্থিমাংস মুহূর্ত্তেই সাবাড় করিয়া ফেলিল।"

ষ্টেগোসরাস নামক আর এক প্রকার জন্তু দেখিতে মেগানোসরাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর কিন্তু ইহারা অত্যন্ত নিরীহ। ইহার দৈর্ঘ্য পঁচিশ ফুট। এটিও টিকটিকি-জাতীয় জন্তু। ইহার গায়ে কতকগুলি গোল গোল হাড়ের আঁশ ছিল, তাহার এক একটির ব্যাস দুই তিন ফুট। তা ছাড়া আঙুলে দুই ফুটের অধিক লম্বা ধাবাল নখর ছিল। ইহার পিছনের অংশটা সাধারণ একজন মানুষের চেয়ে লম্বা কিন্তু সামনের পা দুখানা তাহার তুলনায় অনেক ছোট। কাজেই ষ্টেগোসরাস যখন চলিত তখন তাহার মাথা এবং লেজটা প্রায় মাটিতে গিয়া পৌছিত আর মাঝখানটা পনর ফুট উঁচুতে থাকিত কাজেই দেখিতে কতকটা অর্দ্ধচন্দ্রের আকার হইত। ইহার দাঁত ছোট এবং নরম ছিল—তাহাতেই বোঝা যায় নরম গাছ পাতা খাইয়াই ইহারা জীবন ধারণ করিত।

ষ্টেগোসরাস সম্বন্ধে একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে ইহার মেরুদণ্ডটা লেজের কাছে পৌছিয়া একটু বড় আকার ধারণ করিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় যেন দ্বিতীয় আর একটা মস্তিষ্ক—এই স্থান হইতেই পিছনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবং লেজের কাজ চলিত।

এই শ্রেণীর অদ্ভুত জন্তুদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর দেখিতে ট্রিসেরাটপ্‌স্। ইহার দৈর্ঘ্য পঁচিশ হইতে ত্রিশ ফুট, মুণ্ডটাই সাত আট ফুট এবং সেই প্রকাণ্ড মাথার উপরে তিনটা শিং। দুইটা শিং ষাঁড়ের শিংএর মত কপাল হইতে উঠিত। অপর শিংটা অনেক ছোট, সেটা গণ্ডারের খড়্গের মত নাকের উপর অবস্থিত। মাথার খুলির তুলনায় এই জন্তুর মস্তিষ্ক এত ছোট যে ইহার বিশেষ কিছু বুদ্ধি ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার খুলির পিছন দিকটা উঁচু হইয়া উঠিয়া একটা গোল মুকুটের আকার ধারণ করিয়াছে—তার চারিদিকটা শক্ত আঁশ



মেগাথেরিয়ম—দক্ষিণ আমেরিকার ১৮ ফুট লম্বা ভাষণকায় জন্তু; ইহাদের হাড় হাতীর হাড়ের চেয়েও মোটা। কোণের মনুষ্যাকৃতিটি এই অতিকায় জন্তুর সহিত তুলনা বুঝাইবার জন্য অঙ্কিত হইয়াছে।

দিয়া বেশ করিয়া ঢাকা। ইহার গায়েও অনেক হাড়ের আঁশ ছিল। কাজেই ইহার দেহটি সুরক্ষিত থাকায় ইনি যে একজন ভয়ঙ্কর রকমের যোদ্ধা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে ইনি সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ছিলেন।

সেকালে এক প্রকার উড্ডয়নকারী সরীসৃপজাতীয় জন্তু ছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো ডানার বিস্তৃতিই ২৫ ফুট ছিল আবার কোন কোনোটা বা চড়াইয়ের

মত দেখিতে। ইহাদের ডানাগুলি ঠিক অন্যান্য পক্ষীর ডানার মত নয়—কতকটা বাদুড়ের মত। ইহাদের সামনের পায়ে চারিটি করিয়া আঙুল থাকিত; ইহার মধ্যে তিনটি সাধারণ রকমের লম্বা এবং নখরবিশিষ্ট আর চতুর্থটা খুব বেশী লম্বা। এই লম্বা আঙুলটা ডানার প্রান্তভাগকে ঝুলিয়া পড়িতে দিত না। বাহিরের আকৃতিতে এই জন্তুগুলির সঙ্গে পাখী ও বাদুড়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু ইহাদের হাড়ের গঠন দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহারা সরীসৃপজাতীয় জন্তু।

এই জাতীয় জন্তুর নাম দেওয়া হইয়াছে টেরোড্যাক্‌টিল্ (Pterodactyl)। ইহারা সংখ্যায় প্রচুর ছিল। ইহাদের মধ্যে যেগুলি ছোট তাহারা পোকা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিত, আর বড় বড় গুলি তাহাদের শক্ত দাঁত দিয়া ছোট খাট জানোয়ার শীকার করিত, আবার একদল সমুদ্রেও থাকিত; তাহাদের খাদ্য ছিল মাছ। ইহার পরবর্ত্তীকালে স্তন্যপায়ী জীবদের যুগে যেসমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায় তাহারা অধিকাংশই অতিশয় প্রকাণ্ড এবং অদ্ভুত। ইহাদের মধ্যে একশ্রেণীর নাম টিনোসেরাস, লেজ বাদে ইহার দৈর্ঘ্য ১২ ফুট এবং ওজন তিন টন্ (১ টন্=২৭ মণ)। ইহার দেহটা হাতীর কিন্তু মুণ্ডটা গণ্ডারের মত। ইহার মাথায় জিরাফের শিংএর মত ছটা বড় বড় শিং ছিল, ইহার উপরের চোয়ালে গজদন্তের মতো দুইটা চ্যাপ্টা দাঁত ছিল। এই দাঁতগুলি যে কি কাজে আসিত তাহা বুঝা যায় না। কারণ ইহারা যে ঘাস এবং শাকসবজী খাইয়া জীবন ধারণ করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। আজকালকার গো মহিষ প্রভৃতির মত ইহারা দল বাঁধিয়া থাকিত।

ব্রণ্টপস্ নামে আর এক প্রকার অসংখ্য জন্তু উত্তর আমেরিকার কোনো হ্রদের চতুর্দ্দিকে বাস করিত। লেজ বাদে ইহাদের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট এবং উচ্চতা ৮ ফুট। মোটা-মুটি চেহারায় দুই শিং-ওয়ালা গণ্ডারের সঙ্গে ইহাদের খুব সাদৃশ্য আছে। কেবল তফাৎ এই যে ইহাদের শিং পাশাপাশি —গণ্ডারের মত একটা আর একটার সম্মুখে নয়। ইহাদের মুণ্ড দৈর্ঘ্যে এক গজ এবং দুই শিংএর ডগার ব্যবধান বিশ ইঞ্চি, টাপিরের ন্যায় ইহাদের লম্বা এবং নরম নাক ছিল বলিয়া বোধ হয়।

মধ্য আফ্রিকার সেমালকি অরণ্যে ওকাপি নামক একপ্রকার জন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন সেকালের একশ্রেণীর জন্তুর সঙ্গে ইহাদের জাতি-সম্পর্ক আছে, হয়ত ইহারাই তাহাদের বর্ত্তমান বংশধর। উত্তর ভারতবর্ষে সিবাথেরিয়াম নামক ইহাদের এক শাখার দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। ইহাদের চেহারা অনেকটা



সেটিয়োসোরাস—সেকালের ইংলণ্ডের অধিবাসী টিকটিকি জাতীয় জীব, আকার অন্ততঃ ৪০ ফুট লম্বা হইত।

কালসারের মত; কিন্তু আকৃতি গণ্ডারের চেয়ে অনেক বড় এবং মুণ্ডটা সত্যসত্যই ভয়ানক প্রকাণ্ড। ইহাদের চারিটা করিয়া শিং থাকিত, ঠিক চোখের উপরেই দুইটা ছোট ছোট এবং তার পিছনে দুইটা বড় বড় এবং চ্যাপ্টা। রোমন্থনকারী অন্য সমস্ত জন্তুর চেয়ে ইহাদের চোয়াল বড় ছিল, মহিষের চোয়ালেরও প্রায় দ্বিগুণ হইবে এবং উপরের ঠোঁটটা লম্বা হইয়া একটা ছোট খাট শুঁড়ের আকার ধারণ করিত। নানা কারণে ইহাদিগকে জিরাফ এবং কালসার এই দুই শাখার জন্তুর মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

আমরা যেকালের কথা বলিতেছি সেইকালে দক্ষিণ আমেরিকায় মেগাথেরিয়াম নামে এক প্রকাণ্ড জানোয়ার ছিল, ঐ জন্তুর একটা ছবি দেওয়া হইল। ছবির পাশে যে মানুষের ছবিটা আছে উহা জন্তুর ছবির সঙ্গে একই স্কেলে আঁকা। ইহাতে পাঠক এই প্রকাণ্ড জন্তুর আকৃতি কল্পনা করিয়া লইতে পারিবেন। ইহারা ১৮ ফুট লম্বা হইত এবং ইহাদের অধিকাংশ হাড়ই হাতীর হাড়ের

চেয়েও মোটা ছিল—উরুতের হাড়টা হাতীর হাড়ের তিনগুণ। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অসাধারণ বল এবং পায়ে ভয়ঙ্কর নখর ছিল। পিপীলিকাভুকের ন্যায় ইহারা পায়ের আঙুল গুটাইয়া চলিত।

ইহারা যে রকম করিয়া খাদ্য যোগাড় করিত তাহা অতি আশ্চর্য্য। ডারুইন্ বলেন "ইহাদের দাঁতের সরল গঠন দেখিয়া মনে হয় ইহারা নিরামিষাশী ছিল এবং সম্ভবত গাছের পাতা ও ছোট ছোট ডালপালা খাইত।" বিশাল দেহ এবং বড় বড় শক্ত বাঁকা নখের জন্য ইহাদের পক্ষে চলাফেরা অত্যন্ত অসুবিধাকর ছিল, এইজন্য কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে ইহারা শ্লথদিগের ন্যায় পিঠ নীচের দিকে করিয়া গাছে উঠিয়া ডালপাতা খাইত। যদিও সেকালের গাছপালা এখনকার চেয়ে অনেক বড় এবং শক্ত ছিল তবু হাতীর মত প্রকাণ্ড জন্তু যে তাহারা ধারণ করিতে পারিত তাহা মনে হয় না। অধ্যাপক আউয়েন্ বলেন যে "ইহারা গাছের ডাল নোয়াইয়া এবং ছোট ছোট গাছের শিকড়সুদ্ধ তুলিয়া ফেলিয়া তাহার পাতা খাইত। ইহাদের নিম্নাঙ্গের ভয়ঙ্কর প্রসার এবং ওজন এই কাজের পক্ষে অসুবিধাকর না হইয়া বিশেষ উপযোগীই হইত। প্রকাণ্ড লেজ এবং দুই পায়ের গোড়ালীর উপর শক্ত হইয়া বসিয়া ইহারা বড়-বড়-নখর-বিশিষ্ট দুই হাত অনায়াসে এবং পুরাদমে চালনা করিতে পারিত।"

যে প্রদেশে মেগাথেরিয়ামদের বাসস্থান ছিল সেইখানেই আট নয় ফুট লম্বা একপ্রকার প্রকাণ্ড আর্মাডিলো (Armadillo) বাস করিত। ইহার গায়ে কচ্ছপের খোলার মতো একটা কঠিন আবরণ থাকিত; কাজেই আজকালকার আর্মাডিলোর মত ইহারা কুণ্ডলী পাকাইতে পারিত না। ইহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ অল্প কয়েক ইঞ্চি মাত্র লম্বা।

এখন সেকালের বিশালকায় পাখীদের সম্বন্ধে কিছু বলিব। নিউজিল্যাণ্ড এবং ম্যাডাগাস্কার প্রদেশেই ইহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। ইহাদের মধ্যে মোয়া নামক এক প্রকার পক্ষীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই এক জাতির মধ্যে পনর রকম বিভিন্ন শ্রেণী দেখা যাইত। কোনো কোনো পাখী ১৪ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইত এবং দেখিতে অনেকটা



ডাইনোথেরিয়াম—দেখিতে হাতীর মতো, দাঁত সিন্ধুঘোটকের ন্যায় নীচের দিকে বাঁকান।

উটপাখীর মতো ছিল। নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসীদের জনশ্রুতি অনুসারে বোধ হয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ইহাদের অস্তিত্ব ছিল। এখনো ইহাদের হাড় এবং ভাঙা ডিমের খোলা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যাড্যাগ্যাস্কারে ইপিওর্নিস নামে আর এক প্রকার প্রকাণ্ড পাখী ছিল। ইহাদের ডিমের ব্যাস প্রায় পনর ইঞ্চি ছিল। এক একটা ডিম একশ আটচল্লিশটা মুরগীর ডিম অথবা তিনটা উটপাখীর ডিমের সমান হইত। ইহাদের গোটা হাড় কোথাও পাওয়া যায় নাই। কেবল ভাঙা ভাঙা খণ্ড পাওয়া গেছে কাজেই ইহাদের আয়তন কত বড় ছিল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ডিমের চেহারা দেখিয়া মনে হয় যে ইহারা মোয়ার চেয়ে ছোট ছিল না।

ইংলণ্ডে যে একসময়ে দুইপ্রকার প্রকাণ্ড ডানাবিহীন পাখী ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। লণ্ডনের ভূগর্ভে ডার্মানিস্ নামক একপ্রকার পক্ষীর দেহাবশেষ এবং ক্রয়-ডনের নিকটে গ্যাষ্ট্রনিস্ নামক আর একপ্রকার পাখীর অস্থি পাওয়া গেছে।

এই প্রবন্ধে যেসমস্ত ভীষণকায় জন্তুর বিবরণ দেওয়া

গেল তাহারা যে বহুদিন হইল লোপ পাইয়াছে ইহা আমাদের সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। মানুষের পক্ষে তাহারা বড় সজ্জন প্রতিবেশী হইত না। অবশ্য ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরামিষাশী ছিল এবং তাহাদের চাল-চলনও গদাই-লস্করি ধরণের ছিল। কিন্তু তবু তাহাদের বিশাল বপু এবং প্রভূত বল আদিম যুগের মানুষের পক্ষে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইত সন্দেহ নাই।

এই বিষয়ে যাঁহারা আরো বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের "সেকালের কথা" এবং Hutchinson প্রণীত Extinct Monsters নামক গ্রন্থ পড়িতে পারেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

লক্ষ্মণসেনের সময়

"বঙ্গদর্শনে" ও "প্রতিভা"য় লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশিত হইবার পরে দুই এক স্থানে লক্ষ্মণসেনের সময়সম্বন্ধে আমার মন্তব্যের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তদুত্তরে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। প্রতিবাদ-কারিগণ যেসমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোনটিই নূতন নহে। পুরাতন প্রমাণের নূতন ব্যবহারে দুই একটি কথা সাজাইয়া বলা আবশ্যক হইয়াছে। "প্রতিভা"য় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় যে প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উল্লেখ-যোগ্য কথা বিশেষ কিছুই নাই, এবং তৎসমুদয়ের উত্তর শীঘ্রই "প্রতিভা"য় প্রকাশিত হইবে। সম্প্রতি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তৎকর্ত্তৃক প্রণীত "গৌড়রাজমালা"য় ৬২—৬৮ পৃষ্ঠায় লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনার ফলে রমাপ্রসাদ বাবু লক্ষ্মণসেনের সময় সম্বন্ধে পূর্ব্ব মতই বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার মতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের পূর্ব্বে বিজয়সেনের অভিষেক কাল নির্দ্দেশ করা যায় না। বিজয়সেন সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু অনেক কথাই বলিয়াছেন ও আবহমানকাল ঐতিহাসিকগণ বীরবর লক্ষ্মণসেণের মস্তকে যে দুর্ব্বাক্যরাশি বর্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, রমাপ্রসাদ বাবু তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের কথা বলিতে গেলে ক্ষুদ্র সেনরাজবংশের সম্বন্ধে যে সকল কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা পুনর্ব্বার আলোচনা করা আবশ্যক।

সেনরাজগণ কর্ণাটদেশীয় ক্ষত্রিয়বংশোৎপন্ন, তাঁহারা সম্ভবতঃ সম্রাট প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য হইতে গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই মতের প্রবর্ত্তয়িতা ও আমি তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছি মাত্র। সম্প্রতি বিহ্লনদেব রচিত "বিক্রমাঙ্ক চরিত" নামক গ্রন্থের একটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন যে, কল্যাণীর চালুক্যবংশীয় চালুক্য-বিক্রম সম্বৎসর-প্রতিষ্ঠাতা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য তাঁহার পিতা ভুবনৈকমল্ল দ্বিতীয় সোমেশ্বরদেবের আদেশে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া গৌড় ও কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া রমাপ্রসাদ বাবু স্থির করিয়াছেন যে সেনরাজবংশ চালুক্য যুবরাজের দিগ্বিজয় যাত্রায় সহিত গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন, কারণ বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে সামন্তসেন একাঙ্গসেনা লইয়া অরিকুলাকীর্ণ-কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন এবং শেষ বয়সে গঙ্গাতীরবর্ত্তী পুণ্যাশ্রমনিচয়ে বিচরণ করিয়া-ছিলেন; এবং বল্লালসেনের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় "চন্দ্রবংশে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ... ... তাঁহারা সদাচার-পালন-খ্যাতিগর্ব্বে রাঢ়দেশকে অননুভূতপূর্ব্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়া-ছিলেন (৩ শ্লোক)। এই রাজপুত্রগণের বংশে শক্রসেনাসাগরের প্রলয়তপন সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" রমাপ্রসাদ বাবু স্থির করিয়াছেন যে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাদ্বয় পরস্পরের বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন "প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, সামন্তসেন শেষ বয়সে কর্ণাট ত্যাগ করিয়া, তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে, বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। দ্বিতায় লিপিতে দেখা যায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা রাঢ়নিবাসী ছিলেন। অথচ এই দুইটী লিপি প্রায় একই সময়ে রচিত। এইরূপ তুল্য-কালীন লিপিতে এত বিরোধ কল্পনা অসম্ভব"।* এই বিরোধের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন যে, "কুমার বিক্রমাদিত্য গোড়াধিপকে পরাজিত করিয়া ... ... রাঢ়দেশ গৌড়রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। নবজিত রাঢ় শাসনার্থ কর্ণাটরাজ যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয়সেনানায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্তসেন তাঁহারই বংশধর।" সম্ভবতঃ কল্যাণের চালুক্যবংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্য গোড় ও কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল ও তাঁহার পুত্রত্রয়ের সময়ে পালসাম্রাজ্যের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছিল তাহাতে সকলই সম্ভব। কিন্তু দিগ্বিজয়ের পরে কল্যাণের চালুক্যরাজগণ যে গৌড়, মগধ বা বঙ্গের কোন প্রদেশ আয়ত্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কল্যাণ হইতে রাঢ় বহুদূর, তখনও আর্য্যাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্য রাজশূন্য হয় নাই। রমাপ্রসাদ বাবু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে কল্যাণ হইতে গৌড়বঙ্গে দিগ্বিজয় যাত্রা করা সম্ভব, কিন্তু গৌড়বঙ্গের কোন প্রদেশ অধিকার করিয়া আয়ত্তাধীন রাখা তখন দাক্ষিণাত্যের কোন রাজার পক্ষেই সম্ভবপর নহে। তখন প্রাচীন পালসাম্রাজ্যের অস্তিমদশা উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও ত্রিপুরীতে ও রত্নপুরে চেদীরাজগণ, জেজাভুক্তিতে চন্দ্রাত্রেয়গণ, মালবে পরমারগণ অত্যন্ত প্রতাপশালী। চালুক্যবংশের কোনও তাম্রশাসন বা খোদিতলিপিতে রমাপ্রসাদ বাবু পূর্ব্বোক্ত আর্য্যাবর্ত্ত রাজগণের বিজয়-কাহিনী পাইয়াছেন কি? প্রশস্তিকার বিহ্লনদেবের বাক্য হয় ত সত্য, কিন্তু চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য যে রাঢ় অধিকার করিয়া তাহার শাসনভার কর্ণাটদেশীয় সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি যে স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন একথা ইতিহাসের ক্ষেত্রে টিকিবে কিনা সন্দেহ। কর্ণাট বলিলে কন্নাডাভাষা প্রচলিত দেশকে বুঝায়; কল্যাণ এই কর্ণাটদেশে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি স্বীকার করা যায় না যে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে কর্ণাটদেশীয় কোন রাজা আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়া স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমি সেনরাজগণকে রাজেন্দ্রচোলের বিজয়যাত্রার অনুগামী বলিয়াছি, কিন্তু আমি কোন স্থানে বলি নাই যে এই সেনোপাধিধারী কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশ কোনকালে চোলমণ্ডলের অধিবাসী ছিল। রমাপ্রসাদ বাবু নিশ্চয়ই

* গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪৭।

অবগত আছেন যে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পিতামহ জগদেকমল্ল দ্বিতীয় জয়-সিংহ-দাক্ষিণাত্য রাজচক্রবর্ত্তী রাজেন্দ্রচোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। মেলপাডিগ্রামে চোলেশ্বরমন্দিরে তামিল ভাষায় লিখিত পরকেশরীবর্ম্মা প্রথম রাজেন্দ্রচোলদেবের নবম রাজ্যাঙ্কের যে খোদিতলিপি আছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে জয়সিংহদেব চোলরাজ কর্ত্তৃক মুশঙ্গি বা মুয়ঙ্গি ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়াছিলেন।+ চালুক্যরাজ এই পরাজয় স্বীকার করেন নাই। বালগাম্বে গ্রামে আবিষ্কৃত কান্নাড়া ভাষায় লিখিত এই জগদেকমল্ল দ্বিতীয় জয়সিংহদেবের রাজ্যকালীন একখানি খোদিতলিপি হইতে জানা গিয়াছে যে চালুক্যরাজ পরাজিত হইলেও প্রশস্তিকারগণ তাঁহাকে সিংহের সহিত এবং রাজেন্দ্রচোলদেবকে গজের সহিত তুলনা করিতেন।‡ মুশঙ্গি যুদ্ধক্ষেত্রে চালুক্যরাজ পরাজিত হইয়া চোল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে বোধ হয় বহু কর্ণাটদেশীয় সৈনিক তাঁহার সেনাদলভুক্ত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোলদেব যখন উত্তরাপথ আক্রমণের উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছিলেন তখন হয় ত কোনও ভাগ্যান্বেষী দরিদ্র উচ্চবংশোদ্ভব সৈনিক ধনধান্যপূর্ণা গৌড়ভূমির খ্যাতি শ্রবণ করিয়া চোলবিজয় বৈজয়ন্তীর রক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। চোলমণ্ডল হইতে রাজেন্দ্রচোলের বিজয়বাহিনী উত্তর রাঢ়ের উত্তর সীমায় গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত দেশ বিজয় করিয়া সম্ভবতঃ গঙ্গোত্তরণকালে প্রথম মহীপালদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোল প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেই ভাগ্যান্বেষী সৈনিকপুরুষ সম্ভবতঃ রাঢ়দেশে বাস করিয়াছিল, তাহারই বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপাড়াপ্রশস্তি ও বল্লালসেনের তাম্রশাসন উভয়ের উক্তি সত্য, সামন্তসেন কর্ণাটলক্ষ্মীলুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণকে শাসন করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই যে রাঢ়মণ্ডলে শত্রুসৈন্য পরিবৃত হইয়া তিনি বিদেশীয়গণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঢ়মণ্ডলবাসিগণ যথাসাধ্য বিদেশীয় কণ্টকোন্মূলনের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেশে প্রকৃত রাজশক্তির অভাব হওয়ায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সামন্তসেন রাঢ়বাসীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াও জনকভূমি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, বাঙ্গালাদেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়াও তিনি বাঙ্গালী হইতে পারেন নাই, সেই জন্যই অরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্ষ্মীর কথা তাঁহার পৌত্রের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে। বল্লালসেনের তাম্রশাসনে সামন্তসেনের পিতৃগণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাও সত্য, বর্দ্ধমানভুক্তির রাঢ়মণ্ডল সেনরাজবংশের প্রথম অধিকার, তদ্বংশে বিজয়সেনের পূর্ব্বে কেহই সে অধিকার বিস্তৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। রাঢ়ীয় সেনরাজগণ পালবংশীয় সম্রাটগণের আধিপত্য স্বীকার করিতেন না, সেই জন্যই রামপালের বরেন্দ্রাভিযানে সাহায্যকারী সামন্তরাজগণের মধ্যে কোন সেনরাজের নামের উল্লেখ নাই। রামপালদেব যখন কলিঙ্গাধিপতি চোড়গঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন তখন বোধ হয় হেমন্তসেন রাজ্যচ্যুত হইয়া সামান্য ব্যক্তির ন্যায় দিনপাত করিতেছিলেন।

সেনবংশের প্রথম প্রকৃত রাজা বিজয়সেন। বিজয়সেনের যে সুদীর্ঘ প্রশস্তি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দেবপাড়াগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে বিজয়সেন গৌড়েন্দ্রকে সবলে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এই গৌড়েন্দ্র সম্ভবতঃ মদনপালদেব, ইহার কারণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। বিজয়সেনের কালনির্দ্দেশকালে রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন "লক্ষ্মণাব্দের মূল যাহাই হউক, আমরা কুমারদেবীর সারনাথলিপিতে, 'রামপাল চরিতে', বৈদ্যদেবের এবং মদনপালের তাম্রশাসনে, বরেন্দ্রদেশের যে ইতিহাস প্রাপ্ত হই, তাহার উপর নির্ভর করিতে গেলে, দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের পূর্ব্বে বিজয়সেন কর্ত্তৃক বরেন্দ্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা একেবারে অসম্ভব বোধ হয়।" কুমারদেবীর সারনাথলিপিতে, "রামপাল-চরিতে" বা বৈদ্যদেব ও মদনপালের তাম্রশাসনে এমন কোন কথাই নাই যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বিজয়সেনকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নিক্ষেপ করা যায়। সারনাথে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে মহীপালদেব ১০২৬ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ১০২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু হইয়াছিল তাহা হইলে পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের নিম্নলিখিত পর্য্যায় লিখিত হইতে পারে :—

খৃষ্টাব্দ ১০২৫—প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু।
„ ১০৪০—নয়পালদেবের মৃত্যু। (গয়ার কৃষ্ণদ্বারিকামন্দির ও নরসিংহমন্দিরের খোদিতলিপি ১৫শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ)।
* „ ১০৫৩—তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের মৃত্যু। (আমগাছির তাম্রশাসন ১৩শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ)।
* „ ১০৫৫—২য় মহীপালদেবের মৃত্যু।
„ ঐ —২য় শূরপালদেবের মৃত্যু।
„ ১০৯৭—রামপালদেবের মৃত্যু। (চণ্ডীমৌয়ের শিলালিপি ৪২শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ)।
„ ১১০০—কুমারপালদেবের মৃত্যু।
„ ঐ —৩য় গোপালদেবের মৃত্যু।
* „ ১১০৫—বিজয়সেনদেব কর্ত্তৃক দক্ষিণ বরেন্দ্র জয়।
* „ ১১০৯—উত্তর বরেন্দ্র মদনপালদেব কর্ত্তৃক তাম্রশাসন প্রদান।
* „ ১১১৪—মদনপালদেবের মৃত্যু। (জয়নগরের খোদিতলিপি ১৪শ রাজ্যাঙ্ক)
„ ১১১৯—বল্লালসেনের মৃত্যু।
* „ ১১২০—লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক বরেন্দ্র বিজয় ও পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন।

তারকাচিহ্নিত তারিখগুলি ব্যতীত অপরগুলি সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। "রামচরিত" হইতে জানা গিয়াছে যে গাহড়বালবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব মদনপালের সমসাময়িক ব্যক্তি ও বন্ধু ছিলেন :—

সিংহীসুতবিক্রান্তেনার্জ্জুনধাম্না ভুব প্রদীপেন।
কমলাবিকাশভেষজভিষজাচন্দ্রেণ বন্ধুনোপেতম (তাম্) ॥২০
চণ্ডীচরণসরো [জ] প্রসাদসম্পন্ন বিগ্রহশ্রীকং।*
ন খলু মদনং সাঙ্গেশমীশমগাদ্ জগদ্বিজয়লক্ষ্মীঃ ॥ (২১)

কান্যকুব্জাধিপতি চন্দ্রদেব ১১৪৮ বিক্রমসম্বৎসরে =১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন তাহা দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে কাশীর নিকট চন্দ্রাবতীগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রদেব বারাণসীতে ত্রিলোচন ঘট্টায় স্নান করিয়া বামনস্বামী শর্ম্মাকে যে গ্রাম দান করিয়াছিলেন তাহার তাম্রশাসন তৎপুত্র মদনপাল কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজপুত্র গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিষ্ণুপুর গ্রাম হইতে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তাঁহার পিতা মদনপালদেব নিশ্চয়ই সিংহাসনারোহণ

+ South Indian Inscriptions, Vol, III. No. 18, P. 27.

‡ Indian Antiquary, Vol. V, P. 15; Mysore Inscriptions, No. 72, P. 148.

* Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, P. 52.

করিয়াছেন ও তাঁহার পিতামহ চন্দ্রদেব স্বর্গগমন করিয়াছেন। অতএব গৌড়ীয় মদনপালদেব ১০৯০ হইতে ১১০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। ভরসা করি রমাপ্রসাদ বাবু বিজয়-সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদে নিক্ষেপ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখিতে পাইবেন না।

বিজয়সেনদেব সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তদধিক বিশেষ কিছু বলিবার নাই, গৌড়বঙ্গে বিদেশীয় শত্রুর অবস্থান-হেতু ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন পালসাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। রাঢ় বরেন্দ্রে বিজয়সেন যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন মিথিলায় নান্যদেবও সে কার্য্য সাধন করিতেছিলেন। অবশেষে তুরুস্ক সৈনিকের আগমনে ব্রত উদ্যাপিত হইয়াছিল। নান্যদেবের ন্যায় বিজয়সেনও দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে বিজয়সেনদেবের একখানি তাম্রশাসন পূর্ব্ববঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাম্রশাসনের স্বত্বাধিকারী উহা মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণকে পাঠোদ্ধারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পর বহুদিন উহার সন্ধান পাই নাই। সম্প্রতি সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী রায় বাহাদুর বি, বেঙ্কয়্য কলিকাতার বার্ড কোম্পানীর কার্য্যালয়ের জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তাম্রশাসনখানি পাঠোদ্ধারের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিকট উহা দশ পনের মিনিটের জন্য দেখিয়াছিলাম, বিজয়সেনের পত্নী মহারাজ্ঞী বিলাসদেবী তুলাপুরুষ ব্রত করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণাস্বরূপ বিজয়সেন তাঁহার ৩১ বা ৩৭ রাজ্যাঙ্কে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির বিক্রমপুর মণ্ডলের একখানি গ্রাম শাণ্ডিল্য গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণকে এই তাম্রশাসন দ্বারা দান করিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গে তখন বর্ম্মবংশীয় রাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল। হরিবর্ম্মদেবের কাল সম্বন্ধে অদ্যাবধি যেসমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিশেষ বিশ্লেষণ আবশ্যক। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে হরিবর্ম্মদেবের ১৯ রাজ্যাঙ্কে লিখিত একখানি অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা সংগৃহীত হইয়াছে। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের ভবদেব ভট্টের প্রশস্তি, হরিবর্ম্ম-দেবের তাম্রশাসন ও এই নূতন গ্রন্থের অক্ষরাবলী বিশ্লেষণ করিয়া হরিবর্ম্মদেবের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আবশ্যক। হরিবর্ম্মদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তিনি সম্ভবতঃ রামপাল-দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী এইমাত্র বলা যাইতে পারে।

"বিজয়সেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বল্লালসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সমগ্র গৌড়রাষ্ট্র করায়ত্ত করিতে যত্নবান্ হইয়া-ছিলেন।" এই উক্তির কোন প্রমাণ আছে কিনা জানি না, যদি থাকে তাহা রমাপ্রসাদ বাবুর নিকট সযত্নগুপ্ত আছে। "বল্লালসেন, স্বীয় অভীষ্ট সাধনের জন্য, পালরাজসাম্রাজ্য উন্মূলিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।" এই উক্তির মূলে সত্য আছে কিনা তাহাও গ্রন্থকারই বলিতে পারেন, যদি থাকে তাহা তাঁহার নব প্রকাশিত গ্রন্থে বা কোন পুরাতন গ্রন্থে প্রকাশ নাই। আমার ধারণা যে পূর্ব্বসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া রমাপ্রসাদ বাবু বল্লালসেনের এই অমূলক প্রশংসাবাদ স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "বর্ম্মরাজকে পদচ্যুত বা পদানত করিয়া, বল্লালসেন বঙ্গে বা রাঢ়ে স্বীয় আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন," ইহা সম্পূর্ণ অসত্য। বিজয়সেন যে বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনই তাহার প্রমাণ। বর্ম্মবংশীয় হরিবর্ম্মদেব ইহার বহুপূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন তাঁহার তাম্রশাসন ও ভবদেব ভট্টের খোদিতলিপি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। হরিবর্ম্মদেবের কাল-নির্দ্দেশের উপায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, সহজে সংগৃহীত হইতে পারিত এবং সম্ভবতঃ রমাপ্রসাদ বাবুর পুস্তকখানিকে অধিকতর মূল্যবান করিয়া তুলিত। বল্লালসেন সম্বন্ধে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য কথা এই যে বর্দ্ধমানভুক্তির উত্তর রাঢ়মণ্ডল তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল এবং তিনি অনূন একাদশ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিজয়সেন ৩১ বা ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশকাল রাঢ়ে সামান্য ভূস্বামীর ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রামপালের মৃত্যুর পর পালসাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হইলে বিজয়সেন বরেন্দ্রে পাদক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সম্বৎ হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে বল্লালসেনের রাজত্বকাল ১১১৯ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল। বল্লালসেন সত্যই কৌলীন্যপ্রথার প্রতিষ্ঠাতা কিনা তাহার সত্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌলীন্যপ্রথা সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের বহু শতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোনদিন প্রমাণ হয় যে সত্য সত্যই বল্লালসেনের সময়ে কৌলীন্যপ্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ও প্রাচীন পালরাজ-বংশের পক্ষপাতী দেখিয়া বিজয়সেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থজাতির মধ্যে আভিজাত্য সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তৎপুত্র বল্লাল-সেনের সময়ে আদিশূর ও পঞ্চ ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া নূতন আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় না হইলে এই নবজাত সম্প্রদায় টিকিত কিনা সন্দেহ। দৈববলে শত্রুপক্ষ নিহত হইলে পাদপহীনদেশে আভিজাত্যের নবজাত বৃক্ষ বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহাই বোধ হয় ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত হইবে। সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া সব-ডিবিজনের অন্তর্গত সীতাহাটী গ্রামে আবিষ্কৃত বল্লাল-সেনের নূতন তাম্রশাসনে বল্লালসেন সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায় তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

লক্ষ্মণ-সম্বৎ সম্বন্ধে দুইটি কথা আছে। প্রথমতঃ ডাক্তার কিলহর্ণের গণনায় এবং আবুল ফজলের গ্রন্থ অনুসারে স্থির হইয়াছে যে লক্ষ্মণ-সম্বৎ গণনা ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়াছিল। এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ-সম্বতের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচারিত হইয়াছে :—

(১) লুঘুভারতের একটি উপাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেন যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে বল্লালসেন মিথিলায় যুদ্ধযাত্রায় গিয়াছিলেন। হঠাৎ জনরব হয় যে বল্লাল যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, সেই সময়ে লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ বল্লাল-সেন নবজাত পুত্রের নামে তাহার জন্মদিন হইতে এই সম্বৎ গণনার আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(২) বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন যে সামন্ত সেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া এই নূতন অব্দ গণনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং পরে ইহা লক্ষ্মণসেনের নামে প্রচলিত হইয়াছিল।

(৩) রমাপ্রসাদ বাবুর মত "পাল এবং সেন রাজগণের সময় গৌড়মণ্ডলে শকাব্দ বা বিক্রম-সম্বৎ প্রচার লাভ করিয়াছিল না; নৃপতিগণের বিজয় রাজ্যের সম্বৎসরই প্রচলিত ছিল। পাল এবং সেন বংশের রাজ্য নষ্টের পর, কিছুদিন 'বিনষ্ট রাজ্যের' বা 'অতীত রাজ্যের' সম্বৎ ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার পরে, প্রচলিত অব্দের অভাব পূরণের জন্য, 'লক্ষ্মণাব্দ' উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে।"

প্রথম দুই মত সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রমাপ্রসাদ বাবুর মতানুসারে লক্ষ্মণসেন ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেই বুদ্ধগয়ার খোদিতলিপিদ্বয় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর দিন হইতে লক্ষ্মণাব্দ গণনা করিবার কথা রমাপ্রসাদ বাবুর ন্যায় ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্যাশা করি নাই। শুনিয়াছি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ও তাঁহার প্রতিবাদে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবু বলেন "সুতরাং 'শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনস্যাতীত রাজ্যে সং ৫১=১১৭১ খ্রীষ্টাব্দরূপে গ্রহণ না করিয়া, [আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যু ধরিয়া,] ১২৫১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই সিদ্ধান্তের এক আপত্তি আছে। লক্ষ্মণসেনের 'অতীত রাজ্য' হইতে কোন সম্বৎ প্রচলিত হইবার প্রমাণ নাই। উত্তরে বলা যাইতে পারে—গোবিন্দপাল দেবের 'গতরাজ্য' বা 'বিনষ্টরাজ্য' হইতেও কোন সম্বৎ প্রচলিত নাই। পক্ষান্তরে গোবিন্দপালদেবের রাজ্যলাভ হইতেও কোন সম্বৎ প্রচলিত হওয়ার প্রমাণ নাই।" * সংক্ষেপে এই বুঝা যাইতেছে যে রমাপ্রসাদ বাবু বলিতে চাহেন যে বুদ্ধগয়ার খোদিতলিপি দুইটির কাল লক্ষ্মণসম্বৎ অনুসারে গণিত নহে, লক্ষ্মণসেনের মৃত্যু বা সিংহাসনচ্যুতির তারিখ হইতে গণিত। সুতরাং লক্ষ্মণসম্বতের যেসকল তারিখ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় স্বতন্ত্র। প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুকাল হইতে বৎসর গণনা করিতে কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি? ভারতবর্ষে এরূপ ঘটনা কোন কালে দেখা যায় নাই। শুধু লক্ষ্মণ-সম্বৎ নহে শকাব্দ ও বিক্রমাব্দ ব্যবহার কালেও "অতীত" শব্দের প্রয়োগ দেখা গিয়াছে। বিক্রম-সম্বৎ সম্বন্ধে স্বর্গীয় ডাক্তার কিলহর্ণ একটি উদাহরণ দেখাইয়াছেন। † বিলাতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে ১৫০৩ বিক্রমাব্দে লিখিত "কালচক্র তন্ত্র" নামক একখানি গ্রন্থ আছে তাহার পুষ্পিকায় লিখিত আছে "পরমভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ শ্রীমদ্বিক্রমাদিত্যদেবপাদানামতীত রাজ্যে সং ১৫০৩ ইত্যাদি।" ‡ ইহার পর ডাক্তার কিলহর্ণ উত্তরাপথের খোদিতলিপিসমূহের তালিকা সঙ্কলনকালে "অতীত" শব্দযুক্ত বিক্রম সম্বৎসরানুসারে গণিত বহু খোদিতলিপির উল্লেখ করিয়াছেন। § আবার কতকগুলি খোদিতলিপিতে দেখা যায় যে বিক্রম-সম্বৎসর গণনাকালে নিম্নলিখিত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে:—

"শ্রীমদ্বিক্রমাদিত্যোপাদিত সম্বৎসরশতেষু দ্বাদশাসু ত্রিষষ্টৌত্তরেষু।" ||

"শকনৃপতি-রাজ্যাভিষেক-সংবৎসরেষ্বতিক্রান্তেষু পঞ্চসু শতেষু।"১০*

* গৌড়-রাজমালা, পৃঃ ৬৪।

† Indian Antiquary, Vol. XIX, P. 2, Note, 3.

‡ Bendall's Catalogue of Buddhist. Sanskrit Manuscripts in the Cambridge University Library, p. 70.

§ Epigraphia Indica, Vol. V. Appendix.

|| Indian Antiquary Vol. VI, P. 194; Kielhorn's list No. 191.=Epigraphia Indica, Vol. V. App. p. 28.

রমাপ্রসাদ বাবুর মতানুসরণ করিতে গেলে বলিতে হইবে যে বিক্রমসম্বৎসরের কতকগুলি তারিখ বিক্রমাদিত্যের অভিষেককাল হইতে এবং কতকগুলি তারিখ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুকাল হইতে গণিত হইয়া আসিয়াছে। সেইরূপ শকাব্দ গণনকালে দেখা যায় যে উভয় প্রকার বাক্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। বাদামিগুহায় চালুক্যবংশীয় রণবিক্রান্ত মঙ্গলেশ্বরের খোদিতলিপিতে দেখা যায় যে শকাব্দ কোন শক নৃপতির অভিষেককাল হইতে গণিত হইয়াছে:—

* Indian Antiquary, Vol. III, P. 505, Vol VI. p. 363, Vol. X, P. 58.

কিন্তু ঐ চালুক্যবংশীয় সত্যাশ্রয় দ্বিতীয় পুলকেশীর ঐহোলের খোদিতলিপিতে দেখা যায়:—

সপ্তাব্দশতযুক্তেষু গতেষব্দেষু পঞ্চসু॥
পঞ্চাশৎসু কলৌকালে ষট্সু পঞ্চশতাসুচ।
সমাসুসমাতিতাসু শকানামপি ভূভুজাম।" †

সুতরাং "অতীত" বা "গত" শব্দ থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে ব্যবহৃত অব্দ রাজ্যাঙ্ক নহে, কিন্তু কোন অব্দ বিশেষ হইতে গণিত হইয়াছে এবং কোন রাজার রাজ্যচ্যুতি বা মৃত্যুকাল হইতে গণিত হইতে পারে না। ডাক্তার কিলহর্ণের গণনায় বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়াছে যে প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত লক্ষ্মণসম্বৎসরের গণনা যে তারিখ হইতে আরব্ধ হইয়াছিল বোধগয়ার খোদিতলিপিদ্বয়ে ব্যবহৃত অব্দও সেই তারিখ হইতে গণিত হইয়াছিল। ‡ আকবরের মন্ত্রী লক্ষ্মণসম্বৎ গণনারম্ভের যে কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন বুদ্ধগয়ার খোদিত লিপিদ্বয়ে ব্যবহৃত অব্দ সেই কাল হইতে গণিত হইয়াছে। "অতীত" শব্দ ব্যবহার করিয়া লেখক জানাইয়াছেন যে মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনদেব তখন দেহত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের পুত্রদ্বয় তাঁহাদিগের তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসম্বৎ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু ইহা হইতে বলা যাইতে পারে না যে লক্ষ্মণাব্দের ব্যবহার তৎকালে ছিল না। রমাপ্রসাদ বাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ সম্ভবতঃ সিংহাসন লইয়া গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয় ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া লক্ষ্মণাব্দ প্রচলনে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দিগণ নিজ নিজ রাজ্যাঙ্ক ব্যবহার করিতেন। সে যাহাই হউক, সেন বংশের নূতন খোদিতলিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত না হইলে এ কথার মীমাংসা হইতে পারে না।

লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে এখন এমন একটা সময় আসিয়া পড়িয়াছে যাহাতে সংস্কৃত সাহিত্য এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। খোদিতলিপি ও প্রাচীন মুদ্রা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে লক্ষ্মণসেন ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুলগ্রন্থসমূহ হইতে এবং "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে ১০৮১ শকে বল্লালসেন অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ও ১০৯১ শকে তিনি "দানসাগর" রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কিছুতেই লক্ষ্মণসেনের মৃত্যু হইতে পারে না। একপক্ষে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক খোদিতলিপি ও মুদ্রা প্রভৃতি ও অপর পক্ষে খ্রীষ্টীয় ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত কতকগুলি কুলশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষের গ্রন্থ। কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলি অদ্যাপি ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবার যোগ্য হয় নাই, কিন্তু "দানসাগর" বা "অদ্ভুতসাগরে"র বচনগুলি অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য। রমাপ্রসাদ বাবু "দানসাগরের" শ্লোকগুলির অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিবার জন্য দেখাইয়াছেন যে অনেকগুলি পুঁথিতে শ্লোকগুলি আছে। কিন্তু যদি এইরূপ শত শত গ্রন্থেও এই শ্লোকগুলি সম্পূর্ণরূপে উল্লিখিত থাকিত তাহা হইলেও উহা ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। "দানসাগর" সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। বোম্বাইয়ের, কাশ্মীরের বা বঙ্গদেশের সমস্ত "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" গ্রন্থই আধুনিক অক্ষরে লিখিত, ইহার মধ্যে একখানি গ্রন্থও দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। যদি সত্য সত্যই রাজা বল্লালসেন এই গ্রন্থদ্বয়ের রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শত শত লিপিকারের হস্তে লিখিত হইয়া তাহার পরে আধুনিক

† Epigraphia India, Vol. VI, P. 4.

‡ Indian Antiquary, Vol. XIX, P. 7.

নাগরী বা বঙ্গাক্ষরে এই গ্রন্থদ্বয় লিখিত হইয়াছে। বল্লালসেনের মৃত্যুর পর প্রায় অষ্টশতবর্ষ অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে এই গ্রন্থ কতবার লিখিত হইয়া তবে বঙ্গ বা নাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে তাহা অনুমান করাই অসম্ভব। বল্লালসেন এতদ্দেশে আভিজাত্যাভিমানের প্রতিষ্ঠাতা। আভিজাত্যের অনুরোধে এখনও পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যসমাজে কৃত্রিম বংশপত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। সেই আভিজাত্যাভিমান রক্ষা করিবার জন্য এতদ্দেশীয় ধনিগণ কতশত কুলশাস্ত্র রচনা করাইয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে। কুলগ্রন্থে উল্লিখিত কোন তারিখ সত্য প্রমাণ করাইবার জন্য কোন ব্রাহ্মণ হয় ত "অদ্ভুতসাগর" ও "দানসাগরে" মানবাচক শ্লোক কয়টি রচনা করিয়া যোগ করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থসমূহের অনুলিপি নানা দেশে নীত হইয়াছে ও তাহা হইতে শত শত অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে একখানি গ্রন্থে উক্ত শ্লোকগুলি নাই, তখন সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না। "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" ব্যতীত "সদুক্তিকর্ণামৃতে" এইরূপ মানবাচক কয়েকটি শ্লোক আছে, কিন্তু সেগুলিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদি কেহ কোনদিন সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত "রামপাল-চরিতের" ন্যায় অথবা মহীপালদেব, নয়পালদেব, বিগ্রহপালদেব, রামপালদেব বা হরিবর্ম্মদেবের রাজ্যকালে লিখিত "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকগুলি আবিষ্কার করিতে পারেন, তখন উহা ইতিহাসক্ষেত্রে সাদরে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। কোন স্থান অন্ধকার থাকিলে আলোকের আবশ্যক হয়, কিন্তু স্বতঃ আলোকিত ক্ষেত্রে আলোক আনিলে তাহা ম্লান হইয়া যায়। সেইরূপ অক্ষরতত্ত্ব বা মুদ্রাতত্ত্ব প্রমাণের বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্যের প্রমাণ উপস্থিত করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবার আশা থাকেনা। বাল্যস্মৃতিজড়িত বল্লালসেন সম্বন্ধে নূতন কথা বলিলে তাহা সহজে গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা হয় না। চিরশ্রুতনামা "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" গ্রন্থদ্বয়ে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিতে হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগে। বংশগত আভিজাত্যাভিমান আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করে। যদি কোন স্বদেশীয় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কোন অংশকে পরবর্ত্তীকালের রচিত বলিতে চাহে তাহা হইলে তাহাকে কুলাঙ্গার বলিয়া মনে হয়। জীবনের লক্ষ্য সার সত্যের অনুসন্ধান নেত্রপথ হইতে অপসৃত হয়, সুতরাং জাত্যভিমানজড়িত ঘটনার বিশ্লেষণ বিদেশীয়ের হস্তেই অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়।

রমাপ্রসাদ বাবু কি লক্ষ্য করেন নাই যে সেনরাজগণের তাম্রশাসনসমূহে কৌলিন্যপ্রথার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই? বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনসমূহে তাম্রশাসনগ্রাহী ব্রাহ্মণগণের উল্লেখকালে বল্লালসেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আভিজাত্যের কোন কথাই নাই। বল্লালসেন যদি গৌড়বঙ্গীয় সমাজে এইরূপ কোন নূতন বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার কথা তাম্রপটে উৎকীর্ণ হইত। হয়ত বল্লালসেনের ১১শ রাজ্যাঙ্কের পরে এই নূতন অভিজাতসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলে লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন-চতুষ্টয়ে এবং কেশবসেন এবং বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? ভরসা করি ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ এই কঠিন সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিবেন।

"গৌড়রাজমালায়" ৬৪ পৃষ্ঠায় রমাপ্রসাদ বাবু কিঞ্চিৎ অক্ষরতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। ১২৩২ সম্বৎসরে গোবিন্দপালদেবের গয়ার শিলালিপির সহিত এবং বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত বুদ্ধগয়ার খোদিতলিপিদ্বয়ের অক্ষরসমূহের তুলনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই খোদিতলিপিদ্বয়ের অক্ষরতত্ত্ব বিশ্লেষণ কিঞ্চিৎ কঠিন। ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বসময়েই দেখা গিয়াছে যে সভ্য জগতের প্রান্তে সভ্যজগতাপেক্ষা প্রাচীনতর লিপি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আসামের বল্লভদেবের তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত বুদ্ধগয়ার খোদিতলিপিদ্বয়ের অক্ষরের তুলনা করিলে চলিবে না, কিম্বা চট্টগ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না। সাধারণতঃ গৌড়বঙ্গে যে আকারের অক্ষর খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই আকারের অক্ষর কামরূপে ১২শ শতাব্দীতেও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যাহা বঙ্গে ১২শ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল তাহা চট্টগ্রামে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখিলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। পুনরপি তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত শিলালিপির অক্ষরের তুলনা করিলে চলিবে না। একই ব্যক্তির তাম্রশাসনের ও শিলালিপির অক্ষর ভিন্ন প্রকারের, গাহড়বাল রাজবংশের শিলালিপি ও তাম্রশাসনের অক্ষরের তুলনা করিলে রমাপ্রসাদ বাবু এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। "বঙ্গদর্শনে" "লক্ষ্মণসেন ও মুসলমান বিজয়" নামক প্রবন্ধে প্রথমেই গয়ার যে চারিটি খোদিতলিপির উল্লেখ করিয়াছি তাহা অশোকচল্লদেবের সময়ের, কিন্তু তন্মধ্যে দুই প্রকারের হস্তলিপি আছে। লক্ষ্মণ-সম্বতের ৫১ অব্দের খোদিতলিপি ও বুদ্ধগয়া-মন্দির-প্রাঙ্গণের শিলালিপি অতি অযত্নের সহিত খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর "মহাজনীখতে" উৎকীর্ণ, অক্ষরতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে হইলে সূর্য্যমন্দিরের ১৮১৩ বুদ্ধ-পরিনির্ব্বাণাব্দের শিলালিপি ও বুদ্ধগয়ার লক্ষ্মণ-সম্বৎসরের ৭৪ অব্দের শিলালিপির অক্ষর ব্যবহার করা উচিত। ১২শ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে মগধে মাগধী লিপির সূচনা দেখা গিয়াছিল, সুতরাং উহার অক্ষরের সহিত পূর্ব্বোক্ত শিলালিপিদ্বয়ের অক্ষরের তুলনা হওয়া উচিত কিনা তাহা বিচার্য্য। অশোকচল্লদেবের সমকালীন গয়া ও বুদ্ধগয়ার শিলালিপি-চতুষ্টয় সম্ভবতঃ কোন গৌড়বাসী কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ রমাপ্রসাদ বাবু দেবপাড়া-প্রশস্তির অক্ষরাবলীর সহিত পূর্ব্বোক্ত শিলালিপি-চতুষ্টয়ের অক্ষর সমূহের তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বুদ্ধগয়ার লক্ষ্মণ সম্বৎসরের ৭৪ অব্দের ও গয়ার সূর্য্যমন্দিরের ১৮১৩ বুদ্ধ-পরিনির্ব্বাণাব্দের শিলালিপিদ্বয়ের অক্ষরের সহিত ঢাকার নবাবিষ্কৃত চণ্ডীমূর্ত্তির পাদপীঠস্থিত লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের খোদিতলিপির অক্ষর সমূহের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে "প" ও "দ" একই প্রকারের। এতদ্ব্যতীত "ল," "ণ, "শ," "স," "ক" প্রভৃতি ১২শ শতাব্দীর প্রমাণাক্ষর সমূহ (Test letters) তুলনা করিলেই বুদ্ধগয়ার খোদিতলিপিগুলি যে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর ৩য় ও ৪র্থ পাদের তৎসম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—কাশীধাম

ভারতের অতি প্রাচীন পুণ্যতীর্থ কাশীধামে বহুসংখ্যক সংসার-বিরাগী, মুক্তিপ্রার্থী, নিষ্কিঞ্চন সাধক, জ্ঞানপিপাসু শত শত বিদ্যার্থী এবং দেহান্তে পরাগতি লাভের আশায় সহস্র সহস্র নরনারী আসিয়া বাস করেন। এইরূপ নানা কারণে ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে নানা জাতীয় লোকের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। মানবজীবনে শারীরিক ব্যাধি ও বিপদাপদ যে চির-

দিনের সহচর সে কথা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে। এইরূপ বিপদের সময় অসহায় প্রবাসীর যে কি শোচনীয় অবস্থা হয় সে বিষয়ে যাঁহাদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞান আছে কেবল তাঁহাদের পক্ষেই প্রকৃত ধারণালাভ সম্ভব হইয়া থাকে। সাধু সন্ন্যাসী, তরুণবয়স্ক বিদ্যার্থী এবং প্রবাসাগত তীর্থযাত্রী নরনারীদের সাহায্যের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা যে কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন নাই সে কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ধর্ম্মপরায়ণ সঙ্গতি সম্পন্ন হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই পুণ্যকর্ম্মজ্ঞানে এখানে সত্রশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। এই সমুদয় সত্রশালার সংখ্যা যদিও তত অধিক নহে তথাপি উহা হইতে বহুসংখ্যক নিষ্কিঞ্চন সাধু, দরিদ্র বিদ্যার্থী এবং অসহায় ব্রাহ্মণবংশীয় নরনারী যে নিয়মিতরূপে প্রতিদিন সাহায্য লাভ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইতেছেন সে বিষয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতি এবং শারীরিক অসুস্থতা অথবা বার্দ্ধক্য বশতঃ যাঁহারা সত্রালয়ে উপস্থিত হইতে না পারেন তাঁহারা তথাকার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। রুগ্ন অবস্থার অসহায় নরনারীর আশ্রয় ও সেবার জন্য এখানে তিন চারিটা হাঁসপাতাল ও একটী অনাথালয়* বহুদিবস হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু সাহায্যপ্রার্থী দুঃস্থ লোকসংখ্যার তুলনায় উপরি উক্ত সত্রালয়, অনাথালয় ও হাঁসপাতালগুলির কার্য্য করিবার শক্তি অতি সামান্য। সেজন্য পথে, ঘাটে, ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে প্রায়ই অনাথ, রুগ্ন ও ক্ষুধার্ত্ত নর-নারীকে অতি শোচনীয় অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এখানে অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া দুঃখময় জীবনের নানাবিধ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া থাকেন। ইহাঁরা আমাদের সঙ্গতি-হীনা মধ্যম শ্রেণীর ভদ্রমহিলা। নানারূপ দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করিলেও ইহাঁরা কাহারও দ্বারস্থ হইতে প্রস্তুত নহেন। অর্থাভাবে ইহাঁরা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। যেসকল গৃহে ইহাঁরা বাস করেন তথায় সূর্য্যকিরণ একেবারেই প্রবেশ করিতে পারে না এবং সেজন্য গৃহগুলি এত অধিক অন্ধকারময় যে দিবাভাগেও তন্মধ্যে আলোক সাহায্যে প্রবেশ করিতে হয়। গৃহগুলি আবার অতিশয় স্যাঁৎসেঁতে ও দুর্গন্ধময় বলিয়া মনুষ্যবাসের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী। বিদ্যার্থী বালকেরাও সাধারণতঃ কপর্দ্দকশূন্য। ইহাঁরা সুস্থাবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কোনরূপে দিনাতিপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর লোকেরা যখন রোগে উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া পড়েন তখন ইহাঁদের সমুদয় সাহায্যলাভের পথ এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। কারণ সত্রালয় ও হাঁসপাতাল প্রভৃতিতে স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিলেই সাহায্য লাভের সম্ভাবনা নচেৎ নহে। সেজন্য সে সময় ইহাঁদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠে সে বিষয় বোধ হয় লিখিবার আবশ্যক করে না। এরূপ অবস্থায় অনেকে আবার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও অন্যান্য নানা কারণে পূর্ব্বোক্ত অনাথালয় ও হাঁসপাতালে যাইতে চাহেন না। উপরি উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পুণ্যতীর্থ কাশীধামে আমাদের অসহায় দুঃস্থ দেশবাসীর সেবার জন্য একটী বিশালক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

স্বনামধন্য, পুণ্যশ্লোক, জন্মভূমির মুখোজ্জ্বলকারী, বঙ্গের চিরগৌরব, সন্ন্যাসীবর স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বী ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ-প্রভাবে বার বৎসর পূর্ব্বে বহু সংখ্যক ধর্ম্মপ্রাণ মানবের অন্তরে জীবসেবারূপ সুমহান্ ব্রত জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উপদেশ-প্রভাবে কতিপয় তরুণবয়স্ক বঙ্গবাসী যুবক এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহারা জীবনাভিনয়ের প্রথমাঙ্কেই সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া নিজ নিজ জীবন জীবসেবারূপ সুমহান্ ব্রতে সমর্পণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। কাশীধামে অবস্থান কালে পথে বাহির হইলেই তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে গঙ্গাতীরে ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে অসহায় অবস্থায় রুগ্ন ও দরিদ্র বহু লোক পড়িয়া রহিয়াছে। এরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়া কাশীধামেই তাঁহারা তাঁহাদের মহান্ উদ্দেশ্য প্রথমে কার্য্যে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করেন। সে সময় ১৯০০ সালের ১৩ই জুন তারিখে ইহাদের মধ্যে একজন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে দেওনাথপুরায় পথের পার্শ্বে অশীতি বর্ষীয়া

* এটী ভিজ্ঞানাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এখানে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া হয়।

একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল যে তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবার পর অতি ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন "দুটী ভাত খা'ব—চার দিন কিছু খাই নাই।" যুবকটীর আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না বলিয়া তিনি নিজে কোনরূপ অর্থসাহায্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তিনি বাজারে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া চারি আনা পয়সা সংগ্রহ করিলেন এবং তদ্দ্বারা কিছু দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া বৃদ্ধাকে আহার করাইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি একজন বন্ধুর বাটী হইতে অন্ন আনিয়া বৃদ্ধাকে ভোজন করাইলেন। সন্ধ্যার সময় পুনরায় আসিয়া তিনি তাঁহাকে দুগ্ধ প্রদান করিলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটী বাটীর চৌতারায় বৃদ্ধার সে রাত্রি যাপনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেদিন রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় পরদিবস প্রাতঃকালে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে স্ত্রীলোকটি শীতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছেন। একখানি অতিশয় জীর্ণ ও মলিন পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন বৃদ্ধার গাত্রে অপর কিছুই ছিল না। উহাঁকে তাদৃশ শোচনীয় অবস্থায় দেখিয়া তিনি নিজ উত্তরীয়খানি এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং অতি কষ্টে কোন স্থান হইতে অন্ন সংগ্রহ করিয়া সে দিবসের মত তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন। তারপর গঙ্গাতীরস্থ কোন স্থানে তাঁহাকে রাখিয়া যুবকেরা নিজহস্তে তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষা করেন এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ পূর্ব্বক দৈনিক আহারের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। প্রথম তিন মাস ইহাঁরা দুঃস্থ অনাথাদিগের এই ভাবেই সেবাদি করিয়াছিলেন এবং রুগ্ন অসহায় লোকদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ বাসস্থানে ঔষধ পথ্যাদির দ্বারা সাহায্য করিয়া আসিতেন। প্রয়োজন বিবেচিত হইলে কোন কোন রোগীকে ইহাঁরা নিজেদের ব্যয়ে ভেলুপুর কিম্বা চৌকাঘাট হাঁসপাতালে প্রেরণ করিতেন। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই ইহাঁদের কার্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন এরূপ ভাবে পথে ঘাটে এবং প্রত্যেকের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। শেষে একটী পৃথক সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা অনিবার্য্য বিবেচিত হওয়ায় ১৯০০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করা হয় এবং তথায় প্রথম সেবাশ্রমের কার্য্য নিয়মিত রূপে আরম্ভ হয়। এই স্থানে সেবাশ্রমটী এক বৎসর ছিল। যুবকদিগকে এইরূপে নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে জনসাধারণের হৃদয়ে ইহাঁদের প্রতি সহানুভূতির সঞ্চার হইতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কতিপয় হৃদয়বান্ স্থানীয় ভদ্রমহোদয়ের সাহায্যে একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হয় এবং সেই সভার উপর আশ্রমের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার ন্যস্ত হয়। পরে উক্ত স্থানে নানারূপ অসুবিধার জন্য এবং ক্রমশঃ কার্য্যেরও বৃদ্ধি হওয়ায় অন্যত্র ছয় সাত মাস থাকিয়া মাসিক দশটাকা ভাড়ায় রামাপুরা নামক স্থানে অপেক্ষাকৃত একটী বৃহৎ বাড়ীতে আশ্রমটী স্থানান্তরিত করা হইল। ১৯০৩ সালের প্রারম্ভে, বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায়, আশ্রমটীকে "রামকৃষ্ণ মিশনের" অধীনে ও তত্ত্বাবধানে স্থাপন করা হয়। শেষোক্ত স্থানে আশ্রমের কার্য্য আট বৎসর কাল পরিচালিত হইয়াছিল।

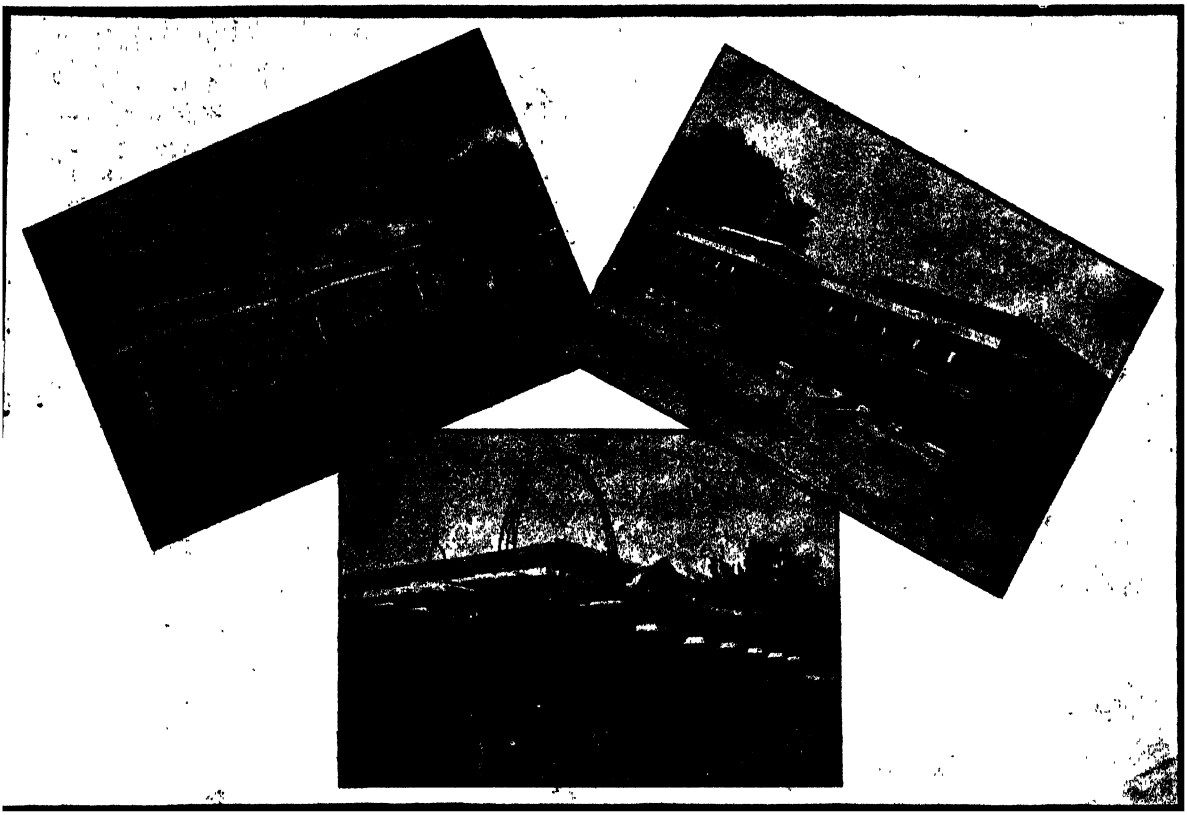
প্রথমে আট জন যুবক আত্মোৎকর্ষ বিধানের উদ্দেশ্যে পূর্ব্বোক্ত জীবসেবারূপ মহদ্ব্রত পালনে প্রবৃত্ত হ'ন। কিছুকাল কার্য্য করিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে যেরূপ কার্য্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে অন্ততঃ তাঁহাদের মধ্যে দু'চার জনের তজ্জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মবিনিয়োগ বিশেষ প্রয়োজন। একথা বুঝিবামাত্র তাঁহাদের মধ্যে তিন জন ব্রহ্মচারী এই কার্য্যের জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহাঁরা এক অভিনব ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। স্ত্রী, পুরুষ, জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে অসহায়, রুগ্ন, মুমূর্ষু, জরাগ্রস্ত ও অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিশেষ আগ্রহ ও যত্নের সহিত সেবা করিতে লাগিলেন। অনাথ, পীড়িত ও মুমূর্ষু লোক পথে দেখিলেই আশ্রমে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। যখনই জানিতে পারিতেন যে কোন স্থানে কোন দরিদ্র স্ত্রী অথবা পুরুষ রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেজন্য তাঁহাদের শিশুসন্তানেরা

অনাহারে কষ্ট পাইতেছে তখনই তাঁহারা তথায় যাইয়া যথাসাধ্য রোগীর জন্য ঔষধ পথ্যাদি ও সন্তানদের জন্য আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া আসিতেন। চলৎশক্তিহীন অথবা জরাগ্রস্ত নরনারীর গৃহে যাইয়া আহারীয় প্রদান করিয়া আসা ইহাঁদের দৈনিক কর্ম্মের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল। যেসমুদয় পীড়িত বিদ্যার্থী ও নরনারী সরকারী অথবা অন্য হাঁসপাতালে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন তাঁহাদের বাসস্থানে ডাক্তার অথবা কবিরাজ লইয়া গিয়া সাধ্যমত রোগের চিকিৎসা করিতেন। এবং অবস্থা-বিপর্য্যয়-হেতু যেসমুদয় মধ্যম শ্রেণীর নরনারী পরদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধাশন অথবা অনশনের ক্লেশ নীরবে সহ্য করিতেন তাঁহাদের সন্ধান করিয়া প্রতি সপ্তাহে তাঁহাদিগকে প্রাণধারণোপযোগী আহারীয় অথবা অর্থ প্রদান করিয়া আসিতেন। অন্যান্য যেসমুদয় পীড়িত লোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেন রোগনির্ণয়পূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে ঔষধ বিতরণও ইহাঁদের কার্য্যের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল।

ঈদৃশ দরিদ্রসেবারূপ সদনুষ্ঠানের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য প্রথম হইতেই একটী উপযোগী আশ্রমের অভাব অনুভূত হইতেছিল এবং সেবাশ্রমের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে এবিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া জনসাধারণের নিকট একটী আবেদনপত্র প্রতি বৎসরই প্রকাশিত হইতেছিল। ধীরে ধীরে আশ্রমের কার্য্যের প্রসার এবং ইহাঁদের স্বার্থগন্ধশূন্য প্রকৃত নিষ্কাম ও পরহিতকর কার্য্যাবলী দর্শন এবং লোকমুখে তদ্বিষয় শ্রবণ করিয়া জনসাধারণ যে মুগ্ধ হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি? এবং আরও কিছুকাল পরে কাহারও জানিতে আর বাকি রহিল না যে কতিপয় বঙ্গীয় যুবক কাশীধামে এক অদ্ভুত পরসেবারূপ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন। ধীরে ধীরে অনেকেরই হৃদয়ে ইহাঁদের কার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উদয় হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে এবিষয়টী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কাশীবাসী কতিপয় পরদুঃখকাতর হৃদয়বান্ ডাক্তার ও কবিরাজ মহোদয়েরা যুবকবৃন্দকে আনন্দচিত্তে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ ও অনুরাগ অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। আশ্রমের কার্য্যবৃদ্ধির সহিত দেশের নানাস্থান হইতে নানাপ্রকার সাহায্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আশ্রমের বাটী নির্ম্মাণের জন্য যে আবেদনপত্র প্রকাশিত হইতেছিল তাহার প্রয়োজনীয়তা, কলিকাতা এন্‌টালি-নিবাসী দানপরায়ণ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় এবং মহা উদারহৃদয় শ্রীযুক্ত তারিণীচন্দ্র পাল মহাশয়, প্রথম অনুভব করিয়া মুক্তহস্তে দান করিয়া আশ্রমনির্ম্মাণের জন্য অর্থাগমের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মহোদয় ৪,০০০৲ চারি সহস্র মুদ্রা দান করেন এবং শেষোক্ত মহোদয় নিজ জীবনব্যাপী পরিশ্রম দ্বারা সঞ্চিত ২০০০৲ দুই সহস্র মুদ্রা দান করিয়া অপূর্ব্ব মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করেন। ইহাঁদের সমুন্নত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া বহু সঙ্গতি-সম্পন্ন সাধুহৃদয়ের তদনুকরণেচ্ছা জাগরিত হইয়া উঠে এবং ক্রমে ক্রমে অনেকেই এই শুভকর্ম্ম সাধনের জন্য অর্থসাহায্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহারই ফলে প্রায় ৬০০০৲ ছয় সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে কাশীধামের অন্তর্গত লাক্‌সা নামক স্থানে প্রায় তিন বিঘা জমী ক্রয় করিয়া ১৯০৮ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে "রামকৃষ্ণ-মিশনের" অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহোদয় কর্ত্তৃক আশ্রমের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। পর বৎসর আশ্রমনির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইলে ১৯০০ সালের জুলাই মাসে তথায় প্রকৃতপ্রস্তাবে নিয়মিতরূপে কার্য্য আরম্ভ হয়। আশ্রমে এক্ষণে সর্ব্বসুদ্ধ ছচল্লিশ জন রোগীর আশ্রয়, সেবা ও পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত আছে। স্ত্রীলোক এবং পুরুষদিগকে পৃথক পৃথক ওয়ার্ডে (ward) রাখিয়া সেবা করা হয়। সম্প্রতি আশ্রমে কি প্রণালীতে কার্য্য হইতেছে সাধারণের অবগতির জন্য সে বিষয় অতি সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল:—

১। আশ্রমে রাখিয়া প্রায় পঞ্চাশ জন রোগীর সেবা করা হয়। যাহার যেরূপ প্রয়োজন তাহার জন্য সেইরূপ ঔষধ ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত হয়। আরোগ্য লাভের পর রোগীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আশ্রমে যাহাদের মৃত্যু হয় আশ্রমের ব্যয়ে তাহাদের যথোচিত সৎকার করা হয়।

২। আশ্রম হইতে প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ জন



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—কাশীধাম।

রোগীকে ঔষধ বিতরণ করা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে পথ্যাদিও প্রদান করা হয়।

৩। যেসকল রোগী আশ্রমে আসিতে অসমর্থ প্রতিদিন এরূপ প্রায় দশ পনর জন রোগীর নিজ নিজ বাসস্থানে চিকিৎসক প্রেরণ করিয়া চিকিৎসা করা হয়। প্রয়োজন বিবেচিত হইলে পথ্যাদিরও ব্যবস্থা করা হয়।

৪। প্রতিদিন প্রায় একশত দরিদ্রকে তাহাদের নিজ নিজ বাসস্থানে চাউল ও অন্য আহারীয় অথবা অর্থ প্রদান করা হয়।

৫। প্রতিদিন প্রায় চার ঘণ্টা কাল ভিক্ষা সংগ্রহ কার্য্যে অতিবাহিত হয় এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য পূর্ব্বোক্তরূপে বিতরণ করা হয়।

৬। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে রেলভাড়া, বাড়ীভাড়া প্রভৃতির জন্য অর্থসাহায্যও প্রদান করা হইয়া থাকে।

গত দশ বৎসর আশ্রমে এইভাবেই কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হই যে এই দীর্ঘকালব্যাপী অশ্রান্ত পরিশ্রমের পর সেবকবৃন্দের অন্তরে অণুমাত্রও অবসাদের উদয় হয় নাই, বরং ইঁহাদের উত্তম ও আগ্রহ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবসেবার জন্য ইঁহারা আরও অধিক পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় যে ইঁহারা সে মহান্ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। কারণ স্থানাভাবে ইঁহারা অনেক রোগীকে ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন এবং অর্থাভাবে বহু উপযুক্ত পাত্রও সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কিন্তু

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস "সদিচ্ছা-পূর্ণকারী শ্রীভগবান্" নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে ইহাঁদের এই নিষ্কাম অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। ইহাঁদের বর্ত্তমান অভিলাষ ও অভাব সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে লিখিত হইল :—

১। স্থানাভাব বশতঃ আশ্রমে নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর সেবার কোন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই। যে সময় এস্থানে কোন কোন ব্যাধির বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় সে সময় বহুলোকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও স্থানাভাবে সেবকেরা সে সময়ও কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। এই উদ্দেশ্যে একটী স্বতন্ত্র (ward) ওয়ার্ড্ নির্ম্মাণ বিশেষ প্রয়োজন—ব্যয় ১২০০০৲।

২। অসহায় সঙ্গতিহীন, অথর্ব্ব একশত কাশীবাসী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার বাসস্থানের জন্য অপর একটী পৃথক আতুরাশ্রম—ব্যয় ২৫০০০৲।

৩। আশ্রমে থাকিয়া রোগীদের চিকিৎসাদি করিবেন এরূপ একজন উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের বাসস্থান—ব্যয় ৫০০০৲।

৪। সেবকবৃন্দের বাসস্থান—ব্যয় ৮০০০৲।

অতএব এখনও সর্ব্বসুদ্ধ ৫০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দ্বারা যে একটী মহাহিতকর কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং দেশের প্রকৃত ও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ হইবে না। ইহা দ্বারা যে দেশের একটী চিরানুভূত অভাব বিদূরিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যিনিই আশ্রম ও আশ্রমের কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন অথবা লোকমুখে শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাহাঁরই হৃদয়ে নিষ্কাম পরার্থব্রতী সেবকবৃন্দের উপর শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছে। ইহার উন্নতি বিধান দ্বারা সেবকবৃন্দের উৎসাহ ও আগ্রহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? দেশ মধ্যে ইহাকে একটী আদর্শ সেবাশ্রমে পরিণত করিয়া তুলিতে পারিলে দেশবাসীর কি উহা মহাগৌরবের বিষয় হইবে না? উক্ত আশ্রমের উন্নতি বিধানের জন্য জনসাধারণের নিকট এই আবেদনপত্র প্রকাশিত হইল এবং আমরা আশাকরি নিয়মিতরূপে সাধ্যমত ইহার সাহায্য করিতে কেহই পরাঙ্মুখ হইবেন না।

সেবাশ্রমের সাহায্যের জন্য যিনি যাহা কিছু দিবেন অনুগ্রহ করিয়া—সহকারী সম্পাদক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, লাক্সা, বেনারসসিটি, অথবা অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়মঠ, জিলা হাওড়া,—এই ঠিকানায় পাঠাইলে উহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

শ্রীহরিদাস দত্ত।

ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা ও তাহার আদর্শ

ইংলণ্ডে যখন ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারি প্রথম দেখিলাম, তখন মনে হইল এ যেন একটি ভাবের স্বর্গলোক, এখানে যেন বাস্তব পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্যসীমারেখা অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোথায় ব্যবসা-বাণিজ্যের নানামুখী ব্যস্ততাময় কর্ম্ম-স্রোত, কোথায় রাষ্ট্রীয় কলেবরের অগণিত শিরাধমনীর নিয়ত বহমান জীবনের আবেগচাঞ্চল্য—লণ্ডনসহরের চারিদিকের জনসমুদ্রের কর্ম্মসমুদ্রের ফেনতরঙ্গের কল্লোলের সঙ্গে সেই শান্তসমাহিত চিত্রশালাটির যেন কোথাও যোগ নাই। তাহার কারণ ন্যাশন্যাল গ্যালরিতে ইতালীয় চিত্রমালার সংখ্যাই অধিক এবং সেই চিত্রগুলি ভগবান্ খৃষ্টের লোকাতীত দৈবীলীলার বিচিত্র পুরাণকাহিনীর নানা পরিকল্পনা। তাহারা অদৃশ্য জগতের রহস্য-পরিপূর, সুতরাং দৃশ্যজগতের সঙ্গে তাহাদের বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত বেশি।

সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শিল্পের আদিগুরু গিয়োটোর চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সায়েনায়, ফ্লোরেন্সে, ভেনিসে ও অন্যান্য ইতালীয় সহরে চিত্রকলার যেসকল নব নব দল সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের চিত্রগুলি ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে ক্রমানুসারে সজ্জিত হইয়াছে। চিত্রের বিষয় প্রায় এক—ঐ খৃষ্টীয় পুরাণ। এক খৃষ্টের জন্মবার্ত্তা ঘোষণা সম্বন্ধেই (Annunciation) কত অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কত গির্জ্জার প্রাচারে প্রাচীরে—

তাহাদের প্রতিলিপি আনিয়া আজ সকল ইউরোপীয় চিত্রশালা রক্ষা করিতেছে।

এখন অবশ্য কালের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে মধ্যযুগে এই অধিকাংশ চিত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই যুগকে ইউরোপ এখন অন্ধযুগ বলিয়া থাকে। তখন স্বর্গ, দেবদূত, সাধুসন্ন্যাসী তাহার কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এখন সেসকল অলীক ও কাল্পনিক কথা—অতীন্দ্রিয় কোন লোককেই ইউরোপ স্বীকার করিতে চায় না। তখন বিশ্বাস মানুষের চিত্তসিংহাসনে একলা অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছিল, এখন বিজ্ঞান তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

তথাপি এসমস্ত চিত্রই ন্যাশন্যাল—বিশেষভাবে ব্রিটিশ বা ইতালীয় বা অন্য কোন জাতীয় নহে। ফ্রাএঞ্জেলিকো, বেলিনি, লিওনার্ডোডাভিঞ্চি প্রভৃতিকে অনুন্নত যুগের মানুষ বলিলেও তাহাদের কল্পনাসম্পদ্ হইতে ইউরোপ বঞ্চিত হইতে চায় না। এমন কি তাহাদের পরবর্ত্তী ডচ্ চিত্রকরগণ যেমন রুবেন্‌স্, ভ্যান্‌ডাইক্, কিম্বা ব্রিটিশ চিত্রকরগণ যেমন টার্ণার কি হগার্থ,—তাহাদিগকেও মধ্যযুগীয় কিম্বা অল্পকাল পরবর্ত্তী ফ্লোরেন্সের ওস্তাদ্ শিল্পীদের সঙ্গে কোন অংশেই কেহ তুলনীয় মনে করে না। মধ্যযুগের ভক্তিধর্ম্মের প্রতি আধুনিক ইউরোপ যতই অবজ্ঞাশীল হৌক্—সেই ভক্তিভাবপ্রসূত আর্ট যে একটি বড় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন আধুনিকতম আধুনিকেরও মনে লেশমাত্র সংশয় নাই। ইউরোপে যদি আবার কোন সময়ে ধর্ম্মের নবযুগ আসে, তখন সেই মধ্যযুগের সাধনার এবং সেই ভক্তিলীলায়িত শিল্পের তলব পড়িবেই—কারণ তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম-সত্যের একটি নিত্যরূপ আছে।

আমার কাছে এইটেই চমৎকার লাগে যে কি ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে কি প্যারীনগরের লুভ্‌র্‌এ ইউরোপীয় মানুষ আপনার যুগযুগের শিল্পসাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। সেখানকার চিত্রগুলি এখন হয় ত কেবলমাত্র কলাকুশলগুণী বা কলাশিক্ষার্থীর কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া থাকে—তাহার সঙ্গে সমস্ত ইউরোপের জীবনের বড় সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ফ্রান্সে এক সময় বড় বড় ইতালীয় চিত্রকর চিত্রকলার আদর্শস্থানীয় ছিলেন, সেখানে এখন নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তির চিত্র সর্ব্বত্রই আদৃত হইতেছে। কিন্তু আধুনিক-কালের এই প্রহসন কি একদিন মরীচিকার মত দিগন্তরালে বিলীন হইয়া যাইবে না? যে আর্ট গ্যালারিতে আজ শিক্ষার্থিগণ প্রাচীন শিল্পীর রচনা নকল করিবার জন্য রং ও তুলি হাতে বসিয়াছে, একদিন তাহারা নিশ্চয় বুঝিবে যে কেবল আকারের সৌষ্ঠব, রং ফলানো, পরিপ্রেক্ষণ—এই সমস্ত জিনিসই শিল্পের প্রাণ নহে, তাহার যথার্থপ্রাণ একটি অধ্যাত্ম আদর্শ যাহা চিরন্তন কাল ধরিয়া মানুষের আত্মাকে আনন্দময় জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রাখিতে সমর্থ।

আমাদের দেশে প্রাচীন শিল্প অল্পে অল্পে উদ্ধার হইতেছে, নূতন শিল্পও তাহার প্রেরণায় জাগিবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু হায়, আমাদের শিল্পকে আমরা কোথায় তেমনি করিয়া পয়ে পরে স্তরে স্তরে সাজাইলাম? বিদেশী ঐতিহাসিক আমাদের কানে মন্ত্র দিতেছে যে ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে আর্ট ছিল না—বৌদ্ধযুগে অশোকের কালে কনিষ্ক প্রভৃতি রাজাদের সময়ে যেটুকু আর্ট দেখ, সে কেবল গ্রীক্‌দের অনুকরণে হইয়াছিল—তাহার পূর্ব্বে বা পরে শিল্পের নামগন্ধ নাই।

ভারতবর্ষের নিজস্ব কোন আর্ট নাই বলাও যা আর ভারতবর্ষকে বর্ব্বরদেশের সমপর্য্যায়ভুক্ত করাও একই কথা হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষে তত্ত্ববিদ্যা ছিল অথচ সৌন্দর্য্যদৃষ্টি ছিল না, সে চিন্তা করিয়াছে কিন্তু বোধ করিতে পারে নাই—তাহার মানে এই যে তাহার মস্তিষ্কের সহিত তাহার স্নায়ুতন্তুর কোন সংযোগ ছিল না—সে এমন একটি সভ্যতার ফল ফলাইয়াছে যাহার আঁটি মাত্র আছে, শাঁস কোথাও নাই। এমন অদ্ভুত কথা যে বিংশশতাব্দীর সভ্যতা-গর্ব্বান্ধ কোন পণ্ডিত লোক কল্পনা করিতেও পারে, ইহাই আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। তথাপি ভারতশিল্প সম্বন্ধে সেই পণ্ডিত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কি বলেন তাহা দেখা যাক্।

নেপালের সীমান্তপ্রদেশে পিপ্রবতে যে প্রাচীনতম একটি স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে শাক্যগণ বুদ্ধের ভস্মরক্ষা করিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, তাহার

তারিখ ইঁহারা ৪৫০ B. C. স্থির করেন। তখন গ্রীক্‌রা আসে নাই। তবে ভারতবর্ষীয়গণ এ স্তূপরচনা কোথা হইতে শিখিল? উত্তর "Perhaps from Babylonia!" এই perhaps-টি নিছক ঐতিহাসিক।

ইহার পর আড়াই শত বৎসর পর্য্যন্ত আর কোন শিল্প নাই—তার মানে পাওয়া যায় নাই। তারপর একেবারে অশোকের কাল—তাঁহার স্তম্ভ স্তূপ গুহাচিত্র প্রভৃতি। মধ্য ভারতবর্ষে বরহুত ও ভূপালে সাঞ্চী স্তূপ আছে—বুদ্ধগয়াতেও আছে। অশোকের প্রস্তর রেলিংএর চিত্রমালাও নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। স্তূপরচনা কোথা হইতে শিক্ষা হইয়াছে তাহাতো জানিলাম, এখন অশোক রেলিংএর চিত্রমালায় যেসকল যক্ষ রক্ষ নাগ প্রভৃতির ভাস্কর্য্য দেখা যায়, সে শিক্ষা কোথা হইতে হইল? গ্রীকদের নিকট হইতে। অশোকস্তম্ভও গ্রীক্ ও পার্সিপলিটান্ অর্থাৎ পারস্যদেশীয় স্তম্ভেরই রূপান্তর মাত্র। সম্রাট্ অশোক নানাদেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সময়কার শিল্পের এই অনুকরণ সহজ হইয়াছিল।

তারপর শক ও কুশানদিগের সময়ে অর্থাৎ কণিষ্ক হুবিষ্ক প্রভৃতি রাজাদিগের রাজত্বকালে, যখন রোমে এবং সর্ব্বত্রই গ্রীক্ শিল্প অপ্রতিহত প্রভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে, তখন গান্ধারদেশে এক শিল্পযুগ আসে। পেশবার ও পঞ্জাবের নানা স্থানে এই শিল্পের অজস্র উপকরণ বাহির হইয়াছে—কলিকাতা, লাহোর, ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রভৃতি মিউজিয়মে তাহা দেখা যায়। সেগুলি 'হুবহু' গ্রীক্—কারণ বুদ্ধের মূর্ত্তি দেখিলে হঠাৎ অ্যাপোলো বলিয়া ভ্রম হয়। দেবতাদের মূর্ত্তিগুলিও গ্রীক্‌দেরই মত। বুদ্ধ যে তখন দেবতারূপে পূজিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যেমন গান্ধারে তেমনি দক্ষিণে অমরাবতীতে এই একই ধরণের শিল্প দেখা যায়। দক্ষিণে তখন অন্ধ্র রাজাদের রাজত্ব।

কিন্তু এই সময়ে অজন্তাগুহার চিত্রাবলীরও জন্ম হইয়াছিল, সে তো গ্রীক অনুকরণে হয় নাই। তবেই তো মুস্কিল। তবে সে আবার কাহার অনুকরণ তাহা গবেষণার দ্বারা বাহির করা তো বিষম গোলযোগের ব্যাপার! গ্রীফীথ্‌স্ ফারগুসন্ হেন মানুষেরাও যে এই চিত্রাবলীর প্রভূত সুখ্যাতি করিয়াছেন। এমনকি গ্রীফীথ্‌স্ ফ্লোরেন্স ভেনিসের চিত্র হইতেও অজন্তাগুহার চিত্রকে উচ্চ আসন দিয়াছেন—

"The Florentine could have put better drawing and the Venetian better colour, but neither could have thrown greater expression into it." সুতরাং অজন্তাগুহার চিত্রাবলী যখন গ্রীক্ অনুকরণ বলিবার উপায় নাই, তখন ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ লিখিতেছেন—

"Their foreign origin is apparent, but nobody knows where the artists came from or what their models were." অর্থাৎ তাহাদের বৈদেশিক উৎপত্তি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান, তবে কোন্ বৈদেশিক শিল্পীরা আসিয়াছিল, তাহাদের শিল্পের আদর্শ কি ছিল তাহা কেহই জানে না। ইহারও নাম যদি ইতিহাস হয়—তবে আমাদের পুরাণতন্ত্র প্রভৃতিকে ইতিহাস বলিতে দোষ কি! ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের এরূপ বলিবার যুক্তি—সাহিত্যে তখন বাণভট্টের কাদম্বরীর 'tawdry and insincere rhetoric' দেখা যাইতেছে, চারিদিকে কোথাও কোন চিন্তার বা চেষ্টার পরিচয় নাই। সুতরাং হয় ত পুলকেশিন্ প্রভৃতি চালুক্য রাজাদের কালে বিদেশ হইতে কোন চিত্রকরের দল আসিয়া অজন্তা গুহাকে চিত্রশোভিত করিয়া থাকিবে। ধন্য সেই অখ্যাতনামা অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী ঐতিহাসিকের মস্তিষ্কসম্ভূত চিত্রকরের দল!

যাক্, তারপর? তারপর ভারতবর্ষে আর আর্ট নাই। কারণ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ একটি আশ্চর্য্য লাইন কলমের এক আঁচড়ে লিখিয়া ফেলিয়াছেন—সে পংক্তিটি এই—

"After A. D. 300, Indian sculpture hardly deserves to be reckoned as Art."

তারপর মোগল সম্রাটদের আমলে স্যারাসেন শিল্প জাগিয়া উঠে, কিন্তু তাহাতে হিন্দুজাতির কোন কৃতিত্ব নাই। ভারতবর্ষের আর্টের ইতিহাসে একটা ধারাবাহিকতা নাই, তাহার ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়া দেখিবারও কোন

সম্ভাব নাই। এই তো পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মোটা-মুটি সিদ্ধান্ত। আমি তাঁহাদের সকল কথা যথাযথ ভাবেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমরা এতদিন পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কারণ স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া আমাদের দেশের কোন বিষয়ের ইতিহাস আলোচনা করিবার শক্তি আমরা রাখি না। পাশ্চাত্য গুরুগণ যাহা বলেন তাহা আমরা বেদবাক্যের মত শিরোধার্য্য করিয়া লই।

শ্রীযুক্ত ই, বি, হ্যাভেল বহুকাল ভারতবর্ষে ছিলেন। কলিকাতার গভর্মেণ্ট স্কুল অব্‌ আর্টের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে জানিবার এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি ভাল করিয়া আলোচনা করিবার সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন—তাহার নাম "The Ideals of Indian Art"। সেই পুস্তকে তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্ট যে কত বড় একটি শক্তি, তাহার ক্রমবিকাশের ধারা যে আজও পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত আর্টকে চিনিতে হইলে একটা অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, কেবল উপর উপর দেখিয়া এটা অমুকের অনুকরণ বা এ অংশটা অমুক দেশ হইতে আসিয়াছে এরূপ স্থির করা মূঢ়তা—হ্যাভেলের পুস্তক পড়িয়া সে কথা বেশ বুঝিয়াছি। ভারতবর্ষের ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে তাহার শিল্পসাহিত্যের যে একটি ভিতরের যোগ আছে—ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার বিশেষত্ব কোথায় তাহা না জানিলে যে তাহার শিল্পসাহিত্যের মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না—সে কথাও এই পুস্তক সপ্রমাণ করিয়াছে। আর্টের প্রাণ যদি সেই গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব হয়, তবে জানিতে হইবে যে সে কোন দিন মরিবার নয়, ফুরাইবারও নয়—তাহার কাজ নিঃসন্দেহ যুগে যুগে ভিতরে ভিতরে হইয়া আসিয়াছে এবং আজি পর্য্যন্ত হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ কেমন করিয়া তাহার সংবাদ পাইবেন?

গ্রন্থের ভূমিকায় হ্যাভেল দুঃখ করিয়াছেন যে ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়মের ভারতবর্ষীয় আর্ট বিভাগে সরকারী রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি বীভৎস—ভারতবর্ষ আর্ট কাহাকে বলে তাহা জানেই না। হ্যাভেল বলেন, ইহার কারণ, যাঁহারা লেখেন তাঁহারা পাশ্চাত্য সংস্কারে আপাদমস্তক এমনি নিমজ্জিত যে একবার মনেও করেন না যে হিন্দু-শিল্পীকে এমন সকল বিগ্রহ (symbol) দ্বারা ভাবপ্রকাশ করিতে হইয়াছে, যাহা হিন্দু জনসাধারণের নিকটেই সুগোচর। যেমন ধর অধ্যাত্মচেতনাকে এদেশে তৃতীয় চক্ষু বলা হইয়াছে। সুতরাং তৃতীয় চক্ষু দেখিয়া এবং তাহার অর্থ না জানিয়া কেহ যদি তাহাকে বীভৎস কি কদর্য্য বলে তবে সে কি নিজের মূঢ়তার পরিচয় দেয় না? এরূপ ভুল বুঝিবার আরও কারণ আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য আর্ট অল্পসংখ্যক কলাবিলাসী ব্যক্তির মধ্যেই আবদ্ধ কিন্তু হিন্দুশিল্প কোনদিন সেরূপ ছিল না। হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর অধ্যাত্মসাধনার গভীরতম উপলব্ধিগুলিকে সকল হিন্দুর নিকটে সুগোচর করিয়া তোলাই হিন্দুশিল্পের মুখ্য অভি-প্রায় ছিল। সেইজন্য যেসকল ইঙ্গিত, রূপ বা চিহ্নের সহিত হিন্দুগণ পরিচিত ছিলেন, শিল্পীকে ভাবপ্রকাশের বেলায় তাহাদেরি সাহায্য লইতে হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে শিল্পসৃষ্টির সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠববিধানের নিত্যনিয়মগুলি রক্ষিত হইয়াছে কি লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহা স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য্য, কিন্তু কি ভাব প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে এবং কোন্‌ বিশেষ রূপ অবলম্বনের দ্বারা সেই চেষ্টা আপনাকে সফল করিয়াছে, গোড়ায় তাহা না জানিয়া সরাসরি বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কি কাহারও পক্ষে উচিত?

হ্যাভেল যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্বন্ধ নির্ণয় দুরূহ—জাতিধর্ম্ম প্রভৃতির এত বিরোধ মাঝখানে আসিয়া জমিয়া পড়ে—ঠিক্‌ সেই প্রকার আর্টের মধ্যেও এত বৈচিত্র্য আছে—আদর্শের এবং তাহার বাহ্যপ্রকাশের—যে সেইসমস্ত বিরোধবিচ্ছিন্নতাকে একটা ঐক্যসূত্রের মধ্যে গাঁথিয়া তোলা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা স্থূল সংস্কার এইরূপ আছে যে, বৌদ্ধযুগ বৈদিক যুগের একটা বিরোধী যুগ, এবং পৌরাণিকযুগে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানকালে বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশ হইতে চিরবিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদিকযুগ বলিতে ইঁহারা যাগযজ্ঞাদিবহুল ক্রিয়াকাণ্ডই বোঝেন, উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে চোখে দেখিয়াও দেখিতে পান্‌না। বস্তুত উপনিষদীয় ব্রহ্মোপলব্ধির তত্ত্ব ও সাধনাই যে বৌদ্ধধর্ম্মে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, উপনিষদীয় সর্ব্বানুভূতি ও বৌদ্ধ বিশ্বমৈত্রীর সঙ্গে যে সাধনার দিক্ দিয়া কোন বিচ্ছেদ নাই, উপনিষদে যাহা ধ্যানলব্ধ ছিল বৌদ্ধধর্ম্মে তাহাই চরিত্র ও সাধনার বিষয়ীভূত হইবার উপক্রম করিয়াছিল মাত্র—অভিব্যক্তির এই সূক্ষ্মক্রমটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের স্থূল দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যায়। যিশুর ধর্ম্মকে ইহুদীয় প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যেমন ভুল, কারণ যিশু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণের বাণীকে আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে মূর্ত্তিদান করিয়াছিলেন মাত্র—ঠিক্ তেমনি উপনিষদ হইতে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করা সেই একই রকমের ভুল, কারণ এক্ষেত্রেও একজন মহাপুরুষ সমস্ত কালের বাণীকে আপনার জীবনের দ্বারা সার্থক করিয়াছিলেন মাত্র। কবির বাণী যে বস্তুতই তপস্বীর তপস্যার অপেক্ষা রাখে—নহিলে সে বাণীর গভীরতা কে পরিমাণ করিবে ?

পৌরাণিক ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে এদেশ হইতে তাড়াইয়াছে, ইহাও আর একটি ভ্রান্ত সংস্কার। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান কালে যে সময়ে দ্রাবিড়, শক, হুন প্রভৃতি বহু অনার্য্য জাতি আর্য্যজাতির সহিত সম্মিশ্রণে ধর্ম্মে, সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিল, সেই সময় একটা প্রবল স্বাজাত্যের ভাব বৈদেশিক প্লাবনকে ঠেকাইবার জন্য উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। তখন অনার্য্য দেবদেবী, অনার্য্য আচার-ব্যবহার সমস্তকেই শোধিত-সংস্কৃত-রূপান্তরিত করিয়া লইবার যে প্রয়াস তাহা কোন হিসাবেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নহে। বৌদ্ধ নির্ব্বাণতত্ত্বই হিন্দুর বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব হইয়াছিল, বৌদ্ধ ত্রিত্বই হিন্দু ত্রিমূর্ত্তি হইয়াছিল, বৌদ্ধ অবতারবাদই হিন্দুর নারায়ণপূজায় পরিণত হইয়াছিল, বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনা হিন্দুর উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে কত ঢুকিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কথাই বরং বলা উচিত যে নব্য হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া তাহার বিচিত্র বিশৃঙ্খলাকে ও বৈদেশিকতাকে স্বাজাত্যের শৃঙ্খল-বন্ধনে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে অন্যান্য দেশের একই ইতিহাসের এত গুরুতর প্রভেদ যে যদি কোন বিদেশীর কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্য্যায়গুলি অত্যন্ত অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়, তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

জাপানী লেখক ওকাকুরা সান্ তাঁহার "Ideals of the East" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে আর্টের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে চীন, জাপান ও ভারতবর্ষে কোন মতবিভেদ নাই। কারণ এসকল দেশেই আর্ট একটি বড় অধ্যাত্মবোধ হইতে উৎসারিত হইয়াছে এবং সেই অধ্যাত্মবোধের মূল উৎসও এই ভারতবর্ষেই।

ইউরোপে মধ্যযুগে আর্টের সঙ্গে ধর্ম্মবোধের এই যোগ ছিল—ধর্ম্মসংস্কারের যুগে পিউরিট্যান-প্রভাবে সে যোগ ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু সে যে কত বড় বিচ্ছেদ তাহা কেহ ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখে নাই। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আর্টকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসজ্ঞ সমাজের মধ্যে বাঁধা রাখিয়া ক্ষীণপ্রাণ ও বিলাসী করিয়া তোলা হইয়াছে—সমস্ত জাতীয় প্রাণধারার সঙ্গে তাহার যোগ নাই—সে নীতিছাড়া ধর্ম্মছাড়া—সৌন্দর্য্যকে সে এমন একটি আকাশ-কুসুম করিয়া রাখিয়াছে যাহার মূল যুগযুগান্তরের মাটীর মধ্যে দৃঢ়রূপে নিহিত নহে।

হ্যাভেল বলেন ভারতবর্ষে এই বিচ্ছেদ আজ পর্য্যন্তও ঘটে নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষীয় আর্টের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে হইলে যে পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধ এদেশে প্রথম জাগ্রত হইয়াছিল—তাহার সংবাদ সর্ব্বপ্রথমে লইতে হইবে। সে কবে? যে দিন "প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে।" সেই বৈদিক কালে।

. কিন্তু বৈদিক কালে তো কোন আর্ট নাই—আমরা তো শুনিয়া আসিয়াছি যে গ্রীক্ আগমনের পর হইতেই গান্ধার শিল্পাদিতে আর্টের উদ্ভব। মাতৃগর্ভে দশমাস যখন শিশু বাস করে, তখন তো সে ভূমিষ্ঠ হয় না, সুতরাং তখন তাহার অস্তিত্বই নাই একথা কি বলা যায়? ঠিক তেমনি

গ্রীকোরোমান্ ভাস্করগণ আসিবার অনেক পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় আর্টের তত্ত্বের সূচনা হইয়া গিয়াছে। যখন মিত্র বরুণ অগ্নি মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণ মানুষের প্রত্যক্ষ সঙ্গী—অগ্নি যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেন, উষা ধনধান্য বর্ষণ করেন, পূষণ তাপের দ্বারা জগতকে পোষণ করেন, মরুৎগণ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের মেঘগুলিকে দশদিকে বিক্ষিপ্ত করেন, পর্জ্জন্যদেব স্বয়ং বিদ্যুতের স্বর্ণকশা দ্বারা তাহাদিগকে অভিক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত ধরণীর তাপ জুড়াইয়া দেন, শস্যকে উদ্ভিন্ন করেন—শুধু তাই নয়—যখন সমস্ত শক্তি একই শক্তির রূপান্তর—যে তেজোময় অমৃতময় শক্তি আকাশে থাকিয়া সমস্ত জানিতেছেন এবং অন্তরলোকেও সমস্তই জানিতেছেন, সেই এক অনাদ্যনন্ত মহান্ আত্মার দ্বারা সমস্ত নিখিল-চরাচর পরিব্যাপ্ত—এই মহাসত্য উপনিষদ্‌কার ঋষিদিগের নির্ম্মল প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত হইল—ঠিক্ সেই সময়েই সেই বহুশতাব্দীপরের এলোরা অজন্তার গুহা-চিত্রনিচয় এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য নানা আশ্চর্য্য শিল্প-রচনার প্রথম সম্ভাবনা জাগিয়া উঠিল। সমস্ত বিশ্ব-ভুবনের যিনি আত্মা, তিনি জীবাত্মার সঙ্গে এক—একেবারে অচ্ছেদ্য ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ—এই তত্ত্বই ভারতীয় শিল্পকলার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। উপনিষদ এই তত্ত্বকেই সর্ব্বানুভূতি বলিয়াছেন—সর্ব্বানুভূতি মানে সকল পদার্থের মধ্যে পরমাত্মাকে অনুভব করা। যাহা বিশেষ নামধারণ করিয়া, বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিয়া, বিশেষ একটি রূপের মধ্যে নানা বিকার বিকল্প লাভ করিতেছে, তাহা সেই নামরূপের সীমা যে অতিক্রম করিয়া অনন্ত অপরি-সীম হইয়া আছে—যেখানে তাহার প্রাণ, যেখানে আনন্দ, যেখানে তাহার বাস্তবিক সত্তা—কি আশ্চর্য্য দিব্যদৃষ্টিতে সেই কোন্ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষের ঋষিগণ তাহা দেখিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই এমন দ্বন্দ্ব-মূলক সব কথা নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে বলিয়া গিয়াছেন যাহার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত—তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে—তিনি চলেন, অথচ চলেন না, তিনি দূরে আছেন অথচ নিকটেও আছেন। যেখানে সমস্ত চলা সেখানে তাঁহার অনন্ত শান্তি সমস্ত ধারণ করিয়া আছে, যেখানে সমস্ত অবসান সেইখানে তাঁহার সৃষ্টির উদ্যম নব নব কর্ম্মচক্র রচনার আনন্দে পরিপূর্ণ। তিনি সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করিয়া দূরাৎ সুদূরে রহিয়াছেন, অথচ তিনি এত নিকটে যে আকাশ ও কাল তাঁহার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়না। এই যে সীমাকে অনন্তে ব্যাপ্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখা, ভারতীয় আর্টে ইহারি পরিচয় আমরা ক্রমাগতই পাইব।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন তাঁহারা কেহই বৈদিক যুগের এই জীবাত্মা-পরমাত্মার যোগের তত্ত্বটিকে ভাল করিয়া ধরেনও নাই এবং তাহার সঙ্গে যে ভারতের শিল্পকলার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহাও তাঁহাদের ধারণার মধ্যেই আসে নাই।

না আসিবার কারণ আছে। যেখানে প্রথম ভারতীয় শিল্পকীর্ত্তি পাওয়া যায়, সে বৌদ্ধ স্তূপ। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বৌদ্ধযুগের সঙ্গে বৈদিকযুগের সম্বন্ধ বিরোধী সম্বন্ধ বলিয়াই মনে হয়—সুতরাং বৌদ্ধ-স্তূপ স্তম্ভ গুহাচিত্রমালার মধ্যে বৈদিক যুগের কোন প্রভাব কল্পনা করা কি করিয়া চলে?

আমি একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বৌদ্ধ বিশ্বমৈত্রীর সাধনা এবং উপনিষদের সর্ব্বানুভূতির সাধনা একই জিনিষ। বুদ্ধদেব কেবল ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গের দিক্‌টা চাপা দিয়া তাহার সাধনাঙ্গের উপরে অধিকতর জোর দিয়া-ছিলেন—মুক্তি কি, আত্মা কি তাহা গোড়ায় আলোচনা ও বিচার না করিয়া সেই পথে একটু একটু করিয়া চলার অভ্যাস অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন। Creed of Buddha নামক একটি গ্রন্থ পাঠ করিয়া এ কথার স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৌদ্ধধর্ম্মকে উপনিষদীয় ধর্ম্মের একটি বিশেষ বিকাশ রূপে দেখিলে বৌদ্ধযুগের আর্টকে একেবারে আধ্যাত্মিকতা-শূন্য গ্রীকোরোমান শিল্পের নকল বলিয়া বিদায় দেওয়া যায় না।

কিন্তু সাঞ্চী বরহুত অমরাবতী প্রভৃতির স্তূপ ও ভাস্কর্য্য যে অনুকরণ নয় এ কথার প্রমাণ কোথায়? যাহা প্রত্যক্ষ দিবালোকের মত দেখা যাইতেছে, তাহাকে

গায়ের জোরে অস্বীকার করা তো চলে না। তাহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন্ আর্ট ছিল?

হ্যাভেল সে কথা অস্বীকার করেন না। তিনি এই যুগকে Transition অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের মুখের একটা যুগ বলিয়াছেন। এই সময়ে ভারতবর্ষ নানা দেশ হইতে শিল্পসম্ভার সংগ্রহ করিতেছিল—সেই সংগ্রহের কার্য্যের পরে যে যুগ আসিল তাহাই সৃষ্টির যুগ—তখনই যে তত্ত্বের কথা আলোচনা করিতেছিলাম তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। যেটা মাঝখানের একটা পর্ব্ব তাহাকে প্রারম্ভ মনে করাতেই ভুল হইয়াছে কারণ আর্ট মানে তো কতগুলি ছবি ভাস্কর্য্য রং ও মালমসলা নহে, তাহার প্রাণই হইতেছে একটি তত্ত্ব, একটি আইডিয়া—যাহা নিয়ামক ও প্রবর্ত্তক রূপে থাকিয়া তাহাকে নানা রচনাতে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং প্রারম্ভ খুঁজিতে হইলে সেই আইডিয়াতে যাইতে হইবে—আরকিয়লজিতে নহে।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতির ন্যায় হ্যাভেল বরহুত ও সাঞ্চী স্তূপকেও সম্পূর্ণরূপে গ্রীক নকল বা পারস্য নকল বলিতেও প্রস্তুত নহেন। ভারতবর্ষীয় অনার্য্য দ্রাবিড়গণ যে শিল্পনিপুণ ছিল তাহা সকলেরই জানা কথা। সম্রাট্ অশোক যখন স্তূপাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তখন তিনি যে অনার্য্য শিল্পীদিগের সাহায্য পান্ নাই, এ কথা বলা চলে না। পারস্য দেশের স্তম্ভের ন্যায় অনেক বৈদেশিক অনুকরণচিহ্নের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও সেই সময়ের স্তূপ ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে এদেশীয় স্বকীয় সৃষ্টিরও অনেক লক্ষণ রহিয়াছে। অশোকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কাষ্ঠের স্থাপত্য প্রচলিত ছিল, সেগুলি চিহ্নমাত্রে বিলুপ্ত হইয়াছে—কিন্তু যদি কোন দিন গঙ্গাগর্ভ হইতে বা রাজপুতানার মরুভূমি হইতে মিসর ও ক্রীটের ন্যায় প্রাচীন কালের সকল কীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে, তখন অশোকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে শিল্পচেষ্টা কিরূপ ছিল তাহা জানিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না এবং সংশয়েরও কোন স্থান থাকিবে না।

অশোক রেলিংয়ের চিত্রমালায় কোন বড় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়না সত্য। বুদ্ধমূর্ত্তি তখনও দেবমূর্ত্তি রূপে পূজিত হইতে আরম্ভ করে নাই। যেসকল যক্ষ রক্ষ লোকপাল প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহারা নৈসর্গিক (naturalistic) ভাবেই বেশি পূর্ণ—এই নৈসর্গিকতার একটা নবীন ভাব সেই চিত্রমালার মধ্যে স্ফুট বটে।

হ্যাভেল বলেন যে, এই একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে যে ভারতবর্ষের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব যেখানে গিয়া পড়ে নাই, সেইখানেই এই নৈসর্গিকতার ভাব আর্টে দেখা যায়।

তিনি বলেন চীন আর্টেরও ইহাই বিশেষত্ব। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে যাইবার পূর্ব্বে চীনদেবতারা ঠিক্ অশোকের স্তূপের এইসকল প্রাকৃত দেবতাদের মতই আকারপ্রকারবিশিষ্ট ছিলেন।

যাহাই হৌক্ এই যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আর যখন নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল সেই সময় পর্য্যন্ত এই নানাস্থানের নানা সংগ্রহকার্য্য চলিয়াছিল। এই সংগ্রহের যুগের পরেই সৃষ্টির যুগ—আদিম দ্রাবিড়শিল্প, পার্সিপলিটান্ অর্থাৎ পারস্যের শিল্প,—গ্রীকোরোমান্-গান্ধারশিল্প—এসমস্তই একত্র করিয়া সমস্তকে একটি বড় অধ্যাত্মবোধের দ্বারা, শুষ্ক অরণির মধ্যে অগ্নি সম্প্রদানের ন্যায়, পূর্ণ করিয়া এক অভিনব ভারতবর্ষীয় শিল্পরচনার কাল পরে উপস্থিত হইল।

যখন মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধ ভগবান বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন, তখনই সংগ্রহের যুগ শেষ হইয়া আসিল। তখন যেমন ইউরোপে মধ্যযুগে কত কত শিল্পী খৃষ্টের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনের ঘটনাকে কত কত চিত্রে স্থাপত্যে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, তেমনি এই সময়ে, কত মন্দিরে, কত বিহারচৈত্যে, কত গিরিগুহায়—যেখানে যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির কোন আশ্চর্য্য রূপ খুলিয়া গিয়াছে, এবং মানুষের পূজা আসিয়া সেই রূপের উপরে একটি ভক্তির রহস্য মাখাইয়া দিয়াছে—সেই-সেইখানে ভগবান অমিতাভ ভারতবর্ষীয় শিল্পীচিত্তের সমস্ত ভক্তি ও কল্পনাকে লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। তাঁহার প্রবুদ্ধ সকল-বন্ধমুক্ত দেবমূর্ত্তিতে সমস্ত ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সিংহলে, জাভায়, চীনে সর্ব্বত্র সেই মূর্ত্তি লোকহৃদয়ে আপনার অমর সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিল।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ গান্ধারশিল্পকে ভারতবর্ষীয় শিল্পের জনক বলিয়াছেন। সেই শিল্পে বুদ্ধের তপোমূর্ত্তিকে একটা জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল করিয়া গড়িয়াছে। কিন্তু এই যুগে যথার্থ ভারতশিল্পী তাঁহাকে প্রাচীন মহাকাব্যোক্ত নরসিংহ করিয়া গড়িল—তাঁহার ললাট দীপ্ত, লোচনদ্বয় স্নিগ্ধ, বর্ণ গৌরোজ্জ্বল, শরীর বীর্য্যশালী, তিনি পদ্মাসনে আসীন! তিনি যে ভিতরে যথার্থই সকল বাসনাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া পরম শান্তিলাভ করিয়াছেন, এ তাহারি মূর্ত্তি! মানুষের ভক্তি এই নরোত্তমের মধ্যে যে দিব্য সৌন্দর্য্যকে দেখিয়াছে, কোন্ বাহ্য সৌন্দর্য্য তাহার সঙ্গে তুলনীয় হয়! গ্রীকৃশিল্পকে ভারতশিল্পের জনক বলা বাস্তবিকই কি হাস্যাস্পদ!

সিংহলে ও জাভায় বুদ্ধের যে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, কোন দেশের কোন স্থাপত্যে তাহার তুলনা মিলে না! বুদ্ধ পদ্মাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার উষ্ণীষের উপরে একটি ক্ষুদ্র ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি। মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল যে পূর্ব্বে এক আদি বুদ্ধ ছিলেন, তাঁহার বহু হইবার বাসনা হইল—সেই বাসনার নাম প্রজ্ঞা—আদি বুদ্ধে এবং প্রজ্ঞায় মিলিয়া কয়েকটি ধ্যানীবুদ্ধ সৃষ্টি করিলেন—সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে তাঁহারা নিগূঢ় ভাবে বিরাজমান। এই অবলোকিতেশ্বরের উষ্ণীষস্থাপিত ধ্যানীবুদ্ধের নাম অমিতাভ। যাক্ তার-পর, পিপ্পল পত্রের ন্যায় একটি জ্যোতির্ম্মণ্ডল বুদ্ধের মস্তক আবৃত করিয়া আছে, তাঁহার বামকরতলে ধর্ম্মচক্র মুদ্রাচিহ্ন—তাঁহার দক্ষিণকরতল উদার উন্মুক্ত—তাহাতে বরমুদ্রা চিহ্ন বিদ্যমান। তিনি ধ্যাননিমগ্ন, সমস্ত শরীরের উর্দ্ধভাগ ঋজু, দক্ষিণ পদতল মেলিয়া দিয়াছেন তাহা একটি শতদলের উপরে স্থাপিত—সেই শতদল নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চিহ্ন। আধ্যাত্মিক শান্তির এমন আশ্চর্য্য প্রবল প্রকাশ—চীন জাপানের কোন বুদ্ধমূর্ত্তিতে দেখা যায় নাই।

ধ্যানীবুদ্ধের এই কল্পনা কি আপনি কোন মূর্ত্তিকারের মাথায় আসিয়াছিল? না—নিশ্চয়ই এই ধ্যানপরায়ণতা, এই যোগনিমগ্নতা বৈদ্যুতশক্তির মত সমস্ত দেশের আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল—সূচীভেদ্য তিমির রহস্যাব-গুণ্ঠন ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদ্দীর্ণ হইয়া উন্মোচিত হইবার উপক্রম করিতেছিল। ইউরোপীয় শিল্পী যেমন নানাপ্রকার বাহ্যিক কসরৎ করিয়া শিল্পের হাত পাকায়, আমাদের দেশে তেমনি এই ধ্যানশীলতাকে অভ্যাস করিতে হইত—ইহারি জন্য এদেশের শিল্পী আপনার শিল্পবিষয়ে তন্ময় হইয়া একাত্ম হইয়া যাইতে পারিতেন এবং সেরূপ একাত্মভাব ভিন্ন এরূপ সত্যশিল্প কখনই ফুটিত না।

এইসকল ধ্যানমূর্ত্তি কাহারা অতি যত্নে কুঁদিয়া তুলিয়াছে? আজ তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত—কারণ তাহারা নামের লোভে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। সেইজন্য দেখা যায় যে ভারতশিল্পে চিত্রকলার চেয়ে ভাস্কর্য্যই বেশি। যাহা সকলের চেয়ে দুরূহ ও পরিশ্রমসাধ্য এবং সকলের চেয়ে দীর্ঘকালস্থায়ী সেই কার্য্যেই ভারতশিল্পী আপনার মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে। যেখানে সমস্ত দেশের পূজা আসিয়া মিলিত হইয়াছে—সেইখানে দেবমন্দিরের এক পার্শ্বে সেও আপনার শিল্পপূজাকে বহন করিয়া আনিয়াছে—তাহার শ্রেষ্ঠ কল্পনার পূজা, নির্ম্মল সৌন্দর্য্যানু-ভবের পূজা, পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতির পূজা—পরমধ্যানের অনুধ্যানের পূজা! ইহাই তো মানবের শ্রেষ্ঠ আর্ট—যেখানে মানুষ ধ্যানে যে গভীরতম উপলব্ধির চিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, তাহাকে অতি যত্নে পাথরের মধ্য হইতে ফুটাইয়া তুলিয়া অনন্তকালের মধ্যে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে!

যাহাই হোক্ বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণামে এই যে আদর্শ মনুষ্য বা যাহা একই কথা মানবরূপী দেবতার পূজা জাগিল, তাহা কেবলমাত্র বৌদ্ধদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিল না। জৈনদের মধ্যে, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও সেই একই ভাবের প্রভাব এই সময়ে লক্ষ্য করা যায়। তাহার কারণ মতামতের দিক্ দিয়া জৈনধর্ম্মে, আর্য্যধর্ম্মে, বৌদ্ধধর্ম্মে যতই অনৈক্য থাকুক্—ইহারা সকলেই একটি জায়গায় মেলে যে বাসনাবন্ধন হইতে মুক্তি মানুষ যে বহু তপস্যার দ্বারা অর্জ্জন করিয়া থাকে তাহাই মানুষের শ্রেষ্ঠরূপ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৈদিকধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের, বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে পৌরাণিকধর্ম্মের যেসকল আত্যন্তিক বিরোধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা সত্য নহে। বস্তুত, ইহারা একটি অন্যটির

পরিণাম—পৌরাণিক ধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মেরই পরিণাম তাহা একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তিবাদ উপস্থিত হইলে যখন বুদ্ধ আর মানুষ রহিলেন না, দেবতা হইলেন, তখন তিনি এক অজর অমর আদি বুদ্ধের প্রজ্ঞাপ্রসূত মানসরূপী ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। এই ধ্যানী বুদ্ধগণ পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম ভাবমাত্র; কালে কালে ইঁহারাই মানবের মধ্যে মানবরূপ ধরিয়া পৃথিবীতে মঙ্গল সাধন করিয়া যান্। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে এই অবতারবাদের প্রথম উৎপত্তি, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি।

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম এই অবতারবাদের তত্ত্বটিকেই আরও ব্যাপকতর গভীরতর করিয়া লইয়াছে। যে তত্ত্ব কেবল একজন মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহাকে সমস্ত বিশ্বব্যাপী একটি বিরাটতত্ত্বে পৌরাণিক ভক্তিধর্ম্ম মুক্তিদান করিল। সেই বিশ্বতত্ত্বটি কি? সেটি আমাদের দেশের চিরপরিচিত প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব। বিশ্বকে পুরুষ এবং স্ত্রী এই দ্বৈতশক্তির লীলাক্ষেত্র করিয়া দেখা।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ ত্রিগুণের অধীন হইয়া কার্য্য করে, পুরুষ অথবা আত্মা ত্রিগুণাতীত, অর্থাৎ দ্রষ্টা এবং সাক্ষী মাত্র। এই ত্রিগুণতত্ত্ব পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গীতাপাঠের ভূমিকায় যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই:—ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ। তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এইরূপ:—সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ দুইটি, প্রকাশ এবং আনন্দ। প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা হইতেছে জড়তা বা অবসাদ ও অশান্তি বা প্রবৃত্তিচাঞ্চল্য। জড়তায় প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, প্রবৃত্তিচাঞ্চল্যজনিত অশান্তিতে আনন্দ বাধাগ্রস্ত হয়। জড়তার বাধার নাম তমোগুণ, প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের বাধার নাম রজোগুণ। রজোগুণ তমোগুণের বিপরীত—তমঃ মানে অসাড়তা—তাহার বাধাজনিত যে চাঞ্চল্য ও দুঃখ তাহাই রজোগুণ। সুতরাং এই তিনগুণের ক্রম এইরূপ—নীচে তমোগুণ তার উপরে রজোগুণ—ও সর্ব্বোপরি সত্ত্বগুণ। ব্যষ্টিসত্তা মাত্রেই আমরা এই ত্রিগুণের পরস্পরের দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই—প্রত্যেক বস্তুই সেখানে জড়তা ছাড়াইয়া উত্তমে এবং উত্তম ছাড়াইয়া আনন্দে ও প্রকাশে বা যাহা একই কথা তাহার বাস্তবিক সত্তায় অধিরূঢ় হইতে চাহিতেছে। কিন্তু সমষ্টিসত্তায় এরূপ কোন বাধার সম্ভাবনা নাই বলিয়া সেইখানে সাত্ত্বিক আনন্দ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

ঐ প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বকেই শিব ও শক্তি প্রভৃতি বিচিত্র রূপকে ধ্যান করিবার একটা উদ্যোগ পৌরাণিক কালে লক্ষ্য করা যায়। এলিফ্যাণ্টা প্রভৃতি গুহাতে ত্রিমূর্ত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সম্মিলিত মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে এই ত্রিমূর্ত্তিই বুদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বোধ হয় এই তিনের আইডিয়াটা এক সময়ে আমাদের দেশকে খুব অধিকার করিয়াছিল—দুই দিকে দুই কোটি এবং মাঝখানে তাহার সামঞ্জস্য। ইহার সঙ্গে হিগেলের Thesis Antithesis Synthesis তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে—আমরা যাহাই ভাবি তাহা দ্বন্দ্বমূলক—আলো ভাবি তো তাহার উল্টা অন্ধকার আছে—ভাল ভাবি তো মন্দ আছে—এই দ্বন্দ্ব আবার মিলিত হয় একটি Absoluteএ বা পরিপূর্ণে—নহিলে দ্বৈত পাকাপাকি ভাবে থাকিয়াই যায়। অবশ্য ত্রিমূর্ত্তির আইডিয়াতে এই দ্বৈতাশ্রয়ী অদ্বৈততত্ত্বের কোন স্থান নাই—তবে সেখানেও ঐ একটি আইডিয়া ছিল যে একদিকে আরম্ভ অন্যদিকে পরিণাম মাঝখানে স্থিতি—একদিকে ব্রহ্মা অন্যদিকে মহেশ্বর মাঝখানে বিষ্ণু।

ঐতিহাসিক দিক্ দিয়া আলোচনা করিতে গেলে ত্রিমূর্ত্তির এই তিন দেবতার মধ্যে শিব স্পষ্টতই অনার্য্য দেবতা। তাঁহার ভূত প্রেত প্রভৃতি দলবল, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক রূপে যে লিঙ্গপূজা এদেশে প্রচলিত আছে, প্রভৃতি নানা অনার্য্য চিহ্নই তাহার সাক্ষী। বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে যে গোপবেশী শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা জড়িত হইয়া আছে, তাহাকেও অনার্য্য বলিয়া নির্দিষ্ট করা কঠিন নহে। সুতরাং বৌদ্ধযুগের অবসানকালে দ্রাবিড় ও আর্য্য সভ্যতা মিলিত হইয়া গিয়া যে একটি আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কলাবিদ্যায় দ্রাবিড়গণ নিপুণ ছিল, তত্ত্বজ্ঞানে আর্য্যগণের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল—কলার সঙ্গে তত্ত্বের মনোহর সম্মিলন ঘটিতেই অনার্য্য দেবতাগণ

একটি বৃহৎ আইডিয়ার মহিমা পাইলেন—তাঁহারা একটি বৃহৎ বিশ্বতত্ত্বের বিগ্রহরূপ হইয়া উঠিলেন। সেই তত্ত্বই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব, যাহার কথা বলিতেছিলাম।

যাহাই হৌক এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে আবার প্রত্যেকেরই পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই দিকই বিদ্যমান। ব্রহ্মা যেখানে পুরুষ সেখানে তিনি বিশুদ্ধসত্তা মাত্র, যেখানে প্রকৃতি সেখানে সৃষ্টিকর্ত্তা। বিষ্ণু যেখানে পুরুষ সেখানে চিৎশক্তি, যেখানে প্রকৃতি সেখানে রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা। শিব যেখানে পুরুষ সেখানে বিশুদ্ধ মঙ্গল, যেখানে প্রকৃতি সেখানে প্রলয়কর্ত্তা।

প্রকৃতিরাজ্যে ত্রিগুণের পরস্পরের দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বির জন্য ভালমন্দ সুন্দরঅসুন্দর জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ প্রভৃতি যেসকল বিরোধ বৈপরীত্য দেখা যায়, সমষ্টিসত্তার মধ্যে সেসকলের কোন স্থান নাই, কারণ সমষ্টিসত্তা ত্রিগুণাতীত—এই ভাবটি সকল দেবতারই ভিতরকার ভাব। শিব প্রলয়কারী ভীষণ রুদ্র দেবতা—কিন্তু তিনিই মঙ্গল—সকল বাহ্য প্রাকৃতিক অমঙ্গলের অন্তরতর স্থানে যে মঙ্গল রহিয়াছে, সেই মঙ্গল তিনি। কালী করালী- সংহারপ্রলয়কারিণী মহাশক্তি—অথচ তিনিই বিশ্বমাতা—প্রাকৃতিক সমস্ত ভীষণতার অন্তরতর স্থানে একটি পূর্ণ প্রেম ও মঙ্গলের ভাব নিত্য বিরাজিত—তাহাই কালীর যথার্থ স্বরূপ।

হ্যাভেল বলেন ত্রিমূর্ত্তির যেসকল স্থাপত্য পাওয়া যায় তাহা হইতে স্পষ্টতই মনে হয় যে হিমালয়ের অনেক দৃশ্যের অভিব্যঞ্জনা ঐসকল তত্ত্বকে রূপ দান করিবার কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে। খুব সম্ভব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এ তিনই সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রূপ। ব্রহ্মা উদয়কালীন সূর্য্য—যখন ভুবনকমল মুকুলিত হইতেছে; বিষ্ণু মধ্যাহ্ন রবি—শেষ নাগের উপরে অনন্ত বিশ্বসমুদ্রের উপরে নিদ্রিত—শেষ নাগ অনন্তকালের চিহ্ন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া আছে; এবং মহেশ্বর অস্তকালীন ভানু এবং সেই জন্যই শশিমৌলি—কারণ সূর্য্য অস্তগমন করিলে অন্ধকার-অসুরগণকে দলন করিবার নিমিত্ত তিনি চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এইসকল দেবমূর্ত্তির যোগ কিছুমাত্র অসম্ভব নহে; কারণ ভারতবর্ষের সমস্ত ধ্যান ধারণা উপাসনা বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাবকে সর্ব্বত্রই স্বীকার করিয়াছে। এমনকি আমার মনে হয় গায়ত্রী মন্ত্রও আদিম সৌরোপাসনার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে—যে জন্য ত্রিসন্ধ্যা তাহাকে ধ্যান করিবার নির্দ্দেশ সকল আর্য্য সন্তানের সম্বন্ধেই বর্ত্তমান। স্মরণাতীত কাল হইতে প্রভাতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত এদেশে ধ্যানের প্রশস্ত কাল বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে, সেই সময় প্রত্যহই অন্ধকারের গর্ভ হইতে বিশ্বপদ্ম উন্মীলিত হয়—প্রত্যহের সেই নবীন সৃষ্টির মধ্যে সেইজন্য শিল্পী ব্রহ্মার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছে। লিডেন মিউজিয়মে জবদ্বীপ হইতে ব্রহ্মামূর্ত্তি আনীত হইয়াছে। আমাদের দেশে জল হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বিশ্বাস আছে, তাই ব্রহ্মার বাহনও হংস—মানসসরোবরবাসী। এই হেতু হিমালয়ের মধ্যে এই আর্টের প্রেরণা জাগিয়াছিল, হ্যাভেল এই অনুমান করিতেছেন।

তারপর বিষ্ণুমূর্ত্তি—বর্ণ গভীর নীল—হিমালয়ের মধ্যাহ্ন আকাশের মত। ঋজুস্তম্ভের মতন মূর্ত্তি, কারণ তিনি সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার বাহন গরুড়—দিগন্ত-বিস্তৃত পক্ষ মেলিয়া দিয়া নিস্পন্দ নিশ্চল হইয়া আছে। হিমাচলের পক্ষবিস্তারকারী নীল পর্ব্বতমালার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র দশদিকে বিকীর্ণ সূর্য্যরশ্মির সঙ্গে তুলনীয়।

তারপর শিব—প্রলয়-দেবতা। হিমালয়ের প্রচণ্ড ঝটিকা, দাবানল, ভূমিকম্প, শৈলস্খলন প্রভৃতি এই রুদ্র দেবতাকে হয় ত সৃষ্টি করিয়া থাকিবে; অথচ এ-সমস্ত দুর্য্যোগ বিপদ্‌পাতসত্ত্বেও হিমাচলের উত্তুঙ্গ অভ্রভেদী মহিমা যেমন অক্ষুণ্ণ অপরিম্লান, প্রভাতে সূর্য্যালোকে মেঘনির্মুক্ত ধ্যাননিমগ্ন তাহার নীলকণ্ঠ যেমন আশ্চর্য্য—সায়াহ্নে অন্ধকারজটাজূটগহন জটিলতার উপর চন্দ্রকলার নির্ম্মল কিরণধারা যেমন মনোরম—এই প্রলয়ঙ্কর ভীষণ দেবতার অন্তরতর স্থানে তেমনি একটি নিশ্চলগম্ভীর ধ্যানমৌন মহিমা বিরাজ করিতেছে।

কালিদাসও মেঘদূতে কৈলাসবর্ণনায় সেই কথা লিখিয়াছেন:—

শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্যস্থিতঃ খং
রাশীভূত প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥

কৈলাসপর্ব্বত কুমুদবিশদতা ও শৃঙ্গের উত্তুঙ্গতার দ্বারা আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া প্রতিদিন ত্র্যম্বকের রাশীভূত অট্টহাস্যের ন্যায় স্থিত হইয়া আছে। কালিদাসের এই শ্লোকটি হিমালয়ের সঙ্গে শিবের সারূপ্য ঘোষণা করে। হিমালয়ের তুষারজটা হইতেই গঙ্গা প্রভৃতির ধারা বিনির্গত হইয়াছে, শিবের জটা হইতে গঙ্গা নিঃসৃত হইবার পুরাণ-কথাও সর্ব্বজনবিদিত।

হ্যাভেল ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতাকেই হিমালয়ের দেবতা বলিলেও বাস্তবিকই একা শিব ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে হিমালয়ের ভাবসঙ্গতি বড় দেখা যায় না। ব্রহ্মার হংস বা বিষ্ণুর নীলবর্ণ তাঁহাদিগকে হিমালয়ের সঙ্গে যুক্ত করিবার যথেষ্ট কারণ নহে। অবশ্য শিব যে স্পষ্টতই হিমালয়ের দেবতা সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।

এই ত্রিমূর্ত্তির সম্মিলিত চিত্র এলিফ্যাণ্টা গুহায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি ইহা বিরল। তাহার কারণ এই যে ভারতবর্ষে বিষ্ণু ও শিব এই দুই দেবতা ব্রহ্মাকে সরাইয়া দিয়া পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের পূজক ভাগ করিয়া লইয়াছেন। বিষ্ণুর ভাগে পড়িয়াছে উত্তর ভারতবর্ষ যেখানে অধিকাংশ বৈষ্ণবসম্প্রদায় দেখা যায়, শিবের ভাগে পড়িয়াছে দাক্ষিণাত্য যেখানে শৈবসম্প্রদায়ের লোক বেশি।

অথচ বিষ্ণু ও শিব প্রত্যেকেই তাঁহাদের নিজের নিজের উপাসকের নিকটে ত্রিমূর্ত্তি একাধারে। বিষ্ণু যুগে যুগে অভিব্যক্তির নানা পর্য্যায়ে অবতীর্ণ হইয়া ধরণীকে রক্ষা ও পালন করিয়াছেন। এলোরার ভাস্কর্য্যে বিষ্ণুর সেই দশাবতারের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুর গোপবেশী মূর্ত্তিই কৃষ্ণমূর্ত্তি।

এলিফ্যাণ্টাতে এলোরাতে শিবের তাণ্ডব নৃত্যের মূর্ত্তি আছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু সেইরূপ মূর্ত্তি চিত্রিত করাতে অনেকের নিকটে ব্যঙ্গভাজন হইয়াছেন। ভগবানের যে বিরাট আনন্দ হইতে সমস্ত জন্ম লইতেছে, স্থিতি করিতেছে, এবং যাঁহার আনন্দে সমস্ত বিলীন হইতেছে, তাঁহার সেই বিরাট্ আনন্দে তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার হাতে ডিমি ডিমি ডমরু বাজিতেছে—সেই ডমরুর ধ্বনি এই চরাচর জীবনের যে একটি অশ্রুত স্পন্দন, যাহা অনাদিকাল আকাশে ক্রন্দন করিতেছে, যে জন্য বৈদিক ঋষি আকাশকে ক্রন্দসী রোদসী বলিয়াছেন—এত বড় একটা মহাশ্চর্য্য মহাগম্ভীর ভাব কি অনায়াস অবলীলার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় শিল্পী কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে!

ভারতশিল্পে এই ত্রিমূর্ত্তির ভাস্কর্য্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষের আদর্শকে দৈবভাবে পূর্ণ করিয়া কিরূপে ধ্যান করা হইয়াছে তাহা আমরা দেখিলাম। দেখা গেল যে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই এ ভাবটি এদেশীয় শিল্পী লাভ করিয়াছে। এখন শ্রেষ্ঠ নারীর আদর্শকে কোন্ দৈবভাবে পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই শিল্প-সাধনার পূর্ণাঙ্গ দেখা হয় না কি?

ত্রিমূর্ত্তির প্রত্যেকটিরই একএকটি স্ত্রীজুড়ি রহিয়াছে। ব্রহ্মার পাশাপাশি সরস্বতী, বিষ্ণুর পাশাপাশি লক্ষ্মী, মহেশ্বরের পাশাপাশি গৌরী। সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ও সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী রহিয়াছেন—তেমনি যিনি পালনকর্ত্তা তাঁহার স্ত্রীরূপ লক্ষ্মী, সকল সমৃদ্ধি ও সম্পদ্, এবং যিনি প্রলয়কর্ত্তা তাঁহার স্ত্রীরূপ মহাশক্তি, কালী ও দুর্গা।

বৌদ্ধযুগে যখন বুদ্ধ দেবতারূপে পূজিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন তখনও স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি বৌদ্ধশিল্পে স্বাভাবিক ও সাধারণই রহিয়া গিয়াছে—তাহাতে কোন আইডিয়া দেওয়া হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে যখন ভিক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুণীরা নির্ব্বাণপদকামিনী হইলেন, তখন তাঁহাদের সমাজবন্ধন ও লোকাচার খসিয়া গেল। তথাপি তাঁহারা খৃষ্টীয়ধর্ম্মের কুমারী তাপসীগণের ন্যায় আজন্ম কৌমার্য্য রক্ষা করিলেও তাঁহাদিগকে কোন শিল্পী আপনার ধ্যানের বিষয় করিয়া তুলিল না।

সুতরাং বৌদ্ধযুগে এই ভিক্ষুণীর আদর্শ থাকা সত্ত্বেও তখন এবং তাহার পরে সকল কাব্যে ও শিল্পে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য নিতান্ত স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবেই চিত্রিত হইয়া চলিল।

তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্ববিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ

শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

এই বর্ণনাই প্রাচীন সাহিত্যে শিল্পে স্ত্রীমূর্ত্তির চরম আদর্শ। কিন্তু এই যে বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, এই যে ভোগের চিত্র, ভারতবর্ষ কখনই এইখানে থামিয়া যাইতে পারে নাই—যে সৌন্দর্য্য তপস্যার দ্বারা পূত নির্ম্মল অন্তরতর সৌন্দর্য্য নহে তাহা কখনই ভারতবর্ষীয় চিত্তকে চিরদিনের মত ভুলাইতে পারে না।

সেই জন্যই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে নারীর আদর্শের যে একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় তাহা যে-কোন সাহিত্যে দুর্লভ। কবি কালিদাস পার্ব্বতীকে বাহ্য-সৌন্দর্য্যের সমস্ত আয়োজনের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া আঁকিয়াছেন—অকাল-বসন্তকে ডাকিয়া আনিয়া যদি কোথাও কিছু অভাব থাকে তাহাও পূরণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যকে সহায় করিয়া কাম যখন অনুত্তরঙ্গ নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ধ্যানমগ্ন যোগীশ্বরের ধ্যানভঙ্গ করিতে উদ্যত হইল, তখন তাঁহার অধ্যাত্মনেত্রের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কামকে এক নিমেষে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। তখন গৌরী তাঁহার রূপকে নিন্দা করিয়া তপস্যায় নিরত হইলেন, অগ্নিতপা হইয়া অপর্ণা হইয়া আপনার বাহ্যরূপকে দগ্ধ করিয়া যখন তাঁহার আত্মার নির্ম্মলতর রূপ জাগিল, তখনই ছদ্মবেশী মহাদেব আসিয়া তাঁহার মন পরীক্ষা করিয়া তাঁহার কাছে ধরা দিলেন। এত বড় আশ্চর্য্য স্ত্রীসৌন্দর্য্য কোন্ কবির হাতে কোন্ শিল্পীর হাতে এমন নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে?

পার্ব্বতীর এই তপোমূর্ত্তিই দাক্ষিণাত্যের অনেক মন্দিরে দেখা যায়।

আমি জানি কোনো কোনো পাঠকের মনে অনিবার্য্যরূপে এই প্রশ্ন উঠিবে যে আমাদের দেশে এই-সকল মূর্ত্তিপূজা হইতে যে ধর্ম্মের মধ্যে নানা বিকার উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কি বলিতে চাও? আর্টের দিক্ দিয়া এইসকল মূর্ত্তির সার্থকতার ব্যাখ্যা করিলে কি সেই বিকারকে মুখস পরাইয়া রাখা হইবে না?

ইহার উত্তর বর্ত্তমান প্রবন্ধে কখনই সম্পূর্ণরূপে দেওয়া যায় না, কারণ ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ। এখানে কেবল এই কথাই বলি যে আমি খুব মনে করি, যে, আমাদের দেশে শিল্পের সাধনার সঙ্গে যেখানে আধ্যাত্মিক সাধনাকে ঘোলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইখানেই এমন একটি অন্যায়কে আমরা স্থান দিয়াছি যাহা শিল্প এবং ধর্ম্ম উভয়েরই প্রাণঘাতী। আমাদের দেশের শিল্প অধ্যাত্ম-সাধনা হইতে প্রাণ পাইয়াছে ইহা হ্যাভেল্ পুনঃপুনঃ প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এবং বিশেষভাবে আর একজন শিল্পরসজ্ঞ কুমারস্বামী মহোদয় এই কথাও যেন বলিতে চান্ যে ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনাও খুব একটি উচ্চশিখরে অধিরোহণ করিয়াছে—কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। কালীকে আদ্যাশক্তির রূপক ও শিবকে প্রলয়কারী মহাশক্তি ও মঙ্গলের আধার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেসকল লৌকিক কাহিনীর ও আচারের বীভৎসতা আছে, তাহার চিত্র কি করিয়া অন্তর্হিত করিবে? বস্তুত যেখানে শিল্পী ধ্যানের দ্বারা একটি বড় বিশ্বতত্ত্বকে মূর্ত্তিতে পরিকল্পনা করিয়াছে, সেখানে তাহা বিশুদ্ধশিল্পহিসাবে অসামান্য এবং চিরকাল মানুষ তাহাকে বিস্ময়বিমুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিবে এবং আদর করিবে—কারণ একটি পরমসত্য তাহার মধ্যে নিত্যরূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু যখনই মনে করা হইয়াছে যে শিল্পের বিষয় পূজার বিষয়, তখনই যাহা ভাব তাহা বিকৃত হইয়া দূষিত হইয়া আপনাকে আপনি নষ্ট করিয়াছে—এ বিষয়ে সন্দেহ কি হইতে পারে? শ্রেষ্ঠ শিল্প, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান—এসমস্তই ধর্ম্মসাধনার পক্ষে সহায়—কারণ অধ্যাত্মবোধ তো একটি শূন্যতার বোধ নয়—সে সকল খণ্ড-বোধকে একটি অখণ্ড আনন্দবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দেয় মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া কি কোন খণ্ড বোধ সেই পরিপূর্ণ আনন্দবোধের সমান হইতে পারে—কাহাকে দিয়াও কি তাহার অভাব পূরণ হয়? শেক্‌সপীয়র পড়িয়া মানবচরিত্রের নানা দুর্ভেদ্য জটিল রহস্য সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি খুলিয়া যায় বলিয়া মনুষ্যপ্রকৃতিকে উদার বিস্তৃত ভাবে আমি দেখিতে সক্ষম হই। এ বেশ কথা, আমার ধর্ম্মবোধকে ইহা বাড়াইয়া দেয় বই কমায় না—কিন্তু যদি আমার এমন দুর্ম্মতি ঘটে যে আমি শেক্‌সপীয়রের গ্রন্থকে তেল সিঁদুর মাখাইয়া বিবিধ

উপচারে প্রত্যহ পূজা করিতে বসিয়া যাই, তবে তাহা কি শেক্‌সপীয়রের দোষ হইবে?

শিল্পকে শিল্পহিসাবেই দেখ, তাহাকে মূঢ়ের মত পূজার বিষয় করিয়া তুলিয়ো না। নিকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে মূর্ত্তির সাহায্যে অনন্তস্বরূপ ভগবানকে ধ্যান করিবার সুবিধা হয়, এসকল ফাঁকিবাজির দ্বারা মানুষকে অমানুষ করিয়া তোলা হয় মাত্র। আর এই উপায়ে ধর্ম্মই যদি যায়, তবে শিল্প কোথা হইতে প্রাণ পাইবে? সেই জন্যই বহুকাল পর্য্যন্ত সমস্ত শিল্পসাহিত্য এদেশে তেমন একটি বৃহৎ বিশ্বরূপ লাভ করে নাই যাহা নিখিলমানবের সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া উল্টা ভ্রমেও যেন না পড়ি! একথা যেন না বলি, যে, এইসকল শিল্প আমাদের দেশের অনিষ্ট করিয়াছে, অতএব ইহারা বর্জ্জনীয়। ইউরোপে মধ্যযুগের আর্টের মর্য্যাদা এখন কেহ দেয় না, কিন্তু আর্টগ্যালারিতে, কত গির্জ্জার দেয়ালে দেয়ালে তাহারা চিরকাল ধরিয়া স্থান পাইয়া গিয়াছে—যদি কোন দিন আবার এখনকার আর্ট তাহার বিলাস ও সৌখীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন কালের সকল বিরুদ্ধ বিচিত্রশক্তির এক আশ্চর্য্য মিলনসেতু রূপে এক মহাধর্ম্মকে চায়, তখন সকল যুগের শ্রেষ্ঠ আর্টকে যে ডাক পড়িবেই। তেম্‌নি ভারতবর্ষে যে মহাযুগে বৌদ্ধধর্ম্ম কতগুলি শুষ্ক নীতি ও আচার ছাড়াইয়া এক মহাভক্তিধর্ম্মে পরিণত হইল, যে যুগে কবি কালিদাস পৌরাণিক আদর্শকে তাঁহার অমর কাব্যসকলে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিলেন, এলিফ্যাণ্টা-ইলোরার ভাস্করগণ পাথরের মধ্য হইতে উত্তুঙ্গ-হিমাচলগিরিবিহারী দেবতাদিগের মূর্ত্তি কর্ত্তিত করিয়া বাহির করিল, সেই বিরাট্ যুগ কি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ভবিষ্যৎ বৃহৎ বিকাশের দিনে কোন কাজেই লাগিবে না? আমাদের দেশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যেসকল আশ্চর্য্য কাব্য, আশ্চর্য্য শিল্প, গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব, সাধনার নিগূঢ় রহস্য, সৃষ্ট হইয়াছে, চিন্তিত হইয়াছে, আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহারা কি এদেশের ভবিষ্যৎ জীবনের আয়োজনের মধ্যে কোথাও স্থান পাইবে না—কেবল বাহিরের এইসকল ফেনবুদ্‌বুদ, বিদেশের অন্ধ অনুকরণ—ইহাদের মধ্যে কি আমাদের সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তা নিশ্চিন্তভাবে পর্য্যবসিত হইবে? আমরা যদি মূঢ় হই, অন্ধ হই, তথাপি বিদেশীর চক্ষে ভারতবর্ষের যে একটি গৌরবের চিত্র জাগিতেছে—তাহা নিশ্চয়ই সত্য—বাহির হইতে সেই সত্য-দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টিকে খুলিয়া দিক্!

কোন্ বাণী ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে বড় বাণী? তাহা এই যে, সমস্ত যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারি প্রাণে কম্পিত হইতেছে—তাঁহারি আনন্দের মধ্যে রহিয়াছে। সেই আনন্দকে যিনি জানেন তিনি আর কিছু হইতেই ভয় প্রাপ্ত হন্ না। তিনি সকলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন।

বিদেশীই আজ এই কথা বলিতেছে যে আর কোন দেশের কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে মানুষের জীবনের এমন একান্ত সহচর, সঙ্গী, বন্ধু করিয়া তোলা হয় নাই যেমন রামায়ণ-মহাভারতে কালিদাস ভবভূতির কাব্যে হইয়াছে। 'তপোবন' প্রবন্ধে 'শকুন্তলার' সমালোচনায় কবি রবীন্দ্রনাথও সেই একই কথা বলিয়াছেন। সেই তপোবনের সর্ব্বানুভূতি যদি বাস্তবিকই ভারতবর্ষের চিত্তের পক্ষে অত্যন্ত সত্য জিনিস না হইত, তবে এ দেশীয় সাহিত্যে তাহার এমন সুস্পষ্ট সুদৃঢ় নিদর্শন কি এমন করিয়া পাওয়া যাইত?

সাঞ্চীর অমরাবতীর চিত্রাবলীতে যে বোধিদ্রুমতলে ভগবান বুদ্ধ উপবেশন করিয়াছিলেন, তথায় বন্যকরীরা পর্য্যন্ত অর্ঘ্য বহন করিয়া আসিতেছে, বনের পশুরা মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বুদ্ধের পদচিহ্ন, বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রকে বন্দনা করিতেছে—এ চিত্র কি কোন দেশের চিত্রশালাতে দেখা যায়? এই যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া আছে মানুষ—সে যে বিচ্ছিন্ন নয় স্বতন্ত্র নয়—এই অনুভূতিই কি ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে বড় অনুভূতি নয়? ভারতবর্ষীয় শিল্পী তাই তাহার চিত্রের মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক রাখেনা, সমস্ত চরাচরকে সে নিমন্ত্রণ করিয়া টানিয়া আনে—আর ইউরোপীয় চিত্রকরকে আরসমস্ত খাটো করিয়া ছোট করিয়া মানুষের মাহাত্ম্যকে বড় করিয়া তুলিতে হয়। বিচিত্রতার মধ্যে ঐক্যকে সুস্পষ্ট ধ্রুবরূপে দেখাইয়া দেওয়াই এ দেশীয় শিল্পীর প্রধান কাজ। কিন্তু ভারতের শিল্পলক্ষ্মীকে বলা যাইতে পারে—

শুনে তোমার মুখের বাণী
আসবে ঘিরে বনের প্রাণী

তবু হয়ত তোমার আপন ঘরে—
পাষাণ হিয়া গল্‌বেনা।

তাই সকলের চেয়ে মজা এই যে ইউরোপীয়গণের মধ্যে যে মূঢ় এই ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ লাভ না করিয়া গান্ধারশিল্পকে স্তুতিবাদ করে, কিম্বা মোগলদের শিল্পকীর্ত্তিকে গৌরবজনক বলিয়া কীর্ত্তন করে, পাষাণ-হিয়া তাহাদেরি চশ্‌মা পরিয়া নিজের দেশকে দেখিবার ও বিচার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। অথচ ফর্গুসন্ প্রভৃতির মনেও আসে নাই যে মোগলকীর্ত্তির বারো আনা প্রশংসাই হিন্দু শিল্পীর প্রাপ্য। আকবর হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মিলনসাধনের জন্য যে উদ্যোগী ছিলেন, তাহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য যেমনি থাক্—যে ব্যক্তি একবার তাঁহার ফতেপুর শিক্রিতে গিয়াছে সেই বুঝিয়াছে হিন্দুভাব সেই সম্রাটের চিত্তকে কতদূর অধিকার করিয়াছিল। ফতেপুর শিক্রির প্রায় সমস্তটাতেই হিন্দু শিল্পীর হাত, জাহাঙ্গীরের আগ্রার প্রাসাদেও তাই। আবুল ফজ্‌ল্ লিখিয়াছেন "হিন্দুদের চিত্র আমাদের ধারণাকে অতিক্রম করিয়া যায়, সমস্ত জগতে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত।" তাজমহল —যাহা জগতের বিস্ময়—সেই 'নন্দনের ফুলরাশি'কে কে সৌন্দর্য্যস্বপ্নলোক হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে? হিন্দু শিল্পী। মুসলমান তো কেবল ভারতবর্ষেই আসে নাই—আরবে, পারস্যে, ঈজিপ্টে কোথায় মুসলমানের শিল্প ভারতবর্ষের মত এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে?

এইবার উপসংহারে একটা বড় প্রশ্ন আমাদের আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার আছে! যে আর্ট এক সময়ে ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া এমন আশ্চর্য্য সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, সে কি এখন সেইদিক্ দিয়াই পুনর্ব্বার জাগিতে পারিবে? ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও কি নূতন রাস্তা লইতে হইবেনা?

ভবিষ্যতের কথা আমি জানিনা—কোন্ পথ ধরিয়া আর্ট এদেশে আপনাকে সার্থক করিবে তাহাও বলিবার অধিকার আমার নাই।

তবে এটুকু নির্ভয়ে বলিতে পারি যে যতই আমাদের দেশ কি, তাহার ইতিহাস কি, তাহার ধর্ম্ম কি, সমাজতত্ত্ব কি, তাহার সৌন্দর্য্যরচনা কিরূপ তাহা আমরা সকল দিক্ দিয়া আবিষ্কার করিব—ততই অন্যান্য সকল সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসাধনাও এদেশে প্রাণ পাইবে। আজ যেটুকু শিল্পসাধনার ঢেউ বাংলাদেশে উঠিয়াছে তাহা সেই কারণেই উঠিয়াছে—কিন্তু এখনও তাহাকে বহুদিন ধরিয়া নিজেকে চিনিতে হইবে এবং তারপর কালের উপযোগী করিয়া আপনার শিল্পকে সৃষ্টি করিতে হইবে। ভাবী মানবের শিল্প, কি এদেশে, কি ইউরোপে, একটি বড় বিশ্বগ্রাসী, সর্ব্বতোমুখী আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে যুক্ত হইবার অপেক্ষায় আছে—সেই বোধের দ্বারা সমস্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—তখনি প্রাচীনে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার ভিতরের ভাবটিকে গ্রহণ করিয়া তাহার বাহিরের রূপটির নকল করিবার কোন প্রয়োজন হইবেনা—তখন যাহাই আঁকা যাইবে তাহার মধ্যে বিশ্বমানবের অখণ্ডরূপের একটি ছায়া পড়িবে—তখন বিশ্বজগতের কাছে আমাদের লজ্জা দূর হইবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

দিদি

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

একএকজন মানুষের স্বভাব বড় অদ্ভুত-ধরণের হয়। ভুল বা জেদের বশে একটা কার্য্য একেবারে করিয়া ফেলিয়া যখন সে তাহার অনুশোচনা বা গ্লানি ভোগ করিতে আরম্ভ করে তখন তাহাকে দেখিলে আর কাহারও মনে এ বিশ্বাস স্থান পায় না যে এ ব্যক্তি আর কখনও উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে বা নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে পারিবে। সে এমনি ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই লোকই যখন বিপরীত দিক্ হইতে আবার একটা ধাক্কা খায় তখন এমনি সবেগে একনিষ্ঠ হইয়া যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যায় যে দর্শকেরা অবাক হইয়া ভাবে এই কি সেই ব্যক্তি!

অমরনাথও সবেগে সতেজে দেড় বৎসর অতীত হইতে না হইতে তাহার মেডিকেল কলেজের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাসেতু অতিক্রম করিয়া কর্ম্মিষ্ঠ ও কৃতী লোকদিগের আসন-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। বাকী এখন তাহার শিক্ষা-উত্তীর্ণ জীবনকে কর্ম্মে সংযোগ করা।

চারু এখনো সেইরূপই আছে। তেমনি সরল, তেমনি অনভিজ্ঞ, তেমনি নির্ভরশীল। তাহাকে একহস্তে বক্ষের নিকটে ধরিয়া রাখিয়া অমরনাথ দ্বিতীয় হস্তে দৃঢ় একাগ্রতা সহকারে নিজেকে ও তাহাকে সংসার-নদীর কূলের নিকটে টানিয়া আনিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল।

ইতিমধ্যে অমরনাথ ও চারুর এক নূতন আত্মীয় জুটিয়াছিল; তাহার নাম তারিণীচরণ, সে চারুর পিস্তুতো ভাই। সে এই সংসার-অনভিজ্ঞ দম্পতির মাঝখানে আসিয়া পড়াতে একদিকে চারু তাহার তারিণী দাদার সাহায্য পাইয়া সংসারকর্ম্মে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছিল, অপর দিকে অমরনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের লেখাপড়ায় মন দিবার অবকাশ পাইয়াছিল।

সত্যের অনুরোধে ইহা বলিতে হইবে যে তারিণীচরণ অমরকে বাস্তবিকই বহু সাহায্য করিয়াছিল। চারু ও সমস্ত সংসারের ভার নিজে লইয়া সে অমরনাথকে শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছিল। তারিণীচরণের সুনিয়মিত ব্যবস্থায় অমরনাথ ও চারু এতদিন কোনও অভাব জানিতে পারে নাই। এই নিঃস্বার্থ বন্ধুতার জন্য অমরনাথ তাহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং তাহার অনেক খুঁটিনাটি দোষ সত্ত্বেও তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসে ও বিশ্বাস করে। আর চারু তো তাহাকে পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল, নহিলে অমরনাথের কলেজ ও পাঠের সময় সে যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় কিরূপে কাটাইত, তাহা চারু ভাবিতেও পারে না।

মাঘ মাস গত হইয়া সবে ফাল্গুন তাহার চঞ্চল অঞ্চলটিকে নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল ও বকুল-সৌরভে পূর্ণ করিয়া সেই নিভৃত কাননের মধ্যে পুষ্পিত অশোক ও পলাশ বৃক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া আসন পাতিতেছিল। স্নিগ্ধ বাতাস সদ্যপ্রস্ফুটিত বেলার কোমল গন্ধটি বহিয়া তখনো সমস্ত কাননে বসন্তের আগমনসংবাদ জানাইয়া উঠিতে পারে নাই। গোলাপের আরক্ত কপোল তখনো ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন, অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কপোলে অনিলের সুধাস্পর্শজনিত ঈষৎ সরমসঙ্কোচাভাস সবে মাত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। মৌমাছির দলে গুঞ্জনধ্বনির বিরাম নাই; মুকুলিত আম্রশাখা তাহাদের ভরে ঈষৎ অবনত, মধ্যে মধ্যে বৃন্তচ্যুত মুকুলগুলি ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বৃক্ষতলে খসিয়া পড়িতেছে। সেদিন একটু বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছিল। বহুকাল অনাবৃষ্টির পরে ঈষৎবারিসিক্ত ধরণী হইতে একটা মধুর গন্ধ উঠিয়া গবাক্ষতল ভরিয়া দিতেছিল। পলাশগাছে শরীর লুকাইয়া বসন্তের চাটুকার অনর্থক ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙিতেছিল। তথাপি তাহার সঙ্গিনী তাহাকে কিছুমাত্র সাড়া দিতেছে না। 'কু-উ'! গবাক্ষপথ হইতে একটা কোমল তরুণ কণ্ঠ তাহাকে ভেঙাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানি মধুর তরুণ-মুখ গবাক্ষে দৃষ্ট হইল। কালো কোকিলটা তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া পূর্ব্বমত ডাকিল 'কু-উ'। আবার সেই কচি মুখখানির আরক্ত পেলব অধর দুখানি মধুর হাস্যে স্ফুরিত হইয়া শব্দ করিল 'কু-উ'। কোকিলটার রাগ চড়িয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ স্বরও উচ্চে উঠিতে লাগিল। তাহার গলায় যতটা উচ্চ সপ্তক পৌছে ততটা উচ্চ সুর তুলিয়াও দুর্ব্বৃত্ত মনুষ্যকে আঁটিতে না পারিয়া বেচারা কোকিল শেষে থামিয়া গেল।

পশ্চাত হইতে অমর আসিয়া দুই হাতে চারুর গাল টিপিয়া ধরিয়া সহাস্য মুখে বলিল "কোকিলটাকে খেপিয়ে তুল্লে যে? একে তো ওর প্রিয়া এখনো সাড়াই দিচ্চেনা তার ওপর এই অত্যাচার?"

চারু মুখ ছাড়াইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "তা সেই থেকে অমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মরছে কেন? এখন তো থাম্‌তে হ'ল?"

"তা চেঁচালেই বা তোমার তাতে কি? ও তো তোমায় কুঞ্জতলে একাকিনী বিরহমলিনা দেখে স্মরস্বরূপ সুতীক্ষ্ণ শরে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ কচ্চে না বা তুমি দ্বিজুরায়ের বিরহিনীও নও যে 'কান্ত বিনে ও পাখীর স্বরে তোমার জীবনটা ঠেকছে ফাঁকা ফাঁকা'? তবে এত রাগ কিসের?"

"কি অতগুলো বল্লে আমি কিছু বুঝ্‌তেই পার্‌লাম না। কিন্তু ও পাখীটে ভারী পাজী। তোমার সেই গানটা আমি কতকষ্টে মুখস্থ ক'রে মনে মনে বল্‌তে যাচ্ছি,

লক্ষ্মীছাড়া পাখীটে একশবারই কানের কাছে চেঁচিয়ে মরছে।"

"সখী ভয় নেই ভয় নেই ও পাখীটে বার' মেসে নয়, এই কটা মাস সহ্য কর, তারপরে বর্ষা এলেই ও চুপ করবে, বার' মেসে হলেও বা দ্বিজুরায়ের মতে বাঁচাটা একটু মুস্কিল হ'তো।"

"মুস্কিল সত্যি। কোকিলকে ভেঙালে চোক্ ওঠে। যাঃ কি কর্‌লাম্!"

অমরনাথ তাহাকে টানিয়া লইয়া একখানা কৌচের উপরে বসাইয়া নিজে তাহার নিকটে বসিয়া বলিল "কোন্ গানটা মুখস্থ কচ্ছিলে?"

"সেই যে তুমি গাও,—সেই 'নিশি নিশি কত রচিব শয়ন' সেইটে।"

"ওটা আমার বল্লে এখুনি শ্রোতারা লাঠি নিয়ে আমায় তাড়া ক'রে আস্‌বে।"

"আচ্ছা ও গানটার ওপরে 'বিরহ' লেখা কেন? বিরহ কাকে বলে?"

"সেটাও জাননা? হা হতোস্মি! সত্যি জাননা?"

চারু বুঝিল এটা না জানা তাহার পক্ষে অতি লজ্জার কথা। সঙ্কোচে ও লজ্জায় লাল হইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল "জানিনা তো। বল' না কাকে বলে?"

"বিরহ কাকে বলে? এই—এই ধর আমি না থাক্‌লে তোমার মন-কেমন করে না?"

"করে না? করে। তাই কি?"

"সেই মন-কেমন-করার নাম বিরহ।"

"তাই বুঝি?" বলিয়া চারু গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ ভাবিয়া শেষে বলিল "তবে তো বিরহ বড় খারাপ।"

"খারাপ কিসে? ঐ বিরহ নিয়েই বলে আমাদের কাব্য ও সাহিত্যজগতের অর্দ্ধেক পুষ্টি। আমাদের কেন সমস্ত সভ্য জগতেরও। ভালবাসা পরিস্ফুট বিরহেই। যাক্ যা তুমি বুঝ্‌বে তাই বলি—দেখনা রাধাকৃষ্ণের বিরহের গানগুলি যত মিষ্টি অন্যগুলি কি তাই? বিরহ অর্থাৎ কৃষ্ণ যখন রাধাকে ছেড়ে মথুরায় ছিলেন?"

চারু অনেক ভাবিল। শেষে সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল "তা হোক্ গো, তা বলে বিরহ কক্‌খোনো ভাল না। আমি ও গানটা আর শিখবনা।"

অমরনাথ হাসি মানিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—"তবে আর একটা গান গাই শোন।"

'বল' বলিয়া চারু প্রফুল্ল ভাবে নিজেকে টানিয়া লইয়া বলিল "হার্ম্মোনিয়মটার কাছে গিয়ে ব'স, তাহ'লে আরও মিষ্টি লাগবে।"

'আচ্ছা' বলিয়া অমরনাথ হার্ম্মোনিয়মের সম্মুখে চেয়ার টানিয়া লইয়া দুই হস্তে বাজাইতে আরম্ভ করিল। শেষে গান ধরিল—

"মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখী! সখি জাগো, জাগো!
মেলি রাগ-অলস আঁখি, সখি জাগো জাগো!"

গান চলিতে লাগিল। চারু নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিল। সে কিছু না জানিলেও অমরনাথের প্রেমপূর্ণ স্বর ও স্নিগ্ধ অনুরাগপূর্ণ চক্ষু তাহাকে অনেক কথা বুঝাইয়া দিতেছিল। অমরনাথ সেই প্রথম-মিলনের কিছুদিন মাত্র তাহার সঙ্গে এমনি ভাবে হাসি খুসী গল্প আমোদ করিয়াছিল, তাহাতেও মধ্যে মধ্যে বিষাদের ছায়া পড়িত; তারপরে এত দিন তো তাহার কর্ম্মব্যাপৃত নয়নের উপর দিয়া পৃথিবী তাহার সমস্ত ঋতু ও সকল মোহজাল সঙ্কুচিত করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে। সহসা কোন' রাত্রে শয্যাপার্শ্বে নিদ্রিতা চারুর কোমল মুখ তাহার কর্ম্মক্লান্ত চক্ষুর উপরে একটা সরল সস্নেহ সূক্ষ্ম মায়ার জাল ফেলিয়া দিত আবার প্রভাতের নবীন সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর কর্ত্তব্যের আহ্বানে সকল মোহ মুছিয়া ফেলিত। সে তখন দ্বিগুণ একাগ্রতার সহিত পুনরায় নিজ কর্ত্তব্যে নিবিষ্ট হইত।

এখন কার্য্য শেষ হইয়াছে। মধুর বসন্তের সঙ্গে মধুর প্রেম এখন নব অনুরাগে তাহার 'যৌবননিকুঞ্জ'কে সুশোভিত করিতেছে। তাহা এখন সুখের বংশীস্বরে ও কল্পনাকোকিলের কুহু রবে মুখরিত। "বকুল যূথী জাতি" ফুলের সৌরভবাহী দক্ষিণপবন ফাল্গুনগুণগীতে ও বাসন্তীচন্দ্রের চঞ্চল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। তাহা প্রথম-মিলনের মতই আনন্দময় আবেশময় চাঞ্চল্যময়। তাই প্রেম, আকুল বাসনার সুখোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া

কম্পিতা ভীতা প্রিয়াকে জাগাইয়া তুলিতে চায়। নিজের বেদনা বাসনা আবেগ তাহাতে সঞ্চারিত করিয়া সুপ্তিমগ্না নবোঢ়া প্রণয়িনীকে বলে 'সখি জাগো, জাগো, জাগো'।

গান একবার দুইবার তিনবার গাওয়া হইয়া গেল তথাপি অমরনাথ গাহিয়া চলিয়াছে

"জাগো নবীন গৌরবে,
মৃদু বকুল-সৌরভে,
মৃদু মলয়-বীজনে
জাগো নিভৃত নির্জ্জনে!
জাগো আকুল ফুল-সাজে,
জাগো মৃদুকম্পিত লাজে,
মম হৃদয়-শয়ন মাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি—
সখি, জাগো, জাগো!"

এমন সময়ে দাসী আসিয়া একখানা পত্র কৌচের উপরে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। চারু হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া অমরনাথকে দিতে গিয়াই বিস্মিতভাবে পত্রের পানে চাহিয়া রহিল। অমরনাথ তাহার সুখোচ্ছ্বাস হইতে সদ্য জাগ্রত হইয়া হার্ম্মোনিয়মের একটা চাবী টিপিয়া ধরিয়া বেলো করিতে করিতে বলিল "কি?"

চারু বিস্মিত ক্ষীণ স্বরে বলিল "এ কার পত্র?"

"প'ড়ে দেখনা? আমার কি তারিণীর হ'বে।"

"না, তা নয়। এতে আমার নাম লেখা রয়েছে। আমায় কে পত্র লিখ্‌লে!"

হার্ম্মোনিয়ম থামাইয়া অমরনাথ কৌতূহলীভাবে হস্ত বিস্তার করিয়া বলিল "কই দেখি।"

চারু লেফাফাখানা স্বামীর হস্তে দিল। অমরনাথ পড়িল। সুন্দর পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"কল্যাণীয়া শ্রীমতী চারুলতা দাসী। কল্যাণীয়াসু!"

"তাই তো, কে লিখ্‌লে? আচ্ছা খুলেই পড়া যাক্‌না।" অমরনাথ লেফাফা ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিতেই চারু ব্যগ্রভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল "নামটা দেখনা আগে পড়ে, কে লিখ্‌লে, ঐ যে নাম লেখা রয়েছে—ওই যে—শ্রীসুরমা দাসী,—সুরমাদাসী কে?"

অমরনাথ চমকিত হইয়া বলিল "কই? কোথায়?"

"শ্রীসুরমা দাসী। ওপরে কি লেখা—মাণিকগঞ্জ।"—

অমরনাথকে বহুক্ষণ নীরব দেখিয়া চারু উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল "চুপ ক'রে রইলে যে? সুরমা দাসী—তিনি কে?—তুমি কি চেন?"

"তুমি কি চিন্‌তে পাচ্ছনা?"

"না। কে তিনি?"

"তিনি—তিনি—" বলিয়া অমরনাথ আর একবার পত্রের স্বাক্ষরটা দেখিয়া লইল। তারপর পত্রখানা চারুর হস্তে দিয়া বলিল "পত্রখানা তুমিই পড়, পড়্‌লে বোধ হয় বুঝ্‌তে পারবে।"

পত্র হস্তে লইয়া চারু শঙ্কিত মুখে বলিল "প'ড়ে যদি না বুঝতে পারি?"

"তখন বল্‌বো।"

"পড়তে ভাল পার্‌বনা হয়ত, তুমি পড়ে বলনা?"

"পারবে। লেখাতো বেশ পরিষ্কার। চেষ্টা ক'রে দেখ। তোমারই পড়া উচিত।"

চারু নীরবে হস্তস্থিত পত্র পড়িতে লাগিল। অমরনাথ কিছুক্ষণ অন্যমনা ভাবে নত মুখে বসিয়া থাকিয়া চারুর পানে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, চারুর উদ্বিগ্ন মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, কম্পিত হস্তে পত্রখানা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

অমরনাথ ব্যস্তভাবে নিকটে গিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল, "কি চারু কি?"

"প'ড়ে দ্যাখ, আমি হয়ত ভাল পড়্‌তে পারলাম না।"

অমরনাথ চমকিত ভাবে বলিল, "বাবা ভাল আছেন তো?"

"তাঁর খুব অসুখ হ'য়েছে প'ড়ে দেখ।"

অমরনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পত্রের প্রতি বর্ণের উপর চক্ষু বুলাইয়া গেল। সহসা পড়িতে যেন সাহস হইতেছে না। শেষে ঈষৎ চেষ্টায় পড়িল—

মাণিকগঞ্জ।

কল্যাণীয়া!

তুমি হয়ত আমাকে চিনিবে না। কিন্তু পত্র পড়িয়া তোমার স্বামীকে সব কথা বলিলে তোমরা আমাকে চিনিতে

পারিবে এবং উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারিবে। পিতাঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত। প্রায় এক বৎসর তাঁহার ব্যারাম আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার অবস্থা সংশয়াপন্ন। তিনি নিজে না লিখিতে পারায় অগত্যা আমি তোমাকে লিখিতেছি, তুমি তোমার স্বামীকে বলিবে পিতা অতিশয় পীড়িত। তিনি তোমাদের দেখিতে চান। তুমি ও তোমার স্বামী পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তোমরা বেশী উতলা হইবে না, তিনি অন্য দিন অপেক্ষা অল্প ভালই আছেন। তাঁহার জন্য কলিকাতা হইতে ভাল আঙুর ও বেদানা লইয়া আসিবে, এখানে ভাল পাওয়া যায় না। অধিক কি লিখিব। ইতি —

শ্রীসুরমা দাসী।

অমরনাথ স্তম্ভিতভাবে নীরবে বসিয়া রহিল। চারু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "কি পড়্‌লে?"

"বাবার অসুখ।"

চারু নীরবে রহিল। সহসা তাহাদের মৌনভাব ভঙ্গ করিয়া অমরনাথ ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল "শীগ্‌গির ঠিক হ'য়ে নাও চারু—বাড়ী যাব—বাবার অসুখ।"

"কি করব?"

"আ, কতকগুলো কাপড় চোপড় গুছিয়ে নাও। তারিণী—তারিণী।"

তারিণীচরণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "কি? এত ব্যস্ত কেন?"

"রাত্রের ট্রেনে বাড়ী যাব। দরকারী জিনিষগুলো গুছিয়ে ঠিক ক'রে ফেল তো।"

তারিণী বিস্মিতভাবে বলিল "হটাৎ বাড়ী! কেন কি হয়েছে?"

"বাবার অসুখ।"

"কর্ত্তার অসুখ! তা তিনি আপনাকে যেতে বলেছেন তো?"

অমরনাথ চটিয়া গেল। "কেন বল্‌বেন না? তাঁর অসুখ।"

"তাতো বুঝ্‌লাম। চটবেন না—কথাটা মন দিয়ে শুনুন,—তিনি আপনাকে মাপ কর্লেন এমন কিছু লিখেছেন?"

"মাপ কর্লেন"—বলিতে বলিতে অমরনাথ সহসা থামিয়া গেল। হঠাৎ তাহার বিগত জীবনের কথা মনে পড়িয়া গেল। সুরমার পত্র দেখিয়া বিস্মিত ভাবের মধ্যে পিতার গুরুতর পীড়ার সংবাদ এমন তন্ময় করিয়া দিয়াছিল যে অমরনাথ সব কথা ভুলিয়া গিয়া যেন পিতৃগতপ্রাণ বহুদিন-প্রবাসী সন্তানের মত পিতাকে দেখিতে ব্যাকুল ও তাঁহার ব্যারামের সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। তারিণী-চরণের এক কথায় এখন সব ঘটনা যেন চক্ষের সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। মনে পড়িল এখন পিতা ডাকিয়াছেন বা তাঁহার অসুখ হইয়াছে শুনিলেই তাহারা ছুটিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইবে এ অধিকার আর নাই। এখন অনেকগুলি প্রশ্নের জবাবদিহি করিয়া তবে তাহাকে নিজের কর্ত্তব্য নিজে স্থির করিতে হইবে। তারিণীর প্রশ্ন শত বৃশ্চিকের ন্যায় শত মুখ বিস্তৃত করিয়া তাহার ব্যাকুল প্রাণকে দংশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তিনি ক্ষমা করেছেন তো?" অমরনাথ ধীরে ধীরে ত্যক্ত কৌচে বসিয়া পড়িল।

তারিণী তাহার ভাব দেখিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"পত্র কে লিখেছে? কর্ত্তা কি?"

"না।"

"তবে কে লিখেছে?"

অমরনাথ ঈষৎ রুষ্টভাবে বলিয়া উঠিল—"যেই লিখুক—বাবা ন'ন।"

তারিণীকে অপ্রতিভ ভাবে নীরব দেখিয়া চারু বলিল —"আমার দিদি হ'ন্—তিনি লিখেছেন।"

তারিণী পুনর্ব্বার সূত্র পাইল। "বেশ, যদি অমরবাবু আমার কথা যুক্তিযুক্ত বোধ করেন তা'হ'লে বলি—তিনি যান্ তো যান্ তুমি থাক।"

চারু নীরব হইয়া রহিল। অমরনাথ বলিয়া উঠিল— "সেই ভাল কথা চারু, তুমি তারিণীর কাছে থাক, আমি যাই—বাবা ডেকেছেন।"

তারিণী মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আপনার স্ত্রী লিখেছেন— পিতা তো লেখেন নি?"

অমরনাথ উগ্রকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিল "থাম তারিণী, বাবাই ডেকেছেন, তাঁর অসুখ,—নিজে কি ক'রে লিখ্‌বেন?"

"তিনি দেওয়ানকে দিয়ে বা অন্য কাউকে দিয়েও তো লেখাতে পাত্তেন? এটা স্পষ্ট আপনার স্ত্রীর অনুমতি—এটুকু বুঝ্‌তে পারচেন না? আগাগোড়া এ সবই আপনার স্ত্রীর খেলা।"

অমরনাথ দুইহাতে মস্তক ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। দুঃখ, লজ্জা, অপমান অতি উগ্রভাবে তাহার মস্তক আন্দোলিত করিয়া তুলিল। ভাবিয়া ভাবিয়া স্খলিতকণ্ঠে বলিল "তবে তো বাবা ডাকেন্ নি,—তবে যাব না।"

"তাই বল্‌ছি অমরবাবু, বেশ বুঝে সুঝে কাজ করুন। ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ ক'রে বসে শেষে সমস্ত জীবনটা অনুতাপ কর্ব্বেন না। মনে করুন, আপনি গেলেন, বাপের রুগ্নাবস্থা দেখে চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌লেন, আর তিনি হয় ত আপনার সঙ্গে কথাই কইলেন না, মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আপনার স্ত্রী হয় ত—"

বাধা দিয়া অমরনাথ আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "চুপ কর তারিণী, আর না। তিনি হয়ত আমাকে ফিরিয়েই দেবেন, হয় ত কথা কইবেন না, তবু তাঁর অসুখ, আমি যাবই।"

"তবে আর কথা কি? কিন্তু চারু? চারুকেও কি নিয়ে যেতে চান? হয় ত আপনার স্ত্রী আপনাকে দ্বিগুণ অপমানিত কর্‌বার জন্যে এই ফন্দি করেছেন? আপনি যান্ কিন্তু চারুকেও কি তার মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত মনে করেন?"

"চারু, চারু, তুমি তাহ'লে তারিণীর কাছে থাক।"

"আমি যাব।" সজলনয়নে স্বামীর নিকটে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ভগ্নকণ্ঠে চারু বলিল, "আমায় নিয়ে চল। আমায়ও দিদি যেতে লিখেছেন।"

"বাবা—বাবা যে লেখেননি চারু!"

"বাবা বলেছেন—তিনিই ডেকেছেন—দিদি তাই লিখেছেন।"

অমরনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল। চারুর সরল বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে অনেকখানি বল দিল। সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এটা কি এত অসম্ভব তারিণী?"

"দেখুন বিবেচনা ক'রে যা ভাল হয় করুন আমার তো কেমন ভালো ঠেক্‌ছে না।"

চারু ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—"এর মধ্যে বিবেচনা করবার কি আছে? তারিণী দাদা, তোমরা কেন বুঝ্‌তে পাচ্চনা?"

"যাক্। যা' হবার হ'বে। তারিণী তুমিই বিপদে আমার একমাত্র বন্ধু। যদি অসাবধানে কিছু ব'লে থাকি ক্ষমা ক'রো। তুমি বাসায় থাক। চারু আর আমি আজই বাড়ী যাব।"

তারপর একটু থামিয়া একটু নিশ্বাস ফেলিয়া অমরনাথ বলিল, "আমার মনে হ'চ্চে—বাবাই আমায় ডেকেছেন—তিনি নিশ্চয় আমায় মাপ করেছেন।"

তারিণীচরণ ক্রূর হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে শুধু বলিল—"হুঁ!"

নবম পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাস্তাটা একটা দুর্ব্বহ ভার বহন করিয়া অমরনাথ চারুকে লইয়া বাটীর অভিমুখে যাইতে লাগিল। পথে চারুর সঙ্গে সে বেশী কথাবার্ত্তা কহে নাই; স্বামীকে নীরব দেখিয়া চারুও চুপ করিয়া ছিল, অজ্ঞাত একটা ভয়ে সেও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। পথে অমরনাথ দুই-তিনবার পত্রখানা খুলিয়া খুলিয়া দেখিতেছিল, চারুর জন্য যত চিন্তা হইতেছিল, নিজের জন্য তাহার তত চিন্তা হয় নাই। পত্রখানার প্রতি বর্ণ সে মনে মনে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল সমস্ত পত্রখানায় যেন একটা কি রকম ভাব, যেন আজ্ঞাধীন ব্যক্তি বা অপরাধীর উপরে বিচারকের কঠোর দৃষ্টি পত্রখানায় মাখানো। অমরনাথ ঈষৎ তীব্র চক্ষে পত্রখানার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল তাহাকে অবজ্ঞা বা অনুমতি করিতে সুরমার কি অধিকার? সঙ্গে সঙ্গে সুরমার উপরে তাহার যেন একটা বিদ্বেষ ভাব মনের মধ্যে মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। মানুষের অপরাধ যেখানে গুরুতর সেখানে সে অপরাধের ভার অনেক সময় বিদ্বেষ রূপেই জাগিয়া উঠে। যদি তারিণীর কথাই সত্য হয়, পিতা না বলিয়া থাকেন তো তাহার এরূপ পত্র লিখিবার কি প্রয়োজন? যেখানে তাহারা যাইতেছে সেখানে এখন ইহারই ক্ষমতা অপ্রতিহত,

তাহারই অনুমতিসূচক আহ্বানে তাহারই অধিকৃত স্থানে ভিখারী ক্ষমাপ্রার্থীর মত উভয়ে যাইতেছে? যে অমর সেখানকার অধীশ্বর সেই অমর সেখানে আজ ত্যাজ্য দূরীকৃত, অপরাধীর মত আজ্ঞা পাইয়া তবে সেখানে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে—আর যে তাহাদের দণ্ড দিবে বলিয়া বিচারকের আসনে বসিয়া আছে সে সেখানকার কে? আগন্তুক বৈ ত নয়? অভিমানে ক্ষোভে অমরনাথের বক্ষ একএকবার ঈষৎ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল পিতা হয়ত সুরমারই সম্মুখে তাহাকে অপমানিত করিবেন। চারু হয়ত তাহার প্রভুত্বব্যঞ্জক দৃষ্টির সম্মুখে শুকাইয়া উঠিবে। নিশ্বাস ফেলিয়া অমরনাথ ভাবিল 'চারুকে আনা ঠিক হয়নি।' নিমেষের মধ্যে আবার মনে আসিতেছিল পিতার পীড়া। অমরনাথ ব্যগ্রভাবে বার বার ঘড়ী দেখিয়া সময়ের পরিমাণ করিতে লাগিল।

ট্রেন ত্যাগ করিয়া যখন উভয়ে শকটারোহণ করিল তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। দুধারে শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর ব্যবধানে যখন অর্দ্ধক্রোশ-দূরস্থিত গ্রামের গৃহ ও তরুরাজী আবছায়া ভাবে দেখা যাইতে লাগিল তখন অমরনাথ আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। সেই দুধারের শস্যের ক্ষেত্র, বোসেদের ও তাহাদের পাশাপাশি বৃহৎ বৃহৎ উদ্যান যেন পরস্পরকে স্পর্দ্ধা দেখাইয়া শির তুলিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। সেই বৃহৎ সাঁকো, দুধারে সেই উভয় পক্ষের বিবাদি কলকল জলস্রোত, এখন ক্ষীণভাবে বহিয়া যাইতেছে, সম্মুখের বৃহৎ বটগাছে রাখাল বালকেরা তেমনি করিয়া দুলিয়া যাইতেছে। অমরনাথের মনে পড়িতে লাগিল এইখানে বাল্যকালে প্রত্যহ বেড়াইতে আসিত, ঐ সেতুর উপর হইতে জলে লাফাইয়া পড়িয়া কত সাঁতার দিত, ঐ বটগাছের 'নাম্‌না'গুলির শ্রেষ্ঠটীতে তাহারই একাধিপত্য ছিল। ঐ পথের উভয়পার্শ্বের খড়ো ঘরগুলির অধিবাসীরা তাহার নিতান্ত পরিচিত। এখনো হরি, পুঁটে, আপ্‌লারা হয়ত ঐ ঘরেই চিরদিনের সুখ দুঃখ লইয়া বাস করিতেছে, আর সে আজ দুই বৎসর এখান হইতে নির্ব্বাসিত।

ক্রমে গ্রামের সুউচ্চ সৌধ ও অনতিবৃহৎ গৃহগুলি পরিস্ফুটরূপে তাহার চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। গ্রামের মধ্যে শকট প্রবেশ করিলে কি একটা লজ্জায় অমরনাথ শকটের গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া দিয়া কৌতূহলী গ্রামবাসীর চক্ষু হইতে আপনাকে লুক্কায়িত করিল। চারুর পানে চাহিয়া দেখিল চারু নীরবে বসিয়া আছে। অমরনাথ ক্রমে অসহিষ্ণুভাবে দ্বার ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিল ঐ দূরে বোসেদের উচ্চ অট্টালিকা ফেলিয়া আসিয়াছে, ঐ সম্মুখে নবীন পালের ডাক্তারখানা, ঐ বাড়ুয্যের চণ্ডীমণ্ডপ, পার্শ্বে গ্রাম্য স্কুল। ওধারে ঐ পোষ্টাফিস, পরে চাটুয্যে ঠাকুরদের পুরাতন ইষ্টকালয়, তারপরে সেই শুভ্র অট্টালিকা বৃহৎ মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সম্মুখে ঐ সেই চিরপরিচিত বৃহৎ শ্বেতবর্ণ গেট। অমরনাথ সজোরে দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিল গেটের সম্মুখ হইতে একখানা গাড়ী তাহাদের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। অমরনাথ গাড়োয়ানকে বেগে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলে পূর্ব্বোক্ত গাড়ীখানা নিকটস্থ হইবামাত্র শকটোপরি উপবিষ্ট রহিমবক্‌স কোচম্যান রশ্মি সংযত করিয়া বসিয়া বসিয়াই ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেলাম করিতে করিতে বলিয়া উঠিল "বাবু আপ্ আয়া হায়্।" অমরনাথের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শকট তাহাকে অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিল। সম্মুখে রামচরণ খান্‌সামা, হস্তে কতকগুলা ঔষধের শিশি লইয়া যাইতেছিল, অমরনাথকে শরীরের অর্দ্ধেক বাহির করিয়া প্রায় ঝুলিতে ঝুলিতে যাইতে দেখিয়া সে ছুটিয়া শকটের নিকটে গেল। "ছোট-বাবু কখন এলেন? বাবুর যে বড্ড অসুখ এতদিন—" অমরনাথ মুখ ফিরাইয়া লইল। খানসামাকে পশ্চাতে রাখিয়া গাড়ী গিয়া গেটের সম্মুখে পৌঁছিবামাত্র অমরনাথ লাফাইয়া নামিয়া পড়িয়া চিরপরিচিত লালকঙ্করময় পথ সবেগে অতিক্রম করিয়া বৈঠকখানার প্রকাণ্ড সিঁড়ির ধাপে পদস্পর্শ করিবামাত্র উপর হইতে স্নেহকোমলকণ্ঠে কে বলিল 'অমর—অমর—আস্তে—অত ব্যস্ত হ'য়োনা'। চমকিত হইয়া অমর মুখ তুলিয়া দেখিল সম্মুখে সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ দেওয়ান শ্যামাচরণ রায়—তাঁহার চারিদিকে কয়েকজন আমলা ও গ্রামস্থ কয়েকটি ভদ্রলোক উন্মুখ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। অমরকে ঈষৎ থামিতে

দেখিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া নামিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন "ষ্টেশনে গাড়ী তো রাখা হয়নি—কষ্ট হয়নি তো? সময়টা ঠিক জান্‌তে পারিনি! কর্ত্তাবাবুর বড়—" অমরনাথ বাধা দিয়া পূর্ব্ববৎ বেগে সোপান অতিক্রম করিতে করিতে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "আমি জানি! চুপ করুন—চুপ করুন কাকা!" বলিতে বলিতে অমর সোপান অতিক্রম করিয়া বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিল দেওয়ানজী হাঁকিয়া বলিলেন "অমর, বাবু অন্দরের সমুখের দোতালার ঘরে আছেন।" অমর চক্ষুর অন্তরাল হইলে কর্ম্মনিষ্ঠ দেওয়ান সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন "গাড়োয়ানটাকে বিদেয় করে দাও। ওরে নদে, কি জিনিষ পত্র আছে নামিয়ে নিয়ে আয়।" নদে খান্‌সামা জিনিষ নামাইতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল "আজ্ঞে; গাড়ীর মধ্যে কেউ আছেন।" চমকিত হইয়া দেওয়ান বলিলেন "তাইতো—আঃ—কি ছেলেমানুষী।" ত্রস্তে শকটের নিকটে গিয়া দেওয়ান বলিতে লাগিলেন "এই গাড়োয়ান, ভেতরে নিয়ে চল—গাড়ী ভেতরে নিয়ে চল্। এগিয়ে চল, আরও খানিকটে চল, ওই ওদিকের দুয়োরটার কাছে ভিড়ে দাঁড়াগে, ওরে নদে—এই হরে—বাড়ীর ভেতরে খবর দে—বামা—ক্ষান্ত কাউকে ডেকে নিয়ে আয়।" পরিচারকেরা ব্যস্ত ভাবে অন্দরে দৌড়িল।

আরোহীকে নামাইয়া দিয়া গাড়ী যখন সম্মুখের বৈঠকখানার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল তখন দেওয়ানজী শান্ত হইয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া চাকরকে তাম্রকূটের আদেশ দিলেন ও সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর সাক্ষাতে কর্ত্তার ব্যারামের ডাক্তার-কথিত লক্ষণগুলি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সরকার গাড়োয়ানের সহিত ভাড়া লইয়া বচসা জুড়িয়া দিল।

দ্বিতলের সোপান সবেগে অতিবাহিত করিয়া অমর হলের সম্মুখের বারান্দায় প্রবেশ করিয়া সহসা থামিয়া পড়িল। মুক্ত গবাক্ষপথে হলের মধ্যে দৃষ্টি পড়ায় দেখিল খানিকটা শয্যার অংশ ও তাহার উপরে শায়িত এবং গাত্রবস্ত্রে আবৃত মনুষ্যের অর্দ্ধাংশ দেখা যাইতেছে,—অমর বুঝিল পিতা। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত ভয়ে কণ্টকিত হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল,—তাহার ভয় হইতেছিল পিতা যদি না বাঁচিয়া থাকেন। গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তি বোধ হয় অমরের আবেগ-ব্যগ্র পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। সহসা সে শব্দ নীরব হওয়াতে গম্ভীর অথচ ক্লান্ত কণ্ঠে গৃহমধ্য হইতে প্রশ্ন হইল "কে?" অমরের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। 'বাবা—বাবারই গলা!'—ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অমর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে করিতে পুনর্ব্বার শুনিল গৃহমধ্য হইতে বামাকণ্ঠে কে বলিল "আপনি স্থির হোন্,—আমি দেখি কে।"—অমরনাথ এবার সবেগে অগ্রসর হইল। মুক্ত দ্বারপথে সম্মুখেই পিতার রুগ্নশয্যা দেখা যাইতেছে। উন্নত ললাট শুভ্রগম্ভীর মুখশ্রী, উদার কোমল নেত্রদুটী ক্লান্তিতে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে—অমরনাথের রুদ্ধ বেদনার স্রোত বক্ষপঞ্জরের মধ্যে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। টলিতে টলিতে সে একনিশ্বাসে পিতার পদতলে শয্যাপ্রান্তে গিয়া বসিয়া পড়িল। পুরু গালিচামণ্ডিত গৃহে পদশব্দ আর কিছুই হয় নাই, তথাপি কি একটা অজ্ঞাত আন্দোলনে পীড়িতের হৃদয় বোধহয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি চক্ষু মুদিয়াই পুনর্ব্বার মস্তকের নিকটে উপবিষ্টা রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কে মা দেখত? কে যেন আমার পায়ের তলায় বস্‌ল,—শ্যামাচরণ কি?"

অমরনাথ মুখ তুলিয়া দেখিল পিতা তখনো চক্ষু মুদিয়াই আছেন—তাঁহার মস্তকের নিকটে একটী রমণী—পরিচিতা সে,—ধীরে ধীরে রোগীর মস্তকে হাত বুলাইতেছে। তাহার অকুণ্ঠিত দৃষ্টির সম্মুখে অমরনাথ আবার দৃষ্টি নত করিল। ঈষৎ অপেক্ষা করিয়া হরনাথ বাবু ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন "মা।"

উপবিষ্টা রমণী তাঁহার মস্তকের উপরে একটু নত হইয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল "বাবা?"

"আমার কি ঘুম এসেছিল?"

"কই না, আপ্‌নি তো চেতনই আছেন বাবা।"

একটা বদ্ধ নিশ্বাস সজোরে ত্যাগ করিয়া তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন "বোধ হয় একটু তন্দ্রামত এসেছিল, যেন বোধ হ'ল কে এসে আমার পায়ের তলায় বসেছে। শ্যামাচরণ এসেছিল কি? তার মত বোধ হ'ল না কিন্তু।"

"কার মত বোধ হ'ল ?"

"কি জানি—তারই মত হবে—না না সে যে কল্‌কাতায় আছে।"

পদতলে উপবিষ্ট অমরের রুদ্ধ আবেগ বক্ষের মধ্যে ফুলিয়া ঠেলিয়া তাহার কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতেছিল। আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া সে পিতার পায়ের উপরে মস্তক রাখিয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাহার স্পর্শে হরনাথবাবু চমকিত হইয়া ব্যাকুল আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "মা মা আবার সেই রকম বোধ হ'চ্চে—দেখনা কে ?"

উপবিষ্টা রমণী পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আপনিই দেখুন্ না কেন বাবা !—চেয়ে দেখুন্।"

"আমার ভয় করছে—যদি মিথ্যা হয় তাই চাইতে পারছি না,—সেই কি ?"

অমরনাথ রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল "বাবা।"

যেন তাড়িতস্পর্শে আহত হইয়া হরনাথবাবু চক্ষু উন্মীলিত করিলেন।

"অমর।"

"বাবা, বাবা" বলিতে বলিতে অমরনাথ পিতার দুই পা সবলে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে মুখ লুকাইল।

সহসা তাহার মস্তকে কোমল করস্পর্শ হইল,—"ছাথ-ছাথ, বাবা অমন ক'রে রয়েছেন কেন।" বলিতে বলিতে সুরমা হরনাথবাবুর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিল। কাতর রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল 'বাবা' 'বাবা'। অমরনাথ পিতার পা ছাড়িয়া দিয়া নীরবে শুধু চাহিয়া রহিল। কি করা কর্ত্তব্য তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সুরমা তাহার পানে দুই অশ্রুপূর্ণ চক্ষে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিয়া ত্বরিতকণ্ঠে বলিল "এদিকে এসো, একটু বাতাস ক'রো, ভয় নেই- কেমন মোহ মতন হ'য়েছে—বড্ড দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন।"

অমরনাথ উঠিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার মস্তকে মৃদু মৃদু ব্যজন করিতে করিতে নীরবে সুরমার অশ্রান্ত ব্যাকুল শুশ্রূষা দেখিতে লাগিল। স্খলিত কণ্ঠে বলিল "কাকাকে একবার ডাকৃব কি ?"

রোগীর অধরে ওষ্ঠে চামচে করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দিতে দিতে সুরমা বলিল "না, এই যে সাম্‌লে উঠেছেন, আর ভয় নেই। বাবা,—বাবা !"

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া হরনাথবাবু বলিলেন "মা।"

সহসা বক্ষের উপরে কি একটা বেদনায় নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া অন্তরে অন্তরে মোহের সঞ্চার হইয়াছিল। সুখ কিম্বা দুঃখের কি একটা তীব্র আঘাতে দুর্ব্বল অন্তঃকরণ কিয়ৎক্ষণের জন্য নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে সে আন্দোলন সে নিস্পন্দতা অতিক্রম করিয়া হরনাথবাবু বলিলেন 'মা'। তারপরে অতি ধীরে ধীরে পার্শ্বস্থিত পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন 'অমর'। পিতার উদ্বিগ্ন নেত্র-পাতের সঙ্গে সঙ্গে অমরনাথ দুই হাতে মুখ ঢাকিল, পিতার সে দৃষ্টি সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

পুনর্ব্বার ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত হইল 'অমর'।

অমর মুখ তুলিয়া দেখিল পিতা তাহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। পিতার এই স্নেহশীল ভাব দেখিয়া অরুন্তুদ যন্ত্রণায় অমরের বক্ষ শতধা হইয়া ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইল। দুই কম্পিত ব্যাকুল হস্তে পিতার হস্তখানি মুখের উপরে চাপিয়া ধরিয়া সে শয্যাপার্শ্বে মস্তক স্থাপন করিয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

পুত্রকে স্পর্শ করিয়া হরনাথ বাবুর বক্ষের যন্ত্রণা যেন শমিত হইয়া আসিল। পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া তাঁহার রুদ্ধ বেদনা অশ্রু-আকারে নয়নে আসিয়া ছাপাইয়া উঠিয়া ঝরঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ধারায় ধারায় উপাদান সিক্ত করিতে লাগিল। প্রবীণ হরনাথ বাবু বালকের ন্যায় অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

বহুক্ষণ অশ্রু নির্গমের পর তিনি কিছু সুস্থ হইলেন। মস্তক ফিরাইয়া বধূর উদ্দেশে ডাকিলেন "মা।"

এই হৃদয়ভেদী আন্দোলনের সময় সে এক কোণে গিয়া মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া কি করিতেছিল কে জানে। শ্বশুর আহ্বান করিতেই নিকটে আসিয়া নত মুখে দাঁড়াইল।

"এইখানে ব'স। একটু বাতাস কর মা।"

সুরমা তাঁহার অপর পার্শ্বে গিয়া বসিয়া নীরবে ব্যজন করিতে লাগিল। হরনাথ বাবু কিছুক্ষণ তাহার ম্লান গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে

বলিলেন "মা, তোমায় আমার একটী অনুরোধ রাখ্‌তে হবে।"

সুরমার কণ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, সে বলিল "বলুন।"

"মা, তুমি হয়ত অমরকে এখনো ক্ষমা ক'রো নি; কখন করতে পারবে কিনা জানিনা, সে অনুরোধ তাই আমি সহসা কর্‌তে পার্‌লাম না, কেন না আমার চেয়ে তোমার কাছে তার অপরাধ ঢের বেশী। মা, আমার তোমার কাছে এই অনুরোধ, যে ক'দিন আমি থাকি, আমার সম্মুখে তুমি যেন তাকে ক্ষমা করেছ এমনি ভাবে চল'।"

সুরমা নীরবে ব্যজন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া হরনাথ বাবু বলিলেন "কখনো পার ত' তাকে ক্ষমা করতে চেষ্টা ক'রো।"

সুরমা ধীরে ধীরে তাঁহার পদতলে গিয়া দাঁড়াইল। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে দুই হস্তে তাঁহার পদযুগল ধরিয়া বলিল "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।"

"তুমি তা পার্‌বে মা। আমি আশীর্ব্বাদ করলাম।"

অমরনাথ নীরবে নতমুখে বসিয়া ছিল। এ দৃশ্যে তখন আর তাহার নিজেকে অপমানিত জ্ঞান হইতেছিল না অথচ পথে আসিতে আসিতে সে এই ঘটনার সম্ভাবনাতেই মনে মনে ক্লিষ্ট হইতেছিল। কিন্তু এখন পিতার ক্ষমাপূর্ণ স্নেহশীল মূর্ত্তি ও সস্নেহ ব্যবহারে সে কেবল তাঁহার অপরিসীম স্নেহেরই প্রমাণ দেখিতেছিল। অমর সুরমার ব্যবহার বা সুরমাকে নিজের লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া সে সম্বন্ধে উদাসীন ভাবে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কেবল তাহার পানে চাহিতে একটু কেমন সঙ্কোচ আসিতেছিল মাত্র। সুরমার সম্মুখে তাহার এ সঙ্কোচটুকুতেও সে নিজের কাছে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। কিসের এ লজ্জা? যাহার সহিত অন্তরে বাহিরে কোন' দিন কোন' সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় নাই তাহার কাছে এ কুণ্ঠা এ লজ্জা কিসের? তাহাকে যদি একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও অমর স্ত্রীর অধিকার দিয়া আসিত তবে না হয় এ লজ্জাকে তাহার সঙ্গত বোধ হইত। তাহা যখন হয় নাই, তখন সুরমা অমরের চক্ষে সম্পূর্ণ পরস্ত্রীর মত একজন স্ত্রীলোক মাত্র, তখন এ লজ্জাকে সে তো ক্ষমা করিতে পারে না।

নির্ব্বোধ অমর বুঝিত না যে ন্যায়ধর্ম্ম এবং সমাজের অধিকারের প্রভুত্ব মানবের উপরে কত প্রবল।—তাহার বিচারাসনতলে অমরের মস্তক নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আপনি নত হইয়া পড়িবে। হরনাথ বাবু অমরের পানে চাহিয়া চাহিয়া ডাকিলেন "অমর, উঠে এখানে ব'স।" কলের পুত্তলিকার ন্যায় অমরনাথ উঠিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল। চক্ষু দ্বারা যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্নেহমার্জ্জিত করিয়া পিতা বলিলেন "বড্ড রোগা হ'য়ে গিয়েছ।"

অমরের চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সস্নেহে তাহার মস্তকের উপরে হস্ত রাখিয়া পিতা বলিলেন "কাঁদিস্‌নে অমর; হাজার দোষ কর্‌লেও তোর ওপরে কি আমি রাগ করতে পারি?"

অমর একটী অনুতাপ বাক্যও উচ্চারণ করিতে পারিল না। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল ও পিতা ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অমর ক্রমে শান্ত হইল।

সুরমা একটা মেজর গ্লাশে খানিকটা ঔষধ ঢালিয়া নিকটে আনিতেই হরনাথ বাবু বলিলেন "আর ও ওষুধ খাবনা মা, যদি ভাল হই এতেই হব।"

"আপনি ত রোজই এমনি আপত্তি করেন।"

"অপত্তি করি ব'লে কি তুমি তোমার ছোট ছেলেটীকে রেহাই দাও মা?"

সুরমা ঈষৎ হাসিয়া উপদেষ্টার ভাবে বলিল "শেষে কথা কবেন বাবা। আগে খেয়ে ফেলুন।" তার পরে অমরনাথের পানে চাহিয়া স্পষ্ট বাক্যে বলিল "বেদানা আনা হ'য়েছে তো?"

"ট্রাঙ্কের মধ্যে আছে" বলিতে বলিতে অমরনাথের মনে হইল চারু কিরূপ জোর করিয়া ষ্টেশনে তাহাকে বেদানা কিনাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল সে তাহাকে গাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছে।

হরনাথ বাবু পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন "তুমি একা এসেছ?"

অমরনাথ মৃদু কণ্ঠে বলিল "না।"

"ছোট বৌমাকে এনেছ? কই কোথায় তিনি।"

"গাড়ীর মধ্যে।"

হরনাথ বাবু ত্রস্ত ভাবে বলিলেন "এখনো তোমার তেম্‌নি স্বভাব আছে। বৌমাকে এতক্ষণ গাড়ীতে ফেলে রেখে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে রয়েছ। মা"—বলিতে বলিতে সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সহসা অমরনাথের পানে দৃষ্টি করিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। অমরনাথ বহু চেষ্টায়ও নিজের মুখের বিকৃত ভাব গোপন করিতে পারিতেছিল না। সুরমা তাহা বুঝিয়া দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মানা একজন আত্মীয়াকে ইঙ্গিতে বলিল "তুমি যাও।"

আত্মীয়া উত্তর করিল "ছোট বৌকে আমরা গাড়ী থেকে তুলে নিয়ে এসেছি। দাওয়ানজী বলে পাঠিয়েছিলেন।"

হরনাথ বাবু ব্যগ্র ভাবে বলিলেন "তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও, আমি তাঁকে দেখে আশীর্ব্বাদ করব।"

"এই যে তাঁকে এই ঘরেই এনেছি।"

ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠিতা চারু কম্পিত পদে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। অমরনাথ গম্ভীর নত মুখে বসিয়া রহিল এবং সুরমা রোগীর পথ্য নির্ম্মাণে নিবিষ্ট ভাবে মনোযোগ দিল। হরনাথ বাবু বলিলেন "এস মা।"

চারু ধীরে ধীরে তাঁহার পদতলে গিয়া দাঁড়াইয়া শির নত করিয়া তাঁহার পদতলে প্রণাম করিল। হরনাথ বাবু স্নিগ্ধ স্বরে ডাকিলেন "এস মা আমার কাছে এসে ব'স; এই পাশে এস।"

তাঁহার নির্দ্দেশ মত চারু তাহার কম্পিত চরণকে কোন মতে টানিয়া লইয়া গিয়া শ্বশুরের শয্যার অপর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

"লজ্জা কি মা, আমি যে তোমাদের বাবা, বসো।"

অবগুণ্ঠনের অন্তরালে চারু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। এত স্নেহবাক্য যেন সে কখনো পায় নাই। এইখানে আসিতে সে এতক্ষণ অজ্ঞাত ভয়ে সঙ্কোচে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল? সেই ভয়ের পাত্র কি এই স্নেহময় শান্তিময় পিতৃসম উদার মহাপুরুষ!

চারু নিকটে উপবেশন করিলে হরনাথ বাবু তাহার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি মা, তোমার নিজের ঘরে তুমি এতদিন স্থান পাওনি। আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুমি সুখী হ'বে!"

বহুক্ষণ সকলের নীরবে কাটিয়া গেল। সুরমা পথ্য লইয়া যেদিকে অমরনাথ বসিয়াছিল সেইদিকে অগ্রসর হওয়ায় অমরনাথ উঠিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। সুরমা ধীরে ধীরে বলিল "বাবা, খাবারটুকু খান।"

"দাও মা।"

সুরমা পার্শ্বে বসিয়া নিপুণ হস্তে সযত্নে তাঁহাকে পথ্য সেবন করাইতে লাগিল। চারু ইহার পূর্ব্বে দ্বারান্তরাল হইতে সুরমাকে চিনিয়াছিল এবং আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে তাহার প্রতি কর্ম্ম প্রশংসার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার উন্নত উদার মুখ, জলপূর্ণ আয়ত নয়ন, অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি, সর্ব্বোপরি তাহার সর্ব্বকর্ম্মনিপুণ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া ভক্তিমিশ্রিত ভালবাসায় চারুর মন অভিভূত হইয়া আসিতেছিল। হরনাথ বাবু ও অমরে মিলনোত্থিত ক্রন্দনের সময়, সুরমা যখন মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ও তাহার জ্যোতিপূর্ণ কৃষ্ণতারক আয়তচক্ষু হইতে অশ্রুরাশি ছাপাইয়া উঠিয়া উজ্জ্বল গণ্ডস্থল বহিয়া মুক্তার মত ঝরিয়া পড়িতেছিল, দ্বারের অন্তরাল হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া তখন চারুর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহা পারে নাই, কেবল লুব্ধ নেত্রে এতক্ষণ সুরমার প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক ভঙ্গী পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল—জীবনে মা ভিন্ন অন্য কাহাকেও যে জানে নাই—জগতের অন্য কোন সম্বন্ধের সহিত যে মোটেই পরিচিতা নয় তাহার পক্ষে সুরমার সহিত সম্বন্ধের জটিলতা মনে করিয়া চারু নিজেকে সুরমা হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই। বিশেষ চারুর মত সংসারানভিজ্ঞার পক্ষে ইহাই সঙ্গত। চারু সুরমাকে একজন আত্মীয়া জানিয়াই মনে মনে "দিদি" নামে অভিহিত করিতেছিল। সেই সুরমাকে এখন অত্যন্ত নিকটে পাইয়া চারু বিশ্বস্ত হৃদয়ে তাহার পানে চাহিবামাত্র সহসা শিহরিয়া উঠিল। সুরমার সে উদার স্নেহপূর্ণ মুখকান্তি যেন নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া কি এক রকম হইয়া উঠিয়াছে। আরক্ত মুখে আয়ত চক্ষুর্দ্বয় যেন চক্ চক্ করিয়া সুকৃষ্ণ বৃহৎ তারা হইতে অস্বাভাবিক জ্যোতি

প্রকাশ করিতেছে। মুখে যেন একটা দারুণ নিষ্ঠুর ভাব আসিয়া অধিকার করিয়াছে। ভীরুস্বভাবা চারু অজ্ঞাত ভয়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

হরনাথ বাবুর পথ্যসেবন শেষ হইলে সুরমা তাঁহার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। হরনাথবাবু স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন "একটু দাঁড়াও মা!—ছোট বৌমা, আমার এধারে একবার এস তো মা।" চারু তাঁহার আজ্ঞামত অপর পার্শ্বে গিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। সুরমার পানে তাহার আর চাহিতে সাহস হইল না। হরনাথবাবু ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ করিয়া চারুর ক্ষুদ্র কম্পিত হস্তখানি এক হস্তে লইয়া অপর হস্তে সুরমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহার উপরে চারুর হস্তখানি স্থাপন করিলেন। আর্দ্র চক্ষে সুরমার পানে চাহিয়া গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন "মা, আমি একে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। এ তোমার ছোট বোন। ছোট বৌমা তোমার দিদিকে নমস্কার কর; ইনি দেবী।"

চারু ধীরে ধীরে কম্পিত বক্ষে আভূমি প্রণত হইয়া নতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইতেই একখানি কোমল বাহু চারুর একখানি হস্ত বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইল। চারু শিহরিয়া চাহিয়া দেখিল অপূর্ব্ব করুণাপূর্ণ স্নেহময়ী দেবীমূর্ত্তি বটে! চারুর ভীত সরল ক্ষুদ্র মুখখানির উপরে তাহার সেই উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় এখন যেন অজস্র স্নেহ বর্ষণ করিতেছে। চারু বিগলিত ভাবে সুরমার বুকে ধীরে ধীরে যেন নিজের অজ্ঞাতেই মস্তক ন্যস্ত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল "দিদি!"—

* * * * *

অমরনাথের অশ্রান্ত চেষ্টা ও সুরমার ক্লান্তিহীন যত্ন সত্ত্বেও হরনাথবাবু আর বেশীদিন তাঁহার নবগঠিত স্নেহের সংসারে আনন্দ ভোগ করিতে পারিলেন না। যে কয়দিন ছিলেন, সেই কয়দিনেই যেন ভিতরে ভিতরে তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর ভাবী আশঙ্কায় ব্যাকুল যে ক'টি স্নেহকাতর প্রাণ আপনাদের দাবী দাওয়া সব ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল প্রশান্ত চিত্তে পরস্পর পরস্পরের উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিল তাঁহার গমনের বিলম্বে পাছে তাহারা স্থৈর্য্যহীন হইয়া তাঁহার সম্মুখেই নিজেদের গণ্ডির রেখা ভগ্ন করে, এই ভয়ে যে কয়দিন ছিলেন, তাহাই তাঁহার দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছিল। অমর সহজে সুরমার সঙ্গে কথা কহিত না, সে সম্মুখে বা নিকটে থাকিলে প্রথমে ঈষৎ তটস্থ হইয়া পড়িত, কিন্তু সুরমা যখন অসঙ্কোচে শ্বশুরের চিকিৎসা ও সেবা সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের জিজ্ঞাসা ও আলোচনা করিত তখন অমরনাথ যেন হাঁপ ছাড়িয়া সহজ সরলভাবে তাহার উত্তর দিত। হরনাথবাবু সে সময়ে মনে মনে সুরমাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতেন। মৃদুকণ্ঠে বলিতেন "আমি এখন সুখে যেতে পারব।" শেষদিনে অমর সকলের সম্মুখে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, আমার প্রতি আপনার কোন আজ্ঞা থাকে তো বলুন।"

হরনাথবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "আজ্ঞা? না।"

"বল্‌তে আপনি সঙ্কোচ করবেন না বাবা। কাকার কাছে শুনেছিলাম, আপনি আপনার জ্যেষ্ঠা বধূকে সমস্ত বিষয় দেবেন বলেছিলেন।"

সুরমার মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া হরনাথ বাবু স্নেহগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন "যখন আমার মাকে বুঝিনি তখন বলেছিলাম। বড় বৌমা যে আমার মা, তাঁকে কি আমি মনঃপীড়া দিয়ে লজ্জা দিতে পারি?"

অমরনাথ উভয় হস্তে পিতার পদতল স্পর্শ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "তাহলে আমায় আপনি ক্ষমা করেছেন বাবা?"

"তোকে ক্ষমা? তোর ওপরে কি আমি রাগ কর্ত্তে পেরেছিলাম অমু?"

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "আর না অমু, এখন আমি এসব কথা আর বেশী ক'বনা। ভেবোনা যে আমি এখন মনে কোন ক্ষোভ নিয়ে গেলাম, আমি এখন বড় সুখী। তোমার স্থানে তোমায়ই প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখে গেলাম। তুমি বড়বৌমার ওপরে যে অন্যায় করেছ আমি তোমায় সে অন্যায়ের প্রতিফলটুকু আমার বিচারমত ভোগ করিয়েছি। কিন্তু তবু তুমি আমার সেই অমরই আছ এবং থাক্‌লে। আমার মা বড় বৌমার সম্বন্ধে আমি তোমায় কিছু বলব না, আমি জানি

তাঁর স্থান তিনি নিজে রক্ষা করবেন, কেউ তাঁকে এখনো চেনে না।"

বৈকালে পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া হরনাথ-বাবু শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। অমরনাথ বালকের ন্যায় অজস্র রোদন করিতে লাগিল, চারু কয়েক দিন মাত্র শ্বশুরের স্নেহস্বাদ পাইয়া পুনর্ব্বার পিতৃমাতৃহীনা বালিকার ন্যায় এক কোণে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্যামাচরণ রায় উভয়কে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। একজন মাত্র ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তির মত নীরবে শ্যামাচরণ রায়ের উপদেশ অনুসারে যথাকর্ত্তব্য কর্ম্মে সহায়তা করিতেছিল, অথচ অব্যক্ত যাতনা ও ক্রন্দনে তাহার হৃদয় যত জর্জ্জরিত তেমন আর কাহারো নহে; তাহার সে সাধারণের অজ্ঞাত চির-আত্মনির্ভরশীল হৃদয়ের যে কতখানি গেল তাহা সেই বলিতে পাবে। সে সুষমা। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

কামাখ্যা-দর্শন

গত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া আসামের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ৺কামাখ্যাধাম ও বশিষ্ঠাশ্রম দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। প্রকৃতি দেবীর প্রকৃত লীলাক্ষেত্র কামরূপ-ক্ষেত্র উচ্চ নীলগিরি* শৃঙ্গ হইতে কি সুন্দর দেখায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া কিছুক্ষণের জন্য সংসারের সমুদায় গোলমালের হাত এড়াইয়া এক অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখ উপভোগ করিয়াছেন। কামাখ্যা পর্ব্বতে সম্মিলনীর ব্যবস্থা করিয়া সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রকৃতই সাহিত্যালোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন।

আমরা অতি প্রত্যুষে রেলগাড়ী হইতে দূরবর্ত্তী আসাম প্রদেশীয় নানা-বৃক্ষলতা-সমাকীর্ণ মনোরম পর্ব্বতশ্রেণীর এবং রেলরাস্তার পার্শ্বস্থিত নলখাগড়া ও উলুখড়ের ক্ষেত্রের মধ্যে মৃগশিশু ও শৃগালের ইতস্ততঃ ছুটাছুটি দেখিতে দেখিতে সহযাত্রিগণ সহ আনন্দ-কোলাহল করিয়া চলিতেছিলাম। সূর্য্যোদয়ের পর পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র নদ দর্শন করিয়া পরশুরামের পিতৃ-আজ্ঞা পালনের স্মৃতি আমাদের মনে জাগরূক হইল। লোহিত্যের নীলাম্বুরাশি অতি স্বচ্ছ ও স্বাদু। আমরা ষ্টীমার যোগে নদ পার হইয়া পুনরায় রেল-গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। এই স্থানে বহুদূর-দেশাগত বন্ধুগণের সহিত আমরা একত্র হইলাম। সকলেই একভাবে একই উদ্দেশ্যে চলিয়াছি। পূর্ব্বাহ্নে আমরা কামাখ্যা ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ষ্টেসনটী কামাখ্যা পর্ব্বতের পাদদেশে, কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই পর্ব্বতারোহণ করিবার সিঁড়িতে উঠিতে হয়। এই পার্ব্বত্য পথটী নরকাসুর পুরাকালে নির্ম্মাণ করাইয়া জনসাধারণের দেবীপীঠ দর্শন করিবার সুবিধা করিয়া দিয়া আজও কীর্ত্তিতে জীবিত হইয়া আছেন। এই পথের প্রস্তর-সোপানগুলি পরে কোন সময়ে—সম্ভবতঃ কুচবিহারাধিপতি শুক্লধ্বজ যখন কামাখ্যা-মন্দির পুনর্নির্ম্মিত করিয়াছিলেন তখন—সংস্কৃত হইয়া থাকিবে। অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া যেসকল সোপান দৃষ্টিগোচর হয়, ঐগুলি কোন একটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। ঐসকল প্রস্তরখণ্ড এবং আরও ঐ প্রকারের বহু খণ্ড যাহা এখন পর্ব্বতের উপরিস্থিত গ্রাম্যপথগুলিতে এবং অনেক পাণ্ডার বাড়ীর গৃহ-ভিত্তিতে স্থাপিত আছে -এককালে দেবীমন্দিরে সংযোজিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

পর্ব্বতারোহণ করিবার আর একটী সুন্দর পথ ব্রহ্মপুত্র নদের ধার হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহা ময়মনসিংহ-নিবাসী স্বর্গীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র নিজ ব্যয়ে সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। এই পথটী পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে, এবং অনেকটা সুগম। ব্রহ্মপুত্র দিয়া নৌকাযোগে এই পথে যাওয়া যায়।

নরকাসুর-নির্ম্মিত সোপানশ্রেণীর পার্শ্বস্থ পর্ব্বতগাত্রে সিদ্ধিদাতা গণেশজীর মূষিকবাহন-মূর্ত্তি খোদিত আছে, মূষিক-পৃষ্ঠে লম্বোদরের অবস্থান অন্যত্র প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। পদ্মাসনের ব্যবস্থাই দেখা যায়। একটী রাক্ষস-

* কামাখ্যা পর্ব্বতের নামান্তর নীলগিরি। (যোগিনীতন্ত্র)

মূর্ত্তি এবং সালঙ্কার বরমুদ্রায় সমাসীন একটী বুদ্ধমূর্ত্তিও পর্ব্বতগাত্রে খোদিত আছে। বৌদ্ধপ্রভাব নীলাচলেও প্রবেশাধিকার লাভ করিতে ছাড়ে নাই। অনেকগুলি সাধুসন্ন্যাসীও পথিপার্শ্বস্থ পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইয়া পারলৌকিক মুক্তির চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। কেহ বা গঞ্জিকাসেবায় সিদ্ধিলাভ কবিতেছেন।

পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিয়া আমরা দেবীকে প্রণাম করিয়া সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সভার দৃশ্য দর্শনে পরম পুলকিত হইলাম। বর্ত্তমান যুগে সভাস্থল বলিলেই চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদি আসবাবে শোভিত প্রাঙ্গন বা মণ্ডপ বুঝায়; কিন্তু এস্থলে তাহার কোনও একটীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। বাঙ্গালীর চিরন্তন প্রথা সেই সতরঞ্চশোভিত বিস্তৃত ফরাশ, তদুপরি সভ্যগণ সমাসীন, পরস্পব কোলে পীঠে পার্শ্বে—দেখিলেই ভ্রাতৃভাব জাগিয়া উঠে। এইসকল সম্মিলন করার প্রধান উদ্দেশ্য এইপ্রকাব মজলিসের প্রচলন দ্বারা এক্ষেত্রে অনেকটা সাধিত হইয়াছিল। আমবা বাঙ্গালী, বাংলাপদ্ধতি ও চালচলন অনুসারে কোন কাজ হইলে তাহাতে যেমন একটা আনন্দ বোধ হয়, অনুকরণীয় ব্যাপারে ঠিক তেমন হয় না। কেমন যেন একটা বাধ-বাধ বোধ হয়। আমাদের মনে হয় বাংলা রকমের সভাসমিতিতে কামাখ্যার ন্যায় ফরাশের প্রথা প্রচলিত হইলে মন্দ হয় না।

কামাখ্যা-পর্ব্বতের ভুবনেশ্বরী শৃঙ্গই সর্ব্বোচ্চ এবং পরম রমণীয়। এখান হইতে গৌহাটী নগরী, ব্রহ্মপুত্র, পর্ব্বতপাদসংলগ্ন রেলপথ ও চতুর্দ্দিকস্থ আসামীয় নীল পর্ব্বতশ্রেণী অতি সুদর্শন! ভুবনেশ্বরী মাতার মন্দিরের পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশের শিলাপৃষ্ঠে বসিয়া ঐসকল স্বভাবের শোভা দেখিলে সংসারের কথা মনে হয় না এবং ঐ স্থানটী ছাড়িয়া আসিতেও ইচ্ছা করে না। যোগিনীতন্ত্রে বর্ণিত কামরূপক্ষেত্র বাস্তবিকই প্রকৃতির লীলাভূমি! ভুবনেশ্বরীর মন্দিরটীও ভূকম্পের পর অতি সুন্দররূপে সংস্কৃত হইয়াছে। বিগত ভীষণ ভূমিকম্পে প্রাচীন মন্দিরগুলির অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছে।

কামাখ্যা-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ নিম্নস্থ একটী শৃঙ্গে যোগীবর অভয়ানন্দ তীর্থস্বামী মহাত্মার অক্লান্ত শ্রমে ও উদ্যোগে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইতেছে। পরহিত-ব্রত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী গবর্ণমেণ্ট হইতে সাধারণ গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এই মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বাড়িটীর আর অতি সামান্য কার্য্যই অবশিষ্ট আছে। কামাখ্যার মাতৃসেবক পাণ্ডাগণ অতি উদারস্বভাব এবং অতিথিসৎকারপ্রিয়। সাধারণত তীর্থস্থানের পাণ্ডাগণ যেপ্রকার অর্থগৃধ্নু এবং যাত্রী-পীড়ক, ইঁহারা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পার্ব্বত্য ব্রাহ্মণগণ অতি সরল ও সাধুপ্রকৃতি। যাত্রিগণকে ইঁহারা পরম যত্নে স্বগৃহে আহার ও বাসস্থান দিয়া থাকেন। ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র প্রভৃতি শ্রেণীনির্ব্বিশেষে আদরযত্নের কাহারও কোনও ত্রুটী হয় না। যিনি যাহা দক্ষিণা দিতেছেন তাহাতেই পরম সন্তুষ্ট। ইঁহাদের কোনওরূপ অভাব অভিযোগও শুনিতে পাওয়া গেল না।

কামাখ্যা-পর্ব্বতে দুইদিন অবস্থান করিয়া আমরা গৌহাটী নগরী পরিদর্শনান্তে বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিয়া-ছিলাম। কামাখ্যা-পর্ব্বতমূল হইতে মহাতপা মহর্ষির আশ্রম প্রায় ১১ মাইল পথ। এই সুদীর্ঘ পথটী গৌহাটী লোকালবোর্ড উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আমরা অশ্বশকটে এই পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ৯টার সময়ে বশিষ্ঠাশ্রমে পৌছিলাম। স্থানটী অতি রমণীয়। চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে একটু উপত্যকা, মনে হয় প্রাচীর-বেষ্টিত একটী সুন্দর প্রাঙ্গন। ইহার পশ্চিম পার্শ্বে মহাতেজা মহর্ষির তপঃপ্রভাবে আনীত সন্ধ্যা, ললিতা, কান্তা নাম্নী বিশাল শিলাভেদী জলধারাত্রয়। কি সুন্দর দৃশ্য, কি মহান গাম্ভীর্য্য, কি চমৎকার ভাব! দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়, আনন্দে প্রাণ ভরিয়া যায়। ভীষণ প্রস্তরখণ্ডরাশির মধ্যে দিয়া জলধারাত্রয় প্রবাহিত হইয়া কিয়দ্দূর পরে তিনটী একত্র মিলিত হইয়া পুনরায় দুইটী ধারায় বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। এই মিলনস্থানটী বশিষ্ঠ-কুণ্ড নামে খ্যাত। ঐ স্থানে বশিষ্ঠদেবের আসন-প্রস্তর-খানি অদ্যাপি সেই মহর্ষির কঠোর তপস্যার সাক্ষ্যদান করিতেছে। জলপ্রপাতের সুমধুর ধ্বনি প্রতিধ্বনি স্থানটীকে সর্ব্বদা মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা প্রকৃতই সাধনার স্থান। এমন চিত্তমুগ্ধকর, প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থান না হইলে তপস্যা হয় না। জলধারাগুলি অতি সুনির্ম্মল ও সুপেয়।

এই স্থানটী হিন্দুর একটী পবিত্র তীর্থ। যাত্রিগণ আসিয়া বশিষ্ঠকুণ্ডে স্নান ও সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া থাকেন। এবং এইসকল বৃহৎ শিলাখণ্ডের উপর রন্ধন ভোজনাদি করেন। কিন্তু শেষোক্ত কার্য্য দ্বারা এমন রমণীয় পবিত্র স্থানটীকে বড়ই অপবিত্র করিয়া যান। ভোজনপাত্র, রন্ধনপাত্র এবং অঙ্গার ভস্ম ইত্যাদি ঐসকল প্রস্তরের উপরেই রাখিয়া যান। অতি সামান্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া উহা পরিষ্কার করিলে স্থানটীও নোংরা হয় না এবং অন্য লোকের স্বাস্থ্যহানিরও আশঙ্কা থাকে না। হিন্দু হইয়া হিন্দুতীর্থে এপ্রকার অত্যাচার করা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

গৌহাটীর কর্ত্তৃপক্ষ আগন্তুকদিগের বিশ্রামের জন্য এই স্থানে একটী ডাকবাংলা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে অবস্থান করিলে কোনও প্রকার টেক্স দিতে হয় না।

জলপ্রপাতটীর পূর্ব্বপার্শ্বে বশিষ্ঠদেবের মন্দির আছে, প্রাচীন মন্দিরটী ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর বর্ত্তমান মন্দির পুরাতন উপকরণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীন মন্দিরটীও মধ্যে সংস্কৃত হইয়াছিল। একখানি শিলালিপি তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। মন্দিরগাত্রে গণেশদেব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। মন্দিরের মধ্যে মহাতপা মহর্ষি বশিষ্ঠদেব একখানি প্রায় ৩½ ফুট দীর্ঘ ও ২½ ফুট প্রস্থ অসমান প্রস্তরাকারে শায়িত আছেন। তিনটী কামরূপী ব্রাহ্মণ ইঁহার সেবক নিযুক্ত আছেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ যাত্রীদিগকে স্নান ও দর্শনাদির মন্ত্র পাঠ করাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা লইয়া থাকেন। কথিত আছে এই বশিষ্ঠকুণ্ডে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করিলে ব্রাহ্মণগণের নিত্য-ত্রিসন্ধ্যা-বন্দনা-দৈবাৎ-অকরণ-জনিত প্রত্যবায় হয় না। আমরা শ্রুত হইলাম যে, রাত্রিতে সময় সময় বন্যহস্তী এবং শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ এখানে আসিয়া থাকে কিন্তু তপোবনের নিয়মানুসারে তাহারা কখনও কোন হিংসা বা উৎপাত করে না। বশিষ্ঠমন্দিরের সম্মুখে একটী টিন-নির্ম্মিত নাটমন্দির আছে, তাহাতে অনেক যাত্রী ও সাধু সন্ন্যাসিগণ আশ্রয় লইয়া থাকেন। একখানি ক্ষুদ্র মুদী-দোকানও ঐ স্থানে আছে।

আমরা যথাবিধি স্নানাদি করিয়া এবং প্রচলিত নিয়মানুসারে রন্ধন, ভোজন সমাপনান্তে জলপ্রপাতের মধ্যস্থিত শিলাতলে উপবেশন করিয়া প্রায় ছয় ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করিয়াছিলাম। এ সময়টা যে কি সুখে কাটাইয়াছি তাহা এখন কল্পনায় আসে না। একজন অধ্যাপক বন্ধু মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের তারা-উপাসনা-বিষয়ক গীত এবং বক্তৃতা দ্বারা আমাদিগকে কিয়ৎকাল পরম আনন্দ দান করিয়াছিলেন। উক্ত বন্ধুবর যে এমন সুকণ্ঠ-গায়ক তাহা কখনও জানিতাম না। গানের কথায় অন্য সময়ে ক্রোধে তিনি "তেলে বেগুনে" হইতেন; কিন্তু আজ স্থানের গুণে তিনিও সুস্বরে ব্রহ্মময়ীর মহিমা গান করিয়াছিলেন।

আমরা বশিষ্ঠাশ্রমের অনির্ব্বচনীয় শান্তি-সুখ ও সুদৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৌহাটী আসিলাম এবং বাষ্পীয় শকট আরোহণে স্বদেশ যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যাসমাগমে ব্রহ্মপুত্রের গাঢ়নীলাম্বুরাশি ষ্টীমারে পার হইয়া পুনরায় শিলং মেলে আরোহণ করিলাম, এবং পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রা-ভঙ্গের পর স্বদেশের শোভাদর্শন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী।

জলস্থল

আমরা ডাঙার মানুষ কিন্তু আমাদের চারিদিকে সমুদ্র। জল এবং স্থল এই দুই বিরোধী শক্তির মাঝখানে মানুষ। কিন্তু মানুষের প্রাণের মধ্যে এ কি সাহস—যে-জলের কূল দেখিতে পাইনা মানুষ তাহাকেও বাধা বলিয়া মানিল না, তাহার মধ্যে ভাসিয়া পড়িল।

যে জল মানুষের বন্ধু সেই জল ডাঙার মাঝখান দিয়াই বহে। সেই নদীগুলি ডাঙার ভগিনীদের মত। তাহারা কতদূরের পাথরবাঁধা ঘাট হইতে কাঁখে করিয়া জল লইয়া আসে—তাহারাই আমাদের তৃষ্ণা দূর করে, আমাদের অন্নের আয়োজন করিয়া দেয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের এ কি বিষম বিরোধ! তাহার অগাধ

জলরাশি সাহারার মরুভূমির মতই পিপাসায় পরিপূর্ণ। আশ্চর্য্য, তবু সে মানুষকে নিরস্ত করিতে পারিল না। সে যমরাজের নীল মহিষটার মত কেবলি শিং তুলিয়া মাথা ঝাঁকাইতেছে কিন্তু কিছুতেই মানুষকে পিছু হঠাইতে পারিলনা।

পৃথিবীর এই দুইটা ভাগ—একটা আশ্রয় একটা অনাশ্রয়, একটা স্থির একটা চঞ্চল, একটা শান্ত একটা ভীষণ। পৃথিবীর যে-সন্তান সাহস করিয়া এই উভয়কেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছে সেই ত পৃথিবীর পূর্ণসম্পদ লাভ করিয়াছে। বিঘ্নের কাছে যে মাথা হেঁট করিয়াছে, ভয়ের কাছে যে পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, লক্ষ্মীকে সে পাইল না। এই জন্য আমাদের পুরাণকথায় আছে, চঞ্চলা লক্ষ্মী চঞ্চল সমুদ্র হইতে উঠিয়াছেন, তিনি আমাদের স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বীরকে তিনি আশ্রয় করিবেন লক্ষ্মীর এই পণ। এই জন্যই মানুষের সামনে তিনি প্রকাণ্ড এই ভয়ের তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন। পার হইতে পারিলে তবে তিনি ধরা দিবেন। যাহারা কূলে বসিয়া কলশব্দে ঘুমাইয়া পড়িল, হাল ধরিল না, পাল মেলিল না, পাড়ি দিল না তাহারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইল।

আমাদের জাহাজ যখন নীল সমুদ্রের ক্রুদ্ধ হৃদয়কে ফেনিল করিয়া সগর্ব্বে পশ্চিম দিগন্তের কূলহীনতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল তখন এই কথাটাই আমি ভাবিতে লাগিলাম। স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম য়ুরোপীয় জাতিরা সমুদ্রকে যেদিন বরণ করিল সেই দিনই লক্ষ্মীকে বরণ করিয়াছে। আর যাহারা মাটি কামড়াইয়া পড়িল, তাহারা আর অগ্রসর হইল না, এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া গেল।

মাটি যে বাঁধিয়া রাখে। সে অতি স্নেহশীলা মাতার মত সন্তানকে কোনমতে দূরে যাইতে দেয় না। শাকভাত তরিতরকারী দিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ায়, তাহার পরে ঘনছায়াতলে শ্যামল অঞ্চলের উপর ঘুম পাড়াইয়া দেয়। ছেলে যদি একটু ঘরের বাহির হইতে চায় তবে তাহাকে অবেলা অযাত্রা প্রভৃতি জুজুর ভয় দেখাইয়া শান্ত করিয়া রাখে।

কিন্তু মানুষের যে দূরে যাওয়া চাই। মানুষের মন এত বড় যে কেবল কাছটুকুর মধ্যে তাহার চলা ফেরা বাধা পায়। জোর করিয়া সেইটুকুর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গেলেই তাহার অনেকখানি বাদ পড়ে। মানুষের মধ্যে যাহারা দূরে যাইতে পাইয়াছে তাহারাই আপনাকে পূর্ণ করিতে পারিয়াছে। সমুদ্রই মানুষের সম্মুখবর্ত্তী সেই অতিদূরের পথ—দুর্লভের দিকে দুঃসাধ্যের দিকে সেইত কেবলি হাত তুলিয়া তুলিয়া ডাক দিতেছে। সেই ডাক শুনিয়া যাহাদের মন উতলা হইল, যাহারা বাহির হইয়া পড়িল তাহারাই পৃথিবীতে জিতিল। ঐ নীলাম্বুরাশির মধ্যে কৃষ্ণের বাঁশি বাজিতেছে—কূল ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য ডাক।

পৃথিবীর একটা দিকে সমাপ্তির চেহারা আর একটা দিকে অসমাপ্তির। ডাঙা তৈরি হইয়া গিয়াছে—এখনো তাহার মধ্যে যেটুকু ভাঙাগড়া চলিতেছে তাহার গতি মৃদুমন্দ, চোখে পড়েই না। সেটুকু ভাঙাগড়ারও প্রধান কারিগর জল। আর সমুদ্রের গর্ভে এখনো সৃষ্টির কাজ শেষ হয় নাই। সমুদ্রের মজুরী করে যেসকল নদনদী তাহারা দূর দূরান্তর হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি কাদা বালি মাথায় করিয়া আনিতেছে। আর কত লক্ষ লক্ষ শামুক ঝিনুক প্রবালকীট এই রাজমিস্ত্রির সৃষ্টির উপকরণ অহোরাত্র জোগাইয়া দিতেছে। ডাঙার দিকে দাঁড়ি পড়িয়াছে, অন্তত সেমিকোলন; কিন্তু সমুদ্রের দিকে সমাপ্তির চিহ্ন নাই। দিগন্তব্যাপী অনিশ্চয়তার চিরচঞ্চল রহস্যান্ধকারের মধ্যে কি যে ঘটিতেছে তাহার ঠিকানা কে জানে! অশান্ত এবং অশ্রান্ত এই সমুদ্র—অনন্ত তাহার উদ্যম।

পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি এই সমুদ্রকে বিশেষ ভাবে বরণ করিয়াছে তাহারা সমুদ্রের এই কূলহীন প্রয়াসকে আপন চরিত্রের মধ্যে পাইয়াছে। তাহারাই এমন কথা বলিয়া থাকে—কোন একটা চরম পরিণাম মানবজীবনের লক্ষ্য নহে, কেবল অবিশ্রাম ধাবমান গতির মধ্যেই আপনাকে প্রসারিত করিয়া চলাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাহারা অনিশ্চিতের মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কেবলি নব নব সম্পদকে আহরণ করিয়া আনিতেছে। তাহারা কোন একটা কোণে বাসা বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। দূর তাহাদিগকে

ডাকে, দুর্লভ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। অসন্তোষের ঢেউ দিবারাত্রি হাজার হাজার হাতুড়ি পিটাইয়া তাহাদের চিত্তের মধ্যে কেবলি ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত আছে। রাত্রি আসিয়া যখন সমস্ত জগতের চোখে পলক টানিয়া দেয় তখনো তাহাদের কারখানা-ঘরের দীপচক্ষু নিমেষ ফেলিতে জানে না। ইহারা সমাপ্তিকে স্বীকার করিবে না, বিশ্রামের সঙ্গেই ইহাদের হাতাহাতি লড়াই।

আর ডাঙায় যাহারা বাসা বাঁধিয়াছে তাহারা কেবলি বলে আর নহে, আর দরকার নাই। তাহারা যে কেবল ক্ষুধার খাদ্যটাকে সঙ্কীর্ণ করিতে চাহে তাহা নহে, তাহারা ক্ষুধাটাকে সুদ্ধ মারিয়া নিকাশ করিয়া দিতে চায়। তাহারা যেটুকু পাইয়াছে তাহাকেই কোনোমতে স্থায়ী করিবার উদ্দেশে কেবলি চারিদিকে সুনিশ্চিতের সনাতন বেড়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। তাহারা মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছে, আর যাই কর, কোন মতে সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করিয়ো না। কেননা সমুদ্রের হাওয়া যদি লাগে, অনিশ্চিতের স্বাদ যদি পাও, তবে মানুষের মনের মধ্যে অসন্তোষের যে একটা নেশা আছে তাহাকে আর কে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে! সেই অপরিচিত নূতনের রাগিণী লইয়া কালো সমুদ্রের বাঁশির ডাক কোনো একটা উতলা হাওয়ায় যাহাতে ঘরের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিতে না পারে সেই জন্যে কৃত্রিম প্রাচীরগুলাকে যত সমুচ্চ করা সম্ভব সেই চেষ্টাই কেবল চলিতেছে।

কিন্তু এই সমুদ্র ও ডাঙার স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধ ঘুচাইবার দিন আসিয়াছে বলিয়া মনে করি। এই দুয়ে মিলিয়াই মানুষের পৃথিবী। এই দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদকে জাগাইয়া রাখিলেই মানুষের যত কিছু বিপদ। তবে এত দিন এই বিচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে কেন? সে কেবল ইহারা হরগৌরীর মত তপস্যার দ্বারা পরস্পরকে পাইবে বলিয়াই। ঐ যে একদিকে স্থাণু দিগম্বরবেশে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন, আর একদিকে গৌরী নব নব বসন্তপুষ্পে আপনাকে সাজাইয়া তুলিতেছেন। স্বর্গের দেবতারা ইহাদেরই শুভযোগের অপেক্ষা করিয়া আছেন, নহিলে কোনো মঙ্গলপরিণাম জন্মলাভ করিবে না।

আমরা ডাঙার লোকেরা ভগবানের সমাপ্তির দিককেই সত্য বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি। তাহাতে ক্ষতি হইত না কিন্তু আমরা তাঁহার ব্যাপ্তির দিকটাকে একেবারেই মিথ্যা বলিয়া মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছি। সত্যকে এক অংশে মিথ্যা বলিলেই তাহাকে অপরাংশেও মিথ্যা করিয়া তোলা হয়। আমরা স্থিতিকে আনন্দকে মানিলাম কিন্তু শক্তিকে দুঃখকে মানিলাম না। তাই আমরা রাণীকে অপমান করাতে রাজার স্তব করিয়াও রক্ষা পাইলাম না, সত্য আমাদিগকে শত শত বৎসর ধরিয়া নানা আঘাতেই মারিতেছেন।

সমুদ্রের লোকেরা ভগবানের ব্যাপ্তির দিকটাকেই একেবারে একান্ত সত্য করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা সমাপ্তিকে কোনোমতেই মানিবে না এই তাহাদের পণ। এই জন্য বাহিরের দিকে তাহারা যেমন কেবলই আহরণ করিতেছে অথচ সন্তোষ নাই বলিয়া কিছুকেই লাভ করিতেছে না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের দিকেও তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, সত্যের মধ্যে গম্যস্থান বলিয়া কোনো পদার্থই নাই, আছে কেবল গমন। কেবলি হইয়া উঠা, কিন্তু কি যে হইয়া উঠা তাহার কোনো ঠিকানা কোনোখানেই নাই। ইহা এমন একটি সমুদ্রের মত যাহার কূলও নাই তলও নাই আছে কেবল ঢেউ,—যাহা পিপাসাও মেটায় না, ফসলও ফলায় না, কেবলই দোলা দেয়।

আমরা দেখিলাম আনন্দকে, আর দুঃখকে বলিলাম মিথ্যা মায়া—উহারা দেখিল দুঃখকে আর আনন্দকে বলিল মিথ্যা মায়া। কিন্তু পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে ত কোনোটাই বাদ পড়িতে পারে না—পূর্ব্বপশ্চিম সেখানে না মিলিলে পূর্ব্বও মিথ্যা হয় পশ্চিমও মিথ্যা হয়। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানিভূতানি জায়ন্তে—অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই সমস্ত কিছু জন্মিতেছে একথা যেমন সত্য, তেমনি "স তপোঽতপ্যত" অর্থাৎ তপস্যা হইতে দুঃখ হইতেই সমস্ত কিছু সৃষ্ট হইতেছে এ কথা তেমনি সত্য। গায়কের চিত্তে দেশকালের অতীত গানের পূর্ণ আনন্দও যেমন সত্য, আবার দেশকালের ভিতর দিয়া গান গাহিয়া প্রকাশ করিবার বেদনাও তেমনি সত্য।

এই আনন্দ এবং দুঃখ, এই সমাপ্তি ও ব্যাপ্তি, এই চির-পুরাতন এবং চিরনূতন, এই ধনধান্যপূর্ণ ভূমি ও দুঃখাশ্রুচঞ্চল সমুদ্র উভয়কে মিলিত করিয়া স্বীকার করাই সত্যকে স্বীকার করা।

এইজন্য দেখিতেছি যাহারা চরমকে না মানিয়া কেবল বিকাশকেই মানিতেছে তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া অপঘাত মৃত্যুর অভিমুখে ছুটিতেছে, পদে পদেই তাহাদের জাহাজ কেবল আকস্মিক বিপ্লবের চোরা পাহাড়ের উপর গিয়া ঠেকিতেছে। আর যাহারা বিকাশকে মিথ্যা বলিয়া কেবলমাত্র চরমকেই মানিতে চায় তাহারা নির্বীর্য্য ও জীর্ণ হইয়া এক শয্যায় পড়িয়া অভিভূত হইয়া মরিতেছে।

কিন্তু চলিতে চলিতে একদিন ঐ ডাঙার গাড়ি এবং সমুদ্রের জাহাজ যখন একই বন্দরে আসিয়া পৌঁছিবে এবং দুই পক্ষের মধ্যে পণ্যবিনিময় হইবে তখনি উভয়ে বাঁচিয়া যাইবে। নহিলে কেবলমাত্র আপনার পণ্য দিয়া কেহ আপনার দারিদ্র্য ঘুচাইতে পারে না;—বিনিময় না করিতে পারিলে বাণিজ্য চলে না এবং বাণিজ্য না চলিলে লক্ষ্মীর দেখা পাওয়া যায় না।

এই বাণিজ্যের যোগেই মানুষ পরস্পর মিলিবে বলিয়াই পৃথিবীতে ঐশ্বর্য্য দিকে দিকে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একদা জীবরাজ্যে স্ত্রীপুরুষের বিভাগ ঘটাতেই যেমন দেখিতে দেখিতে বিচিত্র সুখদুঃখের আকর্ষণের ভিতর দিয়া প্রাণীদের প্রাণসম্পদ আজ আশ্চর্য্যরূপে উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, তেমনি মানুষের প্রকৃতিও কেহবা স্থিতিকে কেহবা গতিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করাতেই আজ আমরা এমন একটি মিলনকে আশা করিতেছি মানুষের সভ্যতাকে যাহা বিচিত্রভাবে সার্থক করিয়া তুলিবে।

আরব সমুদ্র,
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩১৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিরাট

(অথর্ব্ববেদ)

কোন্ ভাগে তাঁর সত্য নিহিত?
কোথা ঋত আর কোথায় ব্রত?
কোন্ সে অঙ্গে শ্রদ্ধা বিরাজে?
কোথা তপস্যা সুসংযত?
কোন্ ভাগে তাঁর অগ্নি দীপিছে?
কোন্ খানে আর পবন বহে?
বিরাটের সেই বিপুল শরীরে
দিনে কোথা চাঁদ গোপন রহে?
কোন্ সে অঙ্গে তিষ্ঠে ভূলোক?
কোন্ সে অঙ্গে দ্যুলোক রাজে?
কোথায় আকাশ রয়েছে প্রকাশ
বিরাটের মহাবপুর মাঝে?
সকল পথের কোথা অবসান?
বায়ু কোথা ধায় সমুৎসুক?
কার অভিমুখে আহুতি বহিয়া
বহ্নি হয়েছে উর্দ্ধমুখ?
কার কটাক্ষে বৎসর মাস
করে যাতায়াত ঋতু ও তিথি?
কার ইঙ্গিতে মস্তকে তারা
বিহিত হব্য বহিছে নিতি?
শুক্লা ও শ্যামা,—দিবা বিভাবরী
নিত্য কাহারে ভজনা করে?
কাহার লাগিয়া নদে বহে স্রোত?
নির্ঝর ঝরে কাহার তরে?
প্রজাপতি প্রজা সৃজন করিয়া
রেখেছেন কোন্ স্তম্ভ 'পরে?
কোন্ স্তম্ভের স্তব্ধ ক্ষমতা
বিশ্বের ভার হেলায় ধরে?
উর্দ্ধে কোথায় উঠেছে সে ফুঁড়ে?
নীচে কত দূর গিয়েছে নেমে?
প্রজাপতি যেথা সৃজিছেন প্রজা
সেই ঠাঁয়ে শুধু আছে কি থেমে?
ভবিষ্য-বীজ কি আছে তাহাতে?
অতীতের বাকী রয়েছে কিবা?
এক হতে বহু গড়িবারে পঁহু
ব্যাপৃত আছে কি যামিনী দিবা?
তিন লোক আর ত্রিবিধ যে কোষ
সকলি রয়েছে তাঁহার মাঝে,

নিখিল-হৃত্থা ব্রহ্ম-বিত্থা
তাঁহারি মধ্যে মধুরে রাজে।
তপস্থা তাহে আছে ব্রত ধরি'
শ্রদ্ধা রয়েছে যজ্ঞ সাথে;
ধরি হাতে হাতে আছে সদসৎ,
মিলে মিশে আছে দিবসে রাতে।
তাঁহারি মধ্যে নিখিল দেবতা,
পৃথিবী, আকাশ, সূর্য্য, শশী;
অগ্নি ও বায়ু, মৃত্যু ও আয়ু,
ঋক্, সাম, যজু, তাপস বশী।
দিক্‌চয় তাঁর চেতনা-তন্তু,
সপ্ত সাগর তাঁহার নাড়ী;
মধুমতী কশা জিহ্বা তাঁহার,
নাই কিছু নাই তাঁহারে ছাড়ি'।
সেই প্রজাপতি, পরমেষ্ঠী সে,
ব্রহ্মবিদেরা তাহারে জানে;
স্তম্ভ,—ধারক, স্কম্ভ,—পূরক,
তারে অথর্ব্ব ঘোষিছে গানে।
যাতুধান—যারা যাদু জানে—তারা
বিরাটেরি দেহে বিরাজ করে;
অঙ্গিরা তাঁর নয়ন সমান,
অগ্নি তাঁহার ললাট 'পরে।
কেহ অশথের অসৎ শাখাটি
দেখিছে ভুবনে প্রতিষ্ঠিত,
অধমে ভজিছে পরম বলিয়া
শাখায় মজিয়া হতেছে প্রীত!
বিরাটের কথা তাহারা জানেনা,
যাঁর অতুলন রতন-কোষ
দেবতারা মিলি' রক্ষা করিছে,—
ব্রহ্মবিত্থা সুনির্দ্দোষ।
ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠ সব দেবতার
সকল দেবতা তাঁহারে পূজে,
তাঁরে যে জেনেছে, যজ্ঞসময়ে
যত যজমান তারেই খুঁজে।
পুরাণ পুরুষ পুত্র তাঁহারি,—
উপজিল তাঁরি অঙ্গ হ'তে;
আর হিরণ্য-গর্ভ উপজে
তাহারি সেচন হিরণ-স্রোতে।
শুক্র রয়েছে ইন্দ্রের মাঝে
ব্রহ্মেরি সেই তেজের কণা,
ইন্দ্র আছেন বিরাটের মাঝে
বিরাটের মাঝে সকল জনা।
নানা দেবতার নামে, নামে, নামে,
হ'তেছে আহুত যজ্ঞে হবি,
অনাদি বিরাট অজ-সম্রাট
তবু লভিছেন একাই সবি!
সূর্য্য তাঁহার অনিমেষ আঁখি
আর চন্দ্রমা পুনর্ণব,
অগ্নি আস্য, হাস্য আলোক,
আকাশ উদর, আসন ভব।
উন্মদ উনপঞ্চাশ বায়ু
হ'য়েছে তাঁহার পঞ্চ প্রাণ,
তিনিই জ্যেষ্ঠ, তিনিই শ্রেষ্ঠ
তিনিই ব্রহ্ম লোক-নিধান।
কৈবল্যের নিদান করিয়া
যে সৃজিল সোম অমৃতোপম,
ধরিল যে দ্যাবাপৃথিবীরে আর
অন্তরীক্ষে,—তাহারে নম।
জল তারি ছলে চলে অহরহ,
বায়ু তারি মাঝে বিরতি মানে;
তারি ধ্যানে মন সদা নিমগন
ধায় ঋক সাম তাহারি পানে।
বিরাট পুরুষ বিরাজে ভুবনে
সলিল-পৃষ্ঠে তপে নিরত,
দেবতা-সমাজে ঘিরে তারে আছে
মূলেরে ঘিরিয়া শাখার মত।
দেবতা মানব বন্দে তাঁহারে
সেবা করে কায়-বচন-চিতে,—
বলি সম্ভার জোগায় নিয়ত,—
উক্‌থ রচে,—সে তাঁহারি প্রীতে।
তিনি নির্ম্মল, তিনি নিষ্কল,
তাঁর কটাক্ষে লুকায় তম,

পাপের কলুষ তাঁরে না পরশে,
দেব-অধিদেব তাঁহারে নম।
তাহারি শরীরে করিছে বসতি
তিন ভুবনের তিনটি জ্যোতি,
নিখিল-ভরণ বিশ্ব-শরণ
তিনি হন্ প্রজাপতির পতি।
সকল প্রজার সাথে প্রজাপতি
তাঁরি সেবা করে হরষ-মতি;
সলিলে নিহিত স্বর্ণ-বেতস,—
তাঁর রহস্য নিগূঢ় অতি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

টাইটানিকের হিসাবনিকাশ

টাইটানিক-জাহাজ ডুবি লইয়া জগতে একটা তোলপাড় হইয়া গেল, এত তোলপাড় যখন বঙ্গোপসাগরে এক-জাহাজ ভারতবাসী নরনারী তীর্থযাত্রী ডুবিয়াছিল তখন হয় নাই, সেদিন যখন ইতালীয় ফৌজ কত সহস্র অসহায় তুর্ক রমণীকে জালবদ্ধ জন্তুর মত নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিল তখনও নয়; চীনে যেদিন কত সহস্র বৎসরের প্রাচীন পুস্তকাগারে আগুন লাগাইয়া ইউরোপীয় ফৌজ সভ্য-জগতের সম্মুখে আলেকজাণ্ড্রা পুস্তকাগারের চিতাসজ্জার পুনরভিনয় করিয়াছিল সেদিন সভ্য-জগতে বিশেষ একটা সাড়া পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পূবে এতগুলা বিষম ব্যাপার ঘটিয়া গেল, কোন উচ্চবাচ্য হইল না, আর পশ্চিম সমুদ্রে একটি জলবুদ্বুদ মিলাইতে না মিলাইতে পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে ঝন্‌ঝনা পড়িয়া গেছে, অথচ পূবে যে কাণ্ডগুলা ঘটিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা পশ্চিমের এই দুর্ঘটনাটা যে অধিক হৃদয়বিদারক তাহা নয়। অতএব দেখিতেছি কোন একটা ঘটনাকে হৃদয়বিদারক করিয়া তোলা না তোলা খবরের কাগজের কাজ। পূর্ব্ব দেশগুলা যেন ফাঁকা জালা, পশ্চিমে শব্দ উঠিলে অমনি প্রতিধ্বনি দেয়। খবরের কাগজে টাইটানিক ধুয়া উঠিবার মুখেই আমি সহর ছাড়িয়া সমুদ্রতীরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম। সেখানে খবরের কাগজের আনাগোনা বড় একটা নাই সুতরাং সমুদ্রের ধারে বসিয়াও ঐ জাহাজডুবির কথা ভাবিবার কোন কারণ ঘটে নাই। কলিকাতায় ফিরিবামাত্র দেখি কাগজে পত্রে ছত্রে ছত্রে টাইটানিক-কাহিনী! এত বড় একটা ঘটনাকে দুই মাস ধরিয়া আমি যে মন হইতে বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়াছিলাম তাহারি শোধ তুলিবার জন্য এই কাহিনীটা দ্বিগুণ বেগে আমায় আক্রমণ করিয়াছে এবং ঐ জাহাজ ঢেউ বরফের পাহাড় ইত্যাদি নানা সামগ্রী লইয়া আমার মস্তিষ্কে একটা সমুদ্রমন্থন-কাণ্ড বাধাইয়া দিয়াছে।

টাইটানিক-সাহিত্য আলোচনা করিয়া অনেকে অনেক জ্ঞানলাভ ও অর্থলাভ করিয়াছেন, আমিও যে কিছু লাভ করিলাম না তাহা নয়, তবে সেটা যে অর্থ নয় এটা ঠিক এবং সেটা যে বড় বেশি কিছু নয় তাহাও ঠিক।

আমি দেখিলাম টাইটানিক সম্বন্ধে factগুলি একে একে পরে পরে সাজাইয়া হিসাব করিতে গিয়া ঠিকে ভুল ছাড়া আর বড় একটা কিছু পাইতেছি না, সুতরাং ব্যাপারটা আমার কাছে চিরকালই একটা প্রহেলিকার মত রহিয়া গেল দেখিতেছি।

টাইটানিকের হিসাবনিকাশ আমি যে ভাবে করিতেছি তাহার আভাষটা এইরূপ :—

প্রথম খবর—জাহাজ ডুবিবার কালে মহিলা ও শিশু-গণকে প্রথমে প্রাণরক্ষার জন্য নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পরের খবর—প্রথম শ্রেণীর অধিকাংশ যাত্রিগণই কেবলমাত্র নিজেদের ও নিজ নিজ স্ত্রী পুত্র রক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ যাত্রী কি মহিলা কি পুরুষ কেহ সে সুযোগ পান নাই!

উত্তর—প্রথম খবরটা পড়িয়া শ্বেত পুরুষের নির্ভীকতা এবং স্ত্রীজাতির প্রতি একটা সম্মান ও করুণার সমুজ্জ্বল ছবি মনে জাগিয়া উঠে কিন্তু পরের খবরে মনটা ছোট হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে শ্বেতাঙ্গের অদ্ভুত আত্মত্যাগের মহিমাটাও খাটো হইয়া পড়ে। মনে হয় ঐ জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে যদি একদল শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও একদল ভারতমহিলা থাকিত তবে প্রথম প্রাণরক্ষার সুযোগ মহিলারা পাইত কি পুরুষে পাইত?

প্রত্যুত্তর—খুব সম্ভব আমেরিকান ক্রোরপতিরাই পাইত—কেননা শুনিতেছি নাকি এক ক্রোরপতি নিজের নৌকায় পাছে অধিক লোক উঠিয়া পড়ে সেইজন্য নাবিকদের রীতিমত ঘুষ দিয়া লোকটা নৌকাখানি একাই দখল করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল।

ফলে দাঁড়াইতেছে—শ্বেতাঙ্গ পুরুষদিগের স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও আত্মত্যাগটার বিশেষ কিছু নিদর্শন টাইটানিক ডুবি হইতে পাওয়া গেল না, এখানেও যেমন সেখানেও তেমন 'চাচা আপন বাঁচা'। যাহারা পয়সা ফেলিয়াছে তাহারা বাঁচিয়াছে।

দ্বিতীয় খবর:—জাহাজ যতক্ষণ জলের উপরে ছিল ততক্ষণ নৌবাদ্যকরগণ 'Nearer to my God' এই ধর্ম্মসঙ্গীত বাজাইতেছে শুনা গিয়াছিল।

পরের খবর:—মগ্ন জাহাজের দিক হইতে একটা বিরাট কাতরধ্বনি একঘণ্টা কাল ধরিয়া সমুদ্রের বহুদূর পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছিল।

উত্তর—পূর্ব্বোক্ত যে ধর্ম্মসঙ্গীত সেটা শ্বেতাঙ্গ নাবিকগণের। জাহাজ ডুবিতেছে, নাবিকগণ ও ফাষ্টক্লাস যাত্রিগণ মিলিয়া ধর্ম্মসঙ্গীতে যোগদান করিতেছে, এটা খুবই Dramatic, কিন্তু ঐ যে জাহাজের খোলের ভিতর হইতে বিকট ক্রন্দন উঠিল সেটা তো' Dramatic আদপে নয়? ঐ বিকট চীৎকার যেটা টাইটানিক-সঙ্গীতশালার রসভঙ্গ করিতেছে সেটা কাহাদের?

প্রত্যুত্তর:—সেটা হচ্ছে সেই হতভাগ্য দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের এবং যেসকল কালা লস্কর ও চীনে মিস্ত্রী যাহারা শেষ পর্য্যন্ত জাহাজের কল চালাইয়াছে জল সেঁচিয়াছে তাহাদেরই।

ফলে:—টাইটানিক-জাহাজ-ডুবিতে যাহারা বাস্তবিক Nearer to God ছিল তাহাদের সাড়া তোমরা শুনিতে পাও নাই, তোমরা শুনিয়াছ কেবল খবরের কাগজের ঢাকের বাদ্যি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুই ইচ্ছা

কেবল মানুষই বলে, আশার অন্ত নাই; পৃথিবীর আর কোনো জীব এমন কথা বলে না। আর সকল প্রাণী প্রকৃতির একটা সীমার মধ্যে প্রাণ ধারণ করে এবং তাহার মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাও সেই সীমাকে মানিয়া চলে। জন্তুদের আহার বিহার নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সীমাকে লঙ্ঘন করিতে চায় না। এক জায়গায় তাহাদের সাধ মেটে এবং সেখানে তাহারা ক্ষান্ত হইতে জানে। অভাব পূর্ণ হইলে তাহাদের ইচ্ছা আপনি থামিয়া যায়—তাহার পরে আবার সেই ইচ্ছাকে তাড়না করিয়া জাগাইবার জন্য তাহাদের দ্বিতীয় আর একটা ইচ্ছা নাই।

মানুষের প্রকৃতিতে আশ্চর্য্য এই দেখা যায়—একটা ইচ্ছার উপর সওয়ার হইয়া আর একটা ইচ্ছা চাপিয়া আছে। পেট ভরিয়া গেলে খাইবার ইচ্ছা যখন আপনি মিটিয়া যায় তখনো সেই ইচ্ছাকে জোর করিয়া জাগাইয়া রাখিবার জন্য মানুষের আর একটা ইচ্ছা তাগিদ করিতে থাকে। সে কোনো মতে চাটুনি খাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আহারের আসন্ন ইচ্ছাকে প্রয়োজনের উর্দ্ধেও চালনা করিতে থাকে।

ইহাতে মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কারণ, ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা নহে। স্বাভাবিক ইচ্ছা সহজেই আপন প্রাকৃতিক স্বভাবের সীমার মধ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। আর মানুষের এই অস্বাভাবিক ইচ্ছা কিছুতেই তৃপ্তি মানিতে চায় না। তাহার মধ্যে একটা কি আছে যে কেবলি বলিতেছে—আরো, আরো, আরো!

কিন্তু যাহাতে মানুষের ক্ষতি করিতে পারে সে ইচ্ছা মানুষের থাকে কেন? নিজের এই দুরন্ত ইচ্ছাটার দিকে তাকাইয়াই মানুষ বিশ্বব্যাপারে একটা সয়তানের কল্পনা করিয়াছে। য়িহুদি পুরাণের প্রথম নরনারী যখন স্বর্গোদ্যানে ছিল তখন ঈশ্বর তাহাদের ইচ্ছাকে প্রকৃতির সীমার মধ্যে বাঁধিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন ইহার মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকিয়ো। প্রাণের রাজ্যই তোমাদের রহিল জ্ঞানের রাজ্যে লোভ দিয়ো না। স্বর্গোদ্যানের প্রত্যেক জীবজন্তুই সেই সন্তোষের সীমার মধ্যেই বদ্ধ রহিল কেবল মানুষই বলিল যাহা পাওয়া গেছে তাহার চেয়ে আরো পাওয়া চাই। এই

যে আরোর দিকে সে পা বাড়াইল এ বড় বিষম রাজ্য। এখানে স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির কোনো সীমা কোথাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই এইজন্য কোন্‌দিকে কতদূর পর্য্যন্ত যে যাওয়া যায় তাহার পরামর্শদাতা পাওয়া শক্ত। এইজন্য এই অতৃপ্তির পথহীন রাজ্যে মরিবার আশঙ্কা চারিদিকেই বিকীর্ণ। এমন ভয়ানক ক্ষেত্রে মানুষকে দুর্নিবারবেগে যে টানিয়া আনিল মানুষ তাহাকে গালি দিয়া বলিল সয়তান।

কিন্তু রাগই করি আর যাই করি জগতে সয়তানকে ত মানিতে পারি না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে মানুষের এই যে ইচ্ছার উপরে আরোর জন্য আরো একটা ইচ্ছা ইহা তাহার বাহিরের দিক হইতে একটা শত্রুর আক্রমণ নহে। ইহাকে মানুষ রিপু বলে বলুক কিন্তু এই ইচ্ছাই তাহার যথার্থ মানবস্বভাবগত ইচ্ছা। সুতরাং যতক্ষণ এই ইচ্ছাকে সে জয়ী করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার কিছুতেই শান্তি নাই,—ততক্ষণ তাহাকে কেবলি আঘাত খাইয়া খাইয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে।

কিন্তু এই আরোর ইচ্ছাকে সে জয়ী করিবে কেমন করিয়া? আহার করিলে পেট তাহার ভরিবেই—ভোগ করিলে এক জায়গায় তাহার নিবৃত্তিতে আসিয়া ঠেকিতেই হইবে—আরোর ইচ্ছাকে সেখানে কোনো একটা সীমায় আসিয়া হার মানিতেই হইবে। শুধু হার মানা নয়, সে জায়গায় সে দুঃখ পাইবে এবং দুঃখ ঘটাইবে। ব্যাধি আসিবে, বিকৃতি আসিবে, সে নিজেকে এবং অন্যকে বাধা দিতে থাকিবে। কেননা, প্রকৃতি যেখানে সীমা টানিয়াছেন তাহাকে লঙ্ঘন করিতে গেলেই শাস্তি আছে।

শুধু তাই নয়। প্রকৃতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের এই আরোর ইচ্ছাকে দৌড় করাইতে গেলেই পরস্পরের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে হয়। যেটুকু আমার আছে তাহার চেয়ে বেশি লইতে গেলেই যেটুকু তোমার আছে তাহার উপর হাত দিতে হয়। তখন, হয় গোপনে ছলনা, নয় প্রকাশ্যে গায়ের জোর আশ্রয় করিতে হয়। তখন দুর্ব্বলের মিথ্যাচার ও প্রবলের দৌরাত্ম্যে সমাজ লণ্ডভণ্ড হইতে থাকে।

এমনি করিয়াই পাপ আসে, বিনাশ আসে। কিন্তু এই পাপ যদি না আসিত তবে মানুষ পথ দেখিতে পাইত না। এই আরোর অতৃপ্তি যেখানে তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় সেখানে যদি পাপের আগুন জ্বলে তবে ঘোড়াটাকে কোনো মতে বাগ মানাইয়া ফিরাইয়া আনিবার কথা মনে আসে। এইজন্য মনুষ্যলোকে অন্যান্য সকল শিক্ষার উপরে সেই সাধনাটা প্রচলিত যাহাতে ঐ আরোর ইচ্ছাটাকে বশে আনা যায়। কেননা, মানুষকে ঈশ্বর ঐ একটা ভয়ঙ্কর বাহন দিয়াছেন, ও আমাদের কোথায় লইয়া গিয়া যে ফেলে তাহার ঠিকানা নাই। উহার মুখে লাগাম পরাও, উহাকে চালাইতে শিখ। কিন্তু তাই বলিয়া উহার দানাপানি একেবারে বন্ধ করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিলে চলিবে না। কেননা, এই আরোর ইচ্ছাই মানুষের যথার্থ বাহন।

প্রয়োজনসাধনের ইচ্ছা জন্তুদের বাহন। এইটে না থাকিলে তাহাদের জীবনযাত্রা একেবারেই চলিত না। এই ইচ্ছাটাই প্রাকৃতিক জীবনের মূল ইচ্ছা। ইহাই দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যেখানে বাধা পায় সেইখানেই জন্তুদের দুঃখ, যেখানে তাহার পূরণ হয় সেইখানেই তাহাদের সুখ। তাই দেখা যায় জন্তুদের সুখদুঃখ আছে কিন্তু পাপপুণ্য নাই।

কিন্তু মানুষের মধ্যে এই যে আরোর ইচ্ছা, ইহা আরামের ইচ্ছা নহে, সুখের ইচ্ছা নহে, বস্তুত ইহা দুঃখেরই ইচ্ছা। মানুষ যে কেবলই প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আপন জ্ঞান প্রেম ও শক্তিরাজ্যের উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করিবার জন্য বারম্বার বাহির হইয়া পড়িতেছে ইহা তাহার সুখের সাধনা নহে। ইহা তাহার কোনো বর্ত্তমান প্রয়োজন সাধনের ইচ্ছা নহে।

বস্তুত মানুষের মধ্যে এই যে দুই স্তরের ইচ্ছা আছে ইহার মধ্যে একটা প্রয়োজনের ইচ্ছা, আর একটা অপ্রয়োজনের ইচ্ছা। একটা, যাহা না হইলে কিছুতেই চলে না তাহার ইচ্ছা, এবং অন্যটা, যাহা না হইলে অনায়াসেই চলে তাহার ইচ্ছা। আশ্চর্য্য এই যে, মানুষের মনে এই দ্বিতীয় ইচ্ছাটার শক্তি এমন প্রবল যে, সে যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই প্রথম ইচ্ছাটাকে একেবারে ছারখার করিয়া দেয়, তখন সে সুখসুবিধাপ্রয়োজনের কোনো দাবিতেই একেবারে কর্ণপাত করে না। তখন সে বলে আমি সুখ চাহি না, আমি আরোকেই চাই; সুখ

আমার সুখ নহে, আরোই আমার সুখ। তখন সে বলে ভূমৈব সুখং।

সুখ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ভূমা নহে। ভূমা সুখ নহে, আনন্দ। সুখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে, সুখের বিপরীত দুঃখ কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নহে। শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন আনন্দ তেমনি করিয়া দুঃখকে অনায়াসেই গ্রহণ করে। এমন কি, দুঃখের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সার্থক করে, আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই দুঃখের তপস্যাই আনন্দের তপস্যা।

তাই দেখিতেছি অন্যান্য জন্তুদের ন্যায় মানুষের নীচের ইচ্ছাটা দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা, আর উপরের ইচ্ছাটা দুঃখকে আত্মসাৎ করিয়া আনন্দলাভের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই কেবলি আমাদিগকে বলিতেছে "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"

তাই প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে আপন সহজবোধটুকু লইয়া জন্তু দুঃখনিবৃত্তিচেষ্টার সনাতন গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিল। মানুষ তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞানপ্রেমশক্তির কোনো সীমাতেই বদ্ধ হইতে চাহিল না; সে বলিল, অভ্যাসকে নহে, সংস্কারকে নহে, প্রথাকে নহে, আমি ভূমাকে জানিব।

তাই যদি হয় তবে এই আরোর ইচ্ছাকে এই আনন্দের ইচ্ছাকে এত করিয়া বশে আনিবার জন্য মানুষের এমন প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন কি ছিল? এই প্রকাণ্ড ইচ্ছার প্রবলস্রোতে চোখ বুজিয়া আত্মসমর্পণ করিলেই ত মানুষের মনুষ্যত্ব সার্থক হইত!

ইচ্ছাকে বল্গাবদ্ধ করিবার প্রধান কারণ এই যে দুটা ইচ্ছার অধিকার নির্ণয় লইয়া মানুষকে বিষম সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে। আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের একটা ক্ষেত্র আছে সেখানে আমরা সীমাবদ্ধ। সেখানে আমাদের বাসনাকে তাহার সহজ সীমার চেয়ে জোর করিয়া টানিয়া বাড়াইতে গেলেই বিপদ ঘটিবে। এই সীমানার বেড়াটা কিছুপরিমাণে স্থিতিস্থাপক—এইজন্য কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহা টান সয়। দুঃসাহসে ভর করিয়া সেই টান কেবলি বাড়াইতে গেলে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হয়, ব্যাবিলনের সৌধচূড়া ভাঙিয়া পড়ে। আমাদের আরো-ইচ্ছার মন্থনদণ্ডকে ঐদিকেই পাক দিতে গেলে ব্যাধি বিকৃতি ও পাপের বিষ মথিত হইয়া উঠে।

দেখা যাইতেছে, মানুষের অহং-এর দিকটাই সঙ্কীর্ণ। সেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে যাহাই গ্রহণ করিতে চাও তাহাই বোঝা হইয়া উঠে। নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ, নিজের ক্ষমতাকে অপরিসীম করিবার চেষ্টা আত্মহত্যার চেষ্টা। ও জায়গায় ভূমার ভর একেবারেই সয় না। আহারে বিহারে স্বার্থসাধনে ভূমা অতি বীভৎস।

এই কারণে মানুষের এই আরোর ইচ্ছাটা যখন মত্ত হস্তীর মত তাহার ক্ষণভঙ্গুর অহং-এর ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহার বিষম বিপদ। কেবল যদি তাহাতে নিজের ও অন্যের দুঃখ আনিত তাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু ইহার দুর্গতি তাহার চেয়ে আরো অনেক বেশি। ইহাতে পাপ আনে—দুঃখের পরিমাপে তাহার পরিমাপ নহে। কারণ, পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি কেবলমাত্র দুঃখের দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয় না—এমন কি, দুঃখের দ্বারা মানুষের মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু পাপই মানুষের পরম ক্ষতি।

ইহার উল্টা দিকটাও দেখ। মানুষের প্রয়োজনের ইচ্ছা, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ সাংসারিক ইচ্ছা যখন স্বার্থের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পরমার্থের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন সেও বড় কুৎসিত। তখন সে কেবলি পুণ্যের হিসাব রাখিতে থাকে। যাহা পূর্ণ আনন্দ, যাহা সকল ফলাফলের অতীত তাহাকে ফলাফলের অঙ্কে গুণভাগ করিয়া গণনা করিতে থাকে। এবং সেই গণনার উপর নির্ভর করিয়া মানুষ অহঙ্কৃত হইয়া উঠে; কেবলি বাহ্যিকতার জালে জড়াইয়া পড়ে; এবং স্বার্থপর শুচিতাকে কৃপণের ধনের মত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অত্যন্ত সাবধানে জমা করিয়া তুলিতে থাকে। তখন সে ভূমার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সাংসারিকের মত নিজের একটা বেড়া তুলিয়া দিয়া বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। ইহাও পাপের আর এক মূর্ত্তি। ইহা আধ্যাত্মিককে বাহ্যিক ও পরমার্থকে স্বার্থ করিয়া তোলা।

মানুষের মনে এই যে একটা পাপের বোধ আসে সে জিনিষটা কি তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমাদের যে মহতী ইচ্ছা আমাদিগকে ভূমার দিকে লইয়া যাইবে

তাহাকে ঠিক বিপরীত পথে ক্ষুদ্র অহং-এর অভিমুখে টানিয়া আনিলে কেবল যে দুঃখ ঘটে তাহা নহে (এমন কি, স্থলবিশেষে দুঃখ না ঘটিতেও পারে) তাহাতে আমরা ভূমাকে হারাই। আমাদের বড়র দিক আমাদের সত্যের দিক নষ্ট হইয়া যায় ;—জন্তুর পক্ষে তাহাতে কিছুই আসে যায় না কিন্তু মানুষের পক্ষে তেমন বিনাশ আর কিছু নাই। এই বিনাশের বোধ সকলের চিত্তে সমান নহে, এমন কি, কারো কারো চিত্তে অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু মোটের উপর সমগ্র মানবের মনে এই পাপের বোধ দুঃখবোধের চেয়ে অনেক বড় হইয়া আছে। এতই বড় যে বহুদুঃখের দ্বারা মানুষ এই পাপকে ক্ষয় করিতে চায়। পাপ নামক শব্দের দ্বারা মানুষ নিজের যে একটি গভীরতম দুর্গতিকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে ইহার দ্বারাই মানুষ আপনার সত্যতম পরিচয় দিয়াছে।

সে পরিচয়টি এই যে, সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র নহে—অনন্তের মধ্যেই মানুষের আনন্দ। অহং-এর দিকই মানুষের চরম সত্যের দিক নহে, ব্রহ্মের দিকেই তাহার সত্য। মানুষ আপনার মধ্যে যে একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে ইচ্ছা কোনোমতেই অল্পকে মানিতে চায় না, তাহা দুঃসহ তপস্যার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মানুষের চিত্তকে আনন্দময় মুক্তির অভিমুখে কেবলি প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেমভক্তি ও পবিত্রতায় মানুষের সমস্ত চেতনাধারাকে এক অপরিসীম অতলস্পর্শ অমৃতপারাবারের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মানুষের সেই পরমগতিকে যাহা কিছু বাধা দেয়, যাহা তাহাকে বিপরীত দিকে টানে, তাহাই পাপ, তাহাই দুর্গতি, তাহাই তাহার মহতী বিনষ্টি।

লোহিতসমুদ্র,
বুধবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোচনা

আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান।

এই প্রসঙ্গে আলোচনার উত্তরে শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় জানাইয়াছেন যে তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পুস্তকখানি নিজে বুঝিবার ও পরকে বুঝাইবার জন্য বারংবার পড়িয়াছেন ; এবং ২০ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহা প্রথমে প্রকাশিত হয় তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত বহুবার পড়িয়াছেন, আলোচনা করিয়াছেন, তথাপি ঐ পুস্তক হইতে সীতানাথ বাবুর নির্দ্দিষ্ট উত্তর তিনি পান নাই। ইহা হইতে মনোরঞ্জন বাবুর বিশ্বাস হইয়াছে যে সীতানাথ বাবু তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াই বিচার মীমাংসার কোনো চেষ্টা করেন নাই, কারণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা গ্রন্থে আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান সম্পর্কীয় সন্দেহের নিরসন করিবার চেষ্টা বা আভাস মনোরঞ্জন বাবু কোথাও খুঁজিয়া পান নাই।

গীতাপাঠ*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

"বেদে ক্রিয়াকর্ম্মের বিধান-ব্যবস্থা যত কিছু আছে সবই ত্রৈগুণ্যবিষয়ক, তুমি অর্জ্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও।" এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ উহার সঙ্গে আর চারিটি বচন যোজনা করিয়া উহার ভাবার্থ ফুটাইয়া দিতেছেন ;—বলিতেছেন— (১) "নির্দ্বন্দ্ব হও," (২) "নিত্যসত্ত্বস্থ হও" (৩) "বিষয়ঘটিত লাভালাভ মনে স্থান দিও না," (৪) "আত্মবান্ হও।" সমগ্র শ্লোকটি এই :—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।"

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ নির্দ্বন্দ্ব-শব্দের অর্থ ভাঙিয়া দিতেছেন এইরূপ :—

"সুখদুঃখ মান-অপমান রাগদ্বেষ শীতোষ্ণ প্রভৃতি দুই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের সংস্রব হইতে বিনির্ম্মুক্ত—এই অর্থে নির্দ্বন্দ্ব।" কথাটা ঠিক্। কিন্তু ঐ কথাটুকুর অস্ফুট আলোকে নিস্ত্রৈগুণ্য এবং নির্দ্বন্দ্বের মধ্যে বন্ধনের আঁট যে কিরূপ তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন। তাহার সন্ধান পাইতে হইলে বর্ত্তমান গীতাপাঠ প্রবন্ধে পূর্ব্বের একটি প্রপাঠে সত্ত্বরজস্তমোগুণের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা যাহা বলা হইয়াছে, সেই কথাটির প্রতি আবার একবার মনঃসমাধান করা আবশ্যক। কথাটি সংক্ষেপে এই :—

সত্ত্বগুণের প্রধান যে-দুইটি অঙ্গ—প্রকাশ এবং আনন্দ, দোঁহার সঙ্গে দোঁহার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী লাগিয়া আছে।

* বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে পঠিত।

প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী কে? না অন্ধতা এবং জড়তা, এক কথায়—তমোগুণ। আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী কে? না দুঃখ এবং অশান্তি, এক কথায়—রজোগুণ। সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজস্তমোগুণের উভয়েরই একে-তো এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহাতে আবার রজস্তমোগুণের আপনা-আপনির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় যে কম তাহা নহে। তার সাক্ষী—একদিকে রজোগুণের প্রকৃতি-সিদ্ধ দুঃখযন্ত্রণার ছট্‌ফটানি এবং উচ্ছৃঙ্খলতার দাপাদাপি, আরেক দিকে তমোগুণের প্রকৃতিসিদ্ধ অপ্রকাশের অন্ধকার এবং জড়তার নাগপাশ, দুয়ের মধ্যে যে কিরূপ সর্প-নকুলের সম্বন্ধ তাহা কাহারো চক্ষে ঢাকা থাকিতে পারে না। অতএব এটা স্থির যে, দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বি ত্রৈগুণ্যের সঙ্গের সঙ্গী, আর, তাহা হইতেই আসিতেছে যে, নির্দ্বন্দ্বভাব নিস্ত্রৈগুণ্যের সঙ্গের সঙ্গী।

এখানে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, নির্গুণভাব স্বতন্ত্র এবং নিস্ত্রৈগুণ্য ভাব স্বতন্ত্র। শূন্য (০) এবং এক (১) এ দুয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, নির্গুণ এবং নিস্ত্রৈগুণ্যের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ। নির্গুণ হওয়া কাহাকে বলে? না একেবারেই গুণবর্জ্জিত হওয়া। নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়া কাহাকে বলে? না তিন গুণের দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বির প্রতিকূলে আত্মশক্তি খাটাইয়া দ্বন্দ্ব-বিনির্ম্মুক্ত একটিমাত্র গুণের সূর্য্যালোকে প্রভাতের পদ্মের ন্যায় মাথা তুলিয়া এবং হৃদয় খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ানো। সে গুণ কি? না রজস্তমোগুণ-দ্বারা অবাধিত পরমপরিশুদ্ধ ঐশ্বরিক সত্ত্বগুণ। (১) রজোগুণ, (২) তমোগুণ, (৩) সত্ত্বগুণ, (৪) মলিন সত্ত্ব বা মিশ্র সত্ত্ব, (৫) শুদ্ধ সত্ত্ব, এই পাঁচের কাহার কিরূপ পরিচয়-লক্ষণ—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থে তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ:—

(১) রজোগুণের পরিচয়-লক্ষণ।

বিক্ষেপশক্তীরজসঃ ক্রিয়াত্মিকা
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।
রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং
দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ॥
কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভোঽভ্যসূয়াঽ-
হঙ্কারের্ষ্যা মৎসরাদ্যাশ্চ ঘোরাঃ।
ধর্ম্মা এতে রাজসাঃ পুম্প্রবৃত্তিঃ
যস্মাদেষা তদ্রজো বন্ধহেতুঃ॥

ইহার অর্থ এই:—

রজোগুণের বিক্ষেপশক্তি ক্রিয়াত্মিকা।* তাহা হইতেই আদিহীনা প্রবৃত্তি-ধারা অজস্র প্রবাহিত হইতেছে। তাহা হইতেই রাগাদি এবং দুঃখাদি মনোবিকারসকল নিত্য-নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অসূয়া (Jealousy), পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি ঘোরা বৃত্তি যত কিছু আছে সমস্তই রজোগুণের ধর্ম্ম। যাহার উত্তেজনায় পুরুষের মনে এইসব প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে তাহাই রজোগুণ, আর তাহাই বন্ধনের হেতু।

(২) তমোগুণের পরিচয়-লক্ষণ।

অজ্ঞানমালস্য জড়ত্ব নিদ্রা
প্রমাদ মূঢ়ত্ব মুখাস্তমোগুণাঃ।
এতৈঃ প্রযুক্তো নহি বেত্তি কিঞ্চিৎ
নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি॥

অজ্ঞান আলস্য, জড়ত্ব, নিদ্রা, প্রমাদ, মূঢ়ত্ব, এই-গুলি প্রধানতঃ তমোগুণের পরিচয় লক্ষণ। এইসকলের বশতাপন্ন হইয়া তামসিক লোকেরা জানে না কিছুই—কেবল হাই তুলিয়া ঝিমাইয়া এবং স্তম্ভের ন্যায় হইয়া কালাতিপাত করে।

(৩) সত্ত্বগুণের লক্ষণ।

সত্ত্বং বিশুদ্ধংজলবৎতথাঽপি
তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্
প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ং॥

ইহার অর্থ:—

সত্ত্বগুণ জলের ন্যায় বিশুদ্ধ; আর তাহাতে আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া নিখিল জড়বস্তু প্রকাশ করে। কিন্তু তথাপি তাহা অপর দুটির সহিত জড়িত হইয়া সংসারগতির অনুপন্থী হয়।

ইহার টীকা।

আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এই যে একটি অন্তর্দৃষ্টির দেখা কথা—কিনা আত্মচৈতন্য সত্ত্বগুণে

* কার্য্যপ্রবর্ত্তনী শক্তিমাত্রই ক্রিয়াত্মিকা। যন্ত্রবিজ্ঞানের (Mechanics-এর) পরিভাষায় তাই Force=acceleration—ক্রিয়া।

প্রতিবিম্বিত হয়, ইহা শুনিয়া শিক্ষিতম্মন্য নব্য পণ্ডিতগণের হাস্যোদ্রেক হইতে পারে;—তা' হো'ক! কিন্তু তাঁহারা যাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগের একজন প্রধান শিরোভূষণ বলিয়া মান্য করেন, তিনি কি বলিয়াছেন তাহা যদি মুহূর্ত্তেক ধৈর্য্য ধরিয়া শোনেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হাস্যবদন তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিবে তাহা বেশ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে। অতএব শুনুন কাণ্ট্ কি বলিতেছেন:—

It may seem difficult to understand how I can say: I, as an intelligent and thinking subject (অর্থাৎ I, as চিন্ময়জ্ঞাতা পুরুষ বা চিদাত্মা), know myself as an object thought like other phenomena, not as I am (স্বরূপতঃ) but only as I appear to myself (প্রতিবিম্ববৎ) * * * But that this must really be so can be clearly shown by the fact that we cannot represent to ourselves time in any other way than under the image of a line which we draw.

ইহার অর্থ এই:—

আপাততঃ এটা একটা কঠিন সমস্যা বলিয়া মনে হইতে পারে যে, চিন্ময় জ্ঞাতাপুরুষের পক্ষে আপনার নিকটে আপনি ঘটপটাদি বা সুখদুঃখাদি প্রতিভাসগুলার ন্যায় জ্ঞেয় বিষয়রূপে প্রতিভাত হওয়া কি প্রকারে সম্ভবে? যাহা বাস্তবিক আমি না, তাহা আমি বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া কিরূপে সম্ভবে? কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে কাঠিন্য কিছুই নাই; কেননা তাহা হইবারই কথা। এটা যেমন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, মনে মনেই হো'ক, আর হাতে কলমেই হো'ক—একটা রেখা টানিয়া সেই দৃশ্য রেখাটিকে অদৃশ্য কালাংশের স্থলাভিষিক্ত করা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে কাল-নিরূপণ করা কাহারো সাধ্য-সুলভ নহে,* এটাও তেমনি আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে, মস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত চিদাভাসকে চিদাত্মার স্থলাভিষিক্ত করা ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায়ে আত্মনিরূপণ করা কাহারো সাধ্য-সুলভ নহে।

* মনঃকল্পিত রেখা'কেও দৃশ্য রেখা বলা উচিত এই জন্য—যেহেতু ক্রোধ কল্পনা করিবার সময় আমরা যেমন অদৃশ্য ক্রোধ কল্পনা করি, রেখা কল্পনা করিবার সময় সেরূপ অদৃশ্য রেখা কল্পনা করি না—দৃশ্য রেখাই কল্পনা করি; কেননা "রেখা" বলিলেই বুঝায় যে, তাহা দ্রষ্টা পুরুষের চক্ষুর সম্মুখে দৃশ্যমান।

কাণ্টের এই কথাটির টীকা।

মনে কর আমি বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা উপলক্ষে মধ্যাহ্নকালে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমার একটি আত্মীয় লোকের বাটীতে গিয়াছিলাম। ভোজনান্তে ঘণ্টা-খানেক বিশ্রামের পর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে, আমার বসিবার ঘরে আমার বাল্যকালের কাব্যানুরাগী বন্ধু দেবদত্ত চৌকিহালান্ দিয়া বসিয়া মেঘদূত পাঠ করিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি এখানে কতক্ষণ?" তিনি "বলিতেছি" বলিয়া টিক্ করিয়া ঘড়ির ডালা উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেন "আমি যখন তোমার এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন ঘণ্টার কাঁটা এবং মিনিটের কাঁটা গায়ে গায়ে লিপ্ত হইয়া বারোটায় ঠেকিয়াছে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল -ঘড়িটি আমার পরম নিষ্ঠাবান্! কেমন দেখ তদ্গতচিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে জোড়হস্তে মধ্যাহ্ন-দেবকে প্রণাম করিতেছে! এখন এ-যাহা দেখিতেছি তাহাতে মনে হইতেছে—ঘড়িটি শেরা কাজের লোক! এই দেখ মিনিটের কাঁটাব নিশান গাড়িয়াছে, আর ঘণ্টার কাঁটার মানদণ্ড দিয়া যে দিকটা আমার ডাহিন্ দিক্ সেইদিকের ভূমি মাপিতেছে। অতএব এটা অকাট্য বেদ-বাক্য যে, আমি তাহা তিন তিন ঘণ্টা কাল তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি।" এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঘটিকা-চক্রের চতুর্থাংশ কি সত্যসত্যই তিন ঘণ্টা কাল? কখনই না। তবে কি? না তাহা অদৃশ্য তিন ঘণ্টা কালের দৃশ্য প্রতিরূপ, আর, প্রতিরূপেরই নাম প্রতিবিম্ব। এখন বলিবামাত্রেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, অদৃশ্য কালাংশ যেমন ঘটিকা-চক্রে দৃশ্যরেখারূপে প্রতিবিম্বিত হয়, চিন্ময় জ্ঞাতাপুরুষ তেমনি মস্তিষ্কের সত্ত্বাংশে চিদাভাসরূপে প্রতিবিম্বিত হ'ন। টীকা এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যা'ক্।

(৪) মিশ্রসত্ত্বের পরিচয়-লক্ষণ।

মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাঃ
স্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।

শ্রদ্ধাচ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ
দৈবী চ সম্পত্তি রসন্নিবৃত্তিঃ ॥

ইহার অর্থ এই :—

মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম্ম এইগুলি :—স্বমানিত (অর্থাৎ যে যাহা মানে তদনুরূপ) দেবপূজাদি, যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুক্তিকামনা, দৈবী সম্পত্তি অর্থাৎ শমদমাদি সাধনসম্পত্তি, অসদাচরণ হইতে নিবৃত্তি (অর্থাৎ মিশ্রসত্ত্বের লক্ষণ = সাধনাবস্থার লক্ষণ) ।

(৩) শুদ্ধসত্ত্বের লক্ষণ।

বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ
স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা
যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি ॥

ইহার অর্থ এই :—

বিশুদ্ধসত্ত্বের পরিচয়-লক্ষণ এইগুলি :—আত্মানুভূতি, পরমাপ্রশান্তি, তৃপ্তি, প্রহর্ষ, আর, সেই প্রগাঢ় পরমাত্মনিষ্ঠা যাহাতে করিয়া সদানন্দরসের সম্ভোগ হয়।

(অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের লক্ষণ = সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ।)

এ স্থানটিতে শঙ্করাচার্য্য পরমাত্মার সংস্পর্শগুণে শুদ্ধসত্ত্বের যেসকল লক্ষণ সিদ্ধপুরুষের অন্তরে বাহিরে ফুটিয়া বাহির হয় তাহাই নির্দ্দেশ করিলেন। স্থানান্তরে তিনি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্বজগতের সারভূত সমষ্টিসত্তা বা সমষ্টিসত্ত্ব যাহা রজস্তমোগুণদ্বারা অবাধিত তাহা পরমাত্মারই উপাধি, তা' বই তাহা জীবাত্মার উপাধি নহে :—রজস্তমোগুণদ্বারা কলুষিত মলিনসত্ত্বই—মিশ্রসত্ত্বই—জীবাত্মার উপাধি। শুদ্ধসত্ত্ব এবং মিশ্রসত্ত্ব সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত মন্তব্য কথাটি তলাইয়া বুঝিতে হইলে তাহার সহজ উপায় হ'চ্চে—বর্ত্তমান গীতাপাঠ প্রবন্ধের পূর্ব্বের একটি প্রপাঠে সত্তাঘটিত সমষ্টি-ব্যষ্টি সম্বন্ধে গোটাদুই কথা আমি যাহা বলিয়াছি তাহার প্রতি, এই প্রসঙ্গে, আবার একবার মনোযোগের সহিত প্রণিধান করা। ঐ স্থানটিতে প্রথমে আমি বলিয়াছি—

"সমষ্টিসত্তা এবং ব্যষ্টিসত্তা'কে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেখিলে প্রথমেই দুয়ের মধ্যেকার একটি মর্ম্মান্তিক প্রভেদ আমাদের চক্ষে পড়ে এই যে, কোনো দুই ব্যক্তি যেহেতু এক নহে, এইজন্য আমাতে তোমার সত্তার অভাব আছে, তোমাতে আমার সত্তার অভাব আছে; আর, যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নাম হয় দেবদত্ত, তবে দেবদত্তে তোমার এবং আমার উভয়েরই সত্তার অভাব আছে। তবেই হইতেছে যে, ব্যষ্টিসত্তা-মাত্রেতেই সত্তার সঙ্গে সত্তার বাধা ন্যূনাধিক পরিমাণে লাগিয়া রহিয়াছে; সাত্ত্বিক আনন্দ রাজসিক দুঃখ এবং অশান্তি দ্বারা ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রতিহত হইতেছে; সাত্ত্বিক প্রকাশ তামসিক জড়তা এবং অবসাদে ন্যূনাধিক পরিমাণে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে।" এ যাহা আমি বলিয়াছি ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, ব্যষ্টিসত্তামাত্রই রজস্তমোগুণের সহিত জড়িত, আর সেইজন্য তাহা মিশ্রসত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না—শুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারে না। তাহার পরে বলিয়াছি—

"পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যায় যে, যেমন তোমার বাহিরে আমি রহিয়াছি, আমার বাহিরে তুমি রহিয়াছ—সমষ্টিসত্তার বাহিরে সেরূপ যখন দ্বিতীয় কোনো সত্তা নাই, তখন কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, সমষ্টিসত্তার সহিত লেশমাত্রও বাধার সংস্পর্শ থাকিতে পারে না।" শেষোক্ত কথাটির ভাবে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে সমষ্টিসত্ত্বই শুদ্ধসত্ত্ব। *

শুদ্ধসত্ত্ব যে পদার্থটা কি, এই তো তাহা দেখিলাম, আর, মিশ্রসত্ত্ব যে পদার্থটা কি তাহাও একটু পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে। এ যাহা দেখা হইল তাহা জিজ্ঞাস্য বিষয়টির মূলে পৌঁছিবার পক্ষে যদিচ সহায় মন্দ না, কিন্তু তাহার কূলে পৌঁছিতে হইলে আরো গোটাকত কথা দেখিবার আছে;—এই নিগূঢ় রহস্য-গুলি ক্রমে ক্রমে ভাঙিতেছি—প্রণিধান কর।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

সত্তাকে যদি চৈতন্যময় সদ্‌বস্তু হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখা যায়, তবে তাহা অস্তি নাস্তি দুয়ের বা'র—একপ্রকার জ্ঞানবিরোধী ভাব-পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ অস্তি এবং নাস্তি দুয়ের বা'র—জ্ঞান-বিরোধী ভাবপদার্থের নাম বেদান্তদর্শনের পারিভাষায়—অবিদ্যা, কাণ্টের পরি-

ভাষায়—thing-in-itself। এ বিষয়ে কাণ্টের মন্তব্য কথা এই :—

ঘটদৃষ্টে যখন আমার মনোমধ্যে ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সে যে ঘটজ্ঞান তাহা আমারই ঘটজ্ঞান; পক্ষান্তরে, ঘটবস্তু কিছু আর আমারই ঘটবস্তু নহে। আমার ঘটজ্ঞান যে আমারই ঘটজ্ঞান তাহার প্রমাণ এই যে, আমি না থাকিলে আমার ঘটজ্ঞান থাকিতে পারে না; আর, ঘটবস্তু যে আমারই ঘটবস্তু নহে তাহার প্রমাণ এই যে, আমি না থাকিলেও ঘটবস্তু যাহা আছে তাহাই থাকে। যাহাই হো'ক্ না কেন—আমার ঘটজ্ঞানের সীমার বাহিরে ঘট নিজে যে কি, তাহা বলিতে পারা একান্ত পক্ষেই আমার সাধ্যাতীত। তবেই হইতেছে যে, যাহাকে আমি বলিতেছি ঘটবস্তু তাহার সহিত আমার ঘটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। তেমনি, আমি যাহাকে বলি পটবস্তু তাহার সহিত আমার পটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, ঘটদ্রষ্টার যদি জ্ঞান না থাকে তবে ঘটজ্ঞানই বলো, পটজ্ঞানই বলো, আর, মঠজ্ঞানই বলো—কোনো জ্ঞানই তাহার মনোমধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে না। ঘটদ্রষ্টার জ্ঞান আছে বলিয়াই, তাহার একই অভিন্ন জ্ঞান ঘটদৃষ্টে ঘটজ্ঞানে পরিণত হয়, পটদৃষ্টে পটজ্ঞানে পরিণত হয়, মঠদৃষ্টে মঠজ্ঞানে পরিণত হয়, ইত্যাদি। তবেই হইতেছে যে, ঘটপটাদিবিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞান একই অভিন্ন জ্ঞানের শাখাপ্রশাখা। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বৃক্ষ এবং শাখা-সমূহের মধ্যে যেমন সমষ্টি-ব্যষ্টি সম্বন্ধ, দ্রষ্টা পুরুষের একই অভিন্ন জ্ঞান এবং ঘটপটাদি-বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে তেমনি সমষ্টি-ব্যষ্টি সম্বন্ধ। অনতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আমি যাহাকে বলি ঘটবস্তু তাহার সহিত আমার ঘটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; আমি যাহাকে বলি পটবস্তু তাহার সহিত আমার পটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; এক কথায়—আমি যাহাকে বলি ব্যষ্টিবস্তু তাহার সহিত আমার ব্যষ্টিজ্ঞান বা শাখাজ্ঞান বা ফ্যাঁকড়াজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ইহা হইতেই আসিতেছে যে, আমি যাহাকে বলি সমষ্টিবস্তু, তাহার সহিত আমার সমষ্টিজ্ঞান বা মূলজ্ঞান বা মোটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এখন, কাণ্টের শাস্ত্রে বলে শুধু এই যে, আমি যাহাকে বলি ব্যষ্টিবস্তু তাহার সহিত আমার ব্যষ্টিজ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া আছে—যেমন ঘটবস্তুর সহিত ঘটজ্ঞান—পটবস্তুর সহিত পটজ্ঞান, ইত্যাদি; আর, আমার ব্যষ্টিজ্ঞানে অবভাসিত সেই যে ব্যষ্টিবস্তু, তাহা হইতে ঐ জ্ঞানাংশটিকে ছাড়াইয়া লইলে অবশিষ্ট থাকে কেবল thing-in-itself। বৈদান্তিকের শাস্ত্রে তাহা তো বলেই, তা ছাড়া অধিকন্তু আর একটি কথা বলে এই যে, জ্ঞানাবভাসিত ব্যষ্টিবস্তু হইতে জ্ঞানাংশটিকে ছাড়াইয়া লইলে অবশিষ্ট থাকে যেমন ব্যষ্টি thing in-itself বা ব্যষ্টি-অবিদ্যা, জ্ঞানাবভাসিত সমষ্টিবস্তু হইতে জ্ঞানাংশটিকে ছাড়াইয়া লইলে অবশিষ্ট থাকে তেমনি সমষ্টি thing-in-itself বা সমষ্টি-অবিদ্যা।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

কাণ্ট্‌কে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ ব্যষ্টিবস্তু, আর, কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ অবিদ্যা বা thing-in-itself? তবে তাহার উত্তরে কাণ্ট্ একটা ঘট এবং একটা পট প্রশ্নকর্ত্তার সম্মুখে রাখিয়া সে দুটার প্রতি একে একে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন যে, এই যে ঘট, আর, এই যে পট, দুইই, জ্ঞানে অবভাসিত হইবামাত্র ব্যষ্টিবস্তু হইয়া ওঠে, আর জ্ঞান হইতে বিযুক্ত হইবামাত্র অবিদ্যা বা thing-in-itself হইয়া পড়ে। পরন্তু, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ সমষ্টিবস্তু, আর কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ সমষ্টি-অবিদ্যা? তবে তাহার উত্তরে তিনি কি বলিবেন? তিনি যে কি বলিবেন তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে;—সকল শাস্ত্রেই যাহা বলে তাহাই তিনি বলিবেন;—তিনি বলিবেন—"তুমি যাহা দেখিতে চাহিতেছ তাহা আমি তোমাকে অবশ্যই দেখাইব—কিন্তু এখন না; পৃথিবী যখন সাগরগর্ভে প্রবেশ করিয়া জলময় হইয়া যাইবে; মহাসাগর যখন অগ্নিগর্ভে প্রবেশ করিয়া অগ্নিময় হইয়া যাইবে; অগ্নি যখন বায়ুগর্ভে প্রবেশ করিয়া বায়ুময় হইয়া যাইবে; বায়ু যখন আকাশে মিশিয়া আকাশের সহিত

একীভূত হইয়া যাইবে; আকাশ যখন আরো সূক্ষ্মাৎ-সূক্ষ্মতর চৈতন্য-ঘ্যাঁসা শুদ্ধসত্ত্বে মিশিয়া চৈতন্যময় হইয়া যাইবে, তখন তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তোমাকে আমি বলিব যে, বিশ্বব্যাপী মহাচৈতন্যে অব-ভাসিত এই যে শুদ্ধসত্ত্ব ইহাই সমষ্টিবস্তু বা একমাত্র অদ্বিতীয় সদ্বস্তু, আর উহাকে চৈতন্য হইতে বিযুক্ত ভাবে দেখিলে উহাই সমষ্টি অবিদ্যা; আবার, উহাকে চৈতন্যের প্রতিবিম্বে অবভাসিত এবং চৈতন্যের প্রভাবে অভিভূত ভাবে দেখিলে উহাই মায়া, অথবা যাহা একই কথা—ঐশী শক্তি। দ্বিতীয় ভাবে দেখিলে শুদ্ধসত্ত্বও যা, মায়াও তা,' ঐশী শক্তিও তা, একই। চৈতন্যের আলোকে আলোকিত এবং চৈতন্যের প্রভাবে প্রভাবা-ন্বিত শুদ্ধসত্ত্বকে মায়া বলা যায় এইজন্য, যেহেতু তাহা বহুধা বিচিত্র পরমাশ্চর্য্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। মায়া শব্দের গোড়া'র অর্থ—লোকে যাহাকে বলে জাদু-বিদ্যা; আর, সেই গোড়া'র অর্থটিই তাহার দার্শনিক অর্থ। কিন্তু যদি বলা যায় যে, "ঈশ্বর জাদুবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন" তবে প্রকা-রান্তরে বলা হয় যে, চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত কার্য্য আছে—সবই জাদুকার্য্য। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, ঈথর-কম্পন হইতে আলোকের অভিব্যক্তি, সচেতন ইচ্ছার বলে অচেতন দৈহিক ব্যাপার সকলের প্রবর্ত্তন, নিদ্রা হইতে জাগরণ, জাগরণ হইতে নিদ্রা—সবই জাদুকার্য্য। এইরূপ যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কার্য্যই জাদুকার্য্য হয়, তবে জাদুকার্য্যের বিশেষত্ব কী-আর থাকে? জাদুকার্য্যের বিশেষত্বই যদি না থাকে, তবে জাদুকার্য্যকে অন্যান্য কার্য্য হইতে বিশেষিত করিয়া তাহাকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর কার্য্যরূপে দাঁড় করাইবার প্রয়োজন কি? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতে নিতান্তই তাহার প্রয়োজনা-ভাব; আর, সেইজন্য তাঁহারা "জাদু" "মায়া" "Miracle" এই ভাবের শব্দগুলার দলবল যেখানে যত আছে সমস্তই বিজ্ঞানরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদিগের এইরূপ কঠোর আইন-জারি-কার্য্যে কবির মন প্রাণান্তেও সায় দিতে পারে না। কথাটা আর কিছু না—বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক চক্ষুষ্মান্, হৃদয় অন্ধ; কবির হৃদয় চক্ষুষ্মান্, মস্তিষ্ক অন্ধ। এইজন্য, বিজ্ঞানীরা যাহা স্পষ্ট দেখিতে পা'ন, কবি তাহা দেখিতে পা'ন না; তেমনি আবার, কবিরা যাহা স্পষ্ট দেখিতে পা'ন, বিজ্ঞানীরা তাহা দেখিতে পা'ন না। বিজ্ঞানীরা যাহাই বলুন না কেন—কবির চক্ষে অঘটনঘটনাপটীয়সী পরমাশ্চর্য্য ঐশীশক্তি মহামায়াই বটে। ঐশীশক্তিকে কবি-চক্ষে বা হৃদয়-চক্ষে দেখা ব্যতীত বিজ্ঞান চক্ষে দেখা—মর্ত্ত্যবাসী মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক—দিব্যধামবাসী দেবতাদিগেরও সাধ্যের অতীত। বিজ্ঞানীদিগের পাণ্ডিত্য খাটাইবার স্থান আছে—কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব সে স্থান নহে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু নিষেধ মানিবার পাত্র নহেন, আর সেইজন্য বিদ্রূপ-শস্ত্রধারী কবিদিগের অগ্রগণ্য পোপ্ বলিয়াছেন "And fools rush in where angels fear to tread" "দেবতারা যেখানে পা বাড়াইতে ভয় করেন—দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য অর্ব্বাচীনেরা সেখানে হুড়্‌মুড়্ করিয়া প্রবেশ করে।"

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

বেদান্তদর্শনের আর একটি কথা এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব বা মায়া বা সমষ্টি-অবিদ্যা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। তাহা তো হইবেই—যাহার গর্ভে পৃথিবী জলময়, জল অগ্নিময়, অগ্নি বায়ুময়, বায়ু ঈথরময়, এবং যিনি আপনি ঈশ্বর-চৈতন্যে চৈতন্যময়ী সেই সর্ব্বধারিণী বিশ্বজননী জগতের মূল উপাদান নহেন তো আর কি? শঙ্করাচার্য্য তাই তাঁহার সর্ব্ববেদান্তসারসংগ্রহে বলিয়াছেন—

"অনন্তশক্তি-সম্পন্নো মায়োপাধিক ঈশ্বরঃ।
ঈক্ষামাত্রেণ সৃজতি বিশ্বমেতচ্চরাচরং॥
অদ্বিতীয়ঃ স্বমাত্রোঽসৌ নিরুপাদান ঈশ্বরঃ।
স্বয়মেব কথং সর্ব্বং সৃজতীতি ন শঙ্ক্যতাং॥
নিমিত্তমপ্যুপাদানং স্বয়মেবাভবৎ প্রভুঃ।
চরাচরাত্মকং বিশ্বং সৃজত্যবতি লুম্পতি॥
স্বপ্রাধান্যেন জগতো নিমিত্তমপি কারণং।
উপাদানং তথোপাধিপ্রাধান্যেন ভবত্যয়ং॥
যথা লূতা নিমিত্তং চ স্বপ্রধানং তথা ভবেৎ।
স্বশরীর প্রধানত্বে চোপাদানং তথেশ্বরঃ॥

ইহার অর্থ এই:—

অনন্তশক্তিসম্পন্ন এবং মায়া-উপাধির সহবর্ত্তী—এমন-যিনি ঈশ্বর, তিনি সংকল্প-মাত্রে বিশ্বচরাচর সৃজন করেন। স্বয়ং ঈশ্বর যখন অদ্বিতীয় আপনি-মাত্র এবং উপাদান-

রহিত, তখন তিনি জগৎ সৃষ্টি করিবেন কিরূপে এপ্রকার শঙ্কা করিও না। স্বয়ংই প্রভু নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়বিধ কারণ হইয়া জগৎ সৃজন পালন এবং সংহার করেন। যে অংশে তিনি স্বপ্রধান, সেই অংশে তিনি নিমিত্ত-কারণ, আর, যে অংশে তিনি উপাধি-প্রধান সেই অংশে তিনি উপাদান-কারণ। যেমন মাকড়সা যে অংশে স্বপ্রধান সেই অংশে তন্তুজালের নিমিত্তকারণ অর্থাৎ কর্ত্তাকারণ, আর যে অংশে শরীরপ্রধান সেই অংশে উপাদান-কারণ (অর্থাৎ মৃত্তিকা যেমন ঘটে পরিণত হয় সেইরূপ পরিণামী কারণ), ঈশ্বর তেমনি নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ দুইই একাকী আপনি। শঙ্করাচার্য্য এই যে বলিয়াছেন—

"মাকড়সা যেমন স্বীয় শরীরগুণে তন্তুজালের উপাদান-কারণ, ঈশ্বর তেমনি স্বীয় উপাধিগুণে নিখিল জগতের উপাদান-কারণ।"

ইহাতেই উপাধি যে পদার্থটা কি তাহা প্রকারান্তরে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপাধি—পদার্থটা আর কিছু না—শরীব। যেমন রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, তপ্ত অঙ্গারের দীপ্তি অগ্নির স্থূল শরীর, তপ্ত অঙ্গারের অদৃশ্য উত্তাপ অগ্নির সূক্ষ্ম শরীর, আর তপ্ত অঙ্গারের দাহিকাশক্তি দীপ্তি এবং উত্তাপ উভয়েরই মূল কারণ—এই অর্থে তাহা অগ্নির কারণ-শরীর; তেমনি বলা যাইতে পারে যে, নিখিল বাহ্যজগৎ পরমাত্মার স্থূল শরীর, নিখিল অন্তর্জগৎ পরমাত্মার সূক্ষ্মশরীর, আর ঐশী শক্তি যাহার দ্বিতীয় নাম মায়া এবং তৃতীয় নাম শুদ্ধসত্ত্ব, তাহা অন্তর্বাহ্য উভয় জগতের কারণ—এই অর্থে কারণশরীর। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেনও তা'ই। সেই সঙ্গে এটাও তিনি বলিয়াছেন যে, জীব শরীরের যে অংশ অস্থিমজ্জারসরক্তত্বক্ প্রভৃতি পাঞ্চভৌতিক উপাদানে পরিগঠিত তাহা জীবেব স্থূল শরীর; যে অংশ বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সূক্ষ্ম উপাদান, তাহা জীবের সূক্ষ্ম শরীর; আর জীব-চৈতন্যের উপাধি-ভূত সেই যে অবিদ্যা বা মলিনসত্ত্ব * তাহা অল্পজ্ঞতা এবং অহঙ্কারাদির কারণ—এই অর্থে তাহা জীবের কারণ-শরীর।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

বেদান্তের মতে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েরই কারণ-শরীর সুষুপ্তি-রূপী। প্রভেদ কেবল এই যে, জীবাত্মার কারণ-শরীর সামান্য-গোচের সুষুপ্তি; পরমাত্মার কারণ-শরীর সেই মহাসুষুপ্তি যাহার আর এক নাম প্রলয়। একটু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পরমাত্মার সেই যে মায়া-উপাধি যাহার আরেক নাম শুদ্ধসত্ত্ব তাহাই তাঁহার কারণ-শরীর, আর তাহাতে পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সমস্ত বস্তু একসঙ্গে মিশিয়া একাকারে পরিণত। ইহা হইতে আসিতেছে যে পরমাত্মার কারণ-শরীর প্রলয়রূপী। আবার, জীবের কারণ-শরীর যেহেতু তাহার সমস্ত শরীরের সারভূত মূল উপাদান, কিনা বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাকে বলে Protoplasm, এইজন্য তাহাতেও জীবের স্থূলসূক্ষ্ম সমস্ত অবয়ব একসঙ্গে মিশিয়া একাকারে পরিণত হইবারই কথা; কাজেই তাহা সুষুপ্তিরূপী।* বেদান্তদর্শনে আরো বলা হইয়াছে এই যে, জীবাত্মার সেই যে সুষুপ্তিরূপী কারণশরীর, তাহা জীবাত্মার আনন্দময় কোষ; আর পরমাত্মার আনন্দময় কোষ হ'চ্চে সেই মহাসুষুপ্তি যাহার আরেক নাম প্রলয়। গীতায় কিন্তু লেখে

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥"

"জানাই তো আছে যে, সৃষ্টির মধ্যাই কেবল ব্যক্ত, পরন্তু তাহার আদিও যেমন—অন্তও তেমনি—দুইই অব্যক্ত, তাহার জন্য খেদ কিসের?" ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ই বা কেমনধারা আর সৃষ্টিই

* পঞ্চদশীতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, মায়া=শুদ্ধসত্ত্বা প্রকৃতি, এবং অবিদ্যা=মলিনসত্ত্বা প্রকৃতি; যথা—

"তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতি দ্বিবিধা চ সা;
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তে মতে॥"

* জীবাত্মার সমস্ত শরীরের সারভূত Protoplasm যাহা তাহার মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠ কোষে পুঞ্জীভূত রহিয়াছে তাহা চৈতন্যের প্রতিবিম্বে চৈতন্যময়, আর সেই জন্য আমরা মস্তিষ্কের শিখরপ্রদেশে আত্মাকে উপলব্ধি করি—যদিও তাহা আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র—চিদাভাসমাত্র। ঐ চিদাবভাসিত জৈব সত্ত্বকে যদি চিদাত্মা হইতে বিযুক্তভাবে দেখা যায়, তবে তাহারই নাম অবিদ্যা বা thing-in-itself, কেননা তাহা অস্তিনাস্তি দুয়ের বা'র। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মস্তিষ্কের অন্তর্নিগূঢ় মলিনসত্ত্ব বা ব্যষ্টিসত্ত্ব যেমন জীবচৈতন্যের প্রতিবিম্বগ্রাহী দর্পণ, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মহাকাশের অন্তর্নিগূঢ় শুদ্ধসত্ত্ব বা সমষ্টিসত্ত্ব তেমনি ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্বগ্রাহী দর্পণ।

বা কেমনধারা তাহাব রহস্য-বার্ত্তা মুখে বলিয়াছেন এবং গ্রন্থে লিখিয়াছেন নানা দেশের নানাশাস্ত্রকার কিন্তু চক্ষে দেখেন নাই কেহই। পক্ষান্তরে, আদি এবং অন্তের মাঝের জায়গাটিতে ভব দিয়া দাঁড়াইয়া আছি এই যে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সবাই আমরা একএকটি, এ ব্রহ্মাণ্ডের আটপহুরিয়া প্রলয় এবং সৃষ্টি যে কিরূপ তাহা আমাদের কাহারো নিকটে অবিদিত নাই। তার সাক্ষী—কল্পনাকুহকিনী যখন আমাদের ধ্যানচক্ষুর সম্মুখে বিরাট্ অন্ধকার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয়ের অভিনয় করে, তখন তাহার কোনো স্থানেই আমরা নাস্তি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না; পক্ষান্তরে আমরা যখন রাত্রিকালের সুনিদ্রা হইতে প্রভাতে গাত্রোত্থান করি, তখন সুনিদ্রা যে কি আরামের বস্তু তাহা আমাদের জানিতে বাকি থাকে না। শ্রোতৃবর্গের জানা উচিত যে, জীবাত্মা, পরমাত্মা, ঐশীশক্তি, অবিদ্যা প্রভৃতির সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া আমি যে কয়েকটি কথা বলিলাম, তাহার একটিও আমার নিজের কথা না—সবই বেদান্তদর্শনের কথা। সত্য কি মিথ্যা—শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রণীত সর্ব্ববেদান্তসারসংগ্রহে জীব ঈশ্বর এবং দোঁহার দুই উপাধি সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি প্রণিধান কর :—

"মায়োপাধিক চৈতন্যং সাভাসং সত্ত্ববৃংহিতং।
সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং॥
অব্যাকৃতং তদব্যক্তং ঈশ ইত্যপি গীয়তে।
সর্ব্বশক্তিগুণোপেতঃ সর্ব্বাজ্ঞানাবভাসকঃ॥
স্বতন্ত্রঃ সত্যসংকল্পঃ সত্যকামঃ স ঈশ্বরঃ।
তস্যৈতস্য মহাবিষ্ণো র্মহাশক্তি র্মহীয়সঃ॥
সর্ব্বজ্ঞত্বেশ্বরত্বাদিকারণত্বান্মনীষিণঃ।
কারণং বপুরিত্যাহুঃ সমষ্টিং সত্ত্ববৃংহিতং॥
আনন্দপ্রচুরত্বেন সাধকত্বেন কোষবৎ।
সৈষানন্দময়ঃ কোষ ইতীশস্য নিগদ্যতে॥
সর্ব্বোপরম হেতুত্বাৎ সুষুপ্তিস্থানমিষ্যতে।
প্রাকৃতো প্রলয়ো যত্র শ্রাব্যতে শ্রুতিভির্মুহুঃ॥
অজ্ঞানং ব্যষ্ট্যভিপ্রায়াদনেকত্বেন ভিদ্যতে।
অজ্ঞানবৃত্তয়ো নানা তত্তদ্গুণ বিলক্ষণাঃ॥
বনস্যব্যষ্ট্যভিপ্রায়াৎ ভূরুহা ইত্যনেকতা।
যথা তথৈবাজ্ঞানস্য ব্যষ্টিতঃ স্যাদনেকতা॥

* * *

ব্যষ্টির্মলিনসত্ত্বৈষা রজসা তমসা যতঃ।
ততো নিকৃষ্টা ভবতি সোপাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ॥
চৈতন্যং ব্যষ্ট্যবচ্ছিন্নং প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে।
সাভাসব্যষ্ট্যুপহিতঃ সং তাদাত্ম্যেন তদ্গুণৈঃ॥
অভিভূতঃ স এবাত্মা জীব ইত্যভিধীয়তে।
কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বানীশ্বরত্ব সংসারিত্বাদি ধর্ম্মবান্॥
অস্য ব্যষ্টিরহঙ্কারকারণত্বেন কারণং।
বপুস্তত্রাভিমান্যাত্মা প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ
প্রাজ্ঞত্বমস্যৈকাজ্ঞানভাসকত্বেন সম্মতং॥

* * *

স্বরূপাচ্ছাদকত্বেনাপ্যানন্দ প্রচুরত্বতঃ।
কারণং বপুরানন্দময়ঃ কোষ ইতীর্য্যতে॥
অস্যাবস্থা সুষুপ্তিঃ স্যাৎ যত্রানন্দঃ প্রকৃষ্যতে।
এষোঽহং সুখমস্বাপ্সং ন তু কিঞ্চিদবেদিষং।
ইত্যানন্দঃ সমুৎকৃষ্টঃ প্রবুদ্ধেষু প্রদৃশ্যতে॥"

ইহার অর্থ এই :—

আপনার প্রতিবিম্বের সহিত মায়া-উপাধিতে অধিষ্ঠান করিতেছেন এমন যে সত্ত্বগুণ-পরিপুষ্ট চৈতন্য, তিনি সর্ব্বজ্ঞতাদিগুণবিশিষ্ট, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ, অব্যাকৃত এবং অব্যক্ত—এই অর্থে ঈশ ব'লিয়া অভিহিত হ'ন। আর, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ সমষ্টি-অবিদ্যার (অর্থাৎ মায়ার) অবভাসক, স্বতন্ত্র, সত্যকাম, এবং সত্যসংকল্প—এই অর্থে ঈশ্বর।* এই মহীয়ান্ মহাবিষ্ণুর মহাশক্তি সত্ত্বগুণে পরিপুষ্ট সমষ্টি-অবিদ্যা, আর, যেহেতু তাহা সর্ব্বজ্ঞতা এবং

* মূলে আছে "সর্ব্বাজ্ঞানাবভাসক" অর্থাৎ সমস্ত অজ্ঞানের অবভাসক। অজ্ঞান শব্দের অর্থ কিন্তু অবিদ্যা, আর, সেইজন্য "সর্ব্বাজ্ঞানাবভাসক" এই শব্দটির আমি অনুবাদ করিলাম "সমষ্টি অবিদ্যার অবভাসক"। উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর আর আর প্রদেশেও যে যে স্থানে লেখা আছে "অজ্ঞান," সেই সেই স্থানে আমি তাহার অনুবাদ করিয়াছি "অবিদ্যা"। প্রচলিত ভাষায় অজ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞানের অভাবমাত্র, পরন্তু বৈদান্তিক ভাষায়—অজ্ঞান-শব্দে বুঝায় অবিদ্যা। "অবিদ্যা" কিনা এক প্রকার অন্যথা-প্রদর্শনী শক্তি—সত্যকে ঢাকা দিয়া রাখিয়া অসত্যকে সত্যের মতো করিয়া সাজাইয়া দাঁড় করাইবার শক্তি। এ যে, "শক্তি," এ শক্তি আর কিছু না—Mill যাহাকে বলেন "Permanent possibility of Sensation."

সর্ব্বাধিপত্যের কারণ, এই হেতু মনীষীরা তাহাকে বলিয়া থাকেন কারণ-শরীর।† তাহা আনন্দবহুল এবং কোষের ন্যায় স্বরূপের আচ্ছাদক বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ, এবং তাহা সর্ব্বজগতের লয়স্থান বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে সুষুপ্তিস্থান; আর বেদে উক্ত হইয়াছে যে, তাহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়।‡ ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে অবিদ্যা অনেক এবং বিভিন্ন। অবিদ্যার ডালপালা অনেক এবং তাহার গুণবৈচিত্র্যও অশেষ-প্রকার। বন এক হইলেও ব্যষ্টি-অভিপ্রায়ে তাহা যেমন অনেক বৃক্ষ, অবিদ্যার অনেকতাও সেইরূপ। ব্যষ্টি অবিদ্যা রজস্তমোগুণ দ্বারা মলিনসত্ত্বা বলিয়া তাহা আত্মার নিকৃষ্ট উপাধি। এই ব্যষ্টি-অবিদ্যা দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে জীবচৈতন্য তাহাকে বলা হইয়া থাকে প্রত্যগাত্মা। এই ব্যষ্টি-অবিদ্যারূপী উপাধিতে স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত বর্ত্তমান, আর সেই উপাধির সহিত একীভূত হওয়া গতিকে তাহার গুণত্রয়ে অভিভূত—এমন যে অল্পজ্ঞ, পরতন্ত্র এবং সংসারী চৈতন্য, তাহা জীব-নামে অভিহিত হয়। ব্যষ্টি-অবিদ্যা অহঙ্কারের কারণ বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে জীবের কারণ-শরীর। কারণ-শরীরাভিমানী জীবচৈতন্যকে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন প্রাজ্ঞ। তাহাকে তাঁহারা প্রাজ্ঞ বলেন এইজন্য—যেহেতু তাহা ব্যষ্টি-অবিদ্যার অবভাসক। জীবেরও কারণ-শরীর স্বরূপের আচ্ছাদক এবং আনন্দ-বহুল বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ। সুষুপ্তির অবস্থাই প্রকৃষ্ট আনন্দের অবস্থা। সুষুপ্তিকালের পরমানন্দ স্মরণ করিয়াই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি বলে—"গতরাত্রে পরমসুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম—কোন্ দিক্ দিয়া রাত্রি প্রভাত হইল তাহা জানিতে পারি নাই।"

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বেদান্তদর্শনের মতে প্রলয়রূপী ঐশ্বরিক কারণ-শরীর এবং সুষুপ্তিরূপী জৈব কারণ-শরীর দুইই আনন্দময় কোষ। প্রলয়ের বৃহৎ ব্যাপারটাকে আপাততঃ না ঘাঁটাইয়া সুষুপ্তির সহিত আনন্দময় কোষের কিরূপ সম্বন্ধ—অগ্রে তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

নিদ্রা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (১) তামসিক, (২) রাজসিক, (৩) সাত্ত্বিক। একপ্রকার পাশব-প্রকৃতির নিদ্রা আছে যাহা ভূরিভোজন এবং মাদকদ্রব্য সেবনাদির ফলস্বরূপ—ইহাই তামসিক নিদ্রা; আর একপ্রকার নিদ্রা আছে যাহা স্বপ্নের উপদ্রবে অশান্তিময়—ইহাই রাজসিক নিদ্রা; তৃতীয় আর একপ্রকার নিদ্রা আছে যাহা শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের ফলস্বরূপ, আর সেই জন্য স্বর্গসুখের পূর্ব্বাভাস—ইহাই সাত্ত্বিক নিদ্রা, আর তাহারই নাম সুষুপ্তি। সুষুপ্তির মন্দাকিনীস্নানে সুপ্ত ব্যক্তির মন হইতে সমস্ত শ্রমক্লম নিঃশেষে ধৌত হইয়া গিয়া যখন তাহার স্থানে সুনির্ম্মলা শান্তি একাকী বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহার অন্তঃকরণের গূঢ়তম প্রদেশে আনন্দময় কোষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় এবং তাহার মধ্যদিয়া পরমাত্মার সুমঙ্গল শান্তি তাহার শরীর মনের উপরে স্বচ্ছন্দমতে কার্য্য করিতে পথ পায়। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কোনো সুস্থশরীর পুণ্যাত্মা রাত্রিকালে সুষুপ্তির স্বর্গে বাস করিয়া প্রাতঃকালে যখন মর্ত্ত্যে আগমন করেন, তখন, বুদ্ধির প্রসন্নতা, মনের স্ফূর্ত্তি, প্রাণের শান্তি, দেহের স্বচ্ছন্দতা সঙ্গে গুছাইয়া লইয়া প্রত্যাগমন করেন, তা বই, শূন্যহস্তে প্রত্যাগমন করেন না। ইহার ভিতরে একটি নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া বলিতেছি—প্রণিধান কর।

† ভাব এই যে পরমাত্মা এক, সমষ্টি অবিদ্যা সর্ব্ব। একজ্ঞান, যে সর্ব্বজ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়—সর্ব্বই (অর্থাৎ সমষ্টি অবিদ্যাই) তাহার কারণ।

‡ প্রলয়ের নাম শুনিলে কাহার না গা কাঁপে? অনতিপূর্ব্ব কালের সুসভ্য লোকেরাও ধূমকেতু কখন্ আসেন, কখন্ যা'ন তাহার ঠিক্ না পাইয়া মনে করিতেন যে, উনি প্রলয়ের গুপ্তচর তাহাতে আর ভুল নাই। অথচ ধূমকেতু এমনি সরস ভদ্রপ্রকৃতির জ্যোতিষ্ক যে, কিয়ৎবৎসরপূর্ব্বে পৃথিবীপৃষ্ঠে তাঁহার পায়ের ধুলা পড়িয়াছিল, অথবা যাহা আরো ঠিক—ল্যাজের ঝাপোট্ পড়িয়াছিল, এম্নি সথ্যরসার্দ্র শান্তশিষ্ট সুকোমলভাবে যে, পৃথিবী তাহা জানিতেও পারে নাই। অতএব ইহাই বেশী সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, আমাদের এই ধাত্রীমণি রজনী যেমন সন্ধ্যার মধ্য দিয়া সুধীরে আগমন করে, ব্রহ্মার মহারজনী তেমনি যুগযুগান্তরব্যাপী মহাসন্ধ্যার মধ্য দিয়া মহাধীরভাবে আগমন করিবে। হয় তো সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাববশতঃ রজস্তমোগুণ, আর সেই সঙ্গে মনুষ্যের বংশবৃদ্ধি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে পাইতে পরিশেষে এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যে, তখন পৃথিবীর ত্রিসীমার মধ্যে জনমানব নাই; আর সেই অবসরে পৃথিবী ধীরে ধীরে আপনার পিত্রালয়ে অর্থাৎ রসাতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

পূর্ব্বে ঢের বলিয়াছি এবং এখানে ফের বলিতেছি যে, তোমারও যেমন, আমারও তেমনি, আর, তৃতীয় যে-কোন ব্যক্তি - যেমন দেবদত্ত—তাহারও তেমনি, সত্তার সঙ্গে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা অবিচ্ছেদে লাগিয়া আছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্ত্তিয়া থাকিবার সেই যে ইচ্ছা—আসে তাহা কোথা হইতে? আসে যে তাহা কোথা হইতে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। সত্তার প্রকাশ হইলেই সত্তার রসানুভূতি হয়, সত্তার রসানুভূতি হইলেই সত্তার প্রতি প্রেম জন্মে, প্রেমের উপরে আনন্দের গোড়াপত্তন হয়, আর, সেই প্রেমানন্দের সঙ্গে এইরূপ একটি সদিচ্ছা আপনা হইতেই আসিয়া যোটে যে "সত্তা চিরজীবী হইয়া বর্ত্তিয়া থাকুক।" এইরূপ দেখা যাইতেছে যে সদিচ্ছার মূলে প্রেমানন্দ চাপা দেওয়া রহিয়াছে—প্রেমানন্দের মূলে চিৎপ্রকাশ চাপা দেওয়া রহিয়াছে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সদিচ্ছার উৎপত্তি হইয়াছে যেমন প্রেমানন্দের অনুভূতি হইতে, সদিচ্ছার চরম উদ্দেশ্যও তেমনি প্রেমানন্দের অনুভূতি। কিন্তু এইমাত্র দেখিলাম যে, সত্তার প্রকাশ না হইলে সত্তার প্রতি প্রীতিজনিত আনন্দ অনুভূত হইতে পারে না। অতএব, যাহাকে বলিতেছি সদিচ্ছা তাহা বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা তো বটেই, তা ছাড়া—তাহা চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্ত্তিয়া থাকিবার এই যে ইচ্ছা—এ ইচ্ছা ইচ্ছা-মাত্র নহে—পরন্তু উহা আত্মশক্তিরই আর এক নাম। কেননা, সমষ্টিসত্তার বাহিরে যখন দ্বিতীয় কোনো সত্তা নাই, তখন, সমষ্টিসত্তা যে আপনার স্বাভাবিকী শক্তি ব্যতিরেকে অপর কোন শক্তির আশ্রয়ে ভর করিয়া নিত্য-কাল বর্ত্তমান, একথা একেবারেই অগ্রাহ্য। দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নির অগ্নিত্ব, কাব্যরচনা-শক্তি যেমন কবির কবিত্ব, তেমনি, চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তি চিদানন্দস্বরূপ সদ্‌বস্তুর সত্ব; আর, সদ্‌বস্তুর সে যে, সত্ব, তাহা রজস্তমোগুণদ্বারা অবাধিত এবং পরম-পরিশুদ্ধ বলিয়া উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া (সা)" পরমাত্মার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া (অর্থাৎ ঐশীশক্তি) স্বাভাবিকী। এই সঙ্গে আর একটি কথা দ্রষ্টব্য এই যে, ব্যষ্টিসত্তা যখন সমষ্টিসত্তা হইতেই আসিয়াছে, তখন ব্যষ্টিসত্তাতে সমষ্টিসত্তার গুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে কিছু না কিছু থাকিবেই থাকিবে। মনুষ্যের তো কথাই নাই—অধম শ্রেণীর জীবেরাও একপ্রকার বাধা-বিঘ্নের প্রতিকূলে আপনার আপনার সত্তা বাঁচাইয়া রাখিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। এখন প্রকৃত কথা যাহা তাহা এই :—

একটু পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সদিচ্ছার উৎপত্তি হইয়াছে যেমন আনন্দের অনুভূতি হইতে, সদিচ্ছার চরম উদ্দেশ্যও তেমনি আনন্দের অনুভূতি; আর এইমাত্র দেখিলাম যে, সেই যে সদিচ্ছা অর্থাৎ সকলে মিলিয়া চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা, তাহা শক্তিময়ী প্রবলা ইচ্ছা, তা বই, তাহা ফাঁকা ইচ্ছা নহে। তবেই হইতেছে যে, সেই যে শক্তিময়ী ইচ্ছা বা ইচ্ছাশক্তি, অথবা যাহা একই কথা—আত্মশক্তি, তাহার গোড়াতেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ; মাঝে শক্তির খাটুনি। গোড়ায় যেখানে আত্মশক্তি সুপ্তিগর্ভে বিশ্রাম করে, সেখানেও জীবাত্মার ভোগের জন্য আনন্দের নৈবেদ্য সাজানো থাকে; আবার মাঝপথে যেখানে আত্মশক্তি উদ্যমের সহিত কার্য্যে খাটে, সেখানেও আনন্দ ধ্রুবতারার ন্যায় চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে। এখন কথা হইতেছে এই যে, প্রকাশের বাধা কিনা জড়তা এবং আনন্দের বাধা কিনা অশান্তি, এই দুইপ্রকার বাধা অতিক্রম করাই জীবাত্মার আত্মশক্তির মুখ্য কার্য্য। একদিনের মতো বাধা অপ-সারিত হইলেই আত্মশক্তির একদিনের কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়; আর তাহা যখন হয়, তখন, সেই অবসরে আত্মশক্তি সেদিনকার মতো বিশ্রাম করে। যে পরিমাণে আত্মশক্তি দিনগত বাধাবিঘ্নের উপরে জয়-লাভ করে, সেই পরি-মাণে চিৎপ্রকাশ এবং প্রেমানন্দ বাধামুক্ত হয়। আবার, আত্মশক্তির বিশ্রাম-কালে সেই যথাপরিমাণে বাধামুক্ত প্রকাশ এবং আনন্দ'কে সঙ্গে লইয়া জীবাত্মা সুষুপ্তির আরাম-নীড়ে প্রবেশ করে; আর সেই গতিকে সুষুপ্তির নিভৃত নিকেতনে চিৎপ্রকাশ এবং আনন্দ উভয়েই একত্রে মিলিত হয়। তবে কিনা—চিৎপ্রকাশ সুষুপ্তির সঙ্গে মিশিয়া ঘনীভূত বা একীভূত হইয়া যায়, আর, সেইজন্য বেদান্তশাস্ত্রে সুষুপ্তিকে বলা হইয়া থাকে "প্রজ্ঞান-ঘন,"

আনন্দ জীবাত্মার ভোগের জন্য অনাবৃত হয়, আর, সেইজন্য বেদান্তশাস্ত্রে সুষুপ্তিকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ। সুষুপ্তিকালে চিৎপ্রকাশ যদি মূলেই বর্ত্তমান না থাকিত —সুপ্তির সঙ্গে মিশিয়া সুপ্তবৎভাবেও বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে সুষুপ্তিতে আনন্দ অনুভূত হইতে পারিত না, কেননা (একটু পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছি) সত্তার প্রকাশ ব্যতিরেকে আনন্দের অনুভূতি সম্ভবে না; আর সুষুপ্তিতে যদি আনন্দের অনুভূতি না হইত, তাহা হইলে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি কখনই এত বড় একটা মিথ্যা কথা মুখে উচ্চারণ করিতে সাহসী হইত না —যে, "কাল রাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।"

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সুষুপ্তি এই যেমন আনন্দময় কোষ; বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের মহাসুষুপ্তি, যাহার আর নাম প্রলয়, তাহাও তেমনি আনন্দময় কোষ হইবারই কথা, কেননা, বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সমষ্টি ব্যষ্টি সম্বন্ধ। প্রভেদ কেবল এই যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে, পূর্ব্বরাত্রের আনন্দ হইতে পররাত্রের আনন্দে প্রয়াণ করিবার সময় মাঝের পথে বাধাবিঘ্নের সহিত আত্মশক্তির সংগ্রাম এবং তজ্জনিত দুঃখক্লেশ অনিবার্য্য; পরন্তু, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে, ঐশী-শক্তির মূলেই বা কি—শেষেই বা কি—আর মাঝেই বা কি, সর্ব্বত্রই আনন্দের বাধা-বোসনাই চির-বিরাজমান। একটুপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জীবাত্মার আত্মশক্তি যে পরিমাণে দিনগত বাধাবিঘ্নের উপরে জয়লাভ করে, সেই পরিমাণে চিৎপ্রকাশ এবং প্রেমানন্দ বাধামুক্ত হয়, আর আত্মশক্তির বিশ্রামকালে—সেই পরিমাণে বাধামুক্ত প্রকাশ এবং আনন্দকে সঙ্গে লইয়া জীবাত্মা সুষুপ্তির আরামনীড়ে প্রবেশ করে। এখন কথা হইতেছে এই যে, "সম্মুখের বাধাবিঘ্ন অপক্রান্ত হইলেই ঈশ্বরপ্রসাদে আনন্দের অভ্যুদয় হইবে" এই বিশ্বাসে ভর করিয়া জীবাত্মার আত্মশক্তি যদিচ খাটুনি'র কষ্টকে কষ্টজ্ঞান করে না, তথাপি তাহাকে কষ্ট করিয়া গন্তব্যপথে প্রতিপদ অগ্রসর হইতে হয় তাহাতে আর ভুল নাই। একপ্রকার খাটুনি আছে—ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে Labour of love—প্রীতির খাটুনি। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, রামায়ণের রচনাকার্য্যে বাল্মীকি মুনি যেরূপ খাটিয়াছিলেন, তাহা প্রীতির খাটুনি; কিন্তু তথাপি তাঁহার সেই সাধের রচনাকার্য্যটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিপাটীরূপে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে তাঁহাকে বিলক্ষণই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল—নারদ মুনির নিকট হইতে রামের সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল—ক্রৌঞ্চী-পক্ষীটির জন্য তাঁহাকে যেরূপ মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার সরস্বতীর গর্ভবেদনা; দুঃসহ শোকসন্তাপে তাঁহার মন যখন কিছুতেই শান্তি মানিতেছিল না—সেই মুখ্য সময়টিতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার নয়ন-সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন, আর তাঁহার দৈবশক্তিময়ী অভয়বাণীতে তাঁহার মনোমধ্যে কবিত্বরসের উৎস উন্মুক্ত হইয়া গেল। তবেই হইতেছে যে, রামায়ণের রচনা-কার্য্যে প্রীতির খাটুনি এবং কষ্টের খাটুনি দুইই একসঙ্গে জড়ানো ছিল। পরন্তু জগতের সৃষ্টিস্থিতিকার্য্যে ঐশীশক্তির খাটুনি আগাগোড়াই প্রীতির খাটুনি—তাহা নিখুঁত আনন্দ-সঙ্গীত; কেননা, ঐশীশক্তি পরমাত্মার স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া; তাহা একান্ত পক্ষেই বাধাবিহীন; তাহার কোথাও কোনো স্থানে কষ্টকল্পনার নামগন্ধও নাই। ঐশীশক্তিতে বিশ্রামের আনন্দ এবং উদ্যমের স্ফূর্ত্তি নিশ্বাস এবং প্রশ্বাসের ন্যায় একসূত্রে গ্রথিত এবং উভয়ে উভয়ের প্রতিপোষক। অতএব এটা স্থির যে, ঐশীশক্তি নিত্যানন্দময়ী। এই যে নিত্যানন্দময়ী ঐশীশক্তি ইহাই নিত্যসত্ত্ব; কেননা, (অনতিপূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি) দাহিকা-শক্তি যেমন অগ্নির অগ্নিত্ব, কাব্যরচনা-শক্তি যেমন কবির কবিত্ব, নিত্যানন্দময়ী ঐশীশক্তি তেমন সৎস্বরূপের নিত্যসত্ত্ব। এই নিত্যসত্ত্বের অমৃত-ভাণ্ডার সর্ব্বজগতের মঙ্গলের জন্য নিরন্তর উন্মুক্ত রহিয়াছে। যাহাতে অমৃতের পুত্রকন্যারা সকলে মিলিয়া চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্ত্তিয়া থাকিতে পারে, আত্মার এই অন্তরতম সদিচ্ছাটিকে বলবতী এবং ফলবতী করিবার অভিপ্রায়ে মনুষ্যের আত্মশক্তি যদি সম্মুখস্থিত বাধাবিঘ্নের অপনয়ন-কার্য্যে কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে, আত্মশক্তি একদিনের কার্য্য একদিনের মতো সুসম্পন্ন করিয়া রাত্রিকালে যখন সুষুপ্তির আনন্দময় কোষে বিশ্রাম করে, তখন পরমাত্মার সেই অমৃত-ভাণ্ডার হইতে—স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া হইতে—নিত্যসত্ত্ব হইতে—

সুনির্ম্মল আত্মপ্রসাদ শান্তি তৃপ্তি এবং আরোগ্য অবতীর্ণ হইয়া সুষুপ্ত ব্যক্তির নির্জীব শরীরে নবজীবনের সঞ্চার করে; আর, পরমাত্মার প্রসাদলব্ধ সেই যে নবজীবন, যাহা সদাচারপরায়ণ পুণ্যাত্মারা সুষুপ্তির হস্ত হইতে প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহাদের নিকটে তাহা অমূল্য ধন, কেননা, পরদিনের কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা তাহা বিধিমতে কাজে খাটাইয়া তাহা হইতে সোনা ফলাইয়া তোলেন।

মনে কর, রাজর্ষি জনক সমস্তদিন তাঁহার অধীনস্থ প্রজাদিগের মুখে তাহাদের নানা প্রকার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি এম্নি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, প্রজাদিগের জন্য তিনি কি করিয়াছেন না করিয়াছেন তাহার বিশেষ বিবরণ কিছুই তখন তাঁহার মনোমধ্যে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না, কেবল মোটের উপরে তিনি যে প্রজাবর্গের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন—এই মোট জ্ঞানটি তাঁহার অন্তঃকরণে আত্মপ্রসাদের জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছে। এই যে মোট জ্ঞান এবং তজ্জনিত আত্মপ্রসাদ, এই দুইটি পুণ্যফল লইয়া তিনি যখন সুষুপ্তির আরামনীড়ে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন তাঁহার এরূপ মনে হইতেছে না যে, "আমি এক্ষণে সর্ব্বসংহারক মৃত্যুর ভীষণ বন্দিশালায় প্রবেশ করিতেছি।" ঠিক্ তাহার বিপরীত। তাঁহার মনে হইতেছে "আমি এক্ষণে সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী জগজ্জননীর চরণচ্ছায়ায় নিলীন হইতেছি।" এ যাহা তাঁহার মনে হইতেছে—বাস্তবিকই তা'ই। কেননা সুষুপ্তির আনন্দময় কোষ হইতে আনন্দামৃত পান করিয়া যাবৎ পর্য্যন্ত না তাঁহার শরীর সবল হয়, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, মন তৃপ্ত হয় এবং বুদ্ধি প্রসন্ন হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সেই স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে আপনার শান্তিসদনের পরিধির মধ্যে যত্নের সহিত আগ্‌লিয়া রাখেন। এখন কথা হইতেছে এই যে, সুষুপ্তিকালে সুপ্ত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনের যেরূপ প্রশান্ত সরল এবং নির্ম্মল অবস্থা স্বভাবত ঘটিয়া দাঁড়ায়, তেমনি, জাগ্রৎকালে যদি কোনো সাধক সজ্ঞানভাবে আত্মশক্তি খাটাইয়া আপনার মন হইতে বিষয়-বাসনা এবং অহঙ্কারাদি ধৌত করিয়া ফ্যালেন, তবে তাঁহারও মনের সেইরূপ প্রশান্ত সরল এবং নির্ম্মল অবস্থা ঘটিয়া দাঁড়াইবারই কথা; আর তাহা যখন ঘটিয়া দাঁড়ায় তখন পরমাত্মার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া হইতে -নিত্যসত্ত্ব হইতে—প্রজ্ঞাজ্যোতি এবং আনন্দামৃত অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সমস্ত অভাব ঘুচাইয়া স্থায়। এরূপ মহাত্মারা আপনার জন্য নির্ভাবনা এবং নিশ্চিন্ত; ইঁহারা "নির্যোগক্ষেম"। ইঁহাদের নিকটে আপনার মঙ্গল এবং অন্যের মঙ্গল—দুই মঙ্গল নহে, পরন্তু সব মঙ্গলই এক মঙ্গল; ইঁহাদের কার্য্যও তদনুরূপ। আর সেইরূপ কার্য্যে ইঁহাদের আত্মশক্তি নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় যখন খাটিবার হয় তখন খাটে, যখন বিশ্রাম করিবার হয় তখন বিশ্রাম করে; ইঁহাদের আত্মশক্তি বাধা-মুক্ত; ইঁহারা "আত্মবান্"। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে "নিত্যসত্ত্বস্থ" হওয়া "নির্যোগ-ক্ষেম" হওয়া এবং "আত্মবান" হওয়া একই ব্যাপার।

কেহ যদি মনে করেন যে, সুষুপ্তি কেবল সুষুপ্ত অবস্থারই নিজস্ব ধন, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। তাঁহার জানা উচিত যে, জাগরিতাবস্থাতে সবই আছে—বুদ্ধির জাগরণও আছে, মনের স্বপ্নও আছে, প্রাণের সুষুপ্তিও আছে; আর তিনের সামঞ্জস্য লোকমধ্যে দুর্লভ হইলেও মঙ্গলকামী ব্যক্তির পক্ষে তাহা অতীব প্রার্থনীয়। বড় বড় চিত্রকরদিগের চিত্ররচনার একটি প্রধান গুণ হচ্চে—জাগ্রৎসুষুপ্তি; আর, সে-যে সুষুপ্তি, অর্থাৎ চিত্রময়ী জাগ্রৎসুষুপ্তি, তাহার ইংরাজি পারিভাষিক নাম Repose।* অব্যবসায়ী লোকদিগের অভিধানে বুক-ফোলানো, চক্ষুরাঙানো, এবং বাহু আস্ফালন করা'র নামই বীরত্ব;—ফলে বীরত্ব যে কাহাকে বলে তাহা নেলসন্ জানিতেন; আর তাহা জানিতেন বলিয়া—ভীষণ জলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রারম্ভমুহূর্ত্তে সমস্ত মানোয়ারি সৈন্যবর্গকে সামনে ডাকিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন শুধু এই যে, England expects every man to do his duty, ইংলণ্ড চা'ন—প্রতিজন আপনার কর্ত্তব্য করে। ভাব এই যে, তোমরা যেমন সুনিশ্চিন্ত মনে আর-আর কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা কর, উপস্থিত কর্ত্তব্য কার্য্যও সেইরূপ সুনিশ্চিন্ত মনে

* Library Dictionaryতে এইরূপ লেখে:—
Repose, in the fine arts, that harmony and moderation which affords rest for the eye.

সমাধা কর। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সঙ্গতিপন্ন গৃহী-ব্যক্তিরা যেমন নিশ্চিন্তমনে বন্ধুবর্গের সহিত প্রীতিভোজনে উপবিষ্ট হ'ন—হাড়পাকা যোদ্ধারা অর্থাৎ Veteran শ্রেণীর যোদ্ধারা সেইরূপ নিশ্চিন্ত মনে তোপের মুখে অগ্রসর হ'ন। ইহারই নাম Repose। সিংহপ্রকৃতির যোদ্ধাবীরদিগের যুদ্ধকার্য্যে এই যেমন এক প্রকার জাগ্রৎ-সুষুপ্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব এবং ঈশা-মহাপ্রভুর ন্যায় ধর্ম্মবীরদিগের অন্তঃকরণে এবং আচার ব্যবহারে তাহা অপেক্ষা তাহা আরো সুপরিস্ফুটভাবে বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভকালে ইহুদীদেশীয় ফারিসীদিগের অভিধানে নিশান ওড়ানো'র নামই ছিল ধর্ম্ম; কিন্তু ঈশা তাঁহার শিষ্যবর্গকে সম্মুখে জড়ো করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা যখন দান করিবে, তখন তোমাদের ডা'ন হাত কি করিতেছে—বাঁ হাত যেন তাহা জানিতে না পারে। প্রকৃত কথা এই যে, কোনোপ্রকার মঙ্গলের উদ্দেশে আত্মশক্তিকে বিধিমতে কার্য্যে খাটাইতে হইলে বুদ্ধিকে জাগ্রত করা সাধকের পক্ষে যেমন আবশ্যক, অশান্ত এবং দুর্দ্দান্ত মন'কে সুযুপ্তির শান্তিসলিলে অবগাহন করানোও তেমনি আবশ্যক। কিন্তু তাহা হইতে পারে কেমন করিয়া? গীতাশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, মনুষ্যের অন্তরাত্মার সুনিভৃত প্রদেশে রজস্তমোগুণদ্বারা অবাধিত যে এক মহাসত্তা পরমাত্মাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে—যাহা পরমাত্মার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া—যাহাকে কোনো প্রকার দুঃখক্লেশও স্পর্শ করিতে পারে না—অশান্তিও স্পর্শ করিতে পারে না—জড়তাও স্পর্শ করিতে পারে না—সেই নিত্যসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মনুষ্যের মন অটল প্রশান্তি এবং স্থিরত্ব লাভ করে। ব্যাপারটি সামান্য নহে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ! তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে কত না প্রভূত পরিমাণে আত্মশক্তির পুঁজি সংগ্রহ করা আবশ্যক? অর্জ্জুনের ধনুক যেমন বিশ্ববিজয়ী গাণ্ডীব ধনু, অর্জ্জুনের তূণীব যেমন অক্ষয় তূণীর, অর্জ্জুনের রথধ্বজা যেমন দুদ্ধর্ষ ভীষণ মহাকপি; অর্জ্জুনের আধ্যাত্মিক রণসজ্জা তেমনি উহাদেরই সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিবার মতো বিরাট্ ছাঁচের হওয়া চাই; অর্জ্জুনের ধৈর্য্যবীর্য্য হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় অটল হওয়া চাই; অর্জ্জুনের জ্ঞাননেত্র নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় স্বর্গমর্ত্ত্যঅন্তরীক্ষের পরিষ্কার প্রতিবিম্ব-গ্রাহী দর্পণ হওয়া চাই; বিশেষতঃ অর্জ্জুনকে, ব্রহ্মের আনন্দের সহিত পরিচিত হওয়া চাই; কেননা, উপনিষদে আছে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন—ন বিভেতি কদাচন" "ব্রহ্মের আনন্দের সহিত যিনি পরিচিত হইয়াছেন তিনি কুত্রাপি ভয় প্রাপ্ত হ'ন না—কদাপি ভয় প্রাপ্ত হ'ন না।" শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয় অর্জ্জুনকে এইসকল আধ্যাত্মিক ব্রহ্মাস্ত্রে সুসজ্জিত করিবার অভি-প্রায়ে তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন যে, যাহারা ত্রৈগুণ্যের সেবক তাহারা বেদাদি শাস্ত্রই জানে সার—তুমি অর্জ্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও, নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও, নির্যোগক্ষেম হও, আত্মবান্ হও।

আজিকের এই একটিমাত্র শ্লোকের অর্থব্যাখ্যা অন্যান্য বারের গণ্ডাতিনেক শ্লোকের অর্থ-ব্যাখ্যার স্থান জুড়িয়া কলেবর বিস্তার করিয়াছে ভয়ানক! অতএব আজ এইখানেই থাকা যুক্তিসিদ্ধ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুস্তক-পরিচয়

Leprosy and its Treatment. Third Edition. By Pundit Kriparam Sarma. ২৩২ পৃঃ।

এখানি ইংরাজিতে লিখিত কুষ্ঠ ও তাহার চিকিৎসা বিষয়ক একখানি পুস্তক। বিখ্যাত কুষ্ঠব্যাধিচিকিৎসক পণ্ডিত কৃপারাম শর্ম্মা ইহার প্রণেতা। পণ্ডিত কৃপারামের নাম বঙ্গদেশে অনেকের নিকট সুপরি-চিত। কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসায় ইনি নাকি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া, অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সংবাদপত্রের সম্পাদককে চমৎকৃত করিয়াছেন এইরূপ শুনা যায়। পুস্তকখানি যখন আমাদের হাতে পড়ে তখন আমাদের মনে এই আশা হইয়াছিল যে, এই পুস্তক পড়িয়া কুষ্ঠ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিব কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হয় নাই। এই পুস্তকে কুষ্ঠরোগ ও তাহার চিকিৎসার কথা যত থাকুক আর না থাকুক লেখক যে একজন অদ্বিতীয় কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসক—এই বিপুল বিশ্বে এ বিষয়ে তাঁহার তুল্য সিদ্ধহস্ত আর কেহ নাই, বিবিধ প্রশংসাপত্র, সংবাদপত্রের অভিমত এবং আরও নানা উপায় দ্বারা, সেই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য বলিতে কি এই ২৩২ পৃষ্ঠার বইখানিতে কেবলমাত্র ৩২ পৃষ্ঠা কুষ্ঠরোগ ও তাহার চিকিৎসার কথায় পূর্ণ, বাকি ২০০ পৃষ্ঠা লেখক ও তাঁহার গুণপনার পরিচয়, গভর্ণমেণ্টের উপেক্ষা জন্য দুঃখ, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের প্রশংসাপত্র, সংবাদপত্রের অভি-মত এবং বিবিধ ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রভৃতি আছে। এই পুস্তকখানি

পড়িয়া আমাদের একান্ত নিরাশ হইতে হইয়াছে। কুষ্ঠরোগ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়ের যাহা বক্তব্য আছে সংক্ষেপতঃ তাহা এই ;—বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইলে কুষ্ঠ হয়। কুষ্ঠ প্রধানতঃ দ্বিবিধ মহাকুষ্ঠ ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। মহাকুষ্ঠ আবার ৭ প্রকার, ক্ষুদ্রকুষ্ঠ ১১ প্রকার। দদ্রু, ব্রণ, বিস্ফোটক প্রভৃতি ক্ষুদ্র কুষ্ঠের অন্তর্গত। মোটামুটি বলিতে গেলে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করিলে বায়ু পিত্ত কফ বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হয়। অধিক খাইলে, অল্প খাইলে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ দ্রব্যাদি খাইলে, কুপিত হইতে পারে—এ সকল ছাড়া আরও সহস্র কারণে বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হইতে পারে। পণ্ডিত মহাশয়ের মতে উপদংশ ও প্রমেহ রোগে ইহারা যেরূপ কুপিত হয়, এমন আর অন্য কোন কারণে নয় এই কারণে উক্ত দুই রোগকে ইনি কুষ্ঠরোগের প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা কিন্তু bacillus leprae নামক একরূপ উদ্ভিদাণুকে কুষ্ঠরোগের মূল কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন—এই ব্যাসিলাসের ধর্ম্ম অনেকটা টিউবার্কেল ব্যাসিলাসেরই ন্যায়, এই ব্যাসিলাস লইয়া ইয়ুরোপে অনেক পরীক্ষা চলিতেছে· যতটা আভাস পাওয়া যাইতেছে কুষ্ঠরোগ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক সত্য আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিব।

এই পুস্তকে কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসার বিশেষ কোন বর্ণনা নাই। পণ্ডিত মহাশয়, কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসায় যেসকল ঔষধ ব্যবহার করেন তাহাদের তালিকা আছে মাত্র। এই তালিকায় যেসকল ঔষধ আছে, সেসকল ছাড়া ইনি আরও অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন—সেগুলি ভয়ানক বিষ এই জন্য তাহাদের নামোল্লেখও করেন নাই। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ জানিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকেও তাহাদের নামোল্লেখ করিয়া শুনাইতে সাহস করেন নাই—কেননা তাহারা ভয়ানক বিষ—অধ্যক্ষ সাহেবের অনর্থ ঘটায় বিচিত্র কি? ইহার উপর আর কোন কথা চলে না। পুস্তকখানিতে একটা কাতরোক্তি দেখা যায়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেকে আবার তাহার সমর্থনও করিয়া থাকেন—যে, গভর্ণমেণ্ট যেন ইচ্ছা করিয়া ঐ পণ্ডিত মহাশয়ের গুণের আদর করিলেন না। আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে এই আশ্বাস দিতে পারি, যদি বাস্তবিকই তাঁহার গুণ থাকে তাহা হইলে শুধু এদেশে কেন, দেশ বিদেশে তাঁহার গুণের একদিন যথার্থ আদর হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সেই গুণের পরিচয় শুধু সংবাদপত্রের অভিমত এবং প্রশংসাপত্রের দ্বারা হইবে না। তিনি কুষ্ঠরোগ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে যেসকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, কিছুমাত্র গোপন না রাখিয়া, সুধী-সমাজে সেসকল উপস্থিত করুন তবেই তাঁহার গুণের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানকালে Serum ও Vaccine দ্বারা কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার অনুষ্ঠান হইতেছে—স্থলবিশেষে, ইহার দ্বারা ফলও পাওয়া যাইতেছে শুনিতেছি কিন্তু ইহার উপর নির্ভর করার এখনও সময় হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের চিকিৎসাপ্রণালী যদি অধিকতর ফলদায়ক হয় তাহা হইলে, তাহার পরীক্ষার সুযোগ সকলকেই দেওয়া উচিত। এই পুস্তকে যেসকল রোগীর চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের রোগের ইতিহাস, এবং তাহাদের চিকিৎসার বিবরণ প্রদত্ত হইলে, তাঁহার প্রণালীমত চিকিৎসা করিবার আমাদের বিশেষ সুযোগের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় ইচ্ছা করিয়াই আমাদিগকে সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

বেলগেছিয়া হাঁসপাতালে দুইটি রোগীকে চিকিৎসা করার পর হইতেই এদেশে পণ্ডিত কৃপারামের নাম প্রচারিত হইতে থাকে। সে সময়, সংবাদপত্রে এবং অনেক চিকিৎসকের মুখে তাঁহার যথেষ্ট গুণগান শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমরা কিন্তু তাহা অনুমোদন করিতে পারি নাই। দুই একটি রোগীকে আরাম হইতে দেখিয়াই কোন মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করি নাই। ডাক্তারি চিকিৎসায়ও এরূপ দুই একটি রোগী না সারে এমন নয়।

"Albuttএর System of Medicine নামক পুস্তকে কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা-প্রসঙ্গে এই কথা লিখিত থাকিতে দেখা যায়।—"The treatment of leprosy is by no means satisfactory ; but although an absolute cure rarely be anticipated, it is a mistake to suppose nothing can be done to prolong life or mitigate suffering or even occasionally to eradicate the disease."

ইহা হইতে এমন বুঝায় না যে কুষ্ঠরোগী একবারেই আরাম হয় না। ২।৪টি রোগী সম্পূর্ণ আরাম হইতে পারে। পণ্ডিত মহাশয়ের রোগীগুলিও যে সে শ্রেণীর অন্তর্গত নয় সেকথা জোর করিয়া কেহ বলিতে পারে না।

এই পুস্তকখানির মূল উদ্দেশ্য যদি কুষ্ঠরোগ ও তাহার চিকিৎসা বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য গ্রন্থকারের সে উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে ; আর, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য যদি আপনার ক্ষমতা সাধারণের নিকট জ্ঞাপন করা হয়, তাহা হইলে তাহা ব্যর্থ হয় নাই। এই পুস্তক পড়িয়া অনেকেই পণ্ডিত মহাশয়কে একজন অদ্বিতীয় কুষ্ঠরোগ চিকিৎসক বলিয়া মনে করিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। —ডাক্তার।

গৃহচিকিৎসা (পারিবারিক চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক) দ্বিতীয় সংস্করণ—

সাব্-এসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জন্ শ্রীসারদাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ২৯৮ পৃঃ, মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

এখানি এলোপ্যাথী চিকিৎসার বই। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"গৃহস্থদিগের ব্যবহারের জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হইতে পারে, এমন কোন ডাক্তারি পুস্তকের বিশেষ অভাব। এজন্য আমি চিকিৎসা বিষয়ক বিবিধপুস্তক অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করিলাম।" গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ভাল ; এখন তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্যটি যদি বাস্তবিকই কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালী গৃহস্থের যে একটা বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা লেখকের পরিশ্রমের যতটা পরিচয় পাইয়াছি—কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সেরূপ পরিচয় পাই নাই। গ্রন্থকার অনেকস্থলেই আপনার উদ্দেশ্যটি মনে রাখিতে পারেন নাই ; ইহার ফলে পুস্তকখানি চিকিৎসাপুস্তক হইয়াছে বটে, কিন্তু পারিবারিক চিকিৎসাপুস্তক হইতে পারে নাই। পুস্তকখানির অধিকাংশ স্থলই সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বোধ হইয়াছে। পারিবারিক চিকিৎসাগ্রন্থের কয়েকটি বিশেষত্ব থাকিতে দেখা যায় :—

(১ম) ইহার ভাষা যথাসম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল হয় ; সাধারণে যাহা বুঝিতে পারে না এরূপ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়।

(২য়) যেসকল রোগ খুবই সাধারণ, ইহাতে প্রধানতঃ সেইসকল রোগেরই বিবরণ প্রদত্ত হয়।

(৩য়) রোগের লক্ষণসমূহের কেবল মাত্র একটা তালিকা থাকে না—লক্ষণগুলিকে এরূপ ভাবে সাজাইয়া বর্ণনা করা যায় যে, পড়িবামাত্র পাঠকের মনে রোগটির যেন একটা ছবি অঙ্কিত হইয়া যায়।

(৪র্থ) সাধারণ গৃহস্থের হস্তে যাহা সম্ভব, ইহাতে কেবলমাত্র সেইসকল চিকিৎসার বিবরণ প্রদত্ত হয়।

(৫ম) যে অবস্থায় রোগীকে নিজের হাতে না রাখিয়া, উপযুক্ত চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত, ইহাতে সেই অবস্থাটির বিশেষ উল্লেখ থাকে।

(৬ষ্ঠ) ঔষধের মাত্রা, মাপ, প্রস্তুতপ্রণালী, থার্ম্মোমিটারের ব্যবহার, বিবিধ পথ্যপ্রস্তুতপ্রণালী প্রভৃতি গৃহস্থের অবশ্যজ্ঞাতব্য এইরূপ অনেক বিষয়ের বর্ণনা প্রদত্ত হয়।

বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে এসকল নিয়মের কোনটাই তেমন ভাবে রক্ষিত হইতে দেখা যায় না। ইহার ভাষা কঠিন নহে বটে, কিন্তু প্রাঞ্জল বলা যায় না। লেখক অনেক স্থলেই আপনার বক্তব্যটি তেমন পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারেন নাই। বসন্ত রোগের চিকিৎসা-প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন—"উপযুক্ত সুশ্রূষা হইলে আরাম আপনিই সারিয়া থাকে।" লেখকের উদ্দেশ্য বোধ হয় এইরূপ বলা যে, বসন্ত রোগের বিশেষ কোন ঔষধ নাই; এ রোগে যাহারা আরোগ্যলাভ করে, আপনা হইতেই করে—তবে সুশ্রূষার আবশ্যক; উপযুক্ত সুশ্রূষা না হইলে, যাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা, তাহারাও বাঁচিতে পারে না। গ্রন্থখানিতে এরূপ অস্ফুটভাবের উদাহরণ নিতান্ত কম হইবে না। আবার অন্তরুৎসেবন, গোমসূর্য্যাধান, হৃদ্দোপন, দন্তনির্ম্মাপক, উদরাধ্মান, প্রভৃতির ন্যায় বিস্তর দুরূহ শব্দ থাকায়, এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায়, পুস্তকখানির অধিকাংশ স্থলই সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বুঝা অসম্ভব হইয়াছে। রোগনির্ব্বাচনও যে খুব ভাল ও সঙ্গত হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। ইহাতে এমন অনেক রোগের কথা আছে, যেগুলি এদেশের রোগ নয়, এবং এদেশে ইহাদের হইতেও দেখা যায় না। সারদাবাবু ত বহুদিন ধরিয়া চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী আছেন; তাঁহার এই সুদীর্ঘ চিকিৎসাকাল মধ্যে, তিনি কয়টি Yellow fever (পীত জ্বর), Scarlet fever (আরক্ত জ্বর), typhus (টাইফাস্) জ্বরের রোগী দেখিয়াছেন আমাদের বলিয়া দিবেন কি? যেসকল রোগের সহিত গৃহস্থের কোনই সম্বন্ধ নাই অথবা অতি সামান্যই সম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনা, সেসকল রোগের বিবরণ দিয়া, ভালমানুষ পাঠকের মনে ধাঁধাঁ উৎপন্ন করিবার পারিবারিক-চিকিৎসাপুস্তক-প্রণেতার যে কোনরূপ বৈধ অধিকার আছে, ইহা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

পুস্তকখানিতে রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণ নাই। উহাদের একএকটা তালিকা আছে মাত্র। ইহাতে, রোগটির যত প্রকার কারণ, লক্ষণ, ও চিকিৎসা থাকিতে পারে, তাহাদের কোনটিরই নাম বাদ পড়ে নাই, কিন্তু কার্য্যকালে, ইহার দ্বারা গৃহস্থ যে কতটা ফল পাইতে পারিবে সে বিষয়ে আমাদের খুবই সন্দেহ রহিয়াছে। Intussusception (অন্ত্র মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ) নামক রোগটির কারণ দেওয়া হইয়াছে—"অন্ত্রের উত্তেজনা, সর্পবৎগতির আধিক্য, লঙ্গিটিউডিন্যাল্ কোটের সংকোচন" ইত্যাদি। সারদাবাবুকেই জিজ্ঞাসা করি, ইহা পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকের মনে কি কোন একটা ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে? আমরা Dr. Birch (ডাঃ বার্চ), Dr. Moore (ডাঃ মুর), Dr. Billroth (ডাঃ বিলরথ) প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকের গৃহ-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছি। এসকল পুস্তকে রোগটির সকল লক্ষণ এবং সকল প্রকার চিকিৎসারই যে উল্লেখ আছে তাহা নহে। যেসকল লক্ষণ সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বুঝা সম্ভব এবং যেসকল চিকিৎসা গৃহস্থের পক্ষে আপনার হাতে করা অসম্ভব নয়, এসকল পুস্তকে কেবল সেইসকল লক্ষণ এবং চিকিৎসার বিবরণ থাকিতে দেখা যায়। এ পুস্তকখানিতে সেরূপ অনুষ্ঠানের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। সারদাবাবু আশা করেন, তাঁহার গৃহস্থ পাঠক শিক্ষিত ডাক্তারের ন্যায় রোগ পরীক্ষা করিবেন; "রঙ্কাস্," "সিবিল্যান্ট্ শব্দ," "ভেসিকুলার মর্ম্মার", "রালস্," "কুইনস্ রঙ্কাস্," "ফ্রিক্শান্ সাউণ্ড্" প্রভৃতি বুঝিতে পারিবেন; "শরীরের টিশুমধ্যস্থ এল্‌বুমেন্ কিম্বা মেদপদার্থ হইতে বিটা-আক্সি-বিউটেরিক্ এসিড উৎপন্ন হয়, ঐ এসিড দ্বারা বিষাক্ত হইলে ডায়াবেটিক্ কোমা হয়" প্রভৃতি তত্ত্ব জলের মত বুঝিতে পারেন; কলেরা রোগ চিকিৎসায়, নাইট্রোগ্লীসিরেনের "ইণ্ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেক্শন্" দিবেন; নিউমোনিয়া রোগে জ্বর কমাইবার জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র দ্বিধা না করিয়া এণ্টিপাইরিন্ নামক ঔষধ প্রয়োগ করিতে থাকিবেন। ফলতঃ শিক্ষিত চিকিৎসক যেসকল কাজ করিতে ভয় পায়, সারদাবাবু দেখিতেছি তাঁহার আনাড়ি পাঠকগণ দ্বারা অবাধে সেসব কাজ করাইয়া লইতে সাহসী। অদ্ভুতের উপর অদ্ভুত এই যে সারদাবাবুর পাঠকদিগের কোন রোগেই এবং রোগের কোন অবস্থাতেই ডাক্তার ডাকার আবশ্যক হয় না। কেবল যেসকল স্থলে অস্ত্রপ্রয়োগ করিবার আবশ্যক সেইরূপ স্থলেই ডাক্তারের সাহায্য লইবার প্রয়োজন হয়। ইংরাজি ভাষায় পারিবারিক চিকিৎসা সম্বন্ধে যেসকল পুস্তক আছে, তাহাদের লেখকেরা কঠিন রোগের বেলায় ত কথাই নাই—অপেক্ষাকৃত সহজ রোগও বাঁকা হইয়া দাঁড়াইবার মত হইলে, কালবিলম্ব না করিয়া গৃহীকে ডাক্তার ডাকিতে পরামর্শ দেন। সারদাবাবুও যদি ইঁহাদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় তাঁহার পুস্তকের গৌরবের বৃদ্ধি বই হ্রাস হইত না। সারদাবাবু তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থলেই, পুল্‌টিস্, চারকোল্ পুল্‌টিস্, ফোমেণ্টেশন্, করোসিভ্ সাব্লিমেট্ লোসন (ওয়ান্ ইন থাউজ্যাণ্ড) এবং সাগু, বার্লি ওয়াটার, সুপ, ব্রথ্ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু এসকল কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। অধিকাংশ গৃহস্থই যে এসকল যথাযথ রূপে প্রস্তুত করিতে জানে না, ইহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি, আর সারদাবাবুও যে তাহা জানেন না, ইহা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। এসকল ত্রুটি ছাড়া পুস্তকখানিতে আরও বিবিধ প্রকার ত্রুটি ও ভ্রম আছে, সকলগুলির উল্লেখ করা অসম্ভব, এ স্থলে দুই একটির উল্লেখ করিব মাত্র।

গোমসূর্য্যাধান অর্থাৎ গোবীজের টীকা নামক প্রসঙ্গটি সুলিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু লেখকের অনবধানতা বশতঃ practical (কার্য্যোপযোগী) হইতে পারে নাই। এদেশে সাধারণতঃ টীকাদারেরা (vaccinators) টীকা দিয়া থাকে। টীকা দেওয়া খুব শক্ত কাজ নয়; বুদ্ধিমান গৃহস্থ ইহা অবাধে দিতে পারে। টীকা দিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে বীজ সংগ্রহের আবশ্যক। সারদাবাবু যে-বালকের টীকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার গুটি হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে বলেন; কিন্তু পল্লীগ্রামে তেমন বালক কি সব সময় পাওয়া সম্ভব? সারদাবাবু কি জানেন না কাচের টিউবে করিয়া calf-lymph (গোবীজ) পাওয়া যায়, এবং আজকাল তাহার দ্বারাই প্রায় স্থলেই টীকা দেওয়া হইয়া থাকে? সে যাহাই হউক সারদাবাবুর পরের ত্রুটির আর মার্জ্জনা নাই। তিনি বলিতেছেন—"যাহাকে টীকা দিবে তাহার বাহুমূলের চারি অঙ্গুলি নিম্নে ৩।৪ স্থলে উপত্বক মাত্র ছেদ করিয়া তন্মধ্যে বীজ বসাইবে।" ইহার পূর্ব্বে antiseptic precaution লওয়ার যে আবশ্যক তাহার কোন উল্লেখ করিলেন না। এরূপ স্থলে erysipelas (বিসর্প), tetanus (ধনুষ্টঙ্কার) প্রভৃতি প্রাণঘাতক রোগ দেখা দেওয়ার যে কত সম্ভাবনা—সে কথাটি সারদাবাবুর ন্যায় বহুদর্শী চিকিৎসক কি করিয়া ভুলিয়া গেলেন, আমরা তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমরা এই পুস্তকে জ্বর বলিয়া একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের আশা করিয়াছিলাম। জ্বর যদিচ স্বতন্ত্র রোগ নয়—অন্য রোগের লক্ষণ, তথাপি জ্বর কি? তাহার আনুসঙ্গিক লক্ষণই বা কি? জ্বরকালে শারীরিক ক্রিয়ার

ব্যতিক্রম কিরূপ হয়? তাপের পরিমাণানুসারে জ্বরের শ্রেণীবিভাগই বা কিরূপ? জ্বরের মোটামুটি চিকিৎসাপ্রণালী কিরূপ? ইত্যাদি বিষয় বিস্তীর্ণভাবে লিখিত হইলে গৃহীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল। জ্বরে অনেক সময় শরীরের তাপ অতিশয় বৃদ্ধি হয়, এই তাপ যদি কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলেই রোগীর প্রাণবিনাশ হইতে দেখা যায়। এই তাপ হ্রাস করিবার যেসকল উপায় আছে, তাহাদের মধ্যে রোগীকে শীতল জলে স্নান করান সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও নিরাপদ উপায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সারদাবাবু তাঁহার পুস্তকের কোন স্থানেই এই উপায়টির উল্লেখও করেন নাই। এই পুস্তকের চিকিৎসা-বর্ণনা অনেক স্থলেই এত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া, গৃহীকে রোগচিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে না। জলমগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসা প্রসঙ্গে এই পুস্তকে লিখিত আছে—"রোগীকে জল হইতে তুলিয়া তাহার পা উর্দ্ধ এবং মাথা নিম্ন দিক করিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে, ফুসফুসের জল বাহির হইয়া যাইবে।" ইহা পাঠ করিয়া কেহ যদি রোগীর পা ধরিয়া, ২।১০ মিনিট কাল তাহাকে ঝুলাইয়া রাখে, তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না; কেননা মাথাটা পা হইতে কতখানি নীচু করিতে হইবে, এবং এরূপ ভাবে কতক্ষণই বা রাখিতে হইবে, সারদাবাবু স্পষ্ট করিয়া তাহা বলেন নাই। একজন ইংরাজ লেখক (Lyon) এ বিষয়ে কত সতর্ক তাহা দেখুন—

Get rid of any water in the mouth &c. by placing the body for a *few seconds* face down with *head a little lower* than the *feet*." গ্রন্থকার ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া, few seconds, head little lower, feet এই কয়টি শব্দ মোটা অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। এতটা সাবধান হওয়ার যে কারণ নাই, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। জলমগ্ন ব্যক্তি যে সব সময় দম বন্ধ হইয়া মারা যায় তাহা নহে। শতকরা ১২টি রোগীর মৃত্যুর কারণ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য (Congestion of brain) কিম্বা সন্ন্যাসরোগ (apoplexy)। রোগীর পা ধরিয়া মাথাটা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ ঝুলাইয়া রাখিলে, মস্তিকে রক্তাধিক্য ও সন্ন্যাস রোগ হওয়ার খুবই যে সম্ভাবনা ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এই কারণেই Lyon (লায়ন্) কিছুক্ষণ না লিখিয়া, few seconds (কয়েক সেকেণ্ডকাল) লিখিয়াছেন, head little lower (মাথাটা পা হইতে সামান্য নীচু) লিখিয়াছেন এবং এই শব্দগুলি যাহাতে পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া না যায়, সেই কারণে মোটা অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। সারদাবাবু কৃত্রিম উপায়ে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সে উপায়টি কি তাহার বর্ণনা করেন নাই। শ্বাসপ্রশ্বাস স্থাপনের যে তিনটি উপায় আছে, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটির বিশেষ রূপে বর্ণনা করা উচিত ছিল। আর একটি কথা এই যে, কতক্ষণ চেষ্টা করার পর রোগীর জীবন-আশা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহারও উল্লেখ করা উচিত ছিল। আমরা একঘণ্টার চেষ্টায় রোগীর প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইতে দেখিয়াছি। রোগীকে ঘিরিয়া যাহাতে লোকে ভিড় না করে, সে বিষয়েও সতর্ক করা উচিত ছিল।

এই ত গেল পুস্তক লিখিতে যেসকল ত্রুটি ঘটিয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা—এখন ইহাতে যেসকল ভ্রম ঘটিয়াছে, তাহাদেরও দুই একটির উল্লেখ করিব। সারদা বাবুর মতে সকল মশকই যেন ম্যালেরিয়ার বাহন। আমরা কিন্তু এনোফেলীস্ (anopheles) নামক বিশেষ একশ্রেণীর মশককেই ম্যালেরিয়ার বাহন বলিয়া জানিতাম। সারদা বাবু বলিতেছেন—"যেসকল মশক ম্যালেরিয়ার বিষবহন করিয়া বেড়ায়, তাহারা যেসকল ডিম পাড়ে, সেই ডিম ফুটিয়া যেসকল মশক হয়, তাহারা সকলেই ম্যালেরিয়া বিষের আধার; উহাদের দংশন কর্ত্তৃক ম্যালেরিয়া বিষ মানবশরীরে সংক্রামিত হয়।" এই অভিনব তত্ত্বটি সারদাবাবুর নিজের না কোন পুস্তক হইতে সংগৃহীত? আমরা ত জানিতাম এনোফেলীস্-নন্দনেরা যতক্ষণ কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্তকে দংশন করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহাদের মানবশরীরে ম্যালেরিয়া সঞ্চার করিয়া দিবার শক্তি জন্মাইতে পারেনা। সারদা বাবু দেখিতেছি cerebrospinal fever (মস্তিষ্কাঙ্গের জ্বর) ও black fever (ব্লাক্ ফিভার) এক মনে করেন। Sir Patrick Manson কিন্তু ব্লাক্ ফিভার ও আসামের কালাজ্বর এক বলেন। কালাজ্বর যে সেরিব্রো-স্পাইন্যাল্ ফিভার্ নয়, বোধ করি সারদা বাবু তাহা অস্বীকার করিবেন না।

এইসমস্ত ত্রুটি আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয় পুস্তকখানি কোন হিসাবেই গৃহস্থের পক্ষে সুবিধাকর হয় নাই। আমরা সারদা বাবুকে বার্ট সাহেবের কথাটি স্মরণ করাইয়া দিই—"Mere enumeration of sets of symptoms and treatments is unsatisfactory and impracticable."

সারদাবাবু যদি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে তিনি বর্ত্তমান পুস্তকখানিকে পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া, চিকিৎসক-সহচর কি ভিষকবন্ধু এইরূপ একটা নাম দিয়া প্রকাশ করুন, আর বার্ট, মুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণের পুস্তক অবলম্বনে, গৃহচিকিৎসা নাম দিয়া একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে চেষ্টা করুন। আমরা তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি, চাই কি সফলকাম হইতে পারিবেন।

—ডাক্তার।

রাণী জয়মতী—

অবলাবান্ধব, শৈব্যাচরিত, প্রভাতকুসুম প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত, কটন লাইব্রেরী, ঢাকা। ঢাকা, কাশী প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৪৬ পৃষ্ঠা। একখানি চিত্র-সম্বলিত। মূল্য কাগজের বাঁধাই ।০ আনা, কাপড়ের বাঁধাই ।৵০ আনা।

আসামের নৃশংস রাজা চুলিকফার অত্যাচার হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তুঙ্গখুঙ্গিয়া রাজবংশের রাণী জয়মতীর অপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জনের কাহিনী লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতেও এই কাহিনীটী সন্দর্ভাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। মূল আখ্যানবস্তুর মাধুর্য্য কাজেই পাঠকগণের অনাস্বাদিত নহে। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে সে মাধুর্য্যের সারাংশটুকু গ্রন্থকারের নীরস ও একঘেয়ে বক্তৃতা-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে! গ্রন্থের প্রায় প্রতিপৃষ্ঠাতেই সতীধর্ম্মব্যাখ্যানে গ্রন্থকারের কর্কশ বাগাড়ম্বর স্থান পাইয়াছে এবং তাহা আবর্জ্জনার মত ঘিরিয়া ঘিরিয়া মূল আখ্যানটীকেও আবিল করিয়া তুলিয়াছে। বর্ণচ্ছেদ বিষয়ে গ্রন্থকার অজস্র কমাচিহ্নের ব্যবহারে পাঠসৌকর্য্যের ব্যাঘাত এবং বিশেষণকে বিশেষ্যের লিঙ্গানুগত করিয়া স্থানে স্থানে ভাষার শ্রুতিকটুত্ব জন্মাইয়াছেন। রাণী জয়মতীর যে-চরিত্রাংশ লইয়া গ্রন্থের সৃষ্টি তাহা মোটেই পরিস্ফুট হয় নাই। পাগলিনী-চরিত্রটীর সমাবেশ বেখাপ্পা হইয়াছে—তাহার মুখের গানগুলি পদ্যাকারে গদ্যেরও অধম। সাধ্বী জয়মতীর স্বামী গদাপাণি বীর না হইতে পারেন, কিন্তু যে স্ত্রী তাঁহারই জন্য নির্য্যাতনের কশাঘাত পৃষ্ঠ পাতিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাকে ঘাতকের হস্তে ফেলিয়া রাখিয়া "চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কোথায় চলিয়া গেলেন"—এরূপ দুর্ব্বলতার চিত্র মানবসমাজের অযোগ্য, সুতরাং জয়মতীর পবিত্র কাহিনীর সঙ্গে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত থাকা দূষণীয়। গ্রন্থের ছাপা মন্দ

নহে; বর্ডারগুলির অধিকাংশ বেমানান। গ্রন্থারম্ভের চিত্রটী সাধারণ, তন্মধ্যে আবার জয়মতীর মূর্ত্তি "গালফুলো গোবিন্দের মা" গোছের।

শেরশাহ—

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু প্রণীত। ঢাকা, কটন লাইব্রেরী হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা, কাশী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীরাইমোহন সরকার দ্বারা মুদ্রিত। পাঁচখানি একরঙ্গের চিত্রবিশিষ্ট। ডবল ক্রাউন চতুর্ব্বিংশাংশিত ৮১ পৃষ্ঠা। মূল্য সিল্ক বাঁধাই ॥০ আনা, কাগজে বাঁধাই ।৵০ আনা।

গ্রন্থারম্ভে 'নিবেদনে' উল্লিখিত হইয়াছে—'যাঁহারা ইতিহাসের কথার মধ্যে উপন্যাসের রস পাইতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য এই চিত্র অঙ্কিত হইল।' গ্রন্থকারের একথা অপ্রকৃত নহে। প্রসিদ্ধ পাঠানবীর শেরশাহের দুঃস্থ বাল্যাবস্থা হইতে বাদশাহীলাভ পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনের প্রধান ঘটনাবলী এই পুস্তকে সরসমধুর প্রণালীতে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের স্থানে স্থানে বহু মুদ্রাকর-প্রমাদ এবং বর্ণচ্ছেদাদি চিহ্নের ক্রটী ঘটিয়াছে; তৎসত্বেও পুস্তকখানি সুখপাঠ্য। তবে ইহার সমস্ত ঘটনা ইতিবৃত্তমূলক বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। শেরশাহ কর্ত্তৃক কালিঞ্জরদুর্গ অবরোধসময়ে যে গোলন্দাজ তাঁহাকে বিশ্বাস-ঘাতকতা পূর্ব্বক রোটাসগড় অধিকারসম্বন্ধ'য় পূর্ব্বকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া বারুদখানায় আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল গ্রন্থমধ্যে তাহার পরিচয় থাকা সঙ্গত। শেরশাহের মৃত্যুসময়ে শাহেন শা ফকির যে গান গাহিতে গাহিতে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন তাহা উর্দ্দু বা পার্শীভাষায় রচিত হইলে তৎসময়ের দৃশ্য আরো একটু গম্ভীর ও সুন্দর হইত। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ মন্দ নহে—সিল্কের বাঁধাইটুকুও মনোরম। ছবিগুলি বিশেষত্ববর্জ্জিত।

খাতির-নদারত।

গ্রহ পর্য্যবেক্ষণ

(৩)

গত অগ্রহায়ণ মাসে প্রধান প্রধান তারকাপুঞ্জের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, এবং মাঘ মাসে নবগ্রহের স্থূল পরিচয় প্রদান করিয়া দৃশ্যমান গ্রহ পাঁচটিকে আকাশ-পটে প্রদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কালচক্রের আবর্ত্তনে দেখিতে দেখিতে সেই স্বর্ণ সুযোগ চলিয়া গিয়াছে; প্রকৃতির অনন্ত বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে গগনপটেও বহুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

(১) কয়েকটি গ্রহ ব্যতীত ঐ যে অসংখ্য তারকারাজি শোভা পাইতেছে উহারা প্রত্যেকেই স্বপ্রকাশ—স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্,—ঠিক আমাদের সূর্য্যের ন্যায় উহারাও একএকটি সূর্য্য। উহারা সকলেই এক অদ্ভুত একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে। আজ উহাদের যেটি যাহার যেদিকে, যতদূরে, দৃষ্ট হইতেছে শতবর্ষ পরেও ঠিক সেইরূপই দৃশ্যমান থাকিবে। শুধু পৃথিবীর দৈনিক গতি বশতঃ বোধ হয় যেন উহারাই দলবদ্ধ হইয়া প্রতিদিন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার করিয়া আবর্ত্তন করিতেছে; আবার পৃথিবী স্বীয় বার্ষিক গতিতে প্রতিদিন এক অংশ (degree) পরিমাণ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া উহারাই দৈনিক এক অংশ করিয়া পশ্চাৎ সরিতেছে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। এইরূপে স্থির নক্ষত্রসমূহ (fixed stars) দৃশ্যতঃ একবর্ষে এক মহা-আবর্ত্তন শেষ করিয়া স্ব স্ব স্থানে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

(২) পরন্তু গ্রহগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির। উহারা পর-মুখাপেক্ষী, পরান্নপুষ্ট, পরাধীন ব্যক্তির ন্যায়—একতা'র আদর জানে না; স্বজাতির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দুই চারিটী পারিপার্শ্বিক (satellites) সহ পরানুগ্রহ লাভের জন্যই লালায়িত হইয়াই যেন কখনও মৃদু, কখনও বা দ্রুত গতিতে, কখনও সরল, কখনও বা বক্র গতিতে অনন্ত আকাশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; একবার অনুগ্রহ লাভ করিয়া বিশেষ হৃষ্টপুষ্ট ও প্রভাবান্বিত হইতেছে, এবং পুনর্ব্বার নিগ্রহ-লাঞ্ছিত হইয়া ক্ষীণকায়, ম্লান, ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছে। ৭ মাস পূর্ব্বে সন্ধ্যার পর পূর্ব্বাকাশে কৃত্তিকা-রোহিণী-পরিবারে যে মঙ্গলঠাকুরের কষিতকাঞ্চনকান্তিতে মহাতেজা শনি মহাশয়কেও অপ্রতিভ হইতে হইয়াছিল, আজ তাঁহার অন্তিমদশা উপস্থিত। ঐ দেখুন সান্ধ্যগগনের পশ্চিম প্রান্তে সিংহরাশিতে ইনি কিরূপ ম্লানভাবে অবস্থান করিতেছেন। ইহার সুন্দর নধর দেহ বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে; বিশেষ লক্ষণ লোহিতকান্তি ব্যতীত দীনদশাগ্রস্ত মঙ্গল-ঠাকুরকে আর চিনিবার উপায় নাই। ঐ দেখুন ইহার পূর্ব্বদিকের সিংহরাশিস্থ মঘা নক্ষত্রের (Regulas) নিকটেই ইহাকে এখন নিষ্প্রভ হইতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ঐ দেখুন পূর্ব্বাকাশে আবার কিরূপ বিপরীত পরিবর্ত্তন! সাত মাস পূর্ব্বে উষাকাশের দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্তে বৃশ্চিকরাশিস্থ অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ অনুরাধার (Antares) সন্নিকটে বৃহস্পতিকে দেখিয়াছিলেন। তখন ইহার প্রভা সাধারণ নক্ষত্রপ্রভা অপেক্ষা বড় বেশী ছিল না। আর, আজ সান্ধ্যগগনের ঐ দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্তেই চাহিয়া দেখুন, সেই বৃহস্পতির কি

শুভযোগ ঘটিয়াছে। সেই লোহিত-সুন্দর অনুরাধা স্বকীয় প্রভাতে সেই ভাবেই শোভা পাইতেছে বটে, কিন্তু সাময়িক অবস্থিতির অসুবিধা বশতঃ বৃহস্পতি ঠাকুর আজ সূর্য্যদেব-প্রদত্ত শুভ্র জ্যোতিতে পূর্ণাবয়ব হইয়া হেমকান্তি অনুরাধার সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া অতুল শোভায় আকাশপটের দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু "যেচে পাওয়া মান" ক'দিন টেঁকে! দেখিতে দেখিতে (২।৩ মাস মধ্যে) দেবগুরুও লঘু হইয়া পড়িবেন। ঠাকুরমহাশয়ের এখনও বক্রগতি। ঐ দেখুন অনুরাধার নিকট হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়দ্দূর পশ্চাৎপদ হইয়াছেন। ২০শে শ্রাবণ এই বক্রতা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বদিকে অতি মন্থর-গতিতে সরিতে সরিতে তিন মাসে ৮° ডিগ্রি মাত্র অগ্রসর হইবেন। পক্ষান্তরে, ঐ যে পশ্চাৎ হইতে সূর্য্যদেব ভীষণ-বেগে "সরিয়া" আসিতেছেন, ইনি এই তিন মাসে তিন রাশি (৯০°) অতিক্রম-পূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসে তুলা রাশিতে উপস্থিত হইবেন। তখন বৃহস্পতির এই রজতশুভ্র সুন্দর কান্তি সৌরতেজে ক্রমশঃ মলিন হইয়া যাইবে, এবং আজ যে কারণে মঙ্গলের এরূপ অমঙ্গল, ৩ মাস পরে ঠিক সেই কারণেই বৃহস্পতির ও দুর্গতি কাটিবে। গ্রহগণের এইরূপ সাময়িক হ্রাস-বৃদ্ধি ও গতি-পরিবর্ত্তন প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, পরাধীন-জীবনে প্রতিপদে বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা স্বর্গেও বুঝি স্বাভাবিক।

(৩) সূর্য্যকে আমরা যখন যে রাশিতে দেখিতে পাই পৃথিবী তখন বিপরীত দিকে তাহার সপ্তম রাশিতে অবস্থান করে। সুতরাং সূর্য্যের দিকে দৃশ্যমান গ্রহগুলি বস্তুতঃ পৃথিবী হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে এবং তদ্বিপরীত দিকের গ্রহগুলি পৃথিবীর নিকটে আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। এইজন্যই সম্প্রতি মঙ্গলকে দূরগত বলিয়া ক্ষুদ্রতর এবং বৃহস্পতিকে সমীপাগত বলিয়া বৃহত্তর দেখাইতেছে। বহিঃস্থ গ্রহগণের (external planets) দৃশ্যমান হ্রাসবৃদ্ধি এই কারণেই সংঘটিত হইয়া থাকে।

(৪) আভ্যন্তর গ্রহ (internal planet) বুধ ও শুক্রের হ্রাসবৃদ্ধি প্রধানতঃ চন্দ্রকলার ন্যায় বিভিন্ন রূপে সংঘটিত হয়। ইহাদের অর্দ্ধাংশ সূর্য্যালোকে সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইলেও অবস্থানবিশেষে বিভিন্ন সময়ে সেই অংশ অল্প বা অধিক পরিমাণে আমাদের সম্মুখীন থাকে; তাহ'তেই তাহাদের হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বুধ ও শুক্র যে-বৃত্তাভাস পথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে, পৃথিবী-কক্ষ তাহাদের বহির্ভাগে অবস্থিত। বুধ ও শুক্র স্বীয় কক্ষে যতই পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে এইরূপে ততই তাহাদের আলোকিত অংশ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে তাহারা যখন আমাদের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হয়, অর্থাৎ পৃথিবী ও সূর্য্যের সংযোজক-রেখায় উপস্থিত হয় তখন আমাদের ঠিক সমক্ষে থাকিয়াও অমাবস্যার চন্দ্রের ন্যায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তৎপরে ইহারা ক্রমশঃ পৃথিবী হইতে দূরগত হইয়া সূর্য্যের অপর দিকে সরিয়া যাইতে থাকে, এবং শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় ইহাদের প্রকাশিত অংশ ক্রমশঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। এইরূপে দিন দিন দীপ্তিময় অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও কিয়দ্দিন মধ্যেই অমিতপ্রভ সূর্য্যদেবের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ইহাদের (পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়) পূর্ণতাপ্রাপ্ত দেহমণ্ডলও একেবারে নিষ্প্রভ ও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে। বুধ-শুক্রের এই "ষোলকলায় সর্ব্বনাশ" অনুধাবন করিলেও মনে হয়, পরাধীন, পরপ্রত্যাশীর অবিরত অবস্থাবিপর্য্যয় স্বর্গেও অপরিহার্য্য।

(৫) সম্প্রতি গ্রহ কয়েকটীর অবস্থান (শ্রাবণের প্রথম ভাগে) এইরূপ—

(ক) বৃহস্পতি—বৃশ্চিকরাশিতে, রক্তাভ অনুরাধার উত্তরপশ্চিমে সন্ধ্যাকালে দক্ষিণপূর্ব্বাকাশে দ্রষ্টব্য।

(খ) মঙ্গল—সিংহরাশিতে, মঘার সন্নিকটে, সন্ধ্যা-কালে, পশ্চিমাকাশে দ্রষ্টব্য।

(গ) বুধ—সিংহরাশিতে, মঘার সন্নিকটে, সন্ধ্যাকালে, পশ্চিমাকাশে মঙ্গলের ৮° আটডিগ্রি পশ্চিমে দ্রষ্টব্য। ৮।১০ দিন মাত্র পরিষ্কার দেখা যাইবে। ১৬ই শ্রাবণ বক্রগতি অবলম্বন করিয়া কয়েকদিন মধ্যেই অদৃশ্য হইবে।

(ঘ) শনি—বৃষরাশিতে, কৃত্তিকা ও রোহিণীর মধ্য-স্থলে প্রত্যূষে পূর্ব্বাকাশে দ্রষ্টব্য।

(ঙ) শুক্র—কর্কটরাশিতে, সূর্য্যের সম্মুখীন বলিয়া

অদৃশ্য। ভাদ্রমাসের শেষাংশে কন্যারাশিতে সন্ধ্যাতারারূপে পশ্চিমাকাশে দেখা যাইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র দে।

"বাঙ্গালীর গ্রহণযোগ্য কি দেখিয়াছি"

নানাদেশের সাহিত্যে যেসব ভাল জিনিষ আছে, লোক-মুখে অলিখিত যেসকল গল্প প্রচলিত আছে, ইংরাজেরা সে সমুদয় অনুবাদ করিয়া আপনাদের সাহিত্য পরিপুষ্ট করিয়াছে। এইরূপ বাণিজ্যরীতি, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী, প্রভৃতিও তাহারা নানাদেশ হইতে শিখিয়াছে। ইংরাজদের ন্যায় পাশ্চাত্য অপরাপর জাতিরাও এই প্রকারে অন্য জাতির জিনিষ আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ অনুকরণ ও অনুসরণ প্রাচীন কাল হইতে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে চলিয়া আসিতেছে।

আমরাও এইরূপে অন্য দেশের ও অন্যজাতির এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশবাসীদের অনেক জিনিষ লইয়াছি ও পাইয়াছি, আরও এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা বিচার করিয়া লইবার যোগ্য। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বাঙ্গালীরা ভ্রমণ করিয়াছে ও করিতেছে। আপাততঃ আমরা যদি ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে আমাদের গ্রহণযোগ্য কি আছে, তাহার আলোচনা করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে। এইজন্য আমরা পর্য্যবেক্ষণপটু প্রবাসীবাঙ্গালীদিগকে এই কার্য্যে আমাদের সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। যিনি যে প্রদেশে বাস করেন বা করিয়াছেন, তিনি তথাকার বিষয় লিখিবেন। সকলেই যে সকল বিষয়ে লিখিবেন, তাহা নয়; যিনি যাহা জানেন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাই লিখিবেন। বঙ্গনারীর গ্রহণযোগ্য রীতিনীতি আদি সম্বন্ধে প্রবাসিনী বঙ্গমহিলারা লিখিলে উপকৃত হইব।

কি কি বিষয়ে লেখা যাইতে পারে, মোটামুটি তাহার একটি তালিকা দিতেছি। এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। ইহা ছাড়াও আরও অনেক বিষয় আছে।

১। লেখক বা লেখিকা যে প্রদেশের বিষয় লিখিতেছেন, তথাকার সাহিত্যে ও লোককথায় বাঙ্গলায় অনুবাদ করিবার মত কি কি জিনিষ আছে, এবং সম্ভবতঃ কাহার দ্বারা এই অনুবাদ, ও সংগ্রহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে? (ক) ঐ প্রদেশের ভাষায় ক্রিয়াপদের গঠন, বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, ইংরাজীতে which দিয়া বিশেষণ-বাক্য রচনায় যে রীতি আছে তদ্রূপ কোন রীতি থাকিলে তাহা,—এইরূপ বিষয়ে অনুকরণযোগ্য কিছু আছে কি না?

২। খাদ্য।* ৩। রন্ধন।* (ক) একত্র বা একাকী আহার; (খ) খাইবার সময় উপবেশনের আসন, বসিবার রীতি, ইত্যাদি। ৪। (ক) পুরুষের পরিচ্ছদ, (খ) নারীর পরিচ্ছদ। ৫। স্নানের নিয়ম, স্থান ও রীতি। ৬। শৌচের স্থান, নিয়ম আদি। ৭। সামাজিক শিষ্টাচার, অভিবাদন-প্রণালী, ইত্যাদি। ৮। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার সময় বা তৎপূর্ব্বে যাহা করা হয়। (ক) কন্যা-পণ ও বরপণ। (খ) বিবাহের বয়স। (গ) শ্বশুরালয়ে যাইবার বয়স। (ঘ) মাতৃত্বের বয়স। (ঙ) পূর্ব্বরাগ। (চ) বরযাত্রীদের আচরণ এবং তাহাদের প্রতি ব্যবহার। (ছ) দুই বৈবাহিক পরিবারের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ও মনের ভাব। ৯। পর্দ্দা। ১০। অবগুণ্ঠন। ১১। নারীর সম্মান বা অসম্মান। ১২। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় নারীর যত্ন বা অযত্ন। ১৩। সূতিকাগার ও তথায় নারীর প্রতি ব্যবহার। ১৪। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ও সম্বন্ধ। ১৫। ব্যবসাবাণিজ্যের রীতি। ১৬। চাষের রীতি। (ক) জল তুলিবার ও সেচন করিবার রীতি। (খ) গুড় ও চিনির ব্যবসায়। ১৭। ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার রীতি। (ক) বস্ত্রবয়ন, ইত্যাদি। ১৮। মৃতের সৎকারে প্রতিবেশীর সাহায্য করা। ১৯। পঞ্চায়েৎদ্বারা নানাপ্রকার বিবাদভঞ্জন। ২০। সামাজিক শাসন। ২১। পূজাপার্ব্বণ। (ক) সর্ব্বসাধারণের উৎসব, যেমন রামলীলা। ২২। বারব্রত। ২৩। আতিথ্য। ২৪। অন্নসত্রাদি। ২৫। খেলা ও ব্যায়াম। ২৬। সুনীতি

---

* কেবল ঔদরিকের রসনাতৃপ্তির সুবিধা করিয়া দিবার জন্য কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। বলকারিতা, স্বাস্থ্যকরতা ও মিতব্যয়িতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতে হইবে।



কাবুলিওয়ালা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে।

চিত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত।

ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয় এরূপ ভাবে গৃহ, বিশেষতঃ অন্তঃপুর, নির্ম্মাণপ্রণালী। ২৭। বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইবার উপায়। ২৮। প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী। (ক) লিখিবার সরঞ্জাম। ২৯। ধর্ম্মশিক্ষা।

কোন বিষয় চিত্র দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে আমাদিগকে ফোটগ্রাফ বা অঙ্কিত ছবি পাঠাইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে আমরা ফোটগ্রাফ ও ছবির খরচ দিব।

সম্পাদক।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

গত ফাল্গুন মাসের বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল "শিক্ষা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা সাধারণের মধ্যে "শিক্ষা-বিস্তারের" চেষ্টার, বিশেষতঃ আইনের সাহায্যে লোককে জোর করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টার, বিরুদ্ধে লিখিত। বিপিনবাবু বলেন যে "এই চেষ্টার পশ্চাতে একটা অসত্য লুকাইয়া আছে।" "সে অসত্যটা এই যে বর্ণপরিচয় ও শিক্ষা, ইংরাজিতে যাকে লিটারেসি (literacy) ও এডুকেশন (education) বলে, এ দুই এক বস্তু। আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই জন ক, খ পড়িতে পারেন না, সুতরাং তাঁরা অশিক্ষিত। বিলাতের শতকরা নিরনব্বই জনেরও বেশী লোকে এ, বি, সি, পড়িতে পারেন, অতএব তাঁরা শিক্ষিত, এই একটা অসদ্‌যুক্তি এই সাধুচেষ্টার অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছে। অসদ্‌যুক্তির উপরে যে প্রয়াস প্রতিষ্ঠিত, তার প্রতিবাদ করা আবশ্যক।" "কথকেরা, কীর্ত্তনীয়ারা, পুরাণাদির পাঠকেরা, সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণের মধ্যে যাইয়া, একই সঙ্গে তাহাদিগকে শিক্ষা ও আমোদ প্রদান করিতেন। এই জন্য আমাদের দেশে বর্ণজ্ঞান-অভাবেও কদাপি সৎশিক্ষার একান্ত অভাব হয় নাই।"

বিপিনবাবু শিক্ষা ও লিখনপঠনক্ষমতার যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব সত্য নহে। ইহা জানিয়াও আমরা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে লিখনপঠনক্ষমতা বিস্তারের সমর্থন করিয়া আসিতেছি। বিপিনবাবুর প্রবন্ধটি পড়িবার পরেও আমাদের মত সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। বিপিনবাবু যাহা বলিয়াছেন ঠিক্ সেইরূপ কথা সার্ টি, ডব্‌লিউ হোল্ডারনেস্, কে, সি, এস্, আই, (Sir T. W. Holderness, K.C.S.I.) প্রণীত "পীপ্‌ল্‌স্ এণ্ড প্রব্লেমস্ অব্ ইণ্ডিয়া" (Peoples and Problems of India) নামক পুস্তকে রহিয়াছে। যথা—

There is this to be said that the Indian peasant, though illiterate, is not without knowledge. He has been carefully trained from boyhood in the ritual and the religious observances of his forefathers. He hears the ancient epics read in their pithy vernacular form. He is full of lore about crops and soils and birds and beasts. In short, he is a disciplined intelligent person, moulded on a traditional system which, in spite of many defects, is not without its good points. This is not an argument for withholding elementary education from him. But it explains why in rural India a knowledge of reading and writing may not be quite as indispensable as we with our Western ideas are disposed to assume." Pp. 84-85.

পাঠক দেখিবেন এই ইংরেজ লেখক বিপিনবাবুর যুক্তি প্রয়োগ করিয়াও বলিতেছেন যে "This is not an argument for withholding elementary education from him." "ইহা ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিবার সপক্ষে প্রযুজ্য যুক্তি নহে।"

আমাদের দেশের সাধারণ লোক নিরক্ষর হইয়াও যেরূপ শিক্ষা পায়, তাহা আমাদের দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। ঐ জাতীয় শিক্ষা মধ্যযুগে বিলাতের সাধারণ লোকেরা mysteries এবং miracle-plays দেখিয়া শুনিয়া লাভ করিত, বর্ত্তমান কালে সুইজার্‌লণ্ডের ওবারণআমারগাউ গ্রামের passion-play-র মত নাটক দেখিয়া লোকেরা পায়, অতীতকালে ও বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য খৃষ্টানদেশের লোকেরা গির্জ্জায় উপদেশ শুনিয়া পাইয়াছে ও পায়, অতীতকালে ও বর্ত্তমান সময়ে ম্যাজিক লণ্ঠন আদির সাহায্যে এবং চিত্রশালা ও মুাজিয়ম্ আদি দেখিয়া পাইয়াছে ও পায়। তা ছাড়া, সকল দেশেই লোকে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছে কত শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু এইরূপ শিক্ষা কোন দেশেই উন্নত প্রণালীর কৃষি-শিল্পবাণিজ্যাদির দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য, জাগতিক ব্যাপারের জ্ঞানলাভের জন্য, আত্মার বিকাশের জন্য, সভ্যজাতিসকলের সহিত সমকক্ষতা করিবার জন্য, যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। আমাদের দেশেও যথেষ্ট নহে। কথকতা, কীর্ত্তন, পুরাণাদি হইতে ভূগোল, ইতিহাস, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, দর্শন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কৃষিশিল্প আদি কিছুই শিক্ষা করা যায় না। স্বাভাবিক কারণে, বিশেষতঃ আধুনিক সভ্যতার বিপাকে পড়িয়া, মানুষ কতপ্রকারে রুগ্ন হয়; নিরক্ষর লোকে কথকতা আদি হইতে, এইসকল পীড়া হইতে আত্মরক্ষার উপায় শিখিতে পারে না। সত্য বটে, কেবল অক্ষর-পরিচয় হইতেও উক্তরূপ শিক্ষা পাওয়া যায় না। কিন্তু অক্ষরপরিচয় জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দেয়। তাহার পর যে যত অগ্রসর হইবে, সে তত জ্ঞান লাভ করিবে।

বিপিনবাবু অক্ষরপরিচয় ব্যতিরেকেও আমাদের দেশের লোকদের যে প্রকার শিক্ষা আছে বলিয়াছেন, অক্ষর পরিচয় হইবামাত্র সে শিক্ষা ত লুপ্ত হইবে না। অক্ষর পরিচয়ও হউক, সে শিক্ষাও থাক্। তাহাতে আপত্তি বা ক্ষতি কি? তদ্ভিন্ন, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আজকাল কথকতা, কীর্ত্তন, পুরাণপাঠ, ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে; অনেক স্থানে উহার অস্তিত্বও নাই। এই হ্রাসের ও লোপের প্রতি-কারার্থও কি কেতাবী শিক্ষার প্রয়োজন নাই?

কথকতা আদি হইতে হৃদয়ের শিক্ষা এবং ভাবের পরিপুষ্টি হইয়াছে ও হইতে পারে, যদিও তাহা কখনও যথেষ্ট পরিমাণে হয় নাই, এবং তাহার সঙ্গে অনেক কুসংস্কার মনোমধ্যে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু যেসকল লৌকিক বিষয়ের জ্ঞানের অভাবে আমাদের চাষারা ও নানা শ্রেণীর কারিগরেরা পাশ্চাত্য চাষা ও কারিগরদের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সেরূপ জ্ঞান কথকতা আদি হইতে কখনই পাওয়া যাইতে পারে না। অথচ, কিছু কেতাবী শিক্ষা ব্যতীত এইরূপ লৌকিক জ্ঞান লাভ করাও যায় না।

এইখানে আমাদের একটি সংশয়ের কথার উল্লেখ করিব। আমাদের দেশের যেসকল শিক্ষিত লোক জনসাধারণকে লিখন পঠন শিক্ষা

দেওয়ার বিরোধী, তাঁহারা নিজের সন্তানদিগকে কেন লেখাপড়া শিখান? কথকতা আদি হইতে শিক্ষাই যদি যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিজ নিজ সন্তানদিগকে নিরক্ষর করিয়া রাখিয়া কেবল কথকতা, কীর্ত্তন, পুরাণাদি শুনান না কেন? তাঁহারা হয় ত বলিবেন, "লিখন-পঠন আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য ভাল ও আবশ্যক; কিন্তু সাধারণ লোকদের সন্তানদের জন্য অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর।" এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, সাধারণ ও অ-সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় কেমন করিয়া করিব? দুই উপায়ে করা যাইতে পারে; (১) ধনের দ্বারা, (২) জা'তের দ্বারা। ধনের দ্বারা বিচার করিলে বড় মুস্কিলে পড়িতে হয়; কারণ আমাদের দেশে ও সকল দেশেই কৃতকর্ম্মা জ্ঞানপিপাসুদের মধ্যে গরীবের ছেলেই বেশী। সুতরাং, দরিদ্রলোকেরা সাধারণ লোক এবং ধনীরা অ-সাধারণ লোক, ইহা বলিবার উপায় নাই। জা'তের দ্বারা বিচার করিতে গেলেও বিপদ। কোন্ জা'তের নীচে রেখা টানিব? কৃষ্ণদাস পাল ও মহেন্দ্রলাল সরকার লেখাপড়া শিখায় তাঁহাদের বা দেশের কি অনিষ্ট হইয়াছে? ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লেখাপড়া শিখায় তাঁহার বা দেশের কি অনিষ্ট হইয়াছে? এলাহাবাদে সরকারী হিসাববিভাগে একজন এম্, এ, পাশকরা ভদ্রলোক উচ্চবেতনের চাকরী করেন। তিনি মুচিজাতীয়। বঙ্গদেশে ডাকবিভাগে একজন উচ্চপদস্থ ধোপাজাতীয় ভদ্রলোক কাজ করিতেন। বঙ্গদেশে শিক্ষিত নমঃশূদ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল, চিকিৎসক, সংবাদপত্র-সম্পাদক আছেন। ইহাতে এইসকল লোকের বা দেশের কি অপকার হইয়াছে? অতএব দেখা গেল যে কোন দিক্ দিয়াই এক একটি শ্রেণীর লোককে সাধারণ এবং অন্য কোন শ্রেণীর লোককে অ-সাধারণ বলিবার উপায় নাই। বিরুদ্ধবাদীদের শেষ যুক্তি এই হইতে পারে, যে, লিখনপঠন দ্বারা কৃষক, দৈহিক শ্রমজীবী প্রভৃতির কার্য্যক্ষমতা কমিয়া যাইবে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহে ও জাপানে সাধারণ লোকদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া দেখা গিয়াছে যে সেইসকল দেশের চাষা ও কারিকরদের শ্রমসামর্থ্য ও দক্ষতা কমে নাই, বরং তাহারা প্রাচ্য নিরক্ষর চাষা ও শ্রমিকদিগকে পরাস্ত করিতেছে।

তাই পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের দেশের কোন কোন লিখনপঠনক্ষম শিক্ষিত ব্যক্তি জনসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইবার বিরোধী, অথচ তাঁহারা নিজ নিজ সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখাইতেছেন এই অসঙ্গতির কারণ নির্দ্দেশ কেমন করিয়া করা যাইবে? এইসকল লোকদের মতামতের মূল্য নির্ণয় করা বড় কঠিন।

বিপিনবাবু বলেন, "যদি অন্য দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা যায়, তবে আমাদের দেশের সাধারণ লোক যে অপর দেশের সমশ্রেণীর লোক অপেক্ষা কোনো বিষয়ে হীন বা অজ্ঞ, এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না।......তাঁরা যেমন তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের কথা জানেন ও বোঝেন; আমাদের দেশের সাধারণ লোকেও তাঁদের নিজেদের কাজকর্ম্মের কথা তেমনই জানেন ও বোঝেন।......কেবল বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য দ্বারাই শিক্ষার পার্থক্য বোঝায়। আর এই বুদ্ধির মাপেই পরস্পরের শিক্ষার ওজন করিতে হইবে।......আর এই মাপে যদি বিলাতের সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের সাধারণ লোকের তৌল করা যায়, তবে যে বিলাতের দিকে দাঁড়িপাল্লাটা কণামাত্রও ঝুঁকিয়া পড়িবে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা কদাপি এ কথা স্বীকার করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।" "যে কথা আমাদের তথাকথিত অশিক্ষিত লোকেরা সহজ বুদ্ধিতে দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারেন, ইংরেজ সমাজের জনসাধারণের কথা দূরে থাক, অপেক্ষাকৃত কৃতবিদ্য লোকেও সেসকল কথায় সে পরিমাণে বুদ্ধি-নিবেশ করিতে পারেন কি না সন্দেহ।"

আমাদের মনে হইতেছে যে বিপিন বাবু আমাদের দেশের সাধারণ লোকদিগকে একটু বেশী মাত্রায় idealize করিয়া ফেলিয়াছেন। নতুবা তিনি কখনই একথা বলিতেন না যে আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা অন্য কোনো দেশের ঐ শ্রেণীর লোকদের চেয়ে "কোনো বিষয়ে" হীন বা অজ্ঞ নহে। যাহা হউক তাঁর সমুদয় ভ্রম প্রদর্শন বা দুর্ব্বল যুক্তি খণ্ডন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সেইজন্য, কেবল আমাদের সাধারণ লোকদের "দৈনন্দিন কাজ কর্ম্মের" কথাই জিজ্ঞাসা করি। তাহাদিগকে যে প্রবঞ্চক মহাজনেরা ঠকায় ও চিরঋণী করিয়া রাখে; রেলওয়ে ষ্টেশনে দুষ্ট লোকেরা ঠকায়; অত্যাচারী জমীদারের লোকেরা ঠকায় ও উৎপীড়ন করে; কুলির আড়কাটিরা ঠকাইয়া পশুর মত, পণ্যদ্রব্যের মত, দেশবিদেশে, দাসত্বচুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া, চালান দেয়; সামান্য গ্রাম্য চৌকিদারের ভয়েও যে তাহারা তটস্থ; এইসকল বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে বিপিনবাবুর ধারণার সামঞ্জস্য বিধান কেমন করিয়া করিব জানি না। আমাদের বিশ্বাস এই যে তাহারা লেখাপড়া জানিলে নিশ্চয়ই এমন অনেক স্থলে আত্মরক্ষা করিতে পারিত, যেরূপ স্থলে এখন তাহারা তাহা করিতে পারে না।

আমরা বিপিনবাবুর মত অনুসারে ধরিয়া লইলাম যে আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা কৃতবিদ্য ইংরাজের চেয়েও বুদ্ধিমান। তাহা হইলে ত তাহাদিগকে খুব বেশী করিয়াই লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া দরকার। কারণ তাহা হইলে আমরা সহজেই বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস শিল্প আদিতে ইংরেজদিগকে পরাস্ত করিতে পারিব। সে আশা বা ইচ্ছা না হয় নাই করিলাম। বিপিনবাবু ত একথা বলেন নাই যে লেখাপড়া শিখিলে বুদ্ধি কমিয়া যায়; সুতরাং যখন সে ভয় নাই, তখন আমাদের দেশের সাধারণ লোককে লিখনপঠনক্ষম করায় ক্ষতি কি? তাহাদের চিন্তার, কল্পনার জগৎকে বৃহত্তর করিয়া দেওয়ায় ক্ষতি কি? জ্ঞানমন্দিরের একএকটা চাবি তাহাদিগকে দেওয়ায় ক্ষতি কি? দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ভয়, ভাবনা, আশা প্রেমের অতিরিক্ত উচ্চতর ও উদারতর, মহত্তর ভয় ভাবনা, আশা, প্রেম, তাহাদিগকে দিতে পারিলে ক্ষতি কি? দশ বিশ হাজার নিরক্ষর লোকের সন্তানকে লিখনপঠনক্ষম করিতে করিতে হঠাৎ যদি একটি প্রতিভাবান্ ছেলে বা মেয়ে সুযোগ পাইয়া সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিল্পী, বা বণিক্ হইয়া উঠে, তাহাতে ক্ষতি কি?

"যদি বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চরিত্রের স্থৈর্য্য ও সংযম, মনের বল, হৃদয়ের উদারতা ও চালচলনের শোভনতা, শিক্ষার প্রামাণ্য হয়, তবে এসকল বিষয়ে যে আমাদের পূর্ব্বকার 'অশিক্ষিত' ভদ্রমহিলাগণ কোন অংশে আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের অপেক্ষা হীন ছিলেন না, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।"

বিপিনবাবুর প্রবন্ধটির অন্য অনেক স্থলে যেমন এখানেও তেমনি, সম্ভবতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক নয়, প্রাকৃত জনের বাহবা পাইবার (playing to the gallery'র) চেষ্টা রহিয়াছে। যাহারা নূতন কিছু করিতে চায়, সকল দেশেই চিরকালই অতীতের বা বর্ত্তমানের বড়াই তাহাদের পথে একটা মহা বিঘ্ন। আমরা কিন্তু বিপিনবাবুর অতীত-গৌরব-উদ্দীপনার ফাঁদে পা দিতে চাই না। আমরা পূর্ব্বকার ভদ্রমহিলাদের গৌরবের কিছুই লাঘব করিতে চাই না। আমরা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চরিত্রের স্থৈর্য্য ও সংযম, মনের বল, হৃদয়ের উদারতা ও চালচলনের শোভনতা, প্রবীণা ও নবীনা সকলের মধ্যেই দেখিতে চাই এবং দেখিয়াছি। "ছাপার হরফ" এইসকল সদ্গুণ ও শক্তি নষ্ট করিবেই করিবে, এমন কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। সুতরাং পূর্ব্বকার নিরক্ষর পুরনারীদের কতকগুলি সদ্গুণ ছিল বলিয়া এখন বালিকা ও নারীদিগকে পুস্তকের সাহায্যে প্রাচীন ও আধুনিক

জ্ঞান দিতে হইবে না, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

"বিলাতে যে সার্ব্বজনীন সাধারণ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তার পশ্চাতে ইংরেজ সমাজের একটা স্বাভাবিক ও সহজ প্রয়োজন উপস্থিত ছিল। সে প্রয়োজন দুই দিক্ দিয়া উপস্থিত হয়। এক দিকে যখন কলকারখানার প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল, তখন এইসকল কলকারখানায় যেসকল শ্রমজীবী কাজ করিতে গেল, তাদের বর্ণপরিচয় আবশ্যক হইয়া উঠিল। কলঘরের বিধিনিষেধাদি মুখে বলিয়া, ক্ষণেক্ষণে এত লোককে তাদের ব্যবস্থা বোঝান অসম্ভব। তাঁহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া, মুদ্রিত ইস্তাহার ও বিজ্ঞাপনের দ্বারা একাজ করা সহজ দেখিয়া, মহাজনেরা আপনাদের ব্যবসায়ের খাতিরে নিজ নিজ অধীনস্থ শ্রমজীবীদিগকে বর্ণজ্ঞান শিখাইতে আরম্ভ করিলেন।...অন্য দিকে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সকলকেই একটু লেখাপড়া শিখানো আবশ্যক হইল।"

তাঁহার ভাল লাগুক বা না লাগুক, বিপিনবাবু জানেন যে আমাদের দেশে ক্রমশই কলকারখানা বাড়িয়া চলিতেছে। তাহাতে হাজার হাজার মজুর কাজ করিতেছে। বিলাতে যে কারণে মজুর শ্রেণীর লোককে লেখাপড়া শিখান দরকার হইয়াছে, এদেশে ঠিক্ সেই কারণেই কেন তাহার প্রয়োজন হইবে না? তাহার পর রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের কথা। আমাদের দেশেও গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন, মিউনিসিপালিটি, লোকাল ও ডিষ্ট্রীকট্‌বোর্ড, প্রভৃতির নানাবিধ ক্ষুদ্র অধিকার, নানাপ্রকার ট্যাক্‌স্, হরেক রকমের বিধি নিষেধ আছে। (ব্যবস্থাপক সভাগুলির সভ্যনির্ব্বাচনের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কারণ তাহার সহিত সাধারণ লোকদের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই।) এইজন্য সকলেরই কিছু লেখাপড়া জানা ভাল। তদ্ভিন্ন আরও দুই একটি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের কথা বিপিনবাবু অনবগত নহেন। আমরা সংবাদ-পত্রাদিতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসকল সম্বন্ধে যেসব মতামত প্রকাশ করি, রাজপুরুষেরা সেসব এই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন যে সেসব জনকতক শিক্ষিত বাবুর মত মাত্র; দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, তাহারা ওসব মতের কোন ধার ধারে না। অতএব রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের মতকে দেশের মত করিতে হইলে এবং দেশের মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইলে, দেশের নিরক্ষর লোকদিগকে লিখনপঠনক্ষম করা আবশ্যক নহে কি? তারপর, ভারতবর্ষকে কেন যে উপনিবেশগুলির মত বা কিছু কম পরিমাণেও স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা দেওয়া হয় না, রাজপুরুষেরা তাহার একটি কারণ এই দেখান যে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ নিরক্ষরের দেশ। সার এণ্ড্রু ফ্রেজার বঙ্গের ছোটলাট-গিরি হইতে অবসর লইয়া গিয়া বিলাতের নাইণ্টীন্থ সেঞ্চুরী পত্রিকার এক প্রবন্ধে ঠিক্ এই যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেও আমাদের দেশে সার্ব্বজনীন সাধারণ শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা কি আবশ্যক নহে?

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখা গিয়াছে যে নিরক্ষর লোকেরা, বাবুরা বন্দেমাতরম্ বলিয়া খাদ্যদ্রব্য আদি দুর্মূল্য করিয়া দিয়াছে, এইরূপ অমূলক কথা প্রচার ও বিশ্বাস করিয়াছিল; কিন্তু লেখাপড়া-জানা লোকেরা এরূপ কথা বলে নাই, বিশ্বাসও করে নাই। এবম্বিধ ব্যাপার হইতে লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কি কোন পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না?

বিপিনবাবু বলেন, যে, বৌদ্ধযুগে ও বঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে লোকে "ভিতর হইতে প্রয়োজন" অনুভব করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিল। যাহা হউক, এতক্ষণ পরে একটা অভয়বাণী শুনিলাম। এখন যদি কেহ বা কোন সম্প্রদায় ভারতের লোককে লেখাপড়া শিখিবার "ভিতর হইতে প্রয়োজন" অনুভব করাইতে পারেন, তাহা হইলে বিপিনবাবুর আপত্তি থাকিবে না।

"বিলাতে......এই সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের ফলে, একদিকে যেমন দেশের প্রায় সকল লোকই লিখিতে পড়িতে শিখিতেছে, সেইরূপ অন্যদিকে, সমগ্র সমাজের বিদ্যাবুদ্ধি ক্রমশঃ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে।"

সার্ব্বজনীন শিক্ষা জার্ম্মেণী, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশেও আছে। সেখানকার লোকের বিদ্যাবুদ্ধিও কি ক্রমশঃ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে? আমাদের এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিবার একটি কারণ আছে। বিপিন-বাবু বলিতেছেন যে এই ম্রিয়মাণ হওয়াটা 'এই সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের ফলে" হইতেছে। যদি বাস্তবিক এইরূপ একটা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে "এই সার্ব্বজনীন শিক্ষার ফলে" ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, প্রভৃতি দেশেও বিদ্যাবুদ্ধি নিশ্চয়ই ম্রিয়মাণ হইতেছে। তাহা হইলে, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পাদির ক্ষেত্রে যেসকল আবিষ্ক্রিয়া, যে উন্নতি হইতেছে, প্রতি সপ্তাহে যেসকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির হইতেছে, তাহা সম্ভবতঃ নিরক্ষর ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, নিগ্রোদের দেশ, প্রভৃতির মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইতেছে। হইতে পারে যে বর্ত্তমান সময়ে ডারুইন, হার্ব্বার্ট-স্পেন্সারের মত জ্ঞানী জীবিত নাই, কিন্তু তাহাতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে বিদ্যাবুদ্ধি ম্রিয়মাণ হইতেছে। যদি তাই হয়, তাহা হইলেও সার্ব্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের স্কন্ধে সেই কুফলটা চাপান উচিত নয়। অতিরিক্ত সাম্রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা অর্থলালসা ও বিলাসভোগলালসার কারণত্ব বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

"ইংরাজী সাহিত্যের বর্ত্তমানে যে অধোগতি দেখা যাইতেছে, এই সার্ব্বজনীন লেখা পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। সাহিত্য পূর্ব্বকালে সাহিত্যিকের আত্মবিকাশেই আপনার চরম সার্থকতা অন্বেষণ করিত। যাঁরা গ্রন্থাদি রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, দারিদ্র্য অনেক সময়েই তাঁহাদের নিত্যসহচর ছিল। সাহিত্য তখন সাধনারূপে গৃহীত হইত। অর্থোপার্জ্জনের ফন্দীতে পরিণত হয় নাই। ...গ্রন্থরচনা এখন একটা ব্যবসায়ের মত হইয়া উঠিয়াছে।...... এইজন্য ইংরাজী সাহিত্য ক্রমশঃই অতিশয় লঘু হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে সমাজের চিন্তাশক্তি হ্রাস ও রুচি বিকৃত হইয়া পড়িতেছে।" বিপিনবাবু এখানে এতবড় একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে তাঁহার সমুদয় কথা পরীক্ষা করিতে হইলে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। যাহাহউক, আমরা সংক্ষেপে দু একটা কথা বলিতেছি।

এন্‌সাইকোপীডিয়া ব্রিটানিকার দশম সংস্করণের ৩০শ ভল্যুমের গোড়ায় বিখ্যাত সাহিত্যিক অগাষ্টিন বিরেল একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে আছে:—"The booksellers of the 17th and 18th Centuries were every bit as anxious to make money for themselves and their families as any publisher today can be .. .and as for the authors, they did the best they could for themselves. Some of the worst of them made a great deal of money, and some of the best of them very little, and people complained then just as they do now of the degeneracy of the times and the vulgarity of the age. Indeed, before the age of printing, and when "the trade" was engaged in selling manuscripts, employing in Paris and Orleans alone ten thousand copyists, doleful cries resounded in University and Church circles as to the evil consequences of cheap learning and unlicensed reading."

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোন যুগেই সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবসাবুদ্ধির অভাব ছিল না, কোন যুগেই সমুদয় বা অধিকাংশ গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে "সাধক" ছিলেন না; অর্থলোলুপ লেখক আগেও ছিল এখনও আছে। প্রভেদ এই যে, পুস্তক মুদ্রণের উপায় সহজতর এবং পাঠকসংখ্যা অধিকতর হওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা এখন সাহিত্যিকেরা বেশী টাকা রোজগার করিতে পারেন। বিরেল সাহেবের কথা হইতে ইহাও প্রমাণ হয় যে সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের পূর্ব্বেও সমসাময়িক সাহিত্যিক জঘন্যরুচির কথা এবং সস্তায় লেখাপড়া শিক্ষার কুফলের কথা তখনকার মার্জ্জিতরুচি শিক্ষিত লোকেরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন। এইজন্যই এই প্রসঙ্গে বিরেল সাহেব বলিয়াছেন, "There is nothing new under the sun." বিরেল আরও বলেন—

"The activity of the press is not confined to the production and distribution of newspapers and periodicals. It also turns out, by the million, popular books at democratic prices. This cheapening of books is one of the great facts of the age. For a penny a piece may be bought no inconsiderable number of books, and among them are included some of the most famous in the world, whilst any one who is prepared to give sixpence a copy may include in his library almost everything that is really worth reading in the English tongue, whether grave or gay, in verse or prose."

যদি ইংরেজদের অধিকাংশেরই রুচি বিকৃত, বিদ্যাবুদ্ধি ম্রিয়মাণ, ও চিন্তাশক্তি কম হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে এই লক্ষ লক্ষ "really worth reading" বহি কে কিনিতেছে? এবং কেহ না কিনিলে পুস্তকব্যবসায়ীরা ছাপাইতেছে কেন? বেশী লোক পড়ে বলিয়া বহি সব সস্তা হইতেছে, এবং বহি সস্তা হওয়ার ফল, বিরেলের মতে—

"Cheap books disseminate the habit of reading, circulate the knowledge that there is pleasure to be got out of books, stimulate the desire of a wider range of study, *contribute to the refinement of the race*, and so affect the conditions under which books are produced and distributed."

অতএব, সার্ব্বজনীন শিক্ষা, সস্তা বহি, জাতীয় প্রকৃতি মার্জ্জিত হওয়া, এই তিনটার কিছু পরস্পর সম্পর্ক আছে দেখিতেছি! অবশ্য জনসাধারণ যে সকলের সেরা বহিগুলিই পড়ে তাহা নয়। কিন্তু তাহারা যে পড়ে না, তাহার কারণ বিরেল বলেন, Scanty leisure, exacting labour, distressing tedium! "To expect this crowd to devote its scanty leisure, gained after hours of exacting labour or distressing tedium, to the perusal of masterpieces is unreasonable. To hard-working men and women, and, unfortunately we must add, to hard-working children, reading can never be more than a pastime competing with many other pastimes."

অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্রমজীবীরা একটু বেশী অবসর পাইলে, তাহাদের শ্রম এখনকার মত হাড়ভাঙ্গা না হইলে, তাহাদের উৎকৃষ্ট সাহিত্য পড়িবার সম্ভাবনা। তাহারা দিন দিন দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের পরিশ্রমের সময় কমাইয়া ও বেতন বাড়াইয়া লইতেছে। সুতরাং এই সম্ভাবনা নিকটতর হইয়া আসিতেছে। এই সম্ভাবনার একটা পরোক্ষ প্রমাণ বিরেলের লেখা হইতে পাওয়া যায়। বিলাতের মধ্যবিত্ত লোকদের অবসর শ্রমজীবীদের চেয়ে বেশী, শ্রম তাহাদের মত হাড়ভাঙ্গা নয়। সুতরাং তাহারা কেমন উন্নতি করিয়াছে, দেখুন:—

"It is sheer ignorance to suppose that the Act of 1870 [the Elementary Education Act,] and the splendid work of the best School Boards, although confined to what is called "Primary Education," have not had a great effect upon the intelligence of the middle classes .. . .no inconsiderable portion of this class . have gone steadily on their way, reading good books, attending lectures, making notes, curing their defects, enlarging their horizons, and purifying their tastes, until, far short as they still may be of perfection, they can hardly be said to be far behind their critics, . In proof of this improvement I can appeal to the private libraries of the land. In the 'forties and 'fifties of the last century the books in too many middle-class homes were a doleful crew,... . Now the blessed change! In countless households scattered up and down the country intelligent students are to be found of Chaucer, of Spenser, of Shakespeare. Modern editions of Bacon's Essays, the *Anatomy of Melancholy*, . of Montaigne's *Essays*, of Jeremy Taylor's masterpieces, of Milton's prose, are as plentiful as blackberries in September . ... The Waverley Novels take the field almost every year in some fresh guise . ... Charles Lamb is among the lares and penates of Great Britain; Hazlitt has come to life again .. . .England is now full of good editions of good books, and the demand for them increases."

অতএব, সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তার সত্ত্বেও (!) বিলাতের সাহিত্যের অন্তিম কাল এখনও ঘনাইয়া আসিতে দেরি আছে। কেননা ভাল বহির চাহিদা বাড়িতেছে (the demand for them increases)। আমাদের মন্তব্যটা দীর্ঘ হইয়া গেল। এখন সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তার সত্ত্বেও (!) বিরেল সাহেবের প্রবন্ধের শেষ কয় পংক্তিতে যে আশার বাণী আছে তাহাই উদ্ধৃত করি।

"An age of widespread diffusion of knowledge can hardly present a romantic aspect. A dungeon is more romantic than a school. Large masses of people, necessarily very imperfectly educated, but with a great conceit of themselves, all eager to know and discuss results, and to experience new sensations, are not likely at first to throw their influence on the side of the things that are "quiet, wise, and good." Dwellers in great cities and in populous and half-educated countries must learn to put up with a great deal of noise of all kinds. It is absurd to be too sensitive. Every thing runs its course. After contemplating the changed

conditions of modern literature, we may congratulate ourselves that wherever we look we see all the symptoms of life and activity in a people striving to get quit of the clogs of ignorance and to enter upon the glorious inheritance that belongs by right to every cultivated intelligence."

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজের বিদ্যাবুদ্ধির অবস্থা সম্বন্ধে বিপিনবাবু যে সুরে কথা বলিয়াছেন, বিরেল সাহেব সে সুরে বলেন নাই। সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের পূর্ব্বেও সাহিত্য কখনও উন্নত, কখনও অবনত দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই বলিয়া অবনতির সময় ইহা মনে করা উচিত নয় যে আর সাহিত্যিক প্রতিভা ও সাধনা দেখা দিবে না।

সার্ব্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে বিপিনবাবু চৈত্রমাসের বঙ্গদর্শনে "জবরদস্তির লেখাপড়া" নাম দিয়া আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা নানা অবান্তর কথার আলোচনায় পূর্ণ। এই প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য এই যে মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহার মঙ্গল করা যায় না; কাহারও ভাল করিতে হইলে তাহার প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শুভকরী শক্তিকে ফুটাইয়া তুলাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সাধারণতঃ ইহা সত্য। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মানুষের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে হইবে না, ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে প্রায় প্রত্যেক পরিবারে যে কখন না কখন পাঠে অমনোযোগী শিশুকে জোর করিয়া হাত ধরিয়া পড়িতে বসাইতে হয়, প্রত্যেক দেশে অপরাধী লোকদিগকে জোর করিয়া কয়েদ করা হয়, প্রত্যেক শহরে অনেক পৌরজনকে শাস্তি বা জরিমানার ভয় দেখাইয়া রাস্তাঘাট অপরিষ্কার করা হইতে বিরত রাখা হয়, তাহা কি অন্যায় না অশুভকর? বাস্তবিক বিপিনবাবুও এরূপ মনে করেন না। কারণ তিনি লিখিয়াছেন, "পিতামাতা একান্ত অক্ষম বা নিতান্ত কর্ত্তব্যবিমুখ হইলে, কচিৎ কোথাও সমাজ এ ভার [অর্থাৎ "সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা"র ভার] স্বহস্তে গ্রহণ করিতেও পারেন, সত্য। কিন্তু এই রূপে, যাহা কেবল একটা সার্ব্বজনীন বিধানের বিরল ব্যতিক্রম থাকা উচিত, তাহাকেই সনাতন বিধানরূপে সমাজে প্রবর্ত্তিত করিলে, সমাজের পক্ষেই আত্মরক্ষা করা শেষে দায় হইয়া উঠে।" বিপিনবাবু যদি দয়া করিয়া শ্রীযুক্ত গোখলের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের পাণ্ডুলিপির ধারাগুলি পড়েন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে তাহাতে কেবল "বিরল ব্যতিক্রম" স্থলেই সামান্য রকমের "জবরদস্তি"র ব্যবস্থা আছে; উহাতে জবরদস্তিটাকেই "সনাতন বিধান" করা হয় নাই। সুতরাং বিপিনবাবুর এই প্রবন্ধ কাল্পনিক শত্রুর সহিত যুদ্ধ মাত্র। তিনি বিলাতে কোন কোন স্থলে সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তার চেষ্টায় যে পরিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, সে কুফল অতিনিঃস্ব পরিবারগুলির অবস্থার উন্নতির সহিত লয় পাইবে। এই উন্নতির চেষ্টা বিলাতে খুব হইতেছে।*

কষ্টিপাথর

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (জ্যৈষ্ঠ)।

আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনতা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার—

প্রাচীনতম বেদমন্ত্রে যে সভ্যতা কথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত মাত্র, কতদিনে এবং কি প্রকারে ভারতবর্ষে উহার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। যাঁহারা কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, কদাচ তাঁহাদের দ্বারা প্রাচীন যুগের সভ্যতার বয়স নিরূপিত হইতে পারে না। ভাষাতত্ত্ববিদ্দিগের অনুসন্ধানের ফল সংগ্রহ করিয়া যখন মানবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা (anthropologists) এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, তখনই শুভ ফল ফলিয়াছে। মানবতত্ত্ববিদেরা যত্নপূর্ব্বক ভূ-স্তর পরীক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই মিসরের ঐতিহাসিক সভ্যতা ১০,০০০ বৎসরের কম প্রাচীন নয় বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে এখনও পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ভাল করিয়া ভূ-স্তর পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। ১০,০০০ বৎসরের পূর্ব্ব হইতে প্রাচীন দিকে ৭০,০০০ বৎসর পর্য্যন্ত যে ভারতবর্ষে মানবলীলা অভিনীত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। বহু প্রাচীন যুগের নরকঙ্কাল প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া Rhys, Beddoe, Keane প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইউরোপের অধিবাসীরা কোন আর্য্যজাতির বংশধর নহেন। সুপ্রাচীন প্রস্তরযুগে ইউরোপে যাহারা বাস করিত, তাহারা নবপ্রস্তরযুগে এসিয়া হইতে আগত জাতিসমূহের সহিত মিলিত হইয়া ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বেই যেসকল নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল, একালের ইউরোপীয়েরা সম্পূর্ণরূপে তাহাদেরই বংশধর। যেসকল জাতির মধ্যে আর্য্যভাষা প্রচলিত হইয়াছিল তাহারা কখনও মূলতঃ আর্য্যজাতি ছিল না; আর্য্য সভ্যতা তাহাদের 'ধার-করা' জিনিষ মাত্র। ভাষার একতা হইতে জাতির একতা প্রমাণিত হয় না। মির্জাপুর সহরের অনতিদূরে নব-প্রস্তরযুগের মানুষের যে পূর্ণ কঙ্কালটি পাওয়া গিয়াছিল, দুঃখের বিষয় যে এখনও পর্য্যন্ত তাহার উপযুক্ত পরীক্ষাদি হইল না। অনুসন্ধানের অভাবে এ কথা স্থির হইতে পারিল না যে, যাঁহারা ভারতে আর্য্য সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই ভারতবর্ষেরই প্রাচীনতম যুগের বংশধর, কি নহেন। ভারতবর্ষের আর্য্যেরা অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া যে কথা কাছে, তাহা ত মোক্ষমুলর প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের একটা মন-গড়া মতবাদ হইতে উৎপন্ন। ভাষাতত্ত্ববিদ্দিগের এই জাতিতত্ত্বকথা এখন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতসমাজে উপহসিত মাত্র। শ্রীযুক্ত মেক্‌ডোনেল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সুবিবেচনার সঙ্গে লিখিয়াছেন যে, সমগ্র বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিলে একথা কদাপি বুঝিতে পারা যায় না যে, বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা বা স্রষ্টৃগণ ভারতবর্ষের বাহিরের অন্য কোন স্থানের বিষয় কিছুমাত্র জানিতেন। প্রাচীন জাতির মধ্যে এই একটি জিনিষ স্বাভাবিক দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্য কোন দেশ হইতে আসিলে বা তদ্রূপ অন্য কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিলে সর্ব্বদাই সেসকল কথা জাতির ঐতিহ্যে রক্ষিত হয়। ভারতের আর্য্যেরা অন্য দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, একথা বৈদিক মন্ত্রে দূরভাবেও ঐতিহ্য (tradition) রূপে রক্ষিত হয় নাই। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ হপ্‌কিন্স মন্তব্যটি সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, যে, বেদমন্ত্রগুলির সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ মন্ত্রই পঞ্জাব হইতে বহুদূর পূর্ব্বপ্রদেশে রচিত হইয়াছিল

* এই আলোচনাটি স্থানাভাবে গতমাসে ছাপা হয় নাই।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের প্রভাব যে ভারতের বাহিরে অন্যত্র বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, একথা এখন কয়েকটি নূতন তথ্য আবিষ্কারের পর প্রমাণিত হইয়াছে।

(১) বেবিলোনিয়ার ঐতিহাসিক যুগ যে খৃষ্ট পূর্ব্বে ৫০০০ বৎসর অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিত; কেননা সেই সময়কার রাজাদিগের নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারা গিয়াছে। ঐ সভ্যতার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে অন্ততঃ তিন চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত সুমেরিয়ান সভ্যতা ঐ দেশে বিকসিত হইয়াছিল, একথাও সুযুক্তি দ্বারা অনুমিত হইতেছে। প্রাচীনতম সুমেরিয়ান, জাতিতে আর্য্য না হইলেও, আর্য্যদিগের ভাষা লাভ করিয়াছিল। হিঙ্কস্ সাহেবের এই সিদ্ধান্ত ভুল হইতে পারে; কিন্তু একথা নির্ভুল যে, খৃষ্ট পূর্ব্বে ১৮০০ সংবৎসরে যে কসাইত (Kassite) জাতি বাবিলোনে 'হম্মুরবি'র বংশধরদিগকে উচ্ছেদ করিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা জাতিতে অনার্য্য হইলেও আর্য্য সভ্যতা দ্বারা নব শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইরানদেশীয়েরা তাহাদের ভাষায় আর্য্য ভাষাকে যে প্রকার প্রাদেশিক বিকৃতিতে লইয়াছিল, এখানে সেই প্রাদেশিক বিকৃতি নাই। কসাইতেরা যে বাবিলোনের বহুদূর পূর্ব্বপ্রদেশ হইতে আসিয়া দেশ জয় করিয়াছিল, এ কথা বাবিলোনের ইতিহাসে সুস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে যাহারা পূর্ব্বে বাস করিত, তাহারা যে ভারত হইতে বিস্তৃত আর্য্যসভ্যতা লাভ করে নাই, এ কথা বলিতে যাওয়া দুঃসাহসের কর্ম্ম। সুপ্রসিদ্ধ Sayce সাহেব লিখিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন আশিরীয় চিত্র-লিপিতে 'সূর্য্য'কে মিত্র নামে পাওয়া যায়। এই জাতিরও নাম মূলতঃ তাহাদের দেবতা 'অসুর' হইতে। 'অসুর' শব্দটি দেবতা অর্থে খাঁটি বৈদিক; ইরাণীয় ভাষা হইতে উহার উৎপত্তি হইলে 'অসুর' স্থলে 'অহুর' হইত।

এখন Hommel এবং Delitzsch আবিষ্কার করিয়াছেন যে, প্রাচীন সুমেরিয়ান ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাবিলোনিয়ান জাতির ভাষায় ১০০ এমন শব্দ পাওয়া যায়, যাহাদের ধাতু আর্য্য শব্দ হইতে উৎপন্ন।

(২) মিসর দেশের 'তেল্-এল্-অমর্ণ' নামক স্থানে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, অন্ততঃ পক্ষে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৬০০ সংবৎসরে এসিয়া মাইনরের 'মিটানি' নামক স্থানে যে রাজারা রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের নামকরণ বৈদিক ভাষায় হইত; এব তাঁহারা বৈদিক দেবতা পূজা করিতেন। ইঁহাদের নামের বর্ণবিন্যাসে ইরাণীয় প্রাদেশিকতা নাই: কাজেই এই জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতের আর্য্যসভ্যতা লাভ করিয়াছিল। মিটানির রাজা অর্ত্তম, অর্ত্তযু বর প্রভৃতি মিসররাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং মিটানির রাজকুমারীদিগের প্রভাবেই মিসরের রাজপরিবারে সূর্য্য-পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (Rogers' History of Babylonia, Vol. I, p. 10)।

'তেল্-এল্-অমর্ণ'-এর আবিষ্কারের কিছুদিন পরে Cappadocia প্রদেশে Boghaz Kyoi নামক স্থানে শ্রীযুক্ত Winckler যে লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতেও ইহা সমর্থিত হয়।

আর্য্যভাষা সম্বন্ধে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদেরা যাহাই বলুন, কিন্তু এ বিষয়ে সকলেরই একমত যে, বেদমন্ত্রে দেবতাদি লইয়া যে ধর্ম্ম পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভারতক্ষেত্রে সৃষ্ট বা উদ্ভূত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে একথা অস্বীকার করিবার পথ নাই যে, বৈদিক উচ্চারণ সহ যেসকল শব্দ অন্যত্র নীত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। Hermann Jacobi যথার্থই বলিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই ভারতপ্রান্ত হইতে মেসোপটেমিয়া পর্য্যন্ত ভারতের আর্য্যসভ্যতা একদিন প্রবলতা লাভ করিয়াছিল।

ইউরোপের কয়েকটী জাতির উপরে আর্য্যভাষার কিঞ্চিৎ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। সুপ্রসিদ্ধ Keane সাহেব ইহাকে a mere veneer of Aryan culture বলিয়াছেন।

এতদূর যাহা দেখা গেল, তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে সময়ে বেবিলোনিয়াতে ঐতিহাসিক যুগ আরব্ধ হইয়াছিল, ভারতক্ষেত্রে সে সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বে ঐতিহাসিক যুগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিচিত্র নহে।

বাবিলোনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আর একটি কথা মনে হয়। প্রথমতঃ দুইএকশত বৎসর বাবিলোনীয়েরা স্বীয় দেশে পরিমিত ভাবে সভ্যতা বিস্তার করিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে ক্ষুধার তাড়নায় উহাদিগকে অপেক্ষাকৃত দূর দেশে রাজ্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। যেসকল স্থানে রাজ্য বিস্তার করা কষ্টকর এবং যেসকল স্থানে ভূমি তেমন উর্ব্বরা ছিল না, সেসকল প্রদেশে যখন বাবিলোনীয়েরা রক্তপাত করিয়া রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল, তখন কেন যে তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে নাই, একথা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। পশ্চিম প্রান্ত হইতে যদি সুবিধা পাইয়া একটা আর্য্যদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল, তখন কি সুতন্ত্রিত একটি রাজ্যের ক্ষমতাশালী লোকেরা সেই পথে উত্তর ভারতবর্ষ অধিকার করিতে আসিতে পারিত না? মনে হয়, সিন্ধুর পরপারে ঐ আদিম কালেও একটা ক্ষমতাশালী জাতি ছিল বলিয়াই বাবিলোনীয়েরা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

ইরাণীদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষা পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন যে, বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে যে ভাষা অপেক্ষাকৃত খুব আধুনিক, ইরাণী ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সেই ভাষায় রচিত। ইরাণের সে ভাষাও খাঁটি বৈদিক ভাষা নহে। উহা বৈদিকের একটি প্রাদেশিক ভাষা মাত্র। ঐ প্রদেশিক ভাষায় অপেক্ষাকৃত নূতন যুগে বৈদিক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত ভাবে রক্ষিত হইবার পূর্ব্বে যে খাঁটি ভারতবর্ষ হইতে, ইরাণ এবং ইরাণের পশ্চিমে, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও ভাষা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাইলাম। ইরাণীদিগের গ্রন্থে আছে যে, তাহারা 'আরিয়ান বইজ' বা আর্য্যব্রজ হইতে স্থানচ্যুত হইয়াছিল। সে স্থানচ্যুতি ভারতের আর্য্যদিগের তাড়নায় হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। যদি হইয়াও থাকে, তবে ঐ ঘটনা দ্বারা ইরাণীয় এবং ভারতবর্ষীয়দিগের মৌলিক একতা প্রতিপন্ন হয় না। এ যখন অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগের কথা, তখন হইতে পারে যে, সিন্ধুপারে আর্য্যদিগের ক্ষমতা এক সময়ে প্রবল হইয়া উঠিবার পর ইরাণীয়েরা স্থানচ্যুত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারও প্রমাণের অভাব।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা (আষাঢ়)।

শেষ কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃসমুদ্রমাঝে
যে শতদলপদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই—

যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই ॥
বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা;
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই ॥

বিদ্যা ও অবিদ্যা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

সকল জীবই অজ্ঞানের নিবিড় অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে। আবার, কতকগুলি অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের একপ্রকার অশিক্ষিত জ্ঞান সকল জীবেরই আছে। বেদান্তাদি শাস্ত্রের মতে ঐরূপ সংস্কারমূলক অশিক্ষিত জ্ঞান জ্ঞানাভাস মাত্র, মনুষ্য জ্ঞানাভাস হইতে প্রকৃত জ্ঞানে উত্থান করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। বেদান্তাদি শাস্ত্রের পারিভাষায় জ্ঞানাভাসের নাম অবিদ্যা। জ্ঞান বীরেরা অবিদ্যার সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া বিদ্যারাজ্যে ক্রমে ক্রমে অধিকার বিস্তার করেন।

বিদ্যারাজ্যের রাজাদের নাম গুরু, প্রজাদের নাম শিষ্য। সময়ে সময়ে শিষ্যপ্রধানেরা গুরুদের উত্তরাধিকারী হইয়া অধিকৃত রাজ্যের সংস্কারসাধন এবং বিস্তার-সাধন করেন। এইরূপে গুরুপরম্পরাক্রমে বিদ্যা মার্জ্জিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া চলিতে থাকে। বিদ্যাই প্রকৃত জ্ঞান। বিদ্যা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অপরা বিদ্যা এবং পরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যার আর এক নাম বিজ্ঞান। পরা বিদ্যার আর এক নাম ব্রহ্মজ্ঞান। বিদ্যাই পৃথিবীস্থ সভ্যজাতিদিগের সভ্যতার ভিত্তিমূল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়ার কথা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান শুধুই যে কেবল বস্তুবিজ্ঞান তাহা নহে, ধর্ম্মবিজ্ঞানও বিজ্ঞান, রস-বিজ্ঞানও বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের গোড়ার কথা অবিদ্যার বা জ্ঞানাভাসের বা অন্ধসংস্কারের পাশচ্ছেদন। আমাদের দেশের পূজ্যতম আচার্য্যেরাও তাহাই বলেন। সমস্ত অবিদ্যার বন্ধন এক উদ্যমে ছিন্ন করিয়া পরাবিদ্যায় উত্তীর্ণ হওয়াই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রাণগত চেষ্টা ছিল। সাধারণ শ্রেণীর জনসমাজের পক্ষে অপরা বিদ্যার সোপান মাড়াইয়া পরাবিদ্যার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই পরামর্শসিদ্ধ।

কথাটি খুব সোজা; তাহা এই যে,

(১) মনুষ্যত্বের গোড়ার কথা বিদ্যা।

(২) বিদ্যার গোড়ার কথা অবিদ্যার পাশচ্ছেদন।

কিন্তু আমাদের দেশের স্কন্ধে এক্ষণে এম্‌নি জড়তা আলস্য এবং নিরুদ্যমের, আর সেই সঙ্গে দ্বেষ ঈর্ষা এবং দাম্পত্যের ভূত চাপিয়াছে যে, ঐ সোজা কথাটির প্রতি আমরা সোজা ভাবে দৃষ্টি করিতে নিতান্তই অপারগ। আমরা মনে করি যে, অবিদ্যার পাশচ্ছেদনের নামই উচ্ছৃঙ্খলতা, আর, যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই চলুক—এইরূপ গতানুগতিকতার নামই সদাচার। অবিদ্যার পাশচ্ছেদন করিতে আমাদের হাত এগোয় না—কিন্তু ব্যাধগণকে ডাকিয়া অবিদ্যার দড়াদড়ি দিয়া আমাদের হস্তপদ আরো দৃঢ়রূপে বন্ধন করাইয়া লইতে আমরা যেমন তৎপর এমন আর কেহই নহে। আমাদের দেশের এইরূপ হীনাবস্থার মধ্যেও যে সময়ে-সময়ে উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাশালী মহাত্মারা অন্ধকার আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান হ'ন, তাহা সর্ব্বদেশের মঙ্গল-বিধাতা জগদ্‌গুরু পরমেশ্বরের করুণার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

যাত্রার পূর্ব্বপত্র—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

মাঠের মাঝখানে এই আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়। এখানে আমরা বড়য় ছোটয় একসঙ্গে থাকি, বিশ্বপ্রকৃতিকে এক মুহূর্ত্ত আমাদের দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয় না।

আমাদের ইচ্ছা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গেও আমাদের এমনি একটা যোগ থাকে। সর্ব্বমানুষের ইতিহাসে যেসমস্ত ঋতু আসে যায়, সূর্য্যের যে উদয়াস্ত ঘটে, ঝড় বাদলের যে মাতামাতি চলে, সমস্তকেই যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া এবং বড় আকাশের মধ্যে বড় করিয়া দেখিতে পাই, ইহাই আমাদের মনের বাসনা। আমরা লোকালয় হইতে দূরে আছি বলিয়াই আমাদের এই সুযোগ আছে। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ এখানে কোন একটি ছাঁচের মধ্যে আসিয়া পড়িতে পায় না, আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাকে অবাধে বিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধটিকে অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড় পৃথিবীর নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি! কিন্তু সেই নিমন্ত্রণ ত বিদ্যালয়ের দুইশো ছাত্র মিলিয়া রক্ষা করিতে যাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম তোমাদের হইয়া আমি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব।

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তুমি য়ুরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতেছ কেন? একথার কি জবাব দিব ভাবিয়া পাই না।

প্রয়োজন না থাকিলে মানুষ অকস্মাৎ কেন বাহিরে যাইবে এ প্রশ্নটা আমাদের দেশেই সম্ভব। বাহিরে যাইবার ইচ্ছাটাই যে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ একথাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কেবলমাত্র ঘর আমাদিগকে এত বাঁধনে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইবার সময় আমাদের এত অযাত্রা এত অবেলা এত হাঁচি-টিকটিকি এত অশ্রুপাত যে বাহির আমাদের পক্ষে অত্যন্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আত্মীয়মণ্ডলী আমাদের দেশে এত নিরন্ধ্র নিবিড় যে, পরের মত পর আমাদের কাছে আর কিছুই নাই। এইজন্যই অল্প সময়ের জন্যও বাহির হইতে হইলেও সকলের কাছে আমাদের এত বেশি জবাবদিহি করিতে হয়। বাঁধা থাকিয়া থাকিয়া আমাদের ডানা এমনি বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উড়িবার আনন্দ যে একটা আনন্দ একথাটা আমাদের দেশে বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অল্প বয়সে যখন বিদেশে গিয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে একটা আর্থিক উদ্দেশ্য ছিল,—সিভিল সর্বিসে প্রবেশের বা বারিষ্টার হওয়ার চেষ্টা একটা ভাল কৈফিয়ৎ—কিন্তু বায়ান্ন বৎসর বয়সে সে কৈফিয়ৎ খাটে না, এখন কোনো পারমার্থিক উদ্দেশ্যের দোহাই দিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন আছে একথাটা আমাদের দেশের লোকেরা মানিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা আশ্চর্য্য হইতেছেন সে উদ্দেশ্য য়ুরোপে সাধিত হইবে কি করিয়া? এই ভারত-বর্ষের তীর্থে ঘুরিয়া এখানকার সাধুসাধকদের সঙ্গ লাভ করাই একমাত্র মুক্তির উপায়।

আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছি পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া যাইব ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

দুইটা চক্ষু পাইয়াছি, সেই দুটা চক্ষু বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।

তবু একথাও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে লাভের প্রতিও আমার লোভ আছে। কেবল সুখ নহে, এই ভ্রমণের সঙ্কল্পের মধ্যে প্রয়োজনসাধনেরও একটা ইচ্ছা গভীরভাবে লুকানো রহিয়াছে।

পরের দেশে না গেলে সত্যের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা অভ্যস্ত তাহাকেই বড় সত্য বলিয়া মানা ও যাহা অনভ্যস্ত তাহাকেই তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া বর্জ্জন করা, ইহাই দীনাত্মার লক্ষণ।

য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে?

য়ুরোপে যে সত্যের কোনো আবরণ নাই তাহা নহে। সে আবরণ জীর্ণ নহে, তাহা সমুজ্জ্বল। এই জন্যই সেখানকার অন্তরতম সত্যটিকে দেখিতে পাওয়া হয়ত আরো কঠিন।

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই এই একটা বুলি চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু একথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে কোনো মঙ্গল দেখিনা কেন তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ মানুষ কখনই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। য়ুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে—কখনই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্ত্তনের পথে চলিতেছে আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চুপ করিয়া থাকিতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে। কিন্তু বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্ব্বল নহে।

টাইটানিক জাহাজ ডুবির প্রকাণ্ড অপমৃত্যুর অভিঘাতে য়ুরোপের বাহিরের আবরণ সরিয়া যাওয়াতে আমরা এক মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরতর মানবাত্মার একটি সত্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছি। যেমনি দেখিয়াছি অমনি তাহার কাছে মাথা প্রণত করিতে আমাদের আর লজ্জা হয় নাই। অমনি আত্মার পরিচয়ে আত্মার আনন্দ উদারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

আর আমরা আমাদের চারিদিকে যে আত্মত্যাগের কার্পণ্য দেখিতে পাই দৃষ্টান্তবাহুল্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না, কেননা আমরা মুখে যে যাহাই বলি না কেন অন্তত মনে মনে আমাদের চরিত্রের এই দৈন্য সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি।

আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই? এটা কি ধর্ম্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে? আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে? আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীর্য্য দান করে না?

টাইটানিক জাহাজ ডুবিতে একসঙ্গে নিবিড় করিয়া যে-শক্তিকে দেখিয়াছি য়ুরোপে সেই শক্তিকেই কি নানাদিকে নানা আকারে দেখি নাই? দেশহিতের ও লোকহিতের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ ও প্রাণবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত কি সেখানে প্রত্যহই হাজার হাজার দেখা যায় না? সেই অজস্রসঞ্চিত পুঞ্জীভূত ত্যাগের দ্বারাই কি য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রবালদ্বীপের মত মাথা তুলিয়া উঠে নাই?

কোন সমাজে যথার্থ কোনো উন্নতিই হইতে পারে না যাহার ভিত্তি দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এই দুঃখকে তাহারাই বরণ করিতে পারে না যাহারা Materialist—যাহারা জড়বস্তুর দাস। বস্তুতেই যাহাদের চরম আনন্দ, বস্তুকে তাহারা ত্যাগ করিবে কেন? কল্যাণকে তাহারা আপনার প্রাণের চেয়ে কেন বড় করিয়া স্বীকার করিবে? শাস্ত্রবিহিত যে পুণ্যকে মানুষ পারলৌকিক বিষয়সম্পত্তির মতই জানে সেই স্বার্থপর পুণ্যের জন্যও সে দুঃখ স্বীকার করিতে পারে—কিন্তু যে পুণ্য শাস্ত্রবিধির সামগ্রী নহে, যাহা তীর্থযাত্রার দুঃখ নহে, যাহা শুভনক্ষত্রযোগের দান নহে—যাহা হৃদয়ের স্বাধীন প্ররোচনা—সেই দুঃখ সেই মৃত্যুকে কি কখনো কোনো বস্তুউপাসক গ্রহণ করিতে পারে?

য়ুরোপে দেশের জন্য মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য প্রেমের জন্য হৃদয়ের স্বাধীন আবেগের সেই দুঃখকে সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিতেছি। ইহার মধ্যে সমস্তটাই খাঁটি নহে, ইহার মধ্যে অনেকটা আছে যাহা বাহাদুরি, কিন্তু সেই অপবাদ দিয়া সত্যকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। কোনো কোনো রাত্রে চন্দ্রের চারিদিকে একটা জ্যোতির চক্র দেখা যায়। আমরা জানি তাহা চন্দ্র নহে, তাহা ছায়া, তাহা মিথ্যা। কিন্তু চন্দ্র মাঝখানে না থাকিলে সেই চন্দ্রের ভাণটুকুও থাকিতে পারে না। সকল সমাজেই যেটি শ্রেষ্ঠপদার্থ তাহাকে ঘিরিয়া তাহার আলোক ধার করিয়া লইয়া একটা ভাণের মণ্ডল সৃজিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই নকলটা আসলের প্রতিবাদ করে না, তাহারই সমর্থন করে। ভণ্ড সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমাদের দেশের সাধু সন্ন্যাসীকে অবিশ্বাস করিয়া বসিলে ঠকিতে হইবে।

সত্যকে ভক্তি করিবার ক্ষমতা, এবং সত্যের জন্য দুর্গম বাধা লঙ্ঘন করিয়া দিনের পর দিন আপনাকে অকুণ্ঠিতভাবে নিঃশেষে দান করিবার শক্তি, য়ুরোপ তাহার জাতীয় সাধনা হইতেই পাইয়াছে।

আমাদের দেশেও আধ্যাত্মিকতার একটা দিক প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের যাঁহারা সাধক তাঁহারা কেহবা জ্ঞানে কেহবা ভক্তিতে অখণ্ডস্বরূপকে সমস্ত খণ্ডপদার্থের মধ্যে সহজেই স্বীকার করিতে পারেন। এইখানে জ্ঞানের দিকে এবং ভাবের দিকে, অনেক কালের চিন্তায় এবং সাধনায়, তাঁহাদের বাধা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য আমাদের দেশের যাঁহারা সাধুপুরুষ তাঁহারা চিৎলোকে বা হৃদয়ধামে অনন্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমাদের দেশের মানবপ্রকৃতিতে এই শক্তিটি দেখিবার জন্য যদি কোনো বিদেশী শ্রদ্ধা ও দৃষ্টিশক্তি লইয়া আসেন তবে নিশ্চয়ই তিনি কৃতার্থ হইবেন; এবং সম্ভবত তিনি আপনার প্রকৃতির ভিতরকার একটা অভাব পূরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

আমাদের মধ্যেও তেমনি পূরণ করিবার মত একটা অভাব আছে এবং সেই অভাবই আমাদিগকে দুর্ব্বলতার অবসাদের মধ্যে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে।

একথা শুনিলেই আমাদের দেশাভিমানীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকতার নহে, তাহা বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বুদ্ধির; য়ুরোপ তাহারই জোরে পৃথিবীর অন্য সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না। কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপরে কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বুদ্ধির জোরে কোনো জাতিই বললাভ করে না। আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন

করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূলশক্তি নিঃসন্দেহই ধর্ম্মের জোর—তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতেই পারে না।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম্ম নহে একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্ত্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এদেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য-শক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই। তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণবিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনোদিকেই মানুষকে খর্ব্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

য়ুরোপের এই ধর্ম্মবল অত্যন্ত সচেতন। তাহা মানুষের কোনো দুঃখ কোনো অভাবকেই উদাসীনভাবে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি মোচন করিবার জন্য নিত্য নিয়তই তাহা দুঃখসাধ্য চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে। খৃষ্টের জীবনবৃক্ষ হইতে যে ধর্ম্মবীজ য়ুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনশক্তি আছে, সেটি দুঃখকে পরমধন বলিয়া গ্রহণ করা। স্বর্গের দয়া যে মানুষের সমস্ত দুঃখকে আপনার করিয়া লয় এই কথাটি আজ বহুশত বৎসর ধরিয়া নানা মন্ত্রে অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে য়ুরোপ শুনিয়া আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর মর্ম্মস্থানকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যাহা চেতনারও অন্তরালবর্ত্তী অতিচেতনার দেশ—সেইখানকার গোপন নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে মানুষের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে—সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই মানুষের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেইজন্য আজ য়ুরোপে সর্ব্বদা এই একটা আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাই যাহারা মুখে খৃষ্টধর্ম্মকে অমান্য করে এবং জড়বাদের জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহারাও সময় উপস্থিত হইলে ধনেপ্রাণে আপনাকে এমন করিয়া ত্যাগ করে, নিন্দাকে দুঃখকে এমন বীরের মত বহন করে যে, তখনি বুঝা যায় তাহারা নিজের অজ্ঞাতসারেও মৃত্যুর উপরে অমৃতকে স্বীকার করে এবং সুখের উপরে মঙ্গলকেই সত্য বলিয়া মানে।

কোনো জাতির মধ্যে যাঁহারা তাপস তাঁহারা সে জাতির সকলের হইয়া তপস্যা করেন এইজন্য সেই জাতির পনেরো আনা মূঢ়ও যদি সেই তাপসদের গায়ে ধূলা দেয় তথাপি তাহারাও তপস্যার ফল হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

ভগবানের প্রেমে মানুষের ছোট বড় সমস্ত দুঃখ নিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্তভাবে দেখিতে পাইনা, এ কথা যতই অপ্রিয় হউক তথাপি ইহ আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা তাহা আমাদের যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে দুঃখস্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে যাহা বীর্য্যের দ্বারাই সাধ্য তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা দুঃখপীড়িত মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্ত-ভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের দুঃখলীলাকে স্বীকার করি নাই। দুঃখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই—দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা। প্রেমের জন্য যে দুঃখ তাহাই যথার্থ ত্যাগের ঐশ্বর্য্য; তাহাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে ও আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের উর্দ্ধে মহী-য়ান করিয়া তুলে। তাই শাস্ত্রে বলে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" অর্থাৎ দুঃখস্বীকার করিবার বল যাহার নাই সে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।

ইহার একটা প্রমাণ এই, আমরা নিজের দেশকে নিজে লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের দেশের লোক কেহ কাহারও আপন হইল না। দেশ যাহাকে চায় সে সাড়া দেয় না। তাহার প্রধান কারণ এই, আমরা দুঃখের দ্বারা পরস্পরকে আপন করিতে পারি নাই। আমরা দেশের মানুষকে মূল্য দিই নাই। মা আপন গর্ভের সন্তানকেও অহরহ সেবাদুঃখের মূল্য দিয়া লাভ করেন। চারিদিকের মানুষকে আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই তাই আপনাকে আনন্দের সহিত ত্যাগ করিতেও পারিলাম না।

মানুষকে এইরূপ সত্য বলিয়া দেখা, ইহা আত্মার সত্যদৃষ্টি অর্থাৎ প্রেমের দ্বারাই ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে, সর্ব্বভূতই এক, সে একটা বাক্যমাত্র—সেই তত্ত্বকথার দ্বারা সর্ব্বভূতকে আত্মবৎ করা যায় না। প্রেম নামক আত্মার চরমশক্তি—যাহার ধৈর্য্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যাহার স্বাভাবিক আনন্দ, সেই সেবাতৎপর প্রেম নহিলে কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না। এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন—মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

য়ুরোপের ধর্ম্ম য়ুরোপকে সেই দুঃখপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে দুঃখতপস্যার হোমাগ্নি নিবিতেছে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত তাপস আত্মাহুতির যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন। সেই দুঃসহ যজ্ঞ-হুতাশন হইতে যে অমৃতের উদ্ভব হইতেছে তাহার দ্বারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজ্য রাষ্ট্রনীতির এমন বিরাট বিস্তার হইতেছে;—ইহা কোনো কারখানাঘরে লোহার যন্ত্রে তৈরি হইতেই পারে না—ইহা তপস্যার সৃষ্টি এবং সেই তপস্যার অগ্নিই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি, মানুষের ধর্ম্মবল।

সেইজন্য দেখিতে পাই বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্ম্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনি সমাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা য়ুরোপে সম্প্রতি দেখিতেছি। ভারতবর্ষের সেই দুঃখব্রত আত্মত্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জ্বল দীপ্তি কৃত্রিমতা ও ভাবরসা-বেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নির্ব্বাপিত হইয়াছে? বাহিরে যদি কোথাও তাহার উদ্বোধন দেখিতে পায় তবে আপনাকে কি তাহার আবার আপনি মনে পড়িবে না—আজ যাহা পরের ঘরে বিরাজ করিতেছে তাহাকেই কি তাহার আপনার সামগ্রী বলিয়া চেতনা হইবে না?

শক্তির আগুন যেখানে প্রচুর পরিমাণে জ্বলে সেখানে ছাইভস্মও প্রভূত হইয়া উঠে একথা মনে রাখিতে হইবে। অশান্তির ক্ষোভ এবং পাপের প্রচণ্ডতা য়ুরোপীয় সমাজে যেমন প্রত্যক্ষ হয় এমন আমাদের দেশে নহে। কিন্তু তাহা তাহাদের চিত্তকে অভিভূত করে নাই বরঞ্চ নিয়-তই জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। সকল অসুরের সঙ্গেই সেখানে হাতাহাতি লড়াই চলিতেছে, অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়া কেহ বসিয়া নাই—নিজের প্রাণকেও সঙ্কটাপন্ন করিয়া বীরের দল সংগ্রাম করিতেছে। গীতায় একটি আশার বাণী আছে স্বল্পপরিমাণ ধর্ম্মও মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে। কোন সমাজে সেই ধর্ম্মকে যতক্ষণ সজীব দেখা যায়, ততক্ষণ সেখানকার ভূরি পরিমাণ দুর্গতির অপেক্ষাও তাহাকে বড় করিয়া জানিতে হইবে।

য়ুরোপে দুর্ব্বল জাতির প্রতি ন্যায়ধর্ম্মের ব্যভিচার দেখা যাইতেছেনা

এমন নহে. কিন্তু তাহাই একান্ত হইয়া নাই। সেই সঙ্গেই সেই নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত লুব্ধতার মধ্য হইতেই ধিক্কার ও ভৎর্সনা উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

আমরা সর্ব্বদাই নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া থাকি যে আমরা ধর্ম্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক জাতি—বাহিরের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই এই জন্যই বহির্বিষয়েই আমরা দুর্ব্বল হইয়াছি। আমাদের অনেকেই মুখে আস্ফালন করিয়া বলিয়া থাকেন দারিদ্র্যই আমাদের ভূষণ। ঐশ্বর্য্যকে অধিকার করিবার শক্তি যাহাদের আছে দারিদ্র্য তাহাদেরই ভূষণ। যে ভূষণের কোনো মূল্য নাই, তাহা ভূষণই নহে। এই জন্য ত্যাগের দারিদ্র্যই ভূষণ, অলক্ষ্মীর দারিদ্র্য কদর্য্য। দরিদ্র বলিয়াই যাহারা সুযোগ পাইলে অন্য দরিদ্রকে শোষণ করে এবং অক্ষম বলিয়াই ক্ষমতা পাইলে যাহারা অন্য অক্ষমকে আঘাত করে কথনই দারিদ্র্য তাহাদের ভূষণ নহে।

আমাদের এই যে দুঃখ দারিদ্র্য অপমান ইহাকে কোনোমতেই আমাদের ধর্ম্মপ্রাণতার পুরস্কার বলিয়া আমরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে পারি নাই, তাহাকে ব্যক্তিগত ভক্তিসাধনার মধ্যে বদ্ধ করিয়াছি, তাহার আহ্বানে সমস্ত মানুষকে একত্র করি নাই; যেখানে সমাজশাসনের অন্ধ উৎপাতের দ্বারা বিধিবিধানের পাথরের জাঁতায় মানুষের বিচারশক্তি ও স্বাধীন মঙ্গলবুদ্ধিকে পিষিয়া সমস্তকে একাকার করিয়াছি সেইখানেই ধর্ম্মবোধের সঙ্কীর্ণতা ও অচেতনতাই আমাদিগকে জড়পিণ্ড করিয়া দাসত্বের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এখনো মনে করিতেছি আইনের দ্বারা আমাদের দুর্গতির প্রতিকার হইবে, রাষ্ট্রশাসনসভায় আসন লাভ করিলে আমরা মানুষ হইয়া উঠিব—কিন্তু জাতীয় সদ্গতি কলের সামগ্রী নহে এবং মানুষের আত্মা যতক্ষণ আপনার ভিতর হইতে তাহার পূরা মূল্য চুকাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে না পারিবে ততক্ষণ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

তাই বলিতেছিলাম, তীর্থযাত্রার মানস করিয়াই যদি য়ুরোপে যাইতে হয় তবে তাহা নিষ্ফল হইবে না। সেখানেও আমাদের গুরু আছেন, সে গুরু সেখানকার মানবসমাজের অন্তরতম দিব্যশক্তি। সর্ব্বত্রই গুরুকে শ্রদ্ধার গুণে সন্ধান করিয়া লইতে হয়—চোখ মেলিলেই তাহাকে দেখা যায় না। নিজের মধ্যে শক্তির সত্য অনুভূতি যাহার নাই অতি সহজেই সে মনে করিয়া বসে শক্তি বাহিরেই আছে এবং যদি কোনো সুযোগে আমরাও কেবলমাত্র ঐ জিনিষগুলা দখল করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের অভাব পূরণ হয়। কিন্তু "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্" একথাটি য়ুরোপেরও অন্তরের কথা। এই জন্যই য়ুরোপ বীরের ন্যায় সত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে, বীরের ন্যায় সত্যের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে, এবং যতই ব্যর্থ হইতেছে, যতই ভুল করিতেছে, ততই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নূতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছে—কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না। সত্যের সম্মুখীন হইতে আমরা উদাসীন, আমরা ঘরগড়া বাঁধাবাঁধনের মধ্যে আপাদমস্তক আপনাকে জড়াইয়া তাহাকেই সত্য আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছি,—সেইজন্য বিপদের দিন যখন আসন্ন হয়, সত্য পন্থা ব্যতীত যখন আমাদের আর গতি নাই, তখন আমরা কিছুতেই আপনাকে জাগ্রত করিতে পারিনা; তখনো খেলা করাকেই কাজ করা মনে করি, নকল করিয়াই আসলের ফল প্রত্যাশা করি, কৃত্রিম উৎসাহকে উদ্দীপ্ত রাখিতে পারিনা, আরব্ধ কর্ম্মকে শেষ করিতে পারিনা এবং ভূরিপরিমাণ তাত্ত্বিকতা ও ভাবুকতার জালে জড়িত হইয়া বারম্বার ব্যর্থ হইতে থাকি। সেইজন্য সত্যের দায়িত্বকে বীরের ন্যায় সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিবার দীক্ষা; সেই সত্যের প্রতি অবিচলিত প্রাণান্তিক নিষ্ঠা; জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদকে প্রাণপণ দুঃখের মূল্য দিয়া অর্জ্জন করিবার সাধনা; এবং বুদ্ধি হৃদয় ও কর্ম্মে সকল দিক দিয়া মানুষের কল্যাণসাধন; মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাদ্বারা ভগবানের দুঃসাধ্য সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য তীর্থযাত্রীর পক্ষে য়ুরোপযাত্রা কথনই নিষ্ফল হইতে পারে না; অবশ্য যদি তাহার মনে শ্রদ্ধা থাকে এবং সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতাকেই যদি সে আধ্যাত্মিক সাফল্যের সত্য পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করে।

আমি জানি য়ুরোপের সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে এবং সেই সংঘাতে আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে অনেক স্থলে গভীর বেদনা পাইতে হইতেছে। সে বেদনা আমাদের আধ্যাত্মিক দৈন্যেরই দুঃখ এবং আমাদের সঞ্চিত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইলেও তাহা বেদনা; আমাদের পক্ষে এই বেদনার উপলক্ষ্য যাহারা তাহাদের ক্ষুদ্রতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় আমরা নানা আকারে পাইয়া থাকি; ইহাও আমরা প্রতিদিন দেখিয়াছি তাহারা নিজের নীচতাকে উদ্ধত কপটতার দ্বারা গোপন করিয়াছে ও পরজাতীয়ের মাহাত্ম্যকে অন্ধতা ও অহঙ্কারের দ্বারা অস্বীকার করিয়াছে; এই কারণেই আমাদের সেই ক্ষতবেদনা লইয়া য়ুরোপের সত্যকে দেখিতে ও তাহাকে গ্রহণ করিতে আমরা অন্তরের মধ্যে বাধা পাইয়া থাকি; তাহাদের ধর্ম্মকেও আমরা অবিশ্বাস করি ও তাহাদের সভ্যতাকে আমরা বস্তুজালজড়িত স্থূলপদার্থ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। শুধু তাহাই নহে, আমাদের ভয় আছে, পাছে প্রবলের প্রবলতাকেই আমরা সত্যের আসন দিয়া তাহার পূজা করি ও তাহার কাছে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে অপবিত্র করি; পাছে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদে নিজের সত্যকে বিসর্জ্জন দিয়া অনুকরণের শূন্যতার মধ্যে পরের কায়ার ছায়া ও পরের ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইয়া জগৎসংসারে নিজেকে একেবারেই ব্যর্থ করিয়া দিই; পাছে এইরূপ একটা অদ্ভুত ভ্রম করিয়া বসি যে অন্যকে স্বীকার করিতে গিয়া নিজেকে অস্বীকার করিয়া বসাই যথার্থ ঔদার্য্যের পন্থা।

এইসমস্ত বিঘ্নবিপদ আছে—সেই জন্যই এই পথে সত্যসন্ধানের যাত্রা তীর্থযাত্রা। বস্তুত অত্যন্ত বিঘ্নের দ্বারাই আমরা এই তীর্থযাত্রার পূর্ণ ফললাভের আশা করিতে পারি; কারণ যাহা সহজে পাই তাহা সচেতন হইয়া গ্রহণ করি না;—অথচ কোনো মহৎ লাভের যথার্থ সফলতাই চেতনার পূর্ণতর বিকাশ—অর্থাৎ আমরা যাহা কিছু সত্যভাবে লাভ করি তাহার দ্বারা আপনাকেই সত্যতররূপে উপলব্ধি করি। তাহা যদি না করি, যদি বাহিরের বস্তুকেই বাহিরে পাই তবে তাহা মায়া, তাহা মিথ্যা।

বোম্বাই সহর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বোম্বাই সহরটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া আসিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। প্রথম ছবিটা দেখিয়াই মনে হইল বোম্বাই সহরের একটা বিশেষ চেহারা আছে; কলিকাতার যেন কোনো চেহারা নাই, সে যেন যেমন-তেমন করিয়া জোড়াতাড়া দিয়া তৈরি হইয়াছে।

আসল কথা সমুদ্র বোম্বাই সহরকে আকার দিয়াছে, নিজের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বেলাভূমি দিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। সমুদ্রের আকর্ষণ বোম্বাইয়ের সমস্ত রাস্তাগলির ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে সমুদ্রটা যেন একটা প্রকাণ্ড হৃৎপিণ্ড, প্রাণধারাকে বোম্বাইয়ের শিরা উপশিরার ভিতর দিয়া টানিয়া লইতেছে এবং ভরিয়া দিতেছে। সমুদ্র চিরদিন এই সহরটিকে বৃহৎ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কলিকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল গঙ্গা। এই গঙ্গার ধারাই সুদূরের বার্ত্তাকে সুদূর রহস্যের অভিমুখে বহিয়

লইয়া যাইবার খোলা পথ ছিল। সহরের এই একটি জানালা ছিল যেখানে মুখ বাড়াইলে বোঝা যাইত জগৎটা এই লোকালয়ের মধ্যেই বদ্ধ নহে। কিন্তু গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমা আর রহিল না, তাহাকে দুই তীরে এমনি আঁটাসাঁটা পোষাক পরাইয়াছে, এবং তাহার কোমরবন্ধ এমনি করিয়া বাঁধিয়াছে যে গঙ্গাও লোকালয়েরই পেয়াদার মূর্ত্তি ধরিয়াছে; গাধাবোট বোঝাই করিয়া পাটের বস্তা চালান করা ছাড়া তাহার যে আর কোনো বড় কাজ ছিল তাহা আর বুঝিবার জো নাই। জাহাজের মাস্তুলের কণ্টকারণ্যে মকরবাহিনীর মকরের শুঁড় কোথায় লজ্জায় লুকাইল।

সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করিয়া দেয় কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না। পাটের কারবার তাহার বিশাল বক্ষের নীলকান্ত মণিটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। তাই এই সহরের ধারে সমুদ্রের মূর্ত্তিটি অক্লান্ত;—যেমন একদিকে সে মানুষের কাজকে পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতেছে তেমনি আর একদিকে সে মানুষের শ্রান্তি হরণ করিতেছে—ঘোরতর কর্ম্মের সম্মুখেই বিরাট একটি অবকাশকে মেলিয়া রাখিয়াছে।

তাই আমার ভারি ভাল লাগিল যখন দেখিলাম শত শত নরনারী সাজসজ্জা করিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়াছে। অপরাহ্নের অবসরের সময় সমুদ্রের ডাক কেহ অমান্য করিতে পারে নাই। সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের কাজ এবং সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের আনন্দ। আমাদের কলিকাতার সহরে এক ইডেন গার্ডেন আছে—কিন্তু সে কৃপণের ঘরের মেয়ে, তাহার কণ্ঠে আহ্বান নাই। সেই রাজপুরুষের তৈরি বাগান, সেখানে কত শাসন, কত নিষেধ। কিন্তু সমুদ্র তো কাহারো তৈরি নহে, ইহাকে ত বেড়িয়া রাখিবার জো নাই। এই জন্য সমুদ্রের ধারে বোম্বাই সহরের এমন নিত্যোৎসব। কলিকাতার কোথাও ত সেই অসঙ্কোচ আনন্দের একটুকু স্থান নাই।

সব চেয়ে যাহা দেখিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যায় তাহা এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবর্জ্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া দেখি এইজন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সেই না দেখার একটা দণ্ড আছে। নিশ্চয়ই তাহা মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ করিতেছে, তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। অপরাহ্নে স্ত্রীপুরুষ ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হইয়াছে, সত্যের এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মত ভাগ্যহীনতা মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যে দুঃখ আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদিগকে অচেতন করিয়া রাখে কিন্তু তাহার ক্ষতি প্রত্যহই জমা হইতে থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ? বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না?

আমাদের গাড়ি ম্যাথেরান পাহাড়ের উপরে একটা বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোট বাগানটিকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে বেঞ্চ পাতা। সেখানেও দেখি কুলস্ত্রীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কেবল পার্সি রমণী নহে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরা মারাঠিমেয়েরাও বসিয়া আছেন—মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসন্নতা। নিজের অস্তিত্বটা যে একটা বিষম বিপদ, সেটাকে চারিদিকের দৃষ্টি হইতে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় এ ভাবনা লেশমাত্র তাহাদের মনে নাই। মনে মনে ভাবিলাম, সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কত বড় একটা সঙ্কোচের বোঝা নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কত দিকে কত সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে মানুষ নিজেই নিজের পক্ষে কিরূপ একটা অস্বাভাবিক বিঘ্ন হইয়া উঠে তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্ব্বদা সসঙ্কোচ অসহায়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। রেলোয়ে ষ্টেশনে আমাদের মেয়েদের দেখিলে তাহাদের প্রতি সমস্ত দেশের বহুকালের নিষ্ঠুরতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। ম্যাথেরানের এই বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের বীডনপার্ক ও গোলদীঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম—তাহার সে কি লক্ষ্মীছাড়া কৃপণতা।

প্রজাপতির দল যখন ফুলের বনে মধু খুঁজিয়া ফেরে তখন তাহারা যে বাবুয়ানা করিয়া বেড়ায় তাহা নহে বস্তুত তখন তাহারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আপিসে যাইবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতার বেশভূষায় যখন নানা রঙের সমাবেশ দেখি তখন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজকর্ম্মের ব্যস্ততাকে গায়ে পড়িয়া শ্রীহীন করিয়া তুলিবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে আমার ত তাহা মনে হয় না। ইহাদের পাগড়িতে পাড়ে মেয়েদের সাড়িতে যে বর্ণচ্ছটা দেখিতে পাই তাহাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে জাগ্রত করে। বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে কিন্তু তাহার মাথায় পাগড়ী এবং গায়ে একটা মেরজাই পরা। মেয়েদের ত কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামান্য বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না—পরিচ্ছন্নতা দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এটুকু মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য। এইটুকু আবরণ এইটুকু সজ্জা প্রত্যেকের না থাকিলে মানুষের রিক্ততা অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া দেখা দেয়। আপনার সমাজকে কুদৃশ্য দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে তবে কতবড় একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে তাহা অভ্যাসের অসাড়তাবশতই আমরা বুঝিতে পারি না।

আর একটা জিনিষ বোম্বাই সহরে অত্যন্ত বড় করিয়া চোখে পড়িল। সে এখানকার দেশীলোকের ধনশালিতা। কত পার্সি, মুসলমান ও গুজরাটি বণিকদের নাম এখানকার বড় বড় বাড়ির গায়ে খোদা দেখিলাম। এত নাম কলিকাতায় কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারিতে, এইজন্য তাহা বড় ম্লান। জমিদারীর সম্পদ বদ্ধ জলের মত—তাহা কেবলি ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হইতে থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির প্রকাশ দেখিনা, তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই। এই জন্য আমাদের দেশে যেটুকু ধনসঞ্চয় আছে তাহার মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীরুতা দেখি। মাড়োয়ারি, পার্সি, গুজরাটি, পাঞ্জাবিদের মধ্যে দানে মুক্তহস্ততা দেখিতে পাই কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে। আমাদের দেশের চাঁদার খাতা আমাদের দেশের গোরুর মত—তাহার চরিবার স্থান নাই বলিলেই হয়। ধন জিনিষটাকে আমাদের দেশ সচেতন ভাবে অনুভব করিতেই পারিল না, এইজন্য আমাদের দেশের কৃপণতাও কুশ্রী, বিলাস বীভৎস। এখানকার ধনীদের জীবনযাত্রা সরল অথচ ধনের মূর্ত্তি উদার—ইহা দেখিয়া আনন্দবোধ হয়।

—মণিভদ্র।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কোন জাতির অতীত গৌরব থাকিলে তাহাতে যেমন লাভের সম্ভাবনা আছে, ক্ষতির সম্ভাবনাও তেমনি আছে। লাভ এই হইতে পারে যে পূর্ব্বকৃতিত্ব স্মরণ করিয়া নিজেদের ক্ষমতায় লোকের বিশ্বাস জন্মে, এবং এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে সমগ্র জাতি আবার উন্নত ও শক্তিশালী হইতে পারে। ক্ষতির সম্ভাবনা দুই দিক্ দিয়া :—লোকে কেবল পূর্ব্ব গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমানে অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতে পারে; কিম্বা পূর্ব্ব গৌরবের বড়াই করিতে করিতে অন্তঃসারশূন্য ও অপদার্থ হইতে পারে।

ভারতবর্ষের অতীত গৌরব আছে। আমরা তাহা হইতে লাভবান্ বা ক্ষতিগ্রস্ত হইব, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে।

যদি কোন জাতির অতীত গৌরব না থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের উন্নতি হইতে পারে। নিগ্রোদের অতীত গৌরবের কোনই প্রমাণ নাই; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এখন অনেকে বিখ্যাত অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনীয়ার, কবি প্রভৃতি হইতেছেন। আমাদের যে-সুদূর-অতীতকালে গৌরব ছিল, তখন ইংরাজ, জার্ম্মান্ ও ফরাসীদের পূর্ব্বপুরুষেরা অরণ্যচারী বর্ব্বর ছিল; আমাদের মত অতীত গৌরব এই তিন জাতির নাই; কিন্তু ইহারা ও ইহাদের বংশের মার্কিনেরা এখন জ্ঞানে ও রাষ্ট্রীয় শক্তিতে জগতের অগ্রণী। অপর দিকে, ইউরোপে গ্রীস্ ও ইটালীর লোকদের অতীত গৌরব আছে; কিন্তু তাহারা ইউরোপের অগ্রণী নহে।

সুতরাং অতীত গৌরব লইয়া বেশী নাড়াচাড়ার প্রয়োজন নাই। অতীতে ভাল যাহা ছিল, তাহা নিশ্চয়ই রাখা উচিত। কিন্তু অতীতে কিছু গৌরবের জিনিষ থাক্ বা না থাক্, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যপালন আমরা করিতেছি কিনা, প্রত্যহ ভাবিয়া দেখা উচিত।

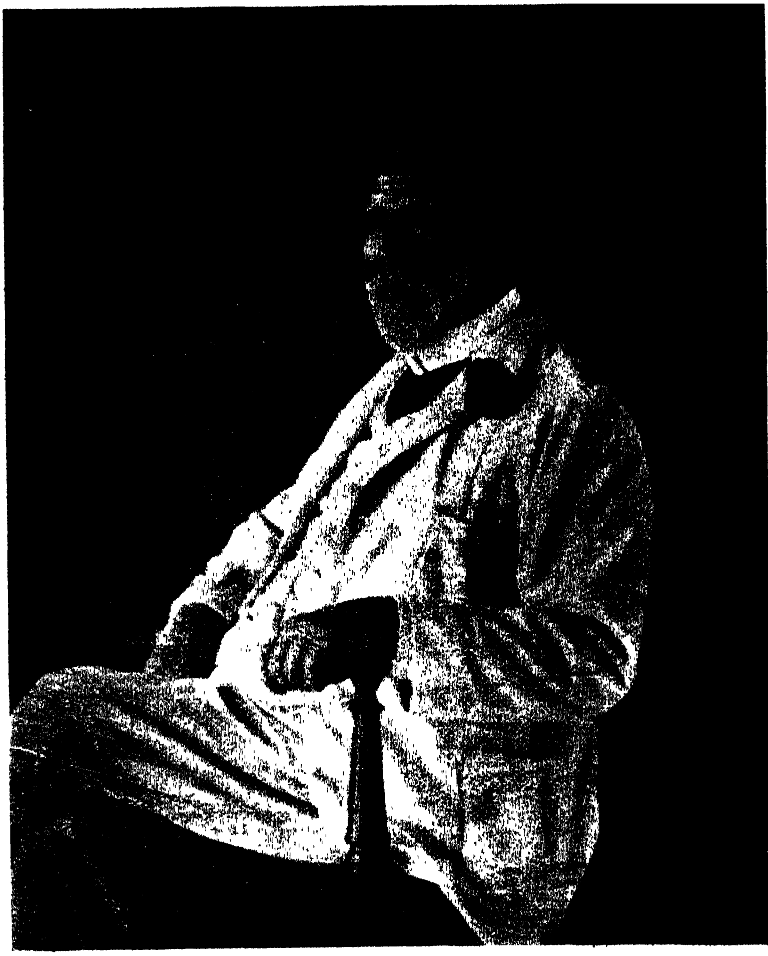
শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়, ভূমি, অট্টালিকা ও নগদ টাকায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন। এই সম্পত্তি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বিজ্ঞান-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে; তজ্জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে হইবে, বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও শিক্ষক আদি নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহার এই একটি সর্ত্ত আছে যে এই কলেজের অধ্যাপকেরা কেবল ভারতবাসী হইবেন। প্রয়োজন হইলে, তাঁহাদিগকে



শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত।
(যৌবনকালের ছবি।)

বিদেশে পাঠাইয়া বিজ্ঞানে পূর্ণশিক্ষিত করিয়া আনিবার ব্যয় এই কলেজ হইতে দেওয়া হইবে। এই কাজে বিশ্ববিদ্যালয় নিজ তহবিল হইতে আরও দুইলক্ষ টাকা দিবেন।

পালিত মহাশয় এই দান করিয়া দেশের মহা উপকার করিলেন। বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ থাকা দূরের কথা, অনেক ছাত্র বি-এস্-সি. ও এম-এস্‌সি.



শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত।

(বর্ত্তমান সময়ের ফটোগ্রাফ।)

পর্য্যন্ত পড়িবার সুযোগও এখন পায় না। পালিত মহাশয়ের বিজ্ঞান-কলেজ স্থাপিত হইলে এই অসুবিধা কিয়ৎপরিমাণে দূর হইবে। কেবল ভারতবাসীরা এই কলেজের অধ্যাপক হইতে পারিবে, এই নিয়ম করায় কলেজের কাজ উৎসাহের সহিত চলিবে, এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্ব দেখাইবার একটি কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে।

পালিত মহাশয় যে একটি মহৎকাজ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলিতেছেন যে এই টাকা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সহিত সম্মিলিত বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন টিউটকে দিবার কথা ছিল। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাভে জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের লোক্‌সান হইল। ইহা সত্য কথা। কিন্তু পালিত মহাশয় বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের প্রতি কেন বিরূপ হইলেন, তদ্বিষয়ে দুই পক্ষের কথা না জানায় কোন আলোচনা করিতে আমরা অসমর্থ। আমরা কেবল এই কথা বলিতে পারি যে এই টাকা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের হাতে দেওয়ার যথেষ্ট কারণ যদি পালিত মহাশয় দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে আমরা অধিকতর সুখী হইতাম। কিন্তু এখন তিনি যাহা করিলেন, তাহাও সৎকাজ; তিনি, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদকে বঞ্চিত করিয়া, ৭॥০ লক্ষ টাকা নিজের সন্তান-সন্ততিকে দিলেন না, আপনার সুখসম্ভোগের আয়োজনও করিলেন না। বিদ্যাদান যে শ্রেষ্ঠ দান, তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং তাঁহার নিন্দা ত আমরা করিবই না, বরং এই কথাই বলিব যে সকল ধনী তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে।

তাঁহার দান বিশেষভাবে প্রশংসার্হ এই কারণে, যে,—তিনি স্বোপার্জ্জিত ধন দান করিয়াছেন, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধন নহে; তাঁহার সম্পত্তির সামান্য অংশমাত্র দান করেন নাই, খুব বেশী অংশ, সম্ভবতঃ অধিকাংশই দান করিয়াছেন, এবং পরে অবশিষ্ট অংশও করিবার সম্ভাবনা আছে; তিনি নিঃসন্তান নহেন, যে, টাকাটা কে খাইবে, ভাবিয়া দান করিয়া ফেলিলেন; এবং তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই দান করিলেন। মৃত্যুর পর মানুষের পার্থিব সম্পদে কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং মৃত্যুর পরে যে

দান সিদ্ধ হয়, মৃত্যুর অগ্রে দান তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জমিদার ও বণিক্‌দের মধ্যে পালিত মহাশয়ের অপেক্ষা ধনী অনেকে ত আছেনই, তাঁহার সমব্যবসায়ী ব্যারিষ্টার উকীলদের মধ্যেও আছেন। সুতরাং দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আরও অনেক টাকা পাইবার আশা করা দুরাশা নহে। আইনব্যবসায়ীরা পরিশ্রম করিয়া টাকা রোজগার করেন বটে; কিন্তু যাহাদের টাকায় তাঁহারা বড় মানুষ, সেই স্বদেশবাসীদের সেবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেই অর্থ ব্যয় করেন। ধনীদের মধ্যে পরার্থে অর্থব্যয় যিনি করেন, তিনি শ্রদ্ধেয়; যিনি তাহা না করেন, তিনি বিন্দুমাত্রও সম্মানের যোগ্য নহেন। এরূপ লোকদের দেশের নেতৃত্ব করিবার কোনই অধিকার নাই।

জমিদারদের অর্থ অধিকাংশ স্থলেই স্বোপার্জ্জিত নহে। স্বোপার্জ্জিত ভিন্ন অন্য অর্থে, আইনতঃ অধিকার থাকিলেও, ধর্ম্মতঃ অধিকার কাহারও নাই। অলসভাবে অপরের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিলে অপরাধ হয়। যাহার মনুষ্যত্ব আছে, সে ইহা করিতে কুণ্ঠা বোধ করে। এই জন্য, দেশের, বিশেষতঃ কৃষকসম্প্রদায়ের, কল্যাণের নিমিত্ত প্রভূত অর্থব্যয় করা প্রত্যেক জমিদারের কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের যেমন অন্নচিন্তা নাই, তেমনি অবসর-কাল সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প আদির চর্চ্চা ও উন্নতিতে যাপন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এইরূপে অর্থব্যয় ও অবসর-কাল-ক্ষেপণ অতি অল্প জমিদারই করিয়া থাকেন। অলস জন্মধনীরা ভুলিয়া যান যে ধর্ম্মের চক্ষে, ন্যায়দর্শীর চক্ষে, অলস লোকেরা পরবিত্তাপহারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। আর যেসকল ধনী বিলাসে ও পাপে মজিয়া আছে, তাহারা ত অতি কৃপাপাত্র।

কোন কোন জমিদারের দ্বারা বঙ্গ দেশের উপকার হইয়াছে; কিন্তু জমিদার-সম্প্রদায়ের দ্বারা বঙ্গের ক্ষতি ভিন্ন বিশেষ কিছু লাভ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহাদের অস্তিত্ব যদি তাঁহারা সার্থক করিতে পারেন, তাহা হইলে পরম আনন্দের বিষয় হইবে।

খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের এই ক্ষতি করিয়াছে যে তাঁহাদের অধিকাংশকে মানুষ হইতে দেয় নাই।

ধার্ম্মিক বড় লাট লর্ড রিপন ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত। ভারতের অনেক যে-সে বড় লাট, মেঝ লাট ও ছোট লাটের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু লর্ড রিপনের মূর্ত্তি এত দিন স্থাপিত হয় নাই। সম্প্রতি উহা মান্দ্রাজে স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতায় বাকী ছিল; শীঘ্রই এই অভাব পূর্ণ হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের রিপন



রিপন সহরে লর্ড রিপনের মূর্ত্তি।

সহরে যে মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, ঠিক্ সেইরূপ একটি মূর্ত্তি কলিকাতার জন্য আগামী আগষ্ট মাসে আসিয়া পৌঁছিবে। উহা ব্রোঞ্জ ধাতুতে নির্ম্মিত অর্থাৎ যে ধাতুতে আজকাল পয়সা নির্ম্মিত হয়, সেই ধাতুতে ঢালাই। মূর্ত্তিটি বিলাত হইতে আসিবে, কিন্তু উহার

প্রস্তরময় পাদপীঠ এখানে নির্ম্মিত হইবে। সমুদয়ে আমাদের ১৫,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে সাড়ে সাত হাজার টাকা আছে। বাকী সংগ্রহ করিতে হইবে। সকলে কিছু কিছু দিলে অনায়াসেই এই টাকা উঠিয়া যাইবে। ১০নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় মাননীয় বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নামে, "রিপনমূর্ত্তির জন্য" লিখিয়া, টাকা পাঠাইতে হইবে।

রিপন সহরে যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সার্ উইলিয়ম্ ওয়েডার্বর্ন তাহার যে ফোটগ্রাফ ভূপেন্দ্রবাবুকে পাঠাইয়াছেন, তাহাই এখানে মুদ্রিত হইল।

লর্ড রিপনের ভারত-শাসনকালে আমরা কলেজের ছাত্র ছিলাম। তাঁহার চেহারা যতটা মনে পড়ে তাহাতে তাঁহার এই মূর্ত্তিটি ঠিক্ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

ইংলণ্ডের একএকটা জেলাকে কাউণ্টি বা শায়ার বলে। এই কাউণ্টিগুলার কোন-কোনটা খুব ছোট, এবং কোন-কোনটা খুব বড়। কিন্তু তথাপি, শাসনকার্য্যের সুবিধার অছিলায় বা অন্যকোন যথার্থ কারণে, বড় কাউণ্টি ভাঙ্গিয়া দুটা কাউণ্টি করা, কিম্বা বড় হইতে কতকটা অংশ লইয়া ছোট একটার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া, এরূপ কোন ঘটনা বা চেষ্টার কথা আমরা জানিনা। কারণ বিলাতের লোকের দেশটা তাহাদের "স্বদেশ," তাহাদের একএকটা কাউণ্টি "স্ব" কাউণ্টি। এরূপ ভাঙ্গাচুরা করিতে তাহারা দিবে না। আমাদের দেশে কিন্তু এরূপ ঘটন ঘটে। প্রদেশ ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা করা, জেলা ভাঙ্গিয়া দুটা জেলা করা, ইহা ভারতের নানা প্রদেশে হইয়াছে। সম্প্রতি এই প্রস্তাব বিবেচিত হইতেছে যে মৈমনসিংহ জেলা খুব বড় বলিয়া, শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য তাহাকে ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা করা উচিত।

কোম্পানীর আমলে ইংরেজশাসিত ভারত যত বড় ছিল, এখন উহা তার চেয়ে আয়তনে ও লোকসংখ্যায় অনেক বড় হইয়াছে। অথচ একজন বড় লাটে তখনও চলিত, এখনও চলিতেছে, কেবল অধস্তন কর্ম্মচারী বাড়িয়াছে। তেমনি মৈমনসিংহের লোকসংখ্যা যদি বাড়িয়া থাকে, ত অধস্তন কর্ম্মচারী বাড়াইলেই চলে। অনর্থক দুটা জেলা করিয়া দুজন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্, দুজন জেলার জজ, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের আফিসের কর্ম্মচারী, ইত্যাদিতে বহু অর্থ ব্যয় করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। জেলা পরিদর্শনের জন্যও এরূপ বিভাগ দরকার নাই। কারণ এখন, রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে স্থলপথ ও জলপথে যাতায়াত পূর্ব্বাপেক্ষা খুব সহজ, ও অল্পসময়সাপেক্ষ হইয়াছে।

মানুষের যেমন স্বদেশপ্রীতি আছে, তেমনি স্বগ্রামপ্রীতি, স্বনগরপ্রীতি, ও স্বজেলাপ্রীতি আছে। এই প্রীতি দ্বারা অনেক সৎকাজও হয়। ইহাতে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। যেসকল দাতা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে সমস্ত জেলার উপকার করিবার জন্য, কলেজে, পুস্তকালয়ে, টাউনহলে, কলের কারখানায়, বা অন্য কোন জনহিতকর কার্য্যে টাকা দিয়া গিয়াছেন, জেলাভাগ করিলে সেসকল দানের সম্পূর্ণ সার্থকতা থাকে না। ভবিষ্যতে এরূপ দানপ্রাপ্তির পক্ষে ব্যাঘাতও ঘটে।

তদ্ভিন্ন, জনসমষ্টির সর্ব্ববিধ শক্তি সমষ্টির ক্ষুদ্রত্ব বা বৃহত্ব অনুসারে হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জেলাকে ছোট করিলে জেলার লোকদের শক্তিও কমাইয়া দেওয়া হয়।

এইসকল কারণে আমরা এইরূপ বিভাগ, বঙ্গে বা অন্য যেখানেই ঘটুক, অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি।

পাঁচ বৎসরেরও অধিক হইল, মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত জামালপুরে এক হিন্দুমুসলমানের বিবাদ ও দাঙ্গা হয়। তাহার ফলে গৌরীপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের জামালপুরস্থ কাছারীতে, লুক্কায়িত অস্ত্রের জন্য, থানাতল্লাসী হয়। কোনও অস্ত্র পাওয়া যায় নাই। মৈমনসিংহের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ ক্লার্কসাহেবের হুকুমে এই থানাতল্লাসী হয়। তিনি তৎকালে কাছারীর সন্নিকটে ছিলেন কিন্তু ভিতরে যান নাই। থানাতল্লাসী তাঁহার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে হয় নাই, এবং সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারাও সব কাজ হয় নাই। মুসলমান জনতা দ্বারা বাক্স ও কাগজপত্র ভগ্ন ও লণ্ডভণ্ড হইয়াছিল। এইসব কারণে ব্রজেন্দ্রবাবু ক্লার্ক সাহেবের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করেন। তাহাতে হাইকোর্টের জজ ফ্লেচার সাহেব তাঁহাকে খরচা সহ পাঁচ শত টাকার ক্ষতিপূরণের ডিক্রী দেন। ক্লার্ক ইহার বিরুদ্ধে আপীল করেন। আপীলেও ব্রজেন্দ্রবাবুর জিত হয়। তখন ক্লার্ক সাহেব প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করেন। প্রিভি কৌন্সিল তাঁহাকে জয়ী করিয়াছেন। এখন ব্রজেন্দ্রবাবু ক্ষতিপূরণ ত পাইবেনই না, অধিকন্তু ক্লার্কের সমুদয় খরচ তাঁহাকে দিতে হইবে। প্রিভি কৌন্সিল এই রায় দিয়াছেন যে থানাতল্লাসী করাইবার ক্ষমতা আইনানুসারে ক্লার্ক সাহেবের ছিল। আমরা আইনজ্ঞ নহি, সুতরাং এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কতকগুলা বেসরকারী, গুণ্ডার মত, বাজে লোক দিয়া জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করাইবার অধিকার কোন্ আইন অনুসারে কাহার আছে? বিচারপতি ফ্লেচার সাহেবের রায় হইতে এই ঘটনা সম্বন্ধে আমরা প্রকৃত তথ্য নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"It became necessary for the search party to break open the outer door of the cutchery. Having thus effected an entrance, some of the Mahomedan mob,

which had collected and were accompanying the search party, were requisitioned to go and bring daos and assist in opening the boxes which contained the zemindary papers. That the search was conducted with unnecessary damage to the property of the plaintiff cannot, to my mind, be doubted for an instant. The papers out of various boxes in the cutcherry were strewn haphazard on the floor of the cutcherry. Mr. Horniman, of the 'Statesman' newspaper, who was accompanied by Mr. Newman, of the 'Englishman' newspaper, who had been specially delegated to proceed to Jamalpore and report on the state of the disturbances there, has graphically described the condition of affairs as he found them at the plaintiff's cutcherry on 1st May. I am satisfied on the evidence that the state of affairs at the plaintiff's cutcherry on May 1st was the same as it had been left on the conclusion of the search."

আমরা প্রিভি কৌন্সিলের রায় আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিলাম। তাহার কোথাও ঘটনার এই দিক্‌টির কোন আলোচনা বা উল্লেখ নাই। বাজে লোকের দ্বারা বাক্স ও কাগজপত্র যে লণ্ডভণ্ড করা হয় নাই, একথা প্রিভি কৌন্সিল বলিতে পারেন নাই। সুতরাং আমাদের ধারণা ব্রজেন্দ্রবাবুর এই যে ক্ষতি হইয়াছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ে তিনি তাহার কোন প্রতিকার পাইলেন না। খানাতল্লাসী করাইবার অধিকার ক্লার্ক সাহেবের থাকিলেও, এইরূপ ভাবে খানাতল্লাসী করাইবার অধিকার তাঁহার ছিল না। সুতরাং প্রিভি কৌন্সিল যে বলিয়াছেন যে ক্লার্ক সাহেব "seems to have acted properly with courage and good sense, and strictly in accordance with the powers committed to him", এই প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য নহে।

প্রিভি কৌন্সিলের রায়টি পড়িলেই বুঝা যায় যে তত্রত্য জজেরা নিম্নস্থ আদালতের রায় দুটিও ভাল করিয়া পড়েন নাই, তাঁহারা এতই ব্যস্ত ছিলেন! কারণ, তাঁহারা বলিতেছেন :—

"It was tried by Mr. Justice Fletcher. He found in favour of the plaintiff and gave a decree of Rs. 500, but without costs. Costs were not awarded to the successful plaintiff on account of the charge of personal misconduct, which his Lordship found to be unfounded and grossly improper."

প্রিভি কৌন্সিল বলিতেছেন যে জজ ফ্লেচার ব্রজেন্দ্রবাবুকে বিনা খরচায় ৫০০ টাকার ডিক্রী দিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা কিন্তু এই যে ব্রজেন্দ্রবাবু খরচা সহ ডিক্রী পাইয়াছিলেন। ফ্লেচার সাহেবের রায় হইতে নিম্নে উদ্ধৃত অংশই তাহার প্রমাণ :—

"Having given the matter the best consideration that I can, I think the justice of the case would be met if I order the defendant to pay the plaintiff Rs. 500 as damages.

"The defendant must also pay to the plaintiff his cost of this suit on scale No. 2."

সামান্য বিষয়ে যে-জজেরা এমন একটা স্থূল ভুল করিতে পারেন, তাঁহাদের বিচার যে অভ্রান্ত হইবেই হইবে, ইহা কেহই মনে করিবে না। ফ্লেচার সাহেব ক্লার্কের আচরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই :—

But whilst this goes to establish the defendant's "bona fide," it does not release him from the obligation the law casts upon him as being in supreme control of the search party from seeing that the search was conducted in a proper and reasonable manner."

ইহার মধ্যে "grossly improper"এর মত একটা কড়া মন্তব্যের কোন ভিত্তি ত আমরা দেখিতে পাইলাম না। প্রিভি কৌন্সিল আরও বলিয়াছেন—"The actual search within the building was made by the police"। ইহা সত্য কিন্তু আংশিক সত্যমাত্র; কারণ খানাতল্লাসীতে যোগ দিবার যাহাদের কোন আইনসঙ্গত অধিকার ছিলনা, এরূপ মুসলমান জনতার লোকেরাও ইহাতে যোগ দিয়াছিল। আর বেশী কিছু আমরা বলিব না। ইংরাজী-জানা পাঠকেরা প্রিভি কৌন্সিলের রায়টি সমস্ত পড়িলেই সব কথা বুঝিতে পারিবেন। রায়টি লম্বা নয়। কিন্তু উহাতে এমন অনেক গরম কথা আছে, যাহার ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কথা উঠিয়াছে, যে, ক্লার্ক সাহেবকে গবর্ণমেণ্ট কিছু ক্ষতিপূরণের টাকা দিবেন। ইহার মত অসঙ্গত প্রস্তাব আর হইতে পারে না। ক্ষতিপূরণটা কিসের? গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মোকদ্দমার সমস্ত খরচ দিয়াছেন। তাঁহার ক্ষতিটা কি হইয়াছে? মোকদ্দমায় নির্দ্দোষী হইলেই যদি ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় তাহা হইলে গত ৫।৭ বৎসরে কত লোক যে রাজনৈতিক মোকদ্দমায় ছয় মাস, এক বৎসর বা ততোধিক কাল হাজতে ও জেলে পচিয়া, শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নির্দ্দোষী প্রমাণ হইল, তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রেই কেন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না?

সম্প্রতি ইংলণ্ডে, জার্ম্মেনীতে ও আমেরিকায় অনেকগুলি ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্বের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আমরা কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি।

এস্, ভী, রামমূর্ত্তি এবং ভূপতিমোহন সেন কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার হইয়াছেন। কেম্ব্রিজে গণিত পরীক্ষায় (বি-এর) প্রথম অংশে এইচ, বি, শিবদাসানি প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন; আইন পরীক্ষায় ব্রহ্মদেশীয় এম্, টী, মঙ্গ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন; ইতিহাসের পরীক্ষায় এস্, বী, বৈদ্য প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন; পদার্থবিজ্ঞানে এস্, পী, দেশাই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পঞ্জাবের ইনায়ৎউল্লাহ্ খাঁ ১৯০৯ হইতে আরম্ভ করিয়া উপর্য্যুপরি কেম্ব্রিজের বি-এ, পরীক্ষায় চারি বিষয়ে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন; যথা—১৯০৯, গণিত, ১ম শ্রেণী; ১৯১০, প্রাচ্যভাষা, ১ম শ্রেণী, ও পদার্থ-বিজ্ঞান, তৃতীয় শ্রেণী; এবং ১৯১২, যন্ত্রবিজ্ঞান, ২য় শ্রেণী। এরূপ কৃতিত্ব কোন ভারতীয় বা অন্যদেশীয় ছাত্র এ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারে নাই।

ব্যারিষ্টার হইবার জন্য শেষ পরীক্ষায় ১৯৭ জন ইংরেজ, ঔপনিবেশিক, চীন ও ভারতীয় পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন ভারতীয় ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার নাম কে, এস্, রেড্ডি। ইনি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর



কে, সুব্বা রেড্ডি।

লোক। ইনি তিন বৎসরের জন্য বার্ষিক ১৫০০৲ টাকার বৃত্তি পাইয়াছেন। পঞ্জাবের লালা রামরাথ্খামল ভাণ্ডারী



রামরাথ্খা মল্ ভাণ্ডারী।

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনিও দুইটী পরীক্ষায় ৭৫০ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বল্লভ ভাই জাবের ভাই পাটেল পঞ্চম স্থান, এবং শচীন্দ্রনাথ ঘোষ একাদশ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, বি-এস্‌সী, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পী, এইচ ডী, উপাধি পাইয়াছেন। বার্লিনের মত শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উপাধি ভারতবাসীদের মধ্যে ইনিই প্রথম পাইলেন।

ইউ, এন্, রায়, আমেরিকার পিট্‌স্‌বর্গ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের খনির এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঈ-এম্, (Engineer of Mines) উপাধি পাইয়াছেন। তৎপরে তিনি কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

এস্, এম্, বসু জাপানে কাপড় ও সূতা রঙ্গান এবং ছিট ছাপা শিখিয়াছেন, এবং আমেরিকার ষ্টান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের বি-এ, উপাধি ও কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের এম্-এস্, উপাধি পাইয়াছেন।

বৈশাখ মাসে যাঁহাদিগকে ভি, পি, ডাকে প্রবাসী পাঠান হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক শত গ্রাহকের

টাকার সঙ্গে ডাকঘর তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা আমাদিগকে এরূপ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণভাবে দিয়াছিলেন, যে, আমরা প্রথমে তাঁহাদের টাকা জমা করিতে ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় সখ্যা তাঁহাদিগকে পাঠাইতে পারি নাই; কাগজ অপ্রাপ্তির অভিযোগ পাইতে পাইতে ক্রমশঃ তাঁহাদের টাকা জমা করিয়া কাগজ পাঠাইতেছি। এই কারণে এখনও অনেকের টাকা জমা হয় নাই।

তদ্ভিন্ন অনেকে যেখান হইতে টাকা দিয়া ভি, পি, লইয়াছেন, আমরা সেই ঠিকানা ডাকঘর হইতে পাওয়ায় সেখানেই পরবর্ত্তী সংখ্যা পাঠাইয়াছি। অথচ কোন কোন গ্রাহক সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা সে খবর পাই নাই। এইরূপ কারণেও অনেকে যথাসময়ে কাগজ পান নাই।

প্রতি বৎসরই এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে। তজ্জন্য কার্য্যাধিক্য বশতঃ অনেকে চিঠির উত্তরও পান না। ইহা দুঃখের বিষয়।

চিত্র পরিচয়

বিশ্বামিত্র।

মুখপত্র রঙিন চিত্রখানির পরিকল্পনার বিষয় বিশ্বামিত্র; এক সময় পৃথিবীতে অত্যন্ত খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; বিশ্বামিত্র ছয় দিন অনাহারের পর একদিন একটি পদ্মফুল প্রাপ্ত হন; সেই ফুলটি আহার করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবেন মনে করিতেই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে পৃথিবীর অসংখ্য নরনারী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, এই পদ্মফুলটি একাকী আহার করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত স্বার্থপর অধর্ম্ম কার্য্য হইবে। বিশ্বামিত্রের ধর্ম্মই পদ্মরূপে বিকশিত হইয়া বিশ্বামিত্রের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই চিত্রে বিশ্বামিত্রের চিন্তাপূর্ণ দ্বিধার ভাবটি বেশ ফুটিয়াছে। কিন্তু বিশ্বামিত্রের আকার বৌদ্ধ ভিক্ষুর ন্যায় কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তরুণ শিল্পীর শিল্পসাধনা সার্থক হইবে তাহার আভাস এই চিত্রে সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়।

কাবুলিওয়ালা।

সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের "কাবুলিওয়ালা" নামক চমৎকার গল্পটি অবলম্বনে এই চিত্রখানি অঙ্কিত। কাবুলিওয়ালার বিরাট মূর্ত্তির মধ্যে শিশুসুলভ প্রফুল্ল সরল ভাবটিই চিত্রের কেন্দ্রগত ভাব। মেওয়া দিয়া, 'হাঁথি'-ভরা ঝুলি আর 'শ্বশুরা'কে মারিবার গল্প করিয়া 'খোঁখি' মিনির সহিত কাবুলিওয়ালা ভাব করিতেছে—সেই অবস্থাটি চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে।

'চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব' প্রবন্ধে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের যে চারটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রবন্ধলেখক ডাক্তার রামলাল সরকারেরই বিভিন্ন পরিচ্ছদে সজ্জিত প্রতিরূপ।

চীন রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান সেনাপতির যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার নাম জেনেরাল লি ইয়েন হুং।

চীনের বিদেশী কনসালের পাল্কীর ছবিতে ব্রিটিশ কনসাল মিঃ রোজের চিত্র গৃহীত হইয়াছে। ইনি গত বৎসর টেঙ্গিয়ে হইতে এসিয়া ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন, এবং তথাকার এসিয়াটিক জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে চীন দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উপলক্ষে সি-আই-ই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



কালীয়দমন।

মোলারাম কর্ত্তৃক অঙ্কিত মূল চিত্র হইতে।

Three Colour Blocks by U. Ray and Sons. *Kuntaline Press, Calcutta*

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩১৯ | ৫ম সংখ্যা

লণ্ডনে

সমুদ্রের পালা শেষ হইল। শেষ দুই দিন প্রবল বেগে বাতাস উঠিল; তাহাতে সমুদ্রের আন্দোলনের সমতালে আমাদের আভ্যন্তরিক আলোড়ন চলিতে লাগিল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম ইহাতে সমুদ্রের অপরাধ নাই, কাপ্তেনেরই দোষ। যেদিন পৌঁছিবার কথা ছিল তাহার দুই দিন পরে পৌঁছিয়াছি। বরুণদেব নিশ্চয়ই এই দুর্ব্বলান্তঃকরণ যাত্রীটির জন্য ঠিকমত হিসাব করিয়া ঝড় বাতাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন--কিন্তু মানুষের হিসাব ঠিক রহিল না।

মার্সেল্‌স্ হইতে এক দৌড়ে পারিসে আসিয়া এক দিনের মত হাঁপ ছাড়িলাম। শরীর হইতে সমুদ্রের নিমক সাফ করিয়া ফেলিয়া ডাঙার হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম। স্নানাহারের পর একটা মোটর গাড়িতে চড়িয়া পারিসের রাস্তায় রাস্তায় একবার হুহু করিয়া ঘুরিয়া আসিলাম।

বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় পারিস সমস্ত য়ুরোপের খেলাঘর। এখানে রঙ্গশালার প্রদীপ আর নেবেনা। চারিদিকে আমোদ-আহ্লাদের বিরাট আয়োজন। মানুষকে খুসি করিবার জন্য সুন্দরী পারিস নগরীর কতই সাজসজ্জা! এই কথাই কেবল মনে হয় মানুষকে খুসি করাটা সহজে সারিবার কোনো চেষ্টা নাই।

যখন পৃথিবীতে রাজাদের একাধিপত্যের দিন ছিল তখন প্রমোদের চূড়ান্ত ছিল কেবল রাজারই ঘরে। এখন সমস্ত মানুষ রাজা। এই সমগ্র মানুষের বিলাস-ভবনটি কি প্রকাণ্ড ব্যাপার! ইহার জন্য কত দাস যে অহোরাত্র খাটিয়া মরিতেছে তাহার সীমা নাই। ইহার জন্য প্রত্যহ কত জাহাজ, কত রেলগাড়ি বোঝাই করিয়া পৃথিবীর কত দুর্গম দেশ হইতে উপকরণ আসিতেছে তাহার ঠিকানা কে রাখে!

এই মানুষ রাজার আমোদ এমন প্রকাণ্ড এমন বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাকে অলস বিলাসীর প্রমোদের সঙ্গে তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা প্রবল চিত্তের প্রবল আমোদ; যে সহজে সন্তুষ্ট হইতে চায় না তাহাকে খুসি করিবার দুঃসাধ্য সাধন। বহুলোক ভোগ করিতে করিতে এবং বহুলোক ভোগ জোগাইতে জোগাইতে এই প্রমোদ-পারাবারের মধ্যে তলাইয়া মরিতেছে কিন্তু তবুও মোটের উপরে ইহার ভিতর হইতে মানুষের যে-একটা বিজয়ী শক্তির মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে তাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিনা।

রবিবারের দিন ক্যালে হইতে সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ডোভারে পৌঁছিলাম। সেখানে ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে যখন রেলগাড়িতে চড়িয়া বসিলাম তখন মনের মধ্যে ভারি একটি আরাম বোধ হইল। মনে হইল আত্মীয়দের মধ্যে আসিয়াছি। ইংরেজের যে ভাষা জানি। মানুষের ভাষা যে আলোর মত। এই ভাষা যতদূর ছড়ায়

ততদূর মানুষের হৃদয় আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলে। ইংরেজের ভাষা যখনি পাইয়াছি তখনি ইংরেজের মন পাইয়াছি। যাহা জানা যায় তাহাতেই আনন্দ। ফ্রান্সে আমার পক্ষে কেবল চোখের জানা ছিল কিন্তু হৃদয়ের জানা হইতে বঞ্চিত ছিলাম—সেই জন্যই আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। ডোভারে পা দিতেই আমার মনে হইল সেই ব্যাঘাত আমার কাটিয়া গেল, যেখানে দাঁড়াইলাম সেখানে কেবল যে মাটির উপর দাঁড়াইলাম তাহা নহে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

অনেককাল পরে লণ্ডনে আসিলাম। তখনো লণ্ডনের রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় দেখিয়াছি কিন্তু এখন মোটর গাড়ির একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। তাহাতে সহরের ব্যস্ততা আরো প্রবলভাবে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। মোটর রথ, মোটর বিশ্ববহ (অম্নিবাস্), মোটর মালগাড়ি লণ্ডনের নাড়ীতে নাড়ীতে শতধারায় ছুটিয়া চলিতেছে। আমি ভাবি লণ্ডনের সমস্ত রাস্তার ভিতর দিয়া কেবলমাত্র এই চলিবার বেগ পরিমাণে কি ভয়ানক প্রকাণ্ড! যে মনের বেগের ইহা বাহ্যমূর্ত্তি তাহাই বা কি ভীষণ। দেশকালকে লইয়া কি প্রচণ্ড বলে ইহারা টানাটানি করিতেছে। পথ দিয়া পদাতিক যাহারা চলিতেছে প্রতিদিন তাহাদের সতর্কতা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। মন অন্য যে-কোনো ভাবনাই ভাবুক না কেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের এই বিচিত্র গতিবিধির সঙ্গে তাহাকে প্রতিনিয়ত আপোষ করিয়া চলিতে হইবে। হিসাবের ভুল হইলেই বিপদ। হিংস্র পশুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রয়াসে হরিণের সতর্কতাবৃত্তি যেমন প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে ব্যস্ততার তাড়া খাইয়া খাইয়া এখানকার মানুষের সাবধানতা তেমনি অসামান্য তীক্ষ্ণতা লাভ করিতেছে। দ্রুত দেখা, দ্রুত শোনা ও দ্রুত চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার শক্তি কেবলি বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতে, শুনিতে ও ভাবিতে যাহার সময় লাগে সেই এখানে হঠিয়া যাইবে।

ক্রমে বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটিতেছে। যে যত্ন ও প্রীতি পাইতেছি তাহা বিদেশীর হাত হইতে পাইতেছি বলিয়া আমার কাছে দ্বিগুণ মূল্যবান হইয়া উঠিতেছে;—মানুষ যে মানুষের কত নিকটের তাহা দূরত্বের মধ্য দিয়াই নিবিড়তর করিয়া অনুভব করা যায়।

ইতিমধ্যে একদিন আমি Nation পত্রের মধ্যাহ্নভোজে আহূত হইয়াছিলাম। "Nation" এখানকার উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। ইংলণ্ডে যে-সকল মহাত্মা স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার ঝুঁটা বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অন্যায়কে যাঁহারা কোনো ছুতায় কোথাও আশ্রয় দিতে চান না, যাঁহারা সমস্ত মানবের অকৃত্রিম বন্ধু, Nation তাঁহাদেরই বাণী বহন করিবার জন্য নিযুক্ত।

নেশন পত্রের সম্পাদক ও লেখকেরা সপ্তাহে একদিন মধ্যাহ্নভোজে একত্র হন। এখানে তাঁহারা আহার করিতে করিতে আলাপ করেন ও আহারান্তে আগামী সপ্তাহের প্রবন্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য এরূপ প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের লেখকেরা সকলেই পাণ্ডিত্যে ও দক্ষতায় অসামান্য ব্যক্তি। সেদিন ইঁহাদের আলোচনা-ভোজে স্থান পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

ইঁহাদের মধ্যে বসিয়া আমার বারম্বার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, ইঁহারা সকলেই জানেন ইঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি সত্যকার দায়িত্ব আছে। ইঁহারা কেবল বাক্য রচনা করিতেছেন না, ইঁহাদের প্রত্যেক প্রবন্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-তরীর হালটাকে ডাহিনে বা বাঁয়ে কিছু না-কিছু টান দিতেছেই। এমন অবস্থায় লেখক লেখার মধ্যে আপনার সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের দেশে খবরের কাগজে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই; আমরা লেখকের কাছে কোনো দায়িত্ব দাবি করি না, এই কারণে লেখকের শক্তি সম্পূর্ণ আলস্য ত্যাগ করে না ও ফাঁকি দিয়া কাজ সারিয়া দেয়। এই জন্য আমাদের সম্পাদকেরা লেখকদের শিক্ষা ও সতর্কতার কোনো প্রয়োজন দেখেন না, যে-সে লোক যাহা-তাহা লেখেন এবং পাঠকেরা তাহা নির্বিচারে পড়িয়া যান। আমরা সত্যক্ষেত্রে চাষ করিতেছি না বলিয়াই আমাদের মঞ্জরীতে শস্য-অংশ অতি সামান্য দেখা যায়—মনের খাদ্য পূরাপুরি জন্মিতেছে না।

আমাদের দেশে রাজ্যনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনাসভা আমি দেখিয়াছি, তাহাতে কথার চেয়ে কণ্ঠের জোর কত বেশি! এখানে কিরূপ প্রশান্ত ভাবে এবং কিরূপ প্রণিধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। মতের অনৈক্যের দ্বারা বিষয়কে বাধা না দিয়া তাহাকে অগ্রসরই করিয়া দিল। অনেকে মিলিয়া কাজ করিবার অভ্যাস ইহাদের মধ্যে কত সহজ হইয়াছে তাহা এই ক্ষণকালের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম। ইহাদের কাজ গুরুতর অথচ কাজের প্রণালীর মধ্যে অনাবশ্যক সংঘর্ষ ও অপব্যয় লেশমাত্র নাই। ইহাদের রথ প্রকাণ্ড, তাহার গতিও দ্রুত, কিন্তু তাহার চাকা অনায়াসে ঘোরে এবং কিছুমাত্র শব্দ করেনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জম্মু

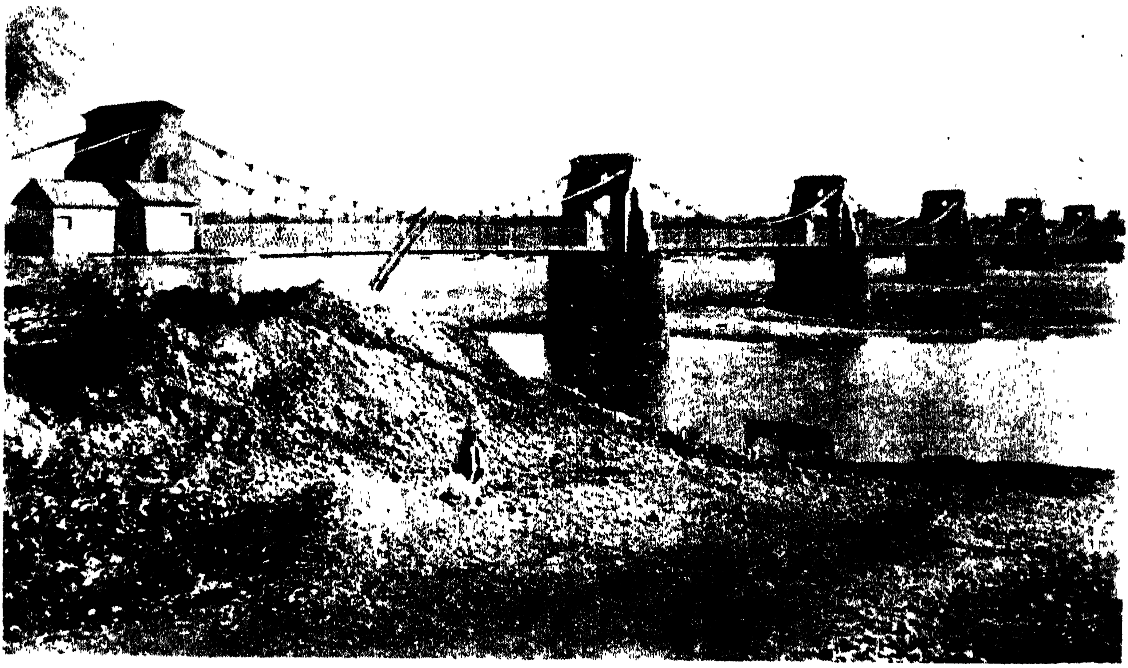
জম্মুপ্রদেশটি কাশ্মীর ও জম্মুরাজত্বের সিংহদ্বার বলা যাইতে পারে। পাঞ্জাবের নিম্নসমতল ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য ক্রমশঃ থাকে থাকে—ঠিক যেন একতলা দুতলা করিয়া ২৮০০০ ফুট উর্দ্ধ উঠিয়াছে; জম্মুনগরের উচ্চতা ১২০০ হইতে ১৫০০ ফুট, শ্রীনগরের উচ্চতা ৪১০০ ফুট।

উত্তরপশ্চিম রেলওয়ের ওয়াজিরাবাদ ষ্টেশন হইতে কেবলমাত্র ৫২ মাইল লম্বা একটি ছোট রেলওয়ে জম্মুনগর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই লাইনের উপর শিয়ালকোট বৃটিশরাজত্বের শেষ নগর। শিয়ালকোট হইতে কুড়ি মাইল জম্মুপ্রদেশের সমতলভূমি অতিক্রম করিলে জম্মুনগর। জম্মুনগর পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই স্থান হইতেই কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্যের পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে। জম্মুর পাহাড়ের দক্ষিণদিকে কেবলমাত্র সমতল-ভূমি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আর উত্তরদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় দৃষ্টিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কলিকাতা হইতে জম্মুনগর প্রায় ১৪০০ মাইল দূরবর্ত্তী। পাঞ্জাব মেলে আসিলে অম্বালায় গাড়ী বদলাইয়া উত্তর-পশ্চিম রেলের গাড়ীতে উঠিতে হয়; তাহার পর ওয়াজিরাবাদ ষ্টেসনে আবার নামিয়া জম্মুর গাড়ীতে উঠিতে হয়। কলিকাতা হইতে জম্মু ঠিক ৪৬ ঘণ্টার পথ।



জম্মুনগরের উর্দ্ধ হইতে সাধারণ দৃশ্য। গম্বুজওয়ালা শ্বেতকুঠি রাজপ্রাসাদ; পার্শ্বে দপ্তরখানা (Foreign Office)।



তবিনদীর পুল (জম্মুর দিক হইতে)। পুলের মুখের উপরকার দুটি ঘরে (Octroi ও Customs tax) শুল্ক আদায় করিবার জন্ম সর্ব্বদা লোক থাকে। [লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

জম্মুনগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম, বিশেষতঃ কলিকাতা মেল যখন বৈকালে ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছায় তখন কেবলমাত্র জম্মু পাহাড়টি দূর হইতে দেখা যায়, জম্মুনগরের সৌধাবলী বড় কিছু দেখা যায় না, পাহাড়টিতে ঢাকিয়া রাখে, কেবল অনেকগুলি শ্বেত ও স্বর্ণবর্ণের মন্দিরের চূড়া দূর হইতে দেখা যায় ও তাহাদের উপর অস্ত-রবির কিরণ পড়িয়া বেশ উজ্জ্বল করিয়া তুলে। তখন জম্মুনগরটি মন্দির নগর বলিয়া মনে হয়।

জম্মুনগরের আভ্যন্তরিক দৃশ্যও খুব সুন্দর। নগরের ভিতর দিয়া পথগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশঃ উঠিয়াছে, আব পথের দুধারেই পাহাড়। জম্মুনগরের ভিতরও একতলা দুতলা করিয়া ছয় সাত তলা আছে। খানিকটা পাহাড় উঠিয়া বেশ সমতলভূমি তাহাব উপর অনেক বাড়ী, তখন পাহাড়ের উপর আছি বলিয়া মনে হয় না, আবার একটা পাহাড় উঠিলে বেশ সমতলভূমি তাহার উপর অনেক বাড়ী, এইরূপ ছয় সাতটি পাহাড়ের উপর ঠিক যেন ছয় সাতটি তলায় বিন্যস্ত জম্মুনগর। এইরূপ একএকটি পাহাড়কে এখানে একএকটি "ঢাক্কি" বা তলা বলে।

ষ্টেসন হইতে জম্মুনগরে যাইতে হইলে তবি নদী পার হইয়া যাইতে হয়। এই স্থানে তবি পার হইবার নিমিত্ত একটি পুল আছে। তবি নদীটি খুব ছোট। জম্মু হইতে বহিয়া গিয়া মাইল খানেক দূরে চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। নদীতে কোমরের বেশী জল নাই। নদীর জলপথটি খুব সঙ্কীর্ণ কিন্তু নদীর গর্ভটি অপেক্ষাকৃত চওড়া ও প্রস্তরময়, এইজন্য নদীর পুলটি নদী অপেক্ষা অনেক বড়, কলিকাতার গঙ্গার পুলের মত লম্বা।

নদীব দুধারের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। পাহাড়ের মধ্য দিয়া নদীটি আঁকিয়া বাঁকিয়া কলকলস্বরে বহিয়া চলিয়াছে। দুধারের বড় বড় পাহাড় ক্রমশঃ বাঁকিয়া আসিয়া নদীর বুকের মাঝে লুটাইয়া পড়িয়াছে। নদীর মাঝে মাঝে ভগ্নপাহাড়ের কতকাংশ এখানে ওখানে জাগিয়া রহিয়াছে।

ষ্টেসনে ঘোড়ারগাড়ী পাওয়া যায়। এখানকার গাড়ী কলিকাতার টমটম গাড়ীর মতো দুচাকার, তবে তাহাতে



জম্মুনগরের নহরের (খালের) দৃশ্য। চন্দ্রভাগা নদী হইতে এই খালে জল আসে বলিয়া ইহারও জল জম্মুবাসীর কাছে পবিত্র। ইহার জলে জম্মুর চাষ আবাদ হয়, জল পম্প করিয়া মাঠে দেওয়া হয়। [লেখক কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

পাঁচজন বেশ আরামে বসিয়া যাইতে পারে। মাথার উপরের চালটি ক্যাম্বিশের, এজন্য এ গাড়ীগুলি খুব হাল্কা ও দ্রুতগামী। এ গাড়ীগুলিকে টঙ্গা বলে।

তবির পুল পার হইয়া জম্মুনগরে প্রবেশ করিলে প্রত্যেককে একপয়সা করিয়া শুল্ক দিতে হয়। ইহা কাশ্মীর ও জম্মু গভর্মেণ্টের প্রাপ্য। এই সময় কষ্টম হাউসের লোকে শুল্ক লইবার কোনো জিনিষ আছে কিনা তাহা একবার দেখিয়া লয়।

জম্মুনগরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া একটি খাল চন্দ্রভাগা-নদী হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর তবিতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই খালের জল বরফের জলের মত ঠাণ্ডা। বরফজলের চেয়ে ইহার উত্তাপ কেবলমাত্র ৪° কি ৫° ডিগ্রি বেশী এবং ইহার জল এইরূপ ঠাণ্ডা বারমাসই থাকে। দারুণ গ্রীষ্মের সময় যখন ছায়াতেও উত্তাপ প্রায় ১১৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে সেই সময় এই "নহরের" (খালের) জলে নগরের সমস্ত নরনারী প্রাতঃস্নান করিয়া যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করে। গ্রীষ্মকালে এখানে দুপুরবেলা খুব ভয়ানক গরম হয় বটে কিন্তু রাত্রি দশটার সময় হইতে সকাল আটটা নয়টা পর্য্যন্ত বেশ ঠাণ্ডা থাকে, আমাদের দেশের বসন্তকালের মত বোধ হয়, তখন বাতাসও বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বহে। এই নহরের পার্শ্বে একটি বিজ্‌লিঘর (power house) আছে, ইহার Dynamo খালের জলের স্রোতের বলেই চলে। এই স্থান হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রস্তুত হইয়া তবির পুল ও অন্যান্য স্থান বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করে। এই বিজ্‌লিঘরটি বাবু উষাপতি রায় নামক জনৈক বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে আছে। জম্মুতে কলের জল আছে, কলের জলের কারখানাও উষাপতি বাবুর অধীনে।

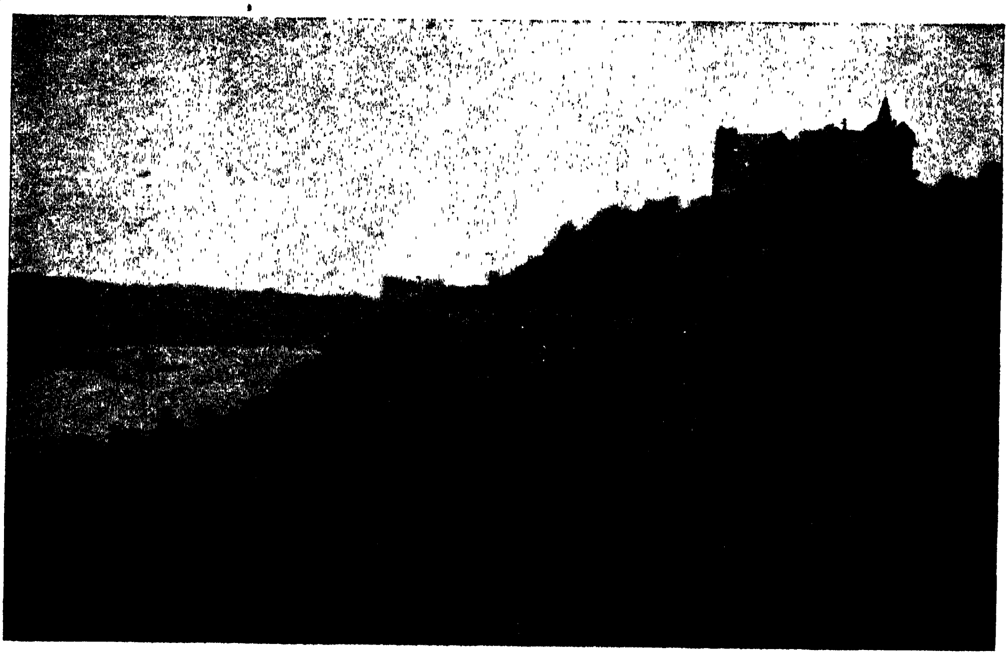
মহারাজের প্রাসাদ, মহারাজের দপ্তরখানা, আদালত, জেল ইত্যাদি অন্যান্য সমস্ত গভর্ণমেণ্টসংক্রান্ত বাড়ীগুলি তবিনদীর উপর পাশাপাশি একজায়গায় অবস্থিত। জম্মুনগরের উপকণ্ঠে মহারাজের আর একটি রামনগর প্রাসাদ বলিয়া প্রাসাদ আছে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত, সম্মুখ দিয়া তবিনদী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে এই স্থানে ঘুরিয়া গিয়াছে।



জম্মুনগরের বহিঃতোরণ— Gomu Gate—জম্মুর উত্তর দিকে। সিঁড়ির ডাহিন দিকে গির্জ্জার মতো যে ঘর সেখানে পুলিস থাকে, নূতন বিদেশী লোক দেখিলে নাম ধাম লিখিয়া লয়। [লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

জম্মুনগরের পশ্চিম দিকে আজবঘর বলিয়া সরকারী একটি বাড়ী আছে। ইহার ভিতরের গুটিকতক হলঘর বহুমূল্য আসবাবে স জ্জত। কোন উৎসবের সময় রাজকীয় ভোজাদি হইলে এই স্থানে হয়। আজবঘরটি উচ্চ পাহাড়ের উপর অপেক্ষাকৃত সমতলস্থানে অবস্থিত; ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা সমস্তই সমতলভূমি খুব নিম্নে অবস্থিত। এই পাহাড়ের উপর হইতে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। নিম্নের গাছগুলি বড় বড় সবুজ রঙের ঢেউএর মত অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই দিকটা দেখিলে প্রবাসীতে প্রকাশিত "পদ্মিনী ও ভীমসিংহ" চিত্রটির কথা মনে পড়ে।

এই আজবঘরের গুটিকতক ঘর লইয়া এখন মহারাজার প্রিন্স্ অব ওয়েল্‌স্ কলেজ (Prince of Wales College) আছে। কলেজের নূতন বাড়ী নহরের তীরে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ লইয়া প্রস্তুত হইয়াছে, কলেজ শীঘ্র সেইখানে উঠিয়া যাইবে। এই কলেজে তিনটি বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন বাবু আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, ও বাবু তারকনাথ সান্ন্যাল, এম-এ, ইংরাজীর অধ্যাপক; এবং বাবু উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু এম-এ গণিতের অধ্যাপক। এখানকার ইস্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও বাঙ্গালী। কেবলমাত্র এই পাঁচজন বাঙ্গালী জম্মুনগরের স্থায়ী অধিবাসী। আরো কয়জন বাঙ্গালী জম্মু ও কাশ্মীর মহারাজের দপ্তরে চাকরী করেন। ডাক্তার আশুতোষ মিত্র মহারাজার শ্রেষ্ঠ সচিব। তাঁহারা শীতকালে মহারাজের সহিত জম্মুনগরে আসেন, তাহার পর গ্রীষ্মকালে মহারাজের সহিত শ্রীনগরে চলিয়া যান। জম্মুনগরটি মহারাজের শীতনিবাস, এখানে মহারাজা পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকেন তাহার পর শ্রীনগরে চলিয়া যান। এখানকার রাজসরকারে বিক্রমসম্বৎ প্রচলিত। এই আজবঘরে রণবীর লাইব্রেরী বলিয়া একটি পাঠাগার আছে। এই স্থানে স্তূপাকার প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি সযত্নে রক্ষিত আছে।

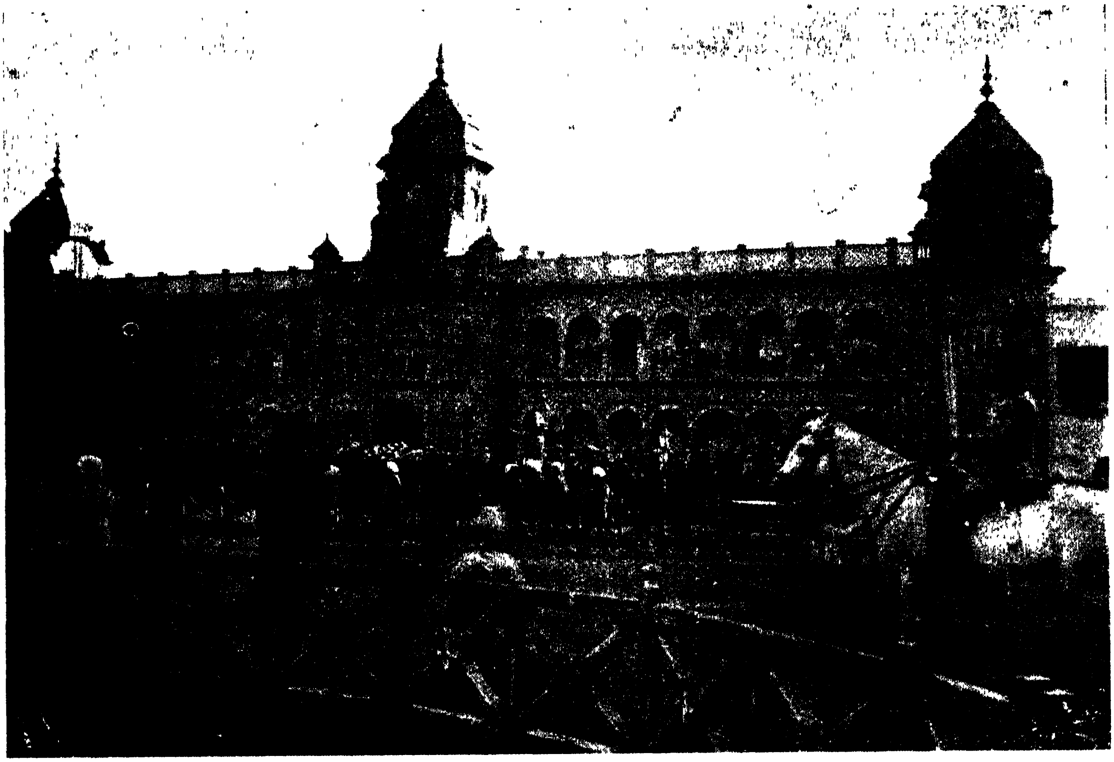


জম্মুর মহারাজার তবিতীরবর্ত্তী রামনগর প্রাসাদ ও সরকারী দপ্তরখানা। তবির পরপারে ঈষদুন্নত ভূমির উপর দিয়া দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের বিজয়বাহিনী আসিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

ঐতিহাসিকগণ এইস্থানে আসিলে এইসকল পুঁথি হইতে অনেক নূতন কথা আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

জম্মুনগরটি ভারতবর্ষের একটি প্রাচীনতম হিন্দুনগর, বরাবর নিজের হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের উপর দিয়া এলেকজণ্ডারের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কত বিদেশী আক্রমণের ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে, কত মুসলমান রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় জম্মু বরাবর হিন্দু রাজার অধীনে আছে; দুএকবার শিখসেনা কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল মাত্র। ইহার প্রধান কারণ বোধহয় জম্মু প্রদেশটি পর্ব্বতসঙ্কুল, সৈন্য গমনাগমনের পথ হইতে দূরে অবস্থিত ও শস্যসম্পদে অপেক্ষাকৃত হীন বলিয়া বিজয়লোলুপ মুসলমান নরপতিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ডোকরা জাতীয় রাজপুত এইস্থানে বরাবর রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। এখনকার মহারাজাও এই শ্রেণীর রাজপুত। শিখমহারাজা রণজিতসিংহের সময়ে রণজিতদেও নামক একজন ডোক্‌রা রাজপুত জম্মু প্রদেশের রাজা ছিলেন। রণজিতদেওএর ভ্রাতার পৌত্র গোলাপসিংহ সেই সময়ে শিখরাজ রণজিতসিংহের সমীপে লাহোরে আসিয়া শিখসেনার মধ্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ শিখ-সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। রণজিতসিংহের মৃত্যুর পর গোলাপসিংহ এই শিখসেনার বলে রণজিতদেওএর বংশধরের নিকট হইতে জম্মু প্রদেশ জয় করিয়া জম্মু প্রদেশের রাজা হন। তাহার পর ১৮৪৬ সালে ইংরাজদের সহিত শিখদের যুদ্ধ বাধিলে গোপালসিংহ কোনো দলে যোগদান না করিয়া মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দেন ও সেই সময় ইংরাজ-দের নিকট হইতে জম্মুর উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও কাশ্মীরের কতকাংশ ৭৫ লক্ষ টাকায় ক্রয় করেন। তাহার পর ইংরাজ সেনাপতি সর্ হেনরী লরেন্সের (Sir Henry Lawrence) সাহায্যে কাশ্মীর রাজের নিকট হইতে কাশ্মীরের সমস্ত দখল করেন এবং আধুনিক কাশ্মীর ও জম্মু রাজত্বের অন্তর্গত সমস্ত প্রদেশ একে একে দখল করেন। গোলাপসিংহ ১৮৫৭ সালে মারা যান, তাহার পর তাঁহার পুত্র রণবীরসিংহ রাজা হন। আজ-কালকার মহারাজা প্রতাপসিংহ রাজা রণবীর সিংহের পুত্র।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজত্বের বিস্তৃতি এখন (৮০০০০)

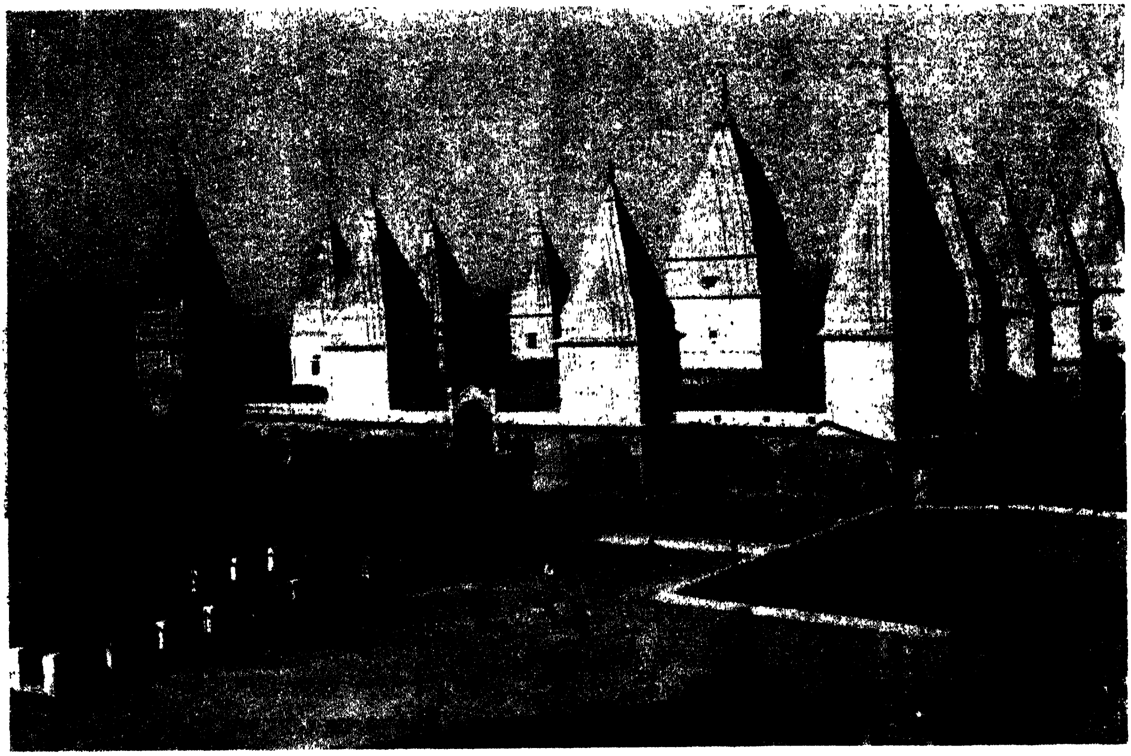


জম্মুর মহারাজার দপ্তরখানা (Secretariat Office) বৈশাখী উৎসবের দিনে।

আশীহাজার বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ। বাৎসরিক আয় এ' কোটি আট লক্ষ টাকা।

ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে "কাশ্মীর ও কাশ্মীরী" নামক প্রবন্ধে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক বিষয় কতক আলোচিত হইয়াছে কিন্তু কাশ্মীরীদের রীতিনীতি বিশেষ কিছু আলোচিত হয় নাই। ইহাদের রীতিনীতিতে বিশেষতঃ বিবাহপ্রথাতে অনেক রকম নূতনত্ব দেখা যায়। এখানে নারীর বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্যের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৫ জন মুসলমান, বাকী হিন্দু, বৌদ্ধ ও শিখ; তবে জম্মুশহরের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু, বাকী মুসলমান। কেবল জম্মুশহরে কেন সমগ্র পাঞ্জাবেও হিন্দু ও মুসলমানগণ আপন আপন জাতিগত পার্থক্য বঙ্গদেশ অপেক্ষা রীতিনীতির প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে বজায় রাখিয়া চলে। শিখেরা তামাকু সেবন করে না কিন্তু মদ্যপান করিতে ইহাদের ধর্ম্মে বাধা নাই, মুসলমানেরা তামাকু সেবন করে কিন্তু মদ্য পান করিলে ধর্ম্মে পতিত হয়। হিন্দুদের এদুটি বিষয়ে বাধা নাই বটে তবে এখানকার হিন্দুরা মুসলমানস্পৃষ্ট জল গ্রহণ তো করেই না, মুসলমানের দোকানের জিনিষটি পর্য্যন্ত কিনে না। মুসলমানেরাও পারগপক্ষে অন্নজলবিষয়ে হিন্দুদের সংস্পর্শে আসিতে চাহে না। তবে এখানকার প্রশংসার বিষয় এই যে হিন্দু ও মুসলমানগণ জাতিগত পার্থক্য বজায় রাখিয়া চলিলেও তাহাদের মধ্যে কোনরূপ জাতিবিরোধ দেখা যায় না। এখানকার মুসলমান হিন্দুব্রাহ্মণকে অনেক সময় ভক্তি করিতেছে দেখা যায়, হিন্দুদের সহিত বৈশাখী উৎসব ও বাসন্তী উৎসবে যোগদান করে। এখানে একদিন আমাদের কিছু বেশী দুধের প্রয়োজন হওয়ায় বাজারে দুধ কিনিতে যাইতে হয়। এক মুসলমান গোয়ালার নিকট যাই। দুধ চাওয়ায় সে বলিল তাহার কাছে আন্দাজ দুই সের দুধ আছে। আমরা তাহাই লইতে ইচ্ছুক হওয়ায় সে ভিতর হইতে একসের তিনপোয়া



জম্মুনগরে রঘুনাথজীর মন্দিরাবলী।

দুধ আনিয়া বলিল—বাবুজী আর নাই। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বাপু তুমি ত ইচ্ছা করিলে ভিতর হইতে একপোয়া জল মিশাইয়া আনিতে পারিতে; ইহাতে সে যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে আমরা হিন্দু হইয়াও তাহার নিকট হইতে দুধ লইতেছি ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট তাহার উপর দুধে জল মিশাইয়া আমাদিগকে "মুসলমানের পানি" খাওয়াইয়া সে আপনাকে কলুষিত করিতে ইচ্ছুক নহে। এরূপ অন্ধবিশ্বাসমূলক সততা বঙ্গদেশে বিরল।

এখানকার হিন্দুমাত্রেই শিখা রাখে এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। মাথায় শিখা না দেখিলে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও ইহারা তাহার হিন্দুত্বের বিষয়ে সন্দিহান হয়। রঘুনাথজিউর মন্দিরে প্রবেশ করিতে আমরা যে মুসলমান নহি তাহা বুঝাইতে ঝুড়ি ঝুড়ি হিন্দুত্বের প্রমাণ দাখিল করিতে হইয়াছিল। তাহার পর ইহারা যখন শুনিল আমরা খাস কলিকাতাবাসী—কালীঘাটের পার্শ্বে ও গঙ্গার উপকূলে থাকি—তখন আমাদিগকে বৈকুণ্ঠের মত নিকটবর্ত্তী জ্ঞানে অতি শ্রদ্ধার সহিত পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল। তবে চামড়ার সমস্ত জিনিষ, এমন কি চামড়ার ঘড়িরচেন ও মানিব্যাগটি পর্য্যন্ত, পকেট হইতে খুলিয়া বাহিরে রাখিয়া যাইতে হইয়াছিল।

রঘুনাথজিউর মন্দির জম্মুশহরের শ্রেষ্ঠ মন্দির। এখানে পর্ব্ব উপলক্ষে বহু দূর হইতেও নরনারীর সমাগম হয়। মহারাজা ও মহারাণীরা এখানে থাকিলে মাঝে মাঝে পূজা দেখিতে যান। মন্দিরাভ্যন্তরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রমাণ প্রস্তরমূর্ত্তি আছে ও বাহিরে প্রায় একতলা সমান হনুমানের মূর্ত্তি আছে।

জম্মুশহরের পুরুষের সকলেই প্রায় ইংরাজী ধরণের কামিজ ওয়েষ্টকোট ও কোট গায়ে দেয়, মাথায় টুপি বা পাগড়ী দেয় ও ঢিলা ঝল্‌ঝলে বা পাটেপা ব্রীচের মত ইজের পরে। কখন কখন ধুতি পরে তবে খুব কম। বাংলাদেশে পাঞ্জাবী আস্তীন বলিয়া যে জামার চলন সেরূপ



জম্মুর ফেরিওয়ালা—ডোক্‌রা রাজপুত জাতীয়।



জম্মুর মুসলমান রমণী—কাশ্মীরী ছাচের।

জামা এখানকার সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে পরিতে দেখা যায় না, গরীব ও ইতরলোকে পরে।

এখানকার স্ত্রীলোকেরা খোঁপা বাঁধে না, চুল বিনাইয়া পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখে। এখানকার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিকাংশই খুব সুন্দরী, রং খুব উজ্জ্বল ও দেহসৌষ্ঠব ভাল। স্ত্রীলোকেরা পায়ের কাছে খুব সরু ও কোমরের কাছে খুব ঢিলা সুকতান নামক এক প্রকার রঙ্গীন ইজের পরে, তাহার উপর হাত খুব সরু ও লম্বা ঝুলওয়ালা এক প্রকার কোর্ত্তা বা জামা গায়ে দেয়, তাহার উপর মাথা ঢাকিয়া ওড়না পরে। বঙ্গদেশে নব্য যুবকদিগের মধ্যে আজকাল যেরূপ মাঝখানে বোতাম হাত সরু ও খুব লম্বা ঝুলওয়ালা জামা চলন হইয়াছে ঐ প্রকার জামা এখানকার স্ত্রীলোকে পরে। একদিন একটি জম্মুশহরবাসী আমাদের নিকট হইতে কলিকাতা বিষয়ক গল্প খুব কৌতূহলের সহিত শুনিয়া শেষে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল যে আমাদের সব ভাল লেকেন আমরা যে এখানকার নকলে এখানকার আওরাৎকা মাফিক কোর্ত্তা গায়ে দিএ আচ্ছা নেহি। বলা বাহুল্য আমাদের গায়েও তখন ঐরূপ জামা ছিল।

এখানে সকল স্ত্রীলোকেই জুতা পরে ও "পর্দ্দা" থাকিলেও মধ্যবিত্ত সকল স্ত্রীলোক হাঁটিয়া পথে বাহির হয়।

এখানকার কাহাকেও শুধু মাথায় বা শুধু গায়ে কখন দেখা যায় না। ভিখারী কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিতেছে তাহার গায়েও লম্বা কোর্ত্তা মাথায় পাগড়ী বা টুপি; কখন কখন পায়ে আবার জুতা থাকে। মুটে মাথায় মোট লইয়া চলিয়াছে তাহারও মাথায় পাগড়ী বাঁধা। হাঁসপাতালে রোগী শুইয়া আছে তাহারো মাথায় কাপড়ের হাল্কা টুপি। আমরা একদিন বাঙ্গালীবেশে খালি মাথায় রাজার দপ্তরখানায় আফিস দেখিতে গিয়াছিলাম। দ্বারের নিকট একজন সিপাহী ছিল আমাদের খালি মাথায় দেখিয়া প্রবেশের পথ আটকাইয়া তিনবার সেলাম ঠুকিয়া বলিল "আপ্‌কো ল্যাঙ্গাশির হ্যায় মাফ্ কিজিয়ে।" অগত্যা সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল। বাড়ী আসিয়া শুনিলাম যে এখানে নগ্নশির দেখান অমঙ্গলের চিহ্ন, রাজ্যের পক্ষে বড়ই অশুভলক্ষণ, এজন্য মাথায় কিছু ঢাকা না দিয়া কোনো সাধারণ স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ। এখানকার ফুটবল খেলার খেলওয়াড়রা পর্য্যন্ত মাথায় পাগড়ী বা টুপি বাঁধিয়া খেলে।



জম্মুর রাজপুত ব্রাহ্মণী—ডোক্‌রা জাতীয়া—জম্মু ছাঁচের।



জম্মুর ফলওয়ালী—ডোক্‌রা রাজপুত জাতীয়।

হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ করিয়া ভস্মাবশেষ ঘরে লইয়া সযত্নে রাখিয়া দেয়। রঘুনাথজিউর মন্দিরের পার্শ্বে কতকগুলি মন্দির আছে এগুলি রাজবংশীয় মৃতব্যক্তিদের ভস্মাবশেষের উপর নির্ম্মিত স্মৃতি-মন্দির। লাহোরেও কেল্লার নিকট মহারাজ রণজিৎ সিংহের এইরূপ স্মৃতি-মন্দির আছে।

উৎসবের মধ্যে এখানে পূজার সময় দশহারা উৎসব খুব জাঁকালো রকম হয় বিশেষতঃ মহারাজা তথন জম্মুতে থাকেন বলিয়া। মহালয়ার দিন হইতে আরম্ভ হইয়া বিজয়ার দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ উৎসব চলে। প্রত্যহই নগরে মেলা বসে ও কলিকাতার রামলীলার সংএর মত সং বাহির হয়। তাহার পর বিজয়ার দিন রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ ইত্যাদি রাক্ষসগণের খড় ও কাগজ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি দাহ করে। সেদিন সমস্ত নগর আলোক-মালায় সজ্জিত হয় ও আতসবাজী পুড়ান হয়।

বৎসরের প্রথম দিনে বৈশাখী উৎসব হয়। সেদিন দলে দলে লোক মিছিল করিয়া কলিকাতার মহরমমিছিলের মত লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে গান ও বাজ্‌নার সহিত শহরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেষে রঘুনাথজিউর মন্দিরে আসিয়া থামে। হিন্দুরা মন্দিরে প্রবেশ করে। ফাল্গুন মাসের প্রথম পঞ্চমীতে বাসন্তী উৎসব হয়। সেদিনও বৈশাখী উৎসবের মত মিছিল বাহির হয়। তবে সেদিন ফুলের খুব বেশী ছড়াছড়ি।

এখানকার আদালতে উর্দ্দু ভাষা ও বাংলা তারিখ ও বিক্রমসম্বৎ ব্যবহৃত হয়। এখানকার দণ্ডনীতি ও দণ্ডবিধি ভারতীয় দণ্ডনীতি ও দণ্ডবিধির উর্দ্দু অনুবাদ। তবে এখানকার দুএকটি নূতন আইন আছে, যথা, এখানে গোহত্যা করিলে এখন পাঁচ বৎসর কারাবাস হয়, পূর্ব্বে প্রাণদণ্ড হইত। যেখানকার অধিবাসী শতকরা ৭৫ জন মুসলমান সেখানে এই আইন নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছে! নগরের পার্শ্ববর্ত্তী নদীতে মৎস্য ধরিলে ছয়মাস জেল হয়! হত্যাপরাধ প্রমাণিত হইলেও ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড

হয় না। এখানে কোন অস্ত্র-আইন নাই। যে ইচ্ছা বন্দুক ব্যবহার করিতে পারে।

এখানকার মিউনিসিপালিটীসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় রাজ-সরকার কর্তৃক বিনা টেক্সে দৃষ্ট হয়। বাড়ী থাকার দরুণ বা জল ও আলোর জন্য শহরবাসীকে কোন কিছু টেক্স দিতে হয় না।

শহর পরিষ্কারের যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত থাকিলেও এখানকার অধিবাসীরা বড়ই অপরিষ্কার। নগরের ভিতরের সুন্দর সুন্দর পার্ব্বত্যপথগুলি দুর্গন্ধ আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। নগরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিতে গিয়া মাঝে মাঝে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়। নগরের পথগুলি সরু ও ধূলিবহুল। অল্প জোরে হাওয়া চলিলে আর বাড়ীর বাহির হইবার জো নাই।

ইহাদের নৈতিক অবস্থা তত সুবিধাজনক নহে। তবে শোনা যায় কাশ্মীরীদের, বিশেষতঃ কাশ্মীরী হাঁজি-গণের, অপেক্ষা বহু অংশে ভাল।

কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের সীমান্তে যে কয়েকটি প্রদেশ আছে তন্মধ্যে লাদক একটি। লাদক প্রদেশে বৌদ্ধ-মতাবলম্বী হিন্দুর নিবাসই বেশী, ইহাদের মধ্যে নারীর বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

লাদক প্রদেশটি পর্ব্বতসঙ্কুল এজন্য উর্ব্বরা জমী অপেক্ষাকৃত অত্যল্প ও এই সংক্ষিপ্ত ভূমির পুনঃ পুনঃ বিভাগ নিবারণার্থ নারীর বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত হইয়াছে; ইহাই ইহার কারণ বলিয়া এখানে নির্দ্দিষ্ট হয়।

লাদকী যৌথসংসারভুক্ত ভ্রাতারা এক যৌথ স্ত্রী ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাবে আপন আপন স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। যদি কেহ পৃথকভাবে বিবাহ করিয়া পৃথক পত্নী গ্রহণ করে তবে তাহাকে পত্নীর সহিত শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতে হয় এবং তাহা হইলে তাহার পৈত্রিক বা বংশের এজমালি সম্পত্তির উপর কোনও প্রকার স্বত্ব বা দাবী দাওয়া থাকে না। বিবাহের পর হইতে তাহাকে মুখপা বা পত্নীর দাস বলে।

এখানকার এইরূপ বহুবিবাহের যে সন্তান সন্ততি হয় তাহারা জ্যেষ্ঠেরই সন্তানরূপে পরিগণিত হয় ও তাহারা তাহাদের অন্যান্য পিতাকে ফস্‌র্ক বা সহকারী-পিতা বলে।



লাদকের তাতার।

মুখপার সন্তানেরা মাতৃনামে পরিচিত হয়, পিতৃবংশের নাম পর্য্যন্ত পায় না।

পিতার মৃত্যুর পর এজমালি সংসারের জ্যেষ্ঠ পুত্রই বংশের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়, অন্যান্য ভ্রাতারা কিছুই পায় না, তবে অন্যান্য পিতা ও ভ্রাতার যাবজ্জীবন ও ভগিনীদিগের বিবাহকালাবধি ভরণপোষণের নিমিত্ত সম্পত্তি দায়সংযুক্ত থাকে।

পুত্রের অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠা কন্যা সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হয়। ইতিপূর্ব্বে তাহার বিবাহ না হইয়া থাকিলে তখন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সে বিবাহ করিতে পারে।

এইরূপে লাদকের কোনো সম্পত্তি কখনো বিভক্ত হয় না বলিয়া বহুকাল পূর্ব্ব হইতে লাদকী বাড়ীগুলি একই বংশের নামে আজ পর্য্যন্ত পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে কন্যাপক্ষীয়েরা প্রথমে

একজন মুখপা সন্ধান করে। তেমন সুবিধা গোছের পাত্র পাইলে বিবাহের কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইয়া যায়, কন্যা বাগদত্তা হইয়া থাকে। একমাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে কোন একটি দিন স্থির করিয়া বিবাহ হয়।

বিবাহের দিন নায়পা (ক্রীত-ব্যক্তি) বা বর আত্মীয় বরযাত্রীদের সহিত যোদ্ধ বেশে সজ্জিত হইয়া বিবাহ করিতে কন্যার বাড়ী যায়। কন্যার বাড়ীর দ্বারদেশে পৌছিলে পর কন্যাপক্ষীয়েরা লাঠি লইয়া তাড়া করে। এইরূপে একটা মিথ্যা যুদ্ধের অভিনয় হয় এবং বরপক্ষীয়েরা যতক্ষণ কন্যা-পক্ষীয়দের কতকগুলি বাঁধা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দেয় ও কিছু মুদ্রা না দেয় ততক্ষণ কন্যাপক্ষীয়েরা পথ ছাড়ে না। সেই মুদ্রা বর যৌতুকরূপে আবার ফেরত পায়।

পূর্ব্বকালে যুদ্ধে কন্যা হরণ করিয়া যে বিবাহ হইত এই প্রথা হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। উভয়পক্ষেরই আত্মীয়স্বজনের সমক্ষে বৌদ্ধ পুরোহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক হইতে শ্লোক পড়িয়া বিবাহ সম্পন্ন করে। তাহার পর দিনকতক ধরিয়া আত্মীয়স্বজনকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ ও উৎসব হয়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

লীলা

আমায় আমি করব বড়
এইত তোমার মায়া—
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেলব রঙীন ছায়া।
তুমি তোমায় রাখবে দূরে,
ডাকবে খুঁজে কতই সুরে
আপ্‌নারি বিরহ তোমার
আমায় নিল কায়া।

বিরহগান উঠল বেজে
বিশ্বগগনময়
কত রঙের কান্না হাসি
কতই আশা ভয়।
কত যে ঢেউ ওঠে পড়ে,
কত স্বপন ভাঙে গড়ে,
আমার মাঝে রচিলে যে
আপন-পরাজয়।

এই যে তোমার আড়ালখানি
দিলে তুমি ঢাকা—
দিবানিশির তুলি দিয়ে
হাজার ছবি আঁকা,—
এরি মাঝে আপ্‌নাকে যে
বাঁধা রেখে বস্‌লে সেজে,
সোজা কিছু রাখ্‌লে না, সব
মধুর বাঁকে বাঁকা।

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা।
দূরে কাছে জড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরণে
বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
তোমার আমার যাওয়া-আসায়
কাটে সকল বেলা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

শাসনপ্রণালী।

তৌ-ছিয়েন-ইয়েকে চারিদিন একপ্রকার খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখার পর তিন মাসের জেল এবং ১৫,০০০৲ টাকা জরিমানা করার হুকুম হইল।

বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে ইনি গত বৎসর বর্ম্মার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে মিচোয়া জেলার সৈনিক বিভাগের মাল বহনের জন্য খচ্চর জোগাইবার ঠিকা লইয়া-ছিলেন। মিচোয়া জেলার প্রান্তে চীনসীমান্তে পিয়েমা-মা নামক একটী ক্ষুদ্র স্থান আছে। ঐ স্থান এতাবৎ না চীনার না ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে ছিল।

চীনারা ঐ স্থান আপন এলাকার অন্তর্গত মনে করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থান বর্ম্মার অন্তর্গত মনে করিয়া দখল করিয়া তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াসী হন। মিঃ তৌয়ের খচ্চর এই ব্রিটিশ অভিযানে গত বৎসর ব্যবহৃত হইয়াছিল। চীনারা ইঁহার এই কার্য্য স্বদেশদ্রোহিতা মনে করিয়া ইঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এই পিয়েনমার বিষয় এখনও নাকি নিষ্পত্তি হয় নাই। বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে লেখালেখি চলিতেছে। গত বৎসর চীনারা এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া ইংরেজদিগের কোন দ্রব্য খরিদ করিবে না বলিয়া 'বয়কট' ঘোষণা করিয়াছিল।

লি-কেন-ইয়ে আসিবার পর ইঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইলে এই খচ্চর জোগানর অপরাধে ইঁহার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

টাই-হুং-শিন—মিঃ টাই কাষ্টম কমিশনারের বড় কেরাণী। ইনি পূর্ব্বে তিব্বতে লাসাতে প্রায় ১৪ বৎসর চীন আম্বানের সেক্রেটারি ছিলেন। লর্ড ল্যান্সডাউনের সময় আম্বানের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবার জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন। তাহার পর আজ ১০।১২ বৎসর যাবত কাষ্টম আফিসে কার্য্য করিতেছেন। ইনি কমিশনার হাওয়েল সাহেবের সঙ্গে বিদ্রোহের পর ভামো গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে আসেন। এক মাসের মধ্যে কোথাও কিছুই না, হঠাৎ একদিন টাওঠাই তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া ডাকিয়া লইয়া কয়েদ করেন। কমিশনার তাঁহার জন্য জামিন হইতে চাহিলে সে জামিন অগ্রাহ্য হইল। ক্রমে মনোবাদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন ডিস্পেনসারিতে কার্য্য করিতেছি, হঠাৎ আমার সহিস্ কহিল যে টাই কেরাণীকে হত্যা করিবার জন্য লইয়া গিয়াছে। আমি এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ঘোড়া প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলাম। তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুতবেগে বধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি লোকারণ্য। দুইটী লোকের মুণ্ড ছিন্ন হইয়া দেহ হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত আছে। দেখিলাম সে মুণ্ড টাই কেরাণীর নহে। তখন মনে আশ্বাস জন্মিল। টাইয়ের এক স্ত্রী উর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় গিয়াছেন। অপর স্ত্রী চীৎকার করিতে করিতে গিয়া কনসালের সাহায্য প্রার্থনা করায় কনসালের লোকও ঘোড়া ছুটাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তবিক টাইকেও হত্যা করিবার প্রস্তাব ছিল, এবং রটনাও হইয়াছিল, তবে কি বিবেচনায় তাঁহাকে বধ্যস্থলে লইয়া যায় নাই জানি না।

টাইয়ের যে অপরাধ তাহা কাল্পনিক। চাং-ওয়েন-কোয়ানের দুই জন সেপাই এই বলিয়া এক দরখাস্ত করে যে "কর্ণেল ছাউকে বিদ্রোহের রাত্রিতে হত্যা করা হয়, তাঁহার ১৫,০০০ টাকা টাই কেরাণীর নিকট আমানত ছিল।" কর্ণেল ছাউ টাইয়ের ঘরের পার্শ্বের ঘরে বাস করিতেন। তাঁহাকে হত্যা করার পর তাঁহার স্ত্রী টাইয়ের বাড়ীতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তাঁহার স্ত্রী ও ভাই বর্ত্তমান ছিলেন। কেহই সে টাকার কথা জানেন না। অক্টোবর মাসে ঘটনা, আর মার্চ্চ মাসে এই টাকার কথা উঠিল, তাহাও তাঁহার স্ত্রী বা ভাই দাবি করেন নাই। কোথাকার দুই জন সেপাই দরখাস্ত করে। মূল কথা টাই কেন টেঙ্গিয়ে ছাড়িয়া গেলেন সেই এক কারণ, অপর কারণ চাংএর প্রিয়পাত্র এক কেরাণীকে কমিশনার নানা কারণে বরখাস্ত করিয়াছিলেন, ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কমিশনারের প্রিয়পাত্র টাইকে প্রাণে বধ করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। অনেক লেখালেখির পর টাইকে মুক্তি দিয়াছে কিন্তু মোকর্দ্দমা এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই।

লি নামক একব্যক্তির স্ত্রী ইউন-ছাংফু সহরে লি-কেন-ইয়ের নিকট এক দরখাস্ত করে যে লিন-হাই নামক এক ব্যক্তি তাহার স্বামীকে হত্যা করিয়া তাহার জেড পাথরের বালা ও অন্যান্য দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে। লি-কেন-ইয়ে ইউন-ছাংফু হইতে টেলিগ্রামে টেঙ্গিয়ের টাওঠাইকে হুকুম দেন যে "লিন-হাইর শিরশ্ছেদ কর।" টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহাকে ধৃত করা হয়, পরদিন তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা হয়। কেমন সুন্দর বিচার! আসামী রহিল টেঙ্গিয়ে, ফরিয়াদি ও বিচারক রহিল চারিদিনের পথ দূরে। টেলিগ্রাফে সমস্ত সম্পন্ন হইল!

এই প্রকার ঘটনা আর কত লিখিব। আমার ডায়ারী এইসকল নরবলির ঘটনায় পূর্ণ। ইউন-ছাংফু সহরে

বদমাইস্ নামকাটা সেপাইগণ লুটপাট করে। তজ্জন্য প্রতিদিনই সেই স্থানের লুণ্ঠনকারী মনে করিয়া সন্দেহে কত নরবলি হইয়াছে। একদিন নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম হইতে পাঁচ জন লোককে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া আনিয়া বাজারের মধ্যে তাহাদিগকে বলি দেওয়া হইল। ইউনছাংফুর লুণ্ঠনকারী বলিয়া তাহাদিগকে সন্দেহ করা হয়। ধরিয়া আনিলে লি-কেন-ইয়ের নিকট সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি তাহাদিগকে না দেখিয়া বা কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই অমনি হুকুম দিলেন "সা-ঠা-মেন" অর্থাৎ তাহাদের মাথা কাটিয়া ফেল। অথচ অনুসন্ধানে জানা গেল এই লোকগুলি উক্ত সহরে আদবেই যায় নাই। তাহারা কুমারের কাজ করিত, ঘরের টালি বা খোলা প্রস্তুত করিত। বিদ্রোহের পর হইতে সৈন্য-দলভুক্ত হয়, এবং লির প্রসাদে কার্য্য হইতে অপসৃত হয়।

একজন স্ত্রীলোক অপর এক পুরুষের সঙ্গে গিয়া কোন মন্দিরে লুকাইয়া ছিল। তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়া উভয়েরই শিরশ্ছেদ করা হইল। এক ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের নামে অভিযোগ হয় যে, সে কোন ব্যক্তির ৭০।৮০ টাকা প্রতারণা করিয়া লইয়াছে। অমনি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া মাথা কাটিয়া ফেলা হইল। আমরা গিয়া দেখি তাহার কন্যা ও স্ত্রী কাঁদিয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, শবাধার আনা হইয়াছে। একজন লোক তাহার ছিন্ন মুণ্ডকে দেহের সঙ্গে সেলাই করিতেছে। এই প্রকার কত লোককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য বিনা বিচারে হত্যা করা হইয়াছে তাহা সমস্ত উল্লেখ করিতে গেলে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করা হইবে।

১৯০৩ খৃঃ জানুয়ারী মাসে এখানে আসিয়াছি, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে এমন নরবলির বীভৎস কাণ্ড আর দেখি নাই। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের আমলে কোন ব্যক্তির গুরুতর অপরাধ বিচারে সাব্যস্ত হইলে পরে গবর্ণর জেনারেলের আদেশ লইয়া তাহার প্রাণদণ্ড হইত। বৎসরে দু চারিটির বেশী প্রাণদণ্ড বড় হইত না। এবার এই কয়েক মাসে সমস্ত চীন দেশে কত লক্ষ লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই যে প্রায় প্রত্যহই দুই চারি পাঁচটার শিরশ্ছেদ করিয়া প্রকাশ্য স্থানে হাটের মধ্যে তাহাদের লাশ সমস্ত দিন ধরিয়া পড়িয়া থাকে, কখন কখন ছিন্নমুণ্ডসকল নগর-প্রাচীরের দ্বারে ঝুলাইয়া রাখা হয়, ইহাতে লোকের মনে যে কি আতঙ্ক বা দুঃখ বোধ হয় তাহা বলা যায় না। কিন্তু এখানকার একটী লোককেও কাহারো জন্য আপশোষ করিতে শুনি নাই, জিজ্ঞাসা করিলে বরং লোকে বলিয়া উঠে "বেশ হইয়াছে এসকল লোককে কাটিয়া না ফেলিলে চোর ডাকাইত দমন হইবে না।" তবে একটী স্ত্রীলোক হঠাৎ এই মুণ্ডমালা দেখিয়া পাগল হইয়াছে। কসাই যখন গরু ভেড়া জবাই করে, তাহা দেখিয়াও আমাদের দেশের লোকের প্রাণে দুঃখ বোধ হয়, কিন্তু চীনাদের প্রাণে যে মনুষ্য বধে কিছুমাত্র দুঃখ বোধ হয় তাহার লক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। মনুষ্যের জীবন কত মূল্যবান! তাহা কি চীনাদিগের নিকট এত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়? পূর্ব্বে তোপখানার একটী সৈনিক কর্ম্মচারীর ফটো প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে (জ্যৈষ্ঠ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)। তাহার কৃত্রিম দন্ত প্রস্তুত করিতেছিলাম। হঠাৎ শুনিলাম উক্ত ব্যক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া হত্যা করা হইয়াছে এবং তাহার হৃদপিণ্ড কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারা নাকি কাটা-ঘায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়, কেননা এ লোকটা নাকি বড় দুরন্ত ছিল। অপর দুইটী মাথা কাটার ফটো দিয়াছি তাহার একটীর জিহ্বা লইয়া গিয়াছে তাহাতেও ঔষধ প্রস্তুত হইবে।*

আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, তখন এদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অতি অল্পই ছিল। অনারেবল নেপিয়ার সাহেবের† সঙ্গে সর্ব্বদা তর্ক হইত। তিনি চীনাদিগের উপর বড় চটা ছিলেন। একদিন তিনি বলিলেন They (Chinese) have no souls। আমি কহিলাম No Sir, I am sure that they have। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন If they have as you say, that is for the hell, not for heaven। তাঁহার সেই কথার মর্ম্ম আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি।

বাস্তবিকই চীনাদিগকে চেনা বড় কষ্টকর। সাংহাইয়ের

* এই ছবিগুলি অত্যন্ত বীভৎস বলিয়া মুদ্রিত হইল না।—প্রবাসী-সম্পাদক।

† ইনি লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালার পুত্র।

একটী সাহেব এদেশে দশ বৎসর বাসের পর একদা বলিয়াছিলেন যে তিনি চীনদেশ ও চীনজাতি সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বিশ বৎসর এদেশে অবস্থিতির পর তিনি একদা কহিলেন যে এদেশ ও জাতি সম্বন্ধে তাঁহার জানিবার আরো অনেক বাকি আছে। ৪০ বৎসর বাসের পর কহিলেন যে তিনি এযাবত কিছুই জানিতে পারেন নাই। যাহা তিনি পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন সমস্তই ভুল। তবে সকল দেশে সকলের মধ্যেই একটা ব্যতিক্রম আছে, এদেশে নাই তাহা বলা অন্যায়।

ব্যক্তিগত কথা।

(১) ছেন্-চির-খোয়ে বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই ব্যক্তি নূতন সৈন্যের একজন নগণ্য ফাইজাং বা নায়ক ছিলেন।

চীন দেশে, কি সদাগর, কি সাধারণ প্রজাবর্গ, কি সরকারী সৈনিক বা সিভিল বিভাগের কর্মচারিগণ সকলের মধ্যেই গুপ্ত সমিতি আছে। সেই গুপ্ত সমিতি দ্বারা যত সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য্যের পরামর্শ গোপনে হইয়া থাকে। গুপ্ত-সমিতি ইহাদের সমাজের অঙ্গবিশেষ।* বিদ্রোহের পূর্ব্ব হইতেই এই-সকল সমিতির কার্য্য অতি ব্যস্ততার সহিত চলিতেছিল। নূতন সৈন্যগণের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব সম্যকরূপে পরিপক্ক হইলে, পুরাতন সৈন্যদিগের মনে ইহারা সেই ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়া কার্য্যসিদ্ধির সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকে। এইসকল গুপ্তমন্ত্রণায় চাং ওয়েন-কোয়ান ও ছেন-চির-খোয়ে যোগ দেন।

ছেন্-চির-খোয়ের সর্ব্বোপরিস্থ কর্ম্মচারী কর্ণেল চাং হইতে এইসকল বিদ্রোহের ভাব ইহারা গোপন রাখে। ২৭শে অক্টোবর রাত্রি নয়টার তোপ পড়িলে সেপাইগণ হঠাৎ ব্যারাকের সমস্ত বাতি নিবাইয়া দিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দেয় এবং কর্ণেল চাংকে বলে যে "আমরা সরকারি ইয়ামিন আক্রমণ করিব।" তাহাতে কর্ণেল চাং রাগান্বিত হইয়া বলেন যে "তোমরা অযথা গোলযোগ করিও না। আপন আপন স্থানে যাও।" ইনি ব্যারাকের উপরের সিঁড়ির উপর দণ্ডায়মান, নিম্নে সৈন্যগণ রাইফল লইয়া দণ্ডায়মান। ইতিমধ্যে হঠাৎ রাইফলের আওয়াজ হইল এবং কর্ণেল চাং ধড়াশ করিয়া পড়িয়া গেলেন। রাইফলের গুলি ইঁহার বক্ষ ভেদ করিয়া গিয়াছিল তবুও তাঁহার তদ্দণ্ডে মৃত্যু না হওয়ায় নৃশংসেরা পিস্তলের গুলি দ্বারা তাঁহাকে একেবারে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়া পরে সকলে নগরপ্রাচীরের দক্ষিণ দরজা দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইয়ামিন আক্রমণ করিল। যে ব্যক্তি কর্ণেল চাংর বক্ষে গুলির আঘাত করিয়াছিল সেই ব্যক্তি ছেন-চির-খোয়ে। বিদ্রোহের পর ইঁহার এই অমানুষিক কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ পদোন্নতি হইয়া সেনাপতির পদে উন্নীত হইলেন। এবং ইঁহার অধীনে সহস্র বিদ্রোহী সৈন্য এখান হইতে বার দিনের পথ টালিফু সহর আক্রমণের জন্য প্রেরিত হইল। টালিফু সুদৃঢ় স্থান, তাহার পূর্ব্বদিকে এক বিস্তীর্ণ হ্রদ, পশ্চিমদিকে দুরারোহ পর্ব্বত। টেঙ্গিয়ে হইতে যাইতে হইলে দক্ষিণদিক দিয়া যাইতে হয়। টালিফু টেঙ্গিয়ে অপেক্ষা অতি বড় সহর, তথায় তোপখানা ও বহু শিক্ষিত সৈন্য থাকে। তাহা আক্রমণ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। টালিফু হইতে সৈন্য গোপনে বাহির হইয়া আসিয়া পর্ব্বতের আড়ালে দশমাইল দূরে লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া ছেন্-চির-খোয়ের সৈন্যকে বেষ্টন করিয়া ফেলে। তিন স্থানে যুদ্ধ হয়। তিন যুদ্ধেই তিনি পরাভূত হইয়া প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য নষ্ট করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার মাল, রসদ ও খচ্চর সমস্ত টালিফুর সৈন্যের হস্তে পতিত হয়। এই বীর পুরুষ যখন অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসেন তখন ইঁহাদের অভ্যর্থনার খুব আয়োজন হয় এবং সহরে জাতীয় পতাকা উড়াইয়া আনন্দ প্রকাশ করা হয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে লি-কেন-ইয়ে আসিবার দুইদিন পূর্ব্বে ইনি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বর্ম্মায় যান। তখনো সহরে খুব ধুম হয়। কিন্তু টালিফু আক্রমণের ধৃষ্টতার জন্য লি-কেন-ইয়ে ইঁহাকে পাইলে শিরশ্ছেদ করিতেন।

(২) চাং-ওয়েন-কোয়ান—ইঁহার কথা পূর্ব্বে কয়েক-বার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইনি এখানে একজন নগণ্য লোক ছিলেন। কিন্তু ইঁহার ভিতর যে এরূপ তেজস্বিতা, সাহস ও দৃঢ়তা আছে তাহা পূর্ব্বে কেহ বুঝিতে পারে নাই। ইনিই বিদ্রোহের দুইমাস পূর্ব্ব হইতে এইসকল

* মডার্ণ রিভিউর ১৯০৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসের কাগজে এই চীন দেশের গুপ্ত-সমিতির বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সৈন্যদিগের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিয়া তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাব বেশ দৃঢ় করিয়া লন এবং নানা প্রকার কল্পনা করিতে থাকেন। শুনিলাম যে ডাঃ সুন্-ইয়েট-সেনের পত্রও ইঁহাদের গুপ্ত-সমিতির নিকট আসিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। কাঙ্গাই সুভার সঙ্গে মন্ত্রণা হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিদ্রোহের দিন ইনিই কতকগুলি সৈন্য গোপনে ছদ্মবেশে নগরপ্রাচীরের ভিতর প্রেরণ করেন। এইসকল লোক অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিয়া দশটার সময় নগরপ্রাচীরের দ্বার খুলিয়া দেয়। ইনিই লি-কোটানটাই ও ছেন-টাই-ফোং নামক দুইজন লোককে গোপনে কর্ণেল ছাউকে হত্যা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। কর্ণেল ছাউ সহরের বাহিরে নদীর অপর পারে ক্ষুদ্র একটী কেল্লার পুরাতন সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন। ইনি তাঁহার কেল্লার নিকট টাই কেরাণীর বাটীর প্রান্তে সপরিবারে বাস করিতেন। উক্ত দুইজন লোক গিয়া কর্ণেল ছাউকে ডাকে যে "হুজুরের নিকট আমরা একটা সংবাদ দিতে আসিয়াছি।" কর্ণেল ছাউ শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া যেই বাহিরে গিয়াছেন, অমনি ঐ দুটি লোক ছুরিকা দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলে তিনি চেঁচাইয়া দৌড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিবামাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া লোক দুইটী পলায়ন করে। ইহার পরই তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ নূতন সৈন্যের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দেয়। কর্ণেল চাং ও কর্ণেল ছাউকে হত্যা করিয়া উভয় সৈন্য মিলিত হইলে চাং-ওয়েন-কোয়ান ও ছেন-চিয়-খোয়ে সৈন্য চালনা করিয়া সমস্ত ইয়ামিন আক্রমণ করিলেন। তাহার বিবরণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পরে ইহার নাম হইয়াছে চাং তু-তু অর্থাৎ জেনারাল কমাণ্ডিং অফিসার চাং।

এই বিদ্রোহের যে পরিণাম কি হইবে কেহই তখন তাহা জানে না। হয়ত কার্য্যসিদ্ধি, না হয় ধনেপ্রাণে নির্ম্মূল হওয়া। ধনে প্রাণে ধ্বংস হইবারই অধিক সম্ভাবনা তখন ছিল। প্রজাসাধারণও তখন প্রায় দুই নৌকায় পা দিয়া ছিল। ইউনান প্রদেশের তখন কোথায়ও বিদ্রোহ হয় নাই। রাজধানী ইউনানফুও তখন নড়াচড়া করিতে সাহস পায় নাই। এমতাবস্থায় ক্ষুদ্র টেঙ্গিয়ে যে এই প্রদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের পথপ্রদর্শক হইবে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। এতবড় গুরুতর একটা কার্য্য করিতে যে সাহস পায় নিশ্চয়ই তাহাকে ধন্য মনে করিতে হইবে। চাং তু তুর তখন সংকট কত? এদিকে ব্রহ্মদেশ হইতে সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে যদি বিদেশীদিগকে রক্ষা না করা যায়, অপরদিকে মাঞ্চু রাজবংশের সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। তাহা ভিন্ন নিজের অধীনের বিদ্রোহিগণ প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিতে পারে এবং তাহাতে বাধা পাইলে তাঁহাকেও গুলি করিয়া কোন মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে। সর্ব্বোপরি সৈন্য গঠন ও রাজ্যে শান্তি রক্ষার চিন্তায় তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কোন কোন দিন রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রা হয় নাই—নানা উদ্বেগে রাত্রি কাটাইতে হইয়াছে। তবুও লোকটার মাথা বিগড়িয়া যায় নাই, বরং স্থিরচিত্তে দৃঢ়তার সহিত সমস্ত বিপদ কাটাইয়া উঠিয়াছেন এবং এই গুণেই এখন মহাসম্মানজনক পদ লাভ করিয়াছেন। লি-কেন-ইয়ে আসিলে কিছুদিনের জন্য সহরের কর্তৃত্ব ইঁহার হাতে ছিল না। ইনি এখান হইতে বদলি হইয়া টালিফুর জেনারাল হইয়া গিয়াছিলেন। ইনি টেঙ্গিয়েরই লোক।

ফটো তুলিবার জন্য ইনি আপন মাতা সহ একদিন আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ফটো তুলিয়া কনসাল সাহেবকে দেখাইলে তিনি কহিলেন "Is that the rotten man?" আমি কহিলাম "Yes, sir." মনে মনে হাসি পাইল যে চাং ইউরোপীয় হইলে Hero বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতেন। যেহেতু তিনি আসিয়াবাসী তখন নিশ্চয়ই "রটন ম্যান" তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে।

(৩) লি-কেন-ইয়ে—ইনিও টেঙ্গিয়ের লোক। ইনি পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জাপানে প্রেরিত হইয়া যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা করিতেছিলেন। পাঁচ ছয় বৎসর কাল জাপানে থাকিয়া যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা করিয়া ইউনানফু সহরে গবর্ণমেণ্টের সৈনিকবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসর যাবত এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।



চীন রাষ্ট্রবিপ্লবের সর্দ্দার চাং-ওয়েন-কোয়ানের মাতা। ইনি খুব বুদ্ধিমতী ও সাহসী। শুনা যায় যে তাঁহার পুত্রের রাজনৈতিক ভাব গঠনে ইনি সহায়তা করিয়াছিলেন।
(ডাক্তার রামলাল সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।)

২৭শে অক্টোবর টেঙ্গিয়ে বিদ্রোহী হয়। ২৯শে এই সংবাদ ইউনানফু পৌঁছে। ৩০শে লি-কেন-ইয়ে তথাকার লেপ্টেনাণ্ট জেনেরাল ছাই অ নামক ব্যক্তির সঙ্গে যোগ দিয়া তথাকার জেনারেল চুং-চেন-লুংকে হত্যা করিয়া নগর আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু তথাকার ভাইসরয় বা গবর্ণর জেনারাল আত্মসমর্পণ করায় তাঁহার প্রাণবধ করিলেন না। তাঁহাকে বরং খরচ-পত্র দিয়া সহর হইতে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। বর্ত্তমান সমস্ত ইউনান প্রদেশের মধ্যে ইউনানফু সহরে ছাই-অ বা ছাই তু-তু (জেনেরাল ছাই) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তা, তাঁহার নিম্নে লি-কেন-ইয়ে এবং তন্নিম্নে চাং-ওয়েন-কোয়ান। জেনেরাল লি-কেন-ইয়ে ইউনানফু হইতে প্রায় দুই সহস্র পদাতিক সৈন্য, তোপখানা ও কলের কামান ও দ্রুত আওয়াজকারী তোপ সহ যাত্রা করিয়া পথে এক একটী সহরে কিছুদিন অবস্থান করিয়া নূতন নিয়মানুসারে তথাকার শাসনকার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিয়া তথা হইতে অপর সহরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং এই প্রকারে ক্রমে প্রায় দুই-মাসে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহার সৈন্যের নূতন ধরণের পরিচ্ছদ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং সৈন্যগুলি অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত। তিনি নিজে এক মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তথা হইতে শাসনকার্য্যের শৃঙ্খলা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় প্রতিদিনই নানা প্রকার ঘোষণাপত্র জারি হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের শিরশ্ছেদ হইতে লাগিল।

এখানে পৌঁছিবার কিছুদিন পরেই চাং তু-তু কর্ত্তৃক গঠিত সৈন্যসকলকে ইনি ক্রমে জবাব দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় সহস্রাধিক সৈন্যের চাকরি গেল। এদিকে এই সহরে আড়াইশত ভলাণ্টিয়ার নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকেও বরখাস্ত করিলেন। চাং তু-তুর লোক বরখাস্ত হইয়াছে বলিয়া তিনি বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারেন মনে করিয়া তাঁহার ইয়ামিন হইতে সমস্ত রাইফল, বন্দুক, ও গোলা বারুদ প্রভৃতি সরাইয়া লইয়া নিজের বাসস্থানে লইয়া গেলেন। ইহা দ্বারা আরো অসন্তোষ বৃদ্ধি হইল। ইনি দুইদিন প্রসিদ্ধ ক্রুপ কামানের (Krupp gun) ও কলের কামানের চাঁদমারি করিয়া প্রজাবর্গকে, স্কুলের ছাত্রদিগকে ও সমস্ত সৈন্যকে দেখাইয়া দিলেন। আমরাও দেখিতে গিয়াছিলাম। চাঁদমারি গড়পড়তা মন্দ হয় নাই। ক্রুপ কামানের গোলা প্রত্যক্ষ ভাবে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে নাই। কিন্তু গোলা ফাটিয়া তাহার শেলগুলি দ্বারা চাঁদমারির লক্ষ্য অনেকটা ভেদ হইয়াছিল। কলের কামানের প্রত্যেক একহাজার গুলির মধ্যে গড়ে আড়াই শত গুলি চাঁদমারির লক্ষ্যভেদ করিয়াছিল। বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। টেঙ্গিয়েতে এদৃশ্য এই প্রথম। এই-

সকল কামান জার্ম্মানির তৈয়ারি। তবে সাধারণ কামান এখন হুপে সহরে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলের কামান এখনও ইহারা প্রস্তুত করিতে পারে নাই।

জেনেরাল লি-কেন-ইয়ে এখানকার সহর রক্ষার বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। সহরের মোড়ে মোড়ে অস্ত্রধারী পুলিশের আড্ডা হইয়াছে। আপন আপন হাতার মধ্যে রাইফলধারী পুলিশসৈন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পূর্ব্বে কখনও এমন ছিল না। সকলে আশঙ্কা করিয়াছিল যে, লি-কেন-ইয়ের সৈন্য এস্থান পরিত্যাগ করিলে দুর্ব্বৃত্তগণ সহর লুট করিবে। কিন্তু এই পুলিশের বন্দোবস্ত করার জন্য ঐপ্রকার ঘটনা ঘটিতে পারে নাই। আজ একমাস হইল ইনি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইউননাফু গমন করিয়াছেন।

ইউনানফুর ছাই তু-তুর সঙ্গে ইউন-সী-খাই বা সুন-ইয়েট-সেনের দেশশাসন সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে পরামর্শ হইতেছে ও তদনুসারে কার্য্য চলিতেছে।

লি-কেন-ইয়ের সঙ্গে টাওটাই আসেন। তিনি আসিলে কাষ্টম কমিশনার পুনবায় এখানে আফিস খোলেন।

টেঙ্গিয়ে, চীন। শ্রীরামলাল সরকার।

তারহীন টেলিফোন্

গত দশ বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানজগতে অনেক নূতন তত্ত্ব ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহার মধ্যে তারহীন টেলিগ্রাফ, তারহীন টেলিফোন্ এবং ব্যোমযান সর্ব্বপ্রধান। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তারহীন টেলিগ্রাফের অন্যতম উদ্ভাবক, কিন্তু আমরা অধীন জাতি বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে ঐ আবিষ্কার সম্বন্ধে গ্রন্থাদিতে বসু মহাশয়ের নাম বড় বেশী উল্লিখিত দেখা যায় না। মার্কনি প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ উহার সমস্ত কৃতিত্ব আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন।

ব্যোমযান প্রভৃতি আকাশ-তরণীর উন্নতি ও পরীক্ষা-গবেষণা ভারতে আইন দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে। ভারতের বাহিরে ভারতসন্তান দু চার জন উহার সংশ্রবে নানা



তারহীন টেলিফোনের আবিষ্কর্ত্তা মিঃ কলিন্স, শিয়াটল্ A. Y. P. প্রদর্শনীতে বসিয়া যন্ত্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি প্রদর্শনীতে স্বর্ণ পদক পাইয়াছেন।

প্রকার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, সময়ে উহার কিছু ফল ফলিতে পারে। ব্যোমযানের ক্রমশঃ উন্নতি ও অত্যধিক প্রচলনে বর্ত্তমান "সভ্য ও খৃষ্টান" জগতে কিরূপ ফল ফলিবে তা তুর্ক-ইটালী যুদ্ধে বেশ দেখা যাইতেছে। ইটালী ব্যোমযানের সামরিক ব্যবহারে তুর্কসৈন্যকে কিরূপ বিপর্য্যস্ত করিতেছে তাহা সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। "রামায়ণে," "ইলিয়দে" যাহা শুধু বর্ণনায় মানব-কল্পনায় আবদ্ধ ছিল—বিজ্ঞানের বাস্তব ক্ষেত্রে আজ তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে।

তারহীন টেলিফোন্ উপরোক্ত দুই আবিষ্কার হইতেও আধুনিক। ক্ষণপ্রভা সৌদামিনী এখন তার-বাহন ব্যতিরেকে নগরের গৃহে গৃহে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী বার্ত্তাবাহিনী দূতীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

মার্কিনের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এ, ফ্রেডেরিক কলিন্স (A. Frederick Collins) তিনটী বিভিন্ন প্রণালীতে তারহীন-টেলিফোন কর্ম্মোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বহু গবেষণায় স্থির করিয়াছেন যে উহার প্রত্যেকটীরই বিশেষ ক্ষেত্র, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সম্পূর্ণ নির্ভর-উপযোগী হইয়াছে। বস্তুতঃ উহার উন্নতি এত দ্রুত সাধিত হইতেছে যে আমার এই প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অথবা সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটী বিভিন্ন প্রণালী যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।



ভারতহিতৈষী প্রজাবন্ধু উইলিয়ম জেনিংস ব্রায়ান কলিঙ্গের কলে কথা বলিতেছেন।

মিঃ ফ্রেডেরিকের তারহীন-টেলিফোন্-যন্ত্রের সহায়তায় যে-কোন আকারের বাড়ীর কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে, নগরের এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে বার্ত্তা প্রেরণ করা যাইতেছে। প্রাচীরের সংখ্যা, ব্যবধানের প্রশস্ততা উহার বাধা জন্মাইতে পারে না। পূর্ব্বে টেলিফোন্ করিতে হইলে তার ও স্তম্ভশ্রেণীর রীতিমত যোগাযোগ রাখা আবশ্যক হইত, এক্ষণে আর উহাদের প্রয়োজন হয় না। দুই গৃহে দুইটা "গ্রাহক" ও "প্রেরক" সংযুক্তযন্ত্র (Receiver and Remitter Composite) থাকিলেই হইল। তারযুক্ত টেলিফোনের যন্ত্রের ভিতর দিয়া কথা-বার্ত্তা বলিতে ও শুনিতে যে যে প্রক্রিয়া করা আবশ্যক তারহীনেরও প্রায় তাই আবশ্যক। তার না থাকায় কোন অসুবিধার কারণ হয় নাই।

সুবিধা ও অসুবিধা। তারহীন টেলিফোন্ কাজে আসিবে না এরূপ অবস্থা খুবই কম। পরন্তু তারযুক্ত টেলিফোন্ অপেক্ষাও ইহার সুবিধার দিক আছে। গিরি, নদী, বন জঙ্গল বা অন্যবিধ প্রাকৃতিক বাধা বিঘ্নে যেখানে সর্ব্বজন-জ্ঞাত সাধারণ তারযুক্ত টেলিফোন্-স্তম্ভ ও তার প্রভৃতি স্থাপন করা কষ্টসাধ্য অথবা অসম্ভব সেখানেও তারহীন টেলিফোন্ অশেষভাবে কার্য্যকর হইবে।

ফেরী-জাহাজ নৌকা প্রভৃতি নদী হ্রদ বা সমুদ্রবক্ষ হইতেই তীরের আফিস হইতে আদেশ উপদেশ লইয়া যথাবশ্যক পথে যাইতে পারিবে।

পরস্পর সম্মুখীন দুই জাহাজের "পাইলট্" মাঝিকে আর উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া অথবা স্বর-প্রসারক "মেগাফোন্" সাহায্যে পরস্পরের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিয়া রিপোর্টের ভয়ে ভীত হইতে হইবে না। মৃদুস্বরেই কার্য্যোদ্ধার হইবে।

তারহীন টেলিফোনে জাহাজ নৌকা প্রভৃতির "সিগন্যাল্" দিবারও এক উন্নত প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। গাঢ়কুয়াসাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাবৃত ঝড়বাত্যায় বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষে অথবা নদীতে ইহার ক্রিয়ার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। উহার ফলে কত সংঘর্ষণ আপদ বিপদ হইতে তরণী রক্ষা পাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃতপক্ষে উহা নাবিকগণের অশেষ উপকারে লাগিবে। টাইটানিক্ পোতের ধ্বংস ও উহার ভয়াবহ পরিণাম সভ্যজগতে কি হুলস্থুল বাধাইয়াছে, তারহীনের উপকারিতা আজ সকলে বুঝিতেছে। আজকাল প্রচলিত প্রণালীতে যখন কোন বার্ত্তা প্রেরণ করা হয়, তখন তাড়িৎপ্রবাহী তারকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রবাহিত (charged) করিতে হয়। ঐরূপ করিবার সময় তারে একপ্রকার তরঙ্গ-বিকম্পন উপস্থিত হয়। টেলিফোনের যে-কোন শব্দগ্রাহক (Receiver) কানের সঙ্গে ধরিলেই ঐ কম্পনের শাঁ শাঁ শব্দ শোনা যায়। কিন্তু কথাগুলি বেশ সুস্পষ্ট ও সুসংলগ্ন ভাবে উচ্চারিত হইলেও তারের বৈদ্যুতিক তরঙ্গকম্পে উহা যতই দূরে নীত ও প্রতি-ধ্বনিত হয় ততই উহা ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু তারহীন টেলিফোনে আমাদের স্বরতরঙ্গকে আকাশঝঙ্কারে একবার ঠিকভাবে মিশাইয়া দিতে পারিলেই উহা বিশুদ্ধ ও অবিকৃতভাবে বহুদূরেও পৌছিতে পারে। ইহার একটী কারণ, যখন আকাশের (ইথারের) মধ্যস্থতায় কোন বার্ত্তা পাঠান হয় তখন আর চিরতড়িৎপূর্ণ

আকাশকে কৃত্রিমভাবে "চপল" করিতে হয় না। সে নিজেই চিরচঞ্চল।

ইহা হইতে দেখা যায় তারহীন টেলিফোন "সস্তার" হইতেও স্বাভাবিক। ঝুটো অপেক্ষা সাচ্চা ত চিরকালই প্রকৃষ্ট পন্থা—তা আবার বিজ্ঞানরাজ্যে। তারহীনের অনুষ্ঠানও স্বল্পব্যয়সাধ্য। উহার জন্য তাম্র-তার, মূল্যবান শালের খুঁটি অথবা লৌহস্তম্ভ দরকার নাই; একটু ঝড়ঝটিকায় মেরামতের জন্য ব্যয় আবশ্যক নাই। অনন্ত নীল আকাশ উহার স্তম্ভ; চপলা বিদ্যুৎ নিজেই উহার দূতী, চাই শুধু তাহার আবির্ভাবের পীঠ-রূপী শব্দগ্রাহক ও শব্দপ্রেরক যন্ত্র। আর একটা সুবিধা প্রথমে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সে হচ্চে ফ্রেডেরিকের এই তারহীন যন্ত্রের সহিত যে-কোন সাধারণ সস্তার টেলিফোন-যন্ত্রের সংযোগ-সম্ভাবনা। শুধু সাধারণ টেলিফোন-যন্ত্র কেন সাধারণ টেলিগ্রাফ (long distance line) অথবা তারহীন টেলিগ্রাফের আফিসের সহিতও ইহাকে সংযুক্ত করা চলে। এইরূপে আমরা শিয়াটলে ওয়াশিংটন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই "লেবরেটারীতে" বসিয়া প্রশান্ত-সাগরের যে-কোন জাহাজের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারি;—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে প্রবাসী আফিস্ হইতে যে-কেহ জাপানযাত্রী জাহাজের সহিত পিনাংবন্দর পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা বলিতে পারিবেন। তা যদি প্রবাসী আফিসে তারহীন-টেলিগ্রাফ-যন্ত্র না থাকে তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,—থাকা চাই ফ্রেডেরিকের তারহীন টেলিফোন যন্ত্র। প্রবাসী আফিসকে তারযুক্ত টেলিগ্রাফে অথবা "তারহীনে" রেঙ্গুনকে ডাকিতে হইবে। রেঙ্গুন তারহীন দ্বারা আণ্ডামানকে ডাকিবে, আণ্ডামান অনায়াসে "জাপান" জাহাজকে সংযুক্ত করিতে পারিবে। তার ফলে, যে স্বর ইতঃপূর্ব্বেই এতদূর অতিক্রম করিয়াছে—ইথারবাহনে অনন্ত শূন্যপথে তাহাই প্রশান্ত-সাগরের উপকূলে পৌঁছিবে।

তারহীন টেলিফোন সম্বন্ধে মোটামুটী একটা ধারণা যাহাতে ভালভাবে জন্মিতে পারে সেজন্য উহার উদ্ভাবক মিঃ ফ্রেডেরিক্ কলিন্সের নিজের কথার সার-সংগ্রহ দিতেছি।

"তারহীন টেলিফোন্ আমার জীবদ্দশায় (এখন তিনি ৩০ বৎসর বয়স্ক) তারযুক্ত টেলিফোনকে বোধ হয় স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না। কিন্তু আমার গত দশ বৎসরের চিন্তা অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে আমি এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি, জগৎ এত দ্রুত উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইতেছে যে, বিজ্ঞান যা-কিছু নূতনতর বার্ত্তা-আদান-প্রদানের উপায় করিয়াছে ও করিতে সমর্থ হইবে উহার প্রত্যেকটারই এখানে প্রভূত আবশ্যক আছে। * * * যেখানে সস্তার টেলিফোন্ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব সেখানে ত তারহীনের আবশ্যক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। উহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর কোন ক্ষতি না হইয়া বরং জগতের অশেষ উপকার সাধিত হইবে।

" * * দুর্গম গিরিশৃঙ্গ, ভীষণ বন, অগম্য উপত্যকা, ধরণীর গভীরতম অঙ্কে খনি প্রভৃতি যখন প্রাকৃতিক দুর্গমতায় অথবা দৈব দুর্ঘটনায় বহির্জগৎ হইতে বিযুক্ত হইয়া যায়—সেই দুঃসময়ে এই তারহীন আকাশ-পথগামী বার্ত্তাবাহক ফোন্‌যন্ত্রের সাহায্যে বার্ত্তা আদানপ্রদানে সমর্থ হইবে। উহাতে শত শত মানবের অনন্ত উপকার সাধিত হইবে। উহাতেই তারহীনের উদ্ভাবনা, অন্ততঃ আমার নিকট, সার্থক হইবে। (Technical World Magazine, Oct. 11)।

আমি এ প্রবন্ধে বিজ্ঞানরাজ্যের যে অচিন্তিত আবিষ্কারের উপর-উপর আলোচনা করিলাম উহা অতি অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক। শক্তিতে ও ধারণায় উহা অতিবিশ্বাসী ও বিজ্ঞানরাজ্যের পরিচিত ভিন্ন আর সকলের নিকট আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত বোধ হইবে। কিন্তু উহা অনন্ত শক্তিশালিনী অসীম রহস্যময়ী প্রকৃতির একটু কণিকা মাত্র। বিজ্ঞান উহা আয়ত্ত করিয়া মানবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছে। নিখিলবিশ্বের এই শক্তি আয়ত্ত করার উপর—প্রাকৃতিক শক্তিজয়ের পরিমাণের উপর বর্ত্তমান সভ্যজগতের কর্ম্মক্ষমতা ও অধিকারসীমা নির্ভর করিতেছে। পতিত জাতির ঐ সাধনার আবশ্যক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মার্কিন জ্ঞানময় শিক্ষাক্ষেত্র ও সাধনার অনন্ত সুযোগ লইয়া কর্ম্মীকে আহ্বান করিতেছে—নবীন ভারত কি সে আহ্বান শুনিবে না?

আমেরিকা। শ্রীযোগেশ মিশ্র।

ভারতীয় বিমান-নাবিক

(মডার্ণ রিভিউ হইতে)

আজিকার নব নব আবিষ্কারের যুগে, মানুষ যখন প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্তাধীন করিয়া লইতেছে, তখন ভারতবর্ষের অবস্থা স্মরণ করিলে বড়ই পরিতাপ হয়। মার্কনি তারহীন টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করিয়া বর্ত্তমান ইতালির নাম চিরদিনের জন্য খ্যাতিমণ্ডিত করিয়াছেন,

অথচ তাহার প্রথম উদ্ভাবনা ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর মস্তিষ্কেও উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এবং কাপ্তেন্ আমাণ্ডসেন্ দক্ষিণমেরু আবিষ্কার দ্বারা নরওয়েকে যশের উচ্চ-শিখরে উত্থিত করিয়াছেন। আকাশভ্রমণ ফ্রান্সের পতাকা উড়াইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু হায়! ভারতের দিকে চাহিয়া আমরা কি দেখিতে পাই?—সেখানে দেখি কেবল অবসাদের বন্যা, গভীর নিস্তব্ধতা, লজ্জাকর বিশ্রাম, একটা শোকাবহ শান্তি; যেন আমরা ধ্বংসের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি! অবশ্য নানা কারণবশতঃ এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে আমাদের শৈথিল্য, আমাদের নিশ্চেষ্টতা, আমাদের ইচ্ছাকৃত অবহেলা। অতীতকালে আমরা কি করিয়াছি তাহা ভাবিতে ভাবিতে, নির্ব্বিকারচিত্তে আমাদের লুপ্তগৌরবের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমরা এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, যেথান হইতে এক পদ অগ্রে বা পশ্চাতে আমাদের অস্তিত্ব থাকা না-থাকা নিরূপণ করিবে।

জাতির জীবনে এমন একটা গুরুতর সময় আসে যখন উহা দ্বিগুণিত তেজে জাগিয়া উঠিয়া নির্ম্মাণের কাজে লাগিয়া যায়; তখন উহা কোনো এক চরম উদ্দেশ্যের জন্য, কোনো এক বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য, সম্মুখে এক আদর্শ স্থাপিত করিয়া স্বকীয় চেষ্টায় সকল ত্রুটি পরিহার করিয়া আপনাকে উন্নীত করে, আপনাকে গড়িয়া তুলে। ইতিহাসে এরূপ সময় সংস্কারের যুগ বলিয়া বিশেষভাবে কথিত; উৎকট অবস্থায় ইহাকে বিপ্লব বলে। এরূপ সময়ে জাতির সমবেত শক্তি সাবধানতার সহিত হিতকর উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক, এবং যাহাদিগের হস্তে জাতির ভাগ্য নিহিত, তাহাদের প্রতি পদে বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইয়া জাতিকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া উচিত। ইহাই উদ্বোধনের যুগ, যাহার প্রথম স্ফুলিঙ্গ অধুনা চীন, পারস্য, তুরস্ক ও জাপানে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও লজ্জাকর নিরর্থক সামাজিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষ কি কেবল শোকের দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে? ভারতবর্ষের কখনই এরূপ



শ্রীযুক্ত সেট্টি, প্রথম ভারতীয় বিমান-নাবিক।

অবস্থা হইতে পারে না। হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হইবে; কেবল যদি সে একবার জাগিয়া উঠিয়া সময়ের সহিত চলিতে আরম্ভ করে। একটি ঘটনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ভারতীয়েরাও সময়ের সহিত চলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে একজন বিমান নাবিক উত্থিত হইয়াছেন। তিনি বিমান নক্সা করিতে, তৈয়ারি করিতে এবং উহা চড়িয়া ব্যোমপথে বিচরণ করিতে সক্ষম তিনি একজন পাকা বিমান-নাবিক।

পাশ্চাত্যদেশের নূতনতম অনুষ্ঠান হইতেছে উড্ডয়ন-বিজ্ঞান; ইহারই উন্নতিবিধানের জন্য বৈজ্ঞানিক জগতের সমবেত চেষ্টা ব্যয়িত হইতেছে; তাহার ফলে অল্পকালের মধ্যে লোকে সমুদ্রে যেমন বিচরণ করে আকাশেও তদ্রূপ সহজেই বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে। অনতিবিলম্বে



ব্রুকল্যাণ্ড উড্ডয়নক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সেট্টি ও তাঁহার "অ্যাভ্রো" বাইপ্লেন বিমান।

আমাদের পুরাণ ও শাস্ত্রকথিত বিমান শূন্যমার্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে, ও পক্ষীরাজ ঈগলের সহিত ব্যোমচারী মানবের দ্বন্দ্বের আর বিরাম থাকিবে না।

শ্রীযুক্ত স. ভ. সেট্টি, বি-এ, এ-ম, আই-ই-ই, মহীশূরের পূর্ত্তবিভাগের সহকারী ইঞ্জিনীয়ার। তাঁহার প্রধান, শ্রীযুক্ত এ. ভি. রো সাহেবের সহিত একত্রে তিনি একটি "অ্যাভ্রো" 'বাইপ্লেনের' কল্পনা করেন। অঙ্কনকার্য্য সম্পূর্ণরূপে শ্রীযুক্ত সেট্টি করিয়াছিলেন। এই বাইপ্লেনে আরোহণ করিয়াই শ্রীযুক্ত সেট্টি আকাশে উঠিয়াছিলেন। ইহা আমাদের কম আনন্দের কথা নহে। এই আদর্শ-যন্ত্রটি বিখ্যাত অষ্ট্রেলীয় বিমান-নাবিক জে. ডিয়াগোন সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তিনি সেট্টি মহোদয়কে যন্ত্রনির্ম্মাণের জন্য প্রশংসা করিয়া অবিলম্বে উহা ক্রয় করেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাইপ্লেনগুলির মধ্যে একটি একজন ভারতীয়ের অঙ্কিত, এবং উহার চালন-চক্রটি তাঁহার কল্পিত, ইহা ভারতীয় ধীশক্তির বিশেষ গৌরবের কথা। নিম্নলিখিত বর্ণনাপাঠে বাইপ্লেনটি কতবড়, তাহা পাঠকপাঠিকার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

প্রসার ৩০ ফুট

'কর্ড্'—৪ ফুট ৬ ইঃ

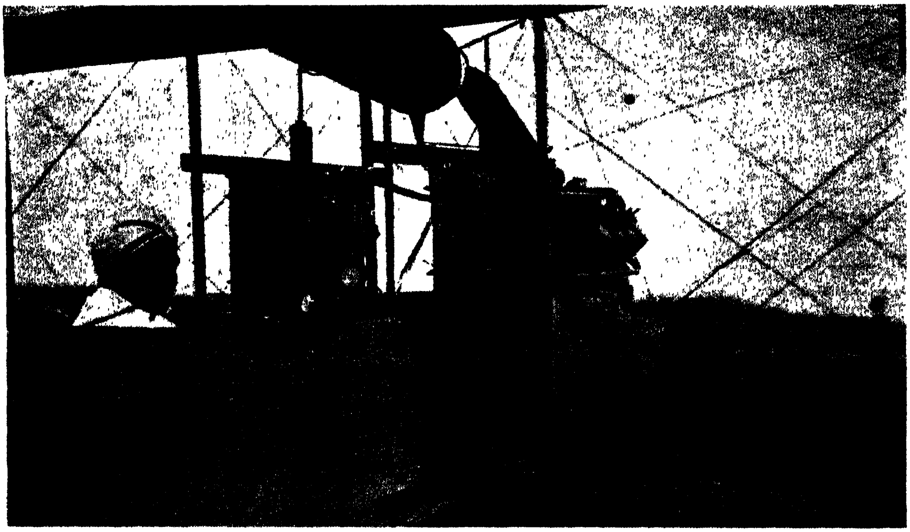
ওজন আরোহী ব্যতিরেকে প্রায় আটশত পাউণ্ড্ বা দশ মণ। ইহাতে ত্রিশ অশ্বের শক্তিযুক্ত ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয় ও বেগ ঘণ্টায় ৪৫—৫০ মাইল।

সেট্টি মহোদয় অধুনা একটি নূতন ধরণের বাইপ্লেনের কল্পনা করিতেছেন, কয়েকমাসের মধ্যেই উহার সম্পূর্ণ নক্সা প্রকাশিত হইবে।

ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে সেট্টি মহোদয় একাগ্রচিত্তে তিন বৎসরের অধিককাল শিক্ষালাভ করিয়া সেখান হইতে সার্টিফিকেট পাইয়াছেন।

ব্রুক্ল্যাণ্ডের উড়িবার ক্ষেত্র, যেখানে সেট্টি মহোদয় উড়িয়াছিলেন, লণ্ডন হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। ক্ষেত্রটি আদর্শস্থানীয় ও বিশেষ কষ্টকর, এখানে উড্ডয়ন-প্রয়াসীকে তাহার সমস্ত দক্ষতা প্রয়োগ করিতে হয়। ক্ষেত্রটির পরিধি তিন মাইল;—একটি নদী, রেলের রাস্তা ও কারখানা-ঘর দ্বারা বেষ্টিত। নামিবার সময় বিমান-নাবিককে বিশেষ সতর্কতার সহিত এইসকল স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক পরিহার করিতে হয়। যাঁহারা একদেশ হইতে অন্যদেশে উড্ডয়নপ্রয়াসী তাঁহাদের পক্ষে এটি উপযুক্ত শিক্ষাস্থল। সেট্টি মহোদয় বহুবার বিপদের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

এই ভারতবর্ষের প্রথম, এবং প্রাচ্যদেশের অত্যল্পসংখ্যক বিমান-নাবিকের অন্যতম বিমাননাবিক সেট্টি মহোদয়ের



শ্রীযুক্ত সেটি তাঁহার 'অ্যাভ্রো" বাইপ্লেনে উড্ডয়নের উপক্রম করিতেছেন।



শ্রীযুক্ত সেটি সাবধানে আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার বিমানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

জীবন ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এস্থলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি রুড়্কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেখানকার পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মহীশূরে কর্ম্মগ্রহণ করেন ও সেখানকার সহকারী ইঞ্জিনীয়ার হন। স্বভাবতই তিনি উড্ডয়ন-বিজ্ঞানের প্রতি আশক্ত ছিলেন, তাই ইংলণ্ডে গিয়া উহাই শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রভূত যত্ন ও শ্রমসহকারে পাঠ ও অভ্যাসের দ্বারা তিনি উড্ডয়নবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসা করা হইলে এই অদম্য পুরুষ উত্তর করিলেন, "আমার ভবিষ্যৎ! বিমান-নাবিক! আর কিছু নয়। আমি আমার দেশবাসীদের মধ্যে উড্ডয়নের বার্ত্তা প্রচার করিব; যাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন ও করিতেন।" তিনি একজন বলিষ্ঠ, সাহসী ও মেধাবী

যুবক। অর্থ পাইলে আধুনিক 'মনোপ্লেন,' 'বাইপ্লেন,' এমন কি 'হাইড্রোপ্লেন' পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ, এরূপ তিনি ভরসা করেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়বিশ্বাসী; তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও ভ্রম হইবার জো নাই।

শতাব্দীব্যাপী নিশ্চেষ্টতার পর যে-নব্যভারত উত্থিত হইতেছেন, তাঁহারা যদি এই যুবককে আদর্শরূপে স্থাপন করিয়া, তাঁহার সাহস ও বিপদসঙ্কুল বিজ্ঞানের প্রতি— যাহাতে কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা এমন নয়, প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে—অবিচলিত অনুরাগদর্শনে উৎসাহিত হন, তবে তাহা ভারতের পক্ষে শুভকর হইবে। বৃথায় কেবলি উকীল-ব্যারিষ্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া এইরূপ বিজ্ঞানপথের পথিক হওয়াই আমাদের যুবকদের কর্ত্তব্য। তাঁহাদেরই উপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসা নির্ভর করিতেছে; মানবজাতির এক-পঞ্চমাংশের মুক্তি প্রধানত তাঁহাদেরই অধ্যবসায় ও উৎসাহের উপর নির্ভর করিতেছে; ভারতের সম্প্রসারণ, এক নবজাতির উদ্বোধন তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি সাহস ও কর্ম্মকুশলতার দ্বারাই ঘটিতে পারে।

বিধির কি বিড়ম্বনা, আধুনিক ভারত জগৎকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের কিছুই দিতে পারে না। কিন্তু যদি স্বদেশপ্রেমিক যুবকেরা একাগ্রচিত্তে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হন ও শ্রমসহকারে বৈজ্ঞানিক ভারতের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ বৈজ্ঞানিক জগৎকে তাহার অংশ যোগাইতে পারে। বিজ্ঞানাকাশে কয়েকটিমাত্রও ভারতীয় তারকা কিরণ দিতে থাকিলে সভ্য মানবের চক্ষে ভারতবর্ষ অনেক উন্নত হইয়া যাইবে, ও এই বিজ্ঞানোন্নতির গৌরবে আমাদের অন্যান্য নানা ত্রুটি ঢাকা পড়িবে।

কিছুদিন গত হইল বোম্বাই সহরে, দুইটি পারসী মহিলা 'এইরোপ্লেনে' আকাশে উঠিয়াছিলেন। 'এইরোপ্লেনে' কত লোক প্রাণ হারাইয়াছেন ও হারাইতেছেন, ইহা সত্ত্বেও যে আমাদের দেশের দুইজন নারী এরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন ইহাতে আমরা বিশেষ আনন্দ ও গৌরব বোধ করিতেছি।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষাশেষে

বর্ষাশেষের ছত্রভঙ্গ
মেঘের অঙ্গ রাঙিয়ে ভোরে
সূর্য্য ছিল পাহাড়গুলোর পিছনে,
দাঁড়িয়ে ছিল বনস্থলী
আলোকিত পুরীর দোরে
ঘন পাতার কাতার-বাঁধা বিজনে;
স্বর্ণ মেঘের পর্ণগুলির
সুরঞ্জিত স্তরের মাঝে
উদ্ভাসিত গাঢ় নীলের স্নিগ্ধতা;
শ্যামল বনের কোমলতায়
তরঙ্গিত ভাঁজে ভাঁজে
উৎসরিল হিরণ্ময়ী দীপ্ত-ভা।
দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে মেয়ে
নদীকূলের বালির চড়ায়
উজল্ চোখে কিরণ প্রতিবিম্বিত;
কুচ্‌কুচে সেই কাল গায়ে
আলো এসে হেসে গড়ায়,
মুক্তকেশে বায়ু মৃদু কম্পিত।
নৌকাখানির পরে আমি—
বালির বাঁধের তীরে তীরে,
পড়েছিলাম প্রাণের পাখা ছড়িয়ে;
ভেসে গেলাম দূরে দূরে
বাঁকে বাঁকে ঘুরে ফিরে
পাখার পালক আলোকেতে জড়িয়ে।

* * *

কোথায় গেল আলোর ঝরা
মোহের শীকর ছিটিয়ে দিয়ে,
ফুটিয়ে হাসি সরল চারু নয়নে?
কোথায় গেল ভোরের বাতাস
ফুল্ল লঘু গন্ধ নিয়ে
স্বপ্ন-তরুর নব কুসুম চয়নে?
দাঁড়ের ঘায়ে, কাল জলের
উচ্ছ্বসিত অঙ্গ পরে
দীপ্তি তোলে শিখা-বাঁধা ধোঁয়াটি;

চম্‌কে ওঠে আলোর কণা
মনের বিজন ছায়াস্তরে,
আঁধার বনে যেন হাজার জোনাকি।

*   *   *

আবার কবে প্রভাত হবে,
সুপ্তি-সিন্ধুর স্তব্ধ নীরে
জাগরণের অরুণ-কিরণ বিম্বিয়া ?
এই তটিনীর সেই কাননের
ওই আকাশের তীরে তীরে
ঝরবে আলো শ্যামলতা চুম্বিয়া ?
এই জীবনের সেই নয়নের
ওই ভুবনের উপর দিয়ে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আসবে বয়ে মাধুরী ?
জমাট-বাঁধা দৃঢ় অটল
মৃত্যু-শিলা উজলিয়ে
জাগরণে জাগবে জাদুর চাতুরী ?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ঋণ শোধ

(জাপানী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

অদৃষ্টের ফেরে কিউসুকিকে দাস্যবৃত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সে যে নিতান্ত গরীবের ছেলে ছিল তাহা নহে ;—তাহার বাপ এমন সংস্থান রাখিয়া গিয়াছিলেন যে চাকরি না করিলেও তাহার দিন চলিত ; কিন্তু সে যখন খুবই ছোটো তখন বাপের মৃত্যু হওয়াতে তাহার দাদার হাতে বিষয় আসিয়া পড়ে ;—দাদা সেই বিষয় দুইদিনে ফুঁকিয়া দেয়—তাহার বদ্‌খেয়ালিতে বিষয়পত্র সমস্ত বিক্রয় হইয়া শেষে বসতবাড়ি পর্য্যন্ত বাঁধা পড়ে। তাহাতেও তাহার দাদার চোখ খোলে নাই। উচ্ছৃঙ্খলতার নেশা তাহাকে এমনি পাইয়া বসিয়াছিল যে শেষে চুরিচামারি করিয়া তাহাকে সখ মিটাইতে হইত। চুরি করিয়া তো সমাজে বাস করা পোষায় না,—কাজেই জেল হইতে মুক্তি পাইয়া সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহা কেহই জানিল না। গ্রামের সকলে তাহাতে নিশ্চিন্ত হইল ; তাহারা বলিতে লাগিল—আঃ আপদ গেছে ! কিন্তু মায়ের প্রাণে যে কি হইতে লাগিল তাহা মাই জানেন ! তিনি দিন,-রাত ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এখন সমস্ত সংসারের ভার একা কিউসুকির উপরে। সে ছেলেমানুষ, যেন অকূল পাথারে পড়িল ;—দু বেলা দু মুঠা খাওয়ার কথা দূরে থাকুক, মাথা গুঁজিবার ঠাঁইটি পর্য্যন্ত নাই। কাজেই তাহাকে চাকরির চেষ্টা করিতে হইল। অনেক কষ্টের পর দূর গ্রামে একটা চাকরি জুটিল। সে মা ও বোনটিকে দেশে রাখিয়া চাকরি-স্থানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার মা তাহার হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন—"দেখিস বাবা ! তোর দাদার কথা যেন ভুলে থাকিসনে—আহা বাছা আমার কোথায় আছে !" বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। কিউসুকি মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"কিচ্ছু ভেবোনা মা ! আমি ঠিক দাদাকে তোমার কাছে এনে দেবো।"

কিউসুকি মায়ের কাছে এ কথা বলিয়া আসিল বটে, কিন্তু দাদার খোঁজ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। সে সমস্ত দিন কাজেকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, কখন সে খোঁজ লয়—আর কোথায়ই বা খবর করে ! থাকিয়া থাকিয়া, মাঝে মাঝে, দাদার জন্য মায়ের শোকের কথা তাহার মনে পড়িত—তাহাতে তাহার প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত, কিন্তু কি করিবে ? উপায় নাই ! সে ভাবিত যদি এমন দিন কখনো আসে যে পরের দাস্যবৃত্তি করিতে না হয়, তাহা হইলেই সে দাদার খোঁজ করিতে পারিবে—মায়ের দুঃখ মোচন করিতে পারিবে—নইলে ইহজন্মে নয়।

কিউসুকির মনিব কিউসুকিকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন। আহা ! বড় ঘরের ছেলে দুঃখে পড়িয়া চাকরি করিতে আসিয়াছে এই কথা মনে করিয়া তাঁহার চিত্ত সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিত ;—যাহাতে কিউসুকির ভালো হয় তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। অবসর সময়ে কিউসুকি যেসকল কাজ করিত তাহার জন্য তিনি আলাদা পারিশ্রমিক দিতেন—তাহা ছাড়া বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে অন্যান্য চাকরদের চেয়েও কিউসুকির পাওনাটা

বেশি হইত। এমনি করিয়া মা বোনের খাওয়া-পরা চালাইয়াও কিউসুকির মাসে মাসে কিছু কিছু জমিতে লাগিল।

কিউসুকি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল, এক হাজার টাকা হইলেই তাহার বন্ধকী বাড়ি ও কিছু জমীজমা উদ্ধার হয়। তাহা হইলে আর তাহাকে চাকরি করিতে হয় না;—নিজের জমীর ফসলে তাহাদের দিন এক রকম বেশ কাটিয়া যাইবে। তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া দাদারও সন্ধান করিতে পারিবে। জমীজমা, বাড়ি ও দাদা এ সকলই যদি সে উদ্ধার করিতে পারে তাহা হইলেই তো তাহার জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হয়;—আর কি চাই!

এই হাজার টাকা কেমন করিয়া কতদিনে পূর্ণ হয় কিউসুকির দিবারাত্র সেই ভাবনা। আয় তো বেশি নয়, কাজেই তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া তিলে তিলে সঞ্চয় করিতে হইতেছিল। অন্য লোক হইলে ইহা অসম্ভব বলিয়া ছাড়িয়া দিত,—বলিত,এ বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র সৃষ্টি করা! কিন্তু কিউসুকি অসীম ধৈর্য্যের সহিত এই অসাধ্য সাধনের জন্য পণ করিয়া বসিয়াছিল। এ নইলে যে তাহার চলিবে না!

অনেক অপেক্ষার পর শেষে সেই শুভদিন আসিল। এই মাসের মাহিনাটা পাইলেই তাহার হাজার টাকা পূর্ণ হয়। ক্রমে ক্রমে দেখিতে দেখিতে সে মাসও শেষ হইয়া গেল;—কিউসুকির আনন্দ আর ধরে না—আজ তাহার জীবনের সকল সাধনা সফল হইতে চলিয়াছে!

কিউসুকির সঞ্চয়ের টাকা থাকিত তাহার মনিবের কাছে। ঠিক হাজার টাকা যেদিন পূর্ণ হইল সেইদিন সে মনিবের নিকট বিদায় লইতে গেল। তিনি সকল কথা শুনিয়া বড়ই খুসী হইলেন;—কিউসুকির যে দাসত্বের দিন শেষ হইয়াছে ইহাতে তাঁহার বোধ হইল যে তাঁহার নিজেরও একটা বোঝা যেন নামিয়া গেছে।

কিউসুকি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছে না;—এতদিন ধৈর্য্য ধরিয়া আর তাহার মন একতিল ধৈর্য্য মানিতেছে না। এখনই সে টাকা লইয়া নিজের গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। তাহার মনিব বলিলেন—"আচ্ছা বেশ এখনই তুমি যাও, কিন্তু অত টাকা একসঙ্গে নিয়ে যেও না। পথ তো ভালো নয়—চোর ডাকাতের ভয় আছে। এখন কিছু সঙ্গে নাও—পরে এসে কিছু কিছু করে নিয়ে যেও।"

অপেক্ষা আর সে করিতে পারে না। এতকালই তো সে শুধু অপেক্ষাই করিয়া আসিয়াছে—এখনো অপেক্ষা? সে আর হয় না। কিউসুকি বলিল—"মাপ করবেন—কিছু ভয় নেই—আমি খুব সাবধানে টাকা নিয়ে যাব।" মনিব আর একবার তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিউসুকি কখনো তাঁহার কথা অমান্য করে নাই—তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা তাহার ভালোর জন্যই—সে কথাও সে বুঝিতেছে, কিন্তু তবুও সে মনের অধীরতা আজ কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছে না।

কিউসুকির মনিব তাহাকে সমস্ত টাকাকড়ি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। টাকাগুলি হাতে করিয়া তুলিয়া লইবার সময় কিউসুকির বোধ হইতে লাগিল, সেগুলি যেন তাহার চিরপরিচিত বন্ধু! সবগুলিকেই তাহার মনে আছে—দেখিবামাত্রই সে তাহাদের চিনিতে পারিতেছে!—কোন্‌টির কোন্‌খানে একটু দাগ আছে, কোন্‌টি একটু ঘসা, কোন্‌টি একটু পাতলা, কোন্‌টি চক্‌চকে, কোন্‌টি ম্যাড়মেড়ে তাহা সবই তাহার জানা আছে! এমন কি কোন্ টাকাটি সে প্রভুকন্যার বিবাহের সময় বখসিস্ পাইয়াছে তাহাও সে বলিয়া দিতে পারে! বহুদিন পরে বন্ধুর সহিত দেখা হইলে যেমন আনন্দ হয়, টাকাগুলিকে দেখিয়া কিউসুকির তেমনি আনন্দ হইতে লাগিল!

এই টাকাগুলি খুব সাবধানে বাঁধিয়া লইয়া কিউসুকি সেই রাত্রেই যাত্রা করিল—পর'দন প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা সহিল না। যাইবার সময় তাহার মনিব বলিলেন—"অস্ত্র একখানা সঙ্গে নাও—কি জানি যদি কোনো বিপদ ঘটে!" বলিয়া একখানা ভালো তরোয়াল তিনি তাহার কোমরে বাঁধিয়া দিলেন।

কিউসুকি বাড়ি হইতে বাহির হইল। গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তাহার পরিচিত পথঘাট বাড়িঘর প্রভৃতির নিকট হইতে তাহার মন একে একে বিদায় মাগিয়া লইতে লাগিল,—সে যেন সবাইকেই মনে মনে বলিতেছিল—'ভাই চল্লুম! ভাই চল্লুম!'

আজ তাহার প্রাণ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে;—কেবল একটা বেদনা থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনের মধ্যে বিঁধিতেছিল—মাকে গিয়া সে কী বলিবে! মা তো টাকার প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া নাই—সে বলিয়া আসিয়াছে দাদাকে ফিরাইয়া আনিবে—মা যে সেই পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন! সে ভাবিল, এতদিন মা অপেক্ষা করিয়াছেন, আরো দুটো দিন করুন—আমি দেশে ফিরিয়া সকল ব্যবস্থা করিব।

গ্রাম ছাড়াইয়া একটা প্রকাণ্ড জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহার পথ—সেই পথে সে চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি অনেক হইয়া আসিল—বনের মধ্যে অন্ধকার ক্রমেই জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল;—কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন নাই—গাছগুলার গা হইতে পর্য্যন্ত যেন অন্ধকার ঝরিয়া পড়িতেছে—কোলের মানুষ দেখা যায় না! কিউস্নুকির মন এতই উতলা হইয়া উঠিয়াছে যে কোনো বাধাই তাহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারিতেছে না;—সে সেই অন্ধকার ঠেলিয়া চলিতে লাগিল।

এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে চলিতে চলিতে কখন যে পথ হারাইয়া ফেলিল তাহা সে জানিতেও পারিল না। শেষে যখন বুকের কাছে গাছের ডালপালা আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার চমক ভাঙিল। পথ পাইবার জন্য সে চতুর্দ্দিক হাতড়াইতে লাগিল, কিন্তু পথ কিছুতেই মিলিল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমেই সে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল। অন্ধকারের মধ্যে এদিক ওদিক করিতে গিয়া ক্রমে তাহার সব গোলমাল হইয়া গেল—কোন্ দিক হইতে আসিতেছে, কোন্ দিকে যাইতে হইবে তাহাও ঠিক রাখিতে পারিল না। একবার একটু রাস্তার মতো পায়, আবার জঙ্গলের মধ্যে গিয়া পড়ে! এমনি করিয়া ঘুরিতেছে হঠাৎ একটা খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল;—অন্ধকারের মধ্য হইতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া কে যেন তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কাছে আসিতে কিউস্নুকি দেখিল, এক বন্য শিকারী!

তাহাকে দেখিয়া কিউস্নুকি যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"ওহে, আমায় পথ বলে দিতে পার?"

শিকারী একবার তাহার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, তাহার পর বলিল—"যাবে কোথা?"

কিউস্নুকি নিজের গ্রামের নাম উল্লেখ করিল।

শিকারী তাহাকে খানিকদূর সঙ্গে লইয়া একটা পথের উপর আসিয়া তাহাকে বলিল—"এই সামনের রাস্তা ধরে বরাবর উত্তর মুখে চলে যাও।"

কিউস্নুকি সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল—ক্রমেই শ্রান্তিতে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—পা আর চলে না। এমন সময় দেখিল কিছুদূরে একখানি কুটীর। কুটীরের মধ্য হইতে একটি ক্ষীণ আলোর রেখা বাহিরের ঘন অন্ধকারের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কিউস্নুকি ধীরে ধীরে সেই কুটীর অভিমুখে চলিল। কুটীরের মধ্যে এক রমণী বসিয়া আপন মনে কাপড় সেলাই করিতেছিল। এত রাত্রি, তবু ঘুমাইতে যাইবার দিকে তাহার কোনো লক্ষ্য আছে বলিয়া বোধ হইল না। সে নিবিষ্ট মনে কাজ করিতেছিল। কিউস্নুকি বলিল—"আমি শ্রান্ত পথিক, আজ রাত্রের মতো এখানে একটু স্থান পাবো?"

রমণী বিস্ময়ের সহিত কিউস্নুকির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল—তারপর অধিকতর বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"এত রাত্রে এপথে তুমি কেমন করে এলে!"

কিউস্নুকি বলিল—"আমি বনের মধ্যে পথ হারিয়েছিলুম—এক শিকারী আমায় এই পথ দেখিয়ে দিয়েছে।" বলিয়া সে বসিয়া পড়িল—আর সে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না।

রমণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, কেমন ইতস্তত করিতে লাগিল, শেষে এদিক ওদিক চারিদিক চাহিয়া অবরুদ্ধ স্বরে বলিয়া ফেলিল—"জান এ কোথায় এসেছ?"

কিউস্নুকি অবাক হইয়া রমণীর মুখের দিকে চাহিল, তার পর বলিল—"না! এ কোথা!"

রমণী বলিল—"এ ডাকাতের বাড়ি। যে শিকারী তোমায় পথ বলে দিয়েছে, সে ডাকাত—তারই এই বাড়ি।"

কিউসুকি উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল—"এখন উপায় !"

রমণী বলিল—"উপায় তো কিছু দেখিনা—নিশ্চয় সে তোমার পিছনে আসছে—এখনই এসে পড়বে।"

বলিতে বলিতে বাহিরে কাহার পদ-শব্দ শোনা গেল। রমণী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কিউসুকিকে বলিল—"ওঠ, ওঠ—আর দেরী কোরো না !" বলিয়া তাহাকে সে ঠেলিতে ঠেলিতে কোথায় এক অন্ধকারের মধ্যে বসাইয়া দিল।

শিকারী কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"শিকার কোথায় ?"

রমণী কোনো উত্তর করিল না—বিস্ময়ের ভান করিয়া তাহার দিকে শুধু চাহিয়া রহিল। শিকারী আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"শিকার কই !"

রমণী যেন কিছুই জানেনা এমনি ভাবে বলিল—"শিকার !"

—"হাঁ, হাঁ, শিকার।"

রমণী বিস্ময়ের সহিত বলিল—"কই !"

শিকারী অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া বলিল—"আমি বরাবর তাকে এই পথে আসতে দেখেছি ;—পথেও নেই, ঘরেও নেই, সে কি তবে উবে গেল !"

রমণী শুধু বলিল—"কি জানি !"

শিকারী তখন রাগে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"বুঝেচি এ তোরই কাজ ! এ রোগ তোর সারল না ! বল কোথায় লুকিয়েচিস !" বলিয়া সে সজোরে এক পদাঘাত করিল। রমণী মাটিতে লুটাইয়া পড়িল—তবুও কোনো কথা কহিল না।

রমণীকে নিরুত্তর দেখিয়া শিকারীর রাগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল—ক্রমাগত প্রহার করিতে করিতে তাহাকে যেন আধমরা করিয়া ফেলিল। রমণী তবুও কোনো কথা বলিল না—পড়িয়া পড়িয়া কেবল মার খাইতে লাগিল।

কিউসুকি অস্থির হইয়া উঠিল—আর নিজেকে গোপন রাখা চলেনা—তাহার জন্য এই অবলা নারীকে কী লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতে হইতেছে ! সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"এই আমি !"

শিকারী তখন রমণীকে ছাড়িয়া বাঘের মতো কিউসুকির উপর গিয়া পড়িল। কিউসুকি তখনও এমন শ্রান্ত যে ভালো করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না,—কাজেই সে কোনো রূপ বাধা দিতে পারিল না। দস্যু তাহার সমস্ত অর্থ অতি সহজে কাড়িয়া লইয়া ছিন্ন বস্ত্র পরাইয়া তাহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিল ;—কিউসুকি কোনো বাধা দিলনা বলিয়া তাহাকে প্রাণে মারিবার আবশ্যক বোধ করিল না।

কিউসুকি নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় পথে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার তরোয়ালখানি পর্য্যন্ত দস্যুতে কাড়িয়া লইয়াছে। বন্য পশুর ভয় আছে—কিউসুকি কাতর কণ্ঠে দস্যুকে ডাকিয়া কহিল—"আমার সব নিয়েছ নাও, কেবল তরোয়ালখানি ফিরিয়ে দাও, নইলে বাঘে ভাল্লুকে প্রাণটা নেবে !"

কি-জানি-কেন দস্যুর দয়া হইল। তরোয়ালখানা হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া কিউসুকিকে দিতে গেল—অন্ধকারে সেটা একবার ঝকঝক করিয়া উঠিল। অমনি দস্যু বলিয়া উঠিল—"এখানা একেবারে নতুন দেখচি যে ! রোসো ! এখানা থাক, আর একখানা দিচ্ছি !" বলিয়া সে ঘরের মধ্যে হইতে একখানা পুরাতন তরোয়াল আনিয়া কিউসুকির হাতে দিল।

পর দিন সকালে কিউসুকি ছিন্নবেশে, শুষ্ক মুখে প্রভুর দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লজ্জায় সে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। টাকাগুলা গিয়াছে বলিয়া তাহার মনে দুঃখ হইতেছিল বটে, কিন্তু প্রভুর কথা না শুনিয়াই যে তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে সেইটাই তাহার বুকে বেশি করিয়া বাজিতেছিল—তাহার মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতেছিল।

কিউসুকির মনিব সকালে বাড়ির বাহির হইতে গিয়া যখন দেখিলেন ছিন্ন বস্ত্রে মলিন মুখে হেঁট মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া কিউসুকি, তখন তিনি বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন চোখের সামনে কোন্ যাদুকরের যাদু দেখিতেছেন। যে কিউসুকি কাল রাত্রে বিদায় লইয়া গেছে এ কি সেই ! কিউসুকির অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দুঃখ হইতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি

তাহার হাত ধরিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া গেলেন। তখন কিউস্থকি তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। তিনি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন—একটুও তিরস্কার করিলেন না। কিউস্থকি যেমন গতরাত্রে কাজ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছিল, আজ সকালে আবার তাহাই সুরু করিল,—মধ্য হইতে রাত্রের ব্যাপারটা যেন স্বপ্ন দেখার মতো ঘটিয়া গেল।

দস্যু যে পুরানো তরোয়ালখানা দিয়াছিল তাহা কিউস্থকির ঘরের দেয়ালে টাঙানো থাকিত। সেখানা দেখিলেই তাহার সে রাত্রের কথা মনে পড়িয়া যাইত। সমস্ত দিন কাজকর্ম্মের পর সে যখন শয়ন করিতে আসিত তখন সেই টাকাগুলার শোক প্রতিরাত্রে নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিত—নিরুৎসাহে তাহার মন ভাঙিয়া পড়িত।—আর কি সে বন্ধকী জমাজমা উদ্ধার করিতে পারিবে?—না, দাদাকে খুঁজিয়া আনিয়া মায়ের শোকাশ্রু মুছাইতে পারিবে? তাহার আশা ভরসা সব গিয়াছে! টাকাগুলা যে জন্মের মতো গিয়াছে সে কথা সে ভুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত কিন্তু প্রতিরাত্রে সেই তরোয়ালখানা তাহার মনে সেই দুর্ঘটনার সমস্ত স্মৃতি একে একে জাগাইয়া তুলিত—সমস্ত ব্যাপারটা যেন সে চোখের সামনে দেখিতে পাইত। যখন সেই দস্যু-গৃহের রমণীর কথা মনে পড়িত, তখন তাহার উপর একটা আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় তাহার মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত;—তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কী লাঞ্ছনাই না সে সহ্য করিয়াছে! সে মনে মনে ভাবিত—তাহার এ ঋণ বোধ হয় সে এ জীবনে শোধ করিতে পারিবে না!

শেষে এমন হইয়া উঠিল যে তরোয়ালখানা চোখের সামনে রাখা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সেখানাকে লইয়া সে কি করিবে প্রথমে ভাবিয়া পাইল না;—পরে ঠিক করিল পুরানো জিনিসের দোকানে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিবে। গ্রাম হইতে একটু দূরে একখানা পুরানো জিনিসের দোকান ছিল, একদিন সে তরোয়াল-খানা সেইখানে লইয়া গেল। দোকানী বৃদ্ধ—চোখের জ্যোতি তাহার কমিয়া আসিয়াছে—সে তরোয়ালখানা তুলিয়া চোখের খুব কাছে লইয়া গিয়া তাহার উপর ধীরে ধীরে চোখ বুলাইতে লাগিল—তরোয়ালখানার মাঝামাঝি আসিয়া সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"এ যে বহুমূল্য জিনিস দেখছি!"

কিউস্থকি চুপ করিয়া রহিল। দোকানী আবার বলিল—"এতে বাদশার ছাপ আছে—এর দাম অনেক!"

কিউস্থকি জিজ্ঞাসা করিল—"কত?"

—"দেড় হাজার!"

দেড়হাজার! কিউস্থকি চমকিয়া উঠিল। তাহা হইলে তো তাহার সকল দুঃখের অবসান!

দেড়হাজার টাকা পাইয়া কিউস্থকির মনে অনেক কথা উঠিতে লাগিল। সে যে মনে মনে বলিত, দিন আসিলে সেই দস্যু-গৃহের রমণীর ঋণ সে শোধ করিবে—এখন তাহার মনে হইতে লাগিল—এই ত দিন আসিয়াছে! হাজার টাকা তাহার প্রয়োজন, অতিরিক্ত পাঁচশত টাকা দিয়া সে তো অনায়াসে ঋণ শোধ করিতে পারে। এই পাঁচশ টাকা পাইলে সে হয়ত দস্যুর নিকট হইতে চির-দিনের মতো মুক্তি পাইতে পারিবে—নিশ্চয়ই সে তাহার ক্রীতদাসী! এ কথা সে যতই ভাবিতে লাগিল ততই টাকা দান করিবার ইচ্ছা তাহার প্রবল হইতে লাগিল;—তাহার মনে হইতে লাগিল,—এ না করিলে তাহার পাপের সীমা থাকিবে না।

মনিবের নিকট এক হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়া সে বাহির হইল। সঙ্গে পাঁচশ টাকা। ইচ্ছা ঐ টাকাগুলা রমণীকে দিয়া সে বাড়ির দিকে যাইবে—পথে যে কখানা গ্রাম পড়ে সেগুলা একবার অনুসন্ধান করিয়া যাইবে। তাহার মনে হইতেছিল হয়ত ঐ গ্রাম কখানারই কোনোটার মধ্যে তাহার দাদা আত্মপরিচয় গোপন করিয়া বাস করিতেছে—লজ্জায় নিজের গ্রামে ফিরিতে পারিতেছে না। কিউস্থকির বোধ হইতেছিল, তাহার জীবনে এইবার দুর্দ্দিনের মেঘ কাটিয়া গিয়া সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইতেছে! কেবল একটা সংশয় দাদাকে লইয়া—তাহাকে যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে মায়ের কাছে সে কি বলিয়া দাঁড়াইবে!

এবার সে এমন সময় বাড়ি হইতে বাহির হইল, যাহাতে

দিনের আলো থাকিতেই বনটা পার হইতে পারে। কিন্তু সে যখন দস্যুগৃহে পৌঁছিল, তখন বনের মাথার উপর দিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন;—গাছের ফাঁক দিয়া চারিদিকে সোনালি আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে;—লাল আকাশের প্রান্ত হইতে পাখীরা কুলায়ে ফিরিয়া আসিতেছে—সমস্ত বনটা স্নিগ্ধ আলো ও মৃদু গুঞ্জনে ভরিয়া উঠিয়াছে!

কিউসুকি কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে কাহাকেও ডাকিল না—রমণীকে সে গোপনে টাকা দিতে চাহে—দস্যু জানিলে নিশ্চয় কাড়িয়া লইবে। কিউসুকি অপেক্ষা করিতে লাগিল। দিনের আলো ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল—ছায়ার মতো একটা অন্ধকার কুটীরখানিকে গ্রাস করিতেছিল; পাখীর কলরব থামিয়া গিয়াছে—চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া স্থানটা যেন কেমনতর হইয়া উঠিল। কিউসুকি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। হঠাৎ দেখিল ঘরের মধ্যে একটি ক্ষীণ দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর অপেক্ষা করা চলে না ভাবিয়া সে অতি সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, একটি জীর্ণ মলিন শয্যায় দস্যু স্থির হইয়া পড়িয়া আছে—শিয়রে প্রদীপ জ্বালিয়া রমণী বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া রমণী চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; কিউসুকি তাড়াতাড়ি টাকার তোড়া তাহার হাতের কাছে ধরিয়া বলিল—"এই নাও! সে রাত্রে আমার জন্যে তুমি যা করেচ সে ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।"

টাকা দেখিয়া রমণীর মুখ হইতে একটা বিষাদের ছায়া যেন সরিয়া গেল;—সে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"আজ তুমি আমাদের প্রাণ দিলে! আমরা অনাহারে মারা যাচ্ছিলুম।"

টাকার কথা শুনিয়া দস্যুও তাহার ক্ষীণদেহ তুলিয়া বসিল। কিউসুকি চলিয়া যাইতেছিল। দস্যু তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। কিউসুকি ধীরে ধীরে তাহার শয্যাপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল।

দস্যুর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে;—রুগ্নদেহে অনাহারে সে পলে পলে মরিতেছিল—একটু আগে সে মৃত্যুর ছায়া সম্মুখে দেখিতেছিল—এ বিজন বনের মধ্যে কোথাও এতটুকু আশার আলো ছিল না। তারপর হঠাৎ এ কী! একদিন সে যাহার জীবন লইতে গিয়াছিল, আজ সেই তাহাকে জীবন দিতে আসিয়াছে! সে কিউসুকির হাত দুখানা লইয়া নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল—তাহার চোখের কোণে জল দেখা দিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, কিউসুকিকে বুকের মধ্যে একবার চাপিয়া ধরিয়া হৃদয় শীতল করিয়া লয়! কিন্তু সে পারিল না—অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

কিউসুকি অবাক হইয়া দস্যুর এই হৃদয়োচ্ছ্বাস দেখিতেছিল—তাহারও সমস্ত হৃদয়টা আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল। সে ধীরে ধীরে দস্যুর শয্যার উপর বসিয়া পড়িল। দস্যু আবার তাহার হাতখানা তুলিয়া লইল—অনেক কথা তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু একটা কথাও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

সে ভাবিতেছিল, যাহাদের জন্য সে বিপদকে বিপদ জ্ঞান করে নাই,—যাহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য সে নিজের প্রাণকে মৃত্যুর সম্মুখে রাখিয়া যুঝিয়াছে—তাহার সেই সব অনুচরেরা তাহার এই অসুস্থতার দিনে, তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তাহাকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া চলিয়া গেল, আর যাহাকে সে প্রাণে মারিতে গিয়াছিল সেই আজ কি না তাহার জীবন দান করিতে আসিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয়টা হায় হায় করিতে লাগিল—সে রুদ্ধ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"হতভাগ্য আমি!"

দস্যু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—যেন সে ভিতর হইতে একটু বল সংগ্রহ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। তারপর কিউসুকির মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"আমার মতো পাষণ্ড জগতে নেই—আমি নরাধম!" বলিয়া সে করুণ স্বরে আত্মকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। কিউসুকি স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে রাত্রির অন্ধকার ক্রমেই জমিয়া উঠিতেছিল; বাহিরের বাতাস, গাছের পাতায় পাতায় আছাড় খাইয়া হা হা করিয়া উঠিতেছিল; দস্যু দীর্ঘশ্বাসের মতো অবরুদ্ধ স্বরে নিজের কাহিনী বলিয়া যাইতেছিল! কিউসুকি একমনে শুনিতেছিল,—তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া আসিতেছিল। দস্যু তাহার ছোট ভাই ও মায়ের কথা বলিতে গিয়া কাঁদিয়া যখন ফেলিল, তখন কিউসুকি হঠাৎ চমকিয়া উঠিল,

তারপর দস্যুকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"দাদা! দাদা!"

দস্যু বিস্মিত হইয়া একবার কিউসুকির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর দুই বাহু আকুলভাবে তাহার দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।—ঘরের ক্ষীণ দীপশিখা হঠাৎ যেন কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

ধর্ম্মের ন্যায়, আরব-সমাজও রূপান্তরিত হইল।

আরব-দেশের যাযাবর বেদুইন্ ও নগরবাসী বণিকেরা, কিসে ধনশালী হইবে সেই চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকিত। এই আরবেরা স্বকীয় বিভিন্ন শাখার মধ্যে মৈত্রীবন্ধন করিত, শত্রুর উপর পুরুষানুক্রমে প্রতিশোধ লইত; তাহাদের সামরিক ও দস্যুসুলভ রীতিনীতি ছিল। সাম্যনীতির প্রতি তাহাদের এরূপ অনুরাগ যে, তাহারা পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত একই বংশে কোন সর্দ্দার নির্ব্বাচন করিত না। দুঃখদৈন্য সত্ত্বেও, অর্থগৃধ্নুতা সত্ত্বেও, উহাদের সাড়ম্বর আতিথেয়তা ছিল এবং উহারা মুক্তহস্তে ভিক্ষাদান করিত।

আরও কিছুকাল পরে, সিরিয়া-রাজ্যের অভ্যুদয়। বড় বড় দেশজয়, অতিদ্রুতভাবে দেশজয়, বর্ব্বরগণকর্ত্তৃক অতিদ্রুতভাবে বিজয়ীর সভ্যতাগ্রহণ, সহসা ধনশালী হইয়া উঠায় দরিদ্রদিগের ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বর—এই সমস্তের ফলে নীতি কলুষিত হইল।

বোগ্‌দাদে, আরব-সভ্যতা চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল। সব জানিতে হইবে, সকল বিষয়েই চেষ্টা করিতে হইবে—এইরূপ একটা প্রয়োজন জনসাধারণের মধ্যে অনুভূত হইয়াছিল। লাম্পট্যের বিলাসিতার মধ্যেও একটা শোভন লালিত্য ছিল। যেমন বড়বড় নগর ছিল সেইরূপ সুশোভন বড়বড় প্রাসাদও ছিল। সুন্দর গৃহসজ্জা, জমকালো কাপড়। তাহাদের ভোগসুখের মধ্যেও একটা মার্জ্জিত রুচি ছিল, গুহ্যতন্ত্রের সঙ্গে সংশয়বাদীসুলভ একটা অবজ্ঞার ভাব এবং, বিলাসিতার সঙ্গে, এক প্রকার তাপসসুলভ কঠোরতা ছিল।

তাহার পর অবনতি; বর্ব্বরদিগের আবির্ভাব; তুর্ক বা মোগলদিগের উপদ্রব ও হত্যাকাণ্ড। পরিশেষে, কালিফ্-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর যেসকল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সাধারণ উন্নতির প্রতি বিদ্বেষবশতঃ সেইসকল রাজ্যের অন্তর্গত উর্ব্বর দেশসমূহ আজিকার দিনে মরুভূমিতে পরিণত।

আরবদিগের সমস্ত কার্য্যে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানে, এই ক্রমবিকাশের গতি অনুসরণ করা যাইতে পারে।

রাজ্যশাসন।

কুলপতিশাসনতন্ত্রের যুগে কালিফ্ নির্ব্বাচিত হইত। আর, সেই কালিফ্ই "ইমান," স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তখন সামরিক রাষ্ট্রনীতি প্রবল ছিল। ওমার, মুসলমান-মাত্রকেই সৈনিক করিয়াছিলেন। যাহারা স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইত, তাহাদিগকে আরবজাতির কোনএক শাখাভুক্ত হইতে হইত;—ইহা আরব-রাষ্ট্রনীতির অঙ্গীভূত একটি নিয়ম। যাহারা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী নহে তাহাদিগকে দ্বিগুণ রাজকর দিতে হইত;—"মাথা-গুণতি"-কর দিতে হইত, ভূমি-কর দিতে হইত। যেসকল মুসলমানের ভূসম্পত্তি নাই, যাহারা রাজকর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, তাহারা মাসে মাসে শস্যাদির আকারে কিছু কিছু সাহায্য পাইত, প্রত্যেক বৎসরে একটা নির্দ্দিষ্ট অবসর-বৃত্তিও পাইত।(১)

ওম্মেইয়াদ্ রাজবংশের শাসনকালে, কালিফের আধিপত্য কুলক্রমাগত হইলেও উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম অনিশ্চিত ছিল। আরবদিগের নিয়মানুসারে, বংশের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সেই সর্দ্দার পদবী প্রাপ্ত হইত। উহাদের রাষ্ট্রনীতি সাধারণতঃ বিজয়মূলক হইলেও, বহু পুরাতন বিজিত প্রদেশসমূহে শান্তিকাল-সুলভ শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইত; আরবজাতীয় নহে,—এমন কি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীও

(১) এই দুই রাজকর বিধর্ম্মীদিগকে দিতে হইত:—ভূমিকর (খরাগ) ও মাথা-গুণতি—কর (জিজিয়া)। এই দুই কর মুসলমান দেশমাত্রেই বিশেষত মুসলমান-অধিকৃত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।

নহে—এরূপ কর্ম্মচারীসকলও নিয়োজিত হইত। সমগ্র সাম্রাজ্য দশ প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ধর্ম্মসংক্রান্ত, সমর-সংক্রান্ত, রাজ্যশাসনসংক্রান্ত, রাজস্বসংক্রান্ত পদ—সমস্তই পৃথক পৃথক, এবং উহাদের পদমর্য্যাদাও এই ক্রমানুসারে একটি হইতে আর একটি উচ্চতর। কাজির হস্তে বিচারের ভার ছিল। প্রত্যেক প্রদেশই, শাসনসম্বন্ধে প্রায় স্বায়ত্ত, প্রত্যেকেরই আয়ব্যয়ের হিসাব স্বতন্ত্র; শাসনকর্ত্তা, জিলার সর্দ্দারদিগকে মনোনীত করিতেন। পরে, রাজস্বের সম্পূর্ণ সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইল। মুসলমান ভূস্বামীদিগকেও—মোটের উপর সমস্ত রাজস্বের দশম অংশ পরিমাণ—রাজকর দিতে হইত। ইতিপূর্ব্বে সমস্ত মুসলমান সৈনিক ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

পরিশেষে, আব্বাসীদ-বংশের শাসনকালে, Byzanceর প্রভাব তিরোহিত হইয়া তাহার স্থানে পারস্যের প্রভাব প্রবেশ করিল। কতকগুলি উজীর লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। আরও কিছুকাল পরে, একজন প্রধান-উজীরও নিয়োজিত হইল। প্রধান-উজীর, কালিফ্ হইতে, সর্ব্বময় কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং এই পদ অনেক স্থলেই কৌলিক হইয়া পড়িল। সচীবদিগের বিভিন্ন অধিকারের মধ্যে—রাজাঙ্গুরীমুদ্রাধিকার, কোষাধিকার, দণ্ডাধিকার (ইহার সহিত ডাক-যোগে পত্রাদি প্রেরণের অধিকারও একীভূত) খাসমহল-বিভাগের অধিকার, ও সমরাধিকার—এইগুলিই উল্লেখযোগ্য। শুল্কস্থাপনপদ্ধতি ক্রমশ পরিপুষ্টি লাভ করিল;—যথা, নৌ-শুল্ক, খনি-শুল্ক, পশুচারণ-শুল্ক, ভূমি-শুল্ক ইত্যাদি। মোটের উপর, ইহা এমন একটি শাসনতন্ত্র যাহাতে রোমের, বিজান্শিয়ার ও চেসিফোনের প্রতিষ্ঠান-গুলি একত্র সম্মিলিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে।

বিধি ব্যবস্থা।

ব্যবস্থাপ্রণয়নে রোমকেরা যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল, আরবেরাও সেইরূপ প্রতিভার পরিচয় দেয়। উহাদের আইন-কানুনের প্রথম উৎস—কোরান; দ্বিতীয় উৎস—জনপ্রবাদ। প্রবক্তা মহম্মদের বাক্যাবলী,—মহম্মদের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক, আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক, পত্নীগণ কর্ত্তৃক, এবং আরও পরে, ঐসকল আত্মীয়বন্ধুগণের পুত্র, প্রপৌত্র ও শিষ্যগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া মুখপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। ব্যবস্থাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায় কোরানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, লোকপ্রবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সম্প্রদায় মেদিনায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক সম্প্রদায় বাগ্‌দাদে অবস্থিত ছিল। বাগ্‌দাদে যে আইন-কানুন প্রণীত হয় উহা রোমীয় আইন-কানুনের সমতুল্য। মহম্মদের বিচার-নিষ্পত্তিগুলি অনুরূপ ঘটনাস্থলে প্রযুক্ত হইয়া ব্যাপকতা লাভ করে। এবং উহারই বেমালুম সংমিশ্রণে বিধর্ম্মী-দিগের জন্যও একটা ব্যবস্থাপদ্ধতি প্রণীত হয়।

আরব-আইনের দ্বারা, ব্যক্তিগণের আপেক্ষিক অবস্থা, পুত্রের কর্ত্তব্য, পত্নীর কর্ত্তব্য, অভিভাবকের কর্ত্তব্য, অপ্রাপ্ত-বয়স্কের সম্পত্তিতত্ত্বাবধারকের কর্ত্তব্য, দাসের কর্ত্তব্য, মক্কেলের কর্ত্তব্য, দাসত্ব-মুক্ত দাসের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই আইন, দাসকে রক্ষা করে এবং দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের সুযোগ করিয়া দেয়। মুসলমান-বিবাহ সিদ্ধ হইবার পক্ষে যেরূপ দুই জন স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান সাক্ষীর উপস্থিতি আবশ্যক, সেইরূপ প্রাপ্তবয়স্কা পাত্রীর সম্মতিও আবশ্যক। কোন দাসী, দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলেও উপপত্নীরূপে থাকিয়া যায়, কখনই ধর্ম্মপত্নী হইতে পাবে না। বিধর্ম্মী রমণীর সহিত বিবাহ করিবার অধিকার মুসলমানের আছে। চুক্তিপদ্ধতিও বেশ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে:—যথা, দানবিক্রয়, সমবায়, ধার, গচ্ছিত, হুণ্ডিপত্র ইত্যাদি। উত্তরাধিকারিত্বের পদ্ধতিও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য—দানপত্র-বিহীন উত্তরাধিকারী, বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারী, রক্ষিত স্বত্ব উত্তরাধি-কারী, ইত্যাদি।

অতএব, মুসলমানদিগের রাজ্যশাসনপ্রণালী ও বিধিব্যবস্থা হিন্দুদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। মুসলমান অধিপতিগণ, স্বকীয় রাজ্যে, কালিফ-সাম্রাজ্যের শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রবর্ত্তিত করেন। ভারতের মুসলমানগণ আরব-আইনের দ্বারা অনুশাসিত হইত।(২) কিন্তু হিন্দুরা, বর্ণভেদ প্রথার ও স্বকীয় প্রথানুগত বিধিব্যবস্থার একান্ত ভক্ত হওয়ায়, মুসলমান আইন প্রত্যাখ্যান করিল।

(২) এখনও ভারতের মুসলমানগণ আরব-আইনের দ্বারা অনুশাসিত হইয়া থাকে।

মুসলমানধর্ম্ম, শিক্ষাকার্য্যের প্রবল সহায় ছিল। প্রত্যেক মুসলমান ভক্তের কোরান জানা আবশ্যক। কোনও নগরে অধিষ্ঠিত হইবামাত্রই, আরব-সৈনিকেরা শস্ত্র রাখিয়া শাস্ত্রের বিতর্ক আরম্ভ করিয়া দিত। সর্ব্বত্রই উহারা ধর্ম্মমূলক সম্প্রদায়, রাষ্ট্রনৈতিক সম্প্রদায়, বিশেষত সমাজঘটিত সম্প্রদায়সকল স্থাপন করিত। আরবদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই উহাদিগকে গণতন্ত্রের দিকে লইয়া যাইত। অনেকেই কোরানের দোহাই দিয়া সর্দ্দার নির্ব্বাচনের ও সম্পত্তি বিভাগের দাবি করিত।

মসজিদ্ই একপ্রকার অবৈতনিক পাঠশালা; মসজিদেই বালকেরা লেখাপড়া শিখিত। উহাদের মধ্যে যাহারা বেশী বুদ্ধিমান তাহারা সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট উচ্চ শিক্ষালাভ করিত। কাইরো, মেক্কা, দামাস, কর্দ্দ্, শেভিল্, টোলেড্—এইসকল নগরে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবস্থাশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও গণিতের শিক্ষা দেওয়া হইত। সর্ব্বত্রই পুস্তকাগার সংস্থাপিত হইত। (৩) কর্দ্দ্র পুস্তকাগারে ৪ লক্ষ গ্রন্থ ছিল। বাগ্‌দাদের পাঠাগারসকল সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কোরানের লিখন-রীতিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিবেচিত হওয়ায়, লিস্‌বন হইতে সমরখন্দ পর্য্যন্ত সকল স্থানের সমস্ত শিক্ষিত লোক, পণ্ডিত লোক, ঐ রীতি অনুসারেই লিখিত ও কথা কহিত। যাতায়াতের জন্য অসংখ্য নৌকা ছিল। রাস্তা ঘাট ভাল অবস্থায় রাখা হইত। ডাকের কাজও বেশ নিয়মিতরূপে চলিত। কোরানের অনুশাসন অনুসারে, মুসলমান মাত্রই জীবনের মধ্যে অন্ততঃ একবার মেক্কায় তীর্থযাত্রা করিতে বাধ্য। দ্রুতভাবে দিগ্‌বিজয় সাধিত হওয়ায়, দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সকলেরই একটা অভিরুচি জন্মিয়াছিল। কোন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করিবার জন্য, ছাত্রগণ কর্দ্দ্ হইতে বোখারায় গমন করিত। এইসমস্ত ভ্রমণ, ও বিভিন্নদেশীয় মুসলমানের বিভিন্ন প্রকৃতি,—সাহিত্য ও বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতিকল্পে সাহায্য করিয়াছিল।

কোরান হইতেই আরব-দর্শনশাস্ত্র নিঃসৃত হয়। সপ্তম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া, মোতাজেল-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ কোরানের কতকগুলি মতবাদ নির্দ্ধারিত করিয়া দিল। তাহারা ঈশ্বরের উপাধি ও গুণ অস্বীকার করিল; তাহারা বলিল, উহা একেশ্বরবাদের বিপরীত কথা। মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন, এই মতটিও তাহারা পোষণ করিল। অষ্টম শতাব্দীতে, উহা সমস্ত গ্রীক্‌গ্রন্থের, সিরিয়ার গ্রন্থের, হিব্রুগ্রন্থের, ভারতীয় গ্রন্থের, পারস্য-গ্রন্থের অনুবাদ করিল এবং সমস্ত বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে লাগিল। জ্ঞানের এইরূপ একটা বিশ্বকোষসংগ্রহের চেষ্টা হইতেই কালিফ্-রাজ্যের অবনতির সময়ে, "চিত্তশুদ্ধিসাধনাকারী ভ্রাতৃমণ্ডলী" নামক একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বসোরা নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ইহা সমস্ত সাম্রাজ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করাই এই ভ্রাতৃমণ্ডলীর প্রধান উদ্দেশ্য। উহারা যোগবাদী বলিয়াও আপনাদিগের পরিচয় দিত; সম্ভবত তাহার মূলে কোন রাষ্ট্রনৈতিক অভিসন্ধি ছিল।

ওম্মেইয়াদ-বংশের শাসন-কালে, আরবদিগের মধ্যে গ্রীকদর্শন প্রসার লাভ করে। দিগ্‌বিজয়ের সময়ে, সেমিটিক-বংশোদ্ভব সিরীয়ানেরা প্রায় গ্রীকভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন হইতে, মোতাজেল্-সম্প্রদায়-ভুক্ত দার্শনিকগণ, ফারাবির ন্যায় স্বাধীন-চেতা আচার্য্যগণ,—অ্যারিষ্টটলের মতবাদের সহিত কোরান-প্রতিপাদিত মতবাদসমূহের ঐক্যসম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা খাস-ধর্ম্মের অধিকার ও দর্শনের অধিকার—এই দুই অধিকারের মধ্যে ভেদ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবেচনায়,—দর্শন একটী বিজ্ঞান, অথবা দর্শনই চরম বিজ্ঞান। তাহাদের মতে, সকল দর্শনশাস্ত্রের মধ্যেই একটা মিল থাকা উচিত। আরবীয় "টুলো" দর্শনের আচার্য্য—আভিসেন্।

আরবদিগের মনোবিজ্ঞানের স্থূল রেখাগুলি নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে :—

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, উপাধিবিহীন, অতিনির্ম্মল ও বিশুদ্ধ সত্য। ঈশ্বরের নিম্নস্তরে, জীবের সোপানপরম্পরা। এই মতটি পারসীকগণ হইতে ও Gnostiqe সম্প্রদায় হইতে গৃহীত। কোন কোন দার্শনিকের মতে, ঈশ্বর—

(৩) আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগারের ধ্বংসের কথা একটা কাহিনী মাত্র।

প্রজ্ঞার স্রষ্টা, "বিশ্বজনীন আত্মার স্রষ্টা ও সর্ব্বাদিম ভৌতিক পদার্থের স্রষ্টা। শেষোক্ত দুই উপকরণ হইতে সমস্ত জীবজগৎ নিঃসৃত হইয়াছে। আভিসেন্ তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ পত্রে,—ঈশ্বরের নিম্নস্তরে, এমন কতকগুলি "আইডিয়া"র অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন যাহা সমস্ত ভৌতিক জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। অতএব, তাঁহার দর্শনপদ্ধতি, "নমিন্যালিষ্ট" ও "রিয়্যালিষ্ট" এই দুই সম্প্রদায়ের দর্শনপদ্ধতির মধ্যে, একটা মাঝামাঝি স্থান অধিকার করে। তাহার পর, আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন কতকগুলি জীব, কিন্তু সেইসব আধ্যাত্মিক জীব এক প্রকার ভৌতিক পদার্থে আচ্ছাদিত। সর্ব্বশেষে, সূক্ষ্ম (Etherial) ব্যোম-জগৎ, যাহার নিজস্ব রূপ ও গতি গোলাকার এবং সেই পাঞ্চভৌতিক জগৎ যাহার রূপ বিচিত্র ও গতি পরিবর্ত্তনশীল। এই পাঞ্চভৌতিক জগতের অন্তর্গত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা ও ধাতুসমূহের সোপান-পরম্পরা। (৪)

আরবেরা পদার্থবিজ্ঞানেরও অনুশীলন করিয়াছিল। উহারা পদার্থবিজ্ঞানকে—মনোবিজ্ঞান, ন্যায়, ও তত্ত্ববিদ্যারই উপশাখা বলিয়া বিবেচনা করিত।

উহারা সমস্ত বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়াছিল। বিজ্ঞানের আলোচনায় যাথাযথ্য রক্ষা করিবার দিকে উহাদের মনের গতি। ঐতিহাসিকেরা কালিফদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও শাসনবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছে; আবার কেহ কেহ সকল জাতিরই কালক্রমিক ইতিবৃত্তের অনুশীলন করিয়াছে; আবার কেহ বা সাধারণ ইতিহাসেরও অনুশীলন করিয়াছে। ওমারের আদেশানুসারে, সেনাপতিগণ বিজিত রাজ্যসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইত; যেসকল পর্য্যটক, যেসকল বণিক, নানাদেশে ভ্রমণ করিত, তাহারা সেইসকল দেশের মানচিত্রসম্বলিত ভৌগলিক বিবরণ প্রদান করিত। স্বকীয় ভাষার একান্ত অনুরাগী আরবেরা, ভাষার নিয়ম সূত্রবদ্ধ করিয়া ভাল ভাল ব্যাকরণ রচনা করিত এবং শব্দসমূহের তালিকা করিয়া অভিধান প্রস্তুত করিত।

পরীক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবক আরবেরা দৃষ্টিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা—এই সমস্তের অনুশীলন করিত। দৃষ্টিবিজ্ঞানে উহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তাহা খুব ঠিক্।

চিকিৎসাশাস্ত্রে আভিসেন্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গ্যালিয়েনের শিষ্য আরবেরা এই শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করে—যদিও, শবচ্ছেদ নিষিদ্ধ হওয়ায়, মানবদেহ সম্বন্ধে উহাদের সম্যক্ জ্ঞান ছিল না। উহারা ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিল, এবং কি করিয়া চক্ষের ছানি কাটিতে হয় তাহা জানিত।

উহাদের রসায়ন শাস্ত্র, ধাতুপরিবর্ত্তনবিদ্যার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। আরবেরা, কঠিন, তরল ও বায়ব পদার্থের ভেদনির্ণয় করিয়াছিল, এবং কঠিন পদার্থকে তরল পদার্থে অথবা তরল পদার্থকে কঠিন পদার্থে পরিণত করিতে পারিত; জলশোধন, স্ফটিকীকরণ, দ্রবণ, ঊর্দ্ধপাতন, বরফ প্রস্তুতকরণ—এই সমস্ত প্রকরণ উহারা অবগত ছিল। কতকগুলি সুরা, কতকগুলি ক্ষার, তুতিয়া, ফট্‌কিরি, সোরা, সোডা, গন্ধকাম্ল—এই সমস্ত পদার্থেরও সহিত উহারা পরিচিত ছিল।

জ্যোতিষ। উহারা জ্যোতিষে টলেমি ও ভারতবাসীদিগের শিষ্য। ভারতবাসীদিগের অনেকগুলি "সিদ্ধির" (সিদ্ধান্ত) উহারা অনুবাদ করে। উহাদের একটা পঞ্জিকা ছিল। উহারা সৌরপথের আনতি ঠিক গণনা করিতে পারিত, এবং উৎকৃষ্ট বীক্ষণ যন্ত্রাদিও নির্ম্মাণ করিত।

গণিত। ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে উহারা সংখ্যাঙ্ক, দশমিক গণনাপদ্ধতি, বীজগণিতের মূলসূত্রাদি গ্রহণ করে। পরে, উহারা বীজগণিতের প্রভূত পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। দশম শতাব্দীতে, উহারা বর্গাত্মক সমীকরণের লাঘবসাধন করে। উহারা যন্ত্রবিদ্যা ও জ্যামিতিরও প্রভূত উন্নতিসাধন করে। ইউক্লিডের মূলসূত্র হইতে যাত্রা আরম্ভ

(৪) Garra d Vaux প্রণীত,—আভিসেন; Renan ... "Averroes it Averroisme,"

প্রধান আরব ঐতিহাসিকদিগের নাম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

"ইব ন্—হিশাম" (৮১৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়); এ "তাবারী" (৮৩৮-৯২২); খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী অবুল-ফরাস্ (১২২৬-৮৬); সুল্‌তান "এজুবিদ্"; "আবুল্‌ফেদা" (১২৭৩-১৩৩১) ইত্যাদি।

প্রধান আরব দার্শনিক :—"ফরাবি" (৯৫০ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়); "ব ন্ সিন" (অভিসেন) (৯৮০-১০০৭); "আল্ ঘজালি" (১১১ অব্দে মৃত্যু হয়); ইব ন্ রস্দ (আভেরোয়ে) (১১২৬-৯৮)।

করিয়া উহারা মাণ্ডলিক ত্রিকোণমিতির দুরূহ সমস্যা-সমূহের সমাধান করে।

আরব-চিন্তার প্রভাব, ভারতবাসীর পক্ষে যেরূপ হিতকর হইয়াছিল, এমন আর কিছুই হয় নাই। নিরঙ্কুশ কল্পনা, শ্রেণীবন্ধন ও নিয়ম-বন্ধনের স্পৃহা, স্বতঃসিদ্ধ মূলতত্ত্বের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ—এই সমস্ত ভারতবাসীর মনকে এরূপ বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল যে উহারা স্বদেশের প্রকৃত গঠন জানিতে পারিয়াও, উহার আকার পদ্মের মত এইরূপ কল্পনা করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীক্ষেত্রে

ভো মহার্ণব, নীল-ভৈরব
গর্জ্জদ্-জলভঙ্গে,
দূর অম্বুদ-মন্দ্র সমান
তুলিতেছ কা'র বন্দনা-গান?
নক্তন্দিব উদ্বোধনের
দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।
নীলকণ্ঠের বিরাট্ পিনাক
টঙ্কৃত অহোরাত্র—
আজো কি ভোলনি মন্থন-রোল,
সুরাসুরে মিলি' উন্মাদ দোল?
ইন্দিরা আজি উদিবেন বুঝি
কক্ষে অমৃতপাত্র।
দাঁড়ায়ে তোমার বেলা-বালুকায়,
হেরি বিহ্বল চিত্তে
যোজনান্তরে গগন-সীমায়
ঢলিয়া পড়েছ মহানীলিমায়,
তরলোজ্জ্বল ফেনিলোচ্ছল
পন্নগ-ফণ-নৃত্যে।
না জানি কোথায় অতল পরশে
অরুণ-প্রবাল-হর্ম্ম্যে,
বারুণী রূপসী বেণী-রচনাতে,
কম্বুশুক্তিকার সঘন আঘাতে
ভাঙে অর্ব্বুদ জল-বুদ্বুদ,
বিলাস-মুকুর-নর্ম্মে।
কোন্ উপকূলে লবঙ্গফুল-
পরিমলে বায়ু ফুল্ল?
দারুচিনি-বনে অপরূপ পাখী
অরাল কলাপে জলধনু আঁকি'
মন্দদোদুল তরুর তোরণে
চন্দ্রহারের তুল্য।
হে দুর্ণিবার, মুক্ত-উদার,
হে পূর্ণ অফুরন্ত,
চেয়ে চেয়ে ওই বিপুল উরসে,
অসীমের ভাষা অন্তরে পশে—
হেরি নেপথ্যে অন্তবিহীন
কল্পলোকের পন্থ।
খেলিছ এমনি লীলা-উদ্বেল,
অমলিন-মণি-দীপ্ত—
কত না ভাবুক তব পাশে আসি'
এমনি হরষে আলোড়ি' উছাসি'
স'পেছেন তোমা' অনঘ অর্ঘ্য,
বিভোর অপরিতৃপ্ত।
এই সেই পুরী, এইখানে ডোবে
নবদ্বীপের চন্দ্র—
তীর্থে তীর্থে ঘুরি' অবশেষে
উদাসীন প্রাণে এইখানে এসে
সমাহিত ওই নীল অনন্তে
ভুঞ্জিতে ভূমানন্দ।
জগ'জনে তিনি দিয়াছেন কোল,
কেহ নাই অস্পৃশ্য,
হোক্ না সে দ্বিজ, হোক্ চণ্ডাল,
বিশ্বের স্রোতে ক্ষুদ্র বিশাল,
সবারে সাদরে আলিঙ্গে কাল—
বর্জ্জনে প্রেম নিঃস্ব।
একদা জগদ্গুরু শঙ্কর
ভারতের বুধবৃন্দে
নিষ্প্রভ করি' মনীষা-কিরণে

এইখানে আসি' তৃতীয়-নয়নে
নেহারিয়াছেন মহামানবের
মিলনের অরবিন্দে।
ধন্য এখানে মানব-আত্মা
পূজি' শাশ্বত সত্যে—
একাকার হেথা অখিল ধর্ম্ম,
টুটি বিচারের কঠিন বর্ম্ম
সব ব্যবধান ডুবে গেছে ওই
পাবন সলিলাবর্ত্তে।
কবীর, নানক, হরিদাস হেথা
অবিনাশ বাক্-ছন্দে
উদ্বোধিলেন শুভ আহ্বানে
চিরমুমুক্ষু মানবের প্রাণে,
লভি' সাধনায় মধুমান্ সেই
ধ্রুব সচ্চিদানন্দে।
এই শ্রীক্ষেত্রে লুটাও ভক্ত,
অভিমান হোক্ চূর্ণ,
হউক্ নিরাস ভেদ-জ্ঞান-ভ্রম,
জগন্নিধান পুরুষোত্তম,
নীলমাধবের চরণোপান্তে
সব মনোরথ পূর্ণ।
ভো মহার্ণব, ভীম-ভৈরব
উত্তাল লীলাভঙ্গে,
গর্জ্জি' মেঘের মন্দ্র সমান,
গাও গাও তাঁ'রি বন্দনা-গান,
নক্তন্দিব মাঙ্গলিকের
ওঙ্কারধ্বনি-সঙ্গে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিদি

দশম পরিচ্ছেদ।

হরনাথ বাবুর মৃত্যুর পর কয়েকদিন কাটিয়া গেল। অমর ক্রমে সান্ত্বনা লাভ করিতে লাগিল। চারুর জন্য তাহাকে আরও চেষ্টা করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে হইল। চারু এখানে অপরিচিত স্থানের মধ্যে সম্পূর্ণ একা; স্বামীর কাছেও সে স্বেচ্ছায় বড় একটা ঘেঁসে না, এক কোণে একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। হরনাথ বাবুর মৃত্যুর পরদিন হইতে সুরমা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে। অগত্যা অমরনাথই চারুর সঙ্গী হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

শ্যামাচরণ রায় একদিন সুরমাকে বলিলেন—"মা, তোমার হাতেই কর্ত্তা অমরকে দিয়ে গিয়েছেন, সে এখনো সংসারের কোনো কাজ শেখেনি, শিখ্‌তে চেষ্টাও করে না; কাজ কর্ম্মের দিকে একবারও ঘেঁসে না; তুমি ইচ্ছা করলে হয়ত তাকে এসব দিকে দৃষ্টি দেওয়াতে পার।"

সুরমা কিছুক্ষণ নীরবে রহিয়া শেষে ক্ষীণ হাস্যের সহিত বলিল—"না কাকা, বাবা যদি থাক্‌তেন তো অবশ্য আমি আপনার কথা রাখ্‌তাম, এখন কোনো বিষয়ে আমার কথা না কওয়াই ভাল। নিজেই দুদিন পরে বুঝে চল্‌তে শিখবেন।"

"মা রাগ ক'রো না। দেখতে পাই তুমি ছোটবৌমা বা অমরের তো একবারও তত্ত্ব নাওনা এখন। এখন ওরাও শোকার্ত্ত, ওদের নিজের বাড়ী হলেও ওরা এখানে যেন নবাগত অতিথি। আমি আশা করেছিলাম মা লক্ষ্মী তুমিই একলা সব বুক পেতে নেবে।"

"নিতে চেষ্টা কর্‌ব কাকা, বাবার আশীর্ব্বাদ আছে; কিন্তু এখন আমায় কিছু বল্‌বেন না।"

শ্যামাচরণ রায় ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন— "সম্পূর্ণ মন দিয়ে যদি না পার মুখে আত্মীয় ভাব প্রকাশ করে তাদের যাতে ভাল হয় সে চেষ্টা করা তোমার কি উচিত নয়?"

"না কাকা, আমি তা মোটেই পারব না। মনে যদি না পারি তো মুখেও আত্মীয়তা করতে পারবনা। মনে এক ভাব রেখে মুখে আর এক রকম ব্যবহার সে আমি পারব না। সেটা পারি না বলেই আপনাদের কাছে কতদিন আমি নিলর্জ্জের মত কত ব্যবহার করেছি। মনও আমার সর্ব্বদা এক রকম থাকে না কাকা। কখনো মনে হয় আমারি সব, আবার তখনি মনে হয় আমি এখানকার কেউ নই। বাবা থাকৃতে আমি যে-

রকমে চলেছি তাই মনে করে হয়ত আপনি ওকথা বল্‌চেন ; কিন্তু বাবার স্নেহের অধিকারে তখন আমার মনে এমন কিছু ক্ষোভ ছিল না—এ আপনাকে সত্য বল্‌ছি। বাবা যখন তাদের আমার হাতে হাতে দিলেন তখন আমার মনে হয়েছিল······যাক্‌ এখন সে সব কথা —আমার মন বড় খারাপ। বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে আর আমি ওঁদের কাছে এগুতে মোটেই পারি না। আমার মনে হয় আমার সব কর্ত্তব্য নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাচরণ রায় চুপ করিলেন।

মহা সমারোহে ও বহু অর্থব্যয়ে স্বর্গীয় হরনাথ মিত্রের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। শত্রুপক্ষীয় বন্ধুদিগকেও স্বীকার করিতে হইল 'হ্যাঁ, তাঁর উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে বটে!' অত্যধিক ব্যয় হওয়াতে অমরনাথের কিছু ঋণও হইয়া পড়িল। শ্যামাচরণ রায়ের এত ব্যয় করা ইচ্ছা ছিল না, কেননা কর্ত্তা অত্যন্ত মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া নগদ তেমন কিছু রাখিয়া যান্‌ নাই। কেবল অমরনাথের ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে এরূপ কার্য্য হইল। প্রতিবাদ অনুচিত বুঝিয়া শ্যামাচরণ রায় ও সুরমা কেহই উচ্চবাচ্য করিলেন না।

কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন দেওয়ান অমরনাথকে ডাকিয়া যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং সমস্ত বিষয়কর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অমরনাথ বিস্মিতভাবে বলিল—"কাকা—এর মানে কি? আপনি থাক্‌তে আমার তো এসব জান্‌বার অত দরকার নেই।"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"বাবা, দাদা এগিয়ে চলে গেলেন, আমারও তো প্রস্তুত হ'য়ে থাকা উচিত। আমি কাশী যাব স্থির করেছি।"

অমরনাথ ম্লানমুখে বলিল—"ও! বুঝ্‌লাম দ্বিতীয়বার আমায় পিতৃহীন হ'তে হবে।"

শ্যামাচরণ রায় তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু অমরনাথ কোনো উত্তর না দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। অগত্যা শ্যামাচরণ সুরমার নিকটে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সুরমা শিহরিয়া বলিল—"না কাকা, আপনি এখন কোনমতেই যেতে পাবেন না।"

"মা তুমি বুদ্ধিমতী হ'য়েও এই কথা বল্‌ছ!"

"না বলে কি বল্‌ব? এই সেদিন বাবা গেলেন এর মধ্যে আপনিও গেলে সত্যিই মিত্তির বংশ উচ্ছন্ন যাবে।"

"সে কি কথা মা? অমর বিষয়কর্ম্ম বোঝে না বটে কিন্তু বড় ভাল ছেলে সে, তাকে তুমি চেন না মা। যাক্‌— আবার বল্‌ছি তুমি অনেক জান শোন, যদি দরকার পড়ে তুমি তাকে পরামর্শ টরামর্শ দিও। এরকম ক'রে পাশ কাটিয়ে থেক না মা।"

সুরমা ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া মুখ নত করিয়া বলিল— "আপনি বারে বারে এই কথাই বলেন কাকা। আমি তো পাশ কাটাইনি। যিনি এখন কর্ত্তা তিনি কি কোন কাজে আমার সাহায্য চান্‌ যে আমি"—

"সে ছেলে মানুষ, আর সেও তো কোনো কাজই নিজের হাতে নেয়নি তুমি নিজ হ'তে কেন নিজের ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্চ মা? কাল সরকারের কাছে শুন্‌লাম তুমি তার হিসাবপত্র কিছুই আর দেখ না, ভাঁড়ারী বল্লে মা আর কোন হুকুম দেন্‌ না, সরকার আমার কথা শোনে না—এসব কি মা?"

সুরমা ক্ষণেক পরে মৃদুস্বরে বলিল—"আমি দুদিন অবকাশ নিয়েছি কাকা।"

শ্যামাচরণ রায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান মুখে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"এসব ভাল লক্ষণ নয়, তাই আমি আগেই যেতে চাচ্ছি।"

সুরমাও এবার গম্ভীর ম্লানমুখে বলিল—"তা হবে না কাকা, আমরা আপনার সন্তান, আমরা যদি খানিক ভুল করে হাসি কাঁদি, আপনি কি তাই ব'লে আমাদের বিপদের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। আমায় কিছুদিন মাপ করুন। আপনি এতে কেন ক্ষুণ্ণ হচ্চেন, যাঁর সংসার তিনি তো এসবের কিছু খোঁজ রাখেন না!"

বৃদ্ধ দেওয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতাশামিশ্র ক্ষোভের স্বরে বলিলেন—"যা ভাল বোঝ কর মা।"

"তা যাই হোক কাকা, আপ্‌নার এখন যাওয়া হবে না। অন্ততঃ বছর খানেক নয়। আমি যাই করি,—এতে অবশ্য তাঁর ক্ষতিও কিছু নেই—কিন্তু আপনি তা বলে

ত্যাগ তাঁকে করতে পাবেন না। বাবা তাহ'লে স্বর্গ থেকে ক্ষুণ্ণ হবেন কাকা।"

দেওয়ানজী চিন্তিত ভাবে বলিলেন—"তুমি হাল ছেড়ে দিয়েছ, অমরও তো কিছু দেখ্‌বেনা, কাজকর্ম্ম শেখাব বলে কাছারীতে ডেকেছিলাম, কিছু না শুনেই সে উঠে চলে গেল। তোমরা সবই সমান ছেলে মানুষ দেখছি। আচ্ছা না হয় নাই গেলাম, জান্‌তে বুঝ্‌তে দোষ কি? আমি একা বুড়ো মানুষ কদিন এতবড় ভার বইতে পারব?"

"আপনি যদি না পারেন কাকা, তবে আর কেউ পারবে না।……এখন বেলা হ'ল স্নান কর্‌তে যান্‌।"

কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। অমরনাথ বিরক্ত ভাবে একদিন দেওয়ানকে ডাকাইয়া বলিল—"এখানকার চাকর বাকরের কোনো কাজের কিছু বন্দোবস্ত কি নেই কাকা? সবই দেখি অপরিষ্কার অনিয়ম। বিশেষতঃ বাড়ীর ভেতরে সবই গোলমাল। শোবার ঘরগুলো অতি অপরিষ্কার, বিছানাগুলো ততোধিক। বাড়ীতে আলো দেয় না, ঝাঁট পড়ে না। এসব কি কারু তত্ত্বাবধানে থাকে না?"

দেওয়ান গম্ভীর মুখে বলিলেন—"ওসব বাড়ীর ভেতরের কাজ চাকরাণীরাই তো করে।"

"সেগুলোর এখন হ'য়েছে কি? আজ ভারী বিরক্ত ধরেছে। আমি তো ওসব কিছু লক্ষ্যই করি না, তবু আমারি আজ অসহ্য বোধ হয়েছে।"

সরকার চণ্ডী ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিল, সে বলিল "চাকরাণীরা আপনাআপনির মধ্যে ঝগড়া ক'রে বামা ক্ষান্ত তো চলে গেছে, তারাই ওপরের ওসব কাজ করত। রান্নাবাড়ীর চাকরাণীগুলো তো আমাদের দফা সার্‌লে। কোঁদলের চোটে কাল নারাণ ঠাকুর জবাব দিয়ে চলে গেছেন, বলে গেলেন যে মা আর ঝিগুলোকে শাসন করেন না—আর এখানে থাকা নয়। কাল রাত্রে মরি শেষকালে বামুন খুঁজে, শেষে তেওয়ারীকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া গেল।"

"এসব এমন অবন্দোবস্ত কেন কাকা—আপনি এসব দেখেন না কেন?"

"আমার কি ওসব দেখার অবকাশ থাকে অমর? বাড়ীর একজন কর্ত্তা বা প্রধান চাই, বিশেষ করে একজন গিন্নি না হলে কি সংসার চলে? তোমরা তো কিছুই দেখ্‌বে না।"

"এসব কি আমার দেখার কথা কাকা? আমি সকল কাজ ছেড়ে ঝি চাকর চরিয়ে বেড়াব? বাবা থাক্‌তে এসব কে দেখ্‌ত?"

দেওয়ান কিছু বলিলেন না। সরকার বলিল "আজ্ঞে মা ঠাকরুণই দেখ্‌তেন্‌। তাঁর শাসনে কি চাকরাণীগুলোর একটু জোরে কথা কবার বা কাজের একটু ইদিক্‌ উদিক্‌ কর্‌বার জোটী ছিল? কাল হারাণি মাগী কল্লে কি—"

বাধা দিয়া অমরনাথ বলিল—"বাবা যেন চলে গেছেন—যিনি দেখ্‌তেন তিনি তো আছেন—তিনি এখন এসব দ্যাখেন না কেন?"

শ্যামাচরণ নীরবেই রহিলেন। চণ্ডী ঘোষ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—"তিনি আর এসব কিছুই দেখেন না। ক'টাকা গোলমাল হ'ল বলে' দাওয়ানজী মশায় আমায় বক্‌লেন,—তা তিনি দ্যাখেন না, মাঠাকরুণ দেখেন না, কাজেই গোল হল, এতে আর আমার দোষটা কি—"

অমরনাথ চণ্ডী ঘোষের কথায় ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"তা তোমার হাতে খরচ, দোষটা কাকারই হওয়া উচিত।……কাকা, এর একটা বন্দোবস্ত করুন নইলে তো এখানে প্রাণ নিয়ে তিষ্ঠনো দায় দেখ্‌ছি!"

"আমি আর কি বন্দোবস্ত করব বাবা, বড়মাই এসব দেখ্‌তেন।"

"তিনি এখন এসব দ্যাখেন না কেন?"

"তুমি তাঁকে কোনো দিন ভার দাওনি ব'লে বোধ হয়।"

অমরনাথ ঈষৎ নীরব হইয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"এ যে অন্যায় কথা কাকা? এতদিন কি আমি ভার দিয়েছিলাম?"

"তখন যিনি কর্ত্তা ছিলেন তিনি দিয়েছিলেন। এখন তুমিই কর্ত্তা।"

"কর্ত্তা হওয়ার অনেক দোষ দেখ্‌তে পাই। এখন

'আমায় কি কর্ত্তে বলেন—আমায় কি তাঁকে গিয়ে বল্‌তে হবে নাকি ?"

"বলা উচিত। গৃহিণী না হ'লে এসব কাজ সুনিয়মে চলে না। এ যেরূপ বৃহৎ গৃহস্থালী তাতে সেই রকম নিপুণা গৃহিণীর প্রয়োজন। এসব কাজ পুরুষের নয়। ছোট বৌমা এখনো ছেলে মানুষ আছেন বোধ হয়, নইলে—"

অমরনাথ ক্ষণেক ভাবিয়া ঈষৎনতমুখে বলিল "সে যেমনই হোক্, প্রধান যিনি তাঁরই এসব দেখা উচিত। বাবা তাঁকেই তো এসংসারের প্রধান ক'রে রেখে গেছেন। তাঁর সে অধিকারে তো কেউ হস্তক্ষেপ করেনি, অনর্থক তিনি এরকম করছেন কেন ?"

"তোমার রাগ করা উচিত নয় অমর। তুমি যখন কর্ত্তা তখন তোমায় এটুকু সহ্য করে সাবধানে তাঁর ভ্রম ভেঙে দিতে হবে।"

"আমি তো কর্ত্তা হ'তে চাই না কাকা ; এসব আমার ভাল লাগে না।"

সহসা অমরনাথের মনে হইল যে পিতার মৃত্যুর পর হইতে সুরমা তাহার বা চারুর নিকটেও আর বসে দাঁড়ায় না। পিতার ব্যারামের সময় সুরমা চারুকে যে প্রকারে নিকটে টানিয়া লইয়াছিল তাহাতে অমরনাথ চারুর নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। চারুর অস্বাভাবিক সরল হৃদয় সে জানিত, বুঝিত যে এই সঙ্গলাভ করিয়া চারু কিছুমাত্র ক্লিষ্ট হইবে না ; সুরমার সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধের উত্তাপ চারু অনুভব করিতেই জানে না। সুরমা যে চারুকে সঙ্গীর মত পার্শ্বে লইয়া এই অপরিচিত স্থানে তাহাকে যেটুকু সাহায্য করিল তাহাতেই অমর একটু খুসী হইয়া উঠিয়াছিল, সুরমার সম্বন্ধে সে আর কিছু ভাবিবার অবকাশও পায় নাই, ভাবিতে ইচ্ছাও করে নাই। জীবনের গ্লানিকর সংগ্রাম এখন মিটিয়া চুকিয়া গিয়াছে। পিতা তাহাকে আন্তরিক স্নেহপূর্ণ ক্ষমা করিয়া স্বর্গে গিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। চারিদিকের কর্ত্তব্যের কঠিন রণ সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল শান্তি ও বিশ্রামের সময়। এই নিঃশব্দ নীরব আরামপূর্ণ জীবনের প্রথম সূত্রপাত আরম্ভ হইতেই এ কি বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। এখন একজন সম্পূর্ণ নূতন লোক, যাহাকে এপর্য্যন্ত কখনো মনের রাজ্যের দ্বারেও কোনো দিন উপস্থিত করা হয় নাই, সেই কিনা কতকগুলা তুচ্ছ ঘটনা লইয়া সেখানে অত্যন্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়া সময়ে সময়ে কি একটা তরল গ্লানির রেখায় জীবনপ্রান্ত ভরিয়া দিতেছে। সময়ে সময়ে মনে হইতেছে এটা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নাও হইতে পারে ; এ বিদ্রোহ করার অধিকার তাহার আছে। তখন অমরনাথ ভাবিল "যাই হোক্, একটা মুখের কথা বললে সকল ঝঞ্ঝাট যদি মেটে তো এটা মিটিয়ে ফেলাই উচিত। সে এতদিন যেমন ছিল তেমনি তো আছে ; আমি তো তার অধিকারে কোনো রকমে হস্তক্ষেপ করিনি, কর্‌তে ইচ্ছাও রাখি না এইটুকু বুঝিয়ে দিলে যদি গোল মেটে তো সেটা তাকে আমার বুঝিয়ে বলাই উচিত।"

অমরনাথ সুরমার উদ্দেশে কক্ষের বাহির হইয়া বারান্দায় পৌঁছিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। একটা দুর্নিবার সঙ্কোচের হস্ত হইতে নিজেকে কিছুতেই সে মুক্ত করিতে পারিতেছিল না। বহু চেষ্টায় সেটাকে সরাইয়া ফেলিবামাত্র মনে আসিল কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করা যাইবে।

নিজেকে একটু কড়া রকম চোখ রাঙাইয়া অমরনাথ ভাবিল এত সঙ্কোচই বা কিসের ! আমি তো কোনো অন্যায় কাজ করিতেছি না। তখন সাধ্যমত সহজ পদবিক্ষেপে অমরনাথ সুরমার কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। সুরমা তখন নিবিষ্টমনে গবাক্ষের নিকটে বসিয়া পশমের কি একটা সেলাই করিতেছিল। পদশব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া চাহিল—সম্মুখে অমরনাথ। সুরমার মনে হইল হঠাৎ চকিত হইয়া না চাহিলে অনেকক্ষণ এরূপে বসিয়া থাকা চলিত—চোখো চোখি হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তো চলে না, একটা কথা 'এসো' 'ব'সো' না বলিলে বড় অসঙ্গত বোধ হয়। অমরনাথ নিশ্চয়ই অগ্রে কথা কহিবে না,—সুরমাকেই প্রথমে একটা কিছু বলিয়া বা করিয়া ফেলিতে হইবে,—বিপদগ্রস্তা হইয়া সুরমা ত্রস্তহস্তে পশমগুলা কাটার বাক্‌সের মধ্যে পুরিয়া উঠিবার উদ্‌যোগ করিল।

সুরমাকে আশ্বাস দিয়া অমরনাথই প্রথমে কথা কহিল —"একটা কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা কর্ত্তে চাই।"

সুরমা মনে মনে বলিল "তা জানি।" তথাপি সে একটু বিস্মিত হইল অমরনাথ না জানি কি কথা বলিতে আসিয়াছে। সুরমা স্থির অকুণ্ঠিত দৃষ্টি অমরনাথের মুখের উপর স্থাপন করিয়া স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল—"কোনো কাজের কথাই বোধ হয় ?"

অমরনাথের আর একদিনের কথপোকথন মনে পড়িল। এ কথাটারও ভঙ্গীতে অমরনাথের মন ঈষৎ গরম হইল। সুরমা যেন জানিয়া রাখিয়াছে যে অমরনাথ কেবল তাহাকে কাজের কথাই বলিতে আসে। এ কিরকম ব্যঙ্গ ! কিন্তু বিরক্তিটুকু মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া অমরনাথ বলিল— "হ্যাঁ, কাজের কথাই বটে। কথাটার শেষ বোধ হয় শীগ্‌গির হবে না, একটু বসা যাক্।" বলিয়া অমরনাথ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

সুরমা বুঝিল অমরনাথ নিজের সঙ্কোচ কাটাইবার নিমিত্তই এত উদ্‌যোগ করিয়া ব্যবহারটা সহজ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। ঈষৎ হাসি তাহার বদ্ধ ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল। সেও সহজ সুরে বলিয়া ফেলিল—"তুমি যদি শীগ্‌গির শেষ কর তবে আমি দেরী কর্‌ব না।"

অমরনাথ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—"কাকা বল্‌লেন তুমি আর সংসারের কিছু দেখনা শোননা ; সত্যি কি ?"

সুরমাও ক্ষণেক নীরব থাকিল। তারপরে অমরের পানে চাহিয়া বলিল—"কে বলেছে একথা ? কাকা নিজ হ'তে বলেছেন তা তো বিশ্বাস হয় না ?"

অমর ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল "কাকা বলেছেন ঠিক্ তা নয়—আমিই বলছি।"

"তুমি ?"

"হ্যাঁ। এটা এমন কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয় তো"—

সুরমার কণ্ঠ ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল—"আশ্চর্য্যের কথা একটু বটে বৈ কি। আমি কি করি বা কর্ত্তাম তুমি তার কি জান ?"

"জানিনা। এতদিন জান্‌বারও প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু যখন তোমার কাছেই আমাদের আশ্রয় নিতে হ'ল তখন মিছামিছি একটা গণ্ডগোলের প্রয়োজন কি ? তুমি যেমন ছিলে তেমনি তো আছ। বাবা তোমায় সকলের ওপর প্রাধান্যের পদ দিয়েছিলেন আমিও তোমায় সেই রকমই জানি, আমি তোমার সে অধিকারের ওপরে হস্তক্ষেপের অধিকারও রাখিনা এবং তা করতে ইচ্ছাও করিনা। তুমি যেমন ছিলে তেমনি সংসারের প্রধান হ'য়ে থাক, আর যেমনি তুমি সংসারের অপর পাঁচজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থা করে দিয়ে আসছ তেমনি তাদের সঙ্গে আমাদেরও স্বস্তিতে থাকৃতে দাও।"

"আমি কি তোমাদের স্বস্তিতে কোন বাধা দিয়েছি ?"

"বাধা না দাও, তোমার এসব কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করারই বা মানে কি ?"

সুরমা মনে মনে গুমরাইতে লাগিল। কি একটা কথা বলিবার ভয়ানক ইচ্ছা হইতে লাগিল, তথাপি একটু সামলাইয়া বলিল—"সব কাজেরই কি অর্থ থাকে ? আর থাকৃলেই বা তা কে কাকে ব'লে থাকে।"

"বেশ ! তুমি না বল আমার তোমায় একথা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করা উচিত তাই বল্লাম। কাকাও বল্‌লেন আমার তোমায় বুঝিয়ে বলা কর্ত্তব্য।"

"কি বুঝোবে ?"

অমরনাথ একটু থামিয়া গেল। তারপরে গলাটা ঝাড়িয়া বলিল—"তুমি বাবা বর্ত্তমানে এ গৃহের গৃহিণী-পদ নিয়েছিলে এখন তা ত্যাগ করবে কিসের জন্যে ? তুমি যেমন ছিলে তেমনি তো আছ।"

এবার সুরমার আপনাকে সামলান দায় হইল। তথাপি সে ধীর কণ্ঠেই বলিল—"আমি যদি ভাবি তা নই ?"

"কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। তোমায় কি কেউ অসম্মান করেছে ?"

"না।"

অমরনাথ একটু নীরব থাকিয়া পরে প্রসন্ন মুখে সুরমার পানে চাহিয়া বলিল—"তবে ? আমরা যখন কোনো অপরাধ করিনি নিজেই স্বীকার করছ তখন তুমি নিজের পদ আবার নেবে তো ?"

"না।"

অমরনাথ নীরব হইয়া রহিল। উত্তর ক্ষুদ্র হইলেও তাহার সুস্পষ্টতায় সহসা নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া অমরের কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। সে ক্রোধ সম্বরণ করিতে চেষ্টামাত্রও না করিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল—"বেশ। আমার এতে স্বার্থ বেশী এমন কিছুই নেই, কেবল যে যেমন ছিল তাকে আমি সেই রকম রাখ্‌তে চাই, স্বার্থ এইটুকু মাত্র। তোমায় আমার কোনো উপবোধ শোনাতে আসিনি। আমার কর্ত্তব্য আমি করে গেলাম।"

সুরমা ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া ফেলিল—"তা আমি জানি। তোমার নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যের অনুগ্রহে আমি সুখী হলাম।"

অমরনাথ সক্রোধপদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়া উদ্যানে কতক্ষণ একাকী বেড়াইয়া বেড়াইল। অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে আলোক জ্বলিল। তাহা দেখিয়া চেতনা পাইয়া সহসা তাহার মনে হইল চারু একলা আছে। তখন সে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ চলিয়া গেলে সুরমা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে কিছুই যেন হয় নাই এমনি ভাবে সে কাঠের বাক্সটা খুলিয়া পুনবার পশম ও কার্পেটখানা লইয়া গবাক্ষের নিকটে গিয়া বসিল।

বিশেষ মনোযোগের সহিত শেলাই করিতে চেষ্টা করিলেও অনেক কথাই তাহার মনে আসিতেছিল। আর একদিনের নির্জ্জন কক্ষের কথোপকথনের এক একটা কথা মনে পড়িল। সেদিনও উপসংহার হইয়াছিল কলহে, আজও তাই। স্বামী স্ত্রীতে তাহাদের ব্যাকালাপটি বড় নূতন রকম ও সুন্দর হয়! সুরমার নিতান্ত কার্য্যাসক্ত ভাব প্রকাশের চেষ্টার উপরেও তাহার মৌন নীরব ওষ্ঠে একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল, "স্বামী স্ত্রী! ঠিক, তাই তো!"

স্বামীর সেদিনের তাচ্ছিল্য বাক্য একটী একটী করিয়া তাহার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সেদিন সে যে পূর্ব্বে কিছু না জানিয়া বিশ্বস্ত হৃদয়ে স্বামীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং স্বামী তাহাকে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, সেই আত্মাপমান বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার মনে ওতপ্রোতভাবে জাগিয়া ছিল। আর আজ! আজ তিনিই নিজে হইতে তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিই বলিলেন —কোমল কণ্ঠেই বলিয়াছেন—এটা আশ্চর্য্যের কথা কিছু নয়—যে, সেই অপমানিতা সুরমারই একটা আকস্মিক খেয়াল তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। তিনি বুঝিতে বাধ্য হইয়াছেন যে সুরমা এত ঘৃণ্যা নয় যে, সে তাহার ক্ষমতাটুকু প্রত্যাহার করিলে কাহারো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধির কারণ হয় না। এ সংসারে সেও অনেকখানি স্থান লইয়া আছে।

যে-স্থান সে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যে ত্যাগ করিয়াছে সেই-স্থানই আজ তাহাকে নিজে সাধিয়া দিতে আসিতে হইয়াছিল। অমরকে যে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া সে ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে ইহা মনে করিয়া একটা বিজয়ানন্দে সুরমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে মনে করিল আরও যদি তাহার কাছে কোনো ক্ষমতা থাকে তাহা প্রয়োগ করিয়া অমরকে অধিকতর উৎপীড়িত চঞ্চল পরাজিত করিতে পারিলে না জানি তাহার কত আনন্দই হইবে।

শ্রান্তি ও বিরক্তি বোধ হওয়ায় সেলাইটা রাখিয়া দিয়া সুরমা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। কয়েকদিন হইতে শুধু কার্পেটের ঘর গুনিয়া ও সূচে পশম পরাইয়া তাহার অশ্রান্ত কর্ম্মরত হৃদয় কেমন ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। চেষ্টা করিয়াও তাহার মধ্যে নিজেকে সে নিবিষ্ট রাখিতে পারিতেছিল না। অন্যমনে সে বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখেই তাহার একলার সম্পূর্ণ অধিকারের কতদিনের যত্নে নিয়ন্ত্রিত গৃহস্থালী। এ কয়দিন সে চক্ষু মেলিয়াও তাহার পানে চাহে নাই বা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার বিষয়ে চিন্তা করে নাই। আজ অমরের আহ্বানে তাহার অভাবে তাহার গুছানো গৃহস্থালীর কতখানি ক্ষতি হইয়াছে দেখিবার জন্য তাহার চক্ষুও কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

সুরমা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুঃখে আনন্দে দেখিতে লাগিল, চারিদিকে অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা। নূতন নিয়োজিত ভাণ্ডারী যথানিয়মে কতকগুলা দ্রব্য বাহির করিয়া দিয়া চাবী লইয়া কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে। রন্ধনশালার উঠানে মাহাল হইতে আনীত কতকগুলা মাছ রাশীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে। দাসীর মধ্যে কেহ বা কাহাকেও তিরস্কার করিতেছে "মাছগুলো যে প'চে উঠ্‌ল কুটবি কিনা?" দ্বিতীয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল "আমি এখন বলে মর্‌ছি নিজের জ্বালায়, আমি মাছ কুটব? মাছ কুটেই বা কি হ'বে? নতুন বামুনঠাকুর যে ব'য়ে রাঁদ্‌ছে, মাগো, ভূতেও তা খেতে পারে না। কতকটা কাঁচা থাকে কতক যায় পুড়ে। আর তেল বার করে দেবেই বা কে? মাহাল থেকে যেসব প্রজা মাছ নিয়ে এসেছে তাদেরই বা চা'ল ডাল বার করে দেয় কে? ভাঁড়ারীটা গেছে কোন চুলোয়?"

তৃতীয়া ঝি বলিল—"কে জানে, কোথায় কোন্ তামাসা হচ্চে, তাই দেখ্‌তে রাতের মত সে গেছে।"

সহিস বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া হাঁকিল—"কয়্ রোজ্‌সে দানামে স্রেফ কমতি পড়তা হায় আউর পান্‌সের দানা চাহি—হো ভাণ্ডারীজী!"

একজন ঝি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে মলোরে! মিন্সে-ভাণ্ডারী এখানে কাঁহা? খুঁজে নে গে, হিঁয়া সে নেই। তোদের'ও দানা চুরী কর্‌বার বড় ধুম পড়ে গিয়েছে, না?"

"হাঁ হাঁ হাম্‌লোগ দানা চোরী কর্‌তে হেঁ, আউর তুম্ খালি পূজাপর রহতে হো। দেখো তো কেয়া মুস্কিল। হর্‌রোজ এইসা হোতা হায়।" সহিস বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

খান্‌সামা রামচরণ আসিয়া সগর্জ্জনে মুখ চোক্ ঘুরাইয়া বলিল—"কেবল মাগীগুলো দালালী কর্‌তে জানিস্! বাবু বাইরে আজ কত বক্‌লেন, দাওয়ানজী আবার আমাকে বক্‌লেন। মাগীরা ওপরগুলো ঝাঁট পাট দিস্‌নি কেন বল্‌তো?"

চাকরাণীরা তখন সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"আ গেল যা। উনি এলেন সরফর্দ্দাজি কত্তে। আমরা নীচের কাজ করি এতেই আমরা অবসর পাইনে। বামা ক্ষান্ত তারাই তো ওপরের কাজ কর্‌ত।"

"তাদের তো তোরাই ঝগড়া ক'রে তাড়িয়েছিস! নতুন ঝিটেকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিস্‌নে কেন! ছোট বৌমা আছেন, আমি যে ওপরে যেতে পারি না।"

"হ্যাগো হ্যাঁ তুমি ভারী কর্ম্মী! বামাকে আমি তাড়িয়েছি! সে কর্‌ল ঝগড়া, বদ্‌নাম আমার। এই চম্ আমি, এত নাক্‌নাড়া কিসের? যে বাড়ীতে বিচের নেই, কত্তা গিন্নি নেই, সে বাড়ীতে আবার লোকে থাকে?"

"যা মাগী বেরো। তোর মতন ঝি ঢের পাওয়া যাবে। ভাঁড়ারীখুড়ো আচ্ছা মজা কল্লে। সরকারকে ডেকে এনে তালা ভাঙতে হবে দেখছি। নইলে লোকগুলো কি না খেয়ে থাক্‌বে? বাপ্‌রে আমিও তো আর পারি না।"

সুরমা বারান্দা হইতে অপসৃত হইল। তাহার মনে হইল অমরনাথ একবার এইগুলা দাঁড়াইয়া দেখিলে তবে তাহার যথার্থ আনন্দ বোধ হইত। যাহার ক্ষোভের জন্য এত আয়োজন করা হইয়াছে সে সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহা উপভোগ না করিলে সকলই ব্যর্থ; ব্যর্থ চেষ্টা নিজের অঙ্গেই আসিয়া বিঁধে।

তখন রাত্রি হইয়াছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুরমা ক্ষণেক কি ভাবিল, তার পরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। দেখিল সম্মুখেই অমরনাথের শয়নগৃহের দ্বারে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। অস্পষ্টালোকেও সুরমা বুঝিল সে চারু,—চারু যেন তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ অগ্রসর হইতেছে বোধ হইল। অমনি সুরমা ফিরিয়া যেন কোনো কার্য্যব্যপদেশে একটু ত্বরিতপদে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার বোধ হইল চারু যেন তাহাকে তিরস্কার করিতেই অগ্রসর হইতেছিল। সুরমা আর পশ্চাতে চাহিতে পারিল না।

সম্মুখেই দ্বিতলারোহণের প্রশস্ত সোপানশ্রেণী। কে একজন সোপানারোহণ করিতে করিতে অন্ধকারে হোঁচট খাইয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল 'আঃ'। সুরমা বুঝিল সে অমরনাথ। ত্রস্তপদে সুরমা কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তারপর শুনিতে পাইল অমর নিরুপায় ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উচ্চকণ্ঠে রামচরণ রামচরণ বলিয়া

ডাকিতেছে। বহুক্ষণ ডাকাডাকির পরে পরিচারক আসিয়া আলোক দেখাইলে অমরনাথ নিজ কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল। তারপরে নূতন ঝির সঙ্গে বহুকলরব করিয়া রামচরণ তাহাকে যেখানে যেখানে যে যে আলোক দিতে হইবে তাহার উপদেশ দিতেছে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে নূতন ঝি আলোক লইয়া তাহার কক্ষদ্বারে আসিয়া আঘাত করাতে অগত্যা সুরমাকে উত্তর দিতে হইল যে, আলোকে তাহার আজ কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

প্রভাতে যখন সুরমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ শার্সিবদ্ধ গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া তাহার নেত্রের উপরে প্রখর জ্বালা প্রদান করিতেছিল। পূর্ব্বাভ্যাস মত সুরমা সচকিতে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়া বলিল—"ও এত বেলা হ'য়ে গিয়েছে।" তার পরে মনে পড়িল এখন বেলা হউক না হউক সমান কথা। সে নিজে হইতেই আপনাকে এই অলসতার মধ্যে টানিয়াছে, নিজেই নিজেকে এই শয্যায় এই গৃহে আবদ্ধ করিয়াছে, নহিলে তাহার দ্বারে এতক্ষণ কতবার আঘাত পড়িত। সুরমা নীরবে কিছুক্ষণ শয্যার উপরে বসিয়া রহিল। এই কর্ম্মহীন কর্ত্তব্যহীন প্রভাত তাহার কাছে একান্ত নিরানন্দ রূপে প্রতিভাত হইল।

কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুরমা বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়া অন্য মনে একটা থামের গা খুঁটিতে লাগিল। সুরমা ভাবিতেছিল এমন নিষ্কর্ম্মা অলসতায় তো তাহার দিন কাটিবে না, একটা কিছু তাহাকে করিতে হইবেই। অথচ কোথা হইতে তাহার পুনরারম্ভ এবং সে কার্য্যটাই বা কি তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। নীচে চাহিয়া দেখিল চাকরাণীমহলে তখন সবেমাত্র বসিয়া বসিয়াই কেহ হাই তুলিতেছেন, কেহ চোখ রগড়াইতেছেন, কেহ বা পা ছড়াইয়া বসিয়া গতরাত্রের মশার দৌরাত্ম্যে অনিদ্রার বর্ণনা করিতেছেন; শয্যাত্যাগ সবে আরম্ভ হইয়াছে, বাসী কাজ সব অমনি পড়িয়া রহিয়াছে। দারুণ বিরক্তিভরে সুরমা রেলিং হইতে মুখ বাহির করিয়া ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল "বিন্দি"। সঙ্গে সঙ্গে চাকরাণীমহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যে যাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে লাগিয়া গেল। বিন্দি সভয়ে উপর পানে চাহিয়া বলিল "আজ্ঞে ওপরে যাব কি মা?" "কি, ইচ্চে কি তোদের? এত বেলা হয়েছে—" পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া সুরমা চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল অমরনাথ। লজ্জায় সুরমার দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, ছিছি অমরনাথ তো তাহার এ দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইল!

অমরনাথ কোনো কথা না বলিয়া যেমন যাইতেছিল তেমনি ভাবে নীচে চলিয়া গেলেও তাহার নিকট ধরা পড়ার লজ্জার হাত এড়াইবার জন্য সুরমা সবেগে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়া অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল কিরূপে অমরনাথের নিকট হইতে এ লজ্জাটা ক্ষালন করা যায়।

সম্মুখেই অমরনাথের শয়নকক্ষের মুক্ত দ্বার। পালঙ্কে তখনো কে শুইয়া রহিয়াছে দেখা গেল। সুরমা থমকিয়া দাঁড়াইল, বুঝিল চারু শুইয়া আছে। ধীরে নিঃশব্দে ফিরিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, চারু ক্লান্ত ভাবে পাশ ফিরিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বলিল "মা-আঃ"। সুরমা চলিয়া যাইতে চাহিতেছিল, পা দুটা কিন্তু থামিয়া গেল। মনটা ধীরে ধীরে বলিল, "অসুখ করেছে বোধ হয়। দেখা উচিত নয় কি? দেখে আর কি করব? তার স্বামী আছে, তার চেয়ে দেখবার লোক আর কে হতে পারে। আমি দেখে আর কি করতে পারব। তার চেয়ে বরং যাই কাজ দেখিগে। কিন্তু কাজই বা আর কি আছে? কই স্বামী তো বেরিয়ে গেল, কোনো উদ্বিগ্ন ভাব তো দেখ্‌লাম না, জানেনা না কি? নাঃ—দেখেই আসি।"

সুরমা নিঃশব্দপদক্ষেপে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কের নিকটে দাঁড়াইল। দেখিল ম্লান বিষণ্ণ মুখে চারু চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিয়াছে। যন্ত্রণার কাতর চিহ্ন ক্ষুদ্র ললাটে ফুটিয়া উঠিতেছে, ভাসা ভাসা চক্ষের নীচে মলিন ছায়া। রুক্ষ অযত্নরক্ষিত চুলগুলা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মুখখানি যেন অতিশিশুর মত, দেখিলেই মায়া হয়, আদর করিতে ইচ্ছা করে। সুরমা নতনেত্রে তাহার মুখের উপর চাহিয়া ভাবিতেছিল "আহা অসুখ করেছে।"

আবার চারু ভ্রূকুটী একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল "মাগো—ওঃ।" সঙ্গে সঙ্গে ললাটে শীতল করস্পর্শ হইল। স্নিগ্ধ স্পর্শে সচকিত ভাবে চারু চাহিল,—চাহিয়া দেখিল নিকটে সুরমা দাঁড়াইয়া আছে। মাথার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া চারু এতক্ষণ তাহার মৃতা জননীকে মনে মনে ভাবিতেছিল, চোখ্ মেলিয়াই প্রথমে মনে হইল মা বুঝি। তারপরে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল যেন তাঁহারি মত স্নেহ ও করুণাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া কে একজন তাহার উত্তপ্ত ললাটে শীতল হস্ত বুলাইতেছে। 'দিদি' বলিয়া চারু উঠিয়া বসিয়া সবেগে সুরমার হাত ধরিয়া নিকটে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া সুরমা তাহার নিকটে উপবেশন করিল। চারু তখন সুরমার আরও নিকটস্থ হইয়া তাহার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বলিল 'দিদি'।

সুরমার ভিতরটা যেন কি রকম করিয়া উঠিল। একটি আত্মসমর্পণকারী নিরুপায় অসহায় শিশু যদি করুণনেত্রে মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে নিকটে অগ্রসর হয় তখন তাহাকে স্নেহাবেগে যেমন সজোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে একটা উন্মত্ত ইচ্ছা হয়, চারুর এই শিশুর মত ব্যবহারে সুরমার অন্তরটা তেমনি করিয়া আন্দোলিত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বাসটা কতকটা দমন করিয়া সুরমা চারুর মাথা আপনার কোলে লইয়া তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে তাহার ললাটে হস্তমার্জ্জনা করিতে করিতে মৃদুস্বরে বলিল "এত জ্বর হয়েছে!" তারপর চারুর নিমীলিত নেত্রের উপর ধীরে ধীরে অঙ্গুলিমার্জ্জনা করিতে করিতে সুরমা বলিল—"মাথা ধরেছে কি তোমার?"

চারু কাতর নেত্রে চাহিয়া বলিল—"বড্ড।"

সুরমা ধীরে ধীরে মাথা টিপিয়া দিতে দিতে বলিল—"একটু সোয়াস্তি হচ্ছে কি?"

"আ! তোমার হাত বেশ ঠাণ্ডা দিদি! বড্ড ভাল লাগ্‌ছে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুরমা চারুর ম্লান মুখখানির চিবুক স্পর্শ করিয়া সস্নেহ কণ্ঠে বলিল—"কবে থেকে অসুখ হয়েছে চারু?"

"আজকে রাত্রে জ্বর হয়েছে। কাল দুপুর থেকে বড্ড মাথা ধরেছিল।

"মাথা ধরেছিল তা কাল আমার কাছে যাওনি কেন, আমায় ডাকনি কেন?"

"সন্ধ্যে বেলায় তুমি যখন দালানে দাঁড়িয়ে ছিলে তখন যাচ্ছিলাম। তুমি আমায় দেখ্‌তে পাওনি দিদি, তুমি চলে গেলে।"

অনুতাপের আবেগে সুরমা বলিয়া ফেলিল—"দেখ্‌তে পাবনা কেন, দেখেও চলে গিয়েছিলাম—আমি তখন যে একেবারে—" বলিতে বলিতে সুরমা হঠাৎ থামিয়া গেল।

"আমার অসুখ হয়েছে তখন তো জান্‌তে না—নয় তো কি আমায় না দেখে তুমি চলে যেতে পারতে—নয় দিদি?"

সুরমা মনে মনে ভাবিল—"তা আমায় বড় বিশ্বাস নেই। ভাগ্যে সে রাগের সময় চারু বেশী সাহস করে কাছে যায়নি, গেলে হয়ত কি বলে বস্‌তাম।"

চারু সুরমার হাতখানি তুলিয়া কপোলের উপর রাখিয়া বলিল—"আঃ ভারী ঠাণ্ডা।"

"এখনো কি তেমনি মাথা ধরে আছে চারু?"

"হ্যাঁ দিদি।"

"একটু অ-ডি-কলোন দিলে ভাল হ'ত" বলিতে বলিতে সুরমা উঠিয়া পড়িল। টেবিলের উপরে, সেল্‌ফের উপরে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া শেষে গ্লাশকেসের দিকে চাহিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল—"গেল কোথায়? দেরাজে, টেবিলে ৩।৪টে শিশি ছিল যে।"

চারু ঈষৎ মাথা তুলিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিল—"মধ্যে মধ্যে মাথা ধরে তাই খরচ হয়ে গেছে বোধ হয়।"

"কার মধ্যে মধ্যে মাথা ধরে?"

চারু শয্যায় মুখ লুকাইয়া মৃদু স্বরে বলিল—"তাঁর।"

"তা ফুরুলে বুঝি আনিয়ে রাখতে নেই? আর কখনো দরকার পড়্‌বেনা বুঝি? খুব গোছাল মানুষ তো। শিশিগুলোও উড়ে গেল নাকি?"

"বাক্‌সের পাশে টাশে পড়ে আছে বোধ হয়।"

"একটা অডিকলনের দরকার হ'ল যে। বিন্দিকে ডেকে বলি।"

"না দিদি তুমি যেওনা তোমার ঠাণ্ডা হাতেই মাথা সেরে যাবে। যেওনা।"

"পাগ্‌লী আর কি! উঠিস্ নে, আমি এই এলাম ব'লে।"

সুরমা চলিয়া গেল। অনতিবিলম্বে একটা অডি-কলোনের শিশি ও খানকটা নেকড়া হাতে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল চারু প্রত্যাশিত নয়নে দ্বারের পানে চাহিয়া আছে। সুরমা তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুভাবে তাহার গাল দুটি টিপিয়া দিল। আহ্লাদে এক মুখ হাসিয়া চারু বলিল—"আমার ভয় করছিল, হয়ত দিদি আসবে না।"

সে কথার উত্তর না দিয়া সুরমা বলিল—"কাঁচের গ্লাশ বাটি কিছুই দেখছি না, যে রকম গুছোন ছিল সব উল্টে পাল্টে গেছে। আল্‌মারীর চাবী কই?"

"চাবী! আমি তো জানিনে দিদি! হয়ত বিছানার তলায়—"

"ব্যস্ত হ'য়ো না আমিই খুঁজে নিচ্ছি।"

সুরমা শয্যার চারিধার খুঁজিল চাবী মিলিল না। ইহাতে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। বিরক্তিটা অমরনাথের উপরেই সম্পূর্ণ ভাবে পড়িল। ভাবিল মানুষ এত অমনোযোগী কিরূপে হয়? সহসা নিজের কথাও যে না মনে পড়িল তাহা নয়। মনে হইল মানুষের মন বিক্ষিপ্ত হইলে অতি কার্য্যকুশলীও এইরূপে নিষ্কর্ম্মারূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

মাথায় অডিকলোন দেওয়ার ব্যাপার শেষ হইলে চারুর মাথা বালিশের উপরে রাখিয়া, মৃদু মৃদু বাতাস করিতে করিতে সুরমা বলিল—"এখন একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর দেখি। ডাক্তার ডাকতে বলেছি, একটা ওষুধ দিলেই জ্বরটা ছেড়ে যাবে এখন।"

"আমি কিন্তু তেতো ওষুধ খাবনা দিদি। নরেশ ডাক্তারের বড্ড বিশ্রী ওষুধ।"

"নরেশ ডাক্তার কল্‌কাতার বুঝি? এ কালীপদ ডাক্তার, হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করে। ওষুধ জলের মত খেতে। ঘুমোও দেখি একটু।"

চারু দিদির আজ্ঞামত ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—"না দিদি ঘুম আস্‌চেনা। তার চেয়ে এস গল্প করি।"

"এখন বকা ঠিক নয়। ঘুমোও। আচ্ছা তোমার যে জ্বর হয়েছে উনি কি জানেন না নাকি?"

"জানেন না বোধ হয়। বেশী রাত্রে জ্বরটা এসেছে কিনা।"

"সকালে যখন উঠে গেলেন তখনো জানেন নি?"

"আমি তখন ঘুমুচ্ছিলাম।"

"মাথা তো কাল দুপুর থেকে ধরেছে। তাও কি জানেন না?"

"তা জানেন বোধ হয়। হাঁ বিকেলে তিনি জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলাম।"

"তা আর কোনো খোঁজখবর নেই। কল্‌কাতায় তোমাদের কি এমনি ক'রে দিন কাট্‌ত? সেখানে অসুখ হ'লে কে কাকে দেখ্‌ত?"

"তারিণী দাদা ছিলেন যে। বেশী অসুখ হ'লে উনিও দেখ্‌তেন।"

"বেশী ব'কে কাজ নেই আর। একটু ঘুমোও।"

চারু পুনর্ব্বার ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল। সুরমা বুঝিল অমরনাথ আসিতেছে। সে ত্রস্তে শয্যা হইতে নামিয়া পার্শ্বস্থিত দ্বার খুলিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। অমরনাথ দ্বারের সম্মুখে আসিয়াই ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল 'চারু,' দেখিল চারু পালঙ্কে ঘুমাইয়া আছে। এমন অসময়ে তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া অমরনাথ ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্তর্পণে একবার তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল। এমন সময় একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল ডাক্তার আসিয়াছে। অমরনাথ তাড়াতাড়ি অথচ সন্তর্পণে বাহিরে গিয়া ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

ডাক্তার চারুর হাত দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"কবে জ্বরটা হ'য়েছে?"

অমরনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"ঠিক জানি না, কালই হয়েছে হয়ত। ডেকে জিজ্ঞাসা করব কি?"

"না তাতে কাজ নেই। সাধারণ জ্বর, তবে একটু বেশী রকম বটে। চিন্তার বিষয় কিছুই নেই। আমি

এখন যাই, ওষুধটা বার কত খেলেই সেরে যাবে। কিন্তু যেন নিয়মিতরূপে খাওয়ান হয়।"

ডাক্তার চলিয়া গেল। তাহার সশব্দ জুতার মস্মসানিতে চারুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোক খুলিয়াই চারু ডাকিল—"দিদি—"

অমরনাথ সস্নেহে তাহার ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিল—"এত জ্বর কখন হ'ল ?"

"তুমি ? তুমি কখন এলে ? দিদি কোথায় গেলেন ? দিদি।"

অমরনাথ বিস্মতভাবে বলিল—"কাকে ডাক্‌ছ ? ঘুমোও দেখি আবার। এমন জ্বর হয়েছে, কই সকালে তো আমায় কিছু বলনি।"

"আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। কাল রাত্রে জ্বর হয়েছে। তোমায় কে বল্লে ?"

"তোমায় অসময়ে ঘুমোতে দেখে গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম গা খুব গরম। তারপরে ডাক্তারও এল। ডাক্তারকে ডাকাবার সময় আমায়ও জানাওনি কেন চারু ?"

চারু বিস্মিতভাবে বলিল—"কই আমি তো ডাক্তারকে ডাকাইনি।"

"তুমি ডাকাওনি ? তবে কে ডাকালে ? বোধ হয় ঝিরা কেউ বুদ্ধি করে ডাকিয়েছে। যাক্ সকালে আমাকে ডাকিয়ে জ্বরের কথা বলা তোমার উচিত ছিল চারু।"

চারু অপ্রতিভ ভাবে বলিল—"কাকে দিয়ে ডাকাব,—দিদি বারে বারে ঘুমুতে বল্লেন —"

বাধা দিয়া অমরনাথ বলিল —"দিদি কে ? বারে বারে কাকে ডাক্‌ছিলে ?"

চারু বিস্মিতভাবে বলিল—"দিদি আবার কে, আমার দিদি, তিনি যে এখানে ছিলেন।"

অমরনাথ এতক্ষণে বুঝিল। একটু থামিয়া পরে বলিল—"কই না, কেউ তো ছিল না, তুমি তো একা ঘুমুচ্চিলে।"

"তবে বোধ হয় তুমি আসবার আগেই তিনি চলে গিয়েছিলেন।"

"তুমি হয়ত স্বপন দেখেছ। মাথা কি ধরেছে ? অডিকলোন দিয়েছিলে বুঝি ?"

"এখন কমে গেছে, আর নেই বল্লেও হয়। তুমি বল্লে দিদি ছিলেন না, স্বপন দেখেছি, এই গ্যাখ তিনিই মাথায় এটা দিয়ে দিয়েছিলেন, কত বাতাস কল্লেন তবে তো মাথাটা কম্‌ল। নইলে যে মাথা ধরেছিল - উঃ।"

কক্ষান্তরে সুরমা চারুর উপর রাগিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। "আঃ মেয়েটা যেন কি! এমন বোকা তো দেখিনি। ছিছি বারণ করে দিতেও ভুলে গেলাম।"

অমরনাথ বলিল -"তা হ'বে। এখন আর একটু ঘুমোও দেখি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সুন্দর

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত,
স্বর্ণেরত্নে শোভন লোভন জানি
বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে,
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে।
গরুড়ের পাখা রক্তরবির রাগে
যেন গো অস্ত-আকাশে।

জীবন-শেষের শেষজাগরণ সম
ঝলসিছে মহাবেদনা।
নিমেষে দহিয়া যাহা কিছু আছে মম
তীব্রভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত,
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি,
চরম শোভায় রচিত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমুদ্র-যাত্রা

[আন্দ্রে ত্যুরিয়ে লিখিত "ল্য ভোআইআজ দ্য পেতি গাব" নামক মূল ফরাসী গল্প অনুসরণে]

আমার ঘরের জানলা হইতে যে খোলার বাড়ীর চত্বর দেখা যাইত তাহারই একদিকে এক পরিবার বাস করিত। সেই পরিবারের ছোট ছেলেটিকে সবাই 'ছোট গাব' বলিয়া ডাকিত। তার বাপ ছিল এক কাটাকাপড়ের দোকানের দর্জি; তার মা ছিল চিররুগ্ন দুর্ব্বল, সে বসিয়া বসিয়া শুধু স্বাস্থ্যের তদ্বির আর আরাম উপভোগ করিত। তাহাদের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে বড় তিনজনের কেউ বা বিদেশে চাকরি করে, কেউ বা বিবাহের পর পরের ঘর করিতেছে। বাপমার সঙ্গে থাকে শুধু একটি মেয়ে—বয়স তাহার আঠার বৎসর, সেও সেলাইয়েরই কাজ করে; আর থাকে ছোট গাব—সে কুঁজো।

তাহার বাপ মা তাহাদের জীবনের বেশির ভাগ আলো-বাতাস-শূন্য স্যাঁতা ঘরে আর দোকানের গোমসানির মধ্যে কাটাইয়াছে, তাহার ফলে ছোট গাব একেবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল। তাহার শিরদাঁড়া ধনুকের মতো বাঁকিয়া কাঁধ দুটাকে কানের কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পলকা পা ত্রিবক্র দেহের ভারে নড়নড় করিত; তাহার কুঁজো পিঠ আর চিতনো বুকের উপর একটা প্রকাণ্ড মাথা বসানো। কিন্তু তাহার মুখখানি ছোট, করুণনম্রতায় কমনীয়, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় উজ্জ্বল। যদিও তাহার বয়স আট বৎসর, কিন্তু তাহার গ্রন্থিল খর্ব্ব দেহ দেখিয়া পাঁচ বৎসরের বেশি বলিয়া বোধ হইত না; কিন্তু তাহার ভাবনা গম্ভীর মুখ, প্রশস্ত কুঞ্চিত ললাট আর কালো চোখের করুণ চিন্তাকাতর দৃষ্টি দেখিয়া তাহাকে প্রবীণ বলিয়া বোধ হইত।

তাহার বাবা মা আর দিদি তাহার ঠাণ্ডা স্বভাব আর অসাধারণ বুদ্ধিবিবেচনার গল্প করিতে ভালো বাসিত—গাবের কথা বলিতে তাহারা অজ্ঞান। ডাক্তারের মানা তাহাকে কোনো কাজ করিতে দিবে না; তবু তাহাকে খুসি করিতে, বৈচিত্র্যের আনন্দ দিতে তাহারা উহাকে স্কুলে দিয়াছিল। সেখানে সে গম্ভীর হইয়া বসিয়া পড়া শুনিত, আর, যাহা শুনিত তাহা ঠিক মনে করিয়া রাখিত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা স্কুলের ছুটির পর আমি দেখিলাম সে বাড়ীর দরজার গোড়াটিতে বসিয়া আছে। তাহার মা বাজারে কিছু কেনাবেচা করিতে বাহির হইয়া গেছে, তাহার দিদি এখনো দোকান হইতে বাড়ী ফিরে নাই, ঘরের দরজায় তালা বন্ধ। দেয়ালে ঠেস দিয়া তাহার করুণ নেত্রের উৎসুক দৃষ্টি পথের উপর মেলিয়া দিয়া চুপটি করিয়া সে বসিয়া আছে। আমি তাহার এই বিমর্ষ নিঃসঙ্গ ভাব দেখিয়া আদর করিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, সে ভয়চকিত কালো চোখ দুটি তুলিয়া আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহার দিদি রুদ্ধশ্বাসে হন হন করিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল—"আহা বাছারে, মরে যাই! তোমায় আমি দরজার গোড়ায় বোস করিয়ে রেখেছি—আ আমার পোড়া কপাল! তুমি কি আমার দেরি দেখে ব্যস্ত হচ্ছিলে ভাইটি?" গাব তাহার শান্ত মধুর কণ্ঠে ধীর পরিষ্কার উত্তর দিল—"না দিদি, আমি কেবল ভাবছিলাম তুমি হয়ত আমাকে ভুলে গেছ, আর কখনো আমার কাছে ফিরে আসবে না ...... আমি এমন রোগা, আমি এমন তোমাদের জ্বালাই!" দিদি ভাইটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া চুমায় চুমায় সোহাগ করিয়া স্নেহের অনুযোগ দুঃখের মাঝে ডুবাইয়া মৃদু গুঞ্জনে বলিতে লাগিল—"দুষ্টু ছেলে! দুষ্টু ছেলে!" তারপর ভ্রাতৃস্নেহের আরতির জলশঙ্খের মতো তার চোখ দুটি জলে ভরিয়া লইয়া আমার দিকে ফিরিয়া সে বলিল—"একরত্তি ছেলে, কিন্তু কত এর বুদ্ধি! ডাগর মানুষের মতো ওর বুদ্ধিবিবেচনা! ...... আমাদের অদৃষ্টের দোষেই এর এমন অসুখ! ...... ডাক্তার বলছে যে একে একবার সমুদ্রের ধারে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যেতে পারলে অসুখ সেরে যেতে পারে। কিন্তু সমুদ্র তো নিকটে নয় ...... সমুদ্রে হাওয়া বদলাতে যাওয়া মানে এক কাঁড়ি টাকা খরচ। ...... তবু আমাদের যেতে হবে, প্রাণের চেয়ে তো আর টাকা বড় নয়। ...... প্রাণপণ করে তাই তো চেষ্টা করছি যদি কিছু জমাতে পারি! ......"

মেয়েটি দিবারাত্রি খাটিতেছে—টাকা জমাইতে হইবে।

সে সেলাইয়ের কলের গোড়ায় বসিয়া পটি আর বখেয়া আর সেলাই আর ফোঁড় দিতে দিতে আপনাকে গুরু শ্রমে পিষিয়া একেবারে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছিল। সে এই কাটে, এই জোড়ে, এই ফোঁড়ে, এই সেলাই করিয়া তোলে—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই! গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শুনি তাহার লোহার সেলাই-কলের তীক্ষ্ণ সূচীর ব্যস্ত ফোঁড়ের করুণ আর্ত্তনাদ—পাড়াগাঁয়ের আলের ধারে অতন্দ্র ঝিঁঝির একটানা সুরের মতো; তাহার ঘরের জানলা-ঢাকা পর্দ্দার উপর তাহার একাগ্র আনত কর্ম্মরত মূর্ত্তিখানির কৃষ্ণ ছায়া প্রদীপের আলোয় স্পষ্ট আমি দেখিতে পাই, আর তখনি আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরিয়া বাজিয়া উঠে টমাস হুডের সেই ভীষণ করুণ অমর গানের ধুয়া—

"খাটো শুধু খাটো আর খাটো,
ভোর না হতে পাখী যখন ডাকে,
খাটো খাটো, যতক্ষণ না আসে,
তারার আলো ভাঙা চালের ফাঁকে;
মুড়ি আর সেলাই আর ফোঁড়,
ফোঁড় আর সেলাই আর মুড়ি,
যতক্ষণ না বক্ষ উঠে কাঁপি,
বাহু অসাড়, মাথা উঠে ঘুরি।"

পাড়ার সকল লোকেই গাবকে চিনিত, আদর করিত, এবং তাহার দিদিকে কিছু না কিছু কাজ করিতে দিত। তাহারা গাবকে দেখিতে পাইলেই তাহাকে ধরিয়া আদর করিত, খাবার দিত, পুতুল দিত। সে মুখচোরা, লাজুক, পাড়াপড়শীর আদরের ভয়ে পাশ কাটাইয়া সকলকে এড়াইয়া চলিত; যদি কখনো কাহারো আদর বা দয়ার দান তাহাকে স্বীকার করিতে হইত তাহা হইলে সে গম্ভীর হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া দিদিকে জিজ্ঞাসা করিত—"আচ্ছা দিদি, ঐ তেতালা বাড়ীর গিন্নি আমাকে খেলনা দিলে কেন, ও তো আমায় চেনে না?" তারপর ভাবিয়া ভাবিয়া সে তাহার দিদির অন্তর ব্যথিত করিয়া বলিয়া উঠিত—"ও! আমি কুচ্ছিত কুঁজো কিনা!"

কাজ আসিয়া জুটিতে লাগিল যথেষ্ট, আর পেঁটরার গোপন কোণে গেঁজের পেটও ভরিয়া উঠিতে লাগিল চটপট। আষাঢ়ের আসিতে আর বিলম্ব নাই, তাহারাও যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল; একটা চামড়ার পোর্ট-মাণ্টো আর খোকার জন্য একটা পোষাক কিনিল। এদিকে ছোট গাব খুসির চোটে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, সঙ্গীদের সঙ্গে সমুদ্রের প্রসঙ্গ ছাড়া তাহার আর অন্য কথা ছিল না। কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় সব পণ্ড হইয়া গেল।

পাঁচ নম্বরের ভাড়াটে বাড়ীর বৌ তাহার বিয়ের পোষাক দর্জিমেয়েকে নূতন ধরণে সাজাইয়া গুছাইয়া মেরামত করিতে দিয়াছিল। এই পোষাকটির দাম ঢের, এইটিকেই একটু নূতন ঢঙে বদলাইয়া আগামী শীতের উৎসবটা কাটাইয়া দিবে বৌটি এই মতলব করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা দিদির কাছে বসিয়া বসিয়া গাব সেলাই দেখিতেছিল এবং অন্যমনস্কভাবে একটা দোয়াত লইয়া খেলা করিতেছিল। হঠাৎ হাত হইতে দোয়াতটি উল্‌টিয়া গিয়া কালির ধারা পোষাকের সাটিনের উপর দিয়া তাহাদের দুর্ভাগ্যের মতো গড়াইয়া গেল। দিদি আর্ত্তনাদ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। গাবের ভয়পাংশুল শুষ্ক মুখ দেখিয়া দিদির মন বেদনায় ভরিয়া গেল, ভাইটিকে কি সে বকিতে পারে? সে তাড়াতাড়ি কানি দিয়া কাপড় হইতে কালি মুছিয়া লইল; তারপর মাপিয়া দেখিতে লাগিল দুর্ঘটনার পরিমাণ কতখানি। আট গজ কাপড় একেবারে কালিতে কলঙ্কিত হইয়া গেছে। উপায়? সে কি বৌটিকে গিয়া বলিবে গাব ছেলে মানুষ, দৈবাৎ তাহার পোষাক নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে? বৌটি যদিও ধনী নয় তবুও তাহার মনে দয়া হইতে পারে। ছিঃ! তাহার আত্মসম্মান-বোধের গর্ব্ব তাহাদের নিজের বিপদের কথা দশের কাছে ধরিয়া হট্টগোল বাধাইতে লজ্জা বোধ করিল। সে তখনি তাড়াতাড়ি দিব্য দৃপ্তভাবে বড়বাজারের চকে চলিয়া গেল এবং নমুনার সহিত মিল করিয়া আট গজ কাপড় কিনিয়া আনিল—পনর টাকা করিয়া গজের সাটিন! তাহার গেঁজের পেট অনেকখানি শূন্য করিয়া, সমুদ্রযাত্রা স্থগিত রাখিয়া, একশো কুড়ি টাকা বাহির হইয়া গেল! যাক! এ বৎসর সমুদ্রস্নানের আর কোনই আশা ভরসা নাই। দিদি ভাইটিকে বুকে চাপিয়া চুমু খাইয়া আবার কাজ করিতে লাগিয়া গেল।

শীত আসিল। খোলার ঘরে খাটুনির বিরাম নাই। শরৎকাল হইতেই এবৎসর বিষম বাদল চলিতেছে, এবং তাহার প্রভাব গাবের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছিল। তাহার পিঠের শিরদাঁড়া কনকন করে, জ্বর হয়, মাথা ধরে। ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িল এবং তাহাকে সমুদ্রের ধারে লইয়া যাইবার জন্য পুনরায় ব্যবস্থা করিল। এবার যাইতেই হইবে; যা থাকে বরাতে যত টাকাই লাগুক বসন্তের বাতাসে সমুদ্রবেলায় গাবকে লইয়া বেড়াইতেই হইবে। সেলাইয়ের কল ঝিল্লিঝঙ্কারে দ্রুততর চলিতে লাগিল—রাতদিন দিনরাত! তাহারা গাবকে সান্ত্বনা ও সবুর করাইবার জন্য একখানি রঙচঙে ছবির বই কিনিয়া দিয়াছে, তাতে শুধু সমুদ্র-দেশের ছবি—মাস্তলের অরণ্যে সজ্জিত বন্দর, তীক্ষ্ণচূড় খণ্ডশৈল ফেনিল শুভ্র তরঙ্গে তরঙ্গে পরিস্নাত, শাদা পাখীর ঝাঁকের মতো পাল-তোলা জেলেডিঙি সমুদ্রময় ছড়ানো!

সমুদ্রের কথা ছাড়া গাবের মুখে অন্য কথা নাই; সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখে সমুদ্র; সারাদিন জাগিয়া বসিয়া উঠানের উপর ধূসর কোয়াসার জটল্লা দেখিয়া মনে করে সমুদ্রের তটবালুকায় স্ফীত তরঙ্গ গড়াইয়া যাইতেছে, ফুলো পালের নৌকাগুলি তরঙ্গের সহিত আন্দোলিত হইতেছে। সে থাকে থাকে একটি শঙ্খ লইয়া কানের কাছে ধরিয়া স্থির নেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্রের চিরন্তন গর্জ্জন শঙ্খের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া শোনে। সুদূরের সমুদ্রগর্জ্জন শঙ্খের মধ্যে স্পন্দিত হইতে সে শুনিতে পায়।

শীত এবার স্যাঁতা আর বিষম কনকনে। আমি আর গাবকে তাহাদের দরজায় বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাই না। ডাক্তার তাহাকে ঠাণ্ডায় বাহির হইতে বিশেষ করিয়া বারণ করিয়াছে। কখনো কখনো জানলার পর্দা সরানো থাকিলে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতাম—তাহার বসা চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি শূন্যে সন্তরণ করিয়া ফিরিতেছে, আর আলোকিত শাসির গায়ে তাহার শীর্ণ আঙুল নৌকার অস্পষ্ট প্রতিরূপ অঙ্কনের চেষ্টা করিতেছে। হঠাৎ আমার ঘরের জানালায় দৃষ্টি পড়িলে, আমি তাহাকে দেখিতেছি দেখিয়া, সে বিরক্তির সহিত জানলার পর্দাটা টানিয়া দিত।

চৈত্রের মাঝামাঝি। আমি আর তাহাকে জানলার শাসির ধারেও দেখিতে পাই না। তাহার শিরদাঁড়া তাহাকে আর দাঁড়াইতে দিতেছিল না, তাহার দুর্ব্বল পা তাহাকে আর বহন করিতে পারিতেছিল না, তাহার মস্তকের ভারে শীর্ণ গ্রীবা ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে সমস্ত দিন তাহার ছোট বিছানাটিতে শুইয়া কাটায় আর দিনের মধ্যে শতেক বার ছবির বইখানির পাতা উল্টাইয়া সহস্র-বার-দেখা সমুদ্রের ছবিগুলি সে দেখে। সে এখনো সমুদ্রযাত্রার আশা ছাড়ে নাই। থাকিয়া থাকিয়া সে তাহার দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—"দিদি, আমরা কবে যাব?" দিদি তাহাকে আদর করিয়া বলে—"যাব ভাই যাব, শিগ্‌গিব যাব, তুমি আগে একটু ভালো হও।" ইহা শুনিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে গাব উত্তর করিত—"সেই জন্যেই তো আমি ভালো হতে ইচ্ছে করছি। কিন্তু চটপট কৈ সারছি দিদি? দিদি, তুমি যে কাঁদ আমি দেখতে পারিনে, আমি তো শিগগিরই সারব!" তারপর সে দিদির সঙ্গে সমুদ্রের গল্প জুড়িয়া দেয়—কোন্ কোন্ শহরের পাশ দিয়া কোন্ কোন্ দেশের ভিতর দিয়া সমুদ্রে পৌছিতে হইবে সব তাহার মুখস্থ। শেষকালে সে বলে—"একবার কোনো রকমে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারলে হয়, তারপর আর আমার কোনো অসুখ থাকবে না।" এবং উষার আভার মতো শঙ্খটি কানের কাছে তুলিয়া ধরিয়া সেই সুদূরের সমুদ্রের শব্দ একমনে শোনে—যাহার দর্শন পাইলে তাহার আর কোনো গ্লানি কোনো অসুখ থাকিবে না।

বৈশাখ মাস। আমি আর সেলাই-কলের ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে পাই না। খোলার ঘরে সেলাই আর হয় না। কিন্তু প্রদীপের আলো একটি জানলা দিয়া সোনালি আভায় আভাস দেয় যে পীড়িত শিশুর শয্যাপার্শ্বে নিশীথ জাগরণের বিরাম নাই।

একদিন প্রভাতে উঠিয়াই দেখিলাম একটি ছোট কফিন তাহাদের ঘর হইতে বাহির হইল, তাহার পশ্চাতে শোককাতর গাবের আত্মীয় স্বজন।

এতদিনে ছোট্ট গাব সকল রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া একাকী অনন্ত অজ্ঞাত মহাসমুদ্রের পথে যাত্রা করিয়া বাহির হইল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিকাশ

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই—
আমি ছিলাম অন্যমনে!
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই
সে যে রইল সঙ্গোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়,
স্বপন দেখে চম্‌কে উঠে চায়,
মন্দমধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন সমীরণে॥

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে ত নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায়রে
আমার হৃদয়-উপবনে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কষ্টিপাথর

ভারতী (শ্রাবণ)।

আমার বাল্যকথা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরকে আমার ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে। আমরা যখন নিতান্ত শিশু তখন তিনি বিলাত যান; তাঁর মৃত্যুর খবর যখন এদেশে আসে তখন আমরা বোটে গঙ্গার উপর ঝড় তুফানে মার কাছে জড়সড়। সে ১৭৬৮ শকে, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। তখন তাঁর বয়স ৫১ বৎসর। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও আত্মীয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুসময়ে নিকটে ছিলেন। লণ্ডন সহরের প্রান্তবর্ত্তী Kensal Green নামক গোরস্থানে তাঁর সমাধি হয়। পিতা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে বিষয়কর্ম্ম দেখতে পারতেন না, এজন্য সম্পত্তি নষ্ট হবার আশঙ্কা করে পিতামহ পিতাকে লেখেন যে তুমি পাদ্রিদের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদে আর সংবাদপত্রে লিখতে ব্যস্ত থাক, বিষয়ের ভার থাকে আমলাদের হাতে এতে বিষয় নষ্ট হয়ে যাওয়া আশ্চর্য্যের কথা নয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতামহ Worthing নামক বন্দরে গিয়ে একমাস যাপন করেন। তখন তাঁর সঙ্গে ১৭ জন অনুচর, ১ জন সেক্রেটারি, একজন দোভাষী, ১ জন সঙ্গীত-ওস্তাদ, ও ১ জন চিকিৎসক ছিল। তাঁর ভৃত্য হুলি কারি-ভাত তৈরি করত, তাই এবং একটু কমলা লেবুর জেলি মাত্র তাঁর আহার ছিল। একটি সুন্দর কাশ্মীরী শাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্য মহিলারা দলে দলে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলারা পর্য্যন্ত তাঁর তত্ত্ব নিতেন। তিনি অমায়িক সৌজন্যে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন। পীড়ার প্রকোপেও তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নি। স্বদেশী আচার ব্যবহারের অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর ভৃত্য হুলি আলবোলায় তামাক সেজে দিত; মসলার ডিবে সর্ব্বদা সঙ্গে থাকত। গরম মোটে সহ্য হত না, জানলা খুলে শুতেন, প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করতেন, বরফজল খেতেন। হুলি তাঁর শয়নকক্ষের পাশের ঘরেই থাকত, তিনি শয়ন করলে সে পায়ে হাত বুলিয়ে দিত। কেহ তাঁকে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি মৃত্যু আসন্ন জেনেও বলিতেন I am content, তার পরে লণ্ডনে ফিরে এসে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেজকাকা ও ছোটকাকাকে (গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ) আমার বেশ মনে পড়ে। বাবামশায় যখন কোথাও বেড়াতে যেতেন তখন কখনো কখনো আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আমরা মার কাছে বেশিক্ষণ থাকতাম না—আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজকাকিমার ঘর; সেই আমাদের শিক্ষালয় ও বিশ্রামস্থান; মেজকাকিমাই আমাদের মাতৃস্থানীয়া ছিলেন। হাতেমতাই, লয়লামজনু, নবনারী, আরব্য-উপন্যাস, ল্যাম্ব্‌স্ টেল, পল ভার্জিনিয়ার অনুবাদ প্রভৃতি বই আমরা তাঁর নিকট হতে নিয়ে পড়তাম। কাকিমা প্রভৃতি বাড়ীর মেয়েরা কেহ কেহ বেশ বাংলা জানতেন। ব্যামোর সময় আমরা মার কাছেই থাকতাম। তখন আমাদের মাঝে মাঝে বাঁধা নিয়মে তিনদিনব্যাপী একরকম জ্বর হ'ত; ডাক্তার দ্বারি গুপ্ত ব্যবস্থা করতেন প্রথম দিন রেড়ির তেল, আর তার চেয়েও বিস্বাদ জলসাগু; দ্বিতীয় দিন এলাচ-দানার মতো কিছু লঘু পথ্য; তৃতীয় দিন ফুলকো রুটি; চতুর্থ দিন ভাত। ডাক্তারকে দেখলেই আমাদের প্রাণ উড়ে যেত। তখনকার কালে ব্যামোর সময় হাওয়া বদলের জন্যে বরাহনগর, হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে লোকে যেত। এখন সেইসব স্বাস্থ্যকর স্থান ম্যালেরিয়ার আবাস হয়েছে।

ছোটকাকা (নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর) গৌরবর্ণ তেজীয়ান সুশ্রী পুরুষ ছিলেন কিন্তু বড় কড়া মেজাজের লোক বলে মনে হত, আমরা তাঁকে ভয় করে চলতুম। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলেত গিয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াতেন; তাঁর রূপলাবণ্যের দরুন তিনি সাহেববিবিদের প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রবাস থেকে সহজে স্বদেশে ফিরতে চাইতেন না। অথচ তিনি ইংরেজ জাতের বণিকবৃত্তি ও চালচলন ঘৃণা করতেন। ছোটকাকার কাছে রমাপ্রসাদ রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং বজলল করিম ও বজলল রহিম আসা যাওয়া করতেন। বিলাত থেকে ফিরে আসার পর কার ঠাকুর কোম্পানির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে কোম্পানির হাউস ফেল হওয়াতে তিনি ঋণভারে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বভাবত ব্যয়শীল ছিলেন। নিজে ঋণ করে তাঁরা অপরের সাহায্যও করতেন। ১৮৫৩ সালে তিনি কষ্টম্‌স্ কালেক্টারের সহকারীর পদে

নিযুক্ত হন, ১৮৫৬ সালেই ইস্তফা দিয়ে দেশভ্রমণে বের হয়ে পড়েন। ১৮৫৪ সালে যশোহরের একটি তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স ১২ বৎসর। ভ্রমণে গিয়ে তিনি রোগগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফেরেন এবং অকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেজকাকা (গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সুরসিক অমায়িক সোখীন পুরুষ ছিলেন, যেন বিলাসিতা মূর্ত্তিমান্। যেমন কলাবিদ্যার প্রতি তেমনি বিজ্ঞানের দিকেও তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ছিল। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর গতিবিধি ছিল, তিনি কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'বাবু-বিলাস' নাটক ও 'কামিনীকুমার' বলে একখানি পদ্যোপাখ্যানের সেকালে বেশ আদর ছিল। বিষয়বুদ্ধিও বেশ ছিল। তিনি সকল দিকেই চৌকষ দক্ষ ছিলেন। তাঁর মোসাহেব দিননাথ ঘোষাল কথক ঠাকুরের মতো রামায়ণ মহাভারতের গল্পের ঘটায় আমাদের মনোরঞ্জন করতেন। মুখে মুখে শুনেই ছেলেবেলায় রামায়ণ মহাভারত একরকম শেখা হয়ে গিয়েছিল।

অন্তরবাহির—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

ভোরে ঘুম ভাঙিলে বেগবান পশ্চিমে বাতাসের শব্দ ও তরঙ্গের কলনাদ শুনিতে শুনিতে মনে হইল কোন একটা অদৃশ্যযন্ত্রে গান বাজিয়া উঠিতেছে। মৃদঙ্গকরতালের বলবান শব্দের ঘটার মধ্যে বেহালার একটি তারের একটানা তান সকলকে ছাপাইয়া বুকের ভিতরে যেমন বাজিতে থাকে তেমনি সেই ধীর গম্ভীর সুরের অবিরাম ধারা সমস্ত আকাশের মর্ম্মস্থলকে পূর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল। প্রভাতে মহাসমুদ্র আমার মনের যন্ত্রে এই যে গান জাগাইল, যাহাতে সুরগুলি ফুলের পাপড়ির মতো একটির পর আরেকটি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত হইতেছিল, তাহা তো বাতাসের গর্জ্জন ও তরঙ্গের কলধ্বনির প্রতিধ্বনি নহে। অথচ মনে হইতেছিল তাহা স্বতন্ত্র কিছুই নহে, তাহা এই সমুদ্রের বিপুল শব্দোচ্ছ্বাসেরই অন্তরতর ধ্বনি। সমুদ্রের নিশ্বাসে নিশ্বাসে যাহা উচ্ছ্বসিত হইতেছে তাহার বাহিরে শব্দ অন্তরে গান। বাহিরের সঙ্গে ভিতরের একটা যোগ আছে বটে কিন্তু সে যোগ অনুরূপতার যোগ নহে, সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যের যোগ। দুই মিলিয়া আছে, কিন্তু দুইয়ের মিল যে কোনখানে তাহা ধরিবার জো নাই, তাহা অনির্ব্বচনীয় মিল। চোখে লাগে স্পন্দনের আঘাত আর মনে দেখে আলো, দেহে ঠেকে বস্তু আর চিত্তে জাগে সৌন্দর্য্য, বাহিরে ঘটে ঘটনা আর অন্তরে ঢেউ খেলাইয়া উঠে সুখদুঃখ। একটার আয়তন আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায়, আর-একটার আয়তন নাই, তাহা অখণ্ড। এই যে আমি বলিতে যাহাকে বুঝি তাহা বাহিরের দিকে কত শব্দ গন্ধ স্পর্শ, কত মুহূর্ত্তের চিন্তা ও অনুভূতি, অথচ এই সমস্তেরই ভিতর দিয়া যে-একটি জিনিষ আপন সমগ্রতায় প্রকাশ পাইতেছে তাহাই আমি। এবং তাহা তাহার বাহিরের রূপের প্রতি-রূপ নহে, বাহিরের বৈপরীত্যের দ্বারাই সে ব্যক্ত।

বিশ্বরূপের অন্তরতর এই অপরূপকে প্রকাশ করিবার জন্যই শিল্পীদের গুণীদের ব্যাকুলতা। এই পৃথিবীর অন্তরতর অরূপতাই আমাদের চিত্তের সামগ্রী। অভ্যাসের মোহে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না; অভ্যাসের আবরণ মোচন করিয়া সেই অপরূপতাকে উদ্ঘাটিত করিবার কাজেই কবিরা গুণীরা নিযুক্ত। এই জন্য তাঁহারা আমাদের অভ্যস্ত রূপটির অনুসরণ না করিয়া তাহাকে খুব একটা নাড়া দিয়া দেন, তাঁহারা এক রূপকে আর এক রূপের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার চরমতার দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া দেন। এমনি করিয়া তাঁহারা দেখান যে, রূপ জিনিষটা ধ্রুব সত্য নহে, তাহা রূপক মাত্র, তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি, তবেই আনন্দের মধ্যে পরিত্রাণ। আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন সায়াহ্ন অর্দ্ধরাত্রি ও বর্ষাবসন্তের রাগিণী রচিত হইয়াছে। সে রাগিণীর সবগুলিই সকলের কাছে ঠিক লাগিবে কিনা জানিনা, তথাপি আমাদের দেশের সঙ্গীতের এই বিশেষত্বটির মানে বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবৎখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নবনব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। য়ুরোপের বড় বড় সঙ্গীত-রচয়িতারাও নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিক দিয়া তাঁহাদের গানে বিশ্বের সেই অন্তরের বার্ত্তাই প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। য়ুরোপীয় গানের মধ্যে একটা বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে গানের সুরে এবং গায়কের কণ্ঠে পদে পদে খুব একটা জোর দিবার চেষ্টা। সে জোর, সঙ্গীতের ভিতরকার শক্তি নহে, তাহা যেন বাহিরের দিক হইতে প্রয়াস অর্থাৎ হৃদয়াবেগের উত্থানপতনকে সুরের ও কণ্ঠস্বরের ঝোঁক দিয়া খুব করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া দিবার চেষ্টা। ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু গান তো স্বভাবের নকল অর্থাৎ অভিনয় নহে। অভিনয়কে গানের সঙ্গে মিলিত করিলে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। আমরা সঙ্গীত তো বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে চাই না; প্রেমিক বা বিরহিণী ঠিকটি কেমন অনুভব করিতেছে তাহা তো জানিবার বিষয় নহে, সেই অনু-ভূতির অন্তরে অন্তরে যে সঙ্গীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই। বাহিরের প্রকাশের সঙ্গে এই অন্তরের প্রকাশ একেবারে ভিন্ন জাতীয়। কারণ বাহিরের দিকে যাহা আবেগ, অন্তরের দিকে তাহাই সৌন্দর্য্য। অভিনয় জিনিষটাও যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে; তাহাও স্বাভাবিকের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। আর্ট জিনিষটাতে সংযমের প্রয়োজন, সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। আর্টেরও চরম সাধনা ভূমার সাধনা। য়ুরোপের আর্ট বাস্তবকে ঠিক বাস্তবের মতো করিয়া দেখিতে চায়। ব্যবসায়ী আর্টিষ্ট বাস্তবের সাক্ষী, আর গুণী আর্টিষ্ট সত্যের সাক্ষী। বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখা যায়, আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাত্ম্যকে খর্ব্ব করিতেই হইবে—বাহিরের রূপটাকে সাহসের সঙ্গে বলিতেই হইবে তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র।

সাহিত্যরথী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টো-পাধ্যায়—

রাঁচী শহরের মধ্যে মোরাবাদী নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর জ্যোতিবাবুর মনোরম বাংলা ও উপাসনা-মন্দির। তাঁহার বাড়ীর নাম শান্তিধাম এবং তাহা বাস্তবিকই শান্তিধাম। আমরা পাহাড়ের উষ্ণীষের মতন সেই মন্দিরটির নীচে বসিয়া নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলাম। জ্যোতিবাবু বলিলেন—"আগের চেয়ে বাংলা সাহিত্য এখন অনেক উন্নত হয়েছে। উদীয়মান কবিদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একজন প্রতিভাবান কবি। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতাও আমার ভাল লাগে। গল্পলেখক প্রভাত মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এঁদের লেখা আমার বড় ভাল লাগে। গল্পলেখা অবজ্ঞার জিনিষ নহে—এতেও খুব গুণপনা আবশ্যক। গল্পের প্লট রচনা করিতে ও চরিত্রাদি বর্ণনা করিতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি

আবশ্যক। তারপর, মানবচরিত্রে অধিকার না থাকিলে গল্প মোটেই হয় না; এ হিসাবে গল্প ও উপন্যাসের মূল্য অল্প নহে। আজকাল দুটো নূতন কথা উঠেছে "কী" আর "মতো"। অনর্থক শব্দবিকৃতিতে লাভ কি? অধিকাংশ স্থলেই অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়—দুই এক স্থলে অর্থের অস্পষ্টতা হতে পারে আমি স্বীকার করি। যেখানে অস্পষ্টতার সম্ভাবনা আছে সেখানে শব্দটা বিকৃত না করে একটা হাইফেন চিহ্ন বসালেই সব গোল মিটে যায়। যাই হোক কোন বিশেষ চিহ্ন প্রয়োগে যদি ভাষার অস্পষ্টতা দূর হয় তা করা কর্তব্য। আরবী ফারশী ভাষাও এই হিসাবে অসম্পূর্ণ। কেননা তাতে এক বানানের অনেকরূপ পাঠ হয়, কাজেই অর্থ না বুঝে পড়া যায় না, এ সমস্ত যে ভাষার অভাব তাতে আর সন্দেহ নেই। আমাদের বঙ্গভাষায় V উচ্চারণের মত বর্ণ নাই, এইজন্য V উচ্চারণের স্থানে "ভ" না লিখে মারাঠী নিয়মে "হ্ব" লেখা উচিত। যোগেশবাবুর যুক্তাক্ষর-নির্বাসন-সজ্জা সে কেবল শক্তির অপব্যবহার ও পণ্ডশ্রম মাত্র। তাহার প্রণালী সাধারণে গৃহীত হইবার পক্ষে কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। বিজয়বাবুর চমৎকার ছন্দজ্ঞান! তিনি যে একজন গ্রন্থকীট তাহা তাঁহার লেখা পড়িলেই বুঝা যায়।"

একদিন তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া "বাল্মীকিপ্রতিভা" আগাগোড়া যথাযথ হাবভাবের সহিত সুর করিয়া গাহিয়া শুনাইলেন। "বাল্মীকিপ্রতিভা" রচিত হইলে তিনিই সকল গানে সুর দিয়াছিলেন। গৌরকান্ত শুভ্রকেশ তপস্বীর মত উজ্জ্বল দীর্ঘ ক্ষীণ দেহযষ্টি উত্তোলন করিয়া যখন তিনি গভীর ভাবাবেশে ও গম্ভীর স্বরে "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাম্ ত্বমগমঃ" শ্লোকটি পাঠ আরম্ভ করিলেন তখন মনে হইল যেন সত্যসত্যই বাল্মীকির মুখে সেই আদি কবিতা শুনিতেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যবসায় ও ললিতকলার প্রতি অক্লান্ত অনুরাগ দেখিবার জিনিষ। এক মুহূর্ত্তও না থামিয়া "বাল্মীকিপ্রতিভার" সমস্ত গানগুলি একে একে গাহিতে তাঁহার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তবু তাঁহার উৎসাহের বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইতে দেখা যায় নাই।

বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা বিচার—জনৈক আসামী—

এদেশের গার্হস্থ্য জীবনে স্ত্রীশিক্ষার ফল ভালো কি মন্দ হইয়াছে ইহা লইয়া প্রায়ই বাদপ্রতিবাদ হয়। সামাজিক সকল অনুষ্ঠানের ন্যায় স্ত্রীশিক্ষার ফল সম্পূর্ণ ভালোও হয় নাই, সম্পূর্ণ মন্দও হয় নাই। সমাজসংস্কার করিতে গেলেই পুরাতন মন্দের সহিত কতক ভালোও লোপ পায়, এবং নূতন ভালোর সহিত মন্দও আসিয়া পড়ে। আমাদের সামাজিক প্রথা সুনির্দ্দিষ্ট পরস্পরসাপেক্ষ ও ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট; পরিবর্ত্তনের কারণ বাহির হইতে আসিয়াছে, দেশের অন্তর হইতে ক্রমশ স্বতঃই উদ্ভূত হয় নাই; সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তনায় যদি কোনো ভুল হইয়া থাকে তজ্জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তকদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। ফলাফল দেখিয়া এখন ভুল ধরা যত সহজ, তাঁহাদের পক্ষে তখন তত সহজ ছিল না।

নব্যশিক্ষিতার বিরুদ্ধে যেসকল অভিযোগ শোনা যায় তাহার সহিত সেকালের স্ত্রীলোকদের স্বভাব তুলনা করিয়া দেখিলে স্ত্রীশিক্ষার দোষগুণ পরিষ্কার হওয়া সম্ভব।

(১) ধর্ম্মভাবের হ্রাস। ধর্ম্ম বলিতে আচার বিচার পূজা আহ্নিক ব্রত উপবাস ধরিলে নবীনারা অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মহীনা বটে। ইহার কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচলন ও পুরুষদিগের হিঁদুয়ানীতে শৈথিল্য। কিন্তু মানসিক ধর্ম্মভাবের বা সুনীতির হ্রাস হয় নাই। (২) নম্রতার অভাব। ইহা শিক্ষার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। যাঁহারা অহঙ্কারব্যাধিগ্রস্ত তাঁহাদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়াই একমাত্র চিকিৎসা। (ক) বাধ্যতার অভাবও এই শ্রেণীভুক্ত। শিক্ষার ফলে কিঞ্চিৎ মানসিক স্বাধীনতা ও তাহার ফলে ভিন্ন মতের সহিত অল্পবিস্তর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। একটা বয়সের পর অতিবাধ্যতার আদান প্রদান দুইই ক্ষতিজনক, কারণ তাহাতে একপক্ষের অত্যাচারপ্রবৃত্তি প্রশ্রয় পায়, অপরপক্ষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের হানি হয়। অন্ধ দাসত্ব অপেক্ষা স্বেচ্ছাসেবার মাহাত্ম্য বেশি। ধীশক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া যাহাতে শ্রী ও হ্রী নষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিলেই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত। (৩) গৃহকর্ম্মে অক্ষমতা ও তাচ্ছিল্য। প্রথমটি আংশিকভাবে স্বীকার্য্য, কারণ ইস্কুল কলেজের তাড়নায় পূর্ব্বের ন্যায় অনায়াসে খেলাচ্ছলে গৃহকর্ম্ম শিখিবার সুযোগ কম। কিন্তু অধিকাংশের অপটুতা ইস্কুলের শিক্ষাপ্রভাবে নহে, গার্হস্থ্যশিক্ষার অভাবে। ইস্কুলেরও এ বিষয়ে সচেষ্ট ব্যবস্থা করা আবশ্যক; পরীক্ষা দেওয়াই নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কন্যাদিগের বাড়ীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বা পরীক্ষা দেওয়া হইতে নিবৃত্ত করিলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালী শিখিবার কোনোই বাধা থাকে না। যে গৃহকর্ম্ম নারীজীবনের সার বস্তু, যাহার জন্য সমাজে নারীর স্থান ও মান, তাহার তুচ্ছতম কর্ত্তব্যকর্ম্মকেও যে রমণী হেয় জ্ঞান করে, সে কৃপাপাত্র অতিদীন। বিবাহরূপ অনিশ্চিত ঘটনার উপর যখন নারীজীবনের সমস্ত নির্ভর, তখন সকলপ্রকার গৃহকর্ম্ম বালিকামাত্রকেই শেখানো উচিত। (৪) স্বাস্থ্যহানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কঠিন সংগ্রাম ইহার একতম কারণ। স্ত্রীপুরুষের শরীর মন জীবনযাপনপ্রণালী সকলই ভগবান্ স্বতন্ত্র ছাঁচে গড়িয়াছেন, উভয়ের শিক্ষা সুতরাং একই ছাঁচে হওয়া ঠিক নয়। অবশ্য, সন্তানশিক্ষার ভার যে-মাতার হস্তে, তাঁহার পক্ষে কোনো শিক্ষাই অনাবশ্যক বলা যায় না, এবং তাঁহার সহৃদয় সহানুভূতির ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হয় ততই ভালো। কিন্তু স্বাস্থ্য, লাবণ্য, কর্ম্মক্ষমতা, প্রসন্নতা, সৌজন্য প্রভৃতি গৃহিণীজনোচিত কোনো গুণই যাহাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। স্বাস্থ্য মানে সামঞ্জস্য, এবং সামঞ্জস্যই নারীজীবনের মূলমন্ত্র। নিছক পণ্ডিতা অসহ্য। পুরুষালী মেয়ে বা মেয়েলী পুরুষ কেহই সমাজে আদৃত হয় না। সেকালের রমণীগণের মধ্যে প্রায়শঃ যে শরীরমনের স্ফূর্ত্তি, উদ্যম, উৎসাহ, পরিশ্রমক্ষমতা, সরসতা ও প্রফুল্লতা দেখা যায়, তাহার তুলনায় আজকালকার অনেক মেয়েকে যেন নিস্তেজ নীরস ও নিরানন্দ বলিয়াই মনে হয়। যদি প্রমাণ হয় যে আধুনিক প্রথার উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের স্বাস্থ্য ভগ্ন ও মন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে শত গুণেও সে দোষ ঢাকিবার নহে। (৫) বিলাসিতা ও আমোদপ্রিয়তা। ইহার বৃদ্ধি হয় নাই, প্রকারান্তর হইয়াছে মাত্র। সেকালের মেয়েরা গয়না ভালো বাসিতেন, একালের মেয়েরা কাপড় বা অপরাপর সৌখীন দ্রব্য ভালো বাসেন, যাহার আমদানী সেকালে এদেশে হয় নাই। কালভেদে সৌন্দর্য্যের উপকরণে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য বসন অপেক্ষা ভূষণ স্থায়ী এবং অসময়ের বন্ধু; সে হিসাবে এ পরিবর্ত্তন মন্দ বলিয়া স্বীকার্য্য। ইংরাজিয়ানার প্রকোপে আমাদের চালচলন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মিতব্যয়িতাই সুগৃহিণীর পক্ষে প্রশংসার্হ। আমোদপ্রিয়তা সম্বন্ধেও উপরের কথা খাটে। যাহার যেরূপ আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, তাহার কাজকর্ম্ম আমোদপ্রমোদ তদনুরূপ হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে বিবাহবয়সের প্রসারণ, অন্তঃপুরের দ্বার উদ্ঘাটন প্রভৃতির জন্য সম্প্রতি বাঙালীর মেয়ে কতকগুলি নূতন আমোদের অধিকারিণী হইয়াছেন। আমোদআহ্লাদ যদি নির্দ্দোষ হয় এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মের ব্যাঘাত না ঘটায় এবং নিজেদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার অনুকূল হয় তাহা হইলে এই দুঃখের সংসারে তাহার প্রচলন তো সুখের বিষয়। সেকাল ও একালের সুসঙ্গত-সংমিশ্রণ-সাধন আধুনিক মেয়েদের প্রধান কর্ত্তব্য ৬)

স্বার্থপরতা এবং বিদেশীয়তা। (ক) একেলে ইংরেজিশিক্ষিতা মেয়েরা অপেক্ষাকৃত স্বার্থপর তাহা মানিতে হইবে; বয়ঃপ্রাপ্তিতে বিবাহ ও পাশ্চাত্যভাবের প্রভাবে একটু নিজত্ব গঠিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অনভিজ্ঞার সারল্য ও সম্পূর্ণ অধীনতা এবং শিক্ষিতার মার্জ্জিত জ্ঞানবুদ্ধি ও আত্মনির্ভরতা একাধারে আশা করা বৃথা। পূর্ব্বের তুলনায় কম হইলেও আজও মেয়েদের নিতান্ত কম ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না—সে যে নারীর স্বধর্ম্ম। নূতন তন্ত্রের সামাজিক অরাজকতার দিনে অবস্থার সহিত বনাইয়া লওয়া একমাত্র সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতীর পক্ষেই সম্ভব, ভাঙনের মুখে নিজেকে স্থির রাখিতেও সুবুদ্ধির প্রয়োজন। (খ) সাহেবিয়ানা বা বিবিয়ানা এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে, তবে প্রায় জড়িত বটে, কারণ আমাদের ইস্কুলকলেজ মাত্রই ইংরেজি ভাব ও ভাষার পরিপোষক। মহাকালী পাঠশালায় এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম সূচিত হইয়াছে তাহার ফলাফল বিচারের সময় এখনো আসে নাই। ইংরেজি-অভিজ্ঞা ও ইংরেজি-অনভিজ্ঞার পার্থক্য অনিবার্য্য, কারণ ইংরেজি আমাদের নিকট নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া দেয়। কিন্তু সেজন্য উভয়ের মেলামেশার তো কোনো বাধা দেখা যায় না; দুই দলের বেশভূষা উভয়ের সম্মতিক্রমে একই ধরণের করিয়া আনিলে মনের মিলের সাহায্য হইতে পারে। হিন্দুসমাজ যেমন উদারতা দেখাইতেছেন, গতিশীল সমাজেরও বিদেশী চালচলনের গতি মন্দ করিয়া মিলনের দিকে অগ্রসর হওয়া চাই। বাঙালীর মেয়েরা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষিতা হইলেও অধিক মাত্রায় বিদেশীয় ভাবাপন্ন বলিয়া স্ত্রীশিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষণে অক্ষম হইয়াছেন, এবং অল্পদিনেই সে শিক্ষার বিরুদ্ধে স্বদেশীর মন ফিরাইয়াছেন।

কিন্তু ক্ষতিপূরণের নিয়মানুসারে প্রায় প্রত্যেক দোষেরই অপর পৃষ্ঠায় একটি গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। (১) বুদ্ধির উদারতা বা সাম্যভাব। (২) আত্মনির্ভর ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান। (৩) সময়ের মূল্যবোধ ও গৃহস্থালীতে সুশৃঙ্খলার চেষ্টা। (৪) বেশভূষা ও গৃহসজ্জায় অধিকতর পারিপাট্য। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান। (৫) গৃহ এবং পরিবারের বাহিরেও মনকে প্রসারিত করিয়া সকলপ্রকার সমাজে মিশিতে পারা, পৃথিবীর খোঁজখবর রাখা এবং সামাজিক উন্নতিচেষ্টায় যোগ দেওয়া। (৬) স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হওয়ার উপযোগিতা। সন্তানের শিক্ষার সাহায্য করিবার ক্ষমতা।

একদিকে সম্পূর্ণরূপ সেকেলে প্রাচ্য ভাব, অপরদিকে সম্পূর্ণরূপ একেলে পাশ্চাত্য ভাব—এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। মেয়েদের স্বাভাবিক সংযম ও স্থিতিশীলতা সমাজের রক্ষাকবচ। সেকেলে স্ত্রীশিক্ষা এখন নানা কারণে দুর্ঘট। অথচ কোনোপ্রকার স্ত্রীশিক্ষা হওয়া উচিত, এবং একেলে স্ত্রীশিক্ষার দোষগুলি অনিবার্য্য নহে। যাহা দেশকালপাত্রোপযোগী আদর্শ বলিয়া গণ্য হইবে সেই পথই অনুসরণ করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের বর্ত্তমান ভাবুক ও কবিগণ আমাদের বর্ত্তমান কালের নূতন আদর্শ গড়িয়া তুলুন।

শারীর স্বাস্থ্যবিধান (আহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা)—শ্রীচুনীলাল বসু—

অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এবং তৈল ও শর্করা জাতীয় খাদ্য, মাংসাদি খাদ্য অপেক্ষা মাংসপেশীর শক্তিবর্দ্ধক। মাছ মাংস, ছানা, লবণ ও জল, পেশী ও অস্থি গঠনের সহায়ক খাদ্য; তৈল, ঘৃত, ভাত, রুটি, আলু, চিনি প্রভৃতি শ্রমশক্তিবর্দ্ধক। ২০।২৫ বৎসরের পর শরীরের বৃদ্ধি স্থগিত হয়, সুতরাং বালক ও যুবকের খাদ্যের প্রয়োজন অধিক এবং তাহাদের মাংসজাতীয় খাদ্য (মাংস, মাছ, ডিম, ছানা, ডাল) অধিক উপযোগী খাদ্য। বালকের চঞ্চলস্বভাব বলিয়া শক্তি-উৎপাদক মিষ্টান্ন খাইতে ভালো বাসে। সমবয়স্ক পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের খাদ্য শতকরা ১০ ভাগ কম প্রয়োজন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ভুক্তাবশেষ খাইয়াই সন্তুষ্ট; কিন্তু পুরুষের কর্ত্তব্য সন্তানের জননী যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দুর্ব্বল হইয়া না যান সে দিকে দৃষ্টি রাখা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খাদ্যে মাংসের পরিমাণ সংযত না হইলে যকৃতের পীড়া জন্মে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঋতুভেদে আহার-ভেদের ব্যবস্থা আছে। ইহার উপকারিতা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এখনো পরীক্ষিত হয় নাই। চরকের মতে হেমন্ত কালে ঘৃতদুগ্ধাদি, গুড়, তৈল ও নবান্ন আহার এবং উষ্ণজল পান আয়ুষ্কর; শীতকালে অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট খাদ্য ও মাংস প্রশস্ত; বসন্তকালে গুরুপাক দ্রব্য, অম্ল, স্নিগ্ধ বা মিষ্টদ্রব্য বর্জ্জিতব্য মাংস ভক্ষণ প্রশস্ত; গ্রীষ্মকালে স্বাদু, শীতল, তরল স্নেহময় দ্রব্যাদি ভক্ষ্য; জাঙ্গল পশুমাংস, পক্ষীমাংস, ঘৃতদুগ্ধসংযুক্ত অন্ন অবসাদনিবারক, লবণ অম্ল কটু ও উষ্ণ দ্রব্য বর্জ্জনীয়। বর্ষাকালে দেহ ও অগ্নি দুর্ব্বল হয়; এই সময়ে অম্ল লবণ ও স্নেহরসবিশিষ্ট দ্রব্য আহার্য্য; জল উষ্ণ করিয়া শীতল করিয়া পান প্রশস্ত। শরৎকালে পিত্তদমনকারী খাদ্য প্রশস্ত; ঘৃত, মৎস্য, মাংস ও দধিভক্ষণ নিষিদ্ধ। চরকের মতে সর্ব্বকালে এবং রাত্রিতে দধি ভক্ষণ নিষিদ্ধ; কিন্তু মেচনিকফ দধিকে রোগোৎপাদক-বীজাণু-ধ্বংসসক্ষম বলাতে আজকাল দধির ব্যবহার প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা অধিকতর সূক্ষ্ম তত্ত্বে উপনীত হইয়া তিথিবিশেষে খাদ্যবিশেষ নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। অতিভোজন রোগের কারণ। ৩।৪ বারে অল্পে অল্পে খাদ্য আহার করা উচিত। প্রত্যহ এক সময়ে ভোজন স্বাস্থ্যের অনুকূল। দুগ্ধপায়ী শিশুদিগকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ও বালকদিগকে ৪ ঘণ্টা অন্তর আহার দেওয়া আবশ্যক। রাত্রে স্বল্পাহার প্রশস্ত। রাত্রিভোজনের অব্যবহিত পরে নিদ্রা যাওয়া অবিধেয়। আহার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মুখ ও হাত ধুইয়া ভোজন করা উচিত; মুখের মধ্যে ও হাতে নানারূপ বীজাণু থাকে, ধুইয়া ফেলিলে সেগুলি উদরে যাইতে পারে না; প্রাচীন গণ্ডূষ করার প্রথা বিজ্ঞানসম্মত। আহারের স্থানেও জলছড়া দিয়া হস্তমার্জ্জনা করার রীতি খুব ভালো; কারণ ধূলার সহিতই রোগের বীজাণু থাকে। এই কারণে দোকানের ধূলিপ্রলিপ্ত খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। তাড়াতাড়ি খাওয়া স্বাস্থ্যের হানিকর। আহারের সময় বা অব্যবহিত পরে অধিক জল বা বরফজল পান করা উচিত নয়, ইহার দ্বারা পাচকরস তরল হইয়া পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে। নিমন্ত্রণ একটি অবশ্যপালনীয় সামাজিক প্রথা। কিন্তু আজকাল ভোজনের আড়ম্বরবাহুল্য নিমন্ত্রণকর্ত্তা ও নিমন্ত্রিত উভয়েরই ভয়ের কারণ হইয়াছে। অপব্যয় করিয়া আড়ম্বর প্রদর্শন করিবার সময় আমাদের চিরদুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের কথা মনে করা উচিত। নিজের স্বাস্থ্য ও রুচি অনুসারে পরিমিত আমিষ বা নিরামিষ খাদ্য আহার করা উচিত; মিশ্রখাদ্য তৃপ্তিপ্রদ ও স্বাস্থ্যপ্রদ একসের মাংসের মধ্যে যে পরিমাণ 'প্রতিদ' থাকে তিন পোয়া দালে তাহা থাকে; ডাল মাংস অপেক্ষা সস্তা; সুতরাং আমাদের গরিব দেশে মাংসের বদলে দাল চলিতে পারে; দাল মাংস অপেক্ষা দুষ্পাচ্য ইহা সত্য নহে। খাদ্য পরিপাক অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (শ্রাবণ)।

আনন্দরূপ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

অনেক সময় বাহিরের সৌন্দর্য্যকে আমরা বাহিরে দেখি—তাহাতে চোখ জুড়ায়, কিন্তু তাহাকে অন্তরে গ্রহণ করি না। কিন্তু সৌন্দর্য্য

যেদিন অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেই দিন তাহার মধ্য হইতে অসীম একেবারে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে; তখনই সমস্ত মন এক মুহূর্ত্তে গান গাহিয়া উঠে—এ শুধু বর্ণ গন্ধ নহে, এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদসুধার প্রবাহধারা। এই যে ধারণার অতীত অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ইহাই আনন্দ। ইহাই দেশে দেশে কালে কালে অগণ্য প্রাণীর প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে, মন হরণ করিতেছে,—ইহা আর কিছুতেই ফুরাইল না। ইহারই অমৃতস্পর্শে কত কবি কবিতা লিখিল, কত শিল্পী শিল্প রচনা করিল, কত জননীর হৃদয় স্নেহে গলিল, কত প্রেমিকের চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উঠিল—সীমার বক্ষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেদ করিয়া এই অসীমের অমৃত-ফোয়ারা কত লীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার আর অন্ত দেখি না। তাহা আশ্চর্য্য, পরমাশ্চর্য্য। ইহাই আনন্দরূপমমৃতং। রূপ এখানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নহে। সত্য দিয়া আনন্দ দিয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতের দিকে দেখিলে আর বস্তু থাকে না, সমস্তই আনন্দ, সমস্তই লীলা—ইহার সমস্ত অর্থ একমাত্র তাঁহারই মধ্যেই আছে। তাঁহার প্রসাদের আনন্দের চৈতন্যের শেষ নাই, কেবলি আরো আরো আরো, তবু সেই অমৃতময় আনন্দময় এক।

যাত্রা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

একদিন মানুষ ছিল বুনো, ঘোড়াও ছিল বনের জন্তু। মানুষ ছুটিতে পারিত না, ঘোড়া বাতাসের মতো ছুটিত। ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গে যে একটি ছুটিবার আনন্দ দ্রুত তালে নৃত্য করিত সেইটের প্রতি মানুষের মনে মনে ভারি একটা লোভ হইত। তখন সে ফাঁশ লাগাইয়া কেশর ধরিয়া ঘোড়ার পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া নিজের দেহের সঙ্গে ঘোড়ার বিদ্যুৎগামী চারটে পা জুড়িয়া লইল। মানুষ অনেক পড়িয়াছে অনেক মরিয়াছে তবু দ্রুতগমনকে জিতিয়া লইয়া আপনার কাজে খাটাইতে ছাড়িল না। ডাঙায় চলিতে চলিতে মানুষ একজায়গায় আসিয়া দেখিল সম্মুখে তাহার সমুদ্র—অকূল নিষেধ লক্ষ লক্ষ ঢেউ-তর্জ্জনী তুলিয়া ডাঙার মানুষদের শাসাইতেছে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাকে যেখানে শেষ করিতে চাওয়া যায় সেই খানেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কোনো বাধাকেই সে চরম বলিয়া মানিতে চায় না। মানুষ ঘোড়ারই মতন সমুদ্রের পিঠের উপর চড়িয়া বসিল—কত ডুবিল কত মরিল তাহার সীমা নাই, তবু সে দূরকে জয় করিয়াই লইল। যাহা কিছু আমাদের বাধা তাহাকেই আমাদের চলিবার পথ, আমাদের মুক্তির উপায় করিয়া লইতে হইবে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ আছে। যাহারা এই আদেশ মানিয়াছে তাহারাই পৃথিবীতে ছাড়া পাইয়াছে, যাহারা মানে নাই এই পৃথিবীটা তাহাদের পক্ষে কারাগার। চলিব বলিয়াই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ, জগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম। বাসা বাঁধিয়া বসিয়া থাকা বিশ্বের ধর্ম্মই নহে, অণুপরমাণু হইতে গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত সবাই বেদুয়ীনদের মতো ছুটিয়া চলিয়াছে। মৃত্যুর ডাক আর কিছু নহে বাসা বদলের ডাক। একই জায়গায় একই প্রথার মধ্যে বসিয়া বসিয়া জীবনের মধ্যে জড়তা আসে, তখন সে এই বৃহৎ পৃথিবীকে বোধ করিতেই পারে না। তখন এমন একটা চেতনার দরকার যাহা আমাদের চোখের কানের মনের রুদ্ধদ্বারে কেবলি নূতন নূতন নূতনের আঘাত দিয়া আমাদের জীর্ণ পর্দ্দাটাকে টুকরা টুকরা করিয়া চিরনূতনকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কি বৃহৎ, কি সুন্দর, কি উন্মুক্ত এই জগৎ! কি প্রাণ, কি আলোক, কি আনন্দ! পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া মানুষের যে মনোলোক তাহার কি অফুরানো ও অদ্ভুত বৈচিত্র্য! এই বিপুল বৈচিত্র্যকে তন্ন তন্ন করিয়া নিঃশেষে দেখিবার সাধ্য ও অবকাশ কাহারো নাই এবং যদিও এক হিসাবে বিশ্ব সর্ব্বত্রই আছে, তবু আলস্য ছাড়িয়া অভ্যাস কাটাইয়া চোখ মেলিয়া যাত্রা করিলে তবেই আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়তা কাটিয়া যায় এবং আমাদের প্রাণ উদ্বোধিত হইয়া বিশ্বপ্রাণের স্পর্শ উপলব্ধি করে। ভ্রমণের ভিতরকার আসল উদ্দেশ্যটিই এই—যাহা আছেই, যাহা হারাইতে পারেই না, তাহাকেই কেবলি প্রতিপদে আছে আছে আছে বলিতে বলিতে চলা; পুরাতনকে কেবলি নূতন নূতন নূতন করিয়া সমস্ত মন দিয়া ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাওয়া।

সমুদ্রপাড়ি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

জাহাজে চড়িতে প্রথমটা মনের মধ্যে কেমন একটা সঙ্কোচ উপস্থিত হয়; জাহাজটার সঙ্গে নিজের জীবনের বিচ্ছেদ অনুভব করাই তাহার কারণ। এ জাহাজ যাহারা গড়িয়াছে, চালাইতেছে, তাহারাই ইহার প্রভু; সমুদ্রের চিহ্নহীন পথ ইহাদেরই নাবিকদের বংশপরম্পরার মৃত্যুর দ্বারা ক্রমশঃ সরল হইয়া উঠিতেছে। আমি টাকা দিয়া এখানে স্থান পাইয়াছি, কিন্তু এখানে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে যে আহার বিহার শয়ন নিদ্রা চলিতেছে তাহা কি শুধু টাকা দিয়া কিনিবার জিনিষ? ইহার পশ্চাতে স্তরে স্তরে কত চিন্তা কত সাহসের সঞ্চয় সমুচ্চ হইয়া রহিয়াছে, সেখানে আমাদের কোনো অর্ঘ্য জমা হয় নাই। জাহাজের উপর ইংরেজ স্ত্রীপুরুষের যে নিশ্চিন্ত স্বচ্ছন্দতা তাহা স্বজাতির শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আছে। ইহারা নিশ্চয় জানে যাহা করিবার তাহা করা হইয়াছে, যাহা করিবার তাহা করা হইবে, সেজন্য ইহাদের সমস্ত জাতি জামিন রহিয়াছে। যদি প্রাণসংশয় সঙ্কট উপস্থিত হয় তবে কেবল যে কাপ্তেন আছে তাহা নহে, ইহাদের সমস্ত জাতির প্রকৃতিগত উদ্যম ও নিরলস সতর্কতা শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এই জায়গায় ইহারা যাহা দিয়াছে তাহাই পাইতেছে—আর আমরা যাহা দিই নাই তাহাই লইতেছি—সুতরাং সমুদ্র পার হইতে হইতে দেনা রাখিয়া রাখিয়া যাইতেছি। এই যে পরের মনুষ্যত্বের উপর ভর দিয়া চলা ইহা ডাঙায় বসিয়া বিলাতি জিনিষ ব্যবহার করার চেয়েও বেশি দীনতার লক্ষণ। উহারা প্রাণ দিয়া চালায় আর আমরা টাকা দিয়া চলি, ইহার মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র পড়িয়া রহিল তাহা আমরা কবে কোন্ কালে পার হইতে পারিব! এখনো আরম্ভও করা হয় নাই, এখনো অকাতরে কত প্রাণ দেওয়া বাকি আছে, এখনো কত বন্ধন ছিঁড়িতে হইবে, কত সংস্কার দলিতে হইবে। গোটাকয়েক খবরের কাগজের নৌকা বানাইয়া তাহারই খেলার পালের উপর বক্তৃতার ফুঁ লাগাইলে আমাদের কিছুই হইবে না।

নীল সমুদ্রের মাঝখান দিয়া দুই ধারে চন্দ্রালোকে জ্বলন্ত ফেনরাশি কাটিয়া কাটিয়া জাহাজ চলিয়াছে, যেন জাহাজটাকে ফুলের বীজকোষের মতো করিয়া তাহার দুই পাশে শাদা পাপড়ি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিকশিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। যেমন সমুদ্র তেমনি সমুদ্রের উপরকার রাত্রি—মধ্যে দাঁড়াইয়া দুই অন্তহীনের সুন্দর মিলটি দেখিতে থাকি, স্তব্ধের সঙ্গে চঞ্চলের, নীরবের সঙ্গে মুখরের দিগন্তব্যাপী আলাপ চুপ করিয়া শুনিয়া লই। মহাসাগর যে ছন্দে মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন, আমার রক্তের নাচ তাহার সঙ্গে দিব্য তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনটুকুর চারিদিকেই যে একটি অক্ষুব্ধ অনন্ত রহিয়াছেন তাঁহার দিকে যাত্রীদের এক মুহূর্ত্তও তাকাইবার অবকাশ নাই। জীবনের প্রতি ইহাদের আসক্তি এত বেশি যে জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে যতটুকু দূরে যাওয়া আবশ্যক ইহারা এক

মুহূর্ত্তের জন্যও ততটুকু দূরে যাইতে পারে না। এইজন্য ইহাদের ধর্ম্মোপাসনা যেন একটা বিশেষ আয়োজনের ব্যাপার। ইহারা ভারতবাসী জাহাজযাত্রী হইলে কাজকর্ম্ম আমোদ আহ্লাদের অত্যন্ত মাঝখানেই অসঙ্কোচে অনন্তকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতে পারিত। সসীমের সঙ্গে অসীম, জীবের সঙ্গে শিব যে একেবারে মিলিয়া আছেন, দুইয়ের সহযোগেই যে সত্য সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, এই চিন্তাটা আমাদের মধ্যে সঙ্কোচশূন্য সহজ হইয়া আছে। কিন্তু ইংরেজযাত্রীদের জীবনের মধ্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতার সহজ সুনম্র শ্রী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা লেশমাত্র অসুবিধাকেও মানিয়া লইতে চায় না। ইহারা সকল অবস্থাতেই আপনার সকল রকমের দাবিকে সর্ব্বোচ্চ সীমায় টানিয়া রাখিতে চায়, তাহার ফলে অবশেষে অসম্ভব দাবিও মেটে। দাবি করিবার সাহস যাহাদের নাই তাহারাই কোনো মতে অভাবের সঙ্গে আপোষ করিয়া দিন কাটায়, তাহারাই বলে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। তাহাতে সেই অর্দ্ধেরও অর্দ্ধ বাদ পড়িয়া যায় এবং পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের মধ্যে ক্রমাগত পণ্ড হইতে থাকেন। কিন্তু সমস্ত সুবিধাই লইব এ দাবি করিলে প্রকাণ্ড ভারও বহন করিতে হয়। বাতি বড় করিয়া জ্বালাইব অথচ সলিতা ক্ষয় করিব না এ তো কোনোমতেই হয় না। এইজন্য ভারসামঞ্জস্যের প্রয়াস সমস্ত পীড়িত সমাজের ভিতর হইতে মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু এই ভার বহন করিবার শক্তি ইহাদের আছে। আর আমরা কেবলি দুঃখ এবং অসুবিধা বহন করি কিন্তু দায়িত্ব বহন করিতে চাই না। এই জন্যই আমাদের দেশের মজুরীর পরিমাণ অল্প হওয়া সত্ত্বেও দেশী জিনিষের মূল্য কমে না, কেননা মানুষ যতগুলি খাটে শক্তি ততটা খাটে না। কোনো অনুষ্ঠানের প্রতি যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার প্রয়োজন তাহা আমাদের দেশের কাহারো নাই, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে নিজের দিকে তাকায়। আমাদের দেশে একজন মানুষকে আশ্রয় করিয়া একএকটা কাজ জাগিয়া উঠে, তাহার পরে সেই কাজকে যাহারা গ্রহণ করে তাহারা তাহাকে যতটা আশ্রয় করে ততটা আশ্রয় দেয় না। দৃঢ়নিষ্ঠ প্রাণপণ লয়ালটি যদি জাতীয় চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তবেই সমস্ত সম্মিলিত শুভানুষ্ঠান সম্ভবপর হয়। এই যে লয়ালটি ইহা বুদ্ধিগত নহে ইহাও হৃদয়গত, জীবনগত, লাভ লোকসানের সমস্ত হিসাব সেই জীবনের টানের কাছে লঘু—কোনো কর্ম্মে যদি জীবনগত নিষ্ঠা না থাকে তবে কোনো অনুষ্ঠানই নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারে না।

যুরোপ তাহার দেহকে সম্পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। আমাদের আত্মা দেহ হারাইয়া প্রেতের মতো পৃথিবীতে নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেছে। আজ যেমন করিয়াই হোক আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে কলেবরহীন আত্মা কখনই সত্য নহে, কেননা কলেবর আত্মারই একটা দিক্। তাহা গতির দিক, শক্তির দিক, মৃত্যুর দিক—কিন্তু তাহারই সহযোগে আত্মার স্থিতি, আনন্দ, অমৃত।

প্রতিভা (জ্যৈষ্ঠ)।

বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী ভাষা—শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—

দ্রাবিড় জাতি অতি পুরাতন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মনুতে ইহাদের উল্লেখ আছে। রামায়ণোক্ত বানর ও রাক্ষস প্রভৃতি এই দ্রাবিড় জাতি বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। প্রাচীন দ্রাবিড় গ্রন্থে দ্রাবিড়দেশ তামিলক নামে উল্লিখিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথকে মোটামুটি দ্রাবিড় দেশ বলা যাইতে পারে। উত্তর ভারতের বৈয়াকরণেরা ভারতবর্ষের অপভাষাগুলিকে দশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—পঞ্চগৌড়ী ও পঞ্চদ্রাবিড়ী। কিন্তু তাঁহারা মহারাষ্ট্রী ও গুর্জ্জরী ভাষাকে পঞ্চদ্রাবিড়ের অন্তনিবিষ্ট করিয়া গোলযোগ করিয়া গিয়াছেন। দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত মারাঠি ও গুজরাতী ভাষার কোনো সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে তামিল, তেলুগু, মলয়ালম্, কর্ণাটী ও টুলু পঞ্চদ্রাবিড়ী ভাষারূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কেহ কেহ টুড়া, কোটা, গণ্ড ও কু সমেত নয়টী দ্রাবিড়ী ভাষা ধরেন। দ্রাবিড়ী ভাষা উত্তর ভারতের পণ্ডিতদিগের অবজ্ঞাভাজন ছিল। ইহাতে ট বর্গের বাহুল্য দর্শনে তাঁহারা ইহাকে টান্ডা ডান্ডা ঢান্ডা ড়ঢ়াণ অসম্ভ্রান্ডা বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। যুরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এককালে আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, সিংহল, বোর্ণিয়ো, সুন্দা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সংযুক্ত মহাদেশ ছিল। এবং দ্রাবিড়, দ্রমিল, দ্রুইড (দ্রুমল) [ও নিগ্রো] প্রভৃতি জাতি একই মানবশাখার অন্তর্গত। চিল্লাপতিকরণ, মণি মেকলাই, পুরণাসুরু, মেন তামিল প্রভৃতি প্রাচীন তামিল গ্রন্থের মতে রাবণ তামিল ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। ত্রৈলঙ্গ বা তেলেগু ভাষার প্রথম ব্যাকরণকর্ত্তা মহর্ষি কণ্ব বলেন—ভগবান অন্ধ্রবিষ্ণু নিশুম্ভ দৈত্যের বধসাধন করিয়া তাঁহাকে ত্রৈলঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা শব্দসম্পদে বিভবশালিনী হইলেও অনার্য্য শব্দ তাহাতে যথেষ্ট প্রবেশ লাভ করিয়াছে। নীর, শর, মলয়, লঙ্কা প্রভৃতি তামিল হইতে গৃহীত বলিয়া কাহারো কাহারো বিশ্বাস। দ্রাবিড় ভাষার সকল শাখার মধ্যে তামিল সমৃদ্ধতম। অপর চারিটি শাখাভাষা অপেক্ষা তামিলে সংস্কৃতসংস্রব কম। তথাপি অনেক শব্দ সংস্কৃত ও বিশেষভাবে বাংলা ভাষার শব্দের তুল্য; মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে অনেক বিদেশী শব্দও বাংলার ন্যায় দ্রাবিড় ভাষাতেও প্রবেশলাভ করিয়াছে। বাংলাসদৃশ শব্দ তামিলে প্রবেশলাভ করার কারণ অনেকে অনেকরূপ বলেন। (১) কনকসভৈ পিলে প্রভৃতি তামিল পণ্ডিতেরা বলেন, প্রাচীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত জাতি খৃষ্টজন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে দক্ষিণভারতে উপনিবেশ করিয়াছিল। তামিল নাম তাম্রলিপ্তির পালি রূপান্তর তামলিটির অপভ্রংশ। (২) সিংহপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সিংহরাজের পুত্র বিজয়সিংহ খৃ-পূ পঞ্চম শতাব্দীতে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইবার সময় কৃষ্ণা নদীর তীরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন; বিজয়বাটিকা (আধুনিক বেজোয়াড়া) তাঁহার স্থাপিত নগর। এই বাঙালী রাজপুত্রের ভাষা দক্ষিণভারতে বহুদিন প্রচলিত ছিল। (৩) অন্ধ্র ভৃত্যগণের বঙ্গবিজয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। উক্ত ব্যাপারে বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে ভাব ও ভাষার আদান প্রদান হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত যোড় ও বল্লালগণের প্রভাব বেলুড় বেলুন প্রভৃতি গ্রামের নামে আজও দেখা যাইতেছে। [Refce. Bibliography :—The Origin of the Tamil Velalas; Caldwell's Comparative Grammar of the Dravidian Languages; Tamil Eighteen hundred years ago; Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature.]

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (শ্রাবণ)।

মহাভারত ও রামায়ণের কাল তুলনা—শ্রীচন্দ্রকিশোর তরফদার—

নিম্নলিখিত জ্যোতিষিক কারণে মহাভারতকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন মনে হয়—(১) মহাভারতীয় কালে যাত্রা, বিবাহ ও অভিষেকাদি কার্য্যে শুভাশুভ কালনির্ণয়ে মুহূর্ত্ত ও তিথি নক্ষত্র ভিন্ন অন্য কিছু বিবেচিত হইতে দৃষ্ট হয় না এবং কলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রে

অভিজ্ঞ দৈবজ্ঞগণেরও মহাভারতে কোন উল্লেখ নাই। রামায়ণের কালে দৈবজ্ঞগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা মুহূর্ত্ত ও তিথি নক্ষত্র ভিন্ন গ্রহ, বার, মাস, ও লগ্নাদি দ্বারাও রীতিমত শুভাশুভ বিচার করিতেন, তৎসাহায্যে লোকের আয়ু ভাগ্যাদি পরীক্ষা করিতেন। রামায়ণে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। (২) মহাভারতীয় কালে মাসসকলের নক্ষত্রজ নাম পরিস্ফুট হয় নাই। রামায়ণে মাসের নক্ষত্রজ নামের অভাব নাই। (৩) মহাভারতীয় কালে রাশিসকলের নামকরণ হয় নাই। রামায়ণে কেবল রাশির নাম নহে, তাহাদের লগ্নের বা উদয়াস্তের পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। সুতরাং তখন লগ্নসকলের পরিমাণ পরিজ্ঞাত ছিল। অধিকন্তু কোন্ রাশি কোন্ গ্রহের উচ্চ বা নীচ স্থান তাহাও পরিচিত ছিল। ইহাতে বোধ হয়, জ্যোতিষের কোন কোন সিদ্ধান্তগ্রন্থ রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী। (৪) মহাভারতে বারের নামোল্লেখ নাই। রামায়ণে বৃহস্পতিবারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (৫) রামায়ণে মহাভারতীয় কালের পূর্ব্বে ঋতুসকল ও অয়ন প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। চৈত্রমাসে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক কাল মনোনীত হইয়াছিল। তাহার অব্যবহিত পরে তাঁহার চিত্রকূট গমনকালে শিশিরান্তে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইয়াছিল এমত বর্ণনা আছে। অতএব চৈত্রমাসেই বসন্তারম্ভ হইত। শ্রাবণ মাসে বর্ষারম্ভ হইত—এবং বর্ষার আগমন সঙ্গেই উত্তরায়ণ চরম প্রাপ্ত হইত। আশ্বিন মাসে সুগ্রীব অঙ্গদাদিকে একমাসকাল মধ্যে সীতান্বেষণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। রামায়ণের কালে আশ্বিন মাসে শরৎ ঋতু প্রবৃত্ত হইত। শরদন্তে হেমন্ত প্রবৃত্ত হইয়া পৌষ মাস পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকার উল্লেখ আছে। দেখা যায় যে পৌষ মাসে রাত্রিসকল অতি দীর্ঘ হইত, সুতরাং উত্তরায়ণ প্রবৃত্তির অধিক বিলম্ব থাকিত না। বাস্তবিক, সূর্য্য তখন অত্যন্ত দক্ষিণগামী হইত। ইহা পাঠে কেহ কেহ পৌষ মাসেই দক্ষিণায়ণ শেষ হইত বলিতে পারেন। আমরা পৌষান্ত মাঘমাসে শীত ঋতু ও উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইত বলিয়াই সম্প্রতি তৃপ্ত থাকিব। এইসকল মাস সৌর কি চান্দ্র, এবং মাসের কয়দিন গতে অয়ন আরম্ভ হইত তাহা বুঝা যায় না। সৌর হইলে, ১লা মাঘ উত্তরায়ণ আরম্ভে সূর্য্য উত্তরাষাঢ়ার দ্বিতীয় পাদারম্ভে অবস্থান করিত (ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা)। আর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রচলিত প্রথামত এইসকল মাস গৌণ চান্দ্র হইলে, অন্তিমপক্ষে সৌরমাঘ ও শ্রবণার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গৌণচান্দ্র উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইত। ইহা বর্ত্তমান সময়ের ন্যূনাধিক ২৮০০ বা খৃষ্টের ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে। ইহার পরে ভিন্ন পূর্ব্বে নহে। সুতরাং রামায়ণের অন্ততঃ সার্দ্ধসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল। যাঁহারা মহাভারতের বনপর্ব্বে রামায়ণ উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা কেহ কেহ আমাদিগের নির্দ্দেশে স্তম্ভিত হইবেন। মহাভারতে থাকিলেই যদি তাহা মহাভারতের কালীয় কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হয় তবে সভাপর্ব্ব, ১১শ অধ্যায়োক্ত ভাষা, তর্কশাস্ত্র, নাটক, বিবিধ কাব্য ও কারিকাগ্রন্থকে, এবং বনপর্ব্ব ১৮৭ম অধ্যায়োক্ত আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ ও যবন প্রভৃতি ম্লেচ্ছ রাজবংশকে কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক বলিব না? মহাভারতের আখ্যানভাগ পরবর্ত্তী কালের লেখা।

মহাভারত রামায়ণের পূর্ব্বের হইলেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বের হইবেন ইহা যুক্তিসঙ্গত হয় না। রামায়ণের মূল মহাভারত অপেক্ষাও পুরাতন হইতে পারে। রামায়ণকর্ত্তা স্বয়ংই লঙ্কাকাণ্ডের শেষভাগে তাঁহার গ্রন্থকে পুরাবৃত্তমূলক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় নটরাজ শিব—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

অনেকের বিশ্বাস যে নটরাজ শিবের মূর্ত্তি দাক্ষিণাত্যে বিরল, আর্য্যাবর্ত্তে মোটেই নাই। কিন্তু সে বিশ্বাস ঠিক নহে। বাংলা দেশেই বিক্রমপুরে দুটি নটরাজমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নটনাথের শিরোভূষণ নাগ, অজন্তাগুহার চিত্রের ন্যায় অর্দ্ধনারী অর্দ্ধসর্পাকার। বৌদ্ধপুরাণে শিবের নাম বিরূপাক্ষ, নাগগণ বিরূপাক্ষের প্রজা। নাগপূজা ও শিবপূজা ভারতের অপর প্রদেশের ন্যায় বঙ্গেও বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল।

আর্য্যাবর্ত্ত (আষাঢ়)।

পুরাতন প্রসঙ্গ—(শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বস্মৃতি) শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত—

তালতলায় নীলমণি কুমারের বাড়ীতে একটি Positivist Club স্থাপিত হয়। এদেশে তখন অনেক Positivist ছিলেন—সিভিলিয়ান গেভিজ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ লব, কটন, বেভারিজ, হ্যাগার্ড ও ২।১ জন ছোকরা সিভিলিয়ান। ইংরেজেরা সে ক্লাবে আসিতেন না; বাঙালী সভ্য ছিলেন—যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee), ছোট আদালতের জজ K. M. Chatterjee, হাইকোর্টের অনুবাদক কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার ও নীলমণি কুমার প্রভৃতি। পুরাপুরি কোমতের শিষ্য না হইলেও ইহাঁরা Humanityর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য মনে করিতেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র সম্পূর্ণ কোমতের মতাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ঝোঁক হইয়াছিল এদেশের উপযুক্ত করিবার জন্য কোমতের মত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। তিনি Humanityর নাম দিয়াছিলেন "নারায়ণী"। কোমত মনে করিতেন, দুগ্ধপোষ্যশিশুক্রোড়ে জননীমূর্ত্তি visible representation of Humanity হইবে। যোগেন্দ্র ঘাগরাপরা মাতৃমূর্ত্তি পছন্দ না করিয়া কস্তাপেড়ে শাড়ী ও সিঁদুর পরা, শিশুকে-স্তন্যদানরতা মাতৃমূর্ত্তি রূপে তাঁহার নারায়ণীর ছবি আঁকাইয়াছিলেন। যোগেন্দ্র কোমতকে ঋষি নাম দিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অমরকোষের মতে ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ, অর্থাৎ যাঁহার শাপ বা বর সমস্ত বাক্যই ফলে তিনিই ঋষি; এজন্য কোমতকে ঋষি নাম দিতে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ইতস্তত করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র সূর্য্যের স্তব পর্য্যন্ত positivism ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া উহার এক হিন্দুয়ানি সংস্করণ খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রের মৃত্যুর পর এদেশে positivismএর আর কেহ পাণ্ডা রহিল না। আচার্য্য কৃষ্ণকমলের দাদার মৃত্যু হইলে মনের আবেগে আচার্য্য কোমতকে এক চিঠি লেখেন, তখন কোমত জীবিত ছিলেন না; সে চিঠি বিদ্যাসাগরের নিকট ফিরিয়া আসে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার romantic কাণ্ড দেখিয়া পাগলামি বলিয়া স্নেহের অনুযোগ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তোতলা ছিলেন, কিন্তু তিনি এমন সাবধান হইয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতেন যে কেহ তাঁহার সে দোষ ধরিতে পারিত না। এই জন্যই বোধ হয় তিনি সংস্কৃত কলেজে কখনো কোনো ক্লাশ পড়ান নাই। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিভিলিয়নদিগকে বাংলা পড়াইবার সময় বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল অংশ পড়াইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন; সেই জন্য তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনা ও প্রকাশ করেন; ইহা 'বেতাল পঁচিশি' নামক হিন্দি বহি হইতে কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা-করা পরম সুন্দর একখানি গ্রন্থ। ইহা বাহির হইবার পূর্ব্বে পুরুষপরীক্ষা ও 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' নামক দুইখানি পুস্তক প্রচলিত ছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বোধহয় প্রথম প্রকাশিত হয়। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের এক খুড়া ছিলেন, সেটি একটি character। বিদ্যাসা তাঁহাকে কলেজে সংস্কৃত

পুঁথির scribe নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার হাতের লেখা মুক্তার মতো ছিল; কিন্তু তিনি সংস্কৃত লেখাপড়া কিছুই জানিতেন না। তথাপি যা-তা সংস্কৃত শ্লোক অনর্গল রচনা করিতেন, পুঁথি নকল করিবার সময় আদর্শ পুঁথিতেও কাটকুট করিতেন।

বিদ্যাসাগর বীটনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। বীটন মেমোরিয়লের জন্য তিনি ছাত্রদের স্কলারশিপ থেকে দুটাকা করিয়া কাটিয়া লইয়াছিলেন, ছাত্রেরা ব্যাপারটা কি না বুঝিলেও বিদ্যাসাগর যখন বলিলেন তখন আর কোনো আপত্তি করেন নাই। বীটন সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। প্রতি বৎসর সব কলেজের ছাত্রদিগকে একত্র করিয়া কলিকাতা টাউন হলে পারিতোষিক দেওয়া হইত। একবার সভাপতি ছিলেন বাংলার ডেপুটি গবর্ণর সার জন লিটলার। তিনি বেঁটে ছিলেন, ও তাঁর পেটটি ছিল মোটা। বীটন বক্তৃতা করিতে উঠিয়া Sir John বলিয়া পুনরায় শুধু Sir বলিয়া আরম্ভ করিলেন। খর্ব্বাকৃতি বর্ত্তুলোদর গবর্ণরকে দেখিয়া বীটনের মনে Sir John Falstaffএর স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি সামলাইয়া গেলেন। বীটন কাপ্তেন রিচার্ডসনকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করেন; একজন Law Member (Lord Macaulay) কাপ্তেনকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আর-একজন Law Member তাঁহাকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। বীটন কোনো বক্তৃতায় তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া hoary libertine বলিয়াছিলেন। এই চরিত্রহীনতা দোষেই বীটন তাঁহাকে শিক্ষাকার্য্য হইতে অপসারিত করেন।

ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার—শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

ম্যালেরিয়া প্রতিকারের উপায়—(ক) যাহাতে মশক কামড়াইতে না পারে তাহার চেষ্টা। অর্থাৎ মশারী টাঙাইয়া শয়ন, গায়ে সর্ব্বদা জামা রাখা, গৃহস্থলী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, জানালা দরজায় মশক-নিবারক জাল দেওয়া, ঘরে ধুনার ধোঁয়া দেওয়া প্রভৃতি। রশুনের গন্ধে বা তামাকের ধোঁয়াতে মশক দূর হয়। (খ) ম্যালেরিয়া হইলে সত্বর রোগমুক্তির উপায় করা। ম্যালেরিয়ার স্থানে প্রত্যহ অল্প কুইনাইন খাওয়া উচিত। (গ) শরীরকে এরূপ ভাবে শিক্ষিত করা যাহাতে রোগ হইতে অব্যাহতি লাভের ক্ষমতা জন্মে। কারণ, শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়। প্রসিদ্ধ মেচনিকফ প্রভৃতি প্রমাণ করিয়াছেন যে রক্তস্থ শ্বেতকণিকাগুলি শরীরের রক্ষিসৈন্যের কার্য্য করে; শরীরের অনিষ্টকর কোনো পদার্থ শরীরে প্রবেশ করিলে উহারা সেই শত্রুকে বিনাশ করে, বা বিতাড়িত করে বা বন্দী করে। শরীরগঠনকারী যাবতীয় কোষেরই এই ক্ষমতা আছে। রক্তস্থ তরল পদার্থও (plasma) এইরূপ গুণবিশিষ্ট। শরীরের বিষদোষনাশক এই ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে অনাহার বা নিরম্বু আহার করিলে শরীরের রক্ত রস কমিয়া যায়, এবং তাহার ফলে রক্ত শরীরের বিভিন্ন কোষ হইতে রস সংগ্রহ করে, এবং তাহাতে রোগবিষ রক্তের মধ্যে গিয়া ধ্বংস হইয়া যায়।

প্রজাপতি (আষাঢ়)।

আর্দ্রক বা আদা—শ্রীকুঞ্জবিহারী বিশ্বাস—

আদা তিন প্রকার—(১) আদা, (২) কৃষ্ণ আদা, (৩) আম আদা। আদার চাষ সহজ; দোঁআশ মাটিতে ভালো হয়; মৃত্তিকা যাহাতে নরম থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আদার পক্ষে গোবরের পুরাতন সার উপকারী। বৈশাখ মাস রোপণের সময়। আদার গায়ের গেঁড়ো রোপণ করিলে গাছ হয়, তাহারই মূল আদা। আদার মূলাংশের নাম শুমো। আদা তুলিয়া বীজ রক্ষার জন্য গেঁড়োগুলি একদিবস রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কোনো স্থানে শুষ্ক ঘাস বিছাইয়া দেড়ফুট উচ্চ গাদি দিয়া ঘাস চাপা দিতে হয়। এক রংপুর জেলা হইতে বৎসরে আশি হাজার টাকার আদা বিদেশে রপ্তানি হয়। জার্ম্মানীতে আদা দুর্ম্মূল্য; পোর্টুগালে আদা হইতে উৎকৃষ্ট সুরা হয়। এক বিঘা জমিতে ৩০ মণ আদা জন্মে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য (আষাঢ়)।

মানকচুর আবাদ—শ্রীনগেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার—

রীতিমত চাষ করিয়া সার দিলে এক একটি কচু এক মণেরও অধিক হয়। ভাদ্র মাসের শেষ হইতে আশ্বিন মাসের শেষ অবধি রোপণের সময়। কচুর ক্ষেত বেশ পরিষ্কার উঁচু রৌদ্রযুক্ত হওয়া চাই। জমিতে তিন তিন হাত অন্তর ১ হাত দীর্ঘ প্রস্থ গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে কচু লাগাইয়া ভিজা মাটি আলগা ভাবে চাপা দিতে হয়। গাছ পুঁতিবার পর হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত বৃদ্ধির সময়; চৈত্র শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠ শেষ পর্য্যন্ত ক্ষেতের পাট করিবার সময়; কচু গাছের গোড়ায় এক একটি ছোট গর্ত্ত সারপূর্ণ করিয়া জমি কোপাইয়া সমস্ত মাটি গুঁড়া করিতে হয়; শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ঘাস নিড়াইয়া দিতে হয়; আশ্বিন মাসে আবার কোপাইয়া মাটি গুঁড়াইয়া দিতে হয়, কিন্তু সাধারণ কচুর একটি শিকড়ও যেন না কাটে। মাঘ ফাল্গুন কচু তুলিবার সময়। কচুর শত্রু সজারু ও শূকর। কচুর গোড়া খুব উঁচু করিয়া বাঁধিয়া দিলে উহারা ক্ষতি করিতে পারে না; মধ্যে মধ্যে প্রত্যহ কয়েকদিন ক্ষেতের স্থানে স্থানে আলো দিলে উহারা আসে না। প্রতি বিঘাতে অন্যূন ৪০০ কচু উৎপন্ন হয়; একজন লোক ২ বিঘা জমি চাষ করিতে পারে। ভাদ্র হইতে জ্যৈষ্ঠ ৪ মাস ও কচু উঠাইতে ১ মাস মোট ৫ মাস খাটিলে ৮০০ কচু লাভ করা যায়। কলিকাতায় প্রত্যেক কচুর দাম পড়ে ১৲ টাকা ধরিলে ৮০০৲ টাকা। খরচ বাদ ১০০৲। লাভ ৫ মাসে ৭০০৲ টাকা। অবশিষ্ট ৭ মাস অন্য কাজ করিলে কচুর চাষের ব্যাঘাত হয় না। কচুতে ছাই সার ভালো নয়, গোবর সারই উপযুক্ত। প্রথম বৎসর যে জমিতে কচু হয় পর বৎসর সে জমিতে আর হয় না, অন্য ফসল দিতে হয়। কোনো জমিতে এক বৎসর অন্তর কচু করিতে হয়। এ সম্বন্ধে কাহারো কিছু জানিতে হইলে 'ব্যবসা ও বাণিজ্য'-সম্পাদকের ঠিকানায় লেখককে জিজ্ঞাসা করিলে লেখক জবাব দিতে স্বীকৃত আছেন।

অর্থোপার্জ্জনের সহজ উপায়—শ্রীমহাম্মদ সফী মিয়া—

আসাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে অর্থোপার্জ্জনের বিশাল ক্ষেত্র এখনো আছে। আসামের চা-বাগানগুলির মালিক শতকরা ৯৯ জন ইংরেজ, লাভ লক্ষ লক্ষ টাকা। আমাদের দেশের শ্রমে ও সামগ্রীতে বিদেশী ধনী হইতেছে, আর আমরা তাহাদের নিকট ১০।২০ টাকার চাকরী করিতেছি। শিক্ষিত যুবকেরা যৌথভাবে ঐসকল পার্ব্বত্য প্রদেশে নিম্নলিখিত উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন—(১) বন্দোবস্তী জমির গাছ বিক্রয়; (২) সাইজমত কাঠ প্রস্তুত করাইয়া চালান দেওয়া; (৩) কাঠের কার্ণিসার প্রস্তুত; (৪) পোড়া কাঠের কয়লা বিক্রয়; (৫) সেগুন, সাল ও মেহগিনি বৃক্ষের বাগান করা; (৬) ফলের বাগান করা; একজন সাহেব পাহাড়ী পেয়ারা

বিক্রয় করিয়া হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করে; (৭) সবজি তরি-তরকারি, রবিশস্য, কপি, সালগম, কচু, লঙ্কা, সরিষা ইত্যাদি উৎপাদন; (৮) কার্পাস উৎপাদন; ৯) ধান্য উৎপাদন; (১০) পান রোপণ; (১১) বাঁশ বিক্রয়; (১২) ছাতার বাঁটের উপযোগী সরু বাঁশ চালান দেওয়া; (১৩) বাঁশের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করানো; (১৪) পশুপালন; (১৫) গব্য ব্যবসায়; (১৬) রবার বৃক্ষের চাষ; (১৭) মৎস্যের ব্যবসায়; (১৮) পক্ষী পালন; (১৯) ছন খড়ের ব্যবসা; (২০) জাহাজের রসি তৈরি করিবার জন্য আনারস জাতীয় গাছের চাষ; (২১) আখের চাষ। যে-কেহ জমি বা পাহাড় জমা লইয়া কারবার করিতে চান তিনি লেখকের নিকট বা সোলতান-সম্পাদক মৌলবী মহম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব, চট্টগ্রাম ঠিকানায় চিঠি লিখিতে পারেন।

—মণিভদ্র।

অনুপ্রাসের অট্টহাস*

(শব্দগঠনে অনুপ্রাসের প্রভাব)

অয়ম্ অহম্ ভোঃ। আমি অনুপ্রাস। রসের আদিতে যেমন আদিরস, অলঙ্কারের আদিতেও তেমনি আমি। নায়ক-নায়িকার মধুরমিলনে আদিরস এবং ভাব ও ভাষার মধুরমিলনে আমি, ঘটকের কায করি। তাই কবি কালিদাস ভাব ও ভাষার, শব্দ ও অর্থের মিলনমঙ্গলে পার্ব্বতীপরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া স্বস্তিবাচনেই আমার মান রাখিয়াছেন। আমার ভক্ত দাশরথি রায় ও মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠকে শব্দকবি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি যে, অনুপ্রাসের স্বভাবসিদ্ধ লীলাখেলায় ভাষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুপ্রাণিত? ইহা আগাগোড়া কবিকল্পিত কৃত্রিম কাণ্ড নহে। মুষ্টিমেয় মার্কামারা সাহিত্যসেবীই যে শুধু অনুপ্রাসে অনুরক্ত, তাহা নহে। বাগ্‌ব্যাপারে অহরহঃ ভূভারতে আবালবৃদ্ধবনিতা কোটিকণ্ঠে সমস্বরে সর্ব্বাবস্থায় আমার বিজয়বার্ত্তা বহন করে।

আমি বিশ্বব্যাপী, জগজ্জয়ী, শক্তিশালী, সর্ব্বেসর্ব্বা। আমার যশঃ জগৎযোড়া, আমার হাসি ভুবন-ভুলান। বিশ্ববাসী আমাকে যথাযোগ্য মানমর্য্যাদা দেয়। যেথানে জনমানবের সমাগম আছে আমি সেথানেই আছি। সকল স্থানে, সকল কালে, কোন-কিছু করিতে, আমায় আবশ্যক হয়। তাই তো পারতপক্ষে আমি কস্মিন্‌কালে কাছছাড়া হই না।

জীবে শিবে, জীবে জড়ে, স্থূলে সূক্ষ্মে, রূপরসে, দিগ্‌দেশে, জলে স্থলে, ভূলোকে দ্যুলোকে, অনলে অনিলে সলিলে, আলোকে আঁধারে, আকাশে বাতাসে, সম্বিৎ-সাগরভূধরে, পারাবারে, সমুদ্রসৈকতে, সাগরসঙ্গমে, বারিধিবক্ষে, বাড়ববহ্নিতে, তরঙ্গভঙ্গে, লহরীলীলায়, সসাগরা ধরায়, ধরাধামের শ্যামশোভায়, ফলমূলে, উদ্‌ভিদে, ফুলফলে, পত্রপুষ্পে, পত্রপল্লবে, লতাপাতায়, তরুলতায়, শাখাপ্রশাখায়, জলেজঙ্গলে, বনেবাদাড়ে, পাহাড়পর্ব্বতে, গিরিগুহায়, গুহাগহ্বরে, নদীনালায়, খালবিলে, বিল ও ঝিলে, চরাই উতরাইএ, জীবজন্তুতে, পশুপক্ষীতে, সরীসৃপে, কৃমিকীটে, সাতসমুদ্রে, দশদিকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, বিশ্ববৈচিত্র্যে, সর্ব্বত্র আমাকে প্রভূত-পরিমাণে পাইবেন। রণে বনে, জীবনে মরণে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, সংসারে সন্ন্যাসে, শ্মশানে মশানে, মান-অপমানে, শয়নে স্বপনে, অশনে বসনে, আসনে বাসনে, বিবাদে বিবাহে, সর্ব্বত্র আমি সুশোভন। সামনে পিছনে, সুরু হইতে শেষে, আমাকে পাইবেন। এ মহীমণ্ডলে, সু কু, ঊর্দ্ধ অধঃ, উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, আপন পর, আসমান জমীন, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, সকল ঘটেই আমি আছি। ধর্ম্মকর্ম্মই বল আর চুরিচামারিই বল, গরুচুরিই বল আর বৈষ্ণববন্দনাই বল, আমাছাড়া কিছুই নাই। মহামায়ার ভোজবাজী হইলেও, আমার জোরেই এই জগদ্‌যন্ত্রটা চলিতেছে।

দিব্যচক্ষুঃর প্রয়োজন নাই, চর্ম্মচক্ষেই আমাকে দেখিতে পাইবে। হাবভাবে, ভাবভঙ্গীতে, ভাবভক্তিতে, ভাবেভোবে, ঠারেঠোরে, রকমসকমে, ধরণধারণে, আকার-প্রকারে, চালচলনে, শিক্ষাদীক্ষায়, শিক্ষাসহবতে, আমি হাতেনাতে ধরা পড়ি। আমারই গুণে কর্ম্ম করিলে ঘর্ম্ম হয়, হিল্লোল উঠিলে জলে কল্লোল হয়। আমারই তাড়নায় ষড়্‌রিপু চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায়। কাম-ক্রোধ, মদ-মোহ-মাৎসর্য্য, আমার বশ। কেবল লোভ লোভ সামলাইয়াছে। হলাহল কালকূটও আমার সংস্পর্শে সুখচরের চিনির মত মিষ্ট। আমারই অনুরোধে এক রবি কবি, আর এক

---

* ২২এ জুলাই তারিখে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে পঠিত। ভক্তিভাজন স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল, পি-এচ, ডি মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রবি ছবি আঁকেন। আমারই আবদারে পেঁচোয়-পাওয়া অবস্থায় এই লেখকের ললিতলবঙ্গ নাম-লাভ হইয়াছিল।

অগ্নিকণায় আমি, বারিবুদ্‌বুদেও আমি। সসীমে আমি, অনন্তেও আমি। অকিঞ্চিৎকরে আমি, সারাৎসার পরাৎপরেও আমি। জ্ঞাননেত্রে আমি, চর্ম্মচক্ষেও আমি। মহামহোপাধ্যায়ে আমি, মহামূর্খেও আমি। দেবভাবে আমি, পশুপ্রকৃতিতেও আমি। সখ্যস্থাপনে আমি, শত্রুতা-সাধনেও আমি; সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আমি, বিদ্বেষবহ্নিতেও আমি। স্বার্থসিদ্ধিতে আমি, পরার্থপ্রাণতায়ও আমি। ন্যায়নিষ্ঠাতে আমি, পক্ষপাতেও আমি। মনের মিলনে আমি, মনোমালিন্যেও আমি। মিথ্যাকথায় আমি, সারসত্যেও আমি। সৎসঙ্গে সৎসংসর্গে সাধুসঙ্গে আমি, আবার কুচক্রী কুলোকের কাছেও আমি। বুদ্ধিবৃত্তিতে আমি, স্মৃতিশক্তিতেও আমি। বিষয়বুদ্ধিতে আমি, আবার বাঁদুরে বুদ্ধি, বিকৃতবুদ্ধি বা বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিতেও আমি। বাহুবলে আমি, ব্রাহ্মণ্যবলেও আমি, আবার বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবলেও আমি। বিরহীর হাহুতাশ (হা হতোঽস্মি ?) দীর্ঘশ্বাসে আমি, আবার বীরের হুঙ্কারটঙ্কারেও আমি। ত্রেতায় রামরাজ্যে রামরাজত্বে আমি, আবার মগের মুল্লুকে কাতলাফেলার দেশেও আমি। নন্দনকাননে, মানস-সরোবরে আমি, আবার নরককুণ্ডে, রৌরবে, প্রেতপুরী বা পাতালপুরীতেও আমি। হাটে ঘাটে বাটে মাঠে গোঠে আমি, নগরে সহরে গণ্ডগ্রামেও আমি। লোকালয়ে আমি, পশুশালায়ও আমি। গহনকাননে বনবাসেই যাও আর লোকালয়েই থাক, আমি সঙ্গের সাথী। বদ্ধবায়ুতে আমি, বিশুদ্ধবায়ুতেও আমি। কুরুকুলে আমি, পঞ্চপাণ্ডবেও আমি। সীতাসতীতেও আমি, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিতেও আমি। মায়া-মৃগে আমি, স্বর্ণসীতায়ও আমি। বালবিধবায় আমি, পতি পুত্রবতীতেও আমি। মেয়েমানুষে আমি, পুরুষমানুষেও আমি। বনের বানরে আমি, মনের মানুষেও আমি।

নরনাথ বা ক্ষিতিপতিতে আমি, রাজরাণীতেও আমি। রাজপূজায় আমি, প্রজাপ্রীতি প্রজাপালন প্রজা-রঞ্জনেও আমি। সুশাসনে আমি, কু-শাসনেও আমি। কুশাসনে গুরুপুরোহিত, সিংহাসনে রাজারাণী, সুখাসনে বরবধূ, আমার নিকট তুল্যমূল্য। শক্তিশালী সৌভাগ্য-শালীতে আমি, প্রিয়পাত্রেও আমি। পূর্ব্বপুরুষে আমি, বংশবৃদ্ধি বংশবিস্তারেও আমি। ঔরসসন্তানে আমি, পোষ্যপুত্রেও আমি। কৃষিকর্ম্মে হলচালনে পশুপালনে গরুচরান ভেড়াচরানয় আমি, ব্যবসায়বাণিজ্যে বণিগ্-বৃত্তিতেও আমি। গুরুগিরিতে আমি, আবার মাছিমারা কেরাণীর কাণে কলমেও আমি।

সুখসম্পদে, সুখসৌভাগ্যে, সুখস্বস্তিতে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে, সুখশান্তিতে, সম্মানসম্ভ্রমে, ধনে মানে, ধনজনযৌবনে, পদ-পসারে, পসার-প্রতিপত্তিতে, বিষয়-সম্পত্তিতে, বিষয়-আশয়ে, বিষয়-বাসনায়, বিষয়বিষে, ব্যয় (ব্যসনে ?) ভূষণে, ব্যয়বৃদ্ধিতে, ব্যয়বাহুল্যে, বিলাসলালসায়, কমলার কৃপা-কটাক্ষে আমি; আবার আপদ্ বিপদে, বিঘ্নবাধায়, বিঘ্নব্যাঘাতে, দৈবদুর্ব্বিপাকে, দেবদৈবে, দুঃখদৈন্যদারিদ্র্যে, মহামুস্কিলেও আমি। ধনীমানী, মান্যগণ্য জনগণের মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইবে, আবার দীনদুঃখী দীনহীন দীনদরিদ্রের মধ্যেও আমাকে দেখিতে পাইবে। (রাজা উজীরের) রাজা রুজীর, রাজা মহারাজার, রাজা রাজড়ার, আমীর ওমরার কাছেও আমি, আবার মুটে মজুরের কাছেও আমি। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে আমি, শ্বশুরদত্ত সম্পত্তিতে আমি, আবার পুরুষ-পরম্পরাগত পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর অস্থাবর সরিকানী সম্পত্তিতেও আমি। রাণী ভবানীতে রাণী রাসমণিতে রাজা রামকৃষ্ণে আমি, আবার ভজা জেলেয় ফুলী জেলেনীতে শিবুসায়ও আমি। পরশপাথরে, মণিমাণিক্যে, মণিমুক্তায়, মুক্তার মালায়, আকবরী মোহরে, হীরার হারে, হীরাজহরতে, ধনদৌলতে, সোণার খনিতে, লাক টাকায়, চেক কাটায়, পুঁজিপাটায়, টাকাকড়িতে, মোটা মাহিয়ানায়, উপরি পাওনায় আমি, আবার কাণাকড়িতে, শকুশরাবে, ভিক্ষাভাণ্ডে, রিক্তহস্তে, খালি থলিতে, ধনস্থানে শনিতে, সর্ব্বস্বান্তে, সর্ব্বশূন্য দরিদ্রতায়ও আমি। এক কথায়, পাতাচাপা কপালেও আমি, পাথরচাপা কপালেও আমি।

সুস্থশরীরে নির্নিমেষ-নয়নে চোখ চেয়ে জলজ্যান্ত বসিয়াই থাক, আর চিররোগী জরাজীর্ণ তন্দ্রাতুর কম্পমান কলেবর হইয়া মরার মত শয্যাশায়ীই থাক, আর ঘুমের ঘোরে, সুপ্তিসুখে বা সুষুপ্তিসাগরে ডুবিয়াই যাও, আমি

আশে পাশে আছি। আনমনা বা অন্যমনস্ক হইয়া একমনে একধ্যানে আকাশকুসুম শশশৃঙ্গ প্রভৃতির ভাবনায় বিভোরই হও, আর কার্য্যকুশল করিৎকর্ম্মা বা অক্লান্তকর্ম্মা বা ক্রূরকর্ম্মা হইয়া অসমসাহসিকতার সহিত প্রাণপণে অসাধ্য-সাধনে কৃতকার্য্যতার জন্য কৃতসঙ্কল্পই হও; শশব্যস্ত, ব্যস্ত-সমস্ত, ব্যতিব্যস্ত, ব্যস্তবাগীশই হও আর বাক্যবাগীশ বচন-বাগীশ বক্তৃতাবাগীশই হও, কার্য্যকালে দ্বিধাবোধ ও গয়ংগচ্ছ না করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেশের জন্য ও দশের জন্য অগ্রগামী ও প্রাণান্তপরিচ্ছেদ বা প্রাণপাত করিয়া অগ্রগণ্যই হও, আর পরপ্রত্যাশী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও মনমরা হইয়া সহজসাধ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মে পিছপাও বা পশ্চাৎপদই হও; শত্রুর গর্ব্বখর্ব্ব করিয়া স্বয়ংসিদ্ধই হও আর কষ্টেসৃষ্টে কায়ক্লেশে কষ্টকল্পনা বা সাধ্যসাধনা করিয়া কেঁদে ককিয়ে বড় বেগতিক বুঝিয়া 'চাচা আপনা বাঁচা' বলিতে বলিতে পিটটানই দাও, (পৈত্রিক প্রাণ লইয়া পালাবার পথ পাবেনা) আমার অধীনতা ছাড়াইতে পারিবে না। সংস্কৃত করিয়া নরনারীকে শুভসংবাদ সুসমাচারই দাও, আর সোজাসুজি মেয়েমর্দ্দকে খোসখবরই দাও, বাক্যব্যয় করিলেই আমার সাড়া পাইবে। শ্রুতিসুখ সরস বচনবিন্যাসে কর্ণকুহরে মধুধারাই ঢাল, আর চৌদ্দ চুপড়ি কথায় ভ্যান ভ্যান করিয়া আবোল তাবোল বকিয়া কাণ ঝালাপালাই কর, আমাকে ঠেলিতে পারিবে না। কেন না, কাযের কথায়ও আমি, বাজে বকুনিতেও আমি।

আপনারা সাহিত্যরসে ভরপুর, সাহিত্য হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া তেলা মাথায় তেল ঢালিব না। ধর্ম্মের কাহিনী বোধ হয় আপনারা—শুনিতে চাহিবেন না। অতএব সে প্রসঙ্গও না-ই তুলিলাম। ব্যাকরণ অভিধান, ছন্দঃ অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, বৈদ্যকশাস্ত্র প্রভৃতির কথা আলাদা আসরে বলিয়াছি। অন্যান্য বিদ্যায়ও আমার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে কি না দেখুন।

(১) বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানবলে বলীয়ান্। অতএব বিজ্ঞানের বিষয়ই বিবেচনা করুন। প্রকৃতিপরিচয়ে, বায়ু-বিজ্ঞানে বা বিমানবিদ্যায়, ব্যোমবিহারে, বিমানযানে, জলযানে (জাহাজে), জলজানে, স্থিতিস্থাপকতায়, কৈশিক আকর্ষণে, দিগ্দর্শনে, মানমন্দিরে, শ্বেতসারে, সুরাসাবে, তাড়িতে, তারহীন তাড়িতবার্ত্তায়, বিজ্ঞানের বরাতে মাথামাপায়, এমন কি টেলিগ্রাফের টরেটক্কায় পর্য্যন্ত আমার রসে নীরস সরস হইয়াছে।

[তাহার পরে বিদেশী শব্দ আসরে আমদানী করিলে তো অনুপ্রাস অফুরন্ত। যথা,—alkali, alcohol, phosphorus, phosphate, Tartaric, Tantalum, Carbide of Calcium, mesmerism, protoplasm, Rontzen rays; Atlantic গামী জাঁদরেল জাহাজ Titanic ও তাহার আরোহী সলিলসমাধিস্থ মহামনাঃ ষ্টুস স্মিথ ষ্টেড এষ্টর; বিজ্ঞানবিৎ Pasteur ও Lord Lister, Hankine, Lagrange, Laplace, Galileo সবাই আমার বশ। রসায়ন-বিজ্ঞানে chemical compound কিন্তু mechanical mixture—এই সূক্ষ্ম প্রভেদেও আমার কৃতিত্ব নহে কি ?]

(২) গণিতবিদ্যায় পাটীগণিত বীজগণিত, জ্যামিতি-ত্রিকোণমিতি, জরিপ পরিমিতি [ক্যালকুলস্ কোয়াটার্নিয়ন] প্রভৃতি শাস্ত্রে, ও যোগবিয়োগ, সঙ্কলন ব্যবকলন, হরণপূরণ, গুণনীয়ক গুণিতক, সম্পাদ্য উপপাদ্য, প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় আমারই যোগাযোগে যুগলমিলন ঘটিয়াছে। পৌনঃপুনিক, সমান্তর সরলরেখা, সমসূত্র, স্বতঃসিদ্ধ—সবই অনুপ্রাস-রসে সুসিদ্ধ। শুভঙ্করের কড়াক্রান্তিকাক, দশবিশ গণ্ডা, কাঠায় কুড়োৎ, কাঠাকালি, নৌকাকালি, সুদকষা, মাস-মাহিনা, সবই আমার প্রসাদে।

(৩) চিকিৎসা-শাস্ত্রেও আমার হাতযশ আছে। কবি-রাজীতে হয় তো ইংরাজি-শিক্ষিতসমাজ গররাজী। অতএব ডাক্তারীর [এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি ইলেক্‌ট্রোপ্যাথি ভাইভোপ্যাথি হাইড্রোপ্যাথি ও মেডিক্যাল ম্যাগ্নেটিজমের] কথাই বলি। ডাক্তারীতে, অন্তর্দর্শী বঙ্কিমচন্দ্র অনেক কাল পূর্ব্বেই ইষ্টরসে কেষ্টরসের ব্যবস্থা করিয়া অনুপ্রাসমাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ ম্যালেরিয়া ও মশকে, মহামারী ও মূষিকে, সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া অনুপ্রাসপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ক্ষেপা কুকুরের কামড়ে কশৌলিতে [প্যাষ্টুর ইনষ্টিটিউটে] পাঠানও অনুপ্রাসের অনুরোধে কিনা, কে জানে ?

ঘুসঘুসে জ্বর, জ্বরজারি, জ্বরজ্বালা, জ্বরবিকার,

জ্বরাতিসার, বিকারের ঘোর, গালগলা ফুলা, মাথাব্যথা, পিত্তিপড়া, কফকাসী, সর্দ্দিকাসী, দাদ, দরদ, গলগণ্ড, স্বপ্নসঞ্চরণ, বেরিবেরি, প্রভৃতি রোগে আমার বীজাণু বিরাজিত। [পিল পাউডার, ক্যাসকারা, কাষ্টকি] মলম, সালসা [সিনকোনা, কুইনাইন, কুইনাইন ক্যাপসুল, (ম্যালেরিয়ার মহৌষধ)] অজীর্ণ অম্বলের অষুধ যমানীজল [টাইকো-সোডা ট্যাব্লেট]—পেটেণ্টের কথা তুলিব না— [হোমিওপ্যাথিক ক্যামোমিলা] প্রভৃতি ঔষধেও আমার ঝাঁঝ পাইবেন। ব্যায়ামে ব্যবহৃত বিলাতী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্রেও আমি অধিষ্ঠিত [যথা পকেট-কেস, ক্লিনিক্যাল থার্ম্মমিটার, ষ্টেথোস্কোপ]। [হেনিমান হোম, হেনিমান হল, হল অভ্ হেল্‌থ, পী-কক কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, প্রভৃতি ঔষধালয়েও আমার দেখা পাইবেন। মেডিকাল কলেজে, মেটিরিয়া মেডিকায়, সিভিল সার্জ্জনে] মুমূর্ষুর সেবাশুশ্রূষায়, পথ্য ও পরিচর্য্যায়, আমার নজর আছে। আমারই জন্য [এরারুট, পার্ল পাউডার, বার্লি বিস্কুট, মল্‌টেড মিল্ক] পাণিফলের পালো ও মাগুরমাছ মৌরলামাছ সুপথ্য। আমারই ব্যবস্থায় চিররোগীর মরণ মঙ্গল।

(৪) আমি ইতিহাসেও প্রসিদ্ধ। [বেবিলনের রাণী সেমিরামিস্, নেবুক্যাডনেজার, বার্নিয়ার, টাভার্নিয়ার, বোর্জ্জোঁ,] সুদাস দিবোদাস, জনমেজয়, পুরুরবাঃ, যযাতি, শক্তসিংহ, সংগ্রামসিংহ, সমরসিংহ বনবীর, দুর্গাদাস, দনুজমর্দ্দন দেব, দেবপালদেব, বল্লাল, প্রতাপাদিত্য, মীরমদন, তান্তিয়াতোপী, দাউদ, কৈকোবাদ, বাবর, সরফরাজ, গুরগণ, বুলবন, আবু বকর, আবুল ফজল, আমেদ সা আবদালি, রায় রায়ান, সাহান সা, নবাব নাজিম, নায়েবনাজিম, আফগানিস্থানের আমীর, খেলাতের খাঁ, পারস্যের শা, সাসেরামে সরোবরে সমাহিত সের-সংহারক সেরসাহ, সকলেই আমার সাফাই সাক্ষী। তক্তাউসে, কমলমীরে, চৈতককা চবুতারায় আমি। কুরুক্ষেত্রে পাণিপথে, [ব্যানকবর্ণ কিলিক্র্যাঙ্কি ওডিনার্ডি হোহেনলিণ্ডেনে] আমার যোগাড়ে যুদ্ধজয় হইয়াছে। আমারই কারসাজিতে [স্পেনে স্যারাসেন] বঙ্গে বর্গী ও বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়।

(৫) খগোল-ভূগোলেও আমি গণ্ডগোল বাধাইতে ছাড়ি নাই। আমারই জন্য পৃথিবী কমলালেবুর মত গোল বা কদম্বকুসুমাকৃতি। স্থলভাগ জলভাগে, সাগর উপসাগর মহাসাগরে, নদনদীতে, উপনদী শাখানদী মহানদীতে, দ্বীপ উপদ্বীপ বদ্বীপ অন্তরীপে, দেশ মহাদেশে, অগ্নিগিরিতে, বাণিজ্য-বন্দরে, সর্ব্বত্র আমি। [ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ চালাইলে, ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউডে, প্রাচীন ব্যাবিলনে, নাইনেভেতে, পিলপনিসসে, চার্চ্চোনিজ্জিতে, কিলিকিয়ায়, আধুনিক কঙ্কর্ডে কনেষ্টিকটে সিনসিনাটিতে টরণ্টোয় টিটিকাকায় মিসিসিপি ম্যাসাচুসেটসে ল্যাপল্যাণ্ডে বার্ব্বারিতে টিম্‌বকটুতে সিসিলিতে লণ্ডনে ডাণ্ডীতে গ্লাস-গোতে উলউইচে সিসিটারে চিচেষ্টারে, বেঅভবিস্কেতে, ফার্থঅভফোর্থে, ষ্টোকঅপনট্রেণ্টে, Lopatka South of Kamaschatkaয়, শ্যানকিন ক্যাণ্টনে, ককেসসে, ষ্ট্যালসেটে, আলিওয়ালে, ওয়াণ্ডিওয়াশে, হংকংএ, ষ্ট্রেট্‌স্ সেট্‌ল্‌মেণ্টসে, পুলোপিনাঙে, কেপ কলোনিতে, কেপ কমরিনে, বেঅভ বেঙ্গলে, আমার অধিকার।] দামোদর, ঘর্ঘরা, কঙ্কণা, গুড়গুড়ে, শীতললক্ষা, বাগ্দেবীবিল, মধুমতী, প্রভৃতি নদনদী খালবিলেও আমার চলাচল।

নবাবী আমলের বাঙ্গালাবিহারে আমি, প্রাচীন কালের অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গ, কাশীকাঞ্চীকোশলেও আমি। প্রাচীনকালে আমার আরও আদর ছিল। আমারই প্রভাবে পাটনার প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র, পেশোয়ারের প্রাচীন নাম পুরুষপুর, মথুরার প্রাচীন নাম শূরসেন ছিল। কিষ্কিন্ধ্যায়, জনস্থানে আমি, কর্ণসুবর্ণেও আমি। রাঢ় বাগড়ী-বরেন্দ্র আমারই সূত্রে বদ্ধ।

কটকে আমি, ক্যালিকটে আমি, কুম্ভকোণমে আমি, ক্যানানোরে আমি, নাইনিতে আমি, দেরাদুনে আমি, বাঁশবেরিলিতে আমি, বোম্বাইএ আমি, কালকায় আমি, সিমলাশৈলে আমি। লুণ্ডিকোটালে আমি, মিয়ানমীরে আমি, মৌলমিনে আমি, মার্কিন মুল্লুকেও আমি। দূর ধাপধাড়ায় আমি, সুদূর পুলিপোলাওয়ে আমি। মহানগরী কলি-কাতায় আমি, আবার এই অধম লেখকের বাসভূমি কাঁচকুলিতেও আমি। সেনানিবাস গোরাবারিক দমদমায় আমি, আবার সাহিত্য-সম্মিলন-স্থান ময়মনসিংহ-চুঁচুড়ায়ও আমি। কোথায় দক্ষিণ বঙ্গ কোথায় আসাম! অথচ

বজবজ বাঁশবেড়িয়া বৈষ্ণবাটী পাইকপাড়া কাঁচড়াপাড়া কুঠীঘাটায় আমি, আবার নবীনগর শিবসাগরেও আমি।

কলিকাতায় ও তাহার আশে পাশে পাড়ায় পাড়ায় বাজারে বাজারে অলিতে গলিতে হাটে ঘাটে আমি চলাফেরা করি। বৌবাজার, বাগ্‌বাজার, রাজার বাজার, বাবুর বাজার, টিকটিকি বাজার, বৈঠকখানা বাজার, বাঙ্গাল বাজার, বড় বাজার, পগেয়া পটী, চাঁদনীচক, ঠন্‌ঠনিয়া, তালতলা, তেঁতুলতলা, তিনকোণা তালাও, শুঁড়িপাড়া, কলুটোলা, পটুয়াটোলা, লেবুবাগান, বকুলবাগান, বাদুড়বাগান, পদ্মপুকুর, তেলকল ঘাট, মীরবহর ঘাট, মৌলাআলি, টালাব নালা, মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ক্রীকরো, ক্রস ষ্ট্রীট, ইলিয়ট রোড, রেড রোড, রসা রোড, মদনমোহন সেন লেন] সর্ব্বত্র আমি। শেয়ালদহ হইতে শ্যামবাজার, গড়পার হইতে হাবড়ার হাটে পর্য্যন্ত আমার গতিবিধি আছে। [মনুমেণ্টে উঠিলে আমাকেই নজরে পড়িবে। ইডন গার্ডন বীডন গার্ডনে, হেষ্টিংস্ হাউসে, স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট কুককেলভি হেমিসন হেথাওয়ের ও হোয়াইটএওয়ে লেডলর নবনির্ম্মিত showshop বা প্রদর্শনী-বিপণিতে আমি আছি।]

দুইটী স্থানকে একত্র যুড়িতে অনুপ্রাস-সূত্রের প্রয়োজন পড়ে। যথা, দূর সহর মক্কা মদিনা, জেদ্দা-জেমো, কাবুল-কান্দাহার, দিল্লী-লাহোর, দেরাগাজীখাঁ-দেরা-ইস্মাইলখাঁ; ইরান-তুরান,তাতার-তিব্বত,সমরখন্দ-বোখারা, ও খাস বাঙ্গালাদেশে, বাঁকুড়া বীরভূম বর্দ্ধমান, বাখরগঞ্জ বরিশাল, অম্বিকা-কালনা, খানাকুল-কৃষ্ণনগর, ঝাপড়দ-মাপড়দ, কাগাঁ-মৌগাঁ, যৌগাঁ-মৌগাঁ, রূপদিয়া-রাংদিয়া, বড়িশা-বেহালা, বান্নে-বরেয়া, শিংটি শিবপুর,সাঁচড়া-পাঁচড়া, সোমড়া-সুখড়া, হুঁটরা-হৃদয়পুর।

গ্রামের নামেও আমার ভরাভর আছে। আরারিয়া, আসানসোল, উজীরপুর, কড়কড়ে, করচমারিয়া, কলসকাটী, কাওয়াকোলা, কাঁচিকাটা (র কুঠী), কাজীর বাজার, কাড়াপাড়া, কালকেওট, কালিয়াকর, কুচকুচিয়া, কুচিয়াকোল, কোড়কদী, কৈকোলা, খঞ্জাম, গয়লগাছা, গাফরগাঁও, গীতগ্রাম, গুণাইগাছা, গুপ্তিপাড়া, গোদাগাড়ী, গোপালগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গোরগ্রাম, ঘোড়াঘাট, ঘোড়ামারা, ঘোলাঘাট, চঞ্চল, ঝাঝা, ডামডিম, ডোরণ্ডা, দিলদারনগর, নাজিরবাজার, নান্নুর, পাতিলপাড়া, পার্ব্বতীপুর, পালপাড়া, পীরপাহাড়, পীরপৈঁতি, পুনপুন্, পৌলমপুর, প্রতাপপুর, ফরিদাবাদ, ভেড়ামারা, মারাপাড়া, মীরপুর, মেহেরপুর, মৌলবীবাজার, রড়া, রাড়ীপাড়া, রাজারামবাটী, রাণীনগর, রিষড়া, লালগোলা, লাহিড়িপাড়া, বজ্রযোগিনী, বড়বড়ে, বদলবাঁধ, বনবিষ্ণুপুর, বাগ্‌বাটী, বারগোড়া, বারহারোয়া, বাবুবাজার, বাহাদুরপুর, বাহিরবন্দর, বীরপুর, বেলাবেড়া, বেড়বরাদী, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, শিয়ারশোল, শিবনিবাস, শিববাড়ী, সারবাড়ী, সারসুনা, সুখসাগর, সুষঙ্গ, সেরপুর, সৈসম, হাজরাহাটী, হাটহাজারি।

(৬) জাতিবর্ণ-উপাধিতে আমি বিরাজিত। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ বৈদ্য, শূদ্র ভদ্র, কামার কুমার, ধোপা নাপিত, তেলি মালি, তেলি তামুলি, দুলি মালি, জেলে মালা, মাঝী মাল্লা, জেলে ও হেলে, ডোম ডোকলা, হাড়ি ডোম, মুচি মুসলমান, মেথর মুদ্দফরাস, রাজ মজুর, মুটে মজুর, মজুর মিস্ত্রী, প্রভৃতিতে সমাজের সকল স্তরে সর্ব্বব্যবসারেই আমি যোড় মিলাইয়াছি। তাঁতী, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, কারুকর (কারিকর), সুবর্ণ-বর্ণিক (সুবর্ণবণিক্) বা সোণার বেণে, কৃষি-কৈবর্ত্ত, গড়োগোয়ালা, ঝাড়ুবরদার, সকলেই আমার তাঁবেদার। এমন কি পশুপালন হলচালন প্রভৃতি বৃত্তির টোলফেলা যাযাবর জাতির মধ্যে পর্য্যন্ত (কুকি, মিশমি) আমার বসবাস।

কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণে আমি, সপ্তশতী ব্রাহ্মণেও আমি। রাঢ়ীতে আমি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে আমি, বৈদিক ব্রাহ্মণে আমি, এমন কি বর্ণের ব্রাহ্মণেও আমি। লাহিড়ি ভাদুড়ি শৈচব যেমন আমার আজ্ঞাধীন, বাঁড়ুজ্যে মুখুজ্যে চাটুজ্যেও তেমনি, তবে উজ্যের দরুণ একটু তিক্ত। মুখুটি কুটিল ও ঘোষাল রসালে আমার সমদৃষ্টি। গাঙ্গুলি, পুতিতুণ্ড, বটব্যাল, বেজবরুয়া, দ্বিবেদী, নন্দন, নন্দী, নাম, গড়গড়ি, গর্গ সরকার, দোবে-চোবে, দাস বসু, দাস ঘোষ, দাস দত্ত, দাস দে, সেন নিয়োগী, সেন সরকার, মিত্র মজুমদার, দফাদার, দস্তিদার, দিহদার, মজুমদার,

তরফদার হালদার চাকলাদার জোয়ারদার প্রভৃতি দেদার উপাধিতে আমি বর্ত্তমান।

গাঁইগোত্র, পর্য্যায়পটী, কুলশীল, গণপণ, আদানপ্রদান, পালটিপ্রকৃতি, কুলক্রিয়া বা কুলকর্ম্ম, কুললক্ষণ, কুলীন-কন্যা, কুলীন বামুন, কুলীন কায়েত, নৈ-কষ্য কুলীন, শুদ্ধ বা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, কুলীন ও কাপ, কেশবকুনি, হড়গুড়, ঘটককারিকা, রাজযোটক, সবই আমার যোটকতায়। ঘোষ বোস আমারই দাবীতে কুলের অধিকারী। দেবী-বর নিজেই আমার কাছে ধরা দিয়াছেন।

(৭) সংসার সম্পর্কে কে কবে আমার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিয়াছে? তাত, মাম, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, স্বস্, ননান্দৃ, মাতামহ প্রভৃতি, ও বাবা, মামা, মামী, দাদা, দিদি, কাকা, কাকী, মামীমা, মাসীমা, মেসোমশায়, বোনাই বাবু, বা চাচা, চাচী, নানা, নানী, ফুফু প্রভৃতি—সর্ব্বত্রই আমার সমান অধিকার। মাতাপিতা, পিতাপুত্র, ভ্রাতাভগিনী, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, পতিপত্নী, স্বামিস্ত্রী, বরবধূ, সন্তানসন্ততি, নাতিপুতি, কাচ্ছাবাচ্ছা, পোলা পান, শিশু, [বেবি]—এক কথায়, যাহাদিগকে লইয়া ঘরকরনার নিবিড়বন্ধ, সকলেই আমার বশ। বাপবেটা, বৌ বেটা, মা মাসি, মাসি পিসি, মেসো পিসে, খুড়াখুড়ী, জ্যেঠাজ্যেঠী, ভাইপো ভাগ্নে বা ভাস্তেভাগ্নে, বহুরীঝিউরী, এই সব ভালবাসার সম্পর্কে আমি যুগল মিলাইয়াছি। একান্নবর্ত্তি-পরিবার-প্রথায় আমার পূর্ণ প্রকোপ। শ্বশুর ভাসুর মাসাশ পিসেশ ননাশ মামশেশ জ্যেঠশেশ বড়শেশ এসব ধরিলে তো শেষ নাই। আজা আই, জামাই বেহাই, তাহুই মাহুই, বোনাই আবুইও আমার আমলে আসেন। ভাসুর ভাদ্র (ভ্রাতৃ) বধূতে মিল আছে, কিন্তু ননদ-ভাজে মিল নাই! জ্ঞাতগোষ্ঠী, জ্ঞাতগোত্র, ভাইভায়াদের ভয়ে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় লইলেও আমার হাত হইতে নিস্তার নাই। সেখানেও শ্বশুরশাশুড়ী শালাসম্বন্ধী শালীশালাজ (সাক্ষাৎ শালা বা সোদর শালাও শুনিয়াছি) ও ভায়রাভাই। স্ত্রী বাপের বাড়ী থাকিলে স্বামীর সঙ্গে মিলিয়া আমার প্রভাবে মধুময়ী হইয়া উঠেন। আমারই কৃপায় ঘরণী-গৃহিণীর নামান্তর সংসার বা পরিবার। পোষ্যপুত্র, পালিতপুত্র, পালকপিতা, ধর্ম্ম-মা আমার আশ্রিত। বরের ঘরের মাসি কনের ঘরের পিসি আমি বড় ভালবাসি। যাহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই তাহাকেও হরির খুড়ো বা সরকারী মামা বলিয়া আমি কোল দিই।

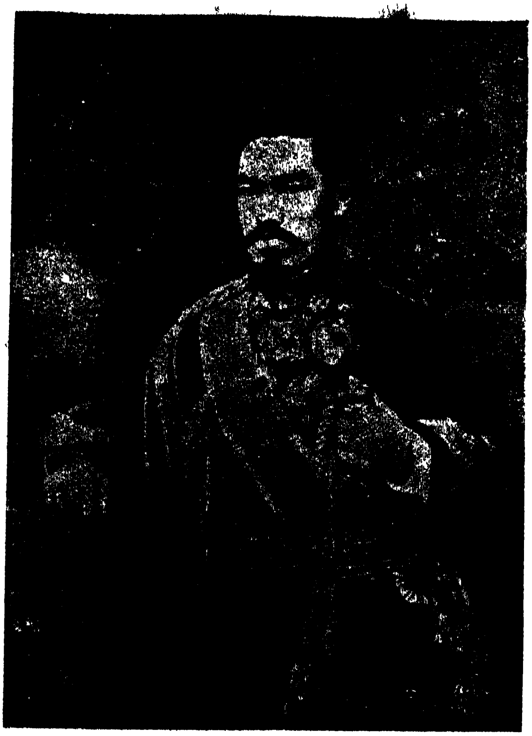
কুমারীর কামনা ভাল ঘর বর। সধবার সাধ সোণাদানা গয়নাগাঁটি অলঙ্কার প্রতিকার বসনভূষণ যত হোক না হোক—শাঁখা সাড়ী ও সকলের সেরা, সুন্দরীর সীমন্ত-শোভা সিন্দূরবিন্দু। সন্তান-সম্ভাবিতার শুভসূচনা সাধসেমন্তন (সীমন্তোন্নয়ন)। পতিপুত্রবতীর ছেলে কোলে দোলে বা শিশুসন্তান স্তনপান করে। স্বামিসেবা, পতি-প্রেম, পত্নীপ্রীতি, সন্তানস্নেহ, এই সব লইয়া সোণার সংসার। গিন্নীধন্নীগোছের শ্যামা স্ত্রী বা সুন্দরী স্ত্রী সংসারাশ্রমের সুশীতল বটচ্ছায়া। পবিত্রপ্রণয়প্রতিমা পতিপ্রাণা বঙ্গবধূ অনুপ্রাসে অনুপ্রাণিতা। বিবাহব্যাপারে বরের বাপ কন্যাকর্ত্তার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। বিবাহবাসরে বরবধূর মধুরমিলনে সুখস্বপ্ন। শুভবিবাহ শুভসাদী হইলে সোণায় সোহাগা হইত। (ক্রমশঃ)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিকাদো মুৎসুহিতো

গত ২৮শে জুলাই মধ্যরাত্রে জাপানকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া নৃপতিশ্রেষ্ঠ, কর্ম্মযোগী, মহাপুরুষ মিকাদো মুৎসুহিতো স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তাঁহার তুল্য নৃপতি বর্ত্তমানকালে পৃথিবীতে আর নাই ইহাই অনেকের বিশ্বাস, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের মধ্যে তিনি যে অন্যতম সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী "প্রবাসী"র দু' এক পৃষ্ঠায় লিখিত হইবার নহে, উহা নব্য জাপানের ইতিহাসে চিরদিন সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

পীড়া যখন তাঁহার বৃদ্ধি পাইল, তখন সহরে আমোদ-প্রমোদ সব বন্ধ হইয়া গেল; সকলে রাজপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া দিবারাত্র তাঁহার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। মহাপ্রাণ মিকাদো এ কথা জানিয়া বলিলেন যে তাঁহার ইচ্ছা নয় যে রাজধানীতে সকল



জাপানের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট মিকাদো মুৎসুহিতো।

আমোদপ্রমোদ বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু কেহই সে কথা শুনিল না। নর্ত্তকী প্রমোদসভা পরিত্যাগ করিল, পালোয়ান কুস্তির আড্ডা ছাড়িয়া আসিল, অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় বন্ধ করিয়া দিল; পুরোহিতেরাও আর মন্দিরাভ্যন্তরে শান্তি পাইল না—তাহাদের সাক্ষাৎ দেবতা যে মৃত্যুমুখে উপনীত হইয়াছেন! তাহারা প্রাসাদপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া অনাবৃত অবনতমস্তকে তাহাদের পিতৃতুল্য নৃপতির আরোগ্য কামনা করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। সম্রাজ্ঞী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বামীর শিয়রে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সম্রাটের মৃত্যু হইল। সংবাদ আসিয়াছে একজন জাপানী তাঁহার মৃত্যুতে আত্মহত্যা করিয়াছে! এ নিদারুণ শোক সহ্য করিয়া সে বাঁচিতে চাহে নাই!

নৃপতির প্রতি প্রজার এই অদ্ভুত অনুরাগ দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইবেন, কিন্তু তিনি যে জাপানীর চক্ষে নরনারায়ণ! তাহারা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত, শ্রদ্ধা করিত; তিনিও এই ভক্তিশ্রদ্ধার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। কেন, তাহা ক্রমশ বলিতেছি—

কিওতো সহরে ১৮৫২ সালের ৩রা নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে যখন তিনি সিংহাসনারোহণ করিলেন, তখন তিনি বালকমাত্র। ১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল, ও পরবৎসর তিনি প্রিন্স্ ইচিজো নামক প্রথম শ্রেণীর ওমরাহের কন্যা হারুকোর পাণিগ্রহণ করিলেন।

অভিষেকের সময় তিনি ঘোষণা করিলেন—"পূর্ব্ব-পুরুষগণের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সকল বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আমরা স্বয়ং দেশ শাসন করিব; আমাদের সকল প্রজাকে শান্তি দান করিব; অন্যান্য দেশের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিব; আমাদের দেশকে গৌরবমণ্ডিত করিব ও আমাদের জাতিকে চিরস্থায়ী সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিব।" তাঁহার প্রতিজ্ঞা শুধু বাক্যের জাল নহে, তিনি তাহা বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছেন।

যখন তিনি জাপানের সিংহাসনে বসিলেন তখন গত দশ বৎসরের অন্তর্বিরোধে দেশ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত-কলেবর; জাপানের আকাশ ঘিরিয়া তখন ঘোর অন্ধকার; দেশ, বিচ্ছিন্ন বিভক্ত,—'দাইম্যো' বা ফিউড্যাল্ লর্ডেরা স্ব স্ব দল গঠন করিয়া পরস্পরে দ্বন্দ্ব-কলহে প্রবৃত্ত; গোঁয়ার-গোবিন্দ "সামুরাই" দল কটিদেশে দুই তরবারি ঝুলাইয়া জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক বিস্তার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে, কথায় কথায় রক্তারক্তি করিতেছে। 'শোগুন'ই দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা; মিকাদো তাঁহার হস্তে ক্রীড়নক মাত্র, তিনি নামে মাত্র সম্রাট্। বিদেশী শক্তিশালী জাতিরা জাপানের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিতেছে; তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তি নাই, আহ্বান করিয়া লইতেও সাহসে কুলায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী 'শোগুন' কয়েকটি বন্দরে বিদেশীকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, তজ্জন্য রক্ষণশীল 'দাইম্যো'গণ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন।

এমন সময় বালক-সম্রাট্ মুৎসুহিতোর আবির্ভাব হইল। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, ঝটিকা আসন্ন দেখিয়াও তিনি শঙ্কিত হইলেন না, দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া বসিলেন ঝড়ের মুখে তরণী ভাসাইলেন, এবং ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া নিপুণ হস্তে তরণী চালনা করিয়া উহা পরপারে পৌছাইয়া দিলেন!

'দাইম্যো'গণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তিনি 'ষোগুনের' গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। 'দাইম্যো'গণের মধ্যে যে হিংসা বিদ্বেষের ব্যবধান ছিল তাহা কোন এক মন্ত্রবলে লুপ্ত করিয়া দিলেন। পরস্পর যাহারা শত্রু ছিল তাহাদিগকে তিনি মিত্র করিয়া দিলেন! দেশের বিচ্ছিন্ন বিভক্ত শক্তিকে একীভূত করিয়া জগতের মধ্যে এক মহাশক্তিশালী নব জাতি গড়িয়া তুলিলেন! দেশে রেল স্থাপনা করিলেন, বন্দর নির্ম্মাণ করাইলেন, বিদেশীকে আহ্বান করিয়া তাহার সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনা করিলেন—দেশে কমলার আবির্ভাব হইল। তিনি বুঝিলেন দেশে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে, তলাইয়া বুঝিলে শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির মূল ভিত্তি, শিক্ষা ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভবপর নয়। অমনি রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল—"জীবনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে জ্ঞানলাভ করা অত্যাবশ্যক। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক। তাহা হইতে সেই উচ্চশিক্ষা পর্য্যন্ত যাহা রাজকর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পী, চিকিৎসক, কৃষক প্রভৃতি গড়িয়া তুলে—এক কথায় সকল প্রকার জ্ঞানলাভই শিক্ষাসাপেক্ষ। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে অনেক সময়, কৃষক শিল্পী ব্যবসায়ী এবং স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার প্রয়োজন নাই, এরূপ কথা বলিয়াছেন। উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও কবিতা ও নীতি-বাক্য রচনা করিয়া কত সময় অপব্যয় করিয়াছেন; সেই সময় নিজের বা দেশের লাভজনক কোনো বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল। এক্ষণে একটি শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, পাঠ্যতালিকাও নূতন করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমাদের অভিপ্রায়, এখন হইতে এমন ভাবে শিক্ষাবিস্তার হউক যাহাতে কোনো গ্রামে নিরক্ষর পরিবার থাকিবে না এবং কোনো পরিবারে নিরক্ষর ব্যক্তি থাকিবে না। এতাবৎকাল যাঁহারা জ্ঞানার্জ্জনে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই কর্তৃপক্ষের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন—দীর্ঘকালের অপব্যবহার হইতে এই ভ্রান্তধারণার উৎপত্তি হইয়াছে; এখন হইতে সকলের স্বচেষ্টায় জ্ঞানার্জ্জনে নিযুক্ত হওয়া উচিত।" ইহা সম্রাটের কেবল মুখের কথা নহে, ইহা তাঁহার প্রাণের কথা ছিল; তাই ইহা জাপানের সকল নরনারীর চিত্ত স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৮৭০ সালে এই বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়, এবং ইহারই ফলে অদ্য জাপানে নিরক্ষর লোক খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। মুটে মজুর, 'রিক্স'-ওয়ালা, চাকরাণী সকলেই প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠ করিয়া স্বদেশ ও বিদেশের সকল সংবাদ জানিতে পারিতেছে!

তিনি দেশবাসীকে অবিচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া বিচারালয় স্থাপন করিলেন। স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন-প্রণালী রহিত করিয়া দেশে নিয়মতন্ত্রমূলক শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলেন। জাপানীর স্বাভাবিক তেজ ও শক্তি সংহত করিয়া পাশ্চাত্য আদর্শে নৌসেনা ও স্থলসেনাদল গঠন করিলেন। তাহা ১৮৯৪ সালে চীনকে, ও ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ রুষশত্রুকে স্থলে জলে পরাজিত করিয়া জগতের মধ্যে বীরাগ্রগণ্য জাতিদের মধ্যে জাপানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল! তাঁহার সেনাদলও এমনি তাঁহার গুণমুগ্ধ, এমনি তাঁহার ভক্ত, যে, বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সকল সময়েই তাঁহারা বলিয়াছেন আমরা আমাদের বীরত্বের দ্বারা নহে, পরন্তু আমাদের সম্রাটের পুণ্যবলে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি! জগদ্বিখ্যাত ৎসুসিমার জলযুদ্ধের পর যখন সারা বিশ্বে অ্যাড্‌মিরাল তোগোর জয়ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, তখন তিনি লিখিলেন—"যে অদ্ভুত সফলতা আমরা এই যুদ্ধে লাভ করিয়াছি তাহা কোনো মানবীয় শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই, উহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের সম্রাটের পুণ্যবলেই সম্পাদিত হইয়াছে!"

ক্ষমাগুণেও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। শেষ 'ষোগুন' কেইকি তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, একজন জাল রাজা খাড়া করিয়া তাহাকে দিয়া সিংহাসনের দাবি করাইয়াছিলেন; এনোমোতো নামক একব্যক্তি 'ষোগুনের'



জাপানের বর্ত্তমান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী। (সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত)।

পক্ষ গ্রহণ করিয়া য়েজোতে প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা করিয়াছিলেন; রেষ্টোরেসনের পর সাইগো সাৎসুমায় বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন; ইঁহাদের সকলকেই মুৎসুহিতো ক্ষমা করেন। বিজিত শত্রুর প্রতি এমন ক্ষমা প্রদর্শন জগতে বিরল!

তিনি যেমন পরিশ্রম করিতে পারিতেন তেমনি কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। প্রতি বৎসর সৈন্তদলের 'ম্যানুভারের' সময় তিনি কয়েক দিবস ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্তপরিচালনা করিতেন ও সাধারণ সৈনিকের আহার্য্য ভক্ষণ করিতেন।

প্রতিদিন প্রাতে আট ঘটিকায় সময় তিনি কার্য্যে বসিতেন, কখনো কখনো কার্য্য শেষ হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইত। গুরুতর রাজকার্য্যোপলক্ষে কোনো মন্ত্রী রাত্রের যে-কোনো সময়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিয়া কখনো ফিরিয়া যান নাই।

যাঁহারা তাঁহার প্রাসাদ দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন সেখানে আড়ম্বর বা বিলাসিতার লেশমাত্র নাই। বাহিরের চালচলনও তাঁহার এতই সাধারণ গোছের ছিল যে তাহার সহিত আমাদের দেশের রাজ্যহীন 'রাজা'দের চালচলনের তুলনা করিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।

তিনি বিপন্নের বন্ধু ও আর্ত্তের সহায় ছিলেন। দেশে যখনই গৃহদাহে, ভূমিকম্পে বা জলপ্লাবনে তাঁহার প্রজাবর্গ বিপন্ন হইয়াছে তখনই তিনি তাহাদের দুঃখমোচনার্থ মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন।

জন্তুর মধ্যে তাঁহার অশ্ব ও কুকুরের সখ্ ছিল। তিনি একজন নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন।

রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি সাহিত্যচর্চ্চা অবহেলা করেন নাই। তিনি নিজে একজন সুকবি ছিলেন, অনেক কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন। প্রতি বৎসর নববর্ষের সময় তিনি একটি করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। সেই বিষয়ে রাজপরিবারের স্ত্রীপুরুষ, রাজসভাসদ্, আমীর-ওমরাহ ও জনসাধারণ, যাঁহারা কবিতা রচনায় পারদর্শী, সকলেই কবিতা রচনা করিতেন। এইরূপে তিনি জন-

সাধারণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগবর্দ্ধনে অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

তিনি স্বদেশের পতিত জাতিকে উন্নীত করিয়াছেন, দেশ হইতে জাতিবিভাগ উঠাইয়া দিয়াছেন, দেশবাসীকে আভিজাত্য অপেক্ষা গুণের সমাদর করিতে শিখাইয়াছেন।

মুৎসুহিতো এক পুত্র ও চার কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। পুত্রের নাম য়োষিহিতো, তিনিই সম্রাট্ হইলেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স তেত্রিশ বৎসর। তিনি ১৮৭৯ সালের ৩১ আগষ্ট্ জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯০০ সালের ১০ই মে রাজকুমারী সাদাকোর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। জাপানের নূতন সম্রাটের তিন পুত্র।

মনে পড়ে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক শীতের প্রভাতে, মৃত সম্রাটের জন্মদিনে প্যারেড দেখিতে গিয়াছিলাম। শষ্পবিরল, বালুকাময়, তোকিওর বিস্তীর্ণ প্যারেডভূমি খাকিপরিহিত পদাতিক, রক্তপরিচ্ছদে সজ্জিত অশ্বারোহী, গোলন্দাজ সৈন্য ও কামানের গাড়ি, এবং জাপানী ও বিদেশী দর্শকে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সবে মাত্র তরুণ সূর্য্য শীতপ্রভাতের কুয়াসাজাল ছিন্ন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নিশানধারী অশ্বারোহীর নিশানশীর্ষের বর্ষাফলকে নবীন রৌদ্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। অশ্বগুলা অধীর হইয়া কেবলি বালুকার উপর খুর ঘর্ষণ করিতেছে। পদাতিকের দল দূরে দূরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের স্কন্ধে উন্নীত বন্দুকগুলি কেবল দেখা যাইতেছিল। প্যারেডভূমির মাঝখানে সম্রাট্ ও বৈদেশিক রাজদূতদের তাঁবু পড়িয়াছে। জাপানের আমীর-ওমরাহ, সম্রাটের মন্ত্রিগণ সম্রাটকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনাবৃত মস্তকে তাঁবুর সন্নিকটে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এমন সময় সম্রাট্ আসিলেন। তাঁহার শান্ত, সৌম্য, ধীর মূর্ত্তি একবার দেখিলে আর ভুলিবার নয়!

তিনি জুড়ি গাড়িতে আসিলেন, সঙ্গে কয়েক জন মাত্র অশ্বারোহী শরীররক্ষক! মুহূর্ত্তমধ্যে দর্শকদের মুখ আনন্দদীপ্ত হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিক হইতে বানজাই ধ্বনি উত্থিত হইল। পদাতিকদল তুরীতে 'কিমিগায়ো' বাজাইতে আরম্ভ করিল; এক দলের শেষ হইতে না হইতে অন্য দল বাজাইতে আরম্ভ করে; প্রভাতের আকাশ অনুরণিত করিয়া প্যারেডভূমির চতুর্দ্দিকে তুরীর সুর ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল—

"অযুত যুগ ধরি, বিরাজো মহারাজ!
রাজ্য হ'ক তব অক্ষয়;
উপল যত দিন না হয় মহীধর;
প্রভূত শৈবালে শোভাময়।"*

হায়! তখন কি তাহারা জানিত তাহাদের মহারাজ এত শীঘ্র তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন!

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ।

সাংখ্য-দর্শনের উপাখ্যানমালা

সে আজ বেশীদিনের কথা নহে যেদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শত শত ধর্ম্মপিপাসুদিগের বহু জটিল প্রশ্ন দুই একটি গল্প দ্বারা সমাধান করিতেন। সাকার নিরাকারবাদ, মানব-আত্মায় সংস্কারের প্রভাব প্রভৃতি দার্শনিক ও ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞদিগের বিতণ্ডার বিষয়গুলি তাঁহার দুই একটি উদাহরণে সরল হইয়া যাইত। খৃষ্টও উপদেশকালে গল্পের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। ইহাতে আপামর সকলেই মনোহর উপদেশাবলীর মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইত। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রেও যে গল্পচ্ছলে উপদেশদানের প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

বহুপ্রাচীন উপনিষদ্ গ্রন্থে আমরা এইরূপ উপাখ্যান দেখিতে পাই। তাহার পর দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সাংখ্যদর্শনই এ বিষয়ে প্রধান সাক্ষী। ইহার চতুর্থ অধ্যায় কেবল উপাখ্যানমালার সংগ্রহ। আমরা তাহার উপাখ্যানগুলির পরিচয় দিতেছি।

একটি কথা পূর্ব্বে বলিয়া রাখা আবশ্যক। সাংখ্যদর্শনের মূলগ্রন্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ঈশ্বরকৃষ্ণ-রচিত সাংখ্যকারিকাকে অনেকে সাংখ্যদর্শন ধরিয়া থাকেন। কিন্তু সূত্রাকারে গ্রথিত কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন বিদ্যমান। বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ভাষ্য, ও অনিরুদ্ধ ইহার বৃত্তি রচনা

করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ছয় অধ্যায়ে সমাপ্ত। আমরা এই গ্রন্থ হইতেই উপাখ্যান সংগ্রহ করিলাম। উপাখ্যানগুলি সংক্ষেপে সূত্রমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু ও অনিরুদ্ধ উভয়েই পূর্ণ আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু উভয়ের উপাখ্যান সকল স্থলে সমান নয়। অনেক স্থলেই দুই উপাখ্যানে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আমরা সেই সেই উভয় স্থলে উপাখ্যানই বর্ণনা করিব।

সাংখ্যদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩২টি সূত্র আছে। এক একটি সূত্রে একটি উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা মূলসূত্রগুলিও উদ্ধৃত করিলাম।

১। রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ।

এক রাজপুত্রের গণ্ডনক্ষত্রে জন্ম হইয়াছিল। তাহাতে তাহার পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এক ব্যাধ তাহাকে পুত্রবৎ লালনপালন করিয়া বর্দ্ধিত করে। রাজপুত্র ব্যাধের গৃহে থাকিয়া সংসর্গবশে ব্যাধের আচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে রাজার মৃত্যু হইল। তাঁহার অন্য সন্তান না থাকাতে মন্ত্রিগণ ব্যাধপালিত রাজপুত্রকে আনয়ন করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিল। সেই সময় মন্ত্রিগণের বাক্যে জ্ঞানলাভ করিয়া রাজপুত্র ব্যাধসুলভ আচার বর্জ্জন করিয়া রাজ-আচার অবলম্বন করিলেন।

এইরূপ, মানবের মনে উপদেশ দ্বারা যদি বোধ জন্মাইয়া দেওয়া যায়, যে, সে ব্রহ্মের অংশ, তাহা হইলে তাহার ভ্রমবুদ্ধির নিরাস হয়।

২। পিশাচবদন্যার্থোপদেশেঽপি।

কোন গুরু শিষ্যকে নির্জ্জনে উপদেশ দিতেছিলেন। গুল্মের অন্তরালেস্থিত পিশাচ তাহা শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিল।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছিলেন তখন এক পিশাচ শ্রবণ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতি যাহারা পূর্ব্বে উপদেশের অনধিকারী ছিল তাহাদেরও প্রসঙ্গক্রমে উপদেশ শ্রবণে মুক্তি হওয়া সম্ভব।

৩। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আরুণি শ্বেতকেতুকে যেমন বারংবার উপদেশ দিয়াছেন সেইরূপ একবার উপদেশে জ্ঞান না হইলে উপদেশের পুনরাবৃত্তি বিধেয়।

৪। পিতাপুত্রবদুভয়োর্দৃষ্টত্বাৎ।

এই সূত্রটির বিজ্ঞানভিক্ষু ও অনিরুদ্ধ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন পুত্র দেখিতে, পিতার মরণ হইল, নিজের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা দেখিয়া সে বুঝিতে পারে যে জগৎ জন্ম ও মৃত্যুর অধীন। এই জ্ঞান হইতে তাহার বৈরাগ্য জন্মে।

অনিরুদ্ধ এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন—কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ গর্ভবতী পত্নীকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ পুত্রকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। পরে ব্রাহ্মণের পত্নী উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই—গুরুর উপদেশ না পাইলেও বন্ধুর উপদেশ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।

৫। শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্।

এ সূত্রটির অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ করিয়াছেন—শ্যেন আমিষখণ্ড-লোলুপ হইয়া আমিষ গ্রহণ করাতে অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সেইরূপ লোভ ত্যাগ করা উচিত। শ্যেন যদি ইচ্ছাক্রমে আমিষ পরিত্যাগ করে তাহা হইলেই সে সুখী হয়। মানব সংসারবাসনা পরিত্যাগ করিলেই সুখী, নহিলে দুঃখী হইবে।

অনিরুদ্ধ বলেন—কোন পুরুষ একটি শ্যেনশাবক প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে অতি যত্নে তাহাকে পালন করিয়াছিল। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে লোকটি ভাবিল কেন ইহাকে অনর্থক কষ্ট দিই? বনে ছাড়িয়া দিলেই এ সুখী হইবে। এই ভাবিয়া সে শ্যেনটিকে বনে ছাড়িয়া দিল। শ্যেন স্বাধীন হওয়াতে সুখী হইল বটে কিন্তু পালকবিরহে দুঃখ অনুভব করিতে লাগিল। ইহার তাৎপর্য্য এই—সুখ সর্ব্বদাই দুঃখমিশ্রিত। সংসারে অবিমিশ্র সুখ দুর্লভ। সেইজন্য সুখ ও দুঃখ উভয়েতেই নিস্পৃহ হওয়া কর্ত্তব্য।

৬। অহিনির্ল্বয়িনীবৎ।

যেমন সর্প জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে সেইরূপ মুক্তিপ্রার্থী মানব প্রকৃতির মায়াজনিত বিষয় পরিত্যাগ

করিবেন। সাংখ্যমতে পুরুষ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, এই জ্ঞানেই মুক্তি। [বিজ্ঞানভিক্ষু]

কোন সর্প কোন বিবরসম্মুখে ত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিল "আহা! আমার এই ত্বক্ ধূলি ও পঙ্কযুক্ত হইয়াছে।" সেই ত্বকের মায়ায় সে সেস্থল ত্যাগ করিল না। একজন সাপুড়ে সেই ত্বক্ দেখিয়া এইখানে সর্প আছে বুঝিতে পারিল ও সেই সর্পকে ধরিয়া ফেলিল। তাৎপর্য্য—স্নেহ, মমতা প্রভৃতি বর্জ্জনই মুমুক্ষুদিগের কর্ত্তব্য। [অনিরুদ্ধ]

৭। ছিন্নহস্তবদ্বা।

যেমন ছিন্নহস্ত একবার পরিত্যাগ করিলে আর তাহা কেহ গ্রহণ করে না, সেইরূপ প্রকৃতির মোহ একবার দূরীভূত হইলে আর তাহা আক্রমণ করিতে পারে না। [বিজ্ঞানভিক্ষু]

কোন মুনি ভ্রাতার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ফল অপহরণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতা বলিলেন "তুমি চোর।" তিনি বলিলেন "কি প্রায়শ্চিত্ত করিব বল।" ভ্রাতা বলিলেন "হস্তচ্ছেদ ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই।" এই শুনিয়া তিনি রাজার নিকট গিয়া নিজহস্ত ছেদন করাইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য—অকার্য্য করা অনুচিত। ভ্রমে করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। [অনিরুদ্ধ]

৮। অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ।

রাজর্ষি ভরত মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয়ে সুনিশ্চিত হইয়াও সদ্যঃপ্রসূতা এক হরিণীকে মরিতে দেখিয়া নবজাত হরিণশাবকটিকে পোষণ করিয়াছিলেন। ক্রমে এই হরিণের প্রতি তাঁহার এরূপ মমতা জন্মিল যে তাঁহার তপস্যা প্রভৃতি সমস্তই লুপ্ত হইল। মরিবার সময় হরিণের ধ্যান করিয়া মরাতে তাঁহার অধোগতি হইল। তাৎপর্য্য এই যে, মোক্ষার্থীর অনিষ্টচিন্তন করা উচিত নয়। তাহাতে বিবেকজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা জন্মে।

৯। বহুভির্যোগে বিরোধঃ রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ।

কুমারীরা হস্তে শঙ্খবলয়সকল পরিধান করে। তাহাদের পরস্পর আঘাতে ঝনৎকার শব্দ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ, বহু ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে কলহ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। ইহাতে যোগভ্রংশ হয়। নির্জ্জনতাই যোগের অনুকূল।

১০। দ্বাভ্যামপি তথৈব।

দুইজন একত্রে থাকিলেও ঐ উদাহরণ। দুইটি বলয়েও ঝনৎকার হয়। দুইজন লোকেও কথাবার্ত্তায় যোগের বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে।

১১। নৈরাশ্যঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ।

পিঙ্গলা নামক বারাঙ্গনা রজনীতে কোন পুরুষের প্রতীক্ষায় রাত্রিজাগরণ করিয়া ক্লিষ্ট হইয়াছিল। একদিন অতিশয় কাতর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল "এরূপ আর অপেক্ষা করিব না।" সেইদিন হইতে আশা ত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা সুখী হইল। তাৎপর্য্য আশা ত্যাগ করিলেই মানব সুখী হয়।

১২ অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী সর্পবৎ।

নিজে কোন উদ্যোগ না করিলেও সর্প যেমন পরকৃত গৃহে বাস করে, সেইরূপ চেষ্টা না করিলেও সুখী হওয়া যায়। সুতরাং চেষ্টা না করাই উচিত।

১৩। বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্পদবৎ।

ভ্রমর বহু পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া মধু সংগ্রহ করে। মানবেরও সেইরূপ বহুশাস্ত্র পাঠ করিয়া ও বহু গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া সারভাগমাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

১৪। ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ।

একজন শরনির্ম্মাতা বসিয়া বসিয়া বাণ নির্ম্মাণ করিতেছিল। সেই সময় এক রাজা তাহার সম্মুখস্থ পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। শরনির্ম্মাতা তাঁহার দিকে চাহিয়াও দেখিল না। একমনে আপন কাজ করিতে লাগিল। এইরূপ একাগ্রতা সহকারে ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

১৫। কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ।

ঔষধ ও পথ্যাদির নিয়ম না মানিলে রোগ আরোগ্য হওয়া অসম্ভব। শাস্ত্রের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে জ্ঞাননিষ্পত্তি হয় না। সকলেই যদি ইচ্ছামত ব্রতাদি শাস্ত্রনিয়ম লঙ্ঘন করে তাহা হইলে কোন শৃঙ্খলা থাকা অসম্ভব।

১৬। তদ্বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ।

নিয়ম বা তত্ত্বজ্ঞান বিস্মৃত হইলেও চলে না। কোন

রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া অরণ্যে একটি সুন্দরী কন্যা দেখিয়াছিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" সে বলিল "আমি রাজকন্যা।" রাজা তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সে বলিল "আমি তাহাতে সম্মত আছি কিন্তু যখন আপনি আমাকে জল দেখাইবেন তখনই আমি চলিয়া যাইব।" রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া তাহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। কিছুকাল পরে একদিন ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া কন্যাটি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল "জল কোথা?" রাজা প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া জল দেখাইয়া দিলেন। তখন সেই কন্যা জল স্পর্শ করাতে ভেকী হইয়া গেল। কারণ সে ভেকরাজদুহিতা ছিল। রাজা জাল প্রভৃতি দ্বারা বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

১৭। নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা
পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ।

ইন্দ্র ও বিরোচন ব্রহ্মার নিকট তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করিতে গিয়াছিলেন। ইন্দ্র শ্রবণ করিয়া আসিয়া সেই বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। বিরোচন আলোচনা করিল না।

১৮। দৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য।

তাহাতে ইন্দ্রের ফললাভ হইল। বিরোচনের কিছু হইল না। সেইহেতু শুধু শ্রবণ করিলেই ফল হয় না। তাহার আলোচনা আবশ্যক।

১৯। প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা
সিদ্ধির্বহুকালাৎ তদ্বৎ।

সেবা, ব্রহ্মচর্য্য ও প্রণতির দ্বারা বহুকাল পরে ইন্দ্র যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন সেইরূপই সিদ্ধিলাভের প্রশস্ত পন্থা।

২০। ন কালনিয়মো বামদেববৎ।

আরাধনায় জন্যই কালব্যাজ হয়, তত্ত্বজ্ঞানে তাহা হয় না। বামদেব পূর্ব্বজন্মের সাধনবলে গর্ভাবস্থানকালেই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

২১। অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেন
যজ্ঞোপাসকানামিব।

যাহারা যাগযজ্ঞাদি করে তাহারা কি তবে মুক্তি পায় না? কেবল জ্ঞানমার্গাবলম্বিগণ কি মুক্ত হয়? কর্ম্মমার্গে কি ফল নাই? উত্তর—ফল আছে। তবে তাহারা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির উপাসনাদ্বারা অনেক পরে জ্ঞানলাভ করে। সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ হয় না।

২২। ইতরলাভেঽপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতো
জন্মশ্রুতেঃ।

কিন্তু কর্ম্মমার্গলব্ধ সুখ স্থায়ী নহে। যজ্ঞদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইলেও তাহার ক্ষয় আছে। পুনর্ব্বার সংসারে আগমন সম্ভব। সুতরাং জ্ঞানমার্গই শ্রেষ্ঠ।

২৩। বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়োপাদানং
হংসক্ষীরবৎ।

যাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে সে, হংস যেরূপ জল পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করে সেইরূপ, হেয় সংসার পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয় মোক্ষ অবলম্বন করে।

২৪। লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ।

যাহার জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে তাহার সংসর্গেও হংসের ন্যায় ঐ প্রকার ত্যাগ ও গ্রহণ ঘটিতে পারে। অলর্ক দত্তাত্রেয়ের সঙ্গমাত্রেই সংসারে অনাসক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২৫। ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ।

রাগযুক্ত পুরুষের সহিত মিলন করা কর্ত্তব্য নয়। শুকপক্ষী সুন্দর বলিয়া পাছে কোন রূপলোলুপ বন্ধন করে এই ভয়ে যেরূপ স্বচ্ছন্দবিহার করে না, সেইরূপ রাগযুক্ত পুরুষ হইতে মুক্তিলাভেচ্ছু সদা দূরে থাকিবে। [বিজ্ঞানভিক্ষু]

রাগযুক্তের মুক্তি নাই। ব্যাসের রাগ থাকাপ্রযুক্ত মুক্তি হয় নাই। তৎপুত্র শুক রাগহীন হওয়াতে মুক্ত হইয়াছিলেন। [অনিরুদ্ধ]

২৬। গুণযোগাদ্ বদ্ধঃ শুকবৎ।

শুকপক্ষী যেরূপ রজ্জুযোগে ধৃত হয় সেইরূপ আসক্তি-পাশে মানবও বদ্ধ হইয়া পড়ে।

২৭। ন ভোগাদ্ রাগশান্তির্মুনিবৎ।

ভোগের দ্বারা কখনও রাগের শান্তি হয় না। সৌভরি মুনি তাহার প্রমাণ। ভোগবাসনায় তপস্যায় জলাঞ্জলি

দিয়া বহুকাল ভোগ করিয়াও তৃপ্তি পান নাই। সুতরাং ভোগ করিতে করিতে বৈরাগ্য জন্মিবে এ কথা অযৌক্তিক।

২৮। দোষদর্শনাদুভয়োঃ।

প্রকৃতি ও তাহার কার্য্যের পরিণাম প্রভৃতি দোষ দেখিয়াই রাগশান্তি হয়। [বিজ্ঞানভিক্ষু]

আত্মা ও বিষয় এই উভয়ের দোষ দেখিয়াই বিষয়ীদিগের চিত্তে বৈরাগ্য জন্মে। [অনিরুদ্ধ]

২৯। ন মলিনচেতস্যুপদেশ বীজপ্ররোহোঽজবৎ।

পত্নী ইন্দুমতীর মৃত্যু হইলে অজরাজা বহুবিধ বিলাপ করিতেছিলেন। তাঁহার শোকার্ত্তচিত্তে বশিষ্ঠের উপদেশ স্থান পাইল না। সেইরূপ মলিনচিত্তে উপদেশের বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

৩০। নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ।

যেমন মলিন দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ে না, সেইরূপ মলিন চিত্তে উপদেশের আভাসমাত্র থাকে না। এসকল ক্ষেত্রে উপদেশ বৃথা।

৩১। ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপতা পঙ্কজাদিবৎ।

জ্ঞান হইলেই যে তাহা উপদেশের ঠিক অনুরূপ হইবে এমন কোন কথা নাই। পদ্ম পঙ্কে জন্মায় বটে কিন্তু তাহা পঙ্কের অনুরূপ নয়। [বিজ্ঞানভিক্ষু]

সাংখ্যোক্ত 'মহান্'কে আত্মা বলা যায় না। কেননা মহান্ কারণ, আত্মা কার্য্য। কার্য্য ও কারণ এক নহে। পঙ্কই পদ্ম নয়। [অনিরুদ্ধ]

৩২। ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতোপাস্য-
সিদ্ধিবদুপাস্যসিদ্ধিবৎ।

অণিমা প্রভৃতি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেই যে চরম হইল তাহা নয়। কেননা তাহারও পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানলাভে সচেষ্ট হওয়াই সকলের কর্ত্তব্য।

সাংখ্যদর্শনোক্ত উপাখ্যানমালা এইখানে শেষ হইল। এইসকল উপাখ্যান পূর্ব্বে ভারতে বিশেষ প্রচলিত ছিল। শ্লোকাকারে যে ইহাদের সংগ্রহ হয় তাহার প্রমাণও বিদ্যমান আছে। যথা—

"পিঙ্গলা কুররঃ সর্পঃ সারঙ্গান্বেষকো বনে।
ইষুকারঃ কুমারী চ ষড়েতে গুরবো মম॥"

পিঙ্গলানাম্নী বারাঙ্গনা, কুরর পক্ষী, সর্প, মৃগান্বেষণকারী ব্যাধ, শরনির্ম্মাতা ও কুমারী এই ছয়জন আমার গুরু।

বিজ্ঞানভিক্ষু স্বীয় ভাষ্যে এইসকল উপাখ্যানের সমর্থক অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার কতকগুলি এই—

গ্রহাবিষ্টো দ্বিজঃ কশ্চিচ্ছূদ্রোঽহমিতি মন্যতে।
গ্রহনাশাৎ পুনঃ স্বীয়ং ব্রাহ্মণ্যং মন্যতে যথা॥

কোন ব্রাহ্মণ গ্রহাবিষ্ট হইলে নিজেকে শূদ্র বলিয়া মনে করে; পরে গ্রহনাশে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে পারে।

[সেইরূপ জীবও মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমি এই দেহ এই জ্ঞান করে, পরে মায়া দূর হইলে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারে।]

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি।
এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণম্॥

বহুলোকের বাসে কলহ উপস্থিত হয়। দুইজন থাকিলেও কথাবার্ত্তা চলিয়া থাকে। কুমারী-করস্থিত কঙ্কণই ইহার নিদর্শন। সুতরাং একক থাকিবে।

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষাপ পিঙ্গলা॥

আশা বিষম দুঃখ। নৈরাশ্যই সুখ। কান্তের আশা পরিত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা সুখে ঘুমাইয়াছিল।

গৃহারম্ভো হি দুঃখায় ন সুখায় কথঞ্চন।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে॥

গৃহারম্ভ দুঃখের জন্য, কখনও সুখের জন্য নয়। সর্প পরকৃত গৃহে প্রবেশ করিয়া সুখে বাস করে।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে, ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে সার গ্রহণ করে সেইরূপ, সার গ্রহণ করিবে।

আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে শ্লোকের উপাখ্যানগুলির সহিত সূত্রবর্ণিত উপাখ্যানগুলির বিশেষ প্রভেদ নাই।

যেমন বেদবিধান গুরুর আজ্ঞার ন্যায় কঠোর বলিয়া কাব্যরসে জনগণকে বশীভূত করিতে হয়, সেইরূপ নীরস ও দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বসকলকে সরস ও সরল করিবার

জন্য উপাখ্যানমালার প্রয়োগ। দুরারোহ জ্ঞান-শৈলশৃঙ্গে আরোহণের সুবিধার্থে সুগঠিত-সোপান-স্বরূপ এই গল্পরাজি মরুভূমি মধ্যে শষ্পচ্ছাদিত সলিলসিক্ত দ্রুমচ্ছায়াভূষিত ক্ষেত্রের ন্যায় মনোমদ। এই উপাখ্যানপ্রবাহ উপনিষদ-শৈল-শিখরোদ্ভূত হইয়া অনন্ত কাল-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বুদ্ধদেবের অনুপম আখ্যানসমূহ ইহার শাখা-সরিৎ। ঈশার উপদেশ-লহরী উপনদী। কত তৃষিত গৃহীকে কত জ্ঞানবারি দান করিয়া বহিয়া আসিতেছে—কোন সাগরে মিলাইবে কে জানে ?

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

হেমকণা

(৩)

লৌহপেটিকার আবরণ যখন উত্তোলিত হইল তখন অন্ধকার দূর হইয়াছে, শুভ্র দিবালোক আসিয়া গৃহটিকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। যিনি অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্য উপত্যকা হইতে আমাদিগকে নগরে আনয়ন করিয়াছিলেন তিনি পেটিকার আবরণ উন্মোচন করিয়া আমাদিগকে উত্তোলন করিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু চর্ম্মাধারে হেমকণা সংগৃহীত হইয়াছিল, আমাদিগের অধিকারী সেগুলি ধাতুপাত্রে একত্র করিয়া পুনরায় বৃহত্তর চর্ম্মাধারে আবদ্ধ করিলেন। আমিও অবশ্য সেই সঙ্গে পুনরায় আবদ্ধ হইলাম। তাহার পর বোধ হইল যেন কেহ আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল, কিয়ৎক্ষণ শব্দশূন্য জনশূন্য পথ অতিক্রম করিয়া কোলাহলময় জনতাপূর্ণ রাজপথে উপস্থিত হইল। রাজপথের কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া অপর একটি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। হঠাৎ চর্ম্মপেটিকা উন্মুক্ত হইল ও আমরা প্রশস্ত ধাতুপাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম। দেখিলাম নগরের প্রধান রাজপথের পার্শ্বস্থিত একটি বৃহৎ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। গৃহের মধ্যভাগে মলিন শয্যায় বৃহদাকার মলিন উপাধানে দেহভার ন্যস্ত করিয়া কৃষ্ণকায় বিরলকেশ জনৈক মনুষ্য অর্দ্ধশায়িত বা অর্দ্ধ উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে লৌহনির্ম্মিত বৃহদাকার আধারসমূহ স্থাপিত রহিয়াছে। গৃহের উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে প্রাচীরের নিম্নার্দ্ধ রক্তবস্ত্রমণ্ডিত ও অপরার্দ্ধ সুবর্ণ ও রজতনির্ম্মিত অলঙ্কার ও তৈজসরাশিতে আবৃত রহিয়াছে। গৃহস্বামীর দক্ষিণপার্শ্বে দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ জন শিল্পী নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে ও অপর পার্শ্বে ছয় কি সাত জন শিল্পী সুবর্ণরেণু হইতে সুবর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত করিতেছে। একজন শিল্পী সুবর্ণকণা লইয়া নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন করিতেছে এবং পরে অগ্নি সংযোগ করিয়া তাহা গলাইতেছে, দ্বিতীয় শিল্পী গলিত সুবর্ণ লইয়া কাষ্ঠাধারে নিক্ষেপ করতঃ সুবর্ণদণ্ড নির্ম্মাণ করিতেছে, তৃতীয় শিল্পী লৌহদণ্ডের আঘাতে সেগুলিকে প্রশস্ত করিতেছে, চতুর্থ ব্যক্তি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে চতুষ্কোণ সুবর্ণখণ্ডসমূহ প্রস্তুত করিতেছে, পঞ্চম ব্যক্তি তুলাদণ্ডের সাহায্যে চতুষ্কোণ সুবর্ণখণ্ডগুলিকে ওজন করিতেছে ও ষষ্ঠ-ব্যক্তি এক একটি সুবর্ণখণ্ড লইয়া তদুপরি একটি লৌহদণ্ড দ্বারা আঘাত করিতেছে ও প্রত্যেক সুবর্ণখণ্ড লইয়া ধাতুপাত্রে নিক্ষেপ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জনৈক দাস আসিয়া বিপণী-স্বামীর সম্মুখ হইতে হেমকণাপরিপূর্ণ ধাতুপাত্র লইয়া প্রথম শিল্পীর সম্মুখে স্থাপন করিতেছে ও ষষ্ঠ শিল্পীর নিকট হইতে নূতন সুবর্ণমুদ্রাপরিপূর্ণ পাত্র লইয়া বিপণীস্বামীর নিকট লইয়া যাইতেছে। গৃহের চতুর্দ্দিকে ক্রেতা ও বিক্রেতারা বিপণীস্বামীর সহকারিগণের সম্মুখে বসিয়া নগরের কোলাহল বৃদ্ধি করিতেছে। আমাদিগের অধিকারী চর্ম্মপেটিকা হইতে আমাদিগকে ধাতুপাত্রে নিক্ষেপ করিলে বিরলকেশ দন্তবিহীন বিপণীস্বামী ঈষৎ হাস্য করিল ও বিনা বাক্যব্যয়ে আধারটিকে তুলাদণ্ডে স্থাপিত করিল। ওজন নির্ণীত হইলে মূল্য লইয়া বিপণীস্বামী ও আমাদিগের অধিকারী ক্ষুদ্র বাক্‌যুদ্ধের অবতারণা করিল। অবশেষে বিপণীস্বামী আমাদিগের অধিকারীকে কতকগুলি নূতন সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। জীবনে আর কখনও তাঁহার সাক্ষাৎ পাই নাই। কিয়ৎক্ষণ বিপণী-স্বামীর শয্যার উপরে ধাতুপাত্রে পতিত ছিলাম, তাহার পর কৃষ্ণবর্ণ একজন দাস আসিয়া পাত্র সহিত আমাদিগকে একজন শিল্পীর নিকট লইয়া গেল, সে ব্যক্তি অবিলম্বে আমাদিগকে নূতন আর্দ্র মৃৎপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডমধ্যে স্থাপন করিল। অগ্নির উত্তাপে আর্দ্র মৃৎভাণ্ড

শুষ্ক হইয়া গেল, কোমল পাত্র অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল। অগ্নির উত্তাপ ক্রমশঃ আমাদিগকে স্পর্শ করিল, আমরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, আমাদিগের দেহে এক অননুভূতপূর্ব্ব শক্তির আবির্ভাব হইল। ক্রমে আমাদিগের কঠিন দেহও কোমল হইতে আরম্ভ হইল, পরিশেষে উত্তাপের আনন্দে একেবারে গলিয়া গেলাম। শিল্পী তখন লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রের সাহায্যে আমাদিগকে অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয় শিল্পীর নিকট প্রদান করিল, আমরা শীতল তৈলাক্ত কাষ্ঠাধারে নিক্ষিপ্ত হইলাম। শীতল বায়ু স্পর্শে আমাদিগের দেহ কঠিন হইতে আরম্ভ হইল ও ধীরে ধীরে আমরা কাষ্ঠাধারের আকারের অনুরূপ দণ্ডে পরিণত হইলাম। তখন তৃতীয় শিল্পী একএকটি দণ্ড লইয়া লৌহদণ্ডের আঘাতে তাহাদিগকে প্রশস্ত করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহা চতুর্থ শিল্পীকে প্রদান করিল। তীক্ষ্ণধার ছেদনক ও লৌহমুদ্গর লইয়া শিল্পী তাহা হইতে চতুষ্কোণ সুবর্ণখণ্ড কর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল ও অতি অল্পকাল মধ্যে সেগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ সুবর্ণখণ্ডে পরিণত করিয়া পঞ্চম শিল্পীকে প্রদান করিল। এক একটি চতুষ্কোণ সুবর্ণখণ্ড তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া আবশ্যকমত কোন কোনটি হইতে শিল্পী কিয়দংশ কর্ত্তন করিতেছিল। অবশেষে সমান ওজনের সুবর্ণচতুষ্কগুলি ষষ্ঠ শিল্পীকে প্রদান করিতেছিল। ষষ্ঠ শিল্পী হস্তীর মূর্ত্তি অঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড প্রত্যেক সুবর্ণচতুষ্কের উপর রাখিয়া লৌহমুদ্গব দ্বারা তাহাব উপরে আঘাত বরিতেছিল। ইহাতে প্রত্যেক সুবর্ণ চতুষ্কের উপরে একটি হস্তীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া যাইতেছিল। শিল্পীর সম্মুখস্থিত ধাতুপাত্রটি সুবর্ণ-মুদ্রায় পরিপূর্ণ হইলে একজন দাস আসিয়া পাত্রসমেত বিপণীস্বামীর সম্মুখে লইয়া গেল। এই সময়ে বিপণীর অধিকারী জনৈক কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল "উগ্রসেন, আজ মধ্যাহ্নে রাজসভায় লক্ষ সুবর্ণখণ্ড উপস্থিত করিতে হইবে, তাহার কতগুলি প্রস্তুত হইল ওজন করিয়া দেখ।" উগ্রসেন উত্তর করিল "শিল্পিগণ চারিদিন পরিশ্রম করিতেছে, বোধ হয় লক্ষাধিক সুবর্ণ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া সে ব্যক্তি আসন ত্যাগ করিল ও বিপণীর অধিকারীর পশ্চাতে যে বৃহৎ লৌহনির্ম্মিত আধারগুলি ছিল তাহার দুইটি লৌহশলাকাদ্বারা উন্মুক্ত করিল। প্রত্যেক আধারের দুইটি দ্বার দুই পার্শ্বে সরিয়া গেল। তখন দাসগণ তাহার মধ্য হইতে দশটি কি দ্বাদশটি চর্ম্মনির্ম্মিত পেটিকা বহির্দ্দেশে আনয়ন করিল। তন্মধ্যস্থিত নূতন সুবর্ণমুদ্রা-গুলি গণিত হইলে বিপণীস্বামী আশ্বস্ত হইল। দশটি বৃহৎ বস্ত্রাধারে লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা আবদ্ধ হইল ও অবশিষ্টগুলি পুনরায় লৌহাধারে প্রেরিত হইল। অনেকের সহিত আমিও বস্ত্রাধারে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। কতক্ষণ বস্ত্রাধারগুলি বিপণীস্বামীর সম্মুখে পতিত ছিল তাহা স্মরণ নাই। বহুক্ষণ পরে কে যেন আমাদিগকে উত্তোলন করিল এবং অপর কোনও স্থানে লইয়া চলিল। রাজপথের জনস্রোত ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া বহুদূর গমন করিল। দ্বিতীয় গৃহমধ্যে প্রবেশকালে কে যেন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "কি লইয়া যাইতেছ?" তাহারা উত্তর করিল "সুবর্ণবণিক মাধবসেন রাজসকাশে সুবর্ণ প্রেরণ করিয়াছে, তাহাই লইয়া যাইতেছি।" তখন প্রশ্নকর্ত্তাদিগের মধ্যে একজন পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল ও একটি অন্ধকার গৃহের সম্মুখে আসিয়া দ্বিতীয় একজন কর্ম্মচারীর নিকট বাহক-গণকে রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাজকর্ম্মচারী বাহক-গণের মধ্যে একজনকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল।—"তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?" "স্বর্ণকার মাধবসেনের বিপণী হইতে।" "কি আনিয়াছ?" "লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা।" "কি উদ্দেশ্যে?" "রাজাদেশানুসারে।" "কি আদেশ ছিল?" "অদ্য মধ্যাহ্নে রাজসভায় লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা উপস্থিত করিতে হইবে।" "মূল্য পাইয়াছ?" "আবশ্যকমত সুবর্ণ ও রজতকণা ভাণ্ডার হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, পারিশ্রমিক স্বরূপ দশমাংশ এখনও প্রেরিত হয় নাই।" "তোমার নাম?" "উগ্রসেন।" "পিতার নাম?" "রুদ্রসেন।" "নিবাস?" "প্রধান রাজপথে মাধবসেন স্বর্ণকারের বিপণীতে।" ইহার পর বাহকগণ বস্ত্রাধারগুলি লইয়া অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল। রাজকর্ম্মচারী তাহাদিগকে গৃহতলে বস্ত্রাবাসগুলি রাখিতে আদেশ করিল। তাহারা বস্ত্রাধার পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলে সশব্দে গৃহের দ্বার বন্ধ হইল। শব্দ

শুনিয়া বুঝিলাম কবাট ধাতবপদার্থে নির্ম্মিত। অন্ধকার গৃহমধ্যে কতক্ষণ ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। বহুক্ষণ পরে পুনরায় সশব্দে দ্বার উন্মুক্ত হইল, কয়েকজন মনুষ্য আসিয়া বস্ত্রাধার সমেত আমাদিগকে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

যাহারা আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহারা ক্রমশঃ অন্ধকারময় গৃহগুলি পরিত্যাগ করিয়া আলোকময় বহুজনাকীর্ণ পথে অগ্রসর হইতেছিল। সময়ে সময়ে জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। তখন একব্যক্তি সুবর্ণবাহকগণের পুরোবর্ত্তী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল "ভ্রাতৃগণ, পথ ছাড়িয়া দাও, আমরা পুরুরাজের আদেশে তাঁহার ঈপ্সিত দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি।" তখনই শত শত কণ্ঠ পৌরবরাজের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, বাহকগণ আমাদিগকে লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল। এইরূপে বারংবার পথরুদ্ধ হইয়া বাহকগণের গমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অশ্বের হ্রেষারব ও খুরধ্বনি শ্রুত হইতেছিল, জনকোলাহলের মধ্যে অবিরাম ধাতবপদার্থের ঝনঝনা আমাদিগের কর্ণে আসিতেছিল, আমরা না দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছিলাম মানবগণ কোনও অসামান্য কারণে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সুবর্ণবাহকগণের সহিত যে রাজকর্ম্মচারী আসিয়াছিলেন তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাহাদিগকে সুবর্ণরাশি ভূমিতে রাখিতে আদেশ করিলেন। তাহার পর তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া বুঝিলাম যে তিনি পাষাণাচ্ছাদিত পথে চলিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অপর একজন মানবের আদেশে বাহকগণ আমাদিগকে উত্তোলন করিল, পথের পাষাণে তাহাদিগের চর্ম্মপাদুকা ধ্বনিত হইতেছিল। স্থানটি নীরব, নিস্তব্ধ, কিন্তু তথাপি বোধ হইতেছিল, বহু মানব সেই স্থানে একত্র হইয়াছে। হঠাৎ পূর্ব্বোক্ত রাজকর্ম্মচারী বলিয়া উঠিলেন "পৌরবরাজের জয় হউক, মাধবসেন শ্রেষ্ঠী লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া ভাণ্ডারে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা রাজসকাশে আনীত হইয়াছে।" তখন একসময়ে বিংশতিজন বাহক লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তরমণ্ডিত গৃহতলে পাতিত করিল, শুভ্র দিবালোক আমাদিগের বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া গৃহটিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিল। লক্ষ সুবর্ণখণ্ডের মধুর নিক্কণ দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া তুলিল। দেখিলাম প্রশস্ত গৃহতলে বহু মানব দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ধূসরবর্ণ পাষাণনির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণীর উপরে উজ্জ্বল রজতনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ স্থাপিত; গৃহের একপ্রান্তে কয়েকখানি কাষ্ঠাসনে কয়েকজন মনুষ্য উপবিষ্ট রহিয়াছে; সুদীর্ঘ গৃহতলের অবশিষ্টাংশ দণ্ডায়মান মনুষ্যশ্রেণীতে পরিপূর্ণ; গৃহের এক পার্শ্বে জনসঙ্ঘ অপসারিত করিয়া আমাদিগের নিমিত্ত স্থান সংগৃহীত হইয়াছিল। গৃহস্থিত মানবগণ সকলেই উজ্জ্বল ধাতুনির্ম্মিত আবরণ পরিধান করিয়া ছিল এবং সকলেরই হস্তে ধাতুনির্ম্মিত দণ্ডাকার আয়ুধ ধৃত ছিল। সকলেই যেন কাহারও আগমন-অপেক্ষায় উৎসুক হইয়া আছে, সকলেই যেন আশুবিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে, কিন্তু কাহারও মুখে ত্রাস বা ভীতির চিহ্ন নাই। গৃহপ্রান্তে যে কয়জন ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যস্থিত একজন, আমাদিগকে-আনয়নকারী রাজকর্ম্মচারীকে কহিলেন, "ভদ্র, তুমি শুভ সংবাদ আনয়ন করিয়াছ। এই দুস্তব যবনযুদ্ধে প্রথম ভরসা অসি এবং দ্বিতীয় ভরসা ইলপুরের শ্রেষ্ঠীগণের সুবর্ণরাশি. আমি দূরতাপ্রযুক্ত সুবর্ণখণ্ডগুলি দেখিতে পাইতেছিনা, তুমি একমুষ্টি আমার নিকটে লইয়া আইস।" কর্ম্মচারী কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণের পর সুবর্ণস্তূপ হইতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দশটি সুবর্ণমুদ্রা লইয়া রাজার নিকটে গমন করিলেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মুদ্রাগুলি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা সুবর্ণখণ্ডগুলি পরীক্ষা করিয়া দক্ষিণহস্তে আমাকে গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি অতি সুন্দর। তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে জগতের রমণীমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিও আমি সুন্দর কিনা। আমি জন্মাবধি সুন্দর। শৈশবে যখন পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর পার্শ্বে পাষাণবক্ষে আবদ্ধ ছিলাম তখনও আমি সুন্দর, কিন্তু আমার সৌন্দর্য্য তখন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় দৃষ্টির অগোচর ছিল। যখন পাষাণবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জলরাশির সহিত শত শত যোজন পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম

ক'রিয়াছিলাম তখনও আমি সুন্দর, তখনও আলোকের প্রথম রশ্মি আসিয়া আমাকে সন্ধান করিত ও আমাকে দেখিয়া হাস্যে দিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিত। বনপথেও আমি সুন্দর, মধ্যাহ্নসূর্য্যকিরণে শুভ্র বালুকারাশির মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল আমার অবয়ব দেখিয়া মোহে লালসায় প্রথমদৃষ্ট মানবের চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। মাধবসেনের বিপণীতে যখন আমরা আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া সুবর্ণমুদ্রায় পরিণত হইয়াছিলাম তখন যেন আমাদিগের কৈশোর অতীত হইয়া যৌবন আসিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রার মধ্যে তখনও আমি অতি সুন্দর। সর্ব্বাপেক্ষা আমার বর্ণ হরিদ্রাভ, মাধবসেনের শিল্পিগণ আমাকে অতি যত্নের সহিত সমচতুষ্কোণ করিয়া কর্ত্তন করিয়াছিল, ইলপুর নগরের চিহ্ন হস্তীর মূর্ত্তি আমার দেহে সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল, পৌরবরাজের রক্তাভহস্তে আমি যেন সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় হাস্য করিতেছিলাম।

পুরুরাজ দক্ষিণহস্তে আমাকে গ্রহণ করিয়া সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন ও গৃহতলে দর্ভশয্যায় উপবিষ্ট এক কদাকার বৃদ্ধের চরণতলে প্রণত হইয়া কহিলেন, "আচার্য্য, নগরবাসী শ্রেষ্ঠিগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সুবর্ণরাশির প্রথম খণ্ড আপনার চরণপ্রান্তে রক্ষা করিয়া অবশিষ্ট যবনযুদ্ধে নিয়োজিত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন পৌরবসেনা যেন জয়দৃপ্ত অরাতিচমূ কুরুবর্ষের মরুপ্রান্তে রাখিয়া আসিতে পারে। যবনসেনা এক অদ্ভুত বালকবীরের চালনায় ঐরাণের প্রবল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া বাহ্লীক গান্ধার ও শকদ্বীপ রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া পবিত্র পঞ্চনদে পদার্পণ করিয়াছে। পৌরবসেনা যদি রণে পরাঙ্মুখ হয়, পুরুবংশীয়গণ যদি আত্মবিস্মৃত হইয়া রণে পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে অপ্রতিহতবেগে দুর্ব্বারবৈরীবাহিনী উত্তরাপথ পদানত করিবে। শুনিয়াছি মগধে শূদ্ররাজ প্রবল পরাক্রান্ত, হয় ত যবনসেনা তাঁহার বারণশ্রেণী দেখিয়া যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে, কিন্তু পুরু যদু ও মদ্রবংশ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের কাল হইতে উত্তরাপথের প্রতীহাররক্ষী, যবনসেনা যদি রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিতে পারে, যদি পঞ্চার্গলবিশিষ্ট পঞ্চনদ যবনের পদানত হয়, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তে দেবতা ও ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইবে। আশীর্ব্বাদ করুন যবনসেনা যেন অসুরপূজকগণের সরস্বতীতীর পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়া দিতে সক্ষম হই।" রাজা পুনরায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরণতলে পতিত হইলেন। বৃদ্ধ আসন হইতে উত্থিত হইলেন, বৃদ্ধের জরাজীর্ণ কম্পমান হস্ত রাজার মস্তকে স্থাপিত হইল। বৃদ্ধের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সকলে শুনিতে পাইল না, তিনি বলিতেছিলেন "রাজন্, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি আপনি জয়যুক্ত হইয়া পৌরবপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, পৌরবসেনা যেন আততায়ী যবনকে সুবস্তুনদীর পরপারে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়। অশীতিবর্ষ পূর্ব্বে বাল্যকালে পবিত্র পঞ্চনদে ঐরাণদেশীয় যবনের অধিকার দেখিয়াছিলাম, তখনও পবিত্র ক্ষেত্রে যবনের অত্যাচারে দেবতা ও ব্রাহ্মণের অশেষ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। সোমবংশীয়গণের বাহুবলে ঐরাণীয় যবন উত্তরাপথ হইতে বিদূরিত হইয়াছে। যে নূতন যবনসেনা আসিতেছে তাহারা ঐরাণ দেশের পশ্চিমসীমান্তস্থিত যোন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী। শক্তিশালী মুষ্টিমেয় যবনসেনা ঐরাণের পরাক্রান্ত প্রাচীন সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছে, আসুরসম্রাট দরিয়াবুশ্ মহানদীর পরপারে হীনাবস্থায় নিহত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু ঐরাণে ক্ষত্রবল বহুদিন ক্ষীণ হইয়াছে। শকদ্বীপ, বাহ্লীক, কপিশা, গান্ধার ও তক্ষশিলা যবনের নিকট শির অবনত করিয়াছে সত্য, মুষ্টিমেয় যবনসেনা দুর্জ্জেয় বরুণপর্ব্বত অধিকার করিয়াছে সত্য, দুস্তর সিন্ধুনদের উত্তাল তরঙ্গরাশি যবনসেনার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই তাহাও সত্য, যাদবমদ্ররাজগণ যবনরাজের পদানত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু পৌরব সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সিন্ধু বিতস্তা ও ইরাবতীর তটরক্ষায় খ্যাতিলাভ করিয়াছে; শত্রু যবনসেনা দুর্দ্দান্ত, কিন্তু পৌরবসেনাও শান্তিপ্রিয় নহে, দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না। বৎস, সিন্ধু অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু হিমানীতনয়া বিতস্তা বিশালবক্ষ বিস্তার করিয়া শত্রুবাহিনীকে বাধা প্রদান করিবে, পৌরবগণ, বিতস্তার পবিত্র তটে মাতৃভূমির রক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। সপ্ততিবর্ষ পূর্ব্বে এক যবনযুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য বিস্মৃত হইয়া অসিধারণ করিয়াছিলাম, জীবনের পরপারে আসিয়া দ্বিতীয় যবনযুদ্ধেও অসিধারণ করিব।" তাহার পর বৃদ্ধ কি বলিতেছিলেন তাহা আর কাহারও শ্রুতিগোচর

হইল না, লক্ষ লক্ষ বজ্রনিনাদের ন্যায় সমবেত জনসঙ্ঘের জয়ধ্বনি তাহা ডুবাইয়া দিল। জয়নির্ঘোষে পাষাণনির্ম্মিত সভাগার কম্পিত হইয়া উঠিল। বহির্দ্দেশে সমবেত পৌরবসেনা লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। নগরে যাহারা যবনরাজের চরস্বরূপ তক্ষশিলানগর হইতে আসিয়াছিল, তাহারা বুঝিল পৌরব সোমবংশের সম্মান রক্ষা করিবে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে পৌরবসেনা বিতস্তার পূর্ব্বতীরে যবনকে পাদক্ষেপ করিতে দিবে না। কোলাহল শান্ত হইবার পূর্ব্বেই উপবিষ্ট পৌরবকুমারগণ একে একে বৃদ্ধের চরণে প্রণত হইলেন। তখন রাজার আদেশে যুদ্ধযাত্রার ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার জন্য গৃহতলের সুবর্ণরাশি সেনানীগণের মধ্যে বিতরিত হইল। সমবেত যোদ্ধৃমণ্ডলীর সহিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষীণ কটিতটে দীর্ঘ অসি বন্ধন করিয়া সভাগার হইতে নির্গত হইল।

নগর হইতে সমস্ত দিন দলে দলে পৌরবসেনা বিতস্তা অভিমুখে অগ্রসর হইল, আমার অধিকারী ব্রাহ্মণও অশ্বারোহণে রাজপ্রতীহার রক্ষীগণের সহিত সমস্তদিন চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমুদ্রবৎ বিশাল বিতস্তাতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীর পরপারে সিন্ধুতীর হইতে আনীত যবননৌবাহিনী কীলকবদ্ধ রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। সমগ্র যবনসেনা তখনও তক্ষশিলা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। পৌরবসেনা রজনী অতিবাহনের জন্য স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। চরগণ প্রতিমুহূর্ত্তে যবনসৈন্যের গতিবিধির সংবাদ আনয়ন করিতে লাগিল। যবনসেনা তখনও তক্ষশিলার পথে, যবনগণ পরপারে সমগ্র বাহিনীর জন্য শিবির স্থাপন করিতেছে শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া পৌরবসেনা আহার ও বিশ্রামলাভের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইল। নিশীথে চরগণ আসিয়া পুরুরাজকে জানাইল যে যবনরাজের নেতৃত্বে সমগ্র যবনসেনা পরপারে উপস্থিত হইয়াছে। প্রভাতে নদীর উভয় পারে উভয় পক্ষীয় সেনা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। সমস্তদিন অতীত হইয়া গেল, যবনসেনা নদীপার হইবার চেষ্টা করিল না। পৌরবকুমারগণ সেনা লইয়া বিতস্তানদীর উত্তরে ও দক্ষিণে যে যে স্থানে নদী পার হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা রক্ষা করিতেছিলেন। বিতস্তাতীরে স্কন্ধাবারে সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, যবনরাজ নদী পার হইয়া পৌরবসেনার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না।

তাহার পর যাহা হইয়াছিল তাহা ইতিহাসভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতায় আর্য্যাবর্ত্তের চিরকাল সর্ব্বনাশ হইয়া আসিয়াছে, জগজ্জয়ী অসাধারণ যুদ্ধনীতিকুশল যবন-সম্রাট বর্ষাগমে স্ফীতবক্ষ বিতস্তা নদীর প্রসার এবং পরপারে সমবেত পৌরবসেনার আকার দেখিয়া সৈন্য-চালনা করিতে ভরসা করেন নাই। পৌরবগণের ঈর্ষাকাতর উত্তরাপথবাসী কোন কুলাঙ্গারই বিতস্তা উত্তরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া যবনসম্রাটকে সংবাদ দিয়াছিল। যবনরাজ কিরূপে নিশাযোগে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিরূপে নৈশ অন্ধকার ও ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া অধিকাংশ যবনসেনা বিতস্তা বক্ষস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপের আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়া নদী পার হইয়াছিল তাহা ইতিহাসভুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিরূপে পৌরবকুমার মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া যবনবাহিনীর গতিরোধের উদ্যমে সসৈন্যে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাবনিক ইতিহাসের পত্রে পত্রে তাহার বিবরণ দেখিতে পাইবে। প্রভাতে যবনরাজের পলায়নসংবাদ পাইয়া পুরুরাজ দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিরূপে পরদিন পথশ্রান্ত ক্লান্ত আত্মীয়গণের নিধনে শোকাকুল পৌরবসেনা জয়োল্লাসে বলীয়ান যবনবাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাও ইতিহাসের কথা। বিতস্তাতীরে হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতি-সম্বলিত পৌরবসেনা ধ্বংস হইলেও পুরুরাজ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন নাই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত একজন পৌরবসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল। পুরুরাজ অস্ত্রাঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেও রাজহস্তী তাঁহার দেহ রক্ষা করিয়াছিল অস্ত্রহীন অবস্থায় রক্তপাতে পিপাসার্ত্ত হইয়া পুরুরাজ যবনহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই আমার অধিকারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যবনহস্তনিক্ষিপ্ত শূলে বিদ্ধ হইয়া শিলাখণ্ডের পার্শ্বে পতিত ছিলেন। যুদ্ধান্তে যবনসেনা যখন লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তখনও তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া জনৈক শক মুষলাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে আমাকে গ্রহণ করিয়া কটিদেশে আবদ্ধ করিয়াছিল। তখন হইতে আমি যবনসেনার সহচারী হইয়াছিলাম।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত-ইতিহাসের জন্মকথা

১। ভূসংস্থান।

এখনও আমরা ইতিহাসের নামে অনেক স্থলে কেবল কয়েকজন রাজার জীবনচরিত পড়িয়া থাকি; রাজার ইতিহাসে জনসাধারণের কথা যতটুকু প্রতিফলিত থাকে, তাহাই যথেষ্ট মনে করিতে বাধ্য হই। রাজা ত জনসাধারণের একজন মাত্র; তিনি নায়ক হউন বা প্রতিভূ হউন, কেবলমাত্র তাঁহার কথায় লোকসাধারণকে চিনিতে পারি না। জনসাধারণের ইতিহাসই দেশের যথার্থ ইতিহাস। অন্যদিকে আবার জনসাধারণের উন্নতি বা অবনতি বহু পরিমাণে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই জন্য আমাদের জনিত্র, জননাস্পদ বা জন্মভূমির আদিম ইতিহাসের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। এই "দেশের মাটি" এবং "দেশের জল" কত দিন হইতে কি ভাবে আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে, প্রথমতঃ সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধে দুচারিটি কথা বলিয়া লইব।

ভারতবর্ষের যে দক্ষিণ বিভাগ এখনও উপদ্বীপ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে, ঐ ভূভাগের সৃষ্টি আমাদের দেশ-সৃষ্টির প্রথমে হইয়াছিল। অন্ততঃ আড়াই কোটি বৎসর পূর্ব্বে দেশসংস্থানের আদিযুগে ঐ দক্ষিণ ভারত বা ভারত-উপদ্বীপের সৃষ্টি। ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় না থাকিলে এই কথাগুলি বৃথা কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে। যাঁহারা নিজে ঐ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবেন না, তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে পারি যে আমি অতিসাবধানে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের সুবিবেচিত সিদ্ধান্তের কথাই লিখিয়াছি।

দেশসংস্থানের বয়সের কথায় কেহ যেন এই সমগ্র ধরিত্রী সৃষ্টির কথা না বুঝেন। খুব ন্যূনকল্পে এই ধরিত্রীর জন্ম প্রায় ছয় কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। যে "নীহারিকা-গোলক" হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি, তাহা যখন প্রথম পৃথিবীরূপে পরিণত হয়, তখন প্রথমে পৃথিবীর "কঠিন আবরণের" সৃষ্টি হইয়াছিল। উত্তপ্ত নীহারিকা-গোলকে যখন তাপ অনেক কমিয়া গিয়া ১১৭০° (C) হইয়াছিল, তখন কঠিন আবরণের সৃষ্টি হয়। তাহার পর যখন উত্তাপ কমিতে কমিতে ৩৭০° ডিগ্রিতে দাঁড়াইল, তখনই জল বা সমুদ্রের সৃষ্টির আরম্ভ। পৃথিবীর ইতিহাসে জলের জন্মের পর স্থলের জন্ম নহে। উত্তাল তরঙ্গ-মালাসঙ্কুল ভীমদর্শন সিন্ধুকে স্বাভাবিক কল্পনার বিরুদ্ধে জোর করিয়া রমণী রূপে না হয় কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু উহাকে "আদি জননী" বলিতে পারি না। সৃষ্টির যে যুগে পৃথিবীর এই আদিম বিকাশ হইতেছিল, আমি সে যুগের কথা বলিতেছি না। যখন জলস্থলের বিভাগ এবং পরিবর্ত্তনে দেশ-উপদেশ গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই আদি (Palæozoic) যুগের কথা বলিতেছি। দক্ষিণ ভারতের জন্মযুগে রাজপুতানা সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল, এবং উহার কূল দিয়া একটি বহুবিস্তৃত এবং বহু উন্নত পর্ব্বতমালা শোভা পাইত। একালের আরাবল্লী পর্ব্বত সেই অতিবৃহৎ পর্ব্বতের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। সেই আদিম যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্ব উপকূল প্রায় একই ভাবে রহিয়া গিয়াছে,—বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু ঐ ভূভাগের দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক একটি সুবিস্তৃত মহাদেশের অংশমাত্র ছিল, এবং সেই মহাদেশ আফ্রিকার দক্ষিণ সীমা হইতে মলয় দেশ পর্য্যন্ত ভারত-সাগর ব্যাপ্ত করিয়া বিস্তৃত ছিল। সে যুগে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত, আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্তান ব্যাপ্ত করিয়া সমুদ্র-তরঙ্গ সঞ্চালিত হইত।

ঐ যুগে শম্বুকাদি জাতীয় কতকগুলি জীব, অল্প দু-চারিটি শ্রেণীর মৎস্য, কতকগুলি উভচর এবং সরীসৃপ জন্মলাভ করিয়াছিল মাত্র। উচ্চশ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবের জন্ম হওয়া দূরে থাকুক, তখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীর আকাশ বিহঙ্গ-গীতে মুখরিত হয় নাই। ধ্যানস্থ সৃষ্টি তখনও মৌনব্রত সাধন করিতেছিলেন।

তাহার পর দ্বিতীয় (Mesozoic) যুগের শেষভাগে যখন ভারতসাগরব্যাপী মহাদেশ হইতে পশ্চিম উপকূল কথঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অর্থাৎ দক্ষিণ ভারত প্রায় একটি দ্বীপের মত হইয়া আসিতেছিল, তখনও পৃথিবীতে মনুষ্যের জন্ম হয় নাই। কিন্তু এই যুগে আসামের কিয়দংশ এবং পূর্ব্ব হিমালয়ের সহিত দক্ষিণ ভূভাগের

সংযোগ সাধিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, সিন্ধুর পরপারের প্রদেশ এবং ব্রহ্মদেশ তখনও জলমগ্ন ছিল।

তাহার পর যে তৃতীয় (Tertiary বা Cainozoic) যুগে মনুষ্যের জন্ম, সে যুগেও সিন্ধু এবং গঙ্গাধৌত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠে নাই। ঐ উর্ব্বর ক্ষেত্র মানবের লীলাভূমির উপযোগী হইতে তাহার পর বড় অধিক দিন লাগে নাই, হয়ত বা আর অতিরিক্ত দশ পনর হাজার বৎসর লাগিয়াছিল। সংক্ষেপতঃ প্রাচীন সময়ের যে ভূমি-সংস্থানের কথা বলিলাম, উহার সহিত ভারতবাসীদিগের ইতিহাসের কি সম্পর্ক আছে, তাহা দেখাইতেছি।

২। নরসংস্থান।

যে তৃতীয় যুগের মধ্যভাগে মানবের জন্ম, সেই যুগ বা সেই সময় প্রায় পনর লক্ষ বৎসর হইল অতীত হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের শরীর এই পনর লক্ষ বৎসরের ক্রমবিকাশের ফল। প্রত্যেক মানবের শরীর যখন পনর লক্ষ বৎসরের আবর্ত্তনে বর্ত্তমান যুগের পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, তখন চেহারা দেখিয়া মানুষকে যত অল্পবয়স্ক বলিয়া মনে হয়, সে তত অল্পবয়স্ক নহে। সেই সুদূর অতীত মানবের আদি পুরুষ বা আদি "মনু" কোন্ পুণ্যতীর্থ বা ধর্ম্মক্ষেত্রে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি।

ভূস্তরের নরকঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া এবং মনুষ্যের জন্মযুগের জলস্থল-সন্নিবেশের অবস্থা আলোচনা করিয়া নরতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে আফ্রিকা এবং এসিয়ার দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি মনুষ্যের আদি জন্মাস্পদ বা জন্মভূমি হইতে পারে না। অভাবপক্ষের প্রমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে হিমালয়ের উত্তরভাগে কিম্বা হিমালয় হইতে উত্তর আফ্রিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখার উত্তরভাগে তৃতীয় যুগের মধ্য সময়ে কুত্রাপি মনুষ্যের "অরিষ্টশয্যা" স্থাপিত হইতে পারে নাই।

সুপ্রসিদ্ধ ডারউইন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অতি তীক্ষ্ণ বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন যে আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগে মানবের প্রথম জন্ম সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। তিনি দেখিয়াছিলেন যে অন্যত্র মানুষের প্রথম জন্ম স্বীকার করা চলে না; কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার অতি অল্প পরিসর ভূভাগে মনুষ্যের অতিশৈশব যুগের পরিবর্দ্ধন সম্ভবপর ছিল না। তিনি যদি তখন জানিতেন যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগের সহিত সংযুক্ত একটি অতি বিস্তৃত মহাদেশ আফ্রিকার দক্ষিণ সীমা হইতে মালেশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মালেশিয়া হইতে উহার বিস্তার অন্যদিকে আবার অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত ছিল, তাহা হইলে আদি পুরুষের জন্মপূত ক্ষেত্রটির পরিচয় লাভ করিতে তাঁহার বিলম্ব হইত না। উল্লিখিত মহাদেশটি যে মানবের আদি জন্মভূমি, এ কথা স্বীকার করিবার অনুকূলে অনেক যুক্তি আছে। বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অবতারণা সুবিধাজনক নয় বলিয়া একটি সহজবোধ্য যুক্তির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

বৈবস্বত মনুর জন্মের বহু যুগ পূর্ব্বে যখন আদি লোক-প্রতিষ্ঠাতা "কৈষ্কিন্ধ মনু" হইতে মানববংশ বিস্তার-লাভ করিয়াছিল, তখন ফলভোজী মানবদিগের এক এক জনের জন্য অনেক ভূভাগের প্রয়োজন হইয়াছিল। কাজেই মানুষের দল যখন বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তখন আহারের স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য মনুজেরা দলে দলে আদি নিবাস ত্যাগ করিয়া দূরে দূরে চলিয়া গিয়াছিল। যাহারা দূরে দূরে চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা নবরাজ্যে অধিকতর খাদ্যলাভ করিয়া অধিক-তর উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছিল। যাহারা প্রাচীন গৃহে বা জন্মভূমিতে পড়িয়া ছিল, তাহারা নিশ্চয়ই তেমন উন্নতি-লাভ করিতে পারে নাই। স্বভাবতঃ কেহই ধ্রুব পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুবকে আশ্রয় করে না। এইজন্য মানুষ চিরদিনই একটু রক্ষণশীল। একটু ঠেসাঠেসি করিয়াও অনেক লোক অবশ্য আদি ভূমিতে বাস করিতেছিল। এইরূপ বাসের ফলে যে আদিম গৃহবাসী দলেরা শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি তেমন লাভ করিতে পারে নাই, তাহা মনে করা যাইতে পারে।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে একদিন ভারতসাগরে যে মহাদেশ বিস্তৃত ছিল, সেইখানেই মানুষের আদি জন্ম, তাহা হইলে আমাদের জানা ঘটনার সহিত সকল কথা মিলাইয়া লইতে পারা যায় কি না, দেখিয়া লওয়া যাক্। আমরা যে মহাদেশের কথা উল্লেখ করিলাম,

তাহা এখন সাগবগর্ভে লুপ্ত; কেবল আফ্রিকার প্রান্ত হইতে মালেশিয়া পর্য্যন্ত সে মহাদেশের নিদর্শন স্বরূপে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়া রহিয়াছে মাত্র। ঐ দ্বীপগুলির উপর যেসকল আদিম মনুষ্য বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই প্রায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোদিগের সদৃশ। কেবল শারীরিক আকৃতিতে নয়, উহাদের অনেক শ্রেণীতে পরস্পরেব মধ্যে ভাষা বিষয়েও অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

দ্বীপগুলি দূরে দূরে, এবং তাহাদিগের মধ্যে অগাধ দুস্তর সাগর বহুকাল হইতে রহিয়াছে। তবুও কেমন করিয়া এই আপাতদৃষ্টিতে নিঃসম্পর্কিত জাতিসমূহের মধ্যে আকৃতিগত এবং ভাষাগত সদৃশতা রহিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। এক সময়ে যদি উহারা একটি সুসংযুক্ত ভূভাগে বাস কবিতে পারিত, তাহা হইলেই এই-সকল সাদৃশ্য শবীরে ও মনে বদ্ধমূল হইতে পাবিত। যখন ভূপ্রলয়ে মহাদেশটি ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, তখন নিশ্চয়ই অনেক নিগ্রো বা নিগ্রোবৎ অধিবাসীবা ছুটিয়া পলাইয়া উত্তবভাগেব অন্যান্য দেশে চলিয়া গিয়াছিল এবং অনেকে প্রাচীন গৃহেই রহিয়া গিয়াছিল। এই কারণেই দুর্লঙ্ঘ্য সাগবের মধ্যে দূরে দূবে সুসদৃশ জাতিগণেব বাস সম্ভব হইয়াছে।

যাহারা পলাইয়া নিকটস্থ দেশে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহারাও যে ঐ নিগ্রোদিগেব অনুরূপ ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। সে প্রমাণ বিষয়েও একটি সহজ কথা কেবল বলিব। ভারতবর্ষের কোল জাতীয় লোকেরা অন্যান্য জাতির সম্পর্কে আসিয়া অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে; কিন্তু এখনও কোন কোন বিষয়ে উহারা নিগ্রোদিগের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে করা যায়। ভাষাতত্ত্ববিদেরা ধরিয়া ফেলিয়াছেন যে কোলদিগের ভাষা অনেক মৌলিক বিষয়ে অতি নিঃসম্পর্কিত এবং অপরিচিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের ভাষার সহিত এবং ভাবতসাগরের দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদিগেব ভাষার সহিত মিলিয়া যায়। এইসকল মিল দেখিয়া নিশ্চয়ই পাঠকেবা একথা বিশ্বাস করিতে অগ্রসর হইবেন যে সুবিস্তীর্ণ মহাদেশ একদিন ভারতসাগরে অবস্থিত ছিল এবং সেখানে আদিম মনুষ্য প্রথমে বিকাশলাভ করিয়াছিল। যব দ্বীপে অতি প্রাচীন যুগের নরকঙ্কালের যে অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রাথমিক মনুষ্যের কঙ্কাল বলিয়াও নির্ণীত হইয়াছে।

এই স্থলে কোন কোন পাঠক একটু তর্ক তুলিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, হাঁ বুঝিলাম যে একটা বিস্তীর্ণ মহাদেশের উপর নিগ্রোজাতীয়দিগের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ভূবিপ্লবে তাহারা এখন দূরে দূরে বিভিন্ন দ্বীপে বাস করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দল ভারতবর্ষ প্রভৃতি অন্য দেশেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু কথা এই, যে, যাহাবা এক সময়ে ভারতসাগবস্থিত মহাদেশে জন্মলাভ করিয়াছিল, এবং এখনও তাহাদের শরীরে বিকাশের আদিম যুগের চিহ্নই বহন করিতেছে, অন্য দেশের লোকদিগের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক হয় ত নাও থাকিতে পারে। অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে পারেন যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে (কেহ বা আফ্রিকার দক্ষিণে, কেহ বা ভারতে) স্বতন্ত্র ভাবে মানুষের সৃষ্টি যে হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরেও কেবল একটি ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করা যাইতে পারে। মানুষ মাত্রেই যে এক জাতি বা গোষ্ঠী (species) অর্থাৎ একই আদিম মনুষ্য শরীব হইতে যে সকল মনুষ্যের উৎপত্তি, তাহার এই প্রমাণটি অতিশয় প্রবল যে, যে-কোন দেশের মানুষেব সহিত যে-কোন দেশের মানুষেব বৈবাহিক সম্পর্ক হইলেই সন্তান উৎপন্ন হইবে এবং ঐ সন্তানগণ আপনাদের নিজের মধ্যে হউক অথবা অন্য জাতীয় লোকের সহিত হউক, যদি বৈবাহিক সম্বন্ধ করে, তবে তাহাদের বংশবৃদ্ধিতে কিছুমাত্র বাধা উপস্থিত হইবে না। কোন জীব যদি এক বর্গেব (genus) অন্তর্ভুক্ত হয়, অথচ জাতি বা species হিসাবে বিভিন্ন হয়, তবে প্রথমতঃ তাহাদের বৈবাহিক মিলনে সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না। একটি species বা জাতি যদি অন্য species বা জাতির সহিত অত্যন্ত নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়, তাহা হইলেও তাহাদের পরস্পরের সংযোগে যে সন্তান জন্মিবে, সে সন্তান জীব-উৎপাদক-শক্তি-বিরহিত হয়। সমগ্র মনুষ্যজাতির মৌলিক একতা স্বীকৃত হইলে নিগ্রোজাতীয় লোকদিগের

সহিত আমাদের মৌলিক একতা স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা হইলে ঐ শেষোক্ত জাতির বিকাশভূমিকে আমাদের আদি পিতৃ-লোক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

মনুষ্য তাহার প্রথম উৎপত্তির যুগে অনায়াসে স্থলপথে ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছিল; একথা ভূসংস্থানের বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহারা সমগ্র দক্ষিণভারতে পরিব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছিল এবং উত্তর-পূর্ব্ব দিকেও ছোটনাগপুর এবং রাজমহল পাহাড়ের পথ দিয়া আসামের কিয়দংশ ভূভাগে খাসিয়া পাহাড় পর্য্যন্ত অধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ যখন নব মৃত্তিকাপূর্ণ উর্ব্বর ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তখন যে-ভাগ্যবানেরা ঐ অংশ অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া সহজে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ সমুদ্রের নামে নামাঙ্কিত সিন্ধুনদ তখন প্রায় সমুদ্রের মতই দুস্তর ছিল এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের শৈলরাজি অনুত্তীর্য্য প্রাকার রচনা করিয়া ছিল।

এসকল কথা আলোচনার পর বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে যেসকল লোক মনুষ্যের প্রথম পরিভ্রমণের যুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহাদের কি হইল এবং তাহারা কোথায় গেল? একালের আর্য্যসন্তান এবং দ্রবিড় জাতীয়েরা সেই আদিমকালের লোকদিগের সহিত সম্পর্কিত কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি যে মনুষ্যের আদিম পিতৃলোক এখন অধিক পরিমাণে সাগরগর্ভে নিমজ্জিত। পিতৃকুলের সাগরনিমজ্জিত অস্থির উপর ভারতের গঙ্গাপ্রবাহ এখনও তর্পণবারি ঢালিতেছে। আমরাও পিতৃলোকের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভারতের প্রাচীন জাতিতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

৩। ভারতে মানব-প্রসার।

মানবের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছি। যাঁহারা ঐ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কোন বিচার না করিয়াই উহাকে একেবারে কল্পনার খেলা বলিতে চাহেন, তাঁহারা যদি ঐ উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে চাহেন, করুন; কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। মনুষ্যের উৎপত্তি বা জন্ম যেখানেই হউক না কেন, বহু প্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতবর্ষ মানুষের আবাসভূমি হইয়া আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। সহজেই সে কথা প্রমাণ করিতেছি।

অন্ততঃ পক্ষে সাত লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের (Pliocene) যুগে যে ভূস্তর রচিত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক স্থানে নরকঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ঠিক্ ঐ যুগের ভূস্তরে ভারতবর্ষে নরকঙ্কাল রক্ষিত আছে কি না, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু যে যুগে মনুষ্য প্রায় সকল দেশেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল (Quaternary যুগ), সেই চতুর্থ বা নূতন যুগের ভূস্তরে ভারতবর্ষে নরকঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এ যুগ প্রায় ছয় লক্ষ বৎসর হইল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, যে, এই সময়ে দক্ষিণ ভারত বা ভারত উপদ্বীপ এসিয়ার অন্য অংশ হইতে সমুদ্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিল; এবং তখন দক্ষিণ ভারতের সহিত একদিকে মাদাগাস্কর এবং অন্যদিকে মলয়দ্বীপ-পুঞ্জ সম্পূর্ণ যুক্ত ছিল। এই নূতন যুগের প্রস্তর-অস্ত্রধারী মনুষ্য (Palæolithic man) যখন ভারত-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল, তখনও ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের সহিত তাহাদের যত সম্পর্ক ছিল, উত্তর ভারতের সকল স্থানের সহিত তেমন ছিল না। তখন যে হিমালয়ের উত্তরে বা উত্তর-পশ্চিমে ভারতবর্ষ হইতে গতি-বিধি অসম্ভব ছিল, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত।

যে ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতার নিদর্শন বেদগ্রন্থে কিয়ৎপরিমাণে পাইয়া থাকি, ভারতে ঐ যুগের উৎপত্তি চারি পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে নহে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। মিসর দেশে এই ঐতিহাসিক যুগ প্রায় দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও ঐ ঐতিহাসিক যুগ যদি দশহাজার বৎসর বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তবে প্রাচীনতার অতি পক্ষপাতী লোকদিগেরও কিছু বলিবার থাকিবে না।

তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছি যে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ মানবের সভ্যতা লাভ করিবার বহুকাল পূর্ব্বে, ভারতবর্ষে মনুষ্যের বাস ছিল। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, সুদূর অতীতে যেসকল বর্ব্বর মনুষ্য ভারতক্ষেত্রে বিচরণ করিত, এবং যাহারা প্রস্তরের অস্ত্র-শস্ত্রে আত্মরক্ষা করিয়া পর্ব্বত-গুহায় বাস করিত, আমাদের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক আছে কি না?

ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর একটি ষাটহাজার-বৎসর-ব্যাপী মানবসভ্যতার যুগ কল্পিত হয়। এই যুগের একভাগে মনুষ্য জাতি প্রস্তরের অস্ত্র ঘষিয়া মাজিয়া উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। অল্পকাল পরেই নবপ্রস্তরযুগের মনুষ্য (neolithic man) সুখসুবিধার নানা উপায় আবিষ্কার করিয়াছিল। ভারতবর্ষের এই যুগের লোক যে তৎপূর্ব্ব যুগের লোকের বংশধর, তাহাতে সন্দেহ হইবে না। মানুষ এই যুগে বাগান করিয়া গাছ লাগাইয়া ফল খাইতে শিখিয়াছিল, কৃষিকার্য্য শিখিয়াছিল, কাপড় বুনিতে পারিত, অনেক খনিজ ধাতু ব্যবহার করিতে পারিত এবং চাকায় ঘুরাইয়া অনেক মাটির পাত্র প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। এই যুগের সভ্যতার নিদর্শন উত্তর ভারতের নাগা এবং খাসিয়া পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গানদীধৌত প্রদেশে পর্য্যন্ত অনেক পাওয়া যায়। খাঁটি বঙ্গদেশে উহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, এবং পঞ্জাবেও এ পর্য্যন্ত কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে দক্ষিণ ভারতের শেষ পর্য্যন্ত অনেকস্থানে এই যুগের মানব-কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু সে কীর্ত্তি উত্তর ভারতের কীর্ত্তি হইতে অনেক ভিন্ন। উহার কয়েকটি পরিচয় দিতেছি।

প্রথমতঃ, প্রাচীন প্রস্তরযুগের ইতিহাসের কথা বলিতেছি। ঐ অতি প্রাচীন যুগের মনুষ্যের কীর্ত্তি-চিহ্ন উত্তর ভারতে তেমন অধিক পাওয়া যায় নাই। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ইহার বাহুল্য অতি অধিক। মান্দ্রাজের শেষ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্ধ্য প্রদেশে পর্য্যন্ত ঐ সময়ের চিহ্ন অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত Le Mesurier (ল্যা মেসিরিয়ে) ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ঐ চিহ্ন আবিষ্কার করেন। তাহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত Bruce Foote (ব্রুস ফুট), Medlicott (মেড্লিকট্) প্রভৃতি নর্ম্মদাকূল হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত ভূভাগ হইতে অনেক প্রস্তররচিত অস্ত্র, প্রাচীন গৃহ-সজ্জার উপকরণ প্রভৃতি বাহির করিয়াছেন। মান্দ্রাজ সহরের অনতিদূরস্থ পল্লাবরম্ নামক স্থানে এবং চিঙ্গলপট, নেলোর ও দক্ষিণ আর্কটে পোড়ামাটি এবং পাথরের প্রস্তুত এক প্রকার শব-শয্যা পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ উহা নবপ্রস্তরযুগের জিনিস। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, ঠিক ঐ প্রকারের শব-শয্যা এখনও পল্লাবরম্ প্রভৃতি স্থানে রমণীদিগের সমাধির জন্য অনেক দ্রবিড়-জাতীয়েরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা হইতেই কি সূচিত হয় না, যে, দক্ষিণ ভারতের একালের দ্রবিড়জাতীয়েরা অতি প্রাচীনকালের অধিবাসীদিগেরই বংশধর? শ্রীযুক্ত Rea (রী) সাহেব তিনেভেলি জেলার যেসকল প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন, এখনও সেগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। মৃতদেহ এক প্রকার সরুগলাবিশিষ্ট মৃৎপাত্রে পূরিয়া সমাধিস্থ করা হইত। ঐ প্রকারের শব-শয্যা উত্তর ভারতে কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

উত্তর ভারতে সুপ্রাচীন প্রস্তরযুগের কীর্ত্তি বড় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু নবপ্রস্তরযুগ এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক মানব-কীর্ত্তি আসামের পূর্ব্বভাগ হইতে গাঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এই কথাটি পাঠকদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। শবের অগ্নিদাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে উত্তর ভারতে যে-প্রকার সমাধির ব্যবস্থা ছিল, তাহার একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মির্জাপুর সহরের অনতিদূরে নবপ্রস্তরযুগের যে সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক অবস্থা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ প্রস্তরসমাধিটি ১২ ফুট দীর্ঘ এবং উহার মধ্যস্থিত পূর্ণাবয়ব পুরুষের কঙ্কালটি এত দীর্ঘ যে উহা কোন খর্ব্বাকৃতি জাতির মনুষ্যের কঙ্কাল হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এখন অন্তর্জলি করিবার সময়ে কোন পুরুষকে যে ভাবে উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করায়, সমাধির মধ্যে ঐ কঙ্কালটি সেইরূপ উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া শায়িত ছিল। মৃত ব্যক্তির নিকটে

শ্মশানে যেমন কলসী দিবার প্রথা প্রচলিত আছে, কঙ্কালটির নিকট তেমনি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কলসী পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মৃৎপাত্রটি হাতে-গড়া নহে,—কুমারের চাকায় প্রস্তুত; এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে ঘষামাজা। ঐ কঙ্কালটির নিকটে একটি অতি ক্ষুদ্র সুন্দর মৃৎপাত্রে একটি ॰ ইঞ্চি দীর্ঘ সবুজবর্ণের কাচের পাত্র পাওয়া গিয়াছে। ঐ অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে কাচের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে জানা যায়। মিসর এবং বাবিলোন ভিন্ন অন্য কোথাও ঐ প্রাচীন সময়ে কাচের ব্যবহার ছিল না বলিয়াই লোকে বলিত; কিন্তু এখন আর তাহা বলিতে পারিবে না। এখনও ভূস্তরের কঙ্কালগুলি এমন ভাবে পরীক্ষিত হয় নাই, যাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, যাঁহারা প্রাগৈতিহাসিক যুগে এবং তাহার পূর্ব্বে ধীরে ধীরে সভ্যতা লাভ করিতেছিলেন, ঐতিহাসিক যুগের আর্য্যেরা তাঁহাদেরই বংশধর। উল্লিখিত প্রমাণগুলির সহিত অন্যান্য প্রমাণ মিলাইলে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে, তাহা পরে বিচার করিয়া দেখিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ইংলণ্ডে সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ইংলণ্ডের সাহিত্যে যখন প্রথম অরুণোদয় হইয়াছিল, তখন সেই আলো-অন্ধকারের সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়া কবিদের চক্ষে এক নূতন জগতের স্বপ্ন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যেমন শেলি। ব্রাউনিংয়ের ভাষায় বলিতে গেলে তাঁহার সমস্ত কাব্যালোকটি "lies quivering in light as something lieth half of life before God's foot", ঈশ্বরের চরণসমীপে অর্দ্ধজীবনপ্রাপ্ত কোন বস্তু যেমন আলোকে কাঁপিতে থাকে, তেমনি করিয়া এক ভাবী জগৎসৃজনের নূতন আশার আবেগে এবং বেদনায় কম্পিত হইয়াছিল। সেই একই মাহেন্দ্রক্ষণে আবার ওয়ার্ডস্বার্থের ন্যায় কোনো কবির কাছে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির উপরকার পর্দ্দা উন্মোচিত হইয়া গেল এবং তিনি চাহিয়া দেখিলেন "into the life of things" সেই প্রাণস্বেষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাকে, যিনি বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ—যিনি বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন। সেই অরুণোদয়ে আশা-আনন্দের কোনো পরিমাণ রহিল না; সমস্তই অত্যন্ত উদার অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া দেখা দিল।

তারপরে ভিক্টোরিয়ার যুগে টেনিসন্ ব্রাউনিংএর সময়ে আমরা একেবারে মধ্যাহ্নের জনতার ভিড়ের মধ্যে, প্রবৃত্তি-ফেনায়িত বিচিত্র জীবনের তরঙ্গান্দোলনের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তখন স্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে, বাস্তবের সঙ্গে তখন মুখোমুখি পরিচয়। বিজ্ঞান প্রত্যহই বিশ্বপ্রকৃতির নূতন নূতন রহস্যের বার্ত্তা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সমস্ত মনুষ্যজাতির ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে। রাষ্ট্রে সমাজে কত পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে হাটের কলরবের মাঝখানে আমরা মানুষের বিচিত্ররূপ দেখিলাম—দূরদেশে, দূরকালে ব্যাপ্ত করিয়া তাহার সমস্ত মহত্ত্ব-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, তাহার কল্পনার গুহাগতি, তাহার প্রেমের নিবিড় অতলতা প্রত্যক্ষ করিলাম।

তারপর, দিন অবসান হইল। বাস্তবেই বাস্তবের পরিসমাপ্তি এ কথা আর সত্য রহিল না। যে মধ্যাহ্নের প্রখর দিবালোক আর কখনও ম্লান হইবে না মনে হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তাহার উপর সন্ধ্যার ঘোর নিবিড় হইয়া আসিল। হঠাৎ বিজ্ঞান দেখিল যে অণুর রহস্যের দিক্ দিয়াও শেষ নাই আবার জীবজগতের সারভূত মস্তিষ্কের জীবকোষের রহস্যেরও কোথাও শেষ নাই। অসীম রহস্য! জড়ে জীবে যে কল্পিত ব্যবধান ছিল তাহাও বুঝি ভাঙে ভাঙে! তত্ত্বজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিল, যে, তত্ত্ব মানে তো স্থিতির কথা,—কিছু আছে ইহা বলা—কিন্তু জীবন যে ক্রমাগতই চলিয়াছে—সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কোনো তত্ত্বই শেষ কথা হইতে পারে না। দ্বৈত, অদ্বৈত, ওসবই স্থিতির কথা। অনন্ত স্থিতি এবং অনন্ত গতি ইহারি একটি সামঞ্জস্যের জায়গা হইতেছে চেতনাময় জীবন। এমনি করিয়া বাস্তবের সমস্ত রূপ, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার রহস্যের ঘোরে অত্যন্ত ঘোরালো হইয়া দেখা দিল।



কবি উইলিয়ম বাট্‌লার য়ীটস্।

এখন তবে কিসের কথা কবিতা গাহিবে? এখন যে রহস্যের হাওয়া দিয়াছে। এখন সুদূরের কথা, গভীরের কথা, অনন্ত আকাশের নক্ষত্রসভার নিবিড় নিস্তব্ধতার কথা। অনেকের কথা নয়, একের কথা; বিচিত্রের কথা নয়, পূর্ণের কথা; সীমার কথা নয়, অসীমের কথা। ইউরোপীয় ভাবুকেরা সেই কথা বলিবার জন্য আঁকুপাঁকু করিতেছেন;—কিন্তু হায়, ধূম যতটা তৈরি হইতেছে, অগ্নিশিখা ততটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইতেছে না; রহস্যের ঘোর যতটা জমিয়া উঠিতেছে, নিশ্চয়তার প্রত্যয় ততটা জাগিতে পারিতেছে না। মেটরলিঙ্ক প্রভৃতি আধুনিকদের লেখা পড়িলে এক মুহূর্ত্তেই তাহা বুঝা যায়।

কবি য়ীটস্ (Yeats) ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের এই সন্ধ্যাকালের ঘোরের কবি। তাঁহার মধ্যে এই অনিশ্চয়তার ব্যাকুলতা আছে। অবশ্য তাঁহার সৌন্দর্য্যের অনুভাব খুব গভীর। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে তাঁর সব কবিতা "বহুদূরে পাখা মেলিয়া"—

They come where your sad, sad heart is,
And sing to you in the night,
Beyond where the waters are moving
Storm-darkened or starry bright.

যেখানে তোমার দুঃখময় বেদনাময় অন্তরটি আছে সেইখানে আসিয়া রজনীতে তোমার কাছে গান গায়, যেখানে জলধারা ঝড়ের অন্ধকারে বা তারকার দীপ্তির তলে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে—তাহারি পরপারে! তিনি আপনাকে 'pilgrim soul' অর্থাৎ পথিক আত্মা বলিয়াছেন—এবং সেই পথযাত্রার নানা রহস্যের গান গাহিয়াছেন।

ফরাসী বিপ্লব হইতে আজ পর্য্যন্ত, সেই প্রথম অরুণাভাস হইতে এই সায়াহ্নের বিষাদমলিন ঘোর পর্য্যন্ত, যে আরম্ভ, মধ্য এবং পরিণামের এক আশ্চর্য্য লীলা দেখা গেল,—কবি রবীন্দ্রনাথ এক জীবনের মধ্যে সেইসকল অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া, সেই বিচ্ছিন্ন-কালের বিভিন্ন সকল লীলাকে এক অখণ্ড জীবনচক্রের মধ্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন দেখিতে পাই। এই পূর্ণ যুগচক্রের সঙ্গে তাঁহার পূর্ণ কবিজীবন-চক্রের কি বিচ্ছেদহীন মিলন! তাঁহার মধ্যে 'Alastor'এর 'তারকার আত্মহত্যা' ছিল, 'Shadow-vested-misery'র ছায়াবগুণ্ঠিত বিষাদের সন্ধ্যাসঙ্গীত ছিল, অনন্ত সৌন্দর্য্যের 'প্রতিধ্বনি'র বেদনাময় সুর ছিল; আবার তাঁহারি মধ্যে 'প্রভাতউৎসব' জাগিয়াছিল, সমস্ত জগতের অন্তরের অন্তরে যে অফুরান রসের ও সৌন্দর্য্যের উৎস নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, সেইখানকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সম্বাদ ছিল;—এসমস্তই যেন সেই ইংরাজী সাহিত্যের অরুণোদয়ের গান। তারপর "সোনার তরী" "চিত্রা"র যুগে গল্পে ও কবিতায় সেই ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যাহ্নের বাস্তবানুভূতি জাগিল। 'Palace of Art' বা দেউল' ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিবার কথা, 'পরশপাথরে'র সন্ন্যাসীরও 'আকাশের চাঁদে'র প্রার্থীর হতাশ্বাসের কথা আমরা পাইলাম,—Idylls রচিত হইল গদ্য গল্পে এবং 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'পুরস্কার' প্রভৃতি কাব্যে; বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি সিদ্ধান্তকে ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে এক করিয়া লইবার, বিশ্বের বিচিত্র প্রাণধারাকে নিজের চেতনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিবার, —সমস্ত প্রাণকে এক প্রাণ ও সমস্ত চৈতন্যকে এক অখণ্ড চৈতন্যরূপে উপলব্ধি করিবার বার্ত্তা শুনিলাম,—"বসুন্ধরায়" 'জীবন-দেবতা' ও 'মৃত্যু'র উপরে সকল কবিতায়

—"স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে";—এবং "প্রেমের অভিষেক" 'one word more'-এর কথাও—ব্রাউনিংয়ের সকল কবিতার সার কথাও—ফুটিয়া উঠিল। তারপর বৈকালের গলিয়া-পড়া রৌদ্রের মাধুর্য্য 'চৈতালী'র পাকা শস্তের উপর যখন নামিল—তখন হইতেই ভোগবিরতির সুর। 'ক্ষণিকায়' 'কল্পনায়' সেই সুরের পূর্ণবিকাশ। এ সুর ইউরোপীয় কবির নাই। এ ঘোর নয়, আবেশ নয়—কিন্তু পরম শান্তি, নিবিড়তম উপভোগ। 'ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন ঝলমল প্রাণ' যাপন করিবার কথা! তারপরে নৈবেদ্য খেয়া-গীতাঞ্জলিতে একেবারে পরিপূর্ণতম গভীরতম রাগিণী—যে রাগিণী এখন ইউরোপীয় কবিসমাজকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।—সে সীমার মধ্যে অসীমের রাগিণী, অরূপকে অনির্ব্বচনীয়কে রূপের মধ্যে গানের মধ্যে ধরিবার ব্যাকুলতার রাগিণী।—

সংবাদপত্রের পাঠকেরা অবগত আছেন যে ইংলণ্ডের সাহিত্যসমাজ এই বঙ্গীয় কবিকে গত ১২ই জুলাই এক সান্ধ্য নিমন্ত্রণে কিরূপে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিয়াছিলেন। সেই সান্ধ্যসভায় ইংলণ্ডের প্রায় সকল বড় বড় সাহিত্যিক এবং সুধীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কবি য়্যেট্‌স্ ছিলেন সভাপতি। এচ্, জি, ওয়েল্‌স্ উপস্থিত ছিলেন,—তিনি সোস্যালিষ্ট এবং ঔপন্যাসিক বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক 'A Modern Utopia' সাহিত্যসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। মিস্ মে, সিন্‌ক্লেয়ার ছিলেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী। নেভিন্‌সন্, হ্যাভেল, রদেনষ্টাইন তো সুপরিচিত নাম। রলেস্‌টন্ ছিলেন, তিনিও একজন বড় কবি। একটা বিরাট্ জনতাময় সভা না করিয়া ইণ্ডিয়া সোসাইটি যে এই বাছা বাছা লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কবিসম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহারা তাঁহাদের সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন এবং অনুষ্ঠানটিকেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। যে বৈঠক উপযুক্ত সমজদারের দ্বারা পূর্ণ হয়, সেখানে যে উৎসবটি জমিয়া উঠে, হৃদয়ের ভাব-উৎস যেমন সহজে খুলিয়া যায়, এমন কেবল বাজে লোকের দলবৃদ্ধির দ্বারা হয় না। স্বভাবত উত্তেজনাপ্রিয় ইংলণ্ডবাসী



চিত্রশিল্পী উইলিয়ম রদেনষ্টাইন।

আপনা হইতে যে এরূপ চিত্তবিভ্রান্তকারী বারোয়ারি সৃষ্টি না করিয়া একটি রসিকজনসম্মিলনের মনোহর মধুচক্র রচিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।

কবি য়্যেট্‌সের সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি এদেশের অধিকাংশ কাগজেই প্রকাশিত হয় নাই। তিনি সেদিন কবিকে যে স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই নিকট অতিবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা য়্যেট্‌সের কাব্যের সহিত পরিচিত, তাঁহার 'Pilgrim Soul'-এর পথিক আত্মার 'Sorrows of changing face' ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল মুখের সকল বেদনা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন—সর্ব্বোপরি যাঁহারা আধুনিক সাহিত্যের রহস্যঘোরের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া জানিয়াছেন কি ব্যাকুলতা এখন ইউরোপীয় চিত্তে প্রকাশের জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে—তাঁহারা য়্যেট্‌সের স্তুতিবাদকে কখনই অতিশয়োক্তি বলিবেন না। তবে যাঁহারা দুনিয়ার কোনো খবরই রাখেন না—এবং

আপনার ব্যঙ্গপ্রিয় প্রকৃতির চাপল্য ও লঘুতার দ্বারাই সকল গভীর জিনিষের অন্তরে প্রবেশ করিবার স্পর্দ্ধা ও দুরাকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করেন, তাঁহারা এরূপ প্রশংসাকে যে অতিশয়োক্তি বলিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি! যাহা হউক য়ীট্‌সের সমস্ত কথাগুলি এখানকার প্রায় কাগজে বাহির হয় নাই বলিয়া আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম:

"একজন শিল্পীর জীবনে সেইদিন সকলের চেয়ে বড় ঘটনার দিন, যেদিন তিনি এমন একজন প্রতিভার রচনা আবিষ্কার করেন, যাহার অস্তিত্ব তিনি পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না। আমার কাব্যজীবনে আজ এই একটি মহৎ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে যে অদ্য আমি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিবার ভার পাইয়াছি। গত দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার লিখিত প্রায় ১০০টি গীতি-কবিতার গদ্যানুবাদের একটি খাতা আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ফিরিতেছি। আমার সমসাময়িক এমন কোনো ব্যক্তিকে আমি জানি না, যিনি এমন কোনো রচনা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন--এই কবিতাগুলির সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। এই অবিকৃত গদ্যানুবাদগুলি পাঠে আমি দেখিতে পাইতেছি, যে, কি রচনারীতিতে, কি চিন্তায়, ইহারা অতুলনীয়। বহুশত বৎসর পূর্ব্বে একদা ইউরোপে এই রচনারীতি পরিচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ একজন বড় গীতরচয়িতা—তাঁহার কবিতাতে তিনি সুর বসাইয়া থাকেন এবং তারপর তিনি সেই কবিতা ও গান কাহাকেও শিক্ষা দেন্। এবং এইরূপে মুখে মুখে সেই গান তাঁহার দেশবাসী কর্তৃক গীত হইয়া চলিতে থাকে—যেমন তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপে কবিতা গীত হইত। ইহার সকল কবিতার একটিমাত্র বিষয়—ঈশ্বরের প্রেম। আমি যখন ভাবিয়া দেখিলাম, যে, আমাদের পশ্চিম দেশে এমন কি গ্রন্থ আছে যাহার সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে, তখন আমার মনে পড়িল টমাস্ এ, কেম্পিসের "খৃষ্টের অনুকরণের" কথা। ইহারা সদৃশ বটে- কিন্তু এই দুই ব্যক্তির রচনায় কি আকাশপাতাল প্রভেদ! পাপের চিন্তার দ্বারা টমাস্ এ, কেম্পিস্ কিরূপ গুরুতররূপে অধিকৃত—কি ভীষণ উপমার সাহায্যে তিনি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যে শিশু লাটিম লইয়া খেলা করিতেছে সে যেমন পাপের চিন্তা জানে না—ঠিক্ তেমনি এই কবিও পাপ সম্বন্ধে কিছু-মাত্র চিন্তা ব্যয় করেন নাই। টমাস্ এ, কেম্পিসের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি প্রেমের কোনো স্থান নাই, তাঁহার কঠোর চিত্তের মধ্যে সেরূপ প্রেম প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রেমিক—তাঁহার কবিতার মধ্যে প্রকৃতির অনেক সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মরেখাপাত হইয়াছে, যাহা তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও গভীর প্রেমেরই পরিচায়ক।"

য়ীট্‌স্ ইহার পর কবির অনুবাদিত তিনটি কবিতার গদ্যানুবাদ পাঠ করেন। তাহার মধ্যে একটি কবিতা নৈবেদ্যের। 'জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যেক্ষণে' এবং 'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর'—মৃত্যুর উপরে এই দুইটি কবিতাকে ভাঙিয়া ইংরাজী অনুবাদে একটি করিয়া লওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়টি গীতাঞ্জলির একটি গান—"শ্রাবণঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে!" য়ীট্‌সের পরে দু একজন কিছু বলিবার পরে কবি স্বয়ং সেই সভায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়, রহস্যপ্রিয়তা এবং দূরদর্শিতা সমস্তই একাধারে ফুটিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতাটিরও বঙ্গানুবাদ নিম্নে দিলাম:—

"আজ এই সন্ধ্যায় আপনারা আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করিলেন, আমার ভয় হয়, যে ভাষার মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই সে ভাষায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার নাই। আশা করি আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন--আপনাদের এই গৌরবান্বিত ভাষায় যদিও আমার সামান্য জ্ঞান আছে--তথাপি আমি কেবল আমার নিজের ভাষাতেই (ভাবিতে পারি) এবং অনুভব করিতে পারি। আমার বাংলা ভাষা অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণা গৃহিণীর ন্যায় বরাবর আমার সমস্ত সেবা দাবী করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁর রাজ্যে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের অনধিকারপ্রবেশকে তিনি প্রশ্রয়মাত্র দেন নাই। সেই জন্য আমি কেবলমাত্র আপনাদিগকে এইটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে এদেশে আসা অবধি যে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি দ্বারা আপনারা আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমাকে এত মুগ্ধ

করিয়াছে যে আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিনা। আমি একটি শিক্ষালাভ করিয়াছি—এবং সহস্র মাইল পথ সেই শিক্ষা লাভের জন্য আমার আসা সার্থক—যে যদিও আমাদের ভাষা, আমাদের আচার ব্যবহার সমস্তই পৃথক্ তথাপি ভিতরে ভিতরে আমাদের হৃদয় এক! নীলনদীর তীরে যে বর্ষার মেঘ উৎপন্ন হয় সে যেমন সুদূর গঙ্গার উপত্যকাকে শস্যশ্যামল করিয়া দেয়, তেমনি পূর্ব্বাকাশের সূর্য্যালোকের অনিমেষ দৃষ্টির নিম্নে যে আইডিয়া আকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে হয়ত সমুদ্রপার হইয়া পশ্চিমে আসিতে হইবে—সেখানকার মনুষ্যহৃদয়ের মধ্যে তাহার সম্ভাষণ লাভের জন্য, সেখানকার সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য। প্রাচী প্রাচীই এবং প্রতীচীও প্রতীচী সন্দেহ নাই এবং ঈশ্বর না করুন যে ইহার অন্যথা হয়—তথাপি এই উভয়ই মিলিতে পারে।—না—সখ্যে, শান্তিতে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিচয়ে ইহারা একদিন মিলিবেই। ইহাদের ভিতরে প্রভেদ আছে বলিয়াই ইহাদের মিলন আরও সফল মিলন হইবে—কারণ সত্যকারের প্রভেদ কখনই বিলুপ্ত হইবার নয়—তাহা ইহাদের উভয়কে বিশ্বমানবের সাধারণ বেদিকার সম্মুখে এক পবিত্র বিবাহবন্ধনে মিলিত করিবার দিকেই লইয়া চলিবে।"

ইহার পর কবির কাছে নানা স্থান হইতে ভক্তির অর্ঘ্য বহন করিয়া যেসকল পত্র আসিয়াছে তন্মধ্যে দুইজন স্ত্রী-কবির পত্রই শুনাইবার মত। একজন লিখিয়াছেন :—"যে দিন প্রথম বাইবেলের কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়াছিলাম সেই দিনটি বাদে, আমার মনে পড়েনা যে গতরাত্রে যেমন অনুভব করিয়াছিলাম জীবনে আর কোনো দিন সেরূপ অনুভব করিয়াছি কিনা।"

আর একজন লিখিয়াছেন "আপনার কবিতাগুলির যে কবিত্ব হিসাবে একটি সম্পূর্ণতা এবং অখণ্ড সৌন্দর্য্য আছে মাত্র তা নয়—কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় জিনিস বিদ্যুৎচমকের মত আসে, যাহা অনিশ্চয়তার বেদনায় অন্তরকে পীড়া দিতে থাকে—সেই তাহারি একটি চিরন্তন রূপ ইহাদের মধ্যে আমি পাইলাম। একজন লোক আরেকজনের চোখ দিয়া দেখিতে পারে কিনা আমি জানিনা বোধ হয় পারেনা; কিন্তু একজনের অন্তরের সুদৃঢ় প্রত্যয় নিশ্চয় আর একজনের বিশ্বাসকে জাগায়। St. John of the Crossএর "আত্মার অন্ধকার রাত্রি" নামক কবিতাটি ছাড়া আপনার কবিতার তুলনা খুঁজিয়া পাইনা—কিন্তু আপনি একটি পরিপূর্ণ অদ্বৈত বোধে এবং একটি অধ্যাত্ম তত্ত্বদৃষ্টিতে St. John এবং অপর সকল খৃষ্টান কবিকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টান "মিষ্টিসিজম্" ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপমায় পরিপূর্ণ; সে যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়—জগতের মায়াবরণ ভেদ করিয়া সে সত্যকে দেখে নাই। সেই জন্য তাহার হৃদয়াবেগ যথেষ্ট নির্ম্মল নয়। তাহার এই অসম্পূর্ণতা আমাকে কোনো দিনই সন্তোষ দেয় নাই। কিন্তু যে পরিপূর্ণ তৃপ্তিটি আমি চাই, তাহা গতরাত্রে আপনার কাব্যই আমাকে দিয়াছে। আপনি অতি স্বচ্ছ-সুন্দর ইংরাজীতে এমন জিনিষ আনিয়া দিয়াছেন যাহা আমি ইংরাজীতে কেন, কোনো পাশ্চাত্য ভাষায় কোনো দিন দেখিব না ভাবিয়া নিরাশ হইয়া গিয়াছিলাম।"

হাউস্ অব্ কমন্সে ভারতবর্ষীয় বজেট্ আলোচনাকালে সহকারী সচীব মিঃ মণ্টেগু কবির বক্তৃতার যে উল্লেখ করিয়াছিলেন বা ইংলণ্ডের টাইম্স্ পত্রে যে তাঁহার সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা খুব উল্লেখযোগ্য মনে করিনা। কারণ কবির যথার্থ সম্মান রসিকসমাজে—জনগণের হৃদয়মধ্যে—রাষ্ট্রদরবারে তাঁহার উল্লেখমাত্র তাহার তুলনায় অতি নগণ্য।

ইংলণ্ডের একজন প্রথিতনামা মনীষীর নিকট হইতে আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু যে পত্র পাইয়াছেন তাহার কিয়দংশের অনুবাদ এখানে দেওয়া সঙ্গত বোধ হইতেছে। তিনি লিখিতেছেন :—

"কবি আসিতেছেন শুনিয়া প্রথমটা যে আনন্দ হইয়াছিল, এখন তাঁহাকে নিকটে পাইয়া তদপেক্ষা কত যে বেশি আনন্দ হইতেছে তাহা আর বলিবার নয়। আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করিয়াছিলাম তাহার সমস্তই এই মধুরস্বভাব সাধুটির মধ্যে দেখিতে পাইতেছি এবং যাহা কল্পনা করি নাই এমনও বহু সদ্গুণরাশি দেখিতেছি। ইহাঁর চেয়ে মহত্তর আত্মা কে কবে দেখিয়াছে—ইহাঁর অপেক্ষা গভীরতর সত্যপ্রেরণা আর কোথায় মিলিয়াছে? আমি যে ইহাঁর কবিতাকে কত

উচ্চে আসন দিই তাহা আপনাকে আমি বলিতে পারি না—যদি বলি, তবে আপনি মনে করিবেন যে আমি বাড়াইয়া বলিতেছি। ইহাঁর অন্তরতর গভীর অভিজ্ঞতা হইতেই ইহাঁর সকল লেখার উৎপত্তি—তাহার মধ্যে নৈপুণ্য বা শক্তি ফলাইবার প্রয়াসমাত্র দেখিনা—তাঁহার সমস্ত রচনাই এই বিশ্বজগতের প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সৌন্দর্য্যের নম্রমধুর আবেগপূর্ণ হৃদয়োত্থিত স্তব-অর্ঘ্য। তাঁহার কাছে সেই সৌন্দর্য্যই বিশ্বের ঐক্যের পরিপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট প্রকাশ—অনন্ত বিশ্বসৌন্দর্য্য ভগবানের অনন্ত প্রেমের বাহ্যচিহ্ন বাহ্যবিগ্রহ মাত্র। সহস্র পদার্থে ইহাই তিনি দর্শন করেন এবং সহস্র রূপে জীবনের ও মৃত্যুর অক্লান্ত স্তবগানে ইহাই তিনি ব্যক্ত করেন। আপনাদের বাংলা ভাষায় যে ইহাঁর কবিতার সৌন্দর্য্য কিরূপ, তাহা আমি আবছায়া-মত কল্পনা করিতে পারি মাত্র—কিন্তু ইহাঁর কবিতার বাহ্যরূপটি না পাইলেও তাহার নিগূঢ়-গভীর অর্থ হৃদয়কে ব্যথিত ও আত্মাকে আলোড়িত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এই গদ্যানুবাদেও আমি এমন জিনিস পাই যাহা আর কোনো সমসাময়িক কাব্যের মধ্যে পাই না। এত বড় আপনাদের কবি, আপনাদের কি গর্ব্বের কথা! বিশেষত যখন এত বড় কবির সঙ্গে এমন একটি চরিত্রের সম্মিলন ঘটিয়াছে। যদি এমন অনেক দূত আপনাদের দেশ হইতে এদেশে আসিতেন! এই কবিকে যে কেহ দেখিয়াছেন, তিনিই ভাল বাসিয়াছেন, এবং ইংরাজীগদ্যে ইহাঁর কবিতা অনুবাদিত হইবার জন্য ইহাঁর প্রতি অনেকের গভীর ভক্তি হইয়াছে। সামনের শরতেই ইণ্ডিয়া সোসাইটি কবির অনুবাদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন এবং য়ীট্‌স্ স্বয়ং তাহার ভূমিকা লিখিয়া দিবেন। আমার বিশ্বাস যে, এই গ্রন্থ বাহির হইলে বহু লোকের নিকট তাহা সমাদর লাভ করিবে।"

এই অনুবাদগুলি কবির স্বকৃত। তিনি কবি য়ীট্‌সকে ঐগুলি মার্জ্জিত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে কবি য়ীটস বলিয়াছিলেন যে, "এই অনুবাদের কোনো কথা বদল করিয়া মার্জ্জিত করিয়া তুলিতে পারা যায়, যদি কেহ এমন কথা বলে তবে সে সাহিত্য কি তাহা জানে না।"

কবির প্রতি কাহারো কাহারো ভক্তি এমন প্রবল হইয়াছে যে তাঁহারা কবিকে গুরু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া পদধূলি লইয়াছেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন তাঁহাদের মধ্যে একজন। দিল্লী কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড সি, এফ, এণ্ড্রুজ মডার্ণ রিভিয়ু পত্রে লিখিয়াছেন—"যে-কবি তাঁহার কাব্যের দ্বারা তাঁহার স্বজাতিকে এতদূর উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতাম, কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। ... তাঁহার সহিত বাংলা দেশের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া আমি বলিলাম 'জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিসকলের মধ্যে বাঙালীর যথার্থ স্থানটি নির্দ্দিষ্ট হওয়ার সময় সুদূর নয়।' এই কথায় কবির মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল, একটি সুদূরের আলোক তাঁহার দৃষ্টিতে জ্বলিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম বঙ্গজননীর মূর্ত্তি তাঁহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং ইংলণ্ডের সুধীসমাজের আতিথ্য ও সমাদরের মধ্যেও তাঁহার চিত্ত প্রবাস-বেদনা অনুভব করিতেছে। ... তাঁহার কবিতা-আবৃত্তি শুনিয়া ভাবাবেশে অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, পুনঃ পুনঃ অক্ষিপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল এ আজ কি আনন্দ, যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ জীবিত কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া এতদিনে আমার দেশ ভারত-প্রতিভার পূজা করিতেছে। ... রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কবিতার অনুবাদে যেসকল বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, সেগুলি ললিত ও যথাযথ (marked by a stately grace and dignity), সুন্দর ও স্বচ্ছ (beautiful and lucid)। আবৃত্তি শুনিয়া একজন বলিয়াছিলেন 'আসল বাংলায় যে ইহা অপেক্ষা আর কি ভালো আছে তাহা আমার ধারণারও অতীত।'"

ইংলণ্ডের অনেক সুধী স্বীকার করিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুক—এ বিষয়ে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতের কোনো দেশে নাই।

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জিয়ান" পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে "ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের আগমনে এদেশে যে সম্মান সম্ভ্রম প্রশংসা ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং রসিকসমাজে যে সাড়া পড়িয়াছে এমনটি এযুগের লোকের জীবদ্দশায় কখনো কোনো প্রাচ্য অতিথির জন্য হইতে দেখা যায় নাই।"

গৌড়-রাজমালা

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "গৌড়-বিবরণ" নামক গ্রন্থমালার প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের নাম "গৌড়রাজমালা"। ইহার প্রণেতা প্রসিদ্ধ মানবতত্ত্ববেত্তা এবং বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ। বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধনামা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সপ্তদশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি উপক্রমণিকায় গ্রন্থের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এইরূপ নীরস বিষয় সরস করিবার ক্ষমতা কেবল শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয়েরই আছে, তবে এত সংক্ষেপে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া তাহা সরল ও হৃদয়গ্রাহী করিতে পারিবেন তাহা অনেকেই ভরসা করিতে পারেন নাই। উপক্রমণিকাটি অতি সুন্দর হইয়াছে। ভবিষ্যতে যদি কখনও "গৌড়রাজমালা" বঙ্গদেশে ক্রমোন্নত ইতিহাসচর্চ্চার ফলে অনাবশ্যকীয় গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে তখনও মৈত্রেয় মহাশয়ের উপক্রমণিকা সুন্দর সরল হৃদয়গ্রাহী রচনা-স্বরূপ বঙ্গ-সাহিত্যে সমাদৃত হইবে। গ্রন্থারম্ভে "গৌড়বিবরণের" সুযোগ্য সম্পাদক ৺বঙ্কিমচন্দ্রের নাম গ্রহণ করিয়া গ্রন্থখানিকে পবিত্র করিয়াছেন। অতীতে বঙ্কিমচন্দ্র লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও বঙ্গদেশ ঐতিহাসিক সারসত্য অনুসন্ধানের জন্য প্রস্তুত হয় নাই, সেই জন্যই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। উপক্রমণিকায় গ্রন্থমালার সম্পাদক নূতন কথা কিছুই বলেন নাই সুতরাং ইহার বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। দীঘাপতীয়ার বিদ্যোৎসাহী রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম,এ, মহাশয়ের ব্যয়ে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্য অশেষ প্রকারে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুরের নিকট ঋণী। ভরসা করি রাজকুমার দীর্ঘজীবী হইয়া তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিয়া যাইবেন।

যে গ্রন্থখানির কথা বলিতেছি তাহা বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব রত্ন। বঙ্গে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান আরম্ভ হইবার সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নাই। অক্ষয়কুমারের "সিরাজদ্দৌলা" সাহিত্য, ইতিহাস নহে, ভবিষ্যৎযুগে বঙ্গবাসিগণ "সিরাজদ্দৌলা' উৎকৃষ্ট গদ্য-সাহিত্যরূপে পাঠ করিবে। "বিক্রম-পুরের ইতিহাস" ইতিহাস নহে, Gazetteer, ইহার ঐতিহাসিক ভাগ মুদ্রিত না করিলে বিশেষ হানি হইত না। "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে গ্রন্থকার যথেচ্ছ অনুবাদ করিয়াছেন এবং যাহা তাঁহার মনে আসিয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা বা ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান তাঁহার মনে স্থানলাভ করে নাই। এই শ্রেণীর যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তগুলিই Gazetteer, ইতিহাস নহে। রমাপ্রসাদ বাবুর গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে তিনি মুষ্টিভিক্ষা করিয়া মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। তিনি যে অমূল্যরত্ন মাতৃভাষাকে উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহা কেবল বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব নহে, জগতের ইতিহাসক্ষেত্রে অপূর্ব্ব। "গৌড়রাজমালা" কোন ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত হইলে এতদিন নানা ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইত। শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয় বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিয়া ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ন্যায় সত্বর ইহার অনুবাদ হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে "বসুমতী"তে ও "সাহিত্যে" রমাপ্রসাদ বাবুর গ্রন্থের কতক-গুলি সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সমালোচকগণ মুক্তকণ্ঠে "গৌড়রাজমালা"র প্রশংসা করিয়াছেন। "সাহিত্যে"র সমালোচক "গৌড়রাজমালা"কে বাঙ্গালার ঐতিহাসিকক্ষেত্রে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেন করিয়াছেন তাহার কারণগুলি দিতে বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন। যে দুটি একটি কারণ উল্লিখিত আছে তাহা উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় "গৌড়রাজমালা"র প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। তিনি "গৌড়রাজমালা" পাঠ করিয়া তিনটি মাত্র নূতন কথা জানিতে পারিয়াছেন :—

(১) গৌড়ের অতীত ইতিহাস আছে।

(২) গৌড়ীয়গণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে দেশশাসন করিয়াছিলেন; আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ে প্রজাশক্তির উন্মেষ ঘটিয়াছিল, প্রজার নির্ব্বাচনে রাজা মনোনীত হইয়াছিলেন।

(৩) বাঙ্গালী চিরপরাধীন ও চিরপরাজিতের জাতি নহে। বাঙ্গালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, শত্রু মর্দ্দিত করিয়াছিল। বাঙ্গালী শিল্পকলায় পারদর্শী হইয়া এসিয়া মহাদেশকে শিল্পের আদর্শ দিয়াছিল! ইত্যাদি।

কিন্তু এসকল কথা যে "গৌড়রাজমালা"র জন্মের বহুপূর্ব্বে শ্রুত হইয়াছে সে কথা দেখিতেছি এখনও পাঁচকড়ি বাবুর শ্রুতিগোচর হয় নাই। গৌড়ের অতীত ইতিহাস আছে একথা কেবল কিলহর্ণ, ফ্লিট্, স্মিথ্ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ বলেন নাই, সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বহুপূর্ব্বে একথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ "গৌড়বিবরণের" সম্পাদক নানা মাসিকপত্রে নানাভাবে বঙ্গবাসিগণকে শুনাইয়া আসিতেছেন যে গৌড়ের ইতিহাস আছে, তবে তিনি যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে পন্থা অনুসরণ করিলে কখনও গৌড়ের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হইত কিনা সন্দেহ। "গৌড়ীয়গণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে দেশ শাসন করিয়াছিলেন" একথা যদি নূতন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে "গৌড়রাজমালা" অগ্নিতে নিক্ষেপ করা উচিত। শুনিয়াছি ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত খৃঃ পূর্ব্বাব্দে লিখিত "বাঙ্গালার ইতিহাসে"ও একথা আছে। আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ পর্য্যন্ত যে গৌড়ীয় প্রভাব বিস্তীর্ণ হইয়াছিল তাহা এই অষ্টাদশ বর্ষ কাল যাবৎ ৺উমেশ-চন্দ্র বটব্যাল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে গৌড়ে প্রজা-শক্তির উন্মেষ ঘটিয়াছিল তাহা ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল, পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে বহুপূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং এই তিনটি কথার একটি কথাও নূতন নহে। রমাপ্রসাদবাবু ভারতের ইতিহাসের উপাদান হইতে গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। বিশাল সমুদ্র স্বরূপ উত্তরাপথ-দক্ষিণাপথের খোদিতলিপিমালার সার সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার "গৌড়রাজমালা" প্রণয়ন করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে যে-কোন ব্যক্তি এই উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে পারিত, কিন্তু সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড প্রমাণগুলি যোজনা করিয়া উত্তরপূর্ব্ব-ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিতে পারিত বলিয়া বোধ হয় না। রমাপ্রসাদবাবু যেসমস্ত উপাদান লইয়া "গৌড়রাজমালা" রচনা করিয়া-ছেন তাহা অধিকাংশই বহুপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইসমস্ত খণ্ড প্রমাণ লইয়া মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা সহজসাধ্য নহে। ভারতবর্ষের অপরাপর দেশ বা রাজবংশের ইতিহাসের সহিত

সামঞ্জস্য রাখিয়া রমাপ্রসাদবাবুকে এই ইতিহাসখানি রচনা করিতে হইয়াছে, ইহাই রমাপ্রসাদবাবুর বিশেষ কৃতিত্ব। এই কার্য্যটি রমাপ্রসাদবাবু বহু পরিশ্রম করিয়া সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ফলে তাঁহার গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের মহা মহা রথীগণ বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টায় যাহা করিতে পারেন নাই, ভিন্সেণ্ট স্মিথ, ফ্লিট প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ যাহাকে অসাধ্যসাধন বলিয়া মনে করিয়াছেন, রমাপ্রসাদবাবু তাহা অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সাধন করিয়াছেন। রমাপ্রসাদবাবুর গ্রন্থে যে নূতন কথা নাই তাহা নহে, কাম্বোজবংশীয় গৌড়পতির কীর্ত্তি ও গৌড় বঙ্গের ইতিহাসে তাহার স্থান, তিনি নিরূপণ করিয়াছেন। চন্দ্রাত্রেয়বংশীয় ধঙ্গ কবে রাঢ় বিজয় করিয়াছিলেন কর্ণাটচালুক্য বিক্রমাদিত্য কবে পশ্চিমবঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, একথার উত্তর বোধ হয় অনেকেই দিতে পারিবেন না। "গৌড়রাজমালার" গ্রন্থকারের সহিত আমার নিজ মতের অনেক অনৈক্য আছে, তথাপি তাঁহার সংগ্রহ, প্রমাণসজ্জা ও রচনাপ্রণালী সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার জগদ্বিজয়ী সেকন্দরের ভারতাভিযান কাল হইতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় পর্য্যন্ত দেশীয় বা বিদেশীয় গ্রন্থে বঙ্গ বা বঙ্গবাসিগণের যত কিছু উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন ও উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সময়ের (খৃঃ পূঃ ৩২৬—খৃঃ অঃ ৩৮০) বাঙ্গালা দেশের কোনও উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সময়ে মগধের গুপ্তরাজগণ উত্তরাপথে শকাধিকার লোপ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, বাঙ্গালার সেই সময়কার কথা আমরা কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি। শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয় মিহিরৌলী গ্রামের লৌহস্তম্ভে যে চন্দ্ররাজার দিগ্বিজয়কাহিনী উৎকীর্ণ আছে তাঁহাকে গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই চন্দ্রের কথা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে বোধ হয় স্বীকার করিতে পারিতেন না। বঙ্গদেশে বাঁকড়া জেলার শুশুনিয়া পর্ব্বতে চন্দ্রের খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে কথাও "গৌড়রাজমালা"য় স্থানলাভ করে নাই। বঙ্গবিজয়ী চন্দ্র, ও গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। ইহার কারণ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের খোদিতলিপিসমূহে পাওয়া যাইবে। মিহিরৌলীর স্তম্ভলিপির অক্ষরমালার সহিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাঞ্চী, মথুরা, বা উদয়গিরির শিলালিপিসমূহের তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে উভয়ে বহু পার্থক্য আছে। মিহিরৌলী স্তম্ভলিপির অক্ষরগুলির বিশেষত্ব আছে। আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশে খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত ইহাদের কোনই সাদৃশ্য নাই পরন্তু প্রথম কুমারগুপ্তের বিলসাড় স্তম্ভলিপির অক্ষরগুলির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মিহিরৌলী স্তম্ভলিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে চন্দ্র নামক কোন রাজা পূর্ব্বে বঙ্গদেশ, পশ্চিমে বাহ্লিক, ও দক্ষিণে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন :—

যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্।
বঙ্গেষ্বাহববর্ত্তিনোঽভিলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে ॥
তীর্ত্বা সপ্তমুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জ্জিতাবাহ্লিকা
যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্য্যানিলৈর্দ্দক্ষিণঃ।

এই স্তম্ভ বিষ্ণুপদগিরির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। দুইটি বিষ্ণুপদগিরি দেখিতে পাওয়া যায়, একটি গয়াধামে, ও দ্বিতীয়টি পুষ্করে। শুশুনিয়া পর্ব্বতের খোদিতলিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে পুষ্করাধিপতি সিংহবর্ম্মার (সিদ্ধবর্ম্মা নহে) পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা কর্ত্তৃক উহা খোদিত হইয়াছিল। সুতরাং এই উভয় চন্দ্রবর্ম্মাই এক ব্যক্তি এবং এই বিষ্ণুপদগিরি পুষ্করে হওয়াই অধিক সম্ভব। সিংহবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মা কিরূপে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্তের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মিহিরৌলী স্তম্ভলিপি ও শুশুনিয়া শিলালিপি উভয়ই বৈষ্ণব খোদিতলিপি; প্রথমটি ভগবান বিষ্ণুর ধ্বজ এবং দ্বিতীয়টি চক্রস্বামীর দাস কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত। মিহিরৌলী স্তম্ভলিপির চন্দ্রের ও শুশুনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্ম্মার একত্ব সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবুর সন্দেহ থাকিলে "গৌড়রাজমালায়" স্বতন্ত্রভাবে শুশুনিয়ার শিলালিপির উল্লেখ করা উচিত ছিল। অক্ষরতত্ত্বের প্রমাণানুসারে শুশুনিয়ার শিলালিপি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে পারে না। অতএব ইহা বুঝিতে হইবে যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পুষ্করদেশের রাজা সিংহবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মা গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং রাঢদেশের মধ্যস্থিত শুশুনিয়া পর্ব্বত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। গৌড় ও বঙ্গ যে গুপ্ত সম্রাটগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল একথা এক্ষণে সর্ব্ববাদীসম্মত। রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন :—

"ফরিদপুর জেলায় স্কন্দগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং ঢাকা, ফরিদপুর এবং যশোহর জেলার কোন কোন স্থানে গুপ্ত সম্রাটদিগের মুদ্রা ঢঙ্গের মুদ্রা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।"

রমাপ্রসাদ বাবু একটু সামান্য চেষ্টা করিলেই কোন্ কোন্ জেলায় কোন্ কোন্ গুপ্তসম্রাটের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ ভিন্সেণ্ট স্মিথ অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে "গুপ্ত সম্রাটগণের সুবর্ণমুদ্রা" নামক প্রবন্ধে বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত গুপ্তসম্রাটগণের মুদ্রাসমূহের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ২৪ পরগনার অন্তর্গত কালীঘাটে, হুগলী জেলার অন্তর্গত মহানদে, উত্তরবঙ্গের মালদহে ও রঙ্গপুরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমার গুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিগত অষ্টাশদবর্ষ মধ্যে বঙ্গদেশে গুপ্ত রাজবংশের যেসমস্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে রমাপ্রসাদ বাবু এসিয়াটিক্ সোসাইটীর কার্য্যবিবরণী মধ্যে তাহার তালিকা পাইবেন। রাজসাহী জেলায় ধানাইদহ গ্রামে প্রথম কুমারগুপ্তের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রমাপ্রসাদ বাবু ইহার উল্লেখ করিয়াই সন্তুষ্ট আছেন, কিন্তু তাম্রশাসন হইতে গৌড়দেশ সম্বন্ধে আমরা কি জানিতে পারি, তাম্রশাসন এতদ্দেশ সম্বন্ধীয় কি না, তৎসম্বন্ধে "গৌড়রাজমালা"য় বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

পরভৃত।

আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের 'পরভৃত' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সত্যই আমরা অনেক সময় বৈদেশীক লেখকের প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ভারতীয় প্রাণীতত্ত্বে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হই। ১৩১৪ সালের 'প্রবাসী'তে 'পিপীলিকা' প্রবন্ধে এ বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। দেশ, কাল, আবহাওয়া ভেদে একই শ্রেণীর প্রাণীর স্বভাবের তারতম্য লক্ষিত হয়। ক্রম-বিকাশ-তত্ত্বের এটা মূল বিধান। মানবের আদি পুরুষ এক; কিন্তু বর্ত্তমানকালের সমগ্র মানব জাতি এক নহে; বাসস্থানাদি ভেদে আমরা কত প্রকার বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছি।

এক ভারতবর্ষেই মানব জাতির মধ্যে আকার ও স্বভাবগত পার্থক্য কিরূপ লক্ষিত হয়। বিভিন্নজনসম্‌কুল মহানগরী কলিকাতার পথে, পথিকের মধ্যে কে বাঙ্গালী, কে উড়িয়া, মান্দ্রাজী ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিতে দর্শকের অনুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। একই মনুজবংশ যেমন দেশকাল ভেদে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সমগ্র জীবজগতও তাহাই। পার্ব্বতীয় গো জাতির মস্তকাদির গঠনে বন্য গোর সাদৃশ্য এখনো বর্ত্তমান কিন্তু সমতলভূমির গো জাতিতে তাহার অভাব। এমত অবস্থায় বিলাতী 'কুকু' যে আমাদের কোকিল হইতে অনেকাংশে ভিন্ন প্রকারের হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি! 'কুকু' প্রবন্ধ পাঠকালে কালীপ্রসন্ন বাবুর ন্যায় আমাদেরও বহু কথা মনে উদিত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন বাবু আমাদের অনেক কথা তাঁহার প্রতিবাদ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিদেশী জিনিষ স্বদেশী নামে অভিহিত হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নহে; কালীপ্রসন্ন বাবু উভয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তবু তাঁহার বক্তব্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমাদের দুই একটি কথা বলিবার আছে। প্রতিবাদ আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আলোচনায় বিষয়টার সত্যাসত্য নির্ণীত হইতে পারে আশায় বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

'গিরিকিরীটিনী ত্রিপুরার পর্ব্বত প্রকৃতির রম্যকুঞ্জ' মধ্যে 'বারমাস কোকিল দেখিতে পাওয়া যায়।' সত্য। কিন্তু ইহার দ্বারা বঙ্গের গিরিহীন সমতল ক্ষেত্রে সকল সময় কোকিল দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অনুমান করিয়া লইবার উপায় নাই। প্রকৃতই কোকিলকুল বঙ্গের অনেক পল্লী হইতেই বসন্ত অন্তে বিদায় গ্রহণ করে। এটি প্রত্যক্ষ সত্য। ত্রিপুরা হয়ত বারমাসই কোকিলের বসবাসের উপযুক্ত; সমগ্র বঙ্গভূমি তাই বলিয়া উহাদের পক্ষে সেইরূপ উপযুক্ত তাহা অনুমান করা চলে না। 'পিঞ্জরাবদ্ধ কোকিলগণ বারমাসই এদেশে থাকে। সাধারণতঃ কোন ঋতুতে তাহাদিগকে অসুস্থ বা স্ফূর্ত্তিহীন হইতে দেখা যায় না।' এ প্রমাণও যথেষ্ট নহে। ময়না প্রভৃতি পাখী আমাদের দেশজ নহে অথচ তাহারা আমাদের দেশে গৃহপালিত অবস্থায়, সুস্থ শরীরে বহু বৎসর কাটাইয়া দেয়। আমাদের গৃহে একটি চন্দনা-টিয়া আটাশ বৎসর কাল ক্রমাগত "রাধা কৃষ্ণ" নাম শুনাইয়া সম্প্রতি কৃষ্ণলাভ করিয়াছে। অথচ বন্য অবস্থায় টিয়ার নাম গন্ধও আমাদের এ প্রদেশে নাই।

স্বীকার করি,—'ঋতুরাজ বসন্তের আগমন ব্যতীত' কোকিলকণ্ঠ 'উন্মুক্ত হয় না—ইহাই কোকিলের স্বভাব।' কিন্তু ইহাও উহার বঙ্গে চির-বাসের প্রমাণ নহে। সে স্বভাবের মূল অন্য। আদিরসের আবির্ভাবই উহার কারণ। আদিকালে আদিরসই প্রথমে জীবকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রণয়ীর প্রণয়িণীকে আকৃষ্ট, আদৃত করিবার প্রচেষ্টায় কণ্ঠের প্রথম পরিস্ফুটন—বৈজ্ঞানিক জগতে সুধীগণ কর্ত্তৃক সে তথ্য বহু প্রমাণ সহকারে সুনির্ণীত হইয়াছে। বসন্তে কোকিলের কলতানের অন্তরালে আজিও আদিরস লুক্কায়িত থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছে।

'অবয়বের বা বর্ণের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, কিম্বা কাক সেই কারণেই নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ডিমে তা দেয় ও ছানা পালন করে, এমন নহে; ইহাও তাহাদের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক।' স্বাভাবিক সত্য। কিন্তু এক এক জাতীয় জীবের এক এক প্রকার বিশিষ্ট স্বভাবের কি কারণ নাই? ইতর জাতি কেন, মানব পর্য্যন্ত আপন সন্তানকে যে প্রাণের টানে, স্নেহ মমতায় লালন পালন করে, অন্যের সন্তানকে তদ্রূপ করে না,—ইহা জীবের স্বভাব বা মায়া। কাক কোকিলের ছানাকে, ফিঙ্গা 'বৌ-কথা-কও'য়ের ছানাকে আপনার সন্তান বলিয়া ভ্রম না করিলে, পরসন্তানকে আত্মসন্তান-নির্ব্বিশেষে পালন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের নিকট আশা করা যায় না। বস্তুতঃ সেরূপ ভ্রমের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। সুধীগণ পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে গণনা দ্বারা বস্তুর সমষ্টি নির্ণয় করিবার শক্তি নিম্নশ্রেণীর ইতর প্রাণীর নাই। তাহারা বস্তুর আকার, অবয়ব ও বর্ণ প্রভৃতির সাহায্যে উহার অস্তিত্ব নির্ণয় করে। কুকুর বা বিড়াল সন্তানের আকারাদি দ্বারা আপন আপন সন্তান চিনিয়া লয়;—পক্ষীগণেরও উহাই স্মৃতিসহায়। কাক, এই জন্যই কোকিলের শাবককে নিজ সন্তান বলিয়া ভ্রম করিয়া তাহাকে সন্তাননির্ব্বিশেষে লালন পালন করে। কাক ও কোকিলের ডিমে সাদৃশ্য রহিয়াছে। কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়িবার কালে, নিজের যতটি ডিম পাড়ে, কাকের ততটি ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলে; আকার ও বর্ণগত সাদৃশ্য থাকায় কাক কোকিলের ডিমের পার্থক্য অনুধাবন করিতে পারে না। নিজ ডিম বোধে তা দিয়া ডিম ফুটায়। কাক ও কোকিলের ছানা প্রথম অবস্থায় দেখিতে একই প্রকারের। তাহা না হইলেও ক্ষতি হইত না; কারণ কাক ডিম ফুটিবামাত্র প্রত্যেকটি ছানার আকারগত পার্থক্যের দ্বারা নিজ সন্তানের পরিমাণ নির্ণয় করে; তাহার স্মৃতিতে কোকিলের ছানাও আত্মসন্তান-শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়া যায়। পরিশেষে পালক উঠিলেও তাহার ভ্রম ভাঙ্গে না, নিজের সন্তানের প্রতিকৃতি এই রূপ ধারণ করিতেছে ইহাই তাহার বিশ্বাস জন্মে। ফিঙ্গা সম্বন্ধেও এই কথা। আমরা ফিঙ্গার বাসায় 'বৌ-কথা-কও'য়ের সন্তান হইতে দেখি নাই। বোধ হয় বৌ-কথা-কও ও ফিঙ্গার ডিমে সাদৃশ্য আছে—সেটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা সাতভায়া বা ছাতার পাখীর বাসায় পাপীয়া বা 'চোক গেল' পাখীর ছানা হইতে দেখিয়াছি। দুই মাস পূর্ব্বেও লক্ষ্য করিয়াছি, ছাতার পাখী পাপীয়ার ছানার আহার যোগাইতেছে। (আমাদের দেশের নামজাদা গায়ক পাখীগণ কি অনেকেই পরভৃত—সৌখীন?) ছাতার ও পাপীয়ার মধ্যে আকার ও বর্ণগত সাদৃশ্য আছে, উভয়ের ডিমও এক প্রকারের। সুতরাং ছাতারের ভ্রমে পতিত হইবার যথেষ্ট উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ভ্রমই কালীপ্রসন্নবাবু-কথিত উহাদের স্বভাবের মূল কারণ। তাহা না হইয়া এই স্বভাবকে কখনই সহজাত সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই।

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

গরুড়স্তম্ভ-লিপি*

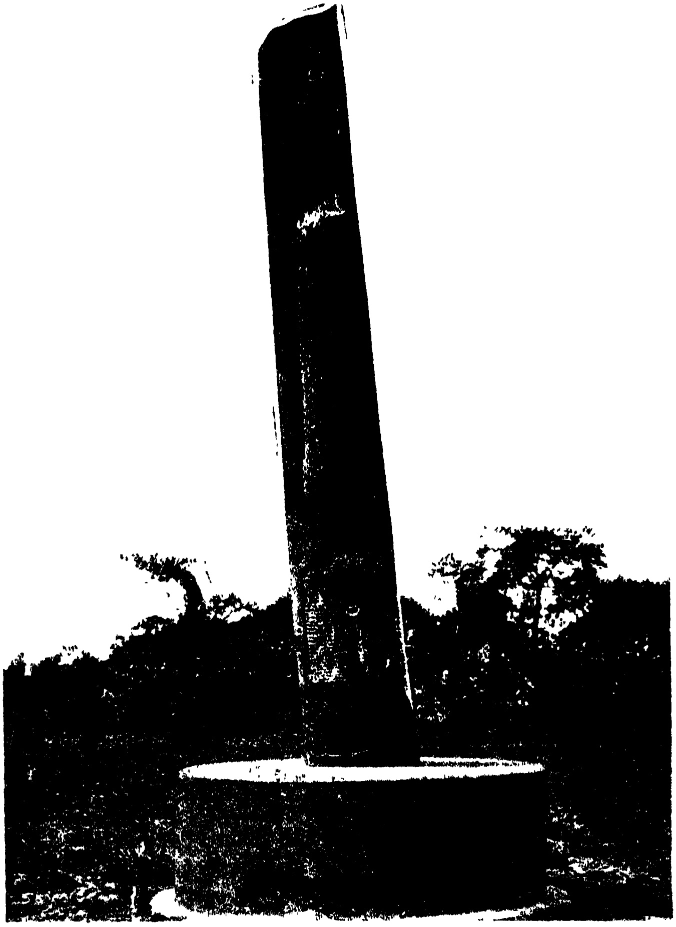
[বাদাল-প্রস্তরলিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদাল নামক স্থানে কোম্পানী-বাহাদুরের একটি কুঠীবাড়ী বর্ত্তমান ছিল। তাহার অধ্যক্ষ [স্যর] চার্লস্ উইল্‌কিন্স ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের শীতকালে বাদালের তিন মাইল দূরবর্ত্তী একটি বনভূমির মধ্যে [প্রায় দ্বাদশ ফুট উচ্চ একটি ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তর-স্তম্ভের গাত্রে] এই পুরাতন

আবিষ্কার-কাহিনী।

* বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির (যন্ত্রস্থ) নূতন গ্রন্থ "গৌড়লেখমালার" এই প্রবন্ধটি সমিতির অনুমতিক্রমে প্রকাশিত হইল। প্রবাসী-সম্পাদক।



গরুড়স্তম্ভ।

প্রশস্তি উৎকীর্ণ থাকিবার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে, এই স্তম্ভলিপির কথা ক্রমে বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত হইয়াছে। বাদালের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া, ইহা "বাদাল-প্রস্তরলিপি" নামে কথিত হইত। ইহা বাদাল অপেক্ষা মঙ্গলবারি-হাটের অধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া, "মঙ্গলবারি-প্রস্তরলিপি" নামেও কথিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই প্রশস্তি একটি গরুড়-স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে বলিয়া, ইহা "গরুড়স্তম্ভ-লিপি" নামেই কথিত হইবার যোগ্য।

এই স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইবার পর, মালদহের কুঠীর অধ্যক্ষ জর্জ উড্‌নী [১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে] এবং মালদহের অন্তর্গত গুয়ামালতী কুঠীর অধ্যক্ষ ক্রেটন্ [১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে] পরিদর্শন করিতে আসিয়া, স্তম্ভ-গাত্রে আপন আপন নাম উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন; তাহা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উইল্‌কিন্স ভিন্ন, আর কাহারও, তৎকালে পাঠোদ্ধার-সাধনের চেষ্টা করিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

উইল্‌কিন্স কিরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা আর জানিবার উপায় নাই। তিনি ইংরাজী ভাষায় যে মর্ম্মানুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই [১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে] এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় * প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই মর্ম্মানুবাদ পাঠে জানিতে পারা যায়,—উইল্‌কিন্স সকল শ্লোকের বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। [১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে] দিনাজপুরের কলেক্টর ওয়েষ্টমেকট্ পণ্ডিতবর হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত একটি পাঠ প্রেরণ করায়, [শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষকৃত ইংরাজী অনুবাদ সহ] তাহা সোসাইটীর পত্রিকায় † প্রকাশিত হইয়া, নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইতেছিল। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সপ্তম এবং ত্রয়োদশ শ্লোক ভিন্ন, আর একটি শ্লোকও যথাযথভাবে উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই; বরং অধিকাংশ স্থলেই, স্বকপোল-কল্পিত পাঠ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্ণের অধ্যবসায়-বলে একটি মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। ‡

যাঁহারা এই প্রস্তর-লিপির পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইহার ব্যাখ্যাকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিতে অসমর্থ

* *Asiatic Researches*, Vol. I, pp. 133—144.

† *J. A. S. B.* 1874.

‡ *Epigraphia Indica*, Vol. II, pp. 160—167.

হইয়া, অনেকেই প্রকৃত ব্যাখ্যার সন্ধানলাভ করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের উদ্ধৃত পাঠেও দুই এক স্থলে সংশয়ের অভাব ছিল না। অনুসন্ধান-সমিতি উপর্য্যুপরি এই স্তম্ভ-লিপির পাঠ সংকলনের চেষ্টা করিয়া, এবং স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির সহিত প্রচলিত পাঠ মিল করিয়া দেখিয়া, একটি বিশুদ্ধ পাঠ মুদ্রিত করিয়া, বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই লিপির সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকিলেও, এ পর্য্যন্ত ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

এই প্রস্তর-স্তম্ভটি এক দিকে ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে, এবং ইহার বজ্রদীর্ণ শীর্ষভাগ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য ইহার মূলদেশে সম্প্রতি একটি ইষ্টক-বেদিকা সংযুক্ত হইয়াছে। তাহার পরিধি ১৮ ফুট ১০ ইঞ্চ। বেদিকা-সংলগ্ন প্রস্তরস্তম্ভ-মূলের পরিধি ৫ ফুট ১০ ইঞ্চ। বেদিকার উপর হইতে ১ ফুট ৪ ইঞ্চ উর্দ্ধে প্রস্তর-লিপিটি সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। তাহা সংস্কৃতভাষা-নিবদ্ধ অষ্টাবিংশতি পংক্তি-বিন্যস্ত অষ্টাবিংশতি-শ্লোকাত্মক ক্ষুদ্র কাব্য বলিয়া কথিত হইতে পারে। পংক্তিগুলি প্রায় ১ ফুট ৯ ইঞ্চ দীর্ঘ, অক্ষরের আয়তন অর্দ্ধ ইঞ্চ হইবে। ১।২।২৩।২৫।২৭ সংখ্যক শ্লোকের কোন কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অন্যান্য অক্ষরাবলী যেরূপ সুদৃশ্য, সেইরূপ সুখপাঠ্য। স্তম্ভটি এক অখণ্ড কৃষ্ণাভ ধূসর প্রস্তরে নির্ম্মিত; তাহার সর্ব্বাঙ্গে যে "বজ্রলেপ" সংযুক্ত ছিল, স্থানে স্থানে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। তথাপি স্তম্ভগাত্র বিলক্ষণ মসৃণ। এই প্রস্তর-লিপিতে যেসকল ঐতিহাসিক বিবরণ উল্লিখিত আছে, তাহা নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য।

লিপি-পরিচয়।

১। শাণ্ডিল্যবংশে * [বিষ্ণুঃ ?]. + তদীয় অন্বয়ে বীরদেব, তদ্‌গোত্রে পাঞ্চাল, এবং পাঞ্চাল হইতে [তৎপুত্র] গর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিতেন যে,—[শক্র] ইন্দ্রদেব কেবল পূর্ব্বদিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না; [কিন্তু বৃহস্পতির ন্যায় মন্ত্রী থাকিতেও] তিনি সেই একটিমাত্র দিকেও [সদ্যঃ] ‡ দৈত্যপতিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন; [আর] আমি সেই পূর্ব্বদিকের § অধিপতি ধর্ম্ম ‖ [নামক] নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।

৩। নিসর্গ-নির্ম্মল স্নিগ্ধা চন্দ্রপত্নী কান্তিদেবীর ¶ ন্যায়, অন্তর্ব্বির্বত্তিনী ইচ্ছার অনুরূপা, তাঁহার ইচ্ছানাম্নী পত্নী ছিলেন।

---

* এই বংশোদ্ভব গুরব মিশ্র [অষ্টাদশ শ্লোকে] "জমদগ্নি কুলোৎপন্ন" বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, এই বংশ রাঢ়ী-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজের সুপরিচিত শাণ্ডিল্য-বংশ হইতে পৃথক্ বলিয়াই বোধ হয়।

+ এই শ্লোকের প্রথম দুইটি অক্ষরে একটি বিসর্গান্ত শব্দে যে বীজি-পুরুষের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার বিসর্গ-চিহ্ন মাত্রই বর্ত্তমান আছে। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ তাহাকে "বিষ্ণু" বলিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু এরূপ অনুমানের কারণ কি, তাহা প্রতিভাত হয় না।

‡ দ্বিতীয় চরণের শেষেও দুইটি অক্ষরে একটি বিসর্গান্ত শব্দ উৎকীর্ণ ছিল; তাহারও বিসর্গ-চিহ্ন মাত্রই অবশিষ্ট আছে। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ তৎসম্বন্ধে কোনরূপ অনুমানের অবতারণা করেন নাই। অন্বয়, অর্থ এবং ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এই বিলুপ্ত শব্দটিকে [সদ্যঃ] বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

§ অধ্যাপক-কিল্‌হর্ণ ধৃত [ধর্ম্ম. ক্ষ্মনল্লহ্ধিপ" স্থলে] "ধর্ম্ম: ক্ষ্মনল্লধিপ:"-পাঠ লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শন বলিয়াই বোধ হয়। পালবংশীয় নরপালগণ প্রথমে বঙ্গদেশে অধিকার লাভ করিয়া, পরে মগধ জয় করিবার যে কিংবদন্তী তারানাথের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, "নদধিপ" শব্দে তাহা সমর্থিত হইতেছে। পাল-নরপালগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, এই বিশেষণ হইতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

‖ এই শ্লোকোক্ত ধর্ম্ম নামক রাজা ইতিহাস-বিখ্যাত ধর্ম্মপাল। তাঁহার [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসন তদীয় বিজয় রাজ্যের [দ্বাত্রিংশদ্বর্ষীয় দ্বাদশ মার্গ দিনে] পাটলিপুত্রের জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিজয়-রাজ্যের ষড়্‌-বিংশতিবর্ষে বুদ্ধগয়াধামে তাঁহার নামাঙ্কিত একটি প্রস্তর-লিপি [কেশব-প্রশস্তি] উৎকীর্ণ হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও পালবংশীয় নরপালগণের শাসন-ক্ষমতা মগধে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রকৃতিপুঞ্জ ধর্ম্মপালের পিতা গোপালদেবকে, "মাৎস্য-ন্যায়" দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, একথা ধর্ম্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৩য় শ্লোকে] উল্লিখিত আছে। তারানাথের গ্রন্থেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (সমগ্র দেশ বহুসংখ্যক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া প্রবলের অত্যাচারে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিলে দেশের সেই অরাজক অবস্থার নাম সংস্কৃত্য সাহিত্যে মাৎস্য-ন্যায়।) গরুড়স্তম্ভ-লিপির এই শ্লোকের বর্ণনায়, ধর্ম্মপালের সময়েই [তাঁহার মন্ত্রিবর গর্গের মন্ত্রণা-বলে] মগধাদি অন্যান্য প্রদেশে পালসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

¶ অধ্যাপক কীল্‌হর্ণ "কান্তি"-শব্দে চন্দ্রের "শোভাকেই" গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু দাম্পত্য-সম্পর্ক বর্ণনা করিবার সময়ে, সেরূপ সাধারণ অর্থে "কান্তি"-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [পঞ্চম শ্লোকে] তাঁহার মাতা

৪। বেদচতুষ্টয়রূপ-মুখপদ্ম-লক্ষণাক্রান্ত, স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট পদগৌরবে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, কমল-যোনি ব্রহ্মার ন্যায়, তাঁহাদের দ্বিজোত্তম * পুত্র † নিজের "শ্রীদর্ভপাণি" এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

৫। সেই দর্ভপাণির নীতি কৌশলে ‡ শ্রীদেবপাল [নামক] নৃপতি মতঙ্গজ-মদাভিষিক্ত-শিলা-সংহতিপূর্ণ রেবা [নর্ম্মদা] নদীর জনক [উৎপত্তিস্থান বিন্ধ্যপর্ব্বত] হইতে [আরম্ভ করিয়া] মহেশ-ললাট-শোভি-ইন্দু কিরণ-শ্বেতায়মান গৌরীজনক [হিমালয়] পর্ব্বত পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদয়াস্তকালে অরুণরাগ-রঞ্জিত [উভয়] জল-রাশির আধার পূর্ব্ব-সমুদ্র এবং পশ্চিম-সমুদ্র [মধ্যবর্ত্তী] সমগ্র ভূভাগ কর-প্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৬। নানা-মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণিতল §-বিসর্পি-ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিক্‌চক্রাগত-ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমান সেনাসমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্ব্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল [নামক] নরপাল [উপদেশ গ্রহণের জন্য] দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায়, তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন।

৭। সুররাজকল্প [দেবপাল] নরপতি [সেই মন্ত্রিবরকে] অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী * [মহার্হ] আসন প্রদান করিয়া, নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংসু হইয়াও, স্বয়ং সচকিত † ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।

৮। অত্রি হইতে ‡ যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার এবং শর্করা দেবীর পরমেশ্বর-বল্লভ § শ্রীমান্ সোমেশ্বর [নামক] পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

"মীনাক্ষীরিব রোহিণী" বলিয়া বর্ণিতা। এখানেও, শব্দান্তরের সাহায্যে, সেইরূপ উপমাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পুরীধামের লোকনাথ-মন্দিরের প্রাঙ্গনে চন্দ্রমূর্ত্তির দক্ষিণে, চন্দ্র-পত্নী কান্তি-দেবীর মূর্ত্তি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রেও তাহার নির্দ্দেশ আছে। যথা—

"চন্দ্রঃ শ্বেতবপুঃ কার্য্যঃ শ্বেতাম্বরধরঃ প্রভুঃ।
চতুর্ব্বাহুর্ম্মহাতেজাঃ সর্ব্বাভরণ-ভূষিতঃ॥
কুমুদী চ সিতৌ কার্য্যৌ তস্য দৈবস্য হস্তয়োঃ।
কান্তির্মূর্ত্তিমতী কার্য্যা তস্য পার্শ্বে তু দক্ষিণে॥"

* অধ্যাপক কিলহর্ণ এই শ্লোকের "দ্বিজেশ"-শব্দের চন্দ্র-বাচক অর্থ গ্রহণ করিয়া, [Epigraphia Indica Vol. II, p. 3] লিখিয়া গিয়াছেন "and the epithet *dvijesha*, applied to him, besides suggests, that he was like the Moon." কিন্তু যে কবি [পূর্ব্ব-শ্লোকেই] দর্ভপাণির মাতাকে চন্দ্র-পত্নীর সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন, সেই কবি, তাহা বিস্মৃত হইয়া, [পর-শ্লোকে] দর্ভপাণির জন্য চন্দ্র-বাচক "দ্বিজেশ"-বিশেষণের চিন্তা করিতেই পারিতেন না। এখানে "দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ" বুঝাইবার জন্যই দ্বিজেশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

† [সূনুঃ] কর্ত্তৃপদের [আসীৎ] ক্রিয়া পদ উহ্য থাকায়, "দধান"-শব্দই ক্রিয়া-পদের আকাঙ্খা নিবৃত্ত করিতেছে। এরূপ প্রয়োগ সংস্কৃত-সাহিত্যে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

‡ নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৫-৬ শ্লোকে] দেবপালের ভ্রাতা জয়পাল নামক বিজয়ী বীরপুরুষের বাহুবলই সাম্রাজ্য বিস্তারের একমাত্র সহায় বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাহার সহিত যে নীতি-কৌশলেরও সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, এই শ্লোকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ ধরণি বিজ্ঞাপক "ক্ষোণী"-শব্দ বৈদিক-সাহিত্যে [ঋগ্বেদ ১।৫৪।১] দেখিতে পাওয়া যায়। লৌকিক-সাহিত্যে "ক্ষোণী" এবং "ক্ষৌণী" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অমর কোষের ২।১।২

"ধারা-ধরিত্রী-ধরণী-ক্ষোণী-জ্যা-কাশ্যপী-ক্ষিতি."

স্মরণীয়। এই শ্লোকের বর্ণনা-কৌশলে রাজ-ভবনের নিকটেই মন্ত্রি-ভবন অবস্থিত থাকিবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে গরুড়-স্তম্ভটি অদ্যাপি তাহার পুরাতন প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দণ্ডায়মান আছে, তাহা যে মন্ত্রিভবনের একাংশমাত্র, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবার কারণ নাই; সুতরাং রাজধানীও তাহার অনতিদূরেই বর্ত্তমান ছিল।

* উড়ুপচ্ছবি-পীঠং" এই বিশেষণের "উড়ুপ"-শব্দের অর্থ—চন্দ্র। এরূপ অর্থে "উড়ুপ"-শব্দের প্রয়োগ কাব্যাদিতে বিরল হইলেও, নক্ষত্র-বাচক উড়ু-শব্দের প্রয়োগ জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপরিচিত। মহাভারতে [বনপর্ব্ব] চন্দ্র-বাচক উড়ুপ"-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"অপশ্যদ্বদনং তস্য রশ্মিবন্তমিবোড়ুপম্।"

† প্রবল পরাক্রান্ত পাল-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে [স্বকীয় মন্ত্রিবরের সম্মুখে] দেবপালদেবের "সচকিত ভাবে" উপবেশন করিবার কারণ কি, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক দেবপালের পিতামহ গোপাল দেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত হইবার কথা স্মরণ করিলে, লোক-নায়ক মন্ত্রিগণকেই [King-maker] রাজ-নির্ব্বাচনকারী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। "সচকিত"-শব্দের প্রয়োগে [ইঙ্গিতে] সেই ঐতিহাসিক-তত্ত্ব সূচিত হইয়া থাকিতে পারে। নচেৎ কেবল মন্ত্রিবরের প্রতি পদোচিত সম্মান-প্রদর্শন-বিজ্ঞাপনার্থ "সচকিত"-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহাতে বৌদ্ধ-নরপালগণের শাসন-সময়ে বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণের সমুচিত পদমর্য্যাদার অভাব না থাকিবারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অধ্যাপক কিলহর্ণ "অগ্রে"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—first offered to him a chair of state. মন্ত্রিবংশের কিরূপ প্রাধান্য ছিল, ইহাতেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

‡ সপ্তর্ষির একতম ঋষি অত্রির নয়ন হইতে ধ্যান-পরম্পরা-পরিণত-পরম-জ্যোতিরূপে চন্দ্র আবির্ভূত হইবার যে পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, এই শ্লোকে এবং লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

§ "পরমেশ্বর-বল্লভ"-শব্দ দ্ব্যর্থ;—[সোমেশ্বর পক্ষে] "রাজার প্রিয়", [চন্দ্রপক্ষে] "মহাদেবের প্রিয়।"

৯। তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত [উচ্চ] স্থানে আরোহণ করিয়াও, [বিক্রম প্রকাশের পাত্রাপাত্র-বিচার-সময়ে ধনঞ্জয়ের ন্যায়] ভ্রান্ত বা নির্দ্দয় হইতেন না; তিনি অর্থিগণকে বিত্তবর্ষণ করিবার সময়ে, [তাহাদের মুখের] স্তুতি-গীতি শ্রবণের জন্য উদগর্ব্ব হইতেন না; তিনি ঐশ্বর্য্যের দ্বারা বহু বন্ধুজনকে [সংবল্গিত] নৃত্যশীল * করিতেন; [বৃথা] মধুরবচন-প্রয়োগেই তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেন না। [সুতরাং] এইসকল জগদ্বিসদৃশ-স্বগুণগৌরবে তিনি সাধুজনের বিস্ময়ের উৎপাদন করিয়াছিলেন।

১০। শিব যেমন শিবার, [এবং] হরি যেমন লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ গৃহাশ্রম-প্রবেশ-কামনায় আত্মানুরূপা রল্লাদেবীকে + যথাশাস্ত্র [পত্নীরূপে] গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১। তাঁহাদিগের কেদারমিশ্র নামে তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভ কার্ত্তিকেয়-তুল্য ‡ [এক] পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার [হোমকুণ্ডোত্থিত] অবক্র-ভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নি-শিখাকে চুম্বন করিয়া, দিকচক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাঁহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দ্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ-পরিণত অশেষ বিদ্যা [যোগ্যপাত্র পাইয়া] তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। তিনি স্ব-কর্ম্মগুণে দেব-নরের হৃদয়-নন্দন হইয়াছিলেন। §

১২। তিনি বাল্যকালে একবারমাত্র দর্শন করিয়াই, চতুর্ব্বিদ্যা-পয়োনিধি * পান করিয়া, তাহা আবার উদ্গীর্ণ করিতে পারিতেন বলিয়া, অগস্ত্য-প্রভাবকে + উপহাস করিতে পারিয়াছিলেন।

১৩। [এই মন্ত্রিবরের] বুদ্ধি-বলের উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর [দেবপালদেব] ‡ উৎকল-কুল উৎকিলিত করিয়া,

---

* গতিবোধক বল্গ ধাতু হইতে "সংবল্গিত" হইয়াছে। অশ্বের গতিবিশেষ "বল্গিত" নামে পরিচিত। ইহার ভাবার্থ, "নৃত্যশীল" বলিয়া গৃহীত হইল।

+ পণ্ডিত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "তরলাদেবী" পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। উইল্‌কিন্সের ইংরাজী অনুবাদে "রল্লাদেবী" পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পাঠ [রল্লা] স্তম্ভগাত্রে স্পষ্টাক্ষরে উৎকীর্ণ আছে। এই নাম এ কালের পক্ষে রুচিকর না হইলেও, সেকালে সুপরিচিত ছিল বলিয়াই, ইহার ব্যুৎপত্তি রঘুনাথ-চক্রবর্ত্তী-কৃত অমর-টীকায় ব্যাখ্যাত আছে। "রল্লা" শব্দের অর্থ, রমণীয়া—ইচ্ছাবিবর্দ্ধিনী।

‡ এই শ্লোকে এক অর্থে কার্ত্তিকেয়কে, অন্য অর্থে কেদারমিশ্রকে, সূচিত করিবার জন্য অনেকগুলি দ্ব্যর্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মিশ্র-পক্ষে "শিখি-শিখা" হোমাগ্নিশিখা; কার্ত্তিকেয়-পক্ষে "ময়ূর-পিচ্ছ"। মিশ্র-পক্ষে "স্ফারশক্তি" বাহুবল; কার্ত্তিকেয়-পক্ষে "শক্তি" নামক অস্ত্র। মিশ্র-পক্ষে "বিদ্যা" জ্ঞান; কার্ত্তিকেয়-পক্ষে "মাতৃকাগণ"। মিশ্র-পক্ষে "স্বক্রিয়া" যাগ যজ্ঞ; কার্ত্তিকেয়-পক্ষে "অসুর-নিপাত"। মিশ্র-পক্ষে "জাতরূপ" প্রশস্তরূপ; কার্ত্তিকেয়-পক্ষে "কাঞ্চন"—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, শ্লিষ্ট-প্রয়োগ-কৌশল বুঝিতে পারা যাইবে। কার্ত্তিকেয়ের ধ্যানের সঙ্গেও ইহার কিছু সম্পর্ক আছে। যথা—

"কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি-সংস্থিতং
তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভং শক্তি-হস্তং বর-প্রদং।
দ্বিভুজং শত্রু-হন্তারং নানালঙ্কার-ভূষিতং।
প্রসন্ন-বদনং দেবং সর্ব্ব-সেনা-সমাবৃতম্।"

§ এই শ্লোকের প্রথম-চরণোক্ত সমাসান্ত পদটি অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ কর্ত্তৃক ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। তিনি ইহাকে ব্যাকরণ-দুষ্ট বলিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,—"As redgards grammar I need draw attention only to the first compound in verse 11, which is formed incorrectly." "শিখি-শিখা দিক্-চক্রবালকে চুম্বন করিতেছে" বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, ব্যাকরণ-দোষ সঙ্ঘটিত হইতে পারে; কিন্তু কবি বলিয়াছেন,—"দিক্‌চক্রবালই শিখি-শিখা চুম্বন করিতেছে।" হোমাগ্নি-শিখা [অজিহ্ম] অবক্র হইলে, "যোগ-ক্ষেম" সূচিত করে। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,—"None of the ordinary meanings of *ajimha* appears very appropriate." "অজিহ্ম"-শব্দের প্রয়োগ দুর্লভ হইলেও, অপরিচিত বলিয়া কথিত হইতে পারে না। যথা—

"অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ ব্রাহ্মণ্য জীবিকাম্।"

* চতুর্থ শ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকেও "বেদ"-অর্থে "বিদ্যা"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদ্যার সংখ্যা চতুর্দ্দশ, মতান্তরে অষ্টাদশ। এখানে সে অর্থ সূচিত হয় নাই। সুতরাং কেদারমিশ্র বেদজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

+ অগস্ত্য [সমুদ্রপান-কালে] বালক ছিলেন না। তিনি একটিমাত্র সমুদ্র পান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাকে আর উদ্গীর্ণ করিতে পারেন নাই; ইহাই [ইঙ্গিতে] উপহাসের কারণ বলিয়া ধ্বনিত হইয়াছে। অগস্ত্য ঋষি বলিয়া, উপহাসের অযোগ্য; তাঁহাকে উপহাস করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। তজ্জন্যই "বাল এব" বলিয়া, কবি বুঝাইয়াছেন,—কেদারমিশ্র বালক বলিয়াই, এরূপ করিয়াছিলেন;—তাহা ক্ষমার্হ।

‡ এই শ্লোকোক্ত "গৌড়েশ্বরের" নাম উল্লিখিত হয় নাই। পূর্ব্বাপর-সামঞ্জস্য-রক্ষার্থ তাঁহাকে "দেবপালদেব" বলিয়াই বুঝিতে হইবে। "চিরং"-শব্দেও তাহাই সূচিত হইয়াছে। দেবপালদেবের [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে ৩৩ সংবৎ লিখিত থাকায়, তাঁহার দীর্ঘকাল রাজ্যভোগের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৬ শ্লোকে] দেবপালদেবের শাসন-সময়েই [তদীয় ভ্রাতা জয়পাল কর্ত্তৃক] উৎকল বিজিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হূণ-গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড়-গুর্জ্জর-নাথ-দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র-মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৪। তিনি যাচকগণকে যাচক মনে করিতেন না;—মনে করিতেন, তাঁহার দ্বারা অপহৃত-বিত্ত § হইয়াই, তাহারা যাচক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আত্মা শত্রু-মিত্রে নির্ব্বিবেক ছিল। [কেবল] ভব-জলধি-জলে পতিত হইবার ভয় এবং লজ্জা [ভিন্ন] অন্য উদ্বেগ ছিল না। তিনি [সংযমাদি অভ্যাস করিয়া] বিষয়-বাসনা ক্ষালিত || করিয়া, পরম-ধাম-চিন্তায় আনন্দলাভ করিতেন।

১৫। সেই বৃহস্পতি-প্রতিকৃতি [কেদারমিশ্রের] যজ্ঞস্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্র-তুল্য শত্রু সংহারকারী নানা-সাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চির-কল্যাণকামী শ্রীশূরপাল * [নামক] নরপাল, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্লুত-হৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র [শান্তি] বারি † গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৬। তাঁহার দেবগ্রাম-জাতা ‡ বব্বা [দেবী] নাম্নী পত্নী ছিলেন। লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া, এবং [দক্ষ-দুহিতা] সতী অনপত্যা § [অপুত্রবতী] বলিয়া, তাঁহাদের সহিত [বব্বা দেবীর] তুলনা হইতে পারে না।

১৭। দেবকী গোপাল-প্রিয়কারক পুরুষোত্তম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন; যশোদা সেই লক্ষ্মীপতিকে [আপন পুত্ররূপে] স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বব্বা দেবীও, সেইরূপ, গো পাল-প্রিয়কারক পুরুষোত্তম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন; যশো-দাতারা || তাঁহাকে লক্ষ্মীর পতি বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮। তিনি জমদগ্নিকুলোৎপন্ন সম্পন্ন-ক্ষত্র-চিন্তক* [অপর] দ্বিতীয় রামের [পরশুরামের] ন্যায়, রাম

§ "স্বয়মপহৃতবিত্তান্" এই বিশেষণ-পদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য অধ্যাপক কিলহর্ণ চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল লিখিয়া গিয়াছেন,—"He allowed suppliants to take freely away his riches." উইল্‌কিন্স কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্যের আভাস দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"He considered his own acquired wealth the property of the needy." এই বিশেষণটি সমাজ-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া, সেকালের বাঙ্গালার ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

|| অধ্যাপক কিলহর্ণের অনুবাদে 'পরিমৃদিত"-শব্দের [বৈদ্যকশাস্ত্র-সম্মত] চূর্ণীকৃত [crushed] অর্থ গৃহীত হইয়াছে; এবং তজ্জন্যই শ্লোকার্থ বিকশিত হয় নাই। উপনিষৎ ও দর্শনাদিতে ব্যবহৃত "মৃদিত-কষায়"-শব্দ সুপরিচিত। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়;—"আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ স্তস্মাৎ মৃদিত-কষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি।" ইহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়া গিয়াছেন,—"রাগ-দ্বেষাদি দোষের নাম কষায়; জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসরূপ ক্ষার-জলে তাহা [মৃদিত] ক্ষালিত হইয়া থাকে।" যথা,— "কষায়ো রাগ-দ্বেষাদি দোষঃ [সত্ত্ব বন্ধন-রূপত্বাৎ], জ্ঞান বৈরাগ্যাভ্যাসরূপ ক্ষারেণ ক্ষালিতো মৃদিতো বিনাশিতঃ" ইত্যাদি।

* এই শ্লোকের "শূরপাল"কে, ডাক্তার হরণ্‌লি "প্রথম বিগ্রহপাল" বলিয়া গ্রহণ করায়, সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অধ্যাপক কিলহর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন,—"As to Suropàla I readily adopt Dr. Hœrnle's suggestion that he is identical with the Vigrahapàla of the Bhàgalpur copper-plate, the immediate predecessor of Nàràyanapàla."

† অনেকে এই শ্লোকে [ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মতানুসরণ করিয়া,] শূরপালদেবের "অভিষেক-ক্রিয়ার" সন্ধান লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু "ভূয়ঃ"-শব্দ তাহার প্রবল অন্তরায়। বহুলোকে আত্মকল্যাণ-কামনায় যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হইয়া, মস্তকে শান্তি-বারি গ্রহণ করিয়া থাকে। "নানাসাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চির-কল্যাণকামী" শূরপাল নামক নরপালও সেইরূপ করিতেন। "ভূয়ঃ"-শব্দে, কেদারমিশ্রের অনেকবার যজ্ঞ করিবার, এবং শূরপালদেবেরও অনেকবার [যজ্ঞ-স্থলে] মস্তকে শান্তি-বারি গ্রহণ করিবার পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে। এই শ্লোকে যদি কোন ঐতিহাসিক তথ্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে তাহা এই,—(১) শূরপালদেবের শাসন-সময়েও, বরেন্দ্র-মণ্ডলে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। (২) বৌদ্ধ-মতাবলম্বী রাজা যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হইয়া, মস্তকে শান্তি-বারি গ্রহণ করিতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন; এবং (৩) তাহাতে রাজ্যের কল্যাণ হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। কেদারমিশ্রকে বৃহস্পতির সহিত এবং শ্রীশূরপালদেবকে ইন্দ্রদেবের সহিত তুলনা করিয়া, কবি তাহারই আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

‡ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, [রামচরিত কাব্যের ভূমিকায়] দেবগ্রামকে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কেন, তাহার কোন কারণের উল্লেখ করেন নাই।

§ এই শ্লোকের "অতুল্যা"-শব্দ রচনা কৌশল-বিজ্ঞাপক। দক্ষ-দুহিতা সতী সন্তান-লাভের পূর্ব্বেই, দক্ষ-যজ্ঞে প্রাণ বিসর্জ্জন করায়, "অনপত্যা" ছিলেন। লক্ষ্মীও চঞ্চলা বলিয়াই সুপরিচিতা। সুতরাং, ইহাদের সহিত তুলনা দিতে না পারিয়া, কবি "অতুল্যা"-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

|| এই শ্লোকে শ্লিষ্ট প্রয়োগের অভাব নাই। দেবকীনন্দন-পক্ষে অর্থ সুব্যক্ত। বব্বানন্দন-পক্ষে "গো-পাল-প্রিয়-কারকের" অর্থ পৃথিবী-পালক "রাজার" প্রিয়কারক; "পুরুষোত্তমের" অর্থ "পুরুষশ্রেষ্ঠ" এবং "যশোদার" অর্থ "যশোদাতা"। এই অর্থে "যশোদা"-শব্দ তৈত্তিরীয়-সংহিতায় [৪।৪।৬।২] ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

"যশোদাং ত্বা যশসি তেজোদাং ত্বা তেজসীতি।"

* পরশুরাম-পক্ষে অর্থ—"সম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের নিধন-চিন্তাকারী"; মিশ্র-পক্ষে অর্থ—"সম্পৎ-নক্ষত্রচিন্তক" [জ্যোতিষিক গণনাকারী]।

[অভিরাম], শ্রীগুরবমিশ্র + এই আখ্যায় [পরিচিত ছিলেন]।

১৯। [পাত্রাপাত্র-বিচার]-কুশল গুণবান্ বিজিগীষু শ্রীনারায়ণপাল [নরপতি] যখন তাঁহাকে মাননীয় † মনে করিতেন, তখন আর তাঁহার অন্য [প্রশস্তি] প্রশংসা-বাক্য কি [হইতে পারে ?]

২০। তাঁহার বাগ্‌বৈভবের কথা, আগমে § ব্যুৎপত্তির কথা, নীতিতে পরম নিষ্ঠার কথা, মহতের গুণ-কীর্ত্তনে আসক্তির কথা, জ্যোতিষে অধিকারের কথা, এবং বেদার্থ-চিন্তা-পরায়ণ অসীম-তেজঃসম্পন্ন তদীয় বংশের কথা, ধর্ম্মাবতার ‖ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

২১। সেই শ্রীভৃৎ [ধনাঢ্য] এবং বাগধীশ [সুপণ্ডিত] ব্যক্তিতে একত্র মিলিত হইয়া, পরস্পরের সখ্য-লাভের জন্যই, স্বাভাবিক শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েই যেন [একত্র] অবস্থিতি করিতেছেন।

২২। শাস্ত্রানুশীলন-লব্ধ-গভীর-গুণ-সংযুক্ত বাক্যে [তর্কে] তিনি বিদ্বৎ-সভায় প্রতিপক্ষের মদগর্ব্ব * চূর্ণ করিয়া দিতেন ; এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও + অসীম-বিক্রম-প্রকাশে, অল্পক্ষণের মধ্যেই, শত্রুবর্গের "ভটাভিমান" [যোদ্ধা বলিয়া অভিমান] বিনষ্ট করিয়া দিতেন।

২৩। যে বাক্যের ফল তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত হইত না, তিনি সেরূপ [বৃথা] কর্ণ-সুখকর বাক্যের অবতারণা করিতেন না। যেরূপ দান পাইয়া [অভীষ্ট পূর্ণ হইল না বলিয়া] যাচককে অন্য ধনীর নিকট গমন করিতে হয়, তিনি কখনও সেরূপ [কেলি-দানের] ‡ দান-ক্রীড়ার অভিনয় করিতেন না।

২৪। কলিযুগ-বাল্মীকির § জন্ম-সূচক, অতি রোমাঞ্চোৎপাদক, ধর্ম্মেতিহাস-গ্রন্থ-সমূহে, সেই পুণ্যাত্মা শ্রুতির বিবৃতি [ব্যাখ্যা] করিয়াছিলেন।

২৫। তাঁহার সুর-তরঙ্গিণীর ন্যায় অ-সিন্ধু-গামিনী

+ অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ ইঁহার নাম "রামগুরব মিশ্র" বলিয়া লিখিবার পর হইতে, অনেকেই "রামগুরব" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "শ্রীগুরব মিশ্রাখ্য" বলিয়া কবি প্রকৃত নামেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ; রাম-শব্দ তাহার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

† নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৫২—৫৩ পংক্তিতে] ভট্টগুরব "দূতক" বলিয়া উল্লিখিত। ধর্ম্মপালের এবং দেবপালের তাম্রশাসনে যুবরাজ ত্রিভুবনপাল এবং যুবরাজ রাজ্যপাল "দূতক" বলিয়া উল্লিখিত। ভট্টগুরব কিরূপ সমাদরের পাত্র ছিলেন, ইহাতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ "traditional lore" বলিয়া "আগম"-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ অর্থে "আগম" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল শাস্ত্রই "আগম" ; তন্মধ্যে তন্ত্র-শাস্ত্রই "আগম" নামে প্রসিদ্ধ। সকল তন্ত্র "আগম" নহে ; সপ্ত-লক্ষণ-সংযুক্ত কোন কোন তন্ত্রই "আগম" নামে কথিত। যথা—

"আগতং পঞ্চবক্ত্রাত্তু গতঞ্চ গিরিজাননে।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদ্ আগম উচ্যতে।"

যদ্বা

"আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজামুখে।
মতস্তস্যা হৃদম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে।"

"আগম" বেদাঙ্গ বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইত। মেরুতন্ত্রে তাহা উল্লিখিত আছে। যথা—

"ন বেদঃ প্রণবং ত্যক্ত্বা মন্ত্রো বেদ-সমন্বিতঃ।
তস্মাদ্ বেদপরো মন্ত্রো বেদাঙ্গ আগমঃ স্মৃতঃ।"

বিচার-কার্য্যে ব্যবহৃত সাক্ষ্যপত্রাদি "আগম" নামে ব্যবহার-মাতৃকায় উল্লিখিত আছে ; মনুসংহিতায় পারিভাষিক অর্থে "আগম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যথা—

"নাধর্ম্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতি বর্ত্ততে।"

এই শ্লোকের "ধর্ম্মাবতার"-শব্দ রাজাকে সূচিত করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। তিনি যে আপন তাম্রশাসনে ভট্টগুরবের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা "ভাগলপুর-লিপিতে" দেখিতে পাওয়া যায়।

* এই শ্লোকের "পরবাদি-মদাবলেপঃ" প্রয়োগটি উল্লেখযোগ্য। প্রতিবাদী বা বিরুদ্ধবাদীর নাম "পরবাদী।" "অবলেপ"-শব্দের অর্থ "লেপন" এবং "গর্ব্ব"। এখানে আত্ম-প্রাধান্য-বিজ্ঞাপক গর্ব্ব বুঝাইবার জন্যই "মদাবলেপ" ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ অর্থে "অবলেপ"-শব্দের ব্যবহারের সুপরিচিত নিদর্শন [মেঘদূতের]

"দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্।"

+ ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রম-প্রকাশের এই আখ্যায়িকা কবি-কাহিনী বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। সেকালে বাঙ্গালা দেশেও যে ইহা সত্য ঘটনা বলিয়া সুপরিচিত ছিল তাহা কুমারপালদেবের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক [বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনোক্ত] কামরূপ-জয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

‡ এই শ্লোকের চতুর্থ চরণের শেষ দুইটী অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভট্টগুরব যাঁহার মন্ত্রিত্ব করিতেন, সেই নারায়ণপালদেবও এইরূপ দানশীল ছিলেন বলিয়া তদীয় [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [১৪শ শ্লোকে], পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ এই শ্লোকে "সূচক"-অর্থে "পিশুন"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ এই শ্লোকের প্রথম চরণের শেষে একটি (চ) অক্ষর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মূল লিপিতে তাহা না থাকায়, ছন্দোভঙ্গ ঘটিতে পারে মনে করিয়া, অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ এরূপ করিয়া থাকিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ স্থলে চরণান্ত অক্ষরটি গুরুবর্ণ রূপে ধরিয়া লইবার রীতি প্রচলিত থাকায়, ছন্দোভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে না।

প্রসন্ন-গম্ভীরা বাণী [জগৎকে] যেমন তৃপ্তিদান করিত, সেইরূপ পবিত্র করিতে। ‖

২৬। তাঁহার বংশে ব্রহ্মা স্বয়ং পিতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, আবার স্বয়ং পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; [ইতি] এইরূপ মনে করিয়া, [লোকে] তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের এবং তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত।*

২৭। তাঁহার [সুকুমার] শরীর-শোভার ন্যায় লোক-লোচনের আনন্দদায়ক, তাঁহার উচ্চান্তঃকরণের অতুলনীয় উচ্চতার ন্যায় উচ্চতা-যুক্ত, তাঁহার সুদৃঢ় প্রেম-বন্ধনের ন্যায় দৃঢ়সংবদ্ধ, কলিহৃদয়-প্রোথিত-শল্যবৎ সুস্পষ্ট- [প্রতিভাত] এই স্তম্ভে, তাঁহার দ্বারা হরির প্রিয়সখা ফণিগণের [শত্রু] এই গরুড়মূর্ত্তি [তার্ক্ষ্য] আরোপিত হইয়াছে। †

২৮। তাঁহার যশ অখিল দিগন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, এই পৃথিবী হইতে পাতাল-মূল পর্য্যন্ত গমন করিয়া, [আবার] এখানে হৃতাহি-গরুড়চ্ছলে উত্থিত হইয়াছে। ‡

‖ এই শ্লোকের বিলুপ্ত অক্ষরগুলির মধ্যে উইল্‌কিন্স "ত্রিধা"-শব্দটি পাঠ করিয়া, "flowing in a triple course," বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল "ধা"-অক্ষরটি কোনক্রমে দৃষ্টিগোচর হয়। "স্বর্ধুনী" [মন্দাকিনী] সমুদ্রে পতিত হয় নাই বলিয়া, "অসিন্ধু-প্রসূতা।" কিন্তু বাণী-পক্ষে তাহার অর্থ কি, তাহা প্রতিভাত হয় না। তৎকালে সিন্ধুদেশ যবনাক্রান্ত থাকায়, তথায় পাল-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর আদেশবাণী প্রসৃত হইত না,—এইরূপ অর্থ ইঙ্গিতে সূচিত হইয়াছে কিনা তাহা চিন্তনীয়।

* এই শ্লোকের "প্রপেদিরে" ক্রিয়াপদের অনুক্ত কর্ত্তৃপদ "লোকা" ধরিয়া লইয়া, অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন। ব্রহ্মার নব-মানস-পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবার পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া, এই শ্লোক রচিত হইয়া থাকিতে পারে।

† অক্ষর-বিলোপ এই শ্লোকের ভাব-প্রকাশের অন্তরায় হয় নাই ; কিন্তু বিলুপ্ত অক্ষরগুলির দ্বারা কি কি শব্দ উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করিবার উপায় নাই।

‡ যাহারা অন্যের যশঃ সহ্য করিতে পারে না, তাহারা সর্পবৎ খল বলিয়া, সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপরিচিত। তাহাদের পরাভব সূচিত করিবার জন্য, স্তম্ভের উপর "হৃতাহি-গরুড়-মূর্ত্তি" স্থাপিত হইয়া থাকিতে পারে। যশের বর্ণ শুভ্র বলিয়া সুপরিচিত ; তাহার সহিত গরুড়ের বর্ণের কোনরূপ সাদৃশ্য আছে কি না, তাহা চিন্তনীয়। তান্ত্রিক পদ্ধতি-ক্রমে গরুড়-পূজার যে ধ্যান উল্লিখিত আছে, তাহা এইরূপ ; যথা—

"वर्म्मान्त-वह्नियुग्माम्बर-कमलगतं पञ्चभूतात्मवर्णं
कल्पमाकल्पं फणीन्द्रैरभयवरकरं पद्मनेत्रं सुवक्त्रम् ।
दुष्टाहिच्छेदितुण्डं सुरवरदखिलविषघ्नीषणं प्राणभूतं
प्राणश्रेष्ठं निवेदीतनुमनलमयं पक्षिराजं भजेऽहम् ॥"

[এই] প্রশস্তি সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছে। §

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

জাপানের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট মুৎসুহিতোর রাজত্বকালে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরে জাপানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, ইউরোপে তাহা হইতে চারিশত বৎসর লাগিয়াছিল। আধুনিক বা প্রাচীন আর কোনো রাজার আমলে এরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। অতএব তিনি যে সকল দেশের রাজাদের মধ্যে প্রথম-শ্রেণীস্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার দেশের বহু মনীষী জাতীয় জীবনের ও রাষ্ট্রীয় নানা বিভাগের উন্নতি করিয়াছেন এবং তিনি সাক্ষী গোপালের মত দেখিয়াছেন, তাহা নয় ; তিনি সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের ও উন্নতির মূলে ছিলেন, এবং তিনি সকলের পরিচালক ছিলেন। যাঁহারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে নিরাশ, তাঁহারা জাপানের কথা ভাবিলে আশান্বিত হইতে পারেন। কিন্তু জাপানে ভারতবর্ষে প্রভেদটাও ভুলা উচিত নয়। জাপানে এত ভাষাবাহুল্য, জাতিবৈচিত্র্য এবং ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংঘর্ষ ছিল না। জাপান সর্ব্ববিধ উন্নতিতে রাজার সাহায্য পাইয়াছে। বিদেশীর অধীনতার অবসাদ জাপানকে অসাড় করে নাই। এইসকল কথা স্মরণ করিয়া জাপানীদের উৎসাহের দ্বিগুণ উৎসাহে আমরা জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করিলে, তবে আমরা সফলকাম হইতে পারিব।

এ. ও. হিউম্ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন দূরদর্শী প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। অনেক ইংরেজ মনে করেন যে তিনি ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ রাজত্ব লুপ্ত করিবার জন্য কংগ্রেস স্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি বাস্তবিক ভারতে ব্রিটিশ শাসন দৃঢ় এবং স্থায়ী করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদসাধনই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হইত,

§ ইহা সূত্রধারের চ্যুত-সংস্কৃত-রচনার নিদর্শনমাত্র।

তাহা হইলে তিনি সিপাহী যুদ্ধের সময় সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন না, বরং তাহাদের সাহায্যই করিতেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসনকে ভারতে চিরস্থায়ী করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মনে করিতেন যে ইহাতেই তাঁহার স্বদেশ ও ভারতবর্ষ উভয়েরই প্রকৃত কল্যাণ হইবে। এইজন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি তাঁহার সময়, শক্তি ও অর্থ কংগ্রেসের কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় শিক্ষিত ভারতবাসীদের অনেকে সচেতন হইয়াছেন ও ভারতবর্ষের কল্যাণ হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলে ইহার প্রকৃত কল্যাণ হইবে না, তাঁহারাও হিউম সাহেবের নিকট ঋণী। কারণ ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর চরম আদর্শ কি, এই চিন্তা ও এতদ্বিষয়ক আলোচনার অন্যতম কারণ কংগ্রেস্, এবং কংগ্রেসের মূলে হিউম। তিনি হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। সকলেরই তাঁহার মত কর্ত্তব্যসাধনে সর্ব্বদা সচেষ্ট হওয়া উচিত।

হিউম সাহেব একজন বিখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিৎ ছিলেন। ভারতবর্ষের শিকারের পাখী সম্বন্ধে তাঁহার একখানি উৎকৃষ্ট সচিত্র বহি আছে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ থিয়সফিষ্ট ছিলেন।

সাত বৎসর পূর্ব্বে ৭ই আগষ্ট তারিখে বঙ্গে যথাসাধ্য বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবার প্রতিজ্ঞা করা হয়। তাহার ফল আশানুরূপ হয় নাই। কিন্তু কিছুই হয় নাই, তাহাও বলা যায় না। সাময়িক কিছু ফল হইয়াছিল, স্থায়ী ফলও কিছু হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ শিল্পবিষয়ে আমাদের শিক্ষার অভাব, যথেষ্ট মূলধনের অভাব, শাসন ও পুলিস বিভাগের বিরোধিতা, এবং অনেক প্রবঞ্চক দোকানদারের স্বদেশী বলিয়া বিদেশী জিনিব বিক্রয় করা। কিন্তু আমরা যতবারই অকৃতকার্য্য হই না কেন, স্বদেশী লক্ষ্য ছাড়া উচিত নয়। জাতীয় চরিত্র উন্নত করিবার চেষ্টা, শিল্পবিষয়ে শিক্ষালাভ, মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা এবং স্বদেশী জিনিষ সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবার চেষ্টা আমাদের বিশেষভাবে করা কর্ত্তব্য। আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে একমাস কাল ধরিয়া কলিকাতার স্বদেশী মেলা খোলা থাকিবে। ইহাতে পূজার বাজারে স্বদেশী জিনিষ ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা হওয়া উচিত।

গবর্ণমেণ্ট প্রথমে শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। এখন বলিতেছেন যে আসানসোলে বা বরাকরে একটি খনির (Mining) এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষালয় হইবে, অন্যত্র একটি শিল্পশিক্ষালয় হইবে, এবং শিবপুরে যে সিবিল এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে তথায় স্থাপিতব্য এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে দেওয়া হইবে। এইরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নানারূপ আপত্তি আছে। প্রথম আপত্তি এই, যে, এই তিন রকম শিক্ষালয়ের শিক্ষিতব্য কতকগুলি সাধারণ বিষয় আছে। তজ্জন্য তিন জায়গায় স্বতন্ত্র শিক্ষক, যন্ত্রাগার, প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্রভাবে খরচ করা অনাবশ্যক। তিনটি শিক্ষালয় এক স্থানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর একটি আপত্তি এই যে জগতের সমুদয় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনীয়ারিং একটি প্রধান শিক্ষার বিষয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অঙ্গটি ছেদন করিয়া ইহাকে অঙ্গহীন কেন করা হইবে? শিবপুর যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, ত, কলিকাতার উপকণ্ঠে স্বাস্থ্যকর স্থান ত অনেক আছে বা করা যাইতে পারে। কলিকাতা ছাড়িয়া দিলে আসান-সোলের নিকটেও ত যায়গা পাওয়া যাইতে পারে।

আমরা ঢাকায় এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু কলিকাতাকে অঙ্গহীন করিয়া একাজ করা উচিত নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগও থাক্, ঢাকাতেও কলেজ হউক, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। ঢাকা ও কলিকাতায় কোন ঝগড়া নাই। যাঁহারা এই প্রসঙ্গে ঢাকা ও কলিকাতায় ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা দেশের শত্রু। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গ বলিয়া যাঁহারা বঙ্গের দুটা ভাগ কল্পনা করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পশ্চিমবঙ্গের সীমা কোথায় এবং পূর্ব্ববঙ্গেরই বা আরম্ভ কোথায়? গবর্ণমেণ্ট একটা ভাগ করিয়া দিলেই ত সেটা স্বাভাবিক ভাগ হয় না।

যে ভূভাগের ভাষা এক, যাহার অধিবাসীদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চলে, তাহা এক দেশ, তাহার স্বার্থ এক। যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের উপকার করিতেছি বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিষ্ট করিতেছেন, তাঁহাদের কথায় কেহ ভুলিবেন না। পূর্ব্ববঙ্গে নানাবিধ শিক্ষালয় খুব বাড়ুক, তাহা খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিষ্ট করিয়া ঢাকার উপকার করিতে যাঁহারা চান, তাঁহাদের চেষ্টার সমর্থন আমরা কোন ক্রমেই করিতে পারিনা।

শ্রীযুক্ত কাশীপতি ঘোষ আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।



শ্রীযুক্ত কাশীপতি ঘোষ।

জলপ্রবাহের শক্তি হইতে তাড়িত শক্তি উৎপাদনের উপায় ও কলকারখানা সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিনি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কস্মোপলিটান ক্লবের (সার্ব্বদেশিক সভার) দুইবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার সরকার ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বল ১৯১০ সালে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বৃত্তি লইয়া শিক্ষা লাভার্থ আমেরিকা গিয়াছিলেন। ধীরেন্দ্রকুমার প্রথমে বিখ্যাত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। উহার



শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার সরকার।

বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি নানা বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাহার পর তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। বর্ত্তমান বৎসরে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস্‌সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি গ্রীষ্মাবকাশ ও অন্যান্য ছুটির সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া চারি বৎসরের কাজ দুই বৎসরে করিয়াছেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সকলে যোগ্য ছাত্রদের এরূপ সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়।

সুরেন্দ্রনাথও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস্‌সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনিও ছুটির সময় অতিরিক্ত



শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বল।

পরিশ্রম করিয়া ৪ বৎসরের কাজ দুই বৎসরে করিয়াছেন। তিনি ঔষধ প্রস্তুত করা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

ভারতবর্ষে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, তাঁহারা সকলেই স্বদেশহিতৈষী হইতে পারেন। হয়ত ক্রমশঃ সকল সম্প্রদায়ের লোক সমান স্বদেশভক্ত হইবেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারতবর্ষকেই পূর্ব্বপুরুষদের ও নিজেদের মাতৃভূমি, ভারতবর্ষকেই নিজেদের প্রাচীন জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতার খনি, জানিয়া, ভারতবর্ষ ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর নাই বুঝিয়া, এই দেশকে যে ভাবে দেখেন, মুসলমানেরা সে ভাবে দেখেন না। মুসলমানদের নামগুলি বিদেশী, অন্ত সম্প্রদায়ের নামগুলি দেশী। মুসলমানদের ধর্ম্ম ও নাম পৃথিবীর নানা দেশে একই রূপ হওয়ায় তাঁহাদের সকলের মধ্যে একটি বন্ধনরজ্জু আছে। ইহা খুব সুবিধাজনক। কিন্তু নামটি সর্ব্বত্র একই রূপ হওয়ায় মুসলমান কোন কোন দেশে সম্পূর্ণ দেশী হইতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক দেশেই পুরা দেশী হইতে পারেন না; বিশেষতঃ সেই সব দেশে যেখানকার সমুদয় বা অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান নয়; — যেমন ভারতবর্ষ।

মুসলমানদের শাস্ত্রে এমন কোন অলঙ্ঘনীয় বিধি আছে কিনা জানি না যে তাঁহাদের নাম আরবী হওয়াই চাই। শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমানেরা বলিতে পারিবেন। খৃষ্টানদের শাস্ত্রে এরূপ নিয়ম নাই যে খৃষ্টান যে দেশেরই হউন, তাঁহার নাম ইহুদীদেশের হওয়া চাই ই। কারণ আমরা দেখিতেছি, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীমোহন রুদ্র, খৃষ্টান ছিলেন। আমাদের মনে হয় কোন শাস্ত্রীয় বাধা না থাকিলে কোন এক দেশের সকল লোকের নাম সেই দেশের ভাষা হইতে গৃহীত হওয়া উচিত। তাহা হইলে সমস্ত জাতিটার মধ্যে বেশ একটি জমাট ভাব আসিতে পারে।

ইউরোপের নানা জাতির লোকদের ব্যক্তিগত নাম অনেক স্থলে ইহুদীদেশীয় হইলেও, তাহা ঠিক ইহুদী নয়, যেমন দায়ুদ ডেভিডে পরিণত হইয়াছে।

অতীত ভারতবর্ষকে আমরা বাদ দিতে পারি না। অতীত ভারতের ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান আদি সকল সম্প্রদায়েরই শিখিবার ও গৌরব করিবার জিনিষ আছে। কিন্তু আমাদের অতীত ইতিহাসে ঝগড়া বিদ্বেষের বিষয়ও আছে। দেশহিতের জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোক সম্মিলিত চেষ্টা করিয়া যদি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই একটি ভারতীয় জাতি গঠিত হইবে।

শ্রীযুক্ত মনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। তিনি মৈনপুরীতে ওকালতী

করিতেন। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন প্রধান লেখক ছিলেন। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়া পাঠকসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে তাঁহার সচিত্র জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল।

রক্তের বন্ধন সহজে ছিন্ন করা যায় না। ইউরোপে হাঙ্গেরীর খৃষ্টান মেগিয়ারেরা বংশতঃ মধ্য-এশিয়ার হুন। ইউরোপীয় তুরুস্কের মুসলমানেরাও মধ্য-এশিয়ার তুর্ক। হুন ও তুর্কের মধ্যে হয় ত জ্ঞাতিত্ব ছিল, হয় ত ছিল



আলেকজান্দার ক্সোমা কোরস।

না। কিন্তু উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষেরা মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী ছিল বলিয়া বর্ত্তমান তুর্ক-ইতালীয় যুদ্ধে হাঙ্গেরীর খৃষ্টান মেগিয়ারেরা ইউরোপীয় তুরুস্কের মুসলমান অধিবাসীদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইতেছে, খৃষ্টান ইতালীয়দিগের সঙ্গে নহে।

ক্সোমা ডি কোরস্ হাঙ্গেরীতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এই ধারণা হয় যে মেগিয়ারদের আদি জন্মভূমি তিব্বতে লাসার নিকট। তাই তিনি সেই পিতৃভূমি দর্শনার্থ ৩৬ বৎসর বয়সে এক বন্ধুর প্রতিশ্রুত বার্ষিক ১৫০ টাকা মাত্র বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া ইউরোপ হইতে তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে মিশরদেশ দর্শন করিয়া তিনি দুইবৎসর পরে তিব্বতে পৌঁছেন। সমস্ত পথ পদব্রজে অতিক্রম করেন। কেবল মধ্যে মধ্যে সাগর ও নদী পার হইবার জন্য জাহাজ ও নৌকার সাহায্য লন। তিব্বতে তিনি নয় বৎসর ছিলেন। তথায় বাসকালে তিব্বতীভাষা শিখেন ও বিস্তর তিব্বতী পুঁথি সংগ্রহ করেন। সেই সমস্তই তিনি কলিকাতায় আসিয়া এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করেন। তিনি চারি বৎসর ধরিয়া ব্রায়েন হজ্‌সনের সংগৃহীত তিব্বতী পুঁথির তালিকা প্রস্তুত করেন। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ক্সোমা ডি কোরসের তিব্বতী ব্যাকরণ ও অভিধান বাহির হয়। তাহার পর তিনি তিন বৎসর পূর্ব্ববঙ্গ ও সিকিমে ভ্রমণ করেন, এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষার নিজ জ্ঞান বৃদ্ধি করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে পাঁচ বৎসর তিনি এশিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে থাকিয়া নিজের উপহৃত পুস্তকাবলীর তালিকা প্রস্তুত করিতে থাকেন, এবং সোসাইটীর পত্রিকায় তিব্বতের ভূগোল, ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে লাসা যাইবার পথে দার্জিলিঙে তাঁহার মৃত্যু হয়। তথায় তাঁহার কবর আছে। এখন উহার মেরামত হইয়াছে। হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞান-পরিষদ সম্প্রতি বঙ্গের এশিয়াটিক সোসাইটীকে তাঁহার একটি সুন্দর আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। আমরা উহার ছবি এখানে দিলাম।

ক্সোমা ডি কোরস জ্ঞান অর্জ্জন ও জ্ঞান দানেই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, যদিও তাঁহার জাতির পিতৃ-ভূমি তিনি খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহার জীবন তপস্বীর মত সাদাসিধে ছিল। তিনি মদ্য, তামাক বা অন্যবিধ কোন মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। চা আর ভাত, এই তাঁহার খাদ্য ছিল। তাঁহার কেবল এক প্রস্থ পোষাক ছিল। তাঁহার সমুদয় আয় প্রাচ্যবিদ্যার

নানা শাখার উন্নতি ও বিস্তারকল্পে ব্যয়িত হইত। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি তিব্বতী-সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ তদীয় প্রবন্ধগুলিও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইবে। এমন জ্ঞানব্রত তপস্বীর জীবনচরিত আলোচনা করিলে উপকার হয়।

দুইজন বাঙ্গালী মনীষী, রাজনারায়ণ বসু ও তাঁহার সহাধ্যায়ী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কনৌজে পিতৃভূমি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। অবশ্য ক্ষোমা ডি কোরসের পিতৃভূমি-দর্শন-যাত্রার মত উহা দুঃসাধ্য ছিল না, এবং সেইজন্য তেমন চিরস্মরণীয়ও হয় নাই।

পুস্তক-পরিচয়

করঙ্ক—

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত গল্পপুস্তক। প্রকাশক শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ১২।১, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা। ১০৪ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

বহুদিন পূর্ব্বে সুধীন্দ্র বাবু বাংলা-সাহিত্যকে "মঞ্জুষা" উপহার দিয়াছিলেন, মাঝে "চিত্ররেখা" প্রকাশিত হইয়াছে, এখন "করঙ্ক" লইয়া তিনি বাংলা-সাহিত্যের দ্বারে হাজির হইয়াছেন। বয়সের সঙ্গে শক্তি হয় ত বাড়িয়াই চলিতে পারে; কিন্তু প্রকাশের অজস্র প্রাচুর্য্য যে দিন দিন কমিয়া আসে, তাঁহার পূর্ব্বের দান গল্পের 'পেটরা' এবং বর্ত্তমানের দান গল্পের 'কৌটা'ই তাহার সাক্ষ্য দিবে। এই কৌটায় আটটি কণিকা আছে, এগুলিকে রত্নকণিকা বলা যাইতেও পারে।

এই গল্প কয়টিতে সুধীন্দ্রনাথের দোষ গুণ তুল্যভাবেই বর্ত্তমান। একটি স্নিগ্ধ সজল সরল করুণাই অধিকাংশ গল্পের প্রাণ, এবং এইখানেই লেখকের বিশেষত্ব। লেখক কবিহৃদয়, শিক্ষা এবং সংস্কারের কৃত্রিমতা-বিমুক্ত আপন চিন্তধারাকে তিনি বাধানির্মুক্ত ভাবে শিশু-পশু এবং তরুজীবনের অন্তরতম স্থানটিতে বহাইয়া দিয়াছেন। লেখকের সহানুভূতির স্পর্শে গল্পগুলিতে মানব-নিম্নতম প্রাণী এবং বৃক্ষজীবনের মধ্যে একটি মধুর ঐক্যবন্ধন নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃত সহানুভূতির নিকট বাহিরের কোনো বাধা টিঁকিতে পারে না; রমানাথ তাই প্রলাপ বকিতে বকিতে সন্ধ্যামণির গাছটির কাছে আসিয়াই প্রাণত্যাগ করে, কাসিম আব্দুল্লার নিষ্ঠুর কবল হইতে মুক্ত শেখ মুরগীটিকে বক্ষে চাপিয়া থাকে, ব্রহ্মদেশবাসী তাই বহুদিন পরে আপন অনুরক্ত কুকুরটির সন্ধান পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে। মানবশিশুর বন্ধুত্বব্যাপার অনেকগুলি গল্পেরই কেন্দ্র। সেখানেও জমীদারপুত্র ও গরীবের ছেলে, কলিকাতাবাসী ও পাড়াগেঁয়ে, মুসলমান কাসিম ও হিন্দু জীবন, কলেজের যুবক ও অপরিচিত ধনীর বালক-পুত্রের মধ্যে বাহিরের বাধা ভেদ করিয়া অন্তরের মিলনের ইতিহাস উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে; সেখানেও বাল্যসঙ্গিনী সরলা-সুকুমারীর বয়স্কজীবনের ভেদকে ডুবাইয়া দিতেই সরলার ছেলে যতীনের আপনাকে ডুবাইতে হয়।

সুধীন্দ্র বাবুর "একতারাতে একটি যে তার" তিনি আপন মনে সেইটিই বাজান। ইহাতে করুণরসের আদিম সরল স্বরূপটি রক্ষিত হয় বটে, কিন্তু এই ভাবপ্রধান বিরলবর্ণ একরঙা ছবিটিতে বহুবিচিত্র মানবব্যাপারের চিত্র কিছুতেই প্রকটিত হইতে পারে না। করুণাই সুধীন্দ্র বাবুর গল্পের প্রাণ,—কিন্তু সেই প্রাণটি কত ক্ষীণ! সংসারোদ্যানের চক্ষুপল্লবপ্রান্তে ইহা ক্ষণকালের জন্য বিরাজ করিতে পারে সত্য, কিন্তু জীবনের মূলদেশে রস-সঞ্চারের দাবী ইহার খুব বেশী নাই।

বৈতানিক—

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত কবিতা পুস্তক। প্রকাশক, শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী ১২।১, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা। ৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য চার আনা।

ইহাতে ভগবদ্ভক্তি, নারী, গৃহচিত্র, "পার্থিব প্রেম" ইত্যাদি বিষয়ক বত্রিশটি কবিতা আছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই সনেট।

"আপন জনায় চিন্‌তে নার
জীবন-ভরা অভিমানে"

এই গানটি সুন্দর। 'বিপদে'র স্বরূপ বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন,—

'বিঁধিয়া বিঁধিয়া নখে, শোণিতে উজলি
সারা অঙ্গে লিখে দিলি হরি-নামাবলী!'

ইহা অতি সুন্দর। কিন্তু ইহার মধ্যে সুকবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভাব উঁকি মারিতেছে।

'গৃহলক্ষ্মী' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

'আছ তুমি নিরবধি
সংসার-সরসীবুকে শতদল সম
প্রচ্ছাদিয়া পঙ্ক নীর।
* * *
বন্দী কভু নহ তুমি বন্দনীয়া নারি!—
প্রেমের এ দ্বারকায় নাহি কোন দ্বারী,
তবু আছ চিরস্থির, ধীর, অচঞ্চলা,
বক্ষে ভরি স্নেহ-ভক্ষ্য সুধার পয়োধি।
* * *
মোরা অন্ধ, অন্ধ তাই
গৃহাঙ্গনে রাকা-চাঁদ দেখিতে না পাই!'

ইহাও চমৎকার। 'মৃত্যু' এবং 'শেষ' দিয়া পুস্তকের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মানবহৃদয়ের সর্ব্বশেষ প্রার্থনাটি কবি ধরিয়া দিয়াছেন,—

'কবে বল কোথা কোন নেপথ্য আড়ালে,
কোন রজনীর প্রান্তে দীপ্ত চক্রবালে,
ফুরাইবে এ বিরহ? পারাবার-শেষে
চুম্বিব অনন্ত বেলা তোমারি উদ্দেশে!'

'বিরহে' কবিতাটিও মন্দ নহে। 'মরণের পথে'র ভাষা ও ছন্দস্রোতের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ উপভোগ্য।

ভগবদ্ভক্তিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতাই কবিত্ব হিসাবে প্রথম শ্রেণীর নহে। সনেটগুলি প্রায়ই আড়ষ্ট। নূতন চিন্তা দেওয়া দূরে থাক্, পুরাতনকে নূতন করিয়া দেখাইবার মত ভাবাছন্দের ইন্দ্রজাল আছে কবিতাগুলিতে এমন দুই চারিটি পংক্তিও খুঁজিয়া বেশী পাওয়া যায় না।

প্রসঙ্গ—

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ১২।১, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা। ১২১ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা।

ইহাতে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ক চতুর্দ্দশটি সন্দর্ভ আছে। সন্দর্ভগুলি নিতান্তই সাধারণ রকমের। চিন্তায় এবং চিন্তাপ্রকাশে কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই। ভক্তির আন্তরিকতা থাকিতেও বা পারে, কিন্তু লেখকের আন্তরিকতাকে পাঠকের নিকট সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে লেখকের পক্ষে যে শক্তির দরকার এই পুস্তকে তাহার যথেষ্ট অভাব আছে বলিয়াই মনে হয়। মহাজনদের অনুগ্রহে যে সব বড় বড় কথা দেশের হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে তার মধ্যে কোনো কোনোটার সাক্ষাৎলাভ এই প্রবন্ধগুলিতে হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু লেখক সেই পরের কথাগুলিকে আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই। ধর্ম্ম সমাজ ইত্যাদি গভীর বিষয়ে লেখনী চালাইতে যে অন্তর্দৃষ্টি ও সাধনার দরকার এই পুস্তকে তাহার বিশেষ কোনো পরিচয় নাই। এইসব বিষয়ে গভীর উপলব্ধির কোনো রকম অপেক্ষা না করিয়াই তরলভাবে আলোচনা করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। সাহিত্যালোচনা সম্পর্কীয় সন্দর্ভ দুটিতেও চিন্তা ও ভাবের গভীরতা যথেষ্ট নাই।

আঙুর—

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ; ৩৫।৬।২, পদ্মপুকুর রোড ভবানীপুর, কলিকাতা। ১২০ পৃষ্ঠা; মূল্য আবাঁধা আট আনা, বাঁধাই দশ আনা।

ইহাতে এগারোটি গল্প আছে। সবগুলি গল্প তেমন ভাল না হউক মোটের উপর এ সংগ্রহটি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। গল্পগুলিতে সাধারণতঃ আখ্যান বস্তুর অভিনবত্ব এবং সম্বন্ধাবস্থানের (situation) বৈচিত্র্য আছে। লেখকের রচনায় সলীল হাস্যরসভঙ্গি মনোজ্ঞ; উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলি অর্থহীন কথা কাটাকাটিতে প্রকাশিত হাস্যরসসৃষ্টির দুশ্চেষ্টা মাত্র নহে; এগুলিতে সৌকুমার্য্য ও হাস্যরসের স্বচ্ছতা আছে। হাস্যরসসম্পৃক্ত হইলেও অবসানটি অধিকাংশ গল্পেরই করুণ। লেখকের রচনাভঙ্গি সংযত, অনাবশ্যক বাহুল্যে পল্লবিত নহে। চারিত্র-ব্যক্তিত্বও মাঝে মাঝে গল্পগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নারীচরিত্রের বাস্তব দিকটা লেখক আদর্শের তুলিকায় মুছিয়া ফেলেন নাই। যাহাকে 'নীলুদাদাভাই' বলিয়া সুরমা আদর জানাইয়া আসিয়াছে সেই নীলরতনকে বহুদিনের রোগশয্যায় শ্রীহীন দেখিয়া সুরমা যখন ভাবিল—'মাগো এত কালো হয়ে গেচে—একে আমি বে করব না' তখন বালিকা-চরিত্রের এই বাস্তবতাটুকু আমাদের চিত্তে হাস্য এবং মাধুর্য্যের সৃষ্টি করে। 'দেনাশোধের' অলঙ্কারপ্রিয়া তারাটিও এই হিসাবে সুন্দর হইয়াছে। 'মনের দাগ' 'দেনাশোধ,' ও 'আদেশ পালন' এই তিনটি গল্পই আমাদের সব চেয়ে বেশী ভাল লাগিল।

পুস্তকটিতে অনেক ত্রুটিও আছে। "মনের দাগে" বলিতে গেলে আখ্যানবস্তু দুইটি। প্রিয়র আখ্যানটি সুখদেবীর আখ্যানটিকে, কাজেই গল্পের মূল আখ্যানের প্রাধান্যকে, কিছু খণ্ডিত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রথম দেখিতে পাইলাম "নবীন ডেপুটী" "গুরুতর অভিযোগ" আছে বলিয়াই সুখদেবীর স্বামীকে শাস্তি দিলেন। পরে দেখিতে পাই "সে নির্দ্দোষী" শুদ্ধমাত্র প্রিয়র এই কথাটির উপরই নির্ভর করিয়া ও অন্য কোনোরূপ জিজ্ঞাসা কিম্বা প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়াই ডেপুটী মহাশয়ের অনুতাপ জাগিয়া উঠিল। মৃত বন্দীর নিঃসন্দেহে নির্দ্দোষিতা প্রমাণের উপরই ডেপুটীর অনুতাপের তীব্রতা, কাজেই গল্পের সৌন্দর্য্য, নির্ভর করে, অথচ এই কথাটির উপর কিছুমাত্র জোর দেওয়া হয় নাই। নবীন প্রণয়ীর অনুতাপের বীজ হয়ত প্রিয়র একটি ছোট্ট কথার মধ্যেই নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু পাঠকসম্প্রদায় এই অনুতাপের একটি ন্যায়সঙ্গত সুদৃঢ় কারণ না পাইলে সন্তুষ্ট হইবে কেন। 'হারজিত' নামক গল্পটির নামের সার্থকতা গল্পটির মধ্যে কোথাও তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সন্ন্যাসীর কথার বিরুদ্ধে মাণিকলালের চিন্তার ভাষা এবং প্রণালী বার বৎসরের মাণিকের পক্ষে কতকটা অশোভন হইয়াছে। "এপ্রিলফুল্" গল্পটি হাস্যরসে উপভোগ্য হইলেও অস্বাভাবিকতার স্পর্শ এড়াইতে পারে নাই। "শেয়ালের ডাকে"ও এই দোষটি আছে। "কাঙ্গাল" এবং "মাণিকলালে"র আখ্যানের বাঁধুনী কেমন ঢিলা হইয়া গিয়াছে, রসটি তেমন ভাবে কোথাও জমিয়া উঠে নাই।

দরিয়া—

শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল, প্রণীত নাটিকা। প্রকাশক, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়; ১৫, হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত, ৮৬ পৃষ্ঠা; মূল্য আট আনা।

গোল্ডস্মিথের She stoops to conquer নামক বিখ্যাত কমিডি "অবলম্বনে" এই নাটিকাটি রচিত হইয়াছে। 'অবলম্বন' কথাটির ফাঁক দিয়া অনুবাদের ত্রুটির অভিযোগ অনেকটা কমিয়া যায়। অবলম্বিত পুস্তকে সাধারণতঃ নূতন সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ত দেখিতে পাওয়া যায়ই না, মূলের সৌন্দর্য্যটুকু রক্ষা করার অক্ষমতাকে শুধু 'অবলম্বন' কথাটির আবরণে ঢাকিয়া দেওয়া হয় মাত্র। আলোচ্য পুস্তকটিও ঠিক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হউক, তার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। নূতন সৃষ্টির দিক দিয়া এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাওয়া ত মূঢ়তা, লেখকও নূতন সৃষ্টির দাবী করেন না। অবলম্বনের নৈপুণ্যের দিক দিয়াই ইহার বিচার করিতে হইবে; আমাদের মতে সেই হিসাবেও ইহাতে খুব বেশী গুণপনার পরিচয় নাই।

প্রথমতঃ লেখকের নূতনত্বের অবলম্বন সম্বন্ধে। মূলের অস্ফুট Maidটিকে তিনি মুখরা আমিনায় ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, অথচ বাঁদী আমিনাকে তিনি যে ভাষায় কথা বলাইয়াছেন তাহা বাঁদীর পক্ষে মোটেই শোভন হয় নাই। যে-কোনো বাঁদীর পক্ষেই যে এইরূপ ভাষায় কথা বলা অসম্ভব তাহা নহে, তবে অসাধারণত্বের বেলায় তার বিশেষ হেতুটি দিয়া পাঠকের মনকে প্রস্তুত হইতে দেওয়া উচিত,—এখানে তাহা দেওয়া হয় নাই। গানগুলি দিয়াই অবশ্য নাটিকাটির শ্রেষ্ঠ নূতনত্বের দাবী। কবিত্বহিসাবে এগুলি মন্দ নয়, কিন্তু নাট্যোল্লিখিত ঘটনা এবং পাত্র পাত্রীর মানসিক ভাবের সঙ্গে সাধারণতঃ ইহাদের বিশেষ কোনো যোগই নাই। রঙ্গমঞ্চের দর্শকগণকে আমোদ বিতরণের সাধু ইচ্ছায় এগুলিকে কৃত্রিমভাবে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। অনেক জায়গায়ই, বিশেষতঃ আলির বাসভূমিকে সরাইখানা মনে করিয়াও বাঁদীগণের সহিত সেলিমের নির্বিচারে নৃত্যগীত সম্ভোগ করায়, নাটকত্ব এবং স্বাভাবিকতার অপচার প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে। ভূমিকাতে লেখক মহাশয় She stoops to conquerএর রোমান্সের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু রোমান্স বলিতে যাহা বুঝি গোল্ডস্মিথের নাটিকায় তাহার কিছুই দেখিতে পাই নাই। বাস্তবিক এই নাটিকাটির গুণ রোমান্সে নয়, অন্যত্র। তবে "দরিয়াতে" লেখক রোমান্স ঢুকাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সব জায়গায় শুভফল প্রসব করে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি অনেক স্থলে মূলের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। সেলিমের বিনয়নম্রতা সম্বন্ধে মূলের কতকগুলি কথা লেখক বাদ দিয়াছেন, অথচ এই কথাগুলির উপর গ্রন্থের নাট্যকলা অনেকটা নির্ভর করে। বন্ধু হেষ্টিংসের উপস্থিতি-অনুপস্থিতিতে মিস্ হার্ডকাস্‌ল্‌এর (দরিয়া) সঙ্গে মার্লোর (সেলিম) প্রথমালাপের প্রকারভেদের রস ও সৌন্দর্য্য লেখক রক্ষা করেন নাই। মিস্ হার্ডকাস্‌ল্‌এর আপন

পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া অসাধারণ পোষাক পরিধানেই মার্লোর তাহাকে দাসী বলিয়া ভ্রম করার কারণ নিহিত, কিন্তু সেলিম দেখিতেছি তাহার অভাবেই সম্ভ্রান্তবংশীয়া (কাজেই উল্লেখ না থাকিলেও, তদনুরূপ বেশপরিহিতা) দরিয়াকে বাঁদী বলিয়া মনে করিয়া লইতে কোনো দ্বিধা বোধ করে না; এই পোষাকপরিবর্ত্তনটিই নাটিকার যাহা নাকি কেন্দ্র, নায়িকার সেই আপনাকে বাঁদী বলিয়া চালানোর উপায় স্বরূপ। লেখক এই উপায়টিকে রাখিবার কোনো দরকার বোধ করেন নাই। মিস হার্ডকাস্‌লকে দাসী ভাবিয়া তাহার নিকট মার্লোর প্রথম প্রেমজ্ঞাপনায় যথেষ্ট চাপল্য আছে কিন্তু সেই চাপল্য মিস্ হার্ডক্যাসলের শিক্ষা এবং অলক্ষিত বংশগৌরবের প্রভাবে ধীরে ধীরে শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছে, এই পরিবর্ত্তনের সৌন্দর্য্যটুকু লেখক ধরিতেই পারেন নাই। এইরূপ অনেক ত্রুটিতে মার্লোচরিত্র সেলিমে আসিয়া অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কয়নাশায় Tony Lumpkin, আসাফে মার্লোর পিতারও সেই দশা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিও অনেক আছে। লেখক দৃশ্য ভাঙিয়াছেন, আগের কথা পাছে জুড়িয়াছেন, দৃশ্য কে-দৃশ্য উঠাইয়া দিয়াছেন—তাহাতে সব স্থলে না হউক, কোনো কোনো স্থলে সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। রসালাপই গোল্ডস্মিথের নাটিকাটির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ, সেই আলাপকে পরিবর্ত্তিত করিয়া এবং নির্বিচারে ছাঁটিয়া দিয়া অনেক জায়গায়ই তাহার রসকে তিনি খণ্ডিত করিয়াছেন।

এই রকম ত্রুটি সত্ত্বেও এই নাটিকায় যে গুণ নাই তাহা নহে। মূলের রসটি রক্ষা করিতে তিনি অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কথোপকথনগুলিতে সাধারণতঃ বেশ একটি তরল চটুলতা ও অনাহত প্রবাহ আছে। কিন্তু এই শ্রেণীর অনুবাদ-অবলম্বনের গুণের জন্ম লেখক প্রশংসার ভাগী যতটা না হউন দোষের জন্য লেখক নিন্দার ভাগী তার চেয়ে অনেকটা বেশী এই জন্যই আমরা দোষপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম। দোষসত্ত্বেও এই নাটিকাখানি দ্বারা "বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নাট্যের উপাখ্যানে সুমধুর বৈচিত্র্য ও অনাবিল হাস্যরসের অবতারণার" উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ইহা অকপটে বলা যাইতে পারে। আর ইংরাজি মূলনিরপেক্ষ ভাবে যাঁহারা এই নাটিকাখানি পাঠ করিবেন তাঁহারা নাটিকার আখ্যান-বৈচিত্র্য, রচনার পারিপাট্য, গানের মাধুর্য্য, রসিকতার অনাবিল আনন্দ, ভাষার স্বচ্ছ অনাহত গতি যথেষ্টই উপভোগ করিতে পারিবেন।

জ্যোতিঃ পিপাসু।

নিবেদিতা—

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত। ১২।১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার, উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ৫৩+।/০ পৃষ্ঠা। পাইকা অক্ষরে এণ্টিক কাগজে ছাপা; স্বামী সারদানন্দ-লিখিত ভূমিকা ও ভগিনী নিবেদিতার চিত্র সম্বলিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

সে বেশি দিনের কথা নয়, মহাপুরুষ বিবেকানন্দ স্বামীর জ্ঞান চরিত্র ও স্বদেশপ্রীতির মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া দেবী নিবেদিতা আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন—নিজের সমাজ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, আত্মীয়স্বজন সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন অধিকতর খ্যাতিসম্মান লাভের প্রত্যাশায় নয়, ভারতের সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিবার জন্য নয়,—তিনি আসিয়াছিলেন সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী তপস্বিনী উমার বেশে ভারতের শিবের আরাধনা করিতে আপনার ভক্তিপূত শরীর মন নিবেদন করিয়া দিয়া। তিনি ভারতবর্ষকে নিজের দেশ, ভারতবাসী নরনারীকে পরমাত্মীয় বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতের জ্ঞানধর্ম্মের শাশ্বত মূর্ত্তি তিনি শ্রদ্ধার সহিত সকল আবর্জ্জনা অপসারণ করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ভারতের জড়ীভূত শিল্প-স্থাপত্য তক্ষণ-বিদ্যা তাঁহার সশ্রদ্ধ স্পর্শে প্রাণে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভারতবাসী নরনারীকে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের রাষ্ট্রে সমাজে গৃহে পরিবারে সর্ব্বত্র নষ্ট স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবার ব্রতে তিনি আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার এক প্রান্তে একটি গলির ভিতর একখানি সামান্য বাড়ী লইয়া যে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যালয়ের মেয়েরা কেহ মাতৃভাষা ভুলিয়া বিদেশী বাক্য ব্যবহার করিলে সেইজন্য তিনি ক্ষুণ্ণ হইতেন; বালিকাদের হাতে গড়া পুতুল, আলপনা-দেওয়া পিঁড়ি, সূচীচিত্রিত বস্ত্র সেইজন্য তাঁহার আদরের গৃহসজ্জা ছিল; সেইজন্যই তিনি গৃহপ্রাচীরের বন্দিনী বালিকা ও বধূদিগকে লইয়া ভ্রমণ করিতে আনন্দ পাইতেন; এবং সেইজন্যই তীর্থপর্য্যটন তাঁহার প্রিয় ছিল।

এই লোকোত্তরচরিত্রবতী প্রখরবুদ্ধিশালিনী তপস্বিনীর ছাত্রীদের মধ্যে লেখিকা অন্যতমা। তিনি ভক্তি দিয়া, হৃদয় দিয়া, বুদ্ধি দিয়া নিবেদিতাকে যেমন ভাবে দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন এই পুস্তকে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন; এই পুস্তকখানির ছত্রে ছত্রে লেখিকা চরম নিপুণতার সহিত নিবেদিতার চরিত্রের সকল দিক অবলীলা-ক্রমে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই পুস্তকখানি a joy for ever চির-আনন্দের খনি হইয়াছে। লেখিকার ভাষা যেমন বিশুদ্ধ তেমনি স্বচ্ছ ও অনাহত, যেমন মধুর তেমনি তাহার প্রবাহ—কোথাও এতটুকু বাধা নাই, অস্পষ্টতা জটিলতা নাই, আপনার আনন্দের বেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে; আর সেই সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে স্বাধীন বুদ্ধি ও বিচার, শ্রদ্ধা ও পর্য্যবেক্ষণ। এমন জীবনচরিত বাংলাভাষায় খুব অল্প আছে।

ইহার বিস্তারিত পরিচয় দিবার লোভ সংবরণ করা দুষ্কর হইলেও অনাবশ্যক; কারণ এই পুস্তিকার বিষয় প্রবন্ধাকারে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইবে তাহা নিবেদিতার বুকের রক্তে লালিত বাগবাজার বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্যে নিবেদিত হইয়াছে; সুতরাং এই পুস্তক এক এক খণ্ড সকল শিক্ষিত বাঙালীর ক্রয় করা উচিত।

ছড়া ও গল্প*

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য চার আনা।

এই শিশুপাঠ্য পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষা অল্প স্বল্প সংস্কার করা ছাড়া একখানি ছবি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে ও একখানি ছবি নূতন সংযোজিত হইয়াছে। ছবিগুলি সম্বন্ধে আমরা প্রথম বারে যাহা বলিয়াছিলাম তদতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই—গ্রন্থকার বা প্রকাশকেরও দোষ নাই, কারণ বাঙালীর চিত্রশিল্পে এই হাতেখড়ির যুগে এতদপেক্ষা কলাসঙ্গত চিত্র সংগ্রহ করা সুকঠিন ব্যাপার বটে। লেখা সম্বন্ধেও বলিবার কিছু নাই—লেখক স্বয়ং অধ্যাপক এবং রসিক, রচনার বিষয় হিতোপদেশ ও নীতিমূলক, সুতরাং শিশুর উপযুক্ত নিশ্চয় হইয়াছে। কিন্তু একটি বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয়কে মাপ করা যায় না—তিনি জানেন যে কবিতা ও বনিতা জোর করিয়া বশ মানানো যায় না, যদি বা বশ মানে তবে রস বাঁধে না। পদ্য রচনাগুলিতে ছন্দ ও মিল নাস্তানাবুদ হইয়াছে, সে দোষ অবশ্য চতুর লেখক ছড়া নাম দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের যা প্রাচীন ছড়া তা এমনি সব হাল্কা কথায় রচিত যে লঘুতায় ছন্দের ওজন রক্ষা হইয়া যায়। কিন্তু লেখক ব্যবহার করিবেন বড় বড় কথা আর যতিভঙ্গ সারিয়া যাইবেন ছড়ার দোহাই দিয়া, এ কখনো হইতে পারে না। যেখান-সেখান হইতে তুলিয়া দেখানো যায়—যেমন,

শশব্যস্তে তাড়ায় মাছি প্রভুভক্ত বানর,

অথবা—

গর্জ্জনেতে গিরিগুহা গম গম করতে থাকে।

ছেলেদের কান যদি ছেলেবেলা হইতেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে এমন বেয়াড়া ভাবে তালিম হইয়া উঠে তবে তাহারা যে বড় হইলে কবিযশপ্রার্থী হইয়া ছন্দের শ্রাদ্ধ করিবে না সে বিষয়ে জামিন কে? আজকাল দেখিতে পাই সমস্ত শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রে ও পুস্তকে এইরূপ ছন্দ জবাই চলিতেছে। অক্ষর গণিয়া পয়ার ত্রিপদী রচনার কাল যে ছিল ভালো; রবীন্দ্রযুগে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে কিন্তু মাত্রাভঙ্গ করার পরিমাণও মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞ ও বিদ্বান অধ্যাপক সেই অনাচারী দলের একজন ইহা ক্ষোভের বিষয়।

যাহাই হোক এই বইখানির কলাকুশলতার খুঁটিনাটি দোষ সত্ত্বেও ইহা বাংলার শিশুসাহিত্যের মধ্যে যে একখানি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিশুরা হাসিতে ভালো বাসে; কিন্তু আমাদের শিশুসাহিত্য এতকাল ভয়ানক রকম গুরুগম্ভীর ছিল; গ্রন্থকার আমাদের শিশুদিগকে অনাবিল হাস্যরস জোগাইয়া দিয়াছেন, ইহার জন্যই এ গ্রন্থ সমাদরের যোগ্য।

বিষ্ণুশর্ম্মার গল্প—

বা পঞ্চতন্ত্র (উত্তর ভাগ)। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় প্রণীত। প্রকাশক ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী, ৫৬৷১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ২৩২ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, পাইকা অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা, মূল্য ৸৵০ আনা।

পঞ্চতন্ত্রের উত্তরভাগের গল্পগুলি সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আজকাল বই লিখিতেছেন অনেকে কিন্তু রসবৈচিত্র্যে মনোরম করিয়া বিশুদ্ধ বাংলা লিখিতে খুব অল্প লোককেই দেখা যায়; এই পুস্তকের ভাষা খাঁটি বাংলা কোথাও শুচিবাইগ্রস্তের ন্যায় চলিত সহজ কথা ছাড়িয়া আড়ষ্ট সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, অথচ ভাষা গ্রাম্য হয় নাই। গদ্য ভাষারও একটি ছন্দ আছে, সে ছন্দের কান খুব অল্প লেখকেরই থাকিতে দেখা যায়; দেখিয়া সুখী হইলাম এই অনুবাদের ভাষায় ছন্দ বজায় আছে, রচনার ওজন কোথাও বেশিকম হয় নাই। আর একটি বিশেষ গুণ, রচনা প্রচ্ছন্ন হাস্যরসে অনুস্যূত বলিয়া হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

রচনারীতিতে দুইএকটি ত্রুটি লক্ষিত হইল, তাহা প্রাদেশিক বাক্যরীতি (idiom) চালানো; আদর্শ বাংলায় এরকম ব্যবহার নাই। যথা—'ধপাস দিয়া পড়িল' ঠিক নয়, ধপাস করিয়া পড়িল লেখা উচিত: 'উঁকি দিয়া দেখিল' লেখা প্রচলিত নয়, উঁকি মারিয়া দেখিল প্রচলিত। এসব ত্রুটি সহজেই প্রতিকার্য্য।

গল্প চয়নে আরো একটু সাবধান হইলে ভালো হইত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এমন সব অনেক কথা আছে যাহা এখন অল্পবয়স্ক বালকদিগকে পড়িতে দেওয়া যায় না। এই সংগ্রহখানি সেই হিসাবে, মাত্র দুই একটি গল্পের জন্য, নিতান্ত বালকের হাতে দিতে অনেক অভিভাবক হয় তো ইতস্তত করিবেন, যদিও সে গল্পগুলিও খুব সাবধানে লেখা হইয়াছে, তবুও তাহার অন্তর্গূঢ় ভাবটি নিরাপদ নহে বলিয়াই একেবারে ত্যাগ করিলে ভালো বই মন্দ হইত না।

পুস্তকে কতকগুলি ছবি আছে। বাংলা বইয়ে সাধারণত যেমন হয়, তেমনি হইয়াছে, অর্থাৎ ভালো হয় নাই।

গিরিকাহিনী—

শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত ও শিলং হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান ষ্টুডেণ্ট্‌স্ লাইব্রেরী, ঢাকা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ৯৬ পৃষ্ঠা। পাইকা অক্ষরে এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা; রেশমী কাপড়ে জমকালো বাঁধা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এখানি আসাম প্রদেশের গিরি নির্ঝর প্রপাত প্রভৃতির নাম সম্পর্কীয় কিম্বদন্তীমূলক কাহিনীসংগ্রহ এবং সেই দেশী ভৌগলিক ঐতিহাসিক সামাজিক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিবরণ এবং আচার বিচার রীতি নীতি আমোদ প্রমোদ পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। গল্পগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে বটে—কিন্তু সে সমস্তই ভাসা ভাসা, লেখকের পর্য্যবেক্ষণ-পটুতার পরিচয় কোথাও বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় না। রচনা সম্বন্ধেও বিশেষ করিয়া বলিবার কিছু নাই।

গ্রন্থে অনেকগুলি ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি আছে। কিন্তু সেগুলি ছাপিবার উপযুক্ত কালি মনোনীত না করিতে পারায় প্রায় ছবিই নষ্টশ্রী হইয়া গিয়াছে।

রেখাক্ষর বর্ণমালা—

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক ব্রাহ্মমিশন প্রেস। প্রাপ্তিস্থান, আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়, ৫৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বাংলা ক্রমশ জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা সকলের সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় অনেক মনীষী বক্তৃতা উপদেশ দিয়া থাকেন কিন্তু তাহা লিখিত না হওয়ায় ক্ষণিকের আনন্দ দান করিয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে; উত্তরপুরুষদিগের জন্য আমরা অনেক অমূল্য বাক্য ইচ্ছা সত্ত্বেও রাখিয়া যাইতে পারিতেছি না। ইহার প্রধান কারণ বাংলায় দ্রুত-লিখন-প্রণালীর অভাব। ইংরেজিতে পিটম্যানের উদ্ভাবিত শর্ট্‌-হ্যাণ্ড লিখনপ্রণালী যে সমস্যা সমাধান করিয়াছে, বাংলায় সেই সমস্যা সমাধান করিবার জন্য, কবি মনীষী ও দার্শনিক পণ্ডিত পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রেখাক্ষর বর্ণমালা উদ্ভাবন করিয়া তাহার লিখনসঙ্কেত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লিখিবার উপদেশ সমস্ত পদ্যে লেখা, সে পদ্য শুধু ছত্রগুলি মিলে গাঁথা নয়, কবিত্বে অনুপ্রাণিত, হাস্যরসে রসালো, চিন্তা ও ভাবুকতায় প্রগাঢ়। শিক্ষার্থীর পক্ষে এই পুস্তক আনন্দপ্রদ হইবে একথা আনাড়ি আমরাও জোর করিয়া বলিতে পারি এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষেও ইহা আনন্দপ্রদ হইবে এই হিসাবে যে একটা technical জিনিষ লেখার গুণে কেমন সরস ও সুন্দর হইতে পারে।

বইখানি আগাগোড়া রচয়িতার হাতের লেখার প্রতিলিপি, এই হিসাবে ইহার মূল্য আরো বেশি। ছাপা কাগজ অত্যুত্তম। মূল্যের উল্লেখ নাই।

যাঁহারা ইংরেজি শর্টহ্যাণ্ড লেখার চর্চা করিয়া থাকেন তাঁহারা এই বাংলা রেখাক্ষর সহজেই আয়ত্ত করিয়া অনেকের উপকারে লাগাইতে পারিবেন আশা করা যায়।

অচলায়তন—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৩৮ পৃষ্ঠা।

এই নাটকখানি সমগ্র গত বৎসর আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। ইহার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, প্রতিবাদ, সমালোচনা ভদ্রভাব হইতে অভদ্রভাবে পর্য্যন্ত হইয়া গেছে। ভালো জিনিষ চিরকাল এমনি দুকূল রাখিয়া চলিতে পারে না; একদলের তাহা বরণীয় হয়, এবং অপর দলের হয় অসহনীয়। এই গ্রন্থখানিতে আশ্চর্য্য রকম নাট্য-

কৌশলে অর্থহীন আচার ও কুসংস্কারের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিচার ও প্রেমের উদারতার প্রতিবাদ কবিত্বরসে ভিজাইয়া তোলা হইয়াছে। যেসকল রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী লোক ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলেন তাঁহারাও ইহার চমৎকার কবিত্বের অপলাপ করিতে পারেন নাই। মতে না মিলিলেও এই হিসাবে এ পুস্তকখানি সকলেরই পরম উপভোগ্য হইয়াছে। মহাকবির এই অসাধারণ নাটকখানি যে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিচারমূলক প্রতিবাদ হইলেও অসাম্প্রদায়িক তাহা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এ গ্রন্থ প্রবাসীর পাঠকের সুপরিচিত; সুতরাং পল্লবিত সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কাছাড়ের ইতিবৃত্ত—

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ প্রণীত। প্রকাশক সাধনা লাইব্রেরী, ঢাকা ও কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬অং ২৫০+॥০। মূল্য ১৲।

প্রাচীন কাছাড় রাজ্যের ইতিহাসের সংশ্রবে ত্রিপুর, কোচ, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস; কাছাড়ী জাতির দেশবিজয় ও উপনিবেশ স্থাপন; রাজ্যশাসনপ্রণালী ও রীতিনীতি; সাহিত্য ও শিল্প; মোট ১৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি বহু জ্ঞাতব্য ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যে পরিপূর্ণ ও সুখপাঠ্য। এইরূপ প্রাদেশিক ইতিহাসসংগ্রহ দ্বারা বাংলা দেশের সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে যাঁহারা সাহায্য করেন তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের হিতৈষী এবং সেইজন্য বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন এবং সাহায্যের যোগ্যপাত্র।

সতীকণ্ঠহার

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত। প্রকাশক শ্রীঅমরনাথ মিত্র, ৫৯ রোকনপুর, ঢাকা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ৮৮+॥০ পৃষ্ঠা। পাইকা অক্ষরে ছাপা; সচিত্র। মূল্য সাধারণ ॥০ আনা; রেশমী কাপড়ে জমকালো বাঁধা বারো আনা।

গ্রন্থখানিতে সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি সংস্কৃত পৌরাণিক, বেহুলা খুল্লনা, চিন্তা প্রভৃতি বঙ্গ-পৌরাণিক, পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী প্রভৃতি ভারত-ঐতিহাসিক এবং সারা বিবি, রহিমা বিবি, হাজেরা বিবি মুসলমান পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ১৭জন সতী রমণীর কাহিনী সংক্ষেপে পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের যতটুকু চিত্তাকর্ষক তাহা কতক সতীচরিত্রমাহাত্ম্যে ও কতক ছাপাখানার প্রসাধনে—গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এক কপর্দ্দকও নাই; সেকেলে বকেয়া পয়ার ত্রিপদী ছন্দ, তাও কবি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—লেখার দোষে অমন ভালো জিনিষও অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। শুধু কি ছন্দের দোষ? না আছে ভাষার লালিত্য, ভাবের অভিনবত্ব, আর না আছে রচনার পারিপাট্য। ইহার আগাগোড়া অক্ষমতার আশ্চর্য্য নিদর্শন। সস্তা ছাপাখানার দৌলতে রাতারাতি হঠাৎলেখক হওয়া যায়, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত সে রচনা সাহিত্যভাণ্ডারে স্থান পাইবে কি না। যদি না পায় তবে পণ্ডশ্রম করিয়া লাভ কি? যার কর্ম্ম তারে সাজে এ কথাটা না মানিয়া চলা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

পুস্তকের ছবিগুলি অত্যন্ত কুৎসিত।

সচিত্র সপ্তকাণ্ড রাজস্থান—

শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত ও প্রকাশিত, পটীয়া, চট্টগ্রাম। ডঃ ক্রাঃ ৮ অংশিত ৩৯২+৬+॥০ পৃষ্ঠা। পাইকা অক্ষরে ছাপা কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ২৲ টাকা।

ভারতবর্ষের ইতিকথায় চরিত্রের বৈচিত্র্যে ও মাহাত্ম্যে রামায়ণ ও মহাভারত যুগে যুগে লোকশিক্ষার কারণ হইয়া যেমন সমাদৃত, ইতিহাসে তেমনি রাজস্থানের কাহিনী যুগে যুগে লোকশিক্ষার সহায় বলিয়া সমাদৃত। আমাদের ভারতবর্ষে স্বদেশ বলিয়া মমতা কোনো কালে তেমন প্রবল ছিল না; ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থই এদেশের সর্ব্বস্ব ছিল। সেই দেশে স্বদেশের জন্য মমতা, রূপ ধরিয়া প্রথম দেখা দিয়াছিল রাজপুত জাতির মনে; এবং তারপর বোধ হয় মহারাষ্ট্র জাতি, বাঙালী জাতি ও শিখ জাতির মনেও দেখা দিয়াছিল। প্রতীচ্য জাতির সংস্রবে আসিয়া এখন আমরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ক্ষুদ্র স্বার্থ সমগ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থের মধ্যে নিমজ্জিত করিতে শিখিতেছি, দেশমাতা এখন আমাদের সকল সন্তানের নিকট রূপ ধরিয়া দেখা দিয় আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ ভক্তি দাবি করিতেছেন।

এই দেশপ্রীতির উদ্বোধনের শুভসূচনার কালে প্রতীচ্য দেশের ইতিহাস যেমন একদিকে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে, আর একদিকে আমাদেরই ঘরের দেশভক্ত বীরদিগের অসাধারণ আত্মত্যাগের কাহিনী আমাদিগের অবসন্ন জড় হৃদয়ে বলসঞ্চার করিবে। ঘরের মূলধন না থাকিলে শুধু ধারকরা ধনে বড় হওয়া যায় না।

যাঁহারা আমাদের পিতৃধনের সংবাদ দিয়া আমাদের বর্ত্তমান ও ভাবী বংশীয়দের চরিত্রগঠনে সাহায্য করেন তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

বিপিন বাবু সমগ্র রাজস্থানের বীরত্ব-কাহিনী প্রদেশ অনুসারে মিবার, অম্বর, মারবার, বিকানীর, যশল্মীর, বুন্দি, কোটা নামক সাতটি কাণ্ডে ভাগ করিয়া, প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিচরিত্র ও ঘটনা অবলম্বন করিয়া পদ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুকরণে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচনা করিয়াছেন।

রচনার ভাষা যথোচিত সরল ও সরস হয় নাই; ছন্দের মধ্যেও বেশ অনাহত স্বচ্ছন্দ গতি নাই। তবে এত বড় গ্রন্থের আগাগোড়া সরস পদ্যে রচনা করা কঠিন ব্যাপার, তাহা কেবল প্রতিভাবান কবিরই সাধ্য। লেখক যতটুকু দিতে পারিয়াছেন তাহাও একেবারে নিন্দার্হ নহে। এই পুস্তকখানি ঘরে ঘরে প্রত্যেক শিশুর নিত্যসহচর হইলে তাহাদিগকে স্বদেশপ্রীতিতে ও শৌর্য্যবীর্য্যে মণ্ডিত করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে যে সাহায্য করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পুস্তকস্থ চিত্রগুলি নেহাত মন্দ হয় নাই।

জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী—

শ্রীকুমুদিনী মিত্র প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ১২।১ রামকিষণ দাস লেন, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২১৪ পৃষ্ঠা। বহুচিত্রসম্বলিত, তন্মধ্যে দুইখানি রঙিন ও তাহার একখানি স্বর্ণমণ্ডিত; পরিষ্কার ছাপা কাগজ; পরিপাটি বাঁধাই। মূল্য এক টাকা।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ঐতিহাসিকের চক্ষে অতি মূল্যবান পুস্তক। ইহাতে তিন শতাব্দী পূর্ব্বকার ভারতের প্রজাবর্গের অবস্থা, বাদশাহদিগের চরিত্র, শাসননীতি ও শাসনপদ্ধতি অকপটে বিবৃত হইয়াছে বলিয়াই ইহার এত মূল্য। এই গ্রন্থ আসলে ফার্সী ভাষায় লেখা; ইংরেজিতে অনুবাদ হইয়াছে বহুদিন; এখানি সেই অনুবাদের অনুবাদ। একেবারে আসলের বাংলা অনুবাদ পাইলে আমরা অধিকতর সুখী হইতাম, কিন্তু নেই মামা চেয়ে কাণা মামা থাকাও ভালো।

অনুবাদ কাজটি সুচারু হইয়াছে; তবে দু এক জায়গায় ইংরেজির গন্ধ বাংলা বচনবিন্যাসের ক্রমভঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানিতে এত রকম বিচিত্র ব্যাপারের সমাবেশ আছে যে ইহা সাধারণ পাঠকের নিকট উপন্যাসের ন্যায়ই সুখপাঠ্য ও কৌতূহল জনক হইবে।

এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী হইবে তৎবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

চিত্রগুলি সমস্তই ফটোগ্রাফের বা প্রাচীন মূর্ত্তিচিত্রের প্রতিলিপি; দুই একখানির ছাপা উপযুক্ত কালি নির্ব্বাচনের অভাবে খারাপ হইলেও আসল ছবিগুলি প্রায় ভালো।

রাজভক্তি-কুসুমাঞ্জলি—

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম প্রণীত। যশোহর, কালিয়া আর্য্য নাট্য-সমাজ কর্ত্তৃক অভিনীত ও প্রকাশিত। ডিমাই ১২ অং ২২+৵০ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ কদর্য্য। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এই পুস্তিকার উপরে লেখা আছে দৃশ্যকাব্য; ভিতরেও পাত্র পাত্রীর কথোপকথন আছে; কিন্তু কোনো কেন্দ্রগত ভাবকে আশ্রয় করিয়া কোনো একটি আখ্যায়িকা গড়িয়া উঠে নাই। রচনায়ও কোনো মুন্সিয়ানা বা বিশেষত্ব নাই। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী আসিতেছেন; "বাঙাল জমিদার" রাজাকে ও শিক্ষিতা মহিলারা রাণীকে অভিনন্দন করিবেন এবং বাঙ্গণ কলার মারিবেন ইহারই আয়োজনে সমস্ত ব্যাপার সমাপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থকার ভূমিকায় ইংরেজ-রাজত্বের সুফলের মামুলি সাক্ষী রেল টেলিগ্রাফ খাড়া করিয়া শেষে বলিতেছেন—"ফলতঃ আমরা মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় কবি; রমেশচন্দ্র, এস. পি. সিংহ ও কান্তিচন্দ্রের ন্যায় রাজনীতিবিৎ এবং জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্ল-চন্দ্রের ন্যায় বিজ্ঞানবিশারদ পাইয়াছি ও পাইতেছি; তাহা একমাত্র ইংরেজ রাজত্বেরই সুফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

আমরা ইংরেজ রাজত্বের সুফল অস্বীকার করি না, কিন্তু তাহার প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গ্রন্থকারকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, চীন জাপান ইংরেজের অধীন নয়; অথচ ঐ দুই দেশে রেল টেলিগ্রাফ হইয়াছে এবং কবি মনীষীও জন্মিয়াছেন। পূর্ব্বে কালিদাস হইতে চণ্ডিদাস পর্য্যন্ত কবি, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক এবং টোডরমল্ল ও নানা ফড়নবিশ প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিবিশারদেরা যখন এই ভারতবর্ষেই জন্মিয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষে ইংরেজের শাসন ছিল না।

ইংরেজশাসনের সুফল অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইংরেজশাসনে আমরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সম্মিলিত হইয়া দেশকে আপনার বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছি, ইহা ইংরেজ শাসনের মহৎ লাভ।

চিত্রপরিচয়

বৃন্দাবনে যমুনার এক দহের মধ্যে কালীয় নাগ সপরিবারে বাস করিত। তাহার সহস্র ফণার বিষে সেই দহের জল পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত, গোরু বাছুর রাখাল কেহ এই জল ভ্রমক্রমে স্পর্শ করিলেই তাহার প্রাণসংশয় হইত। শ্রীকৃষ্ণ এই দুর্জ্জয় নাগের বিষাক্ত সংস্পর্শ হইতে বৃন্দাবনকে মুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া একদিন কালীয়হ্রদে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং সহস্রশীর্ষ মহানাগকে ধরিয়া তাহার ফণার উপর নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রথমে কালীয় নাগ কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্য আস্ফালন করিয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই কৃষ্ণের বিক্রমে পরাভূত হইয়া সে বুঝিল শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তখন সে সহস্র মুখে রক্ত বমন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল; নাগ-নারীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে সপরিবারে রমণক দ্বীপে নির্ব্বাসন করিয়া বৃন্দাবনকে নির্ভয় ও তাঁহার অকল্যাণশঙ্কিত গোপগোপী-দিগকে আশ্বস্ত করিয়া হ্রদ হইতে বিনির্গত হইলেন। এই আখ্যায়িকা বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বিবৃত আছে।

চিত্রখানি পরিকল্পনার সমৃদ্ধিতে, বর্ণবিন্যাসের প্রাচুর্য্য-পটুতায় এবং ভাবব্যঞ্জনায় সুন্দর। জলের আবর্ত্তের আলোড়ন, তাহার মধ্যে নাগনারীদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সুসমঞ্জস সংস্থান, শ্রীকৃষ্ণের অবলীলাক্রমে বিরাট কালীয় নাগ দমনের ভাব, এবং নাগনারীদিগের করুণ মিনতি বিশেষ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত। নাগনারীদিগের মুখের কমনীয় সৌন্দর্য্য, স্বচ্ছ পরিচ্ছদের বিচিত্র বর্ণবিন্যাস, হ্রদ-তীরের দৃশ্য, যেন একটি ছন্দে গাঁথা কবিতার মতো সুসমঞ্জস। জলের আবর্ত্ত অঙ্কন প্রথামূলক (conventional) হইলেও সূক্ষ্ম রেখার আবর্ত্তে আলোড়নের ভাবটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্রখানিতে বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশেও খুব সুসংহত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



রামচন্দ্র ও শবরী।

U. Ray and Sons.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩১৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শিক্ষাবিধি

এখানে আসিবার সময় আমার একটা সঙ্কল্প ছিল এখানকার বিদ্যালয়গুলিকে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইব—শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কিনা তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্য কিছু দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা রকমের উদ্ভাবিত হইতেছে। একদল বলিতেছে ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত, আর একদল বলিতেছে ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে দুঃখের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্য পাকা করিয়া মানুষ করা যায় না; একদল বলিতেছে চোখে কানে ভাবে আভাসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, আর একদল বলিতেছে সচেষ্টভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। বস্তুত এ দ্বন্দ্ব কোনো দিনই মিটিবে না—কেননা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব সত্য; সুখও তাহাকে শিক্ষা দেয় দুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয়; শাসন নহিলেও তাহার চলে না স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই; একদিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জিনিষের প্রবেশদ্বার খোলা, আর একদিকে তাহার খাটিয়া আনা জিনিষের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত। একথা বলা সহজ যে, দুইয়ের মাঝখানের পথটিকে পাকা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লও, কিন্তু কার্য্যত তাহা অসাধ্য। কারণ জীবনের গতি কোনো দিনই একেবারে সোজা রেখায় চলে না—অন্তর বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে সে নদীর মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মত সীধা পড়িয়া থাকে না। অতএব তাহার মাঝখানের রেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবলি স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্যরেখা আর-এক সময়ে তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্তরেখা; একজাতির পক্ষে যাহা প্রান্তপথ আর-এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্যপথ। নানা অনিবার্য্য কারণে মানুষের ইতিহাসে কখনো যুদ্ধ আসে কখনো শান্তি আসে; কখনো ধনসম্পদের জোয়ার আসে কখনো তাহার ভাঁটার দিন উপস্থিত হয়; কখনো নিজের শক্তিতে সে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কখনো নিজের অক্ষমতাবোধে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় মানুষ যখন একদিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর একদিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সংশিক্ষা। মানুষের প্রকৃতি যখন সবলভাবে সজীব থাকে তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ-শক্তিতে আপনার ভারসামঞ্জস্যের পথ সে বাছিয়া লয়। যে মানুষের নিজের শরীরের উপর দখল আছে সে যখন একদিক হইতে ধাক্কা খায় তখন সে স্বভাবতই অন্যদিকে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয়, কিন্তু মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাৎ হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই

পড়িয়া থাকে। যুরোপে ছেলেদের মানুষ করিবার পন্থা আপনাআপনি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাদের চিত্ত যতই নানা ভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংস্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্ত্তন দ্রুত হইতেছে।

অতএব চিত্তের গতি অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না এইজন্যই কোনো দিনই কোনো একজন বা একদল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু যে-দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায়, বাঁধা প্রথা হইতে একচুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয়, সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই—কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনতর? যেমন নদী সরিয়া যাইতেছে কিন্তু বাঁধাঘাট একই জায়গায় পড়িয়া আছে; খেয়া নৌকার পথ একই জায়গায় নির্দ্দিষ্ট; সে ঘাট ছাড়া অন্য ঘাটে নামিলে ধোবা নাপিত বন্ধ। সুতরাং ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নৌকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না, আমাদিগকে দুই চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বকালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড় বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের বর্ত্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই। একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মানুষের কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শূদ্র হইতে বলিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাহার এই একটা কালোপযোগী দাবি ছিল সুতরাং এই দাবির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র আকারে আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। কারণ, সৃষ্টির নিয়মই তাই;—একটা মূল ভাবের বীজ জীবনের তাগিদে স্বতই আপন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া ওঠে—বাহির হইতে কেহ ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জুড়িয়া দেয় না। আমাদের বর্ত্তমান সমাজের কোনো সজীব দাবি নাই—এখনো সে মানুষকে বলিতেছে ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও। যাহা বলিতেছে তাহা সত্যভাবে পালন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নহে, সুতরাং মানুষ তাহাকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবার কালে ব্রহ্মচর্য্য নাই, মাথা মুড়াইয়া তিন দিনের প্রহসন অভিনয়ের পর গলায় সূত্রধারণ আছে। তপস্যার দ্বারা পবিত্র জীবনের শিক্ষা ব্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না কিন্তু পদধূলি দানের বেলায় সে অসঙ্কোচে মুক্তপদ। এদিকে জাতিভেদের মূলপ্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে. অথচ বর্ণভেদের বাহ্য বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। খাঁচাটাকে তাহার সমস্ত লোহার শিক ও শিকল সমেত মানিতেই হইবে অথচ পাখীটা মরিয়া গেছে। দানা পানি নিয়ত জোগাইতেছি অথচ তাহা কোনো প্রাণীর খোরাকে লাগিতেছে না। এমনি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়াতে আমরা কেবল যে অনাবশ্যক কাল-বিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়া আছি তাহা নহে, আমরা সামাজিক সত্যরক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা মূল্য দিতেছি ও লইতেছি অথচ তাহার পরিবর্ত্তে কোনো সত্যবস্তু নাই। শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেছে, কিন্তু গুরু শিষ্যকে গুরুর দেনা শোধ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না, এবং গুরু পুরাকালের বিস্মৃত ভাষায় শিষ্যকে উপদেশ দিতেছে—শিষ্যের তাহা গ্রহণ করিবার মত শ্রদ্ধাও নাই, সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফল হইতেছে এই, সত্যবস্তুর যে কোনো প্রয়োজন আছে এই বিশ্বাসটাই আমরা ক্রমশ হারাইতেছি। একথা স্বীকার করিতে আমরা লেশমাত্র লজ্জাও বোধ করি না যে, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া

গেলেই যথেষ্ট। এমন কি, এ কথা বলিতেও আমাদের বাধে না যে, ব্যবহারত যথেচ্ছাচার কর কিন্তু প্রকাশ্যত তাহা কবুল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই। এমনতর মিথ্যাচার মানুষকে দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, যখন তোমার শ্রদ্ধা অন্য পথে গিয়াছে তখনো সমাজ যদি কঠোর শাসনে আচারকে একই জায়গায় বাঁধিয়া রাখে তাহা হইলে সমাজের পনেরো আনা লোক মিথ্যাচারকে অবলম্বন করিতে লজ্জা বোধ করে না। কারণ, মানুষের মধ্যে বীরপুরুষের সংখ্যা অল্প;—অতএব সত্যকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার দণ্ড যেখানে অসহ্যরূপে অতিমাত্র সেখানে কপটতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা আর চলে না। এইজন্য, আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়—মানুষ একটা জিনিষকে ভাল বলিয়া স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে অথচ সেই মুহূর্ত্তেই অম্লান বদনে বলিতে পারে, যে, সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না —আমরাও এই মিথ্যাচারকে ক্ষমা করি যখন চিন্তা করিয়া দেখি এ সমাজে নিজের সত্যবিশ্বাসকে কাজে খাটাইবার মাশুল কত অসাধ্যরূপে অতিরিক্ত।

অতএব সমাজ যেখানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্যের পথ একেবারেই খোলা রাখে নাই, সুতরাং পুরাতনকালের ব্যবস্থা যেখানে পদে পদে বাধা-স্বরূপ হইয়া তাহাকে বদ্ধ করিয়া তুলিতেছে সেখানে মানুষের যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে, তাহা তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর, তাহা আছে অথচ নাই; তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কলুষিত করিয়া তোলে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের ত এই বদ্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিদ্যালয়। সেও একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে একছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায় ইহাই তাহার সব চেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে ইহাই তাহার মৎলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিদ্যার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের নুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিদ্যালয়ের নূতন শিকল দুই-ই আমাদের মনকে যে-পরিমাণে বাঁধিতেছে সে-পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না। ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। নতুবা নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ককষা মনোরম হইয়াছে সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি, আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য শস্তা পথ খুঁজি। মনে করি উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না। মানুষ বার বার সেই চেষ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি না কেন শেষকালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে। এ দেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এক একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন; তাঁহারাই ভগীরথের মত শিক্ষার পুণ্যস্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ-দিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখ। ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ড‌সন্, ডেভিড্ হেয়ার্, ইহারা শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যূহ এমন ভয়ঙ্কর পাকা ছিল না; তখন তাহার মধ্যে আলো এবং হাওয়া প্রবেশের উপায় ছিল;—

তখন নিয়মের ফাঁকে শিক্ষক আপন আসন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিবেন।

যেমন করিয়া হৌক আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হবে। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বাহ্যপন্থায় আমরা আমাদের চেষ্টাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ কোনো ফল পাইতেছি না। সেই শক্তিকে ও উদ্যমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে চান এইটেই তাঁহাদের সবচেয়ে প্রধান কাজ। নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সচল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে যথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই স্বভাবের নিয়মে শিক্ষকপরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। "জাতীয়" নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হৌক আর বিজাতীয়ের শাসনে হৌক যখন কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারব না—তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না—সে তখন আপিস আদালতের বা কলকারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনি সে মানুষ না হইয়া মাষ্টারমশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য্য সজীবদেহের শোণিতস্রোতের মত চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষনের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিষকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারক রস; তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জ্জীব শিক্ষার মত ভয়ঙ্কর ভার আর কিছুই নাই,—তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি, যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হৌক সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই; তাহার পরিবর্ত্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

চ্যালফোর্ড, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩১ শ্রাবণ, ১৩১৯।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

১। ইউনান প্রদেশের কথা।

অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে ইউনান প্রদেশের যে কয়েকটী শহরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বাদে অপর প্রায় ৭০টী নগর ও উপনগরে কোথায়ও তাদৃশ উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে নাই। ইউনান ফু, টালিফু, টেঙ্গিয়ে প্রভৃতি স্থান বিদ্রোহীদের হস্তগত হওয়ার সংবাদে অন্যান্য সহরের রাজকর্ম্মচারীগণ ভীত হইয়াছিলেন। বিদ্রোহীদিগের হস্তগত স্থানসকল হইতে টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র অন্যান্য নগরের সৈন্যগণ রাজকর্ম্মচারীদিগকে অপসারিত করিয়া প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিয়া জাতীয়

পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিল। এইসকল স্থানে বীভৎস বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা নরহত্যা প্রভৃতি বিশেষ হয় নাই।

ইউনান প্রদেশে এখন শান্তি বিরাজ করিতেছে।

২। ছি-ছোয়ান প্রদেশের কথা।

খাস চীনসাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে এই প্রদেশ অবস্থিত। ইহার উত্তর-পশ্চিমে তিব্বত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ইউনান প্রদেশ। এই প্রদেশ আয়তনে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা খুব বড়, পরিমাণ ফল ২১৮ ৪৮০ বর্গ মাইল এবং ইহার জনসংখ্যাও অত্যন্ত অধিক ৬৮,৭২৪,৮৯০। এই প্রদেশের ভাজিলু এবং বাতাং প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান দিয়া চীনদেশ হইতে তিব্বতে যাইবার প্রশস্ত রাস্তা আছে। ইহারই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক কোণ আসামের সঙ্গে সংলগ্ন।

এই প্রদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র। যত ডুলি-বেহারা টেঙ্গিয়ে প্রভৃতি অঞ্চলে ও ভামোতে দেখা যায় সে সমস্তই ছি-ছোয়ান প্রদেশের লোক। ভৃত্য ও কুলিদের অধিকাংশও এই প্রদেশের লোক।

বিদ্রোহের কারণ।

ছি-ছোয়ান প্রদেশের ধনী সদাগরগণের সমবেত চেষ্টায় চাঁদা তুলিয়া এবং অংশ বিক্রয় করিয়া রেলরোড নির্ম্মাণের আয়োজন হয়। এক রেলওয়ে সমিতি গঠন করিয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। অবশ্য এই গুরুতর কার্য্য স্থানীয় রাজ-কর্ম্মচারীগণের সাহায্য ও সহানুভূতিক্রমে হইয়াছিল। কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেলে চীন গবর্ণমেণ্ট এই রেল লাইন নির্ম্মাণের ভার নিজ হস্তে লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবং ইহার ব্যয় বাবদ ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে নাকি পনর কোটী টাকা ধার করিবার জন্য এগ্রিমেণ্ট হয়। রেলওয়ে সমিতি ও প্রজাগণ এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নানা স্থানে আন্দোলন দ্বারা অসন্তোষের বীজ বপন করিতে লাগিল।

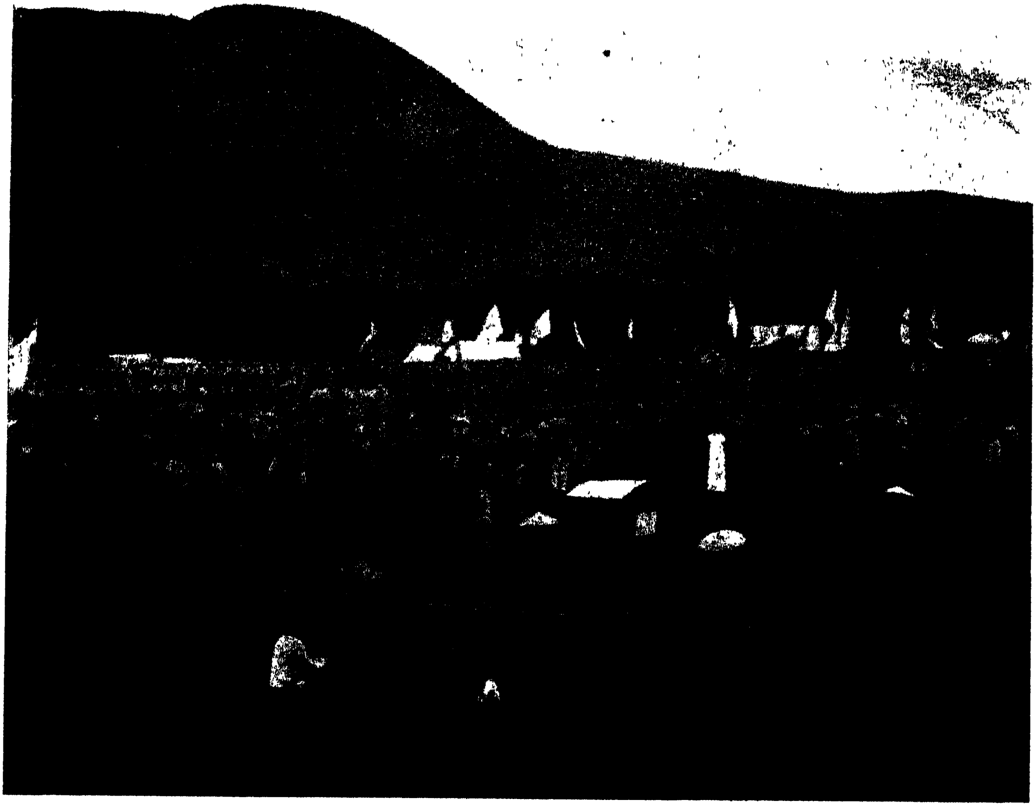
লোকের মনে এমন একটা ত্রাস জন্মিল যে এই রেলওয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা ধার করিলে প্রকারান্তরে ঐ রেল লাইন বিদেশীর নিকট বিক্রয় করার সমান হইবে। কেননা টাকা শোধ না দেওয়া পর্য্যন্ত বিদেশী লোকের কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব এই লাইনের উপর থাকিবে এবং দেশ বিদেশীদিগের হস্তগত হইবে। টেঙ্গিয়ের বিদ্রোহের পূর্ব্বে এখানকার সেপাইগণ ঠিক এই প্রকার কথা বলিত।

চীনাদিগের এই আশঙ্কা যে অমূলক নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ রুষ গবর্ণমেণ্ট সাইবিরিয়া দিয়া যে প্রকাণ্ড রেলপথ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা দ্বারা ক্যালে বন্দর হইতে রেলে চড়িয়া সাইবিরিয়া দিয়া একাদিক্রমে মাঞ্চুরিয়া দিয়া সিওল বা পেকিনে পৌছা যায়। ইহা রুষিয়ার এক বৃহৎ কীর্ত্তি। ইংরেজদিগেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই যে তাঁহারাও এমন একটী রেলপথ নির্ম্মাণ করেন যে সেই ক্যালে বন্দর হইতে রেলে চড়িয়া পারসীয়া, আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান দিয়া হয়ত করাচী হইয়া, না হয় পেশোয়ার হইয়া আসাম পৌছিয়া তথা হইতে ছি-ছোয়ান রেল দিয়া একাদিক্রমে সাংহাই পৌছিতে পারেন। তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিলণ্ডবাসীদিগের বিলাত যাওয়া বা বিলাতের লোকের অষ্ট্রেলিয়া যাওয়াটা বেশ সুগম হইবে। সামুদ্রিক পীড়া বা ঝড় তুফানের আর ভয় থাকিবেনা। পূর্ব্বে কোনো ইংরাজী পত্রিকায় এই প্রকার কল্পনার কথা পড়িয়াছিলাম। আমার বোধ হয় যে সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাওয়ায় পারস্তে গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই কারণেই বা চীনের গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল। সে যাহাই হউক আমরা "আদার ব্যাপারী" এইত নয়, আমাদিগের এত বড় জাহাজের কথার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

ঝড়ের সূচনা।

ঝড়ের পূর্ব্বে যেমন নভোমণ্ডল নিস্তব্ধ ও গম্ভীরভাব ধারণ করে, কেবল মাঝে মাঝে ঈশান বা নৈঋৎ কোনে বিদ্যুচ্ছটা ঝিক্‌মিক্ করিয়া লোকের মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়া থাকে, ছি-ছোয়ানের রাজধানী চেং-ঠো সহরের ভাবও তাদৃশ হইয়াছিল।

গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে নিয়ত গোপনে ও প্রকাশ্যে সভাসমিতি হইতে আরম্ভ হইল, স্কুলে স্কুলে মহা আন্দোলনের



চীনদেশের বিদ্যালয়ের বালকবালিকাদিগের প্যারেড ও উৎসব।

ঢেউ গিয়া আঘাত করিয়া ছাত্রগণকে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

স্কুলের বালিকা ও বালকগণের শতকরা আশিজন ছাত্র ছাত্রী স্কুল ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে গিয়া সকল লোককে দেশের বিপদের কথা জ্ঞাপন করাইয়া উত্তেজিত করিতে লাগিল। এবং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সকল লোককে বিদ্বেষভাবাপন্ন করিয়া তুলিল।

ইয়াংসী নদীর ভাটীতে বহুদুরে দুধারে যত গ্রাম আছে সেইসকল গ্রামের লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য "রিভার টেলিগ্রাম" নাম দিয়া সংবাদ প্রেরণের এক অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করা হইল। বহু কাষ্ঠ-ফলকে বড় বড় অক্ষরে "চেং-ঠোর রাজকর্ম্মচারীগণ হত হইয়াছে। পেকিন হইতে সৈন্য আসিয়া গরীব ছি-ছোয়ানবাসীদিগকে নিপাত করিবে। তোমরা আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ কর।" লিখিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

স্থানীয় মুদ্রাযন্ত্রসকলের প্রভাব আরো বৃদ্ধি হইল। নানা সংবাদপত্রে পেকিন গবর্ণমেণ্ট ও রাজকর্ম্মচারীদিগের নানা কুৎসা করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল। "চক্ষু উন্মেষক" "Eye Opener" "জ্ঞান উন্মেষক" "Wisdom Opener" "পাশ্চাত্য দর্শক" "Western Observer" প্রভৃতি পত্রিকায় নানাপ্রকার ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহার একখানিতে ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বোত্তর কোণ মিচিনা জেলার নিকট পিয়েমেন-মা নামক স্থানে বিদেশী সৈন্যগণ গাছে চড়িয়া চীন সৈন্যদিগকে গুলি করিয়া মারিতেছে; আর একখানিতে সৈন-সুয়ান-হোয়াই নামক প্রধান রাজকর্ম্মচারীকে মুণ্ডপাত করিবার জন্য টানিয়া আনা হইয়াছে এবং তাহার গৃহে অগ্নি-সংযোগ করা হইয়াছে; তৃতীয় খানিতে বিদেশী কর্ত্তৃক রমণীগণ অপহৃত হইতেছে, পুলিশ নিষ্কর্ম্ম অবস্থায় তাহা দেখিতেছে, ইত্যাদি!

বিদেশী-বিদ্বেষ।

চীনদেশী সর্ব্বসাধারণের মনে বিদেশীর প্রতি আন্তরিক ঘৃণা থাকিলেও, বিদেশীকে আক্রমণ করিলে শেষে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ভয়ে, এবার চীনারা অতি সাবধান হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে ছি-ছোয়ান প্রদেশের কোনো স্থানে বিদ্রোহীগণ কাহাকেও আক্রমণ করে নাই বা কাহারও সম্পত্তির ক্ষতি হয় নাই। মাত্র একটী ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। রেভারেণ্ড মানলী সাহেব যখন জি-চাও নামক স্থানের রাস্তা দিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন অল্পবয়স্ক বালকেরা তাঁহাকে অতি কুৎসিত ভাষায় সম্বোধন করিতেছিল। তাহাদের সঙ্গে বয়স্কগণও আসিয়া যোগ দিল। জনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। লোকেরা পাদ্রীর গির্জ্জার ভিতর প্রবেশ করিয়া ভাঙ্গাচুরা আরম্ভ করিল। ইতিপুর্ব্বেই মানলী সাহেব দৌড়িয়া ভিতরে গিয়াছিলেন। তিনি ভিতরে দরজা বন্ধ করিয়া পশ্চাৎ দিকের এক মেটে প্রাচীরে ছিদ্র করিয়া সেই পথে বাহির হইয়া কোনো প্রতিবেশীর বাড়ীর ভিতর দিয়া পলায়ন করেন। চীনাদিগের এই বিশ্বাস যে, রাজ্যে বিদেশীগণের অবস্থানই সকল অনিষ্টের মূল। তাহারা প্রথমে রেলওয়ের মালিক হইয়া ক্রমে রাজ্যটী ভাগাভাগী করিয়া লইবে।

ঝটিকারম্ভ।

পেকিনের মন্ত্রীসভার বিদেশী রাষ্ট্রনীতির মন্ত্রী প্রিন্স চিংয়* উপরই আন্দোলনের প্রধান কোপ পতিত হইল। যত সভাসমিতি তাঁহাকেই আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিল। কারণ লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে তিনিই বিদেশীগণের নিকট এই রেলওয়ে লাইন বিক্রয় করিতে সংকল্প করিয়াছেন। প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি মিং পো এই রেলের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদিগের অগ্রণী। সুতরাং পেকিনের মন্ত্রীসভার কোপটা তাঁহার উপরই পতিত হইল। পো ও অন্যান্য প্রধান আন্দোলনকারীদিগকে ধৃত করিবার জন্য প্রিন্স চিং, চেংঠোর গবর্ণর জেনারালকে তারে আদেশ করেন।

৭ই সেপ্টেম্বর গবর্ণর জেনারাল চাও-আড়-ফাং হঠাৎ চেং-ঠো সহরের নগরপ্রাচীরের সকল দ্বার রুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। চেং-ঠোতে তখন ১৮০ জন বিদেশী লোক ছিলেন। তাঁহাদিগকে নগরের মধ্যে ক্যানাডিয়ান মিশনের বাটীর মধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য আদেশ করিলেন। ব্রিটীশ কনসালজেনারাল মিঃ উইলকিন্‌সন প্রভৃতি ক্যানাডিয়ান মিশন হস্পিট্যালে বাস করিতে লাগিলেন।

গবর্ণর জেনেরাল বিপদের আশঙ্কার ভান করিয়া সকল সৈন্যকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত সহরের সকল রাস্তা সৈন্যগণ ছাইয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে রেলওয়ে সমিতির নেতা মিঃ লো এবং জাতীয় সমিতির সভাপতি মিঃ পো প্রভৃতিকে ধৃত করিয়া ইয়ামিনে বন্দী করা হইয়াছে। চীনাদিগের জাতীয় রীতি অনুসারে পেকিন হইতে টেলিগ্রাফিক আদেশ অনুযায়ী গবর্ণর জেনারাল আন্দোলনকারীদিগের অগ্রণীদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠান যে পেকিন হইতে রেলওয়ে সম্বন্ধে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, সেই সকল বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন। দলপতিগণ তাঁহার ইয়ামিনে উপস্থিত হইলে সামান্য তর্কবিতর্কের পর তাঁহাদিগকে কয়েদ করিবার আদেশ দিলেন। সৈন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। তাহারা ইয়ামিন বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রজাসাধারণ চীৎকার দ্বারা রাজপ্রতিনিধির কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দেশনায়কদিগকে মুক্তি দিতে জেদ করিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ লোকেরা সহরের ভিতরে ও ইয়ামিনের চতুষ্পার্শ্বে জমা হইয়া আরো উচ্চ রবে চীৎকার আরম্ভ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। পশ্চাতের লোকেরা সম্মুখের লোকদিগকে ঠেলিয়া ক্রমে ভিতরের দিকে চাপা দিতে লাগিল। তখন গবর্ণর জেনারাল চাও-আড়-ফাং সৈন্যদিগকে গুলি করিতে আদশ দিলেন। ঘন ঘন রাইফলের আওয়াজ হইতে লাগিল, নিরস্ত্র প্রজামণ্ডলীর অনেকগুলি লোক মুহূর্ত্ত মধ্যে ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। যাহারা আহত হইয়াছিল তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল, অপর লোকেরা ভয়ে দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল।

ইহার পরই সৈন্যেরা রাস্তায় রাস্তায় ঘণ্টা পিটাইয়া জানাইল যে যাহারা দোকান বন্ধ করিয়াছে তাহাদের

* প্রিন্স চিংর ফটো পূর্ব্বে "পেকিনরাজপুরী" প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মুরব্বীদিগকে ইয়ামিনে হাজির হইতে হইবে। সম্রাট কোয়াংসীর সম্মানার্থে দোকানে দোকানে পীত বর্ণের চিহ্ন ছিল তাহা এবং সাহিত্যসমিতি ও অন্যান্য সভাসমিতির সকল আসবাব মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

চাও-আড়-ফাংর অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সকল লোককেই রাষ্ট্রবিপ্লবের দলভুক্ত হইতে বাধ্য করিল। আন্দোলন এখন আর রেলওয়েতে সীমাবদ্ধ রহিল না, উহা এখন রাষ্ট্র-বিপ্লবে পরিণত হইল।

বিপ্লবকারী দল ঘোষণা করিল যে বিদেশীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে কিন্তু মাঞ্চুবংশ ও তাহাদের কর্ম্মচারীদিগকে তাড়াইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট লোকের উপর যতই শক্ত শাসন চালাইতে আরম্ভ করিলেন, প্রজারা ততই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; প্রজাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য যতই লোকের শিরশ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিলেন, রক্তবীজের মত ততই শত শত লোক মস্তক উত্তোলন করিয়া এই নৃশংস কার্য্যের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের চেষ্টায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। প্রজাশক্তির অসীম তেজে মাঞ্চু রাজসিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিল।*

ছি-ছোয়ান প্রদেশে ঘোর আশঙ্কা উপস্থিত হইল। গবর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইয়া দুষ্টলোক মফস্বলের সহর ও গ্রাম লুঠ করিতে আরম্ভ করিল, অপবাদটা হইতে লাগিল রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদিগের। বাস্তবিক তাহা মিথ্যা। রাষ্ট্রবিপ্লবকারীরা এ বিষয়ে বেশ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছে। দুর্ব্বলের সহায়তা করিয়াছে এবং দুষ্টকে যথা-যোগ্য শাস্তি প্রদান করিয়া ন্যায়বিচারের পরিচয় দিয়াছে।

চেংঠো সহরের বাহিরে দুধারে দশ মাইলের মধ্যে নানা স্থানে খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজকীয় সৈন্যগণ প্রায় সকল যুদ্ধেই পরাজিত হইতে আরম্ভ করিল, কোনো কোনো স্থানে সরকারি সৈন্যও বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগ দিল। বিদ্রোহী-গণ অনেকস্থলে গাছের গুঁড়ির ভিতর খোল করিয়া তাহার মধ্যে বারুদ, ভাঙ্গা লোহার টুকরা ইত্যাদি পুরিয়া রাখিয়া তাহাতে বৈদ্যুতিক তার সংলগ্ন করিয়া এমন প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছিল যে সহসা কেহ তাহা টের পাইতে পারে না। লড়াইয়ের সময় রাজকীয় সৈন্যগণকে সেই বারুদে অগ্নি সংযোগ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। মফস্বলের চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে বিদ্রোহীগণ নগর আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

গবর্ণর জেনেরাল চাও-আড়-ফাং প্রজাশক্তির আঘাতে হতভম্ব হইয়া গেলেন, তিনি কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি আপন সৈন্যদিগের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছিলেন না। সন্দেহে দ্বিমনা হইয়া কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না তাই পূর্ব্বেই গোলযোগের আভাস পাইয়া ডাজিলু ডাসিলু প্রভৃতি তিব্বত সীমান্তের দুরস্থ স্থান হইতে সৈন্য আসিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তথা হইতে তিন হাজার সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার মনে বলসঞ্চয় হইল।

১১ই তারিখ তিনি হঠাৎ আবার নগরের সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সৈন্য সমস্ত রাস্তা ছাইয়া ফেলিল। আন্দোলনকারী অপর দলপতিদিগকে, সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে এবং ছাত্র-গণের সর্দ্দারদিগকে ধৃত করিতে আদেশ দিলেন। "চক্ষু-উন্মেষক" "জ্ঞান-উন্মেষক" প্রভৃতি সংবাদপত্রের আপিসের সকল দরজা বন্ধ করিয়া শিলমোহর যুক্ত করা হইল।

কারারুদ্ধ প্রধান ব্যক্তিগণের নাম।

রেলওয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের নেতা লো-লেন; তেন্‌সিয়াও-কো—একজন প্রসিদ্ধ স্পষ্টবক্তা; বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ছাত্রদিগের নেতা নিয়েন; জাপান-ফেরত ছাত্র টিয়েন; রেলওয়ের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট চাং-লান; প্রাদে-শিক সমিতির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট পু-তিওনজুন ও ওয়াং; ব্যবসা ও বাণিজ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নেতা পেন; শিক্ষাবিভাগের অগ্রণী ষাটবৎসরবয়স্ক মুং প্রভৃতি। অনেকে আশঙ্কা করিতেছিল যে এইসকল লোকের মাথা বুঝি কাটা গিয়াছে।

রাজপ্রতিনিধি ঘোষণাপত্রের উপর ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে লাগিলেন কিন্তু লোকে আর তাঁহার ঘোষণাপত্র গ্রাহ্য করিল না।

তাহার একখানির মর্ম্ম এই যে, আন্দোলনকারীগণ

* এস্থলে রবীন্দ্রবাবুর মূল্যবান কথাটি উল্লেখযোগ্য যে "বাহিরের বন্ধন যতই শক্ত হয় ভিতরের বন্ধন ততই শিথিল হইয়া পড়ে।"

সকল লোককে মিথ্যা কথা দ্বারা প্রতারিত করিয়া বিদ্রোহী করার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে নির্দ্দোষ লোকেরা ছাগল ভেড়ার মত হত হইতেছে।

আর একখানির মর্ম্ম এই যে, লোকে যে রেলওয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে তাহা অন্যায় নহে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চেষ্টা করিবেন না। তবে চারিটী বিষয়ে লোকেরা অন্যায় করিতেছে, বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। ১ম, প্রজাবর্গকে সরকারের ট্যাক্স দিতে নিষেধ করিয়া নিজেরা তাহা আদায় করিবার চেষ্টা। ২য়, তাহারা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কাওয়াজ শিক্ষা দিতেছে। ৩য়, আন্দোলনকারীগণ বন্দুক ও কামান সংগ্রহ করিতেছে এবং প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৪র্থ, গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বী যাহারা তাহারা বিদ্রোহী বলিয়া ধৃত হইবে ও তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাইবে, বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

বিদেশীগণের অবস্থা।

চেংঠোর বাহিরের সমস্ত সংবাদাদি বন্ধ। ডাক ও টেলিগ্রাফ বন্ধ, বিদেশীরা নিজেদের ঘরে কয়েদীর মত বাস করিতে লাগিলেন।

চেংঠোর নিম্নে ইয়াংসী নদীর ধারে চুং-কিং নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর। চুং-কিং হইতে চেংঠো যাইতে ৪০ দিন লাগে। এইস্থানে বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকান বাস করেন। চেংঠো হইতে প্রত্যাগত কুলির মারফত গোপনে পত্রাদি পাঠাইয়া সাহেবেরা বহির্জ্জগতের লোককে সংবাদ দিতেন। এই পত্র পাঠানও সহজ ছিল না। বিদ্রোহীরা প্রত্যেক ব্যক্তির শরীর তল্লাস করিয়া দেখিত। কোনো পত্র পাইলে বাজেয়াপ্ত করিত। এই জন্য এক কুলির হাতে ব্রিটীশ কন্‌সালজেনেরাল মিঃ উইলকিলসন চুংকিনে তাঁহার কোনো বন্ধুর নিকট চেংঠো সহরের হাল লিখিয়া জানাইয়া অনুরোধ করিলেন যে তাঁহার যত পত্র টেলিগ্রাম প্রভৃতি তথায় মজুদ আছে তাহা যেন বিস্কুট জাম প্রভৃতির বাক্সের মধ্যে ভরিয়া কুলি দ্বারা পাঠান হয়। বিদ্রোহীগণ এই বাক্স সন্দেহ করিয়া খুলিবে না। যত টেলিগ্রাম কুলির হাতে পাঠাইবেন তাহার নিকাশ রাখিবেন।

বিপদের আশঙ্কা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাজ-প্রতিনিধি ও অন্যান্য উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের পরিবারবর্গ সেনানিবাসে আশ্রয় লইল। মফস্বলের সহর ও গ্রামের লোকেরা পরিবারবর্গ সহ পর্ব্বতে ও জঙ্গলে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। খণ্ডযুদ্ধ ক্রমান্বয়ে চলিতেছিল।

বিদ্রোহীদিগের নিষ্ঠুরতা।

মিয়া নিয়াং-চার নামক স্থান (চেংঠো হইতে ৩০ মাইল দূরে) হইতে প্রায় ১৭।১৮ জন সরকারী সৈন্য আসিতেছিল। কোন ব্যক্তি বন্ধুতার ভান করিয়া তাহাদিগকে কহিল যে সদর রাস্তা দিয়া যাইও না, তথায় বিদ্রোহী সৈন্য আছে। সৈন্যগণ তাহার কথায় বিশ্বাস করায় ঐ ব্যক্তি তাহাদিগকে এক ক্ষুদ্র পথ দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। যখন এক কাঠের পোলের উপর পৌঁছিল তখন পোল ভাঙ্গিয়া পড়িল। পোলটী পূর্ব্বাহ্নেই ইহারা করাত দ্বারা কাটিয়া রাখিয়াছিল। সৈন্যগণ পড়িয়া যাওয়ায় বিদ্রোহীগণ গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সকলকে ধৃত করিয়া নিরস্ত্র করিল এবং পরে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া ছিন্নমুণ্ডগুলি এক মন্দিরে ঝুলাইয়া রাখিল।

টুয়াং-ফাংর ঘোষণাপত্র।

পেকিনের মন্ত্রীসভার সমস্ত দৃষ্টি ছি-ছোয়ান প্রদেশের উপর পতিত হইল। মন্ত্রীসভা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইলেন। তাঁহারা টুয়াং-ফাং নামক সুপ্রসিদ্ধ উচ্চ কর্ম্মচারীকে রেলওয়ের ডাইরেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত করিয়া এই বিদ্রোহ দমনের ভার দিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি ছি-ছোয়ান প্রদেশের নিকট উপস্থিত হইয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"আমি সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ছি-ছোয়ানবাসীদিগকে তাঁহার সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি। আমার সঙ্গে যে সৈন্য আসিয়াছে তাহা কেবল দস্যুদমনের জন্য।

"ছি-ছোয়ানের রেলওয়ে, গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে লইবার কারণ এই যে, এই রেলওয়ে শুধু প্রজার অর্থে নির্ম্মাণ করা কঠিন ব্যাপার এবং রাষ্ট্রনীতির হিসাবে এই রেলওয়ে লাইন অতি প্রয়োজনীয়। ইহা নির্ম্মাণ করিতে

দশ হইতে বিশ বৎসর সময়ের প্রয়োজন। এই লাইন প্রস্তুত করিবার গুরুতর ভার বহন করা গরীব ছি-ছোয়ানবাসীদিগের পক্ষে অতি কষ্টকর হইবে। ইহা নির্ম্মাণ করিতে গেলে এদেশের লোক আরো গরীব হইয়া যাইবে। প্রজার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া গবর্ণমেণ্ট এই লাইন নিজ হস্তে লইয়া ইহার নির্ম্মাণে অর্থ ব্যয় করিবেন। এবং এতদিন লোকের নিকট হইতে যে বলপূর্ব্বক চাঁদা ও অংশ সংগ্রহ করা হইতেছিল তাহা রহিত হইল। গবর্ণমেণ্টের এই অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য ছি-ছোয়ানবাসীদিগের কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি আন্দোলনকারী লোক রটনা করিতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট প্রজার অর্থ শোষণ করিতেছেন এবং বিদেশীর নিকট টাকা ধার করিয়া এই রেলওয়ের ভার বিদেশীর হাতে দিয়া প্রকারান্তরে দেশের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতেছেন। তাহারা কি জানে না যে উত্তর চীনে এবং পেকিন-হাং-কাও রেলওয়ে বিদেশীর নিকট টাকা ধার করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং তাহাতে যথেষ্ট লাভ হইতেছে, কিন্তু কই তাহা দ্বারা ত দেশের স্বাধীনতা নষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ এই নূতন ঋণ অতি সুবিধাজনক সর্ত্তে স্থির হইয়াছে।

"লোকে এইসমস্ত বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া কেবল বৃথা আন্দোলন করিয়া গোলযোগ করিতেছে। স্কুল কলেজ প্রভৃতি বন্ধ করিয়াছে। বাজারের সকল দোকান বন্ধ করিয়া খরিদ্দাবিক্রয়ের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। লোকের এইসমস্ত ব্যবহার দ্বারা রাজদ্রোহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃত বিদ্রোহীগণ চতুরতা দ্বারা প্রজাসাধারণের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহা দ্বারা তোমাদের সন্তানগণ দলে দলে নিহত হইবে। দস্যু ও বিদ্রোহীগণকে গবর্ণমেণ্ট কখনও মাপ করিবেন না।

"রেলওয়ে সমিতি সম্বন্ধে যেসকল অনিষ্টকর গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, সে সমস্তই জ্বালাইয়া ফেলিতে হইবে। যদিও রেলওয়ে সরকারি সম্পত্তি হইল তবুও তাহা প্রজাসাধারণের বস্তু। অতএব আমার অনুরোধ এই যে এই বিষয় লইয়া যেন লোকে আর কোনো গোলমাল না করে। স্কুল ও বাজার খোলা হউক। ব্যবসা বাণিজ্য পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকুক। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হউক। প্রজারা নিয়মমত কর প্রদান করুক। তাহা হইলে রেলওয়ে নির্ম্মিত হইবে এবং গবর্ণমেণ্টও সন্তুষ্ট হইবেন। তাহা হইলে প্রজার সুখ সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।"

এই ঘোষণা দ্বারা কোন ফল ফলে নাই। এই সময় মন্ত্রীসভার কোনো কোনো সদস্য রাজাভিভাবককে পরামর্শ প্রদান করিলেন যে ছি-ছোয়ান প্রদেশের লোকের উপর দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের ট্যাক্সের হার কমান হউক। ইহা দ্বারা প্রজাগণ রাজানুগ্রহ বুঝিতে পারিয়া রাজভক্ত হইবে। এই পরামর্শানুসারে পেকিন হইতে এক গুপ্ত আদেশ ভাইস্‌রয় চাও-আড়-ফাংর নিকট প্রেরিত হয় যে তিনি, ছেন-ছোয়ান-সুয়ান ও টুয়াং-ফাংর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ট্যাক্স কমান যাইতে পারে কিনা সে বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন।

মন্ত্রীসভা হইতে সৈনিকবিভাগের মন্ত্রীর উপর আর এক গুপ্ত আদেশ প্রেরণ করা হয় যে তিনি চারিজন সৈনিক কর্ম্মচারীকে ছদ্মবেশে ছি-ছোয়ানে প্রেরণ করিয়া গোপনে লোকের প্রকৃত অবস্থা ও বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধান করিবেন।

মিঃ ছেন-ছোয়ান-সুয়ান উচাং সহরে উপস্থিত হইয়া ছি-ছোয়ান প্রদেশের বিদ্রোহের বিষয় উল্লেখ করিয়া পেকিনে এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। তাহাতে উল্লেখ করেন যে "ছি-ছোয়ানের বিদ্রোহ রাজদ্রোহ বা রাষ্ট্রবিপ্লবজনিত নহে। তাহা কেবল রেলওয়ে সংক্রান্ত। এমতাবস্থায় তথায় এক যুদ্ধাভিযান লইয়া গেলে ঐ প্রদেশের লোকের বিশেষ ক্ষতি হইবে। তাহা হইলে লোকের মনে আরও অশান্তি বৃদ্ধি হইবে।" মিঃ ছেন দরখাস্তে চারিটী বিষয়ের অবতারণা করেন। (১) "ছি-ছোয়ান রেলওয়ের বিদেশী মূলধন সম্পূর্ণ প্রত্যর্পণ করা হউক। (২) লোককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইচাংর রেলওয়ে-ডাইরেক্টর লি-টী-সুনকে বরখাস্ত করা হউক। (৩) টুয়াং ফাং-কে আদেশ করা হউক যে ৩০ লক্ষ টেল (প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা) যাহা ছি-ছোয়ান রেলওয়ে তহবিল হইতে ধার করা হইয়াছিল তাহা অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হউক। (৪) ইউনান প্রদেশ হইতে যত সৈন্য ছি-ছোয়ান প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের বেতন অবিলম্বে প্রদান করা হউক।"

কিন্তু পেকিনের মন্ত্রীসভা মিঃ ছেনের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য না করায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও ভগ্নমনোরথ হইলেন।

ভাইসরয় চাও-আড়-ফাং পেকিনে যে টেলিগ্রাম পাঠান তাহার মর্ম্ম এই :—"বিদ্রোহ ক্রমে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতেছে। ছেন-ছোয়ান-সুয়ান বিদ্রোহ দমনে ভয় পাইতেছেন। তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহ দমনের আরও অধিক পরিমাণে ক্ষমতা দেওয়া হউক। যতই বিলম্ব হইবে ততই অনিষ্ট হইবে। টুয়াং-ফাং বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ। তাঁহাকে মাত্র রেলওয়ের ভার দেওয়া হউক।"

"আত্মরক্ষার উপদেশ" (Self preserving advices) নামক একখানি গ্রন্থ রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদিগের হাতে ছিল। উক্ত গ্রন্থ জাতীয় সমিতির মেম্বর পু-লু প্রভৃতি সাতজন লোক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করায় গবর্ণর জেনেরাল উক্ত মেম্বরগণকে কারারুদ্ধ করেন। ছি-ছোয়ান গবর্ণমেণ্টের পেকিনস্থ কর্ম্মচারীগণ এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে ঐ পুস্তক এইসকল ব্যক্তির দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং নির্দ্দোষীদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক।

হুপে হইতে এবং ক্যাণ্টন হইতে বহু সৈন্য আসিয়া ছি-ছোয়ান প্রদেশে উপস্থিত হইল এবং সেন্‌সী হইতেও বহু সৈন্য আসিবার হুকুম হইল।

হান বংশধরগণ।

চীনাদিগকে চীন ভাষায় "হানিয়ান" বলে এবং মাঞ্চু-দিগকে "মান্‌জেন্" বলে। যত চীনা সমস্তই হান্‌বংশসম্ভূত। আমরা হিন্দুরা যেমন আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া গৌরব মনে করি, তাদৃশ চীনারা হানবংশসম্ভূত বলিয়া গৌরব মনে করে। আর্য্যগণ যেমন অনার্য্যকে ঘৃণা করে, চীনারাও অনহানবংশসম্ভূতদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। এই কারণেই ইহারা মানজেন বা মাঞ্চুদিগকে ঘৃণা করে।

এই সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবকারীগণ এই সম্বন্ধে যে এক ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছে তাহার মর্ম্ম এই :—

"সমস্ত হান ভ্রাতৃগণের জানা উচিত যে বর্ত্তমান রাষ্ট্র-বিপ্লব যে উপস্থিত হইয়াছে তাহা লোকের মঙ্গলের জন্য এবং অপরাধীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য। বর্ত্তমান মাঞ্চু গবর্ণমেণ্ট, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, উন্মাদগ্রস্ত ও চৈতন্যশূন্য। ইহারা লোকের উপর গুরুতর ট্যাক্‌স বসাইয়াছে এবং লোকের অস্থিমজ্জা পেষণ করিতেছে। ইহারা হান্‌বংশীয় লোককে ময়লার সদৃশ মনে করিয়া ঘৃণার সহিত ব্যবহার করে এবং ইহারা জানে না যে লোকের কি দুঃখ ও ক্লেশ। দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে ইহারা সাহায্য করে না।

"প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া ইহারা রাজপ্রাসাদ ও নন্দন-কানন সকল নির্ম্মাণ করে। পৃথিবীর সমস্তদেশের লোক এইসকল বিষয় অবগত আছে এবং ইহা শুনিয়া দুঃখে লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এই কথা স্মরণ কর যে যখন মাঞ্চুগণ চীন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহারা তখন নগরে নগরে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে হত্যা করিয়া-ছিল। এই প্রকার নৃশংস বর্ব্বরতা বর্ত্তমান ও প্রাচীন কালে কখনও শুনা যায় নাই। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের উপর যেসমস্ত জুলুম হইয়াছে তাহার যদি প্রতিশোধ আমরা না লই তাহা হইলে আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। অতএব সমস্ত ভ্রাতৃগণের কর্ত্তব্য বুঝা উচিত এবং তাহা বুঝিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া বর্ব্বর বিদেশী মাঞ্চুদিগকে নিপাত করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই ইহা ঈশ্বরাদেশ স্বরূপ পবিত্র কর্ম্ম এবং সেইজন্য অবিলম্বে দ্বিধাশূন্য হইয়া অনিষ্টকারীগণ যাহাতে নিপাত হয় তাহা করা কর্ত্তব্য।

"ভগবানের আদেশে আমাদের সম্মুখে এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছে, এই সুযোগ যদি আমরা অবহেলা করি তবে কবে আর এমন সুযোগ উপস্থিত হইবে?

"রাষ্ট্রবিপ্লবকারীগণ দীর্ঘজীবী হউন!"

(ক্রমশঃ)

টেঙ্গিয়ে, চীন। শ্রীরামলাল সরকার।

কাছের সাথী

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে।
শুধু কেবল ফুলের বাসে
মনে হ'ত খবর আসে
উঠ্‌ত হিয়া চমকে।
শুধু যেদিন দখিন হাওয়ায়
বিরহগান মনকে গাওয়ায়—
পরাণ-উনমাদনী,—
পাতায় পাতায় কাঁপন ধরে,
দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে
বনান্তরের কাঁদনী—
সেদিন আমার লাগে মনে
আছ যেন কাছের কোণে—
একটুখানি আড়ালে।
জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে।
একি গভীর, একি মধুর
একি হাসি পরাণ-বঁধুর,
একি নীরব চাহনি!
একি বিজন গহন মায়া
একি বিপুল শ্যামল ছায়া
নয়ন-অবগাহনী!
লক্ষ তারের বিশ্ববীণা
এই নীরবে হয়ে লীনা
নিতেছে সুর কুড়ায়ে,
সপ্তলোকের আলোকধারা
এই ছায়াতে হল হারা
গেল গো তাপ জুড়ায়ে।
সকল রাজার রতন-সজ্জা
লুকিয়ে গেল পেয়ে লজ্জা
বিনা সাজের কি বেশে!
আমার চির জীবনেরে
লও তুমি এই লওগো কেড়ে
একটি নিবিড় নিমেষে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliereএর ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

উৎকৃষ্ট সাহিত্য। আরবদিগের ধর্ম্ম কবিতার ধর্ম্ম। মহম্মদের পূর্ব্বে, উত্তর প্রদেশের বেদুইন্‌রা স্বকীয় বিপদ-সঙ্কুল যুদ্ধযাত্রাসম্বন্ধে, প্রেমের ব্যাপারসম্বন্ধে, শাখাজাতি-দিগের সংগ্রামসম্বন্ধে, এবং যে মরুভূমি দিবসে প্রখর সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ হয় এবং যে মরুভূমিতে রাত্রে শৃগাল ও জিনেরা (দৈত্য) বচরণ করে, সেই মরুভূমিসম্বন্ধে তাহারা গান করিত।

"শন্‌ফরা" হইতে :—

আমার মায়ের 'ছাবাল,' তোমরা এখন পশুদের লইয়া চরাইয়া বেড়াও। আমি তোমাদের ছাড়িয়া চলিলাম। বীরপুরুষের একমাত্র আশ্রয়স্থান—মরুভূমি…আমার সমাজ—চিতা, নেকড়ে ও তরক্ষুর দল; আমার সঙ্গী—আমার বীর-হৃদয়, আমার ধনু, আমার শানিত তলোয়ার…আর ক্ষুধা?—জ্বলিয়া জ্বলিয়া আপনিই নিবিয়া যায়; তখন আমি অন্য বিষয় ভাবি, ক্ষুধার কথা ভুলিয়া যাই। আর বালুরাশি? বরং আমি এই বালুরাশি লেহন করিব, তবু গর্ব্বিত লোকদিগের নিকট নতশির হইব না…গ্রীষ্মের প্রখর তাপ, জ্বলন্ত সূর্য্য, শ্বাসরোধী বাষ্পজাল; তপ্ত বালুকার উপর সর্পেরা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে। আর আমি, সাহসপূর্ব্বক সূর্য্যের সম্মুখে আমার ললাট ও বক্ষ পাতিয়া রাখিয়াছি। আলখাল্লা নাই, টুপি নাই। কেবল একখণ্ড দোমড়ান চীরবস্ত্র। (১)

সমৃদ্ধ ও বাণিজ্যব্রত দক্ষিণ-আরবদেশে, যেখানে সর্ব্বদেশের পোতসকল নিত্য যাতায়াত করে সেইসব বন্দরে, আরবেরা "সবা"র প্রাচীন রাজাদিগের মহিমা ও ঐশ্বর্য্যের কীর্ত্তন করিত।

এইরূপ যথা :—

লুটের বোঝা লইয়া, আমাদের হ্রেষাধ্বনিকারী বলবান অশ্বদের নিকট আমরা ফিরিয়া আসিলাম। আমরা কতকগুলি অসূর্য্যম্পশ্যা রূপসীকে লইয়া আসিয়াছি। তাহাদের সুগোল কপোল, উজ্জ্বল বর্ণ, সুকুমার শরীর, ছিপ্‌ছিপে গঠন, গুরুনিতম্ব; ঠিক যেন ঝটিকা-গর্ভ জলদজাল হইতে পূর্ণচন্দ্র বিনির্ম্মুক্ত। উহাদিগকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে উঠাইয়া

(১) "হমাসা," Ruckert কৃত জর্ম্মান অনুবাদ (১,১৮১)

আসিয়াছি। উহাদের শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কেউর ও নূপুর উহাদের অঙ্গ হইতে অপহৃত হইয়াছে। আমাদের শত্রুগণ নিরস্ত্র ও মৃতকল্প। একটি গৃহও ভূমির উপর দণ্ডায়মান নাই, একটি সর্দ্দারও জীবিত নাই। (২)

সভ্যতা আসিয়া কবিতাকে রূপান্তরিত করিল। প্রাচীন কবিরা যাহা দেখিত, শুধু তাহাই বর্ণনা করিত। নব্য কবিরা, ঘটনা ও স্থানের বর্ণনার সঙ্গে, জীবনক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী নীতি-উপদেশসকল যুড়িয়া দিতে লাগিল; হৃদয়ের অনুরাগাদি প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং আরও কিছুকাল পরে, সেইসকল হৃদয়ের ভাবাবেশ বিশ্লেষণ করিতে সচেষ্ট হইল। কবিতা ছিন্নপক্ষ হইল। পক্ষান্তরে কতকগুলি দার্শনিকের আবির্ভাব হইল। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ—"মারী"। তাঁহার উক্তিগুলি বিষাদ-রঞ্জিত। যথা :—

পিতা অপরাধী; তাঁহার অপরাধ? তাঁহার সন্তানাদি। রাজারও জন্ম কম অপরাধের বিষয় নহে। তাহাদিগের হইতে আপনাকে যদি পৃথক্ করিতে যাও, তোমার অপরাধ আরও বর্দ্ধিত হইবে। বুদ্ধিমান ও উদারচরিত্র হইলে তোমার প্রতি তাহারা আরও বিদ্বেষ প্রকাশ করিবে। নির্দ্দোষ অবস্থাতেই তাহাদের পিতা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে, জীবনের এমন এক রহস্তের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছে যে রহস্তের উদ্ভেদ কস্মিনকালে কোন জ্ঞানীই করিতে পারে নাই।

বড় বড় নীতিবেত্তাদিগের মধ্যে শেষ নীতিবেত্তা—"মারী"। রীতিনীতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে, উচ্চ ভাবের কবিতারও অবনতি হইল।

কিন্তু আরবেরা লঘু কবিতারও অনুশীলন করিয়াছিল। তাহারা যেরূপ মর্ম্মঘাতী কঠোরপ্রকৃতি, যেরূপ কোপন-স্বভাব তাহাতে বিদ্রূপাত্মক পদ্যরচনা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাহারা আদিরসাত্মক গীতিকাব্য, স্তুতি-বাচক পদ্য ও জটিল আকারের রসগর্ভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকও রচনা করিত। লঘু-কবিতার ওস্তাদ ছিলেন—আবু-নুবাস। তিনি হারুন-রসিদের একজন প্রিয়পাত্র।

কালিফের মৃত্যু উপলক্ষে ও কালিফের পুত্রের জন্মোপলক্ষে যে পদ্য রচিত হয় তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

আমাদের নিকট হর্ষ ও শোক আনিয়া দিয়া দিনগুলা আসে, দিনগুলা পলাইয়া যায়। আজ কি?—আজ শোকের দিন। আজ কি?—আজ উৎসবের দিন। বুকের মধ্যে কান্না চাপিয়া আছে, চোখে হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। নির্জ্জনে অশ্রুধারা, লোকসমাজে আনন্দধ্বনি। কি আনন্দ! আমিন আমাদের প্রভু। কি শোক! আমাদের পুরাতন প্রভু মৃত। এক চন্দ্র বাগদাদ আলোকিত করিতেছে, আর এক চন্দ্র সমাধিস্থানের উপর নামিতেছে। (১)

প্রাচীন আরব-কবিতার মধ্যে দুইটি সংগ্রহ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে;—একটি হম্মাদ কর্ত্তৃক রচিত (৭৭১ অব্দে হম্মাদের মৃত্যু)—"মুয়ালাকাৎ"; অপরটি আবু তেম্মাম-কর্ত্তৃক রচিত (৮৪৬ অব্দে তেম্মামের মৃত্যু)—"হমাসা"; প্রাক্-মহম্মদীয় যুগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবি—"অন্তর" (৬০০ অব্দে মৃত্যু হয়); যে আখ্যায়িকায় তাঁহার দুঃসাহসিক কার্য্যসকল বর্ণিত হইয়াছে, উহা সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীতে রচিত।

অম্মেয়িয়াদ্‌দিগের শাসন-কালে :—"হামদানী" (মৃত্যু ৯৪৫ অব্দে), ওয়াদ্দা, ফবজদক্ (৬৪১ অব্দে জন্ম)। আব্বাস বংশীয়দিগের শাসন-কালে :—মোি ইবন্ আজাস, আবু-নুবাস (৭৫০—৮১০), আবুল-আতাহিয়া (৮২৬ অব্দে মৃত্যু), মোটানব্বি (৯৬৫ অব্দে মৃত্যু), আবু ফিরাস (৯৬৮ অব্দে মৃত্যু), আবু আলা-মারি (১০৫৭ অব্দে মৃত্যু)।

প্রধান পারসীক কবি, যথা :—মহাকাব্যে,—"ফির্দ্দুসি" (৯৩৫—১০২০); গীতিকাব্যে "হাফিজ," (১৩৯ অব্দে মৃত্যু); "জামি" (১৪১৪—৯২); গুহ্যতন্ত্রের কবিতা—"অত্তার" (১১১৯—১২৩০), "রূমি" (১২০৭—৭৩), "সাদি" (১১৮৪—১২০২); পদ্যে রচিত গল্প :—"ফির্দ্দুসি" (য়ুসুফ ও জুলেখা), "নিজামী" (১১৪০—১২০২); দরবারী কবিতা, এন্‌ওয়েরি (১১৯০ অব্দে মৃত্যু)।

লঘু ফার্সি কবিতা সচরাচর গজলের আকারে রচিত। কতিপয় দ্বিচরণ কবিতা লইয়া একটি গজল রচিত হয়। প্রতি দ্বিতীয় চরণে একই রকম মিল। "দিবান্"—গজলের একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ।

***

যে সময়ে আরব-কবিতার অবনতি হয়, সেই সময়ে পারস্তদেশে একটা জাতীয়ভাব জাগ্রত হইয়া উঠে। উহা ফির্দ্দুসির "শা-নামায়" প্রবলভাবে প্রকট হইয়া উঠে। ষাট হাজার শ্লোক-নিবদ্ধ এই মহাকাব্যে, পারস্তের পৌরাণিক ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। ইরান ও তুরান—এই দুই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দুই ভ্রাতার বিরোধ লইয়া এই মহাকাব্যের আরম্ভ। কোন একটা অপরাধে, এই দুই রাজ্য পরস্পরের চিরশত্রু হইয়া উঠে। উহাদের সংগ্রামই এই মহাকাব্যের মুখ্য বিষয়। সংগ্রামের দুইটি যুগ :—এক পৌরাণিক যুগ, আর এক—বীর-যুগ। ফির্দ্দুসি কল্পনা করিয়াছেন, Arsacidesদিগের শাসনাধীন পারস্তের ন্যায় ইরান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্যে বিভক্ত। "কৈকাও"—পারস্তের Le Charlemagne। তাঁহার Roland—"রুস্তম্"। এই মহাবীর,—দস্যুদিগকে, অশ্বারোহী যোদ্ধ‍্গণকে, মানবকে, দানবকে, অদ্ভুতদর্শন মৃগ ও

(১) Dr. Brockelmannএর জর্ম্মান-অনুবাদ। M. de Kremer আবুনুবাসের "দিবান" জর্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

(২) A. von Kremer, Sudarabische, Sage p. 76.

পশুদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া সমস্ত ইরান ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

কৈকাও-র মৃত্যুর পর, রুস্তম জীবিত থাকিয়া, Archemenides-দিগের সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন ও জোরোয়াষ্টারের ধর্ম্মপ্রচার প্রত্যক্ষ করেন। প্রকৃত আবির্ভাবকালের ৫০০ বৎসর আরও পরে, ফির্দ্দৌসি জোরোয়াষ্টারকে জন্মগ্রহণ করাইয়াছেন। মহাকাব্যের নায়ক গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। কাবুলের রাজা একটা মৃগয়ার আয়োজন করিয়া রুস্তমকে নিমন্ত্রণ করায়, সেই মৃগয়ায় যাত্রা করিয়া রুস্তম, ভল্ল-কণ্টকিত একটা খাতের মধ্যে পতিত হন। নায়কের আপন ভ্রাতা শেঘাদই এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। সে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক রুস্তমের নিকটে আসিল। কিন্তু রুস্তম বলিলেন :—"নিরস্ত্র হইয়া এই খাতের মধ্যে থাকিলে, হিংস্র জন্তুরা আমাকে ভক্ষণ করিবে। শেষ পর্য্যন্ত আমার ধনুর্ব্বাণ দিয়া আপনাকে রক্ষা করিব।" শেঘাদ তাঁহার এই ইচ্ছার বিরোধী হইল না। ইহা নিশ্চয়ই একটা ছল মাত্র। শেঘাদ মনে করিয়াছিল, তাঁহার ভ্রাতা একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার শক্তি সামর্থ্য নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু এ দিকে রোস্তম অতিকষ্টে একটু বলসংগ্রহ করিয়া শেঘাদের প্রতি লক্ষ্যসন্ধান করিলেন। শেঘাদ একটা বটবৃক্ষের কোটরের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। রুস্তমের তীর যুগপৎ বৃক্ষ ও শেঘাদের বক্ষস্থল ভেদ করিল। তখন রুস্তম বলিয়া উঠিলেন, "হে ঈশ্বর তুমিই ধন্য, তুমি আমাকে প্রতিশোধ লইবার বল প্রদান করিলে।"

পারস্যদেশে, কাহিনী কথার দ্বিতীয় যুগ—সেকন্দরের যুগ। ফির্দ্দৌসির মতে, দিগ্‌বিজয়ী সেকন্দর, এক পারসীক রাজার ঔরসজাত ও "রুমের" রাণীর গর্ভজাত পুত্র। ("রুম"—কিনা, Byzance, প্রাচ্য-রোমনগরী)। প্রাচীন গ্রীস্‌, সেকন্দরের সাম্রাজ্য, রোম-সাম্রাজ্য, বৈজন্তীন-সাম্রাজ্য—এ সমস্তই পারসীকদিগের নিকট, রুম-নামের অন্তর্ভূত।

দ্বিতীয় যুগের ইতিহাস নিঃশেষিত হইলে ফির্দ্দৌসি Seleucidesদিগের ইতিহাস ও Arsacidesদিগের (পার্থীয়) ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার বর্ণনা Sassanides হইতে আবার আরম্ভ হইল। তাঁহার কাব্য যথাযথ ইতিবৃত্তে পরিণত হইল, কিন্তু তাহারও মধ্যে গল্পের অবতারণা আছে। যেমন,—দ্বিতীয় খসরু ও রূপসী শিরীনের গল্প।

তুর্ক ও মোগোলদিগের দিগ্বিজয়ে, মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তারে, প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন ইতিহাস বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইল। মহাকাব্যের পরে গীতিকাব্যের আবির্ভাব।

যিনি কখন প্রেমিক, কখন যোগী—সেই অশ্রান্ত পর্য্যটক "সাদি", জ্বলন্ত প্রেম ও স্বকীয় দুর্ভাগ্যের কথা সুকোমল পদ্যে ব্যক্ত করিলেন।

এইরূপই "লয়লা-মজনুর" প্রণয়-কাহিনী। ইহা—আরবদেশের "রোমিও-জুলিয়েট্‌"।

"আরবদেশের রাজা অবগত হইলেন, লৈলার সহিত বিচ্ছেদ হওয়ায়, মজনু পশুর ন্যায় মরুভূমিতে বাস করিতেছে। মজনু লৈলাকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু ইহা তাহার বাতুলতা বলিয়া রাজা তাহাকে তিরস্কার করিলেন। মজনু বলিয়া উঠিল;—আপনি তাহাকে দেখেন নাই।—রাজা লৈলাকে আনাইলেন। লৈলা ক্ষুদ্রকায়, ক্ষীণাঙ্গী, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ: রাজান্তঃপুরের অধমা দাসীও তাহা অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী। রাজা মুখ শিট্‌কাইলেন, কিন্তু প্রেমিক বলিল:—মজনুর প্রণয় বুঝিতে হইলে, মজনুর নেত্রগবাক্ষ দিয়াই লৈলাকে দেখিতে হইবে। আপনার নিকটে আমি একটুও দয়ার প্রত্যাশা করি না। আমার-মত যে ভুক্ত-ভোগী তাকেই আমার সঙ্গী করিতে ইচ্ছা করি। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের দুঃখের কথা পরস্পরের নিকট বলিব। দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে, আগুন আপনিই জ্বলিয়া উঠিবে। আমি যে পবিত্র কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি, বনের কপোত যদি তাহা শুনিতে পায়—সেও আমার দুঃখে যোগ দিবে। আমার প্রিয় বন্ধুগণ, ঐ প্রেমহীন ব্যক্তিকে তোমরা এই কথা বল:—যে দুঃখে মজনুর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, সে দুঃখ যে কি তাহা আপনি জানেন না।"

যে সুস্থ, সে ব্যথিত জনের ব্যথাকে উপহাস করে। আমার ক্ষতস্থান আমি ব্যথিত জনকেই দেখাইতে চাই। যে ব্যক্তি ভ্রমরের দংশনজ্বালা কখন অনুভব করে নাই, তাহাকে ভ্রমরদংশনের কথা বলিয়া কি ফল? আপনি কখন দুঃখ পান নাই। আমার দুঃখের বর্ণনা শুনিলে আপনি কেবল ক্লান্তি ও বিরক্তি অনুভব করিবেন। আমার দুঃখের সহিত অন্যের দুঃখের তুলনা! তাহাদের লবণ তাহাদের হাতে রহিয়াছে; কিন্তু আমার লবণ আমার 'কাটা ঘায়ের' উপর রহিয়াছে।"(১)

হাফিজ একজন সংশয়বাদী। "প্রান্তর ও উদ্যান যৌবনশ্রীতে বিভূষিত; গোলাপের অভিবাদনে বুল্‌বুল্‌ জাগিয়া উঠিয়াছে। যে মন্দানিল মাঠময়দানে জন্মগ্রহণ করিয়া লোকালয়ে ফিরিয়া আসে, সে ঝাউয়ের নিকট, গোলাপের নিকট আমার মনের

(১) গুলিস্তাঁ (V. ১৭) Nesselmannএর জর্ম্মন-অনুবাদ হইতে গৃহীত।

বাসনা বহন করুক...লোকেরা সুরাপায়ীদিগকে উপহাস করে: পান্থশালা তাহাদিগকে উপহাস করুক; ভাল-ভাল শপথ, বিদায়।—প্রত্যেকের জন্য দুই হাত পরিমাণ ধূলামাটি আবশ্যক; অন্তিম নিদ্রার জন্য ইহাই কি যথেষ্ট নহে? এইসকল উত্তুঙ্গ গগনভেদী প্রাসাদে কি প্রয়োজন? যাও, গগন-চুম্বী গৃহ হইতে পলায়ন কর। এইখানে কিনা শান্তি ও সুখের অন্বেষণ। রূঢ়প্রকৃতি, লুব্ধ সরাই-ওয়ালা, মৃত্যুর দ্বারাই, অতিথিদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়।(২)

উঠ, সাকী! এস আমাদের পেয়ালা পূর্ণ করি। সকলেরই জন্য সুরাপাত্র পূর্ণ করি। প্রেম? প্রেমকে আমি চিনিয়াছি। প্রথমে উহা সুখ, একটু পরেই দুঃখ।—যখন মন্দানিল প্রিয়তমার কুন্তল হইতে কস্তুরীগন্ধী সৌরভ হরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেয়, তখন যন্ত্রণাপূর্ণ ক্ষত-হৃদয় হইতে কতই না শোণিতপাত হয়। যদি অতিথির ইচ্ছা হয়, তবে নিমাজ পড়িবার গালিচাকে সুরায় লাল করিয়া দেও।—আমি প্রেমের সুখ সম্ভোগ করিব! কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই যে বণিক-যাত্রিদলের বাহন-ঘণ্টা নিঃসৃত মৃত্যু-আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে:—"এখনি প্রস্থান করিতে হইবে।"—যাহাদের স্কন্ধে বোঝা নাই, যাহারা নিশ্চিন্তভাবে নদীর তীরে অবস্থিতি করে, তাহারা কি রাত্রির বিভীষিকা, তরঙ্গময় ঝটিকা, ঝটিকার ভীষণ আবর্ত্ত—এ সমস্ত জানে? আমি যে দুর্লভ সুখভোগ করি সেই দুর্লভ সুখই আমার সুখ্যাতি নষ্ট করিয়াছে। সকলেই যাহা পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, কি করিয়া তাহা লুকানো যায়? যদি শান্তিতে জীবনযাপন করিতে চাও, যদি সুখী হইতে চাও, যদি তোমার প্রেমাস্পদকে লাভ করিতে চাও তাহার একমাত্র উপায়, হাফিজ,—লোকের কথা অবজ্ঞা করা।(৩)

ঐ একই সময়ে দরবারী কবিতার আবির্ভাব। madrigal ও ইটালীয় সনেটের সহিত ইহার আকার-সম্বন্ধে তুলনা হইতে পারে। ইহা অনুপ্রাস, মিত্রাক্ষর ও শব্দঝঙ্কারের এক প্রকার জটিল পদ্ধতি। প্রতি শব্দের একটি রূপক-অর্থ আছে। প্রত্যেক কবিতাটিতে একটু রসিকতা, একটু মজার কথা, একটু সূক্ষ্মভাবের কথা, বা হেঁয়ালি আছে। এবং হস্তলিপিতে এরূপ কারুকার্য্যের বাহুল্য যে তাহাতেও প্রকৃত অর্থ বুঝা কঠিন হইয়া উঠে। ইহার পূর্ব্বেই কবিরা, যুবতীকে চন্দ্র বলিত, যুবককে ঝাউগাছ বলিত, চুলের সহিত Hyacinthএর তুলনা করিত, কপোলের সহিত গোলাপের তুলনা করিত, নেত্রের সহিত বাদামের তুলনা করিত। কিন্তু এক্ষণে বিদগ্ধ কবিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে, বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে তুলনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

বসন্তকাল সম্বন্ধে "এন্‌ওয়েরি" রচিত এইরূপ একটি শ্লোক আছে:—"বুল্‌বুলের গানের বিরাম নাই, ঝাউয়ের হর্ষোচ্ছাসের অন্ত নাই...চন্দ্রক (amber) হইতেও মধুরতর একটা সুগন্ধ ভূমি হইতে উত্থিত হইতেছে। মন্দানিল, ফুলের উপর রংএর তূলিকা একটু বুলাইয়াছে কি, অমনি তটিনীর উপর উহার প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া তটিনীকে সহস্র বর্ণে উদ্ভাসিত করিতেছে। জলরাশির গুপ্তকথা তুমি যে তুষার, তোমাকে বিদায়। এস ফুল, এস হরিৎশোভা—তোমাদের আমি অভিবাদন করি; কেননা, এখন ধরণীর পালা; ধরণী এখন নিজের গুপ্তকথা বলিতে চাহে।(১)

গীতি-শ্লোক যতই সুন্দর হউক না কেন, প্রাচ্য জাতির নিকট গল্পের মূল্য আরও অধিক। দীর্ঘ গ্রীষ্মযামিনীতে অবসাদ-ক্লান্ত রাজা, রাজান্তঃপুরবদ্ধ মহিলারা, রাজপথের ব্যস্তসমস্ত পথিকেরা, অথবা রাজদরবারের লোকেরা—ইহারা সকলেই পর্য্যটনকারী কাহিনীকথকদিগের কথা শুনিতে ভালবাসে।

আরবেরা গল্প-আখ্যানে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। উহারা ভারতবর্ষের নিকট হইতে, পারস্যের নিকট হইতে, এসিয়া-মাইনরের নিকট হইতে, ইজিপ্টের নিকট হইতে "সহস্র-এক-রজনীর" গল্পসকল ধার করিয়া আনিয়া নিপুণ ওস্তাদের ন্যায় উহাই আবার নূতন করিয়া রচনা করিয়াছে।

পারসীকেরা আরবদিগের ন্যায় ততটা সুরসিক নহে, কিন্তু আরবদিগের অপেক্ষা বেশী চিন্তাপরায়ণ। পারসীকেরা স্বকীয় পৌরাণিক কাহিনীর আখ্যানে, প্রথমে পদ্য ব্যবহার করে। "য়ুসফ্-জুলিখা" নামক "জামি"-কবির রচিত এইরূপ একটি কাব্য। ইহাতে, সুপুরুষ য়ুসফের প্রতি জুলেখার প্রেম বর্ণিত হইয়াছে।

রাত্রি, মধুর রাত্রি; এইরূপে আমাদের জীবনের উষা। যৌবনের সুন্দর দিনগুলির ন্যায় হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল। সকল পক্ষীই নিদ্রামগ্ন, সকল মৎস্যই নিশ্চল, সকল কার্য্যই, সকল ঘটনাই সুষুপ্ত।

পেলবোষ্ঠা জুলেখা নিদ্রিতা; তাহার মধুর নেত্রের উপর একটি মধুর স্বপ্ন ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার উপাধানটি তাহার মস্তকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার মস্তকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কুন্তলকান্তি Hyacinthএর ন্যায় প্রতীয়মান্ হইতেছে। গোলাপের কেয়ারির মত তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শয্যার উপর প্রসারিত; তাহার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ উপাদান হইতে নিপতিত হইয়া তাহার গোলাপী কপোলকে আচ্ছাদিত করিয়াছে।

সূর্য্যোদয় হইল। জুলেখা চক্ষু উন্মীলিত করিল। হঠাৎ সেই সময়ে এক যুবাপুরুষ দ্বারদেশে দেখা দিলেন। কি বলিয়া বর্ণনা করিব? একি পৃথিবীর মানুষ? না, এ কোন দেবাত্মা, এ কোন জ্যোতির্ম্ময়-লোকবাসী সুন্দর পুরুষ; ইঁহারাই বেহেস্তের কৃষ্ণনেত্র হুরিদিগের চিত্তহরণ করিয়া থাকেন। এই সৌন্দর্য্যের, এই রূপলাবণ্যের, মোহিনী-শক্তি কে অতিক্রম করিতে পারে? জুলেখার হৃদয় বন্দী হইল, জুলেখা

(২) ঐ অনুবাদের সপ্তম গজল।

(৩) প্রথম গজল।

(১) Dr. Paul Horn p. 197.

পরাভূত হইল। সেই রূপের প্রতিবিম্ব তাহার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গেল; উন্মাদ-প্রেমের একটি অঙ্কুর তাহার আত্মার উপর নিপতিত হইল। ঐ মুখখানি, জুলেখার অন্তরে এমন এক আগুন জ্বালাইয়া দিল যে তাহাতে তাহার আত্মসংযম, তাহার ধর্ম্ম সমস্তই বুঝিবা দগ্ধ হইয়া যায়।(১)

পদ্যময়ী কাহিনী গদ্যময় গল্পে পরিণত হইল। প্রাচ্য-দেশের নগর-বর্ণনা:—সোজা রাস্তার দুইধারে কাঠের গবাক্ষ-ওয়ালা বাড়ী; বাজার লোকাকীর্ণ; পুরুষদের লম্বা আলখাল্লা, মাথায় পাগ্‌ড়ী বা পশুলোমাচ্ছাদিত টুপি; স্ত্রীলোকদিগের লম্বা কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ, তাহাদের ওড়নার ভিতর দিয়া তাহাদের বড় বড় কালো চোখ ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ছোট ছোট দোকান। দোকানদারেরা মিষ্টিমিষ্টি কথা বলিয়া (গভীর কণ্ঠ্য শব্দ মধ্যে মধ্যে কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতেছে) দামী গালিচাসকল খুলিয়া দেখাইতেছে; তাহাদের অঙ্গুলীতে ফিরোজা কিংবা পান্নার আংটি। রাত্রি, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি; বাগান-বাগিচা উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত; তালগাছ, ঝাউগাছ, জলের ফোয়ারা; প্রস্ফুটিত গোলাপ, যাহা দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু ক্লান্ত হয় না, যাহার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া নাসিকা ক্লান্ত হয় না; আর সেই বুলবুল, যে, মধুর স্বরে, সুন্দর অথচ নিষ্ঠুর গোলাপের নিকট তাহার প্রাণের কথা বলিতেছে, আবার বলিতেছে, বারংবার বলিতেছে। একটা রহস্যময় প্রাসাদের দ্বার হঠাৎ খুলিয়া গেল; একজন হাব্‌সী দাসীর সঙ্গে এক রাজকুমারী আবির্ভূত হইলেন; তিনি অবগুণ্ঠিতা, কাঁচলীতে বক্ষদেশ আঁটা; বেগ্‌নীরঙ্গের পাজামার উপর, স্বচ্ছ পরিচ্ছদ লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার কেশপাশ হইতে মুক্তাহার ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হইল: চন্দ্রবদন, গোলাপপ্রতিম ওষ্ঠাধর, সূক্ষ্মগঠন নাসিকা, আয়তনেত্র, মুক্তাদন্ত প্রকাশিত হইল। চকিতদৃষ্ট এই মূর্ত্তিখানি, আবার দেখিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া, রাজকুমারেরা অত্যাচারী রাজাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া, যাদুকরদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া, সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া, পৃথিবীময় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; পরে, হতাশ হইয়া সংসারকে বিসর্জ্জন দিয়া, চীরবসন পরিধান পূর্ব্বক বিজনপ্রদেশে গিয়া স্বকীয় দুর্দ্দশার ধ্যান করিতে লাগিলেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"

মানুষের ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা বিশেষ বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের অধিকারের অন্তর্গত ছিল; বংশানুক্রমে তাহারাই সে বিদ্যার চর্চ্চা করিত এবং তাহাকে নিজেদের বিশেষ সম্পত্তি বলিয়া কল্পনা করিত।

এখন নাকি গণতন্ত্রের যুগ, এখন সকলেরই সব বিষয়ে অধিকার। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাকেও, প্রত্যেককে প্রত্যেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ মেলামেশা করিতে হইতেছে। ধ্যানের অভ্রভেদী শিখরে তাহারা আর অনধিগম্য হইয়া নাই, তাহারা এখন সমতলে নামিয়া ধারার সঙ্গে ধারাকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানেই এইরূপ সঙ্গম হইতেছে, সেখানেই মানুষ তাহাদের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য অভাবনীয় রূপ দেখিতেছে। সেখানেই তীর্থ, কারণ, সেখানে স্বাতন্ত্র্যবোধ লুপ্ত হইয়া ঐক্যবোধ প্রত্যক্ষ প্রকাশমান হইতেছে।

হুইটম্যানের একটি কবিতা আছে, তাহার নাম "There was a child went forth everyday"—একটি শিশু প্রত্যহ বাহির হইত। কবি বলিতেছেন, সে যাহাই দেখিত, তাহাই হইত। প্রভাতের সূর্য্যোদয়ের অরুণচ্ছটা, পুষ্পের সৌন্দর্য্য, বিহঙ্গের কাকলি, বৃক্ষলতা, সকল ঋতুর সকল আশ্চর্য্য দান, ফলশস্যের বিচিত্র সম্ভার; সহরের রাজপথের লোকারণ্য, গৃহের পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন পৌরবর্গ—সকল দৃশ্য, সকল শব্দ, সকল ভাব, সকল অনুভাব—তাহার অঙ্গীভূত অংশীভূত হইয়া গিয়াছিল। সে প্রত্যহই এইসমস্ত গ্রহণ করিত, সে প্রত্যহই বাহির হইত।

কবি-কথিত এই শিশুটি কে? কে বাহির হইয়াছে? আধুনিক মানুষ। যে সব চায়। বিশ্বপ্রকৃতিতে যাহা কিছু

(১) "জামি", য়ুসুফ ও জুলেখা, অধ্যাপক Pezzi, Pæsia Persiana (II, 401).

আছে, মানুষের সমাজে যাহা কিছু হইতেছে, সে-সমস্তই 'আমার' এই চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দিতে সে চায়। শুধু আমার বলিয়া সে ক্ষান্ত নহে, সে-সমস্তই তাহার 'আমি'—তাহারই ব্যাপ্তি, তাহারই বহিঃপ্রকাশ—এত বড় কথাটা না বলিলে তাহার চলে না। 'আমার' বলিলে সেগুলি বাহিরের বিষয়সম্পত্তির মত মনে হয়, কিন্তু 'আমি' বলিলে আর তো কোনো কথা নাই। তখন তাহাকে বিভক্ত করিবে কে, খণ্ডিত করিবে কে?

সমস্তকে যে নিজের চেতনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখা চাই—এ ভাব এ যুগের মানুষের মধ্যে ফুটিল কেমন করিয়া? ফুটিল, যতই বিদ্যাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ প্রশস্ততর হইতে লাগিল—বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন, দর্শনের সঙ্গে শিল্পসাহিত্য যতই ক্রমশঃ সাহচর্য্যে ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে দীক্ষিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক বিদ্যার পন্থা, প্রকরণ-পদ্ধতি এবং আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের মোট কাজ একই। মানুষের মনের ক্ষেত্রকে, চেতনার পরিধিকেই তাহারা বিস্তৃততর করিয়া দিতেছে। সুতরাং তাহারা যে যাহাই অন্বেষণ করুক এবং যে যাহাই সিদ্ধান্ত স্থির করুক, তাহারা মানুষের মনকেই নানাদিক্ দিয়া নাড়া দিয়া পরস্পরের সহযোগিতা করিতেছে, এবং সেইজন্য প্রত্যেক বিষয়েই সেই মনঃশক্তির বল ও প্রসারই বাড়িয়া যাইতেছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'র ভাবের অনেক সাক্ষ্য যে আধুনিক বিজ্ঞানে ও দর্শনে পাওয়া যায়,—অর্থাৎ এ আইডিয়াটা যে আধুনিক কালেরই একটি বিশেষ জিনিস, তাহাই দেখাইবার জন্য আজ আমি এই প্রবন্ধ ফাঁদিয়াছি। আমি জানি যে, কবিতার মধ্যে দর্শন-বিজ্ঞানের তত্ত্ব অন্বেষণ করার বিশেষ কোনো সার্থকতা নাই। কারণ, কবিতা তো তত্ত্ব নয়, সে প্রকাশ। কবিতা তত্ত্বকে তো প্রমাণ করে না, সে তত্ত্বকে রূপদান করে। সব সময় যে তাও করে তা নয়—তত্ত্ব হোক্ বা না হোক্, একটা কিছু যে-কোন-জিনিসকে সে আপনার কল্পনার ও ভাবের ছাঁচে ফেলিয়া একটি সুষমাময় রূপে গড়িয়া তুলিতে পারিলেই খুসী হয়। সে ভাবকে চায় না, অভাবনীয়কে চায়—নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বকে চায় না, অনির্ব্বচনীয়কে চায়—এইজন্যই, সে যাহা প্রকাশ করে, সৃষ্টি করে, তাহার মধ্য হইতে তাহার আসল ভাবটা কি, তাহা উদ্ধার করা এত কঠিন হয়। মুখের মধ্যে যেমন মনের নানা ভাবের আলোছায়াপাত দেখা যায়, কবিতার মধ্যে তেম্নি ভাবের নানা ইসারা ইঙ্গিত মাত্র দেখা যায়, কিন্তু তার বেশি নয়। সুতরাং দর্শনবিজ্ঞানের সঙ্গে তাহাকে মিলাইতে গেলে অত্যন্ত অসঙ্গত একটি কাণ্ড ঘটে।

এসব কথা মানিয়া লইলেও বলিতে হয় যে, কবিতার মধ্যেও সত্য আছে, সে যে কেবলি মায়ার সৃষ্টি তা নয়। আমাদের মনের নানান্ মহালে যে সত্যের নূতন নূতন রূপ। কোনোটা বা মস্তিষ্কের মহাল, কোনোটা বা হৃদয়ের মহাল—কিন্তু এই বিচিত্রতায় সত্য কিছু বিভিন্ন হইয়া যান্ না। ইসারায় বলিলেও সত্য, কূটতর্কের জালে আচ্ছন্ন করিয়া বলিলেও সত্য, প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা যন্ত্র দ্বারা দেখাইলেও সত্য। জগতের রূপ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, সুতরাং তাহা মিথ্যা—জগতের বাস্তবিক সত্তার মধ্যে রূপের কোনো সম্ভাব নাই—এ কথা যত বড় দার্শনিকই বলুন না কেন, ইহা সত্য নয়। কারণ, রূপ শুধু চোখে দেখিবার ও ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিবার জিনিস হইলে, মানুষ কখনই বলিত না, জনম অবধি হম্ রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল। রূপের মধ্যেই যে অরূপের বাসা, সে যে ভিতরেরই বাহির, সত্তারই প্রকাশ। কবিতা শুধুই প্রকাশ, আর কিছুই নয়, একথা তেমনই সত্য নহে—কারণ কবিতাও সত্যেরই প্রকাশ।

সুতরাং 'জীবনদেবতা'র আইডিয়ার সঙ্গে যদি দর্শন-বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখা যায়, তবে ইহাই বলিব, যে, এ আইডিয়াটি সত্য, এ নিছক কল্পনা নয়। কবি এই সত্যকে অনুভূতির দিক্ হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হন্ নাই। তিনি ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তত্ত্ব গড়েন নাই।

এখন প্রস্তাবিত বিষয়ে অবতরণ করা যাক্।

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক পত্রে লিখিয়া-ছিলেন:—

"এই পৃথিবীর সঙ্গে কতদিনের চেনা শোনা! বহুযুগ পূর্ব্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে সেদিনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা

থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করেছিলুম, অন্ধজীবনের গূঢ়পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিলুম। মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত, নবপল্লবে ডাল ছেয়ে যেত, বর্ষার মেঘের ঘন নীল ছায়া আমার সমস্ত পাতাগুলিকে পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটীতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখী ক'রে বসলেই আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে।"

সকলেই জানেন যে কবির "জীবন-দেবতা" শীর্ষক কবিতাগুলিতে শুধু নয়, 'বসুন্ধরা' 'প্রবাসী' প্রভৃতি আরও অনেক কবিতায় এই পত্রে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে সেই ভাবের কথাই পাওয়া যায়। কবি বলেন যে, আমাদের এই বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে একটি চিরন্তন জীবন আছে। আমার যে জীবন কত যুগ পূর্ব্ব হইতে কত বিচিত্র জীবপর্য্যায়ের ভিতর দিয়া আমার এই বর্ত্তমানতায় আসিয়া আজ পৌঁছিয়াছে, আমার সেই জীবনই আমার অন্তর্নিহিত চিরন্তন জীবন। কবি তাহারি আশ্বাসে পূর্ণ হইয়া বলেন:—"যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে" এবং "স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে"। এবং এই ক্ষণিক জীবনের স্বল্পপরিসর চেতনার মধ্যে, সেই জন্যই তিনি বিশ্বচেতনাকে এক এক সময় অনুভব করিয়া থাকেন।

ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদে বলে, যে, এক আদিম জীবকোষ হইতে এই নানা বিচিত্র জীবদেহসকল উদ্ভিন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে, এবং সে কথা অধুনা সকলেই দেখিতেছি মানেন। আদিম অ্যামিবা (Amœba) এবং জটিল মানবদেহ একই উপাদানে গঠিত, একই জীবকোষ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। এই জীব কোষ বা প্রটপ্লাজ্‌মিক্ সেল্, ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর ব্যূহ রচনা করিয়া জীবকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছে। মানুষের শরীরে, বিশেষভাবে মানুষের মস্তিষ্কে, ইহার জাল যেরূপ ঘন এবং ক্রিয়া যেরূপ দ্রুত ও গতিশীল, এমন অন্য জীবদেহে বা জীবমস্তিষ্কে নহে। আর সেই জন্যই মানুষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব হইয়া উঠিয়াছে।

ডারুইন্, ওয়ালেস্ প্রভৃতি অভিব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাতৃগণের এইসকল সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি লক্ষিত হয় না। মানুষ যে বিচিত্র জীবজন্মের মধ্য দিয়া সম্ভাবিত হইয়াছে, এ কথাটা সত্য বলিয়া মানা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সুতরাং ডারুইনের এই মত আশ্রয় করিয়া কেহ যদি বলেন যে আমি এক সময়ে গাছ ছিলাম, তবে শুনিতে যতই অদ্ভুত লাগুক্, রাগ করা মূঢ়তা এবং উপহাস করা ততোধিক মূঢ়তা।

কিন্তু এ কথাটা যে অনেকের অদ্ভুত লাগে, তাহার কারণ ইহা নয় যে বৃক্ষজীবনের মধ্য দিয়া ক্রমে মনুষ্যজীবনের অভিব্যক্তি হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তটি কোনো মানুষ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহার আসল কারণ এই যে, একজন মানুষ বলিতেছেন, আমি গাছ হয়ে উঠেছিলুম—'আমি' উঠেছিলুম এই বোধটা। আরো অধিক কারণ এই যে, সে-কথাটা সেই মানুষের আবার "অল্প অল্প মনে পড়ে"।

"আমি গাছ হয়ে উঠেছিলুম" বলিলে বুঝায় যে 'আমি'র ধারাটা যেন গাছ পর্য্যন্ত প্রবাহিত, অর্থাৎ গাছের মধ্যেও এই আমি-বোধটা কোনো না কোনো আকারে ছিল। অথচ তাহা কেমন করিয়া হয়? আমি-বোধটা তো অচেতন বোধ নয়, সংস্কার মাত্র নয়, সে পূর্ণ সচেতন বোধ। প্রকৃতিরাজ্যে এ বোধের স্থান নাই—কারণ সেখানে সমস্তই নিয়মে চলে, অন্ধসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। স্বাতন্ত্র্যবোধের কোনো স্থানই সেখানে নাই।

তারপর "সেই পরিচয়ের কথা অল্প অল্প মনে পড়ে"—এ কথারই বা অর্থ কি? আমাদের স্মৃতি কতদূর পর্য্যন্ত যায়? এই কয়েক বৎসরের জীবনে আমাদের মধ্যে যত বস্তু, যত ভাব ও অনুভাব ও কল্পনা প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার বারো আনা অংশ ভুলিয়াছি, কেবল চারি আনা অংশের সঙ্গে নিয়ত কারবার করিয়া আসিয়াছি বলিয়া বাল্যের সঙ্গে যৌবনকে, যৌবনের সঙ্গে বার্দ্ধক্যকে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ করিতে পারিতেছি। পৈতৃক নানা সংস্কার তো আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু তাহার সবগুলি কি আমাদের জ্ঞাত? যেসকল স্মৃতির উপর সেই সংস্কারের ভিত্তি—সেসকল স্মৃতির কোনো বার্ত্তাই কি আমরা জানি? পিতা গেলেন, তারপর পিতামহ—তখন তো আরও অজ্ঞাত। প্রপিতামহ—আরও অজ্ঞাত। ক্রমে ঊর্দ্ধে

আরও ঊর্দ্ধে গিয়া নিজের বংশের আদি পুরুষ পর্য্যন্ত পৌঁছিলাম। তারপর তাঁহাকে ছাড়াইয়া নিজের জাতির আদিপুরুষ পর্য্যন্ত গেলাম। ধর, প্রথম আর্য্যপুরুষ যিনি ছিলেন, তাঁহার কথাই কল্পনা করি। তাঁহার সম্বন্ধে স্মৃতি তো দূরের কথা, তাঁহা হইতে আগত কোনো সংস্কারের সংবাদ কি আমি জানি? তারপর, আরও যুগ যুগ পূর্ব্বে প্রথম মানব, তারপর যুগ যুগ পূর্ব্বে নানা জীবপর্য্যায়, তারপর আরও কত যুগ পূর্ব্বে উদ্ভিদপর্য্যায়—তারপর, সেই কোন আদিম যুগে সেই প্রথম তরুটি—তাহার কথা "অল্প অল্প মনে পড়ে" এ কথাটা কি কেহ দিবালোকে বসিয়া কল্পনা করিতে পারে, না লিখিতে পারে? এক পুরুষের স্মৃতিই যখন থাকে না, তখন যুগযুগান্তর পূর্ব্বের স্মৃতি থাকে এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়? তবে কবিত্বের মদ্যপান করিলে এবং কল্পনার গঞ্জিকা সেবন করিলে সমস্তই সম্ভব হয়—সাধে শেক্‌স্‌পীয়র—

"The lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact."—

বলিয়াছেন? সুতরাং কবি যদি বলেন যে, "আমি এক সময়ে গাছ হয়ে উঠেছিলুম" এবং সে কথা "আমার অল্প অল্প মনে পড়ে"—তবে শেক্‌স্‌পীয়রের ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া কথাটাকে তলাইয়া ভাবিয়া দেখিবার কোনো আবশ্যকতাই থাকে না। ও আবার একটা কথা!

অথচ অভিব্যক্তিবাদের আদিগুরু ডারুইন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী তাঁহার চেলারা যাঁহারা Post-Darwinians নামে খ্যাত—তাঁহারা এই কথাটাকেও যে স্থানে স্থানে আমল না দিয়াছেন এমন নয়। আমি বলিয়াছি যে, কবির কল্পনা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমর্থন করেন, এমন ব্যাপার এ যুগের পূর্ব্বে আর ঘটে নাই। এ যুগে হইলে মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়র অমন নিশ্চিন্ত মনে কবির সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যটি বলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কারণ এ যুগের মহাকবি স্পষ্টই উল্টা কথা লেখেন; তিনি বলেন—

"A poet never dreams:
We prose folk do: we miss the proper duct
For thoughts on things unseen."—ব্রাউনিং।

অতএব এযুগের মহাকবির এই আশ্বাসবাক্যকেই শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া দেখা যাক্ কবিকথিত আদিম যুগে এই গাছ হইয়া উঠার ব্যাপার এবং সেই যুগযুগান্তরের স্মৃতিকে বহন করিবার ব্যাপারের মধ্যে ডারুইন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ কি সত্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন। ডারুইনের পরে ক্রমে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের লেখার মধ্য হইতে এই ভাবের সমর্থনকারী কথা সকল আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব, তাহা প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছি।

প্রত্যেক মানুষ যে একটিমাত্র ব্যক্তি নয়, কিন্তু অনেক ব্যক্তিত্বের সমষ্টি এবং এই প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্বের যে স্বতন্ত্র বুদ্ধি, ইচ্ছা, স্মৃতি ও সংস্কার রহিয়াছে, আধুনিক মনস্তত্ত্ব এমনতর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডারুইন্ এই কথাটিকে নানা স্থানেই মানিয়া লইয়াছেন দেখা যায়। তিনি বলেন—

"An organic being, is a microcosm, a little universe, formed of a host of self-propagating organisms, inconceivably minute, and numerous as the stars in heaven,"—অর্থাৎ বিচিত্র অঙ্গবিশিষ্ট দেহী একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ, তাহা স্বস্বপ্রধান বহু দেহের সমষ্টিদ্বারা গঠিত এবং সেই দেহগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহারা ধারণার অতীত, এবং আকাশের তারার ন্যায় অগণিত।

আর এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন—

"শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ সকলেই একথা স্বীকার করেন যে আমাদের দেহের নানান্ অঙ্গ সকলের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে,—প্রত্যেকটি জীবকোষের কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বলিয়া ধরা যাইতে পারে; সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপর ভর করিয়াই বলা যায় যে প্রত্যেকটি জীবকোষ একটি স্বপ্রধান স্বতন্ত্র ব্যক্তি"—ইত্যাদি।

জীবকোষের স্বাধীন অস্তিত্বের মত বহু পূর্ব্ব হইতেই বৈজ্ঞানিক সমাজে চলিয়া আসিতেছে। ইহা দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেকটি স্নায়ুকেন্দ্রে (nervous centre) স্মৃতি স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করে। যেমন, আঙুলে ঘা হইয়াছে, ঘা সারিয়া যাইবার পরে ক্ষতের চিহ্নিত স্থানটা শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। তার অর্থ এই যে, সেই চিহ্নিত অংশটুকুর মধ্যে ক্ষতের স্মৃতি জাগরূক হইয়া থাকে। এতো একটা সহজ প্রমাণ, এরূপ নানা প্রমাণের দ্বারা শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মতটকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবং এইসকল প্রমাণসহায় হইয়াই প্রত্যেকটি জীবকোষ যে একটি স্বপ্রধান স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ডারুইন্ এ মতটিও প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

আমাদের মধ্যে এই বহু ব্যক্তির সমাবেশের কারণ

অনুসন্ধান করিতে গেলে, আরও অনেক কথার আলোচনার মধ্যে যাইতে হয়। আমরা দেখিয়াছি যে মনুষ্য যখন জন্ম লাভ করে, তখন হইতে তাহার সকল জীবনী ক্রিয়া এমন সহজভাবে সম্পাদিত হয় যে তাহার কোনো চেষ্টা খাটাইবার বা বুদ্ধি খাটাইবার প্রয়োজনই হয় না। শিশু অনায়াসে নিশ্বাস গ্রহণ করে, মাতৃস্তন্য হইতে দুগ্ধ চুষিয়া লয় এবং গলাধঃকরণ করে, পরিপাক করে, কানে শোনে, চোখে দেখে ইত্যাদি--কিন্তু এতগুলা কার্য্য সে যে আপনিই করিতে পারে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, এগুলি সংস্কাররূপে তাহার মধ্যে আসিয়াছে। আর আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে যখনই কোনো কার্য্য এরূপ অভ্যাসগত হইয়া যায়, যে আর চেষ্টা বা চিন্তা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনমাত্র থাকে না, তখনই তাহা যথার্থরূপে সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু সেরূপ সংস্কার দাঁড় করানো কি এক আধ দিনের কাজ? তাহার জন্য বহু বৎসর, হয়ত বহু যুগও লাগিতে পারে। অতএব, শিশুর জীবনী প্রক্রিয়া বহুকাল ধরিয়া হইয়া আসিয়াছে এবং সেই অনেক কালের অভ্যাসের ফলস্বরূপে সে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই জীবনচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছে। এখন এই সংস্কারকে যদি পূর্ব্বপুরুষের সংস্কার বল, তবে তাহা অসঙ্গত হয় না; যদিচ বৈজ্ঞানিক ভাবে বলিতে গেলে এই কথাই বলা উচিত, যে, তাহার বিশেষ বিশেষ জীবকোষ বহুকাল ধরিয়া এই এক ধরণের জীবনচেষ্টায় অভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং এই সকল অভ্যাসের স্মৃতি তাহার মধ্যে সংস্কারের আকার ধারণ করিয়াছে।

সুতরাং ডারুইন্ যখন বলিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে অগণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ বিদ্যমান—প্রত্যেক জীবকোষই এক একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তি--তখন তাহার অর্থ এই যে, প্রত্যেকটি জীবকোষ আপনার বিশিষ্টতার একটি ধারাকে তাহার আরম্ভকাল হইতে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা মনে করা ভুল হইবে, যে, সেই বহুপূর্ব্বকার কোনো জীবকোষ এবং এখনকার জীবকোষ একই বস্তু—তাহাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ ঘটে নাই। কত লক্ষ লক্ষ জন্মের স্রোতের মধ্য দিয়া তাহাকে প্রবাহিত হইতে হইয়াছে, বাহিরের কত অবস্থার বিপর্য্যয়, কত পরিবর্ত্তনপরম্পরা তাহাকে আঘাত করিয়াছে—সুতরাং যে জীবকোষ সেই আদিম কোন্ যুগে আপনার জীবনলীলা সুরু করিয়াছিল, সে যে আজিও সেই একই ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়?

তথাপি অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও জীবকোষের যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা রহিয়াছে এবং সে যে তাহার জীবনী ক্রিয়ার একটি অখণ্ড সংস্কারকেও বহন করিয়া চলিয়াছে,—যে জন্য তাহার প্রাণরক্ষিণী ক্রিয়া অত্যন্ত সহজ ও অনায়াস-সাধ্য হইতেছে, সে বিষয়ে আর ভুল নাই।

ইহার আর একটি প্রত্যক্ষ জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ ভ্রূণতত্ত্বে (Embryology) পাওয়া যায়। একটি উন্নত জীব অভিব্যক্তির যে-যে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, গর্ভে অবস্থানকালে তাহার ভ্রূণ, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই অবস্থার রূপ পরে পরে ধারণ করে। গোড়ায় তাহাকে এমিবা বা মৎস্যজাতীয় জীবের ন্যায় দেখিতে হয়, তারপর সরীসৃপের মত, তারপর পাখীর মত,—এমনি করিয়া নানা আকারের ভিতর দিয়া সে নিজের বিশিষ্টদেহ লাভ করে। এই মতটিকে সে শাস্ত্রে বলে recapitulation theory অর্থাৎ পুনরাবৃত্তির মত। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, কেন কোনো জীবের ভ্রূণ এইসকল অবস্থার মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া ফুটিবার চেষ্টা করিবে? তাহার সে-সব পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে তাহার তো শ্রেণীগত পার্থক্য হইয়া গিয়াছে? স্যামুয়েল বাট্‌লার নামক বিখ্যাত ডারুইন-শিষ্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন:—

"If the germ of any animal now living is but part of the personal identity of one of the original germs of all life whatsoever, and hence, if any now living organism must be considered as being itself millions of years old, and as imbued with an intense though unconscious memory of all that it has done sufficiently often to have made a permanent impression, if this be so, we can answer the above question perfectly well." অর্থাৎ এখনকার কোনো জীবিত প্রাণীর বীজকে যদি সেই বিশ্বজীবন-ধারার কোন আদিম বীজের সঙ্গে আংশিক ভাবে এক বলিয়া ধরা যায়, এবং সেই হেতু, যদি এই বর্ত্তমান জীবিত প্রাণীকে কোটী বৎসর বয়স্ক বলিয়া মনে করা যায়, এবং মনে করা যায় যে সে এই সুদীর্ঘকাল এমন সকল কাজ করিয়াছে, যাহা তাহার মধ্যে চিরকালের মত মুদ্রিত হইয়া আছে—আর সেই নিগূঢ় অথচ

নিশ্চেতন স্মৃতিতে সে পরিপূর্ণ—তবেই ঐ উপরের প্রশ্নের কোনো সদুত্তর প্রদান করা যাইতে পারে।"

তারপরেই তিনি বলিতেছেন—

"I suppose, then, that the fish of fifty million years back and the man of to-day are one single living being in the same sense, or very nearly so, as the octogenarian is one single living being with the infant from which he has grown." অর্থাৎ, "আমার তাই মনে হয় যে পঞ্চাশ কোটী বৎসর পূর্ব্বের যে মৎস্য এবং আজিকার যে মানুষ সে একই অখণ্ড প্রাণী যেমন অশীতিবৎসরের বৃদ্ধ তাহার আপনার শৈশবকালের শিশুর সঙ্গে একই ব্যক্তি।"

স্যামুয়েল বাট্‌লার ডারুইনের ঐ জীবকোষের স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্বের মতটিকে এই দিক্ দিয়া মানেন, যে, তাহার মধ্যে যেটা instinct অর্থাৎ সংস্কার সে তাহার বহুযুগের সঞ্চিত স্মৃতি বই আর কিছুই নহে। তিনি 'instinct'কে বলেন 'inherited memory' এবং 'unconscious memory' অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষাগত স্মৃতি এবং সুপ্ত স্মৃতি বই সংস্কার আর কিছুই নয়। ডারুইন্ দেখাইয়াছেন যে, যখন জীবকোষগণ কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীকে আশ্রয় করিয়া এমন একটি সংস্কারের ধারা অনুসরণ করে, যাহার সঙ্গে অন্য শ্রেণীর প্রাণীর সংস্কারের ধারার একেবারে মিল হয় না, তখন সেই ভিন্ন শ্রেণীয় (species এর) প্রাণীদিগকে জোর করিয়া মিলাইলে তাহাতে অত্যন্ত কুফল দৃষ্ট হয়। কাছাকাছির মধ্যে বর্ণসঙ্কর চলে, অত্যন্ত দূরবর্ত্তীদের মধ্যে চলে না। স্যামুয়েল বাট্‌লার বলেন যে তাহার কারণ দূরবর্ত্তীদের মধ্যে স্মৃতির ধারা উল্টা ও বিপরীত, সেই জন্য তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক মিলাইলে স্মৃতিভ্রংশ হইয়া যায় এবং সেইরূপ দূরসঙ্করজাত জীব তাহার আদিম অপরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাহাই হৌক্, এই unconscious memory অথবা সুপ্ত স্মৃতির মতকে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রযত্ন করিয়াছেন বলিয়াই স্যামুয়েল বাট্‌লারের নাম পশ্চিমদেশে বিখ্যাত।

ডারুইন্ এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের এই মতটির সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতার' ভাবের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে।

বৈজ্ঞানিক চক্ষে ডারুইন দেখিলেন, প্রত্যেক জীবকোষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, সুতরাং একই মানুষের মধ্যে অগণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটিয়াছে—অথচ তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হয় নাই, একই অখণ্ড জীবনের মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। কবির অন্তদৃষ্টি এবং কল্পনা লইয়া রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন,—বিশ্ব-অভিব্যক্তির নানাধারায় তাঁহার যুগযুগান্তরের জীবন প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নানা জীবনের নানা ব্যক্তিত্ব তাঁহার মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে; অথচ তাঁহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হয় নাই—একই অখণ্ড "জীবন-দেবতা" তাহাদের সকলকে আপনার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন।

"আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভাল বেসেছি,
জনতা বাহিয়া শুধু চিরদিন
তুমি আর আমি এসেছি।"

ডারুইন-শিষ্য স্যামুয়েল বাট্‌লার দেখিলেন, প্রত্যেক জীবকোষের অখণ্ডধারা যে একই সংস্কারের পথ অনুসরণ করিয়া চলে, তাহা তাহার বহুযুগের অভ্যস্ত জীবনী ক্রিয়ার স্মৃতি বই আর কিছুই নয় এবং জীবভ্রূণে অভিব্যক্তির নানা অবস্থার পুনরাবৃত্তির মধ্যেও সেই স্মৃতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়; সুতরাং জীবকোষের ধারা একটি যুগযুগান্তরের অভ্যাসগত সুপ্ত স্মৃতিরই ধারা। কবি রবীন্দ্রনাথও অনুভব করিলেন, যে, সেই নানা সুপ্তস্মৃতি তাঁহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব বিশ্বৈক্যানুভূতির সৃজন করিয়াছে। এ অনুভূতি কল্পনা নয়, এ সত্য যে:—

"দেখি চারিদিক পানে
কি যে জেগে ওঠে প্রাণে।
তোমার আমার অসীম মিলন
যেনগো সকল খানে!
* * * *
হে চিরপুরাণো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া!
* * * *
"প্রাচীনকালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী
পরিচিত সম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিনী!
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমারি স্মৃতি!

কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে মেলিয়া
পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া।"

শুধু স্যামুয়েল বাট্‌লার যে এই সুপ্ত স্মৃতির মত প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, আধুনিক মনস্তত্ত্বে Subliminal consciousness অর্থাৎ মগ্নচৈতন্য বলিয়া একটা কথা বলে। অর্থাৎ আমাদের চৈতন্যের সবটাই আমাদের কাছে প্রকাশ নয়, অনেকটাই অপ্রকাশ। অপ্রকাশ বলিয়াই যে তাহা অনুপস্থিত এবং তাহার কোনো কাজ নাই, এমন কথা বলা চলে না। এ কি রকম? না, উপমাচ্ছলে বলা যায় যে সমুদ্রের তলে যেসব দেশ তৈরি হইতেছে তাহারা যেমন অগোচর, এই মগ্নচৈতন্যও তেমনি অগোচর। দূর হইতে কুহেলিজড়িত বিশাল এক নগরের ক্ষীণাভাসে যেমন সবই অস্পষ্ট নয়, মধ্যে মধ্যে দুটা একটা সমুচ্চ চূড়া, দুটা একটা বড় বড় কীর্ত্তিচিহ্ন যেমন দেখা যায়—অথচ আর সবই ছায়াময়—মগ্নচেতনার রাজ্য কতকটা সেইরূপ।

যদি অভিব্যক্তিবাদ মানি, এবং যেরূপ দেখিলাম, যদি জীবনের ও জীবনী ক্রিয়ার অভ্যস্ত স্মৃতির অখণ্ড ধারাকে মানি, এবং মানি যে আমাদের মধ্যে নানা ব্যক্তিত্বের সমাবেশ সেই অভিব্যক্তির সূত্রে ঘটিতে পথ পাইয়াছে—তবে এ কথা না মানিয়া কোথায় যাইব যে আমাদের চেতনাও অনবচ্ছিন্ন? তার মানে আমাদের যেটুকু চেতনা স্বাধীন-ভাবে আপনার বুদ্ধি ও ইচ্ছা প্রয়োগ করিতেছে, তাহার অপেক্ষা অনেক প্রকাণ্ড চেতনা পূর্ব্বস্মৃতির সংস্কারকে বহন করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং প্রচ্ছন্ন ভাবেই কাজ করিয়া যাইতেছে। জন্ম মানেই একটা নূতন করিয়া আরম্ভ করা—সুতরাং সেই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মগ্নচেতনার যুগযুগান্তরগভীর অতলতার উপরে একটুখানি দ্বীপের বেষ্টনের মধ্যে সচেতন হইয়া জাগিয়া উঠি এবং সেই অল্প একটু সচেতনতাকে সমগ্র চেতনা বলিয়া ভ্রম করি। একজন লেখক বলিয়াছেন:—"Birth is the end of that time when we really knew our business, and the beginning of the days wherein we know not what we would do"—জন্ম হইতেছে একটা কালের শেষ যখন আমরা আমাদের কার্য্য কি তাহা জানিতাম এবং অন্য এক কালের আরম্ভ যখন আমরা জানি না আমরা কি করিব! সুতরাং জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন জীবনধারার কথা, অথবা যাহা একই কথা, জীবন-দেবতার কথাকে ভুলিয়া যদি বর্ত্তমান জীবনকেই একান্ত করিয়া আমরা দেখি, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই!

এই মগ্নচেতনার তত্ত্বকে মানিলে স্মৃতি সম্বন্ধেও আমাদের পূর্ব্বের সংস্কারকে ভাঙিতে বাধ্য হইতে হয়। দেখা গিয়াছে যে বহু পুরাতন স্মৃতিও একেবারে বিলুপ্ত হয় না, যদিচ বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্বের কোনো চিহ্নমাত্র থাকে না। হয়ত একটা গন্ধ একজন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধকে বাল্যের এমন কোনো ঘটনা মনে করাইয়া দেয়, যাহা তাহার মনে পড়িবার কোনো কারণই ছিল না। প্রত্যেকের জীবনের কতগুলি বাঁধা অভ্যাস আছে, এবং সেই বাঁধা অভ্যাসের স্মৃতি তাহার মধ্যে দিব্য জাগরূক থাকে। অথচ যখন এমন কোনো স্মৃতি মানুষের মনে পড়ে যাহা ভাবের অনুবন্ধিতার নিয়মে তাহার পরিচিত অভ্যাসের কোথাও ধরা দেয় না, তখন তাহা কোনো একটি ইঙ্গিতে (suggestionএ) মগ্নচেতনার রাজ্য হইতে উঠিয়া আসিয়াছে ছাড়া আর কি কারণ নির্দ্দেশ করা যায়? সুতরাং স্মৃতি যে কত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায় হইয়া আবার জাগ্রত হইতে পারে, তাহা হিসাব করিয়া নির্দ্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু জড়বস্তুর মধ্যেও স্মৃতির সাক্ষ্য লাভ করিয়াছেন। যে জায়গায় কোনো একটা ধাতু পদার্থ এক সময়ে আঘাত পাইয়াছে, বহু বৎসর পরে সেই জায়গায় সেই আঘাতের স্মৃতির পরিচয় সে প্রদান করিয়া থাকে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বুঝা যাইবে যে জাগ্রৎ চেতনার রাজ্যেই যে স্মৃতির ষোলআনা আধিপত্য তাহা নহে, সুপ্ত বা মগ্ন-চেতনালোকে তাহার আধিপত্য বড় সামান্য নহে। অর্থাৎ জাগ্রৎই বলি বা সুষুপ্তই বলি, সমস্ত চেতনাই এক অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন চেতনা। যতদূর দেখা যাইতেছে, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান এই কথাটা প্রমাণ করিবার দিকেই চলিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক জগতে ফেক্‌নার (Fechner) সর্ব্ব প্রথমে এই সত্যটি ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিশ্বজগতে সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে সমধর্ম্মতা বিরাজমান রহিয়াছে ফেক্‌নারের ইহাই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। তিনি বলিতেন, যেমন চোখের সঙ্গে দৃষ্টি, ত্বকের সঙ্গে স্পর্শ সংযুক্ত রহিয়াছে, অথচ এই-সকল ইন্দ্রিয় বিভিন্ন, ইহাদের চেতনাও বিভিন্ন,—যদিও আশ্চর্য্য এই যে আমাদের মনে এই ভেদ মিলিয়া গিয়া সমগ্র শরীরের এক চৈতন্য অনুভূত হয়—ঠিক তদ্রূপ আমার চৈতন্য, তোমার চৈতন্য, প্রত্যেক মানুষের চৈতন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও অবচ্ছিন্ন হইলেও, এক অখণ্ড মানবচৈতন্যের মধ্যে মিলিয়া যায়। মানসচৈতন্য যেমন ঐন্দ্রিয়-চৈতন্যের পার্থক্য-সকলকে মিলাইয়া লয়, মানবচৈতন্য তেমনি ব্যক্তিগত মানসচৈতন্যের পার্থক্যসকলকে মিলাইয়া লয়। মানব-চৈতন্য আবার সেই একই প্রণালীতে পশু-পক্ষী-বৃক্ষলতার জীবচৈতন্যে মিলিয়া যায়, জীবচৈতন্য সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ-মণ্ডলের বিশ্বচৈতন্যে পর্য্যবসিত হয়, এইরূপে "from synthesis to synthesis and height to height, till an absolutely universal consciousness is reached."—সমন্বয় হইতে সমন্বয়ে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হয় যাবৎ পর্য্যন্ত না বিশ্বচৈতন্যের অখণ্ড সমগ্রতা লাভ করা যায়।

ফেক্‌নার চৈতন্যের ক্ষেত্রকে এইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবীকে তিনি জড়পিণ্ড মনে করিতেন না। তিনি পৃথিবীকে মানুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাণবান্ চেতনাবান্ সত্তা বলিয়া বোধ করিতেন। আমাদের শরীরের মধ্যে কত অসংখ্য জীবাণুর কি প্রচণ্ড আন্দোলন রহিয়াছে, অথচ আমাদের শরীর দেখিয়া তাহা কেন বোধগম্য হয় না? শরীর সেই অসংখ্য বৈচিত্র্যকে সরল করিয়া মিলিত করিয়া লইতে পারিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর তো কোনো কারণ নাই। সেইরূপ এই অগণ্য জীব-শরীরকে পৃথিবী আপনার বৃহৎ শরীরের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে, তাই সমগ্র পৃথিবীর শরীরে জীবনচাঞ্চল্য কিঞ্চিন্মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের হস্তপদের দ্বারা অঙ্গসঞ্চালন আবশ্যক, পৃথিবীর সেরূপ আবশ্যকতা নাই—কারণ তাহার হস্তপদ সর্ব্বত্রই; তাহার লক্ষ লক্ষ চক্ষু এবং কর্ণ—সে আপনার অংশবিশেষের অর্থাৎ মানুষের অসম্পূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুকরণ করিতে যাইবে কেন?

ফেকনারের এই চৈতন্যময় বিশ্বপুরুষের আইডিয়ার সঙ্গে গীতার 'বিশ্বরূপে'র এবং উপনিষদীয় 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'র ভাবের সম্পূর্ণ মিল পাই। বিশ্ব যে সর্ব্বত্র এক চেতনাবান্ পুরুষের সত্তা দ্বারা ওতপ্রোত এবং আমরা সকলেই যে তাহার অন্তর্গত, এ কথার আভাস উপনিষদের নানা শ্লোকের মধ্যে আছে।

মুণ্ডকোপনিষদে আছে:—

> অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
> দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
> বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
> পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

অর্থাৎ অগ্নি (দ্যুলোক) ইঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুদ্বয়, দিক্‌সকল কর্ণদ্বয়, প্রকাশিত বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব, পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী অর্থাৎ মাটী উৎপন্না হইয়াছে—ইনি সমুদয় প্রাণীর অন্তরাত্মা।

এ কেবল কল্পনা মাত্র নহে, ইহাও বিশ্বকে সেইরূপ অখণ্ড চৈতন্যবান্ প্রাণবান্ সত্তারূপে উপলব্ধি, যাহা ফেক্‌নার করিয়াছেন দেখা গেল।

'জীবন-দেবতা'র ভাবের সঙ্গে ফেক্‌নারের যে তত্ত্বটি এতক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলাম, তাহার কি খুবই সাদৃশ্য নাই? জীবন দেবতা মানে একটি "ever evolving personality" ক্রমশঃ উদ্ভিন্নমান ব্যক্তিত্ব। কোন্ আদিম যুগ হইতে এই 'আমি' নামক ব্যক্তিটির প্রথম সূচনা হইয়াছিল তাহা কে জানে! আমার বর্ত্তমান দেহের জীবকোষসমূহের মধ্যে সেই বহু বহু বহু প্রাচীন যুগের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া নানা জীবজীবনযাত্রার সংস্কার-সকল সুপ্তস্মৃতিরূপে আজিও বিদ্যমান, তাহা দেখা গেল। সেইজন্য সমস্ত বিশ্বজগতের সঙ্গে আমার আপনার এমন একটা অন্তরতম যোগ যে আমি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিয়া থাকি, ইহা কল্পনা নয়; ইহা আমার দেহাভ্যন্তরের সমস্ত অব্যক্ত প্রাণের অনির্ব্বচনীয় রহস্যময় স্মৃতি হইতে স্পন্দমান এক আশ্চর্য্য অনুভূতি!

কিন্তু সেই যুগযুগান্তর হইতে প্রবাহিত এই জীবন-ধারার অন্তর্নিহিত সত্তাই যদি জীবন-দেবতা হন্, তবে তাঁহাকে আমার বর্ত্তমান আমিত্বের এই খণ্ড চেতনাটুকুর

মধ্যে উপস্থিত করিবার এবং উপলব্ধি করিবার কোনো প্রয়োজন তো দেখা যায় না। আমি যেসকল অবস্থা মাড়াইয়া আসিয়াছি তাহা আবার মাড়াইবার আমার আবশ্যক কি? তরুলতাপশুপক্ষীব সঙ্গে ঐক্যানুভূতির প্রয়োজন কি? তাহা আর কোনো কারণে নয় কেবল এইজন্য যে, আমি যে মনে করিতেছি যে আমার বর্ত্তমান জীবনের প্রয়োজনের সীমার মধ্যে আমার যেটুকু জাগ্রৎ চেতনা খেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহাই আমার সব চেতনা,—তাহা প্রকৃতপক্ষেই ভুল। আমার চেতনার ক্ষেত্র যে কোন্ সুদূর অতীত হইতে কোন্ সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত, সে কথাটা বুঝিতেই পারিব না। আমায় তাই এই কথাটি জানিতেই হইবে যে, সেই অখণ্ডবিশ্বচৈতন্যলাভ-প্রয়াসী একটি সত্তা আমার মধ্যে চিরকাল ধরিয়া কেবলি আমার জীবনকে গড়িতেছেন, কেবলি তাহাকে বিশ্বের সঙ্গে নানা সম্বন্ধসূত্রে বাঁধিয়া সকল ভেদসীমা দূর করিয়া দিতেছেন। আমাকে অভিব্যক্তির কত স্তরের মধ্য দিয়া তিনি লইয়া আসিয়াছেন, আমার মধ্যে সেইসমস্ত জীবন-যাত্রার অব্যক্ত সংস্কার মগ্নচেতনালোকে মজুত রহিয়াছে—এখনও, এই জীবনেও—যেখানে আমার চেতনার প্রসার ব্যাহত, সেইখানে তাহাকে দূর করিবার জন্য তিনি ভিতর হইতে কেবলি আমাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র ঠেলা দিয়া বাহির করিতেছেন। There was a child went forth every day. তিনিই তো জীবন-দেবতা; তিনি চলিয়াছেন "from synthesis to synthesis and height to height till an absolutely universal consciousness is reached" সমন্বয় হইতে সমন্বয়ে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে, যাবৎ পর্য্যন্ত না বিশ্বচৈতন্যের অখণ্ড সমগ্রতা লাভ করা যায়।

"হে চিরপুরাণো চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।"

ফেক্‌নার সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণে ও চৈতন্যে পূর্ণ করিয়া অনুভব করিয়াছেন এবং আমাদের মানস-চৈতন্য যে ক্রমে ক্রমে চক্র হইতে পরিবর্দ্ধিত চক্রে আরোহণ করিয়া সেই বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিতেছে, ইহাও তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। অর্থাৎ অভিব্যক্তির আরম্ভ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত,—অসংহত জ্যোতিঃপিণ্ড 'নেবুলা' হইতে আর সুসভ্য মানুষের উদ্ভব পর্য্যন্ত যে একটি ধারা চলিয়াছে,—মানুষ সেই ধারাটিকেই পুনবায় অনুসরণ করিয়া আপনার সঙ্গে সমস্ত বিরাট বিশ্বের অখণ্ড যোগ অনুভব করিতে চাহিতেছে। যাহা সে হইয়া আসিয়াছে, তাহা সজ্ঞান ভাবে জানিবে এবং পূর্ণভাবে উ লব্ধি করিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। এজন্য এক সময়ে যাহাকে সে জড় বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিল, আজ তাহারই মধ্যে প্রাণের আশ্চর্য্যলীলা দেখিতেছে। যাহা বিস্মৃত বিলুপ্ত ছিল, তাহা জাগ্রৎক্ষেত্রে আসিয়া রহস্যে তাহাকে অভিভূত করিয়া দিতেছে। সমস্ত চেতনা যে এক অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন চেতনা এই তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করিবার দিকে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সমস্তই এখন প্রবল বেগে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে।

চেতনা সম্বন্ধে যেমন ফেক্‌নারের তত্ত্ব কি তাহা দেখা গেল, তেম্‌নি আধুনিক কালের দার্শনিক আঁরি ব্যার্গসঁ সে সম্বন্ধে কি বলেন তাহা এখন দেখা যাক্।

ব্যার্গস বলেন চেতনা মানেই স্মৃতি। যে চেতনায় অতীতের কোনো সাক্ষ্য নাই সে চেতনাই নয়,—সে তো প্রতি মুহূর্ত্তেই জন্মিতেছে এবং মরিতেছে।

অথচ চেতনার মধ্যে ভবিষ্যতের একটি প্রতীক্ষাও আছে। কিন্তু অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এত গায়ে গায়ে লাগাও, যে, তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যেমন ধর, আমি যখন বলি, 'আমি ভাল আছি,' তখন একটু পূর্ব্বেই ভাল ছিলাম এবং পরমুহূর্ত্তেও ভাল থাকিব, এই দুইটা আশ্বাস ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে এমন অব্যবহিত ভাবে যুক্ত হইয়া থাকে যে তাহাদের বিযুক্ত করা একপ্রকার অসম্ভব। ব্যার্গসঁ সেই জন্য বলিয়াছেন যে "consciousness is a hyphen between past and future"—চেতনা অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে একটা হাইফেনের মত। তিনি বলেন, "জড়ের সঙ্গে চেতনার প্রভেদ এইখানে যে, চেতনার দ্বারা আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে, জড়রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী ব্যাপার, যাহা পরে পরে ঘটিয়াছে, তাহাকে ধারণার মধ্যে আয়ত্ত করিতে

সমর্থ হই। এই মুহূর্তে আমি চক্ষু দ্বারা যে আলোককে দেখিতেছি তাহার মধ্যে কত সুদীর্ঘকালের ইতিহাস সংহত ভাবে নিহিত হইয়া আছে; কত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ঈথরের কম্পনমালা, যাহা আমি গণনা করিতে গেলে আমার লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিবে। অথচ আমি এক মুহূর্তে এত বড় কাণ্ডটা অনুভব করিতে পারিতেছি! দৃষ্টির ন্যায় অন্যান্য চেতনা সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়।" সুতরাং ব্যার্গসঁর মতে চেতনা মানেই অনেকখানি ব্যাপারকে একটুখানির মধ্যে ধরা জড়রাজ্যে যাহা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সম্পাদিত হইতেছে তাহাকে একমুহূর্ত্তের মধ্যে উপলব্ধি করা। তাহাকে ব্যার্গসঁ নানাস্থানে কোথাও impulse অর্থাৎ প্রবৃত্তি বলিয়াছেন, কোথাও intuition অর্থাৎ হৃদস্থিত সহজ ও অখণ্ড বুদ্ধি বলিয়াছেন—অর্থাৎ তাঁহার মতে চেতনা, বিশ্ব-অভিব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টিরই প্রেরণা। এই জন্য ব্যার্গসঁ Creative Evolution গ্রন্থ লিখিয়াছেন—অভিব্যক্তির মধ্যে যে একটি সৃজনীশক্তি চেতনারূপে লীলা করিতেছে, ইহাই তিনি প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যোগী। জড় এই সৃষ্টির প্রেরণার উপকরণ মাত্র। কোথাও কোথাও চেতনা জড়ের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জড়স্বভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু তাহার নিয়ত চেষ্টাই এই যে সে উপকরণের ঊর্দ্ধে উঠিয়া আপনার অনির্ব্বচনীয় অবন্ধন-রূপকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইবে। এ যেন কবিতা—তাহার প্রাণই আসল, ভাষা তাহার উপকরণ; যেখানে তাহার প্রাণ পূর্ণ জাগ্রত, সেখানে ভাষার দেহ সেই প্রাণে প্রাণিত, যেখানে প্রাণ সুপ্ত, সেখানে ভাষাই সব হইয়া উঠিয়া গতিহীন নিশ্চলতা ও মৃত্যুর আকার ধারণ করে।

ব্যার্গসঁর সম্পূর্ণ মতটি এখানে প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব, কারণ তাহা এক কথায় দুকথায় সারিয়া দিবার মত নহে। তবে যতটুকু বলা গেল তাহাতে আমরা দেখিতেছি যে ব্যার্গসঁ চেতনাকে যে সৃষ্টির প্রেরণা বলিয়াছেন, "জীবন-দেবতা"র আইডিয়ার সঙ্গে তাহার বেশ মিল আছে। সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে এই চেতনার দ্বারাই তো জীবনে জীবনে আমাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে; স কত কি আনিয়াছে, কত সংস্কার জমাইয়াছে, কত ফেলিয়াছে, কত গড়িয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত তাহার সেই সৃষ্টির কাজ ক্ষান্ত নাই। সে সমগ্র চেতনাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না লাভ করিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে আপনাকে সৃষ্টি করিয়াই চলিবে। একদিকে তাহার অনাদি অতীত, অন্যদিকে অনন্ত ভবিষ্যৎ।

এখনি কি শেষ, হয়েছে প্রাণেশ
যাকিছু আছিল মোর?
* * * *
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা
আন নবরূপ আন নবশোভা
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন-ডোরে।"

আমি যে 'জীবন দেবতা' লইয়া এত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রামাণপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিলাম, তাহা দেখিয়া অনেক কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। রসের দিক্ দিয়া কবিতার এক প্রকার উপভোগ আছে এবং তাহাই যে তাহার শ্রেষ্ঠ উপভোগ সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, কবিতা শুধু রস এবং সত্য নয়,—এমন করিয়া দেখা আমি যথার্থ দেখা বলিয়া মনে করি না। তাহার মাহাত্ম্যই তাহার প্রকাশে, সেইখানেই তাহার রস, এবং তত্ত্বপদার্থ তাহার মধ্যে একেবারেই গৌণ—ইহা স্বীকার করিলেও তাহাকে সত্ত্বাবর্জ্জিত প্রাণ-বর্জ্জিত রূপ মাত্র মনে করিয়া আমি কোনো সান্ত্বনা লাভ করি না। আমার বিশ্বাস এই এবং "জীবনদেবতা"র আলোচনায় এক্ষেত্রে আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, বড় কবিমাত্রেই জানিয়া এবং না জানিয়া তাঁহার কালের সকল দিক্‌কার সকল প্রয়াসের মধ্যে, সাধনার মধ্যে ও চিন্তার মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া থাকেন। আমি যে-সকল চিন্তার ধারা অনুসরণ করিলাম, হইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছিলেন বলিয়া এই "জীবনদেবতার" ভাব তাঁহার মধ্যে জাগিয়াছে—কিন্তু তাহা না হইলেও আপনা-আপনি আপনার কবিত্বের অন্তর্দৃষ্টি হইতেই এই ভাব তাঁহাকে অধিকার করিতে বাধ্য—যখন এই ভাবের বাষ্প সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া আছে দেখিতে পাই। এই জন্যই বড় কবিকে seer বা দ্রষ্টা বলে—তিনি নদীর মত তাঁহার কালের নিম্নস্তরে

গভীরভাবে প্রবাহিত সকল ভাব-উৎস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। যাহা বিক্ষিপ্ত-ভাবে ছড়াইয়া থাকে তাহাকে তিনি সংহত করিয়া এক করেন। আর এই জন্য বড় কবির সমগ্র জীবনের ভিতর হইতে সমুদ্ভূত কোনো আইডিয়াকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া একমাত্র নির্বোধ ও প্রাকৃত জনের দ্বারাই সম্ভব। অতঃপর "জীবন-দেবতা"র রহস্য কিছু কিছু উদ্ঘাটিত হইলে তাহা খুবই আনন্দের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

জন্ম, কর্ম্ম এবং অবচার

লোকে বলে যে যাহার যাহা কপালে থাকে, তাহাই ঘটে; বিধিলিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। মহাভারতে আছে "বিধাতা বিহিতং মার্গম্ ন কশ্চিদধিবর্ত্ততে।" জীবনে যাহা ঘটে, তাহাই অ-জানা ভাগ্যের ফলে বা "অ-দৃষ্ট"-এর ফলে ঘটিল বলিলে কিছুই বুঝিতে পারা গেল না,—কিছুই বুঝাইতে পারা গেল না। যাহা "অ-দৃষ্ট," অর্থাৎ যাহা দেখি নাই বা যাহা দেখা যায় না, অর্থাৎ যাহা জানি না, তাহার ফলে কিছু ফলিল বলাও যা, কেন কিছু ঘটিল, তাহা জানি না, বলাও তা।

বিধাতা এবং বিধিলিপি সম্বন্ধে যাঁহারা আমার মত অজ্ঞ, তাঁহাদের বিচারের জন্য আমাদের ভাগ্য এবং ভাগ্য-ফলের কথার বিশ্লেষণ করিব। মানুষের ভাগ্যের কথা যে বড় দুর্বোধ্য, তাহাই বিশেষ করিয়া বলিবার জন্য একটা অত্যুক্তি প্রচলিত আছে; প্রবাদ-বচনে উক্ত আছে যে পুরুষের ভাগ্যের কথা মনুষ্য দূরে থাকুক, দেবতারাও জানেন না। দুর্বোধ্য হইলেও ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তন-রীতি একটু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

রাম সবল শরীর লইয়া দরিদ্র কৃষকের গৃহে জন্মিল, আজন্ম কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত রহিল, এবং কৃষক-পল্লীতে কৃষকদিগের সঙ্গে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিল। অন্যদিকে হরি দুর্ব্বল শরীর লইয়া ধনীর গৃহে জন্মিল, এবং উপার্জ্জনের ভাবনা-পরিশূন্য হইয়া সুখভোগ-প্রিয় সঙ্গীদিগের সহবাসে বাড়িয়া উঠিল। রাম এবং হরির ভাগ্যে যাহাই থাকুক, যাহাই ঘটুক, তিনটি অবস্থা যে উভয়ের ভাগ্যকেই শাসন করিতেছে, তাহা দেখিতেছি। জন্মের সময় যে যেমন শরীর লইয়া জন্মিল, সেটা তাহার জন্মফল; জন্মের পরে যে যেমন প্রাকৃতিক সুবিধায় যে কার্য্য করিল এবং তাহার ফলে যেমন ভাবে তাহার জীবন গড়িয়া উঠিল, সেটা তাহার কর্ম্মফল; এবং যে পরিবার বা সমাজের বাহ্যিক অবলম্বনে এবং প্রভাবে তাহার মতি গতি নিয়মিত হইল, সেটা তাহার অবচার-ফল।* ইউরোপীয় সমাজ বিজ্ঞান এবং জীবন-বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ তিনটির নাম যথাক্রমে famille, travail এবং lieu। সহজ রকমে ইংরাজিতে ঐ তিনটিকে যথাক্রমে heredity, function এবং environment বলিয়া থাকে। উহার কোন্‌টি দ্বারা মানুষের ভাগ্য কতখানি নিয়মিত হয়, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন।

সর্ব্বকালে এবং সকল দেশেই জন্মফলের প্রভাব স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। বরং যে-যুগে এবং যে-সমাজে সূক্ষ্ম দর্শনের যত অভাব, সেই সেই স্থলেই জন্মফলের প্রভাব অতি মাত্রায় বেশি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সন্তানেরা দেখিতে যে অনেকটা পিতা-মাতার মত হয়, তাহা বর্ব্বরেরাও লক্ষ্য করিয়া থাকে। পুত্র, পিতার অঙ্গ-ভঙ্গির অনুকরণ করিতে শিখে, পিতার কথা-কহিবার ধরণে কথা কহিতে শিখে, এবং মাতা আদর করিয়া প্রীত-মনে শিশুর সেই অনুকৃতি-কার্য্যে অনেক সময়েই সহায় হইয়া সেই ধরণ-ধারণগুলি বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করে। পুত্র এখানে জন্মফলে যাহা লাভ করে নাই, যাহা সে কর্ম্ম এবং অবচারের ফলে লাভ করিয়াছে, তাহাও সাধারণ লোকে জন্মফল বলিয়া বিশ্বাস করে। জীবন-বিজ্ঞানের (Biology) তথ্য হইতে দেখিতে পাইব যে, সন্তানেরা

* যাহা মানুষের অবলম্ব্য, যাহা তাহার কর্ম্মক্ষেত্র, যাহা তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এ দেশের প্রাচীন কালের ভাষায় তাহার নাম অবচার। Lieu বা environment অর্থে এই "অবচার" শব্দ সুপ্রযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি।

হুবহু পিতা-মাতার দ্বিতীয় সংস্করণ নহে। কিন্তু মোটা দৃষ্টিতে পুত্রকে একেবারে পিতার অবিকল দ্বিতীয় অবতার বলিয়া মনে হয়।

নিজের আত্মাই পুত্ররূপে জন্মলাভ করে, এই হইল প্রাচীন শাস্ত্রের কথা। চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়াই যে এই মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, শাস্ত্র হইতেই তাহা দেখাইতেছি। অতি প্রাচীন "আপস্তম্ব" ধর্ম্মসূত্রের দ্বিতীয় প্রশ্নের নবম পটলের চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের প্রথম দুই শ্লোকেই আছে যে—পিতা সন্তানের জন্মে নিজেই আবার জন্মগ্রহণ করেন, এবং সেই জন্মেই এই মরণশীল জগতে তিনি বংশ-পরম্পরায় অমৃতত্ব লাভ করেন। ঋষি আপস্তম্ব দ্বিতীয় শ্লোকে এই উক্তির প্রমাণস্বরূপে লিখিয়াছেন যে—মানুষে সহজ চোখেই এ কথা প্রত্যক্ষ করিতে পারে যে, শরীর স্বতন্ত্র হইলেও আকৃতি এবং প্রকৃতিতে পুত্র পিতার অনুরূপ। অতএব পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংরাজিতে সাধারণ কথায় পুত্রকে a chip of the old block বলা হয়। টুক্‌রা হইলেও টুক্‌রাটুকুর নূতনত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য খুব সূক্ষ্মদর্শনেই উপলব্ধ হইতে পারে। সে কথা পরে দেখাইতেছি।

মানুষে যে সাধারণতঃ জন্মফলের প্রভাব কত অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা লোক-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অনেক উপকথা এবং প্রবচন হইতে ধরিতে পারা যায়। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে জন্মমাত্রেই রাজার ছেলে বনের মধ্যে পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু সেখানেও পশুপক্ষীরা তাহার প্রজা এবং সেবক হইয়া দাঁড়াইল। বনের পশু আসিয়া দুধ খাওয়াইয়া তাহাকে মানুষ করিল, পাখীরা ফল যোগাইল, সাপ আসিয়া ফণাবিস্তার করিয়া ঘুমের সময়ে তাহার মুখের উপরে রৌদ্রপাত নিবারণ করিল, এবং পরে বড় হইয়া বিনা শিক্ষায় কেবল জন্মের গুণে সে শিশু, বনচারী মনুষ্যদিগের নায়ক এবং প্রভু হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষের এমন প্রান্ত নাই, যেখানে কোন হঠাৎ-অবতার রাজবংশ সম্বন্ধে এই গল্প প্রচলিত দেখা যায় না। বিধাতার কলমে Cainএর কপালে নরহত্যার পাপ অঙ্কিত ছিল, কাজেই সে ভ্রাতৃবধ করিয়া নরকে গেল। ঈশ্বরের বার্ত্তাবহ Ezekiel, ইস্‌রায়েল-বাসীদিগকে গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন যে, বাপ তেঁতুল খাইলে সন্তানের দাঁত টকিয়া যায়। (The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge.)

বংশ-সংক্রমণে মানুষে পূর্ব্বপুরুষের কি রকমের দোষ-গুণের উত্তরাধিকারী হয়, এ কথা লইয়া জীবন-বিজ্ঞানে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে। অনেক শিক্ষিত লোকের সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি যে, অনেকেরই এই অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান নাই, অথচ তাঁহারা গাল্‌টন, ডারউইন প্রভৃতি নামের দোহাই দিয়া অসম্ভব রকমের জন্মফলের কথা বলিয়া থাকেন। অসবর্ণ বিবাহের কথায় অনেক সুশিক্ষিত মূর্খের মুখে heredity নামক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উক্ত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালের অসম্ভব রকমের জন্মফলের প্রভাব বিষয়ক বিশ্বাস যেসকল মনে প্রভুত্ব করিতেছিল, সেখানে বিজ্ঞানের heredity-বাদ একটা ধুয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু উহার যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা জানিবার জন্য কৌতুহল উদ্দীপ্ত হয় নাই।

একটা সুপুষ্ট এবং সুপক্ব বেগুনের সকলগুলি বীজই সমান ফলপ্রদ হইবে বলিয়া মানুষের মোটা বিচারে অনুমিত হইতে পারে। এক সঙ্গে অনেকগুলি বীজ বাড়িয়া উঠিবার সময় কতকগুলি যে সুবিকশিত হইবার সুবিধা পায়, এবং কতকগুলি যে অন্য বীজের চাপে এবং এবং অন্য কারণে উপযুক্ত পুষ্টি লাভ করিতে পারে না, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। যখন বীজগুলি একই মাটিতে পুঁতিয়া সমান যত্নে লালনপালন করিবার সময় অনেক সুপুষ্ট বীজ আমাদের অজ্ঞাতসারে হয়বা একটু কোণঠেসা হইয়া পড়ে, না হয় আপাতদৃষ্টিতে একস্থানে পড়িয়াও ভিন্ন রকম মাটির গুণ প্রাপ্ত হয়, তখনকার পার্থক্য আমরা ঠিক্ ধরিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু যাহা হউক, বেগুনের চারার বেলায় মোটামুটি প্রাকৃতিক কারণের কথাই ভাবিয়া থাকি। বৃক্ষলতায় আত্মবাদের বাড়াবাড়ি নাই বলিয়া বেগুনের চারাগুলির পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-দুষ্কৃতির কথা উঠে না; কিন্তু আমরা না কি আত্মাদরে তরু-লতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতির শারীরিক প্রকৃতি হইতে মানুষের

শারীরিক প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করি, তাই মানুষের জন্মপার্থক্যে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মূল বীজের যে অবস্থার ফলে কোন শিশু বা সবল, কোন শিশু বা বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, বর্ব্বরের মনে সহসা সে প্রাকৃতিক অবস্থার কথা উদিত হয় না। দুর্ব্বল বা দোষগ্রস্ত বীজ যদি অঙ্কুরিত হইবার সুবিধা পায়, তবে ত দুর্ব্বল বা বিকলেন্দ্রিয় সন্তান জন্মিবেই। সকলেই বিকলেন্দ্রিয় হইতে পারে না, সকলেই সুপুষ্ট হইতে পারে না; ভিন্ন ভিন্ন সন্তানকে ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক অবস্থা লইয়া উৎপন্ন হইতেই হইবে, তবুও বর্ব্বরের মন মানে না; সে অজানা পূর্ব্বজন্মের দোহাই দিয়া পার্থক্য বুঝিতে চায়। মানুষের শরীরের প্রকৃতিই এমন যে তাহাতে অবস্থা-বিশেষের দূষিত বীজ উৎপাদিত হইবেই হইবে। সেই দূষিত বীজ যদি অঙ্কুরিত হইতে পারিল, তবে ত একটা দোষগ্রস্ত শরীরের জন্ম হইবেই। পূর্ব্বজন্মবাদীর কুযুক্তিতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, অমুক রাম বা হরি সেই দূষিত শরীর লইয়া জন্মিল কেন? তাহার স্থলে শ্যাম বা যদু সে শরীর পাইল না কেন? একজনকে যখন সে শরীর পাইতেই হইবে, এবং তাহার একটা স্বতন্ত্র নাম হইবেই হইবে, তখন আবার সে ব্যক্তি যদি যদু হইত, তবে সে হরি হইল না কেন, এ প্রশ্ন উঠিতে পারিত। এক জন্মের এক জনের আত্মা অন্য জন্মের অন্য শরীরে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে কি না, সে তর্কের বিচার করিতে গেলে ভূতবাদীর ইতিহাস লইয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যাহা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে সম্ভবপর বলিয়া অতি অল্প পরিমাণেও অনুভব করা যায়, তাহার ব্যাখ্যার জন্য একটা অজানা ধাঁধা বা প্রহেলিকার সৃষ্টি করা কেন? প্রহেলিকাটাও দুর্ব্বোধ্য এবং ব্যাখ্যাটিও ততোধিক। অনেকেরই মনে রাখা উচিত যে সহজ দৃষ্টি ছাড়িলেই একটা গুরু রকমের দার্শনিক হইয়া উঠা যায় না।

যেসকল ঘটনা বৃক্ষলতায় এবং পশু-পক্ষীতে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হই না, সেইসকল ঘটনা যখন মানুষের বেলায় ঘটে, তখন আমরা তাহার অতি-প্রাকৃত ব্যাখ্যা দিবার জন্য উদ্‌যোগী হই। বৃক্ষ-লতার মৃত্যু হয়, পশুপক্ষীর মৃত্যু হয়, ইহা ত সর্ব্বদাই দেখিতেছি; তবুও মানুষ মরে কেন বলিয়া কত অদ্ভুত তত্ত্বেরই অবতারণা করিয়া থাকি। খৃষ্টানের শাস্ত্রে লেখা আছে যে, আদম এবং আদম-পত্নী পাপ করিয়াছিলেন বলিয়া এ সংসারে গর্ভধারণের ক্লেশ জন্মিল, মৃত্যু আসিয়া এ সংসারে বিচরণ করিল। উদ্ভিদ বা অন্য জন্তুরা পাপ করিতে পারে বলিয়া খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন না; মানুষের জন্মের পূর্ব্বে,—কাজে কাজেই পাপের জন্মের পূর্ব্বে—যে উহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাও শাস্ত্রেই স্বীকৃত আছে। তবে পশু-পক্ষী জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করে কেন? উদ্ভিদ এবং পশুপক্ষীদের মৃত্যু হয় কেন? এসকল কথা ভাবিবার অবসর হয় নাই; তাই মানুষের বেলায় দেবতার লীলা-খেলা পাপ হইয়া উঠিয়াছে, এবং মানুষের কল্পিত দুর্ভাগ্যের জন্য অতি-প্রাকৃত ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে! হিন্দুর শাস্ত্রেও ঐ কথা। মানুষ যদি দেবতার বর পায়, কিম্বা যদি নিষ্পাপ হইয়া বাস করিতে পারে, কিংবা নিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া যোগ অভ্যাস করিতে পারে, তাহা হইলে হয় সশরীরে অমর হইবে, না হয় ইচ্ছা-মৃত্যু ঘটাইতে পারিবে, না হয় দীর্ঘ হইতে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিবে। কথা এই যে, মানুষের সঙ্গে যে অন্য জীব-জন্তুর মিল আছে, এ কথা যেন মানুষেরা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না।

যে জৈবনিক (germ-plasm) হইতে আমাদের শরীর এবং জীবন, অল্প পরিমাণে তাহার প্রকৃতি বুঝিয়া না লইলে আমাদের জন্ম এবং জন্মফলের কথা বুঝিতে পারিব না। যাঁহারা এ তত্ত্বের জন্য নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার আশ্রয় লইয়া "গভীর গবেষণা" করিয়াছেন, তাঁহাদের হাতে গুরুপথ্য দর্শনশাস্ত্র এবং Metaphysics সৃষ্ট হইয়াছে। একবার সেই অপার্থিব এবং অমূল্য শাস্ত্রের শিক্ষার কথা ভুলিয়া প্রাকৃতিক অবস্থার দিতে দৃষ্টিপাত করিলে মন্দ হয় না।

যখন একটা অতি নিম্নস্তরের জীবশরীরের প্রতি লক্ষ্য করি, তখন দেখিতে পাই যে একটি দেহপিণ্ড জীবরূপে বহিয়াছে। সে অঙ্গে, প্রত্যঙ্গ বা limbs নাই, চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়াদি নাই; হৃদয়, পাকস্থলী প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি নাই; হাড় নাই, শিরা নাই, স্নায়ু নাই; কেবল

আছে খানিকটা আঠার মত পদার্থের একত্রসম্বদ্ধ পিণ্ড। সে আহার করে সর্ব্বাঙ্গে, সে সমস্ত কার্য্য করে সর্ব্বাঙ্গে। সে-জীবগোষ্ঠীতে পুরুষ-স্ত্রীর ভেদ নাই; সে যেন স্বয়ম্ভু এবং অক্ষয়। যখন পুষ্টিলাভ করে, তখন আপনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র জীব বা পিণ্ডে পরিণত হয়। ঐ বিভক্ত পিণ্ডদ্বয় আবার পুষ্টিলাভ করিয়া আত্মশরীর-বিভাগে বহুতর জীব-পিণ্ডে পরিণত হয়। মনে কর, কোন মাছ বা পাখী উহাদিগকে উদরস্থ করিয়া হজম করিয়া ফেলিল না; তাহা হইলে উহাদের শরীরের কোন অংশকে অর্থাৎ কোন জীবকে মরিয়া যাইতে দেখিবে না। দেখিবে যে, ক্রমাগত জীব পিণ্ড বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, উহাদিগকে দেখিলে স্বয়ম্ভু এবং অক্ষয় বলিয়া মনে হয়।

এই নিম্ন জীবে বা দেহপিণ্ডে যাহা অক্ষয় বলিয়া লক্ষ্য করি, উহাই সকল জীবের শরীর এবং জীবনের উপাদান। আমি একটি প্রবন্ধে জীবন-তত্ত্বের সকল আবিষ্কারের কথা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি না। উদ্দিষ্ট বিষয়টি সুবোধ্য করিবার প্রয়াসে জীবন-বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রত্যক্ষীকৃত সত্যের উল্লেখ করিব। যাঁহারা ফাঁকা আওয়াজে বৈজ্ঞানিকদিগের নামের দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের স্থূল কথাগুলির উল্লেখ করিব।

যেসকল উচ্চ শ্রেণীর জীবে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জন্মিয়াছে, ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ হইয়াছে, এবং দেহ-আয়তনে বিবিধ যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, সেখানেও প্রায় যেন নিম্নস্তরের জীবের মত, শরীর-উপাদানের জৈবনিক, দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে। যে জৈবনিক আমাদের শরীরের একমাত্র উপাদান, উহা যেন প্রথমতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। একটি ভাগ আমাদের দেহ-আয়তন এবং শারীর যন্ত্রাদির সৃষ্টি করিয়া সেই সৃষ্টিতে পর্য্যবসিত হইতেছে, এবং অপর ভাগ যেন ঐ দেহের মধ্যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া অন্য জীব উৎপাদন করিবার ক্ষমতা লইয়া বাস করিতেছে। বলিয়া রাখি যে, এই অবস্থাটি স্ত্রীশরীরে এবং পুরুষশরীরে সম্পূর্ণ একই। কথাটি বলিবার প্রয়োজন এই যে, সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, জীবউৎপাদন বিষয়ে পুরুষশরীরের কার্য্যকারিতা অধিক। অজ্ঞ যুগের শাস্ত্রে এবং উপাখ্যানে পড়িয়া থাকি যে, এক-মাত্র পুরুষের প্রভাবে কখনও মৃৎপাত্রে বা দ্রোণমধ্যে, কখনও বা সম্পর্কশূন্য মৎস্যাদি জাতির গর্ভে অনেক মনুষ্যশিশুর জন্ম হইয়াছিল।

যে শরীরাণু (chromosoma) হইতে একটি মানব-শিশুর জন্ম, উহা সমান অংশে পিতৃশরীর এবং মাতৃশরীর হইতে লব্ধ হইয়া থাকে। একটি মনুষ্য-শরীর ২৪টি শরীরাণু বা chromosomes এর সমষ্টি। মানবশিশু জন্মকালে উহার ১২টি পিতৃশরীর হইতে এবং ১২টি মাতৃশরীর হইতে লাভ করে। পিতামাতা আপন আপন পুষ্টিলাভের সময়ে যে ভাবে ঐ শরীরাণুগুলি বর্দ্ধন করে, অথবা ঐ শরীরাণুতে যেসকল দোষগুণ অঙ্কিত করে, তাহা শিশু-শরীরে অঙ্কিত হইবেই হইবে। পিতামাতার কোন্ শ্রেণীর দোষগুণ তাহাদের নিজের শরীরাণুকে দোষগুণের অনুরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারে, অর্থাৎ পিতামাতার কোন্ দোষগুণের ছাপ শিশুশরীরে অঙ্কিত হইবেই হইবে, সে বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পরে বিবৃত করিতেছি। কিন্তু আমরা এইটুকু হইতেই বুঝিতে পারি যে, শিশুর সমগ্র শরীর যখন পিতৃ-মাতৃদত্ত শরীরাণুর সমষ্টিমাত্র, এবং পিতৃমাতৃ শরীরের অণুগুলি যখন তাহাদেরই নিজের বিশেষ অবস্থার পুষ্টির ফল, তখন শিশুশরীরে পিতামাতা ছাড়া অন্য কোন অসম্পর্কিত মৃত ব্যক্তির আত্মা আসিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে না।

আত্মা বলিলে একটা সূক্ষ্ম কথা বুঝায়। মানুষের সকল কর্ম্মই যখন তাহার শারীরক্রিয়ার ফল, তখন আত্মা অর্থে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা প্রতি শরীরে নূতন সত্তারূপে শরীরাণুর সম্মিলন এবং বিকাশের সময়ে বিকশিত বা উৎপন্ন হয়। অন্য আত্মাকে যদি নব শরীর গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রথমতঃ তাহাকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া, পিতা ও মাতা উভয়ের শরীরের শরীরাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইত। এরূপ করিতে হইলে আবার পিতৃমাতৃশরীরের শরীরাণুগুলির কোনপ্রকার পুষ্টি হইবার পূর্ব্বে উহাকে শরীরাণু সাজিয়া দাঁড়াইতে হয়। এ প্রথায় অগ্রসর হইলেও আবার

আত্মাটিকে ঐ পিতামাতার পিতামাতার শরীর আশ্রয় না করিলে নাতি হইয়া জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এখন যদি যুক্তিপথে আর একটু অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মৃত পুরুষের আত্মাকে যদি নব জন্মলাভ করিতে হয়, তবে তাহাকে কাঁকড়ার পদ্ধতিতে পিছাইয়া গিয়া আদিম জৈবনিক না সাজিলে আর চলে না।

ঠিক্ জন্মসঞ্চারের মুহূর্ত্তে যখন ২৪টি শরীরাণু মিলিত হইয়া জীবকোষ বাঁধিয়া বাড়িতে বসে, সে সময় হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় পর্য্যন্ত একই জৈবনিক-লীলা ঐ শরীরে অভিনীত হয়। সমগ্র অণুর সঙ্ঘে যেমন একটি শরীর, তেমনি সমগ্র শরীরের একটা সূক্ষ্ম গুণফলরূপে এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মার বিকাশ বা উৎপত্তি ধরিয়া লইলে বরং চলিতে পারে।

আত্মার বিষয়ে যাহাই হউক, শরীর সম্বন্ধে ঠিক্ বলিতে পারা যায় যে, শিশুর শরীর ঠিক্ পিতার শরীরও নহে, মাতার শরীরও নহে। পিতা এবং মাতা প্রত্যেকের শরীরই ২৪টি শরীরাণুর সমষ্টি; কিন্তু সন্তানোৎপাদনের সময়ে কেবল বংশপ্রবর্ত্তকরূপে ১২টি ১২টি করিয়া শরীরাণু আসিয়া মিলিত হইয়া নূতন শরীর গড়িয়া তুলে। তাহার পর আবার আর একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিতে হইবে। পিতা এবং মাতা তাঁহাদের আপন আপন পিতামাতার অংশে উৎপন্ন হইবার পর সংসারের চারি পাশের অবস্থায় এবং শিক্ষায় যখন পরিবর্দ্ধিত হইতেছিলেন, তখন আপন আপন কর্ম্ম এবং অবচারের ফলে শারীরিক জৈবনিকের বংশপ্রবর্ত্তক অংশটুকুকে পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। উহাতে ফল এই হইল যে, সন্তানেরা অনেক অংশে যে পিতামাতার অননুরূপও হইবেন, তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল। প্রতি বারের সন্তান উৎপাদনের সময়ে, ঐ বংশপ্রবর্ত্তক জৈবনিকে ভিন্নতা সাধিত হইতে থাকিবেই। কাজেই সন্তান, পিতা ও মাতার (কেবলমাত্র পিতার নহে) আত্মজ হইলেও একটি ভিন্ন স্বতন্ত্র জীব। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত J. A. Thomson লিখিয়াছেন—

"On the one hand, the child is like its parents, 'a chip of the old block', a literal *reproduction*; on the other hand, the child is something original, a new pattern, a fresh start—leading the race."

কর্ম্ম এবং অবচারের ফলে এই শিশু আবার আরও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া ভিন্ন মানুষ হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র জন্মফলে একটি শিশু পিতামাতার দোষগুণের কতদূর পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারী হয়, তাহা বলিতেছি।

পুরীতে সমুদ্রতীরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্রমাগত এক দিক হইতে বাতাস বহে বলিয়া সমুদ্রতীরস্থ গাছগুলি একদিকে ঝুঁকিয়া বাড়িয়া উঠে, এবং চিরকাল বাঁকা হইয়াই থাকে। ঐ গাছগুলি বাঁকা, এবং বাঁকা হইয়া বাড়িয়াছে বলিয়া উহাদের বীজ হইতে যে নূতন গাছ জন্মিবে, তাহাও বাঁকা হইবে, ইহা সত্য নয়। পিতৃমাতৃশরীরের যে-কোন পরিবর্ত্তনই যে সন্তানশরীরে সংক্রমিত হইতে পারে, তাহা ঠিক্ নহে। যাঁহারা ক্রমবিকাশ-বাদের কোন কোন তত্ত্ব গাল-গল্পের মত শুনিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, আমরা যদি কোন অঙ্গের চালনা বন্ধ করি, অথবা শরীরে যাহা প্রাকৃতিকভাবে জন্মিয়াছে, তাহাকে অব্যবহার্য্য করিয়া তুলি, তাহা হইলে বংশপরম্পরায় অব্যবহৃত অংশ একেবারে খসিয়া পড়িবে বা লোপ পাইবে। যাঁহারা গল্পে শুনিয়াছেন যে ডারউইন বলিয়াছেন যে, বানর হইতে মানুষের উৎপত্তি (হায় ডারউইন!), তাঁহারা এ পর্য্যন্তও বলিয়া থাকেন যে মানুষের ব্যবহারে লাগিল না বলিয়া ধীরে ধীরে লাঙ্গুলটি খসিয়া পড়িয়াছে। হাতুড়ের হাতে, ক্ষয়-বৃদ্ধির তত্ত্বটার কি দুর্গতিই হইয়াছে! আমরা পুরুষানুক্রমে হাতের নখ কাটিয়া আসিতেছি। এখনও কিন্তু তাহার ক্ষয় হইল না। তারকেশ্বরের অকৃপা না হইলে ভট্টাচার্য্যবংশে চিরকাল দাড়িগোঁফ কামাইয়া আসিতেছে; তবুও ঐ অব্যবহৃত এবং অব্যবহার্য্য দাড়ি গোঁফ যথাসময়ে গজাইয়া উঠিতে ছাড়ে না। যদি কোন একটা বংশের লোকদিগকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জোর করিয়া খোঁড়া করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের সুদূর বংশধরেরা আপনাআপনি জন্মমাত্রে খোঁড়া হইয়া জন্মিবে না। চীনদেশের স্ত্রীলোকেরা বহুকাল হইতে যত্ন করিয়া পা ছোট করিয়া আসিতেছে; তবুও নবজাত সন্তান সুবিকশিত পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করে।

যেসকল রোগ আমাদের সমগ্র শারীরিক অবস্থা হইতে উৎপাদিত হয় না, যাহা আমাদের হাড়ে গজায় না, অর্থাৎ যাহা মূল জৈবনিকের অবস্থার ফলে যন্ত্রজ বা organic নহে, সে রোগ সন্তানে বর্ত্তে না। এমন অনেক রোগ আছে, যেগুলি কোন আকস্মিক কারণে কিংবা বহিঃস্থ কোন সূক্ষ্ম অণুর (microbes) প্রভাবে উৎপন্ন হয়; সে রোগ কেবলমাত্র জন্মফলে সন্তানশরীরে সংক্রমিত হইতে পারে না। ধরুন, কোন পিতা বা মাতার Phthisis নামক কাশরোগ জন্মিয়াছে; যদি জন্মমুহূর্ত্তের পর সন্তানটিকে বাহ্যিকভাবে ঐ রোগ-সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করা যায়, তবে সন্তান পিতামাতার ঐ রোগের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। শিশু যাহা জন্মের পর পিতামাতার সংস্রবে সঞ্চয় করে, তাহাকে জন্মফল বলা যাইতে পারে না। উহা কর্ম্মফলও নহে; কেবল অবচার-ফল মাত্র।

জৈবনিকের যে অংশ বংশবর্দ্ধকশক্তিরূপে স্বতন্ত্র রহিয়াছে, উহাতে যেসকল অবস্থার ফল অঙ্কিত হইতে পারে, তাহাই সন্তানে বর্ত্তিতে পারে। Gout প্রভৃতি বাত রোগ জৈবনিকের গতির পরিবর্ত্তনের সহিত গ্রথিত হইয়া যায় বলিয়া অনুমিত হয়। কাজেই ঐ প্রকার রোগের উৎপত্তির সম্ভাবনাটুকুই শিশু-শরীরে জন্মলাভ করিতে পারে।

বংশপ্রবর্দ্ধক জৈবনিকের এমন একটা মৌলিক প্রকৃতি আছে, যাহার ফলে সে একটা বিশেষ গতি বা লক্ষ্য লইয়া পুষ্টিলাভ করে বা বাড়িয়া উঠে। শরীরের অবস্থা যদি সেই বৃদ্ধির অনুকূল হয়, তবে কোন গোলই নাই। কিন্তু যদি শরীরে ঈষৎ অনুকূল অবস্থা লাভ করিয়া কোন বিশেষ দিকে উহার গতি বর্দ্ধিত হয়, এবং সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গতি পরে বাড়িয়া উঠিবার সুবিধা না পায়, তাহা হইলে নদীর প্রবাহে কূল ভাঙ্গিয়া যাইবার মত, শরীরে একটা বিকৃতি বা ব্যাধি দেখা দিতে পারে। ঐরূপ বিকৃতি বা ব্যাধিযুক্ত পিতা যদি উন্নততর শরীর জন্ম দিবার ক্ষমতাসম্পন্না নারীকে তাঁহার শিশুর মাতা করেন, তাহা হইলে শিশুশরীরে পিতার ব্যাধি না জন্মিয়া একটা নূতন গুণের জন্ম হইবে। কারণ যে শক্তি পিতৃ-শরীরে একটি গুণরূপে বিকশিত হইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিয়া ব্যাধি উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহা অনায়াসে সন্তান-শরীরে পুষ্টিলাভ করিবার পথ পাইল। এ বিষয়ের একটা মন্তব্য শ্রীযুক্ত J. Arthur Thomson প্রণীত "Heredity" গ্রন্থের ২৫২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। এই মন্তব্যটি হইতে ইংরাজি-অভিজ্ঞ পাঠকেরা কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

"Leaving microbic and acquired diseases out of account, we may safely say that various processes of hypertrophy and atrophy which are associated with disease in a well finished organism like man are, as it were, *recrudescences of important steps in past evolution*. The persistence of germinal activity in a patch of cells may give rise to a tumour, but is it not, as it were, an echo of the power that lower animals have of regenerating lost parts? So it may be that some of the cerebral variations which we call for convenience "nervous diseases" are *attempts at progress.*"

সন্তানের শরীরে পিতৃমাতৃরোগের আবির্ভাব যে রোগের উত্তরাধিকারিত্ব সূচনা করে না, এ বিষয়ের বিশেষ কথা এখানে লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। যেখানে মৌলিক জৈবনিকের প্রভাবে সন্তানের শরীরে রোগ উৎপন্ন করিবার একটি অনুকূল অবস্থা মাত্র থাকে, অর্থাৎ predisposition মাত্র থাকে, সেখানেও ঠিক্ রোগের উত্তরাধিকার বলা চলে না। রোগ সম্বন্ধে সাধারণতঃ এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, সন্তান ঠিক্ জন্ম-ফলমাত্রে পিতার কোন রোগেরই উত্তরাধিকারী হয় না। কেবল কোন কোন রোগে রোগ জন্মিবার অনুকূল অবস্থা লইয়া সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এক দিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই অনুকূল ভাব বা predisposition সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যাইতে পারে। অন্যদিকে আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, পিতামাতার একজনের শরীর হইতে রোগের অনুকূল অবস্থা পাইয়াও অন্য জনের নিকট হইতে সন্তানটি রোগ প্রতিষেধের অবস্থা (immunity) লাভ করে। পূর্ব্বে সমুদ্রতীরস্থ বাঁকা গাছের কথা তুলিয়া কয়েকটি কথা বলিয়াছি। সংক্ষেপতঃ কথাটি এই যে মানুষের শরীরে যেসকল পরিবর্ত্তন বাহ্যিক কারণে ঘটিয়া থাকে,—যে পরিবর্ত্তনের মূলে কেবল জন্মের পরবর্ত্তী

সময়ের কর্ম্মফলের ও অবচারফলের প্রভাব, সেসকল পরিবর্ত্তন বা acquired characters সন্তানশরীরে সংক্রমিত হয় না।

ধরুন, একটি দম্পতির শরীর খুব সুস্থ, দেহ-আয়তন সুপুষ্ট, স্নায়ুচক্র প্রভৃতি সুবিকশিত; আচার-ব্যবহার খুব সংযত, এবং নানা বিদ্যায় মন অলঙ্কৃত। উঁহাদিগের যে সন্তান হইবে, সে প্রথমতঃ জন্মকালে পিতামাতার অনুরূপ শরীরটি পাইবে। ঐ শরীর যদি সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার শরীরের মত সুস্থ এবং সর্ব্বকর্ম্মক্ষম হয়, তাহা হইলেও বলিতে পারা যাইবে না যে, ঐ সন্তান ঠিক পিতামাতার সুশিক্ষালব্ধ গুণও লাভ করিবে। অন্যবিধ বা কুবিকশিত দম্পতির পুত্রের সহিত প্রথম দম্পতির পুত্রের তুলনা করিয়া কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। মনে করুন যে, শরীরখানির হিসাবে প্রথম দম্পতির সন্তান যেন একটা বড় "জালা" হইয়া জন্মগ্রহণ করিল; এবং দ্বিতীয় দম্পতির সন্তানটি একটি ছোট "ভাঁড়" হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। "জালা" হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই যে প্রথম সন্তানটি সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ হইবে, তাহা নয়। কর্ম্ম এবং অবচারের ফলে ঐ বৃহৎ জালায় কেবল কাদা ভরা যাইতে পারে এবং ছোট "ভাঁড়"টিতে অতি অল্প পরিমাণে ধরিলেও সুপেয় সরবৎ পূর্ণ করা যাইতে পারে। একটি শরীরে অনেক সদ্‌গুণ বিকশিত হইবার অনুকূল অবস্থা থাকিলে যে সদ্‌গুণই বিকশিত হইবে, এ কথা বলা চলে না। খাদ্য, গৃহ, সমাজ, শিক্ষা এবং বাড়িবার পথের অন্য রকমের সুবিধা অসুবিধা মানুষকে নিয়মিত করে।

কুটিল রাজনৈতিকের পুত্র অনায়াসে সরল সাধু ব্যক্তি হইয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজে ঐ কুটিলতা নিন্দনীয় নহে বলিয়া সন্তানকে জন্মমাত্রে "একঘরে" হইতে হয় না, বরং সম্মানের সহিত সে দশজনের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিয়া জন্ম এবং অবচারফলের অনুরূপে আপনার নূতন ভাগ্য গড়িয়া তুলে। একজন দরিদ্র চোরের সহিত রাজনৈতিকের মত নৈতিক মিলনই থাকুক না কেন, যে চোরের গৃহে বর্দ্ধিত হয়, সাধারণতঃ তাহার কপাল ভিন্ন রকমের হয়। চোরের বংশে জন্মিয়াছে বলিয়া কেহ চোর হইবেই, এমন কথা বিধাতাপুরুষ কাহারও কপালে জন্মের পূর্ব্বে লিখিয়া দেন না। তবে চোরের ছেলে সাধুসমাজে তেমন স্থান পায় না বলিয়া, রাজনৈতিকের পুত্রের মত ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের সুবিধা পায় না।

আমাদের পাঠশালার পরিচালকেরা এবং সমাজ-সংস্কারকেরা এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইলে ভাল হয়। বহুকাল হইতে মানুষের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, যে ব্যক্তি যেমন স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার সেই স্বভাব কিছুতেই ঘুচে না। জন্ম, কর্ম্ম এবং অবচার পৃথক করিয়া ধরিতে না পারায় সাধারণভাবে এই সংস্কার জন্মিয়াছে। সাধারণতঃ কুৎসিতকর্ম্মকারীদিগের সমাজই স্বতন্ত্র। সেই জন্য আপাতদৃষ্টিতে আমরা বংশানুক্রমে মন্দ লোক দেখিবার সুবিধা পাই। বালকেরা পাঠশালায় পড়িয়া থাকে যে—"স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে, যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ।" শত সুশিক্ষাতেও যে স্বভাবের পরিবর্ত্তন না হইয়া উল্টা ফলটিই ফলে, এই কথা বুঝাইবার জন্য কুনীতি-শিক্ষার গ্রন্থে আছে—"মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ?" না জানি কত হতভাগ্যের গৃহের পুত্র নবজীবনলাভের আশায় পাঠশালায় আসিয়া ঐ কুৎসিত কথা পড়িয়া জন্মের মত দমিয়া গিয়াছে; এবং ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে হতাশ হইয়া শেষে বুক ফুলাইয়া গর্হিত অনুষ্ঠানে মন দিয়াছে। কেবল মাত্র suggestionএ যে অনেক মাতালের ছেলে পরে মাতাল হইয়া উঠিয়াছে, উহার দৃষ্টান্ত সংগৃহীত আছে। একদিন বঙ্গসাহিত্যের নবযুগের কর্ণধার বঙ্কিমচন্দ্র, দর্পনারায়ণের বেত্র হস্তে লইয়া এই শ্রেণীর হিতোপদেশগুলিকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে আদেশ আজিও পালিত হইল না। পাঠ্যনির্ব্বাচন কমিটিতে আমাদের সুশিক্ষিতা মহিলারা যদি থাকিতেন, তবে দর্পনারায়ণের বেত্রের পরিবর্ত্তে মহিলা-কুল-দম্ভোলি "মুড়ো খেঙ্‌রা" দ্বারা এই নীতির বিদায়ের ব্যবস্থা হইতে পারিত।

কর্ম্ম ও অবচার-ফল এবং জাতিভেদের ফল প্রভৃতির কথা বারান্তরে বলিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অনুপ্রাসের অট্টহাস

(শব্দগঠনে অনুপ্রাসের প্রভাব)

পূর্বানুবৃত্তি।

(৮) জীবজগতে জড়জগতে সবাই আমার ভয়ে জড়সড়। দানবমানব, যক্ষরক্ষঃ, ভূতপ্রেত, রাক্ষসখোক্কস, নরবানর, জীবজন্তু, পশুপক্ষী, জন্তুজানোয়ার, [ম্যামথ ম্যাষ্টোডন মেগাথিরিয়ম] মেষমহিষ, গোগবয়, গোগর্দ্দভ, হয়হস্তী, উল্লুকভল্লুক, শকুনি গৃধিনী, শুকশারী, পোকামাকড়, মশামাছি, গেঁড়িগুগলি, আমিই এসব অদ্ভুত যোড় মিলাইয়াছি। আমারই দাপটে বাঘেগরুতে, বাঘেবকরীতে, বাঘেবলদে, এক ঘাটে জল খায়, কোন কথা কাকেবকে কাকেকোকিলে জানিতে পারেনা। কলুর বলদ ও বামুনবাড়ীর বিড়াল উভয়েই আমার বশ। কোকিলের কাকলীতে বা পিককুহুতে, শিখীর কেকায়, পাপিয়ার পিউ পিউ রবে, ভেকের মকমকে, রাসভরাগিণীতে, কুকুরকীর্ত্তনে, আমার সাড়া পাও না কি? কুকুরকুণ্ডলী আমারই পাকচক্রে। আমারই সুবাদে বিড়াল বাঘের মাসী।

পল্লপোকাতে আমি, প্রজাপতিতেও আমি। পঙ্গপালে আমি, মধুমক্ষিকা বা মৌমাছিতে আমি, জোনাকীপোকায় আমি, আবার কাণকোটারি ঘুরঘুরে পোকাতেও আমি। মত্তমাতঙ্গে বন্যবরাহে বনবিড়ালে, গন্ধগোকুলায়, বনের বাঘে, বনের বানরে, [আই আই উরাঙ্গ উটাঙ্গে,] হনুমানে, এঁড়ে গরুতে, বকনা বাছুরে, ছাগলছানায়, লড়াইয়ে মেড়ায়, শশকে, কুকুরে, টাটুতে, ঝিঁঝি ছুঁচো চামচিকে টিকটিকি গিরগিটি সরীসৃপ কৃমিকীটে, সূতোসঙ্কার সাপে, কোথাও আমার অভাব নাই। পাখীপাখালীর ভিতর কাকাতুয়া, কুক্কুট, তোতা, ঘুঘু, বাবুই, কাক, কোকিল, টুনটুনি, বুলবুলি, কাঠঠোকরা, হাঁড়িচাচা, [পেঙ্গুইন পক্ষী,] সারস; জলজন্তুর মধ্যে কাঁকড়া, শুশুক, মিরগেলমাছ, মাগুরমাছ, মৌরলামাছ আমার কাছছাড়া নহে। কাঁকড়ার দাড়ায় ও উর্ণনাভের লূতাতন্তুতে আমি জড়াইয়া আছি। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসাতেও আমাকে পাইবে। জুজু, ঘোঘো, চোখচাঁটা, মামদোও আমার বশ। আড়গোড়ায় পশুশালায় আমি, পিঞ্জরাপোলে আমি, হরিহরছত্রের বা মেষমর্দনের মেলায় ক্রয়বিক্রয়েও আমি।

(৯) জড়জগতে—পানাপুকুরই বল আর পদ্মপুকুরই বল আর মনোহর সরোবরই বল, কুলতলাই বল বেলতলাই বল বকুলতলাই বল আর তেঁতুলতলাই বল, পল্লীপ্রান্তরের বটবৃক্ষই বল আর কৃষককুটিরের কাণাচে বাঁশবন বেতবন বেণাবন ঝোপঝাড়, ঝোড়জঙ্গলই বল, সর্ব্বত্র আমার অধিকার। স্থলকমলে, জলজ লতায়, কুন্দকুসুমে, কেতকীকুসুমে, কদম্বকুসুমে, কনকচম্পকে, শিরীষপুষ্পে, বকুলফুলে, বকুলবীথিকায়, লবঙ্গলতায়, লজ্জাবতী লতায়, এলালতায়, মধুমালতীতে, জাতীযূথীতে, মল্লিকামালতীতে, কমলকুমুদকহ্লারে, করবীর-কুরুবকে আমার শোভা মনোলোভা। পাদপপাদপে আমিই খাড়া রাখি, পদ্মপত্রে আমিই টলমল করি। আবার কাশকুশে, বেউড়বাঁশে, টোপাপানায়, পলাশপাতায়, আলো চা'লে, ছোলার ডালে, ডেঙ্গোর ডাঁটায়, বৈষ্ণবাটীর তরীতরকারীতে, শাকসজীতে, আমজামে, কলামূলায়, ছোলাকলায়, চা'লকলায়, কদুকুমড়োয়, কচুঘেঁচুতে, গোলআলুতে, পাকাকলায়, কাঁচকলায়, কুলবেলতালে, মুগমসুরে, মাকালফলে, কাকুড়ে, কাঁকরোলে, তেঁতুলে, চিচিঙ্গেতে, শশায়, সর্ষেয়, শঙ্খে, আমার অজস্র আনাগোনা। মর্ম্মররবে বা সন্ সন্ শব্দে আমার আওয়াজ সুস্পষ্ট। গজারি গাছ, সপ্তপর্ণ, দেবদারু, কণ্টিকারি, ঋদ্ধি বৃদ্ধি-কন্দদ্বয়, কালকসুন্দে আশশ্যাওড়া ঘলঘসে, শুশুনিশাক সজনাশাক, মর্ত্তমান, সর্ব্বত্র আমি বর্ত্তমান। আমারই যোগাযোগে শালপিয়ালরসাল, তালতমাল, শালপলাশ, শাল্মলী, হরীতকী বিভীতকী আমলকী, বনউপবনের শোভা সংবর্দ্ধন করে। দূর্ব্বাদলে ধরণীর শ্যামশোভা আমারই গুণে। অরহর বরবটীতে আমি, কিসমিসেও আমি। বাতাবী ও কমলালেবু আমারই রসে ভরপুর। পেঁপে ও আম আদা আমারই রসে মুখরোচক। সুনেবু lawless হইয়াও আমার বশ্যতা স্বীকার করে। পলতা তিক্ত-স্বভাববশতঃ পটোলপত্র নাম লইয়া একটু মধুর হইতে চাহে না। নিমনিসিন্দেও তিক্ত, কিন্তু অনুপ্রাসরসে সিক্ত।

তিলকে তাল করিতে, তিল কুড়াইয়া বেল করিতে,

ফুটফাটা বা কুমড়াকাটা করিতে, কুমড়া কুরিতে, কুটনো কুটিতে, চা'ল চিবাইতে, ধান ভানিতে, পাতা পাতিতে, পটোল তুলিতে, ভেরাণ্ডা ভাজিতে, আমার কৃতিত্ব কম নহে।

(১০) প্রকৃতিবৈচিত্র্যে আমারই বিচিত্র লীলা। খরতর রবিকরে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডে দাবদাহে আমি, আবার বর্ষার বারিধারায় বৃষ্টিবাদলে ভরাভাদরে পুবে বাতাসে মেঘ-মালায় জলদজালে বারিদবৃন্দে বিদ্যুদ্‌বিকাশে চপলাচমকে আমি। নিদাঘ-নিশীথে আমি, নিশির শিশিরে আমি, মধুমাসে মলয়-মারুতে আমি। চাঁদনী রজনীতে আমি, আবার পৌষের শীতবাতেও আমি।

(১১) বর্ণবিন্যাসে লাল আমার বাহারে লালে লাল। লালকালা, লালনীল, কালা ও ধলা, হরিৎ-পীত-লোহিত, নীললোহিত, [ব্লুব্লাক, ব্রোঞ্জ ব্লু, গ্রেগ্র্যানাইট,] সর্ব্বত্র আমি জল জল করিতেছি।

(১২) দশদিকে দেখ, আমি আছি। পূর্ব্বপশ্চিম, প্রাচী প্রতীচী, অবাচী উদীচী, ঊর্দ্ধ অধঃ, ঈশান কোণে, পিছুপানে, সব দিকে আমি। দিগ্‌দর্শন আমিই উদ্ভাবন করিয়াছি।

(১৩) সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দে আমি রসসঞ্চার করিয়াছি। দ্বিত্রি, দশ একাদশ, দ্বা-দশ, দ্বিতীয় তৃতীয়, সপ্তম অষ্টম নবম দশম, আর কত ঘুষিব? বিশত্রিশ, দশবিশ, দশপঁচিশ, শতসহস্র, অযুতনিযুত, আমার জোরে যোড়বন্দী। দুদণ্ডে, দুদিনে, দুদশদিনে, আমার পরিচয় পাইবে।

(১৪) বার-তিথি-মাস-ঋতু ও অন্যান্য কালবিভাগে আমি যথাকালে দেখা দিই। কলাকাষ্ঠা, পল বিপল অনুপল, দিবাদণ্ড, বারবেলা কালবেলা কুলিকবেলা, মলমাস, কোটি-কল্প, প্রভৃতি গণনা আমার জন্য। নিশিদিসি, সাঁঝ সকাল, সকাল সন্ধ্যা, সকাল বিকাল, সব সময়েই আমি হাজির। দিনদুপুরেও আমার দেখা পাইবে, সারারাতও আমার দেখা পাইবে। ভূতভবিষ্যৎ ভাবনায় আমি। কলিকালে আমার প্রভাব প্রকট।

তিথির মধ্যে দ্বিতীয়া তৃতীয়া, পঞ্চমী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী, একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী আমার বশীভূত। ষষ্ঠীরও আমার প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা আছে। প্রতিপদে আমিই প্রীতিপ্রদ। ষোলকলায় আমি পরিপূর্ণ।

বারের মধ্যে আমি বার বার তিন বার আছি—রবিবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার। বুধবৃহস্পতি, শুক্রশনি, যোড়ে যোড়ে আমার গুণ গায়। শনির শেষ, বিষ্যুৎবারের বারবেলা, শনির দশা, শেষ শনিবারে ছুটি, সবই আমার কারসাজি।

মাসের মধ্যে কার্ত্তিকে, মার্গশীর্ষে, পৌষমাসে, মাঘমাসে, মধুমাসে, ভরাভাদরে, আমার আদর আছে।

ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্ম বর্ষা, শরৎ শীত, হেমন্ত বসন্ত, আমার কৃপায় সখ্যসূত্রে বদ্ধ। পঞ্জিকাবিভ্রাটের ফলে পর্য্যায়-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে অথবা অয়নচলনহেতু কোন কোন ঋতু অগ্রগামী হইয়াছে, তাহা জ্যোতিষী মীমাংসা করুন।

(১৫) রাশি-নক্ষত্রেও আমাকে দেখিবে। মেষবৃষ আমিই একত্র করিয়াছি; মিথুনমীন, মকরমীন পাশাপাশি না থাকিলেও আমার বশ। কর্কটে আমার কামড় আছে। সাতাশ তারার অনেকগুলিই আমার তেজে তাল পাকাইয়া জ্বলিতেছে। কৃত্তিকা আমার কীর্ত্তি-পতাকা।

(১৬) মানবের দশদশায় আমি। শৈশবে, বাল্যাবস্থায়, বাল্যবয়সে, বালিকাবয়সে, বালকবেশে, ছোটছেলেয়, ছেলে-বেলায়, ছেলেখেলায়, ধুলাখেলায়, খেলাধুলায়, সদানন্দ শিশুর সরল হাসিতে আমি; আবার নবযুবায়, নবযুবতীতে, নব-যৌবনে আমি; বয়োবৃদ্ধিতে, বৃদ্ধবয়সে, বুড়াহাড়ে বুড়া-হাবড়ায়, ঠেঙ্গাধরা বুড়ায়, বাহাত্তুরে বুড়ায়, বুড়ী থুড়থুড়ীতে বড়াইবুড়ীতেও আমি। শৈশবস্বপনে, বাল্যবন্ধুত্বে, বাল্য-বিবাহে, পবিত্রপ্রণয়ে, বনিতাবিলাসে, সন্তানসম্ভাবনায়, শিশুসন্তানের লালনপালনে স্তনপানে, মাতাপিতার মায়া-মমতা বা সন্তানস্নেহে, পতিপ্রেমে, পত্নীপ্রেমে, স্বামিসেবায়, আমার সত্তা অনুভব কর না কি? সমসাময়িক বাল্যবন্ধু-বিয়োগবেদনায়, মা মরায়, যমজ্বালায়, যমযন্ত্রণায়, শিয়রে শমনে, শমনভবন-গমনে, পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতেও আমার ব্যাপ্তি আছে।

(১৭) মলমূত্রময় মানবশরীরের অবয়বে অঙ্গ অঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সর্ব্বশরীরে আমি বিরাজ করিতেছি। মুখচোখ, নাক-কাণ, গালগলা, পিঠপেট, ঠোঁট, টুটী, হুরমুরী,

ফুসফুস, কঁকাল, যোড়াভুরু, নাড়ীভুঁড়ী, ঘড়ঘড়ি ভাঙ্গা, দুধে দাঁত, মেদমজ্জা, মুম্মুর্র, সুষুম্না, শীর্ষ, সর্ব্বত্র আমি। মুখমণ্ডলে, বদনবিবরে, কর্ণকুহরে, চর্ম্মচক্ষে, নিম্ননাভিতে, পদপ্রান্তে আমি। মাথার মগজে, চোখের চাহনিতে, চোখের দেখায়, নাকের নিশ্বাসে, মুখে মেছেতায়, পাঁয়ে পাঁকুইএ, পেটে পিলেয়, মুখময় থুথুতে, নাসিকাকুঞ্চনে, বদনব্যাদানে, মুদি নামায়, ছিরিছাঁদে আমি। ধবধবে, টকটকে বা টুকটুকে রং, বেলুন বেলুন বা গোলগাল গড়ন (নারীনিন্দায় পিতলের পিলসুজ) আমারই যোগাযোগে। চিৎকাৎ, কাণাকুঁজো, কোলকোঙ্গা, সবই আমার প্রসাদে বামনবঙ্খুবে আমি, দশাসই মানুষেও আমি। আমার প্রভাবে চোখে দেখে, কাণে শোনে, নাকে সোঁকে, মুখে খায়।

(১৮) এইবার বীররসের অবতারণা করিব। যুদ্ধবিদ্যায়, সমরশান্তিসন্ধিতে আমার অধিকার। শূরবীর ধনুর্দ্ধরের হুঙ্কার-টঙ্কারে, কার্ম্মুকে, শরাসনে, তরবারিতে, শেলশূলে, দোর্দণ্ডকোদণ্ডে, অস্ত্রশস্ত্রে, বর্ম্মচর্ম্মে, জিঞ্জিরে, তর্জ্জনগর্জ্জনে, তনুত্রাণ আর্ত্তত্রাণে, সম্মুখসমরে, শৌর্য্য বীর্য্য ঔদার্য্য গাম্ভীর্য্যে, কীর্ত্তিকাহিনীতে আমি; আবার অশ্বসাদীতে, সৈন্যসামন্তে, হয়হস্তীতে, লোকলস্করে, সিপাইসান্ত্রীতে, পুলিশপল্টনে, গোরাগুর্খায়, শরীররক্ষী সৈন্যে [বা বডি-গার্ডে, ক্যাডেট- কোরে], গুলিগোলায়, ঢালতরওয়ালে, বারুদবন্দুকে, টোটায়, কুচকাওয়াজে, যুদ্ধজাহাজেও আমি। সামরিক সংবাদে, বালকবীরে, বীরবৌলিতে, প্রবল প্রতিপক্ষেও আমি। মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি যুঝোযুঝি হুটোপুটি ঠেঙ্গাঠেঙ্গি লাঠালাঠি ঘুঁষোঘুঁষি হাতাহাতি গুঁতোগুঁতি জুতোজুতি, অথবা বর্ব্বরের দন্তাদন্তি নখানখি চুলোচুলি কীলোকীলি, আঁচড়কামড়, চড়চাপড়, উত্তমমধ্যম, পাদপ্রহার, চরণতাড়ন, তর্জ্জনীতাড়ন, কেশাকর্ষণ, ভ্রূভঙ্গ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, লাঠিঠেঙ্গা, লাঠিসোঁটা, কোঁৎকা, ডাণ্ডা, বঁটিকাটা, মুড়া খ্যাংরা, কিছুই আমাছাড়া নহে। বুকে ব'সে দাড়ী উপড়াইতে, নাক কাণ কাটিতে, টিকি কাটিতে, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিতে, দফারফা জেরবার নাস্তানাবুদ খুনখারাপী উৎপাত উৎখাত করিতে, আমার কৃতিত্ব কম নহে।

(১৯) আবার হাতাহাতি ছাড়িয়া মুখোমুখি করিলেও আমার অধিকারে থাকিতে হইবে। দ্বন্দ্বদ্বেষ, দ্বেষহিংসা, রেষারেষি, মনকসাকসি, মনোমালিন্য, কাজিয়া কলহ, বিবাদ বিসংবাদ, বাদবিচার, বাদবিতণ্ডা, ঝগড়াঝাঁটি, বাগ্‌বিতণ্ডা, গোলমাল, গণ্ডগোল, দিগদারী, খিটকেল, ধাক্কা, ঝঞ্ঝাট, বিষম সমস্যা, সবই আমার কারসাজিতে। গালাগালি, ঢলাঢলি, কড়কান, জলদি জবাব, রাগে গর গর করা, গা খ খ করা, সবই আমার কর্ত্তৃক। দোষ দেওয়া বা দোষ দেখানয়, লাঞ্ছনা গঞ্জনায়, ব্যঙ্গবিদ্রূপে, শ্লেষবিষে, বাক্যবাণে, বিদ্রূপবাণে, বাঁকা বাঁকা বুলিতে, ফষ্টিনষ্টিতে, সুখশেলে, শেলসম কুবাক্যে, মিছরির ছুরিতে, মজা মারায়, মজার মানুষে, হাসি তামাসায়, ঠাট্টায়, রগড়ে, কৌতুকে, স্তোকবাক্যে আমি। গালিগালাজ মুখখিস্তি মুখখারাপে কড়াকথায় কটুকথায় কটুবাক্যে কটুকাটব্যে আমি মূর্ত্তিমান্। তা' সাধুভাষায় অকালকুষ্মাণ্ড, অব্যবস্থিতচিত্ত, কুলকলঙ্ক, কুলপাংশুল, গজগম্ভীরগতি, জড়ভরত, দেশদ্রোহী, ধর্ম্মধ্বজী, নষ্টদুষ্ট, পাষণ্ডভণ্ডত্রিপণ্ড, মদমত্ত, বকধার্ম্মিক, স্বার্থসর্ব্বস্ব, হৃদয়হীনই বল, আর ইতর ভাষায় উড়েম্যাড়া, একরোকা, ক্যাবলাকান্ত, কাঠখোট্টা, খয়েরখাঁ, খামখেয়ালি, খোদার খাসী, গড়োগোয়ালা, গাছগরু, গুণ্ডাষণ্ডা, গোবরগণেশ, গোবরগাদা, গোঁয়ারগোবিন্দ, ঘাটেপড়া ঘাটযোড়া, ছুঁচো, জবরজঙ্গী, ঠোঁটকাটা, ধামাধরা, নাককাণকাটা, নিঘিন্নে, নিমকহারাম, নির্ব্বংশের বেটা, পাগলপারা, পাজীর পাঝাড়া, ভেড়ের ভেড়ে, মদমাতালে, মড়িপোড়া মিনসে, বুড়োবাঁদর, বে-আকুব, বে-আদব, বে-ইমান বে-তমিজ, বে-হদ্দ বে-হায়া, বোম্বেটে, ষাঁড়ের গোবর, হারামজাদা, হাড়হাবাতে—স্ত্রীলোকের বেলায় ইঁদুরদাঁতী, কাঠকুড়ুনী, দুর্গাটুনটুনি, পাড়াবেড়ানী-ই বল।

(২০) আবার গালাগালি ছাড়িয়া গলাগলি কোলাকুলি কর, তথাপি আমার অধিকারে সামঞ্জস্য, ভাবসাব, বনিবনাও করিয়া থাকিতে হইবে। আনন্দে গদগদ বা আহ্লাদে আটখানা হইবে, অথবা বাপুবাছা করিয়া কাকুতিমিনতি করিবে, আমারই ইচ্ছায়। আটপিঠে, চটপটে, চালাক চতুর, জাঁহাবাজ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, গণ্যমান্য বদান্য বরেণ্য, গুণী জ্ঞানী, বিজ্ঞবিচক্ষণ, পবিত্র-চরিত্র, মাথার

মাণিক, শান্তসংযত, সংস্বভাব, সুশীল ও সুবোধ, সত্যসন্ধ, গোসাইগোবিন্দ, মাটীর মানুষ, মুড়কীমুখী, বাংলা বাহাদুর প্রভৃতি প্রশংসায় গুণগান বা গুণ গাওয়ায় আমার হাত আছে।

মানবজীবনের সকল বিভাগেই আমি বিচার করিতেছি।

(২১) বিচারব্যাপারে ধর্ম্মাধিকরণে আমি, বিচার বিভ্রাটেও আমি। আইনের আমলে আসিলেই আমি দেখা দিব। আইন আদালত, আইনকানুন, আমলা ফয়লা, মামলা মোকদ্দমা, দলিল দস্তাবেজ, সাক্ষী সাবুদ, [উইল কডিসিল], সহিমোহর, সহিসুপারিশ, বাহাল-বরতরফ, [ডিক্রী ডিসমিস, জজ ও জুরী], হাকিম ও হুকুম, জোরজার, জোরজুলুম, জোরজবরদস্তি, জুলুমজবরদস্তি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, দাঙ্গাফাসাদ, হাঙ্গামাহুজ্জুৎ, খুনখারাপী, খুনজখম, ক্রোক, সাফাই সাক্ষী, জোবানবন্দী, বাবরদারী, [সেসন সোপর্দ্দ, জেলা জজ], নকলনবীশ, স্বত্বসাব্যস্ত, প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সালিশী সভা, মামলা মুলতবী, যোগসাযোগ, গরহাজির, গাটকাটা, পকেটকাটা, [লাইবেল বা] মাননাশ বা মানহানির মামলা, আদালতের আমলা, ময়লা সামলা, [ব্যারিষ্টারের বাবু, ডিক্রীজারীর মোহরার], দেনার দায়, আমমোক্তারনামা, কবুলজবাব, বায়নানামা সবই আমার প্রসাদাৎ।

(২২) জমীদারী সেরেস্তায়ও আমি আছি। জমিদার জোতদার তালুকদার ইজারাদার পত্তনিদার দরপত্তনিদার ছেপত্তনিদার একযোগে আমার এলাকায় আছে। খিলজমি, লালজমি, মালজমি, জোতজমা, বাজেজমা, জমিজমা, জমিজায়গা, জমিজিরেৎ, তালুকমুলুক, খোদকস্তা পাইকস্তা, শিকস্তি পয়স্তি, বন্দোবস্ত, বিলিবন্দেজ, বাজেবাব, আবওয়াব, উঠিতপতিত, ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর পীরোত্তর, সুদিবুদি, বাকীবকেয়া, প্রজাপত্তন, রাজাপ্রজাসম্বন্ধ, প্রজা জমিদার, পত্তনিপাট্টা, নিকাশপ্রকাশ, তরতিববন্দী, খাজাঞ্চিখানা, গোমস্তাগিরি, সরকার, কারকুন, পাইক-পেয়াদা, লোকলস্কর, ধরপাকড়, তাড়াহুড়া, ফৌতফেরার, উৎপাত, কিস্তিখেলাপ (লাট!), সব আমার কৃপায়। দশশালা বন্দোবস্ত আমার গুণে [Encumbered Estates আমার দোষে]।

(২৩) মহাজনের মালমশলা, লেনাদেনা, দেনাপাওনা, দাবীদাওয়া, বাকীবকেয়া, বিলাতবাকী, লাভলোকসান, কারকারবার, পুঁজিপাটা, আমদানীরপ্তানি, হাওলাত-বরাত, দরদাম, দরদস্তুর, দাদন, গুণাগার, দেনদার, খরিদদার, দোকানদার, চড়াদর, নরমদর, চড়ণোদর, খাতাপত্র, বিলবাকি, হিসাবকিতাব, [বুককিপিং], যোগান ও টান, বখরাবন্দোবস্ত, বেবকারী, রোকড়, গড়পড়তা, সর্ব্ব-সাকল্যে, দালাল, নমুনা, ধার করা, মরসুম, তহবিল তছরূপ, [পেটেণ্ট], সখের বা খুসির সওদা, ভেজাল মিশাল, কল-কারখানা সবই আমার। মাড়োয়ারী মহাজনে, কলের কুলিতে, ব্যবসায়বাণিজ্যে, বিক্রয়বাণিজ্যে, বাহির্ব্বাণিজ্যে, বাণিজ্যজাহাজে, জাহাজের জেটিতে, বাণিজ্যবিস্তারে, অর্ণব-বাণিজ্যে, ঋণদানে, আয়ব্যয়ে, উত্তমর্ণঅধমর্ণে, পরিশোধ-সমীকরণে, সম্ভূয়সমুত্থানে, আমি বিরাজ করি। স্বদেশীশিল্পে, শ্রমশিল্পে, সূচিশিল্পে, শিল্পিসভায়, শ্রমজীবি সমবায়ে, [ট্রেড গিল্ডে] কৃষিশিল্প-প্রদর্শনীতে, প্রদর্শনীপ্রাঙ্গণে [বেঙ্গল ব্যাঙ্কে, বর্ম্মা ব্যাঙ্কে, চারটার্ড ব্যাঙ্কে] আমার দেখা পাইবে। লক্ষ্মীর্ব্বসতি বাণিজ্যে—এই মূলমন্ত্রে আমি। আমারই কৌশলে কলিকাতা সকলের সেরা বাণিজ্যবন্দর। আমারই চেষ্টায় উড়িষ্যার উপকূলে বালেশ্বর বন্দর বসান হইবে।

(২৪) রাজনীতি রাষ্ট্রনীতিতে, [লাটের লেভিতে], জাতীয় জীবনে, মিলনমন্দিরে, মেটামজলিসে, বাবুবৈঠকে, [কন্‌গ্রেস কনফারেন্সে], স্বায়ত্তশাসনে [নমিনেশানে] নির্ব্বাচনে, পুনর্নিয়োগে, সদস্যপদপ্রার্থনায়, ভোটভিক্ষায়, ভোটভাঙ্গানয়, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়'তে, পঞ্চায়ত-প্রথায় আমি। বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গবিভাগবিষয়ক বিধি-ব্যবস্থায় আমি, আবার বঙ্গবিভাগ-ব্যবস্থা বদলেও আমি। [প্রোক্লামেশান পিলারে] দিল্লী দরবারে, [সেনসাসে, রিপোর্ট রেজলিউশানে, ব্লুবুকে, সিভিল সার্ভিসে] শাক্ত-শাসনে, রাজরোষে [পিউনিটিভ পুলিশে, ডিটেক্‌টিভে] বা পুলিশ পাহারায়, পুলিশ পলটনে, কালকোর্ত্তা কনষ্টেবলে, সূর্য্যাস্তে সভাভঙ্গেও আমি। আমার কল্যাণে সর্ব্বসাধারণের সভায় লক্ষলোক সমবেত হয়। চাঁদাদাতার খাতায়ও আমাকে পাইবে।

(২৫) সমাজসংস্কারকের সম্মতিসঙ্কটে, সহবাস-সম্মতিতে, বিধবাবিবাহবিধিতে, বিবাহবিলাস ব্যবস্থায়, বিবাহবিচ্ছেদ ব্যবস্থায়, বসুর বিলে, বিবাহ-বিভ্রাটে, বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ-বারণে, যৌননির্ব্বাচনে, পুরুষপুঙ্গব-কর্ত্তৃক নারী-নিগ্রহ নিবারণে, মহিলামিত্র সমাজে, সখী-সম্মিলনে, সারদাসদনে, স্ত্রীশিক্ষায়, স্ত্রীস্বাধীনতায়, মেয়ে মজলিসে, মেয়ে মর্দ্দানা ভোটভিখারিণী জেনানা জোয়ানে আমি বলবান্। আবার বালবিধবার বেলায় ব্রহ্মচর্য্য বারব্রত নিরম্বু উপবাসবিধি ও অনুকল্পে দৈবৈদ আমিই ব্যবস্থা করিয়াছি। নববিধানে ভ্রাতৃভাবে প্রতিমা-পূজায় (পুতুল পূজায় ?) পণপ্রথায় আমি সমদর্শী।

(২৬) বাবু বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভাসমিতিতে আমার যাতায়াত আছে। শুদ্ধিসভায়, হিতসাধিনী সভায়, অনুশীলন-সমিতিতে, সাধনাসমিতিতে, সেবাসমিতিতে, ব্রতিসমিতিতে, সাধারণসম্মিলনসমিতিতে, সাহিত্যসম্মিলনে, সারস্বতসম্মিলনে, [মেমোরিয়াল মীটিং বা] স্মৃতিসম্মিলনে, স্মৃতিসভায়, সহানুভূতিসভায়, শোকসভায়, সান্ধ্যসমিতিতে, সুহৃৎসভায়, সখা সম্মিলনে, সৎস্বভাবসাধনার্থ সুনীতিসঞ্চারিণী সভায়, সত্যনারায়ণ সমাজে, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রেম-প্রচারিণী সভায়,সর্ব্বত্র আমাকে পাইবে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভায় আমি, সদ্গোপ সভায়ও আমি। সভারম্ভে, সভাভঙ্গে, স্বস্তি-বাচনে সংস্কৃত শ্লোকে, প্রবন্ধপাঠে, হাততালিতে, [হিপ হিপ হুর্‌রেতে], যৎকিঞ্চিৎ জলযোগে, [টী পার্টিতে], স্মৃতিসৌধে, সমাধিসৌধে, সমাধিস্তূপে, সমাধিস্তম্ভে, শিলালিপিতে, শিলাফলকে, শাসনে, প্রশস্তি পরিচয়ে, পুঁথির পাটায়, মর্ম্মরমূর্ত্তির বা পাষাণপ্রতিমার পাদপীঠে, সর্ব্বাবস্থায় আমাকে দেখিতে পাইবে। আবার প্রাচীন প্রথার কথকতায়, বারইয়ারী ব্যাপারে, মঠমন্দিরপুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠায়, অন্নদানে, আমার স্থান আছে। মুসলমানের মাদ্রাসা মকতাব মুশাফিরখানা মসজিদে, মহম্মদ মহসীনের ইমামবাড়ীতেও আমার প্রবেশনিষেধ নাই।

(২৭) [টেলিফোঁ টেলিগ্রাফ, পোষ্টমাষ্টার, পোষ্ট-পিয়ন] হরকরা [রনার, বুক প্যাকেট, পার্শেল পোষ্ট] প্রভৃতি ডাকঘরের ব্যাপারে আমার ডাক পড়ে। পত্রপাঠ-মাত্র উত্তর-প্রদানে, ভক্তিভাজন পরম পূজনীয় পরম-পোষ্টাবর সম্মানভাজন মহামহিম মঙ্গলালয় বশংবদ অবশ্য-পোষ্য প্রণাম পুরঃসর প্রভৃতি পাঠে আমি বিরাজ করি।

(২৮) আমোদপ্রমোদ, বাজনাবাদ্যি, গায়ন বায়ন, নৃত্য-গীত, গীতবাদ্য, তৌর্য্যত্রিক, সঙ্গীতশাস্ত্র, আমার অগোচর নহে। কায়দাকরতবে, গমকগিটকিরিতে, রাগরাগিণীতে, কড়ি ও কোমলে, সুরসংযোগে, স্বরসুধায়, স্বর ও সুরে, কলকণ্ঠে, কিন্নরকণ্ঠে, আমার আওয়াজ সুস্পষ্ট। কালী-কীর্ত্তনে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে, সঙ্গীতসঙ্কীর্ত্তনে, মানমাথুরে, সখী-সংবাদে, বাসরসায়নে, মনসার ভাসানে, বীণাবাদনে, দুন্দুভিনিনাদে, আমিই আসর মাত করি। তানানানা ভাঁজিলেই, পিড়িং পিড়িং বা বুজতাবুজুম বাজিলেই, তেরাখিটিতা তবলায় চাঁটি দিলেই, তাইরে নাইরে গাহিলেই, ধিন্তাধিনা নাচিলেই, আমি আসিয়া পড়ি। কালোয়াতের কর্কশকণ্ঠে, দাড়িদাতে আমি বিরাজিত। সঙ্গীত শুনিয়া বাহবা দাও, বাঃ বেশ বাঃ বল বা হাততালি লাগাও, সে সবও আমার লীলা।

ইমনকল্যাণ, গুর্জ্জররাগ, জয়জয়ন্তী, ঝিঁঝিট, তেতালা, দশকুশী, দাদরা, মধ্যমান, মেঘমল্লার, বসন্তবাহার, সর্ব্বত্র আমার বাহার। বেণুবীণা, সেতার এসরাজ, সপ্তস্বরা, সুরবাহার, মুরজমুরলী, মৃদঙ্গমন্দিরা, রবাব, দুন্দুভি, ঘুঙ্গুর, কনককিঙ্কিণীতে আমি, আবার খোল-করতালে, নাগারাটিকাবাকাড়ায়, তুরীভেরীতে, ঢোলক-তবলায়, ঢাকঢোলে, দামামাদগড়ে, জগঝম্পে, চড়বড়েয়, ঠেঁটরায়, ব্যাণ্ডবাজনায়, ব্যাংবাঁশীতে, ডুগডুগিতে, গাব-গুবাগুবেও আমি। সঙ্গীতসমাজ, সুহৃৎসঙ্গীতসমাজ, সঙ্গীতসঙ্ঘ, বঙ্গরঙ্গভূমি,[ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটার] নির্ব্বাচিত নৃত্যগীত, পটপরিবর্ত্তন, [বেনিফিট নাইট ফুট লাইট] দুর্গাদাস দে, মিনার্ভায় মহেন্দ্র মিত্র, বৈকুণ্ঠবসু, বেজবরুয়া, তানসেন, গীতবিৎ মাষ্টার মদন, সবাই অনুপ্রাসরসে মগন। যাত্রার কালুয়াভুলুয়া, বৃন্দাদূতা, মালিনীমাসী, আমারই যোগাযোগে যোটে।

(২৯) খেলাধূলা ক্রীড়াকৌতুকেও আমার লীলাখেলা। সুধু ছেলেবেলার ছেলেখেলা ধূলাখেলা খেলাধূলা কেন, অষ্টাকষ্টি, অাগডুমবাগডুম, অাতালিপাতালি, ইক্কিমিক্কি, কিৎকিৎ, ঘুঘু ঘুঘু, ছিনিমিনি, দশপচিশ, বাঘবন্দী,

সিঁদুরটোকাটুকি, সব তা'তেই আমি। [ব্যাটবল বা ক্রিকেটে আমি], ঝালঝাপ্পায় হাডুডুডুতে আমি, প্রাচীন কন্দুকক্রীড়ায় আমি। ঘুড়ী উড়ানয় আমি, আবার লাট্টু-লেটিতেও আমি। তাস পাশা শতরঞ্চে আমি, দাবাবড়েয় আমি, তিনতাস ছবিছুট [পেবেমারা পিংপং] মায় ইস্তক-কাবারে আমি। ধাঁধায় আমি, কথাকাড়াকাড়িতে আমি; জলের খেলায় তুলার খেলায় আমি, ঘোড়দৌড়ে পোলো-খেলায়ও আমি। শারীরিক শক্তি-সঞ্চয়ে, জাপানী জিউ-জিৎসুতে আমি, মালামো কুস্তির কসরতে কুচকাওয়াজেও আমি। ভোজবাজী, বাঁশবাজী, মেড়ার লড়াই, বুলবুলির লড়াই, ভীমভবানা, [কার্লেকারস্ সারকাস], আলিপুরের পশুশালা, মোহনমেলা, সর্ব্বত্র আমার দর্শন পাইবে।

(৩০) সভ্যসমাজের [এটিকেটে] তরিবতে, কায়দা-কানুনে, আদবকায়দায়, আদরআপ্যায়িতে, আদরআহ্বানে, অনুরোধ উপরোধে লোকনকুতায়, লোকলজ্জায়, (আঙ্গুল আবডালে), দানধ্যানে, দয়াদাক্ষিণ্যে, দয়ামায়ায়, মায়ামমতায়, স্বাগতসম্ভাষণে, করকম্পে, প্রাতঃপ্রণামে, গললগ্নীকৃত-বাসে, পাদস্পর্শপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে, আমি আটঘাট বাঁধিয়া রাখিয়াছি। যানবাহনে, পোষাকপরিচ্ছদে, বসন-ভূষণে, বেশবিধানে, বেশবিন্যাসে, বেশভূষায়, ছাঁটকাটে, সাজসরঞ্জামে, ঘরবাড়ীর সাজসজ্জায়, আহারবিহারে, আচার-ব্যবহারে, বিলাসব্যসনে, আমার অধিকার অপ্রতিহত।

(৩১) যানবাহনে—গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ঘরের গাড়ী, ভাড়ার গাড়ী, যুড়ীগাড়ী, দেড়াভাড়ার গাড়ী, [টমটম, পুশপুশ, মোটরকার, ট্রেনট্রলি-ট্র্যাম, (শিয়ালদহ হইতে শ্যামবাজার) ট্রেন ষ্টীমার,] যাত্রীজাহাজ, [সাইকেল ষ্টে] ডার্জ্জিলিঙ্গের ডাণ্ডী, [রেলরোড বা] রেলের রাস্তা, [লুপ লাইন, গ্র্যাণ্ড কর্ড, মান্দ্রাজ মেল], সারাসেতু, শোণসেতু [জাহাজের জেটি ও জলিবোট, কাউ-ক্যাচার, কোষ্টক্যানাল লাইন] সর্ব্বত্র আমি। পানিপাঁড়ে, [ষ্টেশন-মাষ্টার, টিকেট-কলেক্টর, টিকিট, নাইটডিউটি, টাইমটেব্‌ল্,] গাড়ীর গড়গড় ঘড়ঘড় ঘ্যাচরঘ্যাচর হুসহুস, ক্যাচক্যাচ, সবই আমার যোগা-যোগে। [কেলনার কোম্পানীর রিফ্রেশমেণ্ট রূমে আমি আরাম করি।]

(৩২) বিদেশে বিঘোরে ভাড়ার বাড়ী বাসাবাড়ীতেই থাক আর বসতবাটী বাস্তভিটায়ই থাক, শরীর সারার জন্য স্বাস্থ্যনিবাসে বাস কর আর নিরুপায়ে মাতুলালয়েই আশ্রয় লও, আমার মায়া কাটাইতে পারিবে না। গৃহদাহ ঘটিলে, ভিটামাটি ঘুচাইলে, চাটিবাটি তুলিলে, বাড়ী বিক্রয় করিলে বা বাঁধা দিলে, চালচুলা না থাকিলেও আমি তোমায় ছাড়িব না। আবার বাগানবাড়ী বৃক্ষবাটিকা বিশ্রামবাটিকা প্রমোদ-উদ্যান ক্রীড়াকাননে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদপ্রমোদ আহারবিহার বনভোজন [পিকনিক কর বা ইডনগার্ডন বীডন্ গার্ড্‌নে বা বীডন বাগানে] বিশুদ্ধ বায়ুসেবন কর বা বিজনবাসে বনবাসে প্রবাসবাসে যাও, আমি সঙ্গের সাথী। আমার আবদারে ঘরবাড়ীর তরবেতর নামনির্দ্দেশ। যথা, কমলকুটীর, কামিনীকুটীর, দেব-নিবাস, পুলিনপুরী, পাথারপুরী [আইভি ভিলা, অর্কিড ডেল, হলি লজ]।

দ্বারদেশে, সদরদরজায়, দরদালানে, চণ্ডীমণ্ডপে, ঠাকুরঘরে, গোসাঘরে, ঘণ্টাঘরে, খাসকামরায়, গুপ্তগৃহে, গর্ভগৃহে, গুহাগৃহে, পয়ঃপ্রণালীতে, জলের কলে, চৌবাচ্চায়, মাটকোঠায়, শার্শীখড়খড়িতে, ঘুলঘুলিতে, ঝিল-মিলিতে, ঘরদোরে, সদর অন্দরে, বিয়েবাড়ীতে, কোথাও আমার প্রবেশনিষেধ নাই। বহির্ব্বাটী বা বাহিরবাড়ী গেলে সেখানেও আমি হল্লা করিব, তেতালায় উঠিলে সেখানেও আমি চড়াও হইব, বড়বাড়ী গেলে সেখানেও আমি উঁকি মারিব। কারাগারে কারাকক্ষেও আমি কাছছাড়া নহি।

ঘরবাড়ীর মালমশলা সাজসরঞ্জাম তোড়যোড় যোগাড়-যন্ত্রে আমি কার্য্যকুশলতা দেখাই। আমিই রাজমজুর, মুটে মজুর মিস্ত্রী, কারিকর খাটাই, মেরামত করাই, কর্ণিক দ্বারা কারুকার্য্য গজগিরি করাই, মর্ম্মরপ্রস্তর বসাই। ইটকাঠ, ইটটালী, বিলাতী মাটী, আড়াবরগা, কড়িবরগা, বীমবরগা, কড়িকাঠ, কাঠকাটরা, শাল সেগুন সুঁদরী শিশু, খোলাখাপড়া, সুরকী সিমেণ্ট, খড় দড়ি, লাকলাইন, দড়াদড়ি, রশারশি, [মায় গ্রাউণ্ড গ্লাস]—সব যোগাড়-যাগাড় আমার ভার।

ঘরবাড়ীর সাজসজ্জায় আমার হাত আছে। [বেঞ্চি

চেয়ার] চৌকি, [কৌচ] কেদারা [ইজিচেয়ারেও আমি লাট হইয়া আছি], [পাংখা-পুলার], খসখস টাটী, [মেজের ম্যাটিং], জাজিম্, পাপস, গালিচাছুলিচা, সুজুনী শতরঞ্চ, [ডেস্ক ড্রয়ার ডাণ্ডী হোয়াটনট] [পোটম্যাণ্টো ষ্টীলট্রাঙ্ক ক্যাসবাক্স] বিজলীবাতী, খাটের খুরা, গালবালিশ, পাশবালিশ, বিছানা বালিশ, প্রদীপ পিলসুজ, পিতলের পিলসুজ, শেজ সামাদান, লণ্ঠন, গোললণ্ঠন, কেরাসিনের কুপি, শিশি, কাঁচকড়া ও কড়িকোটার জিনিস, [কার্পেটে কারচুপি কায], বাসনকোসন, ঘটীবাটী, বঁটিকাটারী কুরুনী, ছুরীছোরা, বিড়েবারণ, মুড়াখ্যাংরা, খড়কে কাঠি, জিবছোলা, কাঠকয়লা, কোককয়লা, কাঠ খড়, কাঠখড়ি, শুষ্ককাষ্ঠ—সব আমি যোটাই।

(৩৩) সভ্যভব্য নব্য ইঙ্গবঙ্গের [কফ কলারে, হেট-কোট প্যাণ্টশার্টে কালকোটে] ছাতাছাড়িঘড়িযুড়ীগাড়ীতে, জুতামোজায়, জামাজুতায়, চোখের চশমায়, স্বদেশভক্তের সুখচরের স্বদেশী গেঞ্জীমোজা তোয়ালেরুমালে, সেকেলে সম্প্রদায়ের চোগাচাপকান আচকান ইজার চুড়িদারে, জামাযোড়া দোড়দার শালদোশালায়, শাল আলোয়ানে [অল উল] লালইমলিতে, ঘরণীগৃহিণীগণের [শেমিজ জ্যাকেটে] [সিল্ক শাটিনে, সিল্কের শাড়ী] দেশী শাড়ীতে, পরণে পাছাপেড়ে শাড়ী পাকা পাড়ে, শাঁখাসিঁদুরে, মিশিমাজনে, ধনীমানীর মখমলে কিংখাবে, রেশমপশমে, দীনদুঃখীর কাপড়চাদরে, ধুতীফোতায়, কাছাকোঁচায়, তেলধুতীতে সাতহাতী ধুতীতে, বা কাঁধকাটা কাপড়ে, কাঁথা কম্বলে, তেজঃপুঞ্জ সাধুসন্ন্যাসীর জটা ফোটা লোটায়, বাউলের আলখাল্লায়—কোথায় আমি নাই ?

(৩৪) গয়নাগাঁটি সোণাদানা গায়ে এক গা গয়নায়, অষ্ট অঙ্গে অভরণে (আভরণে), অলঙ্কার-প্রতিকারে আমি অলঙ্কারের অলঙ্কার। যথা কেয়ূরকুণ্ডল, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী, নাকে নথনোলকনঙ্গ (কুলকামিনীর কাঁকে কলসী নাকে নোলক পরণে পাছাপেড়ে সাড়ী পাকাপাড়), কাণে ঝুমকো কাণবালা কর্ণকুণ্ডল, সীঁথায় সীঁথিপাটি ঝাপটা, মাথায় মুকুট, মাঝায় মেখলা বা কটিতটে কাঞ্চী কনক-কিঙ্কিনী, সূর্য্যহার চন্দ্রহার রেটগোট, গলায় গজমতি মুক্তাহার, হেলেহার, হেঁসোহার, দড়াহার, মতির মালা, হাতে তার তাগাতাবিজ বাজুবন্ধ বালাবাক [ব্রেসলেট] বাউটি বাঁউড়ি, যবদানা মরদানা, লবঙ্গদানা লবঙ্গফুল, মৌরী-মাদুলি, মুড়কিমাদুলি, দমদম, বিনোদবাহার যৌবনবাহার স্বামিসোহাগিনী চুড়ী, ঢাকার শাঁখা, পায়ে পাশুলী চরণপদ্ম পালংপাতা দমদমা বা গোলমল। গিনীসোণা, অভাবে গিল্টির গয়না, [রোলড গোলড্, কেমিক্যাল, মায়াপুরী মেটালে] পালিশপাতা বা ফারফোর গহনা গড়ান।

(৩৫) নেশার বশ বাঙ্গালী বাবুর আলবোলা গড়গড়ায়, চকমকি ঠোকায়, হুকাকলিকায়, অম্বুরীখাম্বিরায়, তামাক-টিকায়, দোক্তাতামাকে, চাচুরুটে, [চুরট-সিগরেটে, বিড়ি-বার্ডসাইএ, কাফিকোকোতে, কোকেনে], মুক্তিমণ্ডপে গাঁজাগুলিতে—(পেয়ারার পাতায় প্রস্তুত !)—চরসচণ্ডুতে, ছিটাটানায়, চুরুটটানায়, নস্যটানায়, নস্যলোসায়, নস্যনেওয়ায়, সুরাসক্ত মদমাতালের মদের মুখে, মাতলামোয়, পানপাত্রে, শুঁড়ীবাড়ীতে, খাঁটিটানায়, বোতলবাহিনীতে, [ব্র্যাণ্ডীর বোতলে, ব্র্যাণ্ডীবিয়ারে , শেরিশ্যামপেনে, পেল-এলে] আমি অধিষ্ঠিত। আমার গুণে তেল তামাকে পিত্তনাশ, নেশার রাজা গাঁজা, সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে। পাণসুপারি, পাণে চুণ [ও পিপারমিণ্ট], পাণের দোনা, এলাচলবঙ্গ, জৈত্রীজায়ফল, দারুচিনি কাবাবচিনি, কর্পূরপুগ, [সেন-সেন] ইত্যাদিও আমি সরবরাহ করি।

(৩৬) এইবার মধুরেণ সমাপয়েৎ। ভক্ষ্যভোজ্যেও আমি আছি। কমলাকান্তের মত ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভূরিভোজন কর, গণ্ডে পিণ্ডে গেল, কুঁচকিকণ্ঠা বোঝাই কর, গাবগুটো করিয়া খাইয়া আইঢাই কর, সাত তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গোঁজ, আর যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ বা একটু মিষ্টিমুখ কর, পেটপূজা যেখানে আমি সেখানে। দগ্ধোদর বা পোড়াপেটের জন্য যা কিছু যোগাড় কর, আমায় ঠেলিতে পারিবে না। চা'লচিড়ে বেঁধে ধাপধাড়ায়ই যাও আর দিল্লীকা লাড্ডুই খাও, আমি সঙ্গের সাথী। আবার জঠরজ্বালা বা জঠরযন্ত্রণায় ছটফট কর, দাঁতে দড়ি দাও, ভাতে হাতে না কর, হাওয়া খাওয়ায় খুসী থাক, সেখানেও আমি।

খাদ্যপ্রস্তুত-প্রক্রিয়ার জন্য 'পাকপ্রণালী' বা 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' খুঁজিলে আমাকেই পাইবে। পরিপাক,

পাকসাক, পথ্যাপথ্য, খানাপিনা, খাইখরচা, পলাশপাতা, পাতাপাতা, সবাসাপ্তান, ছাঁদাবাঁধা, পড়কেকাঠ্য ও শেষের সম্বল গাড়ুগামছা—সবই আমার প্রসাদে। আনন্দআশ্রমে, বাবুর্চ্চি [বটলারে], রাঁধুনী বামুনে, চা-চিনিতে, চামচেতে, কড়াবেড়ি, হাঁড়িবেড়ি, হাঁড়িসরা, হাঁড়িকুঁড়ি, হাঁড়িহেঁশেল, হাঁড়িচড়ান প্রভৃতি রন্ধনের তাতবাঁতে পর্য্যন্ত আমি।

হোমরা চোমরা আমার ওমরা ও ইংরাজী-জানা বাবুভেয়েদের শিক-কাবাব, পোলাও পাঁঠা, পোলোয়া কালিয়া, কালিয়াকাবাব কোপ্তা কোর্ম্মা [কাটলেট অমলেট মটনচপ], মণ্ডমাংস বা মদমাংস, [রুটিবিস্কুট কেক কমফিটসে] আমার যেমন রুচি, খাঁটি সৌখীন খাদ্যদ্রব্য লুচিচিনি, লুচিকচুরি, পাঁপর, খাজাগজা জেলাপি, মিঠাই-মণ্ডা গণ্ডা চ গণ্ডা, মতিচুর মিহিদানা, রাবড়ীরসগোল্লা, সরভাজা সরপুরিয়া, লবঙ্গলতিকা, মনোমোহিনী খিলি, চমচম, আবার-খাবো, সন্দেশ সন্দেশেও আমার তেমনি রুচি। স্বদেশী পায়সপিষ্টক, দধিদুগ্ধ, ক্ষীরসর, ক্ষীরখণ্ড, নবনীত, মুড়ামাখন, মাখনমিছরিতেও আমার বিলক্ষণ টান আছে। শেষে সুস্বাদু আচারচাটনী, আমের আচার, কাসুন্দি কুলের আচার, স্নিগ্ধ সরবৎ, সোডা লেমনেড।

মধ্যবিত্তের অন্নব্যঞ্জনে, চা'লডা'লে, ডালডালনায়, ঝালঝোলঅম্বলে, শাকসুক্তয়, চড়চড়িতে, সরসরিতে, হাবজা গোবজা তরকারিতে, খাড়াবড়িথোড়ে থোড়বড়িখাড়ায়, মৎস্যমাংসে, মাছমাংসে, ঝালের ঝোলে, (ওলে ঝোলে খেওনা), আটার রুটি পরোটায়, আর পালেপার্ব্বণে—পিঠেপুলিতে, শামসাবা গুড়ে, চিড়ের ফলারে, ক্ষীর-চিড়েতে, সরুচিড়ে শুকো দইএ, উড়কি ধানের মুড়কিতে, মর্ত্তমান পাকাকলায়, থৈদৈএ, ভোজভাতে, নবান্নে, নেমন্তন্নে, অন্নাশনে, (দাঁতে ভাতে খেতে) সর্ব্বত্র আমি আছি। আবার দীনদুঃখী মুটেমজুরের দানাপানিতে, ভুজোভাঙ্গে, ভাজাভুজোয়, গুড়মুড়িতে, চিড়েমুড়িতে, চিড়েমুড়কিতে, মুড়িমুড়কিতে, ফুটকড়াইমুড়কিতে, কটকটেয়, চাণাচুরে, গরমমুড়িতে, ছোলার ছাতুতে, গাছ'ছালায়, ভাততরকারীতে, নুণেফেনে, ভাতের পাতে, ভিজেভাতে, পান্তাভাতে, বীচেংড়িতে, পটোলপোড়ায়, আমি আছি। পিত্তপ্রধান ধাতুর চা'লজলও আমার ব্যবস্থায়।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু-সন্ধ্যা

১

নীরব বিহঙ্গ-গীতি, পশ্চিম অচলে
রবি অস্ত যায় ;
মিশে গেল দিবসের শেষ আলো-রেখা
দিগন্ত সীমায়।
দূর বনরাজি শিরে নেমে আসে যেন ধীরে
কৃষ্ণ যবনিকা, —
সন্ধ্যা বুলাইয়া দিল বিশ্ব-দৃশ্যপটে
তিমির-তুলিকা।
এমনি একদা সন্ধ্যা আসিবে নামিয়া
জীবনের 'পরে,
নিবিবে আঁখির আলো, বাসনার ঢেউ
থামিবে অন্তরে,
ক্ষান্ত যত গীত গান সুখ-দুঃখ ভরা তান ;
শুধু চুপে-চুপে
করুণ মরণ আসি ঘিরিবে আমায়
অন্ধকার রূপে !

২

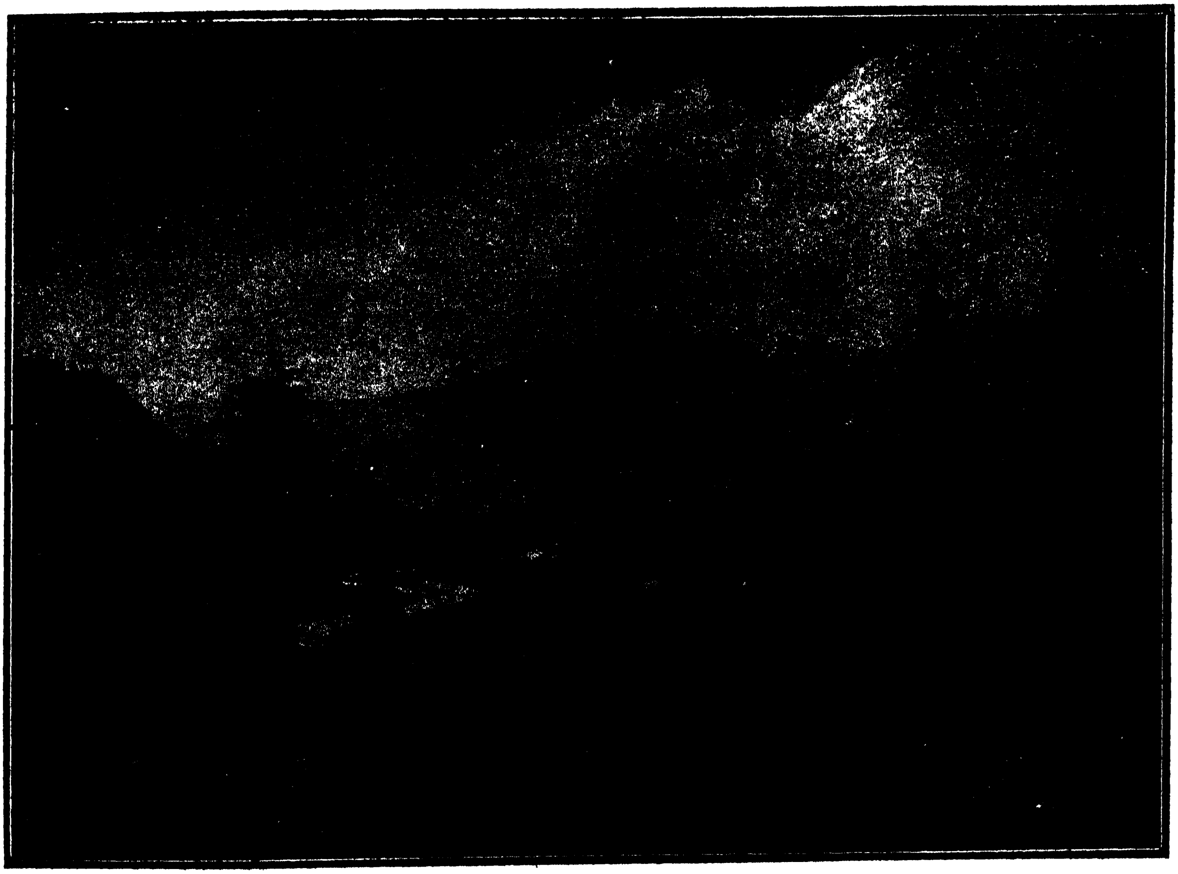
নিখিল ধরণী ক্রমে লুপ্ত রজনীর
অন্ধকার গ্রাসে,
কোথা হ'তে উঠে ফুটে' অগণ্য তারকা
অসীম আকাশে !
কে জানিত রবি-করে ঢাকাছিল নীলাম্বরে
জ্যোতিষ্কনিচয় !
নিবিড় আঁধার মোরে অনন্ত লোকের
দিল পরিচয়।
ওই মত পরিশ্রান্ত জীবনের শেষে
সন্ধ্যায় যখন
মৃত্যুর শীতল কোলে জনমের মত
মুদিব নয়ন,
আঁধারে মিশিবে ভব, দেখিব কি নব নব
জ্যোতির্ম্ময় দেশ —
এ জীবনে কোন দিন স্বপনেও যার
পাইনি উদ্দেশ !

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

কাশ্মীরী পণ্ডিত

পণ্ডিত কথায় অর্থ সচরাচর আমরা শাস্ত্রজ্ঞ ও বিদ্বান বলিয়াই বুঝি কিন্তু কাশ্মীরে এই কথাটির অর্থ বিভিন্ন রকমের। ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের মধ্যে যে যত বড় বিদ্বান হউক না কেন তিনি যে বাবুজী সেই বাবুজীই থাকিবেন; পণ্ডিতজী তিনি কিছুতেই হইতে পারিবেন না। কিন্তু কাশ্মীরের আদি-ব্রাহ্মণ-সন্তান নিরক্ষর হইলেও পণ্ডিতজী। তবে কাশ্মীরনিবাসী সকল ব্রাহ্মণই পণ্ডিত নহেন। পঞ্জাব বা সমতল ভূমির ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা কাশ্মীরে গিয়া বাস করিতেছেন তাঁহারা পণ্ডিত আখ্যা পাইতে পারেন না। কাশ্মীরের পণ্ডিত ব্রাহ্মণজাতির একটি শাখাবিশেষ। ইহাদের সংখ্যা শতকরা বড়জোর ৫ হইবে। ইহারা আদি আর্য্য উপনিবেশীদিগের খাঁটি বংশধর—ইহাদিগের আর্য্যোচিত শ্রী দেখিলেই ইহাদিগকে চেনা যায়।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন সমস্ত কাশ্মীর এক হিন্দু রাজার অধীনে ছিল, তখন কাশ্মীরের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই একটি অবিভক্ত হিন্দু জাতি ছিল। তাহার পর কাশ্মীর মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে কাশ্মীরের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক, মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, হিন্দুধর্ম্ম কোনরূপে রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া যায়। এই হিন্দু অধিবাসীগণের বংশধরেরা এখন কাশ্মীরী পণ্ডিত। সুতরাং এখন কাশ্মীরের আদিম অধিবাসীদিগকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—কাশ্মীরী মুসলমান ও কাশ্মীরী পণ্ডিত। ইহারা উভয়েই এক আর্য্যজাতি-সম্ভূত।



কাশ্মীরের একাংশের দৃশ্য।



কাশ্মীরী পণ্ডিতের পরিবারমণ্ডলী—দেবপূজান্তে গৃহীত চিত্র।

পূর্ব্বে যে কাশ্মীরী মুসলমানগণ ও পণ্ডিতগণ একজাতিরই অন্তর্গত ছিল এখন তাহা তাহাদের নামের উপাধি হইতে অনেকটা বুঝা যায়—জম্মুর গভর্ণরের নাম বাবু নরেন্দ্রনাথ কউল; ইনি একজন হিন্দু পণ্ডিত। মুসলমানদিগের মধ্যেও অনেককে কউল উপাধিধারী দেখা যায়। কাশ্মীরী পণ্ডিতানীদিগের মুখশ্রী মোঙ্গলীয় ছাঁচের; তাতার ছাঁচও দুষ্প্রাপ্য নহে; ইহার কারণ বোধ হয় এই যে আদিম আর্য্য-উপনিবেশীরা স্থানীয় মোঙ্গল ও তাতার জাতীয়া রমণীদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারই চিহ্ন কন্যাকুলে এখনো সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

কাশ্মীরী পণ্ডিত ও কাশ্মীরী মুসলমানদিগের মধ্যে বহিরাকৃতিতে বিশেষ কিছু পার্থক্য না থাকিলেও পণ্ডিতেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকে বলিয়া তাহাদিগকে তাহাদের মুসলমান ভ্রাতাদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও অধিকতর সুন্দর দেখায়। এখানকার মুসলমান অধিবাসিগণ বড়ই অপরিষ্কার। সে কারণে বোধ হয় তাহাদের মুখাকৃতিতে অপরিষ্কার ও বুদ্ধিহীনতার ভাব দৃষ্ট হয়।

কাশ্মীরে পণ্ডিতদের এখন জীবিকা উপার্জ্জন করা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিরক্ষর সম্বলহীন পণ্ডিতগণও হাতের কাজ করিয়া বা অন্যকোন রূপে খাটিয়া খাইতে রাজী নহে। সামান্য জমী জমা থাকিলেও তাহা মুসলমানগণের দ্বারা চাষ করাইয়া লয়, নিজেরা কখন কোন কাজে হাত দেয় না। সুতরাং ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক যাহারা সংস্কৃত পাঠ পূজা বা জ্যোতিষ চর্চ্চা করিয়া কোনো মতে জীবিকা উপার্জ্জন করে তাহারা ছাড়া বাকী পণ্ডিতদের অবস্থা সচ্ছল নহে। লেখাপড়ার চর্চ্চা নাই বলিলেই হয়; কাজেই কাশ্মীর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী সবই প্রায় বিদেশী। ক্রমশঃ লোকের চৈতন্য হইতেছে।

যদিও কাশ্মীরের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০জন মুসলমান ও তাহার উপর প্রায় চারিশত বৎসরের উপর



কাশ্মীরী পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ।



কাশ্মীরী পণ্ডিত পূজারী।

হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমান নরপতিদিগের অধীনে ছিল, তবুও কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ এখনও হিন্দু ক্রিয়াকলাপ ও আচার-ব্যবহার প্রত্যেক খুটিনাটি মানিয়া পালন করিয়া চলে। পণ্ডিতেরা মাথায় হিন্দুপদ্ধতিতে পাগড়ী বাঁধে ও কপালে রক্তচন্দন ও জাফরানের তিলক পরে ও অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বলিয়া শ্রীনগরের অসংখ্য মুসলমান জনসমুদ্রের মধ্য হইতে একজন হিন্দুপণ্ডিতকে চিনিয়া লওয়া খুবই সহজ।

শ্রীনগরের হাতেকাদাল একটি হিন্দু পল্লী। এইস্থানে বহুসংখ্যক পণ্ডিতের নিবাস বলিয়া এইস্থানের প্রভাতকালটি বড়ই মনোরম। তখন দেখিতে পাওয়া যায় সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্ব হইতেই হিন্দু নরনারী দলে দলে স্নান করিতে চলিয়াছে। কেহ বা স্নান করিয়া পূজার নিমিত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। সে সময়ে ঘরে ঘরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইয়া শঙ্খঘণ্টার ধ্বনির সহিত বেদপাঠ হইতেছে। সেই সৌরভ ও সেই ধ্বনিতে জড়াইয়া তখনকার দৃশ্য বড়ই মধুর বলিয়া মনে হয়। বেলা যত বাড়িতে থাকে ক্রমশঃ নগরের কোলাহল জাগিয়া উঠে। বেদ পাঠের মধুরধ্বনি আর শোনা যায় না। অসংখ্য মুসলমান-জনসমুদ্রের মাঝে পণ্ডিতদের তখন আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতগণ যেন সকলে যে-যার আপনার ঘরে লুকাইয়া পড়িল বলিয়া মনে হয়।

কাশ্মীরী হিন্দুদিগের মধ্যে ক্ষেত্রী বলিয়া একটি শ্রেণী আছে। পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে ক্ষেত্রী, বোরা ও পণসারী



কাশ্মীরী পণ্ডিত—আধুনিক ধরণের পোষাকে।

বলে। কিন্তু আকারে ও আচারে ইহাদের সহিত পণ্ডিতদের বিশেষ কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

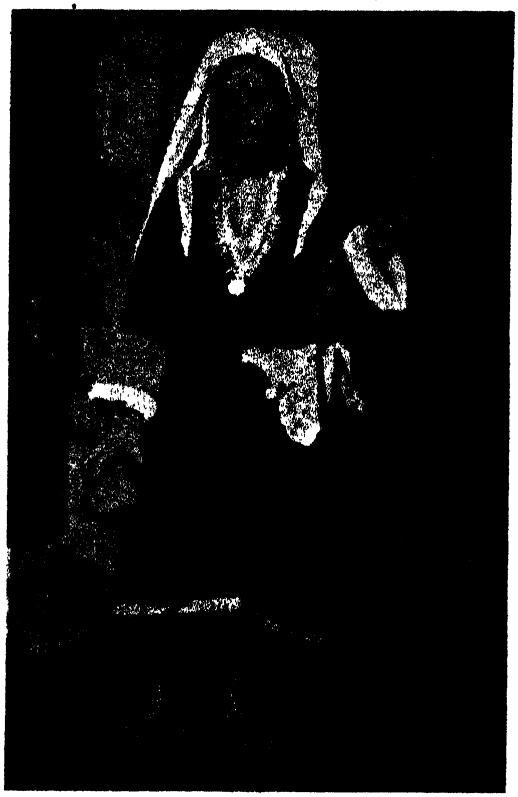
পণ্ডিত ও পণসারীদিগের মধ্যে চালচলন বা আকৃতি ও পরিচ্ছদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। ইহারাও পণ্ডিতদিগের মত হিন্দু-ক্রিয়াকর্ম্ম করে। প্রায় সকল মুদীর দোকানগুলি ইহাদের বলিয়া ইহাদিগকে পণসারি বা পসারি বলে। ইহারাই দেশের ব্যবসাদার। এক একজন করিয়া ধরিলে ইহাদের অবস্থা পণ্ডিতদের চেয়ে ভাল। পণ্ডিতেরা ব্যবসাদি করা বা জমীজমা দেখা বড়ই ঘৃণাজনক মনে করে। ইহাই ইহাদের আর্থিক অবনতির কারণ। কিন্তু সুখের বিষয় এখন তাহাদের মতের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন দু একজন পণ্ডিতকেও ব্যবসা করিতে দেখা যাইতেছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে কাশ্মীরী পণ্ডিতেরাও সময়ের সহিত চলিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

কেবলমাত্র একটি লম্বা পিরান কাশ্মীরী পণ্ডিতদের ও পণসারীদের প্রধান পরিচ্ছদ। মুসলমানগণ ও আধুনিক ধরণের হিন্দুরা ইহার সহিত পায়জামা পরে। কিন্তু পুরাতন ধরণের পণ্ডিতেরা কেহই পায়জামা পরে না, ধুতি পরে। আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত লোকেরা বিলাতী পোষাকও পরিতেছে। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরাও পার্সী বা ব্রাহ্ম ধরণে শাড়ী পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে সাধারণ স্ত্রীলোকের পোষাক এখনো সেই লম্বা পিরানই আছে।

ছবিগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ইহারা কত বড় লম্বা ঝুলওয়ালা পিরান পরে। এই পিরানের হাতাগুলিও হাতের চেয়ে বেশী লম্বা। খাদ্যদ্রব্যাদি ধরিতে হইলে পিরানের হাতাটি হাতের উপর টানিয়া দিয়া, হাতের আঙ্গুলগুলি হাতাটির দ্বারা ঢাকিয়া জামার আস্তিনে করিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি ধরিয়া মুখে দেয়। নগ্নহস্তে খাদ্যদ্রব্যাদি স্পর্শ করা বা মুখে দেওয়া ইহাদের মতে অহিন্দু আচরণ, তাহাতে খাদ্যদ্রব্যাদি কলুষিত হইয়া যায় বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। অন্যের উচ্ছিষ্ট বহুসংখ্যক চায়ের পিয়ালা একে একে ঐরূপভাবে আস্তিনের নীচে আঙ্গুল দিয়া ধরিয়া সরাইয়া সরাইয়া নিজের পেয়ালা ঐরূপভাবে ধরিয়া চা বা কুলচা নামক বিস্কুট খাইতে ইহারা দ্বিধা বোধ করে না।



কাশ্মীরী ক্ষেত্রী।



কাশ্মীরী পণ্ডিতানী।

এইরূপ ভাবে জামার আস্তিন বা কাপড়ের সংস্পর্শে অন্য জিনিষ আসিলে তাহার সকল দোষ কাটিয়া যায় বলিয়া একখানি শাল বা মোটা কম্বলের উপর বসিয়া বা শাল কম্বলের উপর থালা রাখিয়া পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণেতর জাতির সহিত এক সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিতে আপত্তি বোধ করে না। শাল বা কম্বলখানি থাকার দরুণ ইহাতে আর কোনও দোষ থাকে না। এই খানা-খাওয়া শাল বা কম্বল কস্মিন কালেও কাচা হয় না।

কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে আবার কতকগুলি পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ আছেন। ইঁহারা পূজাদি সম্পন্ন করেন ও সকলে ইঁহাদিগকে গুরুর মতো ভক্তি করে।

এই পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদিগের যজমান বা শিষ্যেরা "নমস্কার" বলিয়া প্রণাম করে। গুরুও "জয়কার" অর্থাৎ জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এখানে বয়সে বড় বা পূজনীয় লোকদিগকেও "নমস্তে" বা "নমস্কার" বলিয়া অভিবাদন করা হয়। তাঁহারা প্রত্যুত্তরে "ঔরজু" (ঔর-জীব) বা জীবন বৃদ্ধি হৌক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। বন্ধুবান্ধব ও সমবয়স্কদিগের মধ্যে "বন্দেগি" বলা প্রথা। বন্দেগির প্রত্যুত্তরে বন্দেগি বা জীন্দেগি বলে। জীন্দেগি মানেও জীবন বাড়ুক।

পণ্ডিতগৃহে পুত্র জন্মান বড়ই আনন্দের। পণ্ডিত-বধূ অন্তঃসত্ত্বা হইলে পর পঞ্চম বা সপ্তম মাসে বধূর পিতৃগৃহ হইতে গহনা কাপড় ও দুধের তত্ত্ব পাঠাইতে হয়। ভাবী সন্তানের নিমিত্ত শুভদুগ্ধ সঞ্চয়ের সূচনা করিয়া দুগ্ধ পাঠান হয় বলিয়া এই তত্ত্বে দুগ্ধ বড়ই প্রয়োজনীয়। এই তত্ত্বটিকে দদয়ুন (দোহদ ?) বলে।

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মীয়স্বজনকে সেই সংবাদের সহিত প্রসূতির পিতৃগৃহ হইতে প্রাপ্ত বাদাম পাঠাইতে হয়। পঞ্চম দিনে আত্মীয়স্বজনদিগের মধ্যে তিলের লাড়ু বিতরণ করা হয়, ইহাকে তাহারা ক্রুই বলে। সপ্তম দিনে পুত্রকে



কাশ্মীরী পণ্ডিত বর—পূর্ণসজ্জায়।

স্নান করান হয়, সেই দিন পুত্রের পিতা নূতন পোষাক পরিয়া স্বজাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে ভোজন করায়।

শুভাশৌচ বা সূতিকাগৃহ-নিবাস-কাল পণ্ডিতদিগের মধ্যে দশ দিন। সেই দিন শুদ্ধীকরণ হয় ও জাফরান-রঞ্জিত ভাত আত্মীয়স্বজনকে খাওয়ান হয়। তাহার পরদিন নামকরণ হয়। মন্ত্রপাঠের সহিত যজ্ঞ ও হোম হয়। সেদিনও একটি ভোজ হয়।

এক হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে একটি দিন স্থির করিয়া পুত্রের জড়কাশ বা কেশ কর্ত্তন হয়। সেই দিন বালকের চুল ছোট করিয়া কাটিয়া মাথায় পাঁচটি শিখা রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কাশ্মীরী বালকদিগকে অত্যন্ত কুৎসিত দেখায়। কন্যার বেলায় কিন্তু চুল ছোট না করিয়া চুল সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করিয়া দেওয়া হয়। সেদিনও সন্তানের শুদ্ধির জন্য হোম করা হয় ও পুত্র বা কন্যাকে নূতন পোষাক পরান হয়।

পাঁচ হইতে বার বৎসরের মধ্যে পুত্রের উপনয়ন হয়। উপনয়নের তিনদিন পূর্ব্ব হইতে সমস্ত গৃহ সজ্জিত ও পরিস্কার করা হয়। সেইদিন হইতে রমণীগণ প্রত্যহই শুভসঙ্গীত গাহিতে থাকে। এই রমণীদিগকে মঙ্গলমুখী বলে। প্রথম দিনে বালকের হস্তপদ মেথিপাতায় রাঙান হয় ও দ্বিতীয় দিনে দীবগৌন বা গৃহদেবতার পূজা করা হয়। সে দিন ব্রহ্মচারী মাতুলগৃহ হইতে প্রাপ্ত পোষাক পরে ও সেইদিন নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজনেরা পুত্রের পিতাকে একটি করিয়া রজতমুদ্রা উরবল বা উপহার দেয়। তৃতীয় দিনের দিন যাগযজ্ঞ হয় ও সেইদিন ব্রহ্মচারী প্রথম উপবীত ধারণ করে। তাহার পর নবোপবীতধারী ব্রহ্মচারী আত্মীয়স্বজনের নিকট ভিক্ষা করিতে যায়। কেহ বা গহনা কেহ বা পরিধেয় ভিক্ষা দেয়। গহণাগুলি মন্ত্রদাতা গুরু পান। কাপড়গুলি ব্রহ্মচারীরই থাকে। এইদিন হইতে ব্রহ্মচারীকে প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে একবার করিয়া গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে হয়। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য নামসার হইয়াছে।

উপনয়নের মতো বিবাহের ক্রিয়াদিও বিবাহের পূর্ব্বে হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতেও প্রথম দিনে মেথীপাতা রাঙান ও তাহার পর দিন উরবল হয়। তৃতীয় দিনের দিন বর বরযাত্রীর বরাত বা মিছিল লইয়া কন্যাগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। শ্রীনগরে জলপথে গমনাগমনের সুবিধা বলিয়া নগরে নৌকা করিয়া বর যায়। বরের নৌকায় নর্ত্তকীদের নাচ গান হয়। মফঃস্বলে বর ও বরযাত্রীগণ প্রত্যেকে এক একটি ঘোড়া যোগাড় করিয়া তাহাতে চড়িয়া যায়। বরকে দুল্‌হা বলে। তাহাকে চোগা, পাগড়ীর সম্মুখে ডেকাটিক নামক বড় তিলকের মতো সোনার গহনা, ও পাগড়ীর উপর কলঙ্গ পাখীর পালক পরিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত তিনটি জিনিষ বরের পোষাকের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, এ তিনটি বরের পরা চাই-ই। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাশ্মীরী বিবাহে চারিজন বর বিবাহ করিতে যাইত; কিজানি মানুষের ক্ষণভঙ্গুর শরীরগতিকের



কাশ্মীরী বর ও বধূ।

প্রথা এখানে নাই। কাশ্মীরীগণ সন্দেশ প্রস্তুত করিতে জানে না।

পণ্ডিতগণ মাংস, বিশেষতঃ ভেড়ার মাংস, খাইতে বড় ভালবাসে। পূর্ব্বে অন্ততঃ এক শত ভেড়া না বধ হইলে কোনও পণ্ডিতের বিবাহভোজ ঠিকমত সম্পন্ন হইত না। তখন মাংস খাইবার জন্য বরযাত্রীর সংখ্যাও অনেক হইত, এমন কি অনেক অনিমন্ত্রিত ও অনাহূত ব্যক্তি পর্য্যন্ত পথ হইতে মাংসের লোভে বরযাত্রীদের সহিত জুটিয়া যাইত। তখন তাহাদের মধ্যে নিজে কম মাংস পাইয়াছে ও তাহার পাশের লোক বেশী মাংস পাইয়াছে বলিয়া প্রায়ই কথা কাটাকাটি হইত এবং তখন সত্যই হউক বা কাল্পনিকই হউক এরূপ কারণে অপমানিত বোধ করিয়া বরযাত্রীদের সহিত কন্যাপক্ষীয়দের মনোমালিন্য ঘটিত। এইজন্য বিবাহভোজে এখন আর মাংস খাওয়ান হয় না। এখন কেবলমাত্র নিরামিষ অন্নব্যঞ্জনাদি খাওয়ান হয়। খাওয়াদাওয়া শেষ হইলে পর আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে নানাপ্রকার প্রেম-ভক্তি করুণ-বীর-রসপূর্ণ সুন্দর সুন্দর গান শোনান হয়। এইরূপ আমোদ আহ্লাদে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায়।

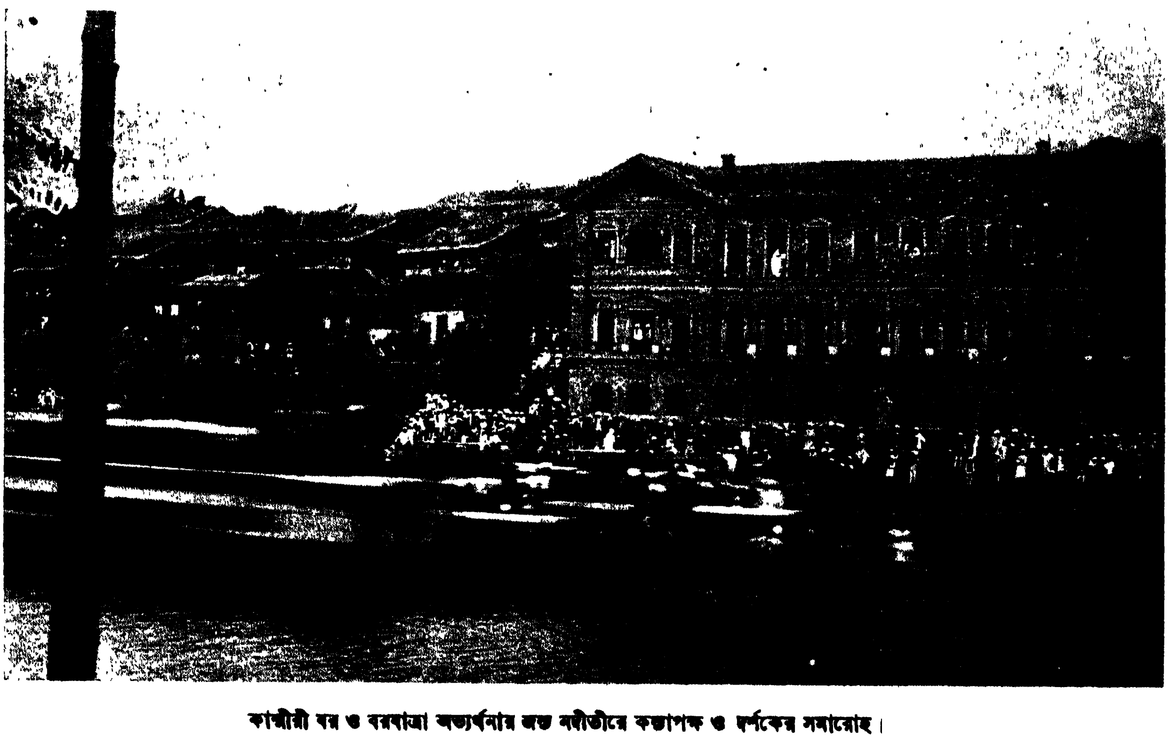
কথা তো বলা যায় না—এক বর মারা গেলে পর পর চতুর্থ বর মজুদ আছে, কন্যা অন্যপূর্ব্বা হইবে না। প্রধান বরকে বলিত দুল্‌হা বা মহারাজ; দ্বিতীয়, পুত্ত মহারাজ; তৃতীয়, শাগাজী বা মিতবর; চতুর্থ মোরছল-বরদার বা ময়ূরপুচ্ছের চামরধারী। বর বরযাত্রীদের সহিত কন্যাগৃহের দ্বারদেশে পৌঁছিলে পর কন্যাগৃহের রমণীগণ গান করিতে আরম্ভ করে এবং বরের পিতা কন্যাগৃহের দ্বার পূজা করিয়া কন্যাগৃহে প্রবেশ করে। তাহার পর কলস পূজা হয়।

বরপক্ষীয়েরা কন্যাগৃহে উপবেশন করিলে পর প্রথমে তাহাদের সকলকে চা পান করান হয়। তাহার অল্পক্ষণ পরে চাঁদোয়া-ঢাকা একটি খোলা জায়গায় তাহাদের সকলকে অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদি সহ ভাত খাওয়ান হয়। সুন্দরভাবে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে কাশ্মীরীগণ সিদ্ধহস্ত। পুরি বা লুচি খাওনর

পরদিন প্রভাত হইতে বিবাহের ক্রিয়াদি আরম্ভ হয়। কন্যা লালরঙের শালে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া বরের সহিত হোমাগ্নির সম্মুখে দাঁড়ায়। কন্যার মাতুল তখন কন্যাকে ধরিয়া থাকে। পুরোহিত চার পাঁচ ঘণ্টা কাল ক্রমাগত বেদ হইতে সংস্কৃত শ্লোক ও মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন ও মাঝে মাঝে অগ্নিতে আহুতি দান



কাশ্মীরী বিবাহভোজ।



কাশ্মীরী বর ও বরযাত্রা অভ্যর্থনায় জন্য নদীতীরে কন্যাপক্ষ ও দর্শকের সমারোহ।



কাশ্মীরী রমণীর বেণীবন্ধন।

করেন। এইরূপে হোমাগ্নির সম্মুখে অন্যান্য ক্রিয়াদি শেষ হইলে বিবাহ শেষ হইয়া যায়। তাহার পর উভয় পক্ষীয় পুরোহিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া নবদম্পতিকে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করে। শ্লোকগুলি পূর্ব্বকালের আদর্শ নরনারীর চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ বিবৃত করিয়া রচিত। সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্ব্বাদ শেষ হইলে পর অবশেষে কাশ্মীরী ভাষায় কন্যাকে—"তুমি সীতার মতো হও" ও বরকে "তুমি রামের মতো হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ শেষ করে। রাম ও সীতার আদর্শ ইহাদের নিকট সবচেয়ে মহান্।

ইহার পর কন্যা লালশালের সেই বিবাহবেশ পরিত্যাগ করিয়া বধূবেশ পরিধান করে। তাহার পর আত্মীয়স্বজন ও পিতামাতার নিকট হইতে অশ্রুজলে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিবাহের সমস্ত যৌতুক ও উপঢৌকনাদি সঙ্গে লইয়া স্বামীর সহিত স্বামীগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

দিদি

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সেদিন আর সুষমা চারুর নিকটে ঘেঁসিল না। বৈকালে চারু ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে বলিল "কই দিদিতো সমস্ত দিনেও এলেন না। তুমি তাঁকে একবার ডাকৃতে পাঠাও না?"

"কেন, তোমার কি কিছু অসুবিধা হচ্চে চারু? আমি তো আজ সমস্ত দিন বাইরে যাইনি। এইখানেই আছি। কি চাই বল না?"

চারু বিষম অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "না তা না, চাইনে তো কিছু।"

"একখানা বই টই কিছু পড়ব।"

"না, তুমি এমনি গল্প কর।"

রাত্রে চারুর জ্বর ছাড়িয়া গেল। সমস্ত রাত্রি চারু বেশ ঘুমাইল। প্রভাতে অমরনাথ বলিল "আর তো এখন কিছু অসুখ নেই? এই বইখানা নিয়ে পড় শুয়ে শুয়ে। আমি বাইরে চল্লাম। দশটার সময় এসে আর একটা পিল দেব। কিছু অসুখ কল্লে ডেকো।"

চারু অভিমান করিয়া বলিল "আমি বুঝি কাল তোমায় সমস্ত দিন ধরে রেখেছিলাম? যাওনি কেন বাইরে? আমি তো ডাকিনি।"

চারুর অভিমানস্ফুরিত গণ্ডে একটু মৃদু টোকা মারিয়া অমরনাথ চলিয়া গেল। চারু শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ পারিল পড়িল। আর মধ্যে মধ্যে একএকবার সচকিত ভাবে দ্বারের পানে চাহিতেছিল যদি কেহ আসে।

বহুক্ষণ পড়িয়া কেমন মাথা ব্যথা করিতে লাগিল। তখন পুস্তক ফেলিয়া চারু চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

নিকটে কেহই নাই। যথাসম্ভব উচ্চকণ্ঠে একবার ডাকিল 'দিদি'। কেহ আসিল না। অভিমানে চারুর চোখে জল ভরিয়া উঠিল।

বিন্দি ঝি কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল "ছোটবৌদি, ডাকছ? বার্লি কি এখন এনে দেব?" চারু একটু বিস্মিত হইল, কেননা ঝিদের এত কর্ত্তব্যবুদ্ধি এতদিন তো কই দেখা যায় নাই। বলিল "আমি বার্লি খাবনা।"

"খাবে না সেকি? না খেলে কি হয়! আনি গে।"

"না আমি খাব না। যাও তুমি, আমার কাছে কাউকে আসতে হবে না।"

অপ্রস্তুত ও রুষ্ট ভাবে ঝি চলিয়া গেল। চারু বইখানা আবার টানিয়া লইয়া পড়িতে গেল, পারিল না, বড় মাথা ব্যথা করিতেছিল। এক হাতে মাথা টিপিতে টিপিতে অন্য হাতে বই খুলিয়া চারু পড়িবার চেষ্টা পাইতে লাগিল; একা সে যে থাকিতে পারে না। "মাথা ধরেছে তাও বই পড়া হচ্চে?" চারু সচকিতে মুখ তুলিয়া দেখিল গৃহমধ্যে বার্লির বাটী হাতে করিয়া প্রসন্নহাস্যে শোভান্বিতা সুরমা দাঁড়াইয়া আছে। দেখিবামাত্র চারুর অভিমান দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। বইখানা দুই হাতে ধরিয়া তাহার অন্তরালে যথাসাধ্য মুখ লুকাইয়া ফেলিল।

"আবার বই পড়ছ? রেখে দাও। ওতেই আরও মাথা বেশী ধরে।"

চারু পূর্ব্ববৎ রহিল। সুরমা ব্যাপার বুঝিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বইখানা টানিয়া লইয়া বলিল "রাগ হয়েছে বুঝি? বার্লিটুকু খাও দেখি।"

"না, আমি খাবনা।"

"আর রাগে কাজ নেই। ওঠ, জুড়িয়ে হিম হয়ে যাবে। ওঠ—"

চারু উঠিয়া বসিয়া ভাল ছেলের মত সুরমার আজ্ঞা পালন করিল। মুখের জলটা মুছাইয়া দিয়া সুরমা তাহার পানে চাহিয়া সস্নেহ হাস্যে বলিল "এত রাগ করেছিলে কেন? কি হ'য়েছে?" চারু মুখ ভার করিয়া রহিল।

"বল্‌বে না?"

"কাল সমস্ত দিন তুমি আসনি কেন!"

"ওঃ এই জন্যে? আমি বলি না জানি কি।"

সুরমাকে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিতে দেখিয়া চারুর অভিমান আরও বাড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ডাগর চক্ষে অশ্রু ছাপাইয়া উঠিয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সুরমা দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত কণ্ঠে বলিল "সত্যি সত্যি কাঁদ্‌লি চারু?"

চারু মুখ সরাইয়া লইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। বিস্ময়ের কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে সুরমা জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া পালঙ্কে চারুর পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। অন্যমনস্কভাবে তাহার উজ্জ্বল আয়ত চক্ষে গবাক্ষপথে চাহিয়া কত কি যে ভাবিতে লাগিল তাহা সেই বলিতে পারে। একবার অস্ফুটকণ্ঠে বলিল "এমন কিন্তু কখনও দে'খিনি,—ভাবতেও পারিনি!"

অনেকক্ষণ অতীত হইল। কেহ কাহারো সহিত কথা কহিলনা। চারু কয়েকবার চাহিয়া চাহিয়া দেখিল সুরমা ম্লান গম্ভীর মুখে গবাক্ষপথে চাহিয়া আছে। তাহার মনে হইল নিশ্চয় দিদি রাগ করিয়াছে। ধীরে ধীরে নিকটে সরিয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল "দিদি।"

অন্যমনস্কভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া সুরমা উত্তর দিল "কেন?"

"রাগ কর্‌লে দিদি?"

সুরমা মুখ ফিরাইয়া উজ্জ্বল চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "কেন করব না? আমাকে এ রকম অপদস্থ করা কি তোমার উচিত? তোমার কি একটু বোঝা উচিত নয়? তোমার এ কী ছেলেমানুষী—এ কী খেলা? আমি তোমার কে তাকি তুমি জান না? আমাকে—" সহসা সুরমার উত্তেজিত স্বর থামিয়া গেল। দেখিল চারুর ম্লান মুখশ্রী একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে; ভীত দুর্ব্বল চারু একহাতে খাটের রেলিং চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে সুরমারই স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সুরমা তাহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিল। পাখা লইয়া ত্রস্তে বাতাস করিতে করিতে ভীতকণ্ঠে ডাকিল "চারু, চারু!"

চারু ক্রমে নিজেকে সামলাইয়া লইল। চোখ বুজিয়া উত্তর দিল "দিদি!"

"আমি বড় খারাপ লোক। আর বক্‌ব না, চারু! আর তোমায় কিছু বল্‌ব না।"

বালিকার মত ফুকরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া চারু বলিল—"তুমি কেন রাগ করলে দিদি? আমি তো কোন দোষ করিনি।"

চারুর চোখ্ মুছাইয়া দিতে দিতে রুদ্ধস্বরে সুরমা বলিল, "চুপ কর্—চুপ কর দিদি!—তোমার দোষ? দোষ তোমার কাছে কখন ঘেঁস্‌তেও পারেনি বোধ হয়। দোষ আমার,—আর কার বল্‌ব? নইলে তোমার সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধ কেন হ'ল।"

"কি সম্বন্ধ দিদি?"

"কিছু না। তুই এখন একটু ঘুমো দেখি।"

"ঘুমুলে তুমি উঠে পালাবে না?"

"না। তোর সঙ্গে আমার কিছুদিন থাকার দরকার দেখ্‌ছি। তোর কাছে থাক্‌লে আমার মনের এ কয়লার কালোও বোধ হয় ফর্সা হয়ে উঠ্‌বে। যত দিন তা না হয়—তোকে আমি একটা কথা বল্‌ব তা রাখিস্ যদি তবেই আমি সব সময় তোর কাছে থাক্‌ব—বল রাখ্‌বি?"

"রাখ্‌ব!"

"নিশ্চয়?"

"নিশ্চয়!"

সুরমা একটু থামিয়া একবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল "কখনো স্বামীর—তোর স্বামীর কাছে আমার সম্বন্ধে কোন কথা গল্প করতে পাবি নে।"

"তোমার সম্বন্ধে কি কথা?"

"যে কথাই হোক্ না কেন, যাতে আমার সংস্রব আছে। যেমন, আমি তোর সঙ্গে কি কথা কই, কি ব্যবহার করি, কখন তোর কাছে আসি, বা তুই কখন আমার কাছে থাকিস্। এই সব?"

চারু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল "কেন দিদি?"

"সে যে জন্যেই হোক্ না—তুই এখন আমার কথা রাখ্‌বি কি না?"

নিতান্ত ক্ষুণ্ণস্বরে চারু বলিল "আচ্ছা।" তার পরে একটু ভাবিয়া বলিল "যদি তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করেন?"

সুরমা বলিল "কখনো তা জিজ্ঞাসা করেছেন কি?" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চারু ভীত ভাবে বলিল "না।"

"তবে কখনো করবেন না। যদি কখনো করেন তো তখন যা করা উচিত তা ভেবে দেখা যাবে। যাক্ এখন শুয়ে শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি। আমি এখন যাই।"

চারু ব্যস্ত ভাবে বলিল "না দিদি, ব'স না কেন।"

"তোর বর যে এখনি আস্‌বে।"

"তা এলেনই বা।"

"এই বুঝি তোমায় এতক্ষণ ধরে বোঝালাম? ঐ বুঝি আসছেন।"

চারু ব্যস্তভাবে বলিল "যদি জিজ্ঞাসা করেন কাছে কে ছিল?"

সুরমা অন্য কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল "বলিস্ বিন্দি। না হয় কিছু বলিস্ নে—সে জিজ্ঞাসা করবে না।"

"যদি করেন—ওদিদি—বলে যাও—দিদি—"

দিদি ততক্ষণ সে মহল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। অমরনাথ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল "কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে—বিন্দির সঙ্গে বুঝি?"

চারু নীরবে রহিল। ভয় হইল, যদি স্বামী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন?

"কেমন আছ? মাথাটাথা ধরেনি তো আর?" বলিতে বলিতে অমরনাথ তাহার শীতল ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল। "না বেশ ঠাণ্ডা আছে।" একটা পিল লইয়া অমরনাথ চারুকে সেবন করাইয়া বলিল "আমি এখন নাইতে যাচ্চি। বিন্দিকে ডেকে দিয়ে যাব নাকি?"

অমরনাথ বেশী তত্ত্বানুসন্ধান না করায় মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চারু বলিল—"বিন্দি ঝিকে?—আচ্ছা দাও।"

অমরনাথ চলিয়া গেলে অনতিবিলম্বে বিন্দি ওরফে বৃন্দাবলী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। "বাতাস করব কি বৌদিদি?"

"না—তুমি ব'স। আমি গল্প করব। দিদি কোথায় গেলেন জান?"

"রান্নাবাড়ীর দিকে গেছেন হয়ত।"

"কখন আসবেন?--তুমি ততক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প কর না।"

"কি গল্প বল্ব? শোলোক?"

"না। তোমাদের দেশের গল্প কর।"

"আমাদের দেশের কিই বা গল্পের মত আছে বৌদিদি। তার চেয়ে তোমাদের কল্‌কাতার গল্প কর। তুমি কল্‌কাতার মানুষ—এখানে কি মন বসে না ভাল লাগে?"

"না বিন্দু ঠাকুঝি—কল্‌কাতার চেয়ে আমার এইখানেই ভাল লাগে। সেখানে আর কেইবা ছিল—সেখানে ভাল লাগ্‌বার মত কিছুই ছিল না—"

"ওমা সেকি—এই বলে মস্ত সহর—তা মানুষ নেই? এই আমাদের এখানে কত বউ ঝি সব দোপোর বেলায় বড় বৌদির কাছে আস্‌ত--গল্প করত্‌--তাস খেল্‌ত।"

"কই আমি এসে তো কিছুই দেখ্‌তে পাইনে? আর বুঝি তারা আসে না?"

"আর কার কাছে আস্‌বে। যার কাছে আস্‌ত তিনি আর ওসবে মেশেন না কাজেই আসে না।"

"কেন, মেশেন না কেন? তুমি তাদের আসতে ব'লো আমি সুদ্ধ দিদির সঙ্গে তাদের সঙ্গে বসে খেলা করব——তারা আস্‌বেনা?"

বিন্দি ঘাড় কাত করিয়া বলিল "আস্‌বে বই কি—বল্লেই আস্‌বে।"

"দিদিকে তোমরা খুব ভালবাস, না? তিনি আমায় ভারি আদর করেন, কত ভাল বাসেন—তিনি বড্ড ভাল লোক—না ঠাকুঝি?"

বিন্দি তখন সাড়ম্বরে আরম্ভ করিল—"বড় বৌদির কথা বল্‌ছ ছোট বৌদি! ওঁর বা কতটুকুই তোমরা জান, আমরা ওঁকে বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেছি—সেই থেকে ওঁর বুদ্ধি বিবেচনা দয়ার কথা কত বা একমুখে বল্‌ব। কর্ত্তাবাবুর তো উনি প্রাণ ছিলেন, তিনি 'মা' 'মা' করে একেবারে গলে যেতেন। ওঁরই কর্ত্তাবাবুকে বা কত ছেদ্দা ভক্তি, ঠিক ছেলের মতন যত্ন করা—এমন কেউ পারবে না—" ইত্যাদি ইত্যাদি বহুক্ষণ চলিতে লাগিল। চারুও সাগ্রহে একান্ত মনোযোগের সহিত তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া অত্যন্ত আরাম বোধ করিতে লাগিল। সুরমার কখনো শান্ত স্নিগ্ধ স্নেহপূর্ণ, কখনো তীব্র তেজঃপূর্ণ নিতান্ত নিঃসম্পর্কের মত, ব্যবহার মধ্যে মধ্যে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিত। কখনো তাহাকে দেখিলে তাহার উদার একান্তসহানুভূতিময় ব্যবহার, স্নেহকরুণার উৎসের ন্যায় মুখ ও স্নেহকণবর্ষী আয়ত চক্ষু দেখিলে তাহাকে নিতান্ত আপনার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদের মত জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করে; আবার কখনো তাহার গম্ভীর অস্বাভাবিক জ্যোতিপূর্ণ চক্ষু দেখিলে অকারণেও ভীত হইয়া পড়িতে হয়। এ প্রহেলিকা চারুর নিকট অত্যন্ত নূতন। একটা মানুষ যে ক্ষণে ক্ষণে এমন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ইহা তাহার সংস্কারের অতীত। রাগ বা অসন্তুষ্ট হইলে লোকে বড়জোর মুখ ভার করিয়া পাশ ফিরিয়া বসে এই পর্য্যন্ত তাহার বিশ্বাস। রাগ না হইলেও লোকে যে কিরূপে এত গম্ভীর হয় এবং গম্ভীরই বা কেন হয় ইহা তাহার বুদ্ধির অতীত। সুরমাকে অমরনাথের পরই পৃথিবীতে একমাত্র আপনার বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছে এবং তাহার মত সরলা এবং সাংসারিকবুদ্ধিলেশমাত্রহীনার এ ধারণা হওয়াও স্বাভাবিক, কেননা সে ইতিপূর্ব্বে মাতা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনও কখনো দেখে নাই বা তাহাদের ভালবাসাও কখনও পায় নাই। সুরমাকে দিদি জানিয়া মাণিকগঞ্জে আসিবার সময় হইতে তাহার স্নেহাকাঙ্ক্ষী মন তৃষিত হইয়াছিল। তাহার পরে শ্বশুরের সস্নেহ আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সুরমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করায় সেও একান্ত বিশ্বস্ত চিত্তেই সুরমার উপরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। চারুদের সেখানে পদার্পণ করার পরে সুরমার ব্যবহারে ও শ্বশুরের প্রতি ক্লান্তিশূন্য আন্তরিকতাপূর্ণ যত্নে চারুর নিকটে সুরমা সত্যই দেবীর আসনে বসিয়াছিল। সুরমার প্রতি শ্বশুরেরও শ্রদ্ধাসূচক বাক্যে চারুর সে ভক্তি অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এরূপ দৃশ্য চারুর নিকট অত্যন্ত নূতন! এই কার্য্যকুশলা, স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, করুণাময়ী যে তাহার আপনার কেহ ইহা মনে করিয়া তাহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইত। তাই সময়ে অসময়ে কাজে অকাজে কারণে অকারণে বড় আনন্দে সে ডাকিত 'দিদি'।

তাহার পরে শ্বশুরের দেহান্তে সুরমার ব্যবহারে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একি! কাল যে এমন সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছে, আজ তাহার একি পরিবর্ত্তন? কিসে এমন হইল ভাবিয়া চারু আকুল হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে স্বামীকে সে কারণ জিজ্ঞাসা করিত, স্বামী গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকিতেন। চারু অগত্যা নীরব হইয়া পড়িত এবং সুরমার নৈদাঘ মেঘের মত মুখকান্তি দেখিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইতেও সাহস হইত না।

আজ চারু তাই তাহার দিদিকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সুরমার অন্তকার ব্যবহারও অধিকতর নূতন, এতখানি স্নেহ যে তাহার মধ্যে আছে ইহা যেন চারুও আর আশা করিতে পারিতেছিল না। তাই তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা করিতেও তাহার অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ হইতেছিল। বিন্দির মুখে তাহার শ্বশুরের সময়কার সংসারের সমস্ত অবস্থা ও কার্য্য শুনিতে শুনিতে তাহার মানস নেত্রে যে একটী সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল সে চিত্র শুধু সুখময় শান্তিপূর্ণ অনাবিল স্নেহমাখা। চারু জ্ঞানে পিতাকে দেখে নাই এবং কন্যাস্নেহ বা পিতাকে কতখানি ভালবাসা যায় তাহাও জানেনা, তাই এই চিত্র তাহার বড় ভাল লাগিল। আবার এই চিত্রের মধ্যে সুরমাই যেন প্রধান নায়িকা। চারু গর্ব্বে, আনন্দে, উৎফুল্ল হইয়া বলিল "দিদি আমায়ও খুব ভালবাসেন বিন্দু ঠাকুর্ঝি।"

সেই সময়ে অমরনাথ কক্ষে প্রবেশ করায় চারু মাথার কাপড় টানিয়া দিল। অগত্যা বিন্দি দাসী বাক্যস্রোত বন্ধ করিয়া ও ব্যজনী রাখিয়া উঠিয়া গেল। অমরনাথ সহাস্য মুখে বলিল—"এত গল্প হচ্চে কিসের? বিন্দুর সঙ্গে বেশ ভাব করে নিয়েছ দেখ্‌ছি যে।" চারু উৎফুল্ল মুখে সাগ্রহে বলিল "আমরা দিদির গল্প কচ্চিলাম।" অমরনাথ একটু নীরব হইল। বারে বারে একজনের কথা সম্মুখে উত্থাপিত হইলে সব কথার মধ্যে উদাসীন থাকাও যায়না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমরনাথ বলিল—"গল্প করবার মত এমনি কথা নাকি?"

"সে গল্প নয়! এমনি এ ও তার কথা। দিদি বড় ভাল লোক, নয়?"

অমরনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল "আমি তা কেমন ক'রে জানব?"

"সবাই জানে আর তুমি তা জাননা? দিদিকে সবাই খুব ভালবাসে। বাবা ভারী ভাল বাস্‌তেন, দিদিকে তিনি মা ব'লে ডাকৃতেন।"

অমরনাথ একটু নীরব থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল "তা জানি।"

"দিদির বাবা দিদিকে কতবার নিতে এসেছেন তা বাবার কষ্ট হবে বলে, আর পাছে সংসার বিশৃঙ্খল হয় বলে তিনি দুদিনের জন্যেও কোথাও যেতেন না।"

অমর অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু হাসিয়া বলিল "আমি বলি না জানি কত নিরীহ দৈত্য দানবদের ঘাড়ে যত আজগুবি কাণ্ডের দায়িত্ব চাপিয়ে কত নতুন নতুন ঘটনাই শুনছ—"

চারু সে কথা কানে না তুলিয়া পূর্ব্বের মত বলিয়া যাইতে লাগিল "দিদি চাকর চাকরাণীদের পর্য্যন্ত খুব ভালবাসেন। বিন্দু ঠাকুর্ঝি কত যে গল্প কচ্ছিল। আর তাঁর মতন সংসারের হিসেব করতে, সকলকে যত্ন করতে, কাজ কর্ম্ম করতে কেউ জানেনা।"

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল "তবে আমার চেয়েও তুমি বেশী জান বল। আমি তো দেখ্‌ছি তার সম্পূর্ণ উল্টো। যাক্ এখন তুমি কেমন আছ বল দেখি? কোন অসুখ বোধ হচ্চে না তো?"

"না বেশ ভাল আছি। আচ্ছা তুমি উল্টো কি দেখ্‌লে বলছ?"

"থাক্ আর ওসব কথায় কাজ নেই। কি পড়লে দেখি?"

"না তা হবেনা। কাকে উল্টো দেখ্‌লে বল।"

"এই তোমার দিদির কথা যা বলছিলে। আগে তিনি ঐ রকমই ছিলেন চারিদিকে শুন্‌তে পাই, কিন্তু চাক্ষুষে যা সব দেখছি তাতে উল্টোই তো বোধ হয়।"

"চাক্ষুষে কি দেখছ? বলনা—বল্‌তেই হবে তোমায়—নইলে বই কেড়ে নেব।"

অমরনাথ পুস্তকে মন দিবার চেষ্টা করিতেছিল। পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল "তিনি এখন তো কোন কিছুই দেখেন না। সংসারের সঙ্গে সম্পর্কই

ছেড়ে দিয়েছেন। সে জন্যে সংসারে ভারী বিশৃঙ্খলা হয়েছে। কাকা তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌তে বলাতে আমি সেদিন বল্‌তে গিয়েছিলাম তা—"

"তা—কি? দিদি কি বল্লেন?"

"সে সব তুমি ছেলে মানুষ বুঝবেনা। মোট কথা এই যে তিনি মনে করেন এখন আর তাঁর সঙ্গে কারু—অর্থাৎ সংসারের কোন সংশ্রবই নেই। সংশ্রব রাখ্‌তেও তিনি অনিচ্ছুক।"

চারু বিস্মিতভাবে বসিয়া রহিল। আবার তাহার নিকটে সুরমা অত্যন্ত প্রহেলিকা হইয়া উঠিতে লাগিল। জোর করিয়া সে ভাবটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চারু বলিল "তা হোক, আমায় তিনি কিন্তু খুব ভাল বাসেন।"

অমরনাথ মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত ভাবে রহিল। নিতান্ত অসঙ্গত স্থানে বেমানান একটা কথা শুনিলে লোকে যেমন থম্‌কিয়া যায় সেইভাবে কিছুক্ষণ বাক্‌হীনভাবে থাকিয়া শেষে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "তা' হবে!"

চারু বুঝিল না। উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমার মাথা ধরেছিল বলে কত মাথা টিপে দিতে লাগ্‌লেন, বড্ড নরম হাত, আর কত ঠাণ্ডা। তাঁর কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে আমার মাথা যেন তখনি ছেড়ে গেল। আমিও আমার দিদিকে খুব ভালবাসি।"

অমরনাথ মনে মনে সত্যই বিস্ময়ান্বিত হইয়া উঠিতেছিল —একি রহস্যচিত্র তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। এ যে নিতান্ত আরব্য-উপন্যাসের গল্প। অমরনাথ জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার কাছে তো আমিও তোমায় খুব ভালবাসি। তোমার মতন লোককে ভালবাসা বোঝান যা শক্ত তা আমার তো বেশ জানা আছে—"

"কেন আমি কি কিছু বুঝ্‌তে পারিনে? এত বোকা আমি?—আচ্ছা সত্যি কি তুমি আমায় খুব ভালবাস না? সত্যি ক'রে বল। না বল ভেবে দ্যাখ।"

অমরনাথ একটু গম্ভীরভাবে রহিল। তারপর সপ্রেম হাস্যে চারুর গাল দুটী টিপিয়া ধরিয়া বলিল "এই যে দিব্যি বুদ্ধি হয়েছে দেখছি। বল্‌তেও শিখে ফেলেছ।"

"আমি ভালবাসাটাও বুঝ্‌তে পারি না তুমি এত বোকা ভাব আমায়?—আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি দিদিও আমায় খুব ভালবাসে।"

"তোমার মত লোকই সুখী চারু। তুমি কখনো দুঃখ পাবে না।"

"কেন?"

"অতি সহজে নিজের মত সবাইকে করে নিতে পার।"

"তবু বল্‌বে? আমি বুঝ্‌তে পারি কি না তোমায় শোনাচ্চি দাঁড়াও। এই শোনো—দিদি কিন্তু তোমার ওপরে একটু রাগ ক'রে আছেন।—"

অমরনাথ সজোরে হাসিয়া বলিল "সত্যি নাকি? বড্ড আবিষ্কার করেছ যাহোক্ এবার। না, তোমার বুদ্ধি আছে তা আর অস্বীকার করবার যো নেই।"

"কেবলি ঠাট্টা! নইলে দিদি তোমায় কেন ওরকম বল্লেন বল্‌তে পার?—" বলিতে বলিতে চারুর সহসা মনে পড়িল সুরমা তাহাকে কি নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। একদিনও সে কথাটা সে রাখিতে পারিল না বলিয়া চারু সহসা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও ভীত হইয়া পড়িল।

অমরনাথ ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিল "কি কথাটা?"

চারু ভীতস্বরে বলিল "আর বল্‌ব না। দিদি শুন্‌লে আমার ওপরেও হয় তো খুব রাগ করবেন।"

"তা তো করবেই। আমায় যদি কিছু বলে থাকে— তা শোন্‌বার আমার এমন জরুরি দরকার ছিল না কিন্তু তুমি আজ এইসব কথা ছাড়া আর যে কিছু কইবে এমন সম্ভাবনা তো দেখ্‌ছি না—"

চারু বাধা দিয়া বলিল "না তা না, তোমায় কিছু নয়, দিদিরই কথা—"

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে অমরনাথ বলিল "আর না চারু— আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। দুটো একটা অন্য কথা থাকে তো বল। একটু হার্ম্মোনিয়মটা বাজাই, শোন—"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ নিজে সংসারে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে না পারিয়া এবং কতকটা সুরমার উপর অভিমান করিয়া তারিণী-

চরণকে ডাকিয়া সংসারের ভার দিল। তারিণীচরণের কর্ম্মকুশলতার প্রতি তাহার অগাধ বিশ্বাস। তারিণী আসিয়া কর্ত্তার শ্যালকের উচ্চ পদবীর দায়িত্বপূর্ণ অধিকার জাঁকাইয়া সাব্যস্ত করিতে লাগিয়া গেল। এবং তাহাতে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সংসারের চাকর দাসী আত্মীয়-স্বজনরা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তারিণী এমনি রাশভারী কর্ত্তব্যপরায়ণ মজবুত লোক।

ভিতরে এইরূপ গণ্ডগোল। সহসা একদিন সুরমা শুনিল বৃদ্ধ শ্যামাচরণ রায় হিসাব নিকাশ পরিষ্কার করিয়া অমরের নিকট বিদায় লইয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন। সুরমার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিয়া যান্ নাই। স্তম্ভিত সুরমা ভাবিল, "আর নয়—কর্ণধারহীন নৌকা এইবার ডুবিবে।"

অমর কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া তারিণীর সাহায্য চাহিলে তারিণী বলিল, "ভয় কি? আমি এসব কাজ খুব ভাল পারি। যত পুরোণো লোকগুলো একদিক থেকে তাড়াতে হবে! অনেক দিন ধরে ক্ষমতা হাতে থাকায় তাদের ভারি আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে!—"

সন্দিগ্ধচিত্তে অমর বলিল, 'তাইত'। প্রভাতে তারিণী আসিয়া সংবাদ দিল নূতন ব্যবস্থা জারি করিতে গিয়া সে দেখিল সকলের উপরে বড়বধূঠাকুরাণীর নাম-আঁকা পতাকা উড়িতেছে! সহসা আজ বড়বধূঠাকুরাণী সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব হাতে লইয়াছেন। তবে আর তাহাকে দরকার কি?"

কিন্তু এ নালিশে উল্টা ফল হইল। অমর সাগ্রহে বলিল, "সত্য নাকি? তিনি ভার নিয়েছেন? আঃ বাঁচা গেল—পুরুষে গৃহস্থালীর কি জানে ভাই—আর তুমিও তো নতুন লোক।"

অভিমানে ফুলিয়া তারিণী বলিল, "তবে বিষয় কাজেও তো তাই।"

এমন সময়ে সুরমাকে সহসা সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সুরমা অসঙ্কোচে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "তুমি নতুন লোক, এখানকার কিছু জান না সত্য কিন্তু তবু তুমি আপনার লোক—তুমি দাওয়ানের পদ নাও—যদি কিছুর সাহায্য দরকার হয় আমি বলে দিতে পারব—বাবা কাকা আমায় সমস্ত জানাতেন, সেজন্যে আমি অনেকটা জানি।"

স্ত্রীলোকের কর্ত্তৃত্বের অধীনে তাহাকে দাওয়ানি পদ গ্রহণ করিতে হইবে! তারিণী বিরক্তভাবে অমরের পানে চাহিল। অমর কিন্তু যেন অধিকতর বিস্মিত আনন্দিত ও ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, "তা'হলে তারিণী আর তোমার কোন আপত্তি নেই।"

সুরমা তারিণীকে বলিল "তোমার আপত্তি আছে?"

তারিণী মাথা নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"না", কিন্তু মনে মনে বলিল "তোমার ক্ষমতা কিছু কমানো দরকার।"

সুরমা চলিয়া গেল। তারিণীও কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করিল। অমরনাথ সহসা সুরমার এই পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইয়াছিল। ভাবিল "এর অর্থ কি?"

সংসার বেশ সুনিয়মে চলিতে লাগিল। বিষয়কার্য্যে তারিণী সাহায্য চাহিত না, তথাপি সুরমা অযাচিতভাবে তাহাকে উপদেশ দিত। নিরুপায় তারিণী নীরবে সহ্য করা ভিন্ন উপায় দেখিল না।

চারু এখন যেন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। তাহার সাজসজ্জা হইতে গৃহসজ্জা পর্য্যন্ত যেন নূতন রুচির পরিচয় দিতেছে। নূতন নূতন শিল্পশিক্ষা, লেখাপড়ার চর্চ্চা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নূতন কার্য্যে সে একান্ত মনে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে। অমরনাথ দাতব্য চিকিৎসায় নিজের অধীত বিদ্যার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে বন্দুক ঘাড়ে শীকার করিয়া আসিয়া চারুকে তাহার কার্য্য হইতে যে সময়ে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয় সে সময়টিই চারুর যা বিশ্রামের কাল। সুরমা অমরের সঙ্গেও পূর্ব্বের মত নিঃসম্পর্ক ব্যবহারে আর চলে না। তবে চারুর নিকটে সে যেমন অকুণ্ঠিত-ভাবে আপনাকে ছাড়িয়া দেয় সেখানে সেরূপ নয়। যখন বৈষয়িক কোন গোলমাল উপস্থিত হয়, কোন বিশৃঙ্খলা হয় বা অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রয়োজন হয় সেই সময়েমাত্র সুরমা অকুণ্ঠিতভাবে অমরের সহিত সে বিষয়ের আলোচনা করে, অন্যথা গৃহিণীপণা ও চারুকে লইয়াই তাহার সময় কাটে। বিষয়েরও ক্রমশ উন্নতিই দেখা যাইতেছিল। চারিদিকে সুশৃঙ্খলা! যে ক্ষণেকের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে এতবড় সংসারটার উচ্ছৃঙ্খল গতি নিপুণ কর্ণধারের মত ফিরাইতে

পারে তাহার ক্ষমতা এমন কোন অন্ধ ব্যক্তি নাই যে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে। বিশেষতঃ অমর যে বিষয়ে অত্যন্ত অক্ষম। সুরমাকে এখন সে মনে এবং বাহ্যতও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত মান্য করিয়া চলে। অমর কিছুদিন পূর্ব্বে সুরমার সম্বন্ধে যেরূপ মনোভাব বহন করিয়াছিল তাহা মনে পড়িলে এখন সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে!—সুরমার উল্লেখমাত্রে তাহার মস্তক এখন সসম্মানে অবনত হইয়া আসে - যেখানে আত্মগ্লানি সেখানে শ্রদ্ধাও বেশী।

দ্বিপ্রহরের বিরামসুখের অবসরে চারু ও সুরমা দুইজনে বসিয়া নিপুণভাবে শিল্পকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল। নিকটে দোলনার ফুল্লকুসুমতুল্য শিশু ঘুমাইতেছিল। চারু অগ্র চারিমাস হইল একটী পুত্র প্রসব করিয়াছে।

সুরমা বলিল "আর পারিনে, চারু তুই এটুকু শেষ কর।"

"না তা হবে না দিদি—তাহলে হয়ত ভাল হবে না।"

"বেশ হবে। খোকা উঠেছে আমি ওকে নি, তুই বোন্।"

"আঃ একটু কাঁদুক না দিদি—শেষটুকুতেই তোমার যত আলিস্যি।"

সুরমা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিল। চারু অভিমানে বলিল "তবে আমিও কর্‌ব না।"

"আচ্ছা রেখে দে—কাল হবে। খোকাকে একটু মাই দে দেখি।"

"তুমি কেবল আমায় একটা-না-একটা ফরমাস্ করবেই।"

"আচ্ছা তবে বল্‌ব না—যাও তোমার ঘরে যাও।"

চারু হাসিয়া ফেলিল "তাই বুঝি? তিনি শীকারে গেছেন।"

সুরমাও মৃদু হাসিয়া বলিল "এক শীকারে তো এই হরিণটি ধরে এনেছেন আবার কি শীকারের চেষ্টায়?"

"আমি বুঝি হরিণ? তবে এবার একটা বাঘ ধরে আন্‌বেন হয়ত।" নিজের কথায়, চারু নিজেই অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। সুরমা একটু গম্ভীরভাবে বলিল "বাঘ তো ঘরেই আছে—একটা ফেউ হলে ঠিক হ'ত।"

চারু বুঝিতে পারিল না। "বাঘ? ও—চিড়িয়াখানার বাঘটা বুঝি? তা ফেউ কি হবে? সে বাঘ তো কাউকে কিছু বলে না—মানুষকে কি জন্তুকে সতর্ক করতেই না ভগবান ফেউ করেছেন!"

"তাকে যে খাঁচায় পূরে রেখেছ!—নইলে সে শীকারীর ঘাড় ভাঙ্‌তে হয়ত।"

"তা সে বাঘটাকে তো আমাদের শীকারী ধরেনি, সেটা যে কেনা বাঘ।"

"তা বটে।" বলিয়া সুরমা খোকাকে আদর করিতে লাগিল। চারু আলস্যে শুইয়া পড়িয়া বলিল "কিচ্ছু ভাল লাগ্‌ছে না দিদি। সেই ভোরে গেছেন, শীকার কি ফুরোয় না?"

সুরমা নিদ্রিত শিশুকে পুনরায় শয্যায় শোয়াইয়া বলিল "এখনি কি! আগে সন্ধ্যা হোক্, না খেয়ে নাড়ী চুঁইয়ে যাক্, মুখময় কালীর দাগ পড়ুক—তবে তো।"

"দেখ দিখি অন্যায় দিদি। তুমি একটু বারণ কর না কেন?"

"এইবার ঠিক্ কথা বলেছ!—সে বারণ একেবারে অকাট্য!"—বলিয়া সুরমা সেলাইটা পুনর্ব্বার হাতে তুলিয়া লইল। চারুর এখন অনেকটা জ্ঞান হইয়াছে। সুরমার কথায় সে ব্যথিত হইল। কিন্তু কি বলিবে উত্তর না পাইয়া নীরবেই রহিল। চারুকে নীরব দেখিয়া সুরমা হাসিমুখে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "রাগ কল্লে নাকি?"

"তুমি মধ্যে মধ্যে এমন একএকটা কথা কেন বল দিদি?"

"কি জানি? আমার ওটা স্বভাব চারু—আমি চিরকাল কুঁদুলে।"

"আমি কি তাই বল্‌লাম।"

"না বলিস্ দেখ্‌তে পাস্‌নে? এই তোর সঙ্গে এক প্রস্তুত হয়ে গ্যাল। আমি ছোটবেলায় আমার বাবার সঙ্গে কি করে ঝগড়া কর্ত্তাম শোন্।"

"তোমার বাবা! আচ্ছা দিদি তোমার বাপের বাড়ী যাবার জন্যে মন কেমন করে না!"

"না।"

"আমার যদি কেউ থাকৃত আমার কিন্তু করত দিদি।"

"বলেছিই তো আমি এক রকমের মানুষ! এখন ঝগড়ার কথা শোন।" চারুকে ব্যথা দিয়াছিল বলিয়া

অনুতপ্তা সুরমা গল্পটাকে নানারকমে ফেনাইয়া তাহার ক্লিষ্ট মনটিকে উৎফুল্ল করিতে চেষ্টা করিল। বর্ণনার ধুমে চারু হাসিয়া গড়াইতে লাগিল।

"ব্যাপার কি—এত হাসি—" উভয়ে আত্মসংবরণ করিয়া দেখিল সম্মুখে অমরনাথ। চারু চকিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কখন এলে?"

"খানিক আগে। এত হাসির কারণটা কি? সিঁড়ি থেকে হাসি শোনা যাচ্ছিল, ব্যাপার কি?"

"ও এমনি একটা গল্প শুনে। দিদি, উঠ্‌ছ কেন?"

"খাওয়াটার বুঝি দরকার নেই?"

বাধা দিয়া অমর বলিল, "খাওয়া যথেষ্ট হয়েছে—এখন আর কিছু খাব না।"

"তবে আর কি—ব'স দিদি।"

অমর ও চারুর এরূপ গল্পগুজবের মধ্যে সুরমা কখনো বসিত না এবং তাহারাও অনুরোধ করিতে সাহস করিত না। আজ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সুরমার একটা অতর্কিত কথা উচ্চারণে চারু ব্যথিত হইয়াছিল, এখন সহসা সে এই অনুরোধ করায় আবার তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে সুরমার মন উঠিল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আর কখনো এমন অসতর্ক ভাবে থাকিবে না। চারু অমরকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "বোস না।"

সুরমার বিপন্ন ভাব অমর বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সেও ইতস্ততঃ করিতেছিল। এক্ষণে চারুর কথায় উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা বসিয়া পড়িল। সুরমা ঘুমন্ত শিশু টানিয়া কোলে লইল।

"কি শীকার কল্লে? দিদি বল্‌ছিল ফেউ ধরে আন্‌বে।"

"ফেউ?"—ঈষৎ হাসিয়া অমর বলিল, "কি রকম? ফেউ কেন?"

"আমি নাকি হরিণ! খাঁচার বাঘটা যদি কাউকে ধরে তাই ফেউটা নাকি আমাদের সতর্ক করে দেবে।"

"তুমি হরিণ আর আমি? বরাহ টরাহ নাকি?"

"তুমি তো শীকারী।"

"তা সে বাঘটা খাচায় আছে—তাকে এত ভয় কেন হঠাৎ?"

বিপদ দেখিয়া সুরমা ত্রস্তে বলিয়া ফেলিল, "না না সে কথা হয় নি? চারু এক বুঝতে আর বোঝে। শীকারের কি হ'ল?"

অমর একটু খুসী হইয়া একেবারে সুরমার পানে চাহিয়া বলিল, "গোটাকত হাঁস—আর বটের। দেখ্‌বে?"

সুরমা মুখ নত করিল। চারু বলিল, "না ও আমাদের ভাল লাগে না—আহা বেচারারা কি দোষ করে যে ওদের মার?"

অমর বলিল, "তা মাছটাও তো শীকার করেই খেতে হয়।"

সুরমা শিশুকে শোয়াইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

"উঠ্‌লে কেন দিদি—এসনা শেলাইটা শেষ করি।"

"তুমি কর! আরও কাজ কাছে—"

সুরমা কথা শেষ করিতে না করিতে অমর উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "একটু জিরুতে হবে—বড় গা ব্যথা কচ্চে।" সুরমার সে সভায় বসিতে অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়াই যে অমরনাথ চলিয়া গেল সুরমা তাহা বুঝিল।

চারু বলিল, "দুজনেই যাচ্চ আর আমি একা বসে থাক্‌ব বুঝি?"

"আয় তবে শেলাইটা শেষ করি।"

"বেশ তাই এসো।" উভয়ে কার্য্যে নিবিষ্ট হইল। কিছু পরে খোকা কাঁদিয়া উঠায় সুরমা চারুর হস্ত হইতে শেলাই কাড়িয়া লইয়া বলিল, "তুই ওকে নে আমি এটা শেষ করে আনি গে।"

"আমি একা থাকব?"

"একা কেন—ওদিকে যাও না।"

"তবে আমি যাব না।"

"ঠাট্টা নয়—যাও—যদি কোন দরকার হয় দেখগে। আর খাওয়ার কথাটাও ব'লো—"

'আচ্ছা' বলিয়া শিশুকে লইয়া চারু উঠিয়া গেল।

সেলাই হাতে লইয়া সুরমা ভাবিতে বসিল। সে কেন এরূপ ব্যবহার করিয়া অমরনাথকে বিপন্ন করে? এই সঙ্কোচে কি অমরের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ আছে তাহাই অমরের মনে জাগাইয়া দেওয়া হয় না। সে সম্বন্ধ যে মুছিয়া ফেলিয়াছে তাহার মনে তাহাই জাগাইয়া দেওয়ার অপেক্ষা লজ্জার কথা কি আছে! জগতে তাহার পক্ষে এর চেয়ে

লজ্জাকর কি আর কিছু নাই!—সে কথা দূর হোক্—সে চারুর স্বামী! চারুর স্বামীর মনে এরূপ একটা গ্লানি জাগাইয়া দেওয়া কি তাহার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত? যে সরলা তাহাকে তাহার স্বামীর সঙ্গে একটু আত্মীয়ভাবে মিশিতে দেখিলেও আনন্দে অধীর হইয়া উঠে সেই চারুর সর্ব্বস্ব যে স্বামী তাহার মনে মুহূর্ত্তের জন্যও লজ্জা বা অনুতাপের আকারে অন্য ভাব আসিতে দেওয়া সুরমার চক্ষে আজ নিজের একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। যদিও অমর তাহার কাছে যে অপরাধ করিয়াছে সে অবহেলার ইহাই প্রতিশোধ! কিন্তু চারুর স্বামীর উপরে সে অন্যায়ের প্রতিশোধ লওয়া তাহার ভাগ্যে নাই। নহিলে সে আবার নিজ কর্ত্তব্য সংসারে দান করিল কেন? প্রতিশোধ লইব না, মনে করিয়াও এটুকু জুয়াচুরী করা কি তাহার উচিত হইতেছে? দিদির কর্ত্তব্যটুকু সে কেন যথাযথ ভাবে করিয়া উঠিতে পারে না? এ দুর্ব্বলতাটুকু তার আর কতদিনে যাইবে!—সুরমা শেলাই ফেলিয়া উঠিল। কক্ষান্তরে গিয়া থালে খাদ্যদ্রব্য গুছাইয়া লইয়া একেবারে চারুর শয়নকক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল। মুক্ত দ্বারপথে গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তিদের দেখা যাইতেছিল!—চারু শিশুকে কোলে লইয়া স্বামীর বক্ষে হেলিয়া রহিয়াছে। অমরনাথ শয্যার উপরে অর্দ্ধশায়িতভাবে উপবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে উভয়কে চুম্বন করিতেছে!

নিঃশব্দে সুরমা সরিয়া আসিল। সে সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আত্মীয়ের উপযুক্ত ব্যবহারে চলিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে—তাই কি ভগবান তাহাকে এমন পরীক্ষার মধ্যে ফেলিলেন? পা যে আর চলে না!

কিন্তু তাহার অন্তরে কি এতটুকু শক্তিও সঞ্চিত হয় নাই? জীবনের প্রথম অধ্যায়েই যৌবনের আকুল বাসনা দীপ্ত হোমানলে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াও তাহার হৃদয় কি এতটুকু বলিষ্ঠ হয় নাই? জীবনের প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, আশা, তৃষা এতগুলি জিনিষ এক নিমেষে পান করিয়া তাহার মৃত্যুঞ্জয় কঠিন প্রাণ কি এখনো এত দুর্ব্বল? না, এ প্রাণকে সবল করিতেই হইবে!

রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সুরমা ডাকিল "চারু!" ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারু বলিল "কে? দিদি?" ব্যস্তে সে খোকাকে শয্যার উপরে ফেলিয়া দিল। থালা হস্তে অনির্দ্দিষ্ট সময়ে অপ্রত্যাশিত রূপে সুরমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অমরনাথও বিস্ময় দমন করিতে পারিল না। সেও শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। খোকা পতনের ভয়ে কাঁদিতে লাগিল।

সুরমাও অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। একে নিজেকে সাম্‌লাইতেই তাহার অনেকখানি বলের প্রয়োজন হইতেছে তাহাতে আবার তাহাদের এই বিস্মিতভাব তাহাকে আরও বিচলিত করিয়া তুলিল—তথাপি সে চাঞ্চল্য সম্বরণ করিয়া অতিকষ্টে ভূমিতে থালা রাখিয়া চারুর মুখের পানে চাহিয়া ম্লান মুখে হাসিয়া বলিল "খাওয়ার কথা মনে নেই বুঝি?"

চারু বলিল—"মনে ছিল—তা খেতে যে চান্ না—আমি কি করব।"

রোরুদ্যমান বালককে শয্যা হইতে বক্ষে তুলিয়া লইতে লইতে মৃদুস্বরে সুরমা বলিল "তবে খাওয়ার দরকার নেই?"

"তুমি একবার বলে ছাখ।"

অমরনাথ তাড়াতাড়ি বলিল—"তা খাচ্চি—খিদেটা ছিল না তাই বলেছিলাম।"

সুরমা দেখিল অমরনাথ তাহাকে বিপন্ন করিতে চাহে না। নিজের অক্ষমতায় ধিক্কার দিয়া অমরনাথের উপর ঈষৎ কৃতজ্ঞভাবে চাহিয়া সুরমা বলিয়া ফেলিল "খেতে বস্‌লেই খিদে পাবে।"

অমরনাথ আর বাক্যব্যয় না করিয়া আসনে বসিয়া পড়িল। চারু পাখা লইল দেখিয়া বলিল "না না ওতে দরকার নেই।" চারু সুরমার ইঙ্গিত পাইয়া বারণ শুনিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে চারু বলিল "খিদে ছিল না বলেছিলে যে?"

"খেতে বস্‌লে খিদে পায় এখন দেখ্‌ছি।"

তবু সুরমা কথা কহিতে পারিতেছিল না। বালককে লইয়া অন্যমনে খেলা করিতে লাগিল। চারু বলিল, "আর কিছু খেলে না?"

"আর খাব না।"

সুরমা চেষ্টায় ঈষৎ হাসিয়া বলিল "খিদে নেই বলে বেশী খেতে লজ্জা হচ্চে।"

অমরনাথও হাসিয়া ফেলিল। সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল---"সেটা বোকামির লক্ষণ।"

চারু মধ্য হইতে বলিল "তুমিই বা বুদ্ধিমানের লক্ষণ কই দেখাচ্ছ ?"

"দেখালাম না ? খাব না বলেও এতটা খেয়েছি।"

সুরমা পুনর্ব্বার বলিল "খাবার ঘরে এল তাইতো, নইলে—"

চারু বলিল "নইলে আলিস্যির জন্যে অমনি থাকতেন —এত বুদ্ধি !"

"বুদ্ধি নয় ? অধ্রুবের পেছনে কে এত দৌড়য় ? কিন্তু যেটা ধ্রুব এসে পৌছয় সেটাতে যে অনাদর করে সেই বোকা।"

সুরমা এবার নিতান্ত সহজ ভাবে অমরনাথের পানে চাহিয়া সহাস্য মুখে বলিল, "অন্ততঃ ওর অর্দ্ধেকটা শেষ কর্‌লে ওকথা মানি।"

"বেশ", বলিয়া অমরনাথ নিরাপত্তিতে আহার শেষ করিয়া উঠিল। দ্বারের নিকটে দাসী দাঁড়াইয়া ছিল। ভুক্তাবশিষ্ট পরিষ্কার করিয়া গেল। অমরনাথ পান খাইতে খাইতে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। চারু টেবিলের উপরটা গুছাইতে লাগিল। এখন সুরমা কি ছলে গৃহ ত্যাগ করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। ইতস্তত করিয়া শেষে বলিল—"চারু, খোকাকে দুধ খাওয়ানো হয়েছে ?"

"এখনও সময় হয়নি দিদি।"

"তোমার তো সময়ের ঠিক্ কত! খিদে পেয়েছে বোধ হচ্চে—" শিশুকে লইয়া সুরমা চলিয়া গেল। চারু বলিয়া ফেলিল, "দিদির ছুতোর অভাব হয় না---ও এখন দুধ খাবে না তবু চলে গেলেন।"

অমরনাথ নীরবেই রহিল। ক্ষণপরে চারু বলিল, "কি ভাবৃছ ?"

অমরনাথ জড়িতকণ্ঠে বলিল, "কই এমন কিছু নয়—তোমার দিদি যে বড় মিশুনে হয়েছেন হঠাৎ! এমন তো কখনো দেখা যায় নি।"

"মিশুনে আবার উনি কবে নুন। তবে তোমার সঙ্গে মেশেন না বটে। কি জানি হঠাৎ হয় ত মনটা ভাল হয়েছে।"

"তাই তো দেখ্‌ছি। আচ্ছা ছাখ চারু, তোমার দিদি লোকটা বড় নতুন ধরণের, না ? কখন কি রকম যে চলে তা বোঝা যায় না।"

"বোঝা যাবে না কেন ? আমি তো চিরকালই ওঁকে ওই রকম দেখে আস্‌ছি। তবে আগে মধ্যে মধ্যে এক রকম পর পর ব্যবহার কত্তেন বটে। তা তখন আমি নতুন। কিন্তু তুমি যে আমার চেয়েও পরের মতন ছিলে।

বাধা দিয়া অমর বলিল, "আমিও কবে না নতুন ? আমার সঙ্গে কবে কোন সম্বন্ধ ছিল ?"

চারু গম্ভীর ভাবে কি ভাবিল। তার পরে মৃদুস্বরে বলিল, "অন্যায়টা কি তাঁরই ? তাঁর সমালোচনা করার চেয়ে নিজের অন্যায়ের—"

অমর তাড়াতাড়ি চারুকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল, "হয়েছে হয়েছে গুরুমশায়, বক্‌তে হবে না বেশী!—সে অন্যায়ের ফল যদি এই হয় তো আমি তাতে অনুতপ্ত নই।"

চারু নিজেকে টানিয়া লইয়া অনিচ্ছায়ও একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি বড় দুষ্ট।"

অমর মুখে বলিল, "বটে," কিন্তু সে কথা কি সত্যই কখনো তাহার মনে জাগিত না ? সুরমার ব্যবহার, তাহার সকলের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ দয়া মায়া ও কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ় কোমল একটা কত বড় হৃদয়ের প্রতি সে কত বড় অবিচার করিয়াছে সে কথা কি একবারও তাহার মনে হইত না ? চারুর প্রতি তাহার অকপট স্নেহে অমর কি বিস্মিত হইত না ? শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিস্ময়ের সঙ্গে একটা অতি সূক্ষ্ম অথচ তীব্র অনুতাপব্যথাও সময়ে সময়ে কি তাহার মনে ফুটিয়া উঠিত না ? উঠিত। তবে সে ভাবকে অমরনাথ সাহস করিয়া বেশীক্ষণ হৃদয়ে স্থান দিতে পারিত না। বড় বেগগামী সে প্লাবন—যেন বন্যার মত! তাহার আভাস মাত্রে তাই অমর কাঁপিয়া উঠিত, সজোরে সে ভাবটাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া অমর ভাবিত, চারু—চারু—চারু! চারুই তাহার স্ত্রী---চারুই তাহার একমাত্র—চারুই তাহার সব! সুরমার কাহারো সহিত বিবাহ হয় নাই, হইতে পারে না, কেননা পৃথিবীর কেহ কি সে? না। সে দেবী—শুধু স্নেহ দিবার জন্যই সে সংসারের সহিত আবদ্ধ। অমরের

সহিতও তাহার ঐটুকুমাত্র সম্বন্ধ, আর কিছু না! আর কোনো কথা যেন তাহার মনে না জাগে! সে জন্য অমর প্রাণপণে সচেষ্ট থাকিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

শরৎ-প্রভাতে

আজকে এই সকাল বেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের
সুরটি মেলাতে।
আকাশে ঐ অরুণ-রাগে
মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলো-ছায়ার
মায়ার খেলাতে—
আজিকে এই সকাল বেলাতে॥

নীলিমা এই নিলীন হল
আমার চেতনায়।
সোনার আভা জড়িয়ে গেল
মনের কামনায়।
লোকান্তরের ওপার হতে
কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ঐ
মেঘের ভেলাতে—
আজিকে এই সকাল বেলাতে॥

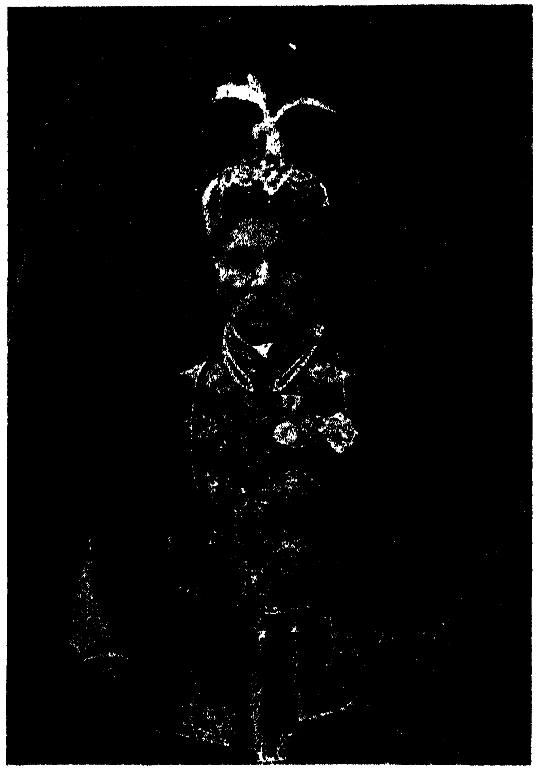
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা চীনাবাসনের কারখানা

(কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস্)

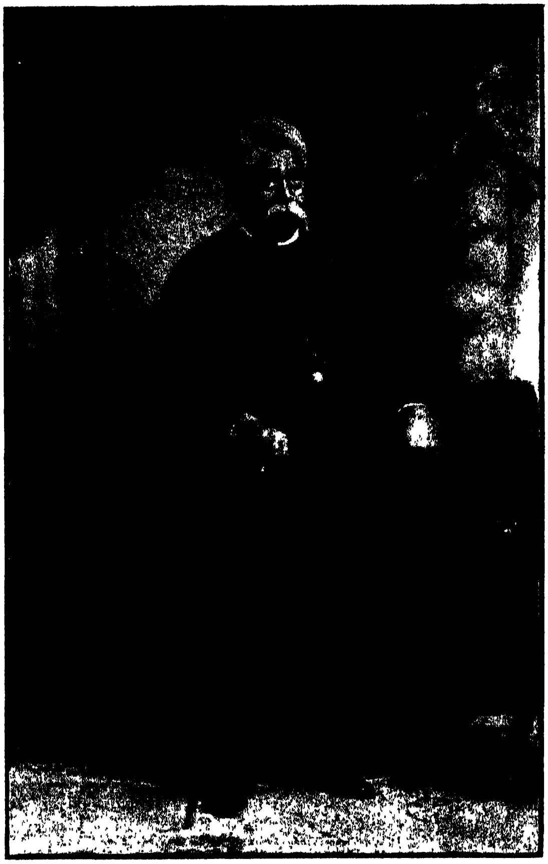
ইতিহাস।

আজ প্রায় ১২ বৎসর হইল কাশিমবাজারের মহারাজা মাননীয় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ও জমিদার রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়গণ কর্ত্তৃক এই চীনের বাসনের কারখানা স্থাপনের সূচনা হয়। সাঁওতাল-পরগণার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ রাজমহলের নিকটবর্ত্তী মঙ্গলহাট নামক স্থানে কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। সেই পাহাড়গুলি সাধারণতঃ সূক্ষ্ম ও শ্বেতবর্ণের বিশুদ্ধ বালুকা দ্বারা গঠিত। সেই সূক্ষ্ম বালির সহিত চীনামাটীর অংশ বহুলপরিমাণে লক্ষিত হয়। কারখানার সত্বাধিকারী-



মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

গণ পানিয়া বালি ও মাটী বিক্রয় উদ্দেশ্যে ঐ পাহাড়গুলি ক্রয় করিয়া Rajmehal Quartz Sand & Kaolin Co. নামক একটী কারবার স্থাপন করেন। পাটের কল, কাপড়ের কল, কাগজের কল, ইত্যাদিতে বিলাত হইতে আনীত চীনামাটী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বিলাতীর পরিবর্ত্তে দেশী মাটী চালানো এই কোম্পানীর একটী বিশেষ উদ্দেশ্য। তা'ছাড়া ইমারতের জন্য বালিও বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিক্রয় করা হয়। পাহাড় হইতে মাটী কাটিয়া বালি ও মাটী ধৌত করিয়া পৃথক করিবার জন্য মঙ্গলহাটে ৩০ হাজার টাকা খরচ করিয়া কল চৌবাচ্চা ও ইমারত



মাননীয় রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন।



শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন।

প্রস্তুত করা হইয়াছে। পরে এই মাটী হইতেই চীনের বাসনের ন্যায় জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে জানিতে পারিয়া ১৯০৩ সালে ৬নং মাণিকতলা রোডে কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস্ স্থাপিত হয়। তখন দেশীয় কুমারদের দ্বারা ও কৃষ্ণনগরস্থ কারিকরদিগের দ্বারা পুতুল ও (Glaze) কাচের মত সামান্য চক্‌চকে করা চায়ের পেয়ালা, ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। কিন্তু উপযুক্ত লোক অভাবে প্রায় ২৫০০০৲ টাকা খরচ করিয়াও দ্রব্যাদি আশানুযায়ী উন্নতি লাভ করিল না; কিন্তু তাহাতে ইঁহারা কোনরূপ নিরুৎসাহ না হইয়া ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় কারখানার বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে ১৯০৬ সালের প্রথমে শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব জাপান হইতে বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীর কুম্ভকারের কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসেন এবং এই কারখানার ভার গ্রহণ করেন।

ইনি এই কারখানায় যোগদান করিয়াই, এই রাজমহলের মাটী ও বালি হইতে যে পোৎসলেন বা চীনামাটীর দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিলেন। তৎপরে এই কারখানায় কেবল চীনামাটীর জিনিষ প্রস্তুত হইবে ইহাই স্থির হইল, এবং মাণিকতলা রোডে স্থান নিতান্ত অসঙ্কুলান হওয়ায় বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান ঠিকানা টেংরা রোডে প্রায় ৯ বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয়। এই জমির উপর প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করিয়া এঞ্জিনঘর, কলঘর, ছাঁচ তৈয়ারের ঘর, চুল্লী (furnace) ঘর, রং করিবার ঘর প্রভৃতি ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা ইমারত প্রস্তুত করা হয়। এই সঙ্গে জারমেনি হইতে ২০ হাজার টাকার এঞ্জিন কল ইত্যাদি আনয়ন করা হয় এবং ৬ হাজার টাকা খরচ করিয়া ২টী পোয়ান (kiln) প্রস্তুত করা হয়। ১৯০৭ সালের প্রারম্ভে এই কারখানার কার্য্য আরম্ভ হয়।



শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব।

প্রথমে ১০ জন মাত্র লোক লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ক্রমশঃ এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমান সময়ে ১১০ জন লোক কার্য্য করিতেছে। এইরূপ করিবার কারণ এই যে ভারতে এই প্রথম চীনের বাসনের কারখানা স্থাপিত হয়; এই কার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক একজনও দেশে ছিল না। কাজেই খুব অল্পসংখ্যক লোককেই প্রথমে শিখাইতে আরম্ভ করা হয় এবং পরে পরে আরও লোক নিযুক্ত করিয়া এত দিনে ১১০ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। ১৯০৭ সালে এই কারখানায় সম্বৎসরে ৩ হাজার টাকার মাত্র জিনিষ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং উত্তর উত্তর তাহা বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান বৎসরে মাসিক প্রায় ৫ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে।

কারখানার প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র স্বদেশী দোকানদারগণ ও স্বদেশসেবকগণের উপর ইহার জিনিষের কাটতি নির্ভর করিত। কারণ তখন দ্রব্যাদি তত উৎকৃষ্ট হয় নাই এবং তা ছাড়া তখন যে টাকার মাল প্রস্তুত হইত তাহাতে স্বদেশী দোকানদারগণের ফরমাইশের জিনিষও সব জোগাইতে পারা যাইত না। কাজেই মুর্গীহাটার জারমেনী হইতে আনীত জিনিষের সমকক্ষতা করিবার কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু ক্রমশ মাল প্রস্তুত বেশী হওয়াতে বিদেশী আমদানী বন্ধ করিতে চেষ্টা করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে হাঁসপাতালের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি এত বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে যে তাহার বিদেশ হইতে আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে।* এই কারখানা এখন জারমেনী হইতে আনীত ৫, ১০, ও ৵০ মূল্যের ছোট ছোট খেলনা পুতুলের সহিত সম্পূর্ণরূপে সমকক্ষতা করিতেছে। তবে এইসকল খেলনা পুতুলের কাটতি এত অধিক যে তাহার আমদানি একেবারে বন্ধ করিতে হইলে কারখানাটী চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিতে হয়। দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্যে বিদেশী অপেক্ষা এই কারখানা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এইসকল দ্রব্য ব্যতীত অত্যাবশ্যক বৈজ্ঞানিক কার্য্যের ব্যবহারোপযোগী পাত্রাদিও প্রস্তুত হইতেছে। শিবপুর সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের জন্য অনেকগুলি পাত্র প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে। ভবিষ্যতে কারখানার স্বত্বাধিকারীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অধিক মূলধনে এই কারখানাটী যৌথ কারবারে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তবে যে পর্য্যন্ত অন্ততঃ শতকরা ৬৲ টাকা হারে লাভ দেওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে না পারেন, ততদিন তাহা করিতে ইচ্ছুক নন।

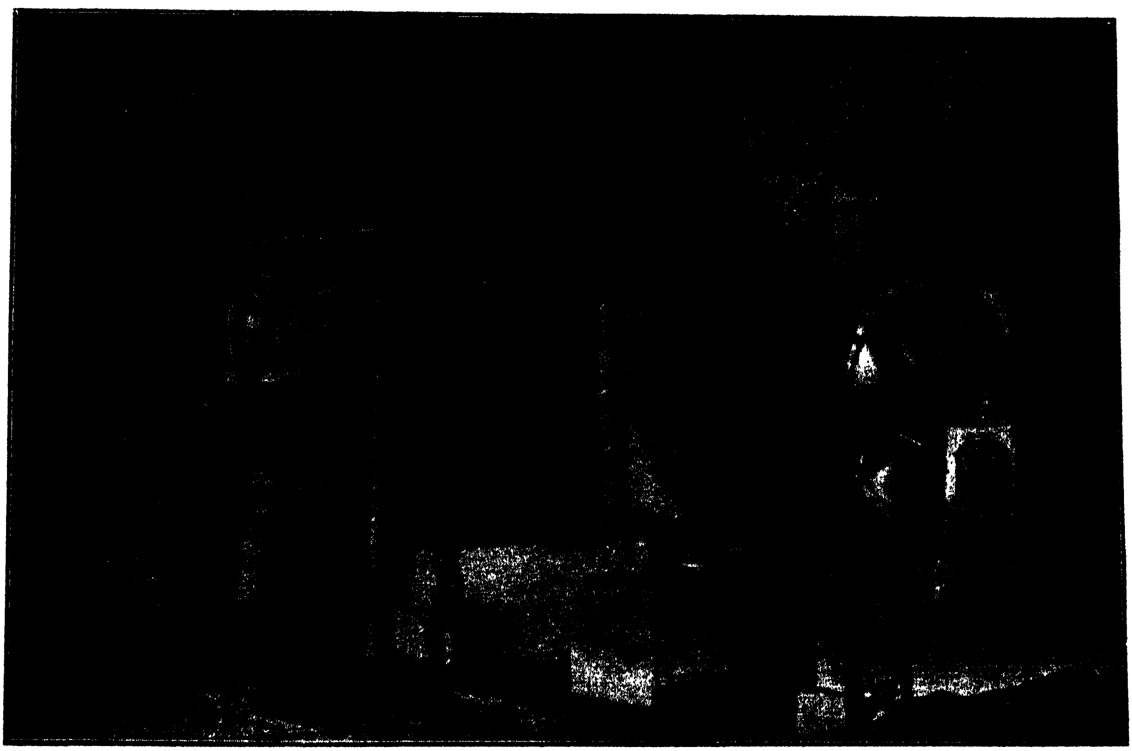
কারখানার বিশেষত্ব।

আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত যেসকল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের অধিকাংশ উপাদানই বিদেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই কারখানায় যে মাটী ও অন্যান্য উপাদান ব্যবহৃত হয় তাহা সমস্তই বঙ্গদেশজাত এবং অধিকাংশই কারখানার নিজের সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত।

* মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং প্রভৃতি কলিকাতার বিখ্যাত ঔষধালয়ে, এমন কি মেসার্স স্মিথ ষ্টেনিষ্ট্রীট এণ্ড কোম্পানি প্রভৃতি সাহেব কর্ত্তৃক পরিচালিত ঔষধালয়েও আমাদের প্রস্তুত গ্যালিপট্, ইউরিন্যাল, কিডিকাপ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে।



কারখানার একাংশের দৃশ্য।





এঞ্জিনঘরের দৃশ্য।

(Filter Press) দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ ঘন চীনে মাটীর ভাগটী তৎপরে যাঁতা হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়। উক্ত চীনে মাটীর অংশ তখনও কার্য্যের উপযোগী হয় না। তৎপরে উহা শানিবার কলের (kneading machine) সাহায্যে কার্য্যোপযোগী করা হয়। উপরোক্ত কার্য্যগুলি সমস্তই কলের সাহায্যে করা হয়। এই প্রস্তুত মাটী হইতে সাধারণতঃ ৩টী উপায়ে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে, যথা :—

(১) Pressing—অর্থাৎ যন্ত্র দ্বারা চাপ দিয়া গঠন করা।

(২) Throwing—অর্থাৎ চাকের সাহায্যে গঠন করা (সাধারণ কুম্ভকারগণের ন্যায়)।

(৩) Casting—অর্থাৎ ছাঁচে ঢালাই দ্বারা গঠন করা।

উপরোক্ত উপায় দ্বারা গঠিত দ্রব্যগুলি কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া পরিকর্ম্ম (Finishing) বিভাগে যায়। সেখানে পরিষ্কৃত ও যথাযথভাবে গঠিত হয় এবং তৎপরে ভাল করিয়া শুকাইবার জন্য কিছুদিনের মত রাখিয়া দেওয়া হয়। সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক হইলে জিনিষগুলি একবার সামান্য উত্তাপে পোড়াইয়া অধিক পরিমাণে শুষ্ক ও শক্ত করিয়া লওয়া হয়,—ইহাকে বিস্কুট (Biscuit) করা বলে। তারপর ঐসকল বিস্কুট-করা জিনিষগুলি, একটী কাচের উপাদান (Glaze) মিশ্রিত জলের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে জিনিষগুলির উপর তৎক্ষণাৎ একটী সাদা পাতলা আবরণ পড়ে। এই চুবান জিনিষগুলি, আগুনের খুব বেশী উত্তাপেও গলিয়া ঝামা হইয়া যায় না এইরূপ মাটী (fire clay) দ্বারা

মাটী হইতে জিনিষ প্রস্তুত প্রণালী ও কারখানা পরিচালনের নিয়মাবলী।

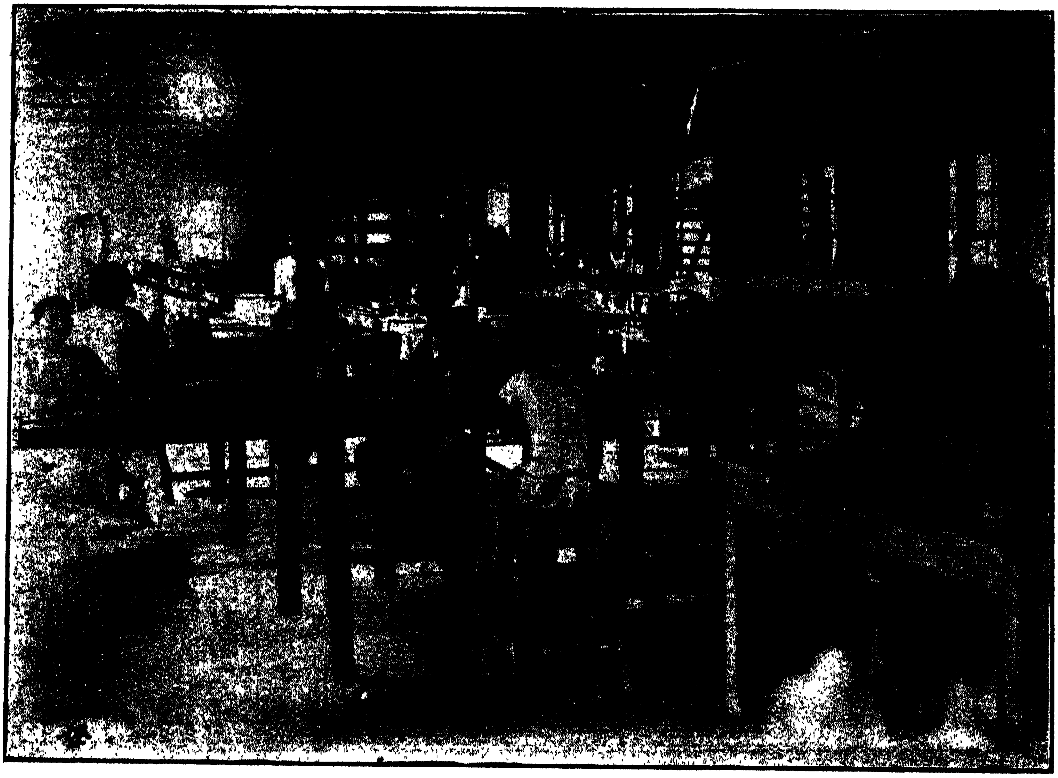
মাটীর সহিত যে যে দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া উহাকে "চীনে মাটীতে" পরিণত করা হয়, তাহা সমস্তই খনিজ। এই খনিজ পদার্থগুলি বিশেষভাবে বাছিয়া ও জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইতে হয়। পরে উহাকে খুব মিহি করিয়া চূর্ণ করা হয় এবং তৎপরে মাটীর সহিত নিজ নিজ অংশানুযায়ী জলে মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রিত জলীয় পদার্থটী হইতে জলীয়ভাগ শক্তিশালী ছাঁকনী যাঁতা



বিস্কুটঘরের দৃশ্য।



প্লেট এবং ছাঁচ তৈয়ারী করিবার ঘরের দৃশ্য।

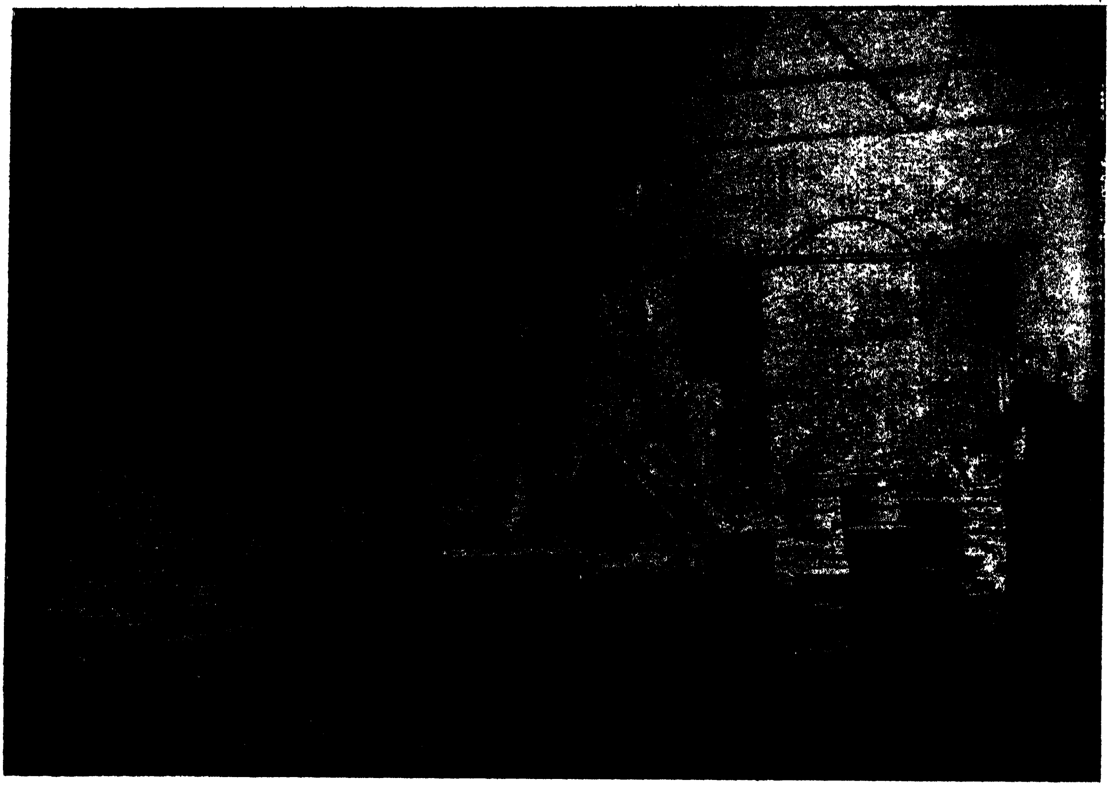


জিনিষ প্রস্তুত করিবার হলের দৃশ্য।

নির্ম্মিত পাত্রের মধ্যে সাজাইয়া ঐ পাত্রগুলি kiln অর্থাৎ পোয়ানের ভিতর উপরিউপরি থাক্ দিয়া সাজান হয়। তৎপরে ১৩০০°C. উত্তাপে পোড়ান হয়। ইহাতে জিনিষ শক্ত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত Glaze অর্থাৎ কাচের উপাদানটী গলিয়া যায়। এই উত্তাপ সচরাচর মাটীর রাসায়নিক উপাদানের (Chemical Composition) উপর নির্ভর করে। মাটী যতই বিশুদ্ধ হয় ততই উত্তাপ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে—এবং উত্তাপ যতই বৃদ্ধি হয় জিনিষের উৎকর্ষ ততই বৃদ্ধি হয়। ইউরোপের অনেক বিখ্যাত কারখানায় ১৪০০°C. হইতে ১৫০০°C. উত্তাপে জিনিষ পোড়ান হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত Scores ফ্যাক্টরী, বারলিনের Royal Porcelain Factory ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। Scores Factoryর প্রস্তুত একটী একটী জিনিষ দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। পোড়াইবার পর ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত জিনিষগুলি ঠাণ্ডা হইবার জন্য পোয়ানেই রখিয়া দেওয়া হয়। পরে উহা বাহির করিয়া রং করিবার ঘরে প্রেরিত হয়। তৎপরে চিত্রিত দ্রব্যগুলি পুনরায় এনামেল্ পোয়ান (Enamel kiln) নামক এক প্রকার পোয়ানে পোড়াইয়া রংগুলি পাকা করা হয় এবং যথারীতি প্যাক্ করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ দেওয়া হয়।

উপরোক্ত বিভাগগুলি ঠিক এরূপ ভাবে পরপর স্থাপিত যে কারখানার এক প্রান্ত হইতে জিনিষ প্রস্তুত আরম্ভ হইয়া ঠিক অপর এক প্রান্তে সম্পূর্ণতা লাভ করে। ইহাতে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয় ও গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়। ইহা একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়।

প্রত্যেক কারিকরের দৈনিক কার্য্য, মাটী ও অন্যান্য খরচ, যন্ত্রাদি পরিচালনের গড় দৈনিক খরচ ইত্যাদির হিসাব অতিশয় সাবধানতার সহিত পৃথক্ পৃথক্ ছাপান কাগজে লিখিত হইয়া থাকে এবং এইসকল হিসাবের সাহায্যে জিনিষের পড়তা Cost of Production বাহির করা হয়।



কিলন্ বা পোয়ান-ঘরের দৃশ্য।

বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার চীনে মাটীর জিনিষ ভারতে আমদানি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কলিকাতা ও চট্টগ্রামেই প্রায় অর্দ্ধেক জিনিষ ব্যবহৃত হয়। এই ১৫ লক্ষ টাকার জিনিষ প্রস্তুত করিতে হইলে শুধু বঙ্গদেশেই অন্ততঃ প্রত্যেকটী তিন লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ১০টী চীনে মাটীর জিনিষের কারখানা স্থাপিত হওয়া দরকার। এরূপ জিনিষের উপাদান দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোং পাইপ, টালি, ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বৎসরে কত লক্ষ টাকা লাভ করিতেছেন এবং তাঁহাদের কারখানা জগতের একটী বৃহত্তম কারখানা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে উৎসাহ বা উদ্যম দেশের লোকের খুব কমই আছে। চীনে মাটীর জিনিষের কারখানা চালানো একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসা। কারণ ইহার উপাদান অল্প-মূল্যে পাওয়া যায়। অনেক জিনিষ কলেই সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় এবং পোড়াইবার জন্য স্বল্প মূল্যে কয়লাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এযাবত কাল বঙ্গদেশে অনেকানেক শিল্পের স্থাপন ও উন্নতির চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু এই কারখানা স্থাপনের পূর্ব্বে উন্নত শ্রেণীর মাটীর পাত্র পুতুল আদি প্রস্তুত করিবার সমবেত চেষ্টা কখন হয় নাই। ইং ১৮৬০ সালে ভগল-পুরের নিকটবর্ত্তী কহলগাঁ [Colgong, E. I. Ry. (Loop)] নামক স্থানে গঙ্গার উপর পাথরঘাটা পাহাড়ে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী মতিলাল শীল প্রায় ২।৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মিঃ জি ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড্ কর্ত্তৃক একটী বৃহৎ পটারি ওয়ার্কস স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৬ সালে উক্ত সাহেব চলিয়া যাওয়ায় কারখানাটী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা ভারতের মাটীর পাত্রের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন উন্নত শ্রেণীর মাটীর জিনিষ প্রস্তুত কার্য্যে বঙ্গদেশ সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাতে পড়িয়া আছে। হাঁড়ি,


কলিকাতা চীনাবাসনের কারখানায় প্রস্তুত সামগ্রী।

কলসি, সরা, জালা, মালসা ভিন্ন আমাদের গৌরবের জিনিষ কিছুই নাই। কাচের সূক্ষ্মস্তরাচ্ছাদিত চক্‌চকে মাটীর জিনিষ (Glazed Pottery)তো দূরের কথা, খসখসে মাটীর জিনিষেরও (হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদির) অবস্থা শোচনীয় এবং তাহা উন্নত করিবার কোনই চেষ্টা দেখিতে পাই না।

কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস্ এই প্রথম বঙ্গদেশে উন্নত শ্রেণীর চক্‌চকে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া সকলের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। এই কারখানার উন্নতিতে দেশের একটী বিশেষ অভাব দূরীভূত হইবে।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমরা এই কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। সত্যসুন্দর বাবু আমাদিগকে মাটী প্রস্তুত করা হইতে আরম্ভ করিয়া প্যাক্ করা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন। আমরা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অনেক শিখিলাম ও আনন্দলাভ করিলাম। সমস্ত কারখানাটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ঘর এরূপ ভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত পরে পরে নির্ম্মিত হইয়াছে, যে, এক প্রান্তে মাটী প্রস্তুত হয়, এবং আর এক প্রান্তে বিক্রয় করিবার উপযোগী জিনিষটি বাহির হয়। আমাদের দেশে এইরূপ একটি কারখানা স্থাপন ও পরিচালন সোজা কাজ নয়। শুধু টাকা দিলে হয় না, কিম্বা কিছু কেতাবী জ্ঞান থাকিলেও হয় না। সত্যসুন্দর বাবুকে ঘর তৈয়ার করান, কল বসান, কারিগর-দিগকে শিখাইয়া কাজের লোক করা, বাজারে পাইকার-দিগকে এই কারখানার জিনিষ লইতে স্বীকার করান, সমস্তই করিতে হইয়াছে। সুতরাং তিনি যে কৃতী পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যাঁহারা, লোক্‌সান হওয়া সত্ত্বেও, লাভ না হওয়া সত্ত্বেও, বৎসরের পর বৎসর, এই কারবারে টাকা ঢালিয়া আসিয়াছেন, সেই সত্ত্বাধিকারীগণও সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এখন কারখানায় যে পরিমাণ লাভ হইতেছে এবং উহা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে উহা শীঘ্রই অন্যান্য বেশী লাভের ব্যবসার সমকক্ষ হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা হয়। উহার মূলধন বাড়াইলে

উহার লাভের পরিমাণ ও অনুপাত দুইই বাড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং যদি উহাকে যৌথ কারবারে পরিণত করা হয় তাহা হইলে উহার অংশীদারের অভাব না হইবারই কথা। এই কারখানাটী বাঙ্গালী মাত্রেরই আদরের জিনিষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

নিবেদন

পুষ্প যদি কর মোরে করো শতদল,
তোমার চরণে, প্রভু! এই নিবেদন;—
বারি যদি কর তবে করো গঙ্গাজল;
করো দুর্ব্বা, দাও যদি তৃণের জীবন;
তুলসী করিও যদি দাও পত্র করে;
বৃক্ষ করি রাখ যদি করিও চন্দন;
জীব যদি,—করো নর নত ভক্তিভরে;
জন্মে জন্মে দিও পদ করিতে বন্দন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কর্ম্ম—শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত।*

"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।" গীতা।

১। বৈদিক কর্ম্ম।

গুণাদি শব্দের ন্যায় কর্ম্ম শব্দেরও নানা প্রকার অর্থে ব্যবহার শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যে যাহা করে, তাহাই তাহার কর্ম্ম—"কর্ত্তৃব্যাপারৈর্যৎ সাধ্যতে।" ন্যায় মতে উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন ইত্যাদিরই নাম কর্ম্ম। কিন্তু সাধারণ অর্থে এসকল লৌকিক কর্ম্ম। আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার কর্ম্মের উল্লেখ আছে—লৌকিক এবং বৈদিক। স্মার্ত্ত কর্ম্ম বৈদিক কর্ম্মেরই অন্তর্গত মনে করা হয়। বৈদিক কর্ম্ম বলিতে প্রধানতঃ যাগযজ্ঞকেই বুঝায়। তবে অধ্যয়ন, ইজ্যা (যজ্ঞ), এবং দান এই তিন প্রকার কর্ম্ম বা "ধর্ম্ম-স্কন্ধেরও" উল্লেখ আছে। কোথাও বা কর্ম্ম বলিতে "ইষ্টাপূর্ত্ত"—অর্থাৎ যাগযজ্ঞ এবং কূপ-তড়াগাদি খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য বুঝায়। কর্ম্ম-মীমাংসার সূত্রকার জৈমিনির মতে "অগ্নিহোত্র-দর্শ-পৌর্ণমাসাদি" যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাই শ্রুতির উদ্দেশ্য, এবং যেসকল শ্রুতিবচন সেইসকল ক্রিয়াকে লক্ষ্য করেনা, সেসকল নিরর্থক, অথবা অর্থবাদ বা প্রশংসাবাক্য মাত্র—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য মত মর্থানাং।" জৈমিনির এই মতই জ্ঞান এবং কর্ম্মের বিরোধের মূল।

* মাঘোৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরা ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা।

২। বৈদিক হবির্যজ্ঞ ও সোমযজ্ঞ।

বৈদিক যজ্ঞ দুই প্রকার—হবির্যজ্ঞ, এবং সোমযজ্ঞ। হবির্যজ্ঞের আহুতি দুগ্ধ, ঘৃত, এবং মাংসাদি, এবং সোম-যজ্ঞের আহুতি সোমরস। অরণি বা কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মন্থন বা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া বিধিপূর্ব্বক অগ্ন্যাধান অর্থাৎ গার্হপত্য অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। গার্হপত্য অগ্নি হইতেই অগ্নি গ্রহণ করিয়া আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি নামক আরও দুইটী অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে এইসকল অগ্নিতে দুগ্ধাদি আহুতি প্রদানের নাম অগ্নিহোত্র। বৈদিক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান দেশে প্রচলিত না থাকিলেও অগ্নিহোত্রী নাম অদ্যাপি প্রচলিত আছে। সোমযজ্ঞে বিধিপূর্ব্বক প্রস্তর দ্বারা পেষণ করিয়া সোমলতার রস প্রস্তুত করিতে হইত। ঋগ্বেদেই সোমযজ্ঞের বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সোমরস অগ্নিতে আহুতি রূপে প্রদত্ত হইত, এবং বৈদিক ঋষিগণ দধি প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া সোমরস পান করিতেন। আধুনিক বিয়ার (beer) প্রভৃতির ন্যায় ইহারও কিঞ্চিৎ মাদকত্ব গুণ ছিল। "অপাম সোমমমৃতা অভূম।" সোম-যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোম, রাজসূয়, এবং অশ্বমেধাদি বিখ্যাত। দিনে তিনবার অগ্নিতে সোমরসের আহুতি প্রদত্ত হইত। ইহারই নাম "ত্রিসবন"—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন, এবং তৃতীয় সবন। বৈদিক যজ্ঞের বেদী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম ছিল, এবং তাহা করিতে জ্যামিতি-জ্ঞানের প্রয়োজন হইত। কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা-সম্বাদে উক্ত হইয়াছে:—

"লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ, যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা"—

ইহা দ্বারাও দেখা যায় কত সহস্র ইষ্টক যজ্ঞবেদীর কোন

অংশে কিরূপে বসাইতে হইবে, তাহার বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল। সোমযজ্ঞের বেদী পক্ষীর আকারে নির্ম্মিত হইত, কারণ এরূপ বৈদিক প্রবাদ ছিল যে গায়ত্রী নামক ছন্দ শ্যেনপক্ষীরূপে স্বর্গ হইতে সোমলতা আনয়ন করিয়াছিল :—

"সা পতিত্বা সোম-পালান্ ভীষয়িত্বা পদ্ভ্যাং চ মুখেন চ সোমং রাজানং সমগৃভ্নৎ।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

দেশের আধুনিক ব্রতপূজাদিকে স্মার্ত্ত কর্ম্ম বলা যাইতে পারে কিন্তু এসকলের সহিত যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মের কোনরূপ সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না। এবং এ সকলকে বৈদিক কর্ম্ম মধ্যে গণ্য করাও সঙ্গত হয় না। এসকল স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রুত্যুক্ত স্বর্গাদি ফললাভ হইবে এরূপ আশাও ভিত্তিশূন্য।

৩। অগ্নি এবং প্রাচীন ইরাণীদিগের আবেস্তা।

মানবজাতির ইতিহাসের আদি ঋগ্বেদ। সেই ঋগ্বেদের আদিঋক্ :—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং।" "যজ্ঞের পুরোহিত, ঋত্বিক, হোতা, উৎকৃষ্ট রত্নের আকর সেই অগ্নিদেবের সম্বর্দ্ধনা করি।"

অগ্নির এত মাহাত্ম্য এত গৌরব কোথা হইতে? শুধু আমাদের বৈদিক ঋষিদিগের মধ্যে নয়,—গ্রীক, লাটিন এবং আদিম ইরাণ বা পারস্যদেশে, এমন কি প্রাচীন মিসর দেশেও অগ্নিদেব এইরূপে পূজিত হইয়াছেন। প্রাচীন ইহুদিদিগের একেশ্বরের পূজায়ও অগ্নির ব্যবহার ছিল। কিন্তু আদিম ইরাণ দেশের অগ্নি-পূজকদিগের কথা এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ইরাণীদিগের সন্তান অধুনাতন বম্বেবাসী পার্শী নামে আমাদের নিকটে সুপরিচিত। তাহাদের আবেস্তা* নামক প্রাচীন গ্রন্থ আমাদিগের ঋগ্বেদস্থানীয়। সেই গ্রন্থের যাস্ন নামক অংশ অগ্নির স্তবে পরিপূর্ণ। তাঁহারাও আমাদের বৈদিক ঋষিদিগের ন্যায় যজ্ঞাদি কার্য্য করিয়া অগ্নিতে সোমরস আহুতি প্রদান করিতেন এবং সোমরস পান করিতেন। আমাদের বৈদিক সোম তাঁহাদের মধ্যে হোম নামে পরিচিত ছিল। ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মানুসারেই (Grimm's laws) সংস্কৃতের 'স' ইরাণি-ভাষায় 'হ' হয়, যেমন সংস্কৃত সিন্ধু পার্শী হিন্দু। ইরাণদেশের যেসকল পুরোহিত কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিত, তাহাদের নাম 'অথ্রবন্' ছিল। আমাদেরও ব্রহ্মার পুত্রের নাম 'অথর্ব্বা,' এবং ব্রহ্মা আদিতে যজ্ঞীয় পুরোহিত বিশেষেরই নাম। আমাদের অথর্ব্ববেদ ও 'ত্রয়ী' নামের বহির্ভূত, এবং বেদসকলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এইসকল কারণে অথর্ব্ববেদের সহিত প্রাচীন ইরাণী ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ থাকাই সম্ভবপর আবার প্রাচীন ইরাণের দেবগণের সহিত আমাদের বৈদিক দেবগণের এত সাদৃশ্য যে তাহা উপেক্ষা করা যায় না। ঋগ্বেদে 'অসুর' শব্দ সূর্য্য, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি দেবগণের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইয়াছে।* দশম মণ্ডলের শেষভাগেই মাত্র দেবশত্রু অর্থে 'অসুর' শব্দ ব্যবহৃত দেখা যায়। ইরাণীদিগের মধ্যে ঈশ্বরের নাম 'অহুর'—'স' স্থানে 'হ' এই মাত্র প্রভেদ। বৈদিক দেবগণ মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, নাসত্য (অশ্বিনীদ্বয়), যম প্রভৃতি পার্শীদিগের আবেস্তা গ্রন্থে মিথ্র, বরুণ, ইন্দ্র, নাসত্য, যিম, প্রভৃতি নামে সুপরিচিত। বৈদিক বৃত্রঘ্ন বা বৃত্রহন্তা (ইন্দ্র)—যাহা মোক্ষমুলার গ্রীকদিগের বেলেরোফনের (Bellerophon) সহিত এক করিয়াছেন, বৈদিক 'অপাং নপাৎ' (জলের বংশধর) এবং ভগদেবতা আবেস্তার 'বেরেথ্রঘ্ন' অপাম্ নপাৎ, এবং ভগের সহিত এক। ইন্দ্রের বৃত্রবধের আখ্যায়িকা বেদে এবং আবেস্তাতে একইরূপ। ইন্দ্রেরই আদি বৈদিক নাম ত্রিত, আবেস্তাতে 'থেইতোনা'। বৈদিক ইন্দ্র যেমন 'অহি' বা 'বৃত্রকে' বধ করিয়াছিলেন, ইরাণী থেইতোনাও ব্‌রৎরকে বা অঝিকে বধ করিয়াছিলেন। তবে এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে আমাদের পৌরাণিক দেবাসুরের যুদ্ধ সম্বন্ধে ইরাণীদিগের সহিত নামের বিরোধ দৃষ্ট হয়। আমাদের 'দেবাসুর' ইরাণীদিগের 'অসুর-দৈব'। পৌরাণিক দেব লোকের হিতকারক, কিন্তু ইরাণীদিগের 'দৈব' লোকের অহিতকারক। আবার পৌরাণিক 'অসুর' লোকের অহিতকারী, কিন্তু ইরাণীদিগের 'অসুর' লোকের হিতকারী।

* আবেস্তা সম্বন্ধে অধিকাংশ কথাই বিলাতের বিশ্বকোষ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

* "ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুরা যে চ মর্ত্ত্যাঃ।" ২-২৭-১০।

এই দেবাসুর এবং অসুরদেব শব্দবিরোধ দৃষ্টেই প্রতিপন্ন হয় যে দেবাসুর সংগ্রাম একটী প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব। আবেস্তা-সম্প্রদায়ভুক্ত ইরাণী আর্য্যদিগের সহিত বৈদিক আর্য্যদিগের বিচ্ছেদ এবং সংগ্রামই দেবাসুরের যুদ্ধরূপে ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে লোকে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। তখন শাস্ত্রকারগণ এই দেবাসুর সংগ্রামের আধ্যাত্মিক অথবা কাল্পনিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শঙ্কর তাঁহার ছান্দোগ্য ভাষ্যে বলিতেছেন :—

"দেব অর্থে শাস্ত্রোদ্ভাষিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি, অসুর তাহার বিপরীত। স্বীয় অসু বা প্রাণাদি ক্রিয়ারূপ স্বাভাবিক বিষয়ে রমণ করে, এই অর্থে 'অসুর' শব্দ স্বাভাবিক তম-আত্মক ইন্দ্রিয়বৃত্তি বুঝায়। তাহাদের পরস্পর একে অন্যের বিষয় অপহরণরূপ যুদ্ধই দেবাসুর-সংগ্রাম। শাস্ত্রীয় প্রকাশবৃত্তির অভিভবের জন্য প্রবৃত্ত স্বাভাবিক তমোরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তিই অসুর। আবার তদ্বিপরীত শাস্ত্রার্থ-বিষয়বিবেকরূপ জ্যোতিস্বভাব দেবগণও স্বাভাবিক তমোরূপ অসুর-অভিভবে প্রবৃত্ত। এই অন্যোন্য অভিভবের চেষ্টাই সংগ্রাম। সকল জীবে, প্রতি দেহে, অনাদিকাল হইতে, এইরূপ দেবাসুর-সংগ্রাম চলিতেছে।" ১-২ ॥

৪। অগ্নির মাহাত্ম্য এবং যজ্ঞের মূলতত্ত্ব।

সে যাহা হউক অগ্নির পূর্ব্বোক্ত দিগদিগন্তব্যাপী সর্ব্বজাতীয় মহাগৌরবের কারণ কি ?

"৩৩৩৯ দেবগণ অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছেন, ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন, তাঁহার জন্য বর্হি (কুশ) বিস্তার করিয়াছেন, হোতারূপে তদুপরি বসাইয়াছেন।" *

ঋষি বিশ্বামিত্র অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—
'কাময়মানো বনা ত্বং,'—ইহাতে দাবানলেরই উল্লেখ।

"স সৃবাংসমিবত্মনাগ্নিমিথা তিরোহিতং। এনং নয়ন্ মাতরিশ্বা পরাবতো দেবেভ্যো মথিতং পরি"—'চলিয়া গেলেও যেমন পুত্রকে ধরিয়া আনে, সেইরূপে তিরোহিত অগ্নিকে মাতরিশ্বা মন্থন দ্বারা উৎপন্ন করিয়া দেবগণের জন্য আনয়ন করেন।'

এস্থলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে অরণিদ্বয়ের মন্থন দ্বারা তাহার পুনরুৎপাদনের উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীকদিগের মধ্যে এরূপ প্রবাদ যে প্রমেথুস (Prometheus) লোকহিতের জন্য স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন। প্রমন্থন—(বলপূর্ব্বক অরণিদ্বয়ের মন্থন) শব্দের সহিত তাঁহার নামের বিশেষ সাদৃশ্য। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে :—

"অগ্নিই সকল দেবতা, বিষ্ণুও (মধ্যাহ্ন সূর্য্য) সকল দেবতা, এই অগ্নি এবং বিষ্ণুর শরীরই যজ্ঞীয় দেবগণের আদি ও অন্তস্থানীয়। অতএব যখন অগ্নি ও বিষ্ণুর জন্য পুরোডাশ অর্পিত হয়, সেই পুরোডাশ সমস্ত দেবমণ্ডলীর সুখবিধান করে।"*

দেবগণের মধ্যে অগ্নির এইরূপ উচ্চ অধিকার লাভের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে ইতিহাস অক্ষম। ইতিহাসেরও জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই অগ্নির গৌরব সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের অতীত দেখিয়াই কি শাস্ত্রকারগণ বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলিতে বাধ্য হইয়াছেন ? অগ্নির দেবত্ব বিষয়ে কোন প্রশ্নের অবতারণা করিতেই কেহ কখনও সাহসী হন নাই। অগ্নিপূজার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ অসম্ভব হইলেও, অগ্নির অভাবে বৈদিক ঋষিগণ যে কত কষ্ট পাইতেন, তাহা ঋগ্বেদেরই দুই একটি সূক্ত হইতে অনুমান করা যায়।

"অগ্নি জলমধ্যে তিরোহিত হইলেন। পশু পলায়ন করিলে যেমন পদচিহ্ন দ্বারা তাহার অনুসন্ধান করে, সেইরূপ পরিচর্য্যাকারীরা অগ্নির অনেক অনুসন্ধান করিল। ধীর ভৃগুবংশীয়েরা অগ্নিলাভের ইচ্ছায় স্তব করিতে করিতে তাঁহাকে পাইলেন। বৈভুবস ত্রিত অনেক কামনা করিয়া এই অগ্নিকে ভূমির উপরে লাভ করিলেন।"†

দূরতাই চারুতার নিদান। অধুনা দ্বাদশবর্ষ কল্প বালকেরও পকেটে দিয়াশালাই, মুখে ধূমায়মান সিগারেট্। আমাদের পক্ষে বৈদিক ঋষির "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" উপহাসের কথা হইবে আশ্চর্য্য কি ? আজকালও বিলাতে পর্য্যন্ত জলের দুর্ভিক্ষের কথা শোনা যায়, কিন্তু জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে অগ্নির দুর্ভিক্ষ সভ্যজগতে অসম্ভব হইয়াছে। আদিম মানবের অবস্থা অন্যরূপ ছিল, হয়ত লৌকিক কৌশল দ্বারা উৎপন্ন অগ্নি এক সময়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ইরাণ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে অগ্নির অভাব একবার কল্পনা করুন। হয়ত ফল মূল আহার দ্বারা জীবন মাত্র ধারণ সম্ভব ছিল, কিন্তু রাত্রিকালে শীত এবং অন্ধকারে তাঁহাদের কষ্টের সীমা ছিল না। হয়ত

---

* "ত্রীণি শতা ত্রীসহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবানব চাসর্পয়ন্। ঔক্ষন্ঘৃতৈ বস্তৃণন্বর্হিরস্মা আদিদ্ধোতারং ন্যসাদয়ন্ত।" ৩-৯-৯। ঋগ্বেদ ॥

* অগ্নিবৈ সর্ব্বা দেবতা, বিষ্ণুঃ সর্ব্বা দেবতা।
এতে বৈ যজ্ঞস্যান্ত্যেতন্বৌ যদগ্নিশ্চ বিষ্ণুশ্চ, তদ্যদাগ্নাবৈষ্ণবং
পুরোডাশং নির্বপন্ত্যন্ত এবতদ্দেবানৃধ্নুবন্তি ॥১-৫

† ইমং বিধন্তো অপাং সধস্থে পশুন নষ্টং পদৈরনুগ্মন্। গুহা চতন্তমুশিজো নমোভির্বিচ্ছন্তো ধীরা ভৃগবোবিন্দন্। ২। ইমং ত্রিতো ভূর্য্যবিন্দদিচ্ছন্বৈভুবনে মূর্বণ্য ন্যায়াঃ। ৩। ম ১০-সূ-৪৬ ॥

নিবিড় অরণ্য মধ্যে বৃক্ষের পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নির উৎপত্তি তাহাদের মধ্যে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিল, হয়ত তিনি নিজের হস্ততলদ্বয় ঘর্ষণ করিয়াও দেখিলেন ঘর্ষণ দ্বারা হাত উষ্ণ হয়। হয়ত নানাপ্রকার শুষ্ক বস্তু পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া দেখিলেন, যতই ঘর্ষণ করা যায়, ততই উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণ করিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। হয়ত ক্রীড়াচ্ছলে বালকেরা শুষ্ক কাষ্ঠদ্বয় লইয়া ঘর্ষণ করিতে করিতে সহসা দেখিল অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে,—এবং ইন্ধনযোগে সেই অগ্নি তাহার সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া সুস্নিগ্ধ উত্তাপ এবং উজ্জ্বল দীপ্তিতে চতুর্দ্দিক অনুপম সুখ এবং শোভায় উদ্ভাসিত করিয়াছে। ধূমকলের আবিষ্কারে লোক বিস্মিত হইয়াছিল, ফনোগ্রাফের আবিষ্কারে লোক বিস্মিত হইয়াছিল, পুষ্পকযানের (Airship) আবিষ্কারেও লোকে বিস্মিত হইয়াছে। কিন্তু অরণিদ্বয়ের মন্থনে অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া আদিম মানবের মনে যে অপার আনন্দ এবং বিস্ময়ের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহার সহিত এসকলের তুলনা হয় না। তখন স্বভাবতঃ প্রাচীন ঋষির উদ্বেলিত হৃদয় বলিয়া উঠিল "অগ্নিমীলে।" যখন তাঁহারা দেখিলেন খদ্যোত-সমান কণামাত্র অগ্নি ইন্ধনযোগে সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিতে সক্ষম, অথবা যখন দেখিলেন পার্ব্বত্য নিবিড় অরণ্যে বিদ্যুৎযোগে অথবা বাত্যান্দোলিত বৃক্ষশাখার ঘর্ষণে নিরাকার হইতে সাকারের উৎপত্তির ন্যায়, সহসা অগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া মহাপরাক্রমের সহিত দিগ্দিগন্ত দগ্ধ করিয়া মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা দেখাইয়া, পুনরায় যেন নিরাকারে বিলীন হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে—যেন পুনরায় কাষ্ঠমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, সেই বলের পুত্র অগ্নি শিশুর ন্যায় শয়ন করিয়াছে,—তখন প্রাচীন ঋষির মন নিশ্চয়ই যুগপৎ ভয়, বিস্ময়, হর্ষ এবং ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছিল। এই মহাপ্রভাবশালী অগ্নি কোনরূপে কোথায় লুক্কায়িত ছিল, কি করিয়া আবার আবির্ভূত হইল, আবার কি করিয়া কোথায় তিরোহিত হইল! তাঁহাদের স্বাভাবিক কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই অগ্নি দেবতা অথবা নিরাকারে সাকাররূপ ভিন্ন কি হইতে পারে? বিশ্বদেবতার প্রতীকস্বরূপ,—অথবা তাহারই রূপভেদ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? স্বভাবতঃই তাঁহারা ঘৃতাদি বিবিধ আহুতি দ্বারা সেই দেবতার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ।" রামায়ণ॥ "যে লোকের যাহা অন্ন, সেই লোকের দেবতারও তাহাই অন্ন।*"

ইন্দ্রাদি অপরাপর বৈদিক দেবগণের কল্পনাও এইরূপ। ইহাই বৈদিক যাগযজ্ঞের মূলতত্ত্ব। কিন্তু পরিচয়ই অনাদরের নিদান—"Familiarity breeds contempt"—অগ্ন্যাদি দেবগণ রহিল, যাগযজ্ঞও রহিল, কিন্তু যতই লোকে অগ্ন্যাদির সহিত সুপরিচিত হইতে লাগিল, ততই সেই প্রাথমিক বিস্ময়, ভক্তি, আনন্দ, ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। ক্রমে অগ্ন্যাদি দেবগণের দেবত্ব সম্বন্ধেও লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলেই আমরা দেখিতে পাই ইন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঋষির মনে সংশয় হইয়াছে:—

"যদি সত্যই ইন্দ্র থাকেন, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যস্তোম (স্তুতি) কীর্ত্তন কর। নেম ঋষি বলেন:—ইন্দ্র নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে? কাহার স্তব করিব?" ১০০-৩।

সেই সংশয় দিন দিন গাঢ়তর হইল।

৫। যজ্ঞের পরিণতি এবং জ্ঞানকর্ম্মের বিবাদের সূত্রপাত।

দেবগণের প্রতি সংশয়। "কাহার স্তব করিব?" কাহাকে আহুতি প্রদান করিব? সংশয়ের সঙ্গেই অগ্ন্যাদি দেবগণের প্রতি লোকের অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তির হ্রাস হইতে লাগিল। অপর দিকে যেন সেই ক্ষতি পূরণের জন্যই যজ্ঞাদি বাহ্যানুষ্ঠানের আড়ম্বরও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পৌরোহিত্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহারা পরম্পরাগত স্তোত্র এবং অনুষ্ঠান-বিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী তাহারা পুরুষপরম্পরায় পুরোহিত-শ্রেণীতে পরিণত হইল। প্রাচীন ইরাণে যেরূপ প্রাচীন ভারতেও সেইরূপই হইয়াছিল। পৌরোহিত্য ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের সমারোহও বৃদ্ধি পাইল। পুরোহিতগণ ব্যবসায় বিস্তারের জন্য যজ্ঞের সঙ্গে ঐহিক পারত্রিক ফল-বিষয়ক নানা প্রকার উপকথা "পুষ্পিতাং বাচং" প্রচার করিল। কালক্রমে তাহা ঐতরেয়

* প্রসুস্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি। নেন্দ্রোস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ইং দদর্শ কমভিষ্টবাম। ৮-১০০-৩।

প্রভৃতি ব্রাহ্মণের আকারে লিপিবদ্ধ হইয়া পৌরোহিত্য ব্যবসায়ের বিশেষ সহায় হইল। যজ্ঞাদির প্রকৃত মর্ম্ম যতই লোকে ভুলিয়া গেল, ততই দিন ...ক্রভক্তির খেলা আরম্ভ হইল। এইরূপে যজ্ঞের বাহ্যাড়ম্বর বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে বিস্তীর্ণ অশ্বমেধ এবং রাজসূয় প্রভৃতির আকার ধারণ করিল। আমরা ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলেই দেখিতে পাই যজ্ঞোপলক্ষে রাজাগণ পুরোহিতদিগকে কিরূপ অকাতরে ধনদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন :—ঋষি শোভরি চিত্র নামক রাজার ধনদানের স্তুতি করিতেছেন :—

"এই ধন কি আমায় ইন্দ্র কিম্বা সুভগা সরস্বতী দিয়াছেন? অথবা হে চিত্র (রাজা), তুমি দিয়াছ। সরস্বতীতীরে অন্য যে যে আছেন, পর্জ্জন্যের বারিধারার ন্যায় চিত্র সহস্র এবং অযুত ধনদানে তাহাদিগকে কৃপা করেন।" ৮-২১--১৭, ১৮ ॥*

দানস্তুতিই অনেক ঋকের দেবতা হইয়া পড়িয়াছিল—বশ ঋষি পৃথশ্রবার দানের স্তুতি করিতেছেন :—

"আমি ষষ্টি সহস্র অযুত অশ্ব, বিশ শত উষ্ট্র, এবং দশ সহস্র গো লাভ করিয়াছি।" ৮-৪৬-২২ ॥†

এইরূপে যজ্ঞের সহিত পুরোহিতদিগের স্বার্থ অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ হইল। পুরোহিতেরা কখনও আপনাদিগের ব্যবসায় নষ্ট হয় এরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন না। বরং পৌরোহিত্য ব্যবসায়কে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব উপায় অবলম্বন করিলেন। যজ্ঞ আর পূর্ব্বের মত সহজসাধ্য রহিল না। যজমান এবং যজমানপত্নী নিজেরাই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অগ্নির আসনের জন্য কুশ বিস্তার করিয়া অগ্নিদেবকে "অগ্নি আগমন কর" "অগ্ন আয়াহি" বলিয়া ডাকিয়া "কুশোপরি উপবেশন কর" "নিষৎসিবর্হিসি" "হব্যদাতার হব্য গ্রহণ কর" বলিয়া তাহাকে নিজ হস্তেই ঘৃতাদি আহুতি প্রদান করিবেন—যজ্ঞ আর সেরূপ সহজসাধ্য রহিল না। পুরোহিত হইল ক্রমে চারিজন, তাহার পর সাত জন, তাহার পর ষোলজন পুরোহিত! ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিবেন যজ্ঞের খুঁটিনাটি কত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়াছে যাহা পুরোহিত ভিন্ন কেহ জানিতে পারে না। চরু, পুরোডাশ কিরূপে প্রস্তুত করিবে, কত খণ্ড কপালে বা চাড়াতে তাওয়া প্রভৃতি পাত্রে অর্পণ করিবে,—"একাদশ খণ্ড কপালে পুরোডাশ প্রদত্ত হয় অথচ তাহার ভোক্তা দুই জন দেবতা—অগ্নি ও বিষ্ণু—ইহা কি সূত্রানুসারে, কি প্রকারে বিভক্ত হয়।"—ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্নের বিচার! অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপের সময় কোন্ ঋঙ্মন্ত্র, কোন্ পুরোহিত উচ্চারণ করিবে, যজমানকে কিরূপে সংস্কার করিতে হয়; কত মুষ্টি কুশ দ্বারা যজমানের শরীর পরিষ্কার করিতে হয়; বস্ত্র দ্বারা দীক্ষিতকে কিরূপে গর্ভস্থ শিশুর উদরের ন্যায় আচ্ছাদন করিতে হয়, কিরূপে কৃষ্ণ মৃগচর্ম্ম দ্বারা জরায়ুর ন্যায় দীক্ষিতকে বেষ্টন করিতে হয়, দীক্ষিতকে কিরূপে গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ের গভীর গবেষণা! তাহার সঙ্গে আবার এসকলের সাঙ্কেতিক (Symbolical) ব্যাখ্যা :—

"যে ব্যক্তি পুত্র-পশ্বাদি-অবলম্বন-রহিত সে ব্যক্তি ঘৃতপক্ক তণ্ডুল দ্বারা চরু অর্পণ করিবে। সে চরুতে যে ঘৃত তাহা স্ত্রীশক্তি স্থানীয়, এবং তাহাতে যে তণ্ডুল তাহা পুরুষশক্তি স্থানীয়। সেই ঘৃতযুক্ত চরু দম্পতি সদৃশ"—ইত্যাদি।

এইরূপে যজ্ঞের আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ রহস্যপূর্ণ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আকার ধারণ করিল। পুরোহিত-শ্রেণী ভিন্ন অন্য কাহারও তাহাতে প্রবেশাধিকার রহিল না। যজ্ঞের এই "বার হাত শসার তের হাত বীচির" অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন :—

"জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদাং, ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং প্রতি।"

অপর দিকে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্ত নামে অভিহিত ৯০ সূক্তে আমরা দেখিতে পাই যে দেবগণ বিশ্বপুরুষকেই হবি কল্পনা করিয়া যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞের আজ্যভাগ বসন্ত, যজ্ঞকাষ্ঠ গ্রীষ্ম, ঘৃত শরৎ। দেবগণ সেই আদিপুরুষকে যজ্ঞরূপে অগ্নিতে প্রদান করিলেন। তাহা হইতে পশ্বাদি এবং বেদসকল উৎপন্ন হইল। দেবগণ সেই পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভাগ করিলেন। তাহারই এক এক খণ্ড হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্রাগ্নি, বায়ু, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, ভূমি এবং দিকসকল উৎপন্ন হইল। যজ্ঞ আর সামান্য

---

* 'ইন্দ্রো বা ঘেদিয়ন্মঘং সরস্বতী বা সুভগা দদির্বসু। ত্বং বা চিত্র দাশুষে।" ৮-২১-১৭।

"চিত্র ইদ্রাজা রাজকাইদণ্যকে যকে সরস্বতী মনু। পর্জন্য ইব ততনদ্ধিবৃষ্ট্যা সহস্রমযুতা দদৎ।" ৮-২১-১৮।

† "ষষ্টিং সহস্রমশ্ব্যাযুতাসন মুষ্ট্রাণাং বিংশতি শতা। দশশ্যাবীণাং শতাদশ, ত্র্যরুষীণাদশ গবাং সহস্রা।" ৮-৪৬-২২।

বাহ্য-অনুষ্ঠান রহিল না। ভক্ত কবি উপাসক বিশ্বসংসারময় এক মহাযজ্ঞ দেখিতে লাগিলেন এবং বলিয়া উঠিলেনঃ—"যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুঃ।" যজ্ঞ একপ্রকার গুহ্য আধ্যাত্মিক ব্যাপার হইয়া পড়িল। গীতাতে আমরা অসংখ্য প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা :—দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, এবং জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদি (৪ ২৮)। আধুনিক মনুসংহিতাতেও আমরা পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধি দেখিতে পাই, যথা :—অধ্যাপন বা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ বা পিতৃযজ্ঞ, হোম বা দৈবযজ্ঞ, বলি বা ভূতযজ্ঞ, অতিথিপূজা বা নৃযজ্ঞ। বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই অনেক জ্ঞানী ঋষি বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য লোকং বিশন্তি"—"যজ্ঞলভ্য পুণ্যের ক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে পুনঃপ্রবেশ করে।" "নাকস্য পৃষ্ঠে, তে সুকৃতে নুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি।" "স্বর্গে সৎকর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া পুনরায় তাহারা এই মর্ত্ত্যলোকে অথবা নরকাদি হীনতর লোকে গমন করে।"

এইরূপে কালক্রমে আমাদের দেশে জ্ঞানকর্ম্মের বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। একদল পুরোহিত-শ্রেণীর মুখপাত্র হইয়া বলিতে লাগিল :—"কর্ম্ম হইতে জীবনের জন্ম" "কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাই বেদের লক্ষ্য।" আর একদল জ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়া বলিতে লাগিল :—

"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ"—"একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও, অন্য কথা পরিত্যাগ কর। আত্মজ্ঞানই অমৃতত্ব লাভের উপায়।"

পরে একদলের নেতা হইলেন জৈমিনি। তাঁহার মতে কর্ম্মই মুখ্য,—জ্ঞান আনুসঙ্গিক মাত্র। অপর দলের নেতা হইলেন বাদরায়ণ। তাঁহার মতে জ্ঞানই মুখ্য—কর্ম্ম আনুসঙ্গিক মাত্র। কর্ম্মীর মতে জ্ঞান-বিষয়ক শ্রুতি অর্থবাদ মাত্র। জ্ঞানীর মতে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের সহায়তা করা ভিন্ন কর্ম্মের অন্য কোন স্বতন্ত্র প্রয়োজন নাই। এই উভয়দলের সন্ধিস্থলে তৃতীয় একদলেরও অভ্যুদয় হইল। তাঁহারা কর্ম্ম এবং জ্ঞানের সামঞ্জস্য স্থাপনে যত্নবান হইলেন। তাঁহাদের মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইই এক :—

"সাঙ্খ্য-যোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।" "জ্ঞান এবং কর্ম্মের ভিন্নত্ব বালকোচিত প্রলাপমাত্র।" গীতা॥ "পক্ষদ্বয় দ্বারা যেমন পক্ষী আকাশে গমন করিতে সক্ষম হয়, মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান এবং কর্ম্মও সেইরূপ দুইটী পক্ষস্বরূপ।" "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণো গতিরিত্যাদি।" যোগ-বাশিষ্ঠ॥

৬। বৈদিক কর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংগ্রাম।

অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের জীবন্ত প্রভাব দাবানলের মত দেশময় বিস্তৃত হইল। বুদ্ধদেবের উদার সার্ব্বভৌমিক প্রেম এবং সমতার আদর্শের সমক্ষে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বালির অট্টালিকা আর দাঁড়াইতে পারিল না। যেন আকস্মিক বিদ্যুৎপাতে পুরোহিত-শ্রেণীর মুখের গ্রাস হস্তচ্যুত হইল। কিন্তু তাহা দেখিয়াও পুরোহিত-শ্রেণী নিরাশ হইল না। তাহারা সময়ের প্রতীক্ষায় রহিল। কালক্রমে যখন বৌদ্ধ-শিক্ষা প্রেমভক্তিবিহীন শুষ্ক হৈতুকবাদে পরিণত হইল, তখন সুযোগ বুঝিয়া পুরোহিত শ্রেণী স্বীয় ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে আরম্ভ করিল। শবর স্বামী জৈমিনিকৃত কর্ম্মমীমাংসা সূত্রের এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্য রচনা করিলেন। বিখ্যাত কুমারিলভট্ট সেই ভাষ্যের এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বার্ত্তিক রচনা করিলেন। পণ্ডিতবর কুমারিল প্রথমে বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারে অনেকবার পরাজিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধশিক্ষা লাভ করিলেন। পুনরায় তিনি বৈদিক কর্ম্মমার্গের পক্ষে বৌদ্ধদিগের বিপক্ষে সমর ঘোষণা করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। তখন তিনি "অসংখ্য বৌদ্ধ এবং জৈনদিগকে নানাবিদ্যাবিষয়ক বিচারে পরাজিত করিয়া, রাজার আদেশক্রমে পরশু দ্বারা তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিলেন, এবং বহু উদূখলে নিক্ষেপ করিয়া মুষলাঘাতে তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিলেন। এইরূপে দুষ্টমতসকল ধ্বংস করিয়া তিনি নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন।"* কিন্তু এত করাতেও উৎসন্ন বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি, অথবা বিলুপ্ত বৈদিক দেবতা পুনর্জীবিত হইল না। পুরোহিত-শ্রেণী নিষ্ঠুরদণ্ডনীতির বলে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিনাশ সাধন করিয়া তাহাদের ধ্বংসাবশিষ্টকে স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার মানসে কৃপানীতি অবলম্বন করিলেন। কঠোরের পর কোমল সর্ব্বদাই কার্য্যকরী

* ভট্টাচার্য্যাখ্যো দ্বিজবরঃ কশ্চিদুদগ্দেশাৎ সমাগত্য দুষ্টমতাবলম্বিনো বৌদ্ধান্ জৈনানসংখ্যাতান্ রাজমুখাদনেকবিদ্যাপ্রসঙ্গভেদৈর্নির্জ্জিত্য তেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশ্ছিত্ত্বা বহুষু উদূখলেষু নিক্ষিপ্য কটভ্রমণৈঃ চূর্ণীকৃত্যৈবং দুষ্টমতধ্বংসমাচরন্ নির্ভয়ো বর্ত্ততে। শঙ্করবিজয়—প্রকরণ ৫৫॥

হয়। যদিও বৈদিক ধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজার কোনও স্থান নাই, তথাপি পুরোহিত-শ্রেণী বৌদ্ধদিগের বুদ্ধমূর্ত্তিপূজার অনুকরণে দেশের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার পরিচিত অপরিচিত দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহারা বুদ্ধকেও বিষ্ণুরই অবতারবিশেষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অবতারদিগের মধ্যে বুদ্ধ স্থানলাভ করিলেন বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহার পক্ষে গৌরবের কিছুই নাই। পদ্মপুরাণে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন:—"দৈত্যদিগের বিনাশের জন্য বুদ্ধরূপী বিষ্ণু ক্ষপণক জৈন প্রভৃতি অসৎ বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন।" এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে তাড়িত হইল। কিন্তু বৈদিক দেবগণ অথবা লুপ্ত বৈদিক যাগযজ্ঞ পুনর্জ্জীবিত হইল না! যাহা হউক ক্ষেত্র আশাপ্রদ, সময় অনুকূল, দেশ হস্তগত—পুরোহিত-শ্রেণী সেই সুযোগ হারাইলেন না। তাঁহারা প্রাচীন পুরাণ-সকল পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত করিয়া অথবা বৈদিক ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ আভাস গ্রহণ করিয়া, ব্যাসের নামে নূতন পুরাণ রচনা করিয়া অথবা মহাদেবের নামে তন্ত্রাদি রচনা করিয়া এবং অজ্ঞলোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয় এরূপ দেবদেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদিগের ব্যবসায় রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেই দেখিতেছি নারদ ব্যাসকে কাম্য ফল লাভের জন্য নামরূপাদিযুক্ত কল্পিত দেবতাপূজায় লোককে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন:—"জুগুপ্সিত বা নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মাদিতে লোক স্বভাবতঃই অনুরক্ত। সেরূপ কাম্য কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ করা তোমার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। তোমার বাক্যকে আশ্রয় করিয়া সাধারণ লোকে এইসকল কাম্য কর্ম্মকেই ধর্ম্ম মনে করিবে। কোন তত্ত্বজ্ঞানী যদি তাহাদিগকে সেই-সকল কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করে তাহারা সে নিষেধ গ্রাহ্য করিবে না।" "জুগুপ্সিতং ধর্ম্ম কৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাব-রক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ। যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতঃ ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥" সে যাহা হউক স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিবলে পুরোহিত-শ্রেণী লোকের ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া আপনাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইলেন। কুমারিলের অভ্যুদয়ের শেষভাগে শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়। 'বৈদিক জ্ঞানমার্গের প্রতিষ্ঠা, অথবা উপনিষদের ব্রহ্মের জ্ঞান প্রচার করাই শঙ্করের জীবনব্রত। তিনি যে কর্ম্মমার্গের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন এরূপ বলা যায় না। তবে চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্য ভিন্ন যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি বলেন "চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম" চিত্তশুদ্ধি সাধন দ্বারা জ্ঞানাগমের পথ সুগম করা ভিন্ন কর্ম্মের কোন স্বতন্ত্র প্রয়োজন নাই। শঙ্কর কাম্যকর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। ঐহিক অথবা পারত্রিক সম্পদ-লাভের উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। এই জন্যই কর্ম্মিগণ সময়ে সময়ে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া শঙ্করের নিন্দা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণ শঙ্করাচার্য্যকেও এজন্য অতি তীব্র-ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। মহাদেব তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈত মত নৈষ্কর্ম্ম্য মত এবং মায়াবাদ সম্বন্ধে পার্ব্বতীকে বলিতেছেন:—"হে দেবি, কলিকালে আমিই ব্রাহ্মণের রূপে (শঙ্করাচার্য্য) মায়াবাদ নামক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ অসৎশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি। আমি তাহাতে শ্রুতিবাক্যের লোক-নিন্দিত অযথা অর্থ প্রদর্শন করিয়াছি, কর্ম্মের স্বরূপ-ত্যাজ্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছি। সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ, জীবাত্মা-পরমাত্মার একত্ব এবং পরব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছি। সমস্ত জগতের বিনাশের জন্য আপাততঃ বেদার্থের অনুযায়ী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবৈদিক মায়াবাদরূপ মহাশাস্ত্র জগতের বিনাশের জন্য কলিকালে আমিই বলিয়াছি।" ইহাতে দেখা যায় পদ্ম-পুরাণাদি কত আধুনিক গ্রন্থ।

আমরা শ্রৌত বা শ্রুতি (বেদ)-বিহিত এবং স্মার্ত্ত বা স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণন করিলাম। শ্রৌতকর্ম্ম বহুকাল হইতে বিলুপ্ত; স্মার্ত্ত কর্ম্ম মাত্রই দেশে কথঞ্চিৎ প্রচলিত। মনুসংহিতা বলিতেছেন:—"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলঃ" ২-৬—বেদই সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মের মূল। স্মৃতিরও মূল শ্রুতি। "ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমংশ্রুতিঃ" ২-১৩॥ তাঁহার টীকায় কল্লূক বলিতে-ছেন:—'শ্রুতি এবং স্মৃতির অর্থের বিরোধ হইলে স্মৃতির অর্থ আদরের অযোগ্য', এবং প্রমাণ-স্বরূপ জাবালের মত:—"শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী"; এবং জৈমিনীর মত:—"বিরোধেত্বনপেক্ষ্যংস্যাদসতিহ্যনুমানং" উল্লেখ করিতে-

ছেন। আমাদের শাস্ত্রমতে যদিও শ্রুতি স্বয়ং এ সম্বন্ধে নীরব, একমাত্র শ্রুতিই অপৌরুষেয়, প্রত্যক্ষবৎ এবং অভ্রান্ত ঈশ্বর-বাণী। দেশের প্রচলিত ব্রতপূজাদির শ্রুতিগত কোন ভিত্তি নাই। স্মৃতি অনুমান মাত্র এবং অপরাপর অনুমানের ন্যায় পরীক্ষার যোগ্য। টাকা যেমন লোকে বাজাইয়া লয়, স্মৃতির বচনও সেইরূপ বাজাইয়া লইতে হয়। স্বতঃ-প্রমাণতা একমাত্র শ্রুতিরই অধিকার। স্মৃতির সেরূপ কোন অধিকার নাই। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় মনুস্মৃতি বলিতেছেন 'ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ' শূদ্রকে সুমতি দান করিবে না; এই নিষেধ বচনের শ্রুতিগত কোন মূল দৃষ্ট হয় না। শ্রুতি ঈশ্বরবাণী হইলে ঈশ্বরের পক্ষে এরূপ শূদ্র-বিদ্বেষ অসম্ভব। আবার মনু ঋগ্বেদেরও মনু বা আদিম মানব। তাঁহার ভাষা বৈদিক সংস্কৃত না হইয়া আধুনিক সংস্কৃত হইতে পারে না। কোন আধুনিক শূদ্রবিদ্বেষী মনুর নাম দিয়া উক্ত বচন প্রচার করিয়া থাকিবে ইত্যাদি কারণে 'ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ' এবম্বিধ স্মৃতিবচন প্রমাণের অযোগ্য। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশের অধুনাতন প্রচলিত ব্রতপূজাদি দ্বারা শ্রুত্যুক্ত পারলৌকিক স্বর্গাদি ফললাভের কতদূর সম্ভাবনা, আপনারাই বিচার করিবেন। আমরা দেখাইয়াছি যে বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের পরে, লুপ্ত বৈদিক কর্ম্মের স্থান পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে স্মৃতিপুরাণাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গীতা যথার্থই বলিয়াছেন, "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ" কর্ম্মের তত্ত্ব অতি জটিল। কর্ম্ম বলিতে এস্থলে গীতাও শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মকেই লক্ষ্য করিতেছেন।

বস্তুতঃ সকল ধর্ম্মকর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি "চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম।" যে কার্য্য করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় তাহাই যথার্থ কর্ম্ম, তাহাই কর্ত্তব্য। বাপী তড়াগাদি খনন বা পূর্ত্তকার্য্য অথবা অন্য প্রকার জনহিতকর কার্য্য করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। মানুষ জ্ঞানে মানুষ-মাত্রেরই প্রতি প্রেম এবং মর্য্যাদা প্রকাশ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, অতএব এসকলই যথার্থ কর্ম্ম। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিলে, তাঁহারই সেবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নরনারীর সেবারূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে, চিত্ত শুদ্ধ হয়, অতএব তাহাই যথার্থ কর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র "তস্মিন প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ"—ইহাই যথার্থ কর্ম্ম-বীজ। "শুচির্দ্বিজোঽহং শ্বপচস্তুজেতি"—বলিয়া স্বীয় ধর্ম্মাভিমানে স্ফীত হইয়া চণ্ডাল কিংবা মেথরের প্রতিও ঘৃণাপ্রদর্শন করিলে, চিত্ত অশুদ্ধ হয়, অতএব তাহা কুকর্ম্ম। অন্যায় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে, অথবা শক্তি থাকিতে প্রত্যুপকার না করিয়া পরের তণ্ডুল ধ্বংস করিলে, চিত্ত অশুদ্ধ হয়, অতএব তাহা কুকর্ম্ম। বস্তুতঃ চিত্তশুদ্ধির মূলই অন্ন-শুদ্ধি। উদার দৃষ্টিতে বিচার করিলে লৌকিক এবং বৈদিক কর্ম্মের ভেদ তিরোহিত হয়। ইহাই কর্ম্মের সার-তত্ত্ব।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

কষ্টিপাথর

ভারতী (ভাদ্র)।

আমার বাল্যকথা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

ছেলেবেলায় বড়দাদা আমার সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন। বড়দাদা যখন খুব ছোট তখন থেকে তাঁর ছবি আঁকার নৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়। সেই বাল্যকালের কবিত্বোচ্ছ্বাস হতে দুটি কাব্যবস্তু প্রসূত হয়—মেঘদূতের পদ্যানুবাদ ও স্বপ্নপ্রয়াণ; তা ছাড়া গুম্ফাক্রমণ কাব্য ও অন্যান্য ছোটখাটো কবিতাও অনেক আছে। গুম্ফাক্রমণ কাব্যের নমুনা—

> পড়ে যেই লোক এ শ্লোক,
> পায় সে গুম্ফলোক ইহার পরে
> যথা গুম্ফধারী ভারি ভারি
> গোঁপের সেবা করি সুখে বিচরে।

তারপরে কিজানি কেন সহসা তিনি তত্ত্ববিদ্যানুশীলনের দুরূহ চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন হলেন, কাব্য ও চিত্রকলা চর্চ্চা ঐখানে থেমে গেল।

তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর দুটী সৌখীন কলা তাঁকে অধিকার করে বসল—কাগজের বাক্স রচনা-প্রণালী, আর রেখাক্ষর বর্ণমালা। তাঁর মতে এ শুধু ছেলেখেলা নয়, এ দুই বিদ্যা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। লেখার সরঞ্জাম আর সহজ লিখনপ্রণালী দুইই তো দরকার। বাক্সতত্ত্বের জন্য তাঁকে অসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে সমস্ত গণিতশাস্ত্র মন্থন করতে হয়েছে এবং বাক্সতত্ত্বের নবগণিতশাস্ত্র আবিষ্কার করে এক আমেরিকান পণ্ডিতের হাতে পরীক্ষার জন্য সম্প্রতি দেওয়া হয়েছে। রেখাক্ষরও এক অপূর্ব্ব বস্তু, তাতে কত কবিত্বরস, কতরকম কৌশলের ছড়াছড়ি। সম্প্রতি এই রেখাক্ষরপদ্ধতি পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছে।

আমি বাল্যকালে রেখাক্ষর লিখনপদ্ধতি অভ্যাস করি নাই, কেবল নিজের সঙ্কেতলিপিতে টুকে নিয়ে অনেক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করতাম। ব্রাহ্মসমাজের বেদী হতে পিতৃদেবের উপদেশ আমি টুকে নিয়ে পরে লিখে তাঁকে দিতাম, তিনি সংশোধন করে ছাপাতে দিতেন; সেইগুলি "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" নামে প্রকাশিত হয়েছে। আমি ইংলণ্ড যাবার পর পিতৃদেবের বক্তৃতা তুলে নেবার কাজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ

নিযুক্ত হন [তাঁর টোকা মহর্ষির উপদেশ 'সাহিত্য' পত্রিকায় কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে।]

বড়দাদা আর আমি দুজনে মিলে গান রচনা করতুম। ব্রহ্মসঙ্গীতের কতকগুলি আমাদের যুক্তরচনা, কতক নিজস্ব রচনা।

বড়দাদা অনেকগুলি ভালো ভালো হেঁয়ালি রচনা করেছিলেন। নমুনা—

১—বল দেখি তিন অক্ষরের কথা,
প্রথম অক্ষরদ্বয়ে সবে যায় বাঁধা ;
শেষ দু অক্ষরে আর সবে যায় বেঁধা ;
সবটাতে দুই পারে—বেঁধা আর বাঁধা ;
মূর্খে কি বলিতে পারে পণ্ডিতের ধাঁধা। (=রসিক।)

২—বল দেখি দুটি ফল,—
তার ভিতরে পাওয়া যায়
ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সকল। (=?)

৩—ইংরাজিতে বলে যাহা প্রথম অক্ষর,
বাঙলায় তাহা বলে দ্বিতীয় অক্ষর,
প্রথমে দ্বিতীয়ে তথা জানায় আপত্তি,
সব তাতে ঘাড় নাড়ে, বিষম বিপত্তি।
দু অক্ষরে ফল এ কি বল দেখি ভাই,
কেহ বলে বড় মিষ্টি কেহ বলে ছাই। (=নোনা।)

বড়দাদা আমাদের বাড়ীর কবি ছিলেন। আমাদের অনেক ঘরাও কথা তাঁর কবিতার মধ্যে স্থান পেত। তিনি তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে আমাদের ভাইদের এইরূপ বর্ণনা করেছেন :—

ভাতে যথা সত্য হেম, মাতে যথা বীর,
গুণোজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির ;
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।

বরাহনগর উদ্যানে।

নিশি অবসান প্রায়, সুখে সবে নিদ্রা যায়,
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চাহে।
ঘা দিয়া হৃদয় মাঝে, মঙ্গল আরতি বাজে,
বেণুধ্বনি কি মধুর তাহে ॥

দ্বিজরাজ হেন বেলা, বাহির হ'ল একেলা
হর্ম্ম্য হ'তে সুরম্য উদ্যানে।
নিঃশব্দ তরঙ্গবতী চলে গঙ্গা স্রোতস্বতী
সনমুখ দিয়া সিন্ধু পানে ॥
শশী অস্ত যায় যায় কি দুর্দ্দশা হায় হায়
কেবা তার দুরবস্থা দেখে॥
এমন যে বন্ধু তারা, স্বচ্ছন্দে এখন তারা
তারে ফেলে যায় একে একে ॥
স্নিগ্ধ অতি এই কাল, নাহি কোন গোলমাল
নিস্তব্ধ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়।
ঝোপে ঝোপে অন্ধকার, নভস্তল পরিষ্কার,
লতাপাতা হিমবিন্দুময় ।
পরপার যায় দেখা, যেন এক চিত্রলেখা,
পশ্চিম দিগন্তে নভসীর।
গাছে গাছে একাকার, মাঝে মাঝে রহে আর
জেবাজর প্রাসাদ কুটীর ।

শাখা পত্র চলাইয়া, জলপুষ্প দুলাইয়া,
বুলাইয়া মাঠ ময়দান।
মৃদুমন্দ বায়ু বহে, মনে মনে দ্বিজ কহে,
আহা কি সুন্দর এই স্থান ॥

শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতন, শান্ত সুশোভন,
সুভদ্র হরিত ক্ষেত্র শ্যামকান্ত নিভৃত কানন।
বিমল শোভায় সরোবর ভায়,
নভসীর বনশ্রীর স্বচ্ছ দরপণ ॥

বড়দাদার সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন রামনারায়ণ পণ্ডিত, 'বহুবিবাহ'-নাটক-রচয়িতা। তাঁহার শিক্ষাগুণে সেই সময় বড়দাদা সংস্কৃত পদ্য রচনা করতেন—

কলিকাতা।

ইংরাজ-রাজরাজ্যং যৎ ত্রিলোকীতলবিশ্রুতং
রাজধানীং সুবিস্তীর্ণাং কলিকাতাং বিভর্ত্তি তৎ।
পয়ঃপূরপ্রবাহিণ্যা গঙ্গয়া পুণ্যসঙ্গয়া
কলিকাতা পুরী ভাতি নিত্যং মেখলিনীব সা।
রথ্যা রম্যাঃ সুগম্যাশ্চ যত্র ভান্তি সহস্রশঃ
দৃতিপাত্রগলদ্বারি নিবারিতরজশ্চ যা
শতঘ্নীশতযুক্তেন দুর্গেণ দুর্গ্রহারিভিঃ
উদ্যৎবিদ্যুৎপ্রভাজাল সৈন্যশস্ত্রশোভনা।
ত্রিলোকবিশ্রুত এই ইংরাজ রাজ্যের মাঝে
সুবিস্তীর্ণা রাজধানী কলিকাতা কিবা সাজে।
পূর্ণকায়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বহিয়া যায়,
তারি অঙ্গে কলিকাতা মেখলিনী সম ভায়।
সুরম্য সুগম্য যথাশত পথ ব্যাপি রয়,
চর্ম্মপাত্র-গলদ্বারি ধূলিরাশি নিবারয়।
শত শত তোপযুত দুর্গ্রহ দুর্গ-রক্ষিত,
উদ্যৎ বিদ্যুৎপ্রভা সৈন্যাস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত ॥

বড়দাদা সংস্কৃত ছন্দে অনেক বাঙলা কবিতা রচনা করেছেন, তার কয়েকটি নমুনা—

প্রভাত বর্ণনা।

বৃক্ষগণ হেলিত সুশীতল সমীরণে,
পুষ্প যত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে।
মত্ত মধুপাবলী আইল ত্বরা করি,
জাগিল বিহঙ্গকুল ভাগিল বিভাবরী।

টঙ্কাদেবী।

ইচ্ছা সম্যক্ জগ দরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি,
পায়ে শিক্লী মন উড় উড় একি দৈবের শাস্তি।
টঙ্কাদেবী করে যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা,
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না খালি ভস্মে ঘি ঢালা।
মন্দাক্রান্তা।

ইঙ্গবঙ্গের বিলাত যাত্রা।

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্তে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে,

স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন-বশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধ্বতি পিরহনে মান রয় না। ১
পিতা মাতা ভ্রাতা নবশিশু অনাথা ছুট করি,
বিরাজে জাহাজে মসিমলিন কুর্ত্তা বুট পরি,
সিগারে উদ্গারে মুহুর-মুহু ধূম্রলহরী
সুখস্বপ্নে আপ্নে মুলুকপতি মানে হরি হরি। ২
বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখীজন রহে জীবন ধরি।
ফি মেলে ফীমেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে। ৩
ফিরে এসে দেশে গল-কলর বেশে হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে উলগতনু দেখে বড় চটে,
মহা আড়ী সাড়ী নিরখি চুলদাড়ী সব ছিঁড়ে
দুটা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে। ৪
শিখরিণী।

বসন্ত।

(রেখাক্ষর বর্ণমালা হইতে)
মধু ঋতু এল ধরণী মাঝে।
হেলে দোলে লতা মোহন সাজে॥
অমৃত বরিষে মৃদু সমীর
পরাণ লভয়ে মৃত শরীর॥
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায়॥
মধুমালতীর ফুটিছে কলি—
চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি
গুন্ গুনায়িছে নব রসিক।
পহরে পহরে কুহরে পিক॥
ফুলের কে পায় কূল কিনারা
অগণন যেন গগন-তারা॥
তরো তরো ফুল রঙ বেরঙ
শতেক ফুলের শতেক ঢঙ
কেহ বা দোলে কেহ বা ঝোলে
কেহ বা গন্ধে মাতায়ে তোলে॥
কদম ছড়ায় কনক-রেণু
রাখাল যথায় বাজায় বেণু॥
রাশি রাশি ফুলে ভরিল সাজি।
ঘরে ফিরি চল আর না আজি॥

মনুয়া।

জাতিতে যদিও বনের টিএ
রতন মাণিক মনুয়াটি এ॥
ছার কোএলিয়া ছার পাপিয়া।
মনুয়াটি মোর লাখ রুপিয়া॥
কেবা জানে কুহু কে জানে পিউ।
গাহে রসভরে চাকে বা জিউ॥
কানে যাহা শুনে দু একবার,
মন থেকে তাহা নড়েনা আর॥

পেন্সিল-প্রকরণ।

লেখনী গুজিয়া কানে পেনসিল্ ধর
এখন লেখ' যা বলি—লেখ "হর হর"॥
পেন্‌সিল্ করিতে হয় অত কি ছুঁচালো?
অতিসূক্ষ্মে কোন কাজ উতরে না ভাল॥
সহজ মধ্যম সুরে বাঁধিবে সেতার।
সপ্তমে বাঁধিলে হবে সামলানো ভার॥
বেশী খাদ ভাল না, ভাল না বেশী জিল।
না সরু না মোটা করি কাটিবে পেন্‌সিল্॥
রেখাক্ষর হবে তবে আজ্ঞার অধীন।
চাপ দিলে মোটা হবে—ঢিল দিলে ক্ষীণ॥
পেন্‌সিল্ খণ্ড তোমার মাসেক দুমাস—
নলপত করিয়া চলিবে যেন হাঁস॥
কালের গতিকে তাহা হয়ে গেলে আধা,
অবাধে চলিবে যেন রজকের গাধা॥
ঐ জন্তুটির মত মাস চারি খাটি
নূতন পেন্‌সিল্ দণ্ড লবে যবে কাটি'
তখন তাহাকে হবে থামানো কঠিন।
ছুটিবে—পরাণ-ভয়ে যেমতি হরিণ॥

সাধন-পদ্ধতি।

কেমনে পাকাবে হাত শুন সাবধানে;
শিষ্য যুটাইয়া আনি মন্ত্র দিবে কানে॥
শিষ্যটিরে কাছে ডাকি সম্ভাষিয়া মিষ্ট
সারস্বত যোগাসনে হ'য়ে উপবিষ্ট—
লেখনী করিয়া হাতে সাজিবে লেখক,
শিষ্যটি হইবে আর উত্তর-সাধক॥
আউড়িবে সে ধীরে ধীরে সমাচারপত্র।
তুলিতে থাকিবে তুমি ছত্র পিছু ছত্র॥
ছিটা ফোঁটা দিবে না রেখাই যাবে টানি।
সঙ্গগুণে তরি যাবে অঙ্গহীন বাণী॥
রেখার পোকামাকড় কৃমি বিটকাল,
উচ্চিংড়ি ফড়িং পিঁপড়া পালে পাল,
ক্ষান্ত হো'ক রোসো আগে করি কিলিবিলি;
ধীরে সুস্থে কোরো শেষে ফুটকুনি বিলি॥
এক-মেটে করিয়া করিবে কাজ ফতে।
দো-মেটে করিবে শেষে অবকাশ-মতে॥

সিদ্ধিলাভ।

প্রথমে প্রথম খণ্ডে পাকাইবে হাত।
দ্বিতীয় খণ্ডের তবে উলটিবে পাত॥
মস্তকে মথিয়া লয়ে পুস্তকের সার।
হস্তকে করিবে তার তুরুক সোয়ার॥
হইবে লেখনী ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া।
আগে কিন্তু পাকা করি বাঁধা চাই গোড়া॥

বড়দাদা গদ্যেও প্রবন্ধাদি অনেক লিখেছেন। তাঁর গদ্য-লেখা সামান্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—দার্শনিক ও সামাজিক। তাঁর সর্ব্বপ্রথম দার্শনিক প্রবন্ধ 'তত্ত্ব-বিদ্যা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সম্প্রতি কয়েকমাস

ধ'রে 'গীতাপাঠ' নামক যে প্রবন্ধগুলি 'প্রবাসী' মাসিকপত্রিকায় আমরা ঔৎসুক্যসহকারে পাঠ করেছি—গীতাশাস্ত্রের এই যে অপূর্ব্ব মৌলিক ব্যাখ্যা—এটি সম্পূর্ণ অবয়বে যখন বেরুবে, তখন ইহা গীতাধ্যায়ীদের পরম আদরের সামগ্রী হবে সন্দেহ নাই। 'তত্ত্ব-বিদ্যা' হতে আরম্ভ করে এই 'গীতাপাঠ' যদি সমাপ্তির মধ্যে গণ্য করা যায়—এই দুইয়ের মাঝখানে বড়দাদার লিখিত বিবিধ দার্শনিক প্রবন্ধ আছে, যেমন "সার সত্যের আলোচনা," "বিদ্যা এবং জ্ঞান," "হারামণির অন্বেষণ," "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ," "বিবর্ত্তবাদ" (evolution), 'বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত," ইত্যাদি। দার্শনিক ছাড়া সামাজিক প্রবন্ধও অনেক এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, যেমন "সোনার কাটি রূপোর কাটি," "আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা," "একটি প্রশ্ন ও উত্তর" ইত্যাদি অনেকগুলি সারগর্ভ ও সুপাঠ্য।

পদ্যই বল, গদ্যই বল, বড়দাদার লেখার যে একটী মাধুর্য্য, প্রসাদ-গুণ, একটী বিশেষত্ব, একটী মৌলিকতা আছে তা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, অন্য কোথাও দেখা যায় না। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বসকল অতি সহজ ভাষায় জলের ন্যায় প্রাঞ্জলভাবে লিখে যাওয়া তাঁর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তাঁর লেখা যে পর্য্যন্ত নিরক্ষর সামান্য লোকেরও বোধগম্য না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। তাই কখন কখন আমরা দেখতে পেতুম তাঁর বড় বড় লেখা, যার কিছুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নেই এমন লোককেও ডেকে শোনাতে তিনি উৎসুক। এই সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। আমাদের একটী পুরাণো দাসী (শিশুকালে যে আমাকে মানুষ করেছিল), আমরা সকলে তাকে কালো' দাই বলে ডাকতুম বড়দাদা তাকে তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' থেকে একটী কবিতা শোনাচ্ছিলেন; তার কানে তা ঠাকুর দেবতার কথার মত কি যে সুধামাখা মিষ্টি লাগল, সে ভক্তির সহিত গড় হয়ে প্রণাম না করে আর থাকতে পারলে না।

বড়দাদার স্মৃতি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত, কখনই বিলুপ্ত হবার নয়। সে ভালবাসা, সেই অট্টহাস, শিশুর ন্যায় সেই সরল অন্তঃকরণ, ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, পুরাণো সে দিনের সে সব কথা কি কখন ভোলা যায়? সে কালের দুএকটি ঘটনা এখনি মনে হচ্ছে। বড়দাদার একটা ভৃত্য ছিল, তার নাম কালী। তার উপর কত রাগ, কত তম্বী, কত ঝড় তুফান গালি বর্ষণ হচ্ছে, আমরা দেখছি অনেক সময় অকারণে; চশমা খুঁজে পাচ্ছেন না তাকে কত ধমকানো হচ্ছে, চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ ফেটে যাচ্ছে অথচ সেই চশমা হয়ত নিজের পকেটে—পকেটে বলাটাও ঠিক হল না, তাঁর চোখের উপর কপালে ঠ্যাকান রয়েছে—আমরা দেখিয়ে দিলে শেষে হেসে অস্থির। এ দিকে এক হাতে যেমন তিরস্কার, পরক্ষণে অন্য হস্তে তেমনি পুরস্কার। এইরূপ ক্ষতিপুরণের কাজ চলেছে, কালীও এই গালি গালাজ চড়টা চাপড়টায় কোন ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মনের সুখে কাজ করে যাচ্ছে।—বড়দাদার ভোলা স্বভাবের দরুণ যে কত লোকে বিপদে পড়ত তার ঠিক নেই। হয়ত কাউকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন সে যথাসময়ে এসে উপস্থিত কিন্তু বড়দাদার কিছুই মনে নেই—তাকে খাওয়ানো দূরে থাকুক তার সামনেই নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছেন অথচ তাকে তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। সে বেচারা প্রতীক্ষা করে আছে কখন তার জন্যে খাবার আসে—এ দিকে রাত হয়ে যাচ্ছে—শেষে বড়দাদার ভুল ভেঙে গেলে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়ে গেল।—একজন বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—বড়দাদা ঠিক সেই সময় বেরবার উদ্যোগে আছেন—তাঁর বন্ধুর গাড়ী নিজের গাড়ী মনে করে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন। সে বন্ধু বসেই আছে বসেই আছে—অনেকক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন তাঁর বন্ধু তখনো সেখানে বসে—বড়দাদা শেষে কারণ জানতে পেরে অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধুর পীঠ চাপ্‌ড়ে তাকে সান্ত্বনা করলেন।

বনের জন্তু পাখী বশ করবার বড়দাদার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যেমন সাধু তুকারামের কথা শোনা যায় সেই রকম। তিনি সকালে তাঁর এজলাসে বসে আছেন আর কত চড়াই, সালিক ও অন্য পাখী তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত থেকে খাচ্ছে—'চড়াই-পাকী চাউল খাকী আয়না ঠোকরাণী" এই আদুরে ভাষায় চড়াইকে ডাকছেন। কত কাঠবেড়ালী তাঁর গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। ইঁদুরও খাবার ভাগ পায়। কাকের তো কথাই নেই, ওরা নাই পেলেতো মাথায় চড়বেই কিন্তু কাককে প্রশ্রয় দিলে অন্য পাখীদের উপর জুলুম করা হয়। একদিন তিনি বিরক্ত হয়ে একটা দাঁড়কাককে মেরে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। পরদিন দেখেন সে কাক যথাসময়ে তাঁর মজলিসে হাজির নেই। এই দেখে হুলস্থূল বেধে গেল। সে কোথায় খোঁজ খোঁজ। খুঁজতে নানা দিকে চর পাঠনো হল, তারা দ্যাখে সে কাক কোন একটা দূরের গাছে বসে আছে—তাকে আনিয়ে বড়দাদা তবে সুস্থির।

বড়দাদার যা নিত্য নিয়মিত প্রাতঃস্নান ঠাণ্ডা জলে—তা চিরকালই সমান চলছে—শীতে গ্রীষ্মে রোগে অরোগে তার আর বিরাম নাই। ব্যামোর সময় তাঁকে ঔষধ পথ্য সেবন করানো এক বিষম দায়। তাঁর লেখায় মগ্ন হয়ে তিনি অনেক সময় আহার, নিদ্রার নিয়ম ভুলে যান।

হাফেজের সহিত একদিন —শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্র—

কামনাকে হোমানলে পূত করিয়া যাঁহারা তাহাকে সাধ্বীর সীমন্তে সিন্দুরবিন্দুর মতো মনোমোহন এবং উজ্জ্বল করিয়া তুলেন তাঁহারাই প্রকৃত কবি, এবং এহিসাবে হাফেজের স্থান অতি উচ্চে। কামনাকে তিনি শুধু তাহার বীভৎসতার দিক দিয়া না দেখিয়া, তাহার মধ্যে বিশ্বসৌন্দর্য্যের যে একটি ছায়া প্রকটিত হয়, তাহারই ধ্যানে মুগ্ধ হইতেন; তাই পানপাত্র, সুরা এবং রমণী তাঁহার বর্ণনার প্রধান বিষয় হইলেও কোনটিকেই তিনি বিলাসীর বর্ণনায় পর্য্যবসিত করেন নাই। আনন্দের তিনি চিরভক্ত, এই তিনটির ভিতরকার আনন্দের অনুভূতিই তাঁহাদিগকে তাঁহার নিকট বরণীয় করিয়াছিল। তিনি হেয়ের মধ্যেও প্রেয় দেখিতে পারিতেন—আমরা যে সকল বিষয় হইতেই আনন্দের পূর্ণস্বাদ পাইতে পারি, ইহাই হাফেজের কাব্য-জীবনের মূলমন্ত্র।

হাফেজের সহিত চণ্ডিদাস ও বর্ণসের কবিতার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হাফেজ আনন্দের পূর্ণাবতার; চণ্ডিদাসের সুর বিষাদময়।

বিশ্বে চলিতে হইবে, নিত্য নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া, নূতন আনন্দ আস্বাদন করিয়া,—এমন কথা হাফেজ বহুবার বলিয়াছেন। ঠিক এমনি কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও পাই।

হাফেজ ভণ্ডামি দেখিতে পারিতেন না। তিনি প্রেমের চির-উপাসক ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন প্রেমই স্বর্গের সোপান। তাই তিনি সেই ধর্ম্মান্ধতার যুগেও আল্লাকে প্রিয়ার পায়ের ভৃত্য ও স্বর্গকে প্রিয়ার বিহারভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সৌন্দর্য্য যে-আকারেই আসুক না কেন হাফেজ তাহা পূজা করিতেন।

দুই একটি কথায় হৃদয়ের মধ্যে একটি মধুর রাগিণী সৃজন করিতে হাফেজ সিদ্ধহস্ত। দুইএকটি তুলিকাস্পর্শে হাফেজ নয়নসমক্ষে যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া দেন তাহাও অতি অপূর্ব্ব।

হাফেজের প্রেমের কবিতা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। প্রিয়া সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে তিনি বলিতেছেন —

ছড়ায় রাস্তার পথে তারা
মণিমুক্তা কতই না জানি ;
আমি কিন্তু মোর প্রিয়া লাগি
আঁখিতে বাঁধাব পথখানি।

* * *

তব কৃষ্ণ কেশপাশে ডুবি
দিন মোর রাত হয়ে যায়—
ওষ্ঠের বেষ্টনী মাঝে পড়ি
আত্মা মম প্রার্থনা হারায়।

* * *

মামুদের প্রাসাদের চেয়ে
বড় করি গড়িলাম বাড়ী।
একি দেখি ? অক্ষি-তারকায়
বাসা নিলে সে সবারে ছাড়ি !

* * *

হে সিরাজি, হে সুন্দরী, হে তরুণ সাথী,
এমন হৃদয় বন্ধু, মোহিয়াছ তুমি ;
তব কপোলের ক্ষুদ্র কৃষ্ণ তিল লাগি
বুখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি !

ইমার্সন বলিয়াছেন যে, হাফেজ নিজের মধ্যে পিণ্ডার, আনাক্রিয়ন, হোরেস এবং বানস্‌ক সম্মিলিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে একটি দার্শনিকের ভাব আছে, তাহা তাঁহার নিজস্ব।

চতুঃষষ্টি কলা—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল—

অতীত যুগে ভারতবর্ষে কলাবিদ্যা উন্নতি লাভ করিয়া ৬৪ বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। (১) গীত। শার্ঙ্গদেব-কৃত সঙ্গীতরত্নাকর, দামোদর-কৃত সঙ্গীতদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং তিন গ্রাম, সপ্তস্বর, দ্বাবিংশতি শ্রুতি, ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতির সাক্ষী। (২) বাদ্য; চার ভাগে বিভক্ত—বীণা প্রভৃতি তত-যন্ত্র, মৃদঙ্গ প্রভৃতি আনদ্ধ-যন্ত্র, বংশী প্রভৃতি শুষির যন্ত্র ও কাংশতাল প্রভৃতি ঘন-যন্ত্র। (৩) নৃত্য; দ্বিবিধ—পুরুষের উদ্দাম নৃত্য তাণ্ডব, ও রমণীর ললিত চরণক্ষেপের নাম লাস্য। নৃত্যাঙ্কুর প্রভৃতি গ্রন্থে নৃত্যের বিবিধ কৌশল ও ভঙ্গীর পরিচয় আছে। (৪) আলেখ্য; ভারতবর্ষে এই বিদ্যা যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহার পরিচয় প্রাচীন কাব্যাদিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। (৫) তিলক-রচনা; এই তিলকরচনার উদ্দেশ্য কাহারো মতে ভ্রূমধ্যে বা নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিতে সহায়তা করিবার জন্য, কাহারো মতে মুখের শোভাসম্পাদনের জন্য। (৬) তণ্ডুল-কুসুম বলি-বিকার; বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত তণ্ডুল বা বিবিধ বর্ণের পুষ্প ভূমিতলে ছড়াইয়া চিত্ররচন—[আলিপনার রূপান্তর]। (৭) পুষ্পাস্তরণ; বিবিধবর্ণের পুষ্প সূত্রে গ্রথিত করিয়া শয্যারচনা। (৮) দশনবসনাঙ্গরাগ; দন্ত, বস্ত্র ও অঙ্গ কুঙ্কুম চন্দনাদি রঞ্জন দ্রব্যে ছোপানো। (৯) মণিভূমিকাকর্ম্ম; বিবিধ প্রকারের প্রস্তরাদির দ্বারা ঋতু-সময়োপযোগী করিয়া কক্ষতল-নির্ম্মাণের বিদ্যা। (১০) শয়ন-রচনা; ঋতুভেদে উষ্ণতা বা শীতলতা-জনক শয্যাবিন্যাস। (১১) উদকবাদ্য; জলে মৃদঙ্গাদিবৎ বাদ্যধ্বনি করা; এক জলপূর্ণ পাত্রের কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া হস্তস্থিত এক পাত্র হইতে জলনিক্ষেপ দ্বারা ধ্বনি উৎপন্ন করা; জলতরঙ্গ প্রভৃতি। (১২) উদকাঘাত; জলবিহার-সময়ে বিবিধ প্রকারে সলিল তাড়না ও সলিলনিক্ষেপ। (১৩) চিত্রযোগ; বিবিধ উপায়ে শত্রুর কেশ শুক্ল করিয়া বা রোগ উৎপাদন করিয়া শত্রুর অনিষ্ট ঘটানো। (১৪) মাল্যগ্রন্থন। (১৫) শেখর ও আপীড়ক-যোজন; নানা বর্ণের পুষ্পে মস্তকে ধারণযোগ্য মাল্য রচনা। (১৬) নেপথ্য প্রয়োগ: দেশ ও ঋতুভেদে বস্ত্র ও মাল্য পরিধানের নিয়ম। (১৭) কর্ণপত্র রচনা; দন্ত শঙ্খ প্রভৃতি দ্বারা কর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ। (১৮) গন্ধযুক্তি। (১৯) ভূষণযোজন। (২০) ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়াদি। (২১) কৌচুমার-যোগ; কুচুমার কর্ত্তৃক কথিত দেহরঞ্জনাদির বিবিধ উপায়। (২২) হস্তলাঘব, অর্থাৎ কর্ম্মে ক্ষিপ্রকারিতা। (২৩) বিচিত্র-পাক যূষ-ভক্ষ্যবিকার-ক্রিয়া, বা রন্ধনবিদ্যা। (২৪) পানক-রস-রাগাসব-যোজন বা পানীয় মদ্যাদি প্রস্তুত। (২৫) সূচীকর্ম্ম। (২৬) সূত্র-ক্রীড়া বা ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার প্রকারভেদ। (২৭) বীণাডমরুবাদ্য। (২৮) প্রহেলিকা বা হেঁয়ালি। (২৯) প্রতিমালা, হেঁয়ালির ন্যায় বিচিত্র উপায়ে রচিত শ্লোক; ইহার অপর নাম অন্ত্য-অক্ষরিকা। (৩০) দুর্ব্বাচকযোগ অর্থাৎ শ্রুতিকটু বা কষ্টোচার্য্য শব্দবিন্যাস। (৩১) পুস্তক-বাচন অর্থাৎ উপযুক্তস্বরে পুস্তক পাঠ, আবৃত্তি প্রভৃতি। (৩২) নাটকাখ্যায়িকা দর্শন। (৩৩) কাব্যসমস্যাপূরণ। (৩৪) পট্টিকা-বেত্রবাণবিকল্প অর্থাৎ বেত্রাসন ইত্যাদি নির্ম্মাণ। (৩৫) তক্ষকর্ম্ম বা কাঠ কুঁদিয়া দ্রব্যনির্ম্মাণ। (৩৬) তক্ষণ। (৩৭) বাস্তুবিদ্যা। (৩৮) রূপ্যরত্নপরীক্ষা। (৩৯) ধাতুবাদ। (৪০) মণিরাগ ও আকর-জ্ঞান। (৪১) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ। (৪২) মেষ-কুক্কুট-লাবক-যুদ্ধ। (৪৩) শুকসারিকা প্রলাপন। (৪৪) উৎসাদন, সংবাহন ও কেশমর্দ্দন; পদ দ্বারা গাত্র মর্দ্দনের নাম উৎসাদন, হস্তদ্বারা মর্দ্দন সংবাহন। (৪৫) অক্ষরমুষ্টিকাকথন বা একপ্রকার গুপ্ত সঙ্কেত [Mnemonics জাতীয়] যেমন মেবৃমিকসিংকতুবৃধমকুমী দ্বাদশ রাশির নামসঙ্কেত। (৪৬) ম্লেচ্ছিতবিকল্প বা ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞান। (৪৭) দেশভাষাজ্ঞান। (৪৮) পুষ্পশকটিকা; পুষ্প দ্বারা শকট আভরণ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার বিদ্যা। (৪৯) নিমিত্তজ্ঞান বা শকুনশাস্ত্র। (৫০) যন্ত্রমাতৃকা বা বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণের বিদ্যা। (৫১) ধারণ-মাতৃকা বা পুস্তকাদি স্মরণে রাখিবার কৌশল। (৫২) সংপাঠ্য বা অনেক ব্যক্তির মিলিত হইয়া পাঠ [Chorus]। (৫৩) মানসী কাব্য-ক্রিয়া বা বিবিধ বন্ধে শ্লোক রচনা। (৫৪) অভিধানকোষ। (৫৫) ছন্দোজ্ঞান। (৫৬) ক্রিয়াকল্প বা সাহিত্যে অলঙ্কারাদিজ্ঞান। (৫৭) ছলিতকযোগ বা ছদ্মবেশধারণ শিক্ষা। (৫৮) বস্ত্রগোপন বা সুকৌশলে বৃহৎবস্ত্র স্বল্পাকারে পরিধান। (৫৯) দ্যূতবিশেষ। (৬০) আকর্ষ ক্রীড়া বা পাশাখেলা। (৬১) বালক্রীড়নক বা খেলনা তৈরি। (৬২) বৈনয়িকী বিদ্যা বা হস্তিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র প্রভৃতিতে জ্ঞান। (৬৩) বৈজয়িকী বিদ্যা বা অস্ত্রজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, প্রভৃতি। (৬৪) ব্যায়ামিকী বিদ্যা।

এই চতুঃষষ্টি কলার বিবরণ বাৎস্যায়ন কৃত কামসূত্র হইতে সংগৃহীত। অনেকে বাৎস্যায়নকে চাণক্য হইতে অভিন্ন মনে করেন, তাহা হইলে কামসূত্র খ্রী-পূ ৪র্থ শতাব্দীর রচনা। শ্রীধরস্বামী-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাতেও চতুঃষষ্টি কলার উল্লেখ আছে—প্রদত্ত তালিকার সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদ নাই। কিন্তু শুক্রনীতিসার গ্রন্থে বর্ণিত চতুঃষষ্টি কলা বর্ণিত তালিকা হইতে অনেকাংশে পৃথক। হাবভাবযুক্ত নৃত্য, বিবিধ বাদ্যকরণে জ্ঞান, বস্ত্র ও অলঙ্কার-বিন্যাস, বিবিধ বেশধারণ, শয্যা-আস্তরণ নির্ম্মাণ ও মাল্যগ্রন্থন, দ্যূতাদি ক্রীড়া ও বিবিধ রতিবন্ধ, এই সাতটি কলা গান্ধর্ব্ববেদের অন্তর্গত। বিবিধ মদ্যপ্রস্তুতপ্রণালী, ব্রণ প্রভৃতি শস্ত্র দ্বারা ছেদন, রন্ধনবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ধাতু প্রভৃতি ভস্মকরণ, ইক্ষুর বিকার করণ, ধাতুসংযোগ ও ঔষধাদি প্রস্তুত, ধাতুর

মেলন ও পার্থক্যকরণ, ধাতুমিশ্রণ ও দ্রব্য হইতে ক্ষার বহিষ্করণ, এই দশটি কলা আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত। বিবিধ ভঙ্গীতে শস্ত্রনিক্ষেপ, মল্লযুদ্ধ, দূরে স্থিত লক্ষ্যে যন্ত্রাদি ও গোলা প্রভৃতি নিক্ষেপ, বাদ্যসঙ্কেতে সৈন্যগণের বিবিধ শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হওয়া (drill), গজ অশ্ব ও রথের যুদ্ধে প্রয়োগ,—এই পাঁচটি কলা ধনুর্ব্বেদের অন্তর্গত। বিবিধ আসন ও মুদ্রা অবলম্বনে দেবতা তোষণ, সারথ্য ও গজাশ্বের গতিশিক্ষা মৃত্তিকা-কাষ্ঠ-প্রস্তরের পাত্রাদি নির্ম্মাণ, চিত্রাঙ্কন, কূপ প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ, ঘটিযন্ত্র-নির্ম্মাণ, রঞ্জনবিদ্যা, জল বায়ু ও অগ্নিযোগে বাষ্পীয় যন্ত্রের ক্রিয়া, নৌকা রথাদি নির্ম্মাণ, রজ্জুপ্রস্তুতপ্রণালী, বস্ত্রবয়ন, রত্নক্রিয়া, ধাতুবিজ্ঞান কৃত্রিম স্বর্ণাদি রচনা, প্রলেপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান, চর্ম্মাদির মার্দ্দবকরণ (tanning), পশুর অঙ্গ হইতে চর্ম্ম উন্মোচন, দুগ্ধ দোহন হইতে আরম্ভ করিয়া ঘৃত পর্য্যন্ত প্রস্তুত, সীবনকার্য্য, সন্তরণ, পাত্র প্রভৃতি পরিষ্কার করণ, বস্ত্রমার্জ্জন, ক্ষৌরকর্ম্ম, তিল প্রভৃতি হইতে তৈল প্রভৃতি আবিষ্কার, লাঙ্গল করা, বৃক্ষারোহণ, সেবানুষ্ঠান, বংশ বা তৃণ দ্বারা পাত্রাদি রচনা, কাচপাত্রনির্ম্মাণ, জলসেচন ও জলরোধ, অস্ত্রশস্ত্রনির্ম্মাণ, গজ ও অশ্বের পর্য্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ, শিশুরক্ষণে ও শিশুক্রীড়নে জ্ঞান, অপরাধীকে তাড়ন-জ্ঞান, বহুবিধ ভাষার বর্ণলেখন-প্রণালী, তাম্বুলরক্ষা, ক্ষিপ্রকারিত্ব ও বিলম্বকারিত্ব,—এইসমস্ত কলা মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪ কলা।

প্রাচীন নাট্যাদি পাঠে জানা যায় যে এইসমস্ত কলা কেবল পুস্তকস্থ ছিল না, কার্য্যে প্রয়োগ করা হইত। এইসকল কলা হইতে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উৎকর্ষ অনুমিত হইতে পারে।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান (পানীয়)—শ্রীচুনীলাল বসু—

শরীর ধারণের জন্য খাদ্য ও জল উভয়েরই প্রয়োজন। আমাদের শরীরে গড়ে শতকরা ৭০ভাগ জল। এই জল প্রশ্বাসে, ঘর্ম্মে, মলমূত্রে ক্রমাগত বাহির হইয়া যায়। শরীরে জলের অভাব হইলে তৃষ্ণা অনুভব করি। রক্ত তরল রাখিবার জন্য জলের প্রয়োজন, খাদ্য পরিপাকের জন্য জলের প্রয়োজন; ভুক্ত দ্রব্যের অজীর্ণ ভাগ, পরিশ্রম ও শারীরিক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন দূষিত পদার্থ, মলমূত্র ও ঘর্ম্মের আকারে শরীর হইতে বাহির করিবার জন্য জলের প্রয়োজন। সকল প্রকার পানীয়ের মধ্যে জল শ্রেষ্ঠ। অপরিষ্কার বা বীজাণুদূষিত জল ত্যাজ্য। বৃষ্টির জলই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ; গভীর কূপ বা প্রস্রবণের জল পানের পক্ষে প্রশস্ত। জলাশয়ের নিকটস্থ স্থান সম্পূর্ণ পরিষ্কার রাখা উচিত; জলেও কোনো দূষিত পদার্থ ফেলা উচিত নয়। নদী প্রভৃতির জল বালি ও কয়লা দিয়া ছাঁকিয়া পান করা উচিত। জল ফুটাইয়া লইয়া ব্যবহার করা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। ফুটানো জল বিস্বাদ হয়; কিন্তু বারকতক এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালাঢালি করিলে পুনরায় সুস্বাদু হয়; অল্প কর্পূর যোগ করিলে আরো ভালো হয়। সমস্ত দিনে দেড় সের জল পান করা আবশ্যক হয়—তাহার কতক খাদ্যের সঙ্গে কতক পানীয় রূপে গ্রহণ করি। আহারের অব্যবহিত পরে জলপান অপকারী; প্রত্যুষে ও রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে জলপান উপকারী; মধ্যে প্রাতরাশের ৩।৪ ঘণ্টা পরে জলপান উপকারী। ঘন ঘন জলপান অজীর্ণের কারণ। অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি রোগে উষ্ণ জল অল্পে অল্পে পান করিলে রোগ উপশম হয়। শয়নের পূর্ব্বে উষ্ণ জল পান করিলে সুনিদ্রা হয়। কবিরাজী মতে বায়ুপ্রধান ব্যক্তির উষ্ণজলপান অবিধেয়। অন্যান্য পানীয়ের মধ্যে ঘোল, ডাবের জল, সরবৎ, উৎকৃষ্ট। গ্যাস-ভরা পানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদারের তৈরি অল্প স্বল্প ব্যবহার করা যাইতে পারে। চা, কাফি, কোকো সহজ শরীরে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিষ্প্রয়োজন; নিয়মিত পান উপকারক; অল্পবয়স্কের পক্ষে অপকারী; কড়া চা ব্যবহারে অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধ হয়। চা ও কফির সুরা ও অহিফেনের মাদকতা নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে; চা পান করিয়া অনেকে সুরাপানের অভ্যাস ত্যাগ করিতে সমর্থ হন। অপরিষ্কার জল চায়ের সঙ্গে ফুটাইয়া পান করা ভালো। সুরা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সুরাপানের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। সুরা মহোপকারী ঔষধ; কিন্তু চিকিৎসকের লঘুচিত্ততা হেতু অনেক পরিবারের সুখসম্পদ প্রতিপত্তি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে দেখা গিয়াছে—সুতরাং চিকিৎসকেরও শীঘ্র সুরা ব্যবস্থা করা উচিত নয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (ভাদ্র)।

আলো-ছায়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া
এ আমার ধরণীতে।
সারাদিন দ্বারে রহে কেন দাঁড়াইয়া
কি আছে, কি চাহে নিতে।
রাতের আঁধারে ফিরে যায় যবে জানি,
নিয়ে যায় বহি' মেঘ-আবরণ খানি
নয়নের জলে রচিত ব্যাকুল বাণী
খচিত ললিত গীতে॥
নব নব রূপে বরণে বরণে ভরি
বুকে লও তুলি, সেই মেঘ-উত্তরী।
লঘু সে চপল শ্যামল কোমল কালো
হে নিরঞ্জন তাই বাস তারে ভালো
তারে দিয়ে তুমি ঢাক আপনার আলো
সকরুণ ছায়াটিতে॥

খেলা ও কাজ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

পোর্টসৈয়দে অনেকগুলি নূতন আরোহী উঠিবার কথা। পুরাতনের দল এই সংবাদে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আর সমস্ত নূতনকে মানুষ খুঁজিয়া বাহির করে কিন্তু নূতন মানুষ। এমন উদ্বেগের বিষয় আর কিছুই নাই। সে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে ভিতরে বাহিরে বোঝাপড়া করিয়া লইতেই হইবে। সে তো কেবলমাত্র কৌতূহলের বিষয় নহে। তাহার মন লইয়া সে অন্যের মনকে ঠেলাঠেলি করে। মানুষের ভিড়ের মত এমন ভিড় আর নাই।

য়ুরোপীয় নরনারীদের প্রতিদিনের কালযাপন দেখিলে প্রথমটাই চোখে পড়ে ইহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল হইয়া আছে। এতটা চাঞ্চল্য আমাদের অভ্যস্ত নহে। আমাদের গরম দেশে আমরা কোনো মতে ঠাণ্ডা থাকিতে চাই—চোখের সামনে অন্য কেহ অস্থিরতা প্রকাশ করিলেও আমাদের গরম বোধ হয়। চুপ কর, স্থির থাক, মিছামিছি কাজ বাড়াইয়ো না, ইহাই আমাদের সমস্ত দেশের অনুশাসন। আর, ইহারা কেবলি বলে, একটা কিছু করা যাক্। এইজন্য ইহারা ছেলেবুড়া সকলে মিলিয়া কেবলি দাপাদাপি করিতেছে। হাসি গল্প খেলা আমোদের বিরাম নাই, অবসান নাই।

আমরা যখন ছোট ছেলেকে কোথাও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই তখন কিছু খেলনার আয়োজন রাখি; নহিলে তাহাকে শান্ত রাখা শক্ত হয়। কেন না, তাহার প্রাণের স্রোত তাহার প্রয়োজনের সীমাকে ছাপাইয়া চলিয়াছে। সেই উচ্ছলিত প্রাণের বেগ আপনার লীলার উপকরণ না পাইলে অধীর হইয়া উঠে।

এই যে য়ুরোপীয় যাত্রীরা জাহাজে চড়িয়াছে ইহাদের জন্যও কত রকম খেলার আয়োজন রাখিতে হইয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমাদের যদি জাহাজ থাকিত তাহা হইলে তাস পাশা প্রভৃতি অত্যন্ত ঠাণ্ডা খেলা ছাড়া এসমস্ত দৌড়ধাপের খেলার ব্যবস্থা করার দিকে আমরা দৃক্‌পাতমাত্র করিতাম না। বিশেষত কয়দিনের জন্য পথচলার মুখে এসমস্ত অনাবশ্যক বোঝা নিশ্চয়ই বর্জ্জন করিতাম এবং কেহ তাহাতে কিছু মনেও করিত না।

ছেলেদের খেলার বয়স বলিয়াই খেলা তাহাদিগকে শোভা পায়—কাজের বয়সে এতটা খেলার উৎসাহ অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কিন্তু যখন নিশ্চয় বুঝিতে পারি য়ুরোপীয়ের পক্ষে এই চাঞ্চল্য এবং খেলার উদ্যম নিতান্তই স্বভাবসঙ্গত তখন ইহার একটি শোভনতা দেখিতে পাই। ইহা যেন বসন্তকালের অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যের মত। যত ফল ধরিবে তাহার চেয়ে অনেক বেশি মুকুল ধরিয়াছে। কিন্তু এই অনাবশ্যক ঐশ্বর্য্য না থাকিলে আবশ্যককে পদে পদে কৃপণতা ঘটিত।

ইহাদের খেলার মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় নাই কেননা এই খেলা অলসের কালযাপন নহে—কেননা আমরা দেখিয়াছি ইহাদের প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্ম্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উদ্যম, ইহার অপ্রতিহত প্রভাব। সেখানে শরীর মনের কোথাও কিছুমাত্র জড়ত্ব নাই, শৈথিল্য নাই; সতর্কতা সর্ব্বদা জাগ্রত; সুযোগের তিলমাত্র অপব্যয় দেখা যায় না।

যে শক্তি কর্ম্মের উদ্যোগে আপনাকে সর্ব্বদা প্রবাহিত করিতেছে সেই শক্তিই খেলার চাঞ্চল্যে আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছে। শক্তির এই প্রাচুর্য্যকে বিজ্ঞের মত অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্য্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহা নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অজস্র ত্যাগ করিতেছে, সেইজন্যই নিজে বহুগুণে ফিরিয়া পাইতেছে। ইহাই সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না—দুর্লভের রুদ্ধ দ্বারে অহোরাত্র প্রবলবেগে আঘাত করিতেছে।

এই যে উদ্যত শক্তি, যাহার একদিকে ক্রীড়া ও অন্য দিকে কর্ম্ম ইহাই যথার্থ সুন্দর। রমণীর মধ্যে যেখানে আমরা লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখিতে পাই সেখানে আমরা একদিকে দেখি সাজসজ্জা লীলা-মাধুর্য্য, আর একদিকে দেখি অক্লান্ত কর্ম্মপরতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুশ্রী। বস্তুত শক্তিই সৌন্দর্য্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করে; আর শক্তিহীনতাই শৈথিল্য ও অব্যবস্থার মধ্য দিয়া কেবলি কদর্য্যতার পঙ্কের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। কদর্য্যতাই মানুষের শক্তির পরাভব; এইখানেই অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অন্ধসংস্কার; এইখানেই মানুষ বলে আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম, এখন অদৃষ্টে যাহা করে! এইখানেই পরস্পরে কেবল বিচ্ছেদ ঘটে, আরব্ধ কর্ম্ম শেষ হয় না এবং যাহাই গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। শক্তিহীনতাই যথার্থ শ্রীহীনতা।

ইহাদের সমস্ত খেলাধুলার ভিতরে ভিতরে স্বভাবতই একটি বিধান দেখা যায়। এইজন্য ইহাদের আমোদপ্রমোদও কোনোমতে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে না।

এই ডেকের উপরে আর কেহ নহে, কেবল আমাদের দেশের লোকে মিলিত হইয়াছে সে দৃশ্য আমি মনে মনে কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথমেই দেখা যাইত কোনো একই ব্যবস্থা দুইজনের মধ্যে খাটিত না। আমাদের অভ্যাস ও আচরণ পরস্পরের সঙ্গে আপনার মিল করিতে জানে না। য়ুরোপীয়দের মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র, আর একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা সকলের। যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র সে জায়গাটা ইহাদের প্রাইভেট, সেখানটা প্রচ্ছন্ন। সেখানে সকলের অবারিত অধিকার নাই এবং সেই অনধিকার সকলেই সহজেই মানিয়া চলে। সেখানে তাহারা নিজের ইচ্ছা ও অভ্যাস অনুসারে আপনার ব্যক্তিগত জীবন বহন করে। কিন্তু যখনি সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসে তখন সকলের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়—সে জায়গায় কোনোমতেই তাহারা আপনার প্রাইভেটকে টানিয়া আনে না। এই দুই বিভাগ সুস্পষ্ট থাকাতেই পরস্পর মেলামেশা ইহাদের পক্ষে এত সহজ ও সুশৃঙ্খল। আমাদের মধ্যে এই বিভাগ নাই বলিয়া সমস্ত এলোমেলো হইয়া যায়, কেহ কোনোখানে সীমা মানিতে চায় না। আমরা এই ডেক পাইলে নিজের প্রয়োজনমত চলিতাম। পোঁটলা পুঁটলি যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখিতাম। কেহবা দাঁতন করিতাম, কেহবা যেখানে খুসি বিছানা পাতিয়া পথরোধ করিয়া নিদ্রা দিতাম, কেহবা হুকার জল ফিরাইতাম ও কালকাটা উপুড় করিয়া ছাই ও পোড়া তামাক যেখানে হোক্ একটা জায়গায় ঢালিয়া দিতাম, কেহবা চাকরকে দিয়া শরীর ডলাইয়া সশব্দে তেল মাখিতে থাকিতাম। ঘটিবাটি জিনিষপত্র কোথায় কি পড়িয়া থাকিত তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইত না এবং ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির অন্ত থাকিত না। ইহার মধ্যে যদি কেহ নিয়ম ও শৃঙ্খলা আনিতে চেষ্টামাত্র করিত তাহা হইলে অত্যন্ত অপমান বোধ করিতাম এবং মহা রাগারাগির পালা পড়িয়া যাইত। তাহার পরে অন্য লোকের যে লেখাপড়া কাজকর্ম্ম থাকিতে পারে কিম্বা মাঝে মাঝে সে তাহার অবসর ইচ্ছা করিতে পারে সে সম্বন্ধে কাহারও চিন্তামাত্র থাকিত না। হঠাৎ দেখা যাইত, যে বইটা পড়িতেছিলাম সেটা আর-একজন টানিয়া লইয়া পড়িতেছে; আমার দূরবীনটা পাঁচজনের হাতে হাতে ফিরিতেছে সেটা আমার হাতে ফিরাইয়া দিবার কোনো তাগিদ নাই; অনায়াসেই আমার টেবিলের উপর হইতে আমার খাতাটা লইয়া কেহ টানিয়া দেখিতেছে, বিনা আহ্বানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গল্প জুড়িয়া দিতেছে এবং রসিক ব্যক্তি সময় অসময় বিচার না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছে, কণ্ঠে স্বরমাধুর্য্যের অভাব থাকিলেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না। যেখানে যেটা পড়িত সেখানে সেটা পড়িয়াই থাকিত। যদি ফল খাইতাম তবে তাহার খোসা ও বীচি ডেকের উপরেই ছড়ানো থাকিত—এবং ঘটিবাটি চাদর মোজা গলাবন্দ হাজার-বার করিয়া খোঁজাখুঁজি করিতে করিতেই দিন কাটিয়া যাইত।

ইহাতে যে কেবল পরস্পরের অসুবিধা ঘটিত তাহা নহে, সুখ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য চারিদিক হইতে অন্তর্ধান করিত। ইহাতে আমোদ আহ্লাদও অব্যাহত হইত না এবং কাজকর্ম্মের তো কথাই নাই। যে শক্তি কর্ম্মের মধ্যে নিয়মকে মানিয়া সফল হয় সেই শক্তিই আমোদ আহ্লাদের মধ্যেও নিয়মকে রক্ষা করিয়া তাহাকে সরস ও সুন্দর করিয়া তোলে।

শক্তি এই যে নিয়মকে মানে সে কেবল নিয়মকে মানিবার জন্য নহে, আপনাকেই মানিবার জন্য। আর শক্তিহীনতা যখন নিয়মকে মানে তখন সে নিয়মকেই মানে, তখন সে ভয়ে হোক্, লোভে হোক্, বা কেবলমাত্র চিরাভ্যাসের জড়ত্ববশত হোক নিয়মকে নতজানু হইয়া শিরোধার্য্য করিয়া লয়। কিন্তু যেখানে সে বাধ্য নয়, যেখানে কেবল নিজের খাতিরেই নিয়ম স্বীকার করিতে হয় দুর্ব্বলতা সেইখানেই নিয়মকে ফাঁকি দিয়া দিয়া নিজেকে ফাঁকি দেয়। সেইখানেই তাহার সমস্ত কুশ্রী ও যদৃচ্ছাকৃত।

যে দেশে মানুষকে বাহিরের শাসন চালনা করিয়া আসিয়াছে, যেখানেই মানুষের স্বাধীন শক্তিকে মানুষ শ্রদ্ধা করে নাই এবং রাজা গুরু ও শাস্ত্র বিনাযুক্তিতে মানুষকে তাহার হিতসাধনে বলপূর্ব্বক প্রবৃত্ত করিয়াছে সেখানেই মানুষ আত্মশক্তির আনন্দে নিয়মপালনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মানুষকে বাঁধিয়া কাজ করানো

একবার অভ্যাস করাইলেই বাঁধন কাটিয়া আর তাহার কাছে ক্লাজ পাওয়া যায় না। এইজন্য যেখানে আমরা নিয়ম মানি সেখানে দাসের মত মানি, যেখানে মানিনা সেখানে দাসের মতই ফাঁকি দিই। সেই জন্য যখন আমাদের সমাজের শাসন ছিল তখন জলাশয়ে জল, চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা, পান্থশালায় আশ্রয় সহজে মিলিত—যখন সামাজিক বাহ্যশাসন শিথিল হইয়াছে তখন আমাদের রাস্তা নাই, ঘাট নাই, জলাশয়ে জল নাই, সাধারণের অভাব দূর ও লোকের হিতসাধন করিবার কোনো স্বাভাবিক শক্তি কোথাও উদ্বোধিত হইয়া কাজ করিতেছে না। হয় আমরা দৈবকে নিন্দা করিতেছি, নয় সরকার বাহাদুরের মুখ চাহিয়া আছি।

কিন্তু এ সকল বিষয়ে কোন্‌টা যে কার্য্য এবং কোন্‌টা কারণ তাহা ঠাহর করিয়া বলা শক্ত। যাহারা বাহিরের নিয়মকে অবাধে শৃঙ্খল করিয়া পরে বাহিরের নিয়ম তাহাদিগকেই বাঁধে,—যাহারা নিজের শক্তির প্রাবল্যে সে নিয়মকে কোনমতেই অন্ধভাবে স্বীকার করিতে পারে না তাহারাই আপনার আনন্দে আপনার নিয়মকে উদ্ভাবিত করিবার অধিকার লাভ করে। নতুবা এই অধিকারকে হাতে তুলিয়া দিলেই ইহাকে ব্যবহার করা যায় না। স্বাধীনতা বাহিরের জিনিষ নহে ভিতরের জিনিষ, সুতরাং তাহা কাহারো কাছ হইতে চাহিয়া পাইবার জো নাই। যতক্ষণ নিজের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা আমরা সে স্বাধীনতাকে লাভ না করি ততক্ষণ নানা আকারে বাহিরের শাসন আমাদের চোখে ঠুলি দিয়া ও গলায় দড়ি বাঁধিয়া চালনা করিবেই। ততক্ষণ, আমরা, মুখে যাহাই বলি, কাজের বেলায় আপনি আপনা হইতেই যেখানে সুযোগ পাইব সেখানেই অন্যের প্রতি অনুশাসন প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিব। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারলাভের বেলায় যুরোপীয় ইতিহাসের বচন আওড়াইব আর সমাজনৈতিক গৃহনৈতিক ক্ষেত্রে কেবলি জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি কনিষ্ঠের ও প্রবল যিনি তিনি দুর্ব্বলের অধিকারকে সঙ্কুচিত করিতে থাকিব। আমরা যখন কাহারো ভাল করিতে চাহিব সে আমারই নিজের মতে, আমারই নিজের নিয়মে; যাহার ভাল করিতে চাই তাহাকে তাহার নিজের নিয়মে ভাল হইতে দিতে আমরা সাহস করি না। এমনি করিয়া দুর্ব্বলতাকে আমরা অস্থিমজ্জার মধ্যে পোষণ করিতে থাকি অথচ সবলের অধিকারকে আমরা বাহিরের দিক হইতে স্বপ্নলব্ধ দৈব সম্পত্তির মত লাভ করিতে চাই।

এইজন্যই পরম বেদনার সহিত দেখিতেছি, যেখানেই আমরা সম্মিলিত হইয়া কোনো কাজ করিতে গিয়াছি, যেখানেই নিজেদের নিয়মের দ্বারা নিজেদের কোনো প্রতিষ্ঠানকে চালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি সেখানেই পদে পদে বিচ্ছেদ ও শৈথিল্য প্রবেশ করিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দিতেছে। বাহিরের কোনো শত্রুর হাত হইতে নহে কিন্তু অন্তরের এই শক্তিহীনতা শ্রীহীনতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করা ইহাই আমাদের একটি মাত্র সমস্যা। যে নিয়ম মানুষের গলার হার তাহাকে পায়ের বেড়ি করিয়া পরিব না, এইকথা একদিন আমাদিগকে সমস্ত মনের সঙ্গে বলিতে হইবে। এই কথা স্পষ্ট করিয়া জানিতে হইবে যে, সত্যকে যেমন করিয়া হৌক মানিতেই হইবে। কিন্তু সত্যকে যখন অন্তরের মধ্যে মানি তখনই তাহা আনন্দ, বাহিরে যখন মানি তখনই তাহা দুঃখ। অন্তরে সত্যকে মানিবার শক্তি যখন না থাকে তখনই বাহিরে তাহার শাসন প্রবল হইয়া উঠে, সেজন্য যেন বাহিরকেই ধিক্কার দিয়া নিজেকে অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দিবার চেষ্টা না করি।

ব্যবসা ও বাণিজ্য (শ্রাবণ)।

মানকচু—শ্রীনগেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার—

মানকচু ছাড়াইয়া ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিলে উত্তম সুখাদ্য পালো হয়। কচু-ধোয়া জল হইতে একপ্রকার এসিড পাওয়া যায়। খোসা ও এটে চোলাই করিলে মেথিলেটেড স্পিরিট প্রস্তুত হয়।

কলার চাষ—শ্রীশরচ্চন্দ্র সান্যাল—

কলা ফল, কলার আঁশ, কলার ময়দা, কলার গুড় সমস্তই সর্ব্বত্র সমাদৃত। বীচা কলা চটকাইয়া চুনের জল মিশ্রিত করিলে কলা হইতে রস বাহির হয়; সেই রস জাল দিলে সুস্বাদু গুড় পাওয়া যায়। কলা বারমেসে ফল, গাছও বহুকাল স্থায়ী। পলি দোআঁশ মাটি কলার চাষের উপযোগী। বৈশাখ হইতে ক্ষেত তৈরি করিয়া বর্ষার সময় তেউড় লাগাইতে হয়। কলার মূলদেশের কুব্জ অংশ পূর্ব্ব বা পশ্চিম মুখো করিয়া বসাইলে কাঁদিও পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে পড়ে, তাহাতে রৌদ্র পাইয়া কলা সুপুষ্ট হয়। কার্ত্তিক ও ফাল্গুন চৈত্রে জমির ও গাছের পাট করিতে হয়। এক বিঘা জমিতে ১০০ গাছের বেশি লাগানো উচিত নয়; ফি বিঘায় ১০০ কাঁদি কলা হইতে ৫০৲ টাকা আয় হইতে পারে। কলার চাষে কখনো লোকসান হয় না। কলার কিছুই অপচয় হয় না, গাছ পাতা থোড় মোচা ফল আঁশ সবই বিক্রয়-যোগ্য।

মানসী (ভাদ্র)।

শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন—

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি,
এলোকেশী কে ওই রূপসী?
জলযন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে!
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ করি,
সারাদিন, সারারাত্রি বারিরাশি পড়িছে ঝর্ ঝরি।
চমকিল বিদ্যুৎ সহসা।
এ আলোকে বুঝিয়াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি:
এ যে সেই সতত সরসা
ভুবনমোহিনী ধনী রূপসী বরষা।
শ্যামাঙ্গী বরষা আজি, বিহ্বলা মোহিনী সাজি,
এলায়ে দিয়াছে তার মসিবর্ণ কালো কালো চুল,
শ্রীকণ্ঠে পরেছে বালা, অপরাজিতার মালা,
দুকর্ণে দোদুল দোলে নীলবর্ণ ঝুমকার ফুল।
নীলাম্বরী সাড়ীখানি পরি,
অপূর্ব্ব মল্লাররাগ ধরেছে সুন্দরী।
স্রস্ত কেশরাশি হ'তে বেলফুল চৌদিকে ঝরিছে;
কালোরূপ ফাটিয়া পড়িছে।
যাই বলিহারি,
কে দেখেছে কবে ভবে হেন বরনারী?

প্রতিভা (আষাঢ়)।

ভাটিয়াল গান—শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত—

ভাটিয়াল গানগুলি পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব জিনিস। গ্রাম্য কবিরা এই ভাটিয়াল সুর অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের প্রাণের সরল কবিত্বমাখা ভাবগুলি অতি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের পথে প্রান্তরে, পল্লীতে পল্লীতে, খাল বিলে, নদী নালায় কৃষক ও নাবিকের কণ্ঠে কণ্ঠে এই গানগুলি বিচিত্র ভাবে দিবানিশি গীত হইয়া থাকে।

এই বিশেষ সুরের আবিষ্কর্ত্তা কে তাহা জানা যায় না। তবে সাধারণতঃ নৌকা যখন ভাটি চলিতে থাকে তখনই এইসকল গান গাওয়া হয় বলিয়া হয়ত এই সুরের "ভাটিয়াল রাগিণী" নাম হইয়াছে। ভাটি ছাড়িয়া দিলে নৌকা পরিচালনে মাঝিদিগের অখণ্ড মনোযোগ ও বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন থাকে না। তখন তাহারা এই ক্লান্তি-হরা রাগিণীতে মনের আনন্দে গান গাহিয়া থাকে। ভাটি অঞ্চলে—বরিশাল প্রভৃতি জেলায়—এই সুর আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে কিনা, তাহাও বিবেচ্য।

যেমন "কীর্ত্তন" বলিলে এক শ্রেণীর অনেক রকমের গান বুঝায়, "বাউল সুরের গান" বলিলে আর এক শ্রেণীর বহু প্রকারের গান বুঝায়, সেইরূপ "ভাটিয়াল গান" বলিলেও অন্য আর একজাতীয় বিবিধ সুরের গান বুঝা যায়। কিন্তু "ভাটিয়ালে"র রাগিণী-স্বাতন্ত্র্যটুকু "কীর্ত্তন" ও "বাউল" সুর অপেক্ষা বহুগুণে স্পষ্ট। এই রাগিণীর প্রধান গুণ, অতি সহজে লোকের মর্ম্মস্পর্শ করিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা উদাস ভাব জাগাইয়া তোলা। এই বিশেষ গুণের জন্যই এই রাগিণীটি এদেশে এত জনপ্রিয়।

ভাটিয়াল সুরের অসংখ্য গান আছে। সংগ্রহ করিলে বিরাট গ্রন্থ হইতে পারে। নমুনা—

(১)

বাদলায় লইয়া যায় বৈদেশী বন্ধুয়ার নায়।
আরে কইও কইও কইও গো খপর শ্বশুরের আগে.—
আমারে যেন্ তালাস করে গাঙ্গের কূলে কূলেরে।
আরে কইও কইও কইও গো খপর শাশরীর আগে,
কোলের ছাওয়াল শুইয়া রইছে মশৈরের তলে রে।
আরে কইও কইও কইও গো খপর ননদীর আগে.—
অখন যেমুন কাইন্দা করে জলের কলসীর লগেরে।
আরে কইও কইও কইও গো খপর সোয়ামীর আগে,
পালের বলদ বেইচা যেন আরেক বিয়া করে রে।

এই সহজ সরল গানটিতে অপ্রথিতনামা কবি একটি বিপথগামিনী রমণীর মনের বিবিধ বিরুদ্ধভাবের উত্থানপতনের করুণ সুন্দর একটি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

(২)

জান, তরে মৈষে মারবো!
মৈষাণ মৈষাণ বলি রে আমি—
মৈষাণ কাচা সোনা,
বন্দের থনে আইলা মইষ্
বাড়ীত্ বাইন্দা থুইও রে।
আরে আমার বাড়ী যাইওরে মৈষাণ,
বস্তে দিমু রে পীড়ি,
আরে জলপান করিতে দিমু রে মৈষাণ,
শাইল ধানের মুড়ি রে।
শাইল ধানের মুড়ি না রে মৈষাণ,
বিন্নিধানের রে খই,—
আরে পেট্-মোটা সবরি কলা রে মৈষাণ,
গামছা বান্দা দইও রে।

এই গানটিতে মহিষের রাখালের প্রতি কৃষকবালিকার হৃদয়ের প্রেমের স্বাভাবিক উদ্বেগভাবটি স্নিগ্ধ সরল ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

(৩)

হায়ে কোন্ না জাউলার মাছ রে খাইয়া
না দিছিলাম রে কড়ি—
হায় রে তার জন্যে হইলাম বুঝি
অল্প বইসা রাড়ী রে।
আমায় পাগল কইরা গেলা—
আমায় অনাথ কইরা গেলা রে প্রাণনাথ
আমায় পাগল কইরা গেলা।
আরে কোন্ না জাউলার মাছ রে খাইয়া
না দিছিলাম রে কড়ি—
হায় রে তার জন্যে হইলাম বুঝি
অল্প বইসা রাড়ী রে।
আরে কা'র জানি ভরা রে ক্ষেতে
দিয়াছিলাম রে হাত,—
হা'রে তাইতে বুঝি আমার মাথায়—
এমন বজ্রঘাত রে।
আরে কোন আয়তীর সিথীর রে সিন্দূর
আমি ফেইলাছি মুইছা,
হায় রে তার শাপে দারুণ রে বিধি
তোমায় গেল লইয়া রে।

গ্রাম্য কবি কেমন তীব্র অনুভূতির সহিত একটি শোকাহতা বালবিধবার অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করিয়াছেন। নিরক্ষরা, জ্ঞানহীনা তরুণীর হৃদয়ে এই সঙ্গীতোক্ত আত্মকৃত কর্ম্মসমূহই তাহার এই দারুণ বৈধব্যের কারণ বলিয়া অনুভূত হওয়া অতি স্বাভাবিক।

(৪)

প্রাণের সুবল রে
আরে কার কামিনী জলে যায়।
সোনার নূপুর রাঙা পায়
রুণু ঝুনু বাদ্য শুনা যায়;
হাউল্কা (হাল্কা) মাজা পবনে হেলায়।
উল্টা খোপায় বান্ধা চুল,
খোপায় শোভে নানান জাতি ফুল,
ওরে মধুর লোভে ভ্রমর আসে যায়।
দুই সখী জলেরে যায়,
আরেক সখী হেইলা পড়ে গায়;—
ওরে অনুভবে বুঝি রাধা যায়।

(৫)

জীবনের নাই রে আশা,
কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা।
দেহের গুমান কর মিছে,
নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে?
কাল শমনে জাল পেতেছে,—
ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা।
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত
সকল পথের পরিচিত।
যখন প্রাণ তোর হ'বে হত
কেউনা রে করবে জিজ্ঞাসা।
আপন আপন বল যারে
কেউত সঙ্গে যাবে না রে!
গুরু ভজন হইল না রে
কেবল ভবে যাওয়া আসা।

কুমারের হাড়ি দড়ি,
আর অষ্ট কড়া কড়ি,
চাইর জনাতে কান্ধে করি'
গাঙ্গের কূলে দিবে বাসা।

নব নিদাঘ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ নব নিদাঘের ঘোর ;
ওরে মন, আয়, সাঙ্গ করিয়ে সকল কর্ম্ম তোর।
বিছায়ে দে মোর শিথিল শরীর—শ্লথ আঁচলের মত।
খোলা বাতায়নে অর্দ্ধ শয়নে চেয়ে থাক অবিরত।

দুপ'র বেলার রৌপ্য রৌদ্রে ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া গুমট করিয়া আছে।
তুই, অম্নি গান কি গন্ধের মত ঘুরে বেড়া মোর কাছে।

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র ঝিল্লী-রবের মত,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি কে হাপরে ফুঁ দিতেছে অবিরত!
দিকে, দিকে, দিকে, জানি না কি পাখী হাতুড়ি ঠুকিছে তালে
কোন্ রূপসার স্বপ্নমেখলা গড়িছে বিশ্বশালে।

কালো দীঘিজলে গাহন করিতে নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে, নির্জ্জন ঘাটে, জাগিছে এ কার মায়া।
মরীচিকা চাহি শ্রান্ত পথিক ফুকারে 'ফটিক জল'।
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়ে ছাড়ে না অশথ-তল।

আজি রে বিশ্ব কি মধু মধুর মদির নেশায় ভোর!
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার ঘূর্ণি হাওয়ার ঘোর ;
বাসনা তাহার মরীচিকা হ'য়ে আঁকা পড়ে দূর পটে,
কল্পনা তার গুন্ গুন্ ক'রে অলি-গুঞ্জনে রটে।

দূর অতীত নিকটে এসেছে কি গোপন সেতু বাহি।
অঙ্গে আলস দাঁড়ায়েছে যেন মোর মুখ পানে চাহি।
এসেছে তাহারা দিগন্তহারা সাহারা-প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে তারা কোন্ বসোরার খর্জ্জুর-বীথি-পথে!

কত বেদুয়ীন্ পার ক'রে মরু—দীপ্ত-অগ্নি-ঢালা—
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে তরুণী ইরাণী বালা।
সরসী-সোপানে কে বসি গোপনে চন্দন মাখি গায়,
মোর, নয়ন-পাতায় শয়ন বিছায় পল্লব-ঘন-ছায়!

আঁখি মুদে একা প'ড়ে আছি এই সুখস্মৃতিঘেরা নীড়ে
প্রাণ ভ'রে যায় চেনা-অচেনার মিলন-মধুর ভিড়ে।
বেলা প'ড়ে আসে বধূ চলে ঘাটে ভরিতে সাঁঝের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল চ্যুত ছায়া-অঞ্চল।
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে নিদাঘ-নিশীথ ঘোর
ওরে মন, আয়, ছিঁড়ে ফেলে আয়, সকল কর্ম্ম-ডোর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—(ভাদ্র)।

গীতা-পাঠ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

পূর্ব্বপ্রপাটে যে শ্লোকটির অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার পরবর্ত্তী আটটি শ্লোকের সারাংশ একটি শ্লোকেই পর্য্যাপ্ত। সে শ্লোকটি এই:—(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন)

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥"

ইহার অর্থ এই :—

যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, ধনঞ্জয়। কি ভাবে? না নিঃসঙ্গভাবে—নির্লিপ্তভাবে—অনাসক্তভাবে। আর কি ভাবে? না সিদ্ধি-অসিদ্ধির প্রতি সমদর্শিভাবে। সমত্বেরই নাম যোগ।

এখানে চারিটি বিষয় সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের সহিত যোগে যুক্ত হইয়া যাঁহারা কর্ম্ম করেন—তাঁহাদের সেই যোগই তাঁহাদের নিকটে সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা। এ যে সিদ্ধি—এ সিদ্ধির নাম পুরুষার্থসিদ্ধি। এ সিদ্ধির জন্য যিনি যত্ন করেন—গীতায় তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে তিনি সহস্রের মধ্যে এক জন—"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে"। ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার সিদ্ধি আছে যাহার নাম স্বার্থসিদ্ধি। সচরাচর লোকের নিকটে স্বার্থসিদ্ধিই সিদ্ধি—স্বার্থহানিই অসিদ্ধি; পরন্তু যোগস্থ ব্যক্তির নিকটে (যেমন বলিলাম) যোগই পরম সিদ্ধি; তা বই, স্বার্থসিদ্ধি হয় হউক, না হয় না হউক, দুইই তাঁহার নিকটে সমান।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

এখানে প্রশ্ন-একটি উঠিতে পারে এই যে, তাহা যদি হয়—এরূপ যদি হয় যে, যোগস্থ ব্যক্তির নিকটে যোগই পরাকাষ্ঠা সিদ্ধি, তবে তো তিনি সিদ্ধ হইয়া চুকিয়াছেন—কর্ম্মানুষ্ঠানে কী তাঁহার প্রয়োজন? ইহার উত্তর এই যে, যোগশাস্ত্রের তাত্ত্বিক (technical) ভাষায় যাহাকে বলে "মৈত্রী" অর্থাৎ লোকের সহিত সমদুঃখসুখিতা, তাহা যোগের একটি প্রধান অঙ্গ। যিনি আপনাকে জানেন যোগী মহাপুরুষ অথচ যিনি হিতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, তাঁহার যোগই নহে। মহোদ্যমশালী সেনাপতি স্বয়ং যখন অশ্বপৃষ্ঠে অসিহস্তে বিরাজমান, তখন যে সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া বসিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে যেমন এ কথা খাটে না যে, সে—সেনাপতির সহিত যোগযুক্ত; তেমনি পরমেশ্বর স্বয়ং যখন মঙ্গলের জাগ্রত জীবন্ত অধিনায়ক, তখন যে সাধক আপনার অধিকারায়ত্ত মঙ্গল-কার্য্য হইতে বিরত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম-ধারণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না যে তিনি পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন।—তবে কি তুমি বলো যে, কোনো সাধক যদি আর আর সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জনশূন্য নিভৃত স্থানে বসিয়া যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হ'ন—তাঁহার পক্ষে তাহা অনুচিত কার্য্য?

উত্তর।—তাহা আমি বলি না। আমি বলি এই যে, পাঠাভ্যাসেরও সময় আছে, যোগাভ্যাসেরও সময় আছে। বিদ্যার্থী ব্যক্তিরা চিরকালই কিছু-আর সন্ধ্যাকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া পাঠাভ্যাস করেন না। যেমন সত্য যে, তাঁহারা সব কাজ ছাড়িয়া নির্জ্জনে বসিয়া পাঠাভ্যাসে রত হ'ন; এটাও তেমনি সত্য যে, তাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শিক্ষিত বিদ্যাকে কার্য্যে ফলাইয়া তোলেন। প্রকৃত কথা এই যে, সাধনের প্রথম অবস্থায় নির্জ্জন-বাস সাধকের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন হয়, আর, প্রয়োজন হয় বলিয়াই তাহা শোভা পায়। পরন্তু, সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে তাহা শোভা পায় বলিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, তাহা সিদ্ধাবস্থার পরিচয়-লক্ষণ তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। যে বীজ মাত্রাতীত দীর্ঘকাল মাটি-চাপা থাকে সে বীজ মাটি হইয়া যায়; পক্ষান্তরে, যে বীজ যথাসময়ে অঙ্কুরিত, শাখান্বিত, পল্লবিত, পুষ্পিত হইয়া, পরিশেষে ফলে পরিণত হয়, সেই বীজই শেরা বীজ। ব্যুৎপন্নচেতা সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, চালচলন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই

বিজ্ঞোচিত ধীর ভাব ধারণ করে, আর, সেই জন্য উপনিষদাদি শাস্ত্রে তাঁহারা ধীর নামে প্রসিদ্ধ; তেমনি যোগে যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের আচার-ব্যবহার চাল-চলন, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই যোগযুক্ত মুক্তভাব ধারণ করে; আর, সেইজন্য তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত বলা যুক্তিসঙ্গত। এমন কি, গীতাশাস্ত্রে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে,—

"যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

ইহার অর্থ এই যে, যাঁহার আচার ব্যবহার যোগযুক্ত, কর্ম্মচেষ্টা যোগযুক্ত, নিদ্রাজাগরণ যোগযুক্ত তাঁহার যোগই সর্ব্বদুঃখের মহৌষধ; অর্থাৎ সেইরূপ যোগই যোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

যেমন, বিদ্যাঙ্গ স্বতন্ত্র আর বিদ্যা স্বতন্ত্র; তেমনি, যোগাঙ্গ স্বতন্ত্র, আর যোগ স্বতন্ত্র। পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশে দশ-বিশ বৎসর ধরিয়া কেহ বা মুগ্ধ-বোধ ব্যাকরণ, কেহবা ন্যায়পরিচ্ছেদ, প্রচুর পরিমাণে জ্ঞানে উদরসাৎ এবং ধ্যানে চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া চতুষ্পাঠীর গুরুগৃহ হইতে মহাদম্ভের সহিত দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। ইঁহাদের বিদ্যা ঐ পর্য্যন্তেই পরিসমাপ্ত। তেমনি যাঁহারা বাল্যাবস্থা হইতে পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, ময়ূরাসন প্রভৃতি তরো-বতরো আসন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আসন-সিদ্ধ হ'ন, তাঁহারা যোগী যত হো'ন বা না হো'ন—রঙ্গ-প্রদর্শনকার্য্যে বড় বড় ভেল্কিবাজদিগকে হারাইয়া দ্যা'ন। আবার যাঁহারা ঐরূপ কঠোর তপস্যায় শ্যাম কেশ শুক্লে পরিণত করিয়া প্রাণায়াম-সিদ্ধ হ'ন, তাঁহাদের মধ্যে কোন মহাত্মা কৌতূহলাবিষ্ট দর্শকগণের বিস্মিত নেত্রের সমক্ষে গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মধ্যে ছয় মাস মাটি-চাপা থাকিয়া শেষে যখন অস্থিচর্ম্মসার অর্দ্ধমৃত শরীরে অন্ধকার হইতে আলোকে বাহির হ'ন, তখন, তাহা দৃষ্টে লোকের তাক্ লাগিয়া যায়—সকলেই বলে "ইনি সিদ্ধযোগী"। এরূপ সাধক যদি যোগী না হইয়া ডুবুরী হইতেন তাহা হইলে সমুদ্রগর্ভ হইতে রাশি রাশি রত্ন সংগ্রহ করিয়া মস্ত একজন ধনাঢ্য বড়লোক হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী যোগাঙ্গের অনুশীলন যোগপন্থীদিগের পক্ষে অনিষ্টজনক বই শুভজনক নহে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। গীতাশাস্ত্র সাধককে শ্বাস রোধ করিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে বলিতেছেন না; বলিতেছেন তিনি—যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে; অথবা যাহা একই কথা—পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার মঙ্গলকার্য্যে যোগ দিতে।

পঞ্চম দ্রষ্টব্য।

প্রকৃত যোগী পুরুষ যে কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত, ভগবদ্গীতায় তাহা দুইটি শ্লোকে নির্দ্ধাত বলিয়া দেওয়া হইয়াছে; সে দুইটি শ্লোক এই:—

(১)

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি সোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"

(২)

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

ইহার অর্থ এই:—

যে জন সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি—আপনাতেও যেমন, অন্যেতেও তেমনি—সর্ব্বত্র সমান দেখেন, অর্জ্জুন, সেই যোগীই পরম যোগী। আবার যোগীদিগের মধ্যে তিনিই যুক্ততম যোগী যিনি আমাগত প্রাণ হইয়া আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন।

পরমাত্মার সহিত যোগে যাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু সুপরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহারা দেখিতে পা'ন যে, আপনারও যেমন—অন্যেরও তেমনি সকল জীবেরই সুখ-দুঃখ একই অভিন্ন প্রেমানন্দের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। কেননা, গোড়ায় প্রেম না থাকিলে—বিচ্ছেদের দুঃখও থাকে না—মিলনের সুখও থাকে না—কিছুই থাকে না—যোগী পুরুষেরা সুখদুঃখমোহের আবরণ ভেদ করিয়া আপনাতেও যেমন অন্যেতেও তেমনি—অন্তরাত্মার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন; আর, সেইজন্য সর্ব্বজগতেই তাঁহার নিকটে আনন্দময় এবং সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহারা সদানন্দ। এইরূপে যাঁহার অন্তঃকরণে প্রেমানন্দের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় তিনি আপনার আত্মাতে সর্ব্বজগতের পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ভজনা করেন এবং তাহাতেই তিনি আপনার সমস্ত কামনার চরিতার্থতা লাভ করেন।

মণিভদ্র।

কানিষ্কের মূর্ত্তি

সাধারণতঃ শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া যিনি সুপরিচিত সেই প্রসিদ্ধ শকরাজ (১) কনিষ্ক আজ প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পরে প্রস্তরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবার এই ভারতে আসিয়া যে দেখা দিয়াছেন এ সংবাদে ইতিহাসপ্রিয়গণের বড়ই আনন্দ হইবে বিবেচনা করিয়া তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

সংবাদ প্রকাশের অগ্রে আমাদের ভারত গবর্ণমেণ্টকে সহস্র ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারাই এসকল কার্য্যের বিধাতা-পুরুষ। তাঁহাদেরই যত্নে ভারতে প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন চলিতেছে ও কত বিলুপ্ত সংবাদ পুনরুদ্ধৃত হইয়া আমাদের অতীত ইতিহাসের দেহশোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

আজ যে মূর্ত্তি লইয়া এই প্রবন্ধ তাহা ভারত গবর্ণমেণ্টেরই যত্নপরিপুষ্ট প্রত্নতত্ত্বানুশীলন কার্য্যেরই ফল। এ ফল ফলিয়াছে মথুরার ভূমিতে। মথুরা যাদুঘরের অবৈতনিক সম্পাদক রায় রাধাকিষণ বাহাদুর এই ফলের আহর্ত্তা। রায় রাধাকিষণ মথুরার এক অযত্ন-নিপতিত উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ খনন করিতে করিতে এই অমূল্য বস্তুটি পাইয়াছেন। যাঁহার পরিশ্রমে আজ এমন বস্তুর আবির্ভাব সেই রাধাকিষণকেও সহস্র ধন্যবাদ।

মূর্ত্তিটি ঠিক্ একটি দণ্ডায়মান মনুষ্যপ্রমাণ। বামহস্তে কৃপাণ, দক্ষিণহস্ত দণ্ডায়মান গদার উপর স্থাপিত। মূর্ত্তিটি

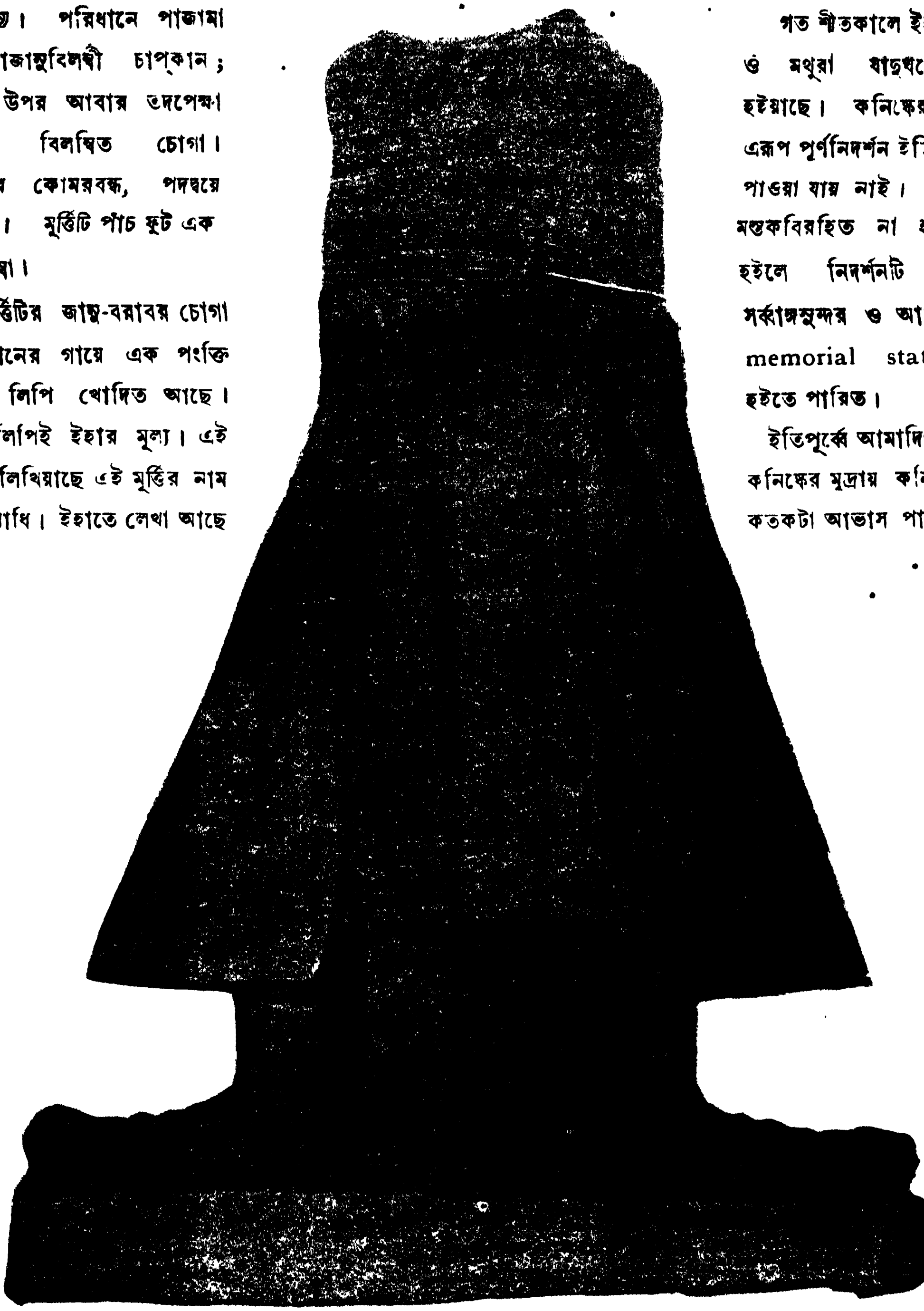
(১) কানিষ্ক নামটিই শিলালিপি-শুদ্ধ হইলেও কনিষ্ক নামেই তিনি এযাবত পরিচিত হইয়া আসিতেছেন বলিয়া সাধারণের সুবোধার্থ আমরা তাঁহাকে কনিষ্কই বলিব।

মস্তকশূন্য। পরিধানে পাজামা ও আজানুবিলম্বী চাপ্‌কান; তাহার উপর আবার তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিলম্বিত চোগা। কোমরে কোমরবন্ধ, পদদ্বয়ে উপানৎ। মূর্ত্তিটি পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা।

মূর্ত্তিটির জানু-বরাবর চোগা চাপ্‌কানের গায়ে এক পংক্তি একটি লিপি খোদিত আছে। এই লিপিই ইহার মূল্য। এই লিপি লিখিয়াছে এই মূর্ত্তির নাম ও উপাধি। ইহাতে লেখা আছে

গত শীতকালে ইহা আবিষ্কৃত ও মথুরা যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। কনিষ্কের চেহারার এরূপ পূর্ণনিদর্শন ইতিপূর্ব্বে আর পাওয়া যায় নাই। মূর্ত্তিটি যদি মস্তকবিরহিত না হইত তাহা হইলে নিদর্শনটি একেবারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও আজ কালকার memorial statueর মত হইতে পারিত।

ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে প্রথমে কনিষ্কের মুদ্রায় কনিষ্কের মূর্ত্তির কতকটা আভাস পাইতে হইত।



কনিষ্ক-প্রতিমূর্ত্তি (মথুরায় প্রাপ্ত)।

"মহারাজা রাজাতিরাজা দেবপুত্রো কনিষ্কো" সুতরাং নিঃসন্দেহে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে ইহা কনিষ্কের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি।

তাহার পর যখন ১৯১০ সালে অপরান্ত প্রদেশের সারভেয়ার ডাক্তার স্পুনার ডাক্তার ফুসের ইঙ্গিত অনুসারে চীন



কনিষ্ক-প্রতিমূর্ত্তির লিপি।

পরিব্রাজকগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত রাজা কনিষ্কের নির্ম্মিত বৃহৎ স্তূপের ও তৎসংলগ্ন বিহারের অনুসন্ধানে পেশোয়ার নগরীর গঞ্জদ্বারের বহির্ভাগস্থিত সাহ-জী কী ঢেরী অর্থাৎ রাজার ঢিবি বলিয়া অভিহিত দুইটা উচ্চ উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ খনন করেন ও একটিতে একটি ভগ্নাবশিষ্ট স্তূপ আবিষ্কার করেন এবং তাহাই কনিষ্কের স্তূপ বিবেচনা করিয়া হিউন্‌সাঙ্গের কথানুসারে তাহাতে রক্ষিত গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ফলে জগতের আনন্দজন্য একটি মিশ্রধাতুর স্থালী ও তন্মধ্যে মৃদঙ্গাকার স্ফটিক-খণ্ডের অভ্যন্তরে তিনখানি বুদ্ধাস্থি প্রাপ্ত হয়েন। তখন হইতে ঐ স্থালীগাত্রে খোদিত কনিষ্কের একটি দুই ইঞ্চি পরিমিত দণ্ডায়মান মূর্ত্তি দেখিতে পাই। ইহাই এই মথুরামূর্ত্তি আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কনিষ্কের দীর্ঘ ও পূর্ণ মূর্ত্তি। পেশোয়ারের সে মূর্ত্তিটি যে কনিষ্কের তাহা তাহাতেই খোদিত আছে। মূর্ত্তিটির উভয়পদের উভয় পার্শ্বে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'কনি' ও 'ষ্ক' এইরূপ ভাগাভাগী রূপে লিখিত আছে। তাহা ছাড়া এই ধাতুপাত্রটি যে কনিষ্ক-সংশ্লিষ্ট তাহার প্রমাণলিপিও তাহাতে আছে। "দস অগিশল নবকর্ম্মি কনষ্কস বিহরে মহসেনস সংঘরমে" বলিয়া কথাগুলি তাহাতে লিখিত দেখা যায়। ডাক্তার স্পুনার ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন, দাস অগিশল মহাসেনের সঙ্ঘারামস্থিত কনিষ্ক-বিহারের তত্ত্বাবধায়ক। মূলে ও অনুবাদে অর্থগত কোন না কোন গোল থাকিলেও "কনষ্কস বিহরে" অর্থাৎ কনিষ্কের বিহার এ কথাটা নির্ব্বিবাদে পাওয়া যাইতেছে।

যে মহারাজা রাজাতিরাজা দেবপুত্র আজ প্রস্তরমূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছেন ইনি কোথাকার, কবেকার ও কোন বংশের এবং ভারতেরই বা কে ছিলেন তাহা বলিতেছি।

প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীরা ইহাঁকে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে এসিয়ার যাযাবর ইউচি জাতীয় কুষাণবংশীয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর কোন এক সময়ে চীন সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তবাসী ইউচি ও হিউংনু নামক জাতিদ্বয়ে একটা বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে ইউচি জাতিকে পরাজিত ও একেবারে দেশভ্রষ্ট হইতে হয়। তখন ইউচিরা আরও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে ও পথিমধ্যে বুসুন নামক আর এক দল যাযাবরের সহিত সংগ্রাম করে। এই সংগ্রামে ইউচিরা জয়ী হয়। বুসুনরা এই সংগ্রামে শুধু যে পরাজিত হয় এমন নহে, তাহাদের রাজা "নন্‌তেওমি" ইহাতে নিহত হয়। বিজয়ী ইউচিরা কিন্তু আরও পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে এবং "সে" বা "সোক্‌" নামক জাতির রাজ্য আক্রমণ করে। সোকেরা তাহাদের এই আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ইউচিদিগের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করতঃ সুদূর দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী "কিপিন" নামক স্থানে গিয়া বসবাস করিতে লাগিল। ইউচিরা এদিকে যখন সোক্‌দিগের রাজ্যে বসবাস করিতেথাকে তখন নিহত বুসুনরাজ নন্‌তেওমির পুত্র "বেন্‌মো" পিতৃহত্যার পরিশোধ লইতে হিউংনু নামক এক জাতির সাহায্যে ইউচিদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করে। ইউচিরা সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা তাহাদিগের নূতন রাজ্য পরিত্যাগ করতঃ তাহিয়ায় বা বক্ত্রিয়াতে (Tahia or Bactria) আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এইখানে নিরাপদে বাস করিতে করিতে ক্রমে তাহারা তাহাদের সেই প্রাচীন

যাযাবর ভাব পরিত্যাগ করে এবং হিওউমি, চোয়াংমো, কৌই-সৌয়াং, হিথুন্ ও কাওকু নামক পাঁচটি রাজবংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে কিন্তু কৌইসৌয়াং-রাজ কিউৎসিউকিও ক্রমে অপর চারটিকে অধীন করিয়া নিজে সর্ব্বপ্রধান হইয়া পড়েন। পার্থিয়া (পারদদেশ) ও কাবুল ক্রমে তাঁহার হস্তগত হয়। এই প্রবলপরাক্রান্ত কৌই-সৌয়াং-রাজ অশীতিবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া আপনার বীরত্ব দেখাইয়া যান। তাঁহার পুত্রের নাম ইয়েন্ কাওসিন্। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। ইহারই দ্বারা সিন্ধুদেশ অধিকৃত হয় ও ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ইউচি-রাজের নামে সে প্রদেশ শাসিত হইতে থাকে। ইহা ঘটিয়াছিল খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে যখন উক্ত প্রদেশ ভারতীয় গ্রীক্‌দিগের শেষ রাজবংশের অধীন ছিল।

এখন হইতেই এই ইউচি বংশের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয়। ভারতে আসিলে পর এই ইউচিদিগের নাম হয় তুষার বা তুখার। বিষ্ণুপুরাণে আমরা তুষারদিগের নাম দেখিতে পাই।

এই তুষারদিগেরই অপর একটি নাম কুষাণ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ইহারা ইউচি জাতির কৌইসৌয়াং রাজবংশীয়। কৌইসৌয়াং চীনদেশীয় কথা। সেই চীনের কথাটি চীনদেশ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভারতে আসিলে কুষাণ এই কথায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাই এই বংশীয় রাজা প্রথম কদ্‌-ফাইসেসের (Kadphises I) মুদ্রায় "মহরজস মহতস কুষন কুযুলকফস" লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। লিপিটির অর্থ মহান্ মহারাজ কুষাণ কদ্‌ফাইসেসের (মুদ্রা)। কদ্‌-ফাইসেস্ খৃষ্টপর প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত-প্রান্তের রাজা ছিলেন।

কুষাণবংশীয় ভারতসংসর্গী প্রথম রাজা ইয়েন কাওসিন্ ব্যতীত আমরা নিম্নলিখিত কুষাণরাজগণের মুদ্রা দেখিতে পাই।

কাদ্‌ফাইসেস ১ম
কাদফাইসেস ২য়
কনিষ্ক
হুবিষ্ক
বাসুদেব

এই প্রথম কাদ্‌ফাইসেস ইয়েন কাওসিনের পুত্র কিনা বলা যায় না। দ্বিতীয় কাদ্‌ফাইসেস প্রথমের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ; ইহার নাম ইয়েন্ কাও চিং বা হিম কাদ্‌-ফাইসেস্। কনিষ্ক এই দ্বিতীয়ের উত্তরাধিকারী কিন্তু পুত্র নহেন। কনিষ্কের পিতার নাম বসিষ্প *। হুবিষ্ক ও বাসুদেব কনিষ্কের পর পর উত্তরাধিকারী—পুত্র কি পৌত্র তাহার কোন প্রমাণ নাই।

এই পঞ্চ কুষাণরাজের মধ্যে কনিষ্কই বিশেষ বিখ্যাত। ভারতবাসীর সহিত বিশেষভাবে মিশ্রিত হইয়া ইনি ভারত-বাসী অনেকের আপনার লোক হইয়া গিয়াছিলেন। বিশেষ ইনি নিজে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায় বৌদ্ধগণের বড়ই প্রিয় হইয়াছিলেন। কাশ্মীরে বৌদ্ধদিগের যে প্রসিদ্ধ চতুর্থ মহাসঙ্গীতি বসিয়াছিল তাহা কনিষ্কেরই উদ্যোগে ঘটিয়াছিল। কনিষ্ক তাই বৌদ্ধদিগের চক্ষে অশোকের সমশ্রেণীর একজন রাজা।

এই কনিষ্ক কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন তাহা লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ অনেক। অতি কম এগার রকম মত ইহার সময় নির্দ্ধারণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইসব মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮ বৎসর হইতে খৃষ্টপর ২৭৮ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার অভিষেককাল কথিত হয়। যে বিক্রম সংবৎ আমরা আমাদের রাজা বিক্রমাদিত্যের সংবৎ বলিয়া থাকি, কেহ কেহ বলেন তাহাই কনিষ্কের সংবৎ। বিক্রম বা বিক্রমাদিত্য বলিয়া বাস্তবিক কেহ ছিল না। উক্ত সংবৎ ৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আরব্ধ বলিয়া পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত মতে তিনি ৫৮ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের রাজা। এইরূপ কাহারও মতে তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চমাব্দের, কাহারও মতে খৃষ্টপর ৬৫, ৭৮ বা ৯০ অব্দের। এই ৭৮ অব্দবাদীরা তাঁহাকে শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই মতটিই অনেকটা প্রসিদ্ধ মত।† ইহার বিরুদ্ধে সম্প্রতি কেনেডি নামক একজন ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দই কনিষ্কের রাজ্যাভিষেকের, ও সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরে অধিষ্ঠিত বৌদ্ধ চতুর্থ মহাসঙ্গীতির,

* শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের Scythian period of Indian History, plate I and its reading.

† শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মতেরই পোষকতা করিয়া-ছেন। Scythian period of Indian History দ্রষ্টব্য।

কাল বলিয়া ৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দবাদী প্রসিদ্ধ কানিংহাম ও ডাক্তার ফ্লিট্কে সমর্থন করিয়াছেন। এবং আমাদের বিক্রমাদিত্যকে উড়াইয়া দিয়া কনিষ্ককেই সংবতের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এরূপ অবস্থায় কনিষ্কের সূক্ষ্মরূপে কালনির্ণয়ের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া তিনি খৃষ্টের পূর্ব্ব বা পর প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন ইহা বুঝাই ভাল।

এখন, ভারতে তাঁহার সাম্রাজ্য ছিল কতদূর দেখা যাউক্। এ সম্বন্ধে শিলালিপির সাহায্যে জানিতে পারা যায় যে তাঁহার পৈতৃক সাম্রাজ্য গান্ধার ও কাশ্মীর ব্যতীত, দক্ষিণে সিন্ধু ও পূর্ব্বে বারাণসী লইয়া সমস্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশটাই তাঁহার সাম্রাজ্য ছিল। তাঁহার মুদ্রা তৎকালে এতই প্রচলিত ছিল যে তাহা বারাণসীর আরও পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী গাজীপুর ও গোরখপুরে পাওয়া যায়।

কনিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ঠিক্ বলা যায় না। তবে তাঁহার পৈতৃক সাম্রাজ্য গান্ধার ও কাশ্মীরের মধ্যে কাশ্মীরেই কনিষ্কের ও তদ্বংশীয়ের অনেক কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কাশ্মীরেই যে উঁহার রাজধানী ছিল তাহা কতক নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। তিনি কাশ্মীরে কনিষ্কপুর বলিয়া এক নগর নির্ম্মাণ করান, তাঁহার উদ্যোগে কাশ্মীরেই বৌদ্ধদিগের চতুর্থ মহাসঙ্গীতি আহূত হয়, তাঁহার পর তাঁহার উত্তরাধিকারী হুবিষ্ক কাশ্মীরেই হুষ্কপুর নামে নগর ও যথেষ্ট মঠ এবং বিহার প্রস্তুত করাইয়া যান। গান্ধারে কনিষ্কের কার্য্যের ভিতরে পেশোয়ারে এক স্তূপেরই নিদর্শন পাওয়া যায়।

গান্ধার ও কাশ্মীর ব্যতীত কনিষ্কের অপর ভারতীয় সাম্রাজ্য তিনি ক্ষত্রপ* (Satrapa, the Governor) নিযুক্ত করিয়া শাসন করিতেন।

ইউচিবংশের বর্ণনাকালে দেখান হইয়াছে যে কনিষ্ক তদ্বংশীয় কৌইসৌয়াং (কুষাণ) ধারার লোক। তবে যে তাঁহাকে শক বলা হয় তাহা কিরূপ। ইহার উত্তরেও মতভেদ আছে। যে মতে ইঁহাকে সংবতের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, সে মতে ইনি শক নহেন। ইঁহাকে শক বলেন শকাব্দের-প্রতিষ্ঠাতৃ-বাদীরা। ইঁহারা বলেন কনিষ্ক খৃষ্টীয় ৭৮ পরাব্দে মথুরায় আসিয়া অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই অভিষেক বৎসর হইতে যে অব্দ প্রচলিত হয় তাহার নাম শকাব্দ। শকাব্দ নাম হইবার কারণ প্রান্তভারতবাসীরা প্রান্তচীনবাসী ভারত-আক্রমণকারী-দিগকে শক নামেই অভিহিত করিত।+ সুতরাং কনিষ্কও যখন মূলতঃ একজন প্রান্তচীনবাসীবংশীয় তখন ইনিও একজন শক, ইহাই তৎকালে ভারতের সিদ্ধান্ত। তাই তদভিষেক বৎসরই শকাব্দের আবির্ভাব-বৎসর বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপে ইনি শক, কিন্তু প্রকৃত শক নহেন।

মথুরায় কনিষ্ক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ইহা যাঁহারা বলেন মথুরায় এই মানবপ্রমাণ কনিষ্কমূর্ত্তি পাওয়া যাওয়ায় তাঁহাদের মতটি যেন দৃঢ়ীভূত হইয়া পড়িতেছে। বিদেশীয় রাজা ভারতে আসিয়া ভারতের প্রসিদ্ধস্থান মথুরায় অভিষিক্ত হইয়া উহা চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্যই তাঁহার একটি মূর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, ইহাই যেন মথুরার এই মূর্ত্তিটির উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের অভ্যন্তরে ইহা যেন তাঁহার Memorial!

শ্রীবিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ।

* ক্ষত্রপ কথাটা প্রাচীন পারস্যভাষার Satrapa কথার সংস্কৃত রূপ, ইংরাজীতে ইহাকে গবর্ণর বলে।

+ এ শক বলিবার কারণ আমার বোধ হয় যখন সে বা সোকেরা ইউচিদিগের আক্রমণে স্থানভ্রষ্ট হইয়া বক্তিয়াতে (Bactria) আশ্রয় লয় ও তথা হইতে ইহাদিগের দ্বারা পুনরাক্রান্ত হইয়া আফগানিস্থান ও পঞ্জাবে আসিয়া পড়ে, তখন প্রান্তভারতবাসীরা সোক্‌দিগকে সক বলিত। উহাতেই ভারতে 'শক' শব্দের আবির্ভাব, ও যে-কেহ চীনপ্রান্তবাসীই তাহাদের চক্ষে তখন শক]।

জলটুঙি

(William Butler Yeats)

এবার আমি নিচ্ছি ছুটি,—ছুট্‌ছি এবার জলটুঙিতে,—
ছোট্টো আমার পাতার কুঁড়ে তুল্‌ব সেথা কাদার ভিতে;
হোগ্‌লা দিয়ে ছাইব তারে,—কাঠের আড়া, বাঁশের ডাঁশা,
পাহাড়তলীর নিদ্‌মহলে মৌমাছিদের গুন্‌ব ভাষা।

সুখ নাহি পাই স্বস্তি পাবই,—শান্তি সুখের খেল্‌ব খেলা
ঘোম্‌টা-ঘেরা ভোরটি হ'তে নাগাদ ঝিঁঝিঁ-ডাকার বেলা;

রাত দুপুরের ঝিক্ ঝিকি আর দিন দুপুরের আলোর খেলা
দেখ্‌ব ;—সাঁঝে আকাশ জুড়ে সবুজ পাখীর হেলাফেলা

এবার আমায় উঠ্‌তে হ'ল—ছুট্‌তে হ'ল জলটুঙিতে
বাঁধা জলে ঢেউ উঠেছে মন্দ মৃদু,—তটের ভিতে ;
শুন্‌তে আমি পাচ্ছি আওয়াজ,—ঢাক্‌বে তারে কোন্ আওয়াজে
শুন্‌ছি তারে পথের ধারে,—শুন্‌ছি আমার বুকের মাঝে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

হেমকণা

পঞ্চনদ যবনসেনার পদানত হইয়াছিল, তাহা বহুপূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছ। বিপাশাতীরে প্রাচীবিভীষিকা যখন যবনের বিজয়উল্লাস নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছিল, মগধরাজের বিজয়বাহিনীর বিবরণ শুনিয়া যবন যখন পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছিল, তখনও আমি যবন সৈনিকের বস্ত্রাভ্যন্তরে ছিলাম। বলদৃপ্ত গৌরবের উচ্চশির নত হইয়াছিল, মরুগুপ্ত দুর্জ্জেয় সকল পর্ব্বতদুর্গ ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। যবনসেনা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যখন দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল তখন আমার অধিকারী স্থলপথগামী সেনাদলের সহিত পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের সিংহদ্বারের অর্গলস্বরূপ পুরুষপুর-দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া পথশ্রান্ত যবনসেনা যখন পংক্তি ভগ্ন করিয়া বিশ্রামলাভের আদেশ পাইল তখন আমার অধিকারী দ্রুতপদে পুরুষপুর নগরের রাজপথে অবস্থিত উজ্জ্বল আলোকমালায় বিভূষিত একটি বিপণী মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহমধ্যে একটি স্থূলকায়া রমণী উচ্চ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া মৃৎভাণ্ডে সুরা বিক্রয় করিতেছিল, গৃহের চতুষ্পার্শ্বে বহু মানবমানবী মৃণ্ময়পাত্র হইতে আসব পান করিতেছিল। বিপণীস্বামিনী আমার পরিবর্ত্তে এই যবনকে দুইটি অতি বৃহৎ মৃৎকলসপূর্ণ মদ্য প্রদান করিল এবং যখন আমাকে কাষ্ঠাধারে আবদ্ধ করিতেছিল তখন দেখিলাম যবন কক্ষে বসিয়া একাগ্র মনে সুরাপান করিতেছে। কাষ্ঠাধারের মধ্যে থাকিয়া বিপণীতে ভীষণ কলরব শুনিতেছিলাম, অনুমানে বুঝিলাম বহুক্ষণ যাবৎ শত শত ব্যক্তি গৃহে গমনাগমন করিতেছে। উষাকালে যখন বিপণী-স্বামিনী কাষ্ঠাধারে সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া অঞ্চলে বদ্ধ করিল, তখন দেখিলাম দীপমালা নির্ব্বাপিত হইয়া আসিয়াছে, মাদকের মোহিনীশক্তির প্রভাবে শতাধিক নরদেহ হর্ম্ম্যতলে অবলুণ্ঠিত হইয়াছে। ভীষণ নাসিকা-গর্জ্জন গৃহটিকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে এক-একজন জড়িতকণ্ঠে বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। গৃহস্বামিনী বিপণী হইতে নির্গত হইল। প্রশস্ত রাজপথে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে যবনরাজের সেনাগণ আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল ; নিশাশেষে অস্পষ্ট আলোকে তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত শবরাশি বলিয়া ভ্রম হইতেছিল ; পথের আচ্ছাদনের পাষাণে তাহার লৌহকীলকবদ্ধ চর্ম্মপাদুকার শব্দে জাগরিত হইয়া কোন কোন যবন মস্তকোত্তোলন করিতেছিল, তাহা দেখিয়া গান্ধারী রমণী পাদুকা মোচন করিয়া তাহা হস্তে গ্রহণ করিল ও অবিলম্বে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিল। বহুদূর গমন করিয়া সুরাবিক্রেত্রী নগরপ্রান্তে একটি ধ্বংসোন্মুখ গৃহের দ্বারে করাঘাত করিল। বারম্বার করাঘাতেও যখন দ্বার উন্মুক্ত হইল না রমণী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া কবাটে পদাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। গুরু আঘাতে জীর্ণদ্বার ভগ্ন হইল, রমণী শ্বাসহীন অবস্থায় দ্রুতবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহমধ্যে দ্বিতীয় কক্ষে কঠিন ভূমিশয্যায় একটি অপরূপ সুন্দরী বালিকা শয়ন করিয়াছিল, রমণী কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তাহার কেশরাশি হস্তে গ্রহণ করিয়া সবলে আকর্ষণ করিল, সদ্যসুপ্তোত্থিতা বালিকা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিষ্ঠা গান্ধারী রমণী বালিকাকে নিক্ষেপ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। গৃহের দ্বিতীয় তলে একটি বৃহৎ কাষ্ঠাধারে রমণী তাহার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ রক্ষা করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

কাষ্ঠাধার যখন পুনরায় উন্মুক্ত হইল তখন পুনরায় রজনী আসিয়াছে, গৃহমধ্যস্থ দ্রব্যগুলি অন্ধকারে দেখা যাইতেছে না। কক্ষমধ্যে ধীরে ধীরে অস্পষ্টস্বরে দুইজন মনুষ্য কথোপকথন করিতেছিল। তাহারা নিকটে আসিলে দেখিলাম একজন পূর্ব্বপরিচিত তরুণী, দ্বিতীয় ব্যক্তি জনৈক

অপরিচিত যুবক। তাহারা কাষ্ঠাধার হইতে প্রাচীনার কষ্টসঞ্চিত অর্থগুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গৃহ হইতে নির্গত হইল ও নগর পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল। বহুদূর পথ চলিয়া উভয়ে গিরিপথে প্রবিষ্ট হইল, বন্ধুর শিলাসঙ্কুল পথ তাহাদিগের গতিরোধ করিল, শ্রান্ত হইয়া যুবক যুবতী পর্ব্বতের পাদদেশে বৃহৎ শিলাখণ্ডের পার্শ্বে আত্মগোপন করিয়া উভয়ে উপবেশন করিল, মুহূর্ত্তমধ্যে মোহিনীমায়ার ন্যায় নিদ্রা আসিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিল; তখন নীলাকাশে চন্দ্রালোক উদ্‌ভাসিত হইতেছিল, গিরিপথে অন্ধকার আচ্ছন্ন শিলাখণ্ড-গুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, আলোক পাইয়া পান্থগণ একে একে অশ্ব ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে গিরিপথে প্রবেশ করিতেছিল; পুরুষপুর হইতে নগরহার তিন প্রহরের পথ, সূর্য্যালোক প্রখর হইলে পথচারণ অসম্ভব হইয়া উঠে।

ক্রমে গিরিপথে সার্থবাহগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, গিরিপথ পণ্যবাহী অশ্ব ও উষ্ট্রচালকগণের কোলাহলে সজীব হইয়া উঠিল, তরুণী ও তাহার সহচরের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাহারা ধৃত হইবার ভয়ে অন্ধকার মধ্যে লুক্কায়িত হইল। কিন্তু তাহাদিগের দুরদৃষ্টবশতঃ একজন বণিক উষ্ট্রত্যাগ করিয়া পদব্রজে চলিতেছিল, শিলাখণ্ডের পার্শ্বে ক্ষীণ অন্ধকার মধ্যে শ্বেতবর্ণ পদার্থ দেখিতে পাইয়া তাহার উষ্ট্র ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, বণিক তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া পাষাণের ছায়ায় মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া যুবক ছায়ার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, কিন্তু যুবতী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। বণিক তাহার হস্ত ধারণ করিয়া আলোকে আনয়ন করিল এবং তাহাকে সুন্দরী দেখিয়া সাদরে একটি পণ্যবাহী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বসাইল, সার্থবাহগণ পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিল। গিরিপথ অতিক্রান্ত হইল, শিলাসঙ্কুল বালুকাময় পথে উষ্ট্র ও অশ্বশ্রেণী চলিতে লাগিল, পশ্চাতে চন্দ্রালোক ম্লান হইয়া আসিতেছিল, পথের চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণীর বর্ণ ক্রমশঃ নীলাভ হইয়া আসিতেছিল। উষা-আগমনে হৃষ্ট হইয়া ভারবাহী পশুগণ দ্রুতবেগে গমন করিতেছিল, তরুণী তখন বস্ত্রাধার হইতে গোপনে এক এক খণ্ড সুবর্ণ লইয়া পরিধেয় বস্ত্রমধ্যে গোপন করিতেছিল। কিন্তু দিবালোক ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল, যুবতী একাদশটি সুবর্ণ মুদ্রার অধিক গ্রহণ করিতে পারিল না। শুভ্র উষা আসিয়া যখন অন্ধকারকে পর্ব্বতকন্দরে বিতাড়িত করিল, তখন সার্থবাহগণ পণ্যসম্ভারবাহী পশুদিগকে বিশ্রাম প্রদান করিবার জন্য অর্দ্ধদণ্ডকাল অপেক্ষা করিল, তখন সকলে অশ্ব ও উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল। তরুণীর আশ্রয়দাতা তাহার ক্ষীণ কটিদেশ হইতে বিলম্বিত গুরুভার বস্ত্রাধার দেখিয়া সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিল ও তাহার মধ্যে হস্তার্পণ করিয়া এক-মুষ্টি সুবর্ণ বাহির করিল। সুবর্ণের বর্ণ দেখিয়া সে উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলে তাহার সহযাত্রীগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কেহ বলিল শ্রেষ্ঠী নাগসেন শুভ মুহূর্ত্তে যাত্রা করিয়াছিল, আমরাই কেবল অশুভের ভাগী হইলাম। কেহ বলিল নাগসেন ভাগ্যক্রমে যৌতুক সহ সুন্দরী পত্নী লাভ করিয়াছে, কেহবা নিলর্জ্জ হইয়া তরুণীর সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বলিল এইরূপ অপরূপ রত্নের মূল্য সহস্র সুবর্ণের অধিক। নাগসেন বস্ত্রাধারটি স্বীয় কটিদেশে রক্ষা করিল এবং তরুণীকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপন কালে তাহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিতে বিস্মৃত হইল না।

দূরে নীলগিরিশিখর প্রথমসূর্য্যকিরণস্পর্শে যখন সুবর্ণমণ্ডিত হইয়া গেল, সার্থবাহগণ তখন পুনরায় যাত্রা করিল। পর্ব্বতসঙ্কুল পাদপহীন মরুসম ভূমি শীঘ্রই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, চালকগণ নির্দ্দয় হইয়া পশুদিগকে চালনা করিতে লাগিল। দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইলে তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল, পশু ও মনুষ্যগণ তাপদগ্ধ ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। চালকগণের বিষম পীড়ন সত্ত্বেও পশুগুলি দ্রুতবেগে চলিতে পারিতেছিল না, অগ্নিময় রক্তাভ বালুকাক্ষেত্রে তাহাদিগের পদ দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, তৃণপাদপবিহীন পর্ব্বতগাত্র হইতে অসহ্য উত্তাপ বায়ুচালিত হইয়া জীবগণকে দগ্ধ করিতেছিল। একটি উষ্ট্র ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল, তাহার আরোহী দ্রুতপদে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে একটি একটি করিয়া ছয়টি অশ্ব ও উষ্ট্র অর্দ্ধমৃত অবস্থায় মরুপথে পতিত রহিল। স্থানে স্থানে পশু ও মানবের কঙ্কাল রক্তবর্ণ মরুভূমিকে শ্বেত আভা প্রদান করিতেছিল।

ধীরে ধীরে পণ্যযাত্রা পর্ব্বতসঙ্কুলপথ পরিত্যাগ করিয়া সমতল বালুকাক্ষেত্রে উপনীত হইল। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে দূরে মরুপ্রান্তে শ্যামল তৃণক্ষেত্র ও পাদপশ্রেণী লক্ষিত হইল, তখন শৃঙ্খলা বিস্মৃত হইয়া, তাড়না বিস্মৃত হইয়া যথাসম্ভব দ্রুতবেগে পশুগুলি তাহার দিকে অগ্রসর হইল। অর্দ্ধ প্রহর পরে মৃতপ্রায় মানবগণ ও পশুগুলি ভীষণ মরুমধ্যে মৃতসঞ্জীবনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। মরুমধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রস্রবণ অর্দ্ধক্রোশাধিক ভূমি তৃণাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে অসংখ্য খর্জ্জুরবৃক্ষ জন্মিয়াছিল। অতীত যুগে কোন আঢ্য শ্রেষ্ঠী পশু ও মানবের হিতার্থ প্রস্রবণের চতুষ্পার্শ্বে জলসঞ্চয়ের জন্য পাষাণনির্ম্মিত সুবৃহৎ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, কালবশে কুণ্ডের আচ্ছাদন জীর্ণ হইলেও তাহা নির্ম্মল সুশীতল বারিপূর্ণ হইয়া থাকিত, অবশিষ্ট জল তৃণক্ষেত্রমধ্যে প্রবাহিত হইয়া মরুমধ্যে জীবনসঞ্চার করিত। কুণ্ডের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া প্রভু ও ভৃত্য, পশু ও মানব আকণ্ঠ জলপান করিল ও খর্জ্জুর বৃক্ষের ক্ষীণ ছায়ায় বিশ্রাম লাভার্থ উপবেশন করিল। তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে পণ্যযাত্রা তৃণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মরুপথ অবলম্বন করিল। যখন দিবালোক ম্লান হইয়া আসিতেছিল তখন ক্লান্ত সার্থবাহগণ দূরে পর্ব্বতবেষ্টিত নগরহারপুরের উচ্চচূড় সৌধমালা দেখিতে পাইল। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভ কিরণমালা যখন নগরহারের শুভ্র প্রাসাদ-শিখরসমূহ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিতেছিল তখন পণ্যযাত্রা ধীরে ধীরে নগরতোরণে প্রবিষ্ট হইতেছিল। দক্ষিণ তোরণের পার্শ্বে বৃহৎ পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বণিকগণ রজনী অতিবাহিত করিল। তরুণী রাত্রিকালে পান্থশালার কক্ষমধ্যে আবদ্ধা রহিল। অশ্বসমূহের হ্রেষারবে, হস্তীর বৃংহণে ও উষ্ট্রের কর্কশ ধ্বনিতে যখন পান্থনিবাসের প্রাঙ্গন কলরবপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন নাগসেন তরুণীকে কক্ষ হইতে বহির্দ্দেশে আনয়ন করিল। পান্থনিবাসের অপর পার্শ্বে রাজপথে দাস-বিক্রয় হইতেছিল, পথের উভয় পার্শ্বে বিক্রেতাগণ তাহাদিগের পণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, যোনদেশের সুন্দরী তরুণী, প্রতীহাররক্ষাসমর্থা বলিষ্ঠা বাহ্লীকরমণী, কপিশাবাসী পিঙ্গলকেশ আর্য্য, বাহ্লীকনিবাসী দীর্ঘকায় শক, মীনাক্ষী গান্ধারী, সবলদেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র প্রভৃতি নানা দিগ্দেশ হইতে আগত দাসদাসী শরতের প্রভাতে নগরহারের রাজপথে বিক্রীত হইতেছিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বালকবালিকা ও পুরুষগণ, এবং ক্ষুদ্রবস্ত্রপরিহিতা রমণীগণ প্রদর্শিত হইতেছিল। নাগসেন যুবতীকে এইস্থানে প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহার রূপে মোহিত হইয়া নগরহারবাসী জনৈক ধনশালী বৃদ্ধ বণিক সহস্রাধিক সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া বালিকাকে ক্রয় করিল, আমরা সার্থবাহগণের সাহচর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম। ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে কটিদেশ আবৃত করিয়া, লজ্জায় অবনত হইয়া বালিকা সভয়ে বৃদ্ধের পশ্চাদনুসরণ করিল। বৃদ্ধ অবিলম্বে তরুণী সমভিব্যাহারে নগরহারের প্রধান রাজপথের পার্শ্বস্থিত সুবৃহৎ প্রাসাদে প্রবেশ করিল।

সুন্দরী তরুণী অত্যল্প কালমধ্যে বৃদ্ধ স্বামীর মনোহরণ করিল ও বৃদ্ধের বিস্তৃত প্রাসাদের কর্ত্রী হইয়া উঠিল। একদিন সন্ধ্যাকালে পুরুষপুর হইতে পলায়ন-বিবরণ বলিতে বলিতে যুবতী ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চল হইতে আমাদিগকে লইয়া বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিল, বৃদ্ধ আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া সযত্নে লৌহপেটিকা মধ্যে আবদ্ধ করিল।

তাহার পর বহুকাল সূর্য্যালোক দেখিতে পাই নাই। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ইতিহাসবিশ্রুত বাবিরুষ নগরে অকালে যবনরাজ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের ভার শিশুপুত্র ও যুবতী বিধবার হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় অনতিবিলম্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মুষ্টিমেয় যবনসেনা পঞ্চনদ হইতে তাড়িত হইয়াছিল। অবিলম্বে মগধনাথ প্রাচীন পৌরব, যাদব ও মাদ্ররাজ্য ধ্বংস করিয়া পঞ্চনদে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। যবনরাজের বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনানীগণের উপভোগ্য হইয়াছিল। মহাসেনাপতি সিলিউক আর্য্যাবর্ত্ত ও যোনদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশসমূহ অধিকার করিয়া যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া যবনরাজের বিজয়যাত্রার অনুকরণে উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যবনাভিযানের প্রথম তরঙ্গ বাহ্লীকের নগরপ্রাকার স্পর্শ করিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া নগরপ্রাকার বিধ্বস্ত করিয়া দিল, তখন বাহ্লীক হইতে

মহামাত্য কপিশা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যবনসেনা কপিশা নগরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সংবাদ আসিল সম্রাট স্বয়ং পাটলিপুত্র হইতে যাত্রা করিয়াছেন। যবনস্রোত বাধা মানিল না, বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া যবনসেনা দুর্গের পর দুর্গ নগরের পর নগর করায়ত্ত করিতেছিল। দাসীপুত্রের শাসনকর্ত্তারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কপিশা দুর্গ রক্ষা করিতে পারেন নাই, পানীয় জলের অভাবে যখন দুর্গবাসীগণ আত্মসমর্পণ করিল তখন বিস্মিত যবনসেনা দেখিল অনাহারে শীর্ণ মৃতপ্রায় শতাধিক পদাতিক দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, যবনরাজ দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিলেন। সিলিউকের বিজয়-বাহিনী কপিশা পশ্চাতে রাখিয়া মরুবেষ্টিত নগরহার দুর্গ অবরোধ করিল। নগরহারে মৌর্য্যসেনা এই সংবাদ পাইল, যে, সম্রাট শতদ্রুতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। ভীষণ মরুবেষ্টিত সুদৃঢ়প্রাকারগুপ্ত নগরহার কিয়ৎকালের জন্য যবনসেনার গতিরোধ করিয়াছিল। নগরহার, পুরুষপুর, উদ্যান ও গান্ধার অধিকৃত হইল, দুস্তর সিন্ধুনদ অতিক্রান্ত হইল। যখন দূরে তক্ষশিলার পশ্চিম তোরণ দৃষ্ট হইল তখন যবনের মুখ শুষ্ক হইল, কারণ নগরদ্বারে মৌর্য্যসম্রাটের সিংহাঙ্কিত রক্তবর্ণ পতাকা প্রবলবায়ুভরে উড়িতেছিল। সিলিউক অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই, তক্ষশিলার এক যোজন দূরে যবনশিবির স্থাপিত হইয়াছিল, নগরোপকণ্ঠ বস্ত্রাবাসে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, নগরপ্রান্তরে দ্বিতীয় যবনাভিযানের ভাগ্যপরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার ফল যাবনিক ইতিহাসে দেখিতে পাইবে।

যবনসেনা যখন নগরহার লুণ্ঠন করিয়াছিল, তখন তাহার নবীনা ক্রীতদাসী যবনের উপভোগ্যা হইয়া স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিল। সেই সময়ে বণিকের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত সুবর্ণরাশি যবনরাজের কোষভুক্ত হইয়াছিল, দ্বিতীয় যাবনিক অভিযানে যবনসেনার সহিত আমি পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম।

যখন বিশ্ববিজয়ী যবনসেনা সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যাবর্ত্তে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন শত শত ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত উত্তরাপথ অনায়াসে যবনরাজের পদানত হইয়াছিল। দ্বিতীয় যাবনিক অভিযানের সময়ে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ সমবেত হইয়া যবনসেনার সম্মুখীন হইয়াছিল। যুদ্ধব্যবসায়ে শুক্লকেশ সিলিউক বুঝিয়াছিলেন বাহ্লীক, কপিশা ও গান্ধার সহজে জিত হইলেও পঞ্চনদ অধিকার সহজসাধ্য হইবে না, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা পরাজিত হইলেও যবনসেনা সাম্রাজ্যের সুশিক্ষিত সেনাদলের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। বৃদ্ধ সিলিউক সহস্রযুদ্ধে বিশ্ববিজয়ী যবনসম্রাট কর্ত্তৃক যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন, ভয় তাঁহার হৃদয় হইতে বহুপূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছিল। অদূরদর্শী সেনানায়কগণ হয় তো অভিযান শেষ করিয়া পশ্চাদ্পদ হইতেন, কিন্তু সিলিউক বুঝিয়াছিলেন বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে যবনসেনার এক নও তাহার নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। তিনি তক্ষশিলা নগরের অদূরে প্রান্তরমধ্যে পরিখা খনন করিয়া ও মৃণ্ময় প্রাকার রচনা করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, অর্দ্ধাধিক সৈন্য দুর্গমধ্যে রহিল, অবশিষ্ট সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত পথরক্ষায় ব্যাপৃত হইল। তক্ষশিলানগরের প্রাসাদে অবস্থান করিয়া চন্দ্রগুপ্ত সকল সংবাদ অবগত হইতেছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যবন আক্রমণ করিবে না, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, তখন অবিলম্বে শিবির ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। পঙ্গপালের ন্যায় মৌর্য্য পদাতিকসেনা প্রান্তরমধ্যস্থিত মৃণ্ময় দুর্গ অবরোধ করিল, অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথারোহীগণ অবিরাম পথরক্ষী যবনগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সপ্তাহকাল মধ্যে দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া যবনসেনা পরিখাপারে যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইল। তখন চন্দ্রগুপ্ত দূর হইতে অশ্বারোহী সেনা দ্বারা যবনসেনার উভয় পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন, দূর হইতে লক্ষ লক্ষ পদাতিকসেনা কৌতুক দেখিতে লাগিল। বিপদ বুঝিয়া সিলিউক প্রত্যাবর্ত্তনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ধীরে ধীরে সুশৃঙ্খলে যবনসেনা হটিতে লাগিল, পথ তখনও স্থানে স্থানে যবনাধিকৃত ছিল। ধীরে ধীরে পশ্চাদ্পদ হইয়া সিলিউক সিন্ধুতীরে উপনীত হইলেন। যবনসেনা যখন তক্ষশিলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল তখন মৌর্য্যসম্রাটের অসংখ্য অশ্বারোহী সুবিধা পাইলেই চতুষ্পার্শ্ব হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছিল, কোনও যবন এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বস্থান পরিত্যাগ করিলে আর ফিরিতেছিল না। যবনরাজ

বিনাযুদ্ধে সিন্ধু পার হইয়া পলায়ন করিলেন। মৌর্য্য অশ্বারোহীগণের অবিশ্রান্ত আক্রমণে দিন দিন যবনসেনার সংখ্যা হ্রাস হইতেছিল। পুরুষপুর নগরে আহার্য্য পাইয়া যবন সেনা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিল। কেহ কেহ সুদৃঢ় পুরুষপুর-দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া সিলিউককে মৌর্য্য সেনার আক্রমণে বাধাপ্রদান করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু সিলিউক তক্ষশিলার প্রান্তরে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন বিদেশে দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ হইলে অন্নাভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, উদ্ধারের কোন আশাই থাকিবে না। যবনসেনা পুরুষপুর হইতে নির্গত হইয়া গিরিপথের প্রবেশদ্বারে শিবির স্থাপন করিল। শিলাসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ গিরিপথে অশ্বারোহী সৈন্য চালনা করা অসম্ভব, তাহা বুঝিয়া সিলিউক একবার ভাগ্যপরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। পুরুষপুর নগরোপকণ্ঠে উভয়সেনা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল। যবনরাজ কোষ, অবরোধ ও পীড়িত ব্যক্তিগণকে গিরিপথে রাখিয়া লৌহবর্ম্মাবৃত দুর্জ্জেয় পদাতিকসেনা গিরিপথের দ্বারে স্থাপন করিলেন। অল্পসংখ্যক যবন অশ্বারোহী গিরিপথের অপর দ্বার অধিকার করিয়া রহিল।

ভীষণ বেগে বার বার আক্রান্ত হইয়াও সুশিক্ষিত যবনসেনা হিমবানের ন্যায় অচল রহিল, সহস্র চেষ্টা করিয়াও মৌর্য্য পদাতিকগণ তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না, ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং সৈন্যচালনা করিতেছিলেন। যবনসেনার সম্মুখে মৃতদেহের প্রাকার রচিত হইয়াছিল, কিন্তু বিশ্ববিদিত ব্যূহ রচনা করিয়া যবনসেনা পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। সময়ে সময়ে সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাতে পুরুষপুর-দুর্গের উচ্চ চূড়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, হঠাৎ দুর্গশীর্ষে হরিদ্বর্ণ আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, একই সময়ে গিরিপথমধ্যস্থিত পর্ব্বতশিখরে অগ্নিশিখা দৃষ্ট হইল। উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া সহস্র সহস্র মৌর্য্য পদাতিক যবনব্যূহ আক্রমণ করিল, শবদেহের সেতু নির্ম্মাণ করিয়া মৌর্য্য পদাতিক সেনা যবনব্যূহ অতিক্রম করিল, অকস্মাৎ নিশ্চল যবনসেনা কম্পিত হইয়া উঠিল, গিরিপথে উচ্চ কোলাহল শ্রুত হইল, যবনগণ পশ্চাদ্‌পদ হইতে লাগিল, ব্যূহ নষ্ট হইল, পংক্তি ভঙ্গ হইল, বিশৃঙ্খল হইয়া যবনসেনা ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। চন্দ্রগুপ্তের আদেশে প্রাদেশিক মহামাত্যগণ গান্ধারে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ হইতে গিরিপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মুষ্টিমেয় যবন অশ্বারোহীসেনা গান্ধার বীরগণের গতিরোধ করিতে পারে নাই, উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া যবনসেনা পরাজিত হইল। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধনভাণ্ডার ও সুশিক্ষিত সেনা হারাইয়া যবনরাজ সিলিউক, মৌর্য্যসেনা কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন, দ্বিতীয় যাবনিক অভিযান শেষ হইল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

"জেনারেল" বুথ

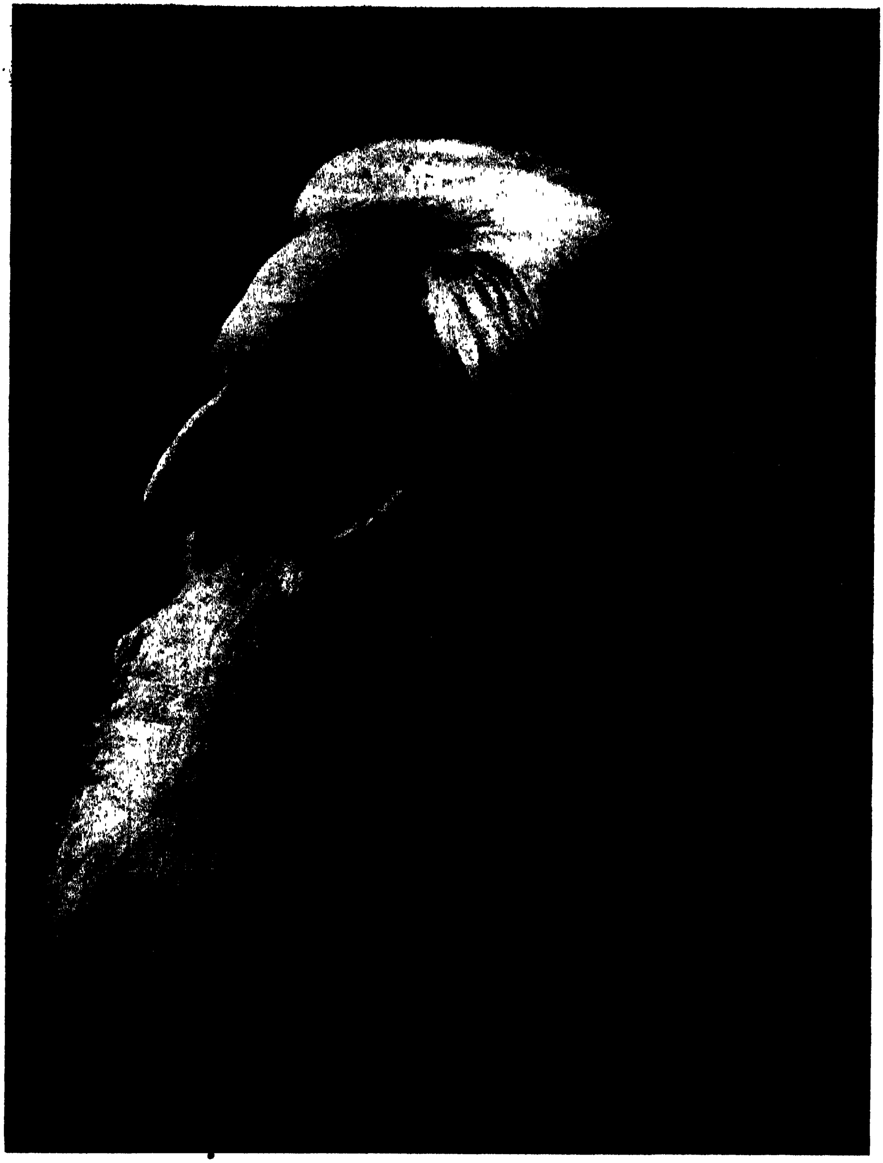
"Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest"—St. Matthew, XI, 28.

বিধাতার বিশ্বে যখনই কোন বিশেষ অমঙ্গল প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠে তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিবিধায়কও আপনা হইতেই দেখা দেয়। মানবজাতির ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ইংল্যাণ্ড রাজশক্তির অপব্যবহারে প্রপীড়িত, তখন বীরবর ক্রমোয়েল অমিততেজে প্রজাশক্তির অধিকার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স যখন বিলাসব্যসনমত্ত বুর্ব্বোবংশের অত্যাচারে ও অভিজাতবর্গের স্বার্থপরতায় অধঃপতনের চরমসীমায় উপস্থিত, তখন ফরাসীবিপ্লবের তাণ্ডবনৃত্য তাহার মৃত প্রাণে চেতনা সঞ্চার করাইয়া দিল। আমাদের ভারতবর্ষেও প্রাচীনকালে যখন আর্য্যগণের সরল বৈদিক ধর্ম্ম ক্রিয়াকাণ্ডবাহুল্যে পঙ্গু ও নিষ্ঠুর যজ্ঞ, জীববলিতে পরিণত হইল তখন নবোত্থিত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বন্যা আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। বর্ত্তমানকালেও আমাদের দেশে একদিন যখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কার ও অর্থহীন আচারপদ্ধতি প্রাচীন সমাজপ্রাণকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ করিয়া তুলিল তখন পশ্চিম হইতে একটা বিরাট অভিঘাত আসিয়া সেই সুপ্ত জাতীয় জীবনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করিয়া দেশে

ও সমাজে নবজীবনের সূত্রপাত করিয়া দিল। এইরূপে সমস্ত জাতির কি রাষ্ট্রীয়, কি ধর্ম্ম, কি সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব যখনি পৃথিবীর যে অংশে কোন বিশেষ অমঙ্গল মস্তক উত্তোলন করিয়াছে তখনই সেখানে তাহার প্রতিবিধানের আয়োজন হইয়াছে।

এক সময়ে যখন ইংল্যাণ্ডের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণী, ধর্ম্ম, প্রেম, করুণা প্রভৃতি মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া পাপের পঙ্কিলাবর্ত্তে পতিত, তখন আজ এ স্থলে যে পূতচরিত্র মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত করিতে যাইতেছি—তিনি তাহাদের তমসাচ্ছন্ন প্রাণে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি সঞ্চার করিয়া দিয়া সেই হীন অবস্থা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহার সেই আত্মোৎসর্গের ফলে পাপের চরম অবস্থায় উপনীত লক্ষ লক্ষ নরনারী আজ নবজীবন লাভ করিয়া শতকণ্ঠে সেই মহতোমহীয়ানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে!

বিশ্ববিশ্রুত ধর্ম্মপ্রচারকমণ্ডলী "মুক্তি ফৌজের" প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মপ্রাণ "জেনারেল" বুথ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে ইংল্যাণ্ডের নটীংহাম নগরে এক অতি দারিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক দারিদ্র্যবশতঃ তাঁহার বাল্যজীবন অতি দুরবস্থাতেই অতিবাহিত হয়। জনৈক ধর্ম্মযাজকের অনুগ্রহে তাঁহার যৎসামান্য শিক্ষালাভ হয়, বিদ্যালয়ে কিম্বা কলেজে পড়িবার সুযোগ তিনি পান নাই। শৈশবে বুথ তাঁহার পরিবার মধ্যে "প্রোটেষ্ট্যাণ্ট চর্চ্চ অব ইংল্যাণ্ডের" ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে প্রতিপালিত হন। কিন্তু বালক বুথের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগী প্রাণ "চর্চ্চ অব ইংল্যাণ্ডের" সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে স্ফূর্ত্তি পাইল না। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়সেই প্রকাশ্যভাবে "ওয়েসলিয়ান মেথডিষ্ট" (Wesleyan Methodist) ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া তাহাদের প্রচারক নিয়োজিত হইয়া নটীংহাম নগরেই ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। প্রায় পাঁচবৎসরকাল এই স্থানে প্রচার করিয়া ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বিংশতি বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডনে আসিয়া নানাস্থানে "উন্মুক্ত সভায়" জনসাধারণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ, বক্তৃতা ও সঙ্গীতের সাহায্যে, প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু "ওয়েসলিয়ান মেথডিষ্ট" সম্প্রদায় এই সমুদয় "উন্মুক্ত সভার" উপকারিতায় বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই বুথের সহিত এ বিষয়ে তাঁহাদের মতান্তর হওয়াতে তিনি "ওয়েসলিয়ান মেথডিষ্ট"দিগের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া "মেথডিষ্ট নিউ কনেক্সন" (Methodist New Connexion) নামে "মেথডিষ্ট"দেরই আর একটী সম্প্রদায়ে প্রচারকের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। কয়েক বৎসর প্রচারের পরে এই সম্প্রদায় বুথের অদ্ভুত কার্য্যকুশলতা ও অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কোন স্থলের স্থায়ী আচার্য্যের পদে বরণ করিলেন। কিন্তু কোন বিশেষ স্থলে আবদ্ধ থাকিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিবার ইচ্ছা তাঁহার একেবারেই ছিল না। বুথের বহুদিনের বাসনা তিনি ইংল্যাণ্ডের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া যেখানে আবশ্যক বোধ হইবে সেইখানেই ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। তিনি এই বিষয়ে আপনার অভিমত "মেথডিষ্ট নিউ কনেক্সনের" কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার এই প্রস্তাবের অনুমোদন না করায় তাঁহাকে আচার্য্যের পদ ত্যাগ করিতে হইল। পদত্যাগ করিয়া বুথ কর্ণোয়ালে (Cornwall) আসিলেন। এই স্থানে পুরুষদিগের মধ্যে তিনি ও রমণীদিগের মধ্যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। কিছুকাল পরে কর্ণোয়াল হইতে তাঁহারা কার্ডিফে (Cardiff) এবং অবশেষে কার্ডিফ হইতে ওয়ালস্‌-অলে (Walsall) গমন করিলেন। ওয়ালস্‌-অলে আসিয়া বুথ ও তাঁহার পত্নী কয়েকটী লোকের সাহায্যে "Hallelujah Band" নামে একটী ধর্ম্মপ্রচারের দল গঠন করিয়া দরিদ্র ও পতিতা-পল্লীতে, কারামুক্ত অপরাধীগণের গৃহে গৃহে, থিয়েটার ও সরাবখানার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া "পতিতপাবন" ও "দীনবন্ধুর" নামগান শুনাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই—চৌর্য্য, মদ্যপান, কুৎসিত বচসা ও জুয়াখেলায় যাহাদের প্রাত্যহিক জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত, ভ্রমেও যাহারা কখনো ভগবানের নাম লইত না—তাহারা বুথের উপদেশে ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতার সংস্পর্শে আসিয়া "Hallelujah Band" ভুক্ত হইয়া পড়িল। বুথের এই "Hallelujah Band" উন্মুক্ত প্রান্তরে এবং অন্যান্য



জেনারেল বুথ (৭।৮ বৎসর পূর্ব্বকার ফটোগ্রাফ)।

প্রকাশ্যস্থানে ধর্ম্মসঙ্গীতের তালে তালে নানাবিচিত্র বাদ্য-যন্ত্র বাজাইয়া ধর্ম্ম প্রচারের এক অভিনব পন্থা খুলিয়া দিল। কিন্তু ওয়ালস্-অলের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার জন্য এই মহৎ অনুষ্ঠান সূচিত হয় নাই একথা বুথ অতি অল্প-দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন। জগতে যে দিবারাত্রি বহুশত অভাগা, আশ্রয়হীন, শোকজীর্ণ ও রোগশীর্ণ পাপী-তাপীর ক্রন্দন উঠিতেছে তাহা তিনি জানিতেন, তাঁহার বিশালহৃদয়ে এইসকল দুঃখকাতর, অনশনক্লিষ্ট, পাপপথের পথিক নরনারীর আর্ত্তধ্বনি পৌঁছিয়া তাঁহাকে আর স্থির থাকিতে দিল না। তিনি লণ্ডনের পূর্ব্বপ্রান্তের [East End] বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে আপনার আরব্ধ কর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ালস্-অল ত্যাগ করিলেন।

লণ্ডনের পূর্ব্বপ্রান্তে বুথ তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে দারিদ্র্যই এইসকল স্থানের অধিবাসীগণের শোচনীয় নৈতিক দুরবস্থার একমাত্র কারণ। বুথ বুঝিলেন ক্ষুধার তাড়নাতেই পুরুষ চৌর্য্য ও নরহত্যা, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাকথন আশ্রয় করে ও রমণী আপনার শালীনতা বিসর্জ্জন দেয়; রাক্ষসী ক্ষুধার তাড়নাতেই জননী, পিশাচীর ন্যায় আচরণ করে, আপন সন্তানের মুখ হইতে আহার কাড়িয়া লয়, আপন গর্ভজাত কন্যাকে পাপ পথে পরিচালিত করে। কিন্তু এই নৈতিক দুরবস্থার মূল কারণ যে দারিদ্র্য তাহা দূর করা অল্পদিনের কিম্বা সহজসাধ্য কার্য্য নয় বুঝিয়া বুথ একদল উৎসাহী লোক সংগ্রহপূর্ব্বক "ঈষ্ট এণ্ডের" নানা স্থানে সভা, সংকীর্ত্তন, ধর্ম্মোপদেশ, বক্তৃতা—এমন কি পুষ্টিকর সুখাদ্য পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই ধর্ম্মপ্রচার-মণ্ডলীর নাম হইল "The East London Revival Society"; ভবিষ্যতে এই সোসাইটী দুইবার নাম পরিবর্ত্তনের পর "The Salvation Army" উপাধি গ্রহণ করে।



জেনারেল বুথ (শেষ ফোটোগ্রাফ)।

"পূর্ব্ব লণ্ডন পুনরুজ্জীবনী সমিতি" গঠিত হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু দরিদ্র, সমাজ-পরিত্যক্ত, কারা-মুক্ত, পাপনিমজ্জিত পতিত ও পতিতা বুথের বৃথাবাগাড়ম্বর-হীন, প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে নবজীবন পাইয়া ক্রমে ক্রমে এক মহামণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়া তুলিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বুথ এই বিরাট মণ্ডলীকে এক সম্পূর্ণ নূতন আকার ও আখ্যা দান করিলেন। ব্রিটীশ সৈন্যবিভাগের আদর্শে তাঁহার প্রচারমণ্ডলীর নিয়মপ্রণালী গঠনপূর্ব্বক তাহার কার্য্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটী বিভাগের উপর এক একটী কার্য্যের ভার দিলেন। মণ্ডলীর সভ্যগণকে সৈনিকবেশে সুসজ্জিত করিলেন, সৈনিকবিভাগের ন্যায় মণ্ডলীর কর্ম্মচারীগণের "কাপ্তেন," "মেজর," "কর্ণেল" প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হইল। রণসঙ্গীতের অনুকরণে "March onward Christian Soldiers." প্রভৃতি ধর্ম্মসঙ্গীত রচিত হইল। এমন কি সভ্যগণের বাসের জন্য ইংল্যাণ্ডের নানাস্থানে "ব্যারাক" পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইল; আর এই "সৈন্যদলের" নাম হইল "The Salvation Army" বা "মুক্তিফৌজ" এবং তাঁহাদের কর্ম্ম হইল পাপের বিরুদ্ধে অভিযান। বুথ এই মুক্তিফৌজের অধিনায়ক হইয়া "জেনারেল" উপাধি গ্রহণ করিলেন। "জেনারেল" বুথের পরিচালনায় "মুক্তিফৌজ" পতিত ও হীনকে পাপতাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য বহু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। প্রকাশ্য সভায় অতি সরল ভাষায় বক্তৃতা ও ধর্ম্মোপদেশ দান, বিরাট শোভাযাত্রা, পানশালা ও কারাগার পরিদর্শন, দরিদ্র-পল্লীভ্রমণ এবং রোগীর পরিচর্য্যা, নৈশবিদ্যালয় স্থাপন ও পতিতা উদ্ধার প্রভৃতি নানা বিচিত্র মঙ্গল অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু সকল দেশে ও সকল যুগে যাহা ঘটিয়াছে এ ক্ষেত্রেও তাহার পুনরভিনয় হইল। বুথের প্রচার-মণ্ডলীর এইরূপ অভিনব আকার ধারণে দেশমধ্যে একটা তুমুল বিরুদ্ধ আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। কতিপয় সংবাদপত্র

এই আন্দোলনে যোগদানপূর্ব্বক তাহার পুষ্টিসাধন করিয়া "মুক্তিফৌজের" বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা নিন্দাবাদ ও কুৎসা প্রচার আরম্ভ করিলেন। গভর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত ফৌজের নামে ভীত হইয়া উঠিল এবং "মুক্তিফৌজের" সভা ও শোভাযাত্রা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া নিষিদ্ধ হইল। "মুক্তি-ফৌজের" কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনেককে সাধারণের শান্তিভঙ্গের অপরাধে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া অর্থদণ্ড এবং কোন কোন স্থলে কারাদণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইল। কিন্তু বুথ ইহাতে ভীত বা নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি জানিতেন ক্ষমতার মদে মাতাল লোকেরা তাঁহার গুরু যীশুকে প্রত্যহ অপমান করিয়াছে এবং অবশেষে তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিয়াছে, তথাপি তিনি সেই হতভাগ্যদিগকে নীরবে ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন। "Blessed are ye when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for His sake," এই উপদেশ সম্মুখে রাখিয়া বুথ বিপুল উৎসাহে "মুক্তিফৌজের" অধিনায়কতায় তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন; সমুদয় ইংল্যাণ্ডে বিপুল আন্দোলনের তরঙ্গ বহিতে লাগিল।

কিন্তু বুথকে স্বদেশবাসীর অবজ্ঞা অধিক দিন বহন করিতে হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার চমৎকৃত স্বদেশবাসীগণ বিস্মিতনেত্রে দেখিল "মুক্তিফৌজ" সহস্র সহস্র দরিদ্র, নিরক্ষর, পাষণ্ড, হৃদয়হীন মদ্যপায়ী ও প্রবঞ্চক এবং দুর্দ্দশার চরমসীমায় পতিত পতিতাগণের মধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। এইরূপে বুথের নাম ও কার্য্যের কথা ক্রমে সমুদয় সভ্যজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাজ্যে ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়াতে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে "মুক্তিফৌজের" শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার অল্প-দিন পরেই ভারতবর্ষে ও লঙ্কাদ্বীপেও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় ছাপান্নটী দেশে ইহার কার্য্যক্ষেত্র এবং একবিংশতিসহস্র কর্ম্মচারী এই সমুদয় শাখাতে কার্য্য করিয়া থাকেন। পতিতা ও অনাথ-আশ্রম, আতুরালয়, হাঁসপাতাল ও দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই "মুক্তিফৌজ" মানবের সেবা করিতেছে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে "জেনারেল" বুথের পত্নীবিয়োগ হয়। বুথের পত্নী তাঁহারি উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। "মুক্তি-ফৌজের" মহিলা-প্রচারবিভাগের কর্ত্রীরূপে তিনি প্রায় দশবৎসরের অধিককাল স্বামীর কার্য্যের সহায়তা করিয়া-ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের পতিতারমণী-উদ্ধারকল্পে এই নারী যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরগৌরবগাথায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে। পত্নীর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই "জেনারেল" বুথের "In darkest England and the way out" পুস্তক-খানি প্রকাশিত হইয়া আর একটী আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। বুথ তাঁহার এই পুস্তকে ইংল্যাণ্ডের অনুন্নতশ্রেণীর অবনতি ও দুঃখদারিদ্র্যের জ্বলন্ত চিত্র আঁকিয়া তাহার প্রতিবিধানের যে সমুদয় পন্থা নির্দ্দেশ করিলেন তাহা পাঠ করিয়া ইংরাজসমাজ বুঝিতে পারিলেন যে সমাজের নিম্নস্তরের অভ্যন্তরেই জাতীয় জীবনের মূলশক্তি নিহিত, আর সমাজ ও জাতিকে যথার্থ শক্তিশালী করিতে হইলে সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত

"ওই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
ওই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে
হবে আশা।"

আর তাহাদেরি জন্য—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট"—

তাই তিনি তাঁহার পুস্তকে ইংল্যাণ্ডবাসীর নিকট এই নিম্নস্তরের জন্য যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার্য্য, উপযুক্ত পরিচ্ছদ, মুক্তস্থানে পরিচ্ছন্ন বাসগৃহ, দরিদ্রের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধবিতরণ, পতিতারমণী মদ্যপায়ী ও ব্যাধি-গ্রস্তের জন্য বাসস্থান প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব উপস্থিতপূর্ব্বক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সহস্র সহস্র মুদ্রা আসিয়া তাঁহার সংকল্পিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল।

মুক্তিফৌজগঠনে দেশে যে একটা বিরুদ্ধভাব জাগিয়াছিল তাহা এতদিনে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সমুদয় পৃথিবীভ্রমণের পর বুথ যখন স্বদেশে ফিরিলেন তখন লণ্ডনের এলবার্ট হলে তাঁহার যে সম্বর্দ্ধনাসভা হয় সেই সভায় ইংল্যাণ্ডের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও দশসহস্র দর্শক তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

"জেনারেল" বুথ অক্লান্তপরিশ্রমী, সদাহাস্যোজ্জ্বল ও অতি মধুরপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কোন প্রকার গর্ব্ব বা অহঙ্কার তাঁহার চরিত্রে স্থান পাইত না। অথচ তাঁহার স্থায় সম্মান সমাদর অতি অল্প ধর্ম্মনেতারই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। ইউরোপের অধিকাংশ রাজন্যবর্গ তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও দার্শনিকগণ তাঁহার সহিত সাগ্রহে আলাপ করিয়াছেন। প্রচারকার্য্যে বুথ মার্কিন যুক্তরাজ্যে পাঁচবার, অষ্ট্রেলিয়াতে তিনবার, ভারতবর্ষে দুইবার ও ইউরোপের সমস্ত দেশে কয়েকবার করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালের জড়বাদ ও নাস্তিকতার যুগে "জেনারেল" বুথ তাঁহার "মুক্তি-ফৌজ" লইয়া যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন একমাত্র মধ্যযুগের মঠপ্রতিষ্ঠাতাদিগের কার্য্যাবলীর সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। আজ সমস্ত ইউরোপ অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছেন যে তিনি "বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনেতা।"

কিন্তু বুথ শুধু 'ধর্ম্মনেতা' ছিলেন না, তিনি অসংখ্য নরনারীর আশাহীন, লক্ষ্যহীন, অন্ধকার হৃদয়ে আনন্দ-উজ্জ্বল-আলোক আনিয়া দিয়াছেন, পতিতানারীর চির-দুঃখের জীবনকে নিজের ভালবাসা দ্বারা উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, ক্ষুধিতকে নিজহস্তে করুণামাখা অন্ন তুলিয়া দিয়াছেন।

বিশ্বমানবের এই হিতৈষী বন্ধু গত ২৩শে আগষ্ট, রাত্রি দশ ঘটিকার সময়, ৮৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়া বিপদ-দুর্গম দীর্ঘ জীবনযাত্রার অবসানে "ক্লান্তপদে রক্তসিক্তবেশে" এক চিরশান্তির স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যু আসিয়া মহৎজীবনের পূত প্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া দেয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের বাণী কি কার্য্যকে কখনই লুপ্ত করিতে পারে না; শত শত শতাব্দীর স্তর ভেদ করিয়া তাহা প্রচ্ছন্নভাবে মানব-অন্তঃকরণকে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখে।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

বিশ্ব-কর্ম্মীর বিজয়-যাত্রা

(William Morris)

কিসের এ গোল? কাণ্ড কি এ? হল্লা কিসের লোকের মেলায়?
পাহাড়তলীর ঝোড়ো হাওয়া গর্জ্জে যেন উঠ্‌ছে হেলায়!
গর্জ্জে যেন উঠ্‌ছে সাগর ভয়ে-ভরা সন্ধ্যা বেলায়!
—জগৎ-জন-সাধারণ ওই গর্ব্ব ভরে
বেরিয়েছে আজ টহল দিতে পথের 'পরে!

কেমন ওরা? যাচ্ছে কোথা?—কোথা হ'তে হ'চ্ছে আসা?
স্বর্গ নরক—দুই ফটকের—মাঝে ওদের কোথায় বাসা?
টাকায় ওদের যায় কি কেনা? কর্ম্মে কাজে কেমন? খাসা?
জনরবের নেইক অন্ত,—হাওয়ার ভরে
বেরিয়েছে সব টহল দিতে বিশ্ব 'পরে!

ওই শোনো—ওই! ঘন ঘন বজ্র হাঁকে,
ওই দেখ—ওই! সূর্য্য হাসে মেঘের ফাঁকে!
ক্রোধ জাগে আর আশা জাগে,—চমক লাগে!
জগৎ-জন-সঙ্ঘ হেথা গর্ব্ব ভরে
টহল দিয়ে ফেরে সারা ভুবন 'পরে!

বর্জ্জে শোচন, শাসন, পীড়ন, স্বাস্থ্য সুখের অভিমুখে
চলেছে সব,—বাঁধ্‌তে বাসা, ছাইতে জগৎ সহজ সুখে;
ধনের হাটে কিন্‌বে ওদের? দেখ না হয় বুকটা ঠুকে!
সময় কিন্তু যাচ্ছে চলে পাখার ভরে,
নূতন হাওয়া দিচ্ছে টহল জগৎ 'পরে!

ওরাই সবে তোমার আমার অন্ন জোগায়, বস্ত্র বোনে,
পাহাড় কেটে রাস্তা বানায়, নগর বসায় বিজন বনে,
তিক্তে ওরা মিষ্ট করে;—কিন্‌বে ওদের কোন্ সে ধনে?
দলে দলে আসছে ওরা গর্ব্ব ভরে
টহল দিতে মুক্ত হাওয়ায় পথের 'পরে!

ওই শোনো—ওই ! ঘন ঘন বজ্র হাঁকে;
ওই দেখ—ওই সূর্য্য হাসে মেঘের ফাঁকে !
ক্রোধ জাগে আর আশা জাগে,—চমক লাগে !
জগৎ-জন-সঙ্ঘ হের গর্ব্ব ভরে
টহল দিতে বেরিয়েছে আজ ভুবন 'পরে !

মুখটি বুজে আস্‌ছে খেটে হাজার হাজার বছর ধ'রে,
ভরসা কভু পায় নি তবু,—আস্‌ছে খেটে মর্ম্মে মরে ;
ঝড়ে এবার বোল্ ফুটেছে—বার্ত্তা আসে হাওয়ায় চড়ে !
ঝড়ের বুলি আস্‌ছে ঝোড়ো হাওয়ার ভরে,
টহল দিয়ে ফিরছে কেবল ভুবন 'পরে !

শুন্‌ছ ? ওগো পুঁজির মালিক ! ভয়ের কথা শুন্‌ছ নাকি ?
বল্‌ছে ওরা "জ্যান্তে ম'রে খাট্‌ব না আর পরের লাগি",
বল্‌ছে ওরা "মানুষ মোরা, সুখের দাবী মোরাও রাখি।"
কৃষাণ, কুলি, মজুর, মুটে গর্ব্ব ভরে
টহল দিয়ে ফিরছে কেবল পথের 'পরে !

ওই শোনো !—ওই ! ঘন ঘন বজ্র হাঁকে !
ওই দেখ—ওই সূর্য্য হাসে মেঘের ফাঁকে !
ক্রোধ জাগে আর আশা জাগে !—চমক্ লাগে !
জগৎ-জন-সঙ্ঘ আজি গর্ব্ব ভরে
টহল দিয়ে ফিরছে সারা ভুবন 'পরে !

যুদ্ধ দেবে ?—তা হ'লে তো সমিধ সম ভস্ম হ'বে,
শান্তি ?—তবে ভেদ রেখনা, কণ্ঠ মিলাও কণ্ঠরবে ;
আশার সঙ্গে ইচ্ছা মিলুক,—নবীন জীবন জাগ্‌ছে ভবে !
নূতন বাণী ছুটছে যেন হাওয়ার ভরে !
আশাদেবী আবির্ভূতা বিশ্ব 'পরে !

টহল্ দিয়ে চলছি মোরা বিশ্বলোকের কর্ম্মী যত,
অব্যাহতির হর্ষ-গীতি শুন্‌ছ না কি অব্যাহত ?
ধ্বজায় মোদের আশার বাণী—কর্ম্মিজনের মনের মত !
জগৎ-জন-সঙ্ঘ আজি গর্ব্ব ভরে
বেরিয়ে প'ল টহল দিতে ভুবন 'পরে !

ওই শোনো—ওই ! ঘন ঘন বজ্র হাঁকে,
ওই দেখ গো সূর্য্য আবার মেঘের ফাঁকে !
আশার সঙ্গে শক্তি জাগে—চমক লাগে !
বিশ্বভূমির কর্ম্মীরা কুচ-কাওয়াজ ক'রে
গর্ব্ব ভরে দিচ্ছে টহল ভুবন 'পরে !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলোচনা

পরভৃত।

বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত জলধর দেব মহাশয় লিখিয়াছেন, "কোকিল বার মাস আমাদের দেশে থাকে না, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে" ইত্যাদি।

জলধরবাবু বঙ্গের বাহিরে অবস্থিত কোন সাহেবের লেখার অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। নতুবা বঙ্গবাসী আর এখন কোকিলকে বিদেশী পাখী বলিতে পারেন না। কোকিল বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, এখানে একরূপ চিরস্থায়ীই হইয়া পড়িয়াছে। চিরবঙ্গবাসী অন্যান্য পক্ষীর সঙ্গে কোকিল সমশ্রেণীতে আসন লাভ করিবার দাবী উপস্থিত করিতে পারে।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় "আষাঢ়ের" প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার প্রবন্ধ প্রবাসীতে পাঠানোর আর তত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি নাই। সম্প্রতি ভাদ্রের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে আমার বক্তব্য প্রকাশ করার আবশ্যকতা দেখিতেছি। "পরভৃত" প্রবন্ধের স্পষ্ট মীমাংসা হওয়া উচিত, অন্ততঃ হইলে ভাল।

কালীপ্রসন্নবাবুর "গিরিকিরীটিণী ত্রিপুরার পর্ব্বত প্রকৃতির রম্যকুঞ্জ মধ্যে বারমাস কোকিল দেখিতে পাওয়া যায়" এই কথার উপর জানকীবাবু লিখিয়াছেন, "কিন্তু ইহার দ্বারা বঙ্গের গিরিহীন সমতল ক্ষেত্রে সকল সময় কোকিল দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অনুমান করিয়া লইবার উপায় নাই। প্রকৃতই কোকিলকুল বঙ্গের অনেক পল্লী হইতেই বসন্ত অন্তে বিদায় গ্রহণ করে। এটি প্রত্যক্ষ সত্য। ত্রিপুরা হয়ত বার মাসই কোকিলের বসবাসের উপযুক্ত ; সমগ্র বঙ্গভূমি তাই বলিয়া উহাদের পক্ষে সেইরূপ উপযুক্ত তাহা অনুমান করা চলে না।"

জানিনা জানকীবাবু কোথা হইতে এই "প্রত্যক্ষ সত্য" পাইয়াছেন। পক্ষীজাতির বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য কৌতূহল বশতঃ বিগত সাত বৎসরের অধিক কাল স্থানে স্থানে ঘুরিয়া, নিজের পর্য্যবেক্ষণে যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা "প্রতিভা" পত্রে* প্রকাশিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে "তোষিণী"তে কোকিলের সম্বন্ধেও শিশুপাঠ্য কিছু লিখিয়াছিলাম। "পাখী" নামে অন্যান্য পাখীর ইতিহাস সম্ভবতঃ পত্রান্তরে প্রকাশিত হইবে। আমি কোনও ইংরেজী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করি নাই ; শুধু নিজ পর্য্যবেক্ষণের ফলে যাহা শিখিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া থাকি। এমতাবস্থায় আমার সাক্ষ্যের উপর জানকী-বাবুর "প্রত্যক্ষ সত্য" মিথ্যা না হউক, অন্ততঃ বিপরীত ভাবের দুইটী সত্য বঙ্গদেশে স্থানলাভ করিবে।

সংখ্যার হিসাবে বার মাস এদেশে সমান পরিমাণে কোকিল দৃষ্ট হয় না। মাঘ মাসের শেষার্দ্ধের সূর্য্যকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে ও প্রাহ্নে কোকিলের কুহুরব একএক বার বনভূমিকে মুখরিত করিয়া তোলে। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই চারি মাস যথাতথা কোকিলের কণ্ঠধ্বনি শোনা যায়। বর্ষার প্রবল ধারাপাতের সময় কোকিল, পাপিয়া,

* "গায়ক পাখী"—প্রতিভা।

দোয়েল প্রভৃতি গায়ক পাখীর শব্দ কদাচিৎ শ্রুতিগোচর হয়। বর্ষণ-শেষে যখন সূর্য্যকিরণ শ্যামলা প্রকৃতির সিক্ত দেহ মুছাইয়া দেয় তখন কোকিল পাপিয়ার মনোহর সঙ্গীত আবার শুনা যায়। শরৎকালেও কোকিল ডাকে। শরতের শেষ হইতেই কোকিলের সংখ্যা যেন অনেক কমিয়া আসে এবং হেমন্ত ও শীত ঋতু কোকিল প্রায় নীরবেই অতিবাহিত করে। তখন যে দিন আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার থাকে, সেদিন কখন কখন কোকিলের ডাক শুনা যায়। শীতের প্রকোপে সমস্ত প্রাণীই জড়সড় হইয়া থাকে; বিশেষতঃ পক্ষী ও পুষ্প। কোকিল একটু বেশী মাত্রায় সৌখীন এবং একটু দুর্ব্বল; কাজেই শীতে বেশী জড়সড় হইয়া থাকে। তখনও কোকিলকে আমাদের দেশে দেখা যায়, তাহার গানও শোনা যায়। এমন কি তখন এদেশে কোকিল না থাকিলে কাকের বাসায় তাহার পক্ষে ডিম পাড়িবার ব্যবস্থাই বাদ দিতে হয়। প্রবাদ আছে, "কাক সকলের আগে বাসায় কুটা নেয়" অর্থাৎ খড়কুটা দ্বারা কাক আগেই বাসা প্রস্তুত করে এবং তাহাতে ডিম পাড়ে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে কাক বাসা তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করে এবং মাঘ মাসের শেষ ভাগে কখন কখন ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি ডিম পাড়ে। মাঘ মাসের শেষভাগে মাদী কোকিলগুলি আসঙ্গলিপ্সায় পুংকোকিলের ডাক শুনিয়া, তাহাদের কাছে যায় এবং 'কু-উ' ও অন্য একরূপ শব্দ করে। অন্য সময় মাদী কোকিল প্রায় দৃষ্ট হয় না; অথবা আমরা তত মনোযোগ করিয়া তাহার সন্ধানও করি না। কারণ মাদী কোকিলের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আকৃতিগত পার্থক্য অনেক রহিয়াছে। মাদী কোকিলকে কোকিল বলিয়া চিনিতে পারাই কঠিন। 'বৌ-কথা-ক' এবং পাপিয়ার সংমিশ্রণে গঠিত একটা নূতন পাখী বলিয়া বোধ হয়। মাদী কোকিল কদাচিৎ বনান্তরাল হইতে বাহিরে আসে।

জানকীবাবু "এদেশে বন্য টিয়ার নাম গন্ধও নাই" বলিয়াছেন, ইহাতে আমাদের মত হয়ত অনেকেই বিস্মিত হইবেন। বন্য অর্থে জানকীবাবু কি বুঝিয়াছেন জানি না, কিন্তু স্বাধীন স্বচ্ছন্দে ভ্রমণকারী টিয়ার এদেশে অভাব নাই। শহরে, মফস্বলে উচ্চ মঠের গাত্রস্থিত ফাঁকে, দালানের কার্ণিসে আলো প্রবেশের জন্য রক্ষিত ক্ষুদ্র খোপে, উচ্চ বৃক্ষশিরের গর্ত্তে (কাঠঠোকরা পক্ষী এই গর্ত্ত বা "খোড়ল" নির্ম্মাণ করে) আমরা টিয়া পাখীর স্থায়ী বাসস্থান ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছি। এবং এইসকল টিয়া প্রতিপালন করিয়া রাধাকৃষ্ণ বুলি শুনিবার আকাঙ্ক্ষা মিটান যায়। ময়না, চন্দনা প্রভৃতি আমাদের দেশে বাসা করে না, এমন কি ভ্রমেও বেড়াইতে আসে না।

জানকীবাবু বলিয়াছেন "সুধীগণ পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে গণনাদ্বারা বস্তুর সমষ্টি নির্ণয় করিবার শক্তি নিম্নশ্রেণীর ইতর প্রাণীর নাই।" পরক্ষণেই বলিয়াছেন "কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়িবার কালে, নিজের যতটী ডিম পাড়ে, কাকের ততটী ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলে," সুতরাং কাক ও কোকিল হয় ইতর প্রাণী নহে; নতুবা সুধীগণের সিদ্ধান্ত ভুল হইয়াছে। জানকীবাবু প্রমাণ করিতেছেন, উভয়েই গণনায় সুদক্ষ। হাঁস মোরগ প্রভৃতি পক্ষী ব্যতীত অনেক পক্ষীই তিনটী হইতে পাঁচটী ডিম্ব প্রসব করে। কাক প্রায়ই দুই তিনটী ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে; কোকিলও তিন চারটী মাত্র ডিম্ব প্রসব করে। এই অবস্থায় ত কাকের বংশ লোপ হওয়ার যোগাড় দেখা যায়। কাক বেচারীর সবগুলি ডিম ফেলিয়া দিলে কাকেরও বংশ নাশ, অবশেষে কোকিলেরও ধাত্রী লোপ। আমরা জানকীবাবুর এইমত সমর্থন করিতে পারি না। তাঁহার লিখিত "সুধীগণের" পরীক্ষার ফলই বাস্তবিক সত্য। কাক ৩+৩=৬টী ডিম বা যাহা তাহার অদৃষ্টে থাকে ততগুলি ডিমেই তা দেয় এবং ততগুলি শাবকেরই আহার যোগায়।

ফিঙ্গার বাসায় 'বৌ-কথা-ক' ডিম পাড়ে (ফিঙ্গা ও বৌ-কথা-ক প্রবন্ধ—প্রতিভা)। আমরা পাপিয়ার সম্বন্ধে ঠিক কিছু জানিতে পারি নাই (পাপিয়া প্রবন্ধ—প্রতিভা)। জানকীবাবু ছাতারে বা সাতভাই পাখীর বাসায় পাপিয়ার ছানা দেখিয়াছেন। তাঁহার নিকট এ তথ্য জ্ঞাত হইয়া উপকৃত হইয়াছি। আরও ২।১টী পাখী পরের উপর সন্তান পালনের ভার দিয়া বড়লোকের মেয়েদের মত স্ফূর্ত্তি করিয়া দিন কাটায়।

জলধর বাবুর প্রবন্ধে প্রতিবাদযোগ্য কথার অভাব নাই। সকল কথা লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। আমরা মাত্র তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। "কোকিল আমাদের দেশে মার্চ্চ হইতে জুলাই পর্য্যন্ত অবস্থান করে।"

ইহা যে ঠিক নহে, উপরে তাহা বলা হইয়াছে।

২। "কাক বর্ষার প্রারম্ভে জুনমাসের মধ্যভাগে বাসা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে।"

কখনও নহে। উপরে তাহার উল্লেখ আছে।

৩। "কাকের সহিত কোকিলের......আকারেও সামান্য পার্থক্য বলিলে চলে।"

মোটেই চলে না। বর্ণগত সাদৃশ্য আছে। আকারগত সাদৃশ্য মোটেই নাই।

৪। "কোকিল ... কিছুকাল এদেশে অবস্থানের পর ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়।"

এ সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য উপরে উল্লেখ করিয়াছি।

জলধর বাবুর প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই পর্য্যালোচনার অভাব দৃষ্ট হয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গত ভাদ্রের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস মহাশয় পরভৃত সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন, "গিরিকিরীটিনী ত্রিপুরার পর্ব্বত প্রকৃতির রম্যকুঞ্জমধ্যে বারমাস কোকিল দেখিতে পাওয়া যায় সত্য কিন্তু ইহার দ্বারা বঙ্গের গিরিহীন সমতল ক্ষেত্রে সকল সময় কোকিল দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অনুমান করিয়া লইবার উপায় নাই।" কিন্তু আমি বলি, কেবল যে গিরিসুশোভিত ত্রিপুরার রম্য পর্ব্বতমালায় বারমাস কোকিল দেখিতে পাইব এমন নয়, প্রকৃতির লীলাকানন বঙ্গের অনেক স্থানেই বারমাস কোকিল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য সময় তাহার কুহুতান গ্রীষ্ম ও বসন্তের ন্যায় তত ভাল রূপে ফুটিয়া উঠে না বটে কিন্তু তাহার তাল লয় একবারে বিলুপ্ত হয় না। মধ্যে মধ্যে কোকিলকে এক একবার দমকা ডাকিয়া উঠিতে শোনা যায় মাত্র।

কাক যে সর্ব্বদাই কোকিলশাবককে যত্ন করিয়া পালন করে এমন নয়। কোকিলশাবক বড় হইলে, কাক যখন তাহাকে চিনিতে পারে, তখন তাহার আর কষ্টের সীমা থাকে না। কাক অবিরত চঞ্চু ও নখের আঘাতে কোকিলশাবককে মৃতপ্রায় করিয়া বৃক্ষতলে ফেলিয়া দেয়। সময় সময় তাহাকে একবারে মারিয়াও ফেলে। কাকের ন্যায় ভীমরাজ, ফিঙ্গে, কোকিলের প্রধান শত্রু। তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইলে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিবেই করিবে। তখন কোকিলের বৃক্ষকোপ ভিন্ন আত্মরক্ষার আর দ্বিতীয় উপায় থাকে না। কোকিল বাসা প্রস্তুত করিতে জানে না, ইহারা বৃক্ষকোপে রাত্রিযাপন করে।

ত্রিপুরা। শ্রীবিলাসমোহন চক্রবর্ত্তী।

দ্রষ্টব্য—এ সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনা গৃহীত বা প্রকাশিত হইবে না।—সম্পাদক।

চিত্রপরিচয়

আমাদের এই জাতিভেদ-পীড়িত ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে আমরা যে অধমের প্রতিও করুণা ও সাম্য ভাব দেখিতে পাই তাহার মাহাত্ম্য চিন্তা করিলে মন তাঁহার প্রতি ভক্তিতে সন্নত হইয়া আসে। তিনি পতিতা অহল্যাকে, গুহক চণ্ডালকে, সামান্যা শবরীকে, বনের বানরকে, আততায়ী রাক্ষসকে ঘৃণা করেন নাই—সকলকেই তিনি সমাদরের সহিত সখ্যভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মহত্ত্বের প্রধান উপাদান।

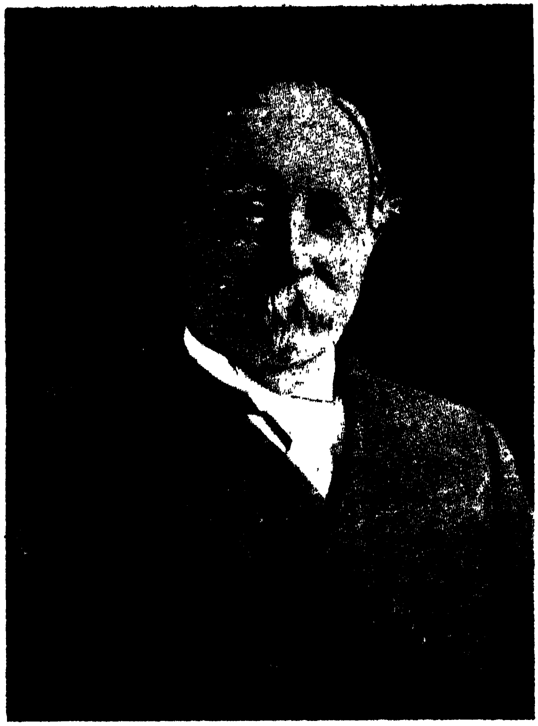
এইবারকার মুখপত্ররূপে মুদ্রিত চিত্রখানিতে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালে শবরী বা ব্যাধরমণী রামচন্দ্রকে ক্লান্ত ক্ষুধিত দেখিয়া নিজের আহৃত বদরী ফল দিতেছে, এবং শ্রীরামচন্দ্র সেই সামান্য দানও সবহুমানে গ্রহণ করিতেছেন, এই দৃশ্যটি অঙ্কিত হইয়াছে।

এই চিত্রে শ্রীরামচন্দ্রের উদার মহত্ত্ব এবং ব্যাধরমণীর স্নিগ্ধ বাৎসল্যতন্ময় ভাব চমৎকার নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। আর সুন্দর হইয়াছে ইহার বর্ণসম্পাত। বনের জটিল গহনতার মধ্যেও ব্যাধরমণীর হৃদয়ও যে দয়াপ্রেম-বাৎসল্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—মানবহৃদয়ের এই মহৎতত্ত্বটি এই চিত্রে বিশেষ ভাবে সূচিত দেখা যায়।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

লর্ড কার্জ্জন সার্ ব্যাম্ফোল্ড্ ফুলার, প্রভৃতির কড়া শাসনে একটি এই সুফল ফলিয়াছিল, যে, লোকে উন্নতির জন্য আত্মশক্তির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। লর্ড কারমাইকেল বেশ ন্যায়বান্ ও সহৃদয় লোক। তাহাতে দেশের কল্যাণ হইতে পারে। কিন্তু আমরা বড় অলস-প্রকৃতির লোক। তাই ভয় হয়, পাছে আমরা ভাবিয়া বসি, যে, শাসনকর্ত্তা যখন এমন ভাল লোক, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে সুশাসক সহায় হইতে পারেন বটে, কিন্তু কোন জাতি বা দেশকে বড় করিতে পারেন না, যদি সেই জাতিতে বস্তু না থাকে এবং যদি সে জাতি আত্মশক্তির উপর নির্ভর না করে। মহামতি হিউম্ "Awake," "উদ্বোধন,"-শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন; তাহার ধুয়া, "Nations by themselves are made," "নিজ তেজে চিরদিন জাতির বিকাশ।" তিনি ঐ কবিতায় ভারতবাসীদিগকে আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত তাহার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।



আর্থার এল্যান হিউম।

উদ্বোধন।

(A. O. Hume.)

কেন তুমি উদাসীন ভারতসন্তান,
　　এখনো কি আছে হায় দৈবের প্রত্যাশ?
দাঁড়াও দাঁড়াও উঠি বাঁধো মনপ্রাণ,
　　নিজ তেজে চিরদিন জাতির বিকাশ!

কি করিবে ধন মান উচ্চ মহাজনী
কি করিবে অর্থহীন উপাধির রাশ,
শাসন স্বায়ত্ত যার তারে শ্রেয় গণি ;
নিজ তেজে চিরদিন জাতির বিকাশ !

অন্ধকারে গুপ্ত কীট করে কানাকানি
তারে দিয়ে পূরিবে না কোনো অভিলাষ,
সে কভু নারিবে দিতে কাম্য ফল আনি ;
নিজ তেজে চিরদিন জাতির বিকাশ !

কর্ম্মী হও কায়মনে ভারতসন্তান,
নাহি ত্রাস, বাধা পেলে হয়ো না নিরাশ,
পূর্ব্বাকাশে হের ওই আলোর নিশান ;
নিজ তেজে চিরদিন জাতির বিকাশ !

কাশ্মীরের মহারাজ, দরবারে আর বাইনাচ হইবে না, এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ইহা সুলক্ষণ। রাজশাহীতে লর্ড কারমাইকেলের অভ্যর্থনা উপলক্ষে যে আমোদ উৎসব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বাইনাচও ছিল, ইহা একটি লজ্জাকর সংবাদ। সংপ্রতি কলিকাতা টাউনহলে একটি স্মৃতিসভা উপলক্ষে কোন কোন মান্যগণ্য ব্যক্তি কলিকাতার কোন কোন থিয়েটারের প্রশংসা করিয়াছিলেন, কাগজে এইরূপ দেখা গেল। ইহা সত্য হইলে গভীর পরিতাপের বিষয়।

পূজার-ছুটি সম্মুখে। হাইকোর্টের ছুটি ত আরম্ভই হইয়া গিয়াছে। এই সময় কেহ স্বাস্থ্যলাভের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবেন, কেহ দেশ ভ্রমণে বাহির হইবেন, কেহ বা পৈত্রিক ভিটায় বৎসরান্তে পদক্ষেপ করিবেন। যাঁহারা দেশভ্রমণ করেন, তাঁহারা যদি নানাস্থান ও নানাদৃশ্য অট্টালিকা আদি দেখিয়া কেবল ক্ষণিক তৃপ্তিলাভের চেষ্টাই করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহাদের নিজেরও যথোচিত উপকার হয় না, দেশেরও লাভ হয় না। ভারতবর্ষের ইতিহাস না জানিলে ভারতবর্ষকে জানা হয় না, ভারতবর্ষকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা যায় না। কিন্তু দেশভ্রমণ ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসও ভাল করিয়া জানা যায় না। রাজাদের জন্ম, সিংহাসনলাভ, যুদ্ধে জয় পরাজয়, মৃত্যু, প্রভৃতির তারিখ, কেবল এইরূপ বৃত্তান্তকে ইতিহাস বলে না। সর্ব্ববিষয়ে দেশবাসীর সভ্যতার বিকাশ, উন্নতি অবনতি প্রভৃতির ইতিহাস জানা একান্ত আবশ্যক। ঐতিহাসিক যে-কোন ঘটনা বা পরিবর্ত্তনই আমাদের জ্ঞাতব্য হউক না কেন, যে স্থানে বা দেশে তাহা ঘটিয়াছিল, তাহা না দেখিলে তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে না। আর শুধু জ্ঞান লাভ করিলেই ত হয় না। প্রাণে নূতন প্রেরণা, নবশক্তি লাভ করিতে হইবে। চিতোরের ইতিহাস মানুষকে উন্নত করে, কিন্তু মানুষ যেদিন চিতোরের মাটি স্পর্শ করে, সেদিন তাহার নবজীবনে দীক্ষা হয়। বুদ্ধদেবের জীবনচরিত এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাস পড়িলে ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধদেব যে যে স্থানে প্রচার করিয়াছিলেন, ভক্তিভরে তথায় ধ্যানস্থ হইলে বিশ্বের মহৎ-জীবনের সহিত মানুষ যোগস্থাপন করিয়া নিজ ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে সমর্থ হয়।

দেশভ্রমণ বলিতে কেবল ভারতবর্ষ ভ্রমণ বুঝিলে চলিবে না। মানবের সর্ব্ববিধ শক্তির বিকাশ ভারতবর্ষেই হইয়াছে এমন নয়। মানবের মহত্ত্ব, মানবের আত্মোৎসর্গ নানা দেশে নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের অনেক ধনী অবসর কাল আমোদে কাটাইবার জন্য বিদেশে যান। কিন্তু তাহা একটা নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য। যাওয়া উচিত নিজ নিজ অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য। বড় জাতির শক্তিকেন্দ্রগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয় হইলে তবে আমরা বুঝিতে পারিব, তাহারা কিসে বড় এবং কেন বড়, আমরা কিসে ছোট এবং কেন ছোট।

কাজের বৈচিত্র্যেই কর্ম্মী মানুষ বিশ্রামসুখ লাভ করেন। মফঃস্বলে পিতৃভূমিতে গিয়া আমরা নিদ্রা বা ব্যসনে কাল-যাপন করিলে, সময়ের সদ্ব্যবহার তো হয়ই না, নির্ম্মলতম সুখ হইতেও আমরা বঞ্চিত হই। গ্রামবাসীদের সহিত সমদুঃখসুখভাগী না হইলে গ্রামগুলির উন্নতির প্রতি কখনও আমরা মনোযোগী হইব না। এবং গ্রামগুলির উন্নতি না হইলে, বঙ্গের উন্নতি হইবে না ; কারণ গ্রাম লইয়াই বাঙ্গলা দেশ, সহর আর ক'টি আছে ?

কেহ যদি ধর্ম্মপ্রচার করিতে চান, মানুষের জীবনকে ধর্ম্মনিয়মের অনুগত করিতে চান, তাহা হইলেও তাঁহাকে জাতীয় চরিত্রের গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়। মুক্তি-ফৌজের "সেনাপতি" বুথ সাহেব ইংরাজচরিত্র বেশ ভাল করিয়া বুঝিতেন। সেইজন্য তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক সম্প্রদায়কে সৈন্যদলের অনুরূপ করিয়া গড়িয়াছিলেন এবং উহার নিয়মাদিও তদনুরূপ করিয়াছিলেন। কর্ম্মিষ্ঠ ও উত্তেজনাপ্রিয় জাতিরা একটা কিছু করিতে চায়, একটা কোন শত্রু বা বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চায়। কেবল ধ্যানধারণার জীবন তাহাদের ভাল লাগে না। তাই তিনি দারিদ্র্য, মাতলামি, দুর্নীতি এবং নাস্তিক-জীবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ শীতপ্রধান দেশে, মানুষ অল্পাহারে বা অনাহারে ক্লিষ্ট হইলে অসাড়বৎ হইয়া যায়। তখন ধর্ম্মের কথা কে শুনে? তাই তিনি দরিদ্র উপবাসী লোকদিগকে ধর্ম্মের কথা শুনাইবার পূর্ব্বে তাহাদের ক্ষুধানিবৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। দলগঠননৈপুণ্যে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য-সাধনদক্ষতায় তাঁহার সমকক্ষ তাঁহার জীবিতকালে কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। ভারতবর্ষেও তাঁহার অনুচরেরা কোন কোন যাযাবর চৌর্য্যব্যবসায়ী জাতিকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাহাদের সৎপথে থাকিয়া জীবনযাপনের উপায় করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা উন্নতপ্রণালীর হাতের তাঁত প্রবর্ত্তিত করিবারও চেষ্টা করিতেছেন।

আমাদের দেশী লোকে কেহ মুক্তিফৌজের অনুরূপ একটা কিছু দল গড়িবার চেষ্টা করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ টিক্‌টিকি লাগিবে, এবং হয়ত বা দু' একটা মোকদ্দমাও তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিবে।

আমরা ছেলে বেলা পড়িয়াছিলাম, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" আমাদের দেশে রোগের এত প্রাদুর্ভাব, এবং যথেষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে আমাদের শরীর এত দুর্ব্বল, যে শরীরের উন্নতির দিকে মন দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। তবে, দুঃখের বিষয় এই যে যাহারা শরীরের উন্নতির দিকে মন দেয়, তাহারা "ধর্ম্ম সাধনের" জন্য অর্থাৎ মনুষ্যোচিত জীবন যাপনের জন্য দেহে বল সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না। যাহা হউক, দেহটা বলিষ্ঠ হইলে, মানুষকে সৎকাজে লাগাইতে পারিলে তাহার নিকট যতটা কাজ পাওয়া যায়, দুর্ব্বল লোকের কাছে ততটা পাওয়া যায় না। সুতরাং দৈহিক বলের দিকে ঝোঁক থাকা ভাল। কয়েক বৎসর হইতে ইউরোপে প্রাচীন গ্রীসের ওলিম্পিক ক্রীড়া পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীন ওলিম্পিক ক্রীড়ায় দৌড়, লাফ দেওয়া প্রভৃতির প্রতিযোগিতায় যাহারা শ্রেষ্ঠ হইত তাহারা অলিভপত্র-বিরচিত জয়মুকুটে ভূষিত হইত। আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এথেন্স নগরে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান বৎসরে সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হল্‌ম্ নগরে ঐ ক্রীড়া হইয়া গিয়াছে। উহাতে মার্কিনেরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক খেলায় জিতিয়াছে। ইংরাজেরা আরও কয়েকটি জাতির নিম্নে স্থান পাইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে ভারতবাসী কেহ কোন প্রকার প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা দূরে থাক্, কেহ উহাতে প্রবৃত্তও হয় নাই। আগামী ওলিম্পিক ক্রীড়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন্ সহরে হইবে। কোন কোন ইংরাজ মনে করেন যে বাঙ্গালীরা ফুটবল খেলায় যেরূপ দ্রুত দৌড়িতে পারে, তাহাদের পা যেরূপ লম্বা ও শরীর যেরূপ লঘু, তাহাতে তাহারা এখন হইতে চেষ্টা করিলে বার্লিনে অন্ততঃ দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে।

আমাদের দেশে অনেক ছেলে পড়াশুনায় অবহেলা করিয়া ফুটবল, ক্রিকেটে মাতিয়া থাকে; ইহা ভাল নয়। কিন্তু অনেকে যে এইসকল ক্রীড়া করে, তাহা ভাল। তবে, এই যে হাজার হাজার লোক নিজের কাজ ফেলিয়া রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া ফুটবল খেলা দেখিতে থাকে ও হৈ হৈ রৈ রৈ করে, তাহাতে কাহার মঙ্গল হয়? দর্শকদের শরীরের বিন্দুমাত্রও উন্নতি হয় কি? না, তাহাদের ঐহিক পারত্রিক কোন সুবিধা হয়? এটা হুজুক মাত্র। আমরা ইহার পক্ষপাতী নহি।

গত শনিবার ২৮শে ভাদ্র কলিকাতায় পান্তির মাঠে দ্বিতীয় স্বদেশী মেলা খোলা হইয়াছে। ইহা অতি শুভ

অনুষ্ঠান। এবার ইহা কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে ও ট্রামের রাস্তার ধারে হওয়ায় দর্শকের সংখ্যা খুব বেশী হইবার সম্ভাবনা।

স্বদেশী মেলা শুধু কলিকাতায় নয়, প্রত্যেক জেলায় হওয়া উচিত।

"গৌড়রাজমালা" নামক পুস্তকের পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতির উল্লেখ করিয়াছি। লর্ড কারমাইকেল যখন রাজসাহী যান, তখন এই অনুসন্ধান-সমিতি তাঁহাদের সংগৃহীত প্রাচীন মূর্ত্তি আদি পুরাদ্রব্য-সংগ্রহ লাটসাহেবকে দেখান। তাহাতে তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। বাস্তবিক সন্তুষ্ট হইবারই কথা। কলিকাতা মিউজিয়মে যেসকল প্রাচীন মূর্ত্তি, স্তম্ভ ও শিলালিপি আদি পুরাদ্রব্য আছে, তৎসমুদয় সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এবিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিতেছে যে ইতিহাসের এবম্বিধ উপাদান সংগ্রহে এবং সংগৃহীত উপাদান সকলের সাহায্যে ইতিহাস রচনা-কার্য্যে বেসরকারী চেষ্টারও যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। দুই দিগ্বিজয়ী বীর যেমন বলিয়াছিলেন, আমাদের উভয়েরই জন্য পৃথিবী যথেষ্ট বিশাল, তেমনি আমরাও বলি, যে, সরকারী, বেসরকারী, উভয় প্রত্নতাত্ত্বিক দলেরই জন্য ভারতবর্ষে একান্ত ন্যূনকল্পে একশত বৎসরের কাজ যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রহিয়াছে। অতএব যদি সরকারী ও বেসরকারীদল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চান ত বন্ধুভাবেই করিতে পারেন। অবন্ধুভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রয়োজন হইলে, তাঁহাদের প্রপৌত্রেরা করিতে পারিবেন!

প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া, আসীরিয়া, মিশর, গ্রীস, ইটালী, ক্রীট্ প্রভৃতির পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের জন্য অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা অধিকাংশই তত্তৎদেশের সরকারী কর্ম্মচারী নহেন; নানা জাতির নানা বেসরকারী লোকে নানা ভাবে ঐই অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। আমাদের দেশেও যত দিন পর্য্যন্ত বেসরকারী লোকেরা এরূপ কার্য্য করিতে অগ্রসর হন নাই, ততদিন সরকার বাহাদুরের হাতে সম্পূর্ণরূপে এই কাজের ভার থাকার একটা সার্থকতা এবং প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন এরূপ একচেটিয়া ভাব থাকার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা সমর্থনও করা যায় না। বরং এই বলা যায়, যে, ক্রমে ক্রমে দূর ভবিষ্যতে এই কাজটা সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী লোকের হাতে আসাই সঙ্গত। তবে, এই আইন অবশ্যই করা উচিত যে ভারতবর্ষের কোন পুরাদ্রব্য ভারতবর্ষের বাহিরে কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না। সেরূপ চেষ্টা করিলে গবর্ণমেণ্ট সেই দ্রব্য তাহার নিকট হইতে লইয়া ভারতবর্ষেই রাখিবেন। কারণ, এপর্য্যন্ত ভারতের অনেক অমূল্য ঐতিহাসিক দ্রব্য ইউরোপের নানা মিউজিয়মে চালান দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস সাক্ষাৎভাবে জানা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে। এখন অনেক বিষয়েই আমাদিগকে পরের মুখে ঝাল খাইতে হইতেছে, এবং একদেশদর্শী ইতিহাসকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে।

কুমার শরৎকুমার রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আশা করি তাহাতে তাঁহারা ভগবৎকৃপায় সিদ্ধিলাভ করিবেন।

গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা, ম্যাজিষ্ট্রেট্ ওয়েষ্টন সাহেবকে মারিয়া ফেলার চক্রান্ত করা, বোমা নির্ম্মাণ করা, ইত্যাদি অপরাধে মেদিনীপুরের সমুদয় গণ্যমান্য বলশালী লোককে দণ্ডিত করিবার একটি আয়োজন হয়। শেষে কমিতে কমিতে অভিযুক্তের সংখ্যা তিনটিতে গিয়া ঠেকে। এই তিন জনও হাইকোর্টের বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করে। মহামান্য প্রধান বিচারপতি এবং মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রায়ে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে পুলিশের আবিষ্কৃত বোমাটা পুলিশেরই তৈরী, এরূপ সন্দেহটা একেবারে অমূলক না হইতেও পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে হাইকোর্টের মতে প্রজাপক্ষের কেহ কোন অপরাধ করে নাই। আবার সেদিন মাননীয় বিচারপতি উড্রফ প্রমুখ জজত্রয় রায়

দিয়াছেন যে ওয়েষ্টন্, মজ্‌হরল হক্ এবং লালমোহন গুহ, এই তিন জন রাজকর্ম্মচারীও নিরপরাধ। সুতরাং, সরকারী বেসরকারী উভয় পক্ষই যখন নির্দ্দোষ, তখন বলিতে হয় মেদিনীপুরের ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র ;—

"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা, রে দূত !"

মেদিনীপুরের পৌর ও জানপদবর্গ, তোমাদের শত লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন অলীক স্বপ্নমাত্র !

হিন্দুসমাজ জাতিবিভেদে নানা স্তরে বিভক্ত। কতকগুলি জাতিকে উচ্চ স্তরের এবং কতকগুলিকে নিম্ন স্তরের লোক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিছুদিন হইতে "নিম্ন" স্তরের অনেক জাতি নিজ নিজ উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। যে যে উপায়ে উন্নতির চেষ্টা হইতেছে তাহা প্রত্যেক স্থলেই যে সুচিন্তিত তাহা বলা না গেলেও, এই উন্নতি-প্রয়াস যে আশাপ্রদ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক জাতি উন্নতির ঠিক্ পথ ধরিয়াছেন। যেমন, নাপিত সমাজের মুখপত্র "সম্মিলন" বলিতেছেন যে, ঐ সমাজের হীন অবস্থার প্রধান কারণ শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব। তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় কার্য্যের একটি তালিকাও এই কাগজে বাহির হইয়াছে। যথা:—

(১) কলিকাতায় সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া মূল সভা গঠন। এই সভার অধীনে স্থানে স্থানে শাখা সভা স্থাপন। এইসকল সভায় যোগ্য লোক পাঠাইয়া স্বজাতিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা ও তাঁহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া। (২) স্বজাতির মধ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তার। এজন্য—(ক) প্রত্যেকে যাহাতে নিজ নিজ সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দেয়, তাহার ব্যবস্থা করা। (খ) নৈশবিদ্যালয় স্থাপন। (গ) প্রতিভূ গ্রহণ করিয়া যোগ্য বিদ্যার্থীকে বিদেশে প্রেরণ। (ঘ) উপযুক্ত দরিদ্র ছাত্রের পাঠের সাহায্য করা। (ঙ) বালকগণ শিক্ষার সহিত যাহাতে প্রথম হইতে বিনয়াদি-গুণসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হয়, তাহার চেষ্টা। (৩) যাহাতে বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া জাতীয় বলবৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা। (৪) জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলন। যিনি সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, ইংরাজীতে সুপণ্ডিত, সমাজতত্ত্বে অভিজ্ঞ এবং বয়সে প্রবীণ, তিনিই এই কার্য্য করিবার যোগ্য। এরূপ লোক আমাদের মধ্যে না থাকিলে অন্য উপযুক্ত লোকের দ্বারা লিখাইতে হইবে। (৫) যাঁহারা স্বীয় গুণ ও কার্য্যসমূহ দ্বারা সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিত প্রকাশ করিয়া ভবিষ্যবংশীয়গণকে উৎসাহিত করা হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে যে কয়জনের জীবনী সংগ্রহ করিতেছি, তাঁহাদের নাম—(ক) ৺ ঈশানচন্দ্র দাস (খ) ৺ রেভারেণ্ড নন্দলাল দাস (গ) ৺ গোরাচাঁদ দাস। (৬) যথাসম্ভব পণগ্রহণ-প্রথা রহিত করা। (৭) অসহায় বিধবা স্ত্রীলোক ও অসমর্থ বৃদ্ধদের সম্ভবমত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা। (৮) কলিকাতায় 'সম্মিলনের' কার্য্যালয় নির্ম্মাণ। এই স্থানে আমাদের জাতীয় অভাবাদির আলোচনা, প্রতীকারের উপায়, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

ধূপছায়া—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে ছাপা। ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত ১৬০ পৃষ্ঠা; মূল্য দশ আনা। ছাপা কাগজ উত্তম; প্রচ্ছদপট রঙ্গীন ও সুচারু শিল্পরুচিসঙ্গত।

এই সংগ্রহে লেখকের ছয়টি মৌলিক এবং আটটি বিদেশী গল্পের অনুসরণে লিখিত গল্প আছে। "চীনদেশে" ও "অপরাজিতা" দুইটি 'রোমান্টীক' গল্প,—একটির ভিত্তি চীনদেশে, অপরটি কাশী-কোশল এবং অবন্তী-শ্রাবস্তীর স্বপ্ন গায় মাখিয়া আমাদের নয়নে ও মনে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমটিতে লেখকের কাঁচা হাতের পরিচয় আছে, "অপরাজিতা" গল্পটি পাকা হাতের রচনা। সবচেয়ে উপভোগের বিষয় হইয়াছে ইহার ভাষা। এই ভাষার রাজোদ্যানে "কুমারীরা গোলাপ-কেয়ারীর ফাঁকে ফাঁকে বকুলবীথির তলে তলে মণিশিলার পথে পথে অরুণরাঙা চরণ ফেলিয়া" নাচিয়া বেড়ায়, সেখানে রূপ-যৌবনের ঢেউ লাগিয়া ফুলের মুখে হাসি ফুটে, কলহাস্যে কোকিল-পাপিয়ার কণ্ঠ খুলে," "হাজার দীপের শিখার মাঝে ফোয়ারার জল তরল হীরার মালার মতো গলিয়া পড়ে," আর "সান্দ্রনিবিড়-পল্লবচ্ছন্ন পথের উপর পরীরা সব জাফ্রা হাতে চাঁদের আলোর আলপনা" দেয়; এই ভাষার রাজোদ্যান "বনের ফুলে শোভিত, চাঁদের জ্যোৎস্নায় ও রূপের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত, পাখীর কলকূজনে ও তরুণীর কলহাস্যকৌতুকে মুখর, ফোয়ারার অজস্র ধারায় ও হৃদয়ের অজস্র প্রীতিতে অভিষিক্ত, মণিদীপের আলোকে ও ডাগর চোখের পুলকে উজ্জ্বল।" বসন্ত এই রাজ্যের চিরঋতু, নায়ক ইহার প্রমূর্ত্ত যৌবন; এই রাজ্যের "বিজয়িনী"রা, কেহ বা যৌবনগর্ব্বে দৃপ্তা, কেহ বা তাহার ভারে আনমিতা—এখানে শুধু হৃদয় জয়েরই লীলাখেলা—কেহ বা জয় করিয়াও এখানে হারিয়া বসে, কেহ বা হারিয়াও সমস্ত জয় করিয়া লয়। সারা গল্পটিকে যৌবনের দয়িতসেবী প্রেমাভিসার যাত্রা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গল্পের প্লটটিও সুন্দর। ইন্দিরা, শুক্লা এবং আনন্দিতার পরস্পরের মধ্যে কোনো চরিত্রস্বাতন্ত্র্য

নাই সত্য, কিন্তু যমুনার স্নিগ্ধ বিনয়নম্রতার পাশে তাঁহাদের রূপগর্ব্ব ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা লেখকের সার্থক হইয়াছে। কারাদৃশ্যে অদৃশ্যমান বন্দী বসন্তর কাছে যমুনার স্নিগ্ধভাবটুকুও বেশ সুন্দর। এই গল্পে জীবনের সামান্তবর্ত্তী উষাসন্ধ্যার বর্ণরাগকে লেখক কতকটা উজ্জ্বলভাবে আঁকিতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু মাধ্যাহ্নিক শুভ্র আলোকের নিম্নে বিশ্বমর্ম্মের মেঘরৌদ্র-খেলার রহস্যটিকে তিনি তেমনভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—সাধারণভাবেই লেখকের রচনা সম্বন্ধে একথা খাটে।

"চটির পাটিতে" ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্কেচটিতে নৈপুণ্য ও হাস্যরস আছে। "ফিনিস্নে" এবং "স্নেহরহস্যে" নূতনত্ব কিম্বা শক্তির পরিচয় নাই বটে, তবে মাধুর্য্য আছে। "খুনের" মনস্তত্ত্ব প্রকাশে লেখক যে বিশেষরকম ক্ষমতার আভাস দিয়াছেন তাহা এই সংগ্রহের মৌলিক গল্পে আর কোথাও নাই। "স্ত্রীচরিত্র" এবং "কুড়নি"—দুইটি বিদেশী গল্প সম্পূর্ণ দেশী ছাঁচে ঢালা;—গল্প দুইটি জমে নাই—"কুড়নি"র যাহা ভাবসম্পদ তাহা যেন কতকটা ভাবরোগ-গ্রস্ততায় (Sentimentality) পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই দুটি ছাড়া আরো ছয়টি বিদেশী গল্প আছে, সেগুলি নিপুণ এবং সুন্দর, এমন কি "গোঁপ-খেজুরে"ও লেখার গুণে তরিয়া গিয়াছে। "জীবন-নাট্য" ও "নীলকুঠির" ভাবসৌন্দর্য্য, "নিষ্কৃতি"তে পঙ্গু কটিকের করুণকাহিনী, "পূজার ঘণ্টা"র পূজারীর ভক্তিসরল শান্ত ছবি, আর "নষ্টোদ্ধারের" সুদী মহাজন এবং ঘুমন্তবালক দুটির চিত্র আমরা আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছি। গল্পগুলির নির্ব্বাচনে লেখক সাহিত্যসুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষাসৌন্দর্য্যে অনুবাদের কাঁটা ঢাকিয়া গিয়াছে।

সমস্ত গল্পগুলিতেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার এবং উপভোগের জিনিষ হইয়াছে লেখকের এই নিজস্ব রচনার ভঙ্গিটি,—তাহা তরল অথচ পানসে নয়, অল্পবিস্তর চলিত কথায় গাঁথা অথচ কবিত্বসম্পদে ভরপুর। গল্পে এই প্রকার ভাষার উপযোগিতা অস্বীকার করিবার যো নাই। বাংলা গদ্যে তিনি একটা নূতন গতি দিয়াছেন এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই দিকে অন্ততঃ তিনি সমস্ত আধুনিক গল্প লেখক-দিগকে পরাজিত করিয়াছেন তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

রত্নাবলী—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ বিরচিত। প্রকাশক, শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়; ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস; ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত, ছাপা কাগজ উত্তম। ৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ছয় আনা।

সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের উজ্জ্বল রত্ন রত্নাবলী নাটকের উপাখ্যান-অংশ লেখক কথা-আকারে ভাষান্তরিত করিয়াছেন। ইহাতে মূল সংস্কৃতের ভাবসম্পদ ও শব্দঝঙ্কার বেশ রক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিচারের রুচিদুষ্ট অংশগুলি পরিহার করিয়া লেখক এই আখ্যায়িকাটিকে সর্ব্বসাধারণের অসঙ্কোচ পাঠের উপযুক্ত করিয়াছেন। তবে এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে বাসবদত্তার চারিত্রস্বাতন্ত্র্য তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, অবশ্য তাহার জন্য লেখক ততটা দায়ী নন যতটা দায়ী মূল আদর্শখানি, কারণ সংস্কৃত নাটকেই বাসবদত্তার চরিত্র বিকাশ লাভের অবসর পায় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের রস বিলাইতে এই পুস্তকের রচনারীতিটি মোটের উপর প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই, কিন্তু শকুন্তলার উপাখ্যান বর্ণনায় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে মৌলিকতা ফলানোর এবং বাংলা ভাষার স্থায়ী সাহিত্য রচনার বেশী অবসর আছে, আর বর্ত্তমান লেখকও সেই পন্থারই একজন সুযোগ্য পথিক, সে কথা আমরা ভুলিতে পারি না।

জ্যোতিঃ-পিপাসু।

কুহু ও কেকা—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত কবিতার বই। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে ছাপা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৯৭ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

বইখানির বাহ্যদৃশ্য প্রথম দর্শনেই মন হরণ করে। ভালো এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে ছাপা; ধুম্রপাটল প্রচ্ছদপটের উপর বসন্তের অশোকমঞ্জরীমুগ্ধ কোকিলের কুহু ও বর্ষার বজ্রমেঘের বিদ্যুৎ-তালে উল্লসিত কলাপীর কেকা বড় সুন্দর ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে। পুস্তকখানির মধ্যে কবির যে কোমল ও গম্ভীর "দুই সুর" বাজিয়াছে তাহার সূচনা এই পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

বাস্তবিকই এই কাব্যে "দুই সুর" বাজিয়াছে।

"বনের কুহু, বনের কেকা,—কুহক-ভরা যুগ্মরাগ,
দেয় গো বাঁটি নিখিল মাঝে আনন্দেরই যজ্ঞভাগ।"

তেমনি কবির—

"মনের কুহু,—মনের কেকা, অনাদি তারো মূর্চ্ছনা,
গোপন তার প্রচার, তবু, তুচ্ছ না সে তুচ্ছ না।"
"হৃদয়ে মুহু কোকিল কুহু ময়ুর কেকা রব করে,
গহন প্রাণ-কুহর মাঝে স্বপন-ঘেরা গহ্বরে।"

কবি সেই মানব-মনের "আদিম কুহু" ও "আদিম কেকা," "মনের সুগোপন দেশে ফুটিতে যাহা ঝরিয়া পড়ে," তাহা, "মন্ত্র-মধু মন্তরে" সঙ্গীতে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন।

কবি নিপুণ আর্টিষ্টের মতো এক দিকে বিশ্বসৌন্দর্য্যকে কল্পনার তুলিকাসম্পাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—তাহাই কাব্যের কুহুতান; আর একদিকে বিশ্বানুভূতিকে স্পষ্ট করিয়া গড়িয়া আকার দিয়াছেন—তাহাই কাব্যের কেকাধ্বনি। যাহা অন্তরকে অকারণপুলকে সৌন্দর্য্যসুষমায় পূর্ণ করিয়া দিয়া লঘুগতিতে মনকে তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া দিয়া যায় এমন কবিতার পাশাপাশি এমন কবিতাও আছে যাহা ভাবের উদ্বোধনে অন্তর তরঙ্গিত করিয়া জাগ্রত করিয়া দিয়া যায়। প্রকৃতি-বর্ণনা-বিষয়ক কবিতাগুলি প্রধানতঃ প্রথম শ্রেণীর এবং ঘটনাপ্রাণ কবিতাগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

কিন্তু দুই সুর একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া নাই—দুই সুরে মিলিয়া একটি রাগিণী যাহা বাজাইয়াছে তাহা আমাদের মনে হয় প্রেমের ভিত্তির উপর নির্ভীক স্বাধীনচিত্ততা। চার্ব্বাককে পর্য্যন্ত মঞ্জুভাষার প্রণয়ে মুগ্ধ করিয়া কবি তাঁহার জীবনে একদিন ধাতার চরণে নত করিয়াছেন—

"প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই এক দিন—
সে যে আনন্দের দিন,—সে যে প্রত্যাশার।"

এই প্রেমের বলে সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি "সহজিয়া" ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিয়াছেন—

"অন্তরে চাই শুধু রূপসীর
অরূপ আবির্ভাব,
যাহা দিলে তার ক্ষতি নাই, তবু
আমার পরম লাভ।"

সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি মুক্ত কণ্ঠে "শূদ্র"কে

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে।"

বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আর "মেথর"কে "নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল" বলিয়া বন্ধু ও শিক্ষকরূপে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। এই শ্রদ্ধা আপনার পিতামহ জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমারের প্রতি যেমন, দেশের দুঃখী হরিনাথ দে ও বিদ্যাসাগরের প্রতিও তেমনি, পরার্থে

উৎসর্গিতপ্রাণ সামান্য হইয়াও অসামান্য নফরকুণ্ডুর প্রতিও যেমন, বিদেশের ঋষি টলষ্টয় ষ্টেড ও নিবেদিতার প্রতিও তেমনি প্রগাঢ়। এবং যে সত্যভাবে মুগ্ধ হইয়া তিনি মাথা নোয়াইয়াছেন, যেখানে তাহা অপলাপের চেষ্টা, যেখানে তাহা আচ্ছন্ন করিবার ইচ্ছা, যেখানে তাহার মেকি দেখিয়াছেন সেখানেই তাঁহার স্বাধীন চিত্ত নির্ভীক ভাবে উদ্যত হইয়া তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করিয়াছে।

কবির স্বাধীন নির্ভীক প্রেম এক দিকে যেমন বিশ্বমানবকে বন্দনা করিয়াছে, "পথের পঙ্কে" পতিত সংসারের মধ্যেও মহত্ত্ব ও প্রাণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছে, অপর দিকে তেমনি স্বদেশ ও স্বদেশীকে অবলম্বন করিয়াছে—সে প্রেম একই কালে বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি মৃদু। স্বদেশের প্রাচীন মহত্ত্বে কবিহৃদয় গর্ব্বিত উৎফুল্ল, বর্ত্তমানের অবসাদে ক্ষুব্ধ কাতর, ভবিষ্যতের আশায় ভরপুর তেজস্বী। "মধুর চেয়েও মধুর" স্বদেশকে উন্নত দেখিবার ব্যগ্র বাসনায় "ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল"কে ডাকিয়া কবি বলিতেছেন "বন্দরে ওই দাঁড়িয়ে জাহাজ, বেরিয়ে পড় বঙ্কদল।" এখনো ইতস্তত কেন ?

"সাগর-পথে যাত্রা নিষেধ ?—লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তি ও,
লক্ষ্মী আছেন সিন্ধু মাঝে—মুক্তাভরা শুক্তি ও।
* * *
হিন্দু যখন সিন্ধুপারে করলে দখল যবদ্বীপ
কোথায় তখন ভট্টপল্লী কোথায় ছিলেন নবদ্বীপ ?
* * *
তাদের ধারা লুপ্ত হবে ? থাকবে শুধু পঞ্জিকা ?
ধানের আবাদ উঠিয়ে দিয়ে ফসল হল গঞ্জিকা ?"

পূর্ব্বকালের হিন্দুরা শুধু আপনাদের সফলতার নিদর্শনই রাখিয়া যান নাই, নিজেদের সিদ্ধির উপায়ের সঙ্কেতও হিন্দুদের পূর্ব্ব পিতামহগণ যবদ্বীপের "সিদ্ধিদাতা" গণেশ মূর্ত্তিতে আভাষ দিয়া

"গড়ে গেছে পাথর কেটে মূর্ত্তিখানি জীবন্ত,
শবাসনে সিদ্ধিদাতা—শোকের দহন নিবন্ত।"

"ওঙ্কারধামের" মন্দির সেও—

"শ্যামকাম্বোজে কনকাম্ভোজ হিন্দুর প্রতিভার।"

এই সমস্ত "নষ্টোদ্ধার" করিতে হইবে, আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, "কাটা-ঝাঁপ" খেলিয়া। তাহা হইলে যে প্রাণদেবতা অর্দ্ধোদয়ে দেখা দিয়াছেন তাঁহার পূর্ণোদয়ের আশা হইবে, "দেবদর্শন" করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির সহিত কবিও ধন্য হইবেন।

এই প্রেম যখন গার্হস্থ্য চিত্রে ফুটিয়াছে তখনও ইহা নূতন, তখনো ইহা মনোরম। "সাড়ে চুয়াত্তর" "অন্তঃপুরিকা" প্রভৃতি কবিতায় দাম্পত্য প্রেম, "নূতন মানুষ" ও প্রথম হাসি' কবিতায় বাৎসল্য, "সৎকারান্তে" ও "ছিন্ন মুকুল" কবিতায় সহৃদয় শোক যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যে প্রত্যেক গৃহস্থ আপনার অন্তরের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন মুগ্ধ হইবেন নিঃসন্দেহ।

সমগ্র কাব্যব্যাপী এই প্রেমমূলক স্বাধীনতার ভাবধারা যে বিচিত্র লীলায় প্রবাহিত তরঙ্গিত হইয়া গিয়াছে তাহার এমন একটি বেগ ও গতি আছে যে পাঠককে বরাবর তাহা সমাপ্তির দিকে বহন করিয়া লইয়া চলে, কোথাও তাহাকে ক্লান্তি অনুভব করিবার অবসর দেয় না। ভাবের অনুযায়ী বিচিত্র ছন্দ অনাহত স্বচ্ছন্দ গতিতে "সুরের ফুলে ফুলঝুরি" খেলাইয়া "ভুবনে বুলায় মদির মায়া।" "পাল্কীর গানে" পাল্কী-বেহারার গতি ও বহনধ্বনির তালে তাল রাখিয়া পাল্কীযাত্রীর দৃশ্যদর্শন ও ভাববর্ণন ছন্দের সাহায্যে পারাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। "গ্রীষ্মের সুর" ক্লান্ত অবসন্ন অথচ অসহ্য তীব্রতা সূচনার যথোপযুক্ত ছন্দ। তা ছাড়া সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে যে কয়েকটি ছন্দ (মালিনী, মন্দাক্রান্তা ও রুচিরা) রচিত হইয়াছে তাহার প্রথম বিশেষত্ব ভাব ও ছন্দের সামঞ্জস্য রক্ষা এবং দ্বিতীয় ও প্রধান বিশেষত্ব বাংলা ভাষার (genius) ধাতু অনুসরণ করিয়া স্বাভাবিক হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরসংঘাতে সংস্কৃতের সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তোলা—কোথাও বাংলা-উচ্চারণ-বিরোধী কৃত্রিম হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের আশ্রয় লইতে হয় নাই। আগাগোড়া কোনো ছন্দের কোথাও একটি স্খলন পতন ত্রুটি নাই।

ভাবের বাহন ভাষা, ভাষার বাহন ছন্দ। কাব্য রচনায় এই তিনের সুসমঞ্জস সংযোগ না ঘটিলে তাহা কাব্য নামের অধিকারী হয় না। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে কাব্যের ভাষা হইবে অপরিবর্ত্তনসহ—অর্থাৎ যে কথাটি কবি ব্যবহার করিবেন সেটির বদলে ছন্দ ও ভাব বজায় রাখিয়া আর কোনো কথা ব্যবহার করা যাইবে না। এই কাব্যখানিতে সেই গুণটি প্রচুর আছে। ইহার ভাষা ভাবদ্যোতক এবং সঞ্জীবিত। আভিধানিক শব্দ অপেক্ষা চলিত শব্দের ভাবব্যঞ্জনার শক্তি সমধিক; সেইজন্য কবি নির্ভয়ে যথাস্থানে যেসমস্ত চলিত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে কবিতাগুলির দ্যোতনশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে—সেইজন্য এই কবির কবিতাগুলি বলে যাহা তাহা অপেক্ষা ভাবায় অনেক বেশি। প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ, মাধুর্য্য ও সরসতা, কাব্যের অপর যে সমস্ত গুণ তাহাও ইহাতে আছে—জানা কথাও নূতন করিয়া মধুর করিয়া সত্য করিয়া তোলাই এই কবির প্রধান বিশেষত্ব।

বিংশ শতাব্দীর সুশিক্ষিত কবির কাব্যে বৈজ্ঞানিক সত্যও কাব্যের ইন্দ্রজালে মোহন হইয়া দেখা দেয়। কবি ও কবিপ্রিয়ার যে মিলন সে যে আজকের ক্ষণিকের খেয়ালে ঘটে নাই, তাহা যে জন্মজন্মান্তরের আকাঙ্ক্ষার ফল, ভাবিতে গিয়া কবি দেখিতেছেন—

"তুমি আমি—আমরা দোঁহে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
ফুল-জনমে ;—ছিলাম যখন পাপড়ি-ঘেরা সিংহাসনে ;
আমার ছিল সোনার রেণু, স্নিগ্ধ মধু তোমার হাসে,
তুমি ছিলে মধ্য-কেশর, আমি তোমার ছিলাম পাশে।"

এই তত্ত্বটীকেই কবি আর এক স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন—

"পাখী শাখী মানুষ হল, তবু
মনের মতন মন হল না কভু,
ভেঙে আমায় গড়তে হবে প্রভু!"

ইহা কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক সত্য। তবে সে কথা না মানিবার মতো মূঢ়েরও অভাব নাই।

কবির কাছে—

"এই মাটি গো এই পৃথিবী—এই যে তৃণগুল্মময়—
তারার হাটে মাটির ভাঁটা,—তাই বলে এ তুচ্ছ নয়।
মাটির মাঝে যা আছে গো সূর্য্যেও তার অধিক নেই,
তাড়িৎস্রোতার লাটাই মাটি, জীবন-ধারার আধার সেই।"

এত বড় একখানি কাব্যের সকল কবিতাই অত্যুৎকৃষ্ট বা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে ইহা কেহ আশা করিতে পারে না; কোনোটি বা ভাবের দিক দিয়া চমৎকার, প্রকাশ তাহার সম্পূর্ণ হয় নাই; কোনোটি বা রচনার পরিপাট্যে সুন্দর, কিন্তু তাহার প্রাণ ক্ষীণ; কিন্তু অসংখ্য উৎকৃষ্ট কবিতার মধ্যে এই ভাবে যে কবিতাগুলিকে খাটো বলিয়া মনে হয় তাহারা কবির নিজের নিরিখের অনুপাতেই খাটো।—যেমন একগাছ গোলাপ ফুলের সকল ফুলগুলিই বর্ণে গন্ধে মাধুর্য্যে বিকাশে অনবদ্য না হইলেও সবগুলিই গোলাপ, অন্য ফুলের সহিত তাহার তুলনা চলে না, তেমনি এই কবির কাব্য সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে।

সমগ্র কাব্যখানি বারংবার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করিয়া

ইহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি তাঁহার সমসাময়িক কবিসভায় শ্রেষ্ঠ আসনখানির দাবী কবির পক্ষে কায়েম হইয়া গিয়াছে।

জন্মদুঃখী—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। কান্তিক প্রেসে ছাপা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৮১ পৃষ্ঠা। মূল্য বারো আনা।

এই উপন্যাসখানি নরওয়ের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোনাস লাই রচিত উপন্যাসের অনুবাদ। ইহা প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, সুতরাং প্রবাসীর পাঠকেরা ইহার সহিত সুপরিচিত।

আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের এক কাল ছিল যখন রাজা রাণী, বাদশা বেগম ছাড়া আমাদের লেখকেরা কথা কহিতেন না। সেই উঁচু নজর এখন অনেকটা নামিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সংসারের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে; কিন্তু এখনো দেশের যাহারা বারো আনা, দেশের যাহারা প্রাণ, তাহাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত আমাদের পরিচয়-সাধন হয় নাই—শীঘ্র হইবে তেমন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না, কারণ আমরা "ভদ্রলোক", "চাষা" "ছোটলোক"দের সংসর্গ বাঁচাইয়া খুব সাবধানে আপনাদের ইজ্জত রক্ষা করিতেছি। কিন্তু বাঙালী লেখকদের দুই বিভাগের দুইজন শ্রেষ্ঠ লেখক—রবীন্দ্রনাথ ও দীনবন্ধু—তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন নাই—গল্পে ও নাটকে তাঁহারা "চাষা"র মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়াছেন।

আমাদের দেশে যাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, য়ুরোপে তাহা তেমন দুর্লভ নহে। ইংলণ্ডে ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ ইলিয়ট; ফ্রান্সে ভিক্তর হ্যুগো, জোলা, বালজাক; রুষিয়ায় গোরকী, টলস্টয়; প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মূক মানবের ওকালতী লইয়া তাহাদিগকে ভাষা দিয়া উচ্চ শ্রেণীর উপেক্ষাপটুদের সহানুভূতি আদায় করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ একখানি দরিদ্রজীবনের করুণ কাহিনী ভাষান্তরিত করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ কবিহৃদয়েরই পরিচয় দিয়াছেন—আমাদের নিজস্ব যাহা অভাব ছিল তাহা পরের ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া সাহায্য করিয়াছেন,—এজন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আবাল্য স্নেহবঞ্চিত নিকোলাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার আরাম-লোলুপ মাতা, কোপনস্বভাবা হলম্যানগৃহিণী, দুর্বলপ্রকৃতি সিলা, বখাটে ধনীপুত্র লাডভিগ প্রভৃতির চরিত্র নিজের নিজের বিশেষত্বে দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ তো গেল আসল গ্রন্থের গুণ।

অনুবাদের গুণ যে ভাষা আগাগোড়া বাংলা হইয়াছে—পলাণ্ডু-গন্ধামোদিত দেবতার ভোগের মতো উৎকট ভাষা হয় নাই। বরং ভাষা অতিরিক্ত বাংলা হইয়াছে। চলিত কথায় সাধারণ ভঙ্গিতে পুস্তক রচনা কেহ কেহ গ্রাম্যরীতি বলিয়া অপছন্দ করিতে পারেন; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে-সমাজের বর্ণনা করা যায় ভাষা সেই সমাজের উপযুক্ত এবং ভাবপ্রকাশক হওয়া উচিত। ছুতার কামার মুদী মালা যদি অভিধান খুলিয়া কথা কহিতে লাগিয়া যায় তবে ভটপল্লী ও নবদ্বীপের উপায় থাকিবে কী। অবশ্য সাহিত্যের ভাষার একটি শালীন শোভন সীমা থাকা দরকার। যাহা অতিক্রম করিলে তাহা ভদ্র সাহিত্য হইবার দাবি করিতে পারে না। এই গুণটি ছিল দীনবন্ধুর নাটকগুলিতে যথেষ্ট। কিন্তু দীনবন্ধুর সময়কার রুচি হইতে বর্ত্তমান সমাজের রুচি পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। সেই রুচির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ যে সাধু ভাষার সহিত ঘরোয়া কথা মিশাইয়া এবং সেই মিশ্র রচনাতেও গদ্যের ছন্দ বজায় রাখিয়া এই উৎকৃষ্ট উপন্যাসখানি অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে অনুবাদের কৃতিত্ব ও মর্য্যাদা ঢের বাড়িয়াছে।

এই আদর্শে আমাদের দেশী নিরক্ষর দরিদ্র সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইলে আমরা দেশকে প্রাণ দিয়া চিনিতে পারিব, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা সন্তানের সেই সেবার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন।

ঝাঁপি—

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। কান্তিক প্রেসে ছাপা। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ১৫৫ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

ছাপা কাগজ উত্তম ঝরঝরে; মলাট বেতে-বোনা ঝাঁপির অনুকরণ—সুন্দর সমগ্রস।

এখানি ছোটগল্পের ঝাঁপি, ইহার মধ্যে আটটি রত্নকণিকা আছে। এই গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে ইহার মধ্যে ঘটনার হট্টগোল নাই—জটিল মানবজীবনের একটি সমস্যা, মানবচরিত্রের একটি রহস্য, মানবচিত্তের একটি সত্য বৃত্তি মাত্র আশ্রয় করিয়া গল্পটি এমন বেদনায় হাস্যে আনন্দে ভরাট হইয়া জমিয়া উঠে যে তাহাতেই পাঠককে আগাগোড়া মুগ্ধ ও কৌতূহলী করিয়া রাখে। এবং এই নিপুণ কলা-কুশলতার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে গল্পগুলির রচনাভঙ্গি ও স্বচ্ছ সরল কবিত্বময় খাঁটি বাংলা ভাষা। ঘটনাবাহুল্য বর্জ্জন করিয়া একটি হৃদয়বৃত্তিকে রূপ দিতে পারাই ছোটগল্পের চরম আর্ট—এই আর্টে এই আটটি গল্পই পচিত। কিন্তু হৃদয়গ্রাহ্য ভাব মাত্র লইয়া গল্প রচনার বিপদ আছে—সাধারণ পাঠকের নিকট তাহা অর্থহীন জটিল হেঁয়ালি লাগিবার আশঙ্কা থাকে। সূক্ষ্ম আর্ট যাহা, তাহা সাধারণের বোধগম্য কোনো দিনই নহে, তথাপি তাহা আপনার আন্তরিক সৌন্দর্য্যে একটা অবুঝ আনন্দ সঞ্চার করিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হয়। এই গল্প-গুলির আন্তরিক ভাবটি যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিবেন তাঁহারা মুগ্ধ হইবেন, যাঁহারা তাহা পারিবেন না তাঁহারাও গল্পের বর্ণনা ও পরিণতির রস হইতে বঞ্চিত হইবেন না। আটটি গল্পই সুন্দর, ঝাঁপি সুনির্বাচিত গল্পের আধার।

আলেখ্য —

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি কোম্পানি। উইলকিন্স প্রেসে ছাপা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১০৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আবাঁধা বারো আনা, বাঁধা এক টাকা।

এখানি বাক্যচিত্রের সংগ্রহ কতকগুলি স্থানের ও ভ্রমণের, এবং কতকগুলি ব্যক্তিবিষয়ক চিত্র। মোট ১২টি চিত্রবর্ণনা এবং ৪খানি ছবি আছে।

লেখক অল্পদিন হইল সাহিত্য-দরবারে আসিয়া দেখা দিয়াছেন—কিন্তু একেবারে পাকা হাতের পরিচয় দিয়া সকলকে বিস্মিত পুলকিত করিয়া। ইঁহার ভাষা স্বচ্ছ তরল, আপনার আনন্দের বেগে আপনি বহিয়া চলে এবং গতির মুখে যে প্রস্তর শুচি হাস্যরস চিকচিক করিয়া উঠে তাহা একেবারে সোনার কুচির মতোই উজ্জ্বল বহুমূল্য দুর্লভ।

বাংলা সাহিত্যে লেখক অনেক, সুলেখক অত্যল্প। বিশেষত সাময়িকপত্রের সংশ্রবে থাকিয়া আমাদিগকে যত সব আবর্জ্জনা ঘাঁটিতে হয় তাহার মধ্যে যদি একটি খাঁটি দামি জিনিষ হাতে ঠেকে তবে আর আনন্দ রাখিবার ঠাঁই থাকে না। এই আনন্দের আতিশয্যে বিচার হয় তো ঠিক হয় না—পক্ষপাতমূলক অত্যুক্তি হইবারও আশঙ্কা থাকে। এই নূতন লেখক আপনার ক্ষমতার প্রশংসা লাভ করিয়া যদি মনে করিয়া বসেন যে আমার সফলতা চরম এবং সাধনা অনাবশ্যক হইয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহার মনকে যদি গর্ব্ব বা আত্মপ্রাধান্যের ভাব স্পর্শ করে তবে সব নষ্ট হইবে। আলেখ্য যে শক্তির আভাসের নমুনামাত্র তাহা সাধনা ও সতর্কতার পরে বঙ্গসাহিত্যকে নব নব অলঙ্কারে ভূষিত করিবে আশা করি।

"আলেখ্য" যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারাই প্রীত হইবেন—বর্ণনার বিষয়টি

স্থানে স্থলেই কিছুনা, কেবল বর্ণনার ও স্বচ্ছ ঝরঝরে ভাষার অন্তরালে হাস্যরসটি তুচ্ছকেও উপভোগ্য তুলয়াছে।

সংস্কৃত সন্দর্ভ—

পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী প্রণীত প্রকাশক ইন্দুশেখর ভট্টাচার্য্য, ১৬৩ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা প্রতিমিহির প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা।

এখানি প্রথম সংস্কৃতশিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক। বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহারই ফলে সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট ক্রম অনুসৃত হইয়াছে। প্রথমে অল্প ও বাক্য প্রথমা প্রভৃতি বিভক্তি ক্রমে সজ্জিত হইয়াছে—এবং বিভিন্ন বিভক্তির জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সরল হইতে কঠিন গণ্যায় ও প্রত্যয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক পাঠের প্রথমে পাঠ্য কঠিন শব্দের ইংরেজি অর্থ ও ব্যাখ্যা দিয়া পরে পাঠ রচিত হইয়াছে—ইহাতে বালক পাঠকের বিশেষ সাহায্য হইবে। অনেক প্রাচীন সদ্‌গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং কতক পণ্ডিত মহাশয়ের নিজের।—সকল পাঠগুলিই সরস এবং তাহার মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের স্নেহময় ভাব ও শিষ্যের ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ নিবিষ্ট তপস্যার চিত্র পাঠকের মনে ফুটিয়া আনন্দ দান করে। গ্রন্থ-পরিশিষ্টে পণ্ডিতবরের স্বরচিত ও সংগৃহীত বিচিত্র মধুর ছন্দে গ্রথিত বহু কবিতা ছাত্রদের আবৃত্তি ও অবসর-পাঠের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। সেগুলি প্রাঞ্জল এবং ললিত। বালকেরা অর্থ না বুঝিলেও ছন্দের ও বাক্যের মাধুর্য্যে আনন্দ পাইবে। ইংরেজিতে ব্যাখ্যা দেওয়ায় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ছাত্রের উপযোগী হইয়াছে। ইহা আদরলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।

মুদ্রারাক্ষস।

অনুসন্ধান—

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। এজেণ্ট—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি কোম্পানি কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। এখানি শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতির লিখিত ১১টি মৌলিক অনুসন্ধান-মূলক বিবিধ প্রবন্ধের সংগ্রহ পুস্তক। প্রায় সকল প্রবন্ধই বিশেষত্ব সম্পন্ন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের "ভারতীয় নাস্তিকদর্শনের ইতিবৃত্ত" ও "মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরবাদ" নামক প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিয়া পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—প্রবাসী-সম্পাদক।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত "নাস্তিকদর্শনের ইতিবৃত্ত"খানি পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিলাম। তাঁহার মতো একজন বুৎপন্ন শ্রেণীর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্বরূপ আমি অল্পই দেখিয়াছি—যিনি একেবারেই পক্ষপাতশূন্য হইয়া আমাদের দেশের প্রকৃত পুরাতত্ত্ব-মহলের অন্ধকারময় প্রদেশের দিকে ব্যক্তির জ্ঞানের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আছেন। আমি নিজে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি-গণের দলভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের কথা। বর্ত্তমান লেখকের সুললিত এবং সুপরিপক্ক রচনা পাঠ করিয়া পিপাসু ব্যক্তি ঝর্ণার জল পান করিয়া যেরূপ সুখ অনুভব করে সেই কথামৃত পান করিয়া আমি সেইরূপ সুখ অনুভব করি। তাহাতে আমার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি না হইয়া আরো আরো জিজ্ঞাসার ফোয়ারা খুলিয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গবেষণার বিষয়টি অতি নিপুণভাবে অন্ধকারময় গুহা-গহ্বরের মধ্য হইতে আলোকে টানিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। তাঁহার লেখা-দৃষ্টে এটা আমার ধ্রুবজ্ঞান হইয়াছে যে, বাস্তবিকই, প্রথম প্রথম বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি যাঁহারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারাই নাস্তিক বলিয়া গণ্য হইতেন। আমাদের দেশের পূর্ব্বতম ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়ের অনেকপ্রকার উচ্চশ্রেণীর সদ্‌গুণ ছিল একথা কাহারো সাধ্য নাই যে, তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু এটাও তেমি সেই যে অস্বীকার করিবেন তাহার জো নাই যে, একটি দোষে তাঁহাদের অনেকানেক গুণ মাটি হইয়াছে;—সেটি হচ্চে আমাদের দেশের সেই চিরকেলে রোগ—ইংরাজি-ভাষায় যাহার নাম Priest-craft। যেমন রোগ তেমি তাহার চিকিৎসা—লোকায়তিক, চার্ব্বাক, পাষণ্ড প্রভৃতি বাজোর আসুরিক চিকিৎসক রোগীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্মের গাত্র হইতে কলুষ মার্জ্জন করিতে গিয়া ধর্ম্মের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিমার্জ্জন করিয়া ফেলিতে তাঁহারা একটুও যত্নের ত্রুটি করেন নাই;—প্রত্যুত তাহার জন্য তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধি ব্যয় করিয়াছেন রাশি রাশি। যদি ও রোগের প্রকৃত চিকিৎসক কাহাকেও বলিতে হয়—তবে তিনি ছিলেন বুদ্ধদেব। পাশ্চাত্য প্রদেশের জহরী শ্রেণীর পণ্ডিতেরা তাই তাঁহাকে মাথায় করিয়া পূজা করেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের নবপ্রণীত গ্রন্থ পাঠে কয়েকটি প্রশ্ন আমার মনে উদিত হইয়াছে; সে কয়েকটি প্রশ্ন এই:—

মহাভারত-প্রণেতা বেদবাদের প্রতি কেন এত রুষ্ট? ভগবদ্‌গীতায় বেদবাদরত মূঢ়ব্যক্তিদিগের নিন্দাবাদ রহিয়াছে খুবই স্পষ্ট। অথচ গীতাশাস্ত্র আস্তিক শাস্ত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। ইহার ভিতরের ঐতিহাসিক রহস্যটা কিরূপ? তন্ত্র-শাস্ত্র অথর্ববেদের ঋণপাশে আপাদ-মস্তক জড়িত—অথচ তন্ত্রশাস্ত্র শিবের উক্তির দোহাই দিয়া বৈদিক আচার ব্যবহারের প্রতি খড়্গহস্ত। ব্রহ্মার বেদের দুর্গের মধ্যে শিবের উক্তি আসিয়া জুড়িয়া বসিল কোথা হইতে? বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রণেতা যিনি এই-সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহাগহ্বরের ভিতরকার রহস্য-কাহিনী জানিবার অভিলাষ আমাদের মনে জাগাইয়া তুলিয়াছেন—তিনি যদি আমাদের প্রতি সদয় না হ'ন—অর্থাৎ তিনিই স্বয়ং যদি আমাদের পাণ্ডা না হ'ন—তবে আমরা নিরুপায়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হানাষি—

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত, ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্ ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

"হানাষি" জাপানী কথা, অর্থ গল্প। সুরেশ বাবু অনেকদিন জাপানে ছিলেন; জাপানের নানা বিষয়ের অভিজ্ঞতা তিনি তাঁহার "জাপান" নামক গ্রন্থে নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—সে পুস্তক পাঠকসমাজে বিশেষভাবে আদৃতও হইয়াছে। এবার তিনি আমাদের জাপানী গল্প উপহার দিয়াছেন। যদিও ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম আমাদিগকে জাপানী গল্পের সহিত পরিচিত করিয়াছিলেন।

অন্য দেশের গল্পের সহিত জাপানী গল্পের বিশেষ পার্থক্য আছে। জাপানী গল্প সাধারণত এই মাটির সংসারের কোনো খবর দেয় না; স্বপ্নরাজ্য বলিয়া যে একটা অসম্ভব রাজ্য আছে—যেখানকার সবই কেমন-এক-রকমের; ভালো করিয়া, স্পষ্ট করিয়া ধরিবার ছুঁইবার যেখানে কিছুই নাই—যেখানকার সকল বস্তু কল্পনার রঙিন

মেলিয়া কেবল হাওয়ার উপর উড়িয়া বেড়ায়—অল্পই প্রকাশ করে এবং অধিকাংশই গোপন রাখে— জাপানী গল্প সেই রাজ্যের সংবাদ আমাদের শুনাইয়া দেয়। স্পষ্ট করিয়া কিছু না দেখিলেও এবং না বুঝিলেও একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হৃদয়তন্ত্রীতে স্পন্দিত হইতে থাকে। সুরেশবাবু এই জাপানী গল্প আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। বাংলা দেশের পাঠকমণ্ডলী এই বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে উপভোগ করিবেন বলিয়া আমাদের আশা আছে।

জাপানী গল্প ভাষান্তরিত করা সহজ নহে;—ইহার মধ্যে এমন মিহি জিনিষ আছে যাহা খুব মোলায়েম হাতে না পড়িলে মোটা হইয়া ভোঁতা হইয়া যায়। সুরেশবাবু সকল স্থানে সূক্ষ্মতা নিখুঁতভাবে বজায় রাখিতে পারেন নাই;—সেইজন্য গল্পের স্থানে স্থানে সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। ভাষা জাপানী গল্পের উপযোগী স্বচ্ছ তরল হাল্কা হয় নাই, ভাবের সঙ্গে ভাষা যেন প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারে নাই, সঙ্কোচে যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে। এইটুকু দোষ থাকিলেও পাঠকগণ গল্পের আন্তরিক রসাস্বাদনের আনন্দলাভে বঞ্চিত হইবেন না ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি।

গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভালো। প্রচ্ছদপটের উপর জাপানী ছাঁদের বাংলা অক্ষরে গ্রন্থের নাম সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। শ্রী:—

সোণাবিবি—

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)—শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস প্রণীত। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, সাম্য প্রেসে মুদ্রিত। ডবলক্রাউন ষোড়শাংশিত ২৩৪ + পরিশিষ্ট ৵০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

বিক্রমপুর-রাজদুহিতা বিধবা স্বর্ণময়ীর সহিত তদীয় রূপে লুব্ধ সুবর্ণগ্রামের মুসলমান নৃপতি ঈশা খাঁর পরিণয় ব্যাপার অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং তৎপ্রসঙ্গে তদানীন্তন কালের পাঠান ও মোগল রাজত্বের কিঞ্চিৎ ইতিহাস এবং স্বাধীন বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রামের অবস্থা আনুষঙ্গিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাসের হিসাবে বর্ণনা উপাদেয় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র সত্যমূলক বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা জানি, কেদার রায় চাঁদরায়ের পিতা; পরিশিষ্টে স্বয়ং গ্রন্থকারও তাহা একপক্ষের মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তত্রাচ, 'বর্ত্তমান গ্রন্থে ইঁহাদিগের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে তাহাই অধিকাংশের মত'— কেবলমাত্র এই নজীর দেখাইয়াই তিনি কেদার রায় চাঁদরায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের এই মত বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত আমরা গ্রহণ করিতে অসম্মত। পরিণয়-সম্বন্ধে স্ব[...] সম্মতি পাইবার পূর্ব্বে ঈশা খাঁ যে মূর্ত্তিতে গ্রন্থমধ্যে দেখা দি[...], তাহাও ইতিহাসের অনুমোদিত নহে। কিন্তু গ্রন্থকার এই চি[...]নের সুযোগে হিন্দুধর্ম্মকে কঠোর ইঙ্গিত করিয়া আবার বলিয়া[...]ছেন—'হিন্দু, গণ্ডির বাহির ক'রে দিতেই জানে।' হিন্দুসমাজ[...] এ মন্তব্য কালবিশেষে খাটিলেও, হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকা[...] খাজা নহে। হিন্দুধর্ম্ম মহা উদার ধর্ম্ম—সমাজের অস্পৃশ্য চণ্ডাল[...] ইহা আশ্রয় প্রদান করিয়াছে। এমন কি, নিজেদের সাম্প্রদা[...] সঙ্কীর্ণতা বশতঃ যাহারা হিন্দুত্ব স্বীকারে অনিচ্ছুক, সনাতন হি[...] তাহাদিগকেও বর্জ্জন করিতে রাজী নহে।

উপন্যাসের হিসাবে গ্রন্থ[...] রচনাকৌশল মন্দ নহে; কিন্তু স্থানে স্থানে বাহুল্য বর্ণনা, অ[...]কতা ও অপবিত্র ভাব গ্রন্থের গৌরব কিঞ্চিৎ হানি করিয়া[...] দূতীস্বরূপে ফতিমা যে ভাবে শ্রীকণ্ঠরায়কে উৎফুল্লন্নেসার [...]হিনী বুঝাইতে চাহিয়াছে, তাহা স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন ক[...]। তেলিয়াগড়ির দুর্গাভ্যন্তরস্থ গুপ্ত প্রকোষ্ঠে উৎফুল যখন গ[...]র দেখা পায় তখন সে একান্তই লোকসঙ্গবিরহিত ছিল: তা[...]ই নিঃসঙ্গ অবস্থা শৈশবাবধি ঘটিয়াছিল বলিয়াই প্রকাশ [...] অথচ সেই অবস্থায় তাহার জীবনধারণের উপায় কি ছি[...] উৎফুলের প্রশ্নে 'আমি—আমি—গলিলাজ'—ইত্যাকার [...] উত্তর প্রদান করিবার শক্তিইবা সে কোথায় লাভ করিল গ্রন্থ[...]াহার কিছুমাত্র আভাস দেওয়া না থাকায় সমস্ত ব্যাপারটাই [...] অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। মন্ত্রণাগৃহে অবস্থান কালে বৃদ্ধ[...] রায় ড্যাশের (—) সাহায্যে বাক্যের জড়তা ও বার্দ্ধক্যজনিত[...]তা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক। সুরুচি [...]া রক্ষা করিয়া যে স্থানে ঘটনার সমাবেশ করা চলিত, সেস্থানে অ[...] অযথা অপবিত্র ভাবের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। এই হিসা[...]নোরা ও রোসিয়ার বৃত্তান্তটী, গুতলু-ভবনের নিমন্ত্রণে উপেক্ষি[...]ফুলের বর্ণনা এবং উৎফুলের বাক্য ও ব্যবহারে যে চিত্র ফু[...] তাহা জঘন্য রুচির পরিচায়ক এবং অযথা বাহুল্য বর্ণনার দো[...]ঙ্কিত। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল। তবে দু এক স্থলে ইংরাজী-ভাঙ্গা[...] (যথা, 'কষ্টদায়ক অন্ধকার,' 'অবয়ববিরহিত সন্দেহ' ইত্যা[...] ব্যাকরণদুষ্ট বাক্যের (যথা, 'মনোকষ্ট,' 'কৌশল কার্য্যকরী,' [...]দি) ব্যবহার ঘটিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট মুদ্রাকর প্রমাদ [...]য়াছে।

—শ্রীখাতির-নদারত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী

আমরা ২৬শে আশ্বিন ডাকে রওনা করিব। পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে কোনো গ্রাহকের প্রবাসী পাইবার নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গেলে এবং প্রবাসী পাঠাইবার ঠিকানা বদল [...] হইলে আমাদিগকে ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে গ্রাহক নম্বর সহ জানাইবেন। অনেকে গ্রাহকনম্বর লেখা [...]ক মনে করেন; কিন্তু গ্রাহকনম্বর ব্যতীত অনেক নামের ভিতর হইতে একটি নাম খুঁজিয়া বাহির করা আমাদে[...] দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ একনামের একাধিক গ্রাহকও অনেক আছেন। গ্রাহকনম্বর প্রত্যেক গ্রাহকের প্রবাসীর [...] উপর লেখা থাকে। ১৫ই আশ্বিনের পরে বা গ্রাহকনম্বর-শূন্য পত্র পাইলে আমরা কোনোই প্রতিকার [...] পারিব না; এবং সেজন্য কাহারো প্রবাসী পাইতে গোলমাল হইলে আমরা সেজন্য দায়ী হইব না।

[...]-সম্পাদক।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত [...]শিত।